নারায়ণ সান্যাল

দশটি উপন্যাস

দে'জ পাবলিশিং

দশটি উপন্যাস

নারায়ণ সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা700 073

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী
সম্পাদক, *সাহিত্য সমাজ*
সুভাষপল্লী, খড়্গপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুজপ্রতিমেষু

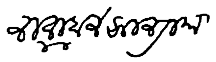

কৈফিয়ত

যদিও গ্রন্থটির নাম *'দশটি উপন্যাস'* তবু প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সাহিত্যে 'উপন্যাস' বলতে যা বোঝায় এ গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে সংকলিত সবগুলি কাহিনি সে অর্থে 'উপন্যাস' নয়। তবে শারদ-সাহিত্যের সম্পাদকেরা যে যোগরূঢ় অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন সেই অর্থে এ অভিধা প্রযোজ্য। এ কাহিনিগুলি কখনো পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কখনো বা কোনো বৃহৎ-গ্রন্থের স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনিরূপে। অনেকগুলি তৎপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—তার সঠিক হিসাব আমার স্মরণে নেই। কাহিনিগুলি রচনার কালানুক্রমে সজ্জিত নয়—পটভূমিকার কালানুক্রমে তারা উপস্থিত। প্রথমটি—অর্থাৎ *'আনন্দ'স্বরূপিণী* বস্তুত 'অস্পষ্ট অতীত হ'তে'। একাধিক প্রামাণ্য ইতিহাস ও গবেষণাগ্রন্থ থেকে তার উপাদান সংগৃহীত। তেমনি শেষ কাহিনি 'অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে'র। তার উপাদান বহু প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থ থেকে আহরিত।

ইদানীং 'উইমেন্‌স্-লিব' বলে একটি শব্দ চালু হয়েছে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে—কালানুক্রমিকভাবে সাজানোর সময় দেখা গেল প্রথম তিনটি কাহিনিতেই নায়িকা নায়কদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা পেয়েছেন।

তৃতীয় কাহিনি *'ব্রাত্য'* আমার প্রথম যুগের রচনা। সেটির বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। বলাইদা—অর্থাৎ বনফুল—সেটি পাঠ করে আমাকে পত্রযোগে পরামর্শ দিয়েছিলেন কাহিনির শেষ পংক্তিটা বর্জন করলেই ভালো হয়। আমি তাঁর সাজেশ্‌শান মানতে পারিনি। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হননি—কারণ তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুযায়ী *শ্রীমধুসূদন* নাটকের শেষাংশ পরিবর্তন করেননি।

'অলকনন্দা' ও *'মনামী'* কিছু ভিন্ন আঙ্গিকে রচনার চেষ্টা করেছিলাম। ভূমিকায় সে কথা বলা হয়েছে। তারপর স্বভাব-পল্লবগ্রাহিতায় সে আঙ্গিক আমি বর্জন করি।

দুর্লভ 'দুর্লভ' কাহিনিটির মূল উপাদান নিতান্ত ঘটনাচক্রে লাভ করা। সেই দুর্লভ-অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে সঙ্গীত বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করে এ কাহিনিটি রচনা করি; সঙ্গীত-বিষয়ে ওইটিই আমার একমাত্র রচনা।

*'স্নেহধন্যা'*টিকে নিতান্ত ঘটনাচক্রে লাভ করি। গত শতাব্দীর সত্তর সালে *'নেতাজি রহস্য সন্ধানে'* যখন পূর্ব-এশিয়ায় হন্যে হয়ে ঘুরে মরছি তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক প্রাক্তন সৈনিকের কাছ থেকে ইংরেজিতে টাইপ

করা একটি জরাজীর্ণ 'আত্মকথন' পাই। সেটুকুই ওই কাহিনির মূল উপাদান। তবে মিস্ নায়ারকে আমি দেখিনি। সমকালীন ইতিহাস ঘেঁটে মনে হয়েছে মিস্ নায়ারের আত্মকথা আদ্যন্ত বাস্তব ঘটনা।

'*শার্লক হেবো*' এ সংকলনে অড্-ম্যান-আউট। ঘনাদা-টেনিদার মতো তাকে নিয়ে আরও কিছু গল্প লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।

'*ছোঁবল*' কাহিনিটিতে শুধু 'দাদাঠাকুর' নন, বাকি চরিত্রগুলিও বাস্তব। 'মুরারী'দা আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। বাস্তব ও কল্পনা মিশিয়ে আমার জন্মভূমির পটভূমিকায় কাহিনিটি দানা বেঁধে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আরও স্বীকার করি—নামকরণে বর্ণাশুদ্ধি নেই। প্রুফনিরীক্ষককে অহেতুক দোষারোপ করবেন না। পাণ্ডুলিপিতেও শিরোনামের মুকুট ছিল 'চন্দ্রোদ্ভাষিত শিখর।'

শেষ রচনাটি যে 'হিন্দের বন্দি' নয় এটা পাঠককে স্পষ্টাক্ষরে জানাতে চাই। এটি একটি মৌলিক 'সায়েন্স ফিকশান'।

প্রসঙ্গত জানাই এ-গ্রন্থ বাংলা আকাদেমির *বানান অভিধান* (৪র্থ সং) অনুসারে রচনার চেষ্টা করা গিয়েছে। হয়তো অনভ্যাসে কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। অভিন্ন বানানরীতির জন্য আকাদেমির সচিব এবং সংকলক শ্রীপবিত্র সরকার প্রমুখ পণ্ডিতেরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। 1936 সাল থেকে যে স্বপ্ন আমরা দেখে এসেছি তা এতদিনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সে অভিধানে ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক আপত্তি আছে। পৃঃ 550-52তে যে তিনশত বিকল্প বানান স্বীকৃত তা মূল প্রতিপাদ্যের পরিপন্থী। এমনকি 'সূর্য, বীর্য'-কে উপেক্ষা করে 'ঈর্ষ্যা' শব্দটি দ্বিত্ববর্জনের আইন অমান্য করেছে। 'ঈর্ষ্যা'কে ঈর্ষা হয়। 'মফঃস্বল' বানানের অনুমোদিত রূপেও (মফস্সল) আমার আপত্তি। 'হত' (নিহত) এবং 'হতো' (হইত) পার্থক্যই তো যথেষ্ট, আবার বিকল্প 'হত' (হইত)তে অভিন্নরীতি হত হল কেন? 'কোনো' এবং 'কোনও' অনুমোদনের পরে 'কোন্'-এ হস্-অন্ত চিহ্নটি কি বাহুল্য নয়? এসব ব্যাপারে আমরা ধূম তর্ক করতে পারি; কিন্তু আমরা চাই বাংলা-সাহিত্যে একটা অভিন্ন রীতি বাধ্যতামূলকভাবে চালু হোক। বিভিন্ন প্রকাশক, প্রুফ-রিডার এবং সহযাত্রী লেখকেরা আকাদেমির এ নির্দেশ 'নত লেখনীতে' মেনে নিক এটাই আমাদের কাম্য। সারস্বতমন্দির-মার্জনাকারীর সম্মার্জনী একই ছন্দে সে মন্দির প্রাঙ্গণকে কলুষমুক্ত করুক—পবিত্র করুক।

নানাস্বাদের এই 'অমনিবাস'টি পাঠিকা-পাঠকদের আনন্দ দিলে নিজেকে ধন্য মনে করব। না দিলে আমি নাচার। বছরআষ্টেক আগেই তো বারোটা 'ছক্কা' হাঁকড়ানো গিয়েছে—এখন এই হচ্পচ সংকলনের জন্য আপনারা যদি বলেন যে, মধ্যমপাণ্ডবের মতো রথারূঢ় হয়েছি তাহলেও আমি দুঃখ করব না!

নারায়ণ সান্যাল

৩০/১২/০৩

এতে আছে

'আনন্দ'স্বরূপিণী/১১
হংসেশ্বরী/৮১
ব্রাত্য/১৮৫
অলকনন্দা/২৪৭
মনামী/৩০৯
দুর্লভ 'দুর্লভ'/৪০৩
স্নেহধন্যা/৪৩১
শার্লক হেবো/৪৮৩
ছোঁবল/৫৪৭
অবাক পৃথিবী/৬০১

'আনন্দ'স্বরূপিণী

উৎসর্গ

পণ্ডিত শ্রীঅনন্তলাল দেবশর্মা (ঠাকুর)

রচনাকাল : 1977
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, 1978,

কৈফিয়ত

এ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অংশ শারদীয় **'শিলাদিত্য'** ১৩৮৪-তে প্রকাশিত। ইতিপূর্বে **'মহাকালের মন্দির'**-এ (রাওয়ালা) আমি ছিলাম সম্পূর্ণভাবে শরদিন্দুর ভাষা-অনুসারী। ক্রিয়াপদগুলি সেখানে কথ্যরূপ পরিগ্রহ করেনি। ফলে এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে মাঝে-মাঝে 'শবপোড়া-মরাদাহ' সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত একজনের দ্বারস্থ হওয়া গেল। তিনি বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন "ইংরাজিতে মূল সংস্কৃত base-গুলিকে অবিকৃত রাখিয়া তাহার উপর বিভক্তি যোগ করা হয়। বাঙলায় অনুরূপ করা ভাল দেখায় না। তাই 'বুদ্ধযশার' 'বুদ্ধযশাকে' প্রভৃতি বাঞ্ছনীয়—'বুদ্ধযশস্-এর', 'বুদ্ধযশস্‌কে' নহে।" প্রথম প্রকাশকালে এই ভুলগুলি ছিল। এবার তা সংশোধন করেছি।

প্রসঙ্গত জানাই স্বভাব-বিনয়ী পণ্ডিত আমাকে চিঠিতে আরও লিখেছিলেন :

"শৈবালো দীর্ঘিকাং প্রাহ
প্রোন্নমস্য শিরঃ স্বকম্।
শিশিরস্য কণো দত্তঃ
স্মর্তব্যঃ সর্বদা তব।।

বলাবাহুল্য এটি কণিকার একটি অণুকবিতায় সংস্কৃত অনুবাদ (শৈবাল দীঘিরে কহে....)

ভারতের ইতিহাসে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যতটা সমুজ্জ্বল মহাভিক্ষু কুমারজীব ততটা স্বীকৃতি পাননি। কাব্যে-উপেক্ষিত-র মতো সেই ইতিহাস-উপেক্ষিত কুমারজীবকে এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র বা নায়ক করতে চেয়েছিলাম। কী জানি হয়তো তাঁর অপেক্ষা অক্ষুমতীই বেশি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।

নির্দেশিকা ও ব্যাখা : কাহিনী-শেষে সন্নিবেশিত।

লক্ষযাত্রীর পদচিহ্নচর্চিত সহস্রাব্দীর মৃত্যুহীন পথ। লক্ষযাত্রীর নরকঙ্কাললাঞ্ছিত মৃত্যুলীন পথও বটে। শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবের। কুমারস্বামী যাকে বলেছিলেন 'প্রাচীন প্রাচী', সেই উপবৃত্তাকার মহান সংস্কৃতির দুইটি মূল নাভির যোজক এই ত্রিধারাপ্রবাহিত পার্বত্যপথ,—ইতিহাস যাকে চিহ্নিত করেছে 'রেশম-সড়ক' অভিধায়। উত্তরে তিয়েনশান, দক্ষিণে কারাকোরাম ও কুন্‌লুনশান, পশ্চিমে পামীরগ্রন্থী এবং পূর্বে ভয়ঙ্করী গোবি মরুভূমির দিকে অভিশাপবর্ষণদৃপ্ত দুর্বাসার প্রসারিত অঙ্গুলিসঙ্কেতের মতো ইঙ্গিতবাহী বালুকাস্তূপের আদিগন্ত বিস্তৃতি। এ পথের এক পার্শ্বে অভ্রংলিহ তুষারাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণীর ধ্যানস্তিমিত গাম্ভীর্য, অপর পার্শ্বে স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীর প্রতি ধাবমান পাতালস্পর্শী মৃত্যুখাদ। সেই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে প্রস্তর-সমাকীর্ণ পাকদণ্ডীর ঘূর্ণাবর্তে অতি সাবধানে পর্বতাবরোহণ করছিল একমুষ্টি মানবশিশু। তাছাড়া সমগ্র চরাচরে প্রাণের কোনো সাড়াশব্দ নেই। না; আছে—লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নির্মেঘ আকাশের নিঃসীমায় চক্রাকারে সঞ্চরমাণ কয়েকটি বিন্দু—ওরা জীবনের সঙ্কেতবহ নয়, জীবনাবসানের দ্যোতক, শকুনি-গৃধিনীর দল। ঊষর তাকলামাকান মরুভূমি আর জনমানবহীন তিয়েনশান পর্বতের এই প্রাণহীন প্রান্তরে ওই রেশম সড়কের ধারে ধারেই ওরা পায় জীবনধারণের উপাদান—মৃত্যুর বিনিময়ে : মুমূর্ষু মানুষ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র!

সংখ্যায় যাত্রীদল অন্যূন দশজন। দূর থেকে ওরা আলম্ব-প্রাচীরগাত্রে সঞ্চরমাণ সারিবদ্ধ পিপীলিকার মতো প্রতীয়মান হচ্ছিল বটে, কিন্তু যাত্রীদল আরও নিকটবর্তী হওয়ায় এখন ওদের শনাক্ত করা যায়। তিনজন রমণী, একজন রাজপুরুষ, অবশিষ্ট কিঙ্করশ্রেণী—পল্যঙ্কিকা-বাহক, দেহরক্ষী, পাচক ও ভৃত্য। শ্বেতবর্ণের একটি আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে যিনি দলের পুরোভাগে পর্বতাবরোহণ করছিলেন তিনিই পূর্বোক্ত রাজপুরুষ; যদিচ তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ আদৌ রাজবংশোচিত নয়। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গে গৈরিক কাষায়, তদুপরি পার্বত্য অঞ্চলের শৈত্যনিবন্ধন পশমের কম্বল। কটিদেশে বিলম্বিত—না, তরবারি নয়, পশম-রজ্জুতে আবদ্ধ অক্ষোট-কাষ্ঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। নিঃসন্দেহে তিনি একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। বহিরাবরণে আড়ম্বরের অভাব সত্ত্বেও তাঁর দেহাকৃতিতে রাজকীয় মর্যাদার ব্যঞ্জনা— শালপ্রাংশু সন্নত দেহ, উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ, চক্ষুতারকায় মধ্যএশীয় নির্মেঘ আকাশের ঘন নীলিমা। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ, যদিও তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে নাতিপ্রৌঢ় বলে ভ্রম হয়। ঋজু দীর্ঘ দেহ, ললাটে বা মুখাবয়বে তিলমাত্র বলিরেখাচিহ্ন নেই, আছে আত্মতৃপ্তির এক প্রশান্ত জ্যোতি। বহিরাবরণে না থাকলেও তাঁর ধমনীতে আছে রাজরক্তের স্বাক্ষর।

ইনিই আমাদের কাহিনীর নায়ক। এঁর নাম—থাক! নাম উচ্চারণে তাঁকে পরিচিত করা যাবে না। তোমরা তাঁর নাম শোননি। ইতিহাস তাঁর নামটি স্মরণে রাখতে ভুলেছে। এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি—তোমরা আমাকে মার্জনা কর। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। ইতিহাসচর্চা আমার সামান্যই। তবু বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয় হিসাবে আমাকে ভারতীয় ইতিহাস পাঠ করতে হয়েছিল। সে আজ ছয় দশক পূর্বেকার কথা। আমার সেই ভারতীয় ইতিহাস গ্রন্থে আমার এই নায়কের নামটি পাইনি। ইদানীংকালের বি.এ. পরীক্ষার ইতিহাসের প্রশ্নপত্রগুলি অন্বেষণ করে দেখেছি, তাঁর বিষয়ে সাম্প্রতিককালে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়নি। নিঃসন্দেহে তিনি ভারতের ইতিহাসে উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়, বিস্মৃত! সে অপরাধ ওঁর নয়; সে পাপ তোমার, সে পাপ আমার। আমি তো মনে করি : উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিশ্ব-সংস্কৃতির মহাসভায় ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা-ধর্মের ধ্বজাধারীরূপে যদি পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের নামটাই সর্বপ্রথমে মনে আসে তবে বিগত দ্বিসহস্রাব্দীতে যে পরিব্রাজকটির নাম স্মরণে আসা সঙ্গত, তিনিই আমার কাহিনীর ইতিহাস-উপেক্ষিত নায়ক—যাঁর নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে মধ্যপথে থেমে পড়েছি!

স্থান, কাল আর পাত্র। প্রথমে 'স্থান', অর্থাৎ ভূগোল; তারপর 'কাল' বা ইতিহাস, সর্বশেষে 'পাত্র'—কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।

প্রথমে ভূগোল। ঘটনাস্থলের অবস্থান—অক্ষাংশ ৪১° উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৮০° পূর্ব। ভূ-মানচিত্র অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন—আমাদের অবস্থান কেন্দ্রীয় রেশম-সড়কে; কুচী জনপদ ও কাশগড় নগরীর মধ্যবর্তী অংশে; তাকলামাকান মরুভূমির উত্তর-সীমান্তলীন পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত তারিম নদীর উত্তর উপকূলে। বোধ করি তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানটার প্রকৃত ধারণা হল না। না,—পাঠকের ভূগোলজ্ঞানের প্রতি এ কোনো তির্যক কটাক্ষ নয়; বস্তুত এ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে লেখকের নিজস্ব ধারণাও ছিল একই রূপ অস্পষ্ট, ধোঁয়াশায় আচ্ছাদিত। একমাত্র জেম্স্ হিল্টনের 'লস্ট হোরাইজন' ভিন্ন অন্য কোনো ঔপন্যাসিকের অনুগামী হয়ে ওই নিষিদ্ধ দিগন্ত-বিলুপ্তির অজ্ঞাত রাজ্যে কখনও পদার্পণ করেছি বলে স্মরণ হয় না। ফলে একটু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে :

'প্রাচীন প্রাচী'-র দুই প্রধান প্রতিবেশী মহাচীন ও ভারত পরস্পরকে প্রথম কবে চিনল, একে অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হল সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সরকারীভাবে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম নাকি মহাচীনে উপনীত হয় খ্রিস্টজন্মের সমসময়ে—বক্ষু উপত্যকার একজন জনপদনায়ক নাকি চীন সম্রাটকে খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে একটি বৌদ্ধগ্রন্থ উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু তারও পূর্বে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করে কোন্ কোন পরিব্রাজক যে চীনখণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। চ'ঈন বংশের প্রথম সম্রাট শী হোয়াঙ তি খ্রিস্টপূর্ব যুগেই নাকি তাঁর রাজধানীতে একজন বিধর্মী বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারককে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান্ বংশীয় সম্রাট উ-র একজন সৈন্যাধ্যক্ষ—'হো পুচিং' তাঁর নাম—উত্তর এশিয়ার এক উপজাতিনায়কের কাছ থেকে একটি সুবর্ণ-বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পানিক্কর। ওই যুগে থেরবাদী বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করতেন না। সুতরাং একথাই কি ধরে নেব যে, উল্লিখিত বুদ্ধমূর্তি একটি স্তূপের বিকল্প? বোধিদ্রুম, পদচিহ্ন, ধর্মচক্র ইত্যাদি কোনো কিছুর প্রতীক? জানি না। মোট কথা, অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীন ও ভারত পরস্পরের পরিচয় পেয়েছিল, সখ্য-বন্ধনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল দুটি বিকল্প পথে। প্রথম সড়কটা হিমালয়ের উত্তর সীমান্ত দিয়ে বিসর্পিল স্থলপথ; দ্বিতীয়টা সমুদ্রপথ—সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), শ্রীবিজয় (যবদ্বীপ), কম্বুজদেশ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (কোচিন চীন) হয়ে কান্তিগড় (ক্যান্টন) বন্দরে উত্তরণ। সেই পথটা সমুদ্রতরঙ্গভঙ্গের অনিত্যতায় পদচিহ্নরেখা রাখেনি কিছু। কিন্তু উত্তর হিমালয়ের স্থলপথ শুধু সহস্রাব্দীর যাত্রীচরণলাঞ্ছিতই নয়, নরকঙ্কাল সমাকীর্ণ, সুচিহ্নিত। সে পথের বাঁকে বাঁকে উদাসীন মহাকালের ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আজও দাঁড়িয়ে আছে স্মারকচিহ্ন—কপিশ, হাড্ডা, বামিহান, তুরফান, খ্যিজিল, তুনহুয়ান-এর ধ্বংসাবশেষ।

চীন ও ভারতের আত্মিক মিলনের পথে একাধিক বাধা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রক্তচক্ষুর বাধার কথা আমি তুলছি না, বলছি প্রাকৃতিক বাধার কথাই। যে প্রতিবন্ধকতা সারির পরে সারি। যেন তিন সারি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চীনের দিক থেকে অগ্রসর হবার পথে প্রথম বাধার অর্ধাংশ দুরন্ত গোবি-মরুভূমি, অপর অর্ধাংশ তুষারমণ্ডিত দুরতিক্রম্য তিয়েনশান পর্বতমালা। দ্বিতীয় সারির প্রতিবন্ধকতা শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর : পশ্চিম থেকে পূর্বে যথাক্রমে—হিন্দুকুশ, পামীরগ্রন্থী, কারাকোরাম, কুন্‌লুনশান, মিন্‌শান পর্বত। এই দুই সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশে আদিগন্ত বালুকাময় সমুদ্র তাকলামাকান মরুভূমি। সর্বশেষ বাধা পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ অভ্রংলিহ মহা হিমালয় স্বয়ং।

তবু মানুষ হার মানেনি। নতিস্বীকার করেনি ভারত অথবা চীন। ঐ অসংখ্য প্রতিবন্ধকতাকে অস্বীকার করে তারা মৈত্রীর পথ চিনে নিয়েছে। অন্বেষণ করে জেনেছে—কোথায় আছে অধিত্যকা, উপত্যকা, পাকদণ্ডীর পথ, পার্বত্যগুম্ফা, পানীয় জল। পাথরের বুকে দুলিয়েছে পাষাণ সোপানের শতনরী, নদীর কটিদেশে পরিয়ে দিয়েছে ঝুলন্ত-সেতুর মেখলা,—পাছে উত্তরকাল পথভ্রষ্ট হয় তাই লক্ষ দধীচি পথের প্রান্তে ছড়িয়ে রেখে গেছে বুকের পাঁজর। তাকলামাকান মরুভূমিকেই ভূগোলের অন্তিম নিদান বলে তারা স্বীকার করেনি; ওরা খুঁজে বার করেছে মরুভূমির সমান্তরালে প্রবহমান

প্রাণধারাকে : স্বচ্ছতোয়া তারিম নদীকে। সেই জীবনদাত্রী তারিম নদীর অববাহিকায় মানুষ গড়ে তুলেছে সারি সারি মরু-পান্থশালা; খর্জুর-সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র জনপদে বালুকাস্তূপের গভীরে আবিষ্কার করেছে মাতৃস্তন্যের মতো সুস্বাদু লুপ্ত প্রস্রবণ। গড়ে তুলেছে—মরুপান্থগৃহ, বাণিজ্যকেন্দ্র, পার্বত্যগুম্ফার আশ্রয়ে সঙ্ঘারাম। ঐসব ক্ষুদ্র জনপদে প্রাণধারণের প্রয়োজন মেটাতে সহস্রাব্দীকাল ধরে যাত্রা করেছে লক্ষ লক্ষ যাত্রী—পদব্রজে, অশ্বারোহণে, অশ্বতরের পৃষ্ঠে, উষ্ট্রে। সে পথকে ইতিহাস আদর করে বলেছে—রেশম সড়ক, বলেছে মশল্লা-পথ।

এ পথ মোটামুটি ত্রিধারায়। যেন খাইবার গিরিবর্ত্মের মুক্তবেণী শেষবেশ যুক্তবেণী হল চীনের প্রবেশ তোরণ : তুনহুয়ান-এ। সরস্বতী-যমুনা-গঙ্গা। প্রথম সড়কটি তিয়েনশান পর্বতের উত্তর সীমান্ত দিয়ে—সমরখন্দ, তাশখন্দ, খোকন্দ্ পার হয়ে, স্ফটিকস্বচ্ছ ঈশক্-কূল হ্রদের কিনার দিয়ে—যা ছিল চীন-ব্যাকট্রিয়া-পারস্যের বাণিজ্যপথ। দ্বিতীয় পথটি তারিম নদীর অববাহিকা-আশ্রয়ী, যে পথে পড়বে কাশগড়, কুচী, কারাশর, তুমশুখ, খ্যিজিল, তুরফান। আর তৃতীয় সড়কটা তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর, হিমালয়ের তরাইয়ের কোল ঘেঁষে। সে পথও শুরু হয়েছে ঐ কাশগড় জনপদে; সে-পথে পড়বে ইয়ারকং, খোটান, চারচান, মিরান;—লবনরের প্রান্ত দিয়ে সে পথও শেষ হবে মহাচীনের প্রবেশ-তোরণে ওই যুক্তবেণীর মহান বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম : তুনহুয়ান-এ।

এই তিনটি বিকল্প পথরেখা ধরেই ভারতবর্ষ থেকে চীন-ভূখণ্ডে গিয়েছিলেন অযুত-নিযুত পরিব্রাজক—কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরত্ন, কুমারজীব, বুদ্ধযশা, বিমলাক্ষ, ধর্মক্ষেম, বুদ্ধভদ্র, গুণবর্মা, ধর্মগুপ্ত, শিক্ষানন্দ, বিনীতরুচি, বোধিধর্ম, বজ্রবোধি প্রভৃতি। যাঁদের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। আবার ঐ পথেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকের দল : ফা-হিয়েন, হিউ-এন-ৎসান, ইৎ-সিঙ, যাঁরা আমাদের ইতিহাসের 'মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন'! তাই বলছিলাম, এ-পথ শুধু মহাপ্রস্থানের নয়, মহা-আবির্ভাবেরও। শুধু পরিব্রাজক নয়, এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে সওদাগরের দল, নিয়ে গিয়েছে উটের পিঠে 'বোঝাই দিয়ে ভারতীয় রপ্তানি-সম্ভার : লাক্ষা, মশল্লা, গজদন্ত, তৈজসপত্র, মৃগনাভি, কস্তুরী, চন্দন—আর নিয়ে এসেছে চীনখণ্ড থেকে নানাবর্ণের চীনাংশুক, ভারতীয় হিন্দু-সীমন্তিনীর জন্য চীনাসিন্দুর, ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, জেড-পাথরের ও চীনামাটির সৌখীন সামগ্রী।

ঐ মধ্যম রেশম-সড়কে কুচী ও কাশগড়ের সমদূরত্বে এ কাহিনীর পটোত্তোলন।

দ্বিতীয় কথা : কাল। ইতিহাস। সময়টা ২৯২ শকাব্দ অর্থাৎ ৩৭০ খ্রিস্টাব্দ। আমরা আছি সেই অজ্ঞাত বন্ধ্যাযুগে, যাকে ইতিহাস বলে 'ডার্ক এজ'। কুশান রাজবংশের গরিমা অস্তমিত, মালব ও সৌরাষ্ট্র-অঞ্চলে শক নৃপতিবৃন্দ 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করে কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করছেন। মগধে এক নতুন রাজবংশের সূচনা হয়েছে। গুপ্ত রাজবংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহ সেই স্বর্ণযুগে ঊষার আলো। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়েক শতাব্দী ধরে মগধ, লিচ্ছবি, কোশল ও কাশীরাজ কোনক্রমে মাৎস্যন্যায় এড়িয়ে নামমাত্র রাজত্ব করছিলেন। তার দুটি শক্তিশালী অংশীদার বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় নতুন যুগের সূচনা হল। আমাদের কাহিনীর কালে শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীতে কবি কালিদাসের হয়তো চূড়াকরণ হচ্ছে—মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের ত্রিংশতি বর্ষকাল রাজ্যশাসন অতিক্রান্ত হল। কিন্তু আমাদের কাহিনী যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সেখানে সমুদ্রগুপ্তের নাম কেউ জানে না। সেখানে মরুভূমির ভেতর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরূদ্যানের ন্যায় আছে কিছু ক্ষুদ্র জনপদ এবং তাদের শাসনকর্তা—কপিশ, নগরহার, কাশগড়, কুচী, খোটান, ইয়ারকন্দ্, তুরফান, তুং-হুয়াঙ। তাঁদের রাজ্যসীমার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে উপনীত হতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তই যথেষ্ট। অবশিষ্ট ভূখণ্ডের অধীশ্বর নিয়তির মতো উদাসীন আদিগন্তবিস্তৃত তাকলামাকান মরুভূমি।

আমরা যতক্ষণ ভূগোল-ইতিহাস আলোচনা করেছি ততক্ষণে ঐ যাত্রীদলের পর্বতাবরোহণ সমাপ্ত হয়েছে। ওঁরা উপনীত হয়েছেন উপলমুখর স্বচ্ছতোয়া এক পার্বত্যনদীর উপকূলে। নদী পারাপারের জন্য একটি ঝুলন্ত সেতু আছে। বৌদ্ধভিক্ষু তাঁর তিনজন সহযাত্রিণীকে নিয়ে অতি সাবধানে সেতু অতিক্রম করে পরপারে এসেছেন। বর্তমানে ভৃত্যশ্রেণীর লোকেরা একে একে মালপত্র নিয়ে নদী পার হচ্ছে। ভিক্ষু ঐ নদীর অতি সন্নিকটে উপবেশন করে লক্ষ্য করছিলেন তাদের। পুরকামিনীদের মধ্যে

দুইজন এতক্ষণ পল্যঙ্কিকায় বাহিতা হচ্ছিলেন। সেতুটি কিন্তু তাঁদের পদব্রজে অতিক্রম করতে হল। একজন বৃদ্ধা; কুচী জনপদের নৃপতি রাজা পো-সাঙ-এর ভগ্নী। বস্তুত, ঐ বৌদ্ধভিক্ষুর গর্ভধারিণী, ভিক্ষুণী জীবা। দ্বিতীয়জন তাঁর পরিচারিকা এবং রাজকন্যার বয়স্যা শ্রবণা। 'পরিচারিকা' বলা বোধ হয় ঠিক হল না, সে আদৌ বেতনভুক কিঙ্করী নয়, রীতিমত সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। রাজ-অমাত্য শিবমিশ্রের আত্মজা। রাজপরিবারের অভ্যন্তরে আভিজাত্যের রীতি ও সংসর্গজ শিক্ষায় অভ্যস্ত হতে সেকালে এভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের অনূঢ়া কন্যাকে রাজাবরোধে রাখার প্রথা ছিল। শ্রবণা পরিচারিকা নয়, বাস্তবে সে রাজকন্যার বয়স্যা। রাজকন্যাকে সঙ্গদান করতেই সে এসেছে এ দলের সঙ্গে। কুচী রাজকন্যা কিন্তু পল্যঙ্কিকায় বাহিতা হচ্ছিলেন না—এ দীর্ঘপথ তিনি অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন। তাঁর পোশাকও পুরুষোচিত। যোদ্ধবেশ। বক্ষে লৌহজালিক, পৃষ্ঠে তূণীর, কটিবন্ধে তরবারি। অশ্বটিকে নদীর কিনারে বন্ধনমুক্ত করে তিনি ফিরে এসে ভিক্ষুর অনতিদূরে এক প্রস্তরাসনে উপবেশন করলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভদন্ত! এই স্রোতস্বিনীর নাম কী?

ভিক্ষু করলগ্নকপোলে আপন চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সম্পর্কে রাজকন্যার জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তবু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় রাজকন্যা তাঁকে আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করতে পারেন না। ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। স্মিতহাস্যের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন, আত্মানং বিদ্ধি!

রাজকুমারী অক্ষুমতীর সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার আছে। কাশগড়, কুচী, খোটান অঞ্চলে ইরানীয় কথ্যভাষার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথ্যভাষার সংমিশ্রণে এক প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত। লিপি ব্রাহ্মী নয়, খরোষ্ঠী; কিন্তু রাজকন্যা যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও তাঁর প্রাকৃত প্রশ্নের এই মার্জিত সংস্কৃত প্রত্যুত্তরের অর্থ তাঁর বোধগম্য হল না। সবিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার দিকে।

শ্রবণা বসেছিল অদূরে। তারও দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা।

রহস্যের উন্মোচন করলেন বৃদ্ধা জীবা। বললেন, অক্ষুমতী! এ জলধারা তারিম নদীর একটি উপনদী। এর নামানুসারেই জন্মলগ্নে তোমার নামকরণ করা হয়েছিল। কুমার তাই রহস্য করে বলছেন, তুমি ঐ নদীর ভিতরেই নিজেকে চিনে নাও। এ স্রোতস্বিনীর নাম : 'অক্ষু'।

রাজকুমারীর চক্ষুদুটি কৌতুকে নৃত্য করে ওঠে। হঠাৎ যেন ঐ উচ্ছল স্রোতস্বিনীর সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধন অনুভব করেন। ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, মাতৃদেবী যথার্থ কথাই বলেছেন অক্ষুমতী। ঐ নদীর জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখ। তোমার স্বরূপটি দেখতে পাবে। ঐ অক্ষু নদী তোমারই মতন চঞ্চলা, তোমারই মতন বেগবতী এবং তোমারই মতন সুশীতল, তৃষ্ণানিবারিণী!

রাজকুমারী লজ্জা পান। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট এ-জাতীয় প্রশংসাবাক্য শ্রবণে তিনি আদৌ অভ্যস্তা নন। ভিক্ষু কুমারজীব গম্ভীর, স্বল্পভাষী, অপ্রমত্ত—বোধকরি মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে, রুক্ষ-ঊষর মরু-অঞ্চলের মানুষ এই নদীর উপকূলে এসে কিছু উচ্ছল। কিন্তু হার মানবার মেয়ে অক্ষুমতীও নয়। সঙ্কোচকে জয় করে সে বলে ওঠে, কিন্তু মহাভাগ! প্রতিবিম্ব অবলোকনের অবকাশ কোথায়? এ দ্রুতছন্দ তটিনীর তো প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মতো মনের স্থিরতাই নেই।

: তাতেই তো সে তোমার সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হয়েছে অক্ষুমতী। কী বল শ্রবণা? পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রমণেও তোমার প্রিয়সখীর অন্তর কারও প্রতিবিম্ব ধরে রাখার মত স্থিরতা লাভ করেছে কি? নদীর আর দোষ কী?

নিঃসন্দেহে ভিক্ষু আজ প্রগল্‌ভ হয়ে পড়েছেন। কথার পিঠে কথা। এবং সে-কথায় ছিল শ্লেষ। কুচী রাজকন্যার সৌন্দর্যের খ্যাতি বৈশাখী ঘূর্ণিঝড়ে তাড়িত তাকলামাকানের বালুকাপুঞ্জের ন্যায় দ্রুতগতি ছড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। শুধু রূপ নয়। রাজনন্দিনী অক্ষুমতী সকলকলাপারঙ্গমা। পুত্রহীন কুচীরাজ পো-সাঙ মাতৃহীনা এই একমাত্র আত্মজাটিকে তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। পুরুষের যোদ্ধবেশে সে সমরনায়কদের নিকট যথোচিত সামরিক শিক্ষা পেয়েছে—অসিবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, পর্বতারোহণ। এদিকে ভাষাশিক্ষা, সঙ্গীত, কাব্য, দর্শনের চর্চাও উপেক্ষিত হয়নি। ফলে রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রমাগত বিভিন্ন জনপদ থেকে ভাটের দল কুচী রাজসভায় এসে স্ব-স্ব রাজ্যের

রাজকুমারদের বীরত্বগাথা ও নানা গুণকীর্তন করে যায়। কুচীরাজ কাউকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি সকলকেই জানিয়েছেন, রাজকন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হলে তিনি এক মহা-স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন। রাজনন্দিনী নিজ অভিরুচি অনুযায়ী তাঁর জীবনসঙ্গীকে নির্বাচন করবেন। যতদূর জানা যায়—রাজকুমারী এখনও মনস্থির করতে পারেননি। তাই কুমারজীবের এই তির্যক ব্যঙ্গ !

শ্রবণা সসম্ভ্রমে বলল, থের! আপনার উপমান এবং উপমেয় কিন্তু অভিন্ন-আত্মা নয়। বিবেচনা করুন : আগামী বৎসর মদনোৎসবে স্বয়ম্বর সভায় প্রিয়সখীর অন্তর-দর্পণে স্থায়ী ছায়াপাত ঘটবে, পরন্তু চঞ্চলা অক্ষু নদীর অন্তরে কোনদিনই কারুর প্রতিবিম্ব পড়বে না।

পঞ্চাশৎবর্ষীয় মহাস্থবিরের প্রতি একটি অনূঢ়া পঞ্চদশীর এজাতীয় বাক্‌প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন—কালের মাপে আমরা আছি মধ্যযুগীয় সঙ্কীর্ণতা এবং পর্দাপ্রথার প্রাক্‌যুগে। বহির্ভারতের পুরললনা হলেও বক্তা কবি কালিদাসের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। উজ্জয়িনীর নিপুণিকা-চতুরিকা দলের পূর্বসূরী। কালের পরিমাপে ও মৈত্রেয়ী-গার্গীর কিছু নিকটবর্তিনী। তাই আপনার-আমার কাছে যেটা প্রগল্‌ভতা বলে মনে হচ্ছে, সেটা নিতান্তই কৌতুক বলে প্রতীয়মান হল মহাস্থবিরের কাছে। তিনি পুনরায় সহাস্যে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না শ্রবণা। নারী ও নদী অভিন্ন-আত্মা। অক্ষুনদীর আর অক্ষুমতীর তুলনা এক্ষেত্রে ত্রুটিহীন। এই নদীর স্রোতরেখা ধরে যদি চলতে থাক উপনীত হবে—বাঘ্রাশ-কোল হ্রদের উপকূলে। সেখানে পৌঁছে স্থির হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে অক্ষু। গতির বিনিময়ে সে সেখানে পাবে গভীরতা। তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, তার অচঞ্চল জলে নির্মেঘ আকাশের সবটুকু নীলিমাই প্রতিবিম্বিত। নদী ও নারীর সার্থকতা ঐ মহাসঙ্গমেই। সুপ্রবুদ্ধতনয়ার সার্থকতা যেমন রাহুলমাতায়।

তর্কে পরাজয়টা সহ্য হয় না শ্রবণার—বিশেষ, মহাভিক্ষু তো আজ স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত নন; ধর্ম ও দর্শনের রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে স্বেচ্ছায় কাব্যের নর্মভূমে নেমে এসেছেন কৌতুক-কুতূহলে। এ কাব্যভূমে অধিকার অক্ষুমতীর, এ রাজ্য শ্রবণার। এখানে সে হার মানতে রাজি নয়। তাই পুনরায় বলে, কিন্তু থের! সুপ্রবুদ্ধতনয়ার পরিণাম কি রাহুলমাতায়? অভিধম্মে উপসম্পদা গ্রহণে নয়?

তর্কের ঝোঁকে শ্রবণা এবার স্বরাজ্য ত্যাগ করে অন্যমনে প্রবেশ করে ফেলেছে মহাভিক্ষুর সাম্রাজ্যে। তিনি কিন্তু ক্ষুব্ধ হন না মোটেই। বলেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না শ্রবণা—সেটা হবে আত্ম-অস্বীকার! তোমার সম্মুখেই সশরীরে উপস্থিত রয়েছেন এ প্রতর্কের মূর্তিমতী প্রত্যুত্তর! অগ্রবিনতা মহা-ভিক্ষুণী জীবা।

মরমে মরে যায় শ্রবণা—নিজের প্রগল্‌ভতায়!

ভিক্ষুণী জীবার জীবনেও তিনটি পর্যায়। অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি ছিলেন অক্ষুমতীর মতো কুচীরাজ-প্রাসাদের এক চঞ্চলা কিশোরী রাজান্তঃপুরিকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রাহুলমাতার মতো সার্থক হয়েছিলেন কুমারজীবকে মাতৃস্তন্যে পুষ্ট করে। বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কুচীনগরীর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মহীয়সী ভিক্ষুণী। আ-লী বিহারের অগ্রবিনতা।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারত ভূখণ্ড থেকে কুচীরাজের দরবারে উপনীত হয়েছিলেন একজন অত্যন্ত সুদর্শন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—ভিক্ষু কুমারায়ণ। তিনি বস্তুত ছিলেন কাশ্মীররাজার একজন অমাত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার দেহাবসানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মতান্তর হল। মনান্তর হল না। কারণ বীতশ্রদ্ধ কুমারায়ণ তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে তথাগতের শরণ নিলেন। ঘর ছেড়ে পথে নামলেন। দীক্ষা নিলেন বৌদ্ধ ধর্মে, হলেন পরিব্রাজক। যষ্টি এবং ভিক্ষাপাত্র সম্বল কুমারায়ণ কাশ্মীর উপত্যকা থেকে রওনা হলেন উত্তর-পশ্চিমে। পেশওয়ার, কাবুল, খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে পামীর গ্রন্থী উন্মোচন করে এলেন কাশগড় সঙ্ঘারামে। কিন্তু

ভিক্ষুর একস্থানে বেশিদিন থাকতে নেই। বর্ষা শেষ হলে এবার পূর্বাভিমুখে চলতে থাকেন কুমারায়ণ; অক্ষুনদী অতিক্রম করে উপনীত হলেন খ্যিজিল-সঙ্ঘারামে, অবশেষে কুচী নগরীতে। কুচীরাজ সসম্মানে তাঁকে আশ্রয় দিলেন নিজের অতিথিশালায়। তাঁকে বরণ করলেন রাজগুরুরূপে। কুচীরাজ ধর্মমতে বৌদ্ধ, বস্তুত তাঁর রাজ্যের শতকরা নব্বই জনই বৌদ্ধ। জনপদের সর্বত্র শুধু চৈত্য, বিহার, স্তূপ আর সঙ্ঘারাম। মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দু প্রজা আছে; তাদের আছে একটিমাত্র মন্দির—প্রাগার্যসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ জীর্ণপ্রায় এক মদনদেবের মন্দির, তো-শান পর্বতশীর্ষে।

বৌদ্ধভিক্ষু কুমারায়ণ, উপসম্পদা লাভ করে তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। সুতরাং মহা সঙ্ঘারামে তাঁর আবাস চিহ্নিত হতে পারে না। মহান অতিথিকে পরিচর্যা করবার দায়িত্ব অর্পিত হল রাজভগিনী কিশোরী জীবার ওপর। এর পরের প্রকৃত ইতিহাস হারিয়ে গেছে; কিন্তু পরিণাম দেখে অনুমান করা যায়, মারবিজয়ীর রাজ্যে পঞ্চশর পুনরায় সফলকাম হয়েছিলেন। কুমারায়ণের উপসম্পদা গ্রহণ স্থগিত থাকল; একদিন তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন কুচীরাজের কাছে যে, তিনি জীবার পাণিপ্রার্থী।

অপূর্ব রূপবান পুরুষ ছিলেন এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তদুপরি বোঝা গেল শুধু অতিথি নয়, রাজকুমারীর অন্তরেও অনুরাগ সঞ্চিত হয়েছে। এক বসন্তোৎসবে মদনপূজার অবসানে কঞ্চুকী রাজকর্ণকুহরে কিছু অনুরাগ-রক্তিম সংবাদ পেশ করে গেল। রাজা সম্মতি দিলেন। কুমারায়ণ এবং জীবা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাঁদেরই সন্তান এই কাহিনীর নায়ক। পিতা ও মাতার নামের অংশ-বিশেষ যুক্ত করে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'কুমারজীব'। তাঁর জন্মের অনতিবিলম্বেই কুমারায়ণ জাগতিক বন্ধনমুক্ত হন। জীবা তখন পূর্ণ যুবতী। কুচী জনপদে এক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহই প্রত্যাশিত ঘটনা ছিল সেকালে। জীবা সে পথে গেলেন না; তিনি তখন বাদ্রাশ-হ্রদে উপনীত সার্থক অক্ষুনদীর মতো স্থির অচঞ্চল। তাঁর অন্তর তখন সমস্ত নীলাকাশকে প্রতিবিম্বিত করত—তথাগত বুদ্ধের করুণাঘন দুটি নয়নের মতো। সদ্যোবিধবা উপনীত হলেন কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান অর্হৎ বুদ্ধস্বামীর কাছে। বললেন, ভগবন্! সংসারে আমার বীতরাগ জন্মেছে; আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন।

মহাস্থবির বললেন, কল্যাণি, সংসারে তোমার বীতরাগ হয়েছে বলছ, পুত্রকে ত্যাগ করতে পারবে?

শিউরে উঠেছিলেন জীবা। বললেন, আমি আমার ভ্রম প্রণিধান করেছি ভদন্ত। না, সংসারে আমার অনীহা জন্মেনি। পুত্রকে ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞায় আমি তথাগতের শরণ নিতে প্রস্তুত নই।

স্মিতহাস্যে মহাস্থবির বলেছিলেন, ভ্রম তোমার ইতিপূর্বে হয়নি জীবা, হল এখন। মাতৃস্নেহকে অস্বীকার করার নির্দেশ সদ্ধর্মে নাই। দীঘ্ঘনিকায় সঙ্গীতি সুত্তন্তে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন—চিত্তশুদ্ধির চতুর্মার্গ : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা। মিত্রের প্রতি যে ভাব তাই হচ্ছে মৈত্রী। সদ্যোজাত সন্তান-ক্রোড়ে জননীর নিকট আর কে মিত্র? মহারাহুলোবাদ সুত্তে বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর পুত্র রাহুলকে বলেছেন, 'হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী-ভাবনায় ব্যাপাদ (বিদ্বেষ-বুদ্ধি) বিদূরিত হইবে।' সুতরাং হে কুমারজীব-মাতা, আমি তোমাকে মৈত্রীভাবনা থেকে বঞ্চিতা করতে চাই না। তোমাকে উপসম্পদা প্রদান করব এবং তুমি সপুত্র ভগবান বুদ্ধের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাবে।

তাই হল। সন্তান ক্রোড়ে সদ্যজননী জীবা আশ্রয় নিলেন ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে। কুচী জনপদ সীমান্তের বাহিরে। চল্লিশ লী[1] উত্তর সীমান্তে। এখানেই তিনি অতি যত্নসহকারে সংস্কৃত ও পালিভাষা শিক্ষা করেন যথাক্রমে মহাযানী ও হীনযানী ধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য। ৎ-সিয়াও লী সঙ্ঘারামে বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে মানুষ হতে থাকেন কুমারজীব। অতি শৈশবকাল থেকেই কুমারজীবের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি সমগ্র প্রার্থনা সুত্ত ও সহস্রগাথা কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। নয় বৎসর বয়সের ভিতরেই তিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় নবমবর্ষীয় বালক কুমারজীব অক্ষরজ্ঞানহীন বৌদ্ধ শ্রোতাদের অভিধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। অশীতিপর মহাস্থবিরের কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছালো। একদিন তিনি স্বয়ং এলেন বালকের শাস্ত্রপাঠ শুনতে। পাঠান্তে তিনি মুগ্ধ হয়ে ভিক্ষুণী জীবাকে অন্তরালে ডেকে এনে বললেন, কল্যাণময়ি, আমার দৃঢ় প্রতীতি—তোমার ঐ পুত্র অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ। হয়তো সে আংশিক

বোধিসত্ব। তুমি এই অসামান্য বালকের যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন কর। পিঞ্জরের সীমিত পরিবেশে ঐ মহাগরুড়শাবককে আবদ্ধ রেখ না। তুমি তোমার স্বামীর দেশে চলে যাও, তথাগতের স্বরাজ্যে।

ভিক্ষুণী জীবা পথে বার হলেন অতঃপর। যে পথে কুমারায়ণ এসেছিলেন একদিন কাশ্মীর থেকে কুচীতে, সেই পথরেখা ধরেই বিপরীতমুখে তিনি এসে উপনীত হলেন ভারত ভূখণ্ডে। কাশ্মীর রাজ্যে। স্বামীর গৃহে স্থান হল না। না হোক, কাশ্মীর-সঙ্ঘারামের মহাস্থবির সানন্দে আশ্রয় দিলেন কুমারায়ণের স্ত্রী-পুত্রকে। এই মহাস্থবিরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি—মহাপণ্ডিত বুদ্ধদত্ত। বস্তুত তিনি ছিলেন কাশ্মীররাজের জ্ঞাতিভ্রাতা। প্রব্রজ্যা নিয়ে তিনি সমস্ত সম্পদ শতদানে বিতরণ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন সঙ্ঘের। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করলেন, বালক কুমারজীব অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী। মাত্র তিন বৎসরের ভেতর, অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষ অতিক্রমের পূর্বেই, বালক কুমারজীব মধ্যম ও দীর্ঘ আগমের যাবতীয় সুত্ত কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। এই সময় ভিক্ষুণী জীবা তাঁর পুত্রকে নিয়ে পুনরায় কুচীরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তোখারিস্তানে য়ু-চী রাজের নির্মিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামে তিনি সপুত্র কিছুকাল বাস করেন। প্রসঙ্গত, য়ু-চী উপজাতি হচ্ছে মধ্য-এশিয়া ও চীনের মঙ্গোলীয় জাতির একটি মিশ্রশাখা—কুষাণরাজ কদ্‌ভিস ভ্রাতৃদ্বয় ও সম্রাট কনিষ্ক এই য়ু-চী জাতির সন্তান।

কুমারজীব আজন্ম ব্রহ্মচারী। বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস নেন। এরপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর তিনি কুচীতেই ধর্মজীবন-যাপন করেন। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নিজ প্রচেষ্টায়। চতুর্বেদ, বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন, স্মৃতি, জৈনধর্ম এবং নানা জাতের ব্যবহারিক বিদ্যা—পঞ্চবিজ্ঞান, চরক, সুশ্রুত ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। ক্ষুদ্র কুচী জনপদে এমন কোনও পণ্ডিত ছিলেন না যাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তৃপ্ত হতে পারেন তিনি। রেশম-সড়কে যে সকল পণ্ডিতেরা যাতায়াত করেন তাঁদের ভিতরেও উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পান না। অন্তরের অন্তস্তলে যে অনুপপত্তি রয়েছে তার 'আরোগ্য' হবে কী করে? উপনিষদের ব্রহ্মলাভ এবং বৌদ্ধদের নিব্বাণলাভের মধ্যে প্রভেদ কী? উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্ম সত্য, অজাত, অভূত, অকৃত। ধম্মপদও ঠিক ঐ কথাই বলছেন। উপনিষদ বলছেন, তিনি অজর, অমর, মৃত্যুর অতীত। থেরী গাথাও বলছেন, 'ইদং অজরং, ইদং অমরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকং'। মাণ্ডুক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন—'ব্রহ্মং শিবং'; সুত্তনিপাত্ত বললেন, 'নিব্বানং পরমং শিবং'। তাহলে বিরোধ কোথায়? তথাগতের মহাপরিনির্বাণ কেন তাহলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ব্রহ্ম-রসাস্বাদন নয়?

স্থির করলেন পুনরায় পরিব্রাজক হয়ে যাবেন। হিমালয়ে অথবা তিয়েনশানের একান্ত গুহায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা হয়তো ওঁর সংশয় নিরাকরণ করতে সক্ষম হবেন। ঠিক এই সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল, কাশগড়ে গৌতমবুদ্ধের নিজস্ব ভিক্ষাপাত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভিক্ষাপাত্রটি মহাপরিনির্বাণকালে শাক্যমুনি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে। কাশগড়রাজ 'পু-তু' সেই ভিক্ষাপাত্রটি সংরক্ষণের জন্য একটি স্তূপ নির্মাণ করেছেন। আগামী বৈশাখী বুদ্ধ-পূর্ণিমায় তিনি চৈত্য-স্তূপের গর্ভে ঐ মহামূল্য সম্পদটিকে সংস্থাপিত করতে চান। কাশগড়রাজ এজন্য সমগ্র মধ্য-এশিয়াখণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য বৌদ্ধ-অর্হৎ মহাস্থবির কুমারজীবকে আমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দে সম্মত হলেন কুমারজীব। ভিক্ষুণী জীবাও এ সুযোগ ছাড়লেন না। অনুগামী হলেন পুত্রের। রাজকন্যা অক্ষুমতী ও তার বয়স্যা শ্রবণাও রাজ-অনুমতি নিয়ে অনুগমন করল তাঁর। কাশগড় মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। কাহিনীর প্রারম্ভে আমরা তাঁদেরই দেখেছি অক্ষু নদীর উপকূলে।

এক বৎসর পরের কথা।

কুচী নগরী আজ উৎসবের সাজে সজ্জিত। পক্ষকালব্যাপী মহা উৎসব। হর্ম্যশীর্ষে নিশান, পথে পথে তোরণ, সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে দীপাবলী। রঙরেজিনীরা মাসাধিককাল দিবারাত্র পরিশ্রম করেছে—রাজ্যসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ বুঝি তাদের গাত্রাবরণ নব-রঙে রঞ্জিত করতে উদগ্রীব। তাই স্বাভাবিক। আসন্ন বসন্তপূর্ণিমার প্রত্যাশায় আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরও যে রঙিন হয়ে উঠেছে আজ—যেমন ভাবে অন্তরকোরকনিবদ্ধ রক্তিম কামনা-বাসনা মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে পথবীথিকার ফুল্ল অশোক, কিংশুকে। বৎসরান্তিক মদনমহোৎসব সমাসন্ন। কুচীরাজ্যের জনপ্রিয়তম জাতীয় আনন্দোৎসব।

মদনদেব বৌদ্ধ দেবতা নন। বস্তুত গিরিমেখলবাহন হচ্ছেন শাক্যসিংহের প্রতিপক্ষ। তবু এ উৎসব বৌদ্ধ কুচীরাজ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লৌকিক উৎসব। মদনদেবের এ পূজার আয়োজন শুধু প্রাক-বুদ্ধ নয়, প্রাগার্যযুগের ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহেন-জো-দারো, চানুদারো, হড়প্পায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। মিশরে মদনাঙ্কশায়িনী রতি ছিলেন ভিন্ন নামে—হোরাস জননী দেবী আইসিস্-এর পরিচয়ে। সেকেন্দার শাহ্-এর দেশে মদন ও রতির অভিধা ছিল ডিমিটার ও আফ্রোদিতে; রোমক-সভ্যতায় তাঁদের রূপান্তর ঘটেছিল—ব্যাক্কাস্ ও ভেনাস-এ। সেই নরনারীর মিলন ও প্রজননের দেবতা এশিয়া-মাইনরে এসে নূতন নামরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন—পাইরিজিয়ায় তিনি ছিলেন 'সাবাজিন'; তারিম নদীর অববাহিকায় তিনিই হয়েছেন মদনদেব। গৌতম বুদ্ধ যদি এশিয়ার অনির্বাণ সূর্য, তবে প্রেম ও প্রজননের এই দেবতাও শাশ্বত-কুজ্ঝটিকা। কুজ্ঝটিকার নাগপাশ ছিন্ন করে সূর্যের আবির্ভাব যদি চিরসত্য, তবে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে জীবন যতদিন আছে অন্তত ততদিন এ কুজ্ঝটিকার অস্তিত্বটাও অনস্বীকার্য সত্য। কুচী নগরীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সে সত্যটা স্বীকার করে—কী বৌদ্ধ, কী হিন্দু। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সঙ্ঘারামের সেই সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, যাঁরা মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে যাবন্মৃত্যু গিরিমেখলবাহনকে অস্বীকার করেছেন। এ উৎসব পরাধম্মের নয়, দেহধর্মের। শাস্ত্রোক্ত নির্দেশানুসারে নয়, লৌকিক। আনন্দের অনাবিল উচ্ছ্বাস। বর্তমানকালে আমরা, হিন্দুরা, যেমন বড়দিনের উৎসবে মাতি; অথবা খ্রিস্টান, শিখ যুবক-যুবতী রঙ-দোলের উদ্দামতায় 'হোলী হ্যায়' উৎসবে মাতে।

এ বৎসর অবশ্য বার্ষিক উৎসবের আয়োজন অনেক ব্যাপক, অনেক বৃহৎ। তার হেতু দ্বিবিধ। প্রথমত, কুচীরাজ পো-সাঙ ঘোষণা করেছেন, মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে রাজকন্যা অক্ষমতীর স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্বয়ম্বর-সভায় পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের নৃপতিনন্দনদের আমন্ত্রণ করা অশোভন; কারণ মাত্র একজন ব্যতিরেকে অপর সকলকেই সেখানে প্রত্যাখ্যানের অমর্যাদায় মণ্ডিত করাটা অনিবার্য। কুচীরাজ তাই সুকৌশলে তাঁর রাজ্যে মদনোৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—অনুষ্ঠানসূচীতে স্বয়ম্বর-সভার উল্লেখ আছে মাত্র। যেন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটা গৌণ, যে কেউ তাতে যোগ দিতে পারেন, নাও পারেন। ফলে কুচী জনপদে সমবেত হয়েছেন পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের রাজপুত্রেরা—এসেছেন অগ্নিদেশ (কারাশর), চক্কুক (ইয়ারকণ্ড), শৈলদেশ (কাশগড়), পুরুষপুর (পেশোয়ার), নিয়া, মীরাণ, তুরফান থেকে কুমার ভট্টারক ও তাঁদের অনুজগণ। সমবেত হয়েছেন ঐ সকল জনপদের বিশিষ্ট সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীতনয়। কুচী নগরীতে বর্তমানে এইটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়—দেববাঞ্ছিতা রাজকন্যা অক্ষমতী কাকে বরমাল্য দেবেন! শোনা যায়, এজন্য নগরীর শৌণ্ডিকাপণে গোপনে বাজিও ধরা হচ্ছে। জনশ্রুতি—চূড়ান্ত নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকি মাত্র তিনজন প্রতিযোগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ সমস্যা ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজের শীর্ষদেশে শৈলদেশের (কাশগড়ের) রাজকুমার 'তা-মো-ফু-ত'। তিনি দুর্ধর্ষ সমরনায়ক, ধর্মের বাতিক নেই। অশ্বারোহণ ও অসিযুদ্ধে প্রথিতযশা। চীনা ইতিহাসে তাঁর ঐ নাম উল্লিখিত বটে তবে তাঁর ভারতীয় নাম ধর্মপুত্র, পালিতে ধম্মপুত্ত। তিনি কাশগড়রাজ 'পু-তু'র (ভদ্রদেবের) জ্যেষ্ঠপুত্র, যুবরাজ। ত্রিভুজের অপর দুটি বিন্দু যথাক্রমে সূর্যভদ্র ও সূর্যসোম। চক্কুক অথবা ইয়ারকণ্ড-রাজ (বর্তমান নাম 'কারগালিক') ৎ-সান

কীয়ুনের দুই উপযুক্ত পুত্র। দুজনেই বৌদ্ধভিক্ষু—অর্হৎ কুমারজীবের দুই প্রিয় শিষ্য। উভয়েই মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—এখনও সম্মত হননি কুমারজীব। কোনো কোনো প্রাকৃতজনের বিশ্বাস জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত কুমারজীব নাকি গণনা করে দেখেছেন—এঁদের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ অনিবার্য, সেজন্যই উপসম্পদা দান স্থগিত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গ রাজকন্যার অন্দরমহলেও ওঠে। ওঠায় তাঁর প্রিয়সখীর দল। তারা জানতে ইচ্ছুক রাজকন্যার মনোভাবটুকু। বস্তুত রাজকন্যা এ বিষয়ে কখন কী বলেন সে কথার উপর আসবাগারে প্রতিযোগীদের বাজারদর ওঠানামা করে। শুধু রাজকন্যার প্রিয়তমা বয়স্যা শ্রবণা কৌতূহল দেখায় না। মাঝে মাঝে জনান্তিক অবকাশে অক্ষুমতীকে বলে—কী ভাষায় বলে জানি না, তবে বর্তমান যুগের ভাষায় তার আক্ষরিক অনুবাদ : 'অহো ভাগ্য! সন্দেহাতীত বুল্‌স্-আই-টিপ্‌স্ আমার অঞ্চলপ্রান্তে গ্রন্থীনিবদ্ধ, পরন্তু আমি ডার্বি সুইপ-এর ট্রিপল্‌টোট্‌বঞ্চিতা।'

অক্ষুমতী কৌতুক করে বলেন, বটে! তুই জানিস ভাগ্যবানটি কে!

শ্রবণা বলে, আমি তো অন্ধ নই পিয়সহি! এক বৎসরকাল তোমার সঙ্গে শৈলদেশে অবস্থান করেছি। আমি যে শুনেছি, সেই পার্বত্যগুম্ফায় তোমার স্বপ্নমঙ্গলকথা! আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি, অক্ষুনদীর চঞ্চলতা ব্যাঘ্রাশ-কোল হ্রদে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! সেখানে একটিমাত্র মুখই আজ প্রতিবিম্বিত।

রাজকুমারী হস্তধৃত পাঙ্খাদ্বারা প্রিয়সখীকে ছদ্মতাড়না করেন।

লঘুচিত্ত অনূঢ়াদের এ সকল হাস্যপরিহাসের কথা থাক। যে কথা বলছিলাম। এ বৎসর বার্ষিক আনন্দোৎসবের আড়ম্বর বৃদ্ধির দুটি হেতু। একটি বিবৃত করেছি; দ্বিতীয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থবির কুমারজীব সম্প্রতি ৎ-সাওলী মহাবিহারে একটি অতি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর ধারণা জন্মেছিল, এ-গ্রন্থ কুষাণরাজ কনিষ্কের সমসাময়িক। খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে পঞ্চনদ-দেশে জলন্ধর মহানগরীতে সম্রাট কনিষ্ক একটি ধর্মমহাসভার আয়োজন করেছিলেন, বুদ্ধচরিত-প্রণেতা মহাপণ্ডিত অশ্বঘোষের সভাপতিত্বে। সে সভান্তে সর্বাস্তিবাদিগণই স্থবিরবাদীদিগের উপর প্রাধান্য পান। অর্হৎ বসুমিত্র প্রথমোক্ত মতের সুত্তগুলি 'মহাবিভাস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাষায়, পালিতে নয়। প্রথমাবস্থায় কুমারজীবের ধারণা হয়েছিল, সদ্য-আবিষ্কৃত গ্রন্থটি এ ঘটনার সমসাময়িক। পরে তিনি অনুধাবন করেন, এ গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত। তবু এটি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রজগতে এক অনবদ্য সঙ্কলন। গ্রন্থটি : 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা'। একক প্রচেষ্টায় তিনি ঐ পুঁথির আদ্যন্ত পাঠোদ্ধার করেছেন। স্থির হয়েছে, ৎ-সিয়াওলী মহাবিহারে মদনোৎসবের অব্যবহিত পরে থের কুমারজীব সমবেত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের ঐ অমূল্য গ্রন্থটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। এজন্য নিকটবর্তী ও দূরবর্তী বহু সঙ্ঘারাম থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও ক্রমাগত সমবেত হচ্ছেন কুচীনগরীতে।

কুচী শৈলনগরী একটি পার্বত্য সানুদেশের ক্রমনিম্নাভিমুখে। সোপানবলীর মতো প্রস্তরের ধাপে ধাপে হর্ম্যরাজি। প্রতিটি গৃহের ছাদ আবশ্যিকভাবে ঢালু। শীতে এখানে তুষারপাত হয়। বিশালায়তন উদ্যান কোথাও নাই। পর্বতগাত্রে 'ভুজঙ্গপ্রয়াত'-ছন্দে গ্রথিত বিসর্পিল পথ—দেবদারু, পাইন প্রভৃতি কদলীপুষ্পাকৃতি পাদপে সমাকীর্ণ। নগরীতে একাধিক বিহার ও সঙ্ঘারাম। প্রধান বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের নাম ওয়েন-সু; মহাস্থবির বুদ্ধস্বামী এই বিহারেরই থের ছিলেন, তাঁর নির্বাণলাভে বর্তমানে কুমারজীব থের হয়েছেন। এখানে প্রায় যাটজন শ্রমণের নিবাস। তাছাড়া পো-সান পর্বতচূড়ায় চে-হু-লি বিহার এবং তা-মু বিহারেও শতাধিক শ্রমণের বাস। ভিক্ষুণীদিগের আবাসের জন্যও ছিল একাধিক পৃথক বিহার—আ-লী এবং লিয়ুন-জো-কান সঙ্ঘারাম। ভিক্ষুণীদিগের বিহারের পরিচালনভারও মহাস্থবির 'ফু-তু-শে-মি' অর্থাৎ বুদ্ধস্বামীর উপর ন্যস্ত ছিল; বর্তমানে কুমারজীবের উপর। ভিক্ষুণী জীবা 'আ-লী' বিহারের সর্বপ্রধানা অর্থাৎ 'অগ্‌গবিনতা'। এই বিহারগুলি সচরাচর নগর কোলাহলের বাহিরে, নির্জন পর্বতচূড়ায়। নগরীর কলকোলাহল সেখানে অশ্রুত।

এই এক বৎসরে—ঠিকই বলেছিল শ্রবণা—রাজকুমারী অক্ষুমতী যেন ব্যাঘ্রাশ-হ্রদে উপনীত হয়েছেন; তাঁর অন্তর-দর্পণে অনপনেয় শাশ্বত প্রতিবিম্ব পড়েছে। আগামীকাল বসন্তোৎসব—সকলেই উচ্ছল, উদ্বেল। যাঁকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন, শুধু তিনিই বাতায়নপথে শূন্য দৃষ্টি প্রসারিত করে করলগ্ন কপোলে আত্মমগ্না : তিনি কি এ উৎসবে যোগদান করতে আদৌ আসবেন?

তিনি অর্থাৎ শৈলদেশের রাজধানীতে দৃষ্ট সেই অনিন্দ্যকান্তি বৌদ্ধ শ্রমণ। না, তিনি কোন জনপদ-নৃপতির কুমার ভট্টারক নন—তবু বংশমর্যাদার কৌলীন্য আছে তাঁর। তিনিও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ—অপূর্ব রূপবান পুরুষ। দীর্ঘদেহী, সুগঠিততনু, অলক্তকরাগরঞ্জিত দুগ্ধের ন্যায় যাঁর গাত্রবর্ণ, নয়ন যুগলে যাঁর দার্শনিক-সুলভ অতল জিজ্ঞাসার সহিত কবিসুলভ সৌন্দর্যতিয়াসের বিচিত্র বৈপরীত্য। কাশগড়ে নৃপতির তরফে তিনিই এসেছিলেন সপরিবারে কুমারজীবকে আমন্ত্রণ করে নিতে—নগরতোরণে। সেখানেই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন, তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাৎপটে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাজপুত্রী অক্ষুমতী। কে জানে, হয়তো ভিক্ষু বুদ্ধযশাও।

তারপর এক বৎসর বারে বারে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে। সসম্ভ্রম সৌজন্যে একটি দূরত্ব রেখে চলেছিলেন বুদ্ধযশা—ভিক্ষু তিনি, সদ্ধর্মের অনুশাসনে কামনাবাসনাকে ত্যাগ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে নির্বাণলাভের পথে তাঁর অভিযাত্রা; মহাপরিনির্বাণ-সুত্তে বর্ণিত প্রাক্‌বুদ্ধযুগের সন্ন্যাসী আলাঢ় কালাম-এর ধ্যান-রাজ্যে তিনি উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন কাশ্মীর মহাবিহারেই। তারপর গৌতম যেমন রাজগৃহ ত্যাগ করে উরুবিল্ব গ্রামে একক-সাধনে প্রবৃত্ত হতে যাত্রা করেছিলেন, বুদ্ধযশাও তেমনি তাঁর পূর্বসূরী কুমারায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খাইবার গিরিবর্ত্ম, পামীর-গ্রন্থী অতিক্রমণে এসে উপনীত হয়েছিলেন শৈলদেশে, কাশগড়ে। উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে। মহাস্থবির কুমারজীব কুচী থেকে কাশগড়ে শুভাগমন করছেন শুনে তিনি তাঁর আজীবনের স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা দেখলেন। বুঝলেন, এ ঘটনা সুনিশ্চিতভাবে তথাগতের নির্দেশেই। মহাথের কুমারজীবই হতে পারেন তাঁর গুরু, তাঁর আচার্য—তাঁর নিকটেই তিনি মরজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গ্রহণ করবেন : উপসম্পদা!

কিন্তু!

কুমারজীব তো একাকী উপনীত হলেন না। তাঁর সঙ্গে আবির্ভূতা হলেন তাঁর ভগ্নী, দেববাঞ্ছিতা অপরূপ রূপবতী রাজকন্যা অক্ষুমতী। যে চিন্তা-ভাবনা-কামনা-বাসনাগুলি নির্মূল হয়েছে বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল, বুদ্ধযশা দেখলেন সেগুলি অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত ছিল মাত্র—নিদাঘ খরতাপে বালুকাস্তরের নিম্নে নিদ্রামগ্ন তৃণদলের মতো। যেন অক্ষুনদীর জলধারায় সেই শিশুতৃণ ঊষর বালুকাস্তূপ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরিত হতে চায়, অবাক বিস্ময়ে দেখতে চায় এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ প্রপঞ্চকে। যেন পুষ্পভারে মুঞ্জরিত হতে চায়। নিরতিশয় আন্তরিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন মুমুক্ষু ভিক্ষু।

বৎসরাধিককাল কুমারজীব অধিষ্ঠিত ছিলেন শৈলদেশে। তিনি মহাস্থবির, তাই তাঁর আবাস চিহ্নিত হয়েছিল মহা-সঙ্ঘারামে; ভিক্ষুণী জীবাও ছিলেন ভিক্ষুণীদিগের জন্য নির্দিষ্ট বিহারে। পরন্তু রাজকুমারী অক্ষুমতী ও শ্রবণা সংসারাশ্রমের জীব, সঙ্ঘারামে তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হতে পারে না; তাই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল রাজ-অতিথিশালা। দুর্ভাগ্য ভিক্ষু বুদ্ধযশার—তিনিও ঐ রাজ-অতিথিশালার অতিথি। উপসম্পদা গ্রহণ না করায় কোন সঙ্ঘারামের পরিবেশে তাঁরও আবাস চিহ্নিত হয়নি। অতিথিশালাটি একটি মাত্র গৃহ নয়,—প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি একান্ত আবাস। এক-একটি এক-একজন অতিথির জন্যে চিহ্নিত। সেই উদ্যানবাটিকার ভিতরেও ছিল একটি ক্ষুদ্রায়তন চৈত্য। সেই চৈত্য-সংলগ্ন কক্ষে প্রস্তর-শয্যায় বুদ্ধযশার বিশ্রামের আয়োজন। চৈত্যের কেন্দ্রস্থ কক্ষে অবস্থিত বুদ্ধমূর্তি সুশোভিত স্তূপমূলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনি পূজারতি করেন। উদ্যানবাটিকায় আশ্রয়প্রাপ্ত অতিথিবৃন্দ সমাগত হন সন্ধ্যাকালে। সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতে যোগদান করেন। বুদ্ধযশা তাই কিছুতেই ভুলে থাকতে পারেন না তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের মূলীভূত উপলক্ষ। প্রতিদিন দুই সখী যোগদান করেন প্রার্থনাসভায়। ভক্তমণ্ডলীর পশ্চাদভাগে অন্ত্যেবাসীর মতো বসে থাকেন। তবু প্রার্থনান্তে বুদ্ধযশা যখন নিমীলিত নেত্রকে মুক্তি দেন, দেখতে পান জনারণ্যের প্রত্যন্তভাসে ঘৃতপ্রদীপের আলোকে সমুজ্জল একটি দেববাঞ্ছিতা ষোড়শীমূর্তি। নীরবে সে অগ্রসর হয়ে আসে—কখনো যূথীর মাল্য, কখনও সহস্রদলের মালিকা সশ্রদ্ধে নামিয়ে রাখে ভিক্ষুর চরণমূলে, ধাতব পাত্রে। যেন সে অর্ঘ্য তথাগতের জন্য নয়, তথাগতের সেবকের। কুণ্ঠিত হন নিত্য ভিক্ষু বুদ্ধযশা সে অর্ঘ্য গ্রহণে।

তারপর একদিন। সেদিন সকাল থেকেই তুষারপাত হচ্ছিল। শ্যামল শস্যভূমির উপর প্রায় বিঘৎপ্রমাণ তুষার সঞ্চিত হয়েছে। তদুপরি দুর্মদ বায়ুবেগ। সেদিন আশ্রমবাসীর কেহই সমবেত হতে

পারেননি সন্ধ্যারতির লগ্নে। ভিক্ষু বুদ্ধযশা একাকী প্রার্থনায় উপবেশনের আয়োজন করছিলেন, সহসা চৈত্যদ্বারের রুদ্ধ কপাটে করাঘাত হল। দুরন্ত তুষারমিশ্রিত বায়ুবেগের জন্য ভিক্ষু চৈত্যদ্বার আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে এসে দ্বার উন্মোচন করে দিয়েই দেখলেন, ঐ তুষারঝটিকা অগ্রাহ্য করে দুইজন ভক্ত সমবেত হয়েছেন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—রাজকন্যা অক্ষুমতী এবং তাঁর বয়স্যা শ্রবণা। তাঁদের অঙ্গাবরণে তুষারের প্রলেপ। কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন ভিক্ষু। বলেন, এই দুর্যোগে আপনারা আজ না এলেই পারতেন।

মুখরা শ্রবণা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, এই দুর্যোগে আপনি ঘণ্টাধ্বনি না করলেই পারতেন!

সে কথা সত্য। পূজারতির পূর্বে ধাতবঘণ্টার নিনাদ প্রতিহত হতে থাকে। প্রথামাফিক বুদ্ধযশা সেদিনও যথারীতি ধাতব-সঙ্কেত ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত করেছেন : সন্ধ্যা বন্দনার সময় সমাগত। সংস্কৃত কাব্য পাঠ করা ছিল ভিক্ষুর। তাঁর মনে হল বৃন্দাবনের গোপনারীরা যেমন বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র সংসারের যাবতীয় কার্য বিস্মৃত হতেন, এঁরাও তেমনি ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনে ছুটে এসেছেন গৃহকেন্দ্রাতীত বিকর্ষণে। কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার সে অভিসারের মূলে কী ছিল? কৃষ্ণলাভের বাসনা তো বটেই। কিন্তু কী ভাবে? সে কি ইন্দ্রিয়াতীত ভগবৎ প্রেম, নাকি দেহের প্রতি রোমকূপে আত্মদানের অভীপ্সা?

ভিক্ষু বলেন, আপনাদের উভয়ের পরিচ্ছদই তুষারপাতে সিক্ত। আমি বরং একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করি।

এবারও শ্রবণা বলেছিল, মহাভাগ! শীতে অবশতনু আমার প্রিয়সখী বর্তমানে উত্তাপের কাঙাল; পরন্তু অগ্নির উত্তাপে তাঁর পরিচ্ছদে সঞ্চিত তুষার দ্রবীভূত হবে এবং তাঁকে সিক্ত করে দেবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পূজারতির আয়োজন করুন বরং।

শ্রবণার বক্তব্যে যেন কিছু গূঢ় ব্যঞ্জনা ছিল। সুতরাং ভিক্ষু সন্ধ্যারতির কার্যেই মনোনিবেশ করেন। অনতিদূরে উপবেশন করে ওরা দুইজন। শ্রবণাই পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কতদিন পূর্বে কাশ্মীর ত্যাগ করে এ রাজ্যে এসেছেন ভদন্ত?

—কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর।

—আপনিও তো কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষু কুমারায়ণের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়। তিনি মহাথের কুমারজীবের পিতৃদেব। বস্তুত তিনি আমার পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সে সম্পর্কে মহাথের আমার খুল্লতাত।

—কাশ্মীরে আপনার আত্মীয়-পরিজন কে কে আছেন?

ভিক্ষু ঘুরে দাঁড়ান। দীপালোকে তাঁর প্রশান্ত ললাটে ভ্রূকুঞ্চনটা স্পষ্ট। লক্ষ্য করে দেখেন—শ্রবণা প্রশ্নটি পেশ করে ঊর্ধ্বমুখে প্রতীক্ষা করছে, পরন্তু তার সখী মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি নতমুখী। একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুর পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ।

কিন্তু তর্কপটু শ্রবণা অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। তৎক্ষণাৎ বলে, মূঢ়মতির প্রগল্ভতা মার্জনা করবেন ভদন্ত, আমার ধারণা ছিল ঐ নিয়ম সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই প্রযোজ্য। উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষু গার্হস্থ্যাশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত; তখন তাঁর 'পূর্বাশ্রমে'র অর্থ গুরুগৃহের জীবন। আমি কিন্তু আপনার গুরু-গুর্বীর পরিচয় জানতে ও প্রশ্ন করিনি।

একটু উদ্ধত শোনায় ভিক্ষুর প্রতিপ্রশ্নটি, তবে কার পরিচয় জানতে চাইছেন?

—আপনার সহধর্মিণীরও নয়, যেহেতু জেনেছি আপনি অকৃতদার। আপনার পিতৃপরিচয়ই—

—আমার পিতৃপরিচয়ে আপনাদের প্রয়োজন?

একবচন এতক্ষণে দ্বিবচনে পরিণত হওয়ায় মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী আর নীরব শ্রোতার অভিনয় করতে পারে না। বয়স্যাকে বলে, কেন ওঁকে বিরক্ত করছিস শ্রবণা? সন্ধ্যারতির বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

শ্রবণা নীরব হল। ভিক্ষু পূজায় বসলেন। ধূপ দীপ পুষ্পার্ঘ্য। কিন্তু নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সন্ধ্যাবন্দনায় আজ যেন সম্পূর্ণ নূতন সুর লেগেছে। ভিক্ষু যখন বর্ণগুণমণ্ডিত কুসুমার্ঘ্য প্রদান করলেন বুদ্ধের চরণমূলে তখন সহসা দুই সখী যুক্তকণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়ে ওঠেন :

বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজায়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরূহে।।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভিক্ষু। সুগন্ধ সম্ভারযুক্ত ধূপদান নিয়ে যখন পূজাভাজন লোকুত্তমকে আরতি করতে থাকেন তখন দুই সখী গাইলেন :

গন্ধ-সম্ভার-যুক্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা।
পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমম্‌।।

স্বর্গীয় সঙ্গীতমাধুর্যে রোমাঞ্চিত হল ভিক্ষুর সর্বাবয়ব। তুলে নিলেন পঞ্চপ্রদীপ। আহ্বান করলেন তরুণীদ্বয়কে স্তূপ-পরিক্রমায়, তাঁর অনুগমন করতে। তিনজনে ধীরে ধীরে স্তূপকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন সুবর্ণপ্রদীপ হস্তে। সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনাসঙ্গীত সেই রুদ্ধদ্বার পাষাণকক্ষের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে :

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তকধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।।

যেন স্তূপপরিক্রমা নয়, সপ্তপদীর চক্রাবর্তন! পূজান্তে তিনজন সমবেত কণ্ঠে গাইলেন :

মহাকারুণিকো নাথ হিতায় সব্বপাণিনং।
পূরেত্বা পারমি সব্বা পত্তোসম্বোধিমুত্তমম্‌।।

বাইরে তখনও অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। তবু ভিক্ষু ওদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন না, নির্মমহস্তে উন্মুক্ত করে দিলেন চৈত্যের নির্গমন-দ্বার। শ্রবণা বলে, ভদন্ত, আর একটি নিবেদন আছে। আপনি যে শীতবস্ত্রে দেহ আবৃত করেন, সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে। পিয়সহি এজন্য আপনার ব্যবহারের নিমিত্ত একটি পশমের উত্তরীয় বয়ন করেছেন। এটি আপনি গ্রহণ করলে আমরা উভয়েই কৃতকৃতার্থ হই।

অঞ্চলতল থেকে অক্ষুমতী সুচারু সূচীকর্ম শোভিত পশমের একটি উত্তরীয় বার করে আনে। মিনতিপূর্ণ দুটি কজ্জললাঞ্ছিত নয়নে নীরবে সে প্রতীক্ষারতা।

মার! রতি-রঙ্গ-তন্‌হ্‌!

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত ঋজু ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হলেন বৌদ্ধভিক্ষু। অক্ষুমতী নয়, শ্রবণাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌদ্ধভিক্ষুর বিলাসও নিষিদ্ধ, আয়ুষ্মতি! তোমার প্রিয়সখীকে বল, এ জীর্ণ উত্তরীয়ে আমার কোনও অসুবিধা নাই।

তর্কপটু শ্রবণা স্তম্ভিতা। সে যে মর্মে মর্মে জানে, ঐ কারুকার্যখচিত পশমের উত্তরীয়টি সূচীশিল্পে অলঙ্কৃত করতে তার প্রিয়সখী কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে। ওই পশমের রক্তমুখী অম্বুজ যে রাজনন্দিনীর শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রীতির দ্যোতক। এতক্ষণে অক্ষুমতী সরাসরি সম্বোধন করেন ভিক্ষুকে। অবমানিতা রাজদুহিতা দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন ভদন্ত। আমাদের ধারণা ছিল—ভক্তের দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার কোনও ভিক্ষাজীবী বৌদ্ধভিক্ষুর নাই। প্রদত্ত বস্তু ব্যবহারে যদি তাঁর রুচি না থাকে, সেক্ষেত্রে অনায়াসে তিনি তা কোনও দীনদরিদ্রকে পুনরায় দান করতে পারেন। সঙ্ঘকে প্রদান করতে পারেন।

সেই প্রথম বুদ্ধযশার সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করলেন অক্ষুমতী। বুদ্ধযশা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। বলেন, আপনি যথার্থই বলেছেন কল্যাণি। আপনার শ্রদ্ধার দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নাই—

গ্রহণের মুদ্রায় দুটি হাত প্রসারিত করে দেন বুদ্ধযশা। কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির করেছে অক্ষুমতী। বলে, মার্জনা করবেন। কীটদষ্ট অর্ঘ্যপুষ্পের মতো এ প্রত্যাখ্যাত অর্ঘ্য এখন দানের অযোগ্য। তাছাড়া আশঙ্কা হয় এই দুর্যোগ সন্ধ্যার স্মৃতি ভিক্ষু বুদ্ধযশা বিস্মৃত হতেই আগ্রহী। সুতরাং এ প্রত্যাখ্যাত দীন উপহার আমার কাছেই থাক।

চৈত্যদ্বার খুলে তুষারঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে পথে নেমেছিল অবমানিতা রাজকন্যা।

ওখানেই যদি শেষ হত ওঁদের অনুরাগ-বিরাগের আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা, তাহলে নিশ্চয় আজ অক্ষুমতী চিন্তা করত না—'তিনি কি আসবেন'?

ঐ ঘটনার পরেও এই এক বৎসরে ঘটেছে আরও অনেক ঘটনা এবং দুর্ঘটনা।

সেই বৎসরাধিককাল মহাস্থবির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ভিক্ষু সূর্যসোম, সূর্যভদ্র এবং বুদ্ধযশার সঙ্গে—শতশাস্ত্র, মধ্যমক শাস্ত্র, দীর্ঘআগম। বস্তুত সমগ্র অভিধম্মপিটক। বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে সাড়ম্বরে গৌতমবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটির পূজাও উদ্‌যাপিত হল। ওঁর তিনজন শিষ্যই উপসম্পদা গ্রহণের কামনা জ্ঞাপন করেছিলেন। মহাঅর্হৎ বলেছিলেন, এখনও সময় হয়নি। সূর্যসোম ও সূর্যভদ্রকে তিনি কী বলেছিলেন জানা যায় না, বুদ্ধযশাকে বলেছিলেন, আমার মনে হয় আপনার অন্তঃকরণ এখনও এ জন্য প্রস্তুত নয়।

সলজ্জে স্বীকার করেছিলেন বুদ্ধযশা। বলেছিলেন, প্রভু আপনি নির্দেশ দিন, কীভাবে আমি পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি?

কুমারজীব বলেছিলেন, আমি নূতন কথা কী বলব আপনাকে? এর নির্দেশ তো অভিধম্মেই রয়েছে। এর প্রত্যুত্তর আপনার অন্তঃকরণই দিতে সক্ষম। আপনার সম্মুখে পথ দ্বিধাবিভক্ত। হয় সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে সমাজবদ্ধজীবের যাবতীয় কর্তব্য সমাপনান্তে তৃপ্ত অন্তঃকরণে তথাগতের স্মরণ নিতে হবে, অন্যথায় কৃচ্ছ্রসাধনায় ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

বিস্মিত বুদ্ধযশা বলেছিলেন, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে! আপনি কি আমাকে সেই নির্দেশই দিচ্ছেন মহাথের?

—না। আমি শুধু বলতে চাই পার্থিব কামনা-বাসনার উত্তরণ ভিন্ন উপসম্পদা গ্রহণ ব্যর্থ। এবং তা উত্তরণের দুইটি মার্গ। দ্বিধাবিভক্ত পথের কোনটি অনুসরণীয় তা শুধুমাত্র আপনার বিবেচ্য। "আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যশরণোভব"—নিজেকে প্রদীপ করে জ্বালুন, সেই প্রদীপের আলোকে বিবেকনির্দেশে জীবনপথে অগ্রসর হন। অপরের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

—বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা থাকলে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে ভিক্ষু হব কেন?

—পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করা সহজ। ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করা কঠিনতর। ত্যাগ করবেন কি তৃপ্ত করবেন তা শুধু আপনার সিদ্ধান্তনির্ভর। তবে ভিক্ষু বুদ্ধযশা! এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি—বিবাহিত জীবনকে অত ঘৃণার চক্ষে দেখবেন না। স্বয়ং মহাকারুণিক তথাগত বিবাহিত জীবনের উত্তরণেই বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, নিব্বাণলাভ করেছিলেন। মহাজনকের অপেক্ষা সীবলীর তপস্যাকে কোন কারণেই হেয় করা চলে না।

বোধিসত্ত্ব মহাজনক ছিলেন মিথিলার নৃপতি। রাজমহিষী সীবলীকে ত্যাগ করে যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তখন অবমানিতা পরিত্যক্তা পট্টমহিষীও কঠিন তপস্যায় বৃতা হয়েছিলেন। অভিমানিনী রাজমহিষীর তপশ্চারণের একটিই মাত্র লক্ষ্য ছিল—সন্ন্যাসী মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা! মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন—ফলে তাঁর সন্তান হওয়ার অর্থ তাঁর ব্রতচ্যুতি, ধর্মচ্যুতি; কিন্তু রাজমহিষীর বক্তব্যও ছিল সহজ সরল : সন্তানবতী হওয়াও নারীর ধর্ম—তাঁর ধর্মাচরণে বাধাসৃষ্টির অধিকারও নেই মহাসন্ন্যাসী বোধিসত্ত্বের। আশ্চর্য কাহিনী! সাধনায় উভয়ে সফলকাম হন। সেজন্মে নয়, বহুতর পরজন্মে। মহাজনক জন্মগ্রহণ করেন কপিলাবস্তুতে, শাক্যকুলে, শাক্যসিংহরূপে। সীবলী সে জন্মে আবির্ভূতা হলেন সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরার মূর্তি পরিগ্রহ করে। এই নবজন্মে মহাজনক গৌতম-বুদ্ধরূপে মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন বটে, কিন্তু মাতৃস্বরূপিণী সীবলীর মাতৃত্বের দাবি পুরোপুরি মিটিয়ে দেবার পূর্বে নয়। মহাভিক্ষু রাহুল মহাভিক্ষুণী সীবলীর তপস্যার ফলশ্রুতি!

অক্ষুমতীর উপহারটি প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে ভিক্ষু বুদ্ধযশা নিরন্তর অন্তরবেদনায় পীড়িত। এর পরেও অক্ষুমতী ও শ্রবণা যথারীতি উপস্থিত হত সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায়; কিন্তু অক্ষুমতী ভিক্ষুকে সম্বোধন করে আর কোনদিন কোন কথা বলেনি। এজন্যও মর্মাহত হয়েছিলেন বুদ্ধযশা।

এরপর কুমারজীব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কুমারজীবকে বিদায় জানাতে এল কাশগড়ের আপামর জনসাধারণ। স্বয়ং মহারাজ ভদ্দদেব এবং কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্ত। এই সময় সহসা বুদ্ধযশা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনিও ওঁদের অনুগমন করবেন। ভিক্ষুর পক্ষে একস্থলে দীর্ঘদিন অবস্থান করা বাঞ্ছনীয় নয়—তাতে স্থানীয় মমত্ববোধ জন্মে, ভিক্ষু পরিব্রাজককে নিরাসক্ত থাকতে হয়। বুদ্ধযশা দুই বৎসর আছেন শৈলদেশে, সুতরাং তাঁর এই সংকল্পকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করলেন শৈলদেশরাজ ভদ্দদেব। মহাসমারোহে তাঁদের বিদায় জ্ঞাপন করে গেল শৈলদেশবাসীরা রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত অনুগমন করে।

এই প্রত্যাবর্তনের পথে—চৈনিকসূত্রে-প্রাপ্ত ইতিহাসে জানা যায়, কুমারজীব প্রথমে 'ওয়েন-সু'-র রাজ্যে উপনীত হন। 'ওয়েন-সু'-র সংস্কৃত নাম 'উচ্চ-তুরফান'। এখানে কুমারজীব তাওপন্থী এক চৈনিক মহাপণ্ডিতকে তর্কে পরাভূত করে তাঁকে স্বধর্মে ও সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন বলেও চৈনিক ইতিহাসে লিখিত আছে। কুচীরাজ পো-সাঙ স্বয়ং এই তর্ক মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভান্তে অর্হৎ কুমারজীবকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তার পূর্বে এই প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু ঘটনা ঘটে, যার উল্লেখ ইতিহাসে নেই, অথচ যা আমাদের কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য :

প্রত্যাবর্তনের পথেও দুইটি পল্যঙ্কিকা ছিল—ভিক্ষুণী জীবা ও শ্রবণার জন্য। এবার অশ্বারোহী তিনজন। বুদ্ধযশাও অশ্বারোহণে অতিক্রম করছিলেন এ পথ। কুমারজীব সর্বক্ষণই জননীর পল্যঙ্কিকার সন্নিধানে ধীরগতিতে অশ্বচালনা করতেন; অপরপক্ষে প্রতিদিনই অপর দুইজন অশ্বারোহী ক্রমশই পদাতিকদের পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতেন। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জন পার্বত্য-পথে দুজনের মধ্যে কথোপকথন অপরিহার্য এবং প্রত্যাশিত হয়ে পড়ে। মুক্ত প্রকৃতিরও একটি মোহজাল বিস্তারের ক্ষমতা আছে—বদ্ধপ্রাচীরের চতুঃসীমায় যে সঙ্কীর্ণতা মানুষের মনটাকে শম্বুকবৃত্তিতে প্ররোচিত করে—ধ্যানগম্ভীর তুষারমৌলী পর্বতের ভুজঙ্গপ্রয়াত-পথে নিঃসীম নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে মনের সেই অর্গল আপনিই উন্মোচিত হয়ে যায়। প্রথম সুযোগেই তাই বুদ্ধযশা সঙ্গিনীকে বলেছিলেন, কুমার ভট্টারিকা, আপনার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। প্রথম দিন আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলাম আমি। আমাকে মার্জনা করবেন।

ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা অক্ষুমতী বলে, একথা কেন বলছেন ভদন্ত ?

—আপনি সেদিন যথার্থ কথাই বলেছিলেন। ভিক্ষু হিসাবে দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আমার নেই, ছিল না।

অক্ষুমতী নীরবে অশ্বচালনা করতে থাকে। বুদ্ধযশা পুনরায় বলেন, আপনি কি আমাকে মার্জনা করতে পারেন না?

—বারম্বার মার্জনার প্রসঙ্গ তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনি সব দিক থেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন। এতে আমার অপরাধ হয়।

—তাহলে আপনি যে সেদিনের সেই তিক্ত স্মৃতিটুকু স্মরণে রাখেননি, তার প্রমাণস্বরূপ সেই পশমোত্তরীয়টি আমাকে দান করুন। আপনার সে শ্রদ্ধার দান—

দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী অস্ফুটে বলে, মার্জনা করবেন মহাভাগ। তা হবার নয়। হয়তো আপনিই সেদিন যথার্থ কথা বলেছিলেন। দান প্রত্যাখ্যানের অধিকার আপনার যেমন ছিল না, তেমনি দান করবার অধিকারও ছিল না আমার।

বিস্মিত ভিক্ষু বলেন, এ কথা কেন বলছেন রাজনন্দিনী?

—মহাভিক্ষুকে দান করতে হলে শুধুমাত্র শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তেই তা করতে হয়।

—আমাকে কি আপনি শ্রদ্ধা করতে পারছেন না? সেটাই কি বাধা?

একটু নীরব থাকেন অক্ষুমতী। তারপর বলেন, না, অনৃতভাষণ করতে পারব না। হয়তো শ্রদ্ধার অতিরিক্ত আর কিছু সেদিন আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল আপনার জন্য ঐ কারুকার্যখচিত উত্তরীয়টি রচনায়। বাধা যে কোথায় তা আমি ব্যক্ত করতে পারব না। সে কথা প্রকাশে বাধা আছে। মহাভাগ, আমাকে মার্জনা করবেন।

মূক হয়ে যেতে হয়েছিল ভিক্ষুকে।

কিন্তু মূক হয়ে তো প্রতিদিন পথ অতিক্রম করা যায় না। তাই এ প্রসঙ্গ সুকৌশলে এড়িয়ে দুজনেই অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। নানান গল্প—বাল্যের, কৈশোরের নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা। অবশিষ্ট যাত্রীদল অধিক দূরে পিছিয়ে পড়েছে মনে হলে ওঁরা পথপার্শ্বে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসেন। অশ্ব দুটিকে বন্ধনমুক্ত করে অপেক্ষা করেন। একদিন সেইরকম মধ্যাহ্ন অবকাশে অক্ষুমতী তার পৃষ্ঠে আবদ্ধ পেটিকা থেকে কয়েকটি খর্জুর ও পৌলিক-পিষ্টক বাহির করে দিতে গেল ভিক্ষুকে। বুদ্ধযশা হেসে বললেন, এই জনমানবহীন দেশে পৌলিক-পিষ্টক কোথায় পেলেন?

কটাক্ষ করে অক্ষুমতী বলে, প্রশ্নটা অবৈধ—'রাজারা মাণিক্য কোথায় পায়' এ প্রশ্নের মতো।

ভিক্ষু বলেন, আপনি ঐন্দ্রজালিক হতে পারেন, কিন্তু এজাতীয় রাজভোগ্য বস্তুতে আমি ক্রমশ না অভ্যস্ত হয়ে যাই, আশঙ্কা সেটাই।

অক্ষুমতী বলে, অভ্যস্ত হলেই বা ক্ষতি কী? সামান্য কয়েকটি পৌলিক-পিষ্টক প্রতিদিন আপনার সেবায় অর্পণ করার মতো ক্ষমতা আছে কুচীরাজনন্দিনীর। যতদিন কুচীতে থাকবেন, ততদিন না হয় এ দায়িত্ব আমিই নিলাম।

—কিন্তু কুচী নগরীতে চিরস্থায়ী বসবাসের কোন বাসনা তো আমার নেই!

—থাকলেই বা ক্ষতি কী? কুচী এক অপরূপ শৈলনগরী। একজন্ম বাসে তার মাধুর্য ম্লান হওয়ার নয়।

ভিক্ষু বলেন, সেটাই তো আমার আশঙ্কা রাজকুমারী। আমিও না শেষ পর্যন্ত আমার পিতামহ কুমারায়ণের মতো কুচীতেই বন্দী হয়ে পড়ি।

অক্ষুমতী বলে, এখানে কিন্তু ভুল হল আপনার। ভিক্ষু কুমারায়ণ কুচীতে আদৌ বন্দী হননি—এখানে এসে তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন।

—কিন্তু উপসম্পদা নেওয়া হয়নি তাঁর!

—তাতে কী? লক্ষ ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন—ইতিহাস তাঁদের স্মরণে রাখবে না; কিন্তু ভিক্ষু কুমারায়ণ চিরজীবী হয়ে থাকবেন ইতিহাসে—নিজের পাণ্ডিত্য প্রতিভায় তো বটেই তদ্ভিন্ন শুধুমাত্র মহাস্থবির 'কুমারজীবের জনক' এই পরিচয়ে।

—কিন্তু ইতিহাসে শাশ্বত আসনলাভই তো মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয় কুমার ভট্টারিকা। পরম লক্ষ্য 'নিব্বাণ', তথাগতের আশীর্বাদলাভ।

অক্ষুমতী বলে, রাজা শুদ্ধোদন উপসম্পদা গ্রহণ করেননি, তবু অন্তিমকালে গোতম দিব্যদেহে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন। আশীর্বাদে ধন্য করেছিলেন তাঁকে। তথাগতের গর্ভধারিণী মায়া দেবী ভিক্ষুণী ছিলেন না, তবু তাঁকে সদ্ধম্মের বাণী শোনাতে গোতমকে জীবদ্দশায় সশরীরে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে যেতে হয়েছিল, নয় কি?

ভিক্ষু বলেন, আপনার সঙ্গে তর্কে জয়লাভ সম্ভবপর নয়, কুমার ভট্টারিকা।

অক্ষুমতী সলজ্জে বলে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

সহসা চমকিত হন ভিক্ষু। আত্মস্থ হন। বলেন, মার্জনা করবেন রাজকন্যা, সে আমি পারব না।

অক্ষুমতী জানতে চায় তার হেতুটা; কিন্তু তৎপূর্বেই পর্বতান্তরালের পথে দেখা গেল পল্যঙ্কিকাবাহীরা আবির্ভূত হয়েছে।

তারপর একদিন। সেদিনও প্রত্যূষে ওঁরা দুজন অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছেন। বেলা দ্বিপ্রহর। খাদ্যদ্রব্যাদি পশ্চাৎবর্তীদের নিকট গচ্ছিত আছে। অগত্যা ওঁরা দুইজন সেই জনশূন্য পথের প্রান্তে বসে পড়েন—যথেষ্ট দূরত্ব রচনা করে। অশ্বদুটিকে যথারীতি বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছেন। ক্লান্তদেহে দুজনে প্রস্তরশয্যায় উপবেশন করেছেন কি করেননি—প্রবলবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠল ভূলোক-দ্যুলোক। পরমুহূর্তেই দিগন্ত প্রকম্পিত করে এক প্রচণ্ড সিংহনাদ শ্রুত হল—যেন পর্বতের আত্মা মথিত করে লক্ষকোটি প্রেতযোনি শতাব্দীর রুদ্ধ হাহাকারকে মুহূর্তে মুক্তি দিল। বিশালকায় প্রস্তরখণ্ড সশব্দে পর্বতচূড়া থেকে ভীমবেগে নিম্নগামী। ভূকম্পন! অক্ষুমতী দণ্ডায়মান হবার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করে। ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ হয়ে সবেগে লুটিয়ে পড়ছিল খাদে, কালবিলম্ব না করে ভিক্ষু

বুদ্ধযশা উঠে দাঁড়ালেন এবং সবলে আলিঙ্গন করে ধরলেন বেপথুমান নারীদেহ। বললেন, দাঁড়াবার চেষ্টা করো না অক্ষুমতী। ভূমিকম্প হচ্ছে।

অক্ষুমতীর সমস্ত মুখাবয়বে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। প্রকৃতির এই ভীষণা রূপ সে কখনও দেখে নাই। নিশ্ছিদ্র পাষাণগাত্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভীমবেগে প্রস্তরচূর্ণ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পরমুহূর্তেই পাতালস্পর্শী খাদের দিকে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে। কর্ণপটাহবিদারী ভয়ঙ্করী শব্দে সমস্ত আকাশবাতাস দলিত-মথিত। যেন পাতালবাসী বন্ধনমুক্ত লক্ষ-শীর্ষ নাগিনী তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ধেয়ে আসছে।

সময়ের পরিমাপ নিশ্চিহ্ন। সম্বিৎ ফিরে এল যখন, তখন অক্ষুমতী অনুভব করল সে ভিক্ষু বুদ্ধযশার কবাটবক্ষে দৃঢ়আবদ্ধ। মুহূর্তের তাণ্ডবনৃত্য সমাপ্ত করে উন্মাদিনী পৃথিবী আবার শান্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বুদ্ধযশা ওকে শুইয়ে দেন ভূশয্যায়। বলেন, তোমার আঘাত লাগেনি তো কোনো?

কী প্রত্যুত্তর করবে অক্ষুমতী? দেহে তার কোন আঘাত লাগেনি—কিন্তু হৃদয়ে? মুহূর্তমধ্যে এ কী কাণ্ড হয়ে গেল!

ভিক্ষু চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, সমস্ত ভূ-প্রকৃতিটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পার্বত্য পথটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তাই তো! তাহলে কুমারজীব কেমন করে এখানে এসে পৌঁছাবেন? পথরেখা যদি না থাকে তাহলে কেমন করে ওঁরা মিলিত হবেন অবশিষ্ট দলের সঙ্গে? দুরন্ত ভয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন অক্ষুমতী। ভিক্ষু এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। বলেন, আপনি বিচলিতা হবেন না রাজকুমারী। আমি তো রয়েছি। ব্যবস্থা কিছু হবেই। কুচী নগরী এখান থেকে এক দিনের পথ মাত্র। আমরা কল্য সন্ধ্যাকালের মধ্যে সেখানে নিশ্চয়ই উপনীত হব। ওঁরাও কোনো ঘুরপথে সেখানে উপনীত হবেন। আসুন, দিবাভাগে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়—

অশ্ব দুটি? তাদের চিহ্নমাত্র নাই। বন্ধনমুক্ত অশ্বদ্বয় যে স্থানে বিচরণ করছিল সে স্থানটায় একটা অতলস্পর্শী গহ্বর।

কাহিনী দীর্ঘতর করা নিষ্প্রয়োজন। সেই উপলবন্ধুর পার্বত্যপথে ভিক্ষু বুদ্ধযশা অগ্রসর হতে থাকেন তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে। নারীদেহ স্পর্শ করবেন না বলে যে প্রতিজ্ঞা ছিল অনায়াসে বিসর্জন দিলেন তা। দুরতিক্রম্য বহুস্থানে সযত্নে অক্ষুমতীর পদ্মকোরকতুল্য হস্তধারণপূর্বক অগ্রসর হতে থাকেন।

ক্রমে ঘনীভূত হল সন্ধ্যার অন্ধকার। ভিক্ষু বললেন, এখন কৃষ্ণপক্ষ। তাছাড়া রাত্রে দুরন্ত শীত পড়বে। তুষারপাতও হতে পারে। সূর্যালোক স্তিমিত হওয়ার পূর্বেই রাত্রের জন্য কোন নিরাপদ পার্বত্যগুম্ফা অন্বেষণ করে নেওয়া ভাল।

সূর্যাস্তের পূর্বেই অমন একটি পার্বত্যগুম্ফা পাওয়া গেল। আশ্চর্য! সে গুহার ভিতর মনুষ্যবাসের চিহ্ন বিদ্যমান। ভিতরে একটি হরিণচর্মের অজিনাসন, একটি কমণ্ডলু, যষ্টি এবং দু'একটি মৃত্তিকা নির্মিত তৈজস—এক পার্শ্বে একটি নাতিবৃহৎ মৃৎপাত্রে পানীয় জল পর্যন্ত সঞ্চিত—এমন কি একটি অগ্নিকুণ্ডে স্তিমিত অগ্নির চিহ্নও বর্তমান। গৃহস্বামী অনুপস্থিত। ভিক্ষু বুদ্ধযশা বলেন, তথাগতের অসীম করুণা। এ গুহা সন্দেহাতীতরূপে কোনো নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—কোন ধর্মাবলম্বী জানি না, কিন্তু অতিথি সৎকারে তিনি পরাঙ্মুখও হবেন না নিশ্চয়।

তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব-সম্ভাবনায় অক্ষুমতীও উৎফুল্ল হয়। বস্তুত সম্পূর্ণ নির্জনে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে একই গুম্ফায় রাত্রিযাপনে সে সাহস পাচ্ছিল না। সীবলীই কি তৃপ্ত হত সেজন্মে ব্রাত্য-সন্ন্যাসী মহাজনকের সন্তান গর্ভে ধারণে সক্ষম হলে?

বুদ্ধযশা কিছু শুষ্ককাঠ সংগ্রহ করে আনেন—রাত্রে শীত রোধের আয়োজন।

ইতিমধ্যে অক্ষুমতী অজ্ঞাত গৃহস্থের রত্নভাণ্ডারটি অনুসন্ধান করে দেখেছে। উদ্ধার করেছে কয়েকমুষ্টি চণক, গোধুম ও চিপিটক, গুটিদশেক শুষ্ক খর্জুর। লুণ্ঠিত সম্পদ সে নিয়ে আসে বুদ্ধযশার সম্মুখে। বলে, মহাভাগ, মূঢ়মতী নারী আপনার নিকট শাস্ত্রীয় বিধান সন্ধানে সমাগত। বিধান দিন, গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে ক্ষুধার্ত অতিথির পক্ষে কি তাঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করার অধিকার ন্যায়সঙ্গত?

ভিক্ষু বলেন, ন্যায়সঙ্গত। অতিথি যদি নারী হয়। বিশেষ, যদি রাজনন্দিনী হয়।

কিন্তু সেই রাজনন্দিনী যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে, তার সঙ্গীকে ক্ষুধার্ত রেখে সে একাকী কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে না?

হাসেন ভিক্ষু। বলেন, সেক্ষেত্রে গৃহস্থের জন্য কিছু আহার্য অবশিষ্ট রেখে অতিথিরা আত্মসৎকার করতে পারে। রাজধানী এস্থল থেকে এক দিবসের পথ। যে ঋণ আমরা গ্রহণ করছি তা কল্যই পরিশোধ করতে পারব।

সুতরাং সম্পূর্ণ উপবাস করতে হল না। ভিক্ষু বললেন, একটা কথা। এস্থলে বন্যজন্তু আছে। দেখুন, সন্ন্যাসী গুহামুখ বন্ধ করার জন্য একটি কপাটও নির্মাণ করেছেন।

অক্ষুমতী বলে, হয়তো শীত নিবারণের জন্যই এ আয়োজন।

—সম্ভবত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ কবাটটি ভিতর হতে অর্গলবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকত না। এ সন্ন্যাসীর গৃহে এমন কিছু নেই যে তস্করাদির জন্য এ সাবধানতা অবলম্বন করবেন তিনি।

ঘনীভূত হল রাত্রি। বাহিরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু নির্মেঘ আকাশে অতন্দ্র প্রহরায় লক্ষ লক্ষ তারকা। যেন এ কোনো পার্বত্য গুম্ফা নয়—এ কোনো নির্জন বাসর-শয্যা। নায়ক ও নায়িকা কীভাবে তাদের প্রথম পুষ্পহীন ফুলশয্যা-রাত্রি উৎযাপন করে, সেই বারতার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দিব্যাঙ্গনা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষারতা। স্বাতী, শ্রবণা, চিত্রা, রেবতী, অরুন্ধতী—সব্বাই!

অক্ষুমতী নানা ক্ষাত্রবিদ্যায় অভ্যস্তা, তবু আজকের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে।

ভিক্ষু বললেন, রাজকুমারী, আমার আশঙ্কা হচ্ছে সন্ন্যাসী ভূকম্পনের সময়ে বাহিরে ছিলেন এবং তিনি দুর্ঘটনায় নিহত। নাহলে এই শীতে এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত তিনি বাহিরে থাকতেন না।

এ আশঙ্কা অক্ষুমতীরও হয়েছিল। বললে, এই অন্ধকারে তাঁর অন্বেষণ করবার চেষ্টা নিরর্থক। নিশাবসানে অনুসন্ধান করে দেখা যাবে। এবার আমরা বরং শয়নের আয়োজন করি। আমার পৃষ্ঠসংলগ্ন পেটিকায় সেই উত্তরীয়টি আছে। আমি সেইটি প্রস্তরশয্যায় বিছিয়ে নিই; আপনি সন্ন্যাসীর ঐ মৃগচর্মটি গ্রহণ করুন।

বুদ্ধযশা অগ্নিকুণ্ডে কিছু কাষ্ঠ নিক্ষেপণে ব্যস্ত ছিলেন। অক্ষুমতীর দিকে দৃকপাত না করে বলেন, না। এ গুহার ভিতর আপনি একাকীই শয়ন করবেন। আমি গুহামুখে ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে থাকব।

—সে কী! ওখানে শয়নের উপযুক্ত যথেষ্ট স্থানই তো নাই।

—না থাক, উপবেশনের পক্ষে প্রকোষ্ঠটি যথেষ্ট।

—কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনি গুহামধ্যে রাত্রিবাস করলে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

ভিক্ষু নীরবে অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করে চলেন। প্রত্যুত্তর করেন না। অক্ষুমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকে ভিক্ষুকে। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, মহাভাগ, আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন—জানি, নারী নরকের দ্বার, কিন্তু নারী হলেও আমি মানুষ! শপথ করছি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার গাত্রস্পর্শ করব না।

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান ভিক্ষু বুদ্ধযশা। বলেন, ক্ষান্ত হও অক্ষুমতী। এভাবে অপমান কোরোনা আমাকে!

—অপমান! আমি? আপনাকে? কী বলছেন আপনি?

—তুমি কী করে ভাবতে পারলে—আমি তোমাকে অত নীচ ভাবি?

—তাহলে গুম্ফার ভিতর রাত্রিযাপনে আপনার আপত্তি কোথায়?

অধোবদন হন বুদ্ধযশা। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুটে বলেন, তোমাকে নয় অক্ষুমতী, আমি নিজেকেই আজ বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণটা ঐ একই। ভিক্ষু হলেও আমি মানুষ।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে ভূশয্যায় বসে পড়ে অক্ষুমতী। এর কী প্রত্যুত্তর?

লাজকুণ্ঠিতা ঐ অপরূপ রূপবতীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভিক্ষু। সান্ত্বনা দিতে ওর মস্তকে হাতখানি রাখতেও সাহস পান না। আত্মগতভাবে অস্ফুটে বলেন, আমাকে মার্জনা

করো, অক্ষুমতী। আমাকে বাহিরেই রাত্রিযাপন করতে হবে। নাহলে হয়তো ভিক্ষু কুমারায়ণের মতো আমাকেও .....

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই তিনি দ্রুতগতি গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

পাষাণচত্বরে লুটিয়ে পড়ে মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী। উচ্ছ্বসিত রোদনে সিক্ত হয়ে যায় সে পাষাণ-কুট্টিম। তারপর উঠে বসে। উপায় নেই। এ কথার পর সে নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ করে দেয় পার্বত্যগুম্ফার একমাত্র দ্বার।

একদণ্ড পূর্বে ক্লান্তিতে তার আঁখিপল্লব নিমীলিত হয়ে আসছিল। এখন কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা এল না। অগ্নিকুণ্ডের সান্নিধ্যে উষ্ণ গুহাভ্যন্তরে সে নিশ্চিন্ত, অথচ দুরন্ত শীতে ঐ মুমুক্ষু একা বসে আছেন গুহাদ্বারে। অনেক রাত্রে সে গুহাদ্বার উন্মোচন করে বাহিরে আসে। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রহর গণনা করছে। গুহাদ্বারের একপ্রান্তে পাষাণগাত্রে দেহভার ন্যস্ত করে আড়ষ্ট ভঙ্গিমায় ভিক্ষু বুদ্ধযশা গাঢ় নিদ্রাভিভূত। করুণায়, মমতায় আপ্লুত হয়ে গেল অক্ষুমতীর অন্তঃকরণ। আর দ্বিধা নেই; অসঙ্কোচে সে একটি রক্তশতদলখচিত পশম উত্তরীয় জড়িয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষটির অঙ্গে। আর কিসের সঙ্কোচ? উনি তো নিজমুখেই স্বীকার করেছেন—উনি শুধু ভিক্ষু নন, উনি মানুষ! অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণের মতো অক্ষুমতী মনে মনে বলে, ঘুমাও তরুণ তাপস! এ হৃদয় যদি শতছিন্ন হয়ে যায় তবু মালিন্য লাগতে দেব না তোমার সংযমে। আমি ডাকব না তোমাকে, শুধু প্রতীক্ষা করব।

তারপর ফিরে আসে গুহাভ্যন্তরে। কটিবন্ধের তরবারিটি খুলে ফেলে। উন্মুক্ত করে বক্ষাবরণ লৌহজালিক। শয়নের পূর্বে সে সচরাচর উন্মুক্ত করে দেয় রেশমের বক্ষাবরণ কঞ্চুকগ্রন্থী, কিন্তু আজ করল না। মৃগচর্মটি অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে এনে শয়ন করে প্রস্তর-শয্যায়।....

এ সকল কথাই অক্ষুমতী অকপটে বর্ণনা করেছিল তার প্রিয়সখী শ্রবণার নিকট, কুচী নগরীতে পুনর্মিলনের পরে। সব, সব কথা। শুধু তাই নয়—সে-রাত্রে যে অদ্ভুত অবৈধ স্বপ্নটা দেখেছিল, সবিস্তারে সেকথাও বর্ণনা করেছিল। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন অবৈধ, অশালীন হলে স্বপ্নদ্রষ্টার অপরাধ কোথায়? গ্রহাচার্যকে প্রশ্ন করলে তিনি হয়তো এ স্বপ্নমঙ্গলের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? এ স্বপ্ন যে নিতান্ত অশ্লীল। বস্তুত স্বপ্নকাহিনীর একটি পর্যায় সে তার প্রিয় সখীকেও ব্যক্ত করতে পারেনি। তার কার্যকারণ সম্পর্ক সে যে নিজেই অনুধাবন করতে পারেনি। স্বপ্ন কি এভাবে বাস্তব প্রমাণ রেখে যেতে পারে?

অক্ষুমতী সেরাত্রে স্বপ্ন দেখেছিল—গভীর রাত্রে কে যেন তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্মম বাহুবন্ধের নিষ্পেষণে ওর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। স্বপ্ন যদিচ, তবু ওর পূর্ণ জ্ঞান ছিল। প্রথমটায় তার বিশ্বাসই হয়নি—যাঁর দৃঢ় আলিঙ্গনে সে আশ্লেষশয়নে আবদ্ধ, তিনি—তিনিই! কিন্তু পরমুহূর্তেই কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে সে সন্দেহাতীতরূপে শনাক্ত করে ফেলে তাঁকে—সেই ঘননীল চক্ষুদ্বয়, উন্নত নাসা, মুণ্ডিতমস্তক, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ। সেই তিনি—যিনি নিজমুখে স্বীকার করেছিলেন, তিনি শুধু ভিক্ষু নন, তিনি মানুষ।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কী একটা কথা বলতে যায় অক্ষুমতী। পারে না। কারণ পরমুহূর্তেই —কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! তিনি ওর মুখচুম্বন করলেন। সে যেন অনন্তকাল ... বক্ষপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হতে চায় ..... বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে বসতে গেল। পারল না। পরমুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তা অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! কল্পনাতীত! তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধযশা নির্মমহস্তে উন্মোচন করে দিলেন ওর বক্ষবন্ধনী! গ্রন্থিমুক্ত হল অনুরাগরক্তিম রেশম কঞ্চুলিকা! তখনও পূর্ণ জ্ঞান আছে অক্ষুমতীর। নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিকুণ্ডের ঈষদালোকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল—ভিক্ষু বুদ্ধযশা বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন তার নিরাবরণ চন্দনকুমকুমচর্চিত বক্ষের দিকে। থরথর করে কেঁপে উঠল রত্যাতুরা অক্ষুমতী! সে আনন্দশিহরণে ভূকম্পনস্পন্দিত যুগল ভূধরের ন্যায় বেপথুমান হল ওর তনুতে অতনুর যুগ্মজয়স্তূপ! সেই মুহূর্তেই জ্ঞান হারালো রাজনন্দিনী।

নিঃসন্দেহে এ এক অবৈধ, অশালীন, অশ্লীল স্বপ্ন। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু বুদ্ধযশার পক্ষে নিদ্রাভিভূতা অসহায়া এক অনাঘ্রাতা যোড়শীকে আক্রমণ করা অসম্ভব! তদুপরি তার মুখচুম্বন করা, তাকে বিবস্ত্রা করা দুঃস্বপ্নেরও অগোচর! কিন্তু স্বপ্ন যদি দুঃস্বপ্ন না হয়! পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে অক্ষুমতী দেখেছিল—সে যথারীতি মৃগচর্মাসনে একাকী শায়িতা। গুহাদ্বারের কপাট উন্মুক্ত নয় এবং ভিক্ষু বুদ্ধযশা বাহিরের পাষাণচত্বরে গভীর নিদ্রামগ্ন। সুতরাং দুঃস্বপ্নই হোক আর বঞ্চিতা নারীর সুখস্বপ্নই হোক, এ শুধু স্বপ্নই—মায়া, মতিভ্রম, উপেক্ষিতা পূর্ণযৌবনা রমণীর অন্তর-কামনার এক তির্যক পরিতৃপ্তি। ওর জাগরমন যে চিন্তাটিকে অস্বীকার করতে চায়, অবচেতনের বিদ্রোহে স্বপ্নরাজ্যে এ বোধ করি তার এক বঙ্কিম পরিতুষ্টি। শুধু অক্ষুমতী নয়, প্রিয়সখীর কাছে স্বপ্নমঙ্গলকথা আদ্যন্ত শ্রবণ করে শ্রবণাও সেই সিদ্ধান্তে এসেছিল।

কিন্তু!

যেকথা 'পিয়সহি'র নিকটেও স্বীকার করতে পারেনি অক্ষুমতী, তার কী অর্থ? কী তার ব্যাখ্যা?' সে যে এক পরম বিস্ময়। চরম রহস্যঘন। স্বপ্ন কখনও এমন বাস্তব প্রমাণের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়?

পরদিন নিদ্রাভঙ্গে অক্ষুমতী দেখেছিল—তার উন্মোচিতগ্রন্থি রেশমবস্ত্রের বক্ষাবরণ কঞ্চুকটি নিদারুণ লজ্জায় ওর চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিতা।

তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত!

মদনোৎসবের প্রমত্ত কলকোলাহলকে পিছনে রেখে অপরাহ্ণবেলায় একজন তরুণবয়স্ক অশ্বারোহী আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে নির্জন পার্বত্যপথে অশ্বারোহণে চলেছিলেন উত্তরাভিমুখে। অশ্বারোহীর অঙ্গে যোদ্ধৃবেশ, বক্ষে লৌহজালিক, পৃষ্ঠে তূণীর, বামস্কন্ধে রণশার্ঙ্গ, মস্তকে উষ্ণীষ—কিন্তু মুখাবয়বের উপর একটি মুখোশ। পথচারীরা এজন্য আদৌ বিস্মিত নয়; কারণ আজ মদনোৎসব—বাসন্তী পূর্ণিমা। এ উৎসবে কী পুরুষ কী নারী সকলেই উষ্ট্রচর্ম-নির্মিত মুখোশে একদিনের জন্য আত্মগোপন করে। সূর্যোদয়ে উৎসবের আরম্ভ, সূর্যাস্তে পরিসমাপ্তি। সমস্ত দিনমান কুমকুমে-ফাগে, আবীরে-গুলালে পরস্পরকে ওরা রাঙায়; কিন্তু পরস্পরের পরিচয় পায় না। এ রীতি বোধকরি রোমক সভ্যতার নিকট থেকে মধ্য এশিয়ার পথে এই পার্বত্য জনপদে সমাগত। মদনোৎসবের রতিরঙ্গে উচ্চ-নীচ ভেদ নাই—অনূঢ়া, বিবাহিতা এবং বিধবাদিগের এ উৎসবে যোগদানের সমান সামাজিক অধিকার—যৌবনপ্রাপ্তিই এ রাজ্যে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। অনুরূপভাবে পুরুষদিগেরও ঐ একই ছাড়পত্র—কুমার, বিবাহিত অথবা মৃতপত্নী। পরস্পরের পরিচয়দান যদিও শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তবু দুর্জনে বলে—গোপন প্রেমিক-প্রেমিকা এই একটি দিবসে অবৈধ প্রেমের আসরে পরস্পরকে পূর্বেই বেশবাসের সঙ্কেত জানায়, কোথায় কোন দণ্ডে প্রতীক্ষায় থাকবে তা জ্ঞাপন করে। রাজাবরোধের বিবাহিত বহু সম্ভ্রান্ত পুরললনাও তাদের প্রাক্‌বিবাহজীবনের প্রেমাস্পদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে—একটি দিন অতীত স্মৃতির রোমন্থনে অতিবাহিত করে। সমাজ ওদের অবদমিত কামের ক্ষণিক তৃপ্তি স্বীকার করে নেয়। দিবাবসানে যে যার চিহ্নিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আশ্চর্য, অদ্ভুত উৎসব!

পাকদণ্ডী পথে আমরা যে তরুণ অশ্বারোহীকে দেখছি, মুখোশের জন্য তাঁকে শনাক্ত করা যায় না বটে, তবে জনান্তিকে পাঠককে জানিয়ে রাখতে পারি, তিনি এ কাহিনীর নায়িকা—ছদ্মবেশী রাজনন্দিনী অক্ষুমতী। মদনমন্দির প্রাঙ্গণের নৃত্যগীত উৎসবে মন্দভাগিনী তৃপ্ত হতে পারেনি। অনুষ্ঠানে নানা দেশের সুপুরুষ তরুণ সমাগত—কুঞ্জে কুঞ্জে বিতানে বিতানে যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা; মদনমন্দির কুট্টিমে নৃত্যগীতের নিরবচ্ছিন্ন আসর। মদিরার স্রোতে মন্দির-সোপান পিচ্ছিল। বাতাসে ভাসমান অনুরাগরক্তিম আবীর। কিন্তু এ আনন্দ উৎসবে অক্ষুমতী অন্তর থেকে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর গুপ্তচর গোপনে সংবাদ এনেছে—'তিনি' এ উৎসবে আদৌ আসেননি!

রাজপুত্রী ইচ্ছা করেই পুরুষের ছদ্মবেশে মদনোৎসবে এসেছিলেন—যাতে অপরিচিত কোনও রসলোভী ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বেশ অনুভব করেন—প্রতিযোগী রাজপুত্রেরা রাজনন্দিনীর সন্ধানে সারা দিনমান কীভাবে তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল।

অপরাহ্ণবেলায় শ্রবণার কর্ণমূলে রাজকন্যা নিবেদন করলেন—গোপনে তিনি মদনোৎসব প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে যাচ্ছেন।

শ্রবণা অস্ফুটে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে পিয়সহি? তিনি কোথায় জেনেছ?

—জেনেছি। মহাথের-এর সঙ্গে তিনি অতি প্রত্যূষে অশ্বারোহণে খ্যিজিল সঙ্ঘারামে যাত্রা করেছেন।

—খ্যিজিল সঙ্ঘারাম! মহাস্থবিরের সঙ্গে? সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই বা কী বলবে?

—কিছু বলব না। শুধু তাঁর পদপ্রান্তে একমুঠো আবীর নামিয়ে দেব।

—যদি তিনি প্রশ্ন করেন—এর অর্থ কী?

—বলব—তিনি ভিক্ষু হলেও মানুষ!

খ্যিজিল সঙ্ঘারাম কুচী নগরীর এক যোজন উত্তরে। বিংশ শতাব্দীতে অধ্যাপক অরেল স্টাইন যে খ্যিজিল সঙ্ঘারাম আবিষ্কার করেছেন সেটি তখনও অজাত। সেই অপূর্ব পার্বত্যগুম্ফার ভাস্কর্য-স্থাপত্য এবং অজন্তা শৈলীর অনুকরণে বিচিত্র প্রাচীরচিত্র তখনও জন্মলাভ করেনি। সেখানে প্রথম গুহামন্দিরটি কুচীরাজ্যের অর্থানুকূল্যে এবং মহাস্থবির কুমারজীবের শিল্পনির্দেশে সবেমাত্র উৎকীর্ণ করা হয়েছে। একটিমাত্র গুহাচৈত্য, যার স্তূপটি উৎকীর্ণ, তার বহির্দ্বারের কারুকার্য অসম্পূর্ণ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি—শতাধিক বৌদ্ধ শিল্পী ও ভাস্কর নিরলস পরিশ্রমে সেটি রূপায়িত করছেন। মহাস্থবির সপ্তাহে একদিন সে কার্য পরিদর্শনে যান। যেমন আজ গিয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা সমভিব্যাহারে।

ক্রমে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল মদনোৎসবের কলকোলাহল, কুচী নগরীর হর্ম্যরাজি। নির্জন গিরিসংকটে কদাচিৎ দু-একটি মেষচারক। ওরা এ জনপদের অন্তেবাসী। তারপর সম্পূর্ণ জনহীন পথ—শুধুমাত্র তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ অন্তরালে রেখেছে দিগন্তকে। খ্যিজিল সঙ্ঘারামের প্রবেশদ্বারে যখন উপনীত হলেন তখন সূর্য পশ্চিম পর্বতশৃঙ্গের পরপারে অবলুপ্ত। দু-একটি কৌতূহলী তারকা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। বৌদ্ধ ভাস্করের দল সমস্ত দিবসের কায়িক পরিশ্রমে ক্লান্ত; বিশ্রাম নিয়েছেন তাঁরা। তবু একক অশ্বারোহীকে অগ্রসর হতে দেখে গুহাদ্বারে বহির্গত হয়ে আসেন পীতবসনধারী একজন বৃদ্ধ শ্রমণ। মুণ্ডিতমস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখাবয়বে প্রশান্ত বৈরাগ্যের আলিম্পন। অক্ষুমতী অশ্ব হতে অবতরণ করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে তাঁকে প্রণতি জানায়। বৃদ্ধ দুই হাত উত্তোলন করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন।

—আর্য, আমি কুচী নগরী থেকে আসছি, মহাস্থবির কুমারজীব এবং তাঁর সঙ্গী ভিক্ষু বুদ্ধযশা এখানে এসেছেন শুনলাম .....

—তাঁরা উভয়েই এখানে উপস্থিত। অদ্য রাত্রিতে এখানেই তাঁরা থাকবেন। তোমার পরিচয়?

—মার্জনা করবেন ভদন্ত ! পরিচয় প্রদানে আমি অসমর্থ!

বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মুখ মুখোশে আবৃত। সম্ভবত তুমি কুচী নগরীর মদনোৎসব প্রাঙ্গণ থেকে আসছ। সত্য কি ?

—সত্য, ভদন্ত। আমি সেই স্থান থেকেই আসছি বটে।

—কিন্তু সে উৎসবে বহু বিজাতীয় রাজপুরুষ যোগদান করেছেন বলে শুনেছি। তোমার পরিচয় না জেনে আমি কীভাবে—

বৃদ্ধের বাক্যটি সমাপ্ত হয় না। কারণ তৎপূর্বেই অক্ষুমতী তাঁর অনামিকা থেকে রাজ-অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি মুক্ত করে বৃদ্ধের চরণপ্রান্তে রাখে। সেটি পরীক্ষা করে বৃদ্ধ বললেন, তুমি ভিতরে যেতে পার আয়ুষ্মন।—অঙ্গুরীয়টি তিনি প্রত্যর্পণ করেন।

অশ্বটিকে উন্মুক্তস্থানে রেখে অক্ষুমতী সোপানাবলী অতিক্রম করে অলিন্দের উপর উপনীত হয়। গুহাভ্যন্তর ঈষদালোকিত। স্তম্ভের ওপ্রান্তে পিত্তলের দীপদণ্ডে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। তারই

অনুজ্জ্বল আলোকে গুহার অভ্যন্তরভাগ রহস্যময়। দুইজন বৌদ্ধ শ্রমণকে দেখা যায়—তাঁরা মুখোমুখি বসে আছেন পদ্মাসনে। একজন বৃদ্ধ—ঈষদুচ্চ কাষ্ঠাসনে বসে আছেন—সমংকায়শিরগ্রীব ভঙ্গিমায়। অক্ষুমতী তাঁকে চিনতে পারে—মহাস্থবির কুমারজীব। তাঁর সম্মুখে জোড়হস্তে যিনি সারঙ্গচর্মাসনে উপবিষ্ট তিনি ভিক্ষু বুদ্ধযশা। মহাস্থবিরের সম্মুখে একটি পুঁথি—তিনি তা থেকে কিছু পাঠ করছেন। অক্ষুমতী চতুর্দিকে দৃকপাত করে। কক্ষে আর কেহ নাই। অতি সন্তর্পণে সে পাষাণগাত্রের সন্নিকট দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়। একটি স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করে। শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন দুটি মুমুক্ষুকে সে এ সময় বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক। পাঠ সমাপ্ত হলে সে আত্মঘোষণা করবে। তার বাম হস্তে একটি উষ্ট্রচর্মের থলিকা—আবীরচূর্ণে পূর্ণ।

পাঠ শেষ হল। মহাস্থবিরের দৃষ্টি এবার শ্রোতার মুখের উপর বর্ষিত হল। তিনি বললেন, হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশা! আপনার নিকট নিদান হইতে অধিকরণ শপথ পর্যন্ত অধ্যায় পাঠান্তে পারাজিক সঙ্ঘাদিবিশেষ ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে প্রথানুসারে প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন স্বীকার করুন। আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ থাকেন, তবে মৌন থাকুন।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষু ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। অপাপবিদ্ধ শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি মহাস্থবিরের মুখের উপর রেখে যুক্তকরে অচঞ্চলভাবে বললেন, থের! আমি নীরব থাকতে পারছি না। কিন্তু আমি পাপ করেছি কি না তা-ও জানি না। কী পাপ, কী পুণ্য তা আমার বুদ্ধিতে মূল্যায়ন করতে পারছি না। নিরন্তর আমি প্রার্থনা করছি—হে শাক্যশ্রেষ্ঠ, হে লোকজ্যেষ্ঠ, তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন কর, আমার অজ্ঞানতমসা বিদূরিত কর, সম্যক দৃষ্টি প্রদান কর—আমাকে বলে দাও, আমি পাপী কি না! কিন্তু হে ভদন্ত! আমি আজও আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাই নাই। আমি জানি না, কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে কি না!

মহাস্থবির কুমারজীব বিস্মিত, কিন্তু নির্বাক।

ভিক্ষু বুদ্ধযশা পুনরায় বলেন, মহাথের! আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি। আপনি বিধান দিন। যদি আমি পাপ করে থাকি, তবে পাতিমোক্ষ-বিধানে আমাকে কঠিনতম শাস্তি দিন! আমি প্রায়শ্চিত্ত করব।

মহাস্থবির বলেন, আপনি শান্ত হন মাননীয় ভিক্ষু। আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত। যে ঘটনার জন্য আপনি অনুতাপে বিদ্ধ হচ্ছেন, তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করুন। শ্রবণান্তে আমি বিধান দেব। আমি অতঃপর কর্ণময়।

আশ্বস্ত হলেন বুদ্ধযশা। যে দুর্বহভার এতদিন একাকী বহন করছিলেন আজ তা গুরুর পদপ্রান্তে নামিয়ে দেবার অনুমতি পেয়েছেন। আর তাঁর দায় নেই। এখন মহাস্থবির যা বিধান দেন তা তিনি নতমস্তকে স্বীকার করে নেবেন।

একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করতে থাকেন উদাসীন নির্লিপ্ততায়। সে কাহিনীর শুরু কুমারজীবের কাশগড় আগমনে। সেই যেখানে তিনি রাজনন্দিনী অক্ষুমতীকে প্রথম দেখেন। নিজ চিত্তচাঞ্চল্যের কথা অকপটে স্বীকার করলেন বুদ্ধযশা। স্বীকার করলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় তাঁর মন কী-ভাবে প্রতীক্ষায় উন্মনা হয়ে যেত। বর্ণনা করলেন সেই তুষারঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত সন্ধ্যাটির কথা—কী-ভাবে তিনি সূচীশিল্পচিত্রিত উত্তরীয়টি প্রত্যাখ্যান করে বিড়ম্বিত হন—তবু তুষারপাত অস্বীকার করে অতিথিকে চৈত্যগৃহ থেকে পথে বিতাড়ন করেন। তারপর শৈলদেশ থেকে কুচী নগরীতে প্রত্যাবর্তনের বিস্তারিত দিনপঞ্জিকা। আশ্চর্য! প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে স্মৃতিপটে। অক্ষুমতীর নিকট সেই উত্তরীয়টি পুনরায় ভিক্ষা করা....অক্ষুমতীর প্রত্যাখ্যান। রাজকন্যা তাঁকে অনুরোধ করেন নাম ধরে ডাকতে ... ভিক্ষু বুদ্ধযশার প্রত্যাখ্যান! কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—বর্ণনা করলেন নিদারুণ ভূমিকম্পে অক্ষুমতী যখন অতলস্পর্শী খাদে পতিত হতে যাচ্ছিল, তখন কীভাবে তিনি তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, ভিক্ষু অকপটে স্বীকার করলেন—'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই খণ্ডমুহূর্তে রাজকুমারীকে বাহুবন্ধের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে আমি....হ্যাঁ

স্বীকার করছি.... এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলাম। জানি না, সে আনন্দ একটি নারীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করায়, অথবা তাতে গিরিমেখলবাহনের কোন কৌতুক মিশ্রিত ছিল কি না।

সেই ঘটনার পর থেকে আমার প্রতিনিয়ত মনে হচ্ছে—

অনিক্কসাবো কাসাবং যে বত্থং পরিদহেস্সতি।
অপতো দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি।।[2]

পাষাণচত্বরে ঝরে পড়ল মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি ভিক্ষুর দুই ফোঁটা অশ্রু। তিনি নীরব হলেন।

মহাস্থবির বলেন, আপনি বলে যান মাননীয় ভিক্ষু। আমি কর্ণময়!

বুদ্ধযশা এরপর বর্ণনা করেন, দিবাবসানে পার্বত্যগুহায় তাঁদের আশ্রয় নেবার কথা। অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর সঞ্চিত চণক ও চিপিটক অপহরণ করে কৌতুকময়ীর সঙ্গে তাঁর কী জাতের রসালাপ হয়েছিল সে কথাও অকপটে বললেন। বর্ণনা করলেন, রাত্রিযাপনের পূর্বে তাঁদের কী ধরনের কথোপকথন হয়েছিল। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কথা—কেন তিনি সেই গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে স্বীকৃত হতে পারলেন না।

অন্ধকারে লজ্জায় অনুশোচনায় মাটিতে মিশে গেল অক্ষুমতী।

—তারপর?

এরপর তরুণ ভিক্ষু যা বললেন তা আরও অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। বজ্রাহত হয়ে গেল অক্ষুমতী!

—গভীর রাত্রে একটা অস্ফুট গোঙানি শুনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। প্রথমটা কিছুই স্মরণ হল না। প্রচণ্ড শীতে এবং তুষারপাতে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল। সহসা মনে হল, যন্ত্রণাসূচক শব্দটা গুহাভ্যন্তর থেকে আসছে। রাজকন্যার নিরাপত্তা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। গুহাকপাট উন্মুক্ত করে ভিতরে পদার্পণ করেই বুঝতে পারি—কী হয়েছে। নীরন্ধ্র গুহাভ্যন্তরে বায়ু গমনাগমনের দ্বিতীয় ছিদ্রপথ নেই,—আমরা তদুপরি সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করাতেই এই সর্বনাশ হয়েছে। ভূশয্যালীন রাজকন্যার নিকটস্থ হয়ে আমার নিজেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। দেখলাম—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উনি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। বাতাসের অভাবে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছে, তবু জ্বলন্ত অঙ্গারপিণ্ডে গুহাভ্যন্তর পরিদৃশ্যমান—কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয়ও হয়েছিল। রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম, গতি অতি ক্ষীণ। এক মুষ্টি বিশুদ্ধ বাতাস! নাহলে ঐ মুমূর্ষু রোগিণীর অচিরে জীবননাশ অবধারিত। তাঁকে গুহার বাহিরে আনা যায়, কিন্তু গুহাভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং বাহিরে তখন তুষারপাত শুরু হয়েছে। অমন একটি মুমূর্ষু রোগিণীকে সে অবস্থায় এ-জাতীয় উত্তাপের পরিবর্তনে নিয়ে আসাও বিপদজনক। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে ফেলে—

ভিক্ষু নীরব হলেন। মহাস্থবির যেন প্রস্তরমূর্তি। অন্তরালে অক্ষুমতীও কাষ্ঠপুত্তলী।

—অকপটে সব কথা স্বীকার করতে আমি বদ্ধপরিকর। মহাথের! আমি সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীর অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত করে নিজমুখ সেস্থলে স্থাপন করলাম! ফুৎকারে তাঁর মুখমধ্যে প্রাণবায়ু সিঞ্চন করলাম। ভূকম্পনস্পন্দিত মেদিনীর মত রোগিণীর সর্বাবয়ব বেপথুমান হল। লক্ষ্য করে দেখলাম—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুকে তাঁর বক্ষ বিস্ফারিত হতে পারছে না। আমি... আমি পরমুহূর্তেই তাঁর রেশমকঞ্চুকের বন্ধনগ্রন্থি উন্মোচিত করে দিলাম....

দুই হাতে আনন আবৃত করে ভিক্ষু বুদ্ধযশা আর্তনাদ করে ওঠেন।

—তারপর?

—না। তারপর আর তাঁকে স্পর্শ করিনি। কিন্তু সে উত্তপ্ত গুহাভ্যন্তর পরিত্যাগ করে বাহিরেও আসিনি। রোগিণীর শিয়রে যাবৎপ্রভাত অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর তাঁর জীবনের আশংকা নাই, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়েছে অনুধাবন করে আমি বাহিরে আসি এবং নিদ্রাভিভূত হই।

পুনরায় নীরব হলেন ভিক্ষু। মহাস্থবির তখনও নিরুত্তর। স্তম্ভের অন্তরালে অক্ষুমতী শুধু চোখের জলে ভাসছে। অর্থী ভিক্ষুই নীরবতা ভঙ্গ করে বলেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ মহাথের, এক্ষণে বলুন, আমি কি পাপী? পাতিমোক্ষমতে আমি কী দণ্ডগ্রহণ করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?

ধ্যানভঙ্গ হল মহাস্থবিরের। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু ! আপনাকে কোনো পাপ স্পর্শ করে নাই। একটি মৃত্যুপথযাত্রিণীকে প্রাণদানের নিমিত্ত আপনি যা কিছু করেছেন তার প্রেরণা করুণার উৎসমুখে। এতে কোন অন্যায় নাই, পাপ নাই।

দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে ভিক্ষু বলেন, কিন্তু.... কিন্তু .....

—বলুন?

এবার দীপালোকে অত্যন্ত করুণ দেখালো তাঁকে। তবু মহাথেরের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে দৃকপাত করে বুদ্ধযশা বললেন, আমি যে স্থিরনিশ্চয় হতে পারছি না মহাথের—কিসের প্রেরণায় আমি যাবৎ প্রভাত সেই গুহাভ্যন্তরে অপেক্ষা করলাম! সে কি গুহামুখের তুষারপাতের বিকর্ষণে কিম্বা উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের আকর্ষণে! অথবা....?

—না। আপনি ব্রাত্য নন! আপনি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এক্ষণে মনস্থির করে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আপনি আপনার জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা! বলুন—কী আপনার অভিলাষ? কুচীরাজদুহিতাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণান্তে গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করতে চান? ভবিষ্যৎ কুচীজনপদ-অধিনায়ক হতে ইচ্ছুক? অথবা আমার নিকট উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী?

—উপসম্পদা! আপনি কি এই অবস্থায় সে দুর্লভ সম্পদ আমাকে প্রদানে স্বীকৃত !

—হ্যাঁ, মাননীয় ভিক্ষু। এক্ষণে আপনি সে অধিকার অর্জন করেছেন।

—তবে সেই মহাসম্পদই আমাকে দান করে আমার জন্ম সার্থক করুন, প্রভু !

—তথাস্তু !

সাষ্টাঙ্গে মহাস্থবিরকে প্রণাম করলেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা।

নিমীলিত নেত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন কুমারজীব :

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
শনে আসনে ঠানে গমনে চাপি সর্বদা।[3]

ওঁরা জানতেও পারলেন না—নীরবে একটি ছায়ামূর্তি বহিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সেই খ্যিজিল সঙ্ঘারামের অর্ধসমাপ্ত চৈত্যগুহার গর্ভ থেকে। যেন এক স্বপ্ন-ছায়ামূর্তি। সুখস্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? জানি না। শুধু স্বপ্নের এক বাস্তব প্রমাণের মতো স্তম্ভমূলে পড়ে রইল অনাদৃত একটি থলিকা। কেউই লক্ষ্য করল না,—সে থলিকার গ্রন্থি উন্মোচন করলে দেখা যেত তার অন্ধকোটরে লজ্জায় লাল হয়ে মুখ লুকিয়েছে একমুষ্টি অনুরাগরক্তিম কুমকুমচূর্ণ!

সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ পো-সাঙ!

অতি প্রত্যূষেই সন্নিধাতা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করে এ দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করেছে। উৎসবের দিনটির সূত্রপাত হয়েছে ঐ দুঃসংবাদে। কুচীরাজ প্রাতঃকৃত্যাদির সময়ও পাননি। তৎক্ষণাৎ আহ্বান করেছিলেন রাজাবরোধের কঞ্চুকীকে, রাজান্তঃপুরিকার রক্ষক বৃদ্ধ কঞ্চুকী নতমস্তকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বীকার করেছেন ঘটনার সত্যতা—গতকল্য রাত্রিতে কুমারভট্টারিকা অক্ষুমতী যোদ্ধবেশে একাকী অশ্বারোহণে প্রাসাদ-কুড্যের বাহিরে গিয়েছিলেন। রাজনন্দিনী এভাবে ইতিপূর্বে বহুবার গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গিয়েছেন—তিনি ক্ষাত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিতা, আত্মরক্ষায় সমর্থা; তদ্ভিন্ন আরক্ষা-আধিকারিকের সুব্যবস্থায় জনপদ পরিসীমার ভিতর তস্করাদির উপদ্রবও নাই। তাই রাজকন্যার এই চপলতায় এতাবৎকাল কঞ্চুকীমহাশয় আপত্তিও করেননি। কিন্তু গতকাল রাত্রিতে প্রাসাদ ত্যাগের পর রাজকন্যা আর প্রত্যাগমন করেননি।

পো-সাঙ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আজই কুমারভট্টারিকার স্বয়ম্বর-সভার দিন ধার্য

হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার অনবদ্য শ্লোকগুলি তখনও রচিত হয়নি। উজ্জয়িনীর কালিদাস আমাদের কাহিনীর কালে নাবালক মাত্র। কুচী নগরী কিছু পাটলীপুত্র, উজ্জয়িনী, বিদিশা, অবন্তী নয়—অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনপদ। স্বয়ম্বর সভায় সহস্রাধিক অভ্যাগতের উপস্থিতির সম্ভাবনা। কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদভবনে অত মানুষের সমবেত হওয়ার মতো মিলনকক্ষ নাই। তাই রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভার সাময়িক ব্যবস্থা হয়েছে। একটি দেবদারু কাষ্ঠনির্মিত উচ্চবেদি, তার উপর উষ্ট্রচর্মের চন্দ্রাতপ। দুই পার্শ্বে সুচিত্রিত মঙ্গলকলস এবং চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে পতাকাশোভিত দণ্ড। মঞ্চের সম্মুখভাগে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রার্থী ও সম্ভ্রান্ত দর্শকদিগের কাষ্ঠাসন। পশ্চাদ্‌ভাগে পর্বতগাত্রে কৃত্রিম সোপানশ্রেণী উৎকীর্ণ—সাধারণ প্রজাদিগের আসন। আয়োজন সম্পূর্ণ। দুইদণ্ড বেলা হলেই স্বয়ম্বর সভায় যোগদানেচ্ছু রাজন্যবর্গ ও কুমারগণ উপস্থিত হবেন। তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনার আয়োজনও সুসম্পন্ন। সন্নিহিত রাজপ্রহরীগণ শূলহস্তে পাহারা দিচ্ছে, কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ শেষ মুহূর্তের ব্যবস্থাদি করছে। অথচ যাঁকে কেন্দ্র করে এই বিরাট আয়োজন তিনিই গতরাত্রি থেকে নিরুদ্দিষ্টা!

পো-সাঙ বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে আদেশ করলেন—নগর-কোট্টাল ও নগর-শান্তি-রক্ষককে অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ করতে। তাঁরা যেন বিনা কালহরণে রাজসমীপে আসেন। বললেন, এ দুঃসংবাদ যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে। আরও বললেন, রাজান্তঃপুর থেকে অমাত্য শিবমিশ্রের কন্যা শ্রবণাকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করতে। শ্রবণা অনতিবিলম্বেই এসে উপস্থিত হল। কুচীরাজকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে নতনেত্রে বদ্ধাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

—কুমারভট্টারিকা গতকাল রাত্রে কোথায় গিয়েছেন জান? তোমাকে কিছু বলে গেছেন?

শ্রবণার দুই চক্ষু রক্তাভ। শিরশ্চালনে সে নেতিবাচক প্রত্যুত্তর করে।

কিয়ৎকাল ইতস্তত করে রাজা বলেন, তুমি তার প্রিয়তমা বয়স্যা। তুমি জান, আজ স্বয়ম্বর-সভায় কার বরমাল্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল?

শ্রবণা প্রস্তরমূর্তির ন্যায় স্থাণু। এ কথার কী প্রত্যুত্তর করবে সে?

পো-সাঙ বলেন, শ্রবণা! সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি এ অশোভন প্রশ্ন করতাম না। কিন্তু রাজকন্যা শুধু আমার আত্মজা নয়—সে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ-নৃপতির রাজমহিষী। অন্তত রাজ্যের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে তুমি অসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য জানাতে পার।

শ্রবণা বললে, মহাভাগ, এ সংবাদ সম্বন্ধে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে বলে আমিও বিশ্বাস করি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি সেই ভাগ্যবানের নাম, যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারলে আজ রাজকন্যা কৃতকৃতার্থ হতেন। কিন্তু মহারাজ! তা হবার নয়—আজকের স্বয়ম্বর-সভায় সেই যুবাপুরুষ উপস্থিত থাকবেন না। তিনি পিয়সহিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কুচীরাজ। এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ-মহিষী, সর্ববিদ্যাপারঙ্গমা অনিন্দ্যকান্তি অক্ষুমতী প্রত্যাখ্যাতা! স্বয়ং শচীপতি আখণ্ডল যাঁর বরমাল্য পেলে ধন্য হয়ে যান তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কে? গম্ভীরস্বরে বলেন, কে সেই যুবাপুরুষ? রাজনন্দিনীকে প্রত্যাখ্যান করার হেতু কী?

—তিনি কাশ্মীরী ভিক্ষু বুদ্ধযশা। গতকাল যিনি মহাথেরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়েছেন।

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন হতভাগ্য মহারাজ। বললেন, তা হলে তো অক্ষুমতীর এ গৃহত্যাগ কোন গোপন অভিসার নয়! সে কোথায় গিয়েছে অনুমান করতে পার?

আর্দ্র দুটি কজ্জললাঞ্ছিত নয়ন মেলে শ্রবণা প্রত্যুত্তর দিতে গেল। পারল না। উচ্ছ্বসিত রোদনে তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়। তবু তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা প্রণিধান করলেন কুচীরাজ। দুই হাত সম্প্রসারিত করে বললেন—ক্ষান্ত হও শ্রবণা! না না—ও কথা বল না। সে কেন আত্মঘাতিনী হতে যাবে?

তবু কথাটা সূচীমুখ কণ্টকের মতো বিদ্ধ হল রাজবক্ষে। অক্ষুমতী আদরের দুলালী। প্রার্থনার পূর্বেই তার বাসনার পূরণ হয়—এতেই সে আবাল্য অভ্যস্তা। সপ্তদশবর্ষের জীবনে ভাগ্যদেবতা তাকে ক্রমাগত অকুণ্ঠ প্রসাদ বিতরণ করেছেন—রাজকুলে জন্ম, যৌবরাজ্যে অধিকার, জনপদকল্যাণীর মতো রূপ, প্রজ্ঞাপারমিতার মতো বিদ্যা, শক্র-মহিষী পৌলমীর মতো ভাগ্য। শুধু একটি দ্রব্যের স্বাদ সে পায়

নাই—বঞ্চনা! আজ প্রথম আঘাতেই কি সে একেবারে ভেঙে পড়েছে! কুচীরাজ গোপনে নিয়োগ করলেন গুপ্তচর। অশ্বারোহণে একরাত্রে সে কতদূর যেতে পারে? যদি জীবিতা থাকে তবে সন্ধ্যাকালের মধ্যেই আরক্ষা-আধিকারিক তাকে উদ্ধার করে আনবে। আর যদি সেই প্রত্যাখ্যাতা রাজনন্দিনী গভীর রাত্রে কোনও পর্বতচূড়ায় আরোহণ করে অতলস্পর্শী সমতলভূমে—?

সূর্য মধ্যগগনে উপনীত। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। একে একে সমবেত হয়েছেন দূর-দেশাগত প্রার্থীগণ। শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধর্মপুত্র, চক্কুকরাজের দুই পুত্র সূর্যসোম ও সূর্যভদ্র; অগ্নিদেশ, পুরুষপুর, মীরান, তুরফান, নিয়ার রাজন্যবর্গ ও রাজকুমার—বিভিন্ন জনপদের শ্রেষ্ঠীতনয়। সন্নিধাতা বারম্বার এসে তাগাদা দিচ্ছেন—আর বিলম্ব করা অনুচিত। অবিলম্বে রাজকন্যাকে সভায় উপস্থিত করার প্রয়োজন। সভাস্থ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

এই সময়ে সংবাদ এল মহাস্থবির কুমারজীব মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। শ্রবণমাত্র মহারাজ চঞ্চল হয়ে ওঠেন—কী আশ্চর্য! মহাথের-এর কথা এতক্ষণ কী-করে বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি? এমন বিপদে তাঁকেই তো সর্বাগ্রে সংবাদ পাঠানো উচিত ছিল। তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অনতিবিলম্বেই রাজসকাশে উপনীত হলেন মহাস্থবির। মহারাজ আসন ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধানিবেদন করলেন। কুমারজীব স্বস্তিবাচন করে উপবেশন করলে রাজা বসলেন একটি নিম্নাসনে। বললেন, মহাথের, আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসায় আমি ধন্য। বস্তুত আমি আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করতে যাচ্ছিলাম। অদ্য প্রাতে আমি একটি মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

কুমারজীব বললেন, রাজন্, আপনি যে বার্তা জ্ঞাপন করতে উদ্যত তা আমার অজ্ঞাত নহে। বস্তুত আমিও ঐ একই উদ্দেশ্যে এখানে সমাগত। চিন্তার কোন কারণ নাই—কল্যাণময়ী অক্ষুমতীর সংবাদ মঙ্গল।

—সে জীবিতা! তার সংবাদ আপনি জানেন?

—রাজকুমারী জীবিতা। সে আমার সঙ্ঘারামে আছে। বস্তুত তাকে একটি পল্যঙ্কিকায় এখানে আনয়নের ব্যবস্থা করেই আমি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

—সে কি অসুস্থা?

—ছিল। বর্তমানে সে রোগমুক্তা। সে সম্পূর্ণ 'আরোগ্য'-লাভ করেছে।

—শাক্যমুনির অসীম করুণা। সে কি তাহলে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতে পারবে?

—পারবে, মহারাজ। সেজন্যই তাকে পল্যঙ্কিকায় এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। আপনি প্রার্থীদিগের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজকন্যা স্বয়ম্বর-সভায় আজ সমুপস্থিত না হলে কুচীরাজের অপমান। কন্যার কর্তব্য সে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে আপনাকে উদ্ধার করা। শুধু সেজন্যই অক্ষুমতী এ স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতে স্বীকৃতা।

—তাহলে অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ করি। অক্ষুমতীকে বধূবেশে সজ্জিত করার আয়োজন....

—কোনো প্রয়োজন নেই মহারাজ। প্রিয় ভগ্নীকে স্বয়ম্বর-সভার উপযুক্ত বেশে সজ্জিতা করেই প্রেরণ করা হয়েছে। সে সরাসরি সভামণ্ডপে আসবে। পরন্তু একটি কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি। অক্ষুমতী বস্তুত গতকাল শেষরাত্রেই স্বয়ম্বরা হয়েছেন। নূতন কোন প্রার্থীকে ধন্য করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। সভায় তিনি একথাই ঘোষণা করবেন মাত্র।

কুচীরাজ কী প্রত্যুত্তর করবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। অবশেষে বলেন, কিন্তু সেকথা আমি কেমন করে ঘোষণা করব?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না, মহারাজ। স্বয়ম্বর-সভায় কুচীরাজের পক্ষে বক্তব্য রাখবেন গার্হস্থ্যাশ্রমের পরিচয়ে যে ছিল তাঁর ভাগিনেয়—বর্তমান কুচী সঙ্ঘারামের 'থের'। দায়-দায়িত্ব সমস্তই আমার।

নিশ্চিন্ত হলেন মহারাজ পো-সাঙ।

অতঃপর ওঁরা দুইজন উপস্থিত হলেন সভামণ্ডপে। সভামঞ্চে পাশাপাশি দুটি উচ্চাসন। তার পশ্চাদ্ভাগে স্তম্ভের উপর স্ফটিক-প্রস্তরে নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তি—ভূমিস্পর্শমুদ্রায় ধ্যানস্তিমিত

তথাগত। মূর্তির পশ্চাদ্ভাগে একটি স্বর্ণদণ্ডশীর্ষে ধর্মচক্র ও তদুপরি ত্রিরত্ন। সভায় কুচীরাজের প্রবেশ-মুহূর্তে রাজপণ্ডিত স্বস্তিবাচন করলেন। সমবেতভাবে তূর্যধ্বনি হল। অতঃপর উষ্ট্রচর্মপটাহনিনাদে সভারম্ভ ঘোষিত হল। মহারাজ আসন গ্রহণ করেন।

মহাস্থবির কুমারজীব মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন, সুস্বাগতম্! পরম ভট্টারক শ্রীমান্ মহারাজ কুচী-অধিপতির অনুজ্ঞানুসারে আমি তাঁর হয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা বহুদূর জনপদ থেকে অসীম শ্রমস্বীকার করে কুচীরাজ্যের বাৎসরিক আনন্দ-উৎসবে যোগদান করে আমাদের কৃত-কৃতার্থ করেছেন।

আজিকার এ সভার আয়োজন কেন সে বিষয়ে আপনারা সবিশেষ অবগত। কুচী-জনপদ-অধিপতি পরমভট্টারক পো-সাঙ ঘোষণা করেছিলেন—আর্যাবর্তের প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা চিরায়ুষ্মতী কল্যাণী অক্ষুমতীকে এ সভায় স্বয়ম্বরা হওয়ার জন্য উপস্থাপিত করবেন। কুমারভট্টারিকা অক্ষুমতী সপ্তদশবর্ষীয়া, প্রাপ্তবয়স্কা। বস্তুত আর্যরীতি অনুসারে স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন স্বীকার করে নিতে কুচীরাজ প্রতিশ্রুত! আপনারাও এখানে সেই প্রতিশ্রুতিমতেই প্রতিযোগীরূপে অবতীর্ণ—অর্থাৎ স্বয়ম্বরা কন্যার নির্বাচন বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনে প্রয়াসী।

এইটুকু ভূমিকা করে আমি ঘোষণা করছি—পরমকল্যাণীয়া অক্ষুমতী গতকাল রাত্রের শেষযামে তাঁর গোপন মনোগত বাসনা আমাকে জনান্তিকে জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচন আমি—কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'—অনুমোদন করেছি। তিনি যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দান করবার সঙ্কল্প করেছেন, তিনিও এ স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত। সুতরাং ভাটগণের পক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগীর গুণকীর্তন এ-ক্ষেত্রে বাহুল্য হবে। আপনারা অনুমতি করলে রাজনন্দিনীকে আমি সভায় উপস্থিত করি।

সভামণ্ডপে একটি গুঞ্জন ওঠে। এ সংবাদে সকলেই বিচলিত। সম্ভবত প্রতিটি প্রতিযোগী অন্তরে যে ক্ষীণ আশা পোষণ করে সমবেত হয়েছিলেন তা নির্মূল হল—সকলেই অনুমান করেছেন, রাজকুমারী কোন একজন ভাগ্যবানের সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। শুধু অনুধাবন করা গেল না—সে-ক্ষেত্রে রাজকন্যা কেন প্রকাশ্য সভাতেই তার কণ্ঠে বরমাল্য দুলিয়ে দিলেন না, কেন মহাস্থবিরকে স্বয়ম্বর-সভার পূর্বরাত্রে গোপনে সেই প্রেমিকের নাম জ্ঞাপন করলেন। সভাস্থ সকলের মুখপাত্রস্বরূপ শৈলদেশের কুমার ভট্টারক ধম্মপুত্ত দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, মহাথের যেমন অনুজ্ঞা করলেন তাই হোক। রাজনন্দিনীকে প্রকাশ্য সভায় আনয়ন করা হোক। তিনি সর্বসমক্ষে সেই ভাগ্যবানের কণ্ঠে বরমাল্য দিলেই আমরা আনন্দিত হব।

কুমারজীবের ইঙ্গিতে প্রবেশদ্বার দিয়ে আটজন পল্যঙ্কিকা-বাহক সভামণ্ডপে প্রবেশ করল। মঞ্চের পাদদেশে উপনীত হয়ে তারা সেটিকে ভূতলে নামিয়ে রাখে। মহাস্থবির স্বয়ং অগ্রসর হয়ে আসেন। পল্যঙ্কিকার প্রবেশপথের উশীরসদৃশ সূক্ষ্ম জালিকা উন্মোচন করে বলেন, নেমে এস অক্ষুমতী! অভ্যাগতগণ তোমাকে দর্শন করতে চান। তোমার নির্বাচন ঘোষণা কর।

ধীরপদে বাহির হয়ে আসে অক্ষুমতী। তার দক্ষিণ হস্তে একটি ঘননিবদ্ধ পুষ্পমাল্য। ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করে সে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়। প্রথমে বুদ্ধমূর্তি, পরে রাজা এবং তৎপরে সভাস্থ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে যুক্তকরে নতি জানায়।

একটা বিস্ময়মিশ্রিত হাহাকার সভার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ভেসে যায়।

রাজনন্দিনীর বধূবেশ নয়। তাঁর অঙ্গে ত্রি-চীবর; তাঁর আষাঢ়সঘন জলদসম্ভারের মতো কুন্তল নিশ্চিহ্ন—মুণ্ডিতমস্তক তিনি। বরমাল্য ছাড়াও তাঁর হস্তে যষ্টি ও ভিক্ষাপাত্র। দেববাঞ্ছিতা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সর্বাঙ্গে এক স্বর্গীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ।

রাজকন্যা অক্ষুমতী আজ সন্ন্যাসিনী। ভিক্ষুণী। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, গতকাল নিশীথ রাত্রে।

বিস্ময়-বিমূঢ় জনতার দিকে পিছন ফিরে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসেন সিংহাসনের দিকে। মহারাজ দণ্ডায়মান হয়েছেন। তিনি যেন বজ্রাহত। কুমারভট্টারিকা তাঁকে অতিক্রম করে বুদ্ধমূর্তির সমীপস্থ হলেন। প্রণামান্তে তিনি বরমাল্যটি নামিয়ে রাখেন তথাগত বুদ্ধের চরণমূলে।

মহাস্থবির তখন মন্ত্রোচ্চারণ করছেন :

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।।[4]

দীর্ঘ দশ বৎসর পরের কথা।

এ দশ বৎসরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। অনুমান করতে পারি, ঘটনা চলেছে ধীর মন্থর গতিতে—রেশম সড়কবাহী সার্থবাহের উষ্ট্রের সারির মতো। কুমারজীবের মাতা দীর্ঘদিন পূর্বেই কুচী নগরী ত্যাগ করে গিয়েছেন। শেষ জীবনটুকু তিনি তাঁর স্বামীর দেশে অতিবাহিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই কুচীরাজের ব্যবস্থাপনায় তিনি কাশ্মীরে গমন করেন। সেখানকার সঙ্ঘারামে কবে কী-ভাবে তাঁর নিব্বাণলাভ হল ইতিহাস তা লিখে রাখতে ভুলেছে। ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন কুচী নগরীর সর্বপ্রধান সন্ন্যাসিনী-আশ্রম 'আ-লী' বিহারের 'অগ্‌গবিনতা'। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ভিক্ষুণীদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান—'অগ্রসেবিকা,' পালীতে যা 'অগ্‌গসেবিকা'। সে সম্মান, যতদূর জানি, শাস্ত্রমতে মাত্র দুইজন লাভ করেছিলেন—ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা ও কাশীমহিষী ক্ষেমাদেবী। সুতরাং নূতন কোন ভিক্ষুণী 'অগ্রসেবিকা'-আখ্যায় ভূষিতা হতে পারেন না। এতদঞ্চলে ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘারামে সর্বোচ্চ অধিকারিকার সংজ্ঞা 'অগ্‌গবিনতা', অথবা অগ্রবিনতা। অর্থাৎ পূজারতির সময় প্রথম প্রণাম নিবেদনের অধিকারিণী। ভিক্ষুণী জীবার প্রস্থানের পরে আ-লী-বিহারে অগ্রবিনতা হয়েছেন ভিক্ষুণী অক্ষুমতী।

বৃদ্ধ পো-সাঙের উত্তরাধিকারী অনির্দিষ্ট। তিনি এখনও কুচীরাজ।

মহাস্থবির কুমারজীবের বয়ঃক্রম একষষ্টি বৎসর। এখনও তিনি জরাগ্রস্ত নন। অর্হৎ বুদ্ধযশা শৈলদেশের সঙ্ঘারামে সাধনরত। অক্ষুমতীর সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি কাশগড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কুচীজনপদের সন্নিকটস্থ খ্যিজিল সঙ্ঘারামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুহামন্দির সমাপ্তির পথে।

কালের মাপে আমরা বর্তমানে ৩০৪ শকাব্দে, যাবনিক বিচারে যা নাকি ৩৮২ খ্রিস্টাব্দ। মধ্য এশিয়ার এই অখ্যাত জনপদে সংবাদ পৌঁছায়নি কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল সমাপ্ত। মগধাধিপতি রাজচক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালের আট বৎসর অতিক্রান্ত। ভট্ট কালিদাস নামক এক অখ্যাতনামা উদীয়মান কবির বাচালতায় নাকি উজ্জয়িনীর প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিরক্ত, যদিচ নবীনেরা ক্রমে এই আধুনিক কবির ভক্ত হয়ে উঠছে। আহিওলে শ্রীদুর্গার একটি মন্দির ইতোমধ্যেই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক নূতন যুগের সূচনা করেছে।

এই সময়ে কুচীজনপদের নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল কালবৈশাখীর আভাস। ইতিমধ্যে মহাস্থবিরের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রসারিত হয়েছে। বহু দূরাগত হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং তাও-পন্থী পণ্ডিতগণ মীমাংসার সন্ধানে আসেন কুচী সঙ্ঘারামে। তক্ষশীলা, পুরুষপুর, এমনকি কাশী, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেও পণ্ডিতেরা সমবেত হন ঐ শৈলরাজ্যে—এদিকে তুরফান, মীরান, তুনহুয়ান অঞ্চলের থেরবাদী বৌদ্ধরাও সমাগত হন। বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতও আসতেন। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। চীনখণ্ডে এতদিন যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল তা থেরবাদী বা হীনযানী মত। কুমারজীব মহাযানী। ফলে স্বতই মীমাংসার প্রয়োজন হত।

এইস্থানে 'হীনযান' ও 'মহাযান' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বোধ করি কিছু ইতিহাস আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে—

গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনিব্বাণের অব্যবহিত পরে মগধের রাজধানী রাজগৃহে নাকি একটি মহা

বৌদ্ধ-সম্মেলন হয়। সঙ্ঘোত্তম কাশ্যপ সে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং গৌতমের প্রত্যক্ষ শিষ্য উপালী সে সভায় 'বিনয় পিটক' আবৃত্তি করে শোনান। গৌতমের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ পাঠ করেন 'সুত্ত পিটক'। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত এ-তথ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, কারণ ইতিহাস অনুমান করে বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশ সঙ্কলিত হয়ে পিটকগুলি লিপিবদ্ধ হয় অনেক পরে। বস্তুতপক্ষে এই শাস্ত্রগুলি ভারত ভূখণ্ড থেকে কালে অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং বৌদ্ধ অর্হতেরা অনেক পরবর্তীকালে সিংহলী ভাষা থেকে পালিতে সেগুলি পুনরায় অনুবাদ করে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনেন।

সে যাই হোক, কথিত আছে বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৈশালীতে, অর্হৎ রেবতের সভাপতিত্বে। সম্ভবত মহাপরিনিব্বাণের শতবর্ষ পরে। এই সভাতেই দেখা গেল বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে আচার, অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধ বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। সঙ্ঘ অতঃপর দুইটি পৃথক চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে গেল : প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদী এবং নবীনপন্থী মহাসংঘিকা দল।

তৃতীয় মহাসম্মেলন হয়েছিল মগধের তদানীন্তন রাজধানী পাটলীপুত্রে, স্বয়ং সম্রাট অশোকের আহ্বানে। কথিত আছে, এই সভাতেই ত্রিপিটকের শেষাংশ— 'অভিধম্ম পিটক' সঙ্কলিত হয়। মতপার্থক্য সত্ত্বেও আরও প্রায় তিনশ' বৎসরকাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি পৃথক শাখা জন্মগ্রহণ করেনি। সেটা ঘটল চতুর্থ সম্মেলনের পর, দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে। এই শেষ বৌদ্ধ সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন কুশানরাজ সম্রাট কনিষ্ক; সম্মেলনের স্থান পাঞ্জাবের জলন্ধর, এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মহাঅর্হৎ অশ্বঘোষ। এই সভায় নবীনপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলেন। তাঁরাই জয়ী হলেন, নিজেদের বললেন—'মহাযানী'; এবং প্রাচীনপন্থী স্থবিরবাদীদের 'হীনযানী' নামে অমর্যাদাসূচক অভিধায় চিহ্নিত করলেন। বলা বাহুল্য স্থবিরবাদীরা নিজেদের 'হীনযানী' মনে করেন না; তাঁরা নিজেদের বলেন, 'স্থবিরবাদী, বা 'থেরবাদী'।

অতঃপর থেরবাদীদের চিন্তাধারা বহির্ভারতে প্রসারলাভ করতে থাকে—সিংহলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে, চীনে ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের ঐ 'থেরবাদী' বা তথাকথিত হীনযানী মতবাদ বিকশিত হতে থাকে। থেরবাদীরা বিনয়, শীল এবং চারিত্রিক শুচিতার দিকেই বেশি জোর দিতেন—মূর্তিপূজার দিকে নয়। তাঁরা বুদ্ধমূর্তি আদৌ নির্মাণ করাতেন না—বুদ্ধের প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন চিহ্নের পূজা করা হত। স্তূপ, পদচিহ্ন, শূন্য-সিংহাসন, ধর্মচক্র, ত্রিরত্ন, বোধিদ্রুম প্রভৃতি।

চীনখণ্ডে স্থবিরবাদী বা 'থেরবাদী' বৌদ্ধধর্মের ভগীরথ বস্তুত কাশ্যপমাতঙ্গ এবং তাঁর সমসাময়িক ধর্মরত্ন। আমাদের কাহিনীর কালের প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে তাঁরা অভিধম্ম প্রচারে চীনদেশে যাত্রা করেন। কাশ্যপমাতঙ্গ চীনা ভাষায় রচনা করেছিলেন এক অমূল্য গ্রন্থ : দ্বাচল্লিশ সুত্ত। কোনো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নয়, থেরবাদী ধর্মের মূল বক্তব্যটুকু দ্বা-চল্লিশসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন তিনি। হান সম্রাটের তদানীন্তন রাজধানী 'লো-য়াঙ'-এ ওঁদের জীবিতকালেই গড়ে ওঠে এক সঙ্ঘারাম, চীনখণ্ডে সদ্ধম্মের প্রথম কেন্দ্র—'পাই-মাৎ-জু' বা 'শ্বেতাশ্ব সঙ্ঘারাম'। কথিত আছে—দুই পরিব্রাজক কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন যে অশ্বপৃষ্ঠে আদি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি চীনদেশে নিয়ে যান তার বর্ণ ছিল শ্বেত—তাই ঐ নাম।

সে যাই হোক, আমাদের কাহিনীর কালে চীনে মহাযান ধর্ম অনুপ্রবেশ করেনি। চীনের তদানীন্তন রাজধানী হোয়াং-হো তীরে 'চাঙ-য়াঙে'। চীনসম্রাট ফু কিয়েন ছিলেন পরম থেরবাদী বৌদ্ধ। তিনি শুনলেন—তথাগত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—সে ধর্মের নাম মহাযান। সম্রাট এ বিষয়ে অবহিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পণ্ডিতেরা বললেন, মধ্য এশিয়া তথা ভারত ভূখণ্ডে এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত হচ্ছেন কুচী-সঙ্ঘারামের মহাস্থবির কুমারজীব। সুতরাং চীনসম্রাট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—এই পণ্ডিতকে তাঁর অবিলম্বে চাই। তাঁকেই তিনি 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু) করবেন। তাঁকে সসম্মানে চীনদেশে আনয়নের ব্যবস্থা করা হোক।

মহামান্য চীনসম্রাটের দূত এল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনপদনায়ক কুচীরাজের দরবারে। সবিনয়ে পো-সাঙ জানালেন—মহাস্থবির কুমারজীব বৃদ্ধ, দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমি উত্তরণ এ বয়সে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তদুপরি তিনি কুচীরাজের ভাগিনেয়। চীনসম্রাট যেন তাঁকে মার্জনা করেন।

বৌদ্ধ হলে কী হয়, চীনসম্রাটের ধমনীতে সহস্রাব্দীর আভিজাত্যের অভিমান। অপমানিত বোধ

করলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন—যেমন করেই হোক কুমারজীবকে নিয়ে যেতে হবে চীন রাজধানীতে। ঠিক কী ভাষায় তিনি আদেশটা জারী করেছিলেন ইতিহাসে সে কথা নেই। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় হেনরি যেমন একদিন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বলে ফেলেছিলেন—'আমার অনুচরদলের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে ঐ টমাস বেকেটের ঔদ্ধত্য থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে?' হয়তো চীনসম্রাটও তেমনি কিছু বলে থাকবেন উত্তেজনার মুহূর্তে। ফল হল মারাত্মক। দুর্ধর্ষ চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুসুন এক বিপুলবাহিনী নিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন, হয়তো চীন সম্রাটের অজ্ঞাতসারেই— কুমারজীবকে ছিনিয়ে আনতে।

অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতি! একদিকে মহাচীনের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট, অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কুচীরাজ! তবু ক্ষাত্রধর্মে আঘাত লাগল পো-সাঙ-এর। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন তিনি। কুমারজীব বারম্বার অনুরোধ করলেন মাতুলকে—কিন্তু পো-সাঙ দৃঢ়সংকল্প। দুর্গ-কুড্য সংস্কার করা হল, নূতন পরিখা খনন করা হল। পর্বতশীর্ষগুলিতে নূতন মঞ্চ নির্মাণ করে নিত্যপ্রহরার ব্যবস্থা হল। শস্ত্র-কর্মকারগণ দীর্ঘদিন পরে স্ব-স্ব অঙ্গারচুল্লী প্রজ্বলিত করে। প্রসবযন্ত্রণায় যেন আর্তনাদ করতে থাকে চর্ম-প্রসেবিকা ভস্ত্রা; সদ্যোজাত শূল, ভল্ল, বাণ, খড়্গ শস্ত্র-শিল্পীর সূতিকাগারে সজ্জিত হতে থাকে।

দিন দিন অশান্ত হয়ে উঠছেন কুমারজীব। চৈনিক সৈন্যবাহিনী রেশম-সড়ক ধরে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়ে আসছে। দ্রুতগামী বার্তাবহের মাধ্যমে যে সংবাদ পাওয়া গেল তা ভয়াবহ। চীনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক অক্ষৌহিণী, কুচীরাজের সামরিক শক্তি মাত্র দুই অনীকিনী—অর্থাৎ চীনাবাহিনীর শক্তি প্রায় পাঁচগুণ। চীনা সৈন্যাধ্যক্ষ হো-লুসুন জাতিতে হুণ—তার নৃশংসতা তুলনাহীন। সে বৌদ্ধ নয়। হুণ জাতির প্রকৃষ্ট পরিচয় তখনও ভারতবর্ষ পায়নি। মধ্য এশিয়াতেও সে তথ্য অপরিজ্ঞাত। হুণশক্তির প্রথম বিষোদ্‌গার হুণরাজ 'অ্যাটিলা'র জন্ম আলোচ্য সময়কালের পরে, শতাব্দীর প্রায় একপাদ পরে। তবু সার্থবাহ বণিকদের মাধ্যমে হুণজাতির নির্দয়তার কিছু কিছু পরিচয় ওঁরা পেয়েছেন। কুমারজীবের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ আছে; তিনি নিরন্তর প্রাচীন পুঁথির অনুলিপি করে যাচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা—এই রণতাণ্ডবে তাঁর সঙ্ঘারামে রক্ষিত অমূল্য গ্রন্থগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই অনুলিপি রেখে একে একে মূল গ্রন্থগুলি তিনি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশাকে প্রেরণ করছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন— শৈলদেশও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখলে অর্হৎ বুদ্ধযশা যেন মূল পুঁথিগুলি পুরুষপুর অথবা তক্ষশীলার সঙ্ঘারামে সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।

অতঃপর একদিন মধ্যরাত্রে সিদ্ধান্তে এলেন কুমারজীব।

সন্ধ্যাকাল থেকেই সঙ্ঘারামের অলিন্দে পদচারণা করছিলেন আর মনে মনে বলছিলেন : 'হে লোকজ্যেষ্ঠ ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও। কীভাবে এই অনিবার্য রক্তপাত বন্ধ করতে পারি আমি?' পূর্বদিন সংবাদ এসেছে—চৈনিক সৈন্য পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে স্কন্ধাবার স্থাপন করেছে। কুচী পর্বতচূড়ায় উঠে তিনি গভীর রাত্রে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন—পূর্ব দিগ্বলয়ে অসংখ্য আলোকবিন্দু। দিবাভাগে দেখা যায়, সেস্থলে দূর নীলাকাশে গণনাতীত ক্রমাগত সঞ্চরমাণ বিন্দু। খাদ্যসন্ধানী চিল্ল-শকুনী-গৃধিনীর পঙ্গপাল!

রাত্রি তৃতীয় যাম। নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করলেন মহাস্থবির। সিদ্ধান্তে এসেছেন এতক্ষণে। এ ছাড়া উপায় নাই। প্রথমেই তাঁর প্রিয় গ্রন্থগুলির ভিতর সুনির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থ একটি পেটিকায় বেঁধে নিলেন। মান্দুরা থেকে প্রিয় অশ্বটিকে নিয়ে সঙ্ঘারাম ত্যাগ করে একাকী নিষ্ক্রান্ত হলেন পথে।

এক-আকাশ নক্ষত্র। কিন্তু সে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই। এ বঙ্গভূমের নৈশাকাশে অরোরা-বোরিয়ালিস্-এর মতো সেই তাকলামাকান মরুভূমির একান্তে অবস্থিত কুচী নগরীর আকাশে মেঘও দুর্লভ বস্তু। ধূলিহীন, জলীয়বাষ্পহীন সে আকাশে নক্ষত্রের দ্যুতি অনির্বচনীয়। সে নক্ষত্রের আলোয় অমাবস্যা রাত্রিও নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়।

প্রায় অর্ধদণ্ডকাল গিরিসঙ্কটের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করে মহাস্থবির উপনীত হলেন আ-লী বিহারের প্রবেশদ্বারে। দুই-তিনবার করাঘাতের পরে কাষ্ঠ-নির্মিত প্রবেশদ্বারে একটি চারি অঙ্গুলিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গবাক্ষ দৃষ্ট হল। ভিতর থেকে প্রশ্ন হল : কে আপনি? রাত্রির শেষযামে এ সঙ্ঘারামের শান্তি বিনষ্ট করছেন কেন?

কুমারজীব বললেন, আমি কুচী-সঙ্ঘারামের 'থের'। দ্বার উন্মোচন কর বুদ্ধক্ষেমা।

তৎক্ষণাৎ বিহারকুড্যের ঊর্ধ্বে একটি মশাল জ্বলে ওঠে। প্রহরারতা ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা দ্বার উন্মোচন করে সবিস্ময়ে বলে, ভগবন্! আপনি?

—হ্যাঁ। দ্বার রুদ্ধ কর। আমার এ আগমন সংবাদ যেন গোপন থাকে। অগ্‌গবিনতাকে জাগরিত কর। অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী কিছু গুহ্যতত্ত্ব তাঁকে এই দণ্ডেই জ্ঞাপন করতে চাই।

ভিক্ষুণী বুদ্ধক্ষেমা বলে, মহাভাগ! আপনি আমার অনুগমন করুন। ভদন্তিকা অগ্‌গবিনতা জাগরিতাই আছেন। কিয়ৎকাল পূর্বে আমি তাঁকে শাস্ত্রপাঠরতা দেখেছি।

অক্ষুমতীও নিরতিশয় বিস্মিত হল রাত্রির তৃতীয়যামে মহাস্থবিরের আকস্মিক আবির্ভাবে। অক্ষুমতীর বয়ঃক্রম ঊনত্রিংশতিবর্ষ। অঙ্গে ত্রিচীবর, মস্তক মুণ্ডিত, সর্বাঙ্গে তিলমাত্র আভরণ নাই। তবু এখনও অপূর্ব রূপবতী তিনি। সে রূপে ঘূর্ণ্যমান হীরকখণ্ডের চকিত আলোকবিচ্ছুরণ নাই, আছে নীরন্ধ্র পরিবেশে ঘৃতপ্রদীপের অচঞ্চল দীপ্তি। উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণকায়া, তৎসত্ত্বেও তাঁর কমনীয় সৌন্দর্য এক অপার্থিব স্বর্গীয় দ্যুতিতে পরিমণ্ডিত। অগ্‌গবিনতা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সঙ্ঘারামের অর্হৎ প্রধানকে।

কুমারজীব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন, অগ্‌গবিনতা, আমি এক মহাসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; সঙ্ঘারামের কুশল চিন্তা করে আমি সে সিদ্ধান্তের কথা গোপনে আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

—আদেশ করুন, মহাভাগ?

নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে মহাস্থবির সহসা অন্তরঙ্গ হলেন। বললেন, অক্ষুমতী! প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এক নিশীথ রাত্রে ঠিক এইভাবে তুমি আমার পরিবেশে উপস্থিত হয়েছিলে। সেদিন তুমিও এক মহাসিদ্ধান্তে কৃতসংকল্প ছিলে। মনে আছে?

—আছে মহাথের।

—সেদিন তোমার সঙ্গে আমার কী কথোপকথন হয়েছিল মনে পড়ে ?

—পড়ে মহাথের। আমি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে আদিকবি যেমন করুণার উৎসমুখে স্বত-উৎসারিত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে আপনি মুখে মুখে রচনা করে আমাকে একটি অপূর্ব শ্লোক শুনিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ধম্মপদ থেকে বহু মন্ত্রগাথা শুনিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—জীবনের কোনও পর্যায়েই মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে নেই। বলেছিলেন,

যথা বুব্‌বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্ চু রাজা ন পস্‌সতি।।[5]

আরও বলেছিলেন,

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্‌স্ নত্থি মমায়িতং।
অসতা চ ন সৌচতি স বে ভিখ্‌খু'তি বুচ্চতি।।[6]

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে কুমারজীবের কণ্ঠস্বর। বলেন, ধম্মপদের শ্লোকগুলি স্মরণে আছে। কিন্তু পালি নয়, সংস্কৃতে যে শ্লোকটা তখন মুখে মুখে রচনা করেছিলাম সেটি কী?

— আপনি আবৃত্তি করেছিলেন—

পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।[7]

প্রশান্ত জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহাস্থবিরের আনন। যেন তপশ্চারণক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর নির্মোক ভেদ করে অতীতের এক রাজকুমারের পুনর্জন্ম হল : যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর অনুজার নিকট শেষ বিদায় নিতে এসেছেন। ভিক্ষুণীর যুক্তকর নিজ করমুষ্টিতে গ্রহণ করে কুমারজীব বললেন, অক্ষুমতী, ঐ শ্লোকটা আজ কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। তোর মুখে ওটা শুনতেই তাই এসেছি।

বিস্মিতা অক্ষুমতী বলে, শুধু এই জন্য?

—না। ওটা তো বীজমন্ত্র। অতঃপর ব্যাখ্যা। আমি সিদ্ধান্তে এসেছি অক্ষুমতী—

মহাস্থবিরের সিদ্ধান্তের কথা শুনে বিস্মিতা হল না অক্ষুমতী। বোধ করি এমনই কিছু সে আশঙ্কা করেছিল। শান্তস্বরে বললে, সম্ভবত এ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু আপনি কি এই দণ্ডেই সঙ্ঘারাম ত্যাগ করছেন?

—হ্যাঁ। আশা করি আগামীকাল অপরাহ্নের পূর্বেই চৈনিক স্কন্ধাবারে উপনীত হতে পারব। আমারই জন্য এ সমরায়োজন। আমি গোপনে চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধের প্রয়োজনও শেষ হবে। কুচীরাজের ক্ষাত্র অভিমানেও আঘাত লাগবে না।

—কিন্তু মহাথের! চীনদেশ শুনেছি এক বৎসরের পথ। আর কি কোনদিন এ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন?

—সম্ভবত নয়। এই হয়তো তোর-আমার শেষ সাক্ষাৎ। কিন্তু সেজন্য দুঃখ কিসের অক্ষুমতী? 'চু-কালান' এবং 'চিয়া-য়েহ-মোর্থ্যেঙ'ও তাঁদের জন্মভূমিতে ফিরে আসেননি।

—ওঁরা দুজন কে? আমি কোনদিন তাঁদের নাম শুনিনি।

—'চু-কালান' হচ্ছেন অর্হৎ ধম্মরত্ন; আর 'চিয়া-য়েহ-মোর্থ্যেঙ' হচ্ছেন মহাজ্ঞানী কাশ্যপমাতঙ্গ। দুজনেই মধ্যভারতীয় পণ্ডিত। চীনখণ্ডে স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্মের ভগীরথ। চীনা ইতিহাসে তাঁদের নাম ঐ অভিধায়। সম্ভবত আমিও চীনখণ্ডে নূতন নাম-রূপ পরিগ্রহ করব।

শুধু ভিক্ষুণী আর মহাথের নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যেও অনেক কথা হল। শেষে কুমারজীব বললেন, অক্ষুমতী, আমি কাশগড়ে অর্হৎ বুদ্ধযশাকে এই সঙ্ঘারামে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি; বলেছি আমার অবর্তমানে তিনি যেন এ সঙ্ঘারামের মহাস্থবিররূপে অধিষ্ঠিত হন। তুমি অগ্‌গবিনতা হওয়ায় অতঃপর তাঁরই আজ্ঞাবহ হিসাবে—

বাধা দিয়ে ভিক্ষুণী বলেন, মার্জনা করবেন মহাথের! সেটা কি আদৌ বাঞ্ছনীয়? আপনি তো সকল তথ্যই অবগত আছেন। উনি এ সঙ্ঘারামে অধিষ্ঠিত হলে আমার কি অন্যত্র প্রস্থান করাই সমুচিত হবে না?

—না, অক্ষুমতী। আমি যে সকল কথাই অবগত আছি। আমি যে বিশ্বাস করি—আত্মহনন নয়, আত্মনিবেদনই তোমাদের দুজনের চরম লক্ষ্য! তোমরা দুজনেই 'নামরূপ'-বন্ধন অতিক্রম করেছ!

স্থবিরের পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা হয় প্রাক্তন রাজকন্যা। বলে, আশীর্বাদ করুন মহাভাগ। ঐ মন্ত্র যেন সার্থক হয় আমার জীবনে।

মহাস্থবির নীমিলিতনেত্রে যুক্তকরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন —

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোহপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।"

চৈনিক স্কন্ধাবারে সেনাপতির সম্মুখে যখন উপনীত হলেন তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। বিপুল সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থিত সেনাপতির শিবিরে উপনীত হতে যথেষ্ট বেগ পেতে হল তাঁকে; তবু 'কুচীরাজের দূত' এই পরিচয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় সেনাপতি সমীপে আনা হল। উষ্ট্রচর্ম নির্মিত প্রকাণ্ড শিবির। সিংহাসনাদির কোনো আয়োজন নাই। ভূমির উপরে স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত। তদুপরি সেনাপতির জন্য উচ্চগদির শয্যা। হুণ সেনাপতি হো-লুসূন একটি উপাধানে কফোনি স্থাপিত করে অর্ধশায়িত অবস্থায় আল্‌বোলা সেবন করছেন। গঞ্জিকা, সম্বিদা অথবা তামাকু—কী, তা বোঝা যায় না; পরন্তু সেনাপতির চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ। একজন সম্বাহক তাঁর পদসেবা করছে, একজন

সুদর্শনা যৌবনবতী যবনী চামর-ব্যজন করছে। সেনাপতির সম্মুখে পানপাত্র এবং ভৃঙ্গার। একটি সুবর্ণপাত্রে কিছু শূল্যপক্ক মাংস। দুই পার্শ্বে দুইজন সন্নদ্ধ দেহরক্ষী মুক্ত কৃপাণহস্তে প্রহরারত।

শিবিরদ্বারের চীনাংশুক অবরোধ উত্তোলিত করে প্রহরীবেষ্টিত কুমারজীব কক্ষমধ্যে পদার্পণমাত্র অট্টহাস্য করে ওঠেন চীনা সেনাপতি। কুমারজীব বিস্মিত হন, অট্টহাস্যের হেতুটা প্রণিধান করে উঠতে পারেন না। প্রহরী তাঁর কর্ণমূলে বলে, অভিবাদন কর্ মূর্খ!

তা ঠিক। এতাবৎকাল যখনই কোনো সেনাপতি বা নৃপতির সম্মুখস্থ হয়েছেন, প্রণাম পেয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। কুমারজীব অনভ্যস্ত নতিস্বীকার করলেন।

সেনাপতির অট্টহাস্যের হেতুটা বোঝা গেল তাঁর প্রথম সম্ভাষণেই : তোর রাজার কি এই অবস্থা? দৌত্যগিরি করবার মতো উপযুক্ত পোশাকও তোকে দিতে পারেনি?

পরিষ্কার পালিভাষা। চীনা নয়। অর্থ গ্রহণে কোনো অসুবিধা হয় না কুমারজীবের। বস্তুত কোনো চীনা সমরনায়ক যখন মধ্য-এশিয়ার রণাঙ্গণে প্রেরিত হতেন তখন পালিভাষাজ্ঞান তাঁর আবশ্যিক গুণ বলে বিবেচিত হত। সে জন্যই এই সৈন্যাধ্যক্ষ কুমারজীবের বোধগম্য ভাষায় বাক্যালাপে সমর্থ; কিন্তু বোঝা গেল মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ অর্হৎ-এর সম্মান সম্বন্ধে সেনাপতির কোন ধারণা নেই। শুধু মধ্য-এশিয়া কেন—ঐতিহাসিক এইচ. সরকার বলেছেন, "ৎসিন যুগেই (২০০ - ৩১৭ খ্রিস্টাব্দে) চীন-ভূখণ্ডে অন্যূন সতের হাজার হীনযানী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম গড়ে উঠেছিল।" কিন্তু হূণ সেনাপতি তো বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠের জন্য পালিভাষা শেখেননি, নিতান্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে এ ভাষা আয়ত্ত করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর জীবন কেটেছে—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ত্রি-চীবর সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না।

কুমারজীব সবিনয়ে বললেন, হে মহান চৈনিক সেনাপতি ! আমি শ্রীমন্ মহারাজ পরমভট্টারক কুচী অধিপতির দূত নই। আমি এখানকার সঙ্ঘারামের মহাস্থবির মাত্র; আমি—

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুসূন, তবে কোন সাহসে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আমার কাছে এসেছিস?

—যেহেতু শুনেছি আপনি আমারই সন্ধানে এসেছেন। আমার নাম—কুমারজীব!

ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করেন সেনাপতি। তাঁর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়। বিরলকেশ ভ্রূযুগলে জাগে কুঞ্চন। হনুর অস্থি দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে বলেন, এ কথা সত্য?

—বৌদ্ধ অর্হৎ মিথ্যা বলেনা মহা-সেনাপতি।

—কিন্তু তুই ছদ্মবেশী গুপ্তচর কি না তাই বা বুঝব কী করে? প্রমাণ দিতে পারিস—যে তুই সেই 'কুমারজীব', যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য এ সমরায়োজন?

—না মহাভাগ। কিন্তু আমি যে অনৃতভাষণ করছি না এ সত্য আপনি সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন। আমার একান্ত অনুরোধ—যে উদ্দেশ্যে আপনার আগমন তা যখন সিদ্ধ হল তখন কুচী নগরের দিকে নয়—চীনখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করুন। আমি মহামহিম চীন সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

চীনা সেনাপতি বাহুবদ্ধবক্ষে শিবিরের এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্তে অশান্তভাবে পদচারণা করলেন কিয়ৎকাল। তারপর সন্নিধাতাকে সম্বোধন করে বললেন, গতকাল খ্যিজিল সঙ্ঘারামে ধৃত দুইজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম—তারা কি জীবিত ?

যুক্তকরে সবিনয়ে সন্নিধাতা প্রত্যুত্তর করে, আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপতি। অদ্য সন্ধ্যাকালে তাদের শূলদণ্ডে উপস্থাপিত করার কথা। তারা জীবিত।

—সেই দুইজন বন্দীকে অবিলম্বে এই শিবিরে আনয়ন কর।

অনতিবিলম্বেই শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই বন্দীকে শিবিরে আনা হল। শিহরিত হয়ে ওঠেন কুমারজীব। বন্দীদ্বয় আর কেহ নয়—অর্হৎ পুণ্যক এবং বিধুরক্ষেম; অর্থাৎ খ্যিজিল সঙ্ঘারামের দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তাঁরা দুইজনেও চমকিত হলেন কুমারজীবকে দেখে। শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় জোড় করার উপায় নেই। তাই লুটিয়ে পড়েন ভূতলে। বলেন, মহাথের! আপনি এখানে?

হো-লুসূন গর্জন করে ওঠেন, বাচালতার স্থান এ শিবির নয়। যা প্রশ্ন করছি তার প্রত্যুত্তর কর্। এঁকে তোরা শনাক্ত করতে পারিস্?

বিধুরক্ষেম বলেন, মধ্য-এশিয়ায় এঁকে না চেনে কে? ইনি কুচী সঙ্ঘারামের মহাস্থবির অর্হৎ কুমারজীব—যাঁকে সসম্মানে চীন সম্রাটের দরবারে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই আপনার আগমন।

—যথেষ্ট ! এদের নিয়ে যাও।

প্রহরীগণ বন্দী দুজনকে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই কুমারজীব বলেন, মহাসেনাপতি ! এঁদের আপনি বন্দী করেছেন কেন? কী এঁদের অপরাধ?

—গতকাল চীনা সৈন্যরা যখন খ্যিজিল রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠনে যায় তখন ঐ দুই বর্বর তাদের বাধা দিয়েছিল। তাই ওদের শূলে দেওয়ার আদেশ দিয়েছি।

আর্তনাদ করে ওঠেন মহাস্থবির—না, না, না। এমন দুষ্কর্ম করবেন না মহা-সেনাপতি ! এঁরা পরম ধার্মিক, বৌদ্ধ শ্রমণ; এঁদের অনিষ্ট হলে চীন সম্রাট আপনাকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

হো-লুসুন বলেন, তুই মহামহিম চীন সম্রাটকে চিনিস? চোখে দেখেছিস?

—না। কিন্তু শুনেছি তিনি পরম বৌদ্ধ। কোনও বৌদ্ধশ্রমণের উপর অত্যাচার করলে—

বাক্যটা তাঁর সমাপ্ত হয় না, তৎপূর্বেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে হুণ সমরনায়কের।

প্রথম মুষ্ট্যাঘাতেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন বৃদ্ধ। দৈহিক আঘাতের অপেক্ষা ব্যথা পেয়েছিলেন অন্তরে। বৌদ্ধ চীন সম্রাটের সেনাপতির নিকট এ-জাতীয় সম্বর্ধনা তাঁর কল্পনাতীত। সমগ্র মধ্য-এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহাস্থবির ধীরে ধীরে ভূতল থেকে উত্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর খড়্গনাসা থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। নতজানু অবস্থাতে বললেন, সেনাপতি ! আমি পুনরায় অনুরোধ করছি—ঐ শ্রমণদ্বয়কে মুক্তি দিন।

এবার ওঁর উদরদেশে প্রচণ্ড পদাঘাত করলেন হো-লুসুন। নাসিকা নয়, এবার মুখবিবর থেকে নির্গত হয়ে এল এক ঝলক রক্ত। সমস্ত শিবিরটা দুলতে থাকে—ক্রমে ক্রমে চেতনা অবলুপ্ত হয়ে আসছে মহাস্থবিরের। রক্তাক্ত মুখে তিনি অস্ফুটে কী যেন বললেন—বোঝা গেল না। হয়তো ওঁর অন্তর্যামী শুনতে পেলেন। না, কোনো অভিশাপ নয়, সংজ্ঞা হারানোর পূর্বমুহূর্তে বৃদ্ধ বলেছিলেন : ‘‘অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে....’’[৪]

দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো চিকিৎসা হলে, জলসিঞ্চন হলে, তার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে আসত; কিন্তু তা আসেনি। জ্ঞান হল যখন তখন কুমারজীব দেখলেন তিনি এক পর্বতচূড়ায় একটি বৃক্ষকাণ্ডের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। উন্মুক্ত জনহীন পর্বতশীর্ষে। কিছুদূরে কয়েকটি প্রহরী শুষ্কশাখায় অগ্নিসংযোগ করে হস্তপদাদি উত্তপ্ত করছিল। সন্ধ্যা সমাগত। চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করলেন কুমারজীব। সহসা একটি মর্মান্তিক দৃশ্যে হাহাকার করে ওঠেন। পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দূরে পাশাপাশি দুটি শূলদণ্ডে বিদ্ধ দুটি নগ্নপ্রায় মৃতদেহ। মৃত্যুযন্ত্রণায় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্তি বিনষ্ট হয়েছে। তাঁরা দুইজন হচ্ছেন খ্যিজিল সঙ্ঘারামের দুইজন অর্হৎ—বিধুরক্ষেম এবং পুণ্যক!

বহুক্ষণ কুমারজীব মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ করছিলেন। মর্মবিদারক দৃশ্যটি না দেখলে হয়তো তিনি প্রহরীদের কাছে পানীয় জল ভিক্ষা করতেন। এখন তাও পারলেন না।

এখানেই যদি যন্ত্রণার শেষ হত, তাহলেও হয়তো শান্ত হতেন মহাস্থবির—কিন্তু তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল পার্বত্য উপত্যকার পরপারে। এ পর্বতশিখর থেকে কুচী নগরীর হর্ম্যরাজি পরিদৃশ্যমান। কুমারজীব দেখলেন—সমগ্র কুচী জনপদ এক ভীষণা বহ্নুৎসবে অবলুপ্ত। রাজপ্রাসাদ, মহা-সঙ্ঘারাম, আ-লী বিহার প্রভৃতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না—কিন্তু এক দিগন্তব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য নিয়ে কুচী জনপদ অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে! হুণ সেনাপতি জীবিতাবস্থায় কুমারজীবকে এভাবে গ্রেপ্তার করতে না পারলে বোধকরি ঐভাবে নির্বিচারে প্রতিটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করত না।

হাহাকার করে উঠলেন বৃদ্ধ : হে লোকজ্যেষ্ঠ ! হে শাক্যনন্দন! এ তুমি কী করলে!

এইস্থলে কিছু স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করছি। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন কুমারজীবের যেটুকু ইতিহাস সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে হুণ সেনাপতির হস্তে তাঁর দৈহিক নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ নেই। অগ্নিদগ্ধ কুচী নগরীর দিকে দৃকপাত করে সেই সন্ধ্যায় বৃদ্ধ শ্রমণের গণ্ডে রক্তধারা অশ্রুর প্লাবনে ধৌত হয়েছিল কি না—ইতিহাস সে বিষয়ে নীরব। এ শুধু ঔপন্যাসিকের কল্পনা। তবু বিশ্বাস করি—পাঠক এ বিষয়ে কথাসাহিত্যের অপেক্ষা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি বেশি আগ্রহান্বিত। তাই বলি—ইতিহাস শুধু বলেছে "বন্দী-জীবনের প্রথমাংশে কুমারজীব চীনা সেনাপতির নিকট নিদারুণভাবে নিগৃহীত হন; তারপর নানা কারণে তিনি চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।" ঐটুকু তথ্যের ভিত্তিতে 'নিদারুণ নিগ্রহে'র আলেখ্য এঁকেছি; এবার আপনারা অনুমতি করলে 'নানা কারণে' কী ভাবে তিনি 'চীনা সেনাপতির বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন' তার কল্পিত চিত্র আঁকতে পারি :

প্রায় তিন মাস পরের কথা। মকররাশিস্থ ভাস্কর এখন পুনরায় মেষরাশিস্থ হয়েছেন। এ তিন মাস কাল চীনা অক্ষৌহিণীর সঙ্গে কুমারজীব ক্রমাগত চলেছেন পূর্বাভিমুখে। প্রথম-প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে পল্যঙ্কিকায় বহন করা হত। এক্ষণে তাঁকে একটি অশ্ব দেওয়া হয়েছে। দিবাভাগে তাঁর হস্তপদাদিও শৃঙ্খলিত করা হয় না। সন্ধ্যা সমাগমে ভারপ্রাপ্ত প্রহরী প্রথামাফিক তাঁকে নৈশ শিবিরের কেন্দ্রস্থ স্তম্ভের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। সাত বৎসর বয়সে যিনি সংস্কৃত ও পালিভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, এ তিন মাসে তিনি যে কথ্য চীনাভাষায় প্রাথমিক কথোপকথনে অভ্যস্ত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বন্দীর পলায়নের কোনো উদ্যোগ যে নেই এ তথ্যটা সকলেই অনুধাবন করেছে। তদ্ভিন্ন পলায়নের পথও নেই সে বিজন গিরিসঙ্কটে। বিরাট বাহিনী এতদিনে অগ্নিদেশের (কারাহ্শর) মরূদ্যান অতিক্রম করেছে, তুরফান মরুজনপদও অতিক্রান্ত। পরবর্তী বৃহৎ জনপদ—চীনের সিংহদ্বার : তুন-হুয়ান। অর্থাৎ—এক্ষণে দুরতিক্রম্য গোবি মরুভূমির দক্ষিণাংশ অতিক্রম করতে হবে। সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মে যাত্রাকালে কখনও কখনও সৈন্যবাহিনী দশ ক্রোশ দীর্ঘ হয়ে যায়। তখন পুরোভাগের কোন সংবাদ পশ্চাদভাগে প্রেরণ করতে সমস্ত দিনমান সময় লাগে। কুমারজীব আছেন বাহিনীর মধ্যবর্তী অংশে। বস্তুত খাদ্য, ধনভাণ্ডার, বন্দী ও লুণ্ঠিত সম্পদ সর্বক্ষণই এই মধ্যবর্তী স্থানে থাকে। সমরনায়ক হো-লুসূনের শিবিরও বাহিনীর এই অংশে অবস্থিত অবস্থাতেই নিত্য সঞ্চরমাণ। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে কুমারজীবের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই—এ বিষয়ে সেনাপতির কঠিন নিষেধ ছিল। কিন্তু এই তিন মাসে কুমারজীব তাঁর চতুষ্পার্শ্বের প্রহরীদিগের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনটি কারণে। প্রথমত, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িক ব্যবহার—করুণা, মৈত্রী ও অহিংসার ফলশ্রুতি। দ্বিতীয়ত, চীনা বাহিনীতে কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও ছিল। সেনাপতি না প্রণিধান করলেও তারা তাঁর মূল্য কিছুটা বুঝেছিল। মহাস্থবিরের প্রার্থনাসভায় তারা নিত্য উপস্থিত হত। তৃতীয়ত, কুমারজীব ছিলেন ভেষগাচার্যও—চরক-সুশ্রুত পাঠই শুধু নয়, পার্বত্য অঞ্চলের লতাগুল্ম নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা জাতের ওষধী প্রস্তুত করতেন। সে ঔষধ নাকি ছিল অব্যর্থ। বস্তুত তাঁর একান্ত-প্রহরী—যার ব্যক্তিগত প্রহরায় তিনি চীনখণ্ডে নীত হচ্ছেন—সেই চিয়াঙ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিল ঐ কারণেই। দীর্ঘদিনের ব্যাধি থেকে কুমারজীব তাকে ঔষধ প্রয়োগে সুস্থ করে তোলেন।

সেদিন রাত্রে মহাস্থবিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে করতে চিয়াঙ বললে, মহাথের! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি আদেশের দাস। আমি জানি—আপনি পলায়ন করবেন না, তবু....

বাধা দিয়ে কুমারজীব বললেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ভাই? তুমি তো তোমার কর্তব্য কর্ম করছ শুধু। প্রতিটি সৈনিককে সেনাপতির আদেশ বিনাবিচারে পালন করতে হয়।

চিয়াঙ বলে; প্রভু, আপনি উদরপীড়ার কোনো ঔষধ জানেন? আমাদের বাহিনীর একজন উদরদেশে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করছে। কোনো ঔষধ প্রয়োগেই তাঁর আরাম হচ্ছে না—অসহ্য যন্ত্রণা...

এবারও বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, আমাকে রোগীর সন্নিধানে নিয়ে যাও। তাকে না দেখে কেমন করে ঔষধ প্রয়োগ করব?

চিয়াঙ সলজ্জে বলে, তাঁকে দেখলে অথবা পরিচয় জানতে পারলে আপনি আর ঔষধ প্রদান করতে পারবেন না—এ জন্যই তাঁর পরিচয় গোপন রাখছি।

—একথা কেন বলছ চিয়াঙ?

অসঙ্কোচেই বলল চিয়াঙ, তিনি আমাদের মহান সেনাপতি হো-লুসূন স্বয়ং। যিনি আপনাকে মুষ্ট্যাঘাত করেছিলেন, পদাঘাত করেছিলেন।

স্মিত হাসলেন কুমারজীব। বললেন, তুমি কেমনতর বৌদ্ধ চিয়াঙ? তিনি একদিন আমাকে আঘাত করেছিলেন বলে আমি তাঁর চিকিৎসা করব না! কী বলছ তুমি? শোননি এ মন্ত্র?—

অক্‌কোচ্ছি মং, অবধি মং, অজিনি মং, অহাসিবে
যে চ তং উপন্‌যহন্তি, বেরং তসং ন সম্মতি।।[9]

তাই ধম্মপদ বলছেন :

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
আবেরন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনাতন।।[10]

চিয়াঙ বিস্মিত! বলে, তবে একটু অপেক্ষা করুন প্রভু! আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসি। আজ সন্ধ্যাকাল থেকে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর। যদি সম্ভব হয়, তবে আজ রাত্রেই আপনি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখুন।

সেই রাত্রেই চিয়াঙ কুমারজীবকে নিয়ে গেল সেনাপতির শিবিরে। সেনাপতির চৈনিক চিকিৎসক সর্বপ্রকারের ব্যবস্থাদি দিয়েও ওঁর যন্ত্রণার কোনো উপশম করতে পারেনি। একজন মধ্য-এশিয়ার চিকিৎসকের ঔষধে রোগী উপকৃত হলে তার অবমাননা। তাই সে কিছুতেই স্বীকৃত হল না। কিন্তু রোগীর জ্ঞান ছিল। বামহস্তে উদরদেশ ধারণ করে শয্যার উপর তিনি এতক্ষণ আর্তনাদ করছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি, চোপরাও উল্লুক! নিজে কিছুই করতে পারছিস্ না—অথচ আর কোনও চিকিৎসককেও আসতে দিবি না! তোকে শূলে দেব আমি। অ্যাই কে আছিস? সেই বৌদ্ধ সাধুব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়!

অনতিবিলম্বেই কুমারজীব উপস্থিত হলেন হো-লুসূনের শিবিরে। সেই একই পরিবেশ, একই শিবির—যদিও সেই প্রথমদৃষ্ট শিবিরের ভৌগোলিক দূরত্ব অসংখ্য যোজন পশ্চিমে। সেনাপতি তাঁর শয্যায় কাতরাচ্ছেন। তিন-চারজন সেবিকা তাঁকে নানাভাবে পরিচর্যা করছে। কুমারজীব এ তিনমাসকাল লু-সূনের সম্মুখে দ্বিতীয়বার আসেননি। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়েন রোগীর শয্যাপ্রান্তে। তাঁকে পরীক্ষা করেন। উত্তমরূপে পরীক্ষার পর বললেন, মহা-সেনাপতি, এ রোগের অর্বথ্য ঔষধ আমি জানি। সে ঔষধও আছে আমার কাছে। কিন্তু ....

—কিন্তু কী? ঔষধ যদি আছে তবে দিচ্ছিস্ না কেন?

—সে ঔষধ তীব্র বিষ! পরিমাণের তারতম্য হলে আপনার মৃত্যু হতে পারে।

হো-লুসূন ভাষা খুঁজে পায় না। সন্নিধাতা বলেন, ঔষধের পরিমাণমাত্রা আপনি জানেন না?

—জানি। এ ঔষধ সেবন করাতে হলে আমাকেই এখানে রাত্রিবাস করতে হবে। প্রতি অর্ধদণ্ডে একমাত্রা ঔষধ প্রযোজ্য। অন্য কোন ব্যক্তির উপর আমি নির্ভর করতে পারব না।

—তবে এখানেই তোকে থাকতে হবে সারারাত।

কুমারজীব অতঃপর তাঁর পেটিকা থেকে সেই উদ্ভিদজ ঔষধ নিয়ে এলেন। বললেন, মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধ সহযোগে এ ঔষধ সেব্য। পৃথক পৃথক পাত্রে আমাকে ঐ দুইটি অনুপান এনে দিন।

সন্নিধাতার আদেশে শিবিরান্তরাল থেকে একজন কিঙ্করী দুই হস্তে দুইটি রৌপ্যাধারে অনুপানদ্বয়

ধারণ করে শিবিরে প্রবেশ করল। তাকে দর্শনমাত্র জ্যামুক্ত ধনুকের মতো দণ্ডায়মান হলেন কুমারজীব : তুমি!

দুই হস্তে দুই পাত্র ধারণ করে মৃন্ময়ী প্রতিমার মতো নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিঙ্করী। তার দুইচক্ষে দরবিগলিত ধারা।

না। তার অঙ্গে ত্রি-চীবর নয়, রক্ত চীনাংশুক। আভরণবিমুক্তা নয় সে, সর্বাঙ্গে মণিমাণিক্যের দীপ্তি। মুণ্ডিতমস্তক নয়, এই তিন মাসে তার মস্তকে কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধ স্পর্শ করছে। তার কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে শতনরী, নিতম্বে মেখলা, চরণে অলক্তকরাগ, ভ্রূমধ্যে কুমকুম চিহ্ন। বাসকশয্যা!

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন হো-লুসূন, তুই চিনিস্ একে? এ হচ্ছে তোদের রাজকন্যা! ওর নাম অ-খু-মো-তি!

কুমারজীব ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পান। অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু উনি শুধু রাজকন্যা নন, উনি আ-লী সঙ্ঘারামের মহামান্যা অগ্‌গবিনতা! এঁকে কেন ধরে এনেছেন?

—ও আমার প্রধানা রক্ষিতা!

—রক্ষিতা! দুই হস্তে আনন আবৃত করে ভূমিতলে উপবেশন করেন কুমারজীব।

এতক্ষণে প্রথম কথা বলেন অক্ষুমতী, অনুপান নিয়ে এসেছি ভেষগাচার্য।

আর্তনাদ করে ওঠেন কুমারজীব, এ আপনি কী করেছেন সেনাপতি? ও যে আমার ভগ্নী!

—ভগ্নী! ও তোর ভগ্নী? এবার উৎসাহে উঠে বসে লুসূন। বলে, এতক্ষণে সমাধান হয়েছে। শোন্ বর্বর! তোর ভগ্নী অত্যন্ত সুন্দরী। তাকে আমার মনে ধরেছিল। তাই এতদিন তাকে শুধুমাত্র আমার উপপত্নীরূপে আবদ্ধ রেখেছিলাম। সর্বজনভোগ্যা বারবনিতা করিনি। এখন....

সন্নিধাতার দিকে ফিরে বলে, শোন আমার আদেশ। এই নারীই আমাকে ওর নির্দেশমতো ঔষধ প্রয়োগ করবে। চিকিৎসক শত্রুপক্ষের বন্দী—সে বিষপ্রয়োগে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে। তা যদি করে তবে আমার মৃত্যুর পর ঐ বন্দীর সম্মুখে এই নারীকে উলঙ্গ করে তোমরা যৌথভাবে বলাৎকার করবে। আমার বাহিনীতে এত সৈন্য আছে যে, আশা করি শুধুমাত্র ঐ পদ্ধতিতেই ওর ভগ্নীটিকে হত্যা করতে পারবে তোমরা। তারপর, এ দৃশ্য দু-চোখ মেলে দেখার পর ঐ বৌদ্ধ ভিক্ষুটাকে তোমরা শূলে দেবে। বুঝলে?

সন্নিধাতা শিরশ্চালনে স্বীকার করে পৈশাচিক আয়োজনটার মর্মার্থ তার গ্রহণ হয়েছে।

লুসূন এবার কুমারজীবের দিকে ফিরে বললে, এবার দে কী তোর ঔষধ আছে!

দীর্ঘদিন পরের কথা। সূর্য মকররাশিতে উপনীত হলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হবে। অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ। সপ্তদশবর্ষ অতিক্রান্ত। মহাস্থবির কুমারজীব এখন আর শালপ্রাংশু নন, জরাক্রান্ত অষ্টসপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধ। চীনখণ্ডে আছেন দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ কাল। রাজধানী চীন-য়াঙে নন, চীন প্রবেশদ্বারের এক অখ্যাত সঙ্ঘারামে—কাংসুতে। ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। বৎসরাধিককাল ধরে মধ্য-এশিয়ার গিরিসঙ্কট এবং গোবি মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্ত উত্তরণে যখন তিনি কাংসুতে উপনীত হলেন তখন সংবাদ পাওয়া গেল বৌদ্ধ চীনা সম্রাট তাঁর রাজধানী চাং-য়াঙে আততায়ীর ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে ইতিপূর্বেই নিহত হয়েছেন। তাঁর শূন্য সিংহাসনে যিনি অধিরূঢ় হয়েছেন সেই নবীন সম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আদৌ আগ্রহী নন। ফলে কুমারজীবের পক্ষে রাজধানীতে আগমন নিরর্থক। ততদিনে হো-লুসূন কুমারজীবকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। বস্তুত কুমারজীবের অদ্ভুত চিকিৎসাতেই নিরাময় হয়েছিলেন তিনি—মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন। তাই হুণ সেনাপতি ঐ বৌদ্ধ ভেষগাচার্যের কাছে উপকৃত। সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করে ভিক্ষুকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এখন আপনি কী করতে চান? এই দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করা এ বয়সে আপনার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়েই বা কী করবেন?

কুমারজীব বলেছিলেন, না, রাজধানীতে যাব না। একাকী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা করলেও পথে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। আমি এই কাংসু সঙ্ঘারামেই অবস্থান করব।

অগত্যা তাঁকে সেই অখ্যাত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে রেখে বিপুল বাহিনী নিয়ে হো-লুসূন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর রক্ষিতা বাহিনী এবং নবলব্ধ অক্ষুমতী সমেত।

কাংসুর এই ক্ষুদ্রায়তন সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা নগণ্য। সেনাপতির ব্যবস্থাপনায় কুমারজীবের জন্য প্রচুর চীনা ধর্মগ্রন্থ সেস্থলে প্রেরিত হল। কুমারজীব ইতিমধ্যে চীনাভাষা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিখে ফেলেছেন। তিনি একে একে পালিভাষায় লিখিত স্থবিরবাদী ধর্মের গ্রন্থগুলি চীনাভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। অনেক চীনা পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন অর্হৎ সেং-চাও। গুরুর বাণী ও জীবনকথা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন—অনেকটা শ্রীম লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের মতো। (বস্তুত তারই ইংরাজী অনুবাদ আমার এ গ্রন্থের অন্যতম মূল উপাদান।) কথাপ্রসঙ্গে সেংচাও লিখছেন, 'একদিন গুরুদেবকে প্রশ্ন করলাম, আপনি ক্রমাগত অনুবাদই করে যাচ্ছেন, মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করছেন না কেন?' তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বৎস সেং-চাও! এখানে আমার মৌলিক রচনার পাঠক কোথায়? স্বদেশে থাকলে সে কার্য সার্থক হত—এখানে আমি পক্ষহীন পক্ষিশাবক—পিঞ্জরের ভিতরে বসে মহাকাশের স্বপ্ন দেখা বৃথা।'

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার অবকাশে মাঝে মাঝে অতীত জীবনকথা স্মরণ করতেন। সমস্ত জীবনে অসংখ্যবার তিনি মহা-মহা পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেছেন। বহু বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোথাও পরাজিত হননি। তাঁর মত, তাঁর নির্দেশ কেউ কোথাও কখনো খণ্ডন করতে পারেনি। চির-অপরাজেয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য তিনি।

নাঃ, ভুল হল। জীবনে একবার তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। নতমস্তকে নিজ ভ্রান্তি স্বীকার করেছিলেন। দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ পূর্বেকার কথা। তবু স্পষ্ট মনে আছে ওঁর। তুন-হুয়ানের পথে সেই শিবিরে—যেদিন হুণ সেনাপতি হো-লুসূনের চিকিৎসা করেছিলেন তার ঠিক পরদিন।

সমস্ত রাত্রি কুমারজীব এবং অক্ষুমতী চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন সেনাপতির। সন্নিধাতাও উপস্থিত ছিল। মধু ও উষ্ট্রদুগ্ধের অনুপানে মিশ্রিত করে প্রতি অর্ধদণ্ডের ব্যবধানে তীব্র হলাহল পান করানো হচ্ছিল রোগীকে। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী এবং সন্নিধাতার উপস্থিতিতে মহাস্থবির অক্ষুমতীকে কোন সম্ভাষণ করেননি। অক্ষুমতীও নীরবে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিল অভিজ্ঞ সেবিকার মতো।

সেরাত্রে কুমারজীব যে অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছিলেন তা তুলনাহীন। অক্ষুমতী তাঁর অতি প্রিয় ভগ্নী। শৈশবাবস্থা থেকেই সে তাঁর কাছে মানুষ। অক্ষুমতী অপেক্ষা তিনি একত্রিশ বৎসরের অগ্রজ—সুতরাং সম্পর্কে ভগ্নী হলেও তিনি তাকে কন্যার মতো স্নেহ করতেন। ভিক্ষু বুদ্ধযশা সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর হতভাগিনী আত্মঘাতিনী হওয়ার সংকল্প করে। অশ্বারোহণে সেই উদ্দেশ্যেই স্বয়ম্বর সভার পূর্বরাত্রে সে গৃহত্যাগ করে; কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম না করে এ পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিতে পারে না। গভীর রাত্রে সে উপস্থিত হয়েছিল কুচীসঙ্ঘারামে মহাস্থবিরের পরিবেণে। অন্তর্যামীর মতো তার উদ্দেশ্যের কথা অনুধাবন করেছিলেন কুমারজীব। সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন ভগ্নীকে। অনৃতভাষণ করতে পারেনি অক্ষুমতী। তখন তিনি অক্ষুমতীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'সদ্ধর্মের' কথা। মৃত্যুর কাছে নতিস্বীকার করে কোনো সমাধানে পৌঁছানো যায় না। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতলাভই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এ জগৎ-প্রপঞ্চ মানুষকে নানাভাবে লুব্ধ করে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ষড়রিপু তাকে নিরন্তর ভ্রমাত্মক পথে নিয়ে যেতে চায়। সকল অবস্থাতেই দৈহিক পীড়নকে অস্বীকার করাই ভিক্ষুর সাধনা। দেহ কিছু নয়—দেহকে অতিক্রম করে নির্বাণের পথে আত্মার উত্তরণ। শুনিয়েছিলেন অক্ষুমতীকে নাম-রূপ উত্তরণের সেই অপূর্ব স্বরচিত মন্ত্রটি। অক্ষুমতী স্বীকার করে নিয়েছিল। দেহের অবমাননায়, দৈহিক নিপীড়নে, দেহজ কামনা-বাসনায় অথবা নির্যাতনে সে আর কোনোদিন বিচলিত হবে না এই প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেই রাত্রেই অক্ষুমতীকে উপসম্পদা দান করেছিলেন কুমারজীব।

রাজকন্যা অক্ষুমতী হয়েছিল অগ্গবিনতা ভিক্ষুণী।

তাই সেরাত্রে সেনাপতির জন্য পাত্রে ঔষধ ঢালতে ঢালতে তাঁর বার বার মনে হয়েছিল—অক্ষুমতীর এই মরণান্তিক ঘৃণিত জীবনের জন্য দায়ী তো তিনিই। সেদিন যদি তিনি অক্ষুমতীকে আত্মঘাতিনী হতে দিতেন তাহলে এই বর্বর হুণটা তার অনাঘ্রাত যৌবনকে, তার দেবীপ্রতিমার মতো দেহকে এভাবে মরণান্তিক নির্যাতনে দলিতমথিত করতে পারত না। ছিল কুমার-ভট্টারিকা রাজনন্দিনী, হল অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী; আর আজ সে এই বর্বর হুণটার পাশবিক কামনা চরিতার্থ করবার যন্ত্রণাময় একটা জৈবিক যন্ত্র! কেমন অনায়াসে পিশাচটা বলল—'অ-খু-ম-তি' তার প্রধানা রক্ষিতা। তার উপপত্নী।

শেষরাত্রে যখন রোগী যন্ত্রণার পূর্ণ উপশমে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হল তখন মনস্থির করলেন মহাস্থবির। সন্নিধাতাকে বললেন, এবার আমি বিশ্রাম নেব। আপনি ভূর্জপত্র, মস্যাধার আর লেখনী নিয়ে আসুন। সেবিকাকে পরবর্তী নির্দেশ দিয়ে আমি শয্যাগ্রহণ করব।

সন্দেহের কোনো কারণ নেই। অনুজ্ঞামতো ভূর্জপত্রাদি নিয়ে আসা হল। মহাস্থবির জানেন, এরা খরৌষ্ঠী লিপি কেউ পড়তে পারবে না। অথচ অক্ষুমতী তার পাঠোদ্ধারে সমর্থা। তাই পরবর্তী শুশ্রূষার নির্দেশদানের অছিলায় কুমারজীব ভূর্জপত্রে লিখে দিলেন, "কল্যাণীয়া অক্ষুমতী, তোমার এই চরম সর্বনাশের জন্য আমিই দায়ী। আমিই সেদিন তোমাকে আত্মঘাতিনী হইতে দিই নাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এই সঙ্গে যে পুরিয়া রাখিয়া গেলাম তাহা সেবন করিও। এই বর্বরের রক্ষিতা হিসাবে জীবনধারণের গ্লানি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইবে। আমার অন্তিম আশীর্বাদ রহিল।"

তার পরদিন সেনাপতির শিবিরে অক্ষুমতীকে দেখতে পেয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন কুমারজীব। উনি শিবিরে প্রবেশ করামাত্র অক্ষুমতী অগ্রসর হয়ে এসেছিল। ওঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রেখেছিল ঔষধের পুরিয়া এবং সেই ভূর্জপত্রটি। স্তম্ভিত কুমারজীব পত্রটি গ্রহণ করে দেখেন, তার বিপরীত দিকে খরৌষ্ঠী হরফে শুধু লেখা আছে

"পরীক্ষণার্থময়ি রুদ্রমূর্তে
সমাগতাদ্ ভীতিলবোঽপি নাস্তি।
ইদং হি বক্ষঃ প্রসৃতং চিরায়
ত্বদ্বজ্রপাতং করুণেতি মন্যে।।'

গুরুকেই ফিরিয়ে দিয়েছিল গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র!

রুদ্রদেবের বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে গ্রহণ করার মন্ত্র!

পত্রপাঠান্তে মুখ তুলে দেখেন কখন অলক্ষ্যে শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে অক্ষুমতী। আর কখনও তাকে দেখেননি।

কুমারজীবের জীবনে সেই একটিমাত্র পরাজয় কাহিনী। তাঁর কন্যাপ্রতিম ভগ্নী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—দেহ কিছু নয়; দেহের অবমাননা অস্বীকার করে দেহাতীত সাধনায় নিব্বাণের পথে আত্মার উত্তরণই হচ্ছে মানবদেহধারী মুমুক্ষুর সাধনা।

—গুরুদেব!

তন্ময়তা ছিন্ন হয় বৃদ্ধ মহাস্থবিরের। বলেন, কী সংবাদ সেং-চাও?

—অর্হৎ কুঙ্গ নামে একজন চৈনিক শ্রমণ শাক্যসিংহের লীলাভূমি দর্শনে গমনেচ্ছু। তিনি আপনাকে প্রণাম করতে এ সঙ্ঘারামে এসেছেন। আপনার দর্শনপ্রার্থী।

—আমার সৌভাগ্য। সসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে এস বৎস।

অনতিবিলম্বে সেং-চাও একজন শ্রমণ সমভিব্যাহারে মহাস্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন মহাস্থবিরকে। কুমারজীব দুই হস্ত তুলে বললেন, আরোগ্য।

পরিব্রাজকের নাম অর্হৎ কুঙ্গ। বয়ঃক্রম আটষট্টি—কুমারজীবের অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের অনুজ। শানসী প্রদেশে জন্ম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ভগবান তথাগতের জন্মভূমি পরিদর্শন করে ভারতের বিবিধ বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রাদির সম্যক পরিচয় লাভ ও বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শন মানসে তিনি ভারত ভূখণ্ডে যাত্রা করতে মনস্থ করেছেন।

মহাসমাদরে ওঁকে নিয়ে বসলেন কুমারজীব। যে পথে এসেছেন তার বর্ণনা দিলেন। পথে কোথায়

কোথায় মরূদ্যান আছে, সঙ্ঘারাম আছে ইত্যাদি জ্ঞাত করালেন। বৌদ্ধতীর্থগুলির নাম, পরিচয়, গমনাগমনের সুবিধা এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলির পরিচয় দিলেন। যাত্রা শুভ হ'ক, এই কামনা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, কবে যাত্রা করবেন?

—এই বৎসরই। বর্তমানে আমি রাজধানী চাং-য়াঙে যাচ্ছি। দুই মাস পরে সেই স্থান থেকে যাত্রা করব। এই পথেই যাব আমরা। সুতরাং দুই মাস পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে। আমার সঙ্গে আরও চারজন ভিক্ষু যাবেন। তাঁরা বর্তমানে রাজধানীতে আছেন। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেই যাচ্ছি আমি।

—তাঁদের নাম ও পরিচয়?

—পরিচয় তাঁরা বৌদ্ধভিক্ষু। তথাগতের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছু। আর তাঁদের নাম ভিক্ষু পুই-চিং, তাও-চিং, হুই-হিং এবং হুই-ওয়েই।

কুমারজীব বললেন, আপনি এসেছেন, আমি এজন্য ধন্য। এখানে কিছুদিন অবস্থান করে যান।

কুঙ্গ বললেন, অমন কথা বলবেন না। বরং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমারই জন্ম সার্থক হল। আমাদের সম্রাট আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার —

বাধা দিয়ে কুমারজীব বলেন, ওকথা থাক।

কুঙ্গ বলেন, থাক। কিন্তু আমি তো চাৎ-য়াঙে যাচ্ছি, প্রত্যাবর্তনের সময় আপনার জন্য কোনো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতে পারি কি ?

কিয়ৎকাল নীরব থাকেন কুমারজীব। তৎপরে বলেন, আমার একটি মাত্র বস্তুরই প্রয়োজন ছিল—ধর্মগ্রন্থ। রাজধানীতে যা কিছু পাওয়া যায় সেনাপতি হো-লুসুন তা অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে একটি সংবাদ যদি রাজধানী থেকে এনে দিতে পারেন কৃতার্থ হই।

—আদেশ করুন মহাভাগ।

—সেনাপতি হো-লুসুনের অবরোধে তাঁর প্রধানা উপপত্নী অ-খু-মো-তি নামের একটি হতভাগিনী নারী আজও জীবিতা আছে কিনা সম্ভব হলে এই সংবাদটি নিয়ে আসবেন। এখন তার বয়ঃক্রম ছয়চল্লিশ। যৌবনোত্তীর্ণা সে। হয়তো সেনাপতি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তা করে থাকলে বর্তমানে সে কোথায় আছে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন?

ভিক্ষু কুঙ্গ বিস্মিত হয়ে বলেন, সেনাপতির উপপত্নীর প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন ভদন্ত? সে কি আপনার পরিচিতা?

—সে ছিল কুচীনগরীর আ-লী বিহারের অগ্‌গবিনতা। মহাধার্মিক ভিক্ষুণী। পূর্বাশ্রমে সে ছিল কুচীরাজ্যের কুমার ভট্টারিকা, রাজনন্দিনী, বস্তুত আমার ভগ্নী সে!

জ্যা-মুক্ত শার্ঙ্গের মত আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন ভিক্ষু কুঙ্গ। বলেন, ক্ষান্ত হন ভদন্ত! আমি সহ্য করতে পারছি না।

সহাস্যে কুমারজীব বলেন, সে কিন্তু সহ্য করেছিল! আপনার যদি ক্লান্তি না আসে তবে তার পূর্ণ উপাখ্যান আমি আপনাকে জ্ঞাত করতে চাই। সে পুণ্যশ্লোকা মহাভিক্ষুণী। তার জীবনকথা আলোচনাতেও পুণ্য।

—আপনি বলুন মহাভাগ। আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

কুমারজীব অতঃপর একেবারে শৈশবকাল থেকে অক্ষুমতীর জীবনকথা বিবৃত করলেন ভিক্ষু কুঙ্গকে। শুধুমাত্র অক্ষুমতীর প্রেমাস্পদের নাম গোপন করলেন—কারণ মহাস্থবির বুদ্ধযশা এখনও জীবিত—কুচী সঙ্ঘারামের প্রধান তিনি। ভারত আগমনের সময় অর্হৎ কুঙ্গ কুচীনগরী হয়েই যাবেন। অহেতুক বুদ্ধযশাকে বিড়ম্বিত করা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করে ভিক্ষু কুঙ্গ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহাভাগ। এই মহিয়সী নারী সেনাপতির অবরোধেই থাকুন অথবা শহরের গণিকালয়েই থাকুন—এঁকে আমি উদ্ধার করবই।

—সে যদি আমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তাকে সসম্মানে নিয়ে আসবেন। সে যদি না আসতে চায় তাহলে বাকি জীবন সে যাতে ভদ্রভাবে—

বাধা দিয়ে কুঙ্গ বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ভদন্ত।

তিন মাস পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সেই চৈনিক পরিব্রাজক, তাঁর চারজন সঙ্গীসহ। মহাস্থবিরের আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরা পশ্চিমাভিমুখে পদযাত্রা করবেন। যাত্রার পূর্বে ভিক্ষু কুঙ্গ কুমারজীবকে পুনরায় নিশ্চিন্ত করে গেলেন। সংবাদ জানিয়ে গেলেন—দুই বৎসর পূর্বেই চাং-য়াঙে চিরশান্তির দেশে মহাপ্রয়াণ করেছেন ভিক্ষুণী অ-খু-মো-তি। তাঁর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে।

'হাংশী'-র প্রথম বৎসরে (৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে) এক শুভ প্রভাতে তাঁর উপরোক্ত চারজন সঙ্গীসহ অর্হৎ কুঙ্গ চ্যাং-য়ান থেকে সুদূর বুদ্ধভূমির দিকে যাত্রা করলেন। লংচো পর্বতমালাকে পশ্চাতে ফেলে পরিব্রাজকের দল যখন কিংকুই রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হলেন তখন গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসান। বর্ষাকালে বিহারের অভ্যন্তরে সাধনভজনের ব্যবস্থা শাক্যমুনির আমল থেকেই প্রচলিত। এ সময় ভিক্ষুদের ভিক্ষার্থে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। এদেশের রাজা তুয়ান ইয়ে তীর্থযাত্রীদের বহুল পরিমাণে সাহায্য করেন। এখানে অবস্থানকালেই এঁরা চীন থেকে আগত অপর একটি তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরাও ভারতবর্ষ দর্শনে চলেছেন। সংখ্যায় তাঁরাও পাঁচজন। সমস্ত দলটি অতঃপর উপনীত হলেন চীনের সিংহদ্বার তুন-হুয়ান-এ। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের দক্ষিণ প্রান্তে এই প্রখ্যাত গুহামন্দির সমন্বিত শহরটির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আশী লী এবং উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ লী। এখানে মাসাধিককাল অবস্থান করে অর্হৎ কুঙ্গ এবং তাঁর সঙ্গীরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন; দ্বিতীয় দলটি কিন্তু সেখানেই রয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের দুর্গম পথযাত্রা শুরু হল এখান থেকেই, কারণ এবার তাঁদের যাত্রাপথ দুস্তর গোবি মরুভূমির উপর দিয়ে। পরিব্রাজক তাঁর দিনপঞ্জিকায় এই অংশে যা লিখে গেছেন তা ভ্রমণ-সাহিত্যে শাশ্বত ইতিহাস রচনা করবার দাবী রাখে। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা প্রথমে একজন পথ-প্রদর্শকের সন্ধান করেছিলাম। পাইনি। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রথমত, যে মহান সঙ্কল্প নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তা থেকে নিবৃত্ত হবার মতো বাধা গোবি মরুভূমি উপস্থাপিত করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এই বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে কোনো পথের চিহ্ন না থাকলেও পূর্বসূরীদের সঙ্কেত ছিল—অগণিত পথিকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল। সেই অস্থিরেখা ধরেই এগিয়ে চললাম আমরা।"

সেন-সেন, খোটান, গোমতী বিহার অতিক্রম করে অগ্নিদেশে বা কারাহ্শরকে পিছনে ফেলে ভিক্ষুদল অবশেষে উপনীত হলেন কুমারজীবের জন্মভূমি কুচীনগরীতে।

দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরে ভস্মীভূত কুচীনগরী পুনর্জীবন লাভ করেছে। পো-সাঙ মৃত। সম্মুখযুদ্ধেই নিহত হয়েছিলেন তিনি। রাজপ্রাসাদ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল, পুনরায় নির্মিত হয়েছে। মহাসঙ্ঘারামও তাই। সেখানে মহাস্থবির হচ্ছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা। কুমারজীবের অনুরোধে তিনি কাশগড় ত্যাগ করে এখানে এসেই অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আ-লী বিহার অবস্থিত ছিল পর্বতের চূড়ায়। সেখান থেকে অল্পবয়স্ক ভিক্ষুণীদের অপহরণ ও বয়স্কাদের হত্যা করে হূণসৈন্য প্রত্যাবর্তন করেছিল। কাষ্ঠনির্মিত বিহারে অগ্নিসংযোগ করেনি। অর্হৎ কুঙ্গ একদিন এসে উপনীত হলেন কুমারজীবের স্মৃতিবিজড়িত সেই কুচী সঙ্ঘারামে।

চৈনিক পরিব্রাজকদের আগমন সংবাদে মহাস্থবির স্বয়ং এগিয়ে এলেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে। কুশল ও সৌজন্য বিনিময়ান্তে অর্হৎ কুঙ্গ বললেন, মহাথের! আপনার নামই তো ভিক্ষু বুদ্ধযশা?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

—আমি আপনার জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছি।

অঙ্গরাখা থেকে সযত্নরক্ষিত একটি ভূর্জপত্র বার করে দেন চৈনিক ভিক্ষু। বুদ্ধযশা সবিস্ময়ে সেটি নিয়ে আদ্যন্ত পাঠ করে চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁর গুরু মহাথের কুমারজীবের হস্তাক্ষর। তিনি লিখেছেন :

"মহাকারুণিকের পদপ্রান্তে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন।। অতঃপর হে মাননীয় ভিক্ষু বুদ্ধযশা, মহাচীন এক উর্বর অকর্ষিত ক্ষেত্র।। অগ্নিদেশ, শৈলদেশ, ভূস্বর্গ ও ভারত-ভূখণ্ডে অগণিত বৌদ্ধ

ধর্মাচার্য বর্তমান, যাঁরা সদ্ধম্মের প্রচারের যথোচিত ব্যবস্থাদি করণে সক্ষম।। পরন্তু চীনখণ্ডে প্রচারকের এবং প্রবক্তার একান্ত অভাব। আমি বৃদ্ধ।। বিদায়গ্রহণের কাল সমাগত।। কুচী সঙ্ঘারামে একদিন আপনি আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছিলেন। চীনখণ্ডে আপনি আমার শূন্যস্থান পূরণ করিয়া আমাকে ধন্য করিবেন কি ? যদি আমার শেষ ইচ্ছা পূরণে উৎসাহী হয়েন তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি সমভিব্যাহারে আসিবেন।।"

দীর্ঘতালিকার উপর চক্ষু বুলিয়ে বুদ্ধযশা বলেন, ভিক্ষু কুঙ্গ, আপনি এ পত্রের মর্ম সম্বন্ধে অবহিত ?

—আদৌ নয়। কেন, কী আছে ওতে ?

বুদ্ধযশা আদ্যন্ত পত্রটি পাঠ করে শোনালেন। চৈনিক ভিক্ষু বললেন, মহাস্থবির যথার্থ কথাই বলেছেন। চীনখণ্ড আপনাকে আহ্বান করছে। সমগ্র চীনবাসীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠেন বুদ্ধযশা। এ আহ্বান কেমন করে প্রত্যাখ্যান করেন? চীনে আছেন মহাস্থবির কুমারজীব—তাঁর গুরু, তাঁর পথপ্রদর্শক, তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। কে জানে, হয়তো এখনো জীবিতা আছে আরও একজন হতভাগিনী!

সপ্তাহকাল চৈনিক ভিক্ষুরা অবস্থান করলেন সেই সঙ্ঘারামে। তারপর একদিন ভিক্ষু কুঙ্গ বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, এইস্থলে ভিক্ষুণীদিগের জন্য একটি বিহার ছিল। তার নাম আ-লী। সেটি কোথায়?

—আ-লী বিহার? আপনি তার নাম শুনলেন কোথায়?

—শুনেছি মহাস্থবির কুমারজীবের জননী ভিক্ষুণী জীবা ছিলেন এই আ-লী বিহারে অগ্‌গবিনতা। সে তো প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষুর তীর্থস্থান।

—ঠিকই শুনেছেন আপনি। আমি স্বয়ং আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।

পরদিন প্রত্যূষে ওঁরা দুইজনে অশ্বারোহণে যাত্রা করলেন আ-লী পর্বতচূড়ায়। অপরাপর চৈনিক পরিব্রাজকেরা সেদিন গেলেন খ্যিজিল সঙ্ঘারাম দর্শনে। আ-লী বিহারে উপনীত হলে বর্তমান কালের অগ্‌গবিনতা ভিক্ষুণী এসে মহাস্থবির এবং চৈনিক পরিব্রাজকের চরণবন্দনা করল। পাদ্যর্ঘ্য এনে স্বয়ং ধৌত করে দিল অতিথির চরণ। সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল প্রথমেই বিহারের কেন্দ্রস্থ চৈত্যগৃহে। চৈনিক শ্রমণ স্তূপপদমূলে প্রণাম নিবেদন করলেন। কিছুক্ষণ প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, মাননীয় অগ্‌গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী জীবাদেবীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

অগ্‌গবিনতা পথ প্রদর্শন করে মাননীয় অতিথিকে নিয়ে আসে প্রাক্তন অগ্‌গবিনতার পরিবেণে। সে কক্ষটি এখন ব্যবহৃত হয় না। ভিক্ষুণী জীবার ভিক্ষাপাত্র, যষ্টি, ত্রি-চীবর ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন সেখানে সযত্নে রক্ষিত। একপুরুষেই জীবাদেবীর উপর প্রায় দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে। চৈনিক শ্রমণ সেখানে প্রণাম নিবেদন করে কিছু কালাগুরু চূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন পুণ্যশ্লোকা জীবার স্মৃতিতে। তারপর বললেন, মাননীয় অগ্‌গবিনতা, অতঃপর আমাকে ভিক্ষুণী অক্ষুমতীর পরিবেণে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধযশা সবিস্ময়ে বলেন, অক্ষুমতী! আপনি তাকে চিনলেন কেমন করে?

চৈনিক শ্রমণ তাঁর কথার প্রত্যুত্তর না করে অগ্‌গবিনতাকেই বলেন, আপনার পূর্বে যিনি এ বিহারে অগ্‌গবিনতা ছিলেন, তিনি কি প্রাক্তন কুচীরাজকন্যা অক্ষুমতী নন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই। আসুন ভদন্ত। তাঁর পরিবেণটিও অব্যবহৃত। তাঁর ব্যবহৃত যষ্টি, তাঁর পরিধেয় চীবর এবং তাঁর ভিক্ষাপাত্র সেখানে সসম্মানে সংরক্ষিত। তিনি পুণ্যশ্লোকা।

চৈনিক শ্রমণ সেই পরিবেণের প্রবেশদ্বারেও কিছু কালাগুরুচূর্ণ প্রজ্বলিত করলেন।

অতঃপর. বিহারের সকল ভিক্ষুণী চৈত্যগৃহে সমবেত হলেন। বুদ্ধযশার পরিচালনায় সকলে সমবেতভাবে প্রার্থনাসঙ্গীত করলেন। চৈনিক শ্রমণও যোগ দিলেন সে প্রার্থনায়।

প্রত্যাবর্তনের পথে বুদ্ধযশা আর কৌতূহল দমন করতে পারেন না। বলেন, ভদন্ত! এক্ষণে বলুন অক্ষুমতীর নাম আপনি কোথায় শুনেছেন?

চৈনিক পরিব্রাজক অপাঙ্গে একবার সহযাত্রী অশ্বারোহীর দিকে দৃকপাত করেন। রহস্য করে বলেন, চীন দেশে নানান ভোজবিদ্যা প্রচলিত, আপনি শোনেননি?

বুদ্ধযশা কাতরভাবে বলেন, তাহলে একটা কথা বলুন। সে হতভাগিনী কি আজও জীবিতা?

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পর্শের মতো একটা সম্ভাবনার কথা উদয় হল চৈনিক শ্রমণের অন্তরে। তিনি অশ্বকে গতিরুদ্ধ করেন। বলেন, বলছি। তৎপূর্বে আমার কয়েকটি প্রতিপ্রশ্নের উত্তর দিন?

—বলুন?

আপনি বলেছিলেন, আপনি মহাথের কুমারজীবের নিকটেই উপসম্পদা গ্রহণ করেন। কিন্তু সেটা কি ভিক্ষুণী অক্ষমতীর সন্ন্যাসগ্রহণের ঠিক পূর্ব দিবসে?

বুদ্ধযশা বলেন, আপনি কি অন্তর্যামী? হ্যাঁ, তাই বটে।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—মহাথের তাঁর জননী এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতীকে নিয়ে কাশগড় থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কি আপনিও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন?

—আশ্চর্য! হ্যাঁ, ছিলাম।

—পথে কি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়? আপনি এবং ভিক্ষুণী অক্ষমতী দলচ্যুত হয়ে কি একটি নির্জন গুহায়—

চিৎকার করে ওঠেন বুদ্ধযশা; বলুন আপনি কে ? আপনি ভিক্ষু কুঙ্গ নন! আপনি অন্তর্যামী! বলুন কী আপনার সত্য পরিচয়?

—বলছি। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন ভদন্ত। আমার নাম কুঙ্গ নয়। ও নামে চীনখণ্ডে কেউ আমাকে চিনবে না। যেমন 'কুমারজীব' এ নামে আপনার গুরুকেও সেখানে কেউ চিনবে না।

বুদ্ধযশাও অশ্বের গতি সম্বরণ করেছিলেন। চৈনিক ভিক্ষুর শেষ কথাটা তাঁর কানে যায়নি। তিনি যেন সহসা আত্মস্থ হয়ে গিয়েছেন। দূর দিগন্তে—যেখানে তুষারধবল পর্বতচূড়া ঘননীল আকাশের চালচিত্রের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন, তিনি যেন সেখানেই কোনো অতীতদিনের স্মৃতির শিলালেখ সন্ধানে স্তিমিতদৃষ্টি। কেমন যেন ভাবাবিষ্ট। শান্তস্বরে বললেন, মাননীয় ভিক্ষু, আপনি যখন এত সংবাদ অবগত আছেন, তখন কি জানেন না—সেই হতভাগিনী এই আ-লী বিহার থেকে অপহৃতা হয়েছিল?

—জানি ভদন্ত। এজন্য আপনারই মতো অনুশোচনায় আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়।

বুদ্ধযশা ক্ষণকাল অপেক্ষা করেন। তারপর মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করেন, তার সেই গ্লানিকর কদর্য জীবনের কি আজও অবসান হয়নি?

চৈনিক পরিব্রাজক শান্তস্বরে প্রত্যুত্তর করেন, তথাগতের অসীম করুণা! ভিক্ষুণী অক্ষমতী নিব্বাণলাভ করেছেন। এ সংবাদ মহাস্থবির কুমারজীবকে জানিয়েছিলাম। আজ আপনাকেও জানালাম।

বুদ্ধযশা অবনত মস্তকে আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন, তথাগতের অশেষ করুণা। চলুন এবার ফেরা যাক।

সেই রাত্রেই বুদ্ধযশা চৈনিক শ্রমণকে বললেন, ভদন্ত, আপনি তখন বলেছিলেন, মহাঅর্হৎ কুমারজীবকে চীনখণ্ডে 'কুমারজীব' নামে কেউ চিনবে না। একথা কেন বলেছিলেন?

—সেখানে তাঁর নামরূপের পরিবর্তন হয়েছে। এক্ষণে তিনি স্থবির, জরাগ্রস্ত। চীনখণ্ডে তাঁর নাম 'চিয়ু-মো-লো-শিহ্'।[11]

—আপনি আরও বলেছিলেন 'কুঙ্গ' আপনার নাম নয়! আপনার প্রকৃত পরিচয় কী?

—'কুঙ্গ' আমারই নাম। পিতৃদত্ত নাম। মাত্র তিন বৎসর বয়সে আমার দীক্ষা হয়। সন্ন্যাসজীবনে আমাকে উপাধি দান করা হয় 'সি'। চীনভাষায় 'সি' শব্দের অর্থ 'শাক্যনন্দন', সেটি তথাগতের নামান্তর। বলুন, সে নাম কি স্বীকার করা যায়? কিন্তু সেটা উপাধি, নাম নয়। সন্ন্যাসজীবনের সঙ্ঘ আমাকে যে নামে চিহ্নিত করে দিলেন, চীনাভাষায় তার অর্থ 'বিনয়ের প্রতিমূর্তি' বা 'মূর্ত বিনয়'। বলুন ভদন্ত, দুর্বিনীতের মতো সে নামটাই বা নিজ পরিচয় হিসাবে প্রদান করি কী করে?

বুদ্ধযশা বলেন, তা হ'ক। সন্ন্যাসজীবনে আপনার যা নাম সে নামেই আপনি পরিচিত হবেন। ভারত ভূখণ্ডে প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক হিসাবে আপনার সেই অভিধাই ভারত-ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। মাননীয় ভিক্ষু, বলুন সে নামটি কী?

চৈনিক শ্রমণ সলজ্জে বলেন, সন্ন্যাস জীবনে আমার নাম : ফা-হিয়েন।

সে রাত্রে কুচী মহাসঙ্ঘারামে রাত্রের তৃতীয়যামে আশ্রমিকরা যখন গভীর নিদ্রায় সুসুপ্ত তখনও মাত্র দুইজন বৌদ্ধশ্রমণ শয্যাগ্রহণ করেননি। পাশাপাশি দুইটি পাষাণ-প্রকোষ্ঠে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে দুইজনই প্রার্থনায় বসেছেন। উভয়েই চিত্তচাঞ্চল্যে উদ্বিগ্ন। অন্তরের উৎকণ্ঠা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তথাগতের চরণমূলে নিবেদন করে শান্তির সন্ধান করছেন একান্ত-উপাসনায়। অথচ আশ্চর্য—তাঁরা যদি পরস্পরের আন্তর-বিষাদের তথ্য অবগত হতে পারতেন, তবে হয়তো নিজেরাই সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

নির্জন পরিবেশে অজীনাসনে সমং কায়শিরোগ্রীব্ ভঙ্গিতে উপাসনায় বসেছেন ভিক্ষু বুদ্ধযশা। অর্হৎ ফা-হিয়েন-এর কাছে অক্ষুমতীর শেষ সংবাদ শ্রবণ করে তিনি অপরিসীম মনোবেদনায় কাতর। অবশ্য এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারত ? অগ্‌গসেবিকা পরিনিব্বাণ লাভ করেছেন, তাঁর ক্লেদাক্ত জীবনের অবসান ঘটেছে—এ তো আনন্দেরই সংবাদ। না, সেজন্য নয়, মৃত্যুর জন্য কোনও আক্ষেপ নাই—কিন্তু সেই মহিমময়ী ভিক্ষুণী যে এভাবে অবজ্ঞাত, অনাদৃত, প্রিয়-পরিজন-পরিত্যক্ত ঘৃণ্য পরিবেশে এই পঠবিং (পৃথিবী) থেকে বিদায় নিলেন এই তথ্যটাই ভিক্ষুর মর্মমূলে বিদ্ধ হচ্ছিল। পরিবেশের একান্ত পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে যুক্তকরে প্রার্থনা করছিলেন তিনি : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু। এভাবে কেন আমাকে রক্ষা করলেন!

অতীত জীবনের স্মৃতি—অক্ষুমতীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় এবং অনুরাগঘন কথোপকথন এতদিন তিনি বিস্মৃত হতেই সচেষ্ট ছিলেন। সেগুলি ছিল তাঁর সাধনার পথে অন্তরায়। কাশগড়ের চৈত্যে প্রদীপহস্তে স্তূপ পরিক্রমা, যৌথ প্রার্থনাসঙ্গীত, অক্ষুমতীর উপহার এবং তাঁর প্রত্যাখ্যান, তারপর কাশগড় থেকে কুচী প্রত্যাগমনের পথে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা—প্রলয়মুহূর্তে একটি বেপথুমানা নারীদেহকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করা, নির্জন গুহায় রুদ্ধশ্বাসরমণীর বিম্বাধর উন্মুক্ত করে—না! এসব চিন্তা অশুচি, অকল্যাণকর! তথাগত প্রবর্তিত ধর্মচক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের নির্দেশ আছে তার সপ্তম নির্দেশ : সম্মাসতি! সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি। নির্জনগুহার সেই স্মৃতি সৎচিন্তা নয়। তাকে অন্তরের অবচেতনে নির্বাসনে পাঠাতেই হবে। তাই পাঠিয়েছিলেন এতদিন।

মহাথের কুমারজীব যখন চৈনিক সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন, তখন একটি পত্রবাহকের হস্তে তিনি কাশগড়ের সঙ্ঘারাম থেকে বুদ্ধযশাকে কুচীনগরীতে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহাথের বুদ্ধযশাকে আদেশ করেছিলেন কুচীসঙ্ঘারামের মহাস্থবিরের পদ অলঙ্কৃত করতে। মনে আছে, সেই পত্রখানি হাতে নিয়ে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধযশা। কী তাঁর করণীয় বুঝে উঠতে পারেননি। কুচী সঙ্ঘারামের দায়িত্ব গ্রহণ করলে অনিবার্যভাবে গ্রহণ করতে হয় আ-লী বিহারের অগ্‌গবিনতা অক্ষুমতীর দায়িত্ব। শঙ্কা ছিল সেখানেই। সম্মাবায়ামোর (সৎ যৌগিক উদ্যোগে) মাধ্যমে অন্তরের তন্‌হা (তৃষ্ণা)-কে, ছত্তিসংসতি সোতা-(ছত্রিশ প্রকারের জাগতিক কামনা-বাসনা)-কে অবদমিত করেছিলেন, আশঙ্কা ছিল অক্ষুমতীর সমীপবর্তী হলে গিরিমেখলবাহন তাঁর অন্তর-রাজ্য পুনরায় দখল করতে চাইবে। অথচ দীক্ষাগুরুর আদেশও অমান্য করতে পারেননি। তাই সেদিন তিনি এমনই ভাবে তথাগতের মূর্তির সম্মুখে প্রার্থনা করেছিলেন : 'এই পরীক্ষাতে আমাকে সসম্মানে উত্তীর্ণ কর প্রভু ! আমি যেন 'অনুপাদিয়ানো' (আসক্তিহীন) নিষ্ঠায় অভিঞ্‌ঞা (উচ্চতর জ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি) লাভ করি। আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে তন্‌হাকে তিরোহিত কর।' তাই করেছিলেন তথাগত। তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন। কাশগড় থেকে কুচীনগরীতে এসে বুদ্ধযশা দেখতে পেয়েছিলেন—তাঁর সম্ভাব্য চিত্তচাঞ্চল্যের মূল উপকরণটি বিদূরিত। আ-লী বিহার থেকে অগ্‌গসেবিকা অক্ষুমতী অপহৃতা! সারাজীবনে সেই মূর্তিমতী তন্‌হার সম্মুখে আর তাঁকে কোনদিন দণ্ডায়মান হতে হবে না। তথাগতের এই কারুণ্যে তুষ্ট হতে পারেননি বুদ্ধযশা। সেদিনও তিনি আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন : এ সমাধান তো আমি চাইনি প্রভু !

পাশের প্রকোষ্ঠেই প্রার্থনারত চৈনিক ভিক্ষু ঠিক তখনই আপনমনে বলছিলেন, হে লোকজ্যেষ্ঠ! হে শাক্যসিংহ! তুমি আমাকে পথের নির্দেশ দাও! তোমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রে যে অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গের

নির্দেশ আছে তার তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে : সম্মা-বাচা (সত্য-বাক্য)। আমি অনৃতের আশ্রয় নিয়েছি, মিথ্যার অনুসরণ করেছি! তুমি আমাকে বলে দাও : সত্য কী? জাগতিক সত্য যদি মঙ্গলময় না হয় তাহলে কোনটি বরণীয়—নিষ্ঠুর সত্য না মঙ্গলকারী অসত্য?

অন্তর-দহনে তিনিও দগ্ধ হচ্ছিলেন। মহাথের কুমারজীবের অনুরোধে তিনি চৈনিক সেনাপতি হো লু-সূনের স্কন্ধাবারে স্বয়ং গিয়েছিলেন। চৈনিক অবরোধে অক্ষুমতীর সঙ্গে ফা-হিয়েনের সাক্ষাৎও ঘটেছিল। সেই অনিন্দ্যকান্তি রমণীই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কথা রটনা করতে। হো লু-সূনের অবরোধ থেকে তাঁর উদ্ধারের কোনো আশা নেই। কিন্তু অহেতুক ভিক্ষু কুমারজীবকে কষ্ট দেওয়াতেই বা কী লাভ ? ভগ্নীর মৃত্যু-সংবাদেই তৃপ্ত হবেন তিনি, তাঁর সাধনার পথ নিষ্কণ্টক হবে। ফা-হিয়েন উপলব্ধি করেছিলেন সেই মহীয়সী মহিলার যুক্তি। সত্যই তো! কী লাভ কুমারজীবকে জানিয়ে যে, অক্ষুমতী আজও ঘৃণিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই নরপিশাচের অবরোধে? তাই প্রত্যাবর্তনের পথে ফা-হিয়েন কুমারজীবকে জানিয়ে এসেছিলেন—অক্ষুমতীর গ্লানিকর জীবনের অবসান ঘটেছে। আজ পুনরায় একই উদ্দেশ্যে ভিক্ষু বুদ্ধযশাকে সান্ত্বনা দিতে অষ্টমুখী সত্যমার্গের তৃতীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন ফা-হিয়েন। 'সম্মা-বাচা' নির্দেশ সজ্ঞানে উপেক্ষা করেছেন। পার্শ্ববর্তী পরিবেণে তাই তিনিও প্রার্থনারত : হে শাক্যনন্দন, হে তথাগত ! তুমি বলে দাও—আমি কি পতিত ?

শৈলদেশ-উড্ডিয়ান-নগরহার-গান্ধার-পুরুষপুর।

ফা-হিয়েন চলেছেন গাঙ্গেয় ভারতবর্ষে—তথাগত বুদ্ধের জীবন-লীলাক্ষেত্র পরিদর্শনে। তাঁর চারজন সহযাত্রীর ভিতর দুইজন—লুই-ওয়েই এবং লুই-হিং—পথিমধ্যে পথের ক্লেশ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হতভাগ্য লুই-চিং পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুধুমাত্র ভিক্ষু তাও-চিং আছেন তাঁর সঙ্গে। ফা-হিয়েন অতি শৈশবেই সদ্ধর্মে দীক্ষিত—বৌদ্ধধর্মের বাতাবরণে তিনি শিক্ষিত, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষকে। অপরপক্ষে তাও-চিং পরিণত বয়সে দীক্ষা নেন; পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন অধ্যাপক, ছিলেন কবি। চীনাভাষায় তাঁর গীতিকবিতা আছে। তিনি কোনো দিনপঞ্জিকা রেখেছিলেন কি না জানা যায় না; রাখলে তা আরও আকর্ষণীয় হত। ভারতখণ্ডে প্রবেশকালে ফা-হিয়েন আটষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, প্রাক্তন অধ্যাপক তাও-চিং পঞ্চাশ বৎসরের ভিক্ষু। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল ধরে ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থে ফা-হিয়েন বিরাশী[12] বৎসর বয়সে সমুদ্রপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পর বৎসর ৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'ফো-কিউ-কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। অপরপক্ষে তাও-চিং এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ করে ও দেশবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিফলন দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি পাটলিপুত্র পর্যন্ত ফা-হিয়েনের সঙ্গে আসেন। ফা-হিয়েন যখন পাটলিপুত্র ত্যাগ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তাও-চিং তাঁকে বলেছিলেন, 'ভদন্ত, আমি এ-দেশেই বাকি জীবন অতিবাহিত করব বলে স্থির করেছি।'

এরপর ফা-হিয়েনের কোনো ভ্রমণসঙ্গী ছিল না। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

পুরুষপুর-নগরহিলোত্র-ভিদা-মথুরা।

ফা-হিয়েনের দিনপঞ্জিকায় মথুরার নিকটবর্তী যমুনা-তীরবর্তী রাজ্যের নাম দেখছি : মধ্যরাজ্য। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা অনুসারে—"এ অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, এখানে তুষারপাত বা বালুকাঝড় হয় না। এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এরা কোনো কর দেয় না বা সম্পত্তির কোন হিসাবও দেয় না। এ দেশের অধিবাসীরা যখন খুশি এবং যেখানে খুশি যেতে পারেন। রাজা মৃত্যুদণ্ড ব্যতিরেকেই রাজ্যশাসন করেন। ..... একমাত্র চণ্ডাল ব্যতীত কেহই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না। ..... এদেশের বাজারে কোনো মদের দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নাই।"

ফা-হিয়েনের এ ভারত-বিবরণ ছাত্রাবস্থায় পাঠ করেছি, পরীক্ষার খাতায় লিখেছি। কিন্তু এ পরিণত বয়সে আশঙ্কা হয়, সরল প্রকৃতির সাধু পরিব্রাজকটি সম্ভবত তদানীন্তন ভারতবর্ষের নিচের তলার স্বরূপটা দেখতে পাননি। তিনি ক্রমাগত বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে আতিথ্য নিয়েছেন—আশঙ্কা হয়, সেই সব সঙ্ঘারামের বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁকে যে পথে পরিচালিত করেছেন তা আজকের দিনের ভাষায় 'কন্ডাকটেড্ টুর'। গুপ্তযুগের সমসাময়িক সাহিত্য পাঠে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, বাজারে তখন শৌণ্ডিকাপণ ছিল না, মাংসের বিপণী ছিল না। বোধ করি সাহিত্যের অধ্যাপক তাও-চিং ভ্রমণকাহিনী লিখলে আরও বাস্তবচিত্র পেতাম আমরা।

মথুরা—সাংস্যসেঙ (কনৌজ-এর পঁয়তাল্লিশ মাইল বা ৭২ কিমি দূরে একটি গ্রাম)—অগ্নিদগ্ধবিহার— কান্যকুব্জ —কোশল—শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে পরিব্রাজক লিখছেন : "এই নগরীর প্রাক্তন-গরিমা অস্তমিত। বুদ্ধের সমসময়ে এই শ্রাবস্তীতেই ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর রাজধানী। এস্থানেই ছিল মহাপ্রজাপতি ও জেতবন বিহার এবং এই পুণ্যভূমি অর্হৎ অঙ্গুলিমাল ও অনাথপিণ্ডৎ-এর স্মৃতি-বিজড়িত। এখন এখানে মাত্র দুইশত ঘর মানুষের বাস। স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামবিশেষ।"

শ্রাবস্তী—জেতবন বিহার—তাদওয়ানগর—কপিলাবস্তু।

"কপিলাবস্তু নগরীতে অসংখ্য স্তূপ আছে, তার মধ্যে শুদ্ধোদন-প্রাসাদে মায়াদেবীর গর্ভধারণের পূর্বে শ্বেতহস্তীরূপে তথাগতের স্বপ্ন-আবির্ভাব, রাজপুত্রের নগর পরিক্রমাকালে চারিটি দৃশ্য দর্শন, ন্যগ্রোধারাম বিহারে বুদ্ধত্বলাভের পরে পিতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎস্থল, ... প্রভৃতি পুণ্যস্থান চিহ্নিত করে স্তূপ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু হায়! পরমকারুণিকের জীবনস্মৃতি বিজড়িত যে কপিলাবস্তু নগরী এককালে দিবারাত্র কলমুখরিত থাকত—এখন তা মূক, বধির। নগরী জনশূন্য বললেই হয়। বিশাল প্রাক্তন-নগরীর ধ্বংসস্তূপের ভিতরে মাত্র দুই-এক ঘর পরিবার এখানে বাস করেন। আর আছেন সাধারণ কিছু বৌদ্ধভিক্ষু।"

লুম্বিনী—রামগ্রাম—বৈশালী।

লিচ্ছবী রাজগণের রাজধানী বৈশালীর উত্তর-সীমান্তে বনভূমির মধ্যে অবস্থিত আম্রবন-বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন পরিব্রাজক। অম্বপালী বা আম্রপালী ছিলেন রাজনটী। তিনি যেন ভিক্ষুণী অক্ষুমতীর বিপ্রতীপ রূপ। অক্ষুমতী হয়েছিলেন ভিক্ষুণী থেকে বর্বর হুণ সেনাপতির উপপত্নী; আর রাজনটী আম্রপালীর উত্তরণ হয়েছিল রাজ্যের জনপদকল্যাণীর পদ থেকে অর্হৎ ভিক্ষুণীতে! এই নগরনটীর গর্ভে স্বয়ং বিম্বিসারের ঔরসে জন্মলাভ করেছিল এক জারজপুত্র—জীবক। ভেষগাচার্য হয়েছিলেন তিনি পরবর্তীকালে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গৌতমবুদ্ধ কুশীনগর যাওয়ার পথে এই রূপোপজীবিনীর অতিথি হন। মহাপুরুষের সেই ক্ষণিক সান্নিধ্যে নটীর জীবনে এল যুগান্তর। আজীবনের সঞ্চয় দান করে তিনি শরণ নিয়েছিলেন—বুদ্ধের, ধর্মের, সঙ্ঘের।

অবশেষে মগধ রাজধানী পাটলীপুত্র।

"মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলীপুত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্য প্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করা হয়। দরিদ্র অনাথ আতুরদের আহারাদি ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকেরা বেশ যত্নসহকারেই তাদের পরীক্ষা করে ঔষধপথ্যাদি প্রদান করেন এবং সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসালয়ে রাখেন।"

পাটলীপুত্রের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এটুকুই লিপিবদ্ধ। বাদবাকি শুধু বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিবরণ। ফা-হিয়েন যে সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্রে বাস করেন তখন গুপ্তসংস্কৃতির সূর্য মধ্যগগনে। অথচ কী আশ্চর্য—সে-কথার ইঙ্গিতমাত্র তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে কোথাও নেই। যে পথে তিনি ভারত পরিক্রমা করেন তার বারো আনাই ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—সমস্ত অংশের একচ্ছত্র অধিপতি মহারাজ-চক্রবর্তী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য—অথচ তাঁর দিনলিপিতে 'গুপ্তসাম্রাজ্য' অথবা 'গুপ্তসম্রাটের' কোনও উল্লেখ নেই। সমসাময়িক অসীম

প্রতিভাধর যে সব ব্যক্তি তখন মগধ রাজধানী পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করতে বাধে না—অমরসিংহ, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, কালিদাস, বেতালভট্ট, আর্যভট্ট, শূদ্রক প্রভৃতি কেউই স্থান পাননি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। ঐ সব যুগান্তকারী ব্যক্তিরা যে সমসাময়িক, তাঁরা যে সে সময় পাটলীপুত্রে উপস্থিত ছিলেন একথার সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই; কিন্তু গুপ্তযুগের ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য নাটক-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্রশিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিকাশ যে পাটলীপুত্রে অতি সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান ছিল একথা সন্দেহ করারও কোন কারণ নেই। বৌদ্ধভিক্ষু সেসবদিকে সম্ভবত আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি; করে থাকলেও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে তার প্রতিফলন হয়নি।

পাঠক-পাঠিকা! এ পর্যন্ত যা বলেছি তা ফা-হিয়েনের বিষয়ে নিছক ইতিহাস। এবার অনুমতি করুন —কল্পনায় কাহিনীর জাল বুনি—

ফা-হিয়েন এবং তাও-চিং আজ মাসাধিককাল আছেন পাটলীপুত্রের মহাসঙ্ঘারামে। কবি-প্রকৃতির ভিক্ষু তাও-চিং মুগ্ধ হয়ে গেছেন এ নগরীর বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রায়। সর্বত্রই প্রাচুর্যের লক্ষণ। নগরবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ—শৈব উপাসকও বড় কম নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায় ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে হয় না। নগরী প্রায় প্রত্যহই উৎসব মুখরিত। সকলে সর্বসময়েই যেন উৎফুল্ল। রঙ্গরস নগরীর পথে-ঘাটে।

কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ—ত্রিভূমিক; পাষাণনির্মিত। অগণিত কারুকার্যখচিত স্তম্ভ, বিচিত্রিত কক্ষ, প্রাসাদশীর্ষে মঙ্গল-কলস ও তদুপরি ধ্বজা। দুর্গের আকারে সুউচ্চ প্রাচীরে রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত। প্রাকারশীর্ষে সারি সারি ইন্দ্রকোষ—সেখানে অতন্দ্রপ্রহরায় ধানুকী। ওই প্রাচীরের বহির্দিকে প্রশস্ত পরিখা। একটি মাত্র সিংহদ্বার। যার ভিতর দিয়ে হাওদা-সহ রাজহস্তী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। সিংহদ্বারের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত একটি সেতু—কপিকলের সাহায্যে তা উঠানো-নামানো যায়। রাত্রের প্রথম প্রহরে কালসূচিকা যবনী প্রহরিণী ধাতব ঘণ্টাধ্বনির সঙ্কেত করলে সেই কাষ্ঠনির্মিত সেতু অপসারিত হয়, ব্রাহ্মমুহূর্তে বৈতালিকদল রামকেলীতে মাঙ্গলিকী শুরু করলে সেতু যথাস্থানে অবনমিত হয়। সিংহদ্বারের সরাসরি রাজপথ উন্মুক্ত প্রান্তর ভেদ করে এসে পড়েছে এক শোভাস্তম্ভ-শোভিত উদ্যানে। স্তম্ভটি বস্তুত একটি প্রকাণ্ড সূর্যঘড়ি—আর্যভট্টের নির্দেশে নির্মিত। তার ছায়াপাত নগরবাসীকে দিবাভাগে সময় নির্দেশ করে। ঐ স্তম্ভকে কেন্দ্র করে একটি চতুর্মহাপথ। তার ধারে ধারে অধিকরণসমূহ—মহাক্ষ-পটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষের অধিকরণ, শুল্কাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতি প্রভৃতির অধিকরণ। চতুর্মহাপথের একটি বাহু পণ্যকেন্দ্রের দিকে প্রসারিত। সেখানে পথপার্শ্বে অজস্র পণ্যবিপণী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপণী, শৌণ্ডিকাপণ। শেষোক্ত স্থানটি মদ্যপদিগের বেলেল্লাপনার স্থান নয়, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মাল্য-চন্দন-সৌগন্ধ্যির আয়োজন। একক পানের ব্যবস্থা। কোথাও বা দীর্ঘায়তন কক্ষে যৌথপানের আয়োজন। সেখানে দিবসান্তে সমবেত হন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ—শ্রেষ্ঠী, সওদাগর, রাজপুরুষেরা। আসেন শিল্পী, ভাস্কর, কবি, নাট্যকার। অক্ষবাটের পার্ষ্টির পার্শ্বপরিবর্তনে সেখানে শ্রেষ্ঠী ও অকিঞ্চন ভাগ্য বিনিময় করে। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এবং ভৃঙ্গারবাহিনী সুতনুকা পরিচারিকার দল বিলোল কটাক্ষের অনুপানসহ সরবরাহ করে চলে শূল্যপক্ব মেষমাংস এবং নানা জাতের মদিরা—গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বক, আম্রশীধু, প্রসন্না, আসব, অরিষ্ঠ, মধু শ্বেতসুরা, বারুণী, সোমরসিকা। ইদানীংকালের আসব-প্রেমিক 'আধারকার' যেমন এক এক পরিবেশে এক-এক পানীয়ের বিধান দেন, গুপ্তযুগের মদিরা-বিশেষজ্ঞও তেমনি এক-এক ঋতুতে এক

এক মধু-আস্বাদনের বিধান দিতেন : গৌড়ী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্ঠী হেমন্তবর্ষয়ে/ শরৎগ্রীষ্মবসন্তেষু মাধ্বী গ্রাহ্যা চ নান্যথা।।

পাটলীপুত্রের এই আনন্দঘন আয়োজন সম্বন্ধে অবশ্য ভিক্ষু তাও-চিং কোনো প্রত্যক্ষজ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি—তিনি আজন্ম সংযমী। প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালে ত্রিশরণ অবলম্বন মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "সুরা-মেরেয়-মেজ্জ-পমাদউঠানো বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি" ("সুরা-মেরেয়-মদ্যাদি প্রমাদ কারণ হতে আজন্ম বিরতির ব্রত গ্রহণ করিলাম;) ফলে তিনি মদ্যপান করেন না। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান শ্রুতি-নির্ভর। এই মহাসঙ্ঘারামের তরুণ ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র এ বিষয়ে তাঁকে পরোক্ষজ্ঞান সরবরাহ করেছিল মাত্র। বুদ্ধভদ্র সম্প্রতি উপসম্পদা নিয়েছে, এ সঙ্ঘারামেরই আবাসিক। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষ। তার জন্ম এক ধনবান শাক্যবংশে, বস্তুত স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের বংশেই তাঁর জন্ম। কৈশোরে এবং তারুণ্যের প্রথম পর্যায়ে পাটলীপুত্র আসবাগারে তার যাতায়াত ছিল।

শুধু আসব নয়, এ মহানগরীর যোষিতেরাও অতি বিচিত্রা। শেন্‌সি, হোনান, চাং-য়ান—বস্তুত সমগ্র হান-সাম্রাজ্যে তাও-চিং যে রমণীদিগকে দেখেছেন তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি ও প্রকৃতিতে। এরা কৃত্রিম কাষ্ঠপাদুকায় চরণদ্বয়ের বৃদ্ধিনাশে আদৌ উৎসাহী নয়, বরং রক্তবর্ণের আলিম্পনে বিচিত্রিত করে যুগলচরণ, তার উপরে পরিধান করে সপ্তস্বরনি : স্বনমধুর আভরণ—তার নাম নূপুর। অভিসার রাত্রিতে আবার নাকি খুলে রাখে সে আভরণ। এদের আননে লোধ্ররেণুর মৃদুপ্রলেপ, নয়নে কজ্জল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম-ইঙ্গুদীতৈলের বর্ণিকাভঙ্গ; কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা। হান-রমণীর ন্যায় এদের গণ্ডদ্বয় চেরীপুষ্পের মতো রক্তাভ নয়, অনিন্দ্য-আননে আষাঢ়-সঘন বুদ্ধভূমি-সুলভ শ্যামলিমার স্নিগ্ধছায়া। হান-কুমারীর মত এরা নিত্যলাজনম্রনয়না নয়—ভ্রূবিলাসাভিজ্ঞা নাগরিকার দল ক্ষণেক্ষণেই কলহংসনিঃস্বনমুখরা; এরা মদালসা, নিপুণিকা, চতুরিকা, কৌতুকপরায়ণা রসিকার দল।

না, মাধ্বীর ন্যায় পাটলীপুত্রী মধুমিতাগণের বিষয়েও আজন্ম-ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিং কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারেননি; প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে এ বিষয়েও তাঁর প্রতিজ্ঞা করা আছে—"নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদম্‌সনা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি, অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং মমাদিয়ামি" ("নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং কৌতুকাদিদর্শন হতে বিরতি, অব্রহ্মবর্য হতে বিরতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম)—ফলে এ বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা পরোক্ষ, শ্রুতিনির্ভর। তরুণবয়স্ক ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সদ্যত্যক্ত সংসারাশ্রমের স্মৃতিকথা।

কিন্তু তৃতীয় একটি বিষয়ে কবি তাও-চিং গুপ্তযুগের মধু রসাস্বাদন প্রত্যক্ষভাবে করেছেন। সাহিত্য-কাব্য-নাটক। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র তাঁকে সরবরাহ করত সদ্যলিখিত কাব্যের অনুলিপি। সে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর—চীনা কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা গুপ্তযুগের সংস্কৃত কাব্য সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। কৌতুক বোধ করতেন ভিক্ষু তাও-চিং। তিনি তর্ক করতেন ঐ ভারত-ঐতিহ্যাভিমানী তরুণের সঙ্গে। বলতেন, না, গুপ্তকবিরা যে মন্দ লেখেন একথা বলা চলে না, তবে চৈনিক কবিকুলের সমকক্ষ হওয়ার এখনও অনেক বাকি।

ক্ষুব্ধ হতো বুদ্ধভদ্র। মর্মাহত হতো। সবিনয়ে বলত, হয়তো তার হেতু সংস্কৃত ভাষাটা আপনার ঠিকমত আয়ত্ত হয়নি, তাই—

—সে কথা অস্বীকার করি না; তবু তুলনামূলক বিচারে বলব, ভাষার অতিরিক্ত ভাবের রাজ্যেও চৈনিক কাব্যের মাধুর্য অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। ধর না কেন, যে কাব্যগ্রন্থটি তুমি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে—সেই বিবাহিত গোপবালার সঙ্গে বংশীবাদক গোপালকের অবৈধ প্রেম-কাহিনী। এই বিষয় নিয়ে দ্বিশতাধিকবর্ষ পূর্বে জনৈক চৈনিক কবি লিখেছিলেন "গোপালক ও তন্তুবায়-কুমারীর কাব্য"; তফাৎ এই যে, চীনা নায়কও রাখাল বটে, কিন্তু চীনা-নায়িকা তন্তুবায় পরিবারের কুমারী-কন্যা। সেখানেও নায়িকা ঐ রাখাল নায়কের বংশীধ্বনি শুনে ঘর ছেড়ে পথে নামতেন। আরও প্রভেদ আছে; চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পথে মূল বাধাটা শাশুড়ী-ননদিনী বা সমাজ নয়; সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার—পুরুবীয়া হান-যুগের সামাজিক অবস্থাটা সেখানে অনেক ভালভাবে ফুটেছে—

বুদ্ধভদ্র বলে, প্রেম যেখানে উপজীব্য সেখানে সামাজিক সমস্যা প্রতিফলিত হল কি হল না সেটা

গৌণ। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় বিরহের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। এমন কিছু কি চীনা সাহিত্যে আছে?

—আছে। কবি চিন-চিয়ার কথা বলি। রাজাদেশে কবিকে দূরদেশে যেতে হল। সেখান থেকে প্রেয়সীকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে বিরহের যে চিত্র পাই তা অকৃত্রিম। কবি বিদেশ থেকে লিখছেন :

"পুরুষ মানুষের সৌভাগ্য—যেন ভোরবেলাকার শিশির,
দুর্ভাগ্য তার নিত্যসঙ্গী, বিরহবেদনা তার নিত্যসহচর।
মিলন-মধুর মুহূর্ত ? সে তো সুদুর্লভ প্রাপ্তি।
আদেশ পেলেম—রাজাদেশে যেতে হবে ভিন্‌দেশে;
দূরে আরও দূরে, তোমার সঙ্গে ব্যবধান দীর্ঘায়ত করে।
পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার রথ
যাবার আগে একবার তোমাকে দেখব বলে।
গেল শূন্যগর্ভ, ফিরেও এল রিক্ত-শকট।
রিক্ত নয়, এল তোমার অন্তর-নিঙরানো আর্তি।
আহারে আজ রুচি নাই,
একা পড়ে আছি শূন্য মন্দিরে।
ত্রিযামা যামিনী যায় বিনিদ্র যন্ত্রণায়;
উপাধানটা নিষ্পেষিত, বিপর্যস্ত।
বেদনা যেন বৃত্তাকার : তার চক্রবর্তন অন্তহীন।
মাদুরের মতো তাকে গুটিয়ে শেষ করা যায় না।"

সহজ সরল বক্তব্য। শেষ কয়টি পংক্তিতে কবি লিখছেন—

"পড়ে আছে মাথার কাঁটাগুলি,
যারা একদিন মুখ লুকাতো তোমার খোঁপায়।
পড়ে আছে অনাদৃত দর্পণ,
যা একদিন ছবি আঁকত একটি অনিন্দ্য আননের।
অমূল্য সম্পদ এরা নয়,
তবু এরা নয় অকিঞ্চন।
এদের মধ্যেই আছে তোমার স্মৃতি
আর আমার আকিঞ্চন।।[13]

বুদ্ধভদ্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়—এ গীতিকবিতাও অনবদ্য।

তাও-চিং বলেন, তফাৎ আরও আছে। আমাদের কবিপ্রিয়াও ছিলেন স্বয়ং কবি। প্রোষিতভর্তৃকা কবি-প্রিয়া এ পত্রের যে ছন্দোবদ্ধ প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি—না, বুদ্ধভদ্র, তেমন কোন কবিতাও আমি সংস্কৃত সাহিত্যে পাইনি :

"তোমার মুখখানা মনে পড়ছে ক্রমাগত
জাগরণে-নিদ্রায়-স্বপ্নে।
বারম্বার মনে পড়ছে : তুমি চলে গেছ!
সে বুঝি কোন যুগ-যুগান্তর অতীতের কথা।
যদি ডানা থাকত এক জোড়া
মেঘের মতন ভেসে যেতাম তোমার কাছে।
এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলেই আমার সান্ত্বনা।[14]

লক্ষ্য করে দেখ বুদ্ধভদ্র—কোথাও অতিশয়োক্তি নেই। কালো তমালবৃক্ষ দেখে উদ্বন্ধনে অথবা কালো যমুনার জল দেখে জলমগ্ন হয়ে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ নেই। সহজ-সরল বক্তব্য।

বুদ্ধভদ্র বলে, আশ্চর্য! মেঘের মতন?

—হ্যাঁ, মেঘের মতন। এতে অবাক হওয়ার কী আছে!

বুদ্ধভদ্র বলে, ভদন্ত, ঐ 'মেঘের মতন' শুনে আমার আর একটি সম্প্রতিলিখিত কাব্যের কথা মনে পড়ল। আপনি সেটি বরং পড়ে দেখুন—

উৎসাহী তরুণ অতঃপর তাঁকে এনে দিয়েছিল একটি সাম্প্রতিক কাব্য। উজ্জয়িনীর এক উদীয়মান কবির সদ্যসমাপ্ত কাব্য। জনৈক শাপগ্রস্ত যক্ষ তার প্রেয়সীর নিকট মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপকটি। এ কী অপূর্ব কাব্য! শব্দ প্রয়োগের কী বিচিত্র মুনশিয়ানা, মন্দাক্রান্তা ছন্দের কী জলদগম্ভীর ব্যবহার, অক্ষরে-গাঁথা কী অক্ষয় চিত্র! স্থানে স্থানে অবশ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে অর্থগ্রহণ ব্যাহত হচ্ছিল; তবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু তাও-চিং। কবির মেঘ যে পথে যাত্রা করেছে উজান পথে তিনি যে সেই সব দেশ দেখতে দেখতেই এসেছেন। মানস সরোবর নয়, তারও উত্তরে অবস্থিত ইশ্‌ক্-কুল হ্রদে তিনি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন স্বচ্ছশীতল জলে গণনাতীত প্রস্ফুটিত পদ্ম, আর সেই বনে সপার্ষদ গজরাজের জলকেলি—"হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ কুর্বন্ কাম ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিমৈরাবতস্য।" কে এই অখ্যাতনামা কবি? উজ্জয়িনীর ভট্ট কালিদাস? বুদ্ধভদ্র বলেছে—মাত্র সপ্তবিংশতি বৎসরের এই ব্রাহ্মণ কবি উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ রত্ন; বর্তমানে তিনি নাকি রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় এই পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। ভিক্ষু তাও-চিং ভিন্ন পথের পথিক; তবু তিনি নিজেও যে একসময়ে চীনা ভাষায় গীতিকবিতা রচনা করেছেন। স্থির করেন, পাটলীপুত্র ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে ঐ উদীয়মান কবির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কিন্তু সেকথা স্বীকার করলে বুদ্ধভদ্রের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়! কৌতুকপ্রিয় ভিক্ষু তাই এক তির্যকপন্থা অবলম্বন করলেন।

দিনকতক পরে বুদ্ধভদ্র যখন এসে প্রশ্ন করে, 'মেঘদূতম্ আপনার কেমন লাগল?' তখন তাও-চিং কোন উৎসাহ না দেখিয়ে সংক্ষেপে শুধু বললেন, মন্দ নয়। তবে কাব্যের মুখবন্ধে কবি যদি চৈনিক কবিদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেন তাহলেই শোভন হত।

বুদ্ধভদ্র বলে, কী বলছেন আপনি ভদন্ত ! তার অর্থ?

—এ তো কোন মৌলিক কাব্য নয়। মেঘকে দূত হিসাবে কল্পনা করার যে ব্যঞ্জনা সেটি তো কবি স্পষ্টতই চীনা সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন—

—ঐ চিন-চিয়ার একটি পংক্তির উল্লেখ থেকে ?

—না। অসংখ্যবার ঐ প্রতীকটি চীনা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

—কিন্তু কবি কালিদাস চীনা কাব্য কোথায় পাবেন?

—সম্ভবত কোনও পর্যটক অথবা সার্থবাহের কাছে।

—কিন্তু তিনি ঐ চীনাকাব্য পাঠ করবেন কী করে?

—সেকথা কবিই বলতে পারেন। আমি নই।

অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে বুদ্ধভদ্র। সে স্পষ্টতই মর্মাহত। তারপর বলে, ভদন্ত, সাহিত্যে আমার অধিকার সামান্যই; কিন্তু এতবড় অভিযোগ যখন আপনি এনেছেন, তখন এ প্রতর্কের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আমি কাল সন্ধ্যায় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে নিয়ে আসব। আপনি তাঁকে প্রমাণ দিন 'মেঘদূতম্' মৌলিক কাব্য নয়।

কৌতুকপ্রিয় তাও-চিং বলেন, বিতর্কের কী প্রয়োজন বুদ্ধভদ্র! তোমাদের কবি তো শুনেছি বর্তমানে পাটলীপুত্রেই অবস্থান করছেন। তাঁকেই বরং জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সর্বসমক্ষে নয়—

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বুদ্ধভদ্র বলে, তাঁকে তো বলবই। হ্যাঁ, আমি তাঁর ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপও আছে। সে যা হোক, কাল সন্ধ্যায় আমি আসব।

পরদিন সন্ধ্যায় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র একজন তরুণ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে। অপরাহ্নকাল। ভিক্ষু তাও-চিং সঙ্ঘারামের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের একপ্রান্তে একটি সপ্তপর্ণী বৃক্ষচ্ছায়ায় কী একটা গ্রন্থ পাঠ করছিলেন। আগন্তুককে নিয়ে বুদ্ধভদ্র তাঁর নিকটস্থ হতেই তিনি চোখ তুলে চাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম আনুমানিক ত্রিংশতিবর্ষ। গাত্রবর্ণ চম্পকগৌর নয়, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের আকাশের মতো দীর্ঘ সন্নত শ্যামকান্তি যুবাপুরুষ। ঋজু শালবৃক্ষের মতো সতেজ। প্রশস্ত ললাট, শুকচঞ্চু নাসা, কম্বুগ্রীব। ঊর্ধ্বাঙ্গে চীনাংশুক উত্তরীয় এবং শ্রীফলরস-সম্মার্জিত শুভ্র উপবীত। কণ্ঠে একটি যূথিমাল্য। মস্তক মুণ্ডিত, পশ্চাদ্ভাগে অর্কশিখায় একটি রক্তকরবী অনুবিদ্ধ। ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের মাঙ্গলিকী। সর্বাবয়বে প্রতিভার স্বাক্ষর। তাও-চিং দর্শনমাত্র অনুভব করেন—আগন্তুক নিঃসন্দেহে কবি কালিদাস স্বয়ং।

বয়োজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধশ্রমণের সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানিয়ে আগন্তুক দণ্ডায়মান হলেন।

তাও-চিং আসন ত্যাগ করে দুই হস্ত উত্তোলন করে বললেন, আরোগ্য।

বুদ্ধভদ্রের দিকে ফিরে বললেন, অতিথির জন্য একটি মৃগচর্মাসন নিয়ে এস বৎস।

আগন্তুক বলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না ভদন্ত। এ আশ্রমের পবিত্র ধূলিস্পর্শ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তাছাড়া স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেছেন, ভূমিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আসন।

উভয়েই উপবেশন করেন। আগন্তুক বলেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য। ইতিপূর্বে চীন দেশের কোন মানুষ আমি দেখিনি। আপনি তো সুন্দর সংস্কৃত বলেন।

তাও-চিং বলেন, মহাশয়ের পরিচয়?

—উল্লেখযোগ্য কিছুই নই। আমি একজন ভারতীয় দীন কবি। ব্রাহ্মণ। উজ্জয়িনীর কবি ভট্ট কালিদাস আমার অভিন্নহৃদয়। ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রও তাঁর গুণগ্রাহী। তাঁর কাছে শুনলাম, আপনি কালিদাসের একটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি পাঠ করেছেন—'মেঘদূতম'। আপনার মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবহিত হলে কবিকে জ্ঞাপন করতে পারি।

'অভিন্নহৃদয়' স্বীকারোক্তি থেকেই তাও-চিং নিঃসন্দেহ হলেন—আগন্তুক স্বয়ং কালিদাস। বললেন, আমার মতামত তো ইতিপূর্বেই ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রকে জ্ঞাপন করেছি। সে কিছু বলেনি?

—বলেছে। আপনি নাকি এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, কালিদাস কোনো চীনাকাব্য অনুকরণে এ কাব্যটি রচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের দুরন্ত কৌতূহল। চীনা কাব্যেও কি বিরহী নায়ক মেঘকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেছিল?

—পরিকল্পনাটা একই রকম, যদিচ তার বিস্তারটা বিভিন্ন। বারিদকে দূত হিসাবে প্রেরণ করার যে চিত্রকল্প সেটি একাধিক চীনা কবিতায় আছে। প্রথম উদাহরণ চু-য়াং-এর একটি ছোট্ট গীতি-কবিতা। 'বিরহ' তার নাম। কবি বলছেন :

"নির্জনে বসি বিরহবিধুর সুরে
গাহি গান, চাহি অসীম দূর আকাশে,
কোথা পাব দূত গৃহ হতে অতি দূরে
কেমনে পাঠাব বার্তা প্রিয়ার পাশে?

....

'পুষ্করমেঘে বৃথা তোষামোদ করি
যাচ্ঞা আমার মোঘা হে নিঠুর মেঘ।
দূর হতে ঐ বিহগে যখন স্মরি
হেসে ভেসে যায় ওরা বিদ্যুৎবেগ।।"[15]

আগন্তুক সবিস্ময়ে বলেন, আশ্চর্য! জড়বস্তু মেঘকে প্রাণবন্ত বলে কল্পনা করে কোন চৈনিক কবি যে তাকে দূত হিসাবে প্রেরণের কথা ভেবেছেন তা তো আমার জানা ছিল না।

তাও-চিং পরিস্থিতিটা উপভোগ করছেন। কৌতুকপ্রিয় চীনা কবি হাস্য গোপন করে বলেন, আপনার হয়তো জানা ছিল না। আমার ধারণা আপনার অভিন্নহৃদয় বয়স্যের হয়তো ছিল। অবশ্য 'অভিন্নহৃদয়' শব্দটা হয়তো এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হচ্ছে না। তারপর দেখুন, চু-য়াং-এর পরবর্তী যুগের বিখ্যাত কবি লি-সাও একটি দীর্ঘায়ত গীতি কবিতায় একই চিত্রকল্প ব্যবহার করছেন। এবারে কবি বলছেন :

"পূর্বাচলে গিয়েছিলেম মরকতের পুরে
হরিৎ-শোভায় খুঁজেছিলাম প্রিয়ার কণ্ঠহার,
বলেছিলেম, 'ঝরাপাতার দিনের আগেই তোরা
অনিন্দ্য সে তন্বী-তনু সাজিয়ে তুলিস্ তার।'
মেঘরাজে বলি, 'খুঁজে দেখুন গগনপথে
মন্দাকিনীর কোন্ বাঁকেতে অপ্সরী মোর আছে।'
পান্নাগাঁথা কোমরবন্ধ দিয়েছিলেম খুলে
দৌত্যকাজে অস্বীকৃত হয় যদি সে পাছে।
খেয়ালী ঐ মেঘের মতো চপলচরণ প্রিয়া
খেয়ালখুশির পাগলামি যার নাইক অবশেষ—
সাঁঝের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে কোন্ পাহাড়ের কোলে
ভোরবেলা ফের ঝরনাধারে ঝাড়ে চিকুর কেশ।।"[16]

বিস্ময়-বিমূঢ় আগন্তুক আপনার অজ্ঞাতসারেই আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হন। বলেন, বিশ্বাস করুন, মহাভাগ! 'মেঘদূতম্' রচনার পূর্বে এসকল কাব্য আমি পাঠ করিনি।

তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হন বৃদ্ধ তাও-চিং। কবিকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠেন, বিশ্বাস করেছি, কবি। কারণ এতক্ষণে যে তুমি ধরা দিয়েছ ভাই! আমি সন্ন্যাসী, ভিন্ন পথের পথিক, তবু তোমার কাব্যপাঠে আমি এতটা অভিভূত যে এই 'বক্রঃপন্থায়' তোমাকে উদ্ধার করলাম।

কবি নিরতিশয় লজ্জিত। উত্তেজনা-মুহূর্তে তিনি আত্মপরিচয় ঘোষণা করে বসে আছেন!

তাও-চিং বলেন—মেঘকে তুমি বলেছিলে 'বক্রঃপন্থায়' উজ্জয়িনী সন্দর্শন করে যেতে, নাহলে তার নয়নই নাকি বৃথা। পড়ে মনে হল সেই উজ্জয়িনীর বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোলাপাঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ যাঁকে কবীন্দ্র আখ্যায় ভূষিত করেছেন, বুদ্ধভূমিতে এসেও যদি তাঁকে দেখে না যাই তবে আমিও 'লোচনৈর্বঞ্চিতোহস্মি'!

কবি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, মহাভাগ! এমন করে বলবেন না।

—নিশ্চয় বলব। আমিই তো বলব। এতাবৎকাল তুমি স্বদেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু কবি! এ তো শুধু ভারতবর্ষের নয়, এ কাব্য যে বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। তাই বিদেশবাসী হিসাবে আমি যদি তোমাকে অভিনন্দিত না করি তবে আমার জীবনই মোঘা!

কবি যুক্তকরে নিমীলিত নেত্রে সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

তাও-চিং বলেন, কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। একই চিত্রকল্প ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে দুই ভিন্ন কবিকে অনুপ্রাণিত করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি কৌতুক করছিলাম মাত্র।[17]

মেঘদূত-কবির মনের মেঘ এতক্ষণে সরে যায়।

অস্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষু বলেন, প্রার্থনার সময় সমাগত। তুমিও কি আসবে আমাদের প্রার্থনা সভায়?

কালিদাস বলেন, নিশ্চয়ই। আপনাদের সঙ্গে একত্রে মহামানব তথাগতকে প্রণাম করা তো সৌভাগ্য।

তিনজনে অতঃপর সঙ্ঘারামের কেন্দ্রস্থ চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ভিক্ষু প্রার্থনা-সভায় ইতিমধ্যেই সমাগত হয়েছেন। মন্দিরটি প্রায় পঞ্চাশ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ। প্রস্থে বিশ হাত।

দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের কেন্দ্রস্থ প্রার্থনাস্থল ভক্তে পরিপূর্ণ। সকলেই মুণ্ডিত মস্তক, সকলেরই পীতবসন। মন্দিরের পশ্চাদভাগ বৃত্তাকার; সেই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে স্তূপটি নির্মিত—তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ পথ। স্তূপমধ্যে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধ—গুপ্তযুগের অনবদ্য ভাস্কর্য। বুদ্ধমূর্তির উপরে অণ্ড, তদুপরি ছত্রাবলীর সপ্তপর্ণী ও ত্রিরত্ন। স্তূপের দুই প্রান্তে দুটি একাদশমুখী দীপাধার। উজ্জ্বল আলোয় চৈত্যস্তূপ আলোকিত। ধূপের গন্ধে চৈত্যমন্দির আমোদিত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন প্রার্থনাসভা পরিচালনা করছেন। আগন্তুক তিনজন ভক্তসমাবেশের একান্তে আসন গ্রহণ করেন।

মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল। শ্রমণেরা সমবেতভাবে প্রণাম করলেন। পূজান্তে অন্যান্য ভিক্ষুরা নিজ নিজ পরিবেণে প্রত্যাগমন করলেন। চৈত্যমন্দির জনশূন্য হয়ে এলে তাও-চিং কবিকে নিয়ে এলেন ফা-হিয়েনের সন্নিকটে। পরিচয় করিয়ে দিলেন উভয়ের। কালিদাস প্রণাম করলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে। পরিব্রাজক বললেন, আপনার নাম শুনেছি। প্রীত হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তবে আমি ভিন্ন পথের পথিক। কাব্য পাঠ করি না। তা হোক, আমার সঙ্গী তাও-চিং কাব্যসাহিত্যের একজন বোদ্ধা।

কথা বলতে বলতে ওঁরা মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হলেন। ততক্ষণে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে শান্ত আশ্রম-উদ্যান এক রূপালী উত্তরীয়ে আবৃত। মৃদুমন্দসমীরে উদ্যান-পুষ্পের সৌগন্ধ্য কালাগুরু সৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কালিদাস বৃদ্ধ পরিব্রাজককে প্রশ্ন করেন, ভগবন, আপনি অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, কৈলাসশিখরের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে এদেশে এসেছেন। দুর্লভ আপনার অভিজ্ঞতা—পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমালয় পর্বত, সিন্ধু-গঙ্গার ন্যায় নদ-নদী, গোবির ন্যায় মৃত্যুস্বরূপিণী মরুভূমি অতিক্রম করেছেন। অনুগ্রহ করে বলুন, কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যে আপনি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছেন?

বৃদ্ধ বললেন, কবি, আমি তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিনি—আমি যে অপ্রাকৃতের সন্ধানে এ তীর্থযাত্রায় এসেছি!

অধোবদন হলেন কবি। বোধ করি ব্যথিত হলেন। পরিব্রাজক তখনও বলছেন, আমি এসেছিলাম মহাকারুণিকের লীলাক্ষেত্র দর্শন করে ধন্য হতে। আমি ধন্য। তবে 'অভিভূত' হওয়ার প্রসঙ্গই যখন উঠল তখন বলি—এই দীর্ঘ পদযাত্রায় দুইবার আমি অত্যন্ত অভিভূত হই। প্রথমত, বৈশালী নগরপ্রান্তে আম্রপালীর জনমানবহীন অরণ্যে এবং দ্বিতীয়ত, রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতচূড়ায় এক নির্জন রাত্রে। শেষোক্ত স্থানে আমি সমস্ত রাত্রি সম্পূর্ণ একাকী সুরঙ্গম 'সূত্র' গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করেছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক এবং সঙ্গীরা নিষেধ করেছিল—জনমানবহীন অরণ্যে একাকী রাত্রিবাস তারা অনুমোদন করেনি। আমি তাদের নিষেধ শুনিনি। সেই রাত্রেই আমার পরম প্রাপ্তি ঘটেছে। সে যে কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমি ভাষায় ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

—আর বৈশালী নগরপ্রান্তে সেই আম্রপালী কাননে?

—সে অভিজ্ঞতাও ব্যাখ্যার অতীত। মহাভিক্ষুণী আম্রপালীর কাহিনী মিলনান্তক। ঘৃণিত জীবন থেকে, নগরনটীর পদ থেকে তাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে—মহাকারুণিকের আশীর্বাদে। অথচ আশ্চর্য! তাঁর নামাঙ্কিত বিহারের ধ্বংসস্তূপের একান্তে বসে আমি সেদিন অকারণ অশ্রুপাত করেছিলাম। অহৈতুকী দুর্মনস্যতায় আমি যে অভিভূত হয়েছিলাম তাও ব্যাখ্যার অতীত।

বৃদ্ধ নীরব হলেন। নৈঃশব্দ ঘনিয়ে আসে। ও প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা অশোভন হবে বিবেচনা করে কবি প্রসঙ্গান্তরে আসেন। যেন বিশেষ করে ভিক্ষু তাও-চিংকে উদ্দেশ্য করেই বলেন, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দিন। আমি বর্তমানে যে কাব্যটি রচনা করছি তার নাম 'কুমারসম্ভবম্'। স্বয়ং মহাদেব এ কাব্যের নায়ক, পার্বতী তথা উমা নায়িকা। কাব্যের বিষয়বস্তু এই রকম—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ দেবগণ ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, মহেশ্বরের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে এক অমিতবিক্রম পুত্রের জন্ম হবে—সেই পুত্র, 'স্কন্দ', তারকাসুরকে সংহার করবেন। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব তখন ধ্যানমগ্ন, এদিকে সতী হিমালয়দুহিতা উমারূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্তা হওয়ার পরে যখন মহেশ্বরের তপস্যাভঙ্গ হল না তখন দেবগণ মদনকে প্রেরণ করলেন। মদনের প্রচেষ্টায় মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হল বটে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত হরের তৃতীয়নয়নজাত বহ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। মহাদেব

যখন তপোভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন আশাহতা উমা কঠিন তপশ্চর্যা শুরু করলেন। পরিশেষে উমার তপস্যায় প্রীত হয়ে মহেশ্বর তাঁর সমীপবর্তী হলেন। নায়ক-নায়িকার বিবাহ হল।

দীর্ঘ কাব্যের চুম্বকসার ব্যক্ত করে কবি নীরব হলেন।

তাও-চিং বললেন, সমস্যা তো একটি মাত্র দেখা যাচ্ছে .... কন্দর্প যদি ভস্মীভূত হয়ে থাকেন তাহলে 'কুমারসম্ভব' হয় কী প্রকারে?

কবি বলেন, আজ্ঞে না। সমস্যা সেটা নয়। সপ্তম সর্গে আমি হর ও পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা করেছি এবং জানিয়েছি যে, মদনপত্নী রতির বিলাপে মর্মাহত মহাদেব মদনকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

ফা-হিয়েনের মুখাকৃতি দেখে আশংকা হয়—তিনি এ সংবাদে মর্মাহত।

তাও-চিং বলেন, তাহলে আপনার সমস্যা কিসের? প্রশ্নটা কী?

—আমার প্রশ্ন—কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে আমার কাব্য কি শেষ হয়েছে?

—অবশ্যই হয়েছে!

—কিন্তু এ-কাব্যে নাম-ভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথা তিনি যে এখনও অনাগত।

—অনাগত হলেও তিনি অবশ্যম্ভাবী। প্রথম কথা, আপনার নায়ক এবং নায়িকা হিন্দুদিগের জগৎপিতা ও জগন্মাতা—তাঁদের দাম্পত্য-জীবন-বর্ণনা গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে; দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সর্গ বাগ্‌বাহুল্যদুষ্ট হবে। কাব্য কিছু আভাস, কিছু ইঙ্গিতেই শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি বলেছেন—নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের অনুরক্ত, বলেছেন কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত এবং নায়ক ও নায়িকাকে এই অবস্থায় আপনি নির্জন বাসরঘরে প্রেরণ করেছেন। এর অনিবার্য পরিণাম সহজবোধ্য।

কবি কিছু বলার পূর্বেই ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলে ওঠেন, মার্জনা করবেন আপনারা, আমি কিন্তু একমত হতে পারলাম না। আমি অবশ্য কাব্যশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ—হয়তো সেজন্যেই আমি ঐ অনিবার্য পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারিনি।

কবি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মহাঅর্হৎ ফা-হিয়েন আজন্ম-ব্রহ্মচারী, সমাজবদ্ধ লৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এ-ক্ষেত্রে 'অনিবার্য পরিণাম' শব্দের যে ব্যঞ্জনা, তা তাঁর বোধগম্য না হতে পারে। ভিক্ষু ফা-হিয়েন বলেন, কবি, আপনার গল্পটি শুনলাম। এবার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লব্ধ একটি কাহিনী বলি। বাস্তব ঘটনা।

—বলুন মহাভাগ?

—আমার কাহিনীর নায়ক একজন মুমুক্ষু কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, যিনি সদ্ধর্ম গ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার পথে যাত্রা করেছেন, নায়িকা মধ্য এশিয়ার এক জনপদের অনিন্দ্যকান্তি কুমারভট্টারিকা। তুলনা করে বলা চলে—আমার নায়কও মদনকে ভস্ম করেছেন, আমার নায়িকাও হিমালয়দুহিতা রাজকন্যা।

এরপর কথাকোবিদের দক্ষতায় বৌদ্ধভিক্ষু বর্ণনা করতে থাকেন বুদ্ধযশা এবং অক্ষুমতীর অনুরাগঘন কাহিনী—তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ, শৈলদেশবিহারে বুদ্ধযশ-এর উত্তরীয় প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। প্রত্যাবর্তনের পথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে থাকেন—যেন কুমারজীবের কথিত কাহিনীর তিনি শ্রুতিধর। এরপর ভূমিকম্প এবং নির্জনগুহায় নায়ক-নায়িকার রাত্রিবাসের আয়োজন। বুদ্ধযশা সলজ্জে স্বীকার করলেন অক্ষুমতীর কাছে—একই শয্যায় নির্জন গুহাভ্যন্তরে রাত্রিযাপনে তাঁর সাহস নেই। তুষারপাত অগ্রাহ্য করে প্রহরায় রইলেন গুহামুখে। তারপর মধ্যরাত্রে গুহাভ্যন্তরে আর্ত গুমরানি শুনে তিনি প্রবেশ করলেন সেই বায়ুশূন্য অন্ধকূপে। দেখলেন—বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে রাজকন্যা মৃতপ্রায়। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রমণ নিরুপায় হয়ে রাজকন্যার অধরোষ্ঠ বিমুক্ত করে নিজ মুখ প্রবিষ্ট করালেন—ফুৎকারে প্রাণবায়ু দান করলেন। লক্ষ্য করলেন—দৃঢ়বদ্ধ কঞ্চুলিকার জন্য মূর্ছাভিভূতা অনাঘ্রাতা ষোড়শীর রক্ষ বিস্ফারিত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনায়াসে তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন তার বক্ষাবরণ, চীনাংশুক কঞ্চুলিকা। জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলেন পূর্ণযৌবনা নারীর কুঙ্কুম-চন্দনচর্চিত যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিত হয়ে উঠলেন বৌদ্ধভিক্ষু।

স্তব্ধ হলেন মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন। জ্যোৎস্নালোকিত উদ্যানভূমিতে নেমে এল নৈঃশব্দ।

কালিদাস অধীর হয়ে বললেন, তারপর?

—তারপর তো আর নেই কবি। আমার কাহিনী তো এখানেই শেষ।

—সে কী! এস্থলে কাহিনী কী করে শেষ হবে?

—কেন হবে না? আমি অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি করেছি, নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, বলেছি গিরিমেখলবাহন পুনরুজ্জীবিত, বলেছি সেই রাত্রির তৃতীয় যামে নির্জন পার্বত্যগুহার ত্রিসীমানায় কোন মর-মানুষ নেই। এরপর কিছু বলা কাব্য-কলা-সঙ্গত ন্যায়ে বাগ্‌বাহুল্যদোষে দুষ্ট হবে না কি?

কবি এবং তাও-চিং দীর্ঘ সময় নীরব রইলেন। অবশেষে কবি বললেন, আপনার বক্তব্য প্রণিধান করেছি প্রভু। অতঃপর কাহিনীটি সমাপ্ত করুন।

মৃদু হাসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, শুনুন।

আদ্যন্ত সমস্ত কিছুই বর্ণনা করলেন। বুদ্ধযশ ও অক্ষুমতীর উপসম্পদা গ্রহণ, অক্ষুমতীর অপহরণ, হূণ সেনাপতির দ্বারা ধর্ষণ এবং তার উপপত্নী হিসাবে ঘৃণিত জীবনের উপাখ্যান। স্বীকার করলেন—কীভাবে অক্ষুমতী বিষপানে আত্মহত্যা করতে অস্বীকার করেন। অবশেষে জানালেন—কীভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ভারতবর্ষে এসে কাহিনীর নায়ককে জানিয়েছেন। এখানেই দ্বিতীয়বার কথ্যকাব্য শেষ হল।

জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির দিকে দৃষ্টি মেলে কবি কালিদাস উদাসীনভাবে বসে রইলেন। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। অক্ষুমতী ও বুদ্ধযশার ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর বেদনা তাঁর অনুভূতিপ্রবণ অন্তরে শেলের মত বিদ্ধ হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলে তিনি দণ্ডায়মান হলেন। উত্তরীয়প্রান্তে চক্ষু মার্জনা করে বললেন, অনুমতি করুন মহাভাগ। রাত্রি গভীর হয়েছে।

ভিক্ষু তাও-চিংও কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ ছিল জ্যোৎস্নালোকিত দূর দিগন্তে। কবির কথা বোধকরি তাঁর কর্ণগোচর হল না। অন্যমনস্কের মত বললেন, কোনটা বরণীয়? কাব্যের সত্য, না জীবনের সত্য?

কবি বললেন, জীবনের জন্যই কাব্য, কাব্যের জন্য জীবন নয়।

কাহিনী সমাপ্ত করে ফা-হিয়েনও আত্মমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এসব কথোপকথন হয়তো তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি। সহসা অপ্রাসঙ্গিক একটি কথা বলে উঠলেন তিনি, কবি! এবার আপনি আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দেবেন?

কবি বলেন, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য কবি। আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি প্রভু?

—আপনার কবির দৃষ্টি নিয়ে। আপনি বলতে পারেন—অকল্যাণকারী সত্য এবং কল্যাণকারী মিথ্যা—এর মধ্যে কোন্‌টি বরণীয়?

—কল্যাণ ও অকল্যাণ শব্দদ্বয় আপেক্ষিক—সত্য ও মিথ্যা তা নয়।

—অর্থাৎ?

—সত্য কখনও অকল্যাণকারী হতে পারে না—দৃষ্টিবিভ্রমে মিথ্যা মরীচিকাকে কল্যাণকারী বলে ভ্রম হয়। সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

সে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে চারজনই সিদ্ধান্তে এলেন। ব্যক্তিগত জীবনের মৌলিক সিদ্ধান্ত।

ভিক্ষু তাও-চিং সিদ্ধান্তে এলেন—এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতেই বাকি জীবন অতিবাহিত করবেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না। তিনি ভারতীয় হয়ে যাবেন।

বুদ্ধভদ্র সিদ্ধান্তে এলেন—সদ্ধর্ম প্রচারে এই পরিব্রাজকদের মতো তিনিও মহাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন—ফা-হিয়েনের সঙ্গে যাত্রা করবেন চীনের উদ্দেশে।

ফা-হিয়েন শয্যাগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনা করলেন : হে লোকজ্যেষ্ঠ! তোমার স্বদেশবাসী কবির কণ্ঠে তুমি সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছ। যে অন্যায় করেছি মহাজ্ঞানী কুমারজীব এবং মহাস্থবির বুদ্ধযশার প্রতি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ আমাকে দিও। কবির কণ্ঠে তোমারই কণ্ঠস্বর আজ শুনেছি : সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।

শুধু সেই চৈত্যমন্দিরে উপস্থিত চতুর্থ ব্যক্তিটি আদৌ শয্যাগ্রহণ করলেন না। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি অতিক্রম করে যখন নিজ আবাসে উপনীত হলেন তখন মহাকালের মন্দিরে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে। রজনী নিস্তব্ধ। পাটলিপুত্র নগরী সুষুপ্ত, শুধু অতন্দ্র প্রহরায় জেগে আছে

শুক্লচন্দ্র। কবি দেখলেন, পরিচারক তাঁর আহার্য সাজিয়ে রেখে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আহার্যে তাঁর রুচি ছিল না। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তিনি তাঁর চিহ্নিত আসনে বসলেন। প্রদীপদণ্ডটি নিকটতর করলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা আমাকে মার্জনা কর। আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম—তারকাসুর এখনও এ ধরাধামে একছত্র—এখনও সে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে! হূণ সেনাপতিরূপে তাকে আজ প্রত্যক্ষ করেছি। তার নিধনের আয়োজন না করে আমার মুক্তি নাই। মহাসন্ন্যাসীর মাধ্যমে তোমার নির্দেশ পেয়েছি প্রভু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে কবি লিখতে শুরু করলেন :

অষ্টমঃ সর্গঃ

'পাণিপীড়নবিধেরণন্তরম্ শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি—'

পাটলিপুত্র-অটবীবিহার-পারাবতবিহার-বারাণসী!

মহাযান-বিহারে ফা-হিয়েন ছয় সহস্র শ্লোক-সমন্বিত 'সংযুক্তাভিধর্ম হৃদয় শাস্ত্রী' এবং তা ছাড়া নির্বাণ সূত্র, বৈপুল্য পরিনির্বাণ সূত্র, মহাসংঘিকাভিধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পান। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তিনি ঐ সব অমূল্য গ্রন্থের একটি করে অনুলিপি প্রণয়ন করেন—স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তাও-চিং ভারতবর্ষেই তাঁর শেষ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ফা-হিয়েন একাকীই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করেন।

পাটলিপুত্র-বুদ্ধগয়া-চম্পানগর-তাম্রলিপ্ত।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রবর্তী সমতটের এক বৃহৎ বন্দর। মধুকর-সপ্তডিঙা-মকরমুখী-ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি অর্ণবপোতে বন্দর আকীর্ণ। ফা-হিয়েন এখানে দ্বাবিংশটি বিহার প্রত্যক্ষ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এখানেও তিনি দুই বৎসরকাল নানা সূত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং অগণিত বুদ্ধমূর্তির প্রতিকৃতি করিয়ে নেন।

তারপর বর্ষা-অন্তে এক শারদপ্রাতে বিরাট এক সওদাগরী অর্ণবপোতে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন—সাত শত যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করে একপক্ষকাল পরে উপনীত হলেন ভারতচরণ-চুম্বনরত সিংহল দ্বীপে। এখানেই অনুরাধাপুরে থুপারাম স্তূপ। সিংহলে পরিব্রাজক দীর্ঘ তিন বৎসর কাল বসবাস করেন। বিনয় পিটকের দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম ও সন্নিপাতসূত্রের অনুলিপি করে একদিন যাত্রা করলেন পূর্ব দিকে—শ্রীবিজয়ের পথে। শ্রীবিজয় অর্থে যবদ্বীপ। তিন মাস পরে উপনীত হলেন যবদ্বীপে।

পাঁচ মাস সেখানে অবস্থানের পর একদিন চীনযাত্রী এক সওদাগরী জাহাজে রওনা হলেন।

এই সমুদ্রযাত্রায় তিনি প্রচণ্ড ঝটিকার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভার-লাঘবের উদ্দেশ্যে নাবিকেরা যাত্রীদিগের যাবতীয় মালপত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফা-হিয়েন তাঁর বহু ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে থাকেন। প্রধান নাবিক যখন ফা-হিয়েনের অমূল্য গ্রন্থগুলি নিক্ষেপের জন্য অগ্রসর হল তখন বৃদ্ধ তার হাত দুটি ধরে বলেছিলেন—ওগুলির পরিবর্তে আমি স্বয়ং সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ছি। এ অর্ণবপোত চীনে যদি আদৌ উপনীত হয় তাহলে ঐ গ্রন্থগুলি চাংয়ান মহাবিহারে প্রেরণ করবেন।

সৌভাগ্যবশত ফা-হিয়েনকে আত্মদান করতে হয়নি। তাঁর অমূল্য সম্পদও অক্ষত ছিল। দিকভ্রান্ত জাহাজ অবশেষে তীরের সন্ধান পেল। অজ্ঞাত উপকূলে অবতরণ করে তাঁরা জানতে পারলেন—এ দেশ মহাচীনই। অদূরে বিখ্যাত চৈনিক বন্দর লাওসান।

সমুদ্র অতিক্রম করে একজন অশীতিপর বৌদ্ধভিক্ষু তথাগতের জন্মভূমি থেকে সদ্য এসেছেন এ

সংবাদ বন্দরে প্রচারিত হতে দেরি হল না। নিকটবর্তী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষুরা দল বেঁধে এলেন তাঁর সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থাদি এবং বুদ্ধমূর্তি দেখতে। অচিরে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কর্ণগোচর হল এ সংবাদ। তিনি স্বয়ং ফা-হিয়েনকে সম্বর্ধনা জানালেন। দ্রুতগামী সন্দেশবহ মারফত তিনি রাজধানীতে এ আনন্দ সংবাদ জানালেন এবং সসম্মানে ঐ বৌদ্ধ পরিব্রাজককে রাজধানী চাংয়ান অভিমুখে প্রেরণের জন্য একটি নৌকা প্রস্তুত করলেন। হোয়াং-হো নদীপথে পরিব্রাজক চললেন রাজধানীতে।

ইতিমধ্যে চীনের রাজনীতিতেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমরা মহাথের কুমারজীবকে শেষ দেখেছি কাংসিতে। হুণ সেনাপতির বন্দী হিসাবে তিনি যখন চীনের প্রবেশদ্বার ঐ কাংসিতে উপনীত হন, তখন তাঁর বয়ঃক্রম তেষট্টি। সেটা ছিল ৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ। সেখানেই মহাথের সংবাদ পান, যে বৌদ্ধ চীনাসম্রাট তাঁকে আনয়নের জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন তিনি গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত। তাই মহাস্থবির কাংসু বিহারেই অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজধানীতে তাঁর আগমন হত নিরর্থক—কারণ নূতন চীনসম্রাট বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নাকি আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

সেসব ঘটনা দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর পূর্বেকার। ফা-হিয়েন যখন চাংয়ানে এসে উপনীত হলেন, তখন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দ। মহাস্থবির কুমারজীবের বয়স এখন একানব্বই। তিনি এখন আর কাংসুতে নেই—অধিষ্ঠান করছেন রাজধানী চাংয়ানের সর্ববৃহৎ সঙ্ঘারামে। ইতিমধ্যে চীনের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েছেন আবার একজন নূতন সম্রাট এবং তিনি পুনরায় পরম বৌদ্ধ। দুই পুরুষ পূর্বে মধ্যরাজ্য থেকে এক মহাপুরুষ চীনখণ্ডে এসে কাংসুর অখ্যাত বিহারে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে আছেন শুনে তিনি সসম্মানে একটি স্বর্ণমণ্ডিত পল্যঙ্কিকা প্রেরণ করেছিলেন কাংসুতে। সাড়ম্বরে মহাস্থবিরকে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাস্থবির যখন রাজসভায় উপনীত হলেন তখন সিংহাসন থেকে অবতরণ করে চীনাসম্রাট তাঁর পদতলে প্রণত হলেন। বললেন, মহাথের, আপনি আমার 'কুয়ো-শী' (রাজগুরু)। বলুন কীভাবে আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারি?

ম্লান হেসেছিলেন মহাস্থবির। প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, সম্রাট মহানুভব। আমাকে আপনার বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তকের গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত করে দিন। কিছু ভূর্জপত্র, মসী ও লেখনীর আয়োজন করুন। আমার আর কিছু প্রার্থনা নেই।

বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে—চীনদেশে কুমারজীব একা-হাতে একশত ছাব্বিশখানি মহাযান ধর্মপুস্তক চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। তার ভিতর ছাপ্পান্নখানি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্হৎ 'চিয়-মো-লো-শিহ' অমর হয়ে আছে চীনের গ্রন্থাগারে। ইতোমধ্যে ভারত ও মধ্যরাজ্য থেকে এসেছেন আরও অনেক পণ্ডিত—কুচীসঙ্ঘারামের মহাথের বুদ্ধযশা, পাটলিপুত্রের গৌতমবুদ্ধের বংশে জাত ভিক্ষু বুদ্ধভদ্র প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিলেন সেন-চাও প্রমুখ অসংখ্য চৈনিক পণ্ডিত। সেও যেন এক নবরত্নসভা!

পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যে বৎসর চীনের রাজধানী চাংয়ানে উপনীত হন—সেই ৪১৩ খ্রিস্টাব্দেই পরিনির্বাণ লাভ করেন এই শতাব্দীর সূর্য। এটুকুই ইতিহাস—বাকিটা ঔপন্যাসিক সত্য —

হোয়াং-হোতে উজান বেয়ে ড্রাগনমুখী সপ্তডিঙা যখন চাংয়ান বন্দরে ভিড়ল তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। নৌকার সম্মুখভাগে যুক্তকরে তিনি দণ্ডায়মান—দেখলেন নদীতীরের ঘাট যেন এক জনারণ্য। হাজারে হাজারে চাংয়ানবাসী সমবেত হয়েছে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে। নদীতীরবর্তী হর্ম্যশীর্ষে নিশান, ঘাটের উপর প্রকাণ্ড একটি পুষ্পতোরণ। ঘাটের সোপানাবলীতে অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু—গৈরিক কাষায়, মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্রধারী চৈনিক শ্রমণদল। অশ্বারোহী সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা করছে। পীতধ্বজা-চিহ্নিত নৌকাটি দর্শনমাত্র সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। রাজ-নিয়োজিত বাদকের দল তূর্যধ্বনি করতে থাকে।

বিনয়ের অবতার ফা-হিয়েন নৌকার সম্মুখভাগে বদ্ধাঞ্জলিপুটে তখন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন :

মেলো যথা একঘণো বাতেন না সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।।[18]

নিজমনে শুধু বলছেন—'ফা-হিয়েন, ভুল করো না। এ সম্মান তোমার প্রাপ্য নয়। যে সম্পদ তুমি নিয়ে এসেছ তথাগতের জন্মভূমি থেকে—এ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।'

পুষ্পমাল্য-আলিঙ্গন-প্রণাম-আশীর্বাদ।

নিজের অজ্ঞাতসারেই নৌকা থেকে অবতরণ করে তিনি উপনীত হলেন সম্রাট-প্রেরিত শকটে। সম্রাট স্বয়ং তাঁর প্রতীক্ষায় আছেন রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ মহাসভায়। সেখানে নির্মিত হয়েছে সুউচ্চ মঞ্চ। আপামর জনসাধারণকে দর্শন দেবেন পরিব্রাজক। তথাগতের জন্মভূমির কথা বলবেন। আশীর্বাদ করবেন সকলকে।

দেখা হল পরিচিত অনেকের সঙ্গে। বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, ভিক্ষু সেন-চাও প্রভৃতি। বুদ্ধযশাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন ফা-হিয়েন। তাঁকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে বলেন, আপনি তাহলে আমাদের আমন্ত্রণে চীনখণ্ডে এসেছেন?

—এসেছি বন্ধু। আমি আপনাকে একটি বিশেষ সংবাদ জানাতে এসেছি। মহাস্থবির কুমারজীব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অনতিবিলম্বে।

—তিনি আজও জীবিত? কোথায়? কাংসুতে ?

—না। এখানকার মহাসঙ্ঘারামে। তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ—না হলে স্বয়ং আসতেন।

—অবশ্যই যাব। আজই সন্ধ্যায়। আপনি মহাথেরকে বলে রাখবেন।

সমস্ত দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল অনুভবই করতে পারলেন না ফা-হিয়েন। কিন্তু সন্ধ্যার সাক্ষাৎকারের কথা তিনি আদৌ বিস্মৃত হননি।

চাংয়ান শহরের এক প্রান্তে, নাগরিক কোলাহলের বাহিরে হোয়াং-হো তীরে এই শান্ত সঙ্ঘারাম। অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে আশ্রমের আয়োজন। মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক প্যাগোডা বা চৈত্যগৃহ। অর্ধচন্দ্রাকারে আবাসিকদের বিহার। চৈত্যসংলগ্ন একটি নির্জন পরিবেণ। কুমারজীব এই সঙ্ঘারামের মহাস্থবির; তিনি 'কুয়ো-শী'—রাজগুরু।

ফা-হিয়েনের শকট যখন এই সঙ্ঘারামের সমীপস্থ হল, তখন দেখা গেল সঙ্ঘারামের সকল ভিক্ষুই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সমবেত হয়েছেন। প্রবেশ-তোরণের ভিতর শকটের প্রবেশে কোন অন্তরায় ছিল না, কিন্তু পরিব্রাজক রাজপথেই রথ রক্ষা করতে বললেন। পদব্রজেই উদ্যানপথ অতিক্রম করে উপনীত হলেন চৈত্য-সংলগ্ন মহাস্থবিরের পরিবেণে।

ভূশয্যার উপর কম্বলাসনে একটি উপাধানে দেহভার ন্যস্ত করে একানব্বই বৎসরের স্থবির কুমারজীব অর্ধশায়িত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমরা যে শালপ্রাংশু দীর্ঘদেহীকে দেখেছিলাম—তাঁকে চিহ্নিত করার মতো অভিজ্ঞান শুধু তাঁর অনির্বাণ জ্যোতিতে। দেহচর্ম লোল, মুখ বলিরেখাঙ্কিত। দুই হস্ত উত্তোলন করে মহাস্থবির আহ্বান করলেন ফা-হিয়েনকে।

সেই সন্ধ্যাটি চাংয়ান মহাসঙ্ঘারামে অবিস্মরণীয়। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণকথা বহুবার বহুলোককে বলেছেন। পুনরায় বিবৃত করলেন। আনুপূর্বিক। নিমীলিত নেত্রে মহাস্থবির যেন প্রত্যক্ষ করতে থাকেন সেই সব মহাতীর্থ—লুম্বিনীকাননে বুদ্ধজন্ম, কপিলাবস্তুতে গৃহত্যাগ, আড়াঢ়-কলম-উদ্দক রামপুত্তের আশ্রম, রাজগৃহের বেণুবন বিহার, উরুবিল্ব, ঋষিপতন! কত স্মৃতি, কত কাহিনী, কত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত একাধিকবার পাঠ করেছেন কুমারজীব, কণ্ঠস্থ আছে আদ্যোপান্ত—তবু প্রত্যক্ষদর্শীর এ বিবরণে যেন তাঁর প্রাপ্ত-প্রাপ্তি ঘটল। দীর্ঘ কাহিনী সমাপ্ত হল কুশীনগরে—গণ্ডক নদীতীর সন্নিকটে শালবৃক্ষদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে শায়িত বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণে।

মহাস্থবির যুক্তকরে নমস্কার করলেন। তাঁর পরিনির্বাণও আসন্ন। তিনি প্রহর গুনছেন শুধু।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করে অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করেন —

"উপনীতবয়ো চ দানি'সিম্
সম্পয়াতো'সি যমস্‌স সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নথি অন্তরা
পাত্যেয়ম্ পি চ তে ন বিজ্জতি।
সো করোহি দীপমত্তনো খিপ্‌পং
বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্বন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন
জাতিজরং উপেহিসি।।[19]

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু, ভ্রমণকালে বহুস্থানে বহু বিভ্রান্তিকর কাহিনী শুনেছি, যার অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য হয়নি; উপযুক্ত গুরুরও সন্ধান পাইনি, যিনি আমার সন্দেহ নিরাকরণ করতে সক্ষম।

—যথা?

—গৃধ্রকূট পর্বতচূড়া হতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'কারণ্ড বেণুবন' প্রান্তরে আমি দুটি পাশাপাশি পার্বত্যগুম্ফা দেখেছিলাম—'পিপুলগুহা' এবং 'সপ্তপর্ণীগুহা'। স্থানীয় বৌদ্ধশ্রমণেরা আমাকে জানালেন, "গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অব্যবহিত পরে সেই স্থলে পাঁচশতজন প্রধান বৌদ্ধ অর্হৎ বৌদ্ধসূত্রগুলি সঙ্কলন করার নিমিত্ত সম্মিলিত হন। সেই ধর্মমহাসভায় সভাপতিত্ব করেন অর্হৎ মহাকাশ্যপ স্বয়ং। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্‌গল্ল্যায়নও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শুধু ভিক্ষু আনন্দ গুহাদ্বারেই অবস্থান করেছিলেন—কারণ মহাসভায় প্রবেশে তিনি অনুমতি পান নাই।"[20] —এখন আমার প্রশ্ন, মহাঅর্হৎ ভিক্ষু আনন্দকে কেন এ সভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হল না?

কুমারজীব বললেন, এ সকল কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য জানি না। অগ্রসেবক সারিপুত্ত এবং মহামৌদ্‌গল্ল্যায়নের পরিনির্বাণ গৌতমের পূর্বে হয়েছিল কি পরে হয়েছিল এ বিষয়েই সন্দেহ আছে আমার। তাছাড়া আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, ভিক্ষু আনন্দ ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য। তিনি ছিলেন শাক্যমুনির প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র; এবং তথাগতের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মুহূর্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অপরাপর অর্হৎদিগের মতো ইনি জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না—আনন্দ ছিলেন আনন্দস্বরূপ। অমিতাভ ধ্যানীবুদ্ধের বোধিসত্ত্ব যেমন অবলোকিতেশ্বর,—ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধগণের বোধিসত্ত্ব যেমন যথাক্রমে শকমঙ্গল, কনকরাজ এবং ধর্মধারা তেমনই বর্তমানকল্পের মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহ তাঁর অগণিত শিষ্যের ভিতর ঐ ভিক্ষু আনন্দকেই নির্বাচন করেছেন স্বীয় বোধিসত্ত্বরূপে। মহাপরিনির্বাণকালে তাঁকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন—তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি দান করে যান। আপনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তাতে বোধকরি ইঙ্গিত রয়েছে—সেজন্য অন্যান্য অর্হতেরা আনন্দের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। আমার তা আদৌ বিশ্বাস হয় না।

ফা-হিয়েন কৌতুক করে বলেন, শাক্যসিংহের প্রত্যক্ষ-শিষ্যরা নিশ্চয় নির্লোভ ছিলেন, কিন্তু মার্জনা করবেন মহাথের—আমরা অতটা নির্লোভ নই। জনান্তিকে তাই জানাই—আপনার ঐ আখরোট কাঠের ভিক্ষাপাত্রটি পবিত্র স্মৃতি হিসাবে লাভ করার বাসনা আমরা সকলেই অন্তরে পোষণ করি—আপনার প্রিয়শিষ্য বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, তাও-চিং, সেন-চাও এবং আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজেও!

প্রশান্ত হাসলেন কুমারজীব। প্রসঙ্গান্তরে এলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন, ভদন্ত, শুনেছি বুদ্ধভূমি থেকে আপনি বহু সংখ্যক ধর্মগ্রন্থাদি অনুলিপি করে এনেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেগুলি এই মহাবিহারে আনয়ন করুন। সেগুলি অবিলম্বে চীনাভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। আমার অবশ্য দৃষ্টিশক্তি নাই—বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, সেন-চাও প্রভৃতিরা আছেন—

ফা-হিয়েন বলেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি নিজেও আছি—

ঃ না ভদন্ত, সে কাজ আপনার নয়। চীনা ও সংস্কৃত দুই ভাষায় যুগপৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন শ্রমণের অভাব নাই এখানে। আপনার ক্ষেত্র ভিন্ন। আপনি একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করুন। তথাগতের লীলাক্ষেত্রের আপনি প্রত্যক্ষদর্শী; এইমাত্র আপনি স্বীকার করলেন—নানা প্রক্ষিপ্ত কাহিনী তাঁর জীবনীতে প্রবেশ করেছে ইতোমধ্যেই। না, না, এ হতে পারে না। আপনি যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন—ভারতভূমির ধর্ম-কর্ম-জীবনযাত্রার যে প্রত্যক্ষজ্ঞান আপনি লাভ করেছেন সেটা লিপিবদ্ধ

করাই আপনার ব্রত। ভবিষ্যৎ কাল আপনার কাছে সেটাই প্রত্যাশা করছে। সে গ্রন্থের নাম হবে 'ফো-কু-কি' অর্থাৎ 'বুদ্ধভূমির বিবরণ'। অনাগত কাল আপনার গ্রন্থের ভিতরেই পাবে আমাদের কালের পরিচয়।

—যথা আজ্ঞা মহাথের।

বিদায় গ্রহণের পূর্বে ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু ! আর একটি নিবেদন আছে; সেটি কিন্তু গোপন কথা। শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে ইচ্ছুক।

শ্রবণমাত্র অন্যান্য ভিক্ষুদল মহাথেরকে প্রণাম করে পরিবেণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ফা-হিয়েন বলেন, প্রভু! আমি পাপী। একটি পাপকার্য করেছি আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে। আমি সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। 'মিথ্যাই কল্যাণকর'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় মিথ্যাচার করেছিলাম। কিন্তু ভারত ভ্রমণকালে এক তরুণবয়স্ক কবির কথায় আমি বুঝতে পারি—আমি অন্যায় করেছিলাম। একথা এতদিন গোপন রেখেছি—আজ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার চরণমূলে নিবেদন করে মিথ্যাভাষণের অপরাধে পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি বিধান দিন।

কুমারজীব বলেন, তৎপূর্বে বলুন, কী সেই ভারতীয় কবির পরিচয় এবং কী বলেছিলেন তিনি?

—তিনি একজন তরুণবয়স্ক অখ্যাত ব্রাহ্মণ। নাম ভট্ট কালিদাস। তিনি বলেছিলেন,—'মিথ্যা কখনও কল্যাণকর হতে পারে না', বলেছিলেন, 'সত্য সর্বদা শিব ও সুন্দরের সহিত সম্পৃক্ত।'

কুমারজীব বললেন, তরুণবয়স্ক হলেও তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। এক্ষণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলুন। পাতিমোক্ষমতে আমি বিধান দেব। মাননীয় ভিক্ষু, আমি কর্ণময়!

ফা-হিয়েন আদ্যন্ত ঘটনাটি বিবৃত করার পর ভিক্ষু কুমারজীব বললেন, এক্ষণে বলুন ভদন্ত, আপনি কেন সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন?

যুক্তকরে ফা-হিয়েন প্রত্যুত্তর করলেন, আমার উদ্দেশ্যের কথা ইতিপূর্বেই নিবেদন করেছি প্রভু। স্বয়ং তথাগত বলেছেন, "তমেব বাচং ভাসেয্য যায়ত্তানাং ন তাপয়ে/ পরে চ ন বিহিং সেব্য সা বে বাবা সুভাসিতা।" (যে বাক্য উচ্চারণে নিজে পীড়িত হতে হয় না সেরূপ বাক্যই বলিবে, যে বাক্য অপরকে কষ্ট দেয় না সেই বাক্যই উত্তম)। তিনি আরও বলেছেন, "পিয়বাচমেব ভাসয্য যা বাচা পাটনক্রিতা/যং অনাদায় পাপানি পরেসং ভাসতে পিয়ং।।" (যে বাক্য সকলকে আনন্দ দেয় সেরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিবে—যে বাক্য অপরের অনিষ্টদায়ক না হইয়া প্রিয় হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে।)

কুমারজীব বললেন, কিন্তু ভদন্ত ! এই মিথ্যাভাষণে আপনি নিজেই পীড়িত হয়েছেন—নিরন্তর ত্রিশ বৎসরকাল আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়েছেন।

—তা হয়েছি। তবু একটি সান্ত্বনা আমার ছিল—'যং অনাদায় পাপানি পরেমং ভাসতি পিয়ং'—আমার ঐ মিথ্যাচার কারও অনিষ্টসাধন করেনি, পরন্তু আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

অমলিন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কুমারজীবের বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল। বললেন, মাননীয় ভিক্ষু ফা-হিয়েন, এক্ষণে আপনার অবহিত হওয়ার সময় হয়েছে যে, ত্রিশ বৎসর পূর্বে উচ্চারিত আপনার সেই মিথ্যা স্তোকবাক্য আমাকে আদৌ কোনও সান্ত্বনা দেয়নি। পরন্তু আমাকে শুধু পীড়িতই করেছিল।

—কেমন করে প্রভু ?

—আমিও যে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে অন্তর্দাহে দগ্ধ হচ্ছি আপনার মিথ্যাচারে। আমি যে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম—আপনি আমাকে সান্ত্বনা দানের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন! অক্ষুমতী যে জীবিতা তা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। তখনই তা জানতাম আমি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভিক্ষু ফা-হিয়েন। বললেন, কেমন করে প্রভু ? কোনো অলৌকিক ক্ষমতার বলে?

—না। আজীবন যে মহাভিক্ষু মিথ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁর পক্ষে জীবনে প্রথম মিথ্যাভাষণের সময় যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটুকু অনুভব করার মতো সাধারণ জ্ঞানও কি আমার নেই?

অধোবদনে ভিক্ষু ফা-হিয়েন বললেন, প্রভু ! তাহলে তখনই আমাকে বলেননি কেন? কেন আমাকে মিথ্যাচার-পরিশুদ্ধ করে তোলেননি?

কুমারজীব প্রত্যুত্তরে শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করলেন :

"অত্তান'ব কর্তং পাপং অত্তনা সংকিলিস্‌সতি,
অত্তনা অকতং পাপং আত্তনা'ব যিম্‌জ্মতি,
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাঞ্‌ঞো অঞ্‌-ঞং বিসোধয়ে।।"

[নিজের কৃত পাপে নিজেই সংক্লিষ্ট হয়। নিজে পাপ না করিলে নিজেই বিশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজেরই সৃষ্টি। কেহ কাহাকেও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না।]

ফা-হিয়েন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন মহাস্থবিরের চরণমূলে।

পরদিন সম্পূর্ণ একাকী একটি নৌকাযোগে ভিক্ষু ফা-হিয়েন চাংয়ান শহরের পশ্চিমে হোয়াং-হো তীরবর্তী একটি শান্ত গ্রামে উপনীত হলেন। শহর থেকে দশ 'লী' উজানে। বুদ্ধভদ্র তাঁর সঙ্গে আসতে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সম্মত হননি চৈনিক পরিব্রাজক। বলেছিলেন, পাতিমোক্ষমতে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছি বন্ধু। এ পথ একলা চলার।

হোয়াং-হো তীরে এক নির্জন ঘাটে তরী তীরসংলগ্ন হল। বিহঙ্গকূজিত শান্ত গ্রাম্যপথ। দূরে ক্ষেতে-খামারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ কৃষক ভূমিকর্ষণরত। মনুষ্যচালিত লাঙল। ক্রীতদাস। পীত উত্তরীয়ধারী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রমণ ধীরপদে সেই গ্রাম্যসরণি অতিক্রম করে অবশেষে উপনীত হলেন টিলার উপরে দুর্গাকারে নির্মিত এক দ্বিভূমিক জীর্ণ প্রাসাদের সম্মুখে। প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানগৃহ। অতীতকালের কোন ধনবান রাজপুরুষের বিলাসভবন। এককালে সুরা ও নারীর প্রাচুর্যে সে উদ্যানবাটিকা কলমুখরিত থাকত। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ। জীর্ণ প্রাসাদের একাংশ বিধ্বস্ত—অপরাংশের আকৃতি বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রীর মতো। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মর্মর প্রস্রবণ, কণ্টকগুল্মাবৃত কুঞ্জবিতান, ক্ষতচিহ্ন-আকীর্ণ উদ্যানপথে ভূশয্যালীন নগ্ন নারীর মর্মর মূর্তি। দ্বিতল বাটির চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু পর্ণকুটীর—গৃহাভ্যন্তর থেকে উত্থিত হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন শব্দ। পরিচিত শব্দ। তন্তুবায় তাঁত পরিচালনা করছে। গবাক্ষপথে দুই-একজনকে দেখাও যায়। তারা সকলেই নারী, পুরুষ নয়—সকলেই প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা।

একটি পুষ্পপত্রহীন বিশুষ্ক চেরীবৃক্ষতলে পাঁচ-সাতজন রমণী—তাঁরাও পঞ্চাশোর্ধ্বা—সীবনকার্যে নিযুক্তা ছিলেন। ভিক্ষাপাত্র হস্তে পীতবসনধারী ভিক্ষুকে অগ্রসর হতে দেখে সকলেই দণ্ডায়মানা হন। বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রণতি জানান। ফা-হিয়েন আশীর্বাদ করে বলেন, এইটাই কি লি-চিয়াঙ গ্রামের মাতৃকাসদন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, থের। অনুগ্রহ করে আমার অনুগমন করুন। আপনি পথশ্রান্ত, আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

ফা-হিয়েন বললেন, আমি পথশ্রান্ত অতিথি নই মা, আমি বিশেষ কারণে এ আশ্রমে সমাগত। আমি আশ্রমমাতৃকার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

—আসুন মহাভাগ। তিনি চৈত্য-মন্দিরে আছেন।

চৈত্য অবশ্য গৌরবে। প্রাসাদ-ধ্বংসস্তূপ-সংলগ্ন একটি ভগ্নপ্রায় কক্ষ। সে কক্ষে কোন বিগ্রহ নাই, শুধু কেন্দ্রস্থলে মৃত্তিকা-নির্মিত একটি স্তূপের অক্ষম প্রয়াস। তার গঠন-সৌকর্য দেখে আশঙ্কা হয় আশ্রমিক মহিলাবৃন্দ অপটুহস্তে সেটি নির্মাণ করেছেন। ফা-হিয়েন সেই মৃত্তিকাস্তূপের সম্মুখে প্রণত হলেন। কক্ষাভ্যন্তর থেকে নির্গত হয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। আনুমানিক ষাট বৎসর বয়ঃক্রম তাঁর। নিরাভরণ দেহ, অঙ্গে একটি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র—পীত বা গৈরিক নয়। তাঁর মস্তকও মুণ্ডিত নয়, অযত্নবিন্যস্ত ফেনশুভ্রকেশরাশি স্কন্ধের উপর কুণ্ডলায়িত। মুখে বলিরেখা চিহ্নের আভাস—তবু তাঁর চম্পকগৌর বর্ণ অম্লান। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—যৌবনকালে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন।

পথপ্রদর্শিকা বললেন, মা, ইনি আপনার দর্শনপ্রার্থী।—চলে গেলেন পথপ্রদর্শিকা।

আগন্তুক ভিক্ষুকে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। ভিক্ষু বললেন, আরোগ্য।

বিনা বাক্যব্যয়ে বৃদ্ধা পূর্বসঞ্চিত এক পাত্র কূপোদক নিয়ে আসেন।

অতিথির পদপ্রক্ষালনান্তে স্বীয় অঞ্চলে তাঁর চরণদ্বয় বিশুষ্ক করে বললেন, আসন গ্রহণ করুন মহাভাগ।

একটি মৃগচর্মাসন বিছিয়ে দেন কাষ্ঠাসনে।

আসন গ্রহণ করে ললিতাসনে বসলেন ফা-হিয়েন। বললেন, আপনিই এই মাতৃকাসদনের আশ্রমমাতা—অ-খু-মো-তি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ভদন্ত। আজ্ঞা করুন?

—আমি ভিক্ষু ফা-হিয়েন।

বিদুৎস্পৃষ্টার মত সচকিত আশ্রমমাতৃকা বলেন, ভিক্ষু ফা-হিয়েন! অর্থাৎ আপনিই কি সেই বিখ্যাত পরিব্রাজক যিনি বুদ্ধভূমি প্রত্যক্ষ করে পরশ্ব সন্ধ্যায় জীবিত প্রত্যাবর্তন করেছেন?

—হ্যাঁ আশ্রমমাতা। আমিই সেই পরম সৌভাগ্যবান!

—আমার এ পর্ণকুটীর আজ ধন্য। কিন্তু ..... কিন্তু এই নগণ্য গ্রামে কেন এসেছেন ভদন্ত ?

—আমি আপনার কাছেই এসেছি আশ্রমমাতৃকা।

—কিন্তু কেন? কেন এভাবে সম্মানিত করলেন আমাকে ? কোন পুণ্যে?

—আমি ভিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি তোমার কাছে —

ফা-হিয়েন দুই হস্তে ভিক্ষাপাত্রটি উপস্থাপিত করেন। শিহরিতা হয়ে ওঠেন বৃদ্ধা। দুই হস্তে মুখ আবৃত করে আর্তকণ্ঠে বলেন, এমন কথা বলবেন না মহাভাগ। আমি পাপী, আমি সামান্যা। আমি কী ভিক্ষা দেব আপনাকে ?

—তোমার সর্বস্ব দিতে হবে অ-খু-মো-তি !

ধীরে ধীরে মুখ হতে হস্তদ্বয় অপসারিত হয়। বৃদ্ধা বলেন, আমি এখনও প্রণিধান করতে পারছি না মহাথের, আপনি এভাবে আমার কাছে কেন এসেছেন?

—তুমি কি ইতিপূর্বে আমাকে কখনও দেখেছ?

—না। আপনি যে তথাগতের জন্মভূমি পরিক্রমায় গিয়েছিলেন তাও অজ্ঞাত ছিল আমার। বস্তুত মাত্র গত পরশু আপনার নাম ও ভ্রমণের কথা জেনেছি।

—ভুল করছ আশ্রমমাতৃকা। আমি তোমার পূর্বপরিচিত। সে পরিচয় এখনই প্রদান করছি। তার পূর্বে বল—এ আশ্রমে কতজন ভিক্ষুণী আছেন?

—ভিক্ষুণী একজনও নাই ভদন্ত। এঁরা সকলেই পতিতা, সমাজত্যক্তা। যতদিন যৌবন ছিল এঁরা দেহ দিয়ে সমাজসেবা করেছেন—এখন এঁরা উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা।

—এ আশ্রমভূমি কার সম্পত্তি ? তোমার?

—না। স্বর্গত হূণ সেনাপতি হো লু-সূনের। বর্তমানে তাঁর পুত্রের। এ উদ্যানবাটিকা হূণ সেনাপতির প্রমোদভবন ছিল—এক্ষণে পরিত্যক্ত। আমাদের বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

—তুমি তো মহাযানী; তাহলে এ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠা না করে স্তূপপূজা করছ কেন?

বৃদ্ধা বললেন, ভগবন, আমি মহাযানী নই, বস্তুত আমি বৌদ্ধই নই। পাতিমোক্ষমতে আমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমি সে দণ্ডাদেশ অনুসারে আত্মহত্যা করতে পারিনি। শাস্ত্রমতে আমি বোধ করি জীবিতা নই, আমি এক জীবন্ত প্রেতিনী।

—না, অ-খু-মো-তি ! মহাথের তোমাকে তো শুধু মৃত্যুদণ্ডই প্রদান করেননি, ঐ সঙ্গে দিয়েছিলেন আর একটি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র। 'নামরূপ'কে অস্বীকার করে মৃত্যুকে উত্তরণের মন্ত্রও তো তিনিই দিয়েছিলেন—তাই নয়? রুদ্রদেবের সেই বজ্র-আশীর্বাদ বুক পেতে নেবার শিক্ষাও তো তাঁরই?

বৃদ্ধা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী?

—না। এ ভ্রম অবশ্য তোমারই প্রথম হল না। ইতিপূর্বে আরও একজন ঐ প্রশ্ন আমাকে করেছিলেন। তিনিও তোমার পরিচিত। তিনি কুচীনগরীর মহাস্থবির : বুদ্ধযশা।

বৃদ্ধা বজ্রাহত !

ফা-হিয়েন বলেন, আশ্রমমাতৃকা! তুমি আম্রপালীর কাহিনী জান?

আশ্রমমাতৃকা তখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারেননি। ফা-হিয়েন বলে চলেন ভিক্ষুণী আম্রপালীর বিচিত্র কাহিনী। রাজা বিম্বিসারের উপপত্নী থেকে যাঁর উত্তরণ হয়েছিল মহাভিক্ষুণীর পদে। উপসংহারে বলেন, বৈশালী নগরীর ধ্বংসস্তূপে সেই আম্রপালী কাননে অঝোরধারায় আমি একদিন অশ্রুপাত করেছিলাম। কেন বলতে পার আশ্রমমাতৃকা?

—না। কেন?

—আমার অবচেতন মন জানতে চাইছিল—বিম্বিসারের উপপত্নী যদি ভিক্ষুণী আম্রপালী হতে পারেন, তাহলে অ-খু-মো-তি কেন পুনরায় অগ্‌গবিনতা অক্ষুমতী হতে পারবেন না?

অক্ষুমতী অধোবদনে বলে, জানি না কেমন করে আপনি আমার পূর্বজীবন-কথা জেনেছেন। মনে হচ্ছে আমি যেন পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করেছি। তথাগতের মতো জাতিস্মর হয়ে বিস্মৃত অতীত-জীবনকে প্রত্যক্ষ করছি।

ফা-হিয়েন বলেন, অতীতেই দৃষ্টিপাত কর আশ্রমমাতৃকা। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে হূণ সেনাপতি হো লু-সূনের অবরোধে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তুমি আমাকে প্ররোচিত করেছিলে মহাস্থবির কুমারজীবকে তোমার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ নিবেদন করতে। পাপ আমিও করেছি—সেই মিথ্যাকেই কল্যাণকর বিবেচনা করে আমি মিথ্যাচরণ করেছিলাম। তখনও আমার জানা ছিল না—একমাত্র 'সত্য সর্বদাই শিব ও সুন্দরের সহিত সংপৃক্ত'।

মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি অক্ষুমতী বলে, মনে পড়েছে। আপনিই যে সেই ভিক্ষু তা আমি অনুমান করতে পারিনি।

ফা-হিয়েন তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি প্রসারিত করে বলেন : এবার আমাকে ভিক্ষা দাও অক্ষুমতী। তোমার সর্বস্ব।

—কেমন করে দেব প্রভু? কীটদষ্ট কুসুমে কি অর্ঘ্য হয়?

—সে কথাই তো বলে গিয়েছেন আম্রপালী—কীটের অপরাধে কুসুম অপবিত্র হতে পারে না।

—কিন্তু মহাস্থবির কুমারজীব যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন?

—সে লীলার কৈফিয়ত একমাত্র মহাস্থবিরই দিতে পারেন। বোধকরি 'ইতি গজ'র অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ দেয় যুধিষ্ঠির পুরোপুরি দেবতা নন, তিনি মর-মানুষ, তেমনি তোমার হাতে বিষের পুরিয়া তুলে দিয়ে মহাস্থবির প্রমাণ রেখে গেলেন—তিনি পূর্ণবুদ্ধ নন, রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষরূপী অবতার। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে সেই মহাস্থবিরের কাছে। তিনি তোমার প্রতীক্ষারত। তিনি মৃত্যুশয্যায়।

—তিনি কি জানেন আমি জীবিতা?

—জানেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। জেনেছেন আরও একজন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বুদ্ধযশা।

—বুদ্ধযশা! তিনি চাঙ য়ানে? চীন দেশে?

—হ্যাঁ। আজ দশ বৎসরকাল। তাঁরা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন অক্ষুমতী। সঙ্ঘ তোমাকে ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ না?

দূর দিগন্তের দিকে কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন অক্ষুমতী। তারপর বলেন, হ্যাঁ ভদন্ত, শুনতে পাচ্ছি।

চাঙ-য়ান শহরতলিতে মহাসঙ্ঘারামে ওঁরা দুজন যখন এসে উপনীত হলেন তখন সে মহাতীর্থ জনারণ্যে পরিণত। সমস্ত নগরবাসী বৌদ্ধ সমাগত হয়েছেন তাঁদের মহাস্থবিরকে শেষ বিদায় জানাতে। শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন। এসেছেন স্বয়ং চীন সম্রাট—তাঁর কুয়ো-শীকে শেষ প্রণাম নিবেদনে।

অতি প্রত্যূষেই লক্ষিত হয়েছে মহাস্থবির চিয়ু-মো-লো-শিহ্ তাঁর মরজীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। জ্ঞান আছে কিন্তু সম্পূর্ণ।

সোপানাবলী অতিক্রম করে ভিক্ষু ফা-হিয়েন প্রবেশ করলেন বিরাট কক্ষে। তাঁর অনুগমন করলেন এক নতমুখী বৃদ্ধা। প্রকাণ্ড কক্ষে শতাধিক বৌদ্ধশ্রমণ—কিন্তু সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মহাস্থবির ভূশয্যালীন। তাঁর পদতলে চীন সম্রাট। বুদ্ধযশা, বুদ্ধভদ্র, বিমলাক্ষ, তাও-চিং, সেন-চাও প্রভৃতি প্রধান অর্হতেরা তাঁকে ঘিরে আছেন।

ফা-হিয়েন তাঁর পদতলে উপবেশন করলেন। চরণস্পর্শ করলেন। নিমীলিত চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হল। ফা-হিয়েন বললেন, অগ্‌গবিনতা অক্ষমতী এসেছেন প্রভু। তিনি বলছেন, বিদায় নেবার পূর্বে আপনি পাতিমোক্ষমতে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে যান।

মহাস্থবিরের চক্ষু-তারকায় প্রতিবিম্বিত হল শুভ্রবসনা এক নতমুখী বৃদ্ধার প্রতিমূর্তি। জাগতিক বন্ধন ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু অন্তিম মুহূর্তে চিনতে পারলেন সেই মহিমাময়ী নির্যাতিতাকে। ম্লান হাসলেন। কিন্তু বাকরোধ হয়ে গেছে মৃত্যুপথযাত্রীর। কোন কথা বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে বলিরেখাঙ্কিত জরাগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তটি সম্প্রসারিত করে দিলেন। তিনি যেন শয্যাপার্শ্বে কিছু খুঁজছেন। কী খুঁজছেন তিনি? সহসা প্রসারিত করাঙ্গুলি স্পর্শ করল তাঁর একমাত্র পার্থিব সম্পদ—আবাল্য-সহচর আখরোট কাঠের একটি ভিক্ষাপাত্র। কম্পিতহস্তে নির্বাক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্রটি সম্প্রসারিত করে দিলেন আগন্তুক বৃদ্ধার দিকে।

তার অর্থ কী?

চিন্তিত হয়ে পড়েন ফা-হিয়েন। যুক্তি দিয়ে এ আচরণের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না যে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে আজ কী ভিক্ষা চাইতে পারেন মহাজ্ঞানী কুমারজীব—ঐ নতমুখী সর্বহারার কাছে! মার্জনা? করুণা? ক্ষমা?

অক্ষমতীও বিহ্বলা। বুঝে উঠতে পারে না—এ আচরণের কী ব্যঞ্জনা! কী দেবে সে ঐ ভিক্ষাপাত্রে? পশ্চিমদিগন্তলীন দৃপ্ত সূর্য এই শেষ বিদায় মুহূর্তে কেন অমনভাবে রাঙিয়ে উঠেছেন?

সহসা দৈববাণীর মতো ধ্বনিত হল : অগ্‌গবিনতা অক্ষমতী! মহাস্থবির তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছেন না। তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকেই উপহার দিচ্ছেন। যে সম্মান আমি পেলাম না, মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন পেলেন না, মহাঅর্হৎ বুদ্ধভদ্র পেলেন না, মহাভিক্ষু সেন-চাও পেলেন না—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছেন। গ্রহণ করে ধন্যা হও অগ্‌গবিনতা। তুমি আজ : 'আনন্দ'-স্বরূপিণী!

অক্ষমতী বক্তার দিকে ফিরে তাকান। সপ্ততি-বৎসরের এক সৌম্য ভিক্ষু।

কুচীরাজ্যের প্রাক্তন মহাস্থবির : বুদ্ধযশা!

দুই হাত সম্প্রসারিত করে সেই অমূল্য ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করেন—'আনন্দ'স্বরূপিণী'।

অগ্রসেবক সারিপুত্ত নন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামৌদ্‌গল্ল্যায়ন নন, 'আনন্দ'স্বরূপিণী বৃদ্ধা। মুখ লুকোলেন ভিক্ষাপাত্রে।

ঝরঝর করে তাতে ঝরে পড়ে তাঁর চোখ থেকে স্বাতীর মুক্তাবিন্দু!

অশ্রুর অর্ঘ্য!

নির্দেশিকা

ক্রম/পৃষ্ঠা	ব্যাখ্যা
(1) পৃঃ ২০	তিন 'লী'তে প্রায় এক মাইল = ১.৬ কিমি। ১ লী = ৫৩৩ মিটার।
(2) পৃঃ ৩৬	'যে ব্যক্তি কামরাগাদি কলুষযুক্ত হইয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, অথচ সত্য ও দমগুণ বিহীন, সে প্রকৃতপক্ষে গৈরিক কাষায় বস্ত্রের অনুপযুক্ত।' [ধম্মপদ ১।৯]
(3) পৃঃ ৩৭	'গমনকালে, উপবেশনকালে, শয়নকালে কায়মনোবাক্যে যেন সর্বদা একমাত্র তথাগতকেই বন্দনা করি।'
(4) পৃঃ ৪১	বরবোধিবৃক্ষমূলে যে অনন্তজ্ঞানী সসৈন্য 'মার'কে পরাজিত করে সম্বোধি লাভ করেছিলেন সেই লোকুত্তম বুদ্ধকে প্রণতি জানাই।
(5) পৃঃ ৪৪	'যে ব্যক্তি জগতকে বুদবুদ ও মরীচিকার ন্যায় ভঙ্গুর ও অসার বলে জানেন তিনি মৃত্যুরাজ্যের অধিকার-বহির্ভূত হয়ে যান।' [ধম্মপদ ১৭০]
(6) পৃঃ ৪৪	নামরূপময় সর্ববস্তুতে যাঁর মমত্ববোধ নাই—'আমার নাম, আমার রূপ' এ চিন্তার ঊর্ধ্বে যিনি উঠেছেন—নামরূপের অপমানে অথবা বিনাশে যিনি শোকাভিভূত হন না তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু। [ধম্মপদ ৩৬৭]
(7) পৃঃ ৪৪	হে রুদ্র! তুমি আমাকে পরীক্ষা করতেই এ-বেশে এসেছ—তাতে আমি ভয় পাব না! তোমার ঐ বজ্র তো করুণারই নামান্তর—তাই চিরদিন বুক পেতে প্রতীক্ষা করব ঐ বজ্র-আশীর্বাদের ('দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে। যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে॥' রবীন্দ্রনাথের ঐ বাণীর ভাবার্থ নিয়ে এই সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করে আমাকে অনুগৃহীত করেছিলেন দ্বারভাঙ্গা-প্রবাসী বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীঅনন্তলাল দেবশর্মা (ঠাকুর)]
(8) পৃঃ ৪৭	'মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে জয় কর, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে'—
(9) পৃঃ ৪৯	'আমার প্রতি আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, অথবা জয় করল, কিংবা আমার সর্বস্ব হরণ করল—যারা এই জাতীয় চিন্তা করে তাদের শত্রুতার উপশম হয় না।' [ধম্মপদ ৩]
(10) পৃঃ ৪৯	'জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়'—সনাতন ধর্মের এই হল নির্দেশ। [ধম্মপদ ৫]
(11) পৃঃ ৫৬	চীনা উচ্চারণ বাঙলা হরফে কীভাবে লিখিত হবে জানা নেই। রোমান হরফে চীনে প্রচলিত কুমারজীবের নাম ইংরাজী গ্রন্থে দেখছি ঃ Chio-mo-lo-shih.

(12) পৃঃ ৫৮ বহু প্রামাণিক গ্রন্থে দেখছি লেখা আছে ফা-হিয়েন ৭৯ বৎসর বয়সে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। আমার ধারণা সেটা ৮২ হবে। এই ভ্রান্তিটা হচ্ছে এ জন্য যে, বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের (৩ বৎসর বয়সে) সময় থেকেই বয়সটা গণনা করেছেন, গার্হস্থ্যাশ্রমের তিন বৎসর বাদ দিয়ে। কারণ ফা-হিয়েনের জন্ম ৩৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে।

(13) পৃঃ ৬২ *'To My Wife'*, by *Chin Chia* (mid-second century A. D.), Translated into English by Yu-tai hsin-yung, [World Book Co., 1935, p. 17.]

(14) পৃঃ ৬২ Ibid, p. 20

(15) পৃঃ ৬৪ চীনা সাহিত্যে বর্তমান লেখকের ব্যুৎপত্তি অগ্রজ সাহিত্যিক বৈকুণ্ঠের (বৈকুণ্ঠের খাতা) সঙ্গে তুলনীয়। অনুবাদ কতটা বাস্তবানুগ হল তার মূল্যায়ন করতে চীনা-কবিতার ইংরাজী অনুবাদটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

"Lovely loving for my Love,
I gaze afar in Distress,
Far from Home and go-between,
How shall I my Grief express?
....
Clouds I seek as Messengers
My petitions they deny ;
Swallows would swift Envoys make
Heedless they have flown on high."

Li Sao & other poems of Chu Yuan : translated into English by Yang Hsion-yi and Gladys Yang [Foreign Language Press, Peking, 1953, p. 55].

লক্ষণীয়—ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহারে কবি বিরহ, দুঃখ, দূত শব্দকে প্রাণবন্ত বলে কল্পনা করেছেন।

(16) পৃঃ ৬৫

'I Wander eastward to the Place green,
And Pendants sought where Jasper Boughs were seen,
And vowed that they, before their Splendour fade,
As Gifts should go to grace the loveliest Maid.
The Lord of Clouds I then bade mount the Sky,
To seek the Stream where once the Nymph did lie,
As pledge I gave my Belt of splendid Sheen,
My Counsellor appointed Go-between,
Fleeting and wilful like Capricious Cloud
Her Obstinacy swift no Chance allowed.
At Dusk retired she to the Crag withdrawn,
Her Hair beside the Stream she washed at Dawn.'

—Ibid, pp. 10-11

(17) পৃঃ ৬৫ দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের Ivanhoe পাঠ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করে ডক্টরেট করেন তাঁদের জ্ঞাত্যর্থে জানাই—মেঘদূতের ঐ চিত্রকল্পের সঙ্গে চীনা কাব্যের সাদৃশ্য, যতদূর জানি, প্রথম নজরে পড়ে ভাষাবিদ

হরিনাথ দে-র (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে)। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কালিদাসের উপর লিখিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় হরিনাথ এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দেন।

মস্কো শহরে ১৯৬০ সালে ভাষণ-দান কালে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমারও বলেন ঃ "Kalidasa lived about 400 A. D., in the first flush of Gupta grandeur, and that was the time when Fa-Hsien also came to India. I would not insist upon it, but it seems to me that in the story framework of the Meghaduta there is also Chinese influence... It may be that Kalidasa was not at all indebted to any one, and much less to Chinese literature for this. But the fact remains that sending or asking the cloud to act as a Messenger to one's Beloved is a common enough motif in ancient Chinese poetry .... A pretty or a great idea easily passes from writer to writer and from literature to literature."

[Vide Paper read by Suniti Kumar Chatterji before the Joint Session of the Indian Sub-Section of the 25th International Congress of Orientalists in Moscow, U.S.S.R., on Aug. 9th, 1960.

Journal of the Asiatic Soc., Vol. I,. No. I, 1959].

(18) পৃঃ ৭১ "কঠিন পর্বত যেমন বায়ুদ্বারা প্রকম্পিত হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তিগণও তেমনই নিন্দা-প্রশংসাতে অবিচলিত থাকেন।"

(19) পৃঃ ৭২ 'এখন তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, তুমি মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীত, পথে তোমার কোনও বিশ্রামস্থান নাই এবং পাথেয় কিছু সঞ্চয় করা হয় নাই। এমতাবস্থায় তুমি নিজের জন্য পুণ্যদ্বীপ গঠন কর, সত্বর উদ্যোগী ও পণ্ডিত হও—নির্মল ও কামজয়ী হও—তাহলেই জন্মজরার হস্তে পুনরায় নিগৃহীত হবে না।'—(ধম্মপদ ২৩৭)

(20) পৃঃ ৭২ ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাহিনী দ্রষ্টব্য : Vide translation 'Fo-Ku-Ki' into English by Li-yung-hsi on the Buddha's 2500 Anniversary at Tsan-Si-Monastery, 1957 [মাসিক 'প্রবাসী', ১৩৬৩ সাল, ভাদ্র-কার্তিক দ্রষ্টব্য]

হংসেশ্বরী

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধেয়া আশাপূর্ণা দেবী

রচনাকাল : 1976
প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট 1977

কলকাতার অদূরে হংসেশ্বরী মন্দির দর্শন করে এসে এই কাহিনী রচনার প্রেরণা পাই। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অন্বেষণ করে রানী শঙ্করীর একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনায় প্রয়াসী হই। ঐতিহাসিক-উপন্যাস লেখকের নির্দেশিত গণ্ডী সজ্ঞানে আমি অতিক্রম করিনি। শুধু একটি ব্যতিক্রম। স্বীকার করে যাই : রানী শঙ্করী যে ব্রাহ্মণকন্যা এটা ঔপন্যাসিক সত্যমাত্র। কেন রাজা নৃসিংহদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং কেনই বা তার অব্যবহিত পরে দেশত্যাগ করেন, সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তার কার্য-কারণ সূত্রসম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

রাণী শঙ্করীর মন্দিরনির্মাণ, পুত্রের সঙ্গে মামলায় প্রথম ভারতীয় নারী হিসাবে প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্যদান ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা। দুই পত্নীসহ রামমোহনের নৌকাযোগে কাশীগমন ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু কেরী-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লেখকের কল্পনা। যেমন কল্পিতচরিত্র শঙ্করদেব।]

তথ্য ও নির্দেশনা :

(1) পৃঃ ৯৪ পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। যে কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস সে যুগটা ঘন কুয়াশাবৃত। মিসেস এলিজা ফে-র ঐ দুষ্প্রাপ্য চিঠিখানি ব্যবহারের লোভ তাই সামলাতে পারলাম না। এ আমার সজ্ঞান-অ্যানাক্রনিজম্! কাহিনী অনুযায়ী ঘটনা 1784 খ্রিস্টাব্দের। এলিজা ফে'র চিঠির তারিখ 27.9.1781; ধরে নেওয়া যাক—মহামায়ার কপালেও অনুরূপ ঘটনা কিছু ঘটেছিল।

নারায়ণ সান্যাল

আশাচলেন্দু সম্পূর্ণে শকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভরা
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেব-দত্ততঃ।।

—অর্থ বুঝলে বাবা?

প্রশ্নটা শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিত শ্রীত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ—অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত। শিলালিপিটা সকলেই দেখেছে—নূতন শক্তি মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রোথিত শিলালেখ। সদ্য বসানো হয়েছে সেটি ; আজই সকালে। শিষ্য বললে, দ্বিতীয় পংক্তির অর্থগ্রহণ হয়েছে, কিন্তু প্রথমার্ধের অর্থগ্রহণ হয়নি—'আশাচলেন্দু সম্পূর্ণ শকে' শব্দসমষ্টির অর্থ কী ?

কথা হচ্ছিল সদ্যসমাপ্ত নাটমণ্ডপে। আগামীকাল মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠা দিবস। পুণ্যাহ। মন্দিরের গর্ভগৃহে স্বয়ম্ভরা কালী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সে মূর্তি কেউ দেখেনি। রক্তচীনাংশুকে আবৃতা তিনি। গর্ভগৃহের গুল-বসানো ভারি কাঁঠাল কাঠের দ্বার অর্গলবদ্ধ। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী, আগামীকাল কার্তিকের অমাবস্যায় মহাকালীর আরাধনা—সেই পুণ্যমুহূর্তে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবেন মহাতান্ত্রিক পুণ্ডরীক শাস্ত্রী। দীর্ঘদিন নৌকাযাত্রা সমাপ্ত করে তিনি সম্প্রতি এসে পৌঁছেছেন কাশীধাম থেকে। বাঁশবেড়িয়া রাজার আমন্ত্রণে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। না, রাজা নয়, রাজা-মহাশয়। রাজা তো কতই আছে, মহারাজাও এ ভারতভূখণ্ডে একাধিক ; কিন্তু রাজা-মহাশয় আছেন মাত্র একজনই। সারা ভারতবর্ষে। বংশবাটির শূদ্রমণি রাজারা আজ চারপুরুষ ধরে 'রাজা-মহাশয়'। স্বয়ং ভারতসম্রাট বাদশাহ্ আলমগীরের দেওয়া খেতাব। ঐ 'রাজা-মহাশয়' খেতাব সারা ভারতে আর কেউ পাননি—প্রথম পেয়েছিলেন বংশবাটির রাজা রাঘবচন্দ্র রায়ের পুত্র রামেশ্বর রায়। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ—বংশানুক্রমে সেই খেতাব ওঁরা চারপুরুষ ধরে ভোগ করে আসছেন—রামেশ্বর, রঘুদেব, গোবিন্দদেব এবং বর্তমান রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব।

নাটমণ্ডপের অপর প্রান্তে ষোড়শ-কোণ বিশিষ্ট একটি শোভাস্তম্ভের নীচে বসেছিলেন একজন তরুণ পণ্ডিত। ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়স তাঁর। সুগঠিত শরীর, উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। প্রথম বৈশাখের নবোদ্ভিন্ন আম্রপত্রের ন্যায় একটা চিক্কণ আভা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত—তাতে দীর্ঘ সামবেদী উপবীত। ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের একটি টিপ। ওখানে বসে একমনে উপবীত গণনা করছিলেন। আগামীকালের পুণ্যাহে এক হাজার আটটি উপবীত লাগবে—ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দেওয়ার প্রয়োজনে। তাই গ্রাম-গ্রামান্তরের ব্রাহ্মণবাড়ি থেকে সংগৃহীত হয়েছে তকলি অথবা চরকায় কাটা সুতোর যজ্ঞোপবীত। তিনি গুণে গুণে সেগুলি একটি কাঠের পরাতে সাজিয়ে রাখছিলেন। এবার তাঁকেই সম্বোধন করে বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, তুমি ঐ শ্লোকের অর্থ বলতে পার, শঙ্করদেব?

নিজ নাম কর্ণগোচর হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। সেটাই শিষ্টাচার। শঙ্করদেব কাব্যতীর্থ পুরোহিতের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র। সম্প্রতি উপাধি পেয়েছেন। পুত্রের পাণ্ডিত্যে পিতা গর্বিত। পিতৃদেবের মুখের উপর আয়ত দুটি চক্ষু মেলে তরুণ পণ্ডিত শুধু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কী? বল দেখি বুঝিয়ে?

—'আশা' অর্থে দিক, অর্থাৎ দশ। 'অচল' অর্থে সাত এবং 'ইন্দু' তো চন্দ্র, এক। সবটা একত্রে দশ-সাত-এক। 'অঙ্কস্য বামাগতি' সূত্রে সংখ্যাটা দাঁড়ালো সতেরোশ' দশ, অর্থাৎ বর্তমান শকাব্দ।

স্মিত তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত মুখে। শিষ্যের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক কথা। বর্তমান শকাব্দ—সতেরোশ' দশ। যাবনিক বিচারে তাহলে হচ্ছে সতেরোশ' অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দ। ঐ

প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকে রাজা-মহাশয় ভবিষ্যৎকালকে জানিয়ে দিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কালটুকু।

কার্তিকের মাঝামাঝি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গঙ্গার পরপারে পশ্চিমাকাশে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য মেঘের আড়ালে অন্তর্ধান করেছেন। তাই মনে হচ্ছে গোধূলিক্ষণ, বাস্তবে এখনও সূর্যাস্ত হয়নি। মন্দিরের চত্বর গঙ্গাবক্ষ থেকে অনেকটা উঁচুতে—নাটমণ্ডপে বসে গঙ্গার স্রোত দেখা যায় না ; তবে খাড়া বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ক্রমসঞ্চরমাণ মহাজনী নৌকার মাস্তুল ও পাল দেখা যায়। দিবারাত্র নৌকা যাতায়াত করছে গঙ্গা দিয়ে। হাজার হাজার মণ পণ্য যায় এক-একটা মহাজনী নৌকায়। গঙ্গাই এ 'গঙ্গাহৃদি'-সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। উত্তরে ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, খাগড়াঘাট, মুর্শিদাবাদ হয়ে পাটনা, কাশী। দক্ষিণে নতুন-গড়ে-ওঠা বন্দর কলকাতা। বাণিজ্যের সদর সড়কের ধারে গড়ে উঠেছে এই বংশবাটি।

নবনির্মিত মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। আগামীকাল সেখানে এসে সমবেত হবে মানুষ, মানুষ আর মানুষ। দূর-দূরান্তর থেকে। শুধু পুণ্যসঞ্চয় করতেই নয়, রাত্রে আতস-বাজির রোশনাই দেখতে। আসবেন গ্রাম-গ্রামান্তরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা—নবদ্বীপ, ত্রিবেণি, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, তেঘড়া থেকে। অনেকে ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজবাটিতে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আসবে ফরাসী চন্দননগর, কলকাতা, হুগলি থেকে সাহেবসুবো। আর আসবে সাধারণ মানুষ—কাতার দিয়ে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বাঁশের খুঁটির ওপর প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটাচ্ছে ঘোলসরা তালুকের প্রজার দল। বেগার খাটছে। তাতে দুঃখ নেই তাদের। কেন থাকবে? প্রথমত, মায়ের কাজ, দ্বিতীয়ত, রাজা-মহাশয় স্বয়ং যে ওঁদের জগজ্জননীর খাসবন্দি সেবায়েত করে যাবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। পাকা দলিলে। হুগলি কালেক্টারিতে দরখাস্ত করে আঠারো নম্বর তৌজির গোটা ঘোলসরা তালুকটা মায়ের নামে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে লিখে দিয়েছেন। ঘোলসরা তালুকের মানুষ আর রাজা-মহাশয়ের প্রজা নয়, 'মায়ে'র প্রজা। ঐ তালুকের উপার্জন থেকেই স্বয়ম্ভরা মায়ের সেবা চলতে থাকবে যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী। ঘোলসরার মোড়ল জগাই সর্দার তাই মাথায় জড়িয়েছে হাট-থেকে-কেনা নতুন গামছা। তদারকি করছে, ওরে ও সুম্বুন্দির পো! তোর বাঁ-হাতি কানাৎটুকু উঠাই লও হে! ত্যাড়চা হই গেল যে গুয়োটার ব্যাটা।

নায়েব রতিকান্ত গড়াঞ দাঁড়িয়েছিলেন অদূরে। সেখান থেকেই প্রতিবাদ করেন, গাল দিচ্ছিস কেন জগাই, অ্যাঁ? ত্যাড়চা হয়ে গেছে তো সোজা করে তোল। মায়ের ঠাঁঞে কাজ করতে এসেছে, গালমন্দ করিস না বছরকার দিন।

স্বয়ম্ভরা মন্দিরের-সংলগ্ন অনন্তবাসুদেব মন্দিরের চাতালে বসে জপ করছিলেন নসীরাম সাণ্ডেল, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। রোজ সন্ধ্যাবেলায় তিনি এসে বসেন মন্দির চাতালে। এখানেই সন্ধ্যাহ্নিক সেরে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ভদ্রাসনে ফিরে যান। জপ শেষ হয়েছিল তাঁর। মালাটি কপালে ঠেকিয়ে তিনি সায় দিলেন, অ্যা-অ্যাই! এই কথাটি তোরা ভুলিস না বাবাসকল। ঐ রতিকান্ত যে কথা বললে। এখন থেকে তোরা যে মায়ের খাস প্রজা হয়ে গেলি। তোরা তো তরে গেলি রে! কত ভাগ্য করেছিলি! এ শুধু তোদের বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যফল! তবে আবার মুখখারাপ করিস কেন, অ্যাঁ? জিহ্বা সংযত করতে শেখ—তোরা হলি মায়ের খাস প্রজা! রাধা-মাধব! রাধা-মাধব—

স্ফটিকের মালাটি আবার কপালে স্পর্শ করালেন।

জগাই মোড়ল একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বটেই তো! এখন থেকে সে যে মায়ের খাস-তালুকের মোড়ল। রসনাকে সংযত করতে হবে। নাঃ, আর মুখ খারাপ করবে না কোনদিন।

রতিকান্ত বৃদ্ধ নসীরামের দিকে ঘনিয়ে আসেন। তাঁর জপ শেষ হয়েছে দেখে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বসে পড়েন মন্দির চাতালে। বলেন, পেন্নাম হই বামুনঠাকুর। আপনার জপ সারা হল?

নসীরাম সেকথার জবাব না দিয়ে পূর্ব-প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে থাকেন, আর ওদেরই বা দোষ দেবে কেমন করে গড়াঞ? পেটে দিনরাত আগুন জ্বলছে—বাকিগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতোই তো বেরিয়ে আসবে।

—তা যা বলেছেন। বাজারের কী হাল হয়েছে! ভাবা যায় না!

মুখটা ফিরিয়ে একটু নলচের আড়াল দেওয়া সহবতে এক টিপ নস্য নিলেন রতিকান্ত।

—তাই বল না কেন! আমাদের কালে আমরা কী পেয়েছি, আর এরা কী পেল? আমার ছেলেবেলায় আমি মুর্শিদাবাদে দেখেছি, এক তঙ্কায় চার মণ চাল! খামারে খামারে উপচে পড়ছে ধানের গোলা। ছোলা-মসুর-মুগের বাখার টইটম্বুর। ভাঁড়ারে জালায় জালায় সংবৎসরের মজুত খেজুর-গুড়। তখন মাসে এক তংকা যার উপার্জন সে সপরিবারে দু-বেলা পেট পুরে গোবিন্দভোগ চালের অন্নসেবা করত।

রতিকান্ত বললে, আপনি তো নবাবী আমলের কথা বলছেন ঠাকুরমশায়। আপনার বাল্যকাল মানে তখনও কোম্পানির রাজ্যের পত্তন হয়নি। এই ফিরিঙ্গিরাই দেশটাকে খেলে!

অর্কফলাসমেত একরাশ কাশফুলের মতো সাদা চুলে ভর্তি মাথা দুলিয়ে নসীরাম বললেন, কথাটা তোমার ঠিক হল না গড়াঞয়ের-পো। শুধু ফিরিঙ্গিদের দোষ দিও না। দেশটাকে শ্মশান করে দিয়ে গেল আসলে বর্গীরা। তারা ফিরিঙ্গি নয়। হিঁদুর সর্বনাশ হিঁদুতেই করেছে: না, শুধু হিঁদু নয়, মুসলমানরাও! যেমন রাজা জগৎশেঠ, কেষ্টচন্দর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ তেমনি জাফর আলি, সিরাজ-উদ্দৌলা, মীরকাসেম আলি! ফিরিঙ্গিদের দোষ দিয়ে কী হবে? ওরা বরং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে। বর্গীদের কব্জা করেছে।

রতিকান্ত কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে, তাহলে কী হয়? বিধর্মী যে! যবন!

—ও কথা বলো না রতিকান্ত। তফাত কী? ওরা মা যশোদার নাম দিয়েছে মা মেরী। তফাত কোথায়? আমাদের হুগলির তারাচাঁদ তো সেই জগজ্জননীরই ভক্ত। ধর না কেন, আমাদের লাট-বাহাদুর— ন্যায়বিচার তো তিনিই করলেন। নবাব আলিবর্দী যে পাপ করেছিল তার কিছুটা তো স্খালন হল? রাজামহাশয়ের তালুকগুলো তিনিই তো ফেরত দিলেন। আর তোমাদের বর্ধমানের মহারাজ বাহাদুর আর নদীয়ার কেষ্টচন্দর—অম্লানবদনে গ্রাস করলেন বিধবার সম্পত্তি! এর পরেও তুমি বলবে এরা হিঁদু আর ওরা যবন?

রতিকান্ত শাস্ত্রবাক্যে একটা জুতসই জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ও পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, পেন্নাম হই না'ব মশাই। আমরা পদ্মফুল নি-এইচি আজ্ঞে। কুথায় থুব বলেন?

এক হাঁটু কাদা, উদাম গা, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা। মাথায় ছোট একটি টুকরি। ওর পিছনে আরও দু-তিনজন মানুষ—তাদের মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাঁকায় ভর্তি পদ্মফুল।

—কোন তালুকের প্রজা তোরা?

—আজ্ঞে কালীচক! আমরা আসছি গাঙের ওপার থিকে। অধমের নাম বেন্দাবন। গোমস্তামশাই হুকুম দেছিলেন, কার্তিকের আঁধার পক্ষ শেষ হবার আগের রাতে, অর্থাৎ কিনা আজ সন্ঝের ভিৎরি, ষাট-কুড়ি পৌঁছে দিতি হবে। তা কুথায় থুব বলেন?

রতিকান্ত জবাব দেবার আগেই নবনির্মিত মন্দিরের নাটমণ্ডপ থেকে ত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ হাঁক পাড়েন—তোমরা এই দিকে এস বাবাসকল। ফুলের ডালি এই মন্দির চাতালে থুয়ে দেও।

লোকগুলি সদ্যসমাপ্ত স্বয়ম্ভরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে। বৃন্দাবন তার মাথা থেকে ফুলের ডালিটা মন্দিরের চাতালে সাবধানে নামিয়ে রাখে। গামছায় মুখটা মুছে নিয়ে ডালির উপরকার ঢাকনাটা খুলে দেখায়। সদ্যফোটা একরাশ লাল পদ্মে ডালিটা ভর্তি। ত্রিপুরেশ্বর পুত্রকে আহ্বান করেন, শঙ্করদেব, ফুলের এই ডালিগুলি মন্দিরের ভিতরে পৌঁছে দাও। ওখানে মা-লক্ষ্মীরা আছেন। ওঁদের বল, এ থেকে বেছে বেছে এক হাজার আটটি নিদাগ পুষ্প চয়ন করে পরাতে সাজিয়ে রাখতে।

মুনিষরা আসছে সাত রাজ্য পাড়ি দিয়ে। তাদের পায়ে কাদা ও ময়লা। তাছাড়া তাদের জাতেরই বা ঠিক কী? মন্দির-চত্বরে তারা ওঠে না। মাটিতে দাঁড়িয়েই মন্দিরের আড়াই হাত বুক-সমান উঁচু পোতায় একে একে ঝাঁকাগুলি নামিয়ে রাখে। শঙ্করদেব এগিয়ে আসেন। মুগ্ধ হয়ে যান সদ্যস্ফুট সহস্রাধিক পদ্মের সৌগন্ধ সৌন্দর্যে। এবার ওঁকেই একা হাতে ঐ ফুলের ঝাঁকাগুলি মন্দিরের গর্ভগৃহ-সংলগ্ন 'অন্তরাল'-এ পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে আছেন রাজবাটির পুরললনার দল। নিশ্চয়ই আছেন। সারাদিন তাঁরা পাল্কিতে করে আসছেন, যাচ্ছেন। শঙ্করদেব লক্ষ করেছেন। ওঁরাই ঝাঁকা থেকে বেছে

বেছে এক হাজার আটটি নিদাগ অর্ঘ্যপুষ্প-চয়ন করে রাখবেন। ঠিক তিনি যেমন এতক্ষণ গুছিয়ে রাখছিলেন যজ্ঞোপবীত। কীটদষ্ট বা অন্যভাবে আহত পদ্মফুলে মায়ের অর্ঘ্য দেওয়া যাবে না। বৃন্দাবনের ডালিটা ভারী নয়, শঙ্করদেব প্রথমে সেটিকেই তুলে নেন। ধীরপদে এগিয়ে আসেন অন্তরালের দিকে।

নামটি সুন্দর : অন্তরাল! তার একদিকে মণ্ডপ—যেখানে সমবেত হয় হাজার ভক্ত। সেটা সদর—জনগণের কৌতুক কোলাহল, 'মা-মা' ধ্বনি আর নামকীর্তনে নিত্য-মুখরিত। অপরদিকে 'গর্ভগৃহ'—বীজমন্ত্রের আধার ; সেখানে কোলাহল নেই, আলো নেই, নৈঃশব্দ্যও নেই—উজ্জ্বল আলোও নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারও নেই। তাই তা যেন আরও রহস্যঘন।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি। মন্দিরের ভিতরটায় তবু দিনান্তের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একটি বড় পিতলের পিলসুজের উপর পঞ্চমুখী ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোকপাতে অন্তরালের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি ঈষদালোকিত। ওখানেই বসে ফুলের মালা গাঁথছেন রাজবাড়ির মেয়েরা। চোখে দেখেননি, তবে তথ্যটা জানা ছিল শঙ্করদেবের। রাজবাটির অন্দরমহলে কখনও যাননি শঙ্করদেব—কাউকে চেনেন না। তাই প্রথমেই আত্মঘোষণার উদ্দেশ্যে একটা গলা-খাঁকারি দিলেন। ফুলের ডালাটি দু'হাতে ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি। তার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হঠাৎ। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন।

অন্তরাল প্রকোষ্ঠটি আকারে ছোট। পূজার নানান উপকরণে পূর্ণ। কোষাকুষি, দীপদান, ধূপপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, জলশঙ্খ পাত্র, নানান আকারের পরাত ও তৈজস—কিছু পূজার, কিছু দানের। পা রাখবার ঠাঁই নেই। যা ভেবেছিলেন তা মোটেই নয়—বৃন্দাবনের ডালায় যেমন ভিড় করে আছে পদ্মফুল, অন্তরালগৃহটি সেভাবে রাজবাটির পুরললনায় আদৌ উপচীয়মান নয়। নির্জন ঘরে বসে আছে একটি মাত্র কিশোরী—হ্যাঁ, প্রথম দর্শনে কিশোরীই মনে হয়েছিল তাকে। একেবারে একা। তার কোলের উপর প্রকাণ্ড একটি গোড়ে মালা, পাশেই পুষ্পপাত্রে স্তূপীকৃত ফুল। মেয়েটি একমনে মালা গাঁথছিল একা—বোধ করি সে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাষাণ-প্রাচীরে ঠেস দিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে মেয়েটি, চোখ দুটি নিমীলিত। শঙ্করদেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঘৃত-প্রদীপে উজ্জ্বল ঐ অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরীর দিকে।

ইতিপূর্বে ওকে কখনও দেখেননি। কিন্তু চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। রূপবর্ণনা শোনা ছিল। বংশবাটি রাজবাড়ির এই কনিষ্ঠা রাজমহিষীর সৌন্দর্য-খ্যাতি রাজপুরীর বাইরেও প্রচারলাভ করেছিল। তাছাড়া ওর মাথায় রানিমার মুকুটটাও তার পরিচয় ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট। রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেবের দ্বিতীয়া মহিষী, রানি শঙ্করী দেবী।

কাব্যতীর্থের মনে পড়ে গেল উত্তরমেঘের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি ; যার শেষ কথা—'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।' তৎক্ষণাৎ মনে মনে সংশোধন করলেন নিজেকে—না! ও যক্ষপ্রিয়া নয়, ও কুমারসম্ভবের নায়িকা। রাজা-মহাশয়ের 'ছায়েবানুগতা'। এ হচ্ছে তপস্যারতা উমা, অপর্ণা। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। অনুষ্টুপ ছন্দে একটি শ্লোক ওঁর মনে অনুরণিত হতে থাকে। কাব্যতীর্থ কবিতা লেখেন—অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটি অজাত শ্লোক ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করতে চায় : কে কাকে আলোকিত করছে? ঐ নিবাত নিষ্কম্প ঘৃতপ্রদীপ শিখাটি কি ঐ দিবাস্বপ্নলীনা মেয়েটির রূপে মুগ্ধ, বজ্রাহত?

হঠাৎ মেয়েটি সচকিত হয়ে ওঠে। গায়ে মাথায় কাপড় টেনে দেয়। উঠে দাঁড়ায়।

শঙ্করদেব সংবিৎ ফিরে পান। ইতস্তত করে বলেন, ইয়ে—আর সবাই কোথায় গেলেন?

মেয়েটি প্রত্যুত্তর করে না। মাথার ঘোমটা আরও একটু টেনে দেয়।

শঙ্করদেব পুনরায় বলেন, আমার কাছে সংকোচ করার কিছু নেই, রানিমা। আমার নাম—থাক, নামে কী এসে যায়? অনন্তবাসুদেব মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হচ্ছেন আমার পিতৃদেব। শুনুন—

মেয়েটি মাথার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয়। প্রদীপের আলোয় আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অন্তরালবর্তিনীর অনিন্দ্য আনন। বলে, আপনিই ন্যায়তীর্থ মশাইয়ের পুত্র? কাব্যতীর্থ?

শঙ্করদেব হাসেন। গ্রীবাসঞ্চালনে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করেন। রানিমা তাহলে তাঁর পরিচয় জানেন। রানি শঙ্করী এগিয়ে আসে। শঙ্করদেব যেন এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দূরত্বটা কমে যাওয়ায় একটু সচকিত হয়ে ওঠেন। যে গন্ধটা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পথে ওঁকে হঠাৎ সচকিত করে তুলল তা কি পদ্মফুলের, না পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌগন্ধ্য? হঠাৎ রানিমা ওঁর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিতে যায়। শিউরে উঠলেন শঙ্করদেব। কী বিড়ম্বনা! এ যে দেবমন্দির! হাতে ধরা ছিল পদ্মফুলের ডালি। কাত হয়ে গেল সেটা। ঝরঝর করে একরাশ পদ্মফুল ঝরে পড়ল আনত রানিমায়ের মুকুট-লাঞ্ছিত খোঁপায়। ডালিটা ফেলে দিলেন। দু'হাত তুলে প্রতিবাদ করেন শঙ্করদেব—না, না, প্রণাম কোরো না।

মেয়েটি শোনে না। কজ্জল-লাঞ্ছিত দুটি আয়ত নয়ন ওঁর মুখে তুলে নিঃসঙ্কোচে বলে, কেন? আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের কুল-পুরোহিতের—

কথাটা তার শেষ হয় না। মাথাটা নেমে আসে শঙ্করদেবের যুগ্মচরণে।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন তরুণ পণ্ডিত। মুহূর্তের বিহ্বলতা। প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সংস্কারবশে বাধা দেন। গাত্রস্পর্শ করেন মেয়েটির। দু হাতে ওর দুই কাঁধ ধরে ফেলে বলেন, না, না, এ যে মায়ের মন্দির। এখানে একজনই প্রণম্য! এখানে আমি প্রণাম নিতে পারি না, রানিমা!

মেয়েটিও অবশ হয়ে যায়। থমকে থেমে পড়ে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে শঙ্করদেবের। হাত দুটি সরিয়ে নেন।

উদ্যত প্রণাম অসমাপ্ত রেখে রানিমা উঠে দাঁড়ায়। একথা বলে না যে, এ মন্দিরে মায়ের এখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। মৃন্ময়ী এখনও চিন্ময়ী হননি। কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য দুজনেই স্তম্ভিত। কথা নেই কারও মুখে।

ঠিক তখনই দ্বারের কাছে আবির্ভূত হল একটি অতি প্রবীণা মহিলার মূর্তি। রাজা নৃসিংহদেবের ধাত্রীজননী—সবাই ডাকে 'আয়ী-মা'। সে বোধ করি কিছু আগে এসে দাঁড়িয়েছিল ওখানে। এরা দুজন খেয়াল করেনি। আয়ী-মা বলে ওঠে, ও মা গ! তা—হ্যাঁ বামুন-ঠাকুর! মায়ের-নামে-আনা পদ্মফুলগুলান শেষ-বেশ রানিমায়ের চরণেই অঞ্জলি দিলে?

একটা আর্তনাদ আটকে গেল শঙ্করদেবের কণ্ঠে—না, না, না।

এ কী বিড়ম্বনা! পলায়নের একমাত্র পথটি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে ওই বর্ষিয়সী মহিলা। না হলে ছুটে বেরিয়ে যেতেন শঙ্করদেব। আয়ী-মা বলে, 'না' কি গো! আমি যে পষ্ট দেখনু! তা তোমারেই বা কেমন করে দুষব বামুনঠাকুর? ও আবাগীরে দেখলি মুনিরও মতিভ্যোম হয়—

আর সহ্য হল না। এবার ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করলেন কাব্যতীর্থ। শঙ্করী আয়ী-মায়ের দিকে ফিরে বললে, ছি ছি ছি! এ তুমি কী বললে আয়ী-মা? তোমার মুখের কি কোনো আড় নেই?

নিদন্ত হাসি হাসল বৃদ্ধা। বললে, আমি আবার কী বল্‌নু? যা চখ্যে দেখনু তাই বল্‌নু। নে, ফুলগুলো টুকিয়ে তোল্ দিকিন।

পদ্মফুলগুলি বৃদ্ধা নিজেই সাজিয়ে তুলতে থাকে ডালায়। গজগজ করতে থাকে আপন মনে, এ ফুলে তো আর অঘ্য হবে নে! এগুলান নে যেতে হবে রাজবাড়িতে! ভালোই হল—এ দিয়েই আজ ফুলশেষ হবে নে।

শঙ্করী অবাক হয়ে যায় : ফুলশেষ! মানে? কার?

—তোর লো, তোর! কিছুই জানিস না, না? তবে অত সাজের ঘটা কেন আজ, অ্যাঁ? ন্যাকা!

শঙ্করী মরমে মরে যায়।

সে জানত আয়ী-মায়ের ষড়যন্ত্রের কথা! জানত—হ্যাঁ, আজ তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন—তিন বৎসর বিবাহিত জীবনান্তে আজ তার ফুলশয্যা!

তাহলে একটু আগে থেকে বলতে হয়।

আজকের দিনে পাঠিকার কাছে সংবাদটা শুধু বিস্ময়কর নয়, ধাঁধার পর্যায়ে। রানি শঙ্করী ষোড়শী! তের বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল তার। তিন বছর স্বামীর ঘর করছে, এবং স্বামীও ওকে প্রোষিতভর্তৃকা করে বিদেশযাত্রা করেননি। তাহলে এতদিন পরে আজ আবার নতুন করে ফুলশয্যা কিসের?

হ্যাঁ, ফুলশয্যা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অবাক-রাত্রি যথানিয়মে এসেছিল ত্রয়োদশবর্ষীয়া শঙ্করীর জীবনেও। খাসগেলাসের আলোয়, আতসবাজির রোশনাইয়ে, সানাইয়ের মূর্চ্ছনায় আর ফুলে-ফুলে-ফুলে ভরা নারীজীবনের সেই সার্থকতার অবাক-রাত্রি এসেছিল ওর জীবনেও। তখন বোঝেনি, আজ বুঝতে পারে—সেটা ছিল শুধুমাত্র প্রহসন। তার সবটাই ফাঁকা, সবটাই ফাঁকি। বড় রানিমার একটা খেয়াল—একটা পুতুল খেলা! বঞ্চনার বেদনাটা সেদিন তিলমাত্র অনুভব করেনি শঙ্করী। আজ সেটা বুঝতে পারে। আজ সে পূর্ণযৌবনা, ষোড়শী। এ তিন বছর ও সীমন্তে দিয়েছে চীনা সিঁদুর, হাতে পরেছে কালীঘাটের শাঁখা, কামাক্ষ্যামায়ের নোয়া, কিন্তু সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা সীমন্তিনী আজও পায়নি স্বামীর উপর নিঃসপত্ন অধিকার! না, একটিমাত্র রাত্রের জন্যও নয়। ওর যখন বিবাহ হয় তখন রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেবের বয়স পঁয়তাল্লিশ। অর্থাৎ বয়সে তিনি ওর চেয়ে তিন গুণের উপর বড়। তা হোক,তবু তিনি তখনও পূর্ণ যুবাপুরুষ। একটি চুলেও পাক ধরেনি, জরা ফেলতে পারেনি তাঁর দার্ঢ্যে-ভরা মুখে আসন্ন বার্ধক্যের একটি আঁচড়। কিন্তু হলে কী হয়, বড় রানী মহামায়ার বয়সও তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, এবং সেই বয়সেও তাঁর যৌবনে ভাটার টান পড়েনি। শুভদৃষ্টির সময়ে শঙ্করী লজ্জায় সংকোচে তার স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সে জানত, পরামানিকের অভিশাপ অগ্রাহ্য করে একরাশ মেয়ে শুভদৃষ্টির কানাত উঁচু করে লক্ষ করছিল তাকে। দেখছিল, অপরূপা নববধূর লজ্জাবনতা মুখটি। পারেনি চোখ তুলে তাকাতে ফুলশয্যার রাত্রেও। ঘরে যদি তৃতীয় ব্যক্তি না থাকত তাহলে হয়তো সব সংকোচ জয় করে সে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখত—সে চেষ্টা করেছিলও একবার। বেচারি ধরা পড়ে যায়। রাজার প্রথমা পত্নী মহামায়া কৌতুকে বিদ্রূপে ওকে এমনভাবে বিদ্ধ করেছিল যে, দ্বিতীয়বার সে আর চেষ্টা করতে ভরসা পায়নি।

তাই বলে শঙ্করী ঈর্ষা করে না তার বড়দিকে। না, বড়দি তার বড় দিদির মতোই। একটু কৌতুকপ্রবণা, কলহাসিনী এবং শঙ্করীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। তা হোক, ছোট বোনকে সে ভালোবাসে প্রচণ্ড। পিতৃকুলে কেউ নেই শঙ্করীর—মাকে হারিয়েছে শৈশবে ; দিদি নেই, মাসি নেই, বৌঠান নেই, বস্তুত বাপের বাড়ির অস্তিত্বই নেই। বড়দি মহামায়ার মধ্যে তাই সে শুধু জ্যেষ্ঠা ভগিনী নয়, খুঁজে পেয়েছিল শৈশবে হারানো তার অদেখা মাকে। হাজার হোক বড়দিই তো তাকে রাজরানি করেছে। পিতৃমাতৃহীন অনাথাকে করেছে বংশবাটি রাজবাড়ির ছোট-মা।

হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা—আজকালকার ছেলেমেয়েরা—বাস্তবে ঘটনাটা ঐ রকমই ঘটেছিল। নৃসিংহদেবের দ্বিতীয়া মহিষীর জন্য পাত্রী নির্বাচন করেছিলেন মহামায়া স্বয়ং। শুধু তাই নয়—সেই অনাথা মেয়েটিকে সম্প্রদানও করেছিলেন তিনি, আবক্ষ অবগুণ্ঠনে আবৃতা হয়ে। বলতে পার রাজরানির খেয়াল, বলতে পার বড়লোকের বউয়ের অহৈতুকী জিদ। তা হোক, এমনটা কেউ কখনও শুনেছে? রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে সপত্নীত্বে স্বেচ্ছায় বরণ করা। স্বয়ং সম্প্রদান করা?

রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব মহামায়াকে বিবাহ করেন সতের বছর বয়সে ; মহামায়ার বয়স তখন আট। গৌরীদান করেছিলেন মহামায়ার পিতৃদেব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সময়টা একটা চিহ্নিত খণ্ডকাল—১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। গঙ্গার এপারে বংশবাটি যখন আতসবাজির আলোয় উদ্ভাসিত, ঠিক তখনই গঙ্গার ওপারে পলাশীর প্রান্তরে অস্ত যেতে বসেছিল সুদীর্ঘ দিনের নবাবী শাসনসূর্য।

তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সাতাশ বছর। মীরজাফরের সুলতানী শেষ হল। মীরকাশেমের স্বপ্ন নিঃশেষিত হল উদয়নালায়। বিদায় হলেন ক্লাইভ। এলেন ভ্যান্সিটার্ট। অস্তমিত হলেন কৃষ্ণনগরের

সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তারপর এল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০)। এক কোটি মানুষ প্রাণ হারালো। এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতায় স্থাপিত হল সুপ্রীম কোর্ট। মহারাজ নন্দকুমার ঝুললেন ফাঁসিকাঠ থেকে।

সতেরোশ' সাতান্ন থেকে সতেরোশ' চুরাশি!

দীর্ঘ সাতাশ বছর বিবাহিত জীবনান্তে বংশবাটি রাজমহিষীর জীবনে এল সমস্যা। দুরারোগ্য রোগের আক্রমণে শয্যাশায়ী হলেন তিনি। রাজবৈদ্য কিছুদিনের মধ্যেই স্বীকার করলেন এ রোগ চিকিৎসার অতীত। মহামায়ার জীবনের মেয়াদ আর বড় জোর দু-এক বছর। রাজা-মহাশয় অত সহজে হার মানবেন না—স্থির করলেন, হুগলি অথবা খাস কলকাতা থেকে নিয়ে আসবেন সাহেব-ডাক্তার। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না মহামায়া। বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তুমি কাশীধামে লোক পাঠাও, মাকে নিয়ে এস।

'মা' অর্থে নৃসিংহদেবের গর্ভধারিণী রানি হংসেশ্বরী। দীর্ঘদিন তিনি কাশীবাসী। সংসার ত্যাগ করে গিয়েছেন চিরকালের জন্য। নৃসিংহদেব রোগাক্রান্ত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কেন বড় বউ? মা এসে কী করবেন?

—তোমাকে সংসারী করে আবার ফিরে যাবেন কাশীতে।

—সংসারী করে? তুমি তো জান বড় বউ—তা হবার নয়। এ নিয়েই আমার সঙ্গে মায়ের মতবিরোধ হয়েছিল।

তা ভালোমতোই জানা ছিল মহামায়ার। তাঁর বিবাহ হয়েছিল নিষ্ফলা। দীর্ঘ সাতাশ বৎসরেও তাঁর গর্ভে আসেনি বংশবাটির অধস্তন পুরুষ। কত বার, ব্রত, মানত করেছেন, কত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন—তবু অভাগিনীর বুক জুড়াতে কোনও সোনার চাঁদ এল না। মা চেয়েছিলেন পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিতে—সে আমলে বহু বিবাহ না করাটাই ছিল ব্যতিক্রম—বিশেষ রাজারাজড়ার পরিবারে। কিন্তু কিছুতেই সম্মত হননি নৃসিংহদেব। কী হবে বংশরক্ষার কথা ভেবে? রাজ্যই থাকল না, তার রাজপুত্র! এ নিয়েই মতান্তর—মায়ে-ছেলেয়। মতান্তর থেকে মনান্তর। মা কাশীবাসী হয়েছিলেন। এসব তথ্য অজানা ছিল না মহামায়ার।

কিন্তু এবার জিদ ধরলেন তিনি। মহামায়াকে অদেয় ছিল না কিছুই। তবু এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না নৃসিংহদেব। আর মজা হচ্ছে এই, বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠতে লাগল ততই যেন জিদ বাড়তে থাকল মহামায়ার। মহানুভবতার প্রতিযোগিতায় তিনি এক ইতিহাস রচনা করতে বদ্ধপরিকর। এ সংসার ও স্বামীর উপর নিঃসপত্ন অধিকার। চিরকাল যা হয়ে এসেছে তাই হল। রানিমায়ের জিদই বজায় থাকল। পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজামহাশয় রাজি হলেন নূতন করে টোপর পরতে। মহামায়ার শেষ ইচ্ছায় বাধা দিতে পারলেন না। কিন্তু পাত্রী কোথায়?

মহামায়া বললেন, পাত্রী আমি দেখে রেখেছি।

নৃসিংহদেব উদাসীন কণ্ঠে বলেন, ও! পাত্রী নির্বাচনও তাহলে করে রেখেছ ইতিমধ্যে! বেশ, বল তার নাম-ঠিকানা। পালকি পাঠাই।

—পালকি পাঠাতে হবে না। সে এখানেই আছ।

—এখানেই? বংশবাটিতেই?

—না। 'এখানেই' মানে এই রাজবাড়িতেই।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাজা-মহাশয়—কী বলছ তুমি! এই রাজবাড়িতেই মানে? তাকে আমি দেখেছি? চিনি?

—দেখেছ। চেন। তাকে তুমিই উদ্ধার করেছিলে। আমি শঙ্করীর কথা বলছি।

বিস্ময়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নৃসিংহদেব। বলেন, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে বড়বৌ? শঙ্করী! সেই দশমবর্ষীয়া বালিকা!

—না, দশ নয়, আমি জানি—তার বয়স তেরো। রাজরানী হবার মতো রূপ যে তার আছে তা তুমি পুরুষমানুষ, নিশ্চয় লক্ষ করেছ?

—কী বলছ তুমি? সে যে আমার কন্যার বয়সি।

—তা হোক। আমি চিতেয় উঠতে আরো হয়তো দু-তিন বছর লাগবে। তদ্দিনে সে দিব্যি ডাগর হয়ে উঠবে।

নৃসিংহদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, অসম্ভব! এতে আমি স্বীকৃত নই।

কিন্তু সে দৃঢ়তাও রাজমহিষীর চক্রান্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল অচিরে। রোগশয্যা থেকেই যাবতীয় আয়োজন করলেন মহামায়া। কারও পরামর্শ শুনলেন না, কারও আপত্তিতে কর্ণপাত করলেন না। রাজরানির খেয়াল! কে বাধা দেবে? স্বয়ং রাজা-মহাশয়ও মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে পারলেন না। পুতুলখেলা বই তো নয়।

হ্যাঁ, মেয়েটিকে তিনিই উদ্ধার করে এনেছিলেন বটে। তখন সে ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র। বিচিত্র পরিবেশে। বিচিত্র ঘটনাচক্রে। সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে ওঁর।

*　　　*　　　*

শহর কলকাতা থেকে ফিরছিলেন নৌকায়। একাই। না, একা নয়, মাঝিমাল্লা ছাড়া সঙ্গে ছিল ভৈরব সর্দার। ওঁর দেহরক্ষী লাঠিয়াল। দিনটা সার্থক। সেই দিনই লাটবাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ওঁকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—নয়টি বাজেয়াপ্ত পরগনা বংশবাটিরাজকে প্রত্যর্পণ করা হবে। লাটবাহাদুরের প্রাসাদ থেকে সফলকাম রাজা-মহাশয় অতঃপর গিয়েছিলেন চিৎপুরে, নবনির্মিত গোবিন্দরামের নবরত্ন মন্দিরে পূজা দিতে। কালীঘাটেই যেতেন, কিন্তু অতদূর যাবার সময় ছিল না। পূজা দিয়ে চাঁদপাল ঘাটে নৌকায় চাপতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। বৈশাখ মাস। কৃষ্ণপক্ষ। ঐ সময়েই উঠল কালবৈশাখী ঝড়। বাধ্য হয়ে আরও দেরি হল নৌকা ছাড়তে। ঝড়বৃষ্টি ততক্ষণে থেমেছে। তবু আকাশ আছে কালো হয়ে—গঙ্গা এবং আকাশ একাকার হয়ে গিয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। নৌকা চলেছে উত্তরমুখো—পালের নৌকো! দাঁড়িরা দাঁড় বাইছে না, শুধু আবদুল মাঝি হালটা ধরে বসে আছে গলুইয়ের মাথায়। রাজা-মহাশয় দাঁড়িয়ে ছিলেন বজরার ছাদে। শাক্ত তিনি, মা-কালীর ভক্ত—এমন বিদ্যুচ্চকিত অমারাত্রে ভীষণা প্রকৃতি যে সেই আদ্যাশক্তিরই রূপ পরিগ্রহ করতে চায়। দু'চোখ ভরে তাই দেখছিলেন উনি। হঠাৎ একটা কোলাহলে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎচমকে রাজা-মহাশয় দেখতে পেলেন ওলাইচণ্ডী শ্মশানঘাটের খাড়া বালিয়াড়ির পাড় দিয়ে একজন মানুষ রুদ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে—সে সবলে বুকের উপর সাপটে ধরেছে কোনো কিছু। হয় কোনো প্যাঁটরা অথবা কোনো মানবশিশু। আর তার বিশ-পঁচিশ হাত দূরে তার পশ্চাদ্ধাবন করছে পাঁচ-সাতজন দস্যু। বিদ্যুৎ-ঝলকে রাজা-মহাশয় স্পষ্ট দেখলেন তাদের হাতে নগ্ন কৃপাণ। অগ্রগামী লোকটা চিৎকার করতে করতে ছুটছে—বাঁচাও! বাঁচাও!

নির্জন গঙ্গাতীর। শুধু ওলাইচণ্ডী শ্মশানঘাটে ধূমায়িত চিতার কাছাকাছি বসেছিল কয়েকজন শববাহী। তারা উঠে দাঁড়াল—কিন্তু সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। একটা 'হায় হায়' রব উঠল শুধু। বর্গীর হাঙ্গামা সদ্য-অতীত। এ দৃশ্য দেখতে তখনো ওরা অভ্যস্ত। সশস্ত্র দস্যুদলকে রুখবার জন্য তারা যে এগিয়ে আসবে না এটা নিশ্চিত। রাজা-মহাশয় নিজের অজান্তেই হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে উঠলেন—অ্যাই! খবরদার!

বজরা তখন ঘাট থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত নদীর ভিতরে। তবু নৃসিংহদেবের ধমনীতে বইছে রাজরক্ত। তাঁর পৌরুষব্যঞ্জক সাবধান-বাণীটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে খাড়া গঙ্গার পাড়ে প্রতিহত হয়ে। দস্যুদল মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। একবার চোখ তুলে দেখল বজরাটার দিকে। পরমুহূর্তেই সেটাকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হল ঐ হতভাগ্যের দিকে! প্রত্যুত্তরে ডাকাতরাও চিৎকার করে উঠল—হর-হর! ব্যোম ব্যোম!

বর্গী! এখনও নিঃশেষ হয়নি তাহলে! আজও আছে ওরা দলছুট হয়ে! ইংরাজ শাসনের গলিঘুঁজিতে দস্যুবৃত্তি করে চলেছে আজও!

সামনের লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নৃসিংহদেবের চিৎকার শুনে। তার পরেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার বিদ্যুৎ চমক দিল। নৃসিংহদেব স্পষ্ট দেখলেন—ঐ লোকটা তার বুকের তলায় চাদরে জড়ানো সম্পদটা নিয়ে সেই খাড়া পাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভরা গঙ্গায়। পরমুহূর্তে চার-দস্যু মুক্ত কৃপাণ দাঁতে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। ঝপ-ঝপ-ঝপ।

নৃসিংহদেব চিৎকার করে ডাকলেন, ভৈরব!

আহ্বানের প্রয়োজন ছিল না। দেহরক্ষী ভৈরব ঘোষ ইতিমধ্যে দ্রুত পরিবর্তিত ঘটনাচক্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সে বন্দুক হাতে এসে দাঁড়িয়েছে প্রভুর পাঁজর ঘেঁষে। রাজা-মহাশয় বলেন, বন্দুকটা আমার হাতে দে।

ঘোষের-পো আপত্তি করে না। বিখ্যাত লাঠিয়াল ভৈরব ঘোষ তার তেলপাকা চার হাত লম্বা লাঠিখানা হাতে পেলে একসঙ্গে বিশ-ত্রিশজন লেঠেলের মহড়া নিতে পারে; কিন্তু সে জানে, ঐ যাবনিক অস্ত্রটা তার প্রভুর ডাকেই ঠিকমতো সাড়া দেয়। ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে প্রতীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে মাঝি-মাল্লারা চার-পাঁচটা মশাল জ্বেলে ফেলেছে। তারই আলোয় নৃসিংহদেব দেখতে পেলেন নৌকো থেকে বিশ হাত দূরে ভাসছে সেই হতভাগ্য মানুষটির মাথা। দক্ষ সাঁতারু সে—কারণ দু'হাতে সে তখনও ধরে রেখেছে তার সম্পদ। কোনোক্রমে ভেসে আছে। নৌকোর দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। অপরপক্ষে চার-পাঁচজন দস্যু দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

অব্যর্থ লক্ষ্যে বন্দুক ছুঁড়লেন রাজা-মহাশয়—দ্রুম্! দ্রুম্!

পরমুহূর্তেই নদীর পাড় থেকে ভেসে এল সংকেত : আ—বা-বা-বা!

দস্যু-দলপতি জলে নামেনি। বোধ করি ওদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তাই এক্ষেত্রে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দস্যু-সর্দারের আহ্বান শুনে বাকি দুটি পশ্চাদ্ধাবনকারী সাঁতারু মুখ ঘোরাল। দুজন তলিয়ে গেছে অব্যর্থ-সন্ধানী নৃসিংহদেবের দু-দুটি বুলেটের বিনিময়ে।

এদিকে ভৈরবও আর অপেক্ষা করেনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জলে।

লোকটা অত্যন্ত সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়েছিল। শঙ্করীর সেটুকুই পিতৃপরিচয়। লোকটার নাম নিত্যানন্দ দাস। সম্পন্ন জোতদার। মূর্ছাহত কন্যাকে রাজা-মহাশয়ের পায়ের নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, আপনারে আমি চিনি। বাঁশবেড়ের রাজা-মশাই। রইল আমার গচ্ছিত ধন। একদিন এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

প্রস্থানোদ্যত লোকটার হাত চেপে ধরেছিলেন নৃসিংহদেব, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—আমার গোলায় ওরা আগুন দেছে। আমার ভিটে এখনও জ্বলছে, হুজুর।

নৃসিংহদেবের হাত ছাড়িয়ে লোকটা তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল গঙ্গায়।

আর কোনোদিন ফিরে আসেনি সে!

ছয় বছরের একফোঁটা মেয়েটাকে নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এসেছিলেন রাজা-মহাশয়। অপুত্রক মহামায়া তাকে মানুষ করেছেন, মেয়ের মতোই। সেই ছয় বছরের বালিকা আজ ত্রয়োদশী। সেই নাকি বংশবাটির কনিষ্ঠা রাজমহিষী হতে চলেছে।

তাই হয়েছিল। কাশীবাসী রাজমাতা অবশ্য আসেননি। তা হোক, তবু অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হতে দেয়নি মৃত্যুপথযাত্রিণী মহামায়া। নিজের বিয়ের সময় যা যা ঘটেছিল তার কোনোটাই বাদ গেল না। শুধু ঐ একটিমাত্র ব্যতিক্রম—ফুলশয্যার রাতে নববধূ দেখতে পেল, স্বামীর সঙ্গে উপস্থিত আছেন কৌতুকময়ী মহামায়া। নববধূকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, দুটো দিন সবুর করতে হবে ছুটকি। তোর তো সারাটা জীবনই পড়ে রইল, আমি যে কটা দিন আছি—বলেই অসংকোচে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিলেন রাজা-মশাইকে তাঁর বাহুডোরে—শঙ্করীর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

এক-গা ফুলের গহনা-পরা ত্রয়োদশী বালিকা লজ্জায় রাঙিয়ে উঠেছিল।

মহামায়া খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিলেন। ধমকে ওঠেন, মর্ ছুঁড়ি! আমি করছি পিরিত, আর তুই লাজে রাঙিয়ে উঠছিস কেন রে?

রাজা-মশাই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, আঃ বড় বউ! কী হচ্ছে!

সে আজ তিন বছর আগেকার কথা।

আশ্চর্য! সব ব্যবস্থা করেও মহামায়া শেষরক্ষা করতে পারলেন না। মরা হল না তাঁর। শঙ্করীর বিবাহের পর অবস্থা যখন আরও খারাপ হল তখন রাজবৈদ্য নাড়ি দেখে বললেন, সময় হয়েছে। এবার গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর। ব্যবস্থা হল। তারপর কী হল জানতে হলে আপনাদের পড়তে হবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লেখা মিসেস এলিজা ফে'র ২৭শে সেপ্টেম্বরের চিঠিখানি। মিসেস ফে তাঁর

ইংল্যান্ডবাসী ভগিনীকে ঐ চিঠিতে লিখেছেন 'রুগ্ন ও মুমূর্ষুদের বিষয়ে হিন্দুদের আরও একটা বীভৎস প্রথা আছে। এ-দেশের ব্রাহ্মণেরা শুধু পৌরোহিত্যই করেন না, চিকিৎসাদিও করেন। কোনো রুগীর মৃত্যু আসন্ন বুঝলে গঙ্গাযাত্রা বা গঙ্গাজলির ব্যবস্থা হয়। আত্মীয়রা তাকে কাঁধে করে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে জলে চুবিয়ে তার চোখ-মুখ-নাকে গঙ্গামাটি ঠেসে দেওয়া হয়। ফলে রুগী অচিরে গঙ্গালাভ করে। অর্থাৎ মরতে তাকে বাধ্য করা হয়। কারণ গঙ্গাজলির পর বেঁচে থাকলেও তাকে আর ঘরে নেওয়া হয় না। তাহলে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়।

'ডাঃ জ্যাকসন (যে আইরিশ চিকিৎসকটির কথা পূর্ব চিঠিতে লিখেছি) একবার একজন হিন্দুরাজার স্ত্রীর গঙ্গাযাত্রা শুরু হবার সময় রাজবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি রাজাকে বলেন যে, তাঁর স্ত্রীর বেঁচে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং তিনি নিজে তাঁর চিকিৎসা করবেন। ভাগ্যিস গঙ্গাযাত্রা শুরু হয়ে যায়নি! তাহলে তো মহিলাকে মরতেই হত। জ্যাকসন কোম্পানির ডাক্তার, তাঁর নামডাক খুব। রাজা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং রানির চিকিৎসা চলতে লাগল। রানি বেঁচে উঠলেন এবং আজও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন।'[1]

মোট কথা, ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে যাবার বাসনা চরিতার্থ হল না মহামায়ার। প্রথম প্রথম শঙ্করীকে বলতেন, কী করব বল্ ছুট্‌কি? মরতে কি আমার অসাধ? কিন্তু মরছি না যে। তোরই কপাল!

শঙ্করী বড়দির হাত দুটি চেপে ধরে বলত, অমন কথা বলো না বড়দি! আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক তোমার।

সে কথাটাও ছিল আন্তরিক। তারপর শঙ্করীও দেহমনে বেড়েছে। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। অনেক দুঃখে বুঝেছে—নিঃসন্তান বড়দি তাকে নিয়ে পুতুলখেলা খেলতে চায়। নিজের বিয়ের গহনা পরিয়ে দেয় তাকে, নিজের বেনারসী, বালুচরী, মসলিন দিয়ে সাজিয়ে তোলে, চুল বেঁধে দেয়, টিপ পরিয়ে দেয়, শ্বেতচন্দনের আলপনা এঁকে দেয় ললাটে, গণ্ডে। তারপর চিবুকটা তুলে ধরে দক্ষ শিল্পীর মতো দেখে ওর অনিন্দ্য মুখশ্রী। বলে, এমন না হলে রাজরানি! আজ তোকে দেখলে রাজা-মশাইয়ের মাথা ঘুরে যাবে।

কিন্তু ঐ! একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মহামায়া তার অধিকার ছাড়ে না। মুখে বলে বটে 'রাজা-মশাইয়ের মাথা ঘুরে যাবে', আসলে প্রসাধন শেষে সে ওকে রাজা-মশাইয়ের সামনে নিয়েই আসে না। হয়তো লোকলজ্জায়—আয়ী-মা বা অন্য কোনও পুরললনার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিহ্বল হয়ে সে শঙ্করীকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় শয়নকক্ষে—কিন্তু শঙ্করী ক্রমশ বুঝতে শিখল, তার সবটাই ফাঁকি। সবটাই ফাঁকা। বড়দির নির্লজ্জ ব্যবহারে শুধু শঙ্করী নয়, রাজা-মশায়ও মর্মান্তিক লজ্জিত হতেন। শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে ছুটকি যখন ছুটে পালাতো তখন খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠতেন বড়রানি। তখন অর্গলবদ্ধ হতো শয়নকক্ষ।

তারপর একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল শঙ্করীর কাছে। এক নিদাঘ দ্বিপ্রহরে শঙ্করীকে আক্রমণ করল আয়ী-মা। শঙ্করীর মহল রাজপ্রাসাদের একান্তে। আপনমনে পুতুল খেলছিল সে। আয়ী-মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ওঠ্ দেখি ছুঁড়ি! তোরে একটা কাজ করতে হবে নে। এই পানের বাটাটা নে যা। দিয়ে আয় রাজা-মশাইকে।

দিবাভাগে রাজা-মহাশয় থাকেন বা'র মহলে। বেলা দ্বিপ্রহরে অনন্তবাসুদেবের ভোগ শেষ হলে মধ্যাহ্নে আহার করতে আসেন অন্দর-মহলে। বড়রানির শয়নকক্ষে রেশমের আসনে বসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাপ্ত করেন। মহামায়া বসে থাকেন পাঙ্খা হাতে অদূরে। "এটা খাও, ওটা খাও—না খাও তো আমার মাথা খাও"—নিত্য রসিকতায় মধ্যাহ্ন আহারের পর্বটা শেষ হত। তারপর রাজা-মহাশয় পান মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করেন। কখনও বা কাব্য পাঠ করে শোনান মহিষীকে। অপরাহ্নে আবার ফিরে গিয়ে বসেন বা'র মহলে। সে মধ্যাহ্ন নাটকে শঙ্করীর কোনো ভূমিকা নেই। তাই সে অবাক হয়ে বলে, কেন? বড়দির কী হল?

—তেনার বাপের বাড়ি থিকে নোক এসেছেন। তুই আয় দেখি মুখপুড়ি।

জোর করে ওকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আয়ী-মা। শঙ্করী চোখ তুলে দেখল—রাজা-মহাশয় বড়রানির পালঙ্কে অর্ধশয়ান হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে ফরসির নল। সবরকম আয়োজন

সম্পূর্ণ করেই মহামায়া গিয়েছিলেন মাঝমহালে, তাঁর ভাইয়ের তদারকি করতে। 'মাঝ-মহাল' একটা মধ্যবর্তী অংশ, যেখানে প্রয়োজনে অন্দর-মহলের মানুষ বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারে—কখনও চিকের পর্দার ওপাশ থেকে, কখনও বা প্রকাশ্যে।

সলজ্জ চরণে ওকে অগ্রসর হতে দেখে উঠে বসলেন রাজা-মহাশয়। ওর প্রসারিত করমুষ্টিতে ধৃত রূপার বাটায় পান-গুবাকের আয়োজনটা দেখে বললেন, তোমার বড়দির ত্রুটি সংশোধন করছ বুঝি?

শঙ্করী নতনয়নে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। পানের বাটা নামিয়ে রেখে প্রস্থান করবে কি না স্থির করে উঠতে পারে না। রাজা-মহাশয় নিজে থেকে বলে ওঠেন, কিন্তু তোমার বড়দি তো শুধু পান দিয়েই নিষ্কৃতি পায় না। এই সময় গল্পও করে আমার সঙ্গে। তুমি বসে গল্প করবে না? বস না?

পঞ্চদশী শঙ্করী কোথায় বসবে বুঝে উঠতে পারে না। বড়দি এক্ষেত্রে কোথায় বসে? ঘরে একটি মাত্র পালঙ্ক। গদি-মোড়া কেদারা কিছু আছে বটে—কিন্তু তা একেবারে ও-প্রান্তে। সেখানে গিয়ে বসলে গাল-গল্প করা যায় না। খাটের বাজু ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওর হাত থেকে পানের বাটাটি গ্রহণ করার পরিবর্তে হাতটা চেপে ধরেন রাজা-মহাশয়। একটু আকর্ষণ করে বলেন, বস এখানে, এই পালঙ্কে।

অগত্যা। গায়ে-মাথায় ভাল করে কাপড় টেনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে শঙ্করী।

—তুমি কী কর সারাদিন? পুতুল খেল?

শঙ্করীর ইচ্ছা হল বলে, আমি কি বাচ্চা মেয়ে? পারল না বলতে। বড়দি ঘরে থাকলে হয়ত বলতে পারত। একেবারে নির্জন ঘরে পুরুষমানুষের কাছে অতটা প্রগল্ভ হওয়া যায়? মাথা নেড়ে সে জানাল—না।

রাজা মহাশয় বললেন, বড় গরম লাগছে, একটু হাওয়া করবে?

শঙ্করী তালপাখাটা তুলে নেয়। হাওয়া করতে হলে এতটা দূরে থেকে তা করা যায় না। উপায় নেই। বাধ্য হয়ে একটু ঘনিয়ে আসে শঙ্করী। হঠাৎ পাখাসমেত ওর হাতখানা চেপে ধরেন রাজা-মশাই। শঙ্করী যেন কাঠের পুতুল। তটস্থ হয়ে যায়। রাজা-মহাশয় বলেন, তুমি আমার উপর খুব রাগ করে আছ, না?

এবার অসংকোচে সে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

জীবনে প্রথম।

বললে, কেন? আপনার উপর রাগ করব কেন?

—আমি বুড়ো বর বলে?

দৃষ্টি নত হল শঙ্করীর। জবর একটা জবাব ওর মনে এসেছিল, কিন্তু সংকোচে বলতে পারল না। রাজা-মহাশয় পুনরায় বলেন, কই জবাব দিলে না?

সব সংকোচ জয় করে এবার বাধ্য হয়ে জবাব দিয়েছিল শঙ্করী। বেচারি জানে না, এই একটিমাত্র বাক্যই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। নতনয়নে মরিয়া হয়ে শঙ্করী শুধুমাত্র প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, আপনি রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' পড়েছেন?

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বংশবাটির রাজা-মহাশয়, নৃসিংহদেব রায়। নিজে তিনি সুপণ্ডিত। একাধিক ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার। সংস্কৃত, আরবী, ফারসি এবং ইংরাজি। সংস্কৃত এবং ফার্সিতে তিনি কবিতাও লিখতেন। 'উড্ডীশতন্ত্র' নামে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর রচিত একটি গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ বঙ্গভাষায় অনুবাদও করেছেন। তাঁর রাজ্য নেই, কিন্তু রাজসভা আছে—এবং সেখানে একাধিক হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত-উলেমা মাসোহারার বন্দোবস্তে হাজিরা দেন। ওঁর এ পরিচয় অবশ্য শুধু বা'র মহলেই সীমিত। অন্দর-মহলে এ জাতীয় কথোপকথন ওঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে কখনও করতে হয়নি। মহামায়ার অক্ষর-পরিচয়ই নেই—রাজা-মহাশয় তাঁকে কাব্য পড়ে শোনাতেন। জুত হত না।

বিস্মিত রাজা-মহাশয় বলেছিলেন, তুমি বাঙলা পড়তে পার? কোথায় শিখেছ?

—পাঠশালায়। তারপর নিজে নিজে।

—কী কী বই পড়েছ তুমি?

—বই পাব কোথায়? তবে অন্নদামঙ্গলের একটা পুঁথি তো আপনার ঘরেই আছে।

—তুমি 'বিদ্যাসুন্দর' পড়েছ?

শঙ্করী জবাব দেবার সুযোগ পায়নি। নূপুর ঝঙ্কারে সে সচকিত হয়ে দ্বারের দিকে ফেরে। দেখে, পরমুহূর্তেই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন মহামায়া। যেন অনধিকারী—লাফ দিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়েছিল শঙ্করী। এমন পরিবেশে সে আশঙ্কা করেছিল, বড়দি কৌতুকে ফেটে পড়বে : 'হ্যাঁ লা ছুটকি! তোর পেটে পেটে এত?' —না, সে-জাতীয় কোনো কথা বড়দি বলেনি। একদৃষ্টে সে শুধু তাকিয়ে দেখছিল ওদের দুজনকে। যেন কিছু একটা পরিমাপ করতে চায়। সে দৃষ্টিতে কৌতুক ছিল না, রহস্যের বাষ্পমাত্র ছিল না। আর বড়দির সেই জ্বলন্ত চোখ-জোড়া থেকেই অনেক কিছু বুঝে ফেলেছিল শঙ্করী।

অপরাধী যেন রাজা-মহাশয় নিজেই। যেন পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলেন এতক্ষণ। ধড়মড়িয়ে তিনিও উঠে পড়েন। বলেন, বেলা যায়। এবার যাই!

ছুটে এসে বাধা দিয়েছিলেন মহামায়া, সে কী কথা রাজা-মশাই! তোমার বিদ্যাকে 'সুন্দর'-এর উপাখ্যানটা না শুনিয়েই চলে যাচ্ছ যে!

রাজা-মহাশয় মহামায়াকে সরিয়ে নীরবেই স্থানত্যাগ করেছিলেন।

এ থেকেই সূত্রপাত। বড় রানিমার ঘরে হাতে-লেখা পুঁথিটা এরপর চুরি করেছিল শঙ্করী। সে জানত, ঐ কাব্যগ্রন্থ থেকে রাজা-মহাশয় পাঠ করে শোনাতেন মহামায়াকে। কী আছে সে গ্রন্থে তা জানত না এতদিন। এবার জানলো। এবং তারপরেই রহস্য-যবনিকাটা সম্পূর্ণ সরে গেল ওর দৃষ্টিপথ থেকে।

বালিকা শঙ্করী যুবতী হল!

পরিবর্তন একা শঙ্করীর হয়নি। হয়েছিল মহামায়ার এবং নৃসিংহদেবের। দোষ দেব কাকে! এই তো জগতের নিয়ম। জগৎ তো 'গম্ ধাতু কিপ্'—পরিবর্তন আছে বলেই না জগৎ? মানুষ ভাবে এক; হয় আর। মহামায়ার কথাই ধরা যাক :

আট বছর বয়সে এসেছিল এ সংসারে। নবাবী আমলে। তারপর দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস গেছে আমূল বদলে, কিন্তু এ ত্রিশ বছরে মহামায়ার জীবনে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। তোমরা বলবে হয়েছে—বালিকা হয়েছে কিশোরী, তরুণী, যুবতী। আজ সে আটত্রিশ বছরের প্রৌঢ়া। তা হোক—তবু তার ধারণা ছিল, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার অধিকার একদিনের জন্যও শিথিল হয়নি। নৃসিংহদেবের একমুখী প্রেমে কোনোদিন কোনো খাদ মেশেনি। প্রথমা পত্নীর সন্তান না হওয়ায় ওঁর জননী হংসেশ্বরী দেবী বহু চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে সম্মত করাতে পারেননি পুত্রকে। তারপর হল ওর মরণাপন্ন অসুখ। কবিরাজ নিদান হাঁকলেন—মেয়াদ এক বছর। জীবনদীপ নিবিয়ে দেবার আগে মহামায়া চেয়েছিল একটা মহান ত্যাগের নজির রেখে যাবে। স্বামীকে সুখী করাই যে ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তার অকাট্য প্রমাণ রেখে বিদায় নেবে। অজানা-অচেনা নয়, তাই সে নির্বাচন করেছিল তার কন্যার মতো ঐ শঙ্করীকে। মাত্র ছয় বছরের বালিকাটিকে নৃসিংহদেব এনে ফেলে দিয়েছিলেন নিঃসন্তানা মহামায়ার ক্রোড়ে। বলেছিলেন, ভগবান এক হাতে দিলেন না, অন্য হাতে তোমাকেই দিয়েছেন। নাও—মানুষ কর একে।

মহামায়া নিজের গর্ভজাত কন্যার মতোই তাকে মানুষ করেছেন। সাজিয়েছেন পরিয়েছেন, পুতুল খেলেছেন। জননীত্বের শখ-আহ্লাদ মিটিয়েছেন। শঙ্করীর মধ্যে তিনি যেন নিজ শৈশবকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শঙ্করী যেন দ্বিতীয়া মহামায়া। তাই যখন ওপারের ডাক এল, তখন নিরভিমান উদারতায় ঐ মেয়েটিকেই দিয়ে যেতে চাইলেন তাঁর সবচেয়ে আদরের সম্পদটিকে।

কিন্তু! মানুষ ভাবে এক, হয় আর। ওপারে পাড়ি দেওয়া হল না। না হোক। তবু ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মহামায়া নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাঁর স্বামীর ঐকান্তিক প্রেমের ভাগীদার কোনোদিন হতে পারবে না ঐ একফোঁটা মেয়েটা। এ হয় না, এ অসম্ভব!

তবু সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে বসেছে। ঐ একফোঁটা মেয়েটা ক্রমে যেন ভাদ্রের ভরা গাঙে

রূপান্তরিতা হতে চায়। পক্ষিশাবক যেন আর তার পরিচিত নীড়ে আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়—এবার সে মুক্ত নীলাকাশে ডানা মেলতে চায়। আর সেখানে তার জননীর কোনো ভূমিকা নেই। যে মা তাকে শৈশবে আহার জুগিয়েছে, উড়তে শিখিয়েছে, সেই মাকে পিছনে ফেলে তারুণ্যের উদ্দামতায় সে নিঃসঙ্গ-সঞ্চারী জীবনে অভিষিক্ত হতে চায়। না, নিঃসঙ্গ নয়—সঙ্গী যে সেও চায়। আর সঙ্গী হিসাবে সে চায় এমন একজনকে,—কিন্তু ওর দোষ কোথায়? এ যে মহামায়ার স্বখাত সলিল!

মহামায়া বুঝল সবই—মেনে নিতে পারল না। প্রাণপণে সে রুখতে চাইল এই অনিবার্য পরিণামটাকে। চোখে-চোখে রাখতে থাকে দুজনকে। ওর বাপের বাড়ি থেকে ভাই এসেছিল নিমন্ত্রণ করতে। ওর ছোট ভগিনীর বিবাহ। কিন্তু প্রাণ ধরে সেখানে যেতে পারল না মহামায়া। ও বুঝতে পেরেছে—মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হলেই ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঐ নবযৌবনবতী শঙ্করী এই সুযোগই খুঁজছে; আর খুঁজছে আর একজন। যাকে এতদিন অকুণ্ঠ বিশ্বাস করে এসেছেন মহামায়া—ঐ প্রৌঢ় মানুষটা। ছি ছি ছি!

কিন্তু দোষ কি রাজা-মহাশয়কেই দেওয়া যায়? হ্যাঁ, তিনি দ্বিতীয়বার যখন বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন তখন তাঁর একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—মৃত্যু-পথযাত্রিণী সহধর্মিণীর শেষ ইচ্ছা পূরণ। এ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মানুষ তার নিজের মনটাকেই বা কতটুকু চেনে? হ্যাঁ, সেই বালিকা আজ ষোড়শী; তার এ পরিবর্তন যে হবে তা তো জানাই ছিল। ছিল অন্তত মহামায়ার, যে বলেছিল—'আমি আর কদিন? তদ্দিনে শঙ্করী দিব্যি ডাগর হয়ে উঠবে।' কথাটা মেনে নিয়েছিলেন, মনে নেননি! নৃসিংহদেব চরিত্রগতভাবে ইন্দ্রিয়সংযমী। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর পাঁচজন রাজা-রাজড়ার মতো আদৌ নন। তাঁর চরিত্র সেদিক থেকে নিষ্কলঙ্ক। বাইজির আসর বসত না তাঁর বিলাসকুঞ্জে। শঙ্করী যদি সাধারণ পুরললনা হত, তাহলে তিনি মাতৃজ্ঞানেই তাঁকে সমীহ করে চলতেন—কিন্তু কেমন করে আজ তিনি ভুলে যাবেন—ও তাঁর স্ত্রী! সহধর্মিণী। তার মনেও এতদিনে কামনা-বাসনা জাগতে পারে! জেগেছে। সে দায় মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব যে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। প্রতিগৃহ্ণামি! তিনি যে দেখেছেন, ঐ মেয়েটির চোখের পাতায় প্রত্যাশা কাঁপছে। অন্নদামঙ্গলের উমা যেন বৃদ্ধ পতির প্রতি তাঁর দেহমনের অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছেন।

অন্নদামঙ্গল! হ্যাঁ, মেয়েটি বাংলা পড়তে পারে। কবিপ্রকৃতির রাজা-মহাশয় হঠাৎ এই প্রৌঢ় বয়সে আবিষ্কার করে বসেছেন—তাঁর দাম্পত্যজীবনের একটা দিকে ফাঁক ছিল। ঐ মেয়েটি হয়তো তা পূরণ করতে পারবে। আজ না পারুক, দুদিন পরে। ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করলে। সে চেষ্টা করেছিলেন রাজা-মহাশয়—কিন্তু শঙ্করী রাজি হয়নি কোনো পরপুরুষের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে। না, বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছেও নয়। মহামায়ার কটাক্ষ অস্বীকার করে অগত্যা তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সে দায়িত্ব। কয়েকদিনের মধ্যেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী, অধ্যবসায়ী। প্রতিদিন সে পাঠ নিত, পাঠ দিত। মহামায়ার উপস্থিতিতেই। রাজা-মহাশয় আর সন্ধ্যার পর বা'রমহলে যান না। খাসগেলাসের আলোয় পড়াতে বসতেন কনিষ্ঠা পত্নীকে। মহামায়া অদূরে বসে পাহারা দিত। সে বুঝে নিয়েছিল—এখানে তার এক বাজি হার হয়েছে। এখানে বাধা দিতে গেলে সে সম্পূর্ণভাবে হেরে যাবে। তাই সে মেনে নিয়েছিল এ ব্যবস্থা।

ইংরাজী শিখতে সম্মত হল না শঙ্করী। বললে, বাংলা আর সংস্কৃতটাই আগে ভালো করে শিখি। বাংলা ছাপা বই কোথায় পাবেন? বছর পাঁচেক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে 'হিকির গেজেট' কিন্তু তাও ইংরাজি ভাষায়। হাতে লেখা কিছু পুঁথি ছিল—বৈষ্ণব কবিদের। সেগুলি পাঠ শুরু কবার পরেই একদিন বিস্ফোরণ হল। সরল বিশ্বাসে শঙ্করী তার শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিল—ঐ পংক্তিটার অর্থ কী হল? ঐ যে—'কচুয়া ধরত যব হাসিয়া'?

শিক্ষক ইতস্তত করছিলেন ব্যাখ্যা দিতে।

মহামায়ার অক্ষর-পরিচয় নেই, কিন্তু রাজা-মশায়ের কাছে শুনে শুনে বৈষ্ণব পদাবলী ভালই জানা ছিল তার। হঠাৎ ক্ষেপে গেল সে। দুম্‌দুম্ করে উঠে গেল এবং একখানা হাতে-লেখা পুঁথি এনে ফেলে দিল শিক্ষক আর শিষ্যার মাঝখানে। বললে, তাহলে এটাই বা বাকি থাকে কেন? নাও, পড়াও। আমি বরং চলে যাচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

শঙ্করী চোখ তুলে দেখে পুঁথিখানা তার সুপরিচিত। 'বিদ্যাসুন্দর'। চুরি করে পড়ে সেটাকে সে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিল। বড়দির ব্যথাটা কোথায় এখন সে বুঝতে পারে। বড়দির ক্রোধোন্মত্ততাই তাকে বুঝিয়ে দেয়—যে পংক্তিটির অর্থ সে জানতে চেয়েছিল তার মানে কী। লজ্জা পায় শঙ্করী। তার চেয়েও দুঃখ হয় বেশি। বড়দি কেন এভাবে মিছামিছি হিংসা করছে তাকে?

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে সেও প্রস্থানের উদ্যোগ করে।

বাধা দেন রাজা-মহাশয় স্বয়ং। বলেন, যেও না, বস। তোমার বড়দি অহেতুক উষ্মা প্রকাশ করছেন। এ রাজ্য এখন আর তোমার কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল নয়। তুমি বয়ঃপ্রাপ্তা। বস, তুমি যে প্রশ্নটা করলে তার অর্থ—

বাধা দিয়ে শঙ্করী বলেছিল, থাক। আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি তার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

ঘর নির্জন। মহামায়া অনুপস্থিত। রাজা-মহাশয় সকৌতুকে বলেন, কী ওর অর্থ, বল তো?

স্বামীর মুখে আয়ত দুটি চক্ষু মেলে শঙ্করী বললে, আমি ঐ পুঁথিখানাও পড়েছি। ইঙ্গিতে সে রায়গুণাকরের কাব্যটিকে দেখায়।

রাজা-মহাশয় একবার গ্রন্থটি একবার তাঁর সহধর্মিণীকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করেন, কোন্ কাব্যটি তোমার কাছে বেশি ভাল লেগেছে? 'অন্নদামঙ্গল' না 'বিদ্যাসুন্দর'?

বড় কঠিন প্রশ্ন। মহা-মহা পণ্ডিতরাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। শঙ্করী একটু ভেবে নিয়ে বললে, অন্নদামঙ্গল।

এ জবাব প্রত্যাশা করেননি রাজা-মহাশয় ঐ যুবতী নারীর কাছে। যে হতভাগিনী স্বামী পেয়েও পায়নি। ষোলোটি বসন্ত যার তনু-মন থরে থরে ভরিয়ে তুলেও সার্থকতা খুঁজে পায়নি। তিন বৎসর বিবাহিত জীবন অতিক্রম করেও যে জানে না—পুরুষমানুষ মুখে চুমু খেলে দেহে কী জাতের শিহরন জাগে! রাজা-মহাশয় নিঃসংশয়ে বুঝলেন, মেয়েটি সংকোচে, সরমে, সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করছে। সাহিত্যে যে পরিমাণ অধিকার থাকলে বলা যায়—তুলনামূলক বিচারে 'অন্নদামঙ্গল' শ্রেষ্ঠতর স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য, সেজাতীয় শিক্ষা ওর নেই। তাই প্রশ্ন করলেন, কেন বল দেখি?

মেয়েটি জবাবে যে কথা বলল তাতে আরও অভিভূত হয়ে পড়লেন নৃসিংহদেব। স্পষ্ট উচ্চারণে শঙ্করী বলল, কোন কাব্যগ্রন্থ উৎকৃষ্টতর তা বলতে পারবেন পণ্ডিতেরা। আমার কাছে অন্নদামঙ্গল ভালো লেগেছে দুটি কারণে। প্রথমত, অন্নদামঙ্গলই হচ্ছে আমার জীবনে প্রথম পঠিত কাব্যগ্রন্থ। স্বতই তার প্রতি একটু বেশি মমতা আছে আমার। দ্বিতীয় কথা, 'বিদ্যাসুন্দর' আমি বড়দির দেরাজ থেকে চুরি করে পড়েছিলেন। অপরাধবোধ আছে তাতে।

নৃসিংহদেব বুঝতে পারেন—এ মেয়েটি শুধু মেধাবী নয়, প্রতিভাময়ী। বিচারবুদ্ধি তার প্রখর। রূপের জন্য নয়, বুদ্ধির জন্যই সে রাজমহিষী হবার উপযুক্ত। অত্যন্ত প্রীত হন তিনি। বলেন, কিন্তু চুরি করে যদি ভালো জিনিস খাওয়া যায় তাতে স্বাদ তো কমে না, ছোট বউ! তা তো আরও মধুর লাগে! চুরি করে খাওয়ার মাধুর্য!

একটু চমকে ওঠে শঙ্করী। জীবনে এই প্রথম রাজা-মহাশয় তাকে ঐ নামে ডাকলেন। শব্দটা তার কানে মধুবৃষ্টি করল। 'ছোট বউ'! অর্থাৎ এতদিনে সে বংশবাটির কনিষ্ঠা মহিষীর মর্যাদা পেল। সেই প্রাপ্তির আনন্দেই বোধ করি আরো একটু প্রগল্‌ভা হয়ে পড়ে শঙ্করী। বলে, তাই হয় রাজা-মহাশয়। মধুর হয়তো লাগে, কিন্তু তাতে তার মূল্যমান বাড়ে না। 'বিদ্যাসুন্দর' হচ্ছে আমার কাছে চুরি করে খাওয়া কুলের আচার ; আর 'অন্নদামঙ্গল' শৈশবের মাতৃস্তন্য। আপনি পণ্ডিত ; এবার বলুন শুধু ভালো লাগাটাই কি তাদের ঔৎকর্ষের কষ্টিপাথর?

নৃসিংহদেব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন, তুমি আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছ, ছোট বউ। এতটুকু বয়সে এত সুন্দর কথা বলতে তুমি শিখলে কেমন করে? বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভারি ভালো লাগছে আজ।

শঙ্করী কিন্তু বসেনি। যথেষ্ট দূরত্ব রেখেই বলেছিল, এবার কিন্তু তুলনাটা আপনার নিজের প্রতি প্রয়োগ করার সময় হয়েছে রাজা-মহাশয়!

—তার মানে?

—আপনার ছোট বউও 'কুলের আচার'! মুখরোচক হলেও তা হয়তো আপনার কাছে পুষ্টিকর নয়। আপনি আপনার অভ্যস্ত 'অন্নদামঙ্গলের' রসাস্বাদনেরই চেষ্টা করুন।

কথাটা বলেই ছুটে পালিয়ে এসেছিল ছুটকি।

নিজেকে শঙ্করীও ঠিক চিনতে পারেনি। বুঝে উঠতে পারেনি, সে কী চায়। ধরা দিতেই যদি চায় তাহলে এমন করে বারে বারে পালিয়ে আসে কেন? সে কি অনাঘ্রাতা কুমারীর সহজাত সংকোচ? লজ্জা? না কি বড়দির মনে ব্যথা দিতে চায় না বলেই। বড়দি তো শুধু তার বড়দি নয়, সে যে তার মা! সে সম্পর্কে নৃসিংহদেব যে আবার তার পালক-পিতা। অথচ নারায়ণ-শিলা আর অগ্নি সাক্ষী করে সে তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করেছে। দ্বিতীয় কোন পুরুষমানুষের দিকে সে কখনও চোখ তুলে তাকায়নি, তাকাবে না। ইতিমধ্যে বিদ্যাসুন্দর পড়ে, বৈষ্ণব-সাহিত্য পড়ে, সে বুঝতে শিখেছে কী ভাবে তার নারীজন্ম সার্থক হতে পারে। বংশবাটির রাজা-মহাশয় আজও অপুত্রক। যে সার্থকতা মহামায়া আনতে পারেনি রাজা-মহাশয়ের জীবনে, সেই অসম্পূর্ণতাকে সুসম্পন্ন করতেই সে জন্মগ্রহণ করেছে এ ধরাধামে। আর তার প্রথম ধাপ ঐ বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষোত্তমের বাহুবন্ধে ধরা দেওয়া। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? বড়দির চোখের সামনে?

সে রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিল আয়ী-মা। এ রাজবাড়িতে ঐ নিরক্ষরা বৃদ্ধা মহিলার একটা মর্যাদা আছে। বোধ করি রানি-মা হংসেশ্বরীর অবর্তমানে সে-ই সে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিতা। স্বয়ং রাজা-মহাশয়কে ভূমিষ্ঠ করেছিল সে। একদিন তার সঙ্গে তুমুল কলহ হয়ে গেল মহামায়ার। যে কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলতে পারছিলেন না নৃসিংহদেব অথবা শঙ্করী, সে কথাটা নির্লজ্জ ভাষায় বলে বসল আয়ী-মা।

পরিবেশ সেই একই। রাজা-মহাশয়ের আহারান্তিক মধ্যাহ্ন অবকাশ। আজকাল অবশ্য তিনি সময়ই পান না। স্বয়ম্ভরা মন্দির সমাপ্ত হয়েছে। আগামী কার্তিক অমাবস্যায় দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। আর মাত্র তিন দিন বাকি। অতিথি-অভ্যাগতরা প্রতিদিনই আসছেন। গঙ্গার ধারে তাঁবু পড়েছে। উঠেছে অস্থায়ী ছাউনি। এই ব্যস্ততায় তাই রাজা-মহাশয় সময়ই পান না। তবু আহারান্তে অভ্যাসমত তামাকু সেবনে বসেছিলেন অর্ধদণ্ডের জন্য। হঠাৎ শঙ্করীর হাত ধরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল আয়ী-মা। রাজা-মহাশয় শায়িত অবস্থায় ছিলেন। হাজার হোক, আয়ী-মা মাতৃস্থানীয়া—তাই উঠে বসলেন তিনি। বললেন, কী সমাচার আয়ী-মা?

—এ আবাগী তোরে নেমন্তন্ন করতে এয়েছে, বাপ্।

—নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ রে ছুট্কি? প্রশ্ন করলেন মহামায়া। তিনিও উঠে বসেছেন।

—বের্‌ত। চতুরদশীর রাত্তিরে।

মহামায়া পুনরায় বলে, এবারও শঙ্করীকে—তা নিমন্ত্রণ করতে চাস নিজে এসেই করলে পারতিস। আবার দূতী সঙ্গে নিয়ে এসেছিস কেন রে ছুট্কি?

এবারও জবাব দিল আয়ী-মা, তোমায় ছুট্কি যে ডরায়। নিজের ঠাঞে নিজেই চোর হয়ে আছে। কপাল!

যে নিমন্ত্রণ করছে এবং যাকে করছে তারা দুজনেই নীরব। মহামায়াই আবার ব্যঙ্গ করে বলে ওঠেন, আহা-হা! মরে যাই! তা কার্তিকের কেষ্টপক্ষের চতুর্দশীতে আবার কিসের ব্রত? এ তো অনন্তচতুর্দশীও নয়, শিবচতুর্দশী নয়। ভূতচতুর্দশী ব্রত নাকি?

কথায় পার পাবে না আয়ী-মার সঙ্গে। অম্লানবদনে বললে, আজ্ঞে না, বড়রানিমা। পেত্নী চতুর্দশী। ছুট্কির ঘাড়ে যে পেত্নী চড়ি বসিছেন, তাঁরেই নামানোর বের্‌ত।

মুখ কালো হয়ে ওঠে মহামায়ার। গম্ভীর হয়ে বলেন, এতবড় কথাটা তুমি বললে আয়ী-মা?

আয়ী-মা নির্ভীক। বলে, ও মা! আমি আবার কই বলনু? তুমিই তো আমারে দে বলালে।

এতক্ষণে রাজা-মহাশয় এ কথোপকথনের ভিতর প্রবেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। ব্যাপারটা লঘু করতে বলে ওঠেন, বেশ তো, আমরা যাব। নিমন্ত্রণ যখন হয়েছে—

—আজ্ঞে না, রাজা-মশায়। 'আমরা' লয়, 'আমি'। নেমন্তন্ন তোমার একার।

আবার রুখে ওঠেন মহামায়া। আয়ী-মাকে অগ্রাহ্য করে শঙ্করীকেই প্রশ্ন করেন, কেন রে ছুট্‌কি? তোর বড়দিকে দুটি রেঁধে খাওয়াতে পারিস না?

শঙ্করী কী জবাব দেবে? সমস্ত ষড়যন্ত্রটাই যে আয়ী-মার। কিন্তু শঙ্করীকে জবাব দিতে হল না। বাক্‌পটু আয়ী-মা তৎক্ষণাৎ বললে, তা পারবে না কেনে গো? এস না তুমি, আজ এস, কাল এস, পরশু এস। ছুট্‌কি তার মহলে বইসে তোমারে পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াবে। তবে বের্‌ত বলে কতা। চতুর্দশীর রাত্তিরে রাজা-মশাই অন্নসেবা করে ওঁয়ার মহালেই শোবেন যে।

এতক্ষণে পরিকল্পনাটার পূর্ণ অর্থগ্রহণ হয় বড়রানির। ফস্ করে বলে বসেন, ও। তাহলে আসল ষড়যন্ত্রটা এই? ফন্দিটা কার? তোমার না ছুট্‌কির?

এবার আয়ী-মাকে সে সরাসরি প্রশ্ন করেছে। তাই জবাব দিতে তার দেরি হয় না। বলে, আমারও লয়, ছুট্‌কিরও লয়, বড়রানিমার। তেনিই তো জিদ করে রাজা-মশায়ের বে দেওয়ালেন।

আর সহ্য করতে পারেননি মহামায়া। দুরন্ত ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন, তুমি এমনি করে আমার সর্বনাশ করবে আয়ী-মা! দুধ-কলা দিয়ে কী সাপই পুষেছিলাম!

অজান্তে সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছে বড়রানি। এবার দুধ-কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তুলে দাঁড়ালো। বললে, কতাটা যখন তুললে বড়রানি তখন খুলেই বলি। রানিমা কাশীবাসী না হলে সে-ই বলত। দুধ-কলা দিয়ে যে আমারে এ রাজবাড়িতে পুষেছেল সে তুমি লয়, তোমার শ্বশুর। তিনি সগ্য থেকে দেখতেছেন—তুমি বুড়ি মাগী হই গেলে—আজও বোঝ না এ বাছার পরাণডা কেমন করে? না বোঝ, নাই বোঝ—কিন্তুক্ এটুকু তো বোঝ বংশবাটির বংশে পিদিম জ্বালাবার সলতে আজও পয়দা হয়নি? ছি ছি ছি! এভাবে বুড়ো বয়সে সোয়ামিরে আগলে রাখতি সরম হয় না তোমার? আয় রে ছুট্‌কি।

শঙ্করী একটা কথাও বলতে পারেনি। আয়ী-মা ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। ওরা জানতেও পারেনি পরমুহূর্তেই বংশবাটির বড়রানিমা লুটিয়ে পড়েছিল তার বিছানায়। বালিশটা আঁকড়ে ধরে তারপর তার কী ফুলে ফুলে কান্না!

একটু পরে ওকে হাত ধরে পুনরায় বসিয়ে দিয়েছিলেন রাজা-মহাশয়। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেছিলেন, বড় বউ! আজ তুমি রাগ কর, অভিমান কর, কিন্তু এ কথাটা তো অস্বীকার করতে পার না—এর জন্য তুমিই মূলত দায়ী। আমি চাইনি, আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলাম—তুমিই শোননি। বল, আমি কিছু ভুল বলছি?

চোখের জল মুছে মহামায়া স্থির হয়ে বসে। জবাব দিতে পারে না।

রাজা-মহাশয় পুনরায় বলেন, রাজ্য নেই, তবু আমি তো বংশবাটির রাজা? নিজের সংসারেই যদি সমদৃষ্টি রাখতে না পারি তাহলে প্রজাসাধারণকে সমদৃষ্টিতে দেখব কেমন করে, বল? তুমি দুঃখ পাবে বলে অনিবার্য পরিণামটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন ; কিন্তু তুমিই আমাকে বুঝিয়ে বল—কোন অপরাধে ছোটরানিকে ত্যাগ করব?

—ত্যাগ করতে তো আমি বলিনি—মহামায়া ভাষা খুঁজে পায়।

রাজা-মহাশয় জবাব দেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহিষীর দিকে। তাঁর সেই নীরব দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ছিল তাঁর জবাবের। মহামায়া বুঝল! বুঝল—যে তার পরাজয় এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মহামায়া জীবনে কখনও হার মানেনি। আজও সে পরাজয়কে জয় করল। এতক্ষণে শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললে, আমারই ভুল। হ্যাঁ, তোমাকে বাধা দেব না। ছুট্‌কির প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। তাছাড়া আমি যা পারিনি, সে তোমাকে হয়তো তাই দিতে পারবে। বংশধর! তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করব আমি, একদিন যেমন ছুট্‌কিকে করেছিলাম। সেটাই হবে আমার সান্ত্বনা।

রাজা-মহাশয় ওঁর হাতখানা তুলে নিয়ে পুনরায় বলেন, তুমি খোলা মনে অনুমতি দিচ্ছ তো বড়

বউ? না হলে, বিশ্বাস কর, আমি হয়তো....কী বলব? স্ত্রী বলতে, সঙ্গিনী বলতে আমি যে আজও শুধু তোমাকেই বুঝি, বড় বউ!

হঠাৎ প্রৌঢ় স্বামীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন কলহান্তরিতা মহামায়া। এর চেয়ে বিজয়ীর আর কী সম্মান হতে পারে? স্বামীর কবাটবক্ষে মুখ লুকিয়ে শুধু বলেছিলেন, ওর মধ্যে তুমি আমাকেই খুঁজে পাবে—সেই বিশ বছর আগেকার আমাকে। ও যে আমার নিজের হাতে গড়া! ও যে দ্বিতীয়া আমি!

চুম্বনে চুম্বনে অবশ করে দিয়েছিলেন নৃসিংহদেব তাঁর উত্তীর্ণ-যৌবনা জীবনসঙ্গিনীকে। মুক্তি পেয়ে রাজার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েই মহামায়া বলেছিলেন, আমার নিমন্ত্রণ নেই—তবু আমি যাব। নিজে হাতে ওর ফুলশয্যা সাজিয়ে দিয়ে আসব। আজ বাদে কাল স্বয়ম্ভরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে তুমি—তার আগে আমার ছুট্‌কিকে স্বয়ম্ভরা করে তোল। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ তুমি—আমার কোনো দুঃখ নেই এতে। কোনো জ্বালা নেই!

বংশের আদিপুরুষ উদয়নারায়ণ দত্তরায় বোধ করি পাটুলিতে বাস করতেন। তাঁর অথবা তাঁর পুত্র জয়ানন্দ দত্তরায়ের সম্বন্ধেও ইতিহাসে কোনো হদিস পাই না। তারপর দেখছি, ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সম্রাট শাহজাহান বর্ধমান অন্তর্গত পাটুলির ভূম্যধিকারী রাঘব দত্তরায়কে একটি সনদে 'চৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করছেন এবং একুশটি পরগনার জমিদারী প্রদান করছেন। রাঘবই সম্ভবত পাটুলি ত্যাগ করে গঙ্গার ধারে বংশবাটিতে এসে জমিদারীর কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হন এবং একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। পাটুলির বাস তুলে দিয়ে বংশবাটিতেই রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাসাদের চারপাশে একটি প্রশস্ত পরিখা খনন এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে রাজপ্রাসাদকে সুরক্ষিত করা তাঁরই কীর্তি। সম্ভবত তখন থেকেই এই স্থানটির নাম হল 'বংশবাটি'। রামেশ্বর ছিলেন অত্যন্ত রাশভারি এবং ক্ষমতাশীল জমিদার। সেটা সম্রাট আলমগীরের আমল। সম্রাট আলমগীর খুশি হয়ে তাঁকে 'পঞ্চপাঞ্জা' প্রদান করেন এবং 'রাজা-মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামেশ্বর রাজবাটির সংলগ্ন ভূখণ্ডে পাশাপাশি কতকগুলি গ্রামের পত্তন করেন এবং ভূসম্পত্তি দান করে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও নবশাক পরিবারকে বাঁশবেড়িয়ার স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করেন। কাশী ও মিথিলা থেকে কিছু সুপণ্ডিত এনে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার চতুষ্পাঠীর আয়োজন করেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অনুপম ভাস্কর্য-সমন্বিত 'অনন্তবাসুদেব' মন্দিরটি তাঁরই কীর্তি। বোধকরি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অথবা রানিভবানীর নির্মিত গঙ্গাতীরের মন্দির বাদ দিলে এত ভালো পোড়ামাটির কাজ সারা বাংলাদেশে আজ আর নেই।

শুধু আলমগীর নয়, বাংলার নবাব পৃথকভাবে তাঁকে একটি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন—'শূদ্রমণি'! শূদ্রমণি রামেশ্বর রাজা-মহাশয় এরপর নদীয়ার জমিদারকে শেষ মুহূর্তে অর্থ সাহায্য করে 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' থেকে রক্ষা করেন। সে আমলে সময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে মুসলমান নবাব কীভাবে জমিদারদের 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' করাতেন তা যাঁরা জানেন তাঁদের বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য, যাঁরা জানেন না তাঁদের না জানানোই মঙ্গল। কল্পনাতেও সে জাতীয় 'বৈকুণ্ঠ দর্শন' না-ই বা করলেন।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হচ্ছেন রঘুদেব ; এবং রঘুদেবের পুত্র গোবিন্দদেব আমাদের কাহিনির যিনি নায়ক তাঁর পিতৃদেব। গোবিন্দদেব স্বর্গলাভ করেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে—অপুত্রক অবস্থায়। হ্যাঁ, আমাদের নায়ক নৃসিংহদেব পিতৃবিয়োগান্তরিত সন্তান—তিনি জন্মগ্রহণ করেন পিতৃবিয়োগের তিনমাস পরে—যাকে যাবনিক ভাষায় বলে 'পস্‌থুমাস চাইল্ড'।

জন্মের পূর্বেই কিন্তু নৃসিংহদেব ইতিহাস রচনা শুরু করেছিলেন। সেটা নবাবী আমল। সুবে বাংলার মসনদে তখন আসীন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁ। নবাবী আমলে আইন ছিল—কোনো ভূম্যধিকারী অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হলে তাঁর সম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। নবাব ঐ অপুত্রক জমিদারের কোনো নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করতেন—কখনও বা অন্য

কোনো পার্শ্ববর্তী জমিদারের সঙ্গে নয়া ব্যবস্থা হতো। বলা বাহুল্য, এই সুযোগে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নজরানার প্রাপ্তিযোগ ঘটত।

এক্ষেত্রেও হুগলির বংশবাটিরাজ গোবিন্দদেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন—এ সংবাদে এ রাজ্য লাটে ওঠাবার আয়োজন হল। তারস্বরে প্রতিবাদ করলেন গোবিন্দদেবের সদ্যবিধবা এবং আসন্নপ্রসবা হংসেশ্বরী দেবী। তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান রঘুদেব দত্ত রওনা হয়ে পড়লেন দ্রুতগামী ছিপ নিয়ে—কর্তার শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন না হতেই। গঙ্গা বেয়ে উজানে মুর্শিদাবাদ এসে পৌঁছলেন। কিন্তু নবাব-বাহাদুরের এজলাসে তাঁর এত্তেলাই পৌঁছায় না। বহু খরচপত্র করে শেষবেশ হাজার-দুয়ারির আম-দরবারে নবাব-বাহাদুরের সামনে সদ্যবিধবার আর্জিটি পেশ করলেন—বললেন, হয়তো ইতিমধ্যে পরলোকগত রাজা-মহাশয়ের পুত্র সূতিকালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রাজা হন—'কর্ণেন অন্ধঃ'। কোনও ফল হল না রানিমায়ের আর্জিতে। যেদিন ফরমানে নবাবের সীল-মোহর পড়ল—বংশবাটির জমিদারী রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে—সেদিন নৃসিংহদেব এক সপ্তাহের শিশু। কিন্তু সে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন নবাব-বাহাদুরের কানে পৌঁছালো না। কারণ ছিল। বর্ধমান মহারাজের পেশকার ধূর্ত মানিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দীকে ইতিপূর্বেই জানিয়ে রেখেছিল—উচ্চতর খাজনার হারে বর্ধমান-রাজ ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত নিতে রাজি—ভালোমতো নজরানাও দেওয়া হবে হস্তান্তরের সময়। ওদিকে গঙ্গার পরপারের মৌজাগুলি গ্রাস করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে নদীয়াকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্রও নোলা বাড়িয়ে বসেছিলেন। তাঁর দূতও নিত্য ঘুরঘুর করছে নবাবী মহাফেজখানায়। ফলে আলিবর্দী ফতোয়া জারি করলেন, যেহেতু বংশবাটিরাজ গোবিন্দদেব অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন, তাই তাঁর সমস্ত জমিদারী নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হল।

রাজ্য দুই টুকরো হয়ে গেল। এক গ্রাস খেলেন বর্ধমানরাজ, অপর গ্রাস নদীয়ারাজ। বিধবার অধিকারে রইল শুধু বসতবাড়ি-সংলগ্ন সামান্য ভূখণ্ড। রাজা নৃসিংহদেবের স্বহস্তলিখিত দিনপঞ্জিকাটি পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। পরিণত বয়সে সুপণ্ডিত নৃসিংহদেব লিখেছেন :

"সন ১১৪৭ (অক্টোবর ১৭৪০) সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দ দেবরায়ের কাল হয়। সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্ধমানের জমিদারের পেস্কার মানিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারীর সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে (এপ্রিল ১৭৪১) মাস বৈশাখে খামখা দখল করে ও হলফা পরগনা কিসমের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কীসমৎ মজকুর আপন পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল, পীর খাঁ ফৌজদার বর্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখলে আছে। সুবে বাঙলার কোনো জমিদার ও তালুকদারের উপর এমন বে-আইনসাপী ও বেদারদ কখনো হয় নাই।"

সূতিকালয়ের সেই শিশুটি ক্রমে হল বালক, কিশোর, ক্রমে তরুণ। জ্ঞান বৃদ্ধিহলে তিনি বুঝলেন ঐ নিষ্ঠুর সত্যটা—যা তিনি লিখে গেছেন তাঁর দিনপঞ্জিকায় পরিণত বয়সে—'সুবে বাঙলার কোনো জমিদার ও তালুকদারের উপর এমন বে-আইনসাপী ও বেদারদ কখনো হয় নাই।' কিন্তু রাগ করবেন কার উপর? ততদিনে সেই অন্যায়কারী আলিবর্দী গিয়েছে কবরের তলায় এবং যার জন্য চুরি করা, সেই তাঁর অতি আদরের দৌহিত্র সিরাজও শুয়েছে মুর্শিদাবাদের খোস্‌বাগে, মীরন-এর ছোরার মুঠটুকু সম্বল করে।

গোবিন্দদেবের বিধবা রানি হংসেশ্বরী রাজ্য খুইয়েছেন বটে কিন্তু আশা ত্যাগ করেননি। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল—পুত্র উপযুক্ত হলে অপহৃত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। 'জীজাবাঈ-য়ী' নিষ্ঠায় তিনি পুত্রকে মানুষ করে তুলতে থাকেন। শিবাজীর যুগ গিয়েছে, এখন অশ্বারোহণ আর অসিচালনায় হৃতরাজ্য উদ্ধার হয় না। দেশে এখন কোম্পানির রাজত্ব। এখন বুদ্ধির যুগ। শিক্ষার যুগ। ছেলেকে অতি সযত্নে তিনি শেখালেন নানান শাস্ত্র, নানান ভাষা, নানান আদবকায়দা! তরুণ নৃসিংহদেব সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, এবং যাবনিক ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। সঙ্গীতচর্চা করতেন তিনি নিষ্ঠাভরে—রাগরাগিণীর উপর তাঁর মৌলিক আলোচনা আছে। পরিণত বয়সে তিনি 'উদ্দীশতন্ত্র' নামে

বাংলা ভাষায় শারীর-বিজ্ঞানের উপর বোধকরি প্রথম গ্রন্থটি রচনা করেন—আদ্যন্ত ছন্দোবদ্ধ পদে। ভূকৈলাশের রাজার তরফে 'কাশীখণ্ডে'র অনেকখানি তিনি রচনা করেছিলেন।

কিন্তু সে সব তো নৃসিংহদেবের পরবর্তী জীবনকথা।

সে যুগে যেমন হত, আগেই বলেছি, কিশোরকালেই পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন রানিমাতা। বালিকাবধূর নাম মহামায়া। ক্রমে সেও বয়ঃপ্রাপ্তা হল। অনেক কিছু বুঝতে শিখল ; বুঝল না শুধু একটি তত্ত্ব—কেন তার স্বামী এমন অশান্ত, অস্থির, অন্যমন। ক্রমে সেকথাও শুনল। বললে, এজন্য তুমি এমন উদাসীন, আনমনা? আমাদের যা আছে তাই তো যথেষ্ট। এই বা কজন পায়?

তরুণ রাজ্যহীন রাজা বলতেন, সে তুমি বুঝবে না, বড় বউ। তুমি আজ এ বাড়ির বধূমাত্র, কিন্তু তোমার যে 'রানি-মা' হওয়ার কথা।

পাটরানিকে 'বড় বউ' ডাকাই প্রথা। নৃসিংহদেব তাঁর একমাত্র স্ত্রীকে ঐ নামেই ডাকতেন। মহামায়া প্রত্যুত্তর করতেন, কিন্তু সবাই তো আমাকে ঐ নামেই ডাকে—'রানি-মা'।

—সেটা সৌজন্যের খাতিরে। সে ডাক অন্তঃসারশূন্য। ও তুমি বুঝবে না।

বুঝবে না, বুঝবে না, সবাই বলে—বুঝবে না। সত্যই বুঝতে পারত না মহামায়া। উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, বংশগৌরবে এবং কোষ্ঠীবিচারের জোরে সে ঢুকে পড়েছে রাজবাড়িতে। যা পেয়েছে, তা যে তার স্বপ্নেরও বেশি। তাই কী পেল না তার হিসাবে মেলাতে সে রাজি নয়। কিন্তু ঐ না-পাওয়ার পথ ধরে আরও অনেক কিছু যে হারিয়ে যেতে বসেছে—ও পেল না শান্তি, পেল না তৃপ্তি, পেল না একটি যুবকের অন্তরে নিঃসপত্ন অধিকার। সে বক্ষপঞ্জরের আধখানা জুড়ে যে হাহাকার। তার স্বামীর হৃদয়ের সিংহভাগ দখল করে বসে আছে একটা ক্ষোভ, একটা বঞ্চনা, একটা 'বে-আইনসাপী বেদারদি' হাহাকার।

ইতিমধ্যে পালাবদল হল সুবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে। এল নূতন যুগ, নূতন শাসনকর্তা। ইংরাজ। এল ওয়ারেন হেস্টিংস, ইলাইজা ইম্পে। বিচার কি নেই? একদিন বংশবাটি থেকে নৌকোযোগে যুবক পণ্ডিত এসে উপনীত হলেন প্রাক্তন সুতানুটি-গোবিন্দপুরে। শহর কলকাতায়। গঙ্গায় নূতন কেল্লা। সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন সুবে বাংলার নূতন ভাগ্যবিধাতা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে। বেনিয়ানের মাধ্যমে যোগাযোগ হল। লাটবাহাদুর দেখা করতে সম্মত হলেন। তখন নৃসিংহদেবের বয়স আটত্রিশ, মহামায়া ঊনত্রিশ। নেটিভ রাজার দোভাষীর প্রয়োজন নেই শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। আরও খুশি হলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে লাট-বাহাদুর দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং দয়াপরবশ হয়ে নয়টি পরগনা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। এর বেশি আমি আর কিছু করতে পারব না। ইয়ংম্যান, তোমার সামনে এখন দুটি রাস্তা। হয়—যা পেলে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, ঐ কটা তঙ্কা নাড়াচাড়া করে বাকি জীবনের দু-কুড়ি-সাতের খেলা সাঙ্গ কর, আর না হলে ঐটাকে মূলধন করে লড়ে যাও।

—লড়তে হলে কী করতে হবে?

—মরদ হতে হবে।

নৃসিংহদেব জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে আছেন দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস পাদপূরণ করেন, লড়তে হলে তোমাকে অর্থসঞ্চয় করতে হবে। অন্তত সাত লক্ষ তঙ্কা। বিলাতে গিয়ে দরবার করতে হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স্‌দের এজলাসে বর্ধমান ও নদীয়া-রাজের বিরুদ্ধে মামলা লড়তে হবে।

নৃসিংহদেব জবাব দিতে পারেননি। ফিরে এসেছিলেন নতমস্তকে। মহারাজাধিরাজ বর্ধমান ও নদীয়ারাজ একপক্ষে এবং অপরপক্ষে বংশবাটির রাজ্যহীন রাজা! এ মামলার কথা যে শুনবে সে-ই হাসবে! তাঁর পিতৃতুল্য দেওয়ানজিও বললেন, ও সব চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলে দিন।

রানি মহামায়া জনান্তিকে স্বামীকে বললেন, ওগো, এ যদি অসম্ভবই হয় তবে ওকথা কেন ভুলে যেতে পারছ না? তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। লোকে পুত্রশোকও ভোলে, আর তুমি ঐ কটা পরগনা হারানোর দুঃখ ভুলতে পারছ না?

নৃসিংহদেব অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এ তুমি বুঝবে না, বড় বউ! আর তাছাড়া আমি যে মাকে কথা দিয়ে রেখেছি!

ততদিনে গোবিন্দদেব রায়ের বিধবা পত্নী কাশীবাসী হয়েছেন।

তারপর আরও দশ বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে নৃসিংহদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। স্বয়ম্ভরা মন্দির নির্মাণ করেছেন। আগামীকাল শুভ কার্তিকী অমাবস্যায়, কৃষ্ণ কোজাগরী রাত্রে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। নৃসিংহদেব স্বয়ং গেলেন কলকাতায় সাহেব-সুবোদের নিমন্ত্রণ করে আসতে।

মন্দির থেকে রাজবাড়ি দুশো হাত হয় কি না হয়। তবু এটুকু পথও ছোট রানি-মা পদব্রজে আসতে পারলেন না। রেওয়াজ নেই। কিংখাবে-মোড়া ঘেরাটোপ পালকিতে চড়ে এসে পৌঁছলেন অন্দর মহলের চিক-দেওয়া দরজার এপারে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে আয়ী-মা। আর এক টুকরি বোঝাই পদ্মফুল। ছোট রানিমার মহলটা দ্বিতলে—পূর্ব দিকে। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়েছে। লাল-নীল কাচ বসানো জাফরির কাজ করা ঘেরা বারান্দায় সারি সারি খাশগেলাস। মোমবাতি জ্বলছে তাতে। আয়ী-মাকে সঙ্গে নিয়ে নূপুর ঝুম্‌ঝুম্ করতে করতে শঙ্করী এসে পৌঁছলো নিজের ঘরে। সেই দুপুরে মন্দিরে গিয়েছিল মালা গাঁথতে, এতক্ষণে ফিরল। আজ রাত্রে রাজা-মহাশয় তার মহলে সায়মাশে আসবেন। সেজন্য অবশ্য তার চিন্তা নেই। আয়ী-মা পাকঘরে সে-সব আয়োজন করে রেখেছে। ওর কাজ পাঙ্খা হাতে রাজা-মহাশয়কে আপ্যায়ন করা। কার্তিক মাস, হাওয়া করারও প্রয়োজন নেই। তবে সেটাই নাকি প্রথা।

ঘরের পর্দা সরিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেল শঙ্করী এবং আয়ী-মা। শয়নকক্ষের চেহারাখানাই পালটে গেছে এক দুপুরে। ওর প্রকাণ্ড পালঙ্কে থরে থরে ফুলের মালা, গোছা গোছা ফুল। দু-জন কিঙ্করীর সাহায্যে মহামায়া একটা মালা টাঙিয়ে দিচ্ছিলেন—ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসেন : আয় রে ছুটকি। আমাদের সাজানোও এইমাত্র শেষ হল।

শঙ্করী অবাক হয়ে বলে, এসব কী বড়দি?

—সেটা কানে কানে বলব। আয় দেখি, তোকে সাজাতে হবে।

কিঙ্করীদের দিকে ফিরে বলেন, এবার তোরা যা। তোদের ছুটি।

ওদের মধ্যে একজন প্রগলভা, কানাইয়ের-মা ফস্ করে বলে বসে, বলতিছ যাচ্ছি। কিন্তু কাল সকালে আবার আসব, ছুট মা! শয্যা-তুলুনি আদায় করতি।

শঙ্করী মাথাটা তুলতে পারে না। মহামায়া একটা হাতপাখা নিয়ে ওদের তাড়া করেন।

আয়ী-মা কিন্তু স্থানত্যাগ করেনি। বললে, হ্যাঁগো বড়রানি! আমার যে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না গো! তোমারে আমরা নেমন্তন্ন করি নাই। আর তুমি অযাচ্ এসে ফুলশেয সাজালে!

মহামায়া মুখ টিপে হেসে বলেন, পেতনি যে! না ডাকলেও আমরা আসি।

আয়ী-মা বড়রানির হাতখানা তুলে নিয়ে বলে, আমারে মাপ কর, বড়-বৌমা। আমি তোমারে চিনতি পারি নাই।

মহামায়া কথা ঘোরান। বলেন, ওসব বাজে কথা থুয়ে একটা কাজ কর দিকিনি। শম্ভুকে বল, আমার ঘরে কর্তার গড়গড়াটা আছে, নিয়ে আসতে। আর মিশিরের কাছে ভাল অম্বুরি তামাক আছে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে।

আয়ী-মা একগাল নিদন্ত হাসি হাসল। বললে, তাইলে ছোট-মারে সাজানোর ভারটা তুমিই নিচ্ছ তো?

—নেব না? ঐ দ্যাখ না। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আয় ছুট্‌কি, তোর চুলটা পালটে বেঁধে দিই।

ঘরের ও-প্রান্তে বড়মা সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন প্রসাধন-দ্রব্য।

আয়ী-মা নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নেয়।

শঙ্করীর দু'চোখ জলে ভরে আসে। নত হয়ে বড়দির পদধূলি নেয়। মহামায়া ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলেন। বলেন, আমার জন্যই তোর ভয় ছিল, না রে পাগলি? কিন্তু আমি তো শুধু তোর বড়দি নই, আমি যে তোর মা!

একপ্রহর রাতে সজ্জাপর্ব সমাপ্ত হল। যাম ঘোষণা করল বংশবাটীর শিবাকুল। অনন্তবাসুদেব মন্দির থেকে শয়নারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল বাতাসে। ছোটরানির ঘরে বিলাতি ঘড়িটা সংকেত জানালো রাত নয়টা বাজে। কিছুক্ষণ আগে শম্ভুচরণ গড়গড়া-তামাক, পান-গুবাক সব কিছু সাজিয়ে রেখে গেছে এবং সংবাদ দিয়ে গেছে—রাজা-মশায়ের নৌকা এইমাত্র ফিরে এসেছে শহর কলকাতা থেকে। সাতরাজ্য নিমন্ত্রণ সেরে রাজা-মশাই তাঁর মহলে গিয়েছেন। একটু পরেই তিনি নৈশ-আহারে আসবেন। বড় ঠাকুর ইতিমধ্যে রেখে গেছে আহার্যপাত্র—প্রকাণ্ড রূপার থালায়। মহামায়া তারের জালতি দেওয়া ঢাকনাটা খুলে শঙ্করীকে নির্দেশ দেয় : একটু নজর রাখবি ছুট্‌কি, সোনামুগের ডাল দিয়ে যেন গুচ্ছেক না খেয়ে ফেলে। আজকাল ওর খাওয়া কমে গেছে তো! তিন রকম মাছ আছে, আর আছে মহাপ্রসাদ—ঐ জামবাটিতে। ঐ থালায় আছে পাঁচ রকমের ভাজা! এটা পায়েস—আগে যেন এইটা একটু মুখে দেয়, ভোগের পায়েস। মিষ্টান্নের থালায় আছে জনাইয়ের মনোহরা, ধনেখালির খইচুর, চন্দননগরের তালশাঁস সন্দেশ আর ঐ বড় মিষ্টিটা—

শঙ্করী বাধা দিয়ে বলে, তুমিও থেকে যাও না বড়দি। খাইয়েদাইয়ে বরং—লজ্জায় কথাটা শেষ করতে পারে না।

ম্লান হাসলেন মহামায়া : দূর পাগলি! আমাকে এখানে দেখলেই ও লজ্জা পাবে। সুর কেটে যাবে। শোন্, ঐ বড় মিষ্টিগুলো নিশ্চয় খাওয়াবি। ওগুলো শ্রীরামপুরের 'গুঁফো সন্দেশ'। ও খুব ভালোবাসে।

হঠাৎ শঙ্করী তার বড়দির হাতটা টেনে নিয়ে বললে, আমার ভয় করছে!

মাটিতে ধপাস করে বসে পড়ে মহামায়া : এই দ্যাখ কাণ্ড! হ্যাঁ রে! ভয় আবার কিসের? ষোলো বছরের ধিঙ্গি মাগি! তোর লজ্জা করে না ওকথা মুখে আনতে? আমাকে মাত্র তেরো বছর বয়সে ও—

শঙ্করী তার জননীপ্রতিম বড়দির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, থাক।

খিলখিল করে হেসে ওঠেন মহামায়া।

রাজা-মহাশয় যখন ছোটরানির শয়নকক্ষে এলেন রাত তখন দশটা।

মহামায়া তার আগেই প্রস্থান করেছেন। আয়ী-মাও নেই। ছোটরানির খাসদাসী মোতির-মা আলো ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাঁকে। ঘরে ঢুকল না সে। চৌকাঠের ও প্রান্তেই দাঁড়িয়ে রইল চিকটা তুলে ধরে।

প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা-মহাশয়। একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন। এমন ফুলে ভরা শয়নকক্ষের একটিই অর্থ। জীবনে দু-দুবার তিনি প্রবেশ করছেন এমন কক্ষে। ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে তাঁর নজর পড়ল গৃহস্বামিনীর উপর। স্তব্ধ বিস্ময়ে তিনি দেখতে থাকেন ওকে! যেন ফুলশয্যা রাত্রে আজ প্রথম দেখছেন ঐ অনিন্দ্যকান্তি দেবী প্রতিমাকে!

মুহূর্তের বিহ্বলতাকে জোর করে জয় করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল শঙ্করী। বড়দি যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল ঠিক তেমনি করে বসে পড়ল রাজা-মশায়ের সম্মুখে, হাঁটু গেড়ে। মুক্তার ঝালর জড়ানো খোঁপাসমেত মাথাটা সে নামিয়ে রাখতে গেল স্বামীর চরণে।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক পা পিছিয়ে গেলেন রাজা-মহাশয়। বললেন, না। আমাকে প্রণাম করো না।

চমকে উঠল শঙ্করী। রাজা-মশায়ের মুখের উপর আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলে, কেন?

রাজা-মশাই কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

শঙ্করী এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কোনো জবাব না পেয়ে আরও অবাক হল। কিন্তু স্বামীর চরণে মাথা নত করার অধিকার যে তার অনস্বীকার্য। পুনরায় সে নত করতে গেল তার মাথা স্বামীর যুগ্মচরণে।

হঠাৎ রাজা-মশাই দু হাত বাড়িয়ে ওর দুটি কাঁধ ধরে ফেললেন। ধীরে ধীরে বিহ্বল শঙ্করী উঠে দাঁড়ালো। ওর মনে পড়ে গেল মাত্র তিন ঘণ্টা আগে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে। আরও একজন ওর উদ্যত প্রণাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তার হেতু তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে?

অনিন্দ্যতনু ষোড়শীর নিকট-সান্নিধ্যে রাজা-মশায়েরও খেয়াল হল না—এ গন্ধ পদ্মফুলের, না

পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌরভ! উনি দেখলেন, শঙ্করী দাঁড়িয়ে আছে ওঁর অতি নিকটে। তার দুটি নয়ন মুদে আছে, সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে—যেন অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত পশ্চিম দিগ্‌বলয়। যেন সে জানে, পরমুহূর্তেই অনিবার্যভাবে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য চুম্বন করবে পশ্চিম দিগন্তসীমা।

নিমীলিত নেত্রেই শঙ্করী অনুভব করল পর পর কী ঘটে গেল। রাজা-মশায়ের দুটি হাত সরে গেল ওর দুটি বাহু থেকে। যে তপ্ত নিশ্বাস স্পর্শ করছিল ওর ললাটে সেটা স্তব্ধ হল। ওর অধরোষ্ঠ প্রত্যাশিত স্পর্শ পেল না। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো শঙ্করী। দেখল, রাজা-মশাই বসে আছেন তাঁর পালঙ্কে যথেষ্ট দূরে।

সংযত করল নিজেকে। কেন এভাবে সুর কেটে গেল জানে না। রাজা-মশাই কি ভুলতে পারছেন না তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে? তাঁর কি ধারণা—অন্তরীক্ষ থেকে সেই বড়রানি লক্ষ করছেন ওদের ব্যবহার? প্রণাম তিনি নিলেন না। ওর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উপেক্ষা করে—

—এ কী! এত আহারের আয়োজন করেছ কেন? জান না, আগামীকাল আমাকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে? যজ্ঞ করতে হবে?

বিহ্বল শঙ্করী বললে, তাই কী? তাতে আজ রাত্রে—

—বাঃ! আজ রাত্রে সংযম না করলে কাল যজ্ঞ করব কেমন করে? তুমি ঐ পায়েসের বাটি আর মিষ্টান্নের পাত্রটা বরং এদিকে সরিয়ে দাও।

সংযম! তাই তো। একথা কারও খেয়াল হল না কেন? ছি ছি ছি! শুধু পলান্ন, মৎস্য আর মহাপ্রসাদই তো নয়—ওর পালঙ্কের চারধার ঘিরে ঐ পুষ্পসম্ভারও যে তাহলে একটা নিদারুণ প্রহসন! কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! বিদ্যুৎচমকে একবার মনে হল—বড়দি কি এটা জানত? তাই কি ষড়যন্ত্র করেছে! না না না! এ অসম্ভব! এত বড় নৃশংস পিশাচী সে নয়! হতে পারে না!

পরদিন প্রাতে মোতির-মা যখন বিছানা তুলতে এল তখনও চুপ করে বসে আছে শঙ্করী তার পালঙ্কের একান্তে। সমস্ত রাত জেগেছে আর কেঁদেছে। ওর কেন যেন মনে হয়েছে—ঐ সংযমের কথাটা একটা অছিলা। সংযম করতে হলে কি প্রণামটাও নিতে নেই? আর সব চেয়ে যে ব্যথাটা বুকে বিঁধছিল সেটা এই : মহামায়া কি সব কিছু জানত? ওর জীবনের এই দ্বিতীয় ফুলশয্যাও যে শেষমেশ প্রহসনে পরিণত হবে সেকথা জেনেই কি সে এসেছিল সতীনকে সাজাতে? আচ্ছা ওরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে এটা করেনি তো? একটা নির্মম কৌতুক! নাঃ, অসম্ভব! বড়দির কথা ও বলতে পারবে না, কিন্তু রাজা-মহাশয় এত বড় পাষণ্ড নন। আর তা ছাড়া সে যে দেখেছে তাঁর মুখচোখে কামনাঘন প্রত্যাশার অনুরণন!

মোতির-মা ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। নিষ্পেষিত ফুল ছড়িয়ে আছে সারা ঘরময়—মোতির-মা তো জানে না যে, শঙ্করীই তা টেনে টেনে ছিঁড়েছে! মুখ টিপে হেসে মোতির-মা বললে, ব্বাস রে! তোমরা দুজনে কি রাতভোর নড়াই করেছিলে নাকি?

শঙ্করী দাঁতে দাঁত টিপে নীরব রইল। স্বীকার করতে পারল না রাজা-মহাশয় এ ঘরে আদৌ রাত্রিযাপন করেননি। মোতির-মা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শিখার দিকে ইঙ্গিত করে আবার বললে, তা হ্যাঁ ছোটরানি-মা, পিদিম এখনও জ্বলতিছে কেনে গো! রাতভোর তোমরা ঘুমাওনি নাকি?

সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত শঙ্করী শুধু বললে, যা এখন, দিক্ করিস না।

—ঈশ্! বই কি! শয্যা তুলুনি পাব্‌নি নেব না?

একটু পরে এল আয়ী-মা। কানে কানে বললে, ভোর-রেতেই পাইলেছে দেখছি। তোরে বলে কয়ে গেছে তো? না মধুটুক্ খায়েই ভাগিছে?

শঙ্করী নেমে পড়ে পালঙ্ক থেকে। দিন কারও জন্য বসে থাকবে না। আয়ী-মাকে নির্জলা মিথ্যা বলতে বাধল। সত্যটাও স্বীকার করতে পারল না। বললে, না। যাবার আগে আমাকে বলেই গেছেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি আয়ী-মার কাছে তবু অত সহজে পার পাওয়া গেল না। শঙ্করীকে ভালো করে দেখে বললে, তা হ্যাঁ রে ছুট্‌কি, তরে অমন উসকু-খুস্‌কু লাগে কেন?

এবারও তির্যক সত্যভাষণ করল শঙ্করী : সারারাত ঘুম হয়নি যে!

দন্তহীন হাসি হাসল আয়ী-মা : তাই বল্ কেনে!

তবু ধরা পড়তে হল। যেখানে সব চেয়ে ব্যথা, সব চেয়ে সংকোচ সেখানেই। নির্জন ঘরে ঝড়ের মতো ঢুকল মহামায়া। প্রথম আঘাতেই ভেঙে দিল ওর সব ছলনা। শঙ্করীকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, বিশ্বাস কর, ছুট্‌কি! আমার এক্কেরে খেয়াল ছিল না।

—কী? কী খেয়াল ছিল না?

—আমি জানি রে! আমার কাছে লুকাতে পারবি নে। কিন্তু এক রাতে তো শীত যায় না। ও পালাবে কোথায়? আজ রাত আসবে, কাল আসবে—সারাটা জীবনই তো পড়ে আছে! ও তো আর সন্ন্যাস নেয়নি!

শঙ্করী আর দ্বিধা করেনি। প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু উনি আমার প্রণামটাও নিলেন না কেন?

—প্রণাম নিল না? মানে?

অকপটে সব কথা খুলে বলেছিল শঙ্করী। সব শুনে মহামায়া বললে, কী জানি বাপু। এ ধাঁধার অর্থ আমিও বুঝছি না। ঠিক আছে, আজ সুযোগ হবে না। আজ মচ্ছব। কাল-পরশু ব্যাপারটা জেনে নেব। তুই কিচ্ছু ভাবিস না ছুট্‌কি। আমি তো আছিরে।

* * *

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নেপথ্যে যে কী নিদারুণ বজ্র উদ্যত হয়ে প্রহর গুনছিল তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শঙ্করী। আকাশ বিদীর্ণ করে সেই বিনা-মেঘের বজ্র যখন সশব্দে নেমে এল তখন বজ্রাহতই হয়ে গেল বেচারি। বুঝে উঠতে পারল না—এটাও কি পূর্বপরিকল্পিত? মহামায়ার কারসাজি? সে কি সব জেনে-বুঝেই শঙ্করীকে নিয়ে ক্রমাগত খেলছে—কব্জার মধ্যে পাওয়া ইঁদুরছানাকে নিয়ে বেড়াল যেমন খেলে! সতীন! কথাটা শুনলেই একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মহামায়া কি এত বড় প্রবঞ্চক! এত নির্মম? এত বড় অভিনেত্রী?

পরদিন সন্ধ্যায় আবার যখন সে শঙ্করীকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, 'ছুট্‌কি। বিশ্বাস কর্ এর মধ্যে আমার কোনো হাত নেই। আমি এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানতাম না।'—তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শঙ্করী। হ্যাঁ-না কোনো কথাই বলতে পারল না।

নিজ বাহুবন্ধ থেকে ওকে মুক্ত করে হঠাৎ মহামায়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো।

বললে, তুই বিশ্বাস করেছিস, এটা আমারই ষড়যন্ত্র! তাই নয়?

শঙ্করী শুধু বলেছিল, কী দরকার বড়দি, ও সব অপ্রিয় আলোচনায়? আমি অনাথা। তোমরা আশ্রয় দিয়েছিলে তাই এতদিন প্রাণে বেঁচে আছি। তুমি জোর করে আমার বিয়ে দিলে, তাই সিঁথেয় সিঁদুর পরছি। আজ তাড়িয়ে দিচ্ছ, চলে যাচ্ছি। ব্যস্। ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে, রাজবাড়ির ষড়যন্ত্রের কথা আমি কেন ভাবতে যাই?

ওর কাঁধ থেকে বড়রানি হাত দুটি সরিয়ে নেয়। সাত চড়ে শঙ্করী রা কাটে না। আজ এমন কথা যখন সে বলেছে—মহামায়া বুঝতে পারে—তখন সে বিশ্বাস করেছে এর পিছনে বড়রানির হাত আছে। গম্ভীরভাবে বললে, তুই কি যাবার আগে আমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিস ছুট্‌কি?

—না। তুমি জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে থাক। স্বামীসেবার অধিকার পেলাম না, আশীর্বাদ কর, যেন শাশুড়িসেবার অধিকারটুকু পাই।

নত হয়ে প্রণাম করেছিল ওর বড়দিকে। মহামায়া পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল শুধু। বুঝল, দুরন্ত অভিমানী স্বীকার করে গেল না কিছুই।

পরদিন নৌকাযোগে রওনা হয়ে পড়ল শঙ্করী—সুদূর কাশীধামে। দুটি বজরায়। একটি ছোট রানিমার জন্য। সেখানে আছে সশস্ত্র পাহারা। ভৈরব ঘোষকে সঙ্গে দিয়েছেন রাজা-মশাই। দ্বিতীয় বজরায় গুটি তিন-চার বিধবা, আরও কারা সব। তাঁরা এই সুযোগে রাজা-মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় তীর্থ দর্শনে চলেছেন। শঙ্করীর সম্পর্কে এক পিসশাশুড়িও যাচ্ছেন—বালবিধবা তিনি। চলেছেন ভাইবৌকে দেখতে। স্বয়ম্ভরা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেই কাশীধাম থেকে সংবাদবহ্ এসেছে দুঃসংবাদ নিয়ে—রানি হংসেশ্বরীর মরণাপন্ন অসুস্থা। তিনি শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন—গঙ্গাপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে দেখে যাবেন।

সবচেয়ে অবাক-করা খবর বিদায়মুহূর্তে রাজা-মহাশয়ের অনুপস্থিতি। কী একটা জরুরি কাজে তিনি প্রত্যুষেই অশ্বপৃষ্ঠে কোথায় যেন রওনা হয়ে গেছেন, যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে। শঙ্করী যেন পাষাণ হয়ে গেছে। এ সংবাদেও তিলমাত্র বিচলিত হল না সে। অপরাধবোধ? কিন্তু শঙ্করী তো কোনও অভিযোগ আনেনি। সে তো একবারও বলেনি—অন্তত একটি রাত তাকে এ রাজবাটিতে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক—এমন একটি সার্থক রাত্রি, যেটা যজ্ঞারম্ভের পূর্বরাত্রির অজুহাতে নিষ্ফলা হবে না! একবারও বলেনি, দীর্ঘ তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে স্বামীর চরণধূলি সীমন্তে তুলে নেবার অধিকার তার অনস্বীকার্য—ভারতীয় হিন্দু সতীসাধ্বী নারীর সে অধিকার যে কোনো রাজা-মহারাজের খেয়ালখুশির ঊর্ধ্বে। তাহলে এভাবে পালিয়ে যাবার অর্থ কী ?

অবাক মহামায়াও বড় কম হয়নি রাজা-মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবহারে। শুধু ছোটরানি নয়, এই কয়দিন তিনি মহামায়ার কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্দরমহলে আদৌ আসেননি। শঙ্করীর বজরা গঙ্গার বাঁকে মিলিয়ে যাবার পর মহামায়া রাজা-মহাশয়ের খোঁজ করেছিল। কিন্তু তিনি বারমহলেও নেই। বস্তুত তিনদিন তিনি অনুপস্থিত থাকার পর রানিমা ডেকে পাঠালেন দেওয়ানজিকে। না, রঘু দত্তকে নয়। দেওয়ান রঘুনাথজি গোবিন্দ দেবরায়ের আমলের লোক। অশীতিপর বৃদ্ধ অবসর নিয়েছেন। অনেকদিন। জমিদারির যা অবস্থা তাতে নূতন দেওয়ান কেউ নিযুক্ত হননি। তবু দেওয়ানজির পৌত্র দিলীপ দত্ত রাজবাড়ির কাজকর্ম দেখে। বেতন নেয় না—দেবার ক্ষমতাও নেই রাজসরকারের। তবে নাকি দত্তরা বংশানুক্রমে বংশবাটিরাজকে সেবা করে এসেছে—এখনও নিষ্কর জমি ভোগ করে, তাই দিলীপ নামমাত্র সম্মানমূল্য নিয়ে রাজবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগটা রেখেছে। তাকেই গৌরবে 'দেওয়ানজি' বলা হয় এখন।

রানিমায়ের আহ্বান পেয়ে দিলীপ দত্ত এল রাজবাড়ির মাঝ-মহলে। চিকের আড়ালে বসে বড়রানিমা প্রশ্ন করলেন, রাজা-মহাশয় আজ তিনদিন অনুপস্থিত। তিনি কোথায় গেছেন কেউ জানে না। আপনি কিছু জানেন?

দিলীপ চিকের পর্দার দিকে তাকিয়ে বললে, জানি, রানি-মা। রাজা-মহাশয় আমার পিতামহকে বলে গেছেন। তাঁর কাছেই শুনেছি। তিনি শহর কলকাতায় আছেন।

—কেন? কবে ফিরবেন?

—উনি কোম্পানির রাজ-সরকারে চাকুরি নিয়েছেন। আছেন কেল্লার ভিতর। সেখানেই থাকবেন আপাতত। সপ্তাহান্তে বা ছুটিছাটায় বংশবাটিতে আসবেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামায়া। চাকুরি নিয়েছেন! রাজা-মহাশয়! কেন?

দিলীপ সবিনয়ে বলে, আমার ধারণা ছিল রাজা-মহাশয় অন্তত আপনাকে সে কথা বলে গেছেন। এখন দেখছি, আমার ধারণা ভ্রান্ত। সে যাই হোক —কথাটা আপনার জানা দরকার। এ কথা বস্তুত আমি রাজা-মহাশয়ের কাছ থেকে স্বকর্ণে শুনিনি। তিনি শুধুমাত্র তাঁর দেওয়ানজি, অর্থাৎ আমার পিতামহকে, বলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। সবই বিস্তারিত জানাচ্ছি, তবে সংবাদটা গোপন রাখবেন। বুঝতেই পারছেন, রাজা-মহাশয় চান না এ কথা আপাতত জানাজানি হোক।

—আপনি বলুন।

দিলীপ দত্তের কাছে যে তথ্য পাওয়া গেল তা সংক্ষেপে এইরকম :

রাজা-মহাশয়ের অন্তরের সেই আকৈশোর-লালিত সুপ্ত বাসনা—পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করা, কোনোদিনই মরেনি। উনি সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চয়ের জন্য বদ্ধপরিকর। যেমন করেই হোক ঐ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে তিনি কালাপানি পার হবেন। অজানা অচেনা ইংল্যান্ডে উপনীত হয়ে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-এর এজলাসে বর্ধমান তথা নদীয়া-রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন। তাঁদেরই প্ররোচনায় আলিবর্দী খাঁ এরকম 'বে-আইনসাপী এবং বেদারদি' ফরমান জারি করেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সেই কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। সাত লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করা প্রায় অসম্ভব—তাই দীর্ঘদিন ওটার কথা ভুলে ছিলেন। মহামায়াও ক্রমাগত তাঁকে ঐ চিন্তা থেকে দূরে

রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই সুপ্ত বাসনা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বয়ম্ভরা মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে সাহেব-সুবোদের নিমন্ত্রণ করতে তিনি নৌকাযোগে কলকাতায় এসেছিলেন। স্বয়ং লাট-বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না ; কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটাও ঘটে গেল। কলকাতায় একজন উচ্চতম মহলের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি বলে ওঠেন, কী সৌভাগ্য রাজা-মহাশয়! আপনি স্বয়ং এসে পড়েছেন। আপনাকেই খুঁজছিলাম আমরা।

কী ব্যাপার? জানা গেল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে একজন আসামির ফাঁসির হুকুম হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী তার অন্তিম বাসনা হিসাবে বংশবাটির রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে। সামান্য মানুষ—তবু ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য ওঁরা বংশবাটিতে সংবাদবহ পাঠাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি স্বয়ংই এসে উপস্থিত। অগত্যা কেল্লার ভিতর ফাঁসির আসামির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হল।

ঐ সূত্রে লাটবাহাদুরের সঙ্গে নৃসিংহদেবের পরিচয় হল। সুযোগ বুঝে নৃসিংহদেব তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন।

লাটবাহাদুর জানালেন, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন বটে, তবে অন্য কাজের জন্য স্বয়ং যেতে পারবেন না। তাঁর তরফে তাঁর কোনো প্রতিভূ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাবে। রাজা-মহাশয়ের সঙ্গে সরাসরি ইংরাজিতে কথা বলে লাটবাহাদুর অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তিনি অতঃপর একটি প্রস্তাব রাখেন, এবং রাজা-মহাশয় সে দুর্লভ সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন।

লাট বাহাদুর বলতে লর্ড কর্নওয়ালিস। ওয়ারেন হেস্টিংস দেশে ফিরে গেছেন। নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁর রাজত্বের একটি মানচিত্র প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন। তাতে কোন জমিদারের কতটা অংশ আছে তা দেখানো হবে। মানচিত্র আঁকবে ইংরাজ-আমীন ও নকশা-নবীশ—তাদের বলে 'রাইটার্স'। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লেখা দলিল তারা পড়তে পারে না। দলিল-বর্ণিত ভূখণ্ডের সীমারেখা বুঝে উঠতে পারে না। তাই আরবি-ফারসি-সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা জানা কোনো একজন পণ্ডিতকে খোঁজা হচ্ছিল—যে শুধু ভাষাবিদ নয়, জমিদারি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বোঝে। এ কাজের জন্য নৃসিংহদেব ছিলেন আদর্শ প্রার্থী। জমিদারি সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ, আইনগঠিত লব্‌জ তাঁর ওষ্ঠাগ্রে; দরকারি সব কয়টি ভাষাও তাঁর আয়ত্তে। ভূমিরাজস্ব এবং উত্তরাধিকার সূত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস আধ ঘন্টার মধ্যে বুঝে নিলেন নৃসিংহদেবের মতো মানুষই তিনি খুঁজছিলেন। নৃসিংহদেব তাই মন্দির প্রতিষ্ঠা শেষ হতেই চলে গেছেন শহর কলকাতায়। কেল্লার ভিতরেই আছেন তিনি।

ছুটিছাটায় নৃসিংহদেব বংশবাটিতে আসেন। দু-একদিন কাটিয়ে ফিরে যান কর্মস্থলে। মহামায়া বেশ অনুভব করেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছেন রাজা-মহাশয়। কেন এই প্রৌঢ় বয়সে তিনি কোম্পানির চাকুরি গ্রহণ করলেন সে বাহুল্য প্রশ্নটা আর জিজ্ঞাসা করলেন না মহামায়া—সেটা তো জানাই আছে, সেই পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আজব স্বপ্ন! কিন্তু আর একটি দুরন্ত কৌতূহল তিনি কেমন করে দমন করেন? তাই প্রশ্ন করেছিলেন, একটা কথা আমাকে সত্যি করে বলবে? কেন অমন করে ছুটকিকে তুমি ত্যাগ করলে?

—ত্যাগ করলাম? সে তো মায়ের কাছে গেল!

এবার মহামায়া এমনভাবে স্বামীর দিকে তাকালেন যে, রাজামশাই বুঝতে পারেন তাঁর প্রত্যুত্তরটা নিতান্তই ফাঁকি—তা দুজনেই বুঝেছেন। বললেন, কী করব বল, বড় বউ। মায়ের মরণাপন্ন অসুখ....

—কিন্তু তুমি তো জানতে, এখান থেকে নৌকায় কাশী যেতে প্রায় দু মাস লাগবে। মা যদি দু মাস অপেক্ষা করতে পারেন, তবে দু মাস একদিনও পারতেন? 'সংযম রাত্রি'র অজুহাতে তুমি সেদিন ওকে স্পর্শমাত্র করনি—কিন্তু তুমি তো জানতে, তার প্রতি তোমারও কর্তব্য আছে। বল, আমি কি কিছু ভুল বলছি?

রাজা-মহাশয় নীরবে অধোবদনে বসেই থাকেন। মহামায়া হেসে বলেন, রাজ্য না থাক, তুমি তো দেশের রাজা! সংসারের মধ্যেই যদি তুমি—

—থাক বড় বউ। এ আলোচনা বন্ধ কর।

—কেন? তুমি কি বুঝতে পার না—ছুট্‌কি কী ভাবল? সে এই বিশ্বাস নিয়ে গেছে যে, এ আমার ষড়যন্ত্র। আমি দুঃখ পাব বলেই তুমি তাকে—

—কিন্তু কথাটা তো মিথ্যা নয়। আমি যখন ছোটরানিকে পড়াতাম তুমি বসে পাহারা দিতে।

চিৎকার করে উঠেছিলেন মহামায়া : না! এভাবে আমাকে ঠকাতে পারবে না। তুমি জানতে, আমার সে মনোভাব শেষ পর্যন্ত ছিল না। না হলে আমি ছুট্‌কিকে ওভাবে সে রাত্রে সাজাতে বসতাম না।

নৃসিংহদেব জবাব দিলেন না। কিন্তু মহামায়া থামতে রাজি নন। বলেন, কী হল? বল, কী তোমার কৈফিয়ত?

—কীসের কৈফিয়ত বড় বউ। মা মরণান্তিক অসুস্থ। ছোটরানিকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এতে কৈফিয়তের কথা উঠছে কোথায়?

মহামায়া স্বামীর অন্তস্তলে একবার দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করলেন। যে হৃদয়টি এতদিন স্ফটিকস্বচ্ছ মনে হত আজ তাকেই মনে হল দুর্ভেদ্য রহস্যাবৃত। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, বেশ, অন্তত এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বল—সে রাত্রে কেন ছুট্‌কির প্রণাম নাওনি? স্পর্শদোষ এড়াতে তুমি ওকে অন্তত দূর থেকে প্রণাম করতে বলতে পারতে।

রাজা-মহাশয় অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, বড় বউ, প্রত্যেকের জীবনেই এমন কোনো গোপন কথা থাকে, যা কাউকে বলা যায় না। এ তেমনই একটা কথা।

ভ্রূকুঞ্চিত হল মহামায়ার। বললেন, কিন্তু আমি যে তোমার সহধর্মিণী! আমার কাছে তোমার কোনও কথাই তো গোপন থাকতে পারে না!

—পারে। ছোটরানিও আমার সহধর্মিণী! তোমার সব গোপন কথা—যা স্বামী হিসাবে আমি জেনেছি—তা কি তার কাছে বলতে পারি? বল?

মহামায়া চুপ করে যান। বলেন, ঠিক আছে। চল এবার শুতে যাই। রাত অনেক হল।

—তুমি শুয়ে পড় বড় বউ। আমি আমার ঘরে ফিরে যাব। রাত জেগে কিছু পড়াশুনা করতে হবে। দিবাভাগে তো সময়ই পাই না।

চমকে ওঠেন মহামায়া। বলেন, কাল বুঝি তোমার কোনো যজ্ঞ আছে? আজও সংযমরাত্রি?

রাজা-মহাশয় ফিরে যাবার জন্য দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়েন। ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, বড় বউ, একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। ওটা আমার একটা বেদনার স্থান। বারে বারে ওটাকে মাড়িয়ে দিও না।

মহামায়া প্রস্তরমূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে থাকেন। রাজা-মহাশয় প্রস্থান করেন।

বদলে গেছেন, সম্পূর্ণ বদলে গেছেন নৃসিংহদেব। শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও। সপ্তাহান্তে বাড়ি আসেন। মহামায়ার সঙ্গে দেখা হয়। কথাবার্তা হয়। কিন্তু এতদিনে তাঁর বুঝি বৈরাগ্য এসেছে, বার্ধক্য এসেছে। মহামায়া বুঝতে পারেন—তিনি সব পেয়েও সব কিছু খুইয়েছেন ; আর সেই হতভাগী সব কিছু খুইয়েও সব পেয়েছে। কেন, কী বৃত্তান্ত বুঝতে পারেন না—কিন্তু বেশ অনুভব করেন রাজা-মহাশয় কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই বাসরশয্যায় প্রত্যাখ্যাতা নায়িকাটিকে!

* * *

চার্লস ফার্স্ট মারকুইস অব কর্নওয়ালিস নৃসিংহদেবের প্রায় সমবয়সী—মাত্র দু বছরের বড়। রাজ্যহীন এই দেশীয় রাজাটির প্রতি তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি বর্ধিত হল। ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্বে একটা রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তিনি ভাবছেন। এ নিয়ে আলোচনা করার মতো মানুষ পান না, সবাই যে যার স্বার্থ অনুযায়ী জবাব দেয়, কখনও তাঁকে খুশি করতে অন্যায় জেনেও তাঁর প্রস্তাবে সায় দেয়। এই সমবয়সি বংশবাটির রাজার মধ্যে তিনি একজন খাঁটি মানুষের সন্ধান পেলেন। তাই কাজের অবকাশে মাঝে মাঝে তাকে ডেকে পাঠাতেন। খোসগল্প করতেন। কখনও শোনাতেন ইটন ও টুরিনের ছাত্রজীবনের কথা, কখনও বলতেন মার্কিন মুলুকে তাঁর সংগ্রামের কাহিনি, ক্যামডেন, গিলফোর্ডের রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা। যদিও কর্নওয়ালিস আমেরিকান কলোনিবাসীদের উপর

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ট্যাক্স নির্ধারণের বিপক্ষে ছিলেন, তবু যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠল তখন মেজর জেনারেল কর্নওয়ালিস সাগরপাড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায়—প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে অংশ নিতে। সেই সব গল্পই বলতেন। ভারত সাম্রাজ্যের গভর্নর জেনারেল এবং বংশবাটির সিংহাসনহীন রাজার মধ্যে সামাজিক প্রভেদটা ছিল আসমান-জমিন ; কিন্তু খেয়ালি লাটবাহাদুর ফরাসি শ্যাম্পেনের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদটা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন। অমনই এক খোশমেজাজি অবকাশে নৃসিংহদেব অকপটে খুলে বললেন তাঁর বঞ্চনার ইতিহাস। লর্ড কর্নওয়ালিস ধৈর্য ধরে সবটা শুনলেন। তারপর বললেন, তুমি কী করবে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম তবে সর্বস্ব পণ করে আমি পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার করতাম।

—কিন্তু তার পূর্বে যে সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চয় করতে হবে।

—কর। কিন্তু তাহলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমাকে পথে বার হতে হবে। বসতবাড়ির নিশ্চিন্ত চৌহদ্দিতে বসে স্বপ্ন দেখা যায়, জীবনসংগ্রাম করা যায় না। এই দেখ না আমাকে। জন্মেছি লন্ডনে, লড়েছি আমেরিকায়, শাসন করছি ভারতবর্ষ।

'দুত্তোর' বলে বেরিয়ে এলেন নৃসিংহদেব। নাঃ, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখতেই হবে। ইস্তফা দিলেন চাকরি থেকে। সেটা ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ। বৃদ্ধ দেওয়ানজি, দিলীপ আর নায়েব রতিকান্তকে ডেকে বললেন, আমি ভাগ্যান্বেষণে বিদেশযাত্রা করছি। আপনারা সংসারের দায়িত্ব নিন। যতদূর সম্ভব ব্যয়সংকোচ করুন। চার লক্ষ তঙ্কা পুঁজি আমি রেখেই যাচ্ছি। এ অর্থ যেদিন সাত লক্ষ হবে তখন আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করব। বৃদ্ধ দেওয়ানজি বললেন, আমি হয়তো ততদিন থাকব না, তবে রতিকান্ত থাকবে, দিলীপ থাকবে।

কিন্তু সম্মত হলেন না রানি মহামায়া। বললেন, কী হবে গো রাজ্য উদ্ধার করে? তুমি যদি এভাবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাও তবে আমি কী নিয়ে বাঁচব? তুমি আজ বাহান্ন বছরের বৃদ্ধ ; ধর সারাজীবন লড়াই করে তুমি পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারও করলে ; কিন্তু ভোগ করবে কে?

উদাসীনভাবে নৃসিংহদেব বললেন, শাস্ত্র বলছেন—যখন ধর্মসঞ্চয় করবে তখন মনে রেখ, আগামীকালই তোমার মৃত্যু হতে পারে; আর যখন অর্থসঞ্চয় করবে তখন মনে কর—তুমি অজর-অমর!

ইতস্তত করে মহামায়া বলেন, তুমি কোথায় যাবে প্রথমে?

—কাশীতে। মায়ের কাছে। এখনও তিনি আছেন। সবার আগে তাঁকে প্রণাম করব। মায়ের আশীর্বাদই যে আমার পাথেয়।

—তারপর? সেখানেই কি থেকে যাবে?

ম্লান হাসলেন রাজা-মহাশয়। বললেন, দুনিয়ায় সব কিছু বদলে গেল বড় বউ—শুধু তুমি বদলালে না!

মহামায়াও ম্লান হাসলেন। বললেন, ঠিক ঐ কথাটাই আমিও ভাবছি কিন্তু! এ দুনিয়ায় সব কিছু বদলে গেল, শুধু বদলালো না তোমার ভ্রান্ত ধারণাটা! তুমি আজও বিশ্বাস কর—ছুট্‌কি আমার মেয়ে নয়, সে আমার সতীন।

রাজা-মশাই চোখ তুলে দেখলেন। নাঃ! এ কয় বছরে অনেক রোগা হয়ে গেছে বড়রানি। অঙ্কের হিসাবে তার বয়স তেতাল্লিশ, কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্বা বৃদ্ধা বলে তাকে মনে হয়। ওর শীর্ণা হাতটি তুলে নিয়ে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, বড় বউ, আজ খোলামনে কয়েকটা কথা বলব। তুমিও বল। মা আছেন কাশীতে, সেখানেই যাচ্ছি। ওর সঙ্গে দেখা হবেই। কিন্তু সত্যি করে বল তো, তুমি কী চাও? কী হলে তুমি সবচেয়ে সুখী হও?

মহামায়া বললেন, যা ঘটলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম তা হবার নয়। আমি সবচেয়ে আনন্দ পেতাম যদি ছুট্‌কিকে আবার নিজে হাতে সাজিয়ে তোমার কাছে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন.....

—বল? তখন?

মহামায়া বলেন, এতদিন আমি যা চেয়েছি তাই তুমি দিয়েছ। আজ তুমি দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশ

যাচ্ছ, কবে ফিরবে তার স্থিরতা নেই। আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছ, হয়তো তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমি থাকব না। এমন দিনে বিদায়-বেলায় তোমার কাছে একটি শেষভিক্ষা চাইব। দেবে?

—এমন করে বলছ কেন বড় বউ। তুমি তো জান, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

—জানি, সেই দাবিতেই বলছি। তুমি তোমার মনকে যতখানি চেন, তার চেয়ে আমি তাকে বেশি চিনি। কেন তুমি ছুট্‌কির প্রণাম নাওনি, কেন তাকে অমনি করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তা আমি জানি না! তুমি বলনি, আমিও জোর করিনি। কিন্তু তারপর চার বছর কেটে গেছে! আমি এই চার বছর ধরে লক্ষ করছি তোমাকে—আমি জানি, তুমি তাকে ভুলতে পারছ না। আর তাই আমাকেও সহ্য করতে পারছ না—না না, আমাকে বাধা দিও না। আমার যা বলার আছে তা আজ বলতে দাও। হয়তো এ সুযোগ আর কোনো দিনই পাব না।

—বেশ বল!

—তাই এই চার বছর ধরে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ। তুমিও তাকে ভুলতে পারছ না, আর সে আবাগীও—তারও তো বিশ বছর বয়স হল, সেও.....

বাধা দিয়ে রাজা-মশাই বলেন, কিন্তু তুমি কী যেন একটা চাইবে বলছিলে?

—হ্যাঁ। কথা দাও, বংশবাটির রাজবাড়িতে যেদিন ফিরে আসবে সেদিন বংশধরকে নিয়েই ফিরে আসবে?

রাজা-মহাশয় একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনীর দিকে—পঁয়ত্রিশ বছর যার সঙ্গে ঘর করেছেন সেই অতিপরিচিতা রহস্যময়ী অনির্বচনীয়া অপরিচিতার দিকে। তারপর হেসে বললেন, বেশ। কথা দিলাম বড় বউ। বংশবাটিতে যে দিন ফিরে আসব সেদিন বংশধরকে নিয়েই ফিরব।

কাহিনির উজান ঠেলে চার বছর পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

উজান ঠেলে শঙ্করীর নৌকাও চলেছে ভাগীরথী বেয়ে। বংশবাটীর ঘাট থেকে বারাণসী ধামের চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে। পার হয়ে গেল—ত্রিবেণী, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কাটোয়া, কর্ণসুবর্ণ, রাজমহল। ভাগীরথী ছেড়ে নৌকা পড়ল মূল গঙ্গায়। পশ্চিমাভিমুখী হল এবার।

শঙ্করী নিশ্চুপ বসে থাকে বজরার ভিতর। জানলা দিয়ে দেখতে থাকে নিয়ত পরিবর্তনশীল গঙ্গাতীরের দৃশ্য! গ্রামের পর গ্রাম, গঞ্জ, খোলা মাঠ। কোথাও বাঁধানো ঘাট, কোথাও কাঁচা পাড়। সকালবেলা একরকম, দুপুরে অন্যরকম, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে আবার মা-গঙ্গার অন্যরকম রূপ। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে দেখা যায় দলে দলে স্নানার্থীরা এসে জমায়েত হয়েছে ঘাটে। তৈলমর্দন করছে সর্বাঙ্গে। ছোট ছেলেমেয়েরা ঝাঁপাই জুড়ছে। নাক টিপে টুপ টুপ ডুব দিচ্ছে ঘোমটায়-ঢাকা বউ। কেউ উচ্চকণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করছে—'মাতর্গঙ্গে ত্বৈ যো ভক্তঃ....' আবার কেউ বা পাড়ে বসে হাঁক পাড়ছে—'অরে অ নক্কি, একা-একা জলে নামিস্‌নি মা! মিনসেরা কেউ ঘাটে নেই! কতা শোন্!'

আর দেখা যায় মৎস্যজীবী পরিবারদের। তারা জাল শুকোয়, জাল ফেলে আর জাল বোনে! রাতভোর লণ্ঠন জ্বেলে মাছ ধরে। মাছরাঙা ঝুপ-ঝুপ করে জলে নামে। শীতালী পাখির ঝাঁক মাঝে মাঝে আকাশ-বাতাস সচকিত করে দলে দলে উড়ে যায়। কদিন আগে মজা হয়েছিল একটা। বজরা তখন ঘাটের কাছে নোঙর-করা। বড় গঞ্জ একটা। মাঝিরা গেছে হাট থেকে বাজার করে আনতে। শঙ্করী বসেছিল জানলার ধারে। দেখছিল ঘাটের দৃশ্য। মেয়েদের স্নানঘাট! হঠাৎ শুনল একটা বৌ বলছে, দ্যাখ দ্যাখ কী সুন্দর! ঠিক যেন নক্ষীঠাকরুন!

দৃশ্যটা দেখবার জন্য অন্যমনস্ক শঙ্করী ঝুঁকে পড়েছিল। পরক্ষণেই সে লজ্জা পায়। বৌটি ওকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে কোনও পুরুষমানুষ না দেখতে পেয়ে শঙ্করী ডাকল—এস না ভেতরে, আলাপ করব তোমাদের সঙ্গে। নৌকোয় আমি একা।

শিশু-কাঁকে বধূ তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলে, যাবি? ডাকছে।

পার্শ্ববর্তিনী বলে, তোর বোনাই জানতে পারলে পিঠে চ্যালাকাট ভাঙবে!

ওরা আসেনি। কেন? ওরা কি তাকে রূপোপজীবিনী ভাবল? এত রূপ দেখে ভুল বুঝল? সে যাই হোক—ওদের সূত্র ধরে শঙ্করী সারাটা দিন কল্পনার জাল বোনে। ঐ শিশু-কাঁকালে ভাগ্যবতী আর পুরুষহস্তের প্রহারে অভ্যস্তা সৌভাগ্যবতীর কথা। ওরা হয়তো দু-বেলা ভরপেট খেতেও পায় না। কিন্তু তবু ওরা সুখী। রাজরানি নয়! আর কিছু না পাক—নিজে উপবাসী থেকে আহার্য-থালা অভুক্ত প্রিয়জনকে ধরে দেবার যে বঞ্চনা-প্রাপ্তি, সেটুকু ওরা পায়!

বয়ে যায় গঙ্গা, বয়ে যায় সময়, আর উজানে বয়ে যায় বজরা। তার গদি মোড়া ঘেরাটোপ চৌহদ্দির ভিতর বন্দিনী শঙ্করী যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কথা বলতে না পারার দুঃখে। মোতির-মা আছে, পিসিমাও মাঝে মাঝে এসে বসেন, কিন্তু ষোলো বছর বয়সের এক তরুণীর কি তাতে মন ভরে?

মাঝে মাঝে ও বজরা থেকে ভেসে আসে সঙ্গীত। পদাবলী কীর্তন। কোথায়? মোতির-মা আর পিসশাশুড়ির বক্-বক্তিমের কল্যাণে ও নৌকোর সবাই পরিচিত। অনেকেই মাঝে মাঝে এ-নৌকোয় এসে ছোটরানিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যান। যেন অচেনা শাশুড়ির জন্য উদ্বিগ্ন শঙ্করীর ঘুম হচ্ছে না। শঙ্করী প্রশ্ন করে, হ্যাঁরে মোতির-মা, ও নৌকোয় গান গায় কে?

—ঠাকুরমশাই গো। আমাদের অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুরুত মশায়ের ছাওয়াল। তিনিও তীর্থদর্শনে চলেছেন যে। কী মিষ্টি গলা! তা তুমিও চল না কেন? গান শুনে আসবেনে?

তথ্যটা জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ সেই নবদূর্বাদলশ্যাম তরুণ পণ্ডিতটির স্মৃতি জেগে ওঠে। অন্তরালের প্রায়ান্ধকারে আয়ী-মায়ের একটা বেফাঁস কথায় যিনি লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন। কাব্যতীর্থ। প্রশ্ন করে, কী নাম রে ওঁর?

—নাম? নাম তো জানি না ছোট মা। সবাই বলে ঠাকুর-মশাই, আমিও বলি ঠাকুর-মশাই। শুধোয়ে আসব?

—দূর পাগলি! ওঁর নাম না জানলে কি আমার ঘুম হচ্ছে না?

—যাবে গান শুন্‌তি? ভারি ভাল গান।

—না থাক।

কেন প্রত্যাখ্যান করল? কর্মহীন অবকাশে কয়েক দণ্ড তো কেটে যেত ভালোই। ঐ সূত্র ধরে শঙ্করীর কি মনে পড়ে গিয়েছিল তার উদ্যত-প্রণামের স্মৃতিটুকু—যার পথরেখা ধরে আর একদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা? অথবা আয়ী-মায়ের সেই বেফাঁস কথাটার সংকোচে? কী যেন বলেছিল আয়ী-মা? 'মায়ের জন্যি আনা পদ্মগুলান শেষমেশ রানিমায়ের চরণেই—'চরণেই না মাথাতেই?' আরও বলেছিল—'অরে দেখ্‌লি মুনিঋষিরও মতিভ্যোম হয়ি যায়!' ছি ছি ছি! কথাগুলো যদি এতদিনেও উনি ভুলে না গিয়ে থাকেন? শঙ্করী কোনোদিনই পারবে না ঐ তরুণ পণ্ডিতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

কিন্তু দাঁড়াতে হল। পিসিমা একদিন হাত ধরে নিয়ে এলেন পণ্ডিতকে, এই নৌকায়। বললেন, জোর করে ধরে এনিচি। নে ছুট্‌কি, বসবার ঠাঁই দে।

শঙ্করী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। উনি হয়তো গদিতে বসবেন না। শঙ্করী একটি পশমের আসন পেতে দেয়। তরুণ পণ্ডিত কিন্তু উপবেশন করলেন না। বললেন, পিসিমা রোজই বলেন আপনাকে গান শোনাতে নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনার আসা হয় না। তাই খোঁজ নিতে এলাম। গান ভালো লাগে না আপনার?

শঙ্করী সে প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে বললে, তার আগে বলুন, এখানেও কি মা গঙ্গাই একমাত্র প্রণম্য?

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, না। কিন্তু আমি বৈষ্ণব। আমি সচরাচর কারও প্রণাম নিই না! আমার ধর্ম আমাকে বলে, সর্বদা তৃণের মতো সুনীচ হয়ে থাকতে।

—বসুন আপনি।

কাব্যতীর্থ বসেন। বলেন, আমার প্রশ্নটার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি। আমি প্রতিদিন এঁদের নাম শোনাই, আপনি শুনতে আসেন না কেন?

শঙ্করী বললে, আপনি তো পদাবলী কীর্তন করেন। জানেন না, আমরা শাক্ত।

পণ্ডিত হাসলেন। বললেন, গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ করতে নেই, রানিমা। আপনি এমন গোঁড়া শাক্ত নন যে, কৃষ্ণনাম কানে গেলে কানে আঙুল দেবেন। অনন্তবাসুদেব মন্দির শাক্ত রাজা-মহাশয়ের বংশই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শঙ্করী বলে, আপনি বসুন, পিসিমার সঙ্গে গল্প করুন। আমি একটু শরবত করে আনি।

পণ্ডিত বলেন, থাক রানিমা। আমার সঙ্গে সৌজন্য করতে হবে না।

—সৌজন্য নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, অতিথি—

—না, আমি অতিথি নই। তিন তিথি যে থাকে না সে-ই অতিথি। আমি বংশবাটি রাজার পোষ্য! ও নৌকায় আমি নিত্য যা সেবা করি তার ব্যবস্থা আপনাদেরই। বরং আমাকে কিছু প্রতিদান দেবার সুযোগ আপনি করে দিন।

—প্রতিদান? কী ভাবে?

—আমি আপনাকে নামগান গেয়ে শোনাতে পারি, শাস্ত্রপাঠ করে শোনাতে পারি—কিংবা...

—কিংবা?

—যদি কাব্যপাঠে আপনার অভিরুচি থাকে তাহলে তাও পাঠ করে শোনাতে পারি। কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থ আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

একটু ভেবে নিয়ে শঙ্করী বলল, সে তো ভালোই। আজ সন্ধ্যায় যাব আপনার নামগান শুনতে। যদি কাব্যপাঠ করে শোনান তাহলে সময়টাও কাটবে। কী কাব্যগ্রন্থ আছে আপনার সঙ্গে?

—পদাবলী কিছু আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এক খণ্ড আছে।

—সংস্কৃত কাব্য কিছু নেই?

একটু চমকে ওঠেন পণ্ডিত। বলেন, আপনার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার আছে, রানিমা?

হাসল শঙ্করী। বললে, না। আদৌ না। বাংলা ভাষায় লেখা পুঁথি তো নিজেই পড়তে পারব। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তাহলে কোনো উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য আমাকে পড়িয়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

পিসিমা বললেন, বাবার ঠাঞয়ে পৌঁছাতে এখনও এক মাস। তুমি অনেক দিন ধরে পড়তে পারবে বাবা। শাস্তর শেষ হয়ে যাবে।

পণ্ডিত হেসে বলেন, শাস্ত্র শেষ হয় না পিসিমা। আর শাস্ত্রালোচনা আমরা করবও না। আমার কাছে এক খণ্ড মূল বাল্মীকি-রামায়ণ আছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন...

শঙ্করী বললে, হাতে-লেখা বাংলা পুঁথিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমি পড়েছি। আপনার কাছে কালিদাসের কোনো কাব্য আছে? মহাকবি কালিদাসের শুধু নামই শুনেছি—

—আছে রানিমা। নলোদয়, মেঘদূতম, কুমারসম্ভবম্ এবং ঋতুসংহার আছে—

শঙ্করী কৌতূহলী হয়। জানতে চায় কোন কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু কী। সব শুনে বলে, আপনি তাহলে কাল থেকে 'কুমারসম্ভবম্' শুরু করুন।

সেদিন সন্ধ্যায় ছোটরানিমা ও বজরায় গেলেন নামগান শুনতে। তরুণ পণ্ডিত বসেছিলেন আসরের মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে। এখন শুক্লপক্ষ। সন্ধ্যারাত্রে চাঁদের আলো থাকে। রাত্রেও নৌকো এগিয়ে চলেছে। শীত বেশ আছে। বজরার রুদ্ধদ্বার কক্ষেই বসেছে গানের আসর। শ্রোতার সংখ্যা বেশি নয়—গুটি আট-দশ। অবশ্য মাঝিমাল্লারাও দাঁড় বাইতে বাইতে শুনবে। বজরার ভিতর বাতিদানে বাতি জ্বলছে। বুড়ির দল দোলাই জড়িয়ে বসেছেন ছড়িয়ো-ছিটিয়ে। শঙ্করী এসে পণ্ডিতের সম্মুখে নামিয়ে রাখল একটি থালায় এক রেকাবি চাঁপা ফুল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কাব্যতীর্থ সংকুচিত হয়ে পড়েন। তাই দূর থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। পণ্ডিত থালাটি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, চম্পকের সময় তো এ নয়। কোথায় পেলেন রানিমা?

শঙ্করী বললে, আজ সকালে একজন মালাকার ঘাটে ফুল বিক্রি করছিল। মোতির-মাকে দিয়ে আনিয়েছি।

পিসিমা বলেন, ও ঠাকুরমশাই, আজ তোমার খঞ্জনী কই গো?

পণ্ডিত বলেন, আজ আর পদাবলী গাইব না পিসিমা। তাই খঞ্জনী আনিনি। খালি গলাতেই কিছু মায়ের নাম শোনাই।

—মায়ের নাম? পিসিমা অবাক হলো—তুমি বোষ্টম, মায়ের গান গাইতে পার?

মনে হল শাক্তবাড়ির বালবিধবা একটু খুশিই হয়েছেন।

পণ্ডিত বললেন, কেন পিসিমা? কালী আর কৃষ্ণ কি আলাদা?

শঙ্করী বুঝতে পারে—এ জবাব তাকেই দেওয়া হল।

পর পর আট-দশখানি কালী-কীর্তন গাইলেন কাব্যতীর্থ। শঙ্করী অবাক হয়ে গেল। এমন অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত সে কখনও শোনেনি। সুরেলা দরাজ কণ্ঠ কাব্যতীর্থের। গঙ্গাবক্ষে তাঁর 'মা—মা' ধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল—জ্যোৎস্নার সঙ্গে যেন এক হয়ে গেল সে গানের রেশ। সঙ্গীত সমাপন করে পণ্ডিত জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। সকলেই প্রণাম করলেন।

শঙ্করী আধো ঘোমটার ভিতর থেকে বললে, এ শ্যামাসঙ্গীত আগে কখনও শুনিনি। পদকর্তা কে?

—মহাসাধক ছিলেন তিনি, কবিরঞ্জন সেন। নিজেই শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন, সুর দিতেন, গাইতেন। বছর ষোলো-সতেরো দেহ রেখেছেন।

পিসিমা কৌতূহল দেখান। বলেন, কোথাকার লোক গো?

—আদি নিবাস কুমারহট্ট গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পণ্ডিত ছিলেন তিনি! সংস্কৃত, হিন্দি ছাড়া ফারসি ভাষাও জানতেন! শোনা যায়, শহর কলকাতায় এক ধনীর বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন এবং হিসাবের খাতাতেই নাকি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করতেন। একদিন নাকি তাঁর উপরওয়ালা তা দেখতে পেয়ে তাঁকে স্বয়ং মালিকের কাছে ধরে নিয়ে যায়। ধনী গৃহস্বামী কিন্তু সদাশয় এবং ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। হিসাবের খাতায় লেখা কবিতাটি দেখে বললেন, তোমার কাজ এ নয়। তুমি মায়ের নাম রচনা কর। আমি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর তিনি বাকি জীবন শুধু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, মায়ের নাম-কীর্তন করেছেন। তন্ত্রসাধনা করেছেন।

শঙ্করী প্রশ্ন করে, 'কবিরঞ্জন' ওঁর নাম, না উপাধি?

—উপাধি। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া খেতাব। তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ লিখে মহারাজকে শোনান, তাতেই খুশি হয়ে—

—কী কাব্যগ্রন্থ? জানতে চায় শঙ্করী।

—'বিদ্যাসুন্দর'।

—বিদ্যাসুন্দর! সেটা তো রায়গুণাকরের রচনা। তাঁর নাম তো ভারতচন্দ্র।

পণ্ডিত এক মুহূর্ত স্থির হয়ে কী যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, না রানিমা। একই নামে দুজন কবি দুখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এঁর পিতৃদত্ত নাম 'রামপ্রসাদ'।

* * *

নৌকা ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বড় বড় গঞ্জ আর শহর। কাব্যতীর্থ প্রতিদিন সকালে এসে দুই-এক দণ্ড কাব্যপাঠ করে যান। প্রথম প্রথম তাঁর পাঁচ-সাতটি শ্রোতা ছিল। কাব্যের বিষয়বস্তু যখন হর-পার্বতীর মিলন তখন ধর্মপ্রাণা বিধবার দল সাগ্রহে এসে বসেছিলেন প্রথমটায়; কিন্তু এ তো আর কথকতা নয়! দু-দিনেই ওঁদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। শুধু সৌজন্যের খাতিরে পিসিমা এসে বসে থাকতেন। তিনিই পণ্ডিতকে এ বজরায় প্রথম দিন হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন। বোধ করি কারণ শুধু সেটাই নয়! শঙ্করী তাঁরই পরিবারের কুলবধূ। যদিচ কাব্যতীর্থ কুলপুরোহিতের সন্তান—গুরুর বংশ, তবু বয়সে তরুণ যে! ঘি আর আগুন! একটু সামলে চলতে হয়। মেয়েটারও যে ভরা যৌবন!

পণ্ডিত তিলতিল করে অগ্রসর হচ্ছেন! মূল পাঠ করে তার অন্বয় আর ব্যাখ্যা করেন। হিমালয়ের বর্ণনা, কিন্নর-কিন্নরীদের কথা, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহাদেবের প্রথম পক্ষের পত্নী সতীর দেহত্যাগ এবং হিমালয়-দুহিতা পার্বতীরূপে তাঁর পুনর্জন্ম! ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে মুঙ্গের, ভাগলপুর, বাঁকিপুর। নবযৌবনের শুভাগমনে পার্বতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশনের বর্ণনায় পণ্ডিত ব্যাখ্যাকে সংক্ষেপিত করতে বাধ্য হলেন। পীনোন্নত স্তনযুগল, বিপুল জঘন ও কৃশ মধ্যদেশের বর্ণনা পর্যন্ত

করতে পারলেন কাব্যতীর্থ, কিন্তু হোঁচট খেলেন ব্যাখ্যা করতে—'তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবরোম-রাজি! নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য' ইত্যাদি শ্লোকে। কিংবা 'অন্যোন্যমৃৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ', 'স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম! মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য ...'

নিজে থেকেই একদিন বললেন, রানিমা যদি চান তাহলে আমরা বরং কাল থেকে রামায়ণ পাঠ করি—

শঙ্করী অবাক হয়ে বলে, কেন? আমার তো খুব ভালো লাগছে! 'কুমার' কবে আসবেন উমার গর্ভে আমি তো তারই প্রতীক্ষায় আছি।

কাব্যতীর্থ বলেন, তথাস্তু!

শঙ্করী সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, আপনার কি ক্লান্তি আসছে? আমার মতো নির্বোধ শ্রোতাকে পাঠ করে শোনাতে?

কাব্যতীর্থ মাথা নেড়ে বলেন, না-না রানিমা ; সেজন্য নয়। আমার সংকোচ অন্য কারণে—

শঙ্করী বুদ্ধিমতী। বলে, বুঝেছি। তা হোক। বাল্মীকি, বেদব্যাসের মহাকাব্যের চেয়ে কালিদাসই শুনতে চাই। রামায়ণ-মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আছে, কালিদাসের নেই—

কাব্যতীর্থ বলেন, ঠিকই বলেছেন রানিমা। 'প্রসন্ন রাঘব' রচয়িতা কবি জয়দেব বলেছেন,

বাল্মীকে রজনি প্রকাশিতাগুণা ব্যাসেন লীলাবতী।
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।

অর্থাৎ, 'কবিতা মহাকবি বাল্মীকির কন্যা ; ভগবান বেদব্যাস তাঁকে পালন করেছিলেন, তিনি তাঁর পালক-পিতা—তাঁরা স্বীয় লীলাবতী কন্যার গুণরাশি জগতে প্রকাশ করেছিলেন। সেই কবিতা-কন্যা বিদর্ভ-রীতির অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে স্বেচ্ছায় শ্রীকালিদাসকে পতিরূপে বরমালা পরিয়েছেন।'—নারী-জীবনের ভূমিকায় পিতা ও পালক-পিতার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু স্বামী যে তার সব।

তা কি আর জানে না শঙ্করী? ওর ক্ষেত্রে যে-পালক-পিতা আর স্বামী একাকার হয়ে গেছেন!

শঙ্করী বলে, আমার মতো অরসিক শ্রোতাকে কাব্যপাঠ করে শোনাতে—

বাধা দিয়ে কাব্যতীর্থ বলেন, তাহলে শুনুন রানিমা। জনশ্রুতি—কবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্যগুলি রচনা করে সর্বপ্রথমেই তা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নিয়ে যেতেন না। সমস্ত রাত্রি ধরে তিনি কাব্য রচনা করেন, প্রত্যুষে তাঁর কুটিরে আসত একজন মালিনী—সে রাজবাটীতে ফুলের জোগান দেয়। ফুল সরবরাহ করে ফেরার পথে সে এসে বসত কবির কুঞ্জ-কুটিরে। বলত, কই কবি, কাল কী লিখেছ, শোনাও। আর মহাকবি কালিদাস সেই নিরক্ষরা মালিনীকে প্রথম শ্রোতা হিসাবে নিত্য বরণ করে নিতেন। মালিনী নিরক্ষরা ছিল, অরসিক ছিল না। মহাকাব্য শুনতে শুনতে সে কবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। সে নিজেকেই আরোপ করত ঐ কাব্যে। কখনও কল্পলোকে সে নিজেকে ভাবত ইন্দুমতী, কখনও যক্ষপ্রিয়া, কখনও বা হিমালয়-দুহিতা উমা!

আশ্চর্য! শঙ্করীরও যে ঠিক ঐ রকম মনে হয়। কাব্যতীর্থ উমার বর্ণনা করেন, আর শঙ্করী মনে মনে নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলিয়ে নেয়। কাব্যতীর্থ পড়েন :

"আত্মানমালোক্যচ শোভমানমাদর্শাবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ"।।৭।২২

[প্রসাধন-অন্তে সালঙ্কারা উমা দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আনন্দে মোহে চোখ দুটি মুদিত করেন—চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আসন্ন মিলনে তিনি যে উদগ্রীব! তাই তো হবে! রমণীকুলের বেশভূষা সাজসজ্জায় চরম সার্থকতাই তো প্রিয়তমের মনোহরণে—না হলে প্রসাধনের আর প্রয়োজন কী?]

আর শঙ্করীর মনে পড়ে যায় সেই কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রির কথা। মহামায়া তার সর্বাঙ্গে পরিয়েছেন অলঙ্কার—তনুদেহ ঘিরে বিক্রমপুরী 'খাসা-মস্‌লিন', যৌবনের যুগ্ম জয়স্তম্ভের উচ্ছ্বাস সংহত করেছেন দৃঢ়নিবদ্ধ কঞ্চুকে, স্তবকিত জলদ সম্ভারের মতো কবরীগুচ্ছে পুষ্পস্তবক, সীমন্তের মধ্যভাগে বালার্ক-রক্তিম চীনা সিন্দুর, কণ্ঠে দিয়েছেন ইন্দ্রনীল শতনরী, গুরুনিতম্বে মূর্ছিত হয়ে আছে স্বর্ণখচিত মণিমেখলা, অলক্তকরাগরঞ্জিত ফেনশুভ্র যুগ্ম চরণে কলহংসকণ্ঠ-নিঃস্বনমধুর নূপুর। তারপর মহামায়া

শঙ্করীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন উত্তমরূপে পালিশ-করা ধাতব দর্পণ ; বলেছিলেন, এবার দ্যাখ্ ছুট্‌কি! কেমন সাজিয়েছি। কী মনে হয়? বুড়ো বরের মাথা ঘুরে যাবে না?

শঙ্করী উমার মতোই সলজ্জে চোখ দুটি মুদে বলেছিল, আঃ! বড়দি! কী বকছ যা-তা।

মহামায়া ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ও ব্বাবা! বুড়ো বর বলেছি বলে এত রাগ! দেখিস পতিনিন্দায় বেমক্কা দেহত্যাগ করে বসিস না বাপু। তাহলে রাজা-মশাই তোর বদলে আমাকেই একান্ন টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীময়। তার পর তাঁর এই একান্নবর্তী রাজপরিবার চালিয়ে যাবেন!

শঙ্করীর সে বাসকশয্যা ব্যর্থ হয়েছিল। তাই ও উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চায়—উমার ক্ষেত্রে কী হল? শঙ্করীর কোল জুড়ে 'কুমার' সম্ভাবিত হয়নি, উমার হবে তো?

পণ্ডিত পাঠ করেন :

"ন নূনমারুঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে সংন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ"।।৭।৬৭

[ক্রোধবশে এই শঙ্কর—এমন অপরূপ শিব— যে মদনকে দগ্ধ করেছিলেন বলে শোনা যায় সেটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। তাই কি হয়? এত কঠোর কি হতে পারেন তিনি? মনে হয়, এই অপূর্বকান্তি দেবাদিদেবকে দেখে নিজের গর্ব খর্ব হওয়ার লজ্জায় কন্দর্প নিজেই আত্মহত্যা করেছিল।]

কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় বললেই বা শুনছে কে? শঙ্করী যে স্বচক্ষে দেখেছে কন্দর্পের মহামৃত্যুদৃশ্য : 'এত আয়োজন করেছ কেন? জান, না, কাল আমাকে যজ্ঞ করতে হবে?' না। ক্রোধবশে মহাদেব মদনকে দগ্ধ করেননি—শঙ্করী যে দেখেছে তাঁর চোখে অপরিসীম করুণার মূর্ছনা! মদনকে দগ্ধ করতে তিনিও ব্যথা কম পাননি। শঙ্করী যে স্পষ্ট দেখেছিল, মুগ্ধ চোখের তারায় তাঁর অন্তরের কামনা-বাসনার প্রতিবিম্ব। তাহলে হঠাৎ দুই হাতে মদনের কণ্ঠনালী কেন টিপে ধরেছিলেন তিনি?

—রানিমা!

সংবিৎ ফিরে পায় শঙ্করী। বলে, বলুন?

আমাদের কাব্যপাঠের এখানেই সমাপ্তি। কাল-পরশুর মধ্যেই আমরা কাশীধামে উপনীত হব!

শঙ্করী চমকে ওঠে : সে কী! এত শীঘ্র? কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, এ কাব্যে আছে সপ্তদশ সর্গ। মাত্র সাতটি তো শেষ হল?

তরুণ পণ্ডিত নির্বাক রইলেন। শঙ্করী পুনরায় বলে, কাশীধামে তো আপনি আমাদের ভদ্রাসনেই থাকবেন। বাকিটুকু বরং—

—তা হয় না, রানীমা। এই সপ্তম সর্গেই আমাদের কাব্যপাঠ সমাপ্ত হবে—

—কেন ঠাকুর-মশাই?

একটু ইতস্তত করে কাব্যতীর্থ কারণটা ব্যক্ত করেন। বলেন, আলঙ্কারিক মম্মথ ভট্ট মহাশয় তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যের প্রথম সাতটি সর্গই মহাকবির রচনা। পরবর্তী অংশ প্রক্ষিপ্ত—অর্থাৎ অন্য কারও লেখনীপ্রসূত। মল্লিনাথেরও ঐ একই অভিমত। আমারও তাই বিশ্বাস।

শঙ্করী প্রশ্ন করে, পরবর্তী অংশের কাব্যমাধুর্য কি নিকৃষ্ট স্তরের?

—না, ঠিক তা বলতে পারি না। অন্তত অষ্টম সর্গের রচনা যথেষ্ট উন্নত মানের।

—তাহলে সপ্তম সর্গেই থামছেন কেন?

কাব্যতীর্থ এক মুহূর্ত নীরব থাকেন। গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ নাকি করতে নেই। শেষমেশ স্বীকারই করেন—সপ্তম সর্গে উমার বিবাহ হল, তা আমরা পড়েছি। অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর দৈহিক মিলনের নিরাবরণ বর্ণনা আছে। আমাকে মার্জনা করবেন, রানিমা! সে আমি ব্যাখ্যা করে শোনাতে পারব না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শঙ্করীর। এই বুঝি ওর নিয়তি! উমা-মহেশ্বরের বিবাহ হবে, উমা সীমন্তে আঁকবে এয়োতির চিহ্ন, হাতে পরবে কালীঘাটের শাঁখা, কামাক্ষ্যা-মায়ের নোয়া; কিন্তু তার কোল জুড়ে সোনার চাঁদ কুমার আসবে না কোনোদিন। 'কুমারসম্ভব' শেষ হবে সপ্তম সর্গের 'অসমাপ্ত গানে'।

চার বছর পরে কথায় ফিরে আসা যাক এবার।

আজ প্রায় দেড় মাস হল নৃসিংহদেব ভাগ্যের সন্ধানে বংশবাটি থেকে নৌকাযোগে যাত্রা করেছেন কাশীধামের উদ্দেশ্যে। উনি রওনা হয়েছিলেন ফাল্গুনের মাঝামাঝি—দোলপূর্ণিমার পরেই ; আর এটা বর্ষশেষের শেষ সপ্তাহ। এই দেড় মাসে মহামায়ার শরীর যেন আরও ভেঙে গেছে। চৈতালী অপরাহ্ণে তিনি বসেছিলেন দ্বিতল গৃহের ছাদে—অস্তসূর্যের দিকে মুখ করে। ছাদের উপর থেকে অবশ্য গঙ্গা দেখা যায়। পাল-তোলা মহাজনি নৌকা চলেছে সারি সারি। দূরবিন থাকলে নৌকার মানুষও শনাক্ত করা যায়। মহামায়া এই সময়টা ছাদে এসে বসেন—বহুদিন পূর্বে রাজা-মহাশয় ওঁকে একটা দূরবিন উপহার দিয়েছিলেন। তারই সাহায্যে দূর-দূরান্তের দৃশ্য দেখতে ভারি ভালো লাগত। কী মজা! উনি ওদের দেখতে পাচ্ছেন, অথচ তারা সে-কথা জানেই না। প্রৌঢ়া মহামায়া এখনো যন্ত্রটা হাতে পেলে যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠেন। গাছে গাছে পাখি এসে বসে—তাদের দেখেন। বজরার ছাদে বারবিলাসিনীদের নিয়ে কাপ্তেনবাবুরা যখন গঙ্গার হাওয়া খেতে বের হয় তখন তারা জানতেও পারে না—ঐ প্রাসাদের শীর্ষ থেকে একজন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাদের।

সেদিনও যথারীতি তিনি বসেছেন ছাদে। হঠাৎ মতি এসে বললে, বড়-রানিমা, এই লেফাফাটুক্ নায়েব-মশাই পাইঠে দেচে। তোমার পত্তর!

—পত্র! পত্র কে লিখবে রে আমাকে?

মহামায়া তাঁর তেতাল্লিশ বছরের জীবনে কখনও চিঠি পাননি। রীতিমত অবাক হয়ে যান তিনি। বংশবাটির রাজপুরীর বড়-রানিমা কেমন করে জানবেন ঘোড়ার-ডাকে আজকাল রীতিমত 'ডাক' যাতায়াত করছে শেরশাহের বাঁধানো সড়ক ধরে। আগেও যেত, ইদানীং কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় সেটার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত হয়েছে! সীলবদ্ধ লেফাফাটা হাতে নিয়ে বড়-রানিমা ভেবে পান না এখন কী করণীয়। তাঁর অক্ষর পরিচয় নেই—ছুটকি থাকলেও না হয় পড়ে দিতে পারত। কে লিখেছে, কী লিখেছে না জেনে কেমন করে লোক ডাকেন? আর লোক বলতেও তো পুরুষমানুষ কেউ। রাজপুরীতে তেমন কোনো ললনার কথা মনে করতে পারলেন না, যে চিঠি পড়তে পারে।

—কী বললে রে নায়েব-মশায়? কোথা থেকে আসছে?

—বললে যে, রাজা-মশাই পাইঠেচেন। পাটনা থিকে। তেনারও পত্র এয়েচেন যে।

কী আজব কাণ্ড! রাজা-মহাশয় পাটনা পৌঁছলেনই বা কবে আর চিঠিই বা লিখলেন কখন? আর সেটা এত শীঘ্র বংশবাটিতে এসে পৌছালোই বা কেমন করে? পাটনা কোথায়? হয়তো কাশী যাবার পথে কোনো বড় গঞ্জ। তবে রাজা-মশাই জানেন যে, মহামায়া নিরক্ষরা। সুতরাং পত্রে তিনি এমন কিছু লিখবেন না যাতে লজ্জা পেতে হয়। অনেক ভেবেচিন্তে রানিমা এত্তেলা পাঠালেন দেওয়ান দিলীপ দত্তকে। গোপন কথা যদি কিছু থাকে, নিশ্চয়ই থাকবে, না হলে খামকা উচ্ছ্বাস জানাতে রাজা-মশাই তাঁর অক্ষরপরিচয়হীনা সহধর্মিণীকে এভাবে পত্রাঘাত করতেন না।

ডাকতে হল না, দেওয়ান দিলীপ দত্ত নিজেই এত্তেলা পাঠালেন। সংবাদবহ কিঙ্করী এসে জানালো দেওয়ান-মশাই জরুরি কাজে একবার রানিমায়ের দর্শনপ্রার্থী।

মাঝমহালের চিকের এপাশে বড়-রানিমা এসে বসলেন, ওপাশে যথারীতি এসে বসেছেন দেওয়ান দিলীপ দত্ত। কিঙ্করী ওপাশে গিয়ে বললে, রানিমা এয়েচেন। কথা কন।

দিলীপ বললেন, ঠিক আছে। তুমি এখন যেতে পার। আমাদের গোপন কিছু কথা আছে। লক্ষ রেখো, ওদিকে কেউ যেন আড়ি না পাতে।

কিঙ্করী নিষ্ক্রান্ত হলে দিলীপ বললেন, রানিমা, আজই 'ঘোড়ার-ডাকে' রাজা-মহাশয়ের একটি পত্র এসেছে। উনি নিরাপদে পাটনায় পৌঁছেছেন গত অমাবস্যায়। আমাকে পত্রে অনেক বৈষয়িক নির্দেশ লিখেছেন—যা বিস্তারিত আপনার না শুনলেও চলবে। ঐ পত্রে তিনি আরও লিখেছেন যে, আপনাকে তিনি নাকি একটি পৃথক গোপন পত্র পাঠিয়েছেন। রাজা-মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে আদেশ করেছেন, পত্রখানি আপনাকে পাঠ করে শোনাতে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যা করে দিতে। এ বিষয়ে আপনার কী নির্দেশ তাই জানতে আমি এখানে এসেছি, রানিমা।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে দেওয়ান-পৌত্র দিলীপ দত্ত অপেক্ষা করতে থাকে। ওপ্রান্ত থেকে কোনও প্রত্যুত্তর ভেসে আসে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পুনরায় বলে, রানিমা! আপনি ও-প্রান্তে আছেন তো?

পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়ায়। সবিস্ময়ে দেখে চিকের পর্দা উত্তোলন করে বংশবাটির প্রধানা মহিষী স্বয়ং এ-প্রান্তে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাঁর মাথায় আধোঘোমটা। তবু মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসঙ্কোচে তিনি এগিয়ে এসে একটা গদি-মোড়া সোফায় বসে পড়েন। বলেন, দিলীপ, সময়ে আমার সন্তান হলে সে তোমার বয়সিই হতো। তোমাকে নাম ধরে ডাকলাম, কিছু মনে করো না, বাবা। তুমি আমার পুত্রতুল্য।

দিলীপ অগ্রসর হয়ে আসে। নিচু হয়ে সশ্রদ্ধে পদধূলি গ্রহণ করে রাজমহিষীর। বলে, আমি ধন্য হলাম মা!

—আমার শাশুড়ি উপস্থিত থাকলে হয়তো আমার এ-কার্য তিনি অনুমোদন করতেন না। আমাদের সাতপুরুষের ঐতিহ্যে এমন অনাচার নাকি নেই। না থাক, আমার মতো ভাগ্য নিয়েও আসেনি বংশবাটির আর পাঁচজন রানি। আমার স্বামী দেশত্যাগ করে গেছেন। আমার সন্তান নেই, দেবর নেই। আমি নির্বান্ধব। তুমিই তাঁর একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই এ পর্দা আমি মানব না, মানতে পারি না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, রানিমা।

—এবার তুমি চিঠিখানি পড়ে শোনাও—

সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফাখানি খুলে দিলীপ পড়তে থাকে :

"সাবিত্রীসমানাসু, শ্রীঅনন্তবাসুদেবপ্রসাদ শ্রীস্বয়ম্ভরা জয়তি। অতঃপর আমি নিরাপদে মোকাম পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আগামীকল্য পুনরায় যাত্রা করিব। একটি বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে এই পত্র দিতেছি। গত এক মাস কাল নৌকাযোগে আগমনকালে আমি নিরন্তর মনোবেদনায় ভুগিয়াছি। আমার সর্বদা মনে হইতেছে তোমার নিকট সত্য গোপন করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। তোমার নিকট আমি সত্যবদ্ধ আছি, একটি বিশেষ দ্রব্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করিতে না পারিলে আমি কোনোদিন বংশবাটিতে প্রত্যাগমন করিব না। কিন্তু এক্ষণে মনে হইতেছে তাহা তো কেবলমাত্র পুরুষকারে প্রাপ্তব্য নহে, তাহার জন্য যে দৈবের দাক্ষিণ্যও অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তদ্ভিন্নও বাধা আছে। সে বাধা অনতিক্রম্য না হইলেও দুরতিক্রম্য। অবধান কর : স্বয়ম্ভরা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের পূর্বদিনে আমি যখন শহর কলিকাতায় গিয়াছিলাম তৎকালে কেল্লায় একজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হতভাগ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। একথা পরমকল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপ অবগত আছে। কোম্পানির আইনে ব্যবস্থা আছে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামি কোনও শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে সাধ্যমতো তাহা পরিপূরণ করা হয়। ঐ হতভাগ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিল মাত্র। সে-কারণ আমাকে কেল্লায় ঐ বধ্যভূমে যাইতে হয়। যে তথ্য শ্রীমান দিলীপ জানে না তাহা এই—সেই হতভাগ্য মৃতুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামি হইতেছে ছোট বউয়ের জনক—যে ষড়বর্ষীয়া বালিকাকে আমার পদপ্রান্তে রাখিয়া একদিন গঙ্গাবক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে সেই হতভাগ্য ছোট রানিমায়ের বিষয়ে আমাকে কিছু গুহ্যবার্তা জ্ঞাপন করিয়া নিজেকে পাপমুক্ত করে। সকল কথা পত্রে লিপিবদ্ধ করার যোগ্য নহে। সাক্ষাতে বলিব। এ সংবাদ তুমি ও শ্রীমান দিলীপ ভিন্ন যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয়। এত কথা তোমাকে পত্রযোগে জানাইলাম শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি প্রণিধান করিবে আমার সত্যরক্ষার বাধা কোথায়! এমতাবস্থায় আমার কর্তব্য কী? তোমার অভিমত কাশীধামের ঠিকানায় জানাইও। ইতি—"

চিঠি শেষ হয়ে গেল। শ্রোতা ও পাঠক দুজনেই নির্বাক। দিলীপই প্রথম কথা বললে। একটু ইতস্তত করে বললে, বড়-রানিমা, জানি এ আমার অশোভন প্রশ্ন। তবু পুত্র বলে আমাকে সম্বোধন করেছেন, সেই অধিকারে জানতে চাইছি—আপনি রাজা-মশাইকে এমন কী জিনিস নিয়ে আসতে বলেছেন ফেরার সময়?

ম্লান হাসলেন মহামায়া। বললেন, তোমাকে পুত্র সম্বোধন করেছি বাবা, তাই তা আজ আর তোমাকে জানাতে পারি না!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল দিলীপ। তারপর বললে, আপনি যদি এ পত্রের উত্তর দিতে চান, তাহলে বলুন! আমি লিখে নিই।

—না বাবা। আমি আবার কী লিখব? তুমি শুধু তাঁকে জানিও যে, তোমার বড়-রানিমা শুধু বলেছিলেন, 'রাজা-মহাশয়ের ধর্ম এবং বিবেক যা বলে, তিনি যেন তাই করেন।'

—তাই লিখব বড়মা।

—তোমার ছোটমা সম্বন্ধে পত্রে যা লেখা আছে—

বাধা দিয়ে দিলীপ বলে ওঠে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত কেমন করে থাকবেন মহামায়া নিজে? ছুটকির সম্বন্ধে কী এমন গুহ্যতথ্য জানিয়ে গেল তার বাপ? ফাঁসিকাঠে চড়ার আগে? ছয় বছরের মেয়ের তো আর অতীত ইতিহাস বলে কিছু নেই। তবে কি তার জন্মরহস্য বিষয়ে? তার মায়ের কোনো কলঙ্কের কথা?

মহামায়া ছটফট করতে থাকেন। আরও ভেঙে পড়ে তাঁর শরীর।

ওর দুদিন পরেই ঘটল আর একটা অকল্পনীয় ঘটনা। মোতি ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, মা আসিচে। ও-বড় রানিমা, দেখসে,—কে এয়েছেন দেখ!

মোতির-মা ফিরে এসেছে কাশী থেকে? এমন হঠাৎ যে? মহামায়া ছুটে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে এবং এসেই তিনি যেন ভূত দেখলেন। দাঁড়িয়ে আছে শঙ্করী আর মোতির মা।

—এ কী রে! তোরা! কী করে এলি? কেন? হঠাৎ?

সংবাদ নিদারুণ। প্রায় দু মাস পূর্বে অর্থাৎ নৃসিংহদেব যে সময়ে যাত্রা করেছেন তার আগেই তাঁর জননী রানি হংসেশ্বরীর কাশীলাভ ঘটে। শঙ্করীই তাঁর শ্রাদ্ধ করেছে। তারপর ভৈরব সর্দারের ব্যবস্থাপনায় ওরা ফিরে এসেছে বংশবাটিতে। আশ্চর্য! পথে নিশ্চয় উজান-ভাঁটি দুটি বজরা পরস্পরকে অতিক্রম করেছে—অথচ কেউই জানতে পারেনি বিপরীতমুখী বজরায় বসেছিলেন তাঁদের অতি-আপনজন!

সতীনকে বুক জড়িয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলেছিলেন মহামায়া : উঃ! কী কাঠ বরাত করে জন্মেছিলি হতভাগী। তোর জন্যে লোকটা দেশান্তরী হয়ে গেল, আর তুই....

শঙ্করী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েই রইল শুধু।

সেই বংশবাটি রাজপুরীর বৈচিত্র্যবিহীন ছককাটা জীবন—সূর্যোদয়ে যার সূচনা, সূর্যাস্তে সমাপ্তি। এ জীবনের সঙ্গে শঙ্করীর আবাল্য পরিচয়। সেই সব চেনা মুখ—মোতি, মোতির মা, নৃত্যকালী, কানাই, কানাইয়ের মা, বংশী, শ্রীধর, গোবর্ধন। ঘেরাটোপ খাঁচায় সারি সারি কোকিল ওর জীবনের আর দশ-বিশটা বসন্তের মতো এই চৈত্রশেষেও অন্ধ আর্তি জানায়—কুহু-কুহু-কুহু। অনন্তবাসুদেব মন্দিরে প্রহরে প্রহরে বেজে ওঠে শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, সন্ধ্যাবন্দনা, শয়নারতি। ক্লান্ত মধ্যাহ্নে ঘুঘুর একটানা ঘুমপাড়ানিয়া তান। কখনও বা রাজপথ-দিয়ে-চলা পালকিবাহকদের শ্রান্ত ধ্বনি,—হুম্-ব্রো, হুম্-ব্রো! ভেনিশীয় খড়খড়ির পাল্লা তুলে শঙ্করী শয়নকক্ষ থেকে দেখে মা গঙ্গাকে। জল দেখা যায় না—খাড়া পাড়ের ওপাশ থেকে দেখা যায় মহাজনি নৌকার পালের মিছিল। ওর মনে হয়, ওরাও বুঝি একসার রাজান্তঃপুরিকা! ফাঁকা হাওয়ায় অন্তঃসারশূন্য উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠেছে ঐ লাল-নীল-গেরুয়া নৌকার পাল! সার বেঁধে চলেছে অচেনা উজান থেকে অজানা ভাটার দিকে—জন্ম থেকে মৃত্যুর রাজ্যে। কিঙ্কর-কিঙ্করীর দল প্রথামত কাজ করে যায়—নিত্যকর্মপদ্ধতি। বংশী ঝারিতে করে বাগানের চারাগাছে জলসেচন করে—বেল, জুঁই, গাঁদা, দণ্ডকলস ফোটে আর ঝরে। শ্রীধর মাঝে মাঝে ঝাড়পোছ করতে বসে বারান্দা আর সিঁড়ির প্রকাণ্ড তৈলচিত্রগুলি। ফাঁকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা নৌকোর পালের সারির মতো ড্যাবড়েবিয়ে তাকিয়ে থাকে তেলরঙের রাজা-রাজড়ার দল—রামেশ্বর, রঘুদেব, গোবিন্দদেব। যেদিকেই যাও, মনে হবে তোমারই দিকে তাকিয়ে আছে—মরা পাবদা মাছের ঝাঁক যেন! গোবর্ধন ময়লা ন্যাকড়ায় মুছতে থাকে খাশগেলাসের কালিমা। তার কি শেষ আছে? ওরা

আলো ছড়ায় যতটা কালি মাখে তার চেয়েও বেশি! তারপর সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে! কামিনী, গন্ধরাজ আর কাঞ্চনের ঝোপেঝাড়ে জ্বলতে থাকে লাখ লাখ জোনাকি। হাসনুহানার তীব্র মদির গন্ধ মিশে যায় দেউড়ি থেকে ভেসে আসা মিশিরজীর তুলসীদাসী রামায়ণের গানের সঙ্গে। 'অশোকবনের' একান্তে নর-সিংহ রাঘবের ধর্মপত্নী করলগ্নকপোলে ভাবছেন—তিনি কেমন করে আজও আমাকে ভুলে আছেন? আসে মালাকার—জুঁই-বেলির মালা নিয়ে। শঙ্করীকে নিতে হয়—না হলে রাগ করবেন মহামায়া। দুঃখ পাবেন। মহামায়া তো আর কুমারসম্ভব পাঠ করেননি, জানেন না 'স্ত্রীণাংপ্রিয়লোকফলা হি বেশঃ।'

এই ছককাটা জীবনের পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে শঙ্করীর প্রায় আবাল্য পরিচয়; কিন্তু এবার যেন তা দুঃসহ লাগছে। ও যে ইতিমধ্যে আভাস পেয়েছে নিষিদ্ধ ফলের—দেখে এসেছে রাজপুরীর পাঁচিল-ঘেরা এই চতুঃসীমার বাইরের দুনিয়াটাকে। দেখেছে বিস্তীর্ণ গঙ্গার বালি চিক-চিক জলে বালিহাঁসের মিছিল, শুনেছে তাদের দুঃসাহসী পাখায় দিগন্ত উত্তরণী নিঃস্বন; দেখেছে বিশ্বনাথের শয়নারতি, শুনেছে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে লক্ষ যাত্রীর উচ্ছল আবেগের 'হর-হর ব্যোম-ব্যোম!' আজ তাই এই ঘেরাটোপ খাঁচায় শঙ্করীর অন্তর ঐ অন্ধ কোকিলের মত ব্যর্থ বসন্তের আর্তি জানাতে চায়—কুহু, কুহু, উহু! উহু!

বেশ ছিল কাশীতে! চার-চারটে বছর। সেই চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে হাতিফট্‌কার বাড়িতে। শাশুড়ি তো ওকে দেখে হাতে স্বর্গ পেলেন। পুত্রবধূর রূপের সুখ্যাতি লোকমুখে শুনেছিলেন—কিন্তু সে যে এমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী এ তত্ত্বটার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। আর কী তার সেবা-যত্ন! বধূমাতাকে পাঁজরসর্বস্ব বুকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা বলতেন, এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে পাগলি?

বৃদ্ধা তখন চলৎশক্তিহীনা। তবু বধূমাতাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকতেন না। আহা, বেচারি ওঁর জন্যেই স্বামী ছেড়ে, সংসার ছেড়ে এতদূরে এসেছে। কী-ই বা বয়স ওর? শখ-আহ্লাদের সময়! মোতির-মা আর ভৈরব কিংবা কাব্যতীর্থকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েদেখিয়ে দিয়েছেন কাশীর সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট; এমন কি একদিন কাব্যতীর্থ ওকে টাঙায় করে দেখিয়ে এনেছেন ধামেকস্তূপ। ঘন অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অতীত যুগের সাক্ষী। কাছে যাওয়া যায় না, দেখবার কিছু নেই। গহন অরণ্যের মাঝখানে পরিত্যক্ত সে বিস্মৃত অতীতকে দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। টাঙায় যেতে যেতে শুনল শাক্যমুনির জীবনকথা। মোতির মা আর ভৈরবও ছিল টাঙায়। কাব্যতীর্থ মুখে মুখে বলতে থাকেন সিদ্ধার্থ বা গৌতমের জীবনী—সারনাথ মৃগদাবে তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন কাহিনি। মোতির-মা দেখল ঊর্ধ্বগ্রীব উটের সারি—ভৈরব দেখল গাছে গাছে কত বেওয়ারিশ ফল ফলেছে, আর শঙ্করী লীন হয়ে গেল দু-আড়াই হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষে। কাব্যতীর্থের কাহিনি শুনতে শুনতে আবার সে যেন হারিয়ে গেল কাহিনি-বর্ণিত নায়িকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা রাত্রে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন—রাজবধূ যশোধরা অঘোর নিদ্রায় মগ্ন। সুপ্রবুদ্ধতনয়ার-প্রেম বেঁধে রাখতে পারল না উদাসীন শাক্যসিংহকে। শুনতে শুনতে মনে হয়—ওর যে বেদনা, যে বঞ্চনা, তা তো নতুন নয়। এই তো চিরদিনের ভারতীয় নারীর নিয়তি। তবু যশোধরার একটা সান্ত্বনা ছিল। অন্তত জীবনের কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্তের সার্থকতা সে সাজিয়ে রাখতে পেরেছিল স্মৃতির মঞ্জুষায়। না হলে তার জীবনে 'কুমারসম্ভব' সার্থক হত না—কোল জুড়ে আসত না সোনার চাঁদ : রাহুল!

কাব্যতীর্থ মায়ের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। অমন সুরেলা অথচ দরাজকণ্ঠে মায়ের নাম শুনলে কে না মুগ্ধ হয়? বৃদ্ধা বলেছিলেন, তুমি তাহলে আমাদের ন্যায়রত্ন মশায়ের পুত্র? তবে তো আমাদের ঘরের লোক গো। তুমি এ বাড়িতেই থাকবে। সিধের ব্যবস্থা করে দেব—তুমি স্বপাক আয়োজন করে নিও, আর রোজ সন্ধ্যায় এসে আমাকে মায়ের নাম শুনিয়ে যাবে।

মোতির-মা উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিল, ঠাকুরমশাই তো রোজ ছোটরানিমাকে শাস্তর পড়ে শোনাতেন—নৌকোয় আসবার কালে।

—তাই নাকি! তা বেশ তো। এখানেই থাক। ছোট বৌমাকে শাস্তর পাঠ করে শুনিও। কী নাম তোমার?

কাব্যতীর্থ করুণভাবে শঙ্করীর দিকে তাকিয়েছিলেন। আধো-ঘোমটা মাথায় শঙ্করী দাঁড়িয়েছিল অদূরে মায়ের ঘরজোড়া পালঙ্কের বাজু ধরে। মিটিমিটি হাসছিল সে। আচ্ছা জব্দ হয়েছেন এবার ঠাকুরমশাই। কারণ ছিল। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর শঙ্করী নাম জানতে চেয়েছিল কাব্যতীর্থের। কিন্তু তিনি ক্রমাগত জবাবটা এড়িয়ে গেছেন। শঙ্করীর ধারণা হয়েছিল—পিতৃদত্ত নামের বিষয়ে কাব্যতীর্থের নিশ্চয় কোনও সংকোচ আছে হয়তো হাস্যকর কোনো নাম। না হলে এতদিন সেটা তিনি জানাননি কেন?

হংসেশ্বরী তাগাদা দেন, কী নাম গো তোমার, হ্যাঁ ছেলে? কী বলে ডাকব?

কাব্যতীর্থ কোনোক্রমে বলেন, এঁরা আমাকে 'ঠাকুর-মশাই' বলে ডাকেন।

—ওরা ডাকুক। আমি বাপু তা পারব না। তুমি আমার নাতির বয়সি। তোমার ঠাকুরকে একদিন আমি ঐ নামে ডাকতাম। বাপ-মায়ের দেওয়া নাম তো একটা আছে। সেটা কী?

এবার কাব্যতীর্থ সলজ্জে বলে, শঙ্করদেব।

চমকে ওঠে শঙ্করী। ওমা এই জন্য! ছি ছি ছি! কোনো মানে হয়? এত কাণ্ড যদি না হত, প্রথম দিনই সরল ভঙ্গিমায় যদি কাব্যতীর্থ নামটা বলে দিতেন তাহলে সংকোচের কিছু থাকত না। নাম নামই। ওর নাম শঙ্করী বলে কারো নাম শঙ্কর হতে পারবে না?

এ নিয়ে পরে কিন্তু কোনও কথা হয়নি। শঙ্করদেব প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসতেন, গান শোনাতেন, রামায়ণ অথবা চৈতন্যভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। হংসেশ্বরী ঘুমিয়ে পড়লে কখনও কখনও সংস্কৃত কাব্যপাঠ করেও শোনাতেন শঙ্করীকে। মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে ঘুমোত মোতির মা—আর ঘৃতপ্রদীপ-জ্বলা আধো-অন্ধকারে পাঠক এবং শ্রোতা বিচরণ করতেন অতীত যুগের ভারতবর্ষে—কাদম্বরী, বিক্রমোর্বশী, মেঘদূত-এর রাজ্যে। দীর্ঘ চার বছরে শঙ্করীর শব্দজ্ঞানও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। অন্বয়-ব্যাখ্যা ছাড়াই অনেক শ্লোকের অর্থ গ্রহণ হত তার।

সে একটা নতুন জীবন! অনাস্বাদিতপূর্ব ....

* * *

একদিন মহামায়া ওকে কাছে ডেকে বললেন, ছুট্‌কি, একটা কথা রাখবি?

—কী?

—আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই আবার কাশী চলে যা।

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে শঙ্করী শুধু বলেছিল : ন্‌না!

—না কেন? কিসের মিথ্যা অভিমান? আমি জানি, সে শুধু তোর জন্যেই কাশীতে গিয়েছিল এবার। আমার কাছে সে স্বীকার করেছে—সে অনুতপ্ত। বিশ্বাস কর। তাছাড়া কাশীর মোকামে এখন কে আছে বল? কে ওর দেখাশোনা করে? হয়তো সময়ে খায় না, নায় না, ঘুমোয় না। এতটা বয়স পর্যন্ত কখনও তো এমন নির্বান্ধব একা থাকেনি। তুই যা—মোতির-মা আর ভৈরবকে সঙ্গে দিচ্ছি।

কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না শঙ্করী। কেন হবে? শঙ্করী জানে, দেওয়ানজির সঙ্গে বৈষয়িক প্রয়োজনে রাজা-মহাশয় যথারীতি পত্রালাপ করে থাকেন। এ কথা শুনেছে, তিনি কাশী যাবার পথে পাটনা থেকে বড়রানিকে কী একটা গোপন পত্র পাঠিয়েছিলেন। মাঝমহালে দেওয়ানজি সে পত্রের পাঠোদ্ধার করে শুনিয়েছিলেন বড়দিকে। তাহলে? রাজা-মহাশয় ইচ্ছে করলে তো তাকেও পত্র লিখতে পারতেন। তিনি তো জানেন—শঙ্করী মহামায়ার মতো নিরক্ষরা নয়; গোপন পত্র সে নিজেই পড়তে পারবে। তিনি যদি চান শঙ্করী পুনরায় কাশী যাত্রা করুক তাহলে অনায়াসে সেই মর্মে নির্দেশ পাঠাতে পারেন—তাকে, বড়দিকে অথবা দেওয়ানজিকে।

যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ!

নাঃ! ভুল হল। রাজা-মহাশয় 'অধম' নন, অধিগুণের অধিকারীই। এ শুধু ওর কপাল।

কিছুদিন পরে শঙ্করীই আবার এল বড়দির কাছে। বললে, একটা কথা ছিল বড়দি! ভাবছি সংস্কৃতটা শিখব।

—সংস্কৃত শিখবি? সে তো বেশ কথা। কিন্তু তুই নিজেই তো অ-রাজি হয়েছিলি যখন রাজা-মশাই ব্যবস্থা করতে চাইলেন।

—সে তো পাঁচ বছর আগের কথা। এখন আমার মন বদলেছে। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। পড়াশুনাই শুরু করি।

—তা বেশ তো। দিলীপকে বলি একজন পণ্ডিতের সন্ধান করুক।

—সন্ধান করতে হবে না। তুমি ঁবাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত কাব্যতীর্থ-মশাইকে সংবাদ দাও। তিনি রোজ সকালে, দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায়—যখন তাঁর সুবিধে হয়, আমাকে পড়িয়ে যাবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত হল মহামায়ার। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ন্যায়রত্নমশাই দেহ রেখেছেন। তাঁর উপযুক্ত পুত্র কাব্যতীর্থ এখন পূজারী। একটি টোলও তিনি চালান—তাঁর পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী। মহামায়ার ভ্রূকুঞ্চন সেজন্য নয়—কিছু কানাঘুষা তাঁর কানে এসেছে। ঐ নবীন পণ্ডিত নাকি শঙ্করীর সঙ্গেই তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। হংসেশ্বরীর প্রিয়পাত্রও হয়েছিলেন। তাঁর শেষ কাজের ব্যবস্থা তিনিই করে দেন। ঐ প্রসঙ্গে মহামায়া শুনেছিলেন—কাব্যতীর্থ নাকি প্রতিদিন সন্ধ্যায় শঙ্করীকে কাব্যপাঠ করে শোনাতেন। মোতির-মা মিথ্যা বলবে না তাঁর কাছে। নবীন পণ্ডিতের যে রূপবর্ণনা সে দিয়েছিল তাতে সন্দেহটা আরও বাড়ে। তবে পিসিমা এবং মায়ের সম্মতিক্রমেই যখন এ ব্যবস্থা হয়েছিল তখন মহামায়ার বলার কিছু নই। বিশেষ—ওঁরা গুরুকুলের বংশ।

তবু মহামায়া ইতস্তত করে বলেছিলেন, তাঁর কত কাজ। ঁবাসুদেবের নিত্যসেবা আছে, চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আছে। তার চেয়ে আমি বরং অন্য কোনো পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে দিই। পড়াশুনা করতে চাস, এ তো ভাল কথাই।

শঙ্করী বলেছিল, না! অন্য কোনো পণ্ডিতের কাছে আমি পড়ব না। ওঁর যদি সময় বা সুবিধে না হয় তাহলে তিনি নিজেই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। তুমি খবর পাঠিয়েই দেখ না?

মহামায়া গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, তোর ভালোর জন্যই বলছি। উনি বয়সে নবীন তো—

শঙ্করীও গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আজ আর আমি তেরো বছরের ছোট্ট খুকিটি নই বড়দি। নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স আমার হয়েছে।

—বেশ। যা ভালো বুঝিস কর্।

সাত বছর পরের কথা। টিপু সুলতানের মৃত্যু-বৎসর। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হচ্ছে। মহামায়া এখন পঞ্চাশোর্ধ্বা বৃদ্ধা, শঙ্করীর বয়স সপ্তবিংশতি বর্ষ। এ সাত বছরে যেমন তিলতিল করে ভেঙে পড়েছে বড়রানিমার স্বাস্থ্য, ঠিক তেমনি ভাবে বিকশিত হয়েছে নিঃসন্তানা সীমন্তিনী শঙ্করীদেবীর তনুদেহ। আজ সাত বৎসর নৃসিংহদেব প্রবাসী। একবারও আসেননি স্বদেশে। তিনি কী করেন কেউ খবর রাখে না। তবে কাশীতেই আছেন। নিয়মিত পত্র আসে দেওয়ান দিলীপ দত্তর কাছে। সংসারে বীতরাগ হননি নিশ্চয়—না হলে এত খুঁটিনাটি বৈষয়িক নির্দেশ আসত না তাঁর পত্রে। শোনা যায়, তিনি ভূকৈলাশের রাজার অর্থানুকূল্যে 'কাশীখণ্ড' রচনা করছেন। সেইটাই তাঁর উপার্জনের রাজপথ। আরও কী সব করেন। প্রতি পত্রেই দেওয়ানজিকে তাগাদা দেন—জানতে, রাজকোষে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত। সাত লক্ষ তঙ্কার তহবিল পূর্ণ হতে আর কত বাকি? প্রায় ষাট বৎসর বয়স হল তাঁর—জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। তবু সংকল্পচ্যুত হননি। পিতৃরাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন তাহলে তিনি আজও দেখেন।

ইতিমধ্যে বংশবাটির রাজান্তঃপুরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যাতে আর স্থির থাকতে পারলেন না মহামায়া। তিনি এবার নিশ্চিত বুঝেছেন—তাঁর কাল ঘনিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য তাঁর চিরকালই খারাপ। সাহেব ডাক্তারের অদ্ভুত চিকিৎসায় পুনর্জীবন লাভ না করলে বহুদিন পূর্বেই তাঁর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার কথা। বেঁচে গেছেন, কিন্তু তিলতিল করে শরীর ভেঙে যাচ্ছে। বর্তমানে তিনি বস্তুত শয্যালীনা। মহামায়া বুঝলেন, অনতিবিলম্বে রাজা-মহাশয় যদি বংশবাটিতে প্রত্যাবর্তন না করেন, তাহলে ইহজন্মে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আশা নেই।

তাছাড়া আরও একটি দুর্ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাতে আর বিলম্ব করা কোনোমতেই উচিত হবে না। মহামায়া ডেকে পাঠালেন দেওয়ানকে। এখন আর মাঝ-মহল নয়, দিলীপ ঘরের ছেলেই হয়ে গেছেন। কানাইয়ের মা তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বড়রানিমার মহলে।

—বস দিলীপ। তোমার সঙ্গে কথা আছে। জরুরি এবং গোপন।

দিলীপ বড়রানিমার পদধূলি নিয়ে একটা গদিমোড়া কেদারায় বসেন। বলেন, জরুরি এবং গোপন পরামর্শের প্রয়োজন না হলে তো আপনি আমাকে ডাকেন না বড়মা। বলুন? কিন্তু তার আগে বলুন—আপনার শরীর কেমন আছে? কবিরাজ মশাই কী বলছেন?

—কবিরাজ মশাই যাই বলুন, আমি বুঝতে পারছি দিলীপ—আমার সময় আর বেশি বাকি নেই, না না, আমাকে বাধা দিও না। জরুরি কথাগুলো বলে নিতে দাও। রাজা-মহাশয় যদি মাস তিন-চারের মধ্যে ফিরে না আসেন তাহলে খুব সম্ভব তাঁকে আর দেখতেই পাব না। তা ছাড়া এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে—সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি—যেজন্য অনতিবিলম্বে তাঁর বংশবাটিতে ফিরে আসার প্রয়োজন। এখন বল, কী ব্যবস্থা করা যায়?

দিলীপ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি যতদূর জানি—রাজা-মহাশয়ের প্রত্যাবর্তনের পথে দুটি বাধা। প্রথম বাধাটা কী, তা আমি জানি না ; কিন্তু আপনি জানেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল মহামায়ার। বলেন, বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ তুমি?

—সাত বছর পূর্বেকার কথা স্মরণ করুন বড়মা। পাটনা থেকে লেখা পত্রে রাজা-মহাশয় বলেছিলেন, তিনি আপনার কাছে সত্যবদ্ধ—কী একটা জিনিস না নিয়ে তিনি ফিরবেন না।

মহামায়া বলেন, বুঝেছি। না সেটা আদৌ বাধা নয়। দ্বিতীয়টা?

—দ্বিতীয় অন্তরায় রাজা-মহাশয় প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন—রাজকোষে সাতলক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত না হলে তিনি রাজবাটিতে প্রত্যাবর্তন করবেন না।

—জানি। কত তঙ্কা সঞ্চয় হয়েছে ইতিমধ্যে?

—ছ লক্ষ।

—ঠিক আছে। তুমি তাহলে রাজা-মশাইকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাও যে, সাত লক্ষ তঙ্কা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে। তিনি যেন পত্রপাঠ প্রত্যাবর্তন করেন। আমার স্বাস্থ্যের কথাও জানাবে এবং লিখবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে না পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

দিলীপ দত্ত অধোবদনে বসে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত।

—না, মিথ্যা লিখতে আমি বলিনি। তার আগে তুমি নীলমণি স্যাকরাকে সংবাদ দাও। তাকে নিয়ে নিজেই এস। আগামীকাল সকালে। সে যেন নিক্তিপাল্লা এবং নগদ এক লক্ষ তঙ্কা নিয়ে আসে। আমি আমার সমস্ত যৌতুক অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে দেব। তার মূল্য এক লক্ষ তঙ্কার বেশি বই কম নয়।

দিলীপ অবাক হয়ে বলেন, কী বলছেন, মা! আপনি সব কিছু বিক্রয় করে দেবেন? নিঃস্ব হয়ে যাবেন?

হাসলেন মহামায়া। বললেন, নিঃস্ব কেন হব রে, দিলীপ? বিনিময়ে নিঃসন্তানা সীমন্তিনী পাবে স্বামীর চরণধূলি। মৃত্যুপথযাত্রিণীর সেটাই তো একমাত্র পাথেয়। একরাশ গহনা আঁকড়ে থাকলে তো আমি স্বর্গে যাব না? আমার কে আছে বল, যাকে দিয়ে যাব? মেয়ে নেই, পুত্রবধূ নেই। বংশে বাতি দিতে আর কে রইল?

দিলীপ উঠবার উপক্রম করেন। বলেন, তবে তাই হোক। যেরকম আপনার অভিরুচি।

—না। বস ; আরও কথা আছে। এ কাজটা আরও গোপন এবং গুরুতর। তুমি অনন্তবাসুদেব মন্দিরের জন্য একজন ভালো পুরোহিতের ব্যবস্থা কর। অবিলম্বেই।

—কেন রানিমা? আমাদের কাব্যতীর্থ মহাশয় তো—

—হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে জানিয়ে দাও—বড়রানিমার ইচ্ছা তিনি কাশী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন বা নবদ্বীপে গিয়ে নতুন টোল খুলে বসুন। এ জন্য রাজ-তহবিল থেকে তাঁকে সহস্র তঙ্কা প্রণামী দিও।

দিলীপ অবাক হয়ে যান। একটা কানাঘুষা তাঁর কানেও এসেছে। বিশ্বাস করেননি। এখন সন্দেহ হল, তাহলে নিশ্চয় তার কিছু বাস্তব বনিয়াদ আছে। না হলে সহস্র রজতখণ্ডের বিনিময়ে বড়-রানি

ঘৃতকুম্ভ এবং অগ্নির মাঝখানে এভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইবেন কেন? একটু ভেবে বলেন, আর কাব্যতীর্থমশাই যদি জানতে চান, বড়-রানিমার এমন অদ্ভুত ইচ্ছা হল কেন? কী বলব?

—প্রস্তাবটা তোমার কাছে যতটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে, ঠাকুর-মশায়ের কাছে অতটা অপ্রত্যাশিত হবে বলে মনে হয় না। তবু তিনি যদি প্রশ্ন করেন, তখন বল, কারণটা তিনি যেন আমার কাছ থেকে জেনে নেন। আর কথাটা যেন গোপন থাকে।

কথাটা গোপন থাকেনি। ওঁদের দুজনের কেউই জানতেন না, দেওয়ান দিলীপ দত্ত দ্বার রুদ্ধ করার পর কানাইয়ের মা সচকিত হয়ে উঠেছিল। এ পথে কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়ে রুদ্ধদ্বারে সে কান চেপে ধরেছিল। প্রথমাংশটা না-হলেও কথোপকথনের শেষ দিকটা সে শুনেছে। হাজার দু-হাজার বছরের ঐতিহ্য। রাজবাড়ির কিঙ্করীরা জানে—রাজমহিষী যখন রুদ্ধদ্বার কক্ষে দেওয়ানজির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করেন, তখন দধিভক্ষণমানসে ঠিকমত কান পাততে পারলে 'নেপো'র ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারে। ঐ জাতীয় গুহ্য-তথ্য কখনও কখনও অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা যায়। তার একটা বাজার দর আছে। তুঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে তার মূল্য হতে পারে রাজপুত্রের হাতের হীরকখচিত অঙ্গুরীয় অথবা রাজ-মহিষীর কণ্ঠের শতনরী।

দেওয়ান দিলীপ দত্তকে পথ দেখিয়ে অন্দরমহলটা পার করিয়েই কানাইয়ের মা নাচতে নাচতে ফিরে আসে ছোটরানিমার মহলে। সবার আগে বন্ধ করে দেয় দ্বার। শঙ্করী চমকে উঠে বলে, ও কী করছিস রে?

হাত দুটি কচলে কানাই-জননী বলে, একটা কথা কইতে এনু ছোটরানিমা। এখন বল ভয়ে বলব, না নিভ্ভয়ে বলব?

শঙ্করী দীর্ঘদিন আছে রাজাবরোধে। আবাল্য। তবু এজাতীয় খানদানি লব্‌জে তার অধিকার নেই। বললে, ও আবার কী ঢং! কী বলবি বল্ না।

—কতাটা শুনে আমার গদ্দানা নেবে না তো?

—গর্দানা নেবার মতো কথা বললে ছেড়েই বা দেব কেন!

—অ্যাই দ্যাখো! তবে থাক বাপু! আমি যাই।—ঠিক প্রস্থানোদ্যতা নয়, প্রস্থানের একটি ভঙ্গি ক… ত্রিভঙ্গ ঠামে প্রতীক্ষা করতে থাকে। শঙ্করী ধমক দেয়, ন্যাকামি করিস না। কী বলতে এসেছিস বল।

কানাইয়ের মা মুখটা ওর কানের কাছে এনে বললে, তোমার ঠাকুরমশায়ের জবাব হই গেল যে। বড়রানিমা দেওয়ানজিরে ডাক্যে বললে, তে-রাত্তিরের ভিৎরি তাঁরে বংশবাটি থিকে খেইদে দিতি হবে। নতুন পূজারী বহাল হচ্ছে বাসুদেব মন্দিরের জন্যি।

চমকপ্রদ সংবাদ বটে। এমন একটা আঘাত আশঙ্কাতীত নয়, তবে এমন অতর্কিতে তা আসবে এটা ভাবেনি। শঙ্করী বলে, তুই কেমন করে জানলি?

—আই দ্যাখো! আমি নিজের কানে শুন্‌নু যে! তবে হ্যাঁ, মাথা মুইড়ে ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চইড়ে তেনারে খ্যাদাতে বলেনি। বরং হাজার তঙ্কা খেসারদের হুকুম হয়েচে!

—কী বলছিস যা-তা? একবর্ণ বুঝছি না।

কানাইয়ের মা তখন সমস্ত কথোপকথনটা ব্যক্ত করে। বড়রানিমার সঙ্গে দেওয়ানজির প্রথম কী কথাবার্তা হয়েছিল তা সে শোনেনি। তখন সে ব্যস্ত ছিল তার আড়িপাতার ব্যাপারটার নিরাপত্তা বিষয়ে। তাই রাজা-মশাইয়ের প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ এবং বড়রানিমার গহনা বিক্রি করার কথা সে জানে না। কিন্তু শেষাংশটুকু ঠিকই শুনেছে।

সবটা শুনে শঙ্করী বলে, অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না। অকারণে বড়দি কেন ওঁকে বরখাস্ত করবেন?

—অকারণ কী গো? বড়মা যে সব বিত্তান্ত জান্তে পেরেছে।

—সব বৃত্তান্ত! মানে? কী বলতে চাইছিস?

মিশিমাখা কালো হাসি হাসল প্রৌঢ়া। নেহাত না বিইয়ে সে কানাইয়ের মা হয়নি। বড় ঘরের বহু কেচ্ছা তার জ্ঞানসীমায়। অনেক অনেক রাজবাড়ি, জমিদারবাড়ি, বামুনবাড়ির গোপন 'কতা'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক রাজার তিন রানি। রাজা পড়ে থাকেন বিলাসকুঞ্জে রক্ষিতাকে নিয়ে, রানিরা

যথেচ্ছ অভিসার চালায়। অশীতিপর কুলীন ব্রাহ্মণ এক পিঁড়িতে বসেই একসঙ্গে পিসি-ভাইঝির জাত বাঁচান ; তারপর পিসে আর ভাইঝি-জামাইয়ের বকলম কখন কে হয় কে তার খবর রাখে। ঘরে ঘরে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'—ঠিক যেমনটি ঘটেছে নৃসিংহদেব আর শঙ্করীর মধ্যে। না, এতে দোষ নেই কিছু। অন্তত কানাইয়ের মা এতে দোষের কিছু দেখে না। ষাট বছরের বুড়ো পড়ে রইল কাশীতে আর বিশ বছরের রানিমা যদি দেড়কুড়ি বছরের জোয়ান বামুনঠাকুরকে নিয়ে—

—কী হল? বল্? কী বলতে চাইছিস তুই?

ফিক করে হেসে কানাইয়ের মা বললে, আমার কাছে খামকা নুকোতে যেওনি ছোটরানিমা। আমি সব জানি। আর সে জন্যি দোষও ধরি না কিছু। আমারও তো একদিন ঐ বয়স ছেল। তোমার ভরা যৌবন, অমন রূপ—

চাপা গর্জন করে ওঠে শঙ্করী : চুপ কর্! হতচ্ছাড়ি!

—বেশ চুপ গেনু! আমার ছোট মুখে বড় কথা না হয় নাই বলনু!

উত্তেজনায় শঙ্করী ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে, কই চল্ তো দেখি আমার সঙ্গে বড়দির কাছে। তাঁকে তোর সামনেই জিজ্ঞাসা করব আমি।

আকাশ থেকে পড়ে কানাইয়ের মা : ওমা, আমি কনে যাব! হ্যাঁ, ছোটরানিমা, এ কথা কি যাচিয়ে দেখার? পেত্যয় না হয় তে-রাত্তির সবুর কর, চক্ষুকন্নের বিবাদ ভঞ্জন হবে। শুধাতে গেলে বড়রানিমা আমার কী হেনস্তা করবে কও দিনি। সেই যারে বলে 'হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা,' তাই করবে না?

শঙ্করীর মুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। ঠিক কথা। কানাইয়ের মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারে—এর সত্যতা ওভাবে যাচাই করা যাবে না। কিন্তু সব শুনে ওর মনে হল—কথাটা মিথ্যে নয়। বললে, ঠিক আছে। তুই যা এখন আমার সামনে থেকে!

—'যা' কী গো? আমার বশ্‌কিশ্?

—বকশিশ! কিসের?

—ওমা আমি কনে যাব! খবর বেচনু কড়ি মিলবে না?

হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল শঙ্করী : তুই যা করেছিস তাতে আমারই ইচ্ছে করছে তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে। শোন্, এরপর যদি কোনোদিন জানতে পারি কারও ঘরে আড়ি পেতেছিস তাহলে জ্যান্ত তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব। যা!

কানাইয়ের মা অভিজ্ঞ। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, এটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। মনে মনে ছোটরানিমায়ের মুণ্ডপাত করতে করতে পালিয়ে বাঁচে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বড়রানিমা ডেকে পাঠালেন শঙ্করীকে। শঙ্করী বুঝতে পারে, এবার একটা চরম বোঝাপড়ার সময় এসেছে। ব্যাপারটা গ্লানিকর, তবু উপায় নেই, মনকে শক্ত করে সে এসে দাঁড়াল বড়রানির শয়নকক্ষে। মহামায়া শুয়েই ছিলেন—আজকাল তিনি সারাক্ষণই শয্যাশায়ী, পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে আধশোওয়া অবস্থায় রয়েছেন। একটি দাসী তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। তাকে ছুটি দিয়ে শঙ্করীকে বললেন, আয় রে ছুট্‌কি। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

বিনা বাক্যব্যয়ে শঙ্করী দ্বার রুদ্ধ করে তার বড়দির মুখোমুখি দাঁড়ায়। অপ্রিয় আলোচনাটা অনিবার্য—মনকে আবার শক্ত করে। মহামায়া বলেন, এবার সিন্দুকটা খোল দিকিন। তোর আর আমার গয়নাগুলো আলাদা আলাদা প্যাঁটরায় আছে, নিয়ে আয়।

রীতিমত অবাক হল শঙ্করী! আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অলঙ্কারের কী সম্পর্ক? দুই রানিমার যাবতীয় মূল্যবান অলঙ্কার সুরক্ষিত আছে বড়রানিমার শয়নকক্ষে, দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুকে। তার অবস্থান সম্বন্ধে শুধু ওঁরা দুজনেই অবহিত। একটি তৈলচিত্রের অন্তরালে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা আছে সিন্দুকের পাল্লাটা। চাবি এতদিন ছিল বড়রানিমার কাছে—এখন থাকে শঙ্করীর আঁচলে। আদেশমত শঙ্করী তৈলচিত্রটা অপসারিত করল ; সিন্দুক খুলে দুটি মণিমঞ্জুষা নিয়ে এসে রাখলো পালঙ্কের উপর। বললে, হঠাৎ কী হল?

হাসলেন মহামায়া : গয়নাই মেয়েমানুষের প্রাণ! তাই প্রাণটা বেরুবার আগে একটু নাড়াচাড়া করতে চাই। আয় বস্ দেখি!

শঙ্করী নিঃশব্দে বসল পালঙ্কের একান্তে। মহামায়া একটি একটি করে গহনা বার করে দেখলেন। দুটি বাক্সেই দুটি তালিকা ছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, কী বলিস?

—আমি আবার কী বলব? বন্ধ আলমারিতে যা ছিল তাই আছে।

—তা তো বটেই। এবার এগুলো তুলে রাখ্। সিন্দুক বন্ধ করে চাবিটা আমার কাছেই রেখে যা।

শঙ্করী আদেশ পালন করল। তারপর তৈলচিত্রটি যথাস্থানে টাঙিয়ে এসে বসল বড়দির কাছে। অনেক খোশগল্প হল। পুরানো দিনের রোমন্থন; কিন্তু মহামায়া কাব্যতীর্থের কোনো প্রসঙ্গই তুললেন না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে শঙ্করী ভাবতে বসল—এমন করার অর্থ কী? অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর একটা সমাধানের ক্ষীণ আভাস পেল—কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে মন চাইল না। এত দূর? ধরা যাক, বড়দির মনে সন্দেহ জেগেছে—ছোটরানির সঙ্গে একজন পরপুরুষের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার মানে কি এতদূর বড়দি চিন্তা করতে পারল যে, দুই রানির গহনা যাচাই হওয়া দরকার? শঙ্করী কি তলে তলে তার গহনা সরাচ্ছে? অথবা আরও কদর্য চিন্তা—লালসার বশে সে বড়রানির অলঙ্কারে হাত দিয়েছে! আগুন ধরে গেল শঙ্করীর মাথায়। ছি ছি ছি! এতদূর ভাবতে পারল বড়দি? না হলে এমন হঠাৎ রুদ্ধদ্বারকক্ষে তালিকা মিলিয়ে গহনা যাচাই করার প্রয়োজন হল কেন? কেন চাবিকাঠিখানা এতদিনের মতো শঙ্করীর আঁচলেই বাঁধা হল না। তাহলে তো কানাইয়ের মা মিথ্যা বলেনি! কাব্যতীর্থকে বিতাড়নের আয়োজন নিশ্চয় করেছে বড়দি।

বারকয়েক পায়চারি করল ঘরময়। মনস্থির করল। তারপর ডেকে পাঠালো মোতির মাকে। বললে, মোতির মা, তোকে একটা কাজ করতে হবে। কেন, কী বৃত্তান্ত জানতে চাইবি না, আর ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখা চাই। পারবি?

অবাক দুটি চোখ মেলে মোতির মা বলে, বল?

—তুই এখনই বাসুদেবের মন্দিরে চলে যা। তাঁকে গোপনে বলবি, আজ শয়নারতির পর তিনি যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সদর দিয়ে নয়, খিড়কির দরজা দিয়ে। আনতে পারবি তাঁকে? আমার শোবার ঘরে?

আদেশটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবু বিশ্বাসও যে হতে চায় না। সব জেনে-বুঝেও একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য মোতির মা বললে, কার কথা বলছ গো? ঠাকুরমশাই? শোবার ঘরে?

—হ্যাঁ, কাব্যতীর্থ মশাই! পারবি? কেউ যেন না টের পায়—বড়দিও না।

মোতির মায়ের চোখ দুটি হঠাৎ ছলছল করে ওঠে। বেচারি সত্যিই ভালোবাসে তার ছোটরানিমাকে। আয়ী-মায়ের দেহান্ত হবার পর রাজবাড়ির মধ্যে সেই বোধকরি তাঁকে সবচেয়ে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। ধরা গলায় শুধু বললে, পারব। কিন্তু কিছু মনে করনি ছোটমা। কথাটা নিজের কানে শুনেও আমার পেত্যয় হচ্চেনি!

শঙ্করী ওর হাতটা তুলে নিয়ে বলে, মোতির মা, তুই আমাকে যতটা দেখেছিস, যতটা চিনিস আর কেউ তা জানে না, চেনে না। বল্ তুই—আমি কোনো অন্যায় কাজ কখনও করেছি? করতে পারি?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মোতির মা বললে, তাই তো বলচি গো ছোটমা!

—আমার কথা ছেড়ে দে। আমি সামান্য মেয়েমানুষ। মতিভ্রম হতে কতক্ষণ? কিন্তু তাঁকে তো দেখেছিস—বছরের পর বছর! তিনি কোনও অন্যায় কাজ করতে পারেন? বিশ্বাস কর মোতির মা—এর ভিতর অন্যায় ব্যভিচার কিছুই নেই। তাঁকে আমি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। তাঁর একটা বিপদ হয়েছে। যে কথা সবার সামনে বলা যায় না। তাই তাঁকে ডাকছি। বলিস, আমার বড় বিপদ!

—তা কাল দিনমানে ডেক না বাপু!

—না। আজ রাত্রেই সেটা সারতে হবে। বল্, পারবি নে? তুই কী পুরস্কার চাস বল্।

মোতির মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, আমি দাসীবাঁদী, যা পাবুনী দেবে মাথা পেতে নোব। তবে এ কাজের জন্যে কিছু নিতে পারবনি বাপু। তুমি হুকুম দেছ, আমি তামিল করব। তারপর তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই, আমার ধম্ম আমার ঠাঁই!

মোতির মা চলে যায়। শঙ্করী বুঝতে পারে—মোতির মার শ্রদ্ধাও সে হারালো। উপায় নেই। এ

তাকে করতেই হবে। শঙ্করী এবার বড়দির দাবার চালের উল্টো চাল দেবে। এজাতীয় রাজনীতি তার ভালো লাগে না ; কিন্তু তাকে যে বাধ্য করা হচ্ছে।

*   *   *

কাব্যতীর্থ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মোতির মায়ের মুখে বার্তাটা শুনে। বললেন, তুমি কিছু ভুল করছ না তো মোতির মা? আমাকেই ডেকেছেন তিনি?

—হ্যাঁ গো! তোমারেই। বাসুদেব মন্দিরের পুরুত আবার ক'জন আছে? তার ওপর বললেন, 'কাব্যতীর্থ'। তোমাকেই!

—এবং স্থানটা তাঁর শয়নকক্ষ? সময়টা শয়নারতির পর?

—এক কতা তোমায় কতবার বলব, বামুনঠাকুর?

—কাল সকালে গেলে হয় না?

—না, হয় না। বলেচে তাঁর বড় বিপদ। আজ রেতেই আপনারে আসতে হবে।

কাব্যতীর্থ দীর্ঘ সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মোতির মায়ের পক্ষে সেই নিবাত প্রদীপশিখার মতো স্থির মানুষটা কী ভাবছিলেন তা বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয়! অনেকক্ষণ পর বললেন, তথাস্তু। আমি স্বীকৃত। কিন্তু কী ভাবে যাব?

—আমি এসে তোমারে নে যাব। চাঁদনি রাত, আলো লাগবেনি। খিড়কি দুয়ার দিয়ে যেতে হবে নে। তার ঘরের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দেব—তারপর তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই, আমার ধম্ম আমার ঠাঁই।

কাব্যতীর্থের মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাস্যরেখা। বললেন, বড় দার্শনিক উক্তি করেছ মোতির মা। তিনি ডেকেছেন; বলেছেন তাঁর বিপদ। আজ রাত্রেই সে কথা বলতে হবে। বেশ আমি যাব—তারপর তাঁর ধর্ম তাঁর এবং আমার ধর্ম আমার।

একপ্রহর রাতে মোতির মা এসে নিয়ে গেল কাব্যতীর্থকে। সমস্ত বংশবাটি তখন নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা-রাত্রেই মানুষজন শয্যা নেয়। রাজবাড়ির দেউড়িতে নটার ঘন্টা বাজার অর্থ বংশবাটি গ্রামের নিষুতি রাত। জেগে আছে শুধু লাখ লাখ জোনাকি—আর জেগে আছে আকাশের অগুনতি কৌতূহলী তারা। না, আরও কেউ কেউ জেগে আছে। খোলা গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসছে বিনিদ্র কেনো মাঝির লোকায়ত সঙ্গীত। প্রাকৃত ভাষায় রচিত দেশওয়ালী গান, যার ভাবার্থ—'ওরে ভোলা মন! ছয় শত্রু তোকে পিছন থেকে টানছে, কিন্তু ভুলিস না—তোর মিত্র তোর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন!' না, ভুলবেন না কাব্যতীর্থ! কিছুতেই ভুলবেন না ষড়রিপুর কুহেলিকায়! স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু!

রাজবাড়ির খিড়কির দরজা খুলে রেখেই গিয়েছিল মোতির মা। বংশবাটির রাজবাড়ির অন্দর মহলে প্রবেশে কোনও বাধা হল না। নিরাপদেই মতির মা অতিথিকে নিয়ে আসতে পারল ছোটরানির মহলে—মেথর-খাটার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। ছোটরানিমার ঘরে আলো জ্বলছিল না। পায়ের সাড়া পেয়ে তিনি প্রদীপ জ্বাললেন; পিছনের দ্বার খুলে দিয়ে শুধু বললেন, আসুন। মোতির মা, তুই বাইরেই অপেক্ষা কর। আধঘন্টার মধ্যে ঠাকুর-মশাই ফিরে যাবেন। তাঁকে রাজবাড়ির দেউড়ি পার করে দিলেই তোর ছুটি।

ম্লান জ্যোৎস্নালোকে মোতির মায়ের মুখখানা করুণ দেখালো। যেন বিসর্জনের পূর্বমুহূর্তে ঢাকির মুখ।

কাব্যতীর্থ বললেন, প্রথমটায় আমার বিশ্বাসই হয়নি রানিমা। এখন বুঝছি, আপনি সত্যিই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন? কী হয়েছে? কী বিপদ আপনার?

—বলছি। বসুন।

যথারীতি পশমের আসন পাতাই আছে। কাব্যতীর্থ খড়ম পরে আসেননি—আসতে আসতে তাঁর মনেও হয়েছিল সেকথা—কালিদাসের বর্ণনা। অভিসারিকা যখন নৈশ অভিযানে যায় তখন নূপুর খুলে রেখেই যায়। —রাধামাধব! রাধামাধব!

কাব্যতীর্থ ধুলোপায়েই বসলেন আসনে। যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ভূশয্যাতেই বসল শঙ্করী। কাব্যতীর্থ লক্ষ করে দেখলেন—ছোটরানিমা আজ তিলমাত্র প্রসাধন করেননি। অন্যদিন যেটুকু সাজসজ্জা থাকে আজ তাও নেই। লালপাড় একটি কার্পাসের বস্ত্র তাঁর অঙ্গে। আভরণ, কী জানি কেন, সব খুলে রেখেছেন। শুধু হাতে এয়োতির চিহ্ন দুগ্ধধবল শঙ্খ, আর কামাক্ষ্যা মায়ের নোয়া। ছোটমায়ের এমন নিরাভরণা রূপ কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না কাব্যতীর্থ। বলেন, এবার বলুন?

মোতির মার ধারণা সে সম্পূর্ণ গোপনে কাব্যতীর্থকে পৌঁছে দিতে পেরেছে ছোটরানিমায়ের শয়নকক্ষে। কাব্যতীর্থ এবং শঙ্করীও সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই নিশ্চিন্তে নিভৃত আলাপে রত হলেন। ওঁরা কেউই জানতে পারেননি—ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল একজন : কানাইয়ের মা!

কানাই বালকমাত্র; তার বাপ গঙ্গালাভ করেছে আজ বছরপাঁচেক। তাই শয়নারতির পরে—রাজবাড়ি নিঝুম হলে—কানাই-জননী মাঝে মাঝে বংশীর ঘরে যায়। বংশী উৎকলদেশীয়। বার-মহলের ভৃত্য। স্ত্রীপুত্র সে দেশে রেখে এসেছে। তাই কানাই-জননীর অনিয়মিত আবির্ভাবে তার আপত্তি ছিল না কিছু, আগ্রহ ছিল। আজকের রাতটি ঘটনাচক্রে কানাই-জননীর তেমনি একটি চিহ্নিত অভিসার-রাত্রি। কাজকর্ম সেরে, শাড়ি পালটিয়ে, কপালে কাঁচপোকার টিপ, গালে পান ও পায়ে আলতা দিয়ে সে খোশমেজাজে খিড়কির দরজায় এসে দেখে সেটি অর্গলমুক্ত। এমন তো হবার কথা নয়। কার কাণ্ড? কেন? হঠাৎ তার মনে হয় কারা যেন আসছে। কানাইয়ের মা তৎক্ষণাৎ আত্মগোপন করে। কাব্যতীর্থকে নিয়ে মোতির মা ছোটরানিমার মহলের দিকে সঙ্গোপনে এগিয়ে যেতেই সে আহ্লাদে আটখানা হবার উপক্রম করে। একবার দাঁও ফসকেছে, এবার কিছুতেই ফসকাবে না! ছোটরানিমায়ের উপর তার প্রচণ্ড রাগও হয়েছিল—ভালো করলে মন্দ হয়! উনি করবেন লুকিয়ে পিরিত—তা কর না বাপু—কিন্তু সেকথা দাসীবাঁদীর মুখে শুনলেই অমনি কুলোপানা চক্কর! ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব, পিঠের চামড়া তুলে নেব। এবার কানাইয়ের মা দেখে নেবে কে কার পিঠের চামড়া তোলে! ঐ ফোঁটা-কাটা বামুনঠাকুরকে হাতেনাতে ধরতে পারলে তার পুরস্কার বাঁধা। বড়রানিমা তাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেবে সতীনকে। কাল শহরগঞ্জে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। বড়ঘরের কেচ্ছা ফিরবে মুখে-মুখে।

আনন্দে ডগমগ কানাইয়ের মা বকের মত পা ফেলে ফেলে এসে হাজির হল বড়রানির মহলে। বড়রানি বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। হায়রে আমার পোড়া কপাল—মনে মনে বললে কানাইয়ের মা—পাশের মহলে তোর সতীন পিরিত করছে, আর তুই মোষের পারা নাক ডেকে ঘুমাচ্চিস!

—বড়রানিমা, ও বড়-রানিমা!

—কে? কী হয়েছে? কে তুই? কী চাস্?

—আমি কানাইয়ের মা—একবার উঠতি হবেনে তোমারে।

—উঠতে হবে। কেন? আলো জ্বালিসনি কেন? অন্ধকারে মাঝরাতে—

—আলো জ্বাললি পাখি পাইলে যাবে। শোন কেনে—

কানে কানে গুহ্যবার্তাটি সে নিবেদন করে। এবার আর জানতে চায় না—ভয়ে বলবে না নির্ভয়ে বলবে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে উঠে বসলেন মহামায়া। এ যে অবিশ্বাস্য! এত বড় সাহস হবে ছুট্‌কির? নিজের শয়নকক্ষে পরপুরুষ ঢুকিয়ে—

—তুই ঠিক দেখেছিস? আমার গা ছুঁয়ে বল।

—ওমা আমি কোথায় যাব! মিছে কতা বুললে আমার জিভ খসে যাবে না! তবে একটু তড়িঘড়ি করতি হবে বাপু—যদি হাতে-নাতে ধরতি চাও।

অনেকদিন খাট থেকে নামেননি। দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরে ওঠে ; কিন্তু আজ তাঁর মর্মান্তিক প্রয়োজন। বললেন, আমাকে ধর। তোর কাঁধে ভর দিয়ে যাব। শোন্, ওর ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে দূরে সরে যাবি। আড়ি পেতেছিস জানতে পারলে—

—সে আর বলতি হবেনি বড়রানীমা। এস কেনে—

কানাইয়ের মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল শরীরে টলতে টলতে নির্জন বারান্দা হয়ে পুব মহলে এসে পৌঁছলেন। নির্দেশ দেওয়াই ছিল। ছোটরানিমার দরজার সামনে ওঁকে বসিয়ে দিয়ে কানাইয়ের মা সরে গেল শ্রুতিসীমার বাইরে। দারুণ ইচ্ছা করছিল তার আড়ি পাততে। বড়ঘরের বড়মানুষরা কী জাতের পিরিত করে জানবার কৌতূহল প্রবল; কিন্তু তার সাহস হল না। মহামায়াকে সে যমের মতো ভয় পায়।

ক্লান্ত অবসন্ন মহামায়া বসে থাকতে পারলেন না, মার্বেল পাথরের চৌখুপি কাটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন। কর্ণমূল প্রবিষ্ট করে দিলেন ভেনিশীয় পাল্লার ফাঁকে, দরজার গায়ে! হ্যাঁ, ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। দুজনে অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলছে—অভিসার-রাত্রে অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকা যেভাবে কথা বলে। একটি পুরুষ কণ্ঠ, একটি নারীর। দুটি কণ্ঠস্বরই শনাক্ত করা যায়। শঙ্করী তাঁর কন্যার মতো—তার এই মর্মান্তিক অধঃপতনে বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল মহামায়ার। ইতিপূর্বে কী কথাবার্তা হয়েছে জানা নেই। কান পেতে উনি শুনলেন কাব্যতীর্থ বলছেন, আমাকে মার্জনা করবেন ছোটরানিমা। আমি আপনার অনুরোধ রাখতে অশক্ত।

চমকে ওঠেন মহামায়া। 'ছোটরানিমা! মা?' এ আবার কোন জাতের সম্বোধন? সীমিত সাহিত্যজ্ঞানেও নিরক্ষরা মহামায়ার এটুকু জ্ঞান ছিল—এ ভাষা পিরিতের নয়। অবৈধ প্রণয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাহলে?

শঙ্করীর কণ্ঠস্বর এবার শোনা গেল, কিন্তু কেন? আপনি আমাদের কুলগুরুর বংশধর। বহু মুমুক্ষুকে আপনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। তাহলে আমাকেই বা এভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন কেন?

—হেতু একটা ছেড়ে আমি দশটা দেখাতে পারি রানিমা। প্রথমত, আমার কাছে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে আপনাকে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমার স্বর্গত পিতৃদেব ন্যায়রত্ন মহাশয় শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন ; কিন্তু আমি—

বাধা দিয়ে শঙ্করী বললে, স্বামীর অনুমতি আমি নিশ্চয় আনিয়ে নেব। আর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেব একথা তো আমি বলিনি—

শঙ্কর বলেন, আমার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ হয়নি রানিমা। আমি বলছিলাম—হেতু আমি দশটা দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে মিথ্যাচার। মূল বাধা যেটি আছে তা অনতিক্রম্য এবং সেটা যে কী, তা আমি আপনাকে জানাতে পারব না।

—কেন পারবেন না? আমাকে কেন প্রত্যাখ্যান করছেন জানাবেন না?

অনেকক্ষণ নীরব রইলেন শঙ্করদেব। তারপর বললেন, আমি সজ্ঞানে অনৃতভাষণ করি না। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমি অব্যাহতি পেতে চাই না। কিন্তু সত্য কথাটাও আপনার কাছে স্বীকার করতে পারব না। বাধা আছে। সামাজিক এবং নৈতিক।

এবার জবাব দিতে শঙ্করীই দেরি করল। তারপর বলল, অন্তত একটা কথা বলে যান। সে বাধা কি আমার ভিতর? আমি কি কৃচ্ছ্রসাধনায় নিজেকে ক্লেদমুক্ত করে—

এবার রীতিমত আর্ত শোনাল কাব্যতীর্থের কণ্ঠস্বর : না! না! না! তাহলে আরও স্বীকার করি। আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, আমার স্নেহের পাত্রীই হওয়ার কথা। কিন্তু একদিক থেকে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। এমন মহিমময়ী নারী আমি আমার জীবনে দেখিনি। এ বাধা আপনার কোনো চরিত্রগত ত্রুটির জন্য নয়। আমিই হতভাগ্য—এ অসম্পূর্ণতা শুধু আমার, একান্তই আমার।

এর পর দুজনেই নীরব। কেউই ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। ওঁদের দুজনের কেউই জানেন না রুদ্ধদ্বারের ওপারে ভূশয্যালীন অসুস্থা একটি প্রৌঢ়া নারী চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিলেন। শঙ্করী বুঝতে পারুক, না পারুক—সেই সংসারাভিজ্ঞ প্রায়-বৃদ্ধা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন—বাধা কোথায়। দুঃখে, বেদনায় এবং হ্যাঁ, আত্মগ্লানিতে, তিনি চোখের জলে অন্তরের সব ক্লেদ, সব মালিন্য ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। আবার শোনা গেল শঙ্করদেবের কণ্ঠস্বর, এত কথাই যখন বললাম, তখন আরও বলি—আপনার দুঃখের কথা আমি সবই জানি। আমি জানি, পিতৃকুলে আপনার কেউ নেই। শৈশবে জননীকে হারিয়েছেন, বাল্যে পিতাকে এবং হ্যাঁ, কৈশোরের প্রারম্ভেই স্বামীকে। আমার কাছে লজ্জা

করবেন না রানিমা—আমি তো জানি কী অসময়ে আপনাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে এনেছি। সারা জীবনই আপনি দুঃখ পেয়েছেন—তবু ভেঙে পড়েননি। আপনার জ্ঞানস্পৃহা, অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় এবং মুমুক্ষা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন রানিমা—সব আশা জলাঞ্জলি দেবার কোনো কারণ ঘটেনি। বাসুদেবের আশীর্বাদে হয়তো অচিরেই আপনার স্বামী প্রত্যাগমন করবেন, হয়তো আপনি সন্তানবতী হবেন—

বাধা দিয়ে শঙ্করী শুধু বললে, ঠাকুর-মশাই, আমার স্বামীর বয়স ষাট বৎসর।

—জানি, রানিমা, জানি। তাহলে আমার বৃদ্ধ পিতামহ তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের কথা বলি। সারা ভারতবর্ষে অত বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত আছেন কি না সন্দেহ।

শঙ্করী বলে, শুনেছি তাঁর নাম—ত্রিবেণীর শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঠাকুর। সেই যিনি ইংরেজি না জেনেও শ্রুতিধরের মতো আদালতে দুই গোরা সাহেবের কথোপকথন অনর্গল বলে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। তাঁর কথাই বলছি। তিনি আজও জীবিত। এখন তাঁর বয়স একশো সাত। তাঁর যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশের বয়ঃক্রম ছিল ছয়ষট্টি। কথিত আছে, একজন দিকপাল জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, রুদ্রদেবের একটি অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্রসন্তান হবে। সেই কথা শ্রবণ করে বাসুদেব ব্রহ্মচারী নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ষাট বৎসর বয়সের জরাজীর্ণ অপুত্রক বৃদ্ধ রুদ্রদেবের সঙ্গে স্বীয় বালিকাকন্যার বিবাহ দেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় বাসুদেব জগন্নাথধামে গিয়ে কঠিন তপস্যা করেন। তখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়—"তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্যরত্ন পুত্রসন্তান আবির্ভূত হবে। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। জগন্নাথধামে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হল, তাই দৌহিত্রের নামকরণ কর—জগন্নাথ।"....রানিমা, ঈশ্বরের কী অপার লীলা দেখুন। সেই বৃদ্ধের ঔরসে কিশোরী কন্যার গর্ভে সত্যই আবির্ভূত হলেন ক্ষণজন্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। একশো সাত বছর বয়সে আজও তিনি ভারত-ভূখণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত। তাই বলছিলাম—আপনার হতাশ হবার তো কিছু নেই। যাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে তাঁরই আশীর্বাদে আপনার ক্রোড়েও আসতে পারে অমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

মহামায়া স্পষ্ট শুনলেন—ছুট্‌কি কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রত্যাশায়, আনন্দে, ব্রাহ্মণের শুভাশীর্বাদে।

কাব্যতীর্থ পুনরায় বলেন, আমি প্রণিধান করেছি, আমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেবার জন্য আপনি কী পরিমাণ ব্যাকুল। না হলে লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমাকে এভাবে গভীর রাত্রে ডেকে পাঠাতেন না। আপনার সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না বলে আমিও একই পরিমাণে মর্মাহত। রাধামাধবের কাছে প্রার্থনা করব—তিনি আমাকে উপযুক্ত করে তুলুন। একদিন এসে যেন আপনার কানে বীজমন্ত্র দিয়ে যেতে পারি।

শঙ্করী কী বুঝল তা সে-ই জানে। বললে, আর একটি ভিক্ষা আছে। আমি কোনোদিন আপনার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করিনি। আজ আমার একটি প্রণাম নেবেন?

একটু শব্দ হল। বোধহয় গাত্রোত্থান করলেন শঙ্করদেব। প্রস্থানের প্রস্তুতি। বললেন, নেব। অন্য সময় হলে আপত্তি করতাম। আজ করব না। কারণ, কে বলতে পারে এই হয়তো আপনার শেষ সুযোগ।

—শেষ সুযোগ! মানে?

একটু যেন ইতস্তত করলেন শঙ্করদেব। তারপর মনস্থির করে বললেন, না, সব কথা স্বীকার করে যাই। শুনুন—আপনার আমার মধ্যে যে স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে এটা ইতরজনে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। আপনি তা জানেন না; কিন্তু কিছু অপ্রিয় কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তাই আমি স্থির করেছি দেশত্যাগ করব। দু-চারদিনের মধ্যেই।

—দেশত্যাগ! কোথায়? আপনার মন্দির? চতুষ্পাঠী?

—সব ব্যবস্থাই করে যাব। স্বর্গত নসীরাম সান্ডেল মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান রামজীবন লাহিড়ী আমার মন্ত্রশিষ্য—তাকেই পূজারি নিযুক্ত করে যাব। চতুষ্পাঠীর দায়িত্বও সে নেবে।

শঙ্করী বললে, একটা কথা বলুন। দেওয়ানজির সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

—দেওয়ানজি। কেন?

—কারণ যাই হোক, বলুন?

—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক পূর্বে তিনি মন্দিরে এসেছিলেন।

শঙ্করীর ম্লান হাসিটা দেখতে পেলেন না মহামায়া। শুধু শুনলেন, মিথ্যাকথা আমিও সজ্ঞানে বলি না ঠাকুরমশাই; কিন্তু সত্যটাও স্বীকার করতে পারছি না। বাধা আছে। শুধু একটি অনুরোধ। কাল প্রাতে হয়তো তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। হয়তো তিনি উপযাচক হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তা যদি আসেন, তাহলে তিনি কোনো কথা বলার পূর্বেই আপনি তাঁকে আপনার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবেন।

—আপনি যখন বলছেন তখন দেব। কিন্তু হেতুটা তো ঠিক বুঝলাম না।

—আপনি কেন আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে পারলেন না, তার হেতুটাও তো আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেননি!

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না মহামায়া। সন্তর্পণে খড়খড়ি তুলে ভিতরে দৃকপাত করলেন। দেখলেন, সমভঙ্গ বিষ্ণুমূর্তির মতো শঙ্করদেব দাঁড়িয়ে আছেন যুক্তকরে এবং তাঁর যুগ্মচরণের উপর এক হতভাগিনী নারী নামিয়ে রেখেছে তার নিরবগুণ্ঠন মস্তক।

শঙ্করদেব যুক্তকরে শুধু বললেন, ওঁ! নমঃ নারায়ণায়।

অর্থাৎ ওই সীমন্তিনীর ঐকান্তিক প্রণামটি তিনি নারায়ণকেই নিবেদন করলেন!

—ঠাকুরমশায়! ও ঠাকুরমশায়? মোকামমে আসেন না কি?

—কে? রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে কাব্যতীর্থ সাড়া দেন।

—হামি দোবেজি আছি। জারাসে বাহিরে আস্‌বেন?

দ্বার খুলে বাইরে আসেন পণ্ডিত। রামাওতার দোবে তাঁকে প্রণাম করে বললে, মহাবীরজির কিরপা হোলে আজ আপনার হিঞ্ছা পূরণ হইয়ে যাবে মনে লাগসে। হমার সাথে আসেন। ঘাটে এক নতুন নৌকা লেগেসে। বড়া ভারি জমিদার। কাশী যাইতেসেন। আসেন, বাৎচিৎ কোরেন—

কাব্যতীর্থ দোবেজিকে তাঁর মনোবাসনার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। দোবেজি রাজসরকার থেকে ঘাট জমা নিয়েছে। দ্বারভাঙা অঞ্চলের মানুষ। ওর বাপ এসেছিল বর্ধমান রাজসরকারে ফৌজের কাজ নিয়ে। দোবেজি যদিচ মহাবীরের ভক্ত, তবু লড়াই-কাজিয়া তার পোষায়নি। সে এই গঙ্গার পাড়ানিঘাট জমা নিয়েছে। ওখানেই ছাপরা বেঁধে দিবারাত্র পড়ে থাকে। শঙ্করদেব তাকে জানিয়েছিলেন তিনি কাশীধামে যেতে ইচ্ছুক—কিন্তু পাথেয় নেই। কোনো জমিদার, রাজা-মহারাজা বা বণিক বজরা নিয়ে কাশী যাচ্ছেন এই খবর পেলে দোবেজি যেন তাঁকে সংবাদ দেয়। রামাওতার তাই সাতসকালে এসেছে সংবাদ দিতে। একজন বাঙালি জমিদার সস্ত্রীক কাশীধামে যাচ্ছেন। বড় বজরা—স্থানাভাব হবার কথা নয়। এখন শঙ্করদেবের ভাগ্য!

পণ্ডিত উড়ুনিটি গায়ে চড়িয়ে, খড়মজোড়া পায়ে গলিয়ে রামাওতারের পিছু পিছু ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। সত্যিই বড় বজরা। খানদানি ব্যবস্থা, স্থানাভাব হওয়ার আশঙ্কা নেই। কাল রাত্রে তিনি এঘাটে বজরা ভিড়িয়েছেন। দোবেজি ভূম্যধিকারীর সঙ্গে আলাপ করে ঠাকুরমশায়ের কথা মোটামুটি বলে রেখেছে। কাব্যতীর্থকে ঘাটে দাঁড় করিয়ে রেখে সে ভিতরে গেল এত্তেলা দিতে। অল্প পরে এসে বললে, বাবুমশায় সেলাম দিয়েছেন। আসুন। মহাবীরজির কিরপায় বন্দোবস্ত্ হইয়ে যাবে মনে লাগে।

বজরার সামনের কামরাটি সুসজ্জিত। অহেতুক আড়ম্বর নেই—কিন্তু পরিপাটি! সবার প্রথমে কাব্যতীর্থের নজর পড়ল পিছনে একটি র‍্যাকের উপর। তাতে অনেক পুঁথি এবং যাবনিক গ্রন্থ থাক দেওয়া। নিঃসন্দেহে বাবুমহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তি। ভূস্বামীর বয়স বেশি নয়, শঙ্করদেবের সমবয়সিই, সাতাশ-আটাশ। অর্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলা সেবন করছিলেন। শঙ্করদেবকে দেখেই যুক্তকরে নমস্কার করলেন। বললেন, আসুন পণ্ডিতমশাই। উপবেশন করুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই।

শঙ্করদেব প্রতি-নমস্কার করে বসলেন। দোবেজি বললে, অব্ আপ্ দোনো বাৎচিৎ করিয়ে। তারপর বাবুমশায়ের দিকে ফিরে বললে, বরাম্ভণ! বহুৎ ইমানদার আদমি!

বাবুমশাই বললেন, আপনার সুপারিশের প্রয়োজন নেই। উনি যে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব তার বিজ্ঞপ্তি ওঁর সর্বদেহে প্রকট। আচ্ছা, আসুন আপনি।

দোবেজি প্রস্থান করলে কাব্যতীর্থ বলেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দোবেজি নিশ্চয় বলেছেন—

—হ্যাঁ। আপনি ঁকাশীধামে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু কেন তা বলেননি। তীর্থ করতে, না অধ্যয়ন করতে?

—উভয়তই। আপনারা?

বাবুমশাই বললেন, ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীশ্রেণির। উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে। ঠাকুরের নাম ঁরমাকান্ত রায়।

কাব্যতীর্থ শুধু বললেন, রায়?

—হ্যাঁ। আমার প্রপিতামহ ঁকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে 'রায়-রায়ান' উপাধি লাভ করেছিলেন। বাবা-মহাশয় 'রায়' উপাধিই ব্যবহার করতেন। আপনারা?

—আমার নাম শ্রীশঙ্করদেব কাব্যতীর্থ। রাঢ়ীশ্রেণিয়। উপাধি ভট্টাচার্য। পাঁচপুরুষে বংশবাটিতেই বাস। ঠাকুরের নাম ঁত্রিপুরেশ্বর ন্যায়তীর্থ। তিনি ছিলেন বংশবাটির ঁঅনন্তবাসুদেব মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর স্বর্গারোহণে আমিই ঐ মন্দিরের পুরোহিত।

—অনন্তবাসুদেব মন্দির! শূদ্রমণি রামেশ্বর রায় প্রতিষ্ঠিত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি সে মন্দির দেখেছেন?

—না দেখিনি। আজ যখন এসে পড়েছি, নিশ্চয় দেখব। শুনেছি অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য আছে।

—তা আছে। চলুন না এখনই দেখিয়ে আনি।

হাসলেন রায়-মহাশয়। বললেন, আপনার ব্রাহ্মণী ক'জন?

এ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অর্থগ্রহণ হল না কাব্যতীর্থের। বললেন, আমি দারপরিগ্রহ করি নাই। কেন?

—আগেই তা আন্দাজ করেছি। আপনি কি কুলীন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

—প্রথমত জানাই—আমার দুজন সহধর্মিণী। জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী দেবী, কনিষ্ঠা উমা দেবী। উভয়েই এ বজরায় উপস্থিত। ফলে, একাকী এখনই দেবদর্শনে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। পালকির আয়োজন করতে হবে। দ্বিতীয়ত জানাই—আপনি যখন কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে এই বয়সে অনূঢ় তখন আপনি আমার সঙ্গে নিশ্চয় কাশীধামে যাচ্ছেন।

কাব্যতীর্থ বলেন, আপনার প্রথম বক্তব্যের অর্থগ্রহণ হল, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের—

বাধা দিয়ে রায়-মহাশয় বললেন, বুঝলেন না? আপনি একজন দুর্লভ ব্যতিক্রম। এমন কাব্যতীর্থকে বয়স্য করায় আমারও যথেষ্ট আগ্রহ।

কাব্যতীর্থর মনে হল উনিও একজন দুর্লভ ব্যতিক্রম। সদ্যপরিচিত কোনো যুবকের কাছে স্বীয় পত্নীর নাম এভাবে ব্যক্ত করতে তিনি কখনও শোনেননি। ওঁর স্বগ্রামবাসী এমন বহু ভদ্রলোককে উনি ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, যাঁরা সস্ত্রীক মন্দিরে পূজা দিয়ে যাচ্ছেন দশ-বিশ বছর ধরে,—তাঁদের ধর্মপত্নীদের প্রসারিত অঞ্জলিতে বছরের পর বছর চরণামৃত ঢেলে দিয়েছেন, কিন্তু তাদের কারও নাম জানেন না, মুখ দেখেননি!

অচিরেই দুজন দুজনের বয়স্য হয়ে উঠলেন। পালকির ব্যবস্থা হল। ওঁর দুই স্ত্রী এসে শঙ্করদেবকে প্রণাম করল। একজন—তিনি বড় না ছোট ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না শঙ্করদেব—প্রায় শঙ্করীরই বয়সি, মাথায় আধো-অবগুণ্ঠন টেনে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, আপনিও আমাদের সঙ্গে কাশীধামে যাচ্ছেন শুনলাম। খুব আনন্দের কথা।

অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কোনো পুরললনা এভাবে কথা বলতে পারে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি শঙ্করদেব। বললেন, হ্যাঁ মা। বাবুমশায়ের অশেষ করুণা।

বাবুমশাই ওপ্রান্ত থেকে প্রতিবাদ করেন, বাবুমশায় নয়, কাব্যতীর্থ। রায়-মশায়। তোমাকে আমি যাবৎকাশী বয়স্য পদে বরণ করেছি।

শঙ্করদেব বললেন, যাবৎকাশী! তারপর কি বন্ধুত্বের ছেদ?

—সেটা নির্ভর করছে যদি তুমি....এরপর যাবনিক ভাষায় তিনি কী বললেন তা বোঝা গেল না। রায়মশাই নিজেই নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে বললেন, অর্থাৎ শৃগাল যদি লাঙ্গুলহীন হতে স্বীকৃত হয় তাহলেই বন্ধুত্ব বজায় থাকবে, যেহেতু আমি স্বয়ং নির্লাঙ্গুল!

—অস্যার্থ?

—আমি তিনবার লাঙ্গুলহীন হয়েছি। একজন স্বর্গে গেছেন। দুজন এখানে সশরীরে বর্তমান। এখন 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান!'

ইংরাজি পড়া না থাকলেও রায়গুণাকরের কাব্য পড়া ছিল কাব্যতীর্থের। হেসে উঠলেন তিনি।

নৌকা ছাড়ল। অনতিবিলম্বেই কাব্যতীর্থ অনুভব করলেন রায়মহাশয় প্রগাঢ় পণ্ডিত। আরবি, ফারসি, ইংরাজি এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ অধিকার। ঐ চারটি ভাষার ভিতর শুধু শেষোক্তটাই জানা ছিল কাব্যতীর্থের। সেটুকুই তির্যক পদ্ধতিতে পরিমাপ করতে চাইলেন—কিন্তু দেখা গেল সংস্কৃতেও রায়মশায়ের জ্ঞান অতলান্তিক। বোধ করি সমস্ত সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ, উপনিষদ আয়ত্ত করেছেন এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। শুধু তাই নয়, আরবি, ফারসি এবং ইংরাজি ভাষা জানা থাকায় তিনি ধর্মতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় যেভাবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন এবং সুফীধর্মের বিশ্লেষণ করছিলেন তাতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, আপনি তো জ্ঞানের আকর!

সৌজন্য বলে—একথায় সবিনয়ে প্রতিবাদ করাই প্রথা। কিন্তু রায়মহাশয়ের সব কথাই রহস্যঘন। বললেন, একেবারে মূর্খ নই। অন্তত একটি আত্মজ্ঞান আমার হয়েছে—'আমি জানি যে, আমি জানি না।' কথাটা কার জানেন? সক্রেটিস্-এর।

ঐ যাবনিক পণ্ডিতের নামও জানতেন না কাব্যতীর্থ।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর রায়মহাশয় একটি পাণ্ডুলিপি বার করে বললেন, আসুন আপনাকে পড়ে শোনাই। আমারই রচনা। ষোড়শবর্ষ বয়সে এটি আমার প্রথম রচনা। প্রকাশ করিনি যদিচ।

—কেন? আপনার তো অর্থাভাব নাই?

—গ্রন্থটির নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী'। বস্তুত এটি হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ মন্তব্যে পূর্ণ। অমুদ্রিত অবস্থাতেই পাণ্ডুলিপি যে পরিমাণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তাতে ওটি আর প্রকাশ করতে সাহসী হইনি। আপনাকে পড়ে শোনাই। যুক্তি দিয়ে আমার যুক্তিকে খণ্ডন করুন।

নৌকা চলেছে উজানে। কর্মহীন অবসর। রায়মহাশয় তাই এই অবকাশে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি একজন উপযুক্ত শ্রোতাকে শোনাতে চাইলেন। কাব্যতীর্থ বললেন, পাণ্ডুলিপিতে কী-জাতীয় প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

—আমার একান্ত আত্মীয়গণের সঙ্গে মনান্তর। আমার স্বর্গত পিতৃদেব সে সময়ে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন কিনা চিন্তা করতে বসলেন। বেগতিক বুঝে আমি দেশত্যাগ করি এবং সমস্ত উত্তরখণ্ড পর্যটন করি। আমি তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছিলাম—মহাযান ও বজ্রযান-তত্ত্বের মূলকথা জানতে।

কাব্যতীর্থ বুঝতে পারেন দৈবকৃপায় তিনি এক দুর্লভ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বললেন, বেশ আসুন, আলোচনা করা যাক।

বজরার ভিতর দুজন তন্ময় হয়ে রইলেন শাস্ত্রালোচনায়। কাব্যতীর্থ লক্ষ্য করলেন, রায়মহাশয়ের দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ—অদ্ভুত তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা। নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে তিনি প্রচলিত সংস্কারের মূলে পরুষহস্তে কুঠারাঘাত করেছেন। কোথাও কোনো শাস্ত্রোক্ত আপ্তবাক্যের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য নেই—প্রতিটি তথ্য যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার চেষ্টা। যেখানে ভ্রান্তি সেখানেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কাব্যতীর্থের বুকে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। বংশানুক্রমে তিনি মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত। আজন্ম সংস্কারের মূলে আঘাত লাগছে—যা বিশ্বাস করতে মন চায় না, ক্ষুরধার যুক্তির বেড়াজালে তা যেন বারে বারে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, রায়মশায়, স্বীকার করছি আপনার গ্রন্থটি অপূর্ব। অদ্ভুত। কিন্তু আপনার মত আমি মানি না।

—কেন মানেন না? বুঝিয়ে বলুন? কোথায় আমার ভ্রান্তি?

—স্বীকার করছি—তাও আমি প্রদর্শন করতে পারছি না। আমি কাব্যতীর্থ মাত্র—ন্যায় ও দর্শনে আমার চর্চা সামান্যই। কিন্তু এর বিরুদ্ধ-যুক্তি নিশ্চয় আছে। এখনো ভারতবর্ষে এমন পণ্ডিত আছেন যিনি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করতে পারেন। এ কি হয়? হাজার হাজার বছর ধরে পূর্বাচার্যরা যা বলে গেছেন—

—সেখানেই ভ্রান্তি হচ্ছে আপনার! আর্য ঋষিরা ও-কথা বলেননি—বলেছেন কিছু স্বার্থসন্ধানী টুলো পণ্ডিত! যাঁরা ধর্মের নামে ব্যাবসা করেন। কিন্তু থাক। আপনি নৈয়ায়িক নন, কাব্যতীর্থ। কাব্যালোচনাই করা যাক। বলুন কোন কাব্য বার করব?

কাব্যতীর্থ বলেন, আসছি সে প্রসঙ্গে। তার পূর্বে আমার একটি সমস্যার সমাধান করে দিন। আমার এক সতীর্থ প্রশ্নটি আমাকে করেছিল। সদুত্তর জানা না থাকায় আমি তার প্রতর্কের মীমাংসা করতে সক্ষম হইনি। আপনি প্রগাঢ় পণ্ডিত, বেদজ্ঞ—পরন্তু যাবনিক দর্শনেও আপনার সুদৃঢ় অধিকার। আপনি এ সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন?

—বলুন? সমস্যাটি কী?

—আমার সেই সতীর্থ আমারই বয়সি একথা বলাই বাহুল্য। সে আমার মতো পৌরোহিত্য করে না—গুরুগিরি তার ব্যবসা। যজমানদের সে মন্ত্রদীক্ষা দেয়। তার একজন বান্ধবী আছে—না, বান্ধবী নয়, শিষ্যাস্থানীয়া। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং অপূর্ব সুন্দরী। মেয়েটি জানে না, কিন্তু আমার বয়স্যের মনে ইতোমধ্যে তার প্রতি কিছু গোপন অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে।

রায়মহাশয় বাধা দিয়ে বলেন, বিবাহে কি বাধা আছে? জাতিগত, বর্ণগত অথবা—

—আছে। বাধা অনতিক্রম্য! কারণ স্ত্রীলোকটি বিবাহিতা।

—তারপর?

—মহিলাটি আমার সতীর্থের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আবেদন জানায়। আমার বন্ধুর মতে সে সত্যই মুমুক্ষু, তার মন নিষ্পাপ এবং আমার বন্ধুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের সংবাদ মেয়েটি বিন্দুমাত্র জানে না, কখনও সন্দেহ করেনি। এক্ষেত্রে আমার বয়স্যের কী করণীয়? মেয়েটিকে দীক্ষাদান কি শাস্ত্রসম্মত কাজ হবে?

রায়মহাশয় বলেন, আপনার হাইপথেসিস্ পরস্পর-বিরোধী।

—হাইপথেসিস্! অস্যার্থ?

—পূর্বস্বীকৃত অভ্যুপগম। আপনি বলেছেন, স্ত্রীলোকটি বিবাহিতা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পুনরায় বলেছেন, সে জানে না—আপনার বয়স্যের মনে তার প্রতি গোপন অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। এই দুটি পূর্বসিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী। হয় স্বীকার করুন স্ত্রীলোকটি নিতান্ত মূঢ়মতি, নচেৎ স্বীকার করুন সে আপনার বন্ধুর গোপন অনুরাগ সম্বন্ধে সম্যক অবহিতা, যদিচ লোকলজ্জায় সে কথা কখনো আপনার বন্ধুর কাছে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ মূর্খ আপনার বন্ধুই। কোনটা স্বীকার করবেন?

কাব্যতীর্থ কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়েন। কোনোটাই স্বীকার করতে পারেন না।

রায়মশাই বলেন, আচ্ছা প্রথমে আমার দু-একটি প্রশ্নের জবাব দিন। মহিলাটির বয়ঃক্রম বিশ থেকে পঁচিশ! কেমন?

—আজ্ঞে তাই হবে হয়তো।

—এবং তাঁর স্বামীর বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন?

—না। ষাট!

—এবং আপনার বন্ধু অতি সুদর্শন?

—আজ্ঞে না। এই আমারই মতো দেখতে।

রায়মশাই হেসে বলেন, তাহলে সমাধান হয়ে গেছে। সেই মহিলাটিও মূঢ়মতি নন, আপনার বন্ধুও মূর্খ নন। তবু এ সমস্যা সমাধানে মূর্খ তো একজনকে হতেই হবে, কী বলেন? অবৈধ প্রণয় মানেই মূর্খামি!

আরও বিহ্বল হয়ে কাব্যতীর্থ বলেন, মার্জনা করবেন, আমি আপনার বক্তব্যটা ঠিকমত প্রণিধান করতে পারছি না।

—এখনও পারছ না বন্ধু? তাহলে আমাকেই মার্জনা করতে হবে। আমাকে স্পষ্টভাষণে বলতে হচ্ছে—তুমিই সেই হস্তিমূর্খ, যেহেতু গঙ্গাবক্ষে অনৃতভাষণ করে নিজের জীবনের বাস্তব সমস্যা কল্পিত বন্ধুর স্কন্ধে অর্পণ করতে চাইছ! কুলীন ব্রাহ্মণ তুমি—এতটা বয়সে দার-পরিগ্রহ করনি—কোথায় একাধিক ব্রাহ্মণীর সেবায় তোফা মৌজ করবে তা নয়, দেশান্তরী হয়ে কাশী চলেছ!

কাব্যতীর্থ বজ্রাহত। অট্টহাস্য করে ওঠেন রহস্যপ্রিয় রায়মহাশয়।

আলোচনায় বাধা পড়ল। বড় মাঝি এসে মস্ত সেলাম করে বললে, হুজুর, একবার বাইরে আসুন। ঘাটে সতীদাহ হচ্ছে।

—সতীদাহ! কই, কোথায়? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠেন রায়মশাই। ছুটে বেরিয়ে আসেন বাইরে। চোখে দুরবিন লাগিয়ে দেখলেন, পার্শ্ববর্তী ঘাট লোকে লোকারণ্য। একটি প্রকাণ্ড চিতা সাজানো রয়েছে। সতীকে দেখা যাচ্ছে না। রায়মশাই বললেন, বজরা ঘাটে ভেড়াও বড় মাঝি।

কাব্যতীর্থও বের হয়ে এসেছিলেন। বললেন, কী প্রয়োজন? ক্রিয়াকলাপটা শাস্ত্রসম্মত বটে, কিন্তু বড় নৃশংস! ও না দেখাই ভালো। বিশেষ মায়েরা আছেন বজরায়।

বড় মাঝি ইতস্তত করে। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? বজরা ঘাটে ভিড়বে, না সোজা যাবে? বজ্রগম্ভীর স্বরে রায়মশাই হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন : এই বেওকুফ্! শুনতে পাচ্ছ না? বজরা ঘাটে ভেড়াও!

বজরা দিক-পরিবর্তন করল! ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কাব্যতীর্থ বলেন, এটি একটি বিখ্যাত ঘাট—ত্রিবেণীর জগন্নাথ ঘাট।

রায়মশাই দুরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে বললেন, জানি, সময় থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম।

—কার সঙ্গে? কার কথা বলছেন?

—যাঁর নামে এই ঘাট—শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। আপনি এখনই বলছিলেন না, 'ভারতভূখণ্ডে আজও এমন পণ্ডিত আছেন যিনি আমার ঐ গ্রন্থের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারেন।' আমি তো মনে করি—তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন ঐ উনি। শুনেছি, এখনও তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং মেধা অক্ষুণ্ণ; যদিও শতাধিকবর্ষ বয়স হয়েছে তাঁর!

—একশো সাত। তিনি সম্পর্কে আমার প্রপিতামহ। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার। বংশবাটিতেই তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। তর্কপঞ্চাননের জ্যেষ্ঠতাত তিনি। তাঁর চতুষ্পাঠীতেই তর্কপঞ্চানন ঠাকুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

বজরা ঘাটে এসে ভিড়ল। গঙ্গার ঘাট জনারণ্যে পরিণত। গাছের উপর পর্যন্ত উঠেছে মানুষ। মাঝখানে একটি চিতা সাজানো। তার উপর এক বৃদ্ধের শব শায়িত। সতী অনুপস্থিত। শোনা গেল, তাঁকে স্ত্রীলোকদের ঘাটে স্নান করানো হচ্ছে। শবদাহ হতে বিলম্ব আছে। কাব্যতীর্থ বললেন, এ নৃশংস দৃশ্য দেখা কি নিতান্তই প্রয়োজন?

বজরার ছাদে দুটি কেদারা নিয়ে দুজনে অপেক্ষা করছিলেন। রায়মশাই উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে। আমি জেনে যেতে চাই সতীর প্রকৃত মনোভাব। কেন সে স্বীকৃতি দিল এ আচারে? এ কি শুধুই লোকাচার? ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অথবা—

কাব্যতীর্থ বলেন, 'লোকাচার' কেন বলছেন? এই তো শাস্ত্রীয় বিধান।

সোজা হয়ে বসলেন তরুণ জমিদার : বটে! শাস্ত্রীয় বিধান? কোন শাস্ত্রের?

—ধরুন, ঋষি অঙ্গিরা বলেছেন, "মৃতে ভর্তারি যা নারী সমারোহে দ্বুতাশনং। সারুন্ধতী-সমাচারা স্বর্গলোক মহীয়তে।।" [স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রী ঐ জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে বশিষ্ঠজায়া অরুন্ধতীর মত অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারিণী হয়।] আরও বলছেন, "নান্যেহি ধর্ম বিজ্ঞয়ো মৃতে ভর্ততি কর্হিচিৎ।।" '[স্বামীর মৃত্যুতে সাধ্বী স্ত্রীগণের পক্ষে অগ্নিপ্রবেশ ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই।]

রায়মশাই বলেন, মনু কিন্তু অন্য সুরে গাইছেন। ওটাই যদি একমাত্র নির্দেশ হয় তাহলে মনু-সংহিতায় কেন বলা হল, "কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু ?" [পতির মৃত্যুর পর পবিত্র ফলমূল ভক্ষণে বিধবা শরীরকে কৃশ করবে এবং অন্য পুরুষের নামোচ্চারণও করবে না।]

কাব্যতীর্থ বলেন, এ নির্দেশ সে যাবৎকাল চিতারোহণ না করছে ততক্ষণের জন্য।

রায়মশাই প্রচণ্ড ধমকে ওঠেন, বি সেন্‌সিব্‌ল কাব্যতীর্থ! স্বামীর মৃত্যু এবং তার দাহকার্যের মধ্যে সময়ের কতটা ব্যবধান? তিন চার ঘণ্টা? বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টা? তার জন্য ঐ নির্দেশ? ফলমূল খেয়ে 'শরীরকে কৃশ করা'? তোমাদের মনুর কী ধারণা? ঐটুকু সময়ের মধ্যে সদ্যোবিধবা দধি-দুগ্ধ-মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করে স্থূলাঙ্গী হয়ে যাবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পরপুরুষের ভজনায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে?

—তা নয়! মানে—

—মানে ঐ একটাই। আর্য ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না! সতীদাহ প্রথার শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত! এ কখনই সনাতন হিন্দুধর্মের নির্দেশ নয়!

কাব্যতীর্থ দেখেন রায়মশাই রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বলেন, থাক এ আলোচনা।

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেন তরুণ জমিদার। বলেন, তুমি যাই বল কাব্যতীর্থ, এ ব্যবস্থায় আমার সায় নেই। তাই আমার উইলে এই শর্ত করেছি—যদি আমার মৃত্যুর পর আমার দুই ধর্মপত্নীর মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে সহমরণে যায় তবে সে আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতা হবে!

কাব্যতীর্থ অর্কফলাসমেত শিরশ্চালন করেন। পরমুহূর্তেই চমকে ওঠেন তিনি! রসিকতাটার মর্মোদ্ধার করেন। রহস্যপ্রিয় রায়মহাশয় এমন গুরুতর বিষয়েও কৌতুক করছেন! তিনি হেসে ওঠার পূর্বেই ঘাটে একটি শোরগোল উঠল। দেখা গেল স্নানান্তে সতী এসেছেন চিতার কাছে। রায়মশায় বললেন, চলুন, এবার ওখানে যাই।

—মায়েরা?

—ওরা বজরাতেই থাকবে। দুরবিন দিয়ে দেখবে, যদি দেখবার অভিরুচি হয়।

ভিড় ঠেলে ওঁরা অগ্রসর হয়ে আসেন। সদ্যবিধবার বয়ঃক্রম ত্রিংশতি বর্ষ হবে। তাঁর পরিধানে একটি রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র। শুধু সীমন্তে নয়, সমস্ত মূর্ধায় সিন্দূর-চর্চিত। ললাটে রক্তচন্দনের আলিম্পন; সর্বাঙ্গে কোনো আভরণ নাই, শুধু কণ্ঠে সারি সারি পুষ্পমাল্য। ওঁর চরণদ্বয় অলক্তকরাগরক্তিম—দুই করতলেও অলক্তক লেপন করা হয়েছে। সতীর ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও কঞ্চুলিকা নেই। একবস্ত্রা তিনি। স্থির অচঞ্চল পদক্ষেপে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন চিতাকে। তাঁর পুত্র ও কন্যা এসে তাঁর চরণধূলি নিল। একটি শিশু সবলে আলিঙ্গন করে রইল তাঁর বাম জানু। সম্ভবত সে সর্বকনিষ্ঠ। একজন জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে। সতী দু হাতে কর্ণমূল রুদ্ধ করে রইলেন—যতক্ষণ সেই শিশুর 'মা মাগো' শব্দ ভেসে এল। তারপর দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল সেই সন্তানের আর্তকণ্ঠ। সতী স্বাভাবিক হলেন। অচঞ্চল পদক্ষেপে উঠে বসলেন চিতায়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কী যেন সব মন্ত্রোচ্চারণ করল, পুনরুক্তি করলেন সদ্যবিধবা। সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠল—'সতী মাঈকী জয়!'

শঙ্খ-ঘণ্টা ও তূর্যধ্বনি মিলিত হল সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে।

কাব্যতীর্থের লক্ষ হল জনতার ভিতর একজন গোরা-সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। বছর চল্লিশ বয়স। তাঁর পরিধানে একটি আলখাল্লা, মাজার কাছে ফাঁস দিয়ে আটকানো। হাতে একটি বাঁধানো বই। গলায় একটি চেন, তা থেকে একটি লকেট ঝুলছে। সংখ্যাতত্ত্বের যোগচিহ্নের মত। হঠাৎ তিনি এগিয়ে এসে যাবনিক ভাষায় কী যেন বললেন। জনমণ্ডলীর কেউই জবাব দিতে পারল না। একপদ অগ্রসর হয়ে এলেন রায়মশাই। সাহেবের সঙ্গে তাঁর কিছু কথোপকথন হল।

রায়মশাই ফিরে এলে কাব্যতীর্থ বলেন, উনি কে? কী জানতে চাইছিলেন?

—উনি একজন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। ত্রিবেণীর ঘাটে সতীদাহ হচ্ছে সংবাদ পেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে এসেছেন সতীদাহ দেখতে। উনি জানতে চাইলেন, স্ত্রীলোকটি কি স্বেচ্ছায় সহমরণে যাচ্ছে? আমি বললাম—আপনার কী মনে হচ্ছে? ওঁর প্রতি কোনো জোর-জবরদস্তি হতে দেখছেন?

এই সময় সতী পুরোহিতকে কী যেন বললেন। বোঝা গেল, তিনি স্বামীর মস্তকটি স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নেবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। কয়েকজন শববাহী আত্মীয় মৃতের মস্তকটি ওঁর কোলে উঠিয়ে দিল। সতী বললেন, তোমরা আমাকে ওঁর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করে দাও!

ওঁর অনুরোধটুকুর অর্থগ্রহণ হয়নি পাদরি সাহেবের কিন্তু দড়িদড়া এনে যখন সতীকে বাঁধবার

আয়োজন হল তখন তিনি প্রতিবাদ করলেন। রায়মশাইকে ইংরাজিতে বললেন, এ কী! ওঁকে বাঁধা হচ্ছে কেন?

—কারণ, উনি নিজেই সেই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন।

—আহ্! তার মানে উনি ভয় পাচ্ছেন। আগুনের উত্তাপে তাঁর সঙ্কল্পচ্যুতি হতে পারে।

তরুণ জমিদার বলেন, ঠিক তাই! সেটাই স্বাভাবিক। নয় কি? উনি হয়তো জোন-এর কথা জানেন!

—'জোন'! জোন মানে?

—আমি জোন অব আর্কের কথা বলছি, যাঁকে আপনারা এই কিছুদিন আগে পুড়িয়ে মেরেছেন। ডাইনি বলে!

সাহেবের মুখ কালো হয়ে ওঠে। বলেন, 'জোন অব আর্ক' ডাইনি ছিলেন না, তিনি প্রায় সেইন্ট!

—সেদিন তা আপনারা বোঝেননি। তা সেই 'প্রায়-সেইন্ট'ও কিন্তু প্রথমবার আগুনের উত্তাপে অগ্নিকুণ্ড থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলেন। তাই নয়?

পাদরি আপাদমস্তক দেখে নিলেন ভারতীয় জমিদারটিকে। বললেন, ওইটুকুই তাঁর কলঙ্ক। তিনি অন্যথায় দেবী। ওইটুকুতেই প্রমাণ হয় তিনি সেইন্ট নন, মানুষ! আপনাদের যুধিষ্ঠির যেমন! 'ইতি গজ'-টুকুতেই তিনি মানুষ!

রায়মশাই বলেন, দেহধারীকে দৈহিক কার্য-কারণ সম্পর্কের অনুবর্তী হতেই হবে। শুধু জোন এবং যুধিষ্ঠির কেন, স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র যিশুও তো—

সাহেব রুখে ওঠেন—কী বলতে চাইছেন আপনি? ঈশ্বরপুত্র যিশু কোনোদিন দেহের দাসত্ব স্বীকার করেননি!

রায়মশাই বলেন, আমি দুঃখিত সাহেব। বাইবেলটা তাহলে আপনাকে আবার ভালো করে পড়তে হবে। ঐ তো আপনার হাতেই আছে—দিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় ক্রুশবিদ্ধ যিশু আর্তনাদ করে উঠেছিলেন "Eli, Eli, lama sabachtani?" ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমাকে কেন তুমি ত্যাগ করলে? চিরদিন যাঁকে 'ফাদার' বলেছেন, মৃত্যু-যন্ত্রণার অভিমানে তাঁকে বললেন 'গড'! দৈহিক যন্ত্রণায় তাঁর ক্ষণিক ভ্রম হয়েছিল—করুণাময় ঈশ্বর বুঝি তাঁকে ত্যাগ করেছেন!

পাদরি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন ঐ অপরিচিত হিন্দু যুবকটিকে। যুবকটি পুনরায় বলেন, তাই বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না যেন। আমি যিশাস্‌কে ছোট করছি না! তিনি মহামানব। আমি শুধু বলতে চাই, দেহধারীকে দেহের ধর্ম মানতেই হবে। আপনিও যেন ছোট করবেন না ওই মহিলাকে—উনি তাঁর দেহ রজ্জুবদ্ধ করতে চাইছেন বলে।

সাহেব প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই মত্ত কোলাহলে সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সতী স্থির হয়ে বসে আছেন পদ্মাসনে। তাঁর দুই চক্ষু মুদ্রিত! যুক্তকরে তিনি ধ্যানস্থ—বাহ্যজ্ঞান নেই তাঁর। বোধ করি এই তুমুল কোলাহল, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি তাঁর শ্রবণে প্রবেশই করছে না। দুই-তিন-চার মুহূর্ত! চিতার তলদেশ থেকে অগ্নি তার লেলিহান শিখায় অগ্রসর হয়ে এল ঐ ধ্যানমগ্না নারীর দিকে। কাব্যতীর্থ আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন—খণ্ড মুহূর্তের জন্য—পদ্মাসনার ধ্যানভঙ্গ হয়েছে! দুরন্ত আতঙ্কে তাঁর দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। সর্বভুক অগ্নি সর্বপ্রথমেই দগ্ধ করল ওঁর পট্টবস্ত্র। বীভৎস দৃশ্য! উনি উঠে দাঁড়াতে চাইলেন—ছুটে পালাতে চাইলেন—মুহূর্তে মহিমময়ী সতী প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে পড়লেন! তখনও তাঁর পূর্ণজ্ঞান আছে! উলঙ্গ রমণী গগনবিদারী আর্তনাদ করে উঠলেন—বাঁচাও! বাঁচাও!!

পাদরি ছুটে এসে চেপে ধরলেন রায়মশায়ের দুটি হাত : ফর গডস্ সেক, সেভ্ হার!

রায়মহাশয় যেন প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে—দেখছেন! না, সতীকে নয়, বিবস্ত্রা রমণীকে নয়, মানুষকে! তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। যদিও সেই চোখে তাঁর অজ্ঞাতে নেমেছে দুটি জলের ধারা। কাব্যতীর্থ দু হাতে কান বন্ধ করে মুদ্রিত নেত্রে বসে পড়েছেন ভূতলে।

—বাঁচাও! বাঁচাও! হায় ভগবান!

ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠেন রায়মশাই : ভগবান! ভগবান নেই! থাকলে, তিনি অন্ধ, তিনি বধির!

কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত। তারপরে মূলোৎপাটিত কদলীবৃক্ষের মতো লুটিয়ে পড়ল একটা নিরাবরণ নারীদেহ তার স্বামীর দেহের উপর। পরম করুণাময় অগ্নিদেব গ্রহণ করলেন হতভাগ্য বিধবার প্রাণাঞ্জলি। বিবস্ত্রা নারীর লজ্জা আবৃত করলেন ঘন ধূম্রজালে।

*　　　*　　　*

ঘন্টাখানেক পরে। ধীরপদে শ্রান্ত খিন্ন রায়মশায় ফিরে আসছিলেন বজরায়। পিছন পিছন কাব্যতীর্থ। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তাঁদের ডাকল। রায়মশাই ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন সেই ধর্মযাজক এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি বললেন, বাবু, আমি দুঃখিত। হয়তো উত্তেজনার মুহূর্তে তোমাকে আঘাত দিয়েছি। তোমার ধর্মে!

রায় বলেন, সেটা উভয়তই। আমিও দুঃখিত! আমিও তোমাকে ফিরে আঘাত করেছি।

দুজনে করমর্দন করলেন। সাহেব বলেন, কিন্তু এখন তো আমরা কেহই উত্তেজিত নই। এখন বল, তুমি কি মনে কর—এই ব্যবস্থা ভাল? তুমি জোন অব আর্কের কথা তুলেছিলে। হ্যাঁ, আমরা আজ স্বীকার করি—আমরা ভুল করেছিলাম, অন্যায় করেছিলাম, পাপ করেছিলাম। এখন বল, এই সতীদাহ প্রথাটা কি তুমি অন্তর থেকে ভালো বলে মান?

হাতটা ধরাই ছিল। রায়মশাই বলেন, না। সেইজন্যেই এসেছিলাম এই সহমরণ দেখতে। আমি তথ্য সংগ্রহ করছি। যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করছি। সংগ্রাম অনিবার্য। আশা করি, লড়াই যখন বাধবে তোমাকে আমার দলে পাব!

—লড়াই? কিসের লড়াই?

—সহমরণ-প্রথা উচ্ছেদের লড়াই। টুলো পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে!

সাহেব ওঁর হাতটা ঝাঁকি দিতে দিতে বললে, নিশ্চয় পাবে বন্ধু! তুমি বিদ্বান, পণ্ডিত এবং বয়সে তরুণ। আন্দোলন শুরু কর। আমি আছি! আমাকে সংবাদ দিও। আমি নিশ্চয় এসে দাঁড়াব তোমার পাশে। আমাকে পাবে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন চার্চে। এই বৎসরই ঐ চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমিই তার প্রথম ধর্মযাজক। আমার নাম : উইলিয়াম কেরী।

রায়মশাই বললেন, ডিলাইটেড টু মিট য়ু ফাদার কেরী। আমার নাম : রামমোহন রায়।

প্রায় চার মাস পরের কথা।

বংশবাটির রাজবংশের ইতিহাসে একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল। ত্রিবেণী থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী এসে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে আজ সন্ধ্যাকালের মধ্যেই রাজা-মহাশয়ের নৌকা বংশবাটির ঘাটে ভিড়বে। ত্রিবেণীর ঘাটে ওঁরা নৌকা ভেড়াননি; কিন্তু ঘাট থেকেই রাজা-মহাশয়ের ধ্বজা-সমন্বিত বজরাটি নজর হয়েছে। সংবাদবহ জানিয়েছে রাজা-মহাশয়ের বজরার পিছু পিছু আসছে পণ্যসম্ভারপূর্ণ সপ্তডিঙা!

কী আছে ওতে?

এই চার মাসে বংশবাটির জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। অনন্তবাসুদেব মন্দিরে বহাল হয়েছেন নূতন পুরোহিত—রামজীবন লাহিড়ী। কাব্যতীর্থের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নামে কানাঘুষাটা বন্ধ হয়েছে। রাজবাটির ভিতরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ কানাইয়ের মায়ের চাকরি গিয়েছে।

এই চার মাস সবচেয়ে কষ্ট গেছে শঙ্করীর। মন খারাপ হলেই সে পুঁথি নিয়ে বসত, অথচ এখন তাও বসতে পারে না। ভালো লাগে না। নিয়মমাফিক কাজ করে যায়। মহামায়ার ঘরে আসে। তাঁর খোঁজখবর নেয়; কিন্তু ঘনিষ্ঠ আলাপ কোনোদিনই হয়নি। মহামায়াই শেষে একদিন অভিমানিনী ছুক্রির হাতখানা চেপে ধরলেন : শোন্! বস্, এখানে।

—কী, বল না?

—দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

শঙ্করী ফস করে বলে, কেন? আজ আবার গহনা মেলাবে নাকি?

—ঠিক তাই। এই নে চাবি। দরজাটা বন্ধ করে বার কর।

শঙ্করী রুখে ওঠে, আবার আমাকে কেন? চাবি তোমার কাছে আছে, তাই থাক। আমি মতির মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই-ই গহনার পুঁটলি বার করে দেবে এখন।

মহামায়ার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। বললেন, অভিমান তুই করতে পারিস। সে হক তোর আছে। কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি ছুট্‌কি! আর বেশিদিন তোকে জ্বালাব না, কী বলিস?

শঙ্করী চোখ তুলে দেখল। সত্যিই রোগপাণ্ডুর মহামায়া একেবারে শয্যালীন হয়ে গেছেন। যে-কোনোদিন মৃত্যু হতে পারে তাঁর। শঙ্করী আর রাগ করে থাকতে পারল না। দ্বার রুদ্ধ করে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। কিন্তু এ কী? বড়দির গয়নার বাক্স কোথায়? চাপা আর্তনাদ করে ওঠে শঙ্করী : বড়দি! তোমার গহনা!

—আছে রে বাপু, আছে। হারায়নি। তোর পুঁটুলিটা নিয়ে আয়।

—হারায়নি তো কোথায় গেল? চাবি বরাবর তোমার কাছেই ছিল তো।

—ছিল। বলছি। অনেক কথা বলার আছে। তুই ঐ পুঁটুলিটা নিয়ে এসে বস্ দিকিনি। সব অপরাধ আজ কবুল করব তোর কাছে। তারপর তুই রাখিস আর মারিস।

চিরদিন যেমন হয়েছে, আজও তাই হল। বড়দির ইচ্ছার স্রোতে শঙ্করী গা ভাসালো। কাছে এসে বসল। মহামায়া তাকে একটি একটি করে অলঙ্কার পরাতে পরাতে বললেন, সবার আগে কবুল করি—হ্যাঁ, ঠাকুর-মশাইকে তাড়াবার পরিকল্পনা আমি করেছিলাম। কানাইয়ের মা তোকে মিথ্যা বলেনি।

শঙ্করী জবাব দিল না।

—কই তুই তো কোনো তিরস্কার করলি না? জানতে চাইলি না—'কেন?'

—সেটা আমি অনুমান করেছি।

—তাই তো করবি। তুই বুদ্ধিমতী। দোষ আমি তোকেও দিই না, তাঁকেও দিই না।

অপ্রিয় আলোচনাটার মোড় ফেরাতে শঙ্করী বলল, আসল কথাটা বল। তোমার গহনা কোথায়?

—আমি বেচে দিয়েছি।

—বেচে দিয়েছ! তোমার অত অত গহনা! বিয়ের সব যৌতুক! কেন? কী জন্যে?

—আমারও যে একজনের সঙ্গে পিরিত হয়েছে!

—বাজে কথা বললে উঠে যাব কিন্তু—

মহামায়া ওর হাতটা চেপে ধরেন—তুই তো জানিস, রাজা-মশাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত না হলে তিনি ফিরে আসবেন না। তাই—

—তাই তুমি তোমার সব গহনা বেচে দিলে?

—দেব না! বিনিময়ে কী পেলাম দ্যাখ্। তিনি আসছেন! খবর পেয়েছি। দিনসাতেকের মধ্যেই।

মহামায়ার লক্ষ্য হল—এ কথায় এই বয়সেও শঙ্করীর মুখে একটা লজ্জারুণ আভা ফুটে উঠল। অত্যন্ত তৃপ্তিভরে তিনি সেই সাতাশ বছরের প্রোষিতভর্তৃকার ভাবান্তরটুকু উপভোগ করলেন। বললেন, গত মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় রওনা হয়েছেন। তাইতো আজ তোকে সাজাতে বসেছি। কখন হুট করে এসে পড়েন, কে বলতে পারে!

ঠোঁট ফুলিয়ে শঙ্করী বলল, ন্-না!

মহামায়াও অভিমান করেন, বারে! সেই জন্যেই গহনাগুলো বিসর্জন দিলাম। তোর না থাক, আমার একটা শখ-আহ্লাদ থাকতে নেই? আমি কলকাতা থেকে আতসবাজির বায়না দিয়েছি। রাজবাড়ি প্রদীপ দিয়ে সাজানো হবে। রসুনচৌকি বসবে! তোরণ তৈরী হবে—

—সে সব হোক। সে তো রাজা-মশায়ের প্রত্যাবর্তনের উপলক্ষে। আমি বলছি—ঐ খাট-পালঙ্ক সাজাতে পারবে না কিন্তু!

মহামায়া প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, একটা খটকা লেগে আছে। উনি এক লাখ টাকা পাঠাতে বললেন কেন?

—তার মানে?

মহামায়া বুঝিয়ে বলেন, দেওয়ান দিলীপ দত্ত যেই কাশীতে সংবাদ পাঠালেন এতদিনে রাজকোষে সাতলক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত হয়েছে অমনি রাজা-মহাশয় আদেশ করলেন—তা থেকে এক লক্ষ তঙ্কা কাশীতে পাঠাতে। কেন, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানাননি। সম্ভবত তিনি কিছু সওদা করেছেন সস্তা দরে, যা কলকাতায় বেশি দরে বিক্রয় করবেন। অর্থাৎ বাণিজ্য। সে যাই হোক, আদেশ পালিত হয়েছে এবং রাজা-মহাশয়ও জানিয়েছেন তিনি অবিলম্বে রওনা হচ্ছেন। বস্তুত তিনি এতক্ষণে রাজমহল অতিক্রম করেছেন।

হঠাৎ ওকে কাছে টেনে মহামায়া বলেন, হ্যাঁরে ছুট্‌কি, ষোলো বছর বয়সে তুই বলেছিলি ভয় করছে। এখনও কি তাই বলবি নাকি?

শঙ্করী উত্তেজনায় আবেগে জড়িয়ে ধরল তার বড়দিকে। এমন মাতৃসমা বড়দিকে সে কেন এতদিন ভুল বুঝে দূরে সরে ছিল? অথচ বড়দি তলে-তলে ওকে স্বামীর হাতে তুলে দেবেন বলে তাঁর সব যৌতুক, সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করে দিয়েছেন। মহামায়া ওকে তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকে চেপে ধরে বললেন, আমি বিশ্বাস করি, তোর কোলেও আসবে ঐ রকম ক্ষণজন্মা পুরুষ—পঞ্চানন-ঠাকুরের মতো।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত সোজা হয়ে বসে শঙ্করী। তৎক্ষণাৎ ভুলটা বুঝতে পারে। বড়দি নিশ্চয় সে রাত্রের কথোপকথনের কথা জানে না। কেমন করে জানবে? হয়তো অন্য কারো মুখে শুনেছে—মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জননী ছিলেন কিশোরী, জনক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। তবু বাজিয়ে নিতে বললে, পঞ্চানন ঠাকুর মানে?

আবার ওকে বুকে টেনে নিয়ে মহামায়া বলেন, রাগ করিস না ছুট্‌কি। আমি তোদের মতো বলতে পারব না—'সজ্ঞানে কখনও মিছে কথা বলি না', কিন্তু আজ তা বলে সত্যিই পারব না মিছে কথা বলতে। আমি সব জানি রে। তোর মন্তর নিতে চাওয়ার কথা—ওঁর অরাজি হওয়া! তোর প্রণাম আর ওঁর আশীর্বাদ! আমি সে রাত্রে আড়ি পেতে সব শুনেছিলাম!

শঙ্করী মুখটা আর তুলতে পারে না।

—তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে হতভাগী? লজ্জা তো পাব আমি। কারণ আমিই তোকে মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম। তুইই বরং আমাকে বাঁচিয়েছিস লোকলজ্জা থেকে। আগে থেকে সাবধান করে দিয়ে তুই অতবড় মানুষটার মাথা হেঁট হতে দিসনি!

শঙ্করী তার অশ্রুআর্দ্র মুখখানা অকপটে মেলে ধরে মাতৃসমা বড়দির দিকে। বলে, কিন্তু কেন তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন না বড়দি?

মহামায়া ওর চোখের দিকে তাকালেন। অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, ছুট্‌কি, তুই কি কিছুই আন্দাজ করতে পারিস না?

শঙ্করী নয়ন নত করল।

—তাকিয়ে দেখ্! আমার চোখে চোখে তাকিয়ে দ্যাখ্‌দিনি।

শঙ্করী পারল না। মাথা নাড়ল।

—তবে! তাহলে তো তুইও জানিস হতভাগী।

হুহু করে কেঁদে উঠল শঙ্করী। লজ্জা! এ কী লজ্জা! ছি ছি ছি! কেন তাঁকে এত রূপ দিয়েছিলেন ভগবান, কেন যৌবন দিয়েছিলেন? তারই জন্য তাঁকে দেশান্তরী হতে হল!

* * *

এ ঘটনা তিনদিন পূর্বেকার।

আজ সংবাদ এল রাজা-মশায়ের বজরা ত্রিবেণীর ঘাট ছেড়েছে। যে-কোন মুহূর্তে বংশবাটির ঘাটে বজরা ভিড়তে পারে।

মহামায়া আয়োজনের কোনো ত্রুটি রাখেননি। রাজবাড়ির সিংহদ্বারটি সজ্জিত হয়েছে দেবদারু

পাতায়। নিশান আর ধ্বজা উড়ছে প্রাসাদশীর্ষে! কলি ফিরিয়েছেন রাজবাটির। কার্নিশে সারি-সারি মৃৎপ্রদীপ—সন্ধ্যায় জ্বালানো হবে। আতসবাজিও এসেছে কলকাতা থেকে। এসেছে গোরার বাদ্যি। আর তাঁর গোপন বাসনাটিও চরিতার্থ করেছেন গোপনে। শুধু শঙ্করীই সে খবর জানে না। ছোটরানিমার শয়নকক্ষে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিছু মালা আর ফুল। পালঙ্ক সাজানো হয়নি—হয়তো লজ্জা পাবেন রাজা-মশাই। কিন্তু অর্গলবদ্ধ ঘরে সেগুলি বার করে শঙ্করীই সেগুলি মেলে দেবে পালঙ্কে। মহামায়া নিশ্চিত ছিলেন—রাজা-মহাশয় দীর্ঘদিন পূর্বে শঙ্করীর জন্ম সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সে বাধা এতদিন পরে নিশ্চয় তিনি মানবেন না। মানতে দেবেন না মহামায়া।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল—বজরার এখনও দেখা নেই। মানুষজন ভিড় করে আছে বংশবাটির ঘাটে। নাপতিনি-বৌ এসে শঙ্করীর চরণে আলতা পরালো, নিম্নকণ্ঠে বলল, নতুন কাপড় নে যাব কাল ছোটরানিমা।

মোতির-মা এসে বললে, বড়মা তোমারে ডাক্‌তিচে।

আবার কী হল? সেই একই ব্যাপার। কোন শাড়িটা শঙ্করী পরবে। বেনারসি না মস্‌লিন, নাকি মুর্শিদাবাদী! শঙ্করী বললে, তুমি যা বলবে তাই পরব। আজ তো তোমার জন্যেই সাজছি।

—বেশি ন্যাকামি করিস না ছুট্‌কি। ওরে আমার রে! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সতীনের কাছ থেকে সোয়ামী কেড়ে নিচ্ছেন আবার কাঁদুনি গাওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হল মোতির মা। এসে গেছে!

শঙ্করীর বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

গঙ্গার দিক থেকে ভেসে এল তূর্যধ্বনি। পটকার শব্দ। শঙ্খধ্বনি।

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত হল মহামায়ার। মোতির-মা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। ও কী! ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন?

—কীরে মোতির মা! তোর কী হল? শঙ্করী ওকে ধরে তুলতে গেল। মোতির-মা শঙ্করীর চরণজোড়া জড়িয়ে ধরে বললে, রাজা-মশাই কই গো? এ কে এল! এরে চিনি না!

—তার মানে!

—কে একজন বললে, রাজা-মশাই সাত নাও বোঝাই পাথর এনেছেন!

—পাথর! সাত নৌকা বোঝাই পাথর! কী বলছিস যা তা!

—যা-তা কেন গো! স্বচখ্যে দেখনু যে!

মোতির-মা তখনও মাথা খুঁড়ছে—ও রাজা মশাই নয় গো! ও অন্য কেউ!

মহামায়া বিহ্বল হয়ে পড়েন। শঙ্করী বিমূঢ়। হঠাৎ বিনা এত্তেলাতেই ছুটে এলেন দেওয়ান দিলীপ দত্ত। বললেন, ভিড় হটাও। তোমরা চলে যাও সবাই! রানিমাদের সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

সবাই ছুটে পালালো। মহামায়া বলেন, কী হয়েছে দিলীপ? এরা কী বলছে?

দিলীপ বলে, মনকে শক্ত করুন বড়মা। অত্যন্ত দুঃসংবাদ আছে।

শঙ্করী মাথার ঘোমটা কমিয়ে দিয়ে বললে, বলুন। বড়দি প্রস্তুত। বড়দির মাথাটা সে কোলে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসে। বলে, বলুন?

দিলীপ নতনেত্রে ধীরে ধীরে যে তথ্য নিবেদন করলেন তা অচিন্ত্যপূর্ব।

হ্যাঁ, রাজা-মহাশয় সাত-নৌকা-বোঝাই চুনার পাথর এনেছেন, লক্ষ তঙ্কা ব্যয়ে। সেটা কোনো খবর নয়, আসল সংবাদ রাজা-মহাশয় সন্ন্যাস নিয়েছেন। তিনি আর সংসারে প্রবেশ করবেন না। বস্তুত রাজবাটিতে প্রবেশ করতেই তিনি অস্বীকৃত হয়েছেন। তিনি উঠেছেন তাঁর প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠিত ঁঅনন্ত-বাসুদেব মন্দির সংলগ্ন অতিথিশালায়!

দিলীপ বলেন, বড়মা, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমি পালকির ব্যবস্থা করি? ঁবাসুদেব মন্দিরে যেতে হবে।

মহামায়া জবাব দিতে পারলেন না। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে তিনি কেমন যেন পাথর হয়ে গেছেন। জবাব দিল শঙ্করী। স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, না! রাজামশায়কে বলবেন, হ্যাঁ, আমি বলেছি বলেই বলবেন—তাঁর প্রস্তুতির জন্য বড়রানিমা যদি সাত বছর প্রতীক্ষা করতে পেরে থাকেন, তবে

বড়রানিমার প্রস্তুতির জন্য তাঁকে সাতদিন প্রতীক্ষা করতে হবে। বড়দিকে স্থির হতে দিন। রাজামহাশয়ের এবং আপনাদেরও বোঝা উচিত, এ রকম একটা সংবাদে রোগপাণ্ডুর বড়রানিমা কতদূর মর্মাহত হয়েছেন।

দিলীপ বললেন, আপনি যথার্থ কথাই বলেছে ছোটমা। আর কোনো আদেশ?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকে যে বাজনদার এসেছে তাদের পাওনা মিটিয়ে বিদায় দিন। সন্ন্যাসীর জন্য গৃহসজ্জা বেমানান। ওগুলো সরিয়ে ফেলুন। আপনাদের রাজা-মহাশয় যদি আজ এই নাটকীয় প্রবেশের পরিবর্তে সংবাদটা পূর্বে জানাতেন, তাহলে আমাদের এভাবে লোকলজ্জায় পড়তে হত না।

দিলীপ পুনরায় বলেন, আমি আপনারই পক্ষে রানিমা! আমিও মর্মাহত!

—তৃতীয়ত, রাজা-মশাইকে জিজ্ঞাসা করবেন : তিনি কি অতিথিশালার ভোগ গ্রহণ করবেন, না স্বপাক খাবেন, অথবা রাজবাড়ির অন্ন গ্রহণ করবেন?

—স্বপাক আহার করলে কি সিধা পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

—সে কথার জবাব আমি কেন দেব? আপনাদের সন্ন্যাসীরাজা জানেন, তিনি সাত লক্ষ টাকার মালিক! তাঁর যা অভিরুচি! আমি শুধু জানতে চাই, আমার হেঁসেলে তাঁর জন্য চাউল মাপা হবে কি না! সেটুকুই আমার এক্তিয়ারে!

দিলীপ এবার পদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন শঙ্করীকে।

গোরার বাদ্যি ফিরে গেল। নামিয়ে ফেলা হল প্রাসাদশীর্ষ থেকে নিশান আর ধ্বজা। প্রদীপগুলি জ্বালা হল না—ফিরে গেল মালগুদামে। আতসবাজির কী হল খবর নেই।

অনন্তবাসুদেব মন্দিরে যথারীতি সন্ধ্যারতির শঙ্খটা বেজে উঠল!

শয়নারতি সমাপ্ত হলে নৃসিংহদেব তাঁর কম্বলটি বিছিয়ে দিলেন অতিথিশালার পাষাণ-চত্বরে। নৈশ আহারের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি একাহারী সন্ন্যাসী।

ক্রমে সমস্ত তথ্যটাই জানতে পারল শঙ্করী। দিলীপের মাধ্যমে। রাজা-রানির সাক্ষাৎ হল না। না বড়রানির, না ছোটরানির। বড়রানিমা এ শোকের আঘাতে কেমন-যেন হয়ে গেছেন। যেন তাঁর কোনো বোধই নেই। হাসেন না, কাঁদেন না, কথা বলেন না। তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। কবিরাজ বলেন, বদ্ধ উন্মাদ তিনি হননি। হয়তো ক্রমে ক্রমে বোধের বিকাশ হবে, যদি দেহযন্ত্র ইতিমধ্যে বিকল না হয়ে যায়। আর ছোটরানিমা? না, রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আর্জিই পেশ করেননি। রাজা-মহাশয়ও কোন ঔৎসুক্য দেখাননি। তিনি আছেন নতুন মন্দিরের জমিতে। একটি ছাপরা তুলে সেখানেই থাকেন তিনি। স্বপাক আহার করেন। কম্বলের শয্যা, ত্রিশূল কমণ্ডলু—এই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাদবাকি সবই নাকি মায়ের। চোখে দেখেনি শঙ্করী, তবে মোতির মায়ের কাছে বর্ণনা শুনেছে—রাজা-মশাই একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কুঁজো হয়ে হাঁটেন। তাঁর মাথায় একমাথা পাকা চুল। একমুখ দাড়ি। কপালে যজ্ঞভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক।

শোনা গেল তাঁর কাশীবাসের ইতিকথা!

নৃসিংহদেবের সঙ্গে কাশীতে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের আলাপ হয়। রাজা-মহাশয় তাঁকে 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেন। ঐটাই ছিল তাঁর উপার্জনের রাজপথ। এছাড়া জোনাথান ডানকান নামে একজন সাহেব ঐ সময়ে কাশীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাচর্চা ছাড়া তিনি ধর্মালোচনার দিকেও ঝুঁকেছিলেন। এক তান্ত্রিক সাধুর প্রভাবে কিছুদিন যোগাভ্যাসও করেছিলেন।

পাছে সংকল্পচ্যুত হন, তাই প্রতিদিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে যোগাসনে বসে জননী হংসেশ্বরীকে তিনি স্মরণ করতেন। মনে মনে বলতেন, মাগো—তুমি আমাকে শক্তি দাও! তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমি ভুলিনি মা! নবাব আলিবর্দী তোমাকে অপমান করেছিল—সে আজ নির্বংশ। তবু স্বীকার করছি, তোমাকে আমি সসম্মানে বংশবাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি। অভিমানে তুমি

দেশত্যাগ করেছিলে, কাশীবাসী হয়েছিলে। অভিমানেই তুমি আমাকে শেষ দেখা না দিয়ে চলে গেলে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—পিতৃসম্পত্তি আমি উদ্ধার করবই। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। সসম্মানে তোমার স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত করব আমার রাজ্যে।

তারপর এক রাত্রে। মাতৃস্মরণ করে যথারীতি শয্যাগ্রহণ করেছেন নৃসিংহদেব। কম্বলের শয্যায়, পাষাণচত্বরে। রাত্রি গভীর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রাজামশায়ের। দেখলেন এক অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিচ্ছটা। সমস্ত শয়নকক্ষে পদ্মগন্ধ। ক্রমে সেই জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর মাকে—হংসেশ্বরীকে। আবির্ভূতা হয়েছেন। অথচ কী আশ্চর্য! তিনি মাকে ঠিক চিনতে পারছেন না! ওঁর গর্ভধারিণী ছিলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা—অথচ প্রত্যাদেশে যাঁকে দেখলেন তিনি মসীকৃষ্ণা! চিৎকার করে উঠলেন নৃসিংহদেব—মা গো! এ তোর কী রূপ! তুই যে শোকে-দুঃখে মসীবর্ণা হয়ে গেছিস।

পরমুহূর্তেই মনে হল না—যাঁকে দেখছেন তাঁর মুখের আদলটা তাঁর জননীর মতো হলেও তিনি বস্তুত জগজ্জননী। তাঁর একার জননী নন। প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মের উপর ললিতাসনে মা বসে আছেন—তাঁর কোনো শোক নেই, ক্লেশ নেই, ক্ষেদ নেই—তিনি সদাহাস্যময়ী। বাম-চরণখানি দক্ষিণ-জঙ্ঘার উপর উত্তোলন করে হংসেশ্বরী মা তাঁকে বরাভয়-মুদ্রায় আশীর্বাদ করছেন। উজ্জ্বল আলোয় প্রথমটা চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ লক্ষ্য হল—মা যে-পদ্মের উপর উপবিষ্টা সেটি প্রস্ফুটিত হয়েছে যে-মৃণালদণ্ডে, তা শায়িত-মহাদেবের নাভিমূল থেকে বহির্গত। শিব এক ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রের উপর শায়িত। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর বামদিকের উপরস্থ হস্তে খড়্গ এবং নীচে নরমুণ্ড এবং দক্ষিণাংশে উপরে অভয়মুদ্রা ও নীচে শঙ্খ।

ঠিক তখনই যেন অন্তরীক্ষে দৈববাণী হল : অহমিতি বীজম স ইতি শক্তিঃ। সোহহম্ ইতি কীলকম্।।

হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হল। স্বপ্নভঙ্গ? স্বপ্ন দেখছিলেন এতক্ষণ? এত প্রত্যক্ষ? এত সজ্ঞানে? মোট কথা বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। দেখলেন—জ্যোতি পুঞ্জ অন্তর্হিত হয়েছে, পদ্মগন্ধ বিলীন হয়ে গিয়েছে বাতাসে এবং তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে স্বেদে।

আশ্চর্য ঘটনাচক্র! পরদিন সকালেই বংশবাটি থেকে সংবাদ এল দেওয়ান দিলীপ দত্ত জানিয়েছেন—গত সাত বৎসরে রাজকোষে সাত লক্ষ তঙ্কা সঞ্চিত হয়েছে। কেমন করে হয়? তিল তিল করে বর্ধিত হয়েছিল সঞ্চয়ের অঙ্ক পাঁচ থেকে ছয় লক্ষে। সঞ্চয়ের হার অপরিবর্তিত থাকলে আরও পাঁচ-সাত বছর লেগে যাওয়ার কথা—ঐ ছয় অঙ্কটা সাতে পরিবর্তিত হতে। তাহলে কোন মন্ত্রবলে দিলীপ রাতারাতি এক লক্ষ তঙ্কা সংগ্রহ করল? সে কথা দিলীপ লেখেনি। একটু ক্ষুব্ধ হলেন রাজা-মহাশয়। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠালেন, অবিলম্বে তাঁকে এক লক্ষ তঙ্কা প্রেরণ করতে। কেন—তা জানালেন না। জানালেন না—ইতিমধ্যে তাঁর অন্তররাজ্যে বিরাট এক ভূমিকম্পে আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। না, মামলা নয়, পিতৃরাজ্য উদ্ধার নয়, ঐ সাত লক্ষ তঙ্কায় তিনি বংশবাটিতে নির্মাণ করে যাবেন অপরূপ এক মায়ের মন্দির। মা হংসেশ্বরীর মন্দির। এই তাঁর মায়ের আদেশ। একদিন তিনি থাকবেন না, তাঁর রাজ্য থাকবে না—হয়তো রাজবাটির গরিমা ধুলার সঙ্গে মিশে যাবে মহাকালের শাসনে। যাক, তবু সেই উন্নতশীর্ষ মন্দির থাকবে। আর শাশ্বতকাল থাকবে মায়ের নাম। তাঁর গর্ভধারিণী মা, হংসেশ্বরীর—তাঁর ইষ্ট জননী মা, হংসেশ্বরীর।

লক্ষ রৌপ্যমুদ্রায় তিনি ক্রয় করলেন সাত নৌকোবোঝাই চুনার-পাথর। নৃসিংহদেব পণ্ডিত—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রানি ভবানী-নির্মিত গঙ্গাতীরের মন্দির এবং তাঁর প্রপিতামহ রামেশ্বর রায় প্রতিষ্ঠিত অনন্তবাসুদেব মন্দিরে দেখেছেন, পোড়ামাটির কাজ বাংলা দেশের এই জলো আবহাওয়ায়, ক্রমাগত বার্ষিক ধারাপাতে অত্যন্ত দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ঢলে পড়ে। মাত্র তিন পুরুষের ভিতরেই অনন্তবাসুদেব মন্দিরের অনেক ভাস্কর্যের নাক-মুখ ক্ষয়ে গিয়েছে। তাই তিনি হংসেশ্বরী মন্দির গড়বেন প্রস্তরে, পোড়ামাটিতে নয়। সে মন্দির হয়তো 'যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী' দাঁড়িয়ে থাকবে না, তবু বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হবে।

রাজা-রানিতে সাক্ষাৎ হয়নি, এ কাহিনি নৃসিংহদেব সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন তাঁর পুত্র-প্রতিম দিলীপ দেওয়ানকে।

সেই কাহিনি বিস্তারিত শোনাচ্ছিল দিলীপ, রাজা-মহাশয়ের প্রত্যাবর্তনের দিন-তিনেক পরে—বড়রানিমার শয়নকক্ষে! মহামায়া নির্জীবের মতো পড়ে আছেন বিছানায়। দিলীপের বিস্তারিত বিবরণ হয়তো কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল ঠিকই, কিন্তু মস্তিষ্কের চিহ্নিত রন্ধ্রকোষে বোধের হয়তো জন্ম দিচ্ছিল না। কারণ তাঁর কোনো ভাবান্তর নেই। কাঁদছেন না, আহা-উহু করছেন না—শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানলার দিকে। চতুষ্কোণ জানলায় লোহার গরাদে মা-গঙ্গার দৃশ্যটি শূলবিদ্ধ। সেইদিকেই তাকিয়ে নিশ্চুপ শুয়েছিলেন তিনি। শঙ্করী বসেছিল ওঁর পায়ের কাছে। ধীরে ধীরে মহামায়ার পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বস্তুত সেই ছিল দিলীপের একমাত্র শ্রোতা।

দিলীপ আজ সাত বছর ধরে যাতায়াত করছে রাজবাড়ির অন্দরমহলে। কিন্তু কোনোদিন শঙ্করীর সঙ্গে কথা বলেনি। ছোটরানিমার সঙ্গে তার বয়সের প্রভেদ খুব বেশি নয়। দিলীপ প্রায় শঙ্করদেবেরই বয়সি। তাই উভয়েই সংকোচে কখনো পরস্পরের সম্মুখে আসেননি। ছোটরানিমার সৌন্দর্যের খ্যাতি সুবিদিত। সে কথা না-জানা থাকার কোনো কারণ নেই। দুরন্ত কৌতূহলও ছিল দিলীপের। কিন্তু কৌতূহলকে সে দমন করেছিল এতদিন। মাঝে মাঝে অলক্তকরাগরঞ্জিত দুটি দ্রতচ্ছন্দ নূপুরনন্দিত চরণ সে দেখেছে। কখনও দেখেছে কঙ্কন-চূড়শোভিত গজদন্তশুভ্র একটি হাত—কিন্তু তাঁর মুখখানা কখনও দেখেনি। সেদিন সন্ধ্যায় মর্মান্তিক প্রয়োজনে সে যখন দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করতে এল তখন শঙ্করী তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে সরাসরি কথা বলেছিল তাঁর সঙ্গে। তারপর থেকেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিমতী শঙ্করী বুঝে নিয়েছে—বড়দির যা অবস্থা তাতে তাকেই এবার হাল ধরতে হবে। এবং তা করতে হলে—ঐ দেওয়ানজির সঙ্গে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রাখলে চলবে না। বহির্জগতের সঙ্গে ঐ একটিই বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র। ওর সঙ্গেই বড়দির স্বাস্থ্যের বিষয়ে পরামর্শ করতে হয়, বৈষয়িক কথাবার্তা চালাতে হয়। তাই দেওয়ানজি বড়মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শুনে সে অকুণ্ঠচিত্তে এসে বসেছিল বড়দির পায়ের কাছে। মাথায় আধো-ঘোমটা টেনে।

দীর্ঘ কাহিনি শেষ করে দিলীপ সরাসরি তার ছোটমাকে সম্বোধন করে বলল, ছোটমা, আজ আমি এসেছিলাম আর একটি সংবাদ জানাতে, এটিও দুঃসংবাদ এবং মর্মন্তুদ। বড়মাকে বলে লাভ নেই! তিনি তো থেকেও নেই। আপনাকেই বলব। কিন্তু এভাবে একের পর এক দুঃসংবাদ জানাতে স্বতই আমি কুণ্ঠিত হচ্ছি।

শঙ্করী বললে, আপনি দূতমাত্র। শুধু তাই নয়, আপনিই এ রাজপুরীর একমাত্র হিতৈষী। বলুন আপনি। আমি প্রস্তুত।

—রাজা-মহাশয় কাশীধাম থেকে একাকী প্রত্যাবর্তন করেননি। তাঁর সঙ্গে আরও একজন এসেছেন। আপনার চেয়ে বছর দশেকের ছোটই হবেন। তাঁর নাম শ্রীকৈলাসদেব রায়। তিনি বংশবাটির ঘাটে অবতরণ করেননি—সোজা কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, মিস্ত্রি-মজুর সংগ্রহ করে আনতে। আজ তিনি ফিরে এসেছেন।

—বুঝলাম না। এটা দুঃসংবাদ কেন?

ইতস্তত করল দিলীপ। তারপর বললে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে রাজা-মশায় ঐ কৈলাসদেব রায়-মশায়কে কাশীতে থাকতেই শাস্ত্রমতে দত্তক-পুত্র নিয়েছেন। তিনি আইনমতে রাজা-মহাশয়ের ওয়ারিশ—তাঁর সন্তান।

শূন্যে-নিবদ্ধ দৃষ্টি মহামায়া হঠাৎ বলে ওঠেন: তাহলে এভাবেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করলে তুমি! বলিহারি!

দুজনেই চমকে ওঠে। শঙ্করী বললে, বড়দি কিছু বললেন, না?

দিলীপ বললে, অসঙ্গত কথা। সম্ভবত বিকারের ঝোঁকে।

তবু শঙ্করী ঝুঁকে পড়ে তার বড়দির মুখের উপর: কিছু বললে বড়দি?

মহামায়া না-রাম, না-গঙ্গা!

শঙ্করী এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। দিলীপকে বলে, এটাই বা দুঃসংবাদ কেন হতে যাবে দেওয়ানজি? আমরা দুই বোনই নিঃসন্তানা। পূর্বপুরুষদের 'লুপ্তপিণ্ডোদক' না করার এটাই তো শাস্ত্রীয় বিধান। উনি তো ঠিকই করেছেন।

দিলীপ পূর্বদিনই প্রণাম করেছিল তার ছোটমাকে। আজও তার করতে ইচ্ছে করছিল। কী অদ্ভুত মহিমময়ী নারী। কোনো বিকার নেই। বললে, কৈলাসবাবু আমাকে বলেছেন, তিনি মায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তিনি বস্তুত মাঝমহলে অপেক্ষা করছেন। তাঁর পরিচয় অবশ্য আমি এবং রাজামহাশয় ছাড়া এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না। আপনি অনুমতি করলে তাঁকে নিয়ে আসি এখানে।

এক মূহূর্ত কী যেন ভেবে নিল শঙ্করী। তারপর বললে, না। তাঁকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে বলুন। আজ সন্ধ্যায় আমি রাজা-মশায়ের পর্ণকুটিরে যাব। তাঁকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলবেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। আপনি পালকির ব্যবস্থা করুন।

দিলীপ অনেক কিছুই জানে। সে বিস্মিত হয়ে যায় ছোটরানিমার এ সিদ্ধান্তে। অবাক হয়ে বলে, আপনি নিজে যাবেন রাজা-মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?

—উপায় কী বলুন দেওয়ানজি? কৈলাস আমার সন্তান, আমার পুত্র—কিন্তু ধর্মপত্নীর হাতে সন্তানকে তুলে দেবার অধিকার আর কার আছে?

এবার আর দ্বিধা করেনি দিলীপ। উঠে এসে পদধূলি নিয়েছিল তার ছোটমায়ের।

বয়সের বাধা অস্বীকার করে শঙ্করী ওকে 'তুমি' সম্বোধন করল, নাম ধরে ডাকতে একটুও কুণ্ঠিত হল না। বললে, তুমিও সেখানে উপস্থিত থাকবে দিলীপ। কৈলাসের পরিচয় তার বাপকে দিতে হবে দু'বার—দুটি পরিচয় ; পারিবারিক—যা বুঝে নেব আমি, এবং আইনঘটিত—যা বুঝে নেবে তুমি। কৈলাসকে দত্তক নেওয়ার সময় তুমি-আমি কেউই তো উপস্থিত ছিলাম না।

—তাই হবে ছোটমা।

সেদিন সন্ধ্যায় পালকি এসে লাগল অন্দরমহলে। স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার পূর্বে শঙ্করী এসে দাঁড়ালো তার বড়দির শয়নকক্ষে। সঙ্গে মোতির-মা। বললে, মোতির-মা, বড়দির মাথাটা একটু তুলে ধর্ তো, প্রণাম করব।

বড়দির বোধ নেই, থাকলে তিনি দেখতেন শঙ্করীর সাজসজ্জা ঠিক সেই রাত্রের মতো। যে-রাত্রে সে শয়নকক্ষে আহ্বান করেছিল কাব্যতীর্থকে। সেই লাল-পাড় কার্পাসের শাড়ি, সেই নিরলঙ্কার মণিবন্ধে শাঁখা আর নোয়া। মোতির-মা আপত্তি করেছিল। শঙ্করী শোনেনি, বলেছিল—সন্ন্যাসী দর্শনে যাচ্ছি যে রে। সাজতে নেই।

বড়দি কিন্তু কোনো কথা বলল না। বুঝবে না, তবু শঙ্করী ঐ জড়বুদ্ধিসম্পন্নাকে বললে, বড়দি! তাঁর কাছে যাচ্ছি! তুমি অনুমতি দাও! আজ তিনি আমাকে পুত্রসন্তান দান করবেন!

বড়দি কী বুঝলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর মাথাটা টেনে নিয়ে সীমন্তের উপর চুম্বন করলেন।

* * *

হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো! পালকি এসে থামল অনন্তবাসুদেব মন্দিরের কাছে। হংসেশ্বরীর মন্দির উঠছে, তারই ঠিক পাশ ঘেঁষে। সেখানেই তৈরি হয়েছে এক পর্ণকুটির। বাঁশের খুঁটি, উলুখড়ের চাল, মাটির দেওয়াল। বংশবাটির রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায়ের রাজপ্রাসাদ! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্ত লালে লাল। মিষ্টি একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে ; আর তার সঙ্গে হাসনুহানার গন্ধ। পালকি থেকে নামল বংশবাটির ছোটরানি। মাথার ঘোমটা আরও একটু টেনে দিল। উঠে এল পর্ণকুটিরের দাওয়ায়। বাঁশের ঝাঁপ-লাগানো দরজাটা খোলাই আছে। ঘরে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বলছে। তারই অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় কম্বলের আসনে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। এক সন্ন্যাসী। সংসারাশ্রমে যাঁর পরিচয় ছিল নৃসিংহদেব রায়, রাজা-মশায়। তাঁর এক পার্শ্বে দিলীপ এবং অপর পার্শ্বে একজন তরুণ—নিঃসন্দেহে রাজা-মশায়ের দত্তকপুত্র, কৈলাস।

শঙ্করী হাঁটু গেড়ে বসল। পদ্মাসনে বসে থাকা সন্ন্যাসীর পদধূলি নিতে বাড়িয়ে দিল তার শঙ্খশোভিত নিরাভরণ দক্ষিণহস্ত। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, না, না, না! আমার পদস্পর্শ কোরো না, ছোটরানিমা।

হাত টেনে নিল শঙ্করী। ছোটরানিমা! মা! ছোটবউ নয়! গড় হয়ে মাটিতেই মাথা ঠেকালো। দিলীপ একটি আসন পেতে দিল, সেটা সরিয়ে ভূতলেই বসল শঙ্করী। মাথার ঘোমটা হাত দিয়ে কমিয়ে দিল। প্রদীপের আলো পড়ল তার মুখে। স্পষ্টভাবে বলল, সন্ন্যাসাশ্রমে আপনার কী নাম জানি না, আপনাকে কি রাজা-মশায় বলেই সম্বোধন করব?

চমকে উঠল দিলীপ ছোট মায়ের অকুণ্ঠ দৃঢ়তায়। নৃসিংহদেবও বোধ করি কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শঙ্করীর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বললেন, তোমার বড়দি কেমন আছেন?

শঙ্করী মুখটা ঘোরালো। একটু ভর্ৎসনা-মিশ্রিত কণ্ঠে দিলীপকে বললে, বড়রানিমার শারীরিক সংবাদ ওঁকে জানান না কেন? এবার থেকে প্রত্যহ কবিরাজমশাই কী বলে গেলেন তা ওঁকে জানাবেন।

দিলীপ বুঝতে পারে এ ধমক তাকে নয়। সে শুধু বললে, জানাব মা। বড়মা একই রকম আছেন। ওঁকে এইমাত্র তা জানিয়েছি।

নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। নৃসিংহদেব প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললেন, পড়াশুনার চর্চাটা রেখেছ?

এ প্রশ্নেরও জবাব দিল না শঙ্করী। প্রতিপ্রশ্ন করল, ইনিই কি কৈলাসদেব?

—হ্যাঁ। তোমার ছোটমাকে প্রণাম কর কৈলাস।

কৈলাস উঠে এসে প্রণাম করল শঙ্করীকে। পুনরায় গিয়ে বসল তার আসনে।

—এঁকে আপনি কাশীতে দত্তক নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। মাসকয়েক পূর্বে।

শঙ্করী কৈলাসের দিকে ফিরে বললে, তাহলে তুমি বাবা এখন থেকে রাজবাড়িতে থাকবে। রাজা-মশায় যে ঘরে ছিলেন সেটা ঝাড়-পোঁছ করাই আছে—

বাধা দিয়ে কৈলাস বললে, না ছোটমা, আমি বাবামশায়ের সঙ্গে এখানেই থাকব। ওঁর দেখাশোনার কেউ নেই—

নৃসিংহদেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই শঙ্করী বলে ওঠে, কথাটা তোমার ঠিক হল না, বাবা। উনি সন্ন্যাসী। ওঁর তো দেখাশুনার জন্য লোকের প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলেই তো উনি দশটা দাস-দাসী নিয়োগ করতে পারেন। এ ওঁর স্বকীয় কৃচ্ছ্রসাধনা। অথচ তুমি গৃহী। এতবড় জমিদারি তোমাকে চালাতে হবে। এতটা বয়স পর্যন্ত বোধ করি জমিদারি সংক্রান্ত কিছুই শেখনি, নয়?

কৈলাস জবাব দিল না। নৃসিংহদেবই তার হয়ে বললেন, তুমি ঠিক অনুমান করেছ ছোটরানিমা। কৈলাস এতদিন কাশীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেছে। যন্ত্রসঙ্গীতে ওর অদ্ভুত অধিকার। জমিদারি সংক্রান্ত কোনও অভিজ্ঞতা ওর নেই। আর ও-কথাটাও তোমার ঠিকই হয়েছে। ও গৃহী, আমি সন্ন্যাসী। ওর পক্ষে এই কুটিরে পড়ে থাকা নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়, অন্যায়।

কৈলাস তবু দৃঢ়স্বরে বললে, তা হোক। আমি আপনার কাছে এখানেই থাকব।

শঙ্করী শুধু বললে, তোমার যেমন অভিরুচি।

আবার ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ। সে নিস্তব্ধতা শঙ্করীই ভঙ্গ করল। বললে, আর একটা কথা। দেওয়ান রঘুনাথ দত্তজি অবসর নেবার পর থেকে বংশবাটির কোনও আইনত দেওয়ানজি নেই। অর্থাভাবে রাজসরকার কোনো দেওয়ান নিযুক্ত করেননি। অথচ আজ প্রায় দশ বৎসর কাল দিলীপ সে কর্মভার বহন করছে। অবৈতনিকভাবে। এখন তো রাজসরকারের অর্থাভাব নেই। তাই আমার প্রস্তাব—দিলীপ দত্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়ান পদে বরণ করা হোক, ওর পিতামহ যে বেতন পেতেন সেই বেতনে।

নৃসিংহদেব বলেন, অর্থাভাব এখনও আছে। আমাদের সঞ্চয় হয়েছিল সাত লক্ষ। তার ভিতর এক লক্ষ তঙ্কার উপকরণ ক্রয় করেছি। হংসেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করতে বাকি ছয় লক্ষ তঙ্কাই লাগবে। তবে তুমি যা বলছ তাও সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। দিলীপ কেন অবৈতনিক পরিশ্রম করবে?

দিলীপ দত্ত বাধা দিয়ে বলে, না না, রাজা-মহাশয়! আপনি, ব্যস্ত হবেন না। আপনি এবং আপনার পিতৃদেব আমার পিতামহকে যে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন তাতেই আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায়। অর্থের জন্য আমি লালায়িত নই। ব্যবস্থা যে রকম ছিল তাই থাকুক। তা ছাড়া আমি এঁদের 'মা' বলে ডেকেছি। মায়েদের সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য আবার বেতন কিসের?

রাজা-মহাশয় বললেন, তবে তো লেঠা চুকেই গেল।

—না, গেল না! শঙ্করী দৃঢ় প্রতিবাদ করল। সকলেই চমকে ওঠেন। শঙ্করী তার স্বামীর চোখে চোখ রেখে বললে—আপনি মায়ের মন্দির গড়তে যে-সব মিস্ত্রি-মজুর-স্থপতিবিদদের নিয়োগ করবেন তাদের তো যথাযথ পারিশ্রমিক দেবেন, 'মায়ের মন্দির' বলে তারা তো আপনাকে রেয়াত করবে না। দিলীপও পরিশ্রম করছে; কৈলাস জমিদারির কিছু জানে না—আদায়পত্র কীভাবে হয়, কীভাবে তহবিল বৃদ্ধি করতে হয়, কীভাবে জমিদারি সুরক্ষিত করতে হয়। মনে হয়, সেদিকে ওর আগ্রহও নেই—যেহেতু ও তা শিখতেও অরাজি। এক্ষেত্রে মন্দির তৈরির কাজের জন্যই দিলীপকে দেওয়ান হিসাবে নিয়োগ করা উচিত। এই আমার অভিমত। আপনি কী বলেন?

—আমি কী বলব শঙ্করী? আমি সন্ন্যাসী! এসব বৈষয়িক কথা।

শঙ্করী! এতক্ষণে তাকে নাম ধরে ডাকলেন। তবু নরম হল না ছোটরানি। একই ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, এটা তো আপনার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির কথা হল না রাজামশায়। আপনি সন্ন্যাসী—কিন্তু তহবিল আপনার নামে। আপনার সই ছাড়া ওর এক কপর্দক ব্যয় করা যাবে না। আপনি সংসারত্যাগী হলেও বিত্তবান সন্ন্যাসী। চার-ধামের মোহান্তের মতো। তাঁরা সাধন-ভজন করেন, কিন্তু বিষয় যখন আছে তখন বৈষয়িক আলোচনাও করেন। বিত্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনিই বা তা থেকে রেহাই পাবেন কেমন করে?

নৃসিংহদেব হঠাৎ বলে ওঠেন, বেশ। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দান করে দিচ্ছি। তুমি গ্রহণ কর, শুধু এক শর্তে! আমার মনের মতো মন্দির তুমি গড়তে দেবে।

সিদ্ধান্ত নাকি এমন হঠাৎই নিতে হয়!

শঙ্করীও সিদ্ধান্তে এল মুহূর্তে। বললে, আমি তা গ্রহণ করব কেন? আপনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করার পূর্বে প্রস্তাব করলে নিশ্চয় আমি রাজি হতাম। আজ পারি না রাজা-মশায়। আপনি কাশী থেকে অপুত্রক প্রত্যাবর্তন করেননি। তার অভিশাপ কেন আমি কুড়োতে গেলাম?

তিনজনেরই দৃষ্টি গেল কৈলাসদেবের উপর। সে নতনয়নে স্থির হয়ে বসে রইল। নৃসিংহদেব বলেন, বেশ, তাহলে তোমার প্রস্তাবই গ্রহণ করছি। দিলীপকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়ানপদে বরণ করে নেব।

এবার আপত্তি জানালো দিলীপ স্বয়ং: আমার আপত্তি আছে রাজা-মহাশয়। আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নই।

নৃসিংহদেব নন, শঙ্করী প্রশ্ন করলে, কেন দিলীপ?

—ছোটমা, বিবেচনা করে দেখুন,—ঠিক যে কারণে আপনি রাজা-মহাশয়ের দান গ্রহণ করতে পারলেন না, সেই কারণেই আজ আমি এ জমিদার সরকারের দেওয়ান-পদ গ্রহণ করতে পারি না। আমি আপনাদের সুপরিচিত—কিন্তু এ সম্পদের ভবিষ্যৎ-অধিকারী কৈলাসবাবুর কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং যে-ব্যবস্থা ছিল সেটাই চলতে দিন।

এবারও শঙ্করী বললে, তোমার যেমন অভিরুচি।

হংসেশ্বরী মন্দিরকে অসমাপ্ত রেখে নৃসিংহদেব স্বর্গারোহণ করলেন আরও তিন বছর পরে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। একটা ইন্দ্রপাত হল যেন বংশবাটিতে। মহাশবের দাহ দেখতে কাতারে কাতারে লোক ভিড় করে এল বংশবাটির শ্মশানঘাটে। না, শুধু রাজা-মহাশয়ের শেষকৃত্যের জন্য নয়—এত জনসমাবেশ হওয়ার কারণ—ঐ সঙ্গে বংশবাটির দুই রানিমা সহমরণে যাচ্ছেন, এই খবর রটে যাওয়ায়। প্রধানা না হলেও কনিষ্ঠা রাজমহিষী—ত্রিংশতিবর্ষীয়া রানি শঙ্করীর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। তাঁকে চোখে কেউ দেখে না—শুধু কানে শোনে তাঁর অপূর্ব দেহ-লাবণ্যের কথা। সেই তিনি উঠবেন জ্বলন্ত চিতায়!

১৭৪০ থেকে ১৮০২। বাষট্টি বছরে নৃসিংহদেব অনেক কিছুই দেখে গেলেন দুনিয়ায়। নবাবী আমল থেকে কোম্পানির রাজত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসও বদলে গেছে দ্রুতছন্দে। ফরাসি দেশে বাস্তিল দুর্গ বেদখল হয়েছে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জাকোবিন-দল রাজতন্ত্রকে ধুলায় লুটিয়ে দিল—গিলোটিনে কাটা পড়ল রাজা-মহারাজার মাথা। সপরিবারে। তারপর সেই গিলোটিনেই কাটা পড়লেন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা। ড্যান্টন, রোবসপীয়র। সন্ত্রাসের রাজ্যকাল উত্তীর্ণ হল—সেখানে সদ্য উদিত হচ্ছেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ইংল্যান্ডে এল শিল্পবিপ্লব। স্বাধীন হল আমেরিকা।

বংশবাটির ঢিমেতালা জীবনে এ সবের কোনো ছায়াপাত ঘটেনি। সেখানে আগেও যেমন, আজও তেমনি—শেয়াল ডাকে, জোনাক জ্বলে, মাঝিরা গান গায়, আর পালকিবাহকরা পথ চলে, হুম্‌ব্রো-হুম্‌ব্রো! বেল-জুঁই-শিউলি ফোটে আর ঝরে। আসে নানা পালা-পার্বণ—দুর্গোৎসব, কোজাগরী, গাজন, রথের মেলা। বছরে বছরে একই রূপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে কোনো ছন্দবদল হয় না—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বৈকালি, সান্ধ্যবন্দনা, শয়নারতি!

রাজা-মশায় চলে গেছেন—ভ্রূক্ষেপও করল না বংশবাটির আম-তাল-অর্জুন-পাকুড়-শিমুল গাছের সারি। তারা একই ছন্দে মাথা দোলাতে থাকে।

এ তিন বছরে বংশবাটির রাজপরিবারের রূপও বেশ কিছু বদলেছে। বড়রানিমার যদিচ কোনো পরিবর্তন হয়নি, ছোটরানিমার হয়েছে। তিনি আর মোটেই উদাসীন নির্লিপ্ত নন, কাব্যপাঠে একটি মুহূর্ত ব্যয় করেন না। বস্তুত শঙ্করদেব দেশত্যাগ করার পর তিনি আর কোনোদিন তাঁর অতিপ্রিয় পুঁথিপত্রের বাণ্ডিলটা পেড়ে নামাননি। এখন সমস্ত ভিতরবাড়ির দায়িত্ব যে তাঁর উপর। বড়রানিমা থেকেও নেই। শয্যাশায়ী তো ছিলেনই, এখন বোবা-কালা। কানে শোনেন কিনা কে জানে, মুখে বলেন না কোনো কথা। চুপচাপ বিছানায় পড়ে আছেন তিন বছর। তাঁকে নাওয়ানো-খাওয়ানোর দায়িত্ব এখন মোতির-মায়ের। ছোটরানি তাঁর খাস দাসীকে ছাড়া আর কাউকে ও কাজ দিয়ে ভরসা পাননি। অন্দর-মহলে কাজ ছাড়াও তাঁকে আর একটি কাজ করতে হয়—ঐ মন্দিরের হিসাব দেখা। নিত্য সন্ধ্যায় বড়মিঞা এসে দাঁড়ায় খাস-মহলে। চিকের ওপাশ থেকে হাজরির হিসাব জানায়; উনি লিখে নেন। সপ্তাহান্তে টাকা মেটানোর দায় তাঁর। মাঝে মাঝে পালকি চেপে স্বয়ং কাজ পরিদর্শনে যান।

ইতোমধ্যে উত্তরখণ্ড থেকে এসেছে দক্ষ কারিগর। প্রস্তরশিল্পী। চুনারপাথর দিয়ে তারা তিল তিল করে গড়ে তুলছে নৃসিংহদেবের 'তাজমহল'। রাজামশাই আছেন মন্দিরের সংলগ্ন সেই কুটিরে। ব্রাহ্ম-মুহূর্তেই শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জপে বসেন। তারপর একপ্রহর বেলায় ছাতাটি বগলে নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে যেতেন মন্দির-চাতালে। মধ্যাহ্নে ঘরে ফেরার তাগাদা নেই—একাহারী তিনি। সন্ধ্যায় কুটিরে প্রত্যাগমন করে পুনরায় জপে বসেন। এক প্রহর রাতে রান্না চড়ান। যা-হোক কিছু ফুটিয়ে নিয়ে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ। নিত্যি ত্রিশ দিন।

কৈলাসদেব অবশ্য এখন আর সে কুটিরের ভাগিদার নন। তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছেন রাজা-মহাশয়ের পরিত্যক্ত কামরাটায়। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-খোলা সব চেয়ে ভাল ঘরখানায়। ইতোমধ্যে শ্বরী যে বিবাহ দিয়েছেন পুত্রের। দশম বর্ষীয়া রানি-কাশীশ্বরী এখন বৌ-রানিমা। এ পঞ্চাশ বছরে যুগের হাওয়া কিছু পাল্টেছে। আগেকার কালে রাজাদের ঘর আর রানিদের ঘর পৃথক ছিল। রাজা দিবাভাগে থাকতেন বারমহলে—শুধু মধ্যাহ্নভোজনের সময়েই আসতেন অন্দরে। এখন কৈলাসদেব এবং কাশীশ্বরীর ঘর অভিন্ন। যুগের হাওয়া। কৈলাস জমিদারির ঝামেলার মধ্যে যেতে চান না। গান-বাজনার শখ তাঁর। সন্ধ্যাবেলায় শুধু বার-মহলে গিয়ে সঙ্গীতচর্চা করেন। বাকি সময়ে নিজের ঘরে বসেই রেওয়াজ করেন কাশীশ্বরীর নজরবন্দী হয়ে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে রাজপরিবারে। কাশীশ্বরীর সম্পর্কে মামা হন এমন একজন এসে আশ্রয় নিয়েছেন রাজবাটিতে। তিনি নাকি জঙ্গি! কোম্পানির হয়ে লড়াই করেছেন কোথায়-কোথায়। তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। ভাগ্নীর প্রতি স্নেহবশত এখন তার সংসারেই আছেন। চেহারাখানা না হলেও মেজাজখানা তাঁর জঙ্গিলাটের মতো। আর আছে মোম দিয়ে পাকানো মোক্ষম

একজোড়া গোঁফ। নানান বাতিক আছে তাঁর। রাজবাড়ির হেঁসেলে আহারাদি করেন না। তাঁর ঘরে সিধে পাঠিয়ে দিতে হয়। তাঁর খাসভৃত্য শম্ভু পাক করে দেয়। ভদ্রলোকের অদ্ভুত গল্প করার ক্ষমতা। ঐ এক গুণেই তিনি বংশবাটি গ্রামের অনেক অনেক আবালবৃদ্ধের মনোহরণ করেছেন। টিপু সুলতানের মৃত্যুসময়েও তিনি উপস্থিত, আবার আরাকানরাজের সেনাপতির হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যও তাঁর প্রত্যক্ষ করা ঘটনা—যদিও সাল-তারিখের হিসাবে হয়তো দেখা যাবে দুটি ঘটনাই ঘটেছে একই সময়ে—হাজার হাজার মাইল ব্যবধানে। তা হোক—গল্প শোনাবার ক্ষমতা আছে হাবিলদার-মামার।

হাবিলদার-মামা নামেই তিনি পরিচিত বংশবাটিতে। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে মিলিটারি বুট পায়ে, ব্যাটন হাতে তিনি প্রাতর্ভ্রমণে যান, এবং ফেরার পথে হাটের কোনো দোকানে বসে গল্প ফাঁদেন।

এতে আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু দেখা গেল—কী জানি কী ভাবে তিনি ক্রমশ কৈলাস ও কাশীশ্বরীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন। শঙ্করীর দৃষ্টি এদিকে প্রথম আকৃষ্ট হল একটি তুচ্ছ ঘটনায়। তুচ্ছ অবশ্য শঙ্করীর কাছে, মোতির মায়ের কাছে সেটা মর্মান্তিক। সে এসে জড়িয়ে ধরল শঙ্করীর চরণ দুটি : মা, তুমি না বাঁচালে মরি যাব!

—কী হল তোর? এমন করছিস কেন?

কুমার-বাহাদুর মোতিরে জবাব দে দিছে! মাইনে দে খ্যাদায়ে দিছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় শঙ্করীর। অন্দর-মহলের দাস-দাসীদের শাসন করাটা তার এক্তিয়ারে। মোতির মায়ের মেয়ে মোতি এখন আর ছোটটি নয়, দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছে। বয়সে সে কাশীশ্বরীর চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। তাকে কাশীশ্বরীর খাস-দাসী করা হয়েছিল। হয়তো কাশীশ্বরীর ইচ্ছানুযায়ীই তাকে বরখাস্ত করেছে কৈলাস—কিন্তু ব্যাপারটা শঙ্করীকে জানানো উচিত ছিল। শঙ্করী মোতির-মাকে বললে, ঠিক আছে। আমি দেখছি।

কৈলাস ঘরেই ছিল, কিন্তু ঘরে বৌমাও আছে। দরজার বাইরে থেকে গলা খাঁকারি দিল শঙ্করী : বৌমা আছ নাকি?

সেতারের ঝঙ্কার স্তব্ধ হল। ভিতর থেকে কৈলাস সাড়া দিল : আসুন ছোটমা! আছে।

—এই যে তুমিও আছ। দরকারটা তোমার সঙ্গেই, বাবা। মোতিকে কি তুমি জবাব দিয়েছ?

কৈলাস কিছু বলার পূর্বেই ঘোমটার ভিতর থেকে কাশীশ্বরী বলে ওঠে, হ্যাঁ, দিয়েছে। দেবেই তো। ও কেন আড়ি পেতে আমাদের দুজনের কথা শুনতে আসে?

শঙ্করী বুঝতে পারে। এ আড়ি-পাতা কানাইয়ের মায়ের মতো নয়। মোতিরও পনেরো-ষোলো বছর বয়স। এতটা বয়সেও অনূঢ়া। নবদম্পতির ঘরে সে যদি আড়ি পেতেই থাকে তার মূল কারণ নিতান্তই কৌতুক। কৌতূহল! শঙ্করী গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে আমি প্রশ্নটা করিনি বৌমা। তাছাড়া স্বামীর সম্মুখে শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলাও বংশবাটির রাজবাড়ির শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ!

কাশীশ্বরীর বয়স মাত্র দশ, কিন্তু সব মানুষ তো এক ধাতুতে তৈরি নয়। সে মাথার ঘোমটা কমিয়ে দিল। সরাসরি শঙ্করীর চোখে চোখ রেখে বললে, আপনি যতই ওর হয়ে সুপারিশ করুন, আপনার ছেলে ওকে চাকরিতে রাখবে না!

ঝনাত করে চাবির গোছা পিঠে ফেলে মল ঝম্‌ঝমিয়ে বৌরানিমা কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

শঙ্করী স্তম্ভিত। দুনিয়া কী দ্রুত পালটে যাচ্ছে! এবার সে আবার কৈলাসের দিকে ফিরে বলল, অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে না, বাবা?

—কিন্তু অপরাধটাকে লঘু করেই বা দেখছেন কেন? দাসীবাঁদীর এমন আড়িপাতা কি ভাল? যার খাই, যার পরি, তারই ঘরে আড়ি পাতি।

শঙ্করী বললে, অন্যায় সে করেছে, আমি স্বীকার করছি—কিন্তু তুমি তো বৌমার মতো ছেলেমানুষ নও। তোমার বোঝা উচিত এ শুধু কৌতুক! কৌতূহল! বাসরঘরে আড়ি পাতাটা কি অপরাধ?

—বাসরঘর? আমাদের বিয়ের তো বছর ঘুরে গেছে।

—তা গেছে। তবু তোমরা নবদম্পতি। আর মোতি ছেলেমানুষ—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কৈলাস বললে, না ছোটমা, ওর হয়ে আপনি সুপারিশ করবেন না। ওকে চাকরিতে আমি আর রাখতে পারি না।

আশ্চর্য! কৈলাস যেন শ্রুতিধর! স্ত্রীর ভাষণটাই প্রথম-পুরুষের বদলে উত্তর পুরুষে শুনিয়ে দিল! এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শঙ্করী। তারপর বলল, চাকরি ওর যাবে না। ও আমার খাস-দাসী হবে আজ থেকে। তবে তোমাদের মহলে ওকে আসতে বারণ করে দেব।

কৈলাস উঠে দাঁড়ায়, বলে তার মানে আমাদের অপমান করতে ওকে রাজবাড়িতে রাখবেন?

শঙ্করী বলে, এ ভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছ কেন কৈলাস? তাকে আমি ধমকে দেব। তোমাদের ঘরে যেন না আসে সে হুকুম দেব। তাতেও তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না! কী হলে খুশি হও তোমরা? ওকে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে?

—তাই দেওয়া উচিত। হাবিলদার-মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, 'আড়ি পাতার শাস্তি শূলে দেওয়া'; আমি তো শুধু ওর চাকরি খেয়েছি!

—হাবিলদার-মামা? ও বুঝেছি!

সেই তাঁর কথা প্রথম লক্ষ করল শঙ্করী। স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা মেটাতে কৈলাস হাবিলদার-মামার শরণাপন্ন হয়েছে! বংশবাটির এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ রাজা!

সেই সূত্রপাত। তারপর তিল তিল করে নানান ক্ষেত্রে হাবিলদার-মামার উপস্থিতিটা-স্বীকার করতে হল। একদিন দেখল বাগানের পূর্বদিকের অমন সুন্দর কাঞ্চনগাছটা কাটানো হচ্ছে। প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছিল গাছটা। বসন্তকালে বেগনি রঙের থোকা-থোকা ফুলে ভরে যেত, আর বাঁদর-ছড়ির মতো লাঠি দুলত হাওয়ায়। আহা! অমন গাছটা কাটা হচ্ছে কেন? শঙ্করী হুকুম দিল, দেখ তো, দেখ তো মোতির মা, গাছ কাটছে কারা! বারণ কর। বল, আমি বলেছি।

মোতির মা ফিরে এসে বললে, হাবিলদার-মামা হুকুম দেছে। কাঠুরে বুললে, তিন-পো কাটা হয়ে গেছে—এখন না কাটলেও গাছ বাঁচবেনি।

কাঞ্চনগাছটাকে বাঁচানো গেল না।

তারপর গেল গোবর্ধন। পরের সপ্তাহে ভৈরব ঘোষ। কর্তার বিশ্বস্ত লাঠিয়াল। কেউ বিশ বছর চাকরি করেছে, কেউ পঁচিশ। শঙ্করীকে প্রণাম করে গেল যাবার আগে। তাদের জবাব হয়ে গেছে। কী অপরাধ তা বোঝা গেল না, তবে হুকুমটা জারি করেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ হাবিলদার-মামা। শঙ্করী শুনল, দেখল—ওদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এল নতুন নতুন লোক। তারা সবাই নাকি লড়াই করেছে। জঙ্গি আইনে অভ্যস্ত, নিয়ম-শৃঙ্খলায় রপ্ত। বারমহলের ব্যাপারে শঙ্করীর কথা বলবার অধিকারই নেই। শেষ পর্যন্ত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সে ডেকে পাঠালো দেওয়ানজিকে। দিলীপ এসে বললে, আপনি না ডাকলেও আসতে হত আমাকে। কদিন ধরেই আসব আসব ভাবছিলাম। এবার আমাকে ছুটি দিন ছোটমা। আমি আর পারছি না।

শঙ্করী অবাক হল না। এমনই কিছু সে আশঙ্কা করছিল। বললে, কিন্তু ছুটি তো আমি দিতে পারব না দিলীপ। আমি স্ত্রীলোক হয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, আর তুমি পুরুষমানুষ হয়ে ছুটি চাইছ?

—কী করব বলুন? হাবিলদার-মামার অত্যাচারে—

—কে হাবিলদার-মামা! তুমি এ রাজ্যের দেওয়ান—

বাধা দিয়ে দিলীপ বলে, আজ্ঞে না। আইনত নই, আপনাদের স্নেহের বন্ধন ছাড়া আমারই বা জোর কিসের? আপনাদের স্নেহে আমি আছি, কৈলাসবাবুর আদরে হাবিলদার-মামা আছেন। আমরা দুজনেই তো এক সমতলে!

—কিন্তু তার জন্যে তুমিই তো দায়ী দিলীপ। এমনটি ঘটতে পারে আশঙ্কা করে প্রথম দিনই তো আমি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম। রাজামশাইও রাজি ছিলেন। তুমিই রাজি হওনি। এখন ছুটি চাইছ কোন লজ্জায়?

এমনিভাবে তিল-তিল করে বদলে গেছে বংশবাটির রাজবাড়ির ভিতর-বাহির—বাইরের লোক তা টের পায় না; ভিতরের লোক তা টের পায় হাড়ে-হাড়ে। সংকীর্ণ সীমিত ক্ষেত্রে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে একা-হাতে সপ্তরথীর বিরুদ্ধে লড়ে যায় শঙ্করী—একটিমাত্র লক্ষ্য তার: রাজামশায়ের জীবিতাবস্থায় ঐ মন্দিরটা শেষ করা। মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে ছোটরানি যে অতর্কিতে শুনে ফেলেছিলেন

রাজামশায়ের আর্ত আকুতি : ও বড়মিঞা! তোমার লোকজনদের আর একটু হাত চালাতে বল। না হলে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা যে দেখে যেতে পারব না।

বড়মিঞা জবাবে বলত : কী করব রাজামশাই! বড় জবর দেউল ফেঁদেছেন যে। সময় কিছুটা তো লাগবেই। তবে ব্যস্ত হবেন না; খোদাতালার দয়ায় দেউল শেষ হওয়া তক তিনি আপনাকে জিন্দা রাখবেন।

না। তা রাখেননি খোদাতালা অথবা হংসেশ্বরী। অসমাপ্ত দেউলকে পিছনে ফেলে একলা-চলার পথে একদিন রওনা হতে হল নৃসিংহদেবকে। কাজ তদারকি করতে গিয়েই একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। হাহাকার করে উঠল মিস্ত্রি-মজুরের দল! ছুটে এল বংশবাটির ইতর-ভদ্র। রাজবৈদ্য কবিরাজমশাই নাড়ি দেখে বললেন, তারকব্রহ্ম নাম শোনাও। তে-রাত্তির পোয়াবে না!

পূর্ণজ্ঞান আছে কিন্তু।

দুঃসংবাদটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল কৈলাস। বললে, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

আদ্যন্ত শুনে শঙ্করী বললে, মানুষজন চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ। বাম অঙ্গ পড়ে গেছে। দক্ষিণাঙ্গ ঠিকই আছে। কথাও বলতে পারছেন। আপনাকে ডেকেছেন।

—আমাকে? শুধু আমাকে? বড়দিকে নয়?

—বড়মা কেমন করে যাবেন? বাবামশাই বললেন, তোমার ছোটমাকে ডেকে নিয়ে এস।

—দিলীপ কোথায়?

—তাঁকে বসিয়ে রেখেই তো ডাকতে এলাম।

—ঠিক আছে? পালকি পাঠিয়ে দাও। দুখানা। বড়দিও যাবে। বুঝুক না বুঝুক, চিনুক-না চিনুক এ সময় তাঁকে ফেলে আমি একা যেতে পারব না।

কৈলাস ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজার পাল্লাটা ধরে মনকে শান্ত করল শঙ্করী। না, ভেঙে পড়লে চলবে না। মাথা ঘুরে উঠলে চলবে না। স্থির করল নিজের দেহমন। মনের জোরে। তারপর ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করল বড়দির ঘরে। মোতির মা হাওয়া করছিল। অবাক হয়ে বললে, ও কী! কী হয়েছে ছোটরানিমা!

শঙ্করী জবাব দিল না। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তার বড়দিকে। ওঁর হাড়পাঁজরা বার করা বুকে মুখটা ঘষতে ঘষতে বললে, কী ভাগ্যবতী তুমি! এতবড় শোকটা পেতে হল না তোমাকে! ও বড়দি! তোমার রাজা-মশাই যে বিদায় নিচ্ছেন দুনিয়া থেকে! তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

আস্তে আস্তে মহামায়ার হাতখানা এসে পড়ল শঙ্করীর মাথায়। শঙ্করী স্পষ্ট শুনল দৈববাণী—তার বড়দির কণ্ঠস্বরে : কাঁদিস না ছুট্‌কি! এখন কাঁদতে নেই! ওঁর যাত্রাপথ কেঁদে পিছল করে দিসনি!

ধীরে ধীরে মুখটা তুলল শঙ্করী। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল তার বড়দির দিকে। বললে, কথাগুলো তুমিই বললে? বড়দি! বড়দি!

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ফেললেন মহামায়া। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ রে ছুট্‌কি! একবার তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারিস?

—তুমি? তুমি কথা কইছ! বুঝতে পারছ আমার কথা?

—পাগল আমি কোনো দিনই হইনি রে। আমি সবই দেখছি, বুঝছি! আজ তিন বছর!

বড়দিকে ঝাঁকি দিতে দিতে শঙ্করী বলে, কিন্তু কেন? কেন? কেন? এত ডেকেছি, তবু পাষাণের মতো সাড়া দাওনি কেন?

—কোন লজ্জায় দেব? কী বলব?

—আজ যা বলছ! তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ যে এক!

—না! আমি সন্তান পাইনি, কিন্তু স্বামী পেয়েছি। তুই আমার চেয়েও হতভাগী। অনেক অনেক বেশি। তাই তো লজ্জায় দাঁতে-দাঁত দিয়ে পড়ে আছি আজ তিন বছর!

*　　　　*　　　　*

জোড়া পালকি এসে থামল অসমাপ্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে। নৃসিংহদেব শুয়ে আছেন কম্বলশয্যায়—আধশোয়া হয়ে, তাঁর পিঠের দিকে কয়েকটি তাকিয়া ঠেশ দেওয়া। ধরাধরি করে সকলে বড়রানিমাকে নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। বিছানা পাতাই ছিল। শুইয়ে দিল তাঁকে। দিলীপ কৈলাস প্রভৃতি। তারা এখনও জানে না বড়রানিমা সুস্থমস্তিষ্কা। শঙ্করী আধো-ঘোমটা টেনে দিলীপকে বললে, সবাইকে সরে যেতে বল। ঘরে এখন কেউ থাকবে না। না, তুমিও নয়, কৈলাসও নয়।

ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বললে, হ্যাঁ, এখন ভিড় হটাও!

শঙ্করী চোখ তুলে চাইতে পারল না. কিন্তু নতনয়নে অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে দেখতে পেল বক্তার পায়ে একজোড়া জঙ্গি বুট। শঙ্করী এগিয়ে এল দ্বারের কাছে। চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে দেখল—ঘরে পাশাপাশি শুয়ে আছেন রাজা-মশাই আর তাঁর বড়রানি, আর রাজা-মশায়ের পায়ের কাছে বসে আছে কাশীশ্বরী। এবার সে কৈলাসকে বললে, বৌমাকেও নিয়ে যাও।

কাশীশ্বরী অবাধ্য হল না। উঠে এল। পালকি চড়ে ফিরে গেল। রইলেন ওঁরা তিনজন। দুজনে ঘরের ভিতর ; শঙ্করী চৌকাঠের বাইরে। এ তিন বছরে সে রাজা-মশায়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করতে আসেনি।

—বড়বৌ!

আশ্চর্য! বড়রানিমা নয়! বড়বৌ! সন্ন্যাসী নৃসিংহদেব ডাকছেন।

বড়রানিমা বললেন, তোমার চোখে জল কেন রাজা-মহাশয়? এমন আনন্দের দিনে কাঁদছ কেন?

বজ্রাহত হয়ে গেলেন রাজা-মহাশয়। বললেন, তুমি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ?

চোখ দুটি একবার নিমীলিত করলেন বড়রানিমা। ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ!

ম্লান হাসলেন রাজা-মহাশয়। ডান হাত দিয়ে চোখটা মুছে বললেন, না! তাহলে আর কাঁদব না। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারছিলাম না বলেই চোখে জল আসছিল।

মহামায়া বললেন, আমার কাছে তো তুমি অপরাধ করনি কোনো। কিসের ক্ষমা?

রাজা-মহাশয় বললেন, তবে ওকে ডাক। আমার ডাকে তো আসবে না। হ্যাঁ, অপরাধটা ওর কাছেই করেছি। ক্ষমাও ওর কাছেই চাইতে হবে। কিন্তু সে তো অভিমান করে সরে থাকল, এ সময়েও এল না!

শঙ্করী চৌকাঠের পাল্লা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। না, কাঁদবে না সে; কিছুতেই কাঁদবে না।

মহামায়া বললেন, ভুল বললে রাজা-মশাই। আমি তো ডাকব না ওকে। ঐ তো দোরের কাছে ও দাঁড়িয়ে আছে। তুমি ওকে ডাক।

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরালেন। এতক্ষণে দেখতে পেলেন ওকে। পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, ছোটবৌ! ভেতরে এস। এখনো রাগ করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে? আমি যে আজ বিদায় নিচ্ছি।

শঙ্করী ছুটে এগিয়ে এল।

কী করবে সে? জড়িয়ে ধরবে স্বামীকে? যে স্বামী কোনোদিন ওকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধেননি? লুটিয়ে দেবে মাথাটা ওঁর যুগ্মচরণে—যে স্বামী ওর প্রণাম নেননি কোনো দিন! না, স্পর্শ করল না তাঁকে। বরং জড়িয়ে ধরল বড়দিকে। ডুকরে কেঁদে উঠল।

রাজা-মশাই বললেন, তোমার কাছে আমার অপরাধের সীমা-পরিসীমা নেই, ছোটবৌ। তবু এই শেষ সময়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে তুমি মুক্তি দাও। তোমার মার্জনা না পেলে—

অবশ বাঁ হাতটা উঠল না। একটা হাতে যুক্তকর হবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

মুখ তুলল শঙ্করী। বলল, অমন করে বলবেন না। আমার কোনো অভিমান নেই।

—আহ্। বাঁচালে তুমি। আমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

শঙ্করী উঠে বসে। ধীরে ধীরে দু'হাতে দুজনের কপালে হাত বুলোতে থাকে। দুই মৃত্যুপথযাত্রী। রাজামশাই আবার বললেন, আঃ! আজ বড় তৃপ্তি পেলাম। বুকের মধ্যে পাষাণ জমেছিল। আমার সময়

কম। তোমরা দুজনেই আছ। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। আমি তো চললাম। আমার অবর্তমানে মন্দিরটা যেন শেষ হয়। ছোটবৌ, সেদিন তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ নেবে সে দায়িত্ব? আমি সজ্ঞানে আছি, বুদ্ধিভ্রংশ আমার হয়নি। দক্ষিণহস্ত এখনো সবল। বল.....সব কিছু তোমাকে লিখে দিয়ে যাব? নেবে? নেবে এ ভার?

শঙ্করী পাষাণ। বড়দি এবার ডাকলেন, ছুট্‌কি! ওঁর কথার জবাব দে।

শঙ্করী বললে, তার আগে একটা কথা বলুন। কেন আপনি আমার প্রণাম নেননি এতকাল? কেন সেদিন....সংকোচে থেমে পড়ে।

নৃসিংহদেব বলেন, ঠিক কথা। সে কৈফিয়তটা আমার দেওয়া বাকি। ভেবেছিলাম সে কথা প্রকাশ করব না। আমি ভিন্ন তা আজ আর কেউ জানে না। কিন্তু—ঠিকই বলেছ তুমি—সে কথা স্বীকার না করে গেলে আমার ব্যবহারের অনেক কার্য-কারণ সম্পর্ক তুমি বুঝবে না। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে গেলাম ছোটবৌ, তোমাকেও আমি ভালোবেসেছিলাম ; ঠিক বড়বৌয়ের মতোই। কিন্তু স্বয়ম্ভরা মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন ঘটনাচক্রে জানতে পারি—বিস্তারিত তুমি দিলীপের কাছে শুনে নিও—যে, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা। যাকে তুমি পিতা বলে জানতে সে তোমার পালকপিতা মাত্র। সে তোমাকে শৈশবে অপহরণ করেছিল—না, সে ডাকাত নয়, সে যে ডাকাতদলে ছিল সেই ডাকাতদলের হাত থেকেই সে তোমাকে নিয়ে পালায়। সে পূর্বজীবনে ডাকাতি করত ; কিন্তু তোমাকে নিয়ে ডাকাতদলের কাছ থেকে পালিয়ে আসে। দলত্যাগীকে শাস্তি দিতেই সে রাত্রে ডাকাতেরা তোমাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল।

শঙ্করী বললে, আমি শূদ্রাণী নই? আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা?

—হ্যাঁ। ছোটবৌ, আর সে জন্যই কোনোদিন তোমার গাত্র স্পর্শ করিনি। তোমার প্রণাম নিইনি। স্বজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্ম নষ্ট করেছি একথা জানাজানি হলে আমাকে জাতিচ্যুত করা হত। আমি সবংশে পতিত হয়ে যেতাম।

শঙ্করী কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। জবাব দিলেন মহামায়া। বললেন, ছি ছি ছি! রাজা-মশাই, তুমি এতবড় পণ্ডিত হয়ে এমন সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারনি! আমাকে বলনি কেন? ও বামুনের মেয়ে তাতে কী হল? অগ্নিসাক্ষী করে যেদিন তোমায় বিয়ে করল সেদিন থেকেই ও যে শূদ্রাণী—শূদ্রের বউ। ছুট্‌কি, পেন্নাম কর্ ওঁকে। আমি বলছি। আমার হুকুম! কর্।

রাজা-মহাশয় বললেন, ঠিকই বলেছ তুমি। আমার সংস্কারটাই বড় হল! ছি ছি ছি! কী ভ্রান্তি!

শঙ্করী লুটিয়ে পড়ল রাজা-মহাশয়ের চরণে। ঘষতে থাকে তার মুখটা।

রাজা-মশাই বাধা দিলেন না। অনেকক্ষণ পর বললেন, ছোটবৌ, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে। আমার দানপত্র গ্রহণ করবে তুমি? তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা তো আমি দিয়েছি!

অশ্রুআর্দ্র মুখখানা তুলে শঙ্করী বললে, হ্যাঁ, এতদিনে তুমি স্ত্রীর মর্যাদা আমাকে দিয়েছ, কিন্তু আমার প্রেমের মর্যাদা তো দাওনি!

—প্রেমের মর্যাদা! তা আমি কেমন করে দেব ছোটবৌ? সে-হাটে আমি যে আজ দেউলে।

—না। আমি যা চাইব, বল তা দেবে?

রাজা-মহাশয় বললেন, দেব শঙ্করী। জীবনভর তোমাকে শুধু বঞ্চনাই করেছি। আজ যা চাইবে তাই দেব, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়। বল, কী চাও তুমি এই ফকির-রাজার কাছে?

—তুমি সত্যবদ্ধ কিন্তু!

—হ্যাঁ। আজ আনন্দের দিনে তোমাকে কিছুই অদেয় নেই আমার।

—তবে অনুমতি দাও, আমি সহমরণে যাব।

রাজা-মশাই বজ্রাহত।

আর্তনাদ করে উঠলেন মহামায়া : ছুট্‌কি!!

নবদ্বীপে গঙ্গাতীরের পর্ণকুটীরেও সে সংবাদ এসে পৌঁছলো। সবকিছু ভুল হয়ে গেল শঙ্করদেবের। তাঁর সাধনার কথা, তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। চমকে উঠলেন তিনি : ঠিক শুনেছ তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঁশবেড়ের রাজা-মহাশয়ের দেহান্ত হয়েছে। দুই রানিমা সহমরণে যাচ্ছেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব : জীবনকৃষ্ণ! তুমি এক্ষুনি দ্রুতগামী ছিপনৌকার ব্যবস্থা কর, আমি যাব।

শিষ্য জীবনকৃষ্ণ চমকিত হয়ে ওঠে : কী বলছেন ঠাকুরমশাই? আগামীকাল না আপনার বিচারসভা? আপনি গিয়ে কী করবেন?

—সে-সব পরে হবে জীবন, তুমি নৌকোর ব্যবস্থা কর। আমাকে এখনই যেতে হবে বাঁশবেড়িয়ায়। যেমন করেই হোক, এ সর্বনাশকে ঠেকাতে হবে।

জীবনকৃষ্ণ তার শিক্ষাগুরুকে চেনে। এখন কিছুতেই ওঁকে রোধ করা যাবে না। উনি যাবেনই। আজ বৎসর দুয়েক উনি এসেছেন নবদ্বীপধামে, একবারও বাঁশবেড়ে যাবার নাম করেননি। রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেবের অনুগ্রহভাজন ছিলেন তিনি, জীবনকৃষ্ণ জানে সে-কথা। এখন তাঁর মৃত্যুসংবাদে স্বদেশে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছাটা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু আগামীকালই যে বিচারসভার আয়োজন হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি শঙ্করদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করে যান তাহলে শত্রু হাসবে না?

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জীবনকৃষ্ণকে নৌকোর বন্দোবস্ত করতে গোঁসাইপাড়া ঘাটে ছুটতে হল।

শঙ্করদেব আজ প্রায় দু বছর আছেন নবদ্বীপধামে। একটি টোল খুলে বসেছেন। বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাই ছিল না তাঁর। ফিরতে হয়েছে তাঁর সেই বয়স্যের নির্দেশে। রাজা রামমোহনের ইচ্ছানুসারে।

রাজা রামমোহনের সঙ্গে তিনি প্রায় বছর দুই ছিলেন কাশীধামে। যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজারামের মাথায় তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রচেষ্টাই প্রখর। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, নানা তত্ত্ব নোট করেন,—হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে মহানির্বাণতন্ত্রে পাঠ নেন। হরিহরানন্দ ছিলেন বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, মহানির্বাণতন্ত্রমতে ব্রহ্মোপাসনা করতেন। রামমোহনের চেয়ে বছর দশেকের বড়। বছর দুই কাশীবাসের পর রামমোহন একদিন বললেন, এবার তো আমি দেশে ফিরব, কাব্যতীর্থ, তুমি কী করবে?

—দেশে ফিরবেন? কেন? এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেল?

রামমোহন বলেছিলেন, কাজ তো শুরুই হয়নি বয়স্য, শেষ হবে কী? তা নয়, সাংসারিক প্রয়োজন। আমি তো তোমার মতো বাউণ্ডুলে নই। পিতৃদেব বর্ধমানের মোকামে অসুস্থ, মরণাপন্ন। তাছাড়া আমার এক স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। কলকাতাতেই ফিরে যাব। তাই জানতে চাইছি, তুমি এখন কী করবে? কাশীতেই থেকে যাবে, না ফিরবে?

শঙ্করদেব প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কী পরামর্শ দেন?

হেসে ওঠেন রাজারাম : কী জ্বালা। তোমার জীবনের লক্ষ্য কী তাই তো আমি জানি না, পরামর্শ আবার কী দেব? তোমার সম্বন্ধে শুধু এটুকুই জেনেছি যে, তুমি হৃদয়বান যদিচ পাষণ্ড, পণ্ডিত যদিচ মূর্খ। এক্ষেত্রে আমি কী বলব?

শঙ্করদেবও হেসে ফেলেছিলেন। বলেন, আমার সম্বন্ধে ঐটুকুই তথ্য শুধু জেনেছেন?

—না। আরও কিছুটা জানি। তুমি একটি কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েছ। এখন নিউটনের ফার্স্ট-ল অনুসারে তুমি ক্রমশ একমুখে ছুটতে থাকবে, আনলেস্ ইম্প্রেস্‌ড্ বাই অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স....

ঐখানেই মুশকিল! ওঁর অর্ধেক কথার অর্থই বোঝা যায় না। শঙ্করদেব বলেন, আমাকে আপনার কোনো কাজের দায়িত্ব দিন না।

—খুব ভাল প্রস্তাব। আমার অনেক, অনেক, অনেক কাজ আছে। বল কোনটা তোমার পছন্দ?

শঙ্করদেব বলেন, তাহলে এবার আমাকেই প্রশ্ন করতে হয়, আপনার জীবনের লক্ষ্য কী?

রামমোহন তৎক্ষণাৎ বলেন, হলকর্ষণ।

—হলকর্ষণ? মানে, চাষবাস?

—না বন্ধু। কৃষিকর্মের একটি মাত্র পর্যায় আমার। বীজ বপন, সেচ, ফসল-কাটা, নবান্ন ওসব আমার কাজ নয়। আমি ডিভিশন অব লেবারে বিশ্বাসী। আমি শুধু হলকর্ষণ করতে চাই।

স্বীকার করলেন শঙ্করদেব : বুঝলাম না।

রামমোহন গম্ভীর হলেন। বলেন, বেশ, বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। দেখ, বুঝতে পার কিনা। আমি শ্রমবিন্যাসে বিশ্বাসী। একজন হলকর্ষণ করবে—নির্মমহস্তে জমিকে কর্ষণ করবে; দ্বিতীয়জন এসে বীজ বপন করবে; তৃতীয়জন তার পরিচর্যা করবে এবং চতুর্থজন সেই উৎপন্ন ফসলে নবান্ন করবে।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ-সবই তো আলঙ্কারিক অর্থে। মূল বক্তব্যটা কী?

—ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করে দেখ। কৃষ্ণ ছিলেন নির্মম—

বাধা দিয়ে রাধামাধবের উপাসক বলেন, প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণ নির্মম?

—আমি বেন্দাবনের শ্রীরাধার নাগর কেষ্টোঠাকুরের কথা বলছি না, বেদব্যাসের কল্পনায় চক্রপাণি পার্থসারথির কথা বলছি। তিনি নিষ্ঠুর নির্মম—রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে! সমস্ত পাপ, সমস্ত মালিন্য ধুইয়ে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়রক্তস্রোতে। সেই কর্ষিত উর্বর ভূখণ্ডে করুণার বীজবপন করতে এলেন শাক্যসিংহ, হাজার বছর পরে। শুধু বীজই বপন করলেন, সেচের কাজ, পরিচর্যার কাজ করলেন পরবর্তী যুগের মানুষ—অশোক, হর্ষবর্ধন, গুপ্তরাজারা। আর তার ফসল তুলে নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করল আর এক জাতের মানুষ কাবুল-কান্দাহার থেকে যবদ্বীপ-ওঙ্কারধাম, সিংহল থেকে চীন-জাপান! হাজার বছর ধরে!

এমন তন্ময় হয়ে বলছিলেন যে, শঙ্করদেব পুনরুক্তি করতে পারলেন না : বুঝলাম না। রামমোহন বলেই চলেন, ইতিহাসের রথচক্র কিন্তু থেমে যায়নি। আবার পুঞ্জীভূত হল ক্লেদ-গ্লানি-ব্যভিচার—ধর্মের নামে, সমাজনীতির নামে—এল বামাচার, চীনাচার, বজ্রযান। অমনি আবির্ভূত হলেন আবার এক নতুন যুগের বলরাম—হলকর্ষণ করতে। নির্মম, নিষ্ঠুর! এবারও করুণা নয়, ভক্তিযোগ নয়, ক্ষুরধার জ্ঞানযোগের হলের ফলায় কর্ষণ করলেন ভারত ভূখণ্ড। আমি বলছি, অদ্বৈত বেদান্তাচার্য শঙ্করের কথা। জ্ঞানমার্গের পথে ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তিনি নূতন করে তৈরি করলেন জমি। বীজ বপন করলেন না কিন্তু। করুণা, ভক্তি, প্রেম, দাস্য, সখ্য, কোনও রকম কোমল হৃদয়বৃত্তির বীজই নয়। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর পরবর্তী যুগেই আসবেন বীজ বপনকারীরা—রামানুজ, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য। আবার পাঁচ-সাতশো বছর ধরে নবান্ন উৎসব ছিল অব্যাহত। তারপর আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ। কোম্পানি আবার বিশ বছর ধরে ভারতবর্ষকে শোষণ করবার অধিকার পেয়েছে, নীলকর সাহেবরা দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছে। এ নিয়ে দেশের কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। সমাজপতিরা কূপমণ্ডুক, অশিক্ষিত, ঘোর স্বার্থপর, স্ত্রীজাতির নির্যাতন উঠেছে চরমে। এদিকে বাবু-কালচার উঠছে মাথা চাড়া দিয়ে। কী অপরিসীম অবক্ষয়! দেখতে পাচ্ছ না কাব্যতীর্থ? তোমার কি মনে হয় না, চক্রপাণির নূতন করে আবির্ভূত হবার মহালগ্ন ঘনিয়ে এসেছে?

শঙ্করদেব ভয়ে ভয়ে বললেন, কল্কি অবতার?

নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে ওঠে রাজা রামমোহনের। বলেন, না! কল্কি অবতার আছে কল্পনায়। আমি কল্পনাবিলাসী নই কাব্যতীর্থ। কল্কি নয়, আমি...আমি রাজা রামমোহন রায়। এ কোনো আত্মশ্লাঘা নয়, কাব্যতীর্থ। আমি বলছি, তুমি দেখে নিও, আমি নিজে নির্মম হাতে দেশমাতৃকার হৃদয়টা ফালাফালা করে দিয়ে যাব। তার বেশি আর কিছু পারব না। আর কিছু করার আমার সময়ও নেই। আমি জানি, আমি দীর্ঘজীবী হব না। তাই বীজ বপনের কথা আমি চিন্তাও করি না। সেটা করবে উত্তরকাল। তারা আসছে, তারা আসবে।

শঙ্করদেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বক্তার দার্ঢ্যে, আত্মপ্রত্যয়ে। তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বললেন, কী করতে চান আপনি?

—ঐ যে বললাম—অনেক অনেক অনেক কিছু! বাংলাভাষায় ব্যাকরণ লিখব, বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য রচনা করবো, ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা করব, সতীদাহ বন্ধ করব, বহুবিবাহ রোধ করব,

বেন্থাম-বেকন-রিকার্ডো-ভলতেয়ার-রুসোর জ্ঞানজাহ্নবীকে এই মৃত্যু-আকীর্ণ সগররাজ্যে নিয়ে আসব ভগীরথের মতো।

আবার বয়স্যের কথাবার্তা ওঁর জ্ঞানরাজ্যসীমার বাইরে চলে যেতে চায়, তাই শঙ্করদেব বলেন, এ যুদ্ধে কে আপনার বন্ধু, কে শত্রু?

—সবাই বন্ধু, সবাই শত্রু। টুলোপণ্ডিতদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করব তখন কেরী-মার্শম্যান-হাইড-হেয়ার আমার বন্ধু; আবার যখন পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে লড়াই করব তখন ঐ বিদ্যালঙ্কার-তর্কালঙ্কার-মহামহোপাধ্যায়রা আমার বন্ধু। লড়াই কি একটা—যে শত্রু-মিত্র বেছে নিতে পারি?

শঙ্করদেব বলেছিলেন, বেশ, আপনি বলুন এর মধ্যে কোন কাজে আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি অসাধারণ প্রতিভার মানুষ, কোনো একটি মাত্র ক্ষেত্রেই আমি আপনার সেবা করতে পারি, আপনার বহুমুখী প্রয়াসে।

—বুঝেছি। তুমি তাহলে বরং সতীদাহ-নিবারণের কাজটার দায়িত্ব নাও। কিন্তু তাহলে তোমাকে আমার সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরতে হবে। কাশী ও-কাজের ক্ষেত্র নয়—

—কেন?

—প্রথমত, কাশীধামে ভূমিকম্প হয় না। দ্বিতীয়ত লড়াইটা হবে কলকাতায়, রাজধানীতে। ফলে বিপক্ষের ঘাঁটি হবে নবদ্বীপ। তুমি আমার সঙ্গে চল। নবদ্বীপে টোল খুলে বস। নবদ্বীপ-সমাজকে যদি স্বমতে আনতে পার তাহলেই আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে—

—আপনি কি কলকাতায় থাকবেন? জোড়াসাঁকোর মোকামে?

—বলতে পারছি না। সম্প্রতি সিভিলিয়ান জন ডিগ্‌বির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি সম্ভবত কোম্পানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করব। তাহলে আমাকে যেতে হবে ঢাকায়—ঢাকার কালেক্টার টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান হিসাবে চাকুরিতে যোগ দেব।

প্রশ্নটা না করে পারেননি; আপনার তো অর্থের অভাব নেই, কোম্পানির অধীনে—

বাধা দিয়ে রামমোহন বলেছিলেন, সে তত্ত্বটা বোঝার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তোমার নেই। আগেই বলেছি, তুমি পণ্ডিত হলেও মূর্খ! বাউণ্ডুলে বামুন, অকৃতদার। অথচ আমার দুই স্ত্রী বর্তমান।

রামমোহনের সঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বঙ্গদেশে। নবদ্বীপে টোল খুলে বসেছেন। ছাত্র জুটেছে বেশ কয়েকটি। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তার মধ্যে প্রধান। এখানকার পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে সহমরণ প্রথা নিয়ে বহুবার আলোচনাও হয়েছে, খণ্ড-খণ্ড ভাবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল, একটি পণ্ডিতি মজলিসে এ নিয়ে শঙ্করদেব রামমোহনের বক্তব্য পেশ করবেন। আয়োজন সব সম্পূর্ণ। এমন সময়েই হঠাৎ সংবাদ এল ওঁর স্বগ্রামে ইন্দ্রপাত হয়ে গিয়েছে। সেটা খবর নয়, আসল খবর—রাজা-মশায়ের সঙ্গে তাঁর দুই স্ত্রীই সহমরণে যাচ্ছেন।

শঙ্করদেবের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। তাত্ত্বিক বিচার নয়, এখন সম্মুখ সংগ্রাম। যেমন করে হোক, রুখতে হবে এই সর্বনাশ। সহস্রাব্দির ঐ বিষপ্রথা—সহমরণের বিরুদ্ধে যে সতী প্রথম মাথা তুলে দাঁড়াবে সে কে? এতদিন মনশ্চক্ষে তার চিত্রই দেখতেন শঙ্করদেব। আজ যেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঐ কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করবে সেই মেয়েটিই—যার কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়ে— রাজা রামমোহনের মতে—শঙ্করদেব নাকি ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েন!

কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো বার্তাটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রটে গেল। বংশবাটির রাজা-মশাই মৃত্যুশয্যায়—তাঁর দুই স্ত্রীই সংকল্প করেছেন সহমরণে যাবেন। বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরস্বতী। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে ফিরে যাচ্ছেন। কাতারে কাতারে মানুষজন আসতে থাকে বংশবাটিতে—গোযানে, নৌকোয়, পদব্রজে। গঙ্গার ঘাটে রীতিমত মেলা বসে গিয়েছে।

রাজা-মহাশয় মারা গেলেন তার পরদিন সকালে।

বড়রানিমা শুয়ে আছেন তাঁর পাশেই। উত্থানশক্তিরহিতা। এতক্ষণে জ্ঞানহীনা। তাঁকে ধরাধরি করে

শুইয়ে দেওয়া হবে পাশের চিতায়। শবদাহ হবে সন্ধ্যায়—সূর্যাস্ত মুহূর্তে। পঞ্জিকা দেখে অগ্নিসংযোগ মুহূর্তটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন ভট্টশালী।

অন্দর-মহলে রানি শঙ্করীর কোনো ইচ্ছাকেই একপক্ষ ভালো মনে মেনে নিতে পারত না—নবাগতের দল। আজ তাঁর এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু তারাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিল। হ্যাঁ, বংশবাটির রানিমায়ের উপযুক্ত কথা। কাশীশ্বরী তার কিঙ্করীদের নিয়ে সাজাতে বসল শাশুড়িকে। মনের মতো করে সাজালো তারা—একদিন বড়দি যেমন সাজিয়েছিলেন তাকে। শুধু সিঁথি নয়, সমস্ত ব্রহ্মতালুটা রক্তিম হয়ে উঠেছে সিন্দুর-লেপনে। অঙ্গে উঠেছে পট্টবাস—রক্তচীনাংশুক। কঞ্চুলিকা নেই—একবস্ত্রা হয়ে চিতায় উঠতে হয়। শাড়ির আঁচলটাই আবদ্ধ করেছে তাঁর 'স্তোকনম্রা' হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। অলক্তকরাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে শঙ্খধবল দুটি রাতুল-চরণ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সারিবদ্ধ এয়োস্ত্রী তাঁর পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে যাচ্ছে। সেই আবির সংগ্রহ করে রাখছে কৌটোয়। যে সে সতী নয়, স্বয়ং রানি-মা। অনিন্দ্যসুন্দরী লক্ষ্মিঠাকরুন।

মোতির-মা আসেনি সাজাতে। কোথায় লুকিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সে উঠে এল কোথা থেকে। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। শঙ্করীর কানে কানে কী যেন বলল। চমকে উঠল শঙ্করী : ঠিক বলছিস? কোথায় তিনি?

—ডেকে আনব?

—ডাক। এঁদের সরে যেতে বল আগে।

মোতির-মা ভিড় হটালো। তারপর ডেকে নিয়ে এল তাঁকে। দশ বছরে খুব কিছু একটা পরিবর্তন হয়নি তাঁর। কৃশকায় হয়ে গেছেন একটু। তবু তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না। উঠে এল শঙ্করী। প্রণাম করল। একটি আসন বিছিয়ে দিয়ে বলল, কবে এলেন?

শঙ্করদেব বললেন, এইমাত্র এসেছি রানিমা। কাছেই ছিলাম। নবদ্বীপে। বছরকয়েক হল সেখানেই আছি। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি।

—খুব ভাল করেছেন। আমার শেষ ইচ্ছাও পূরণ হল। অনুষ্ঠান কিছু করব না। শুধু বীজমন্ত্রটা কানে দিয়ে যান, যা জপ করতে করতে দাহনজ্বালাকেও অস্বীকার করতে পারি—

কী ভাবে কথাটা পাড়বেন স্থির করে উঠতে পারেন না শঙ্করদেব। বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। রাজা রামমোহনের সংস্পর্শে এসে তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছেন—স্বামীর চিতায় উঠে আত্মদাহনে সাধ্বী স্ত্রী স্বর্গে যায় না। ওটা একটা নিষ্ঠুর লোকাচার! ওটা শাস্ত্রীয় বিধান নয়। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন রামমোহনের বয়স্যরূপে—অনেক কিছু শিখেছেন, অনেক কিছু বুঝেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছে। কিন্তু কেন এত দেরি করলেন এখানে এসে পৌঁছতে? রানিমা যে ঘোষণা করে বসে আছেন, সহমরণে যাবেন। দেশ-দেশান্তর থেকে লোক যে ভিড় করে দেখতে আসছে। এ লোকলজ্জাকে কী করে প্রতিহত করবেন?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শঙ্করী বুঝি আজ প্রগল্ভা হয়ে গেছে। সে যেন স্বপ্নাবেশে বলে চলে, দেখে এসেছেন রাজা-মশাইকে? ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছে ওরা। আজ আর ওঁর কপালে ত্রিপুন্ড্রক নেই—আবার উঠেছে শ্বেতচন্দনের মুক্তাবিন্দু—সেই সেদিন যেমন ছিল। গলায় আজ আর নেই রুদ্রাক্ষমালা—ওরা পরিয়ে দিয়েছে গোড়ে মালা, সেই সেদিনের মতো। অগ্নিসাক্ষী করে সেদিন তিনি আমাকে বরণ করেছিলেন আর আজও সেই অগ্নিকে সাক্ষী করেই—

—রানিমা!

সংবিৎ ফিরে পায় শঙ্করী। বলে, বলুন!

—সহমরণে আপনার যাওয়া হবে না!

ভ্রূকুঞ্চিত হয় রানিমার। তবু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর বলে, কী বললেন আপনি!

—এ ভুল! এ নিদারুণ ভুল! এ কোনো শাস্ত্রীয় বিধান নয়। সহমরণপ্রথা একটা নিদারুণ প্রহসন। আমি জানি, আমি জেনেছি। এক মহাপণ্ডিত—রাজা রামমোহন রায়—আমাকে স্থিরসিদ্ধান্তে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

শঙ্করী বললে, আপনি উন্মাদ।

আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। বললেন, বিশ্বাস করুন রানিমা। এ সত্য আমি প্রণিধান করেছি—এ ধ্রুব সত্য!

শঙ্করীও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়! বলে, এবার আসুন আপনি।

শঙ্করদেব বললেন, রানি শঙ্করী! এ তোমার গুরুর আদেশ। সহমরণে যেতে পারবে না তুমি। তুমি গুরুত্বে বরণ করতে চেয়েছিলে আমাকে। আজ আমি তোমাকে দীক্ষাদানে স্বীকৃত। এ তোমার গুরুদক্ষিণা!

স্থিরদৃষ্টিতে শঙ্করী দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর শোনা গেল তার অস্ফুট আর্তি : কেন এলেন আপনি? একটা সুখস্মৃতি পুড়িয়ে খাক করে দিতে? এবার আপনি যান। বীজমন্ত্র দিতে হবে না আপনাকে। আমি আপনার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেব না। আমি আপনাকে গুরু বলে মানি না। যান এবার।

নতমস্তকে বেরিয়ে এলেন কাব্যতীর্থ।

রানিমা তাঁর সঙ্কল্পে অটল। এই তাঁর শেষ ইচ্ছা।

কিন্তু—

নিষ্ঠুর বিধাতা সারাজীবন তাঁর কোন ইচ্ছাটা পূরণ করেছেন?

এবারও বাধ সাধলেন তিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে।

শেষ ইচ্ছা পূরণ হল না ছোটরানিমার।

হঠাৎ একটা অসতর্ক কথোপকথন কর্ণগোচর হল তাঁর। কাশীশ্বরীর সঙ্গে তার মাতুল হাবিলদার-মামার একটি জনান্তিক আলাপচারী। আপাদমস্তক শিউরে উঠল শঙ্করীদেবীর।

কথাটা আগেও কানে গিয়েছিল—কানাঘুষায়; মোতির মায়ের, দিলীপের, মোতির কথায়—আভাসে-ইঙ্গিতে। বিশ্বাস হয়নি, বিশ্বাস হবার কথাও যে নয়। এখন স্বকর্ণে শুনে বুঝলেন—মিথ্যা গুজব এটা নয়। অপরিসীম মনোবেদনায় পাথর হয়ে গেলেন শঙ্করী। মনে হল এত বড় আঘাত তিনি জীবনে পাননি—না, স্বামী তাঁকে কাশী প্রেরণ করায় নয়, তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণে নয়, কাব্যতীর্থের মন্ত্রদীক্ষায় অস্বীকৃতিতে নয়, এমনকি তাঁর বিচিত্র গুরুদক্ষিণা প্রস্তাবেও নয়।

অদ্ভুত ওঁর মনোবল। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। মুহূর্তমধ্যে সিদ্ধান্তে এলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন মোতির মাকে, দিলীপকে ডেকে নিয়ে আয়। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। যদি তাকে খুঁজে না পাস, তবে কাব্যতীর্থকে। বলবি, খুব জরুরি দরকার। ভীষণ জরুরি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল দিলীপ : ছোট মা! ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে এস। কথা আছে! অত্যন্ত গোপন। অত্যন্ত জরুরি।

ওকে টেনে নিয়ে গেলেন শয়নকক্ষে। পুরললনার ভিড় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। সবাই সরে দাঁড়ালো, ঘোমটা টানল দেওয়ানজিকে আসতে দেখে। রুদ্ধদ্বারে পিঠ দিয়ে শঙ্করী বললেন, দিলীপ! আমি সতী হব না। সহমরণে যাব না।

বজ্রাহত হয়ে গেল দিলীপ দত্ত। কী বলবে ভেবে পেল না।

—আমি নিজে কানে শুনেছি—ঐ হাবিলদার-মামা বৌমাকে বলছিল, 'তিনচিতার আগুন নিভলেই মিস্ত্রিদের বিদায় করে দেব, দ্যাখ্ না। কাশিমবাজারের রাজা পাথর খুঁজছে। লাখ টাকা দামের পাথর দেড় লাখে ঝেড়ে দেব!' দিলীপ, আমি এখন মরতে পারব না, বাবা।

—কিন্তু ছোটমা, কেমন করে আপনাকে বাঁচাব? দশ-বিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে যে!

—লোকলজ্জাকে পরোয়া করলে চলবে না।

—লোকলজ্জা নয় ছোট-মা! আপনি যে নিজ-মুখে ঘোষণা করেছেন। ওরা যে জোর-জবরদস্তি করবে! শেষে একটা মারপিট দাঙ্গা বেধে যাবে!

—তোমার জমিদারিতে লেঠেল নেই?

—আছে। কিন্তু লেঠেলদের সর্দার হাবিলদার-মামার লোক। আমার হুকুম তারা মানবে কেন?

শঙ্করী এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, কোনো বিশ্বস্ত ভালো ঘোড়সোয়ার তোমার জানা আছে?

—আমি নিজেই ভালো ঘোড়ায় চড়তে জানি। কেন?

—তবে এই মুহূর্তে তুমি রওনা হয়ে যাও। আমার এ সিদ্ধান্তের কথা কাউকে কিছু বোলো না। সোজা চলে যাও হুগলিতে। কালেক্টার সাহেবকে আমার বিপদের কথা বলবে। বলবে, আমাকে জোর করে ওরা সহমরণে পাঠাচ্ছে—আমার সম্মতি ব্যতিরেকে। তিনি যেন ফৌজ পাঠিয়ে দেন সন্ধ্যার আগেই।

অত্যন্ত দ্রুত হাতে মায়ের পদধূলি নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দিলীপ। শঙ্করী এসে বসলেন পদ্মাসনে। আবার সবাই প্রণাম করতে থাকে সার বেঁধে। যে-সে সতী নয়! স্বয়ং রানিমা। লক্ষ্মিঠাকরুণটি!

বিকেল গড়িয়ে গেল। দিলীপের কোনো খবর নেই। হুগলি থেকে থানাদার এসে পৌঁছায়নি। মোতির-মা ফিরে এসে বলেছে—কাব্যতীর্থমশাই সহমরণ দেখবার জন্য অপেক্ষা করেননি। যে নৌকায় নবদ্বীপ থেকে এসেছিলেন সেই নৌকাতেই ফিরে গেছেন।

চতুর্দোলা নিয়ে অপরাহ্ণে হাবিলদার-মামা ফৌজী ভঙ্গিতে প্রবেশ করল অন্দর-মহলে। সেপাইরা এতদিন এমন তালে-তালে হাঁটত না। এখন নতুন কুচকাওয়াজ শিখেছে। লেফ্-রাট, লেফ্-রাট, লেফ্-রাট—হাল্ট! দাহিনা মোড়! স্যাল্‌লুট!

পুরললনার দল বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে জঙ্গিশাসকের কার্যক্রম।

এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে কৈলাসদেব : সময় হল। আসুন ছোটমা!

আর বিলম্ব করা যায় না। শঙ্করী দেবী উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, পালকি ফিরিয়ে নিয়ে যাও কৈলাস। আমি যাব না।

—যাব না! যাব না মানে?

—আমি সহমরণে যাব না। আমি সতী হব না।

এর চেয়ে প্রাঙ্গণের মাঝখানে বজ্রপাত হলে প্রতিক্রিয়াটা কম হত। দশ বছরের পুত্রবধূ ছুটে এসে মুখ চেপে ধরল ওঁর : অমন কথা বলতে নেই মা!

শঙ্করী জোর করে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, কৈলাস, তোমার মামাশ্বশুরকে বল তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বাইরে যেতে। এটা অন্দরমহল।

কৈলাস সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললে, আপনি কি ভয় পেয়েছেন মা?—এমন হঠাৎ ঐ অদ্ভুত সংকল্পটা করে বসলেন?

—সংকল্প এমন হঠাৎই করতে হয় বাবা। দেখনি তোমার বাবার ক্ষেত্রে? মামলার টাকায় মন্দির গড়বার সংকল্প করতে তাঁর সময় লাগেনি।

হাবিলদার-মামা এগিয়ে এল কয়েক পা। রানিমা'র সঙ্গে জীবনে সে বাক্যালাপ করেনি। যে আমলের কথা, সে-যুগে এ জাতীয় সম্পর্কে বাক্যালাপ রেওয়াজের বাইরে। তবু জঙ্গিমামা একপদ অগ্রসর হয়ে এসে বললে, বেয়ানঠাকরুন, আমরা তো আপনাকে এভাবে বাঁশবেড়ের সম্মান ধুলোয় লুটাতে দেব না।

জঙ্গিমামা উঠোনের সমতলে, শঙ্করী বারান্দার উপর। প্রাঙ্গণে তিন-চার শো মহিলা—বাঁশবেড়ের এবং নিকটবর্তী গ্রামের এয়ো-স্ত্রীই বেশি। এ ছাড়া জনাপাঁচিশ লাঠিয়াল—যাদের নিয়ে হাবিলদার-মামা বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করেছে অন্দরমহলে। আর আটজন বেহারা এসেছে কিংখাবে-মোড়া পালকিটা কাঁধে! এত লোকের সামনে বৈবাহিকের সঙ্গে কথা বলা চলে না। শঙ্করী এগিয়ে এলেন দাওয়ার প্রান্তে। এক বুক উঁচু, খাড়া পোতা। মাথার ঘোমটা একটু টেনে নিয়ে কৈলাসের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, কৈলাস, তোমার মামাশ্বশুরকে বল—আমি বাঁশবেড়ে রাজ্যের অন্নপুষ্ট কুটুম নই—আমি এ রাজ্যের রানিমা। বাঁশবেড়ের সম্মান—

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ভিড় ঠেলে ছিলে-খোলা ধনুকের মতো এগিয়ে এল দশ বছরের মেয়ে কাশীশ্বরী। নাখে নথ, মাথায় ঘোমটা, পায়ে মল। শ্বশ্রূমাতার নাকের সামনে মণিবলয়-খচিত হাতখানা

নেড়ে বললে, উনি তো ঠিকই বলছেন। আপনি আমাদের মুখ হাসাচ্ছেন। সতী হতে যদি অত ভয় তবে দিনভর অত সিঁদুর মাখলেন কেন মাথায়? এক-গাঁ লোকের পেন্নাম নিলেন কেন? ভড়ং করলেন কেন?

জানকীর আহ্বানে মাতা ধরিত্রী দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিলেন। শঙ্করীর আহ্বানে হলেন না। এক উঠোন গ্রামবাসীর সম্মুখে ঐ বালিকাবধূ এ বাড়ির ছোটরানিমায়ের এতদিনের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিল। কথা খুঁজে পেলেন না—মর্মাহতা অপমানিতা বাঁশবেড়ের ছোটরানিমা!

কৈলাসই বরং স্ত্রীকে ধমক দিয়ে ওঠে, তোমাকে নথ নাড়তে হবে না। কাকে কী বলছ?

কাশীশ্বরী ক্ষেপে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে, এক-প্রাঙ্গণ মানুষের উপস্থিতিতে যে স্বামী-সম্ভাষণ করতে নেই সে কথা মনে রইল না ওর। দৃপ্তভঙ্গিতে বললে, কাকে আবার কী বলছি? ঢঙীকে ঢঙী বলেছি, তাতে হয়েছেটা কী?

মল ঝমঝমিয়ে সে নাটকীয় প্রস্থান করে।

কৈলাস বলে, ওর কথা কানে নেবেন না মা, আসুন আপনি। পাল্‌কি এসে গেছে, সবাই প্রতীক্ষা করছে। এখন 'সতী হব না' বললে লোকে শুনবে কেন?

—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে? লোকে যদি জোর-জবরদস্তি করে তবে তোমার লেঠেলরা আছে কেন?

কৈলাস তার মামার দিকে তাকায়। তিনি আরও একপদ অগ্রসর হয়ে এসে বলেন, লেঠেলরাও যে সবাই হিঁদু, বেয়ান-ঠাকরুন। মোছলমান নয়। তারাও জানে শাস্ত্রীয় বিধান না মানলে লাঠি কোনদিকে চালাতে হয়। আসুন, আসুন, রঙ্গ করবেন না—

অম্লানবদনে লোকটা এগিয়ে আসে সিঁড়ির দিকে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয়—যেন পরমুহূর্তেই চেপে ধরবে বৈবাহিকার হাতখানা। হেঁচকা টানে টেনে নেবে বুকে। শঙ্করী এবার ভয় পেলেন! পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। পুরললনার দল সভয়ে সরে গেল। শঙ্করী চিৎকার করে উঠলেন, কৈলাস, তোমার উপস্থিতিতে ঐ লোকটা আমাকে—

কথাটা তাঁর শেষ হল না। সিঁড়ি বেয়ে হাবিলদার-মামা উঠে এল রোয়াকে। বললে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করবেন না বেয়ান-ঠাকরুন। আসুন, আসুন।

এবার সে দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওঁকে ধরতে।

শঙ্করী ছুটে পিছিয়ে গেলেন বারান্দার ও-প্রান্তে। সেখানে ছিল একটা জলচৌকি। তার উপর উঠে দাঁড়ালেন! হাবিলদার-মামা নাটকীয় ভঙ্গিতে একবার জনতার উপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। যেন দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণের পূর্বমুহূর্তে দুঃশাসন বুঝে নিতে চাইছে কুরু রাজসভার মনোভাব। না, কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। সহমরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর সদ্যবিধবা যদি ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়, তখন তার উপর দৈহিক বলপ্রয়োগে সামাজিক অনুমোদন আছে। লোকাচার বলে—তখন তার গাত্রস্পর্শ করায় পাপ নেই। এ যে শাস্ত্রীয় বিধান! তাই পৈশাচিক উল্লাসে লোকটা হাসতে হাসতে বলতে পারল—ছেনালি করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার যে মধুর সম্পর্ক তাতে আপনাকে পাঁজাকোলা করেও আমি নিয়ে যেতে পারি বেয়ান-ঠাকরুন—পালকির প্রয়োজন নেই। নেব তুলে?

আশ্চর্য! যে রানিমা ছিলেন বাঁশবেড়ের অতিশয় শ্রদ্ধেয়া মহিষী—সর্বসমক্ষে তাঁর গাত্রস্পর্শ করতে এগিয়ে আসছে পিশাচটা—অথচ কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই! জনতা রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছে। জনতা! কাব্যতীর্থ বলেছিলেন, মানুষ নাকি 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'; চণ্ডীদাসের ভাষায়, 'তাহার উপরে নাই'!

সহসা ভাবান্তর হল রানিমার। একবস্ত্রা নারী একটানে খুলে ফেললেন তাঁর অবগুণ্ঠন। চমকে উঠল হাবিলদার-মামা। জলচৌকির উপর দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন—অনবগুণ্ঠিতা জগদ্ধাত্রী! একমাথা সিঁদুর! পট্টবস্ত্র পরিহিতা! যেন সাঙ-দোলে উঠেছেন বিসর্জন-মুহূর্তে জগন্মাতা। বিসর্জন মুহূর্তে জগদ্ধাত্রীও তো একবস্ত্রা! মক্ষীচুষ যজমান বছরে বছরে খুলে নেয় তাঁর পরিধেয় বেনারসি, পরিয়ে দেয় লাল সালুর তেনা। চিৎকার করে উঠলেন শঙ্করী, খবর্দার!

থমকে গেল হাবিলদার-মামা! সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। উচ্চগ্রামে শঙ্করী ঘোষণা করলেন : শুনুন বেয়াইমশাই! আমি দিলীপকে পাঠিয়েছি হুগলির কালেক্টারের কাছে। আধঘন্টার মধ্যেই তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য এসে যাবে। আমি আপনার নাম উল্লেখ করে তাঁর কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছি আপনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইছেন। বলপ্রয়োগের চেষ্টা আপনি করতে পারেন। কিন্তু তারপর ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে আপনাকে। মনে থাকে যেন।

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাবিলদার-মামা। সে জানে, কোম্পানির শাসনে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে সতী করা যায় না। কে এক রামমোহন নাকি লড়াই শুরু করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে থানাদার জেনে যায়—সতীর সম্মতি আছে কি নেই। এখানে আসবার সময়েই অশ্বপৃষ্ঠে দিলীপ দেওয়ানকে সে বাদশাহী সড়ক ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে। তার মানে—রানিমার এটা ফাঁকা হুমকি নয়।

জলচৌকি থেকে নেমে এলেন একবস্ত্রা সীমন্তিনী। লীলায়িত ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ডান হাত, বৈবাহিকের দিকে। বললেন, আমাকে ধরতে আসছিলেন না? হিম্মৎ থাকে তবে আমার কব্জি ধরুন! এত লোক সাক্ষী রইল। স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার রেহাই পাননি, দেখি আমাদের হাবিলদার-মামা ফাঁসির দড়িতে ঝোলেন কি না!

মাথা নিচু করে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল হাবিলদার-মামা।

পাইক-বরকন্দাজদের দিকে ফিরে শঙ্করী বললেন, তোমাদের সর্দার কে?

একজন দশাসই জোয়ান এগিয়ে এসে সেলাম করল : হামি রানিমা। মহাদেও পরসাদ।

—মহাদেব! তুমি বংশবাটি রাজার নিমক খেয়েছ। আমি রানিমা। তোমাকে হুকুম করছি। চলে যাও এখান থেকে। এটা অন্দরমহল। তোমাদের রাজা-মহাশয়ের মহাশব তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছে। যাও, দাহকার্য সম্পন্ন হলে আমাকে এসে খবর দিয়ে যেও।

মস্ত সেলাম করে মহাদেও সর্দার বললে, যো হুকুম রানিমা।

এবার আর 'লেফ্‌-রাট' নয়, সার দিয়ে চলে গেল ওরা—হাবিলদার-মামার হুকুমের অপেক্ষা না করেই।

বংশবাটির রাজপরিবারের ইতিহাসে দেখছি এরপর এক বিশ্রী মামলায় বিষিয়ে উঠল রাজবাড়ি। দীর্ঘ চব্বিশ বছর—১৮০২ থেকে ১৮২৬—বৃদ্ধা বিধবার শুরু হল নূতন জীবনসংগ্রাম। যে মামলাকে আকৈশোর এড়াতে চেয়েছিলেন মহামায়া, বারে বারে স্বামীকে বুঝিয়েছিলেন—মামলা করতে নেই, যা আছে তাতেই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, যে মামলাকে এড়াতে রাজা-মহাশয় রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—ঐ টাকায় মন্দির তৈরি হবে, সেই মামলাতেই জড়িয়ে পড়লেন শেষমেশ। শুভানুধ্যায়ীরা এবার ওঁকেই বোঝাতে এল : মামলা করতে নেই। ছি ছি ছি! সম্পত্তি নিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাটা-ব্যাটাবৌয়ের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা!

রানি শঙ্করী বললেন, উপায় নেই।

প্রতিবেশিনীরা আড়ালে বললে, তবে তো ঠিকই শুনেছিলাম। মৃত্যুশয্যায় বুড়োকে দিয়ে সম্পত্তি লিখিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল।

স্বর্গত নৃসিংহদেবের ওয়ারিশদের মধ্যে সে মামলা দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে চলেছিল। একপক্ষে উপযুক্ত পুত্র কৈলাসদেব—যাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন রাজা-মহাশয়; অপরপক্ষে ছোটরানি, যিনি ঐ সম্পত্তির লোভে সহমরণের চিতা থেকে উঠে এসেছিলেন। সকলের সহানুভূতি কৈলাসদেবের পক্ষেই গেল। হাবিলদার-মামা পরগনা পরগনা ঘুরে প্রচারকার্য চালাতে থাকে—প্রজারা যাতে রানিমার দফতরে খাজনা জমা না দেয়। শহর কলকাতা থেকে এক জাঁদরেল উকিলবাবুকে নিয়ে এল হুগলি আদালতে মামলা পরিচালনা করতে। রানি শঙ্করী দিলীপ দত্তের পরামর্শে নিয়োগ করলেন সাবেক আমলের মোক্তারবাবুকে—বৃদ্ধ হরেরাম চৌধুরীকে। তিল তিল করে ডুবতে থাকেন রানি শঙ্করী। অনেকেই বলল—তাঁর পরাজয় অনিবার্য।

এদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও হয়ে পড়ল দুর্বিষহ। প্রাসাদের মধ্যে বস্তুত তিনি বন্দিনী—একঘরে। কোম্পানির সিপাহিদের সাহায্যে প্রাণে বাঁচা যায়, মানে বাঁচা যায় না। কালেক্টার-সাহেব তাঁর প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একঘরে হয়ে থাকা সে ঠেকাবে কী করে? অশাস্ত্রীয়-কাজ করায় শঙ্করী জাতিচ্যুতা। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে না, বিজয়ায় প্রণাম করতে আসে না। কারো বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ হয় না। তাঁর নিমন্ত্রণেও কেউ আসবে না নিশ্চয়। তা ছাড়া রাজবাড়ি প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ওদিকে শহর কলকাতা জমজমাট হয়ে উঠেছে। রাজা-জমিদার-বেনিয়ান বাবুদের বাড়িতে নিত্য উৎসব। কবিগান-ঢপ-যাত্রাগান-বাইজির নাচ। বিত্তস্ফীত ইজারাদার কাপ্তেনবাবুদের এইসব আমোদ কৌতুকে দোষ ধরত না কেউ। নিকী-বাইজি তখন কলকাতার সেরা রূপোপজীবিনী। মাসিক হাজার তঙ্কা মাহিনায় তাকে রক্ষিতারূপে রেখেছিলেন কলকাতার এক গণ্যমান্য পদস্থ সমাজনেতা—নামটা আর নাই করলাম। এমন কি স্বয়ং রামমোহনের দালানেও সে একাধিক রজনী নেচে গিয়েছে। নেচেছে দ্বারকানাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও। হরুঠাকুর, নীলুঠাকুর, নীলমণি ইত্যাদি কবিওয়ালা আর গোলকমণি, দয়ামণি, রত্নমণি প্রভৃতি 'নেড়ীকবির দল' তখনও আসর মাতিয়ে রেখেছেন। সেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতে আশপাশের অনেক জমিদার কলকাতায় বাসা-বাড়ি, অথবা বসতবাড়ির বন্দোবস্ত করতে থাকেন। জমিদারিতে এসে আদায়পত্র করে যাওয়া ছাড়া বারো মাসই তাঁরা কলকাতাবাসী। সেই গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসালেন কৈলাসদেব। কালীঘাট অঞ্চলে একটি গলির ভিতর নূতন বাড়ি কিনে সস্ত্রীক উঠে গেলেন কলকাতায়। ভবিষ্যতে সেই গলিটিরই নাম হয়েছিল—'রানী শঙ্করী লেন'।

আজও তার ঐ নাম।

নির্বান্ধব পুরীতে মোতির-মা-সম্বল রানি শঙ্করী এতদিন পরে আবার পেড়ে নামালেন তাঁর পুঁথিপত্র। আবার মন দিলেন লেখাপড়ায়। এখন বাংলা বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছাপা। দিলীপকে দিয়ে অনেকগুলি বই আনিয়ে নিলেন—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', কেরী সাহেবের 'ইতিহাসমালা,' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন,' চণ্ডী মুনশীর 'তোতা ইতিহাস'। কিছু মাসিক-সাপ্তাহিকও বার হয়েছে। তারও গ্রাহক হলেন—দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেট। দিবারাত্র সেগুলিই নাড়াচাড়া করেন। ওঁর প্রায়ই মনে পড়ত কাব্যতীর্থের কথা। আহা, এ সময়ে তিনি যদি থাকতেন! রানিমা নবদ্বীপে লোক পাঠিয়েছিলেন। শঙ্করদেবের সন্ধান পাননি। তিনি নাকি নৃসিংহদেবের মৃত্যুর ঠিক পরেই উত্তরখণ্ড পরিক্রমায় গিয়েছেন। কোথায় আছেন কেউ জানে না—হরিদ্বার, হৃষিকেশ, উত্তরকাশী, কিংবা, কে জানে, তিনিও তিব্বতে চলে গেলেন কিনা। শঙ্করীর দৃঢ় বিশ্বাস—কাব্যতীর্থ জানেন না, শেষমুহূর্তে রানিমা তাঁর আদেশটাই মেনে নিয়েছিলেন। যদিচ সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। গুরুদক্ষিণা তিনি দিলেন—বীজমন্ত্র পেলেন না। সবই তাঁর কপাল।

মন্দিরের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়নি। মন্দির নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ নৃসিংহদেব পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বেই। সে অর্থ ব্যয় করার অধিকারী—একমাত্র রানি শঙ্করীদেবী। আর কেউ নয়! তাই বড়মিঞার কাজ বন্ধ হয়নি। বৃদ্ধা রানিমা এতদিনে আর চিকের বাধা মানেননি। মহামায়া যেমন করে মর্মান্তিক প্রয়োজনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপ দেওয়ানের সামনে, তিনিও একদিন তেমনি মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ বড়মিঞার সম্মুখে। বললেন, কর্তাকে তোমরা ফাঁকি দিয়েছ, আমাকেও যেন ফাঁকি দিও না বাবা। হপ্তায় হপ্তায় এসে টাকা নিয়ে যাবে। আমার জীবদ্দশায় যেন মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

উত্তরখণ্ডের বৃদ্ধ মিস্ত্রি খোদাতালার নামে কসম খেয়ে বলেছিল, আপনি আমার মা। নিশ্চিন্ত থাকুন রানিমা—আমরা তঞ্চকতা করব না। দিবারাত্র পরিশ্রম করব। আর দুটি বছরের মধ্যেই শেষ হবে দেউল।

তাই হয়েছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হল সেই অপূর্ব দেব-দেউল। চতুর্দশ শিবের প্রস্তরমূর্তি-বেষ্টিত মন্দির। তার গর্ভগৃহে নিমকাঠের দারুময় মাতৃমূর্তি—অবিকল যে মূর্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন নৃসিংহদেব। দ্বারদেশে উৎকীর্ণ করা হল :

"শাকাব্দে রস-বহ্নি মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার-চতুর্দশেশ্বর-সমং হংসেশ্বরী-রাজিতং।।
ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিমারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মণে।। শকাব্দা ১৭৩৬

[চতুর্দশ মোক্ষদ্বাররূপী মহাদেবের সহিত হংসেশ্বরী কর্তৃক বিরাজিত এই শ্রীমন্দির, যেটি কৃতি নৃসিংহদেব ভূপাল কর্তৃক আরব্ধ হয়েছিল, সেটি এই ১৭৩৬ শকাব্দে তাঁর আজ্ঞানুগা পত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী সমাপ্ত করলেন।]

১৭৩৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ। কালটা চিহ্নিত করতে বলতে পারি—ইউরোপ-খণ্ডে ওয়াটারলু যুদ্ধপূর্ব-বৎসরের ঘটনা, কলকাতায় এ বছরই টেকচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করলেন। রাজা রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

সে মন্দির আজও অটুট। যুগে যুগে যাত্রীদল এসেছে বংশবাটিতে সেই শ্রীমন্দির দেখতে। স্তব্ধ বিস্ময়ে তারা লক্ষ্য করেছে মন্দির-স্থাপত্য, শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে প্রণাম করে গেছে মাতা হংসেশ্বরীকে। তারা কিন্তু জেনে যায়নি এ মন্দিরের প্রতিটি প্রস্তর কী করুণ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী! তারা রানি শঙ্করীকে চেনে না। তাতে তাঁর দুঃখ নেই। কর্মেই শুধু ছিল তাঁর অধিকার—তিনি নিজেকে বলেছেন স্বামীর 'আজ্ঞানুগা' যে স্বামী সারাজীবন তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। তিনি নিজেকে বলেছেন 'গুরুপাদপদ্মনিরতা', যে গুরু সারাজীবনে তাঁর কানে বীজমন্ত্র দেননি। সাধারণ যাত্রী মাতৃমূর্তিকে প্রণাম করেই ধন্য হয়, সাধারণ ট্যুরিস্ট মুগ্ধ হয় স্থাপত্য ভাস্কর্যে; একটু বিদগ্ধ যাঁরা, তাঁরা বলেন—এ মন্দিরের নির্মাতা নৃসিংহদেব। রানি শঙ্করীর নাম কেউ করে না। এমনকি প্রগাঢ় পণ্ডিত ইংরাজকবি চ্যাপম্যান এ মন্দির দর্শনে যে দীর্ঘ গীতিকবিতাটি রচনা করেছিলেন তাতেও শঙ্করী 'কাব্যে-উপেক্ষিতা'।

এমনই হয়! শুধু ঊর্মিলা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়াই নন—সব যুগাবতারের সহধর্মিণীই কাব্যে উপেক্ষিতা। গুরু নানকের তিন পুত্রের জননী সুলক্ষণীর দুঃখের কথা, অথবা গুরুগোবিন্দের তিন পত্নীর, জিতো, সুন্দরী, সহিব-দেবীর—মর্মদাহনের ইতিকথা লিখে যাননি শিখধর্মের প্রবক্তারা; তুলসীদাসজির নাম সারা ভারত জানে, কিন্তু কজন খবর রাখে তুলসীদাসজির ধর্মপত্নী তারকজননী রত্নাবলীর আত্মত্যাগের কাহিনি? আর রানি শঙ্করী তো সন্তানহীনা—স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা!

জন আলেকজান্ডার চ্যাপম্যান ছিলেন প্রথম যুগের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বিদগ্ধ গ্রন্থগারিক। পণ্ডিত এবং কবি। গত শতাব্দীতে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ '*Religious Lyrics of Bengal*' গ্রন্থে দেখছি—হংসেশ্বরী মন্দিরের উপর একটি কবিতা। খ্রিস্টান-কবি মন্দিরের ভিতর ঢুকবার অনুমতি পাননি। বাহিরদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন ঐ দেবদেউলকে। লিখেছিলেন :

"What did he do? He built a temple, still
It stands and I have seen it, but too ill
Would words of mine describe it. Inside, out,
Silent on earth, in pinnacled air shout :
It doth reveal what to the initiate
Figures pure thought. So unto them a gate
Is opened to deliverance. I outside
Alien but not unmoved untouched abide."

"আজন্ম সঞ্চয় দিয়ে বংশবাটি ভূপ
জীবন সায়াহ্নে এসে অতি অপরূপ
রচিলা মন্দির এক : আজও উচ্চশির,
ভিতরে, বাহিরে, ভূমে, আকাশে, গম্ভীর
উদাত্ত-কণ্ঠে ঘোষিছে মুক্তির বাণী। বলিছে
'তিনিই চরম সত্য! আর সব মিছে।'

বিজাতি বিধর্মী আমি, মন্দির-বাহিরে
রয়েছি দাঁড়ায়ে একা, শ্রদ্ধানম্র শিরে।
বর্ণিবারে শক্তি নাই, মাথা মোর নত;
নির্বাক! অন্তর শুধু স্তব্ধ অভিহত!"

১৮২০—অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বৎসর পরের কথা। সেকালের সংবাদপত্রে দেখছি প্রকাশিত হয়েছে একটি সংবাদ "১৯.২.১৮২০ : *সমাচার দর্পণ* : চুরি। মোং বাঁশবেড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলঙ্কার দুই-তিন-হাজার টাকার স্বর্ণ-রৌপ্যাদিঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁর পূজা হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসানকালে তাঁহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারকী অনেক হইতেছে।"

* * *

১৮২০—শঙ্করী দেবীর বয়স ঊনপঞ্চাশ।

দিলীপ দত্ত একদিন এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। বললে, আবার দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি মা। মামলায় আমাদের হার হয়েছে। বিচারক রায় দিয়েছেন, এ মন্দির জমিদারির অন্তর্ভুক্তই—দেবোত্তর নয়। যেহেতু কৈলাসদেব জমিদারির উত্তরাধিকারী সেই হেতু মূর্তিসহ মন্দির তাঁর সম্পত্তি।

শঙ্করী কয়েকটি মুহূর্ত ভাষা খুঁজে পেলেন না। তারপর একটু দম নিয়ে বলেন, আমি মন্দিরের সেবায়েত নই? কৈলাস মায়ের সেবায়েত! এই বিচার হল?

দিলীপ বুঝতে পারে রানিমার নিদারুণ মর্মযাতনা।

পাশ থেকে বৃদ্ধ হরেরাম মোক্তার বলে ওঠেন, রানিমা, আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন না। কৈলাসও সেবায়েত নয়। সেবায়েত কখন হয়? যখন সম্পত্তি হয় দেবোত্তর। আদালতের রায়-মোতাবেক এ সম্পত্তি দেবোত্তর নয়—রাজা কৈলাসদেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি—ঐ মন্দির, শিবলিঙ্গ এবং দারুময় মাতৃমূর্তি। কৈলাস ইচ্ছা করলে একখানি একখানি করে ঐ পাথর খুলে ফেলতে পারেন। বেচে দিতে পারেন।

শঙ্করী বসে পড়েন ভূশয্যায়। দিলীপ দ্বিধা করে না, এগিয়ে এসে ধরে ফেলে তার ছোটমাকে : এ কী করছেন! আপনি পড়ে যাবেন যে!

ততক্ষণে সামলেছেন রানিমা। বললেন, না, আমি ঠিক আছি। শোন দিলীপ....

কথাটা তাঁর শেষ হল না, হঠাৎ তূর্যনিনাদে আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে ওঠে। নির্বান্ধব রাজপুরীতে সহসা এ শব্দে রানিমা চমকে ওঠেন। বলেন, ও কী?

মোতির মা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, বাজনদার। হাবিলদারমামা বাজনদার নে এসেছে। রাজবাড়ির সামনে বাজাবে। মামলায় রাজামশায়ের জয় হল যে।

শঙ্করী বললেন, দিলীপ, তুমি আপিল কর। আমি এ বিচার মানি না।

মাথা নত করে দিলীপ কী বলল শোনা গেল না। ঢাক-ঢোল-শিঙার শব্দে ডুবে গেল সে-কথা। রানিমা বললেন, কী বললে?

মুখটা কানের কাছে এনে দিলীপ বললে, উপায় নেই মা। আপনি আজ কপর্দকহীনা।

—ও! এই কথা। আচ্ছা অপেক্ষা কর একটু। আমি এখনই আসছি।

উঠে দাঁড়ালেন রানিমা। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন তাঁর বড়দির কক্ষে। ঘরের পরিবর্তন হয়নি বিশেষ কিছু। শুধু প্রাচীরে বিলম্বিত ফ্রেমে বাঁধানো এক-জোড়া চরণের ছাপ। আলতার-ছাপ। সহমরণে শায়িতা মহামায়ার যুগল-চরণের ছাপ। শঙ্করী সেটার উপর তাঁর মাথাটা ঠেকালেন। অস্ফুটে বললেন, বড়দি, তুমি আশীর্বাদ কর তোমার ছুটকিকে।

অনতিবিলম্বে ফিরে এলেন রানিমা। নামিয়ে দিলেন একটি পুঁটুলি। বললেন, নিয়ে যাও দিলীপ। আপিল দায়ের কর।

পুঁটুলিটা না খুলেই দিলীপ বুঝতে পারে ওর ভিতরে কী আছে। অনুরূপ একটি পুঁটুলি খুলে সে বড় রানিমার সামনেই গহনা ওজন করিয়েছিল—স্যাকরা দিয়ে। আজ ছোটমা সামনে ওজন করানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন তাঁর যৌতুক, তাঁর সমস্ত অলঙ্কার দিলীপের হাতে!

* * *

১৮২৬—আরও ছ বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে কলকাতাবাসী কাশীশ্বরীর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে—কৈলাস তার নাম রেখেছেন দেবেন্দ্রদেব। তার অন্নারম্ভে শঙ্করীর নিমন্ত্রণ হয়নি। শুনেছেন লোকমুখে কলকাতায় ঐ উপলক্ষে কত সাহেব-সুবো, রাজা-উজির নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। একদিন দেশি মতে, একদিন বিলাতি খানাপিনা। আতস-বাজী, খ্যামটার নাচ, বাইজি। রাজপুত্রের অন্নারম্ভ সাড়ম্বরেই হয়েছে। নাতির মুখ অবশ্য এখনও দেখেননি রানি শঙ্করী।

আবার একদিন মোক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন রানিমার কাছে, দিলীপ দেওয়ানকে সঙ্গে করে। বললেন, মা, আমি তো শেষরক্ষা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আপিলে হাবিলদার-মামা এক সাহেব ব্যারিস্টার দিয়েছে। তার কথাই বুঝতে পারি না আমি। বিচারকও সদ্য এসেছেন কালাপানি পার হয়ে। উদ্ধত নবীন যুবক—খাস সাহেব। সে তো আমার কোনো যুক্তিই শুনতে চায় না। বলছে—দায়ভাগ-মিতাক্ষরা কোনো আইনেই কোথাও লেখা নেই উপযুক্ত দত্তকপুত্র পিতৃপুরুষের সম্পত্তির অধিকারী হবে না।

শঙ্করী বলেন, জমিদারি সম্পত্তি তো চাইছি না আমি। আমি চাইছি শুধু ঐ মন্দির। ও মন্দির তো পিতৃপুরুষের বংশানুক্রমিক সঞ্চিত অর্থে নির্মিত হয়নি। ওর মধ্যে যে রয়েছে বড়দির বিবাহের যৌতুক। এ তো আমার স্বামীর স্বোপার্জিত। আমার সতীনের বুকের পাঁজর দিয়ে গাঁথা। সাহেব একথা বুঝছে না?

বৃদ্ধ মোক্তার মাথা নেড়ে বললে, না মা! আইনের সেরকম নির্দেশ নয়। তাছাড়া সম্পত্তি তো সত্যই স্বর্গত রাজা-মহাশয়ের স্বোপার্জিত অর্থে নয়। কাশীখণ্ড রচনা করে তিনি কতটুকুই বা জমিয়েছিলেন? বড়রানিমার যৌতুকের সব অর্থ যে মন্দির গড়ার জন্য ব্যয়িত হয়েছে তারই বা প্রমাণ কই, সাক্ষী কই?

—কেন? কৈলাস তা জানে, কাশীশ্বরী জানে।

এত দুঃখেও হাসলেন মোক্তারবাবু: আপনি ভুলে গেছেন রানিমা—তাঁদেরই সঙ্গে মামলা।

—রাজা-মহাশয় যে আমাকে ঐ মন্দিরের সেবায়েত করতে চেয়েছিলেন সে-কথাও কি স্বীকার করে না কৈলাস?

দিলীপ বললে, কই আর করছেন? হয়তো আলাদা করে পেড়ে ফেললে তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাকে তিনি আজও শ্রদ্ধা করেন—পুত্রের অন্নপ্রাশনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতেও নাকি আসছিলেন—কিন্তু ঐ হাবিলদার-মামার জন্য পারেননি। তিনি যেন ভাগ্নে-জামাইকে সর্বদা আগলে রেখেছেন।

রানিমা বলেন, বুঝলাম। আপনারা তাহলে এক কাজ করুন। সাহেবকে বলুন, আমি আদালতে গিয়ে স্বয়ং এজাহার দিতে চাই।

মোক্তারবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দিলীপ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী বলছেন ছোটমা! প্রকাশ্য আদালতে আপনি কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন? সেখানে 'চিক'-এর ব্যবস্থা নেই কিন্তু!

—জানি। আপনি শুধু একটা কাজ করবেন মোক্তারবাবু। একজন ইংরাজিনবীশ বাঙালি উকিলের ব্যবস্থা রাখবেন। যিনি আমার এজাহার ঠিক ঠিক ভাবে সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

দিলীপ দৃঢ়ভাবে বলে, এ অসম্ভব!

দৃঢ়তর স্বরে রানিমা বলেন, তুমি তো আমাকে চেন দিলীপ।

তা চেনে!

সতীদাহের চেয়ে এ তামাসা বড় কম নয়। সম্ভ্রান্ত রাজবাড়ির পর্দানসীন পুরললনা প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে এজাহার দেবেন! বোরখা পরলে চলবে না—শনাক্ত হতে হবে। চিকের আড়ালে থাকলে চলবে না, সহস্র দর্শকের সামনে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে হবে। বিপক্ষের উকিল তাঁর দাম্পত্য-জীবন নিয়ে নির্লজ্জ প্রশ্ন করতে পারে—তাঁর সঙ্গে রাজা-মহাশয়ের সম্পর্ক কী জাতের ছিল তা আদালতে প্রতিষ্ঠিত করতে—তাতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না।

ব্যাপারটা যে কতদূর অবাস্তব তা আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকাকে বোঝানো শক্ত। হয়তো কিছুটা আভাস দেওয়া যাবে 'কাল'টাকে চিহ্নিত করলে—ভারতবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা ইংল্যান্ডে কুইন ভিক্টোরিয়া তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। আমেরিকা-য়ুরোপে তখনও রদ হয়নি দাসপ্রথা। বন্ধ হয়নি সতীদাহ—এই ভারতবর্ষে!

* * *

ষোলো বেহারার পালকি এসে থামল হুগলি কালেক্টারির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে! দিলীপ কিংখাবে মোড়া পালকির দরজাটা খুলে বললে, নেমে আসুন ছোটমা, আমরা আদালত প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছি।

শঙ্করী নেমে এলেন। তাঁর পরিধানে সাদা থান। সর্বাবয়বে নেই একটি অলঙ্কার। যেন পঙ্ককুণ্ডের ভিতর থেকে উঠে এল দুগ্ধশুভ্র মানস-যাত্রী রাজহংসী। আবক্ষ অবগুণ্ঠন। দিলীপের পিছন-পিছন প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে উঠে এলেন পাষাণ সোপান বেয়ে। সোপান-শীর্ষে প্রতীক্ষা করছেন একজন। বললেন, আসতে আজ্ঞা হোক বেয়ান ঠাকরুন। এই দিকে—

শঙ্করী অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলেন একজোড়া ভারী জঙ্গি বুট।

লোকটা অনাহূত তাঁর পাশে পাশে চলতে থাকে। এটা অন্দরমহল নয়। প্রকাশ্য আদালতের বারান্দা। পাশাপাশি হাঁটলে আপত্তি করা চলে না। দিলীপ দাঁতে দাঁত দিয়ে নীরব রইল। লোকটা আপনমনেই বকবক করতে করতে চলেছে : এই জন্যেই বলে—'বিষয় হচ্ছে বিষ'। সম্পত্তি এমন জিনিস যে, মাকেও ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হয়। বাঁশবেড়ের রানিমা, কোথায় অন্দরমহলে দাসীর সেবা খাবেন, তা নয়—একহাট লোকের সামনে ঘোমটা খুলে খ্যামটা নাচতে হবে।

চাপাগর্জন করে ওঠে দিলীপ : থামুন আপনি! বেয়াদপ, বেসরম কোথাকার!

একগাল হাসলেন হাবিলদার-মামা। বললেন, আমাকে ধমকে থামাতে পার দেওয়ান-সাহেব, কিন্তু আমার উকিল-ব্যারিস্টার যখন রানিমাকে খ্যামটা নাচাবে—

—শাট আপ স্কাউন্ড্রেল!

চমকে ওঠেন শঙ্করী। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। ঘোমটা তুলে দেখেন ও পাশ থেকে কে যেন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে হাবিলদার-মামার হাত। চিনতে পারেন। অনেক অনেকদিন পরে দেখছেন বটে—তবু চিনতে অসুবিধা হয় না। কৈলাসদেব। হাবিলদার-মামাকে বলে, উনি আমার মা। ওঁকে অপমান করলে—

হাবিলদার-মামা হঠাৎ কেঁচো। বলেন, না বাবা, অপমান করব কেন? এস এস, আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।—হাত ধরে তিনি আকর্ষণ করেন কৈলাসকে।

কৈলাস তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বিস্মিত বিমূঢ় শঙ্করী কিছু বলবার আগেই কৈলাস যেন ছোঁ মেরে তাঁর পদধূলি নেয়। শঙ্করী ওকে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কৈলাসদেব ছুটে পালালো।

অবাক হয়ে গেলেন শঙ্করী। কৈলাস অনেক বদলে গেছে। রোগা হয়ে গেছে, সাহেবসুবোর সঙ্গে মিশে ইংরাজি গালাগালও শিখেছে। ভাষাটা বোঝেননি, কিন্তু সুর শুনে বুঝতে পারেন মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করলেও মায়ের অপমান সে সইবে না।

কোর্ট-পেয়াদা-ইস্তক সমস্ত আদালত-সুদ্ধ লোক দেখতে পাচ্ছে ওঁকে। বস্তুত ঐ অবগুণ্ঠনবতীই মানুষ-জনে-ঠাশা আদালতকক্ষের মূল আকর্ষণ—কেন্দ্রবিন্দু। তবু প্রথামাফিক কোর্ট-পেয়াদা নির্দেশমত হাঁক পাড়ল : রানি শঙ্করী দেবী। হা—জি—র?

দিলীপ ওঁর কানে কানে বলল, এবার আপনার সাক্ষী ছোটমা। আসুন।

একগলা ঘোমটা দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন রানি শঙ্করী। দিলীপ রয়ে গেল দর্শকের আসনে। কোর্ট-পেয়াদা ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে, কাঠের রেলিং ঘেরা অংশটা অতিক্রম করে, কাঠের সোপান বেয়ে সাক্ষীর মঞ্চে।

প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা। আদালতের কার্য-কারণ প্রণালী সে-যুগে ঠিক আজকের মতো ছিল না। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ল'-এর নিয়ম-কানুন তখনও এভাবে দানা বেঁধে ওঠেনি। কোম্পানির আমলে বিচারপদ্ধতি ছিল—চণ্ডীমণ্ডপের বিচার-পদ্ধতিরই একটা মার্জিত সংস্করণ। ক্রস-রিক্রস-রিডাইরেক্ট প্রভৃতির ঝামেলা নেই। দু-পক্ষের উকিল এবং বিচারক যাঁর যখন খুশি সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারতেন। বিচারকের পাশে বসে আছেন দো-ভাষী। দুর্ভাগ্যবশত বিচারক বঙ্গভাষা ভালোভাবে জানেন না। অল্প অল্প বুঝতে পারেন মাত্র।

কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, এই গ্রন্থটি স্পর্শ করুন রানিমা। এটি শ্রীমদ্ভগবতগীতা। এটি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করুন—'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।'

শঙ্করী গ্রন্থটি স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হলেন না। বক্তার হাত থেকে সেটি কেড়ে নিলেন। দু হাতে সেটি ধরে, ললাটে স্পর্শ করিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন—'যাহা বলিব, সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না—'

সমস্ত আদালতে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা—রানিমায়ের সুউচ্চ কিন্তু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সকলেরই কর্ণগোচর হল।

একজন সাহেব-উকিল বললেন—আপনার নাম কী আছে? পরিচয় কী আছে?

—আমার নাম শ্রীশঙ্করী দাসী। আমি বংশবাটির স্বর্গত রাজা-মহাশয়ের কনিষ্ঠা মহিষী।

—আপনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন। আপনিই যে রানী-শঙ্করী আছেন, তাহা আমরা কীরূপে জানিব? চিনিব?

শঙ্করী অবলীলাক্রমে তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেন ললাট পর্যন্ত। চোখে চোখ রেখে তাকালেন সাহেব-ব্যারিস্টারের দিকে। সমস্ত আদালতে একটি গুঞ্জন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো প্রবাহিত হল। পঞ্চাশোর্ধ্বা রানিমা এখনও দেবীপ্রতিমা!

—আপনিই যে সত্যই রানি শঙ্করী আছেন, তাহা কে সনাক্ত করিবে? এ আদালতে কেহ আপনাকে চেনে কি?

অসংকোচে তাঁর নিরাভরণ দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে তর্জনীসংকেতে রানিমা বলেন, বাদী স্বয়ং। তিনি আমাকে চেনেন—আমার পুত্র, শ্রীকৈলাসদেব রায়।

হঠাৎ এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কৈলাসদেব। অধোবদন হলেন তিনি।

সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামীর কী নাম আছে?

রানি শঙ্করী কঠিন স্বরে বললেন, তুমি এদেশে ব্যারিস্টারি করতে এসেছ সাহেব, অথচ এটুকু জান না—কোনো হিন্দু স্ত্রী তাঁর স্বামীর নামোচ্চারণ করেন না!

আদালতে একটা হাস্যরোল ওঠে। বিচারক তাঁর হাতুড়িটা ঠোকেন।

এবার ও-পাশ থেকে একজন দেশি উকিল, কৈলাসদেবেরই উকিল—বলে ওঠেন, না রানিমা, নাম বলতে হবে না। আমিই প্রশ্ন করছি : স্বর্গত রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায় কি আপনার স্বামী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ-কথা কি সত্য যে, নৃসিংহদেব কাশী থেকে শেষবার ফিরে আসার পর আপনার অন্দরমহলে আদৌ প্রবেশ করেননি?

—হ্যাঁ সত্য।

—এবং তিনি ফিরে আসার পর যে তিন বৎসর বংশবাটিতে ছিলেন তার ভিতর মাত্র একবার আপনাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

—হ্যাঁ, তাও সত্য।

—তার অর্থ—আপনাদের দুজনের দাম্পত্য জীবনে সেই তিন বৎসর কোনো সদ্ভাব ছিল না? দেখাসাক্ষাৎ হত না?

—না। সেটা সত্য নয়। আমার স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসজীবনে কেউ সংসারাশ্রমে যে তার স্ত্রী ছিল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না। সদ্ভাব ঠিকই ছিল।

শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে উকিলবাবু বলেন, কিন্তু আমরা শুনেছি—সন্ন্যাস নেবার পূর্বে সংসারাশ্রমেও আপনাদের দুজনের আদৌ দেখাসাক্ষাৎ হতো না। রাজা-মহাশয় বড়রানিমায়ের শয়নকক্ষেই বরাবর রাত্রিযাপন করতেন। সে কথা কি সত্য নয়?

রানি শঙ্করীর মুখ ক্রোধে রক্তজবার মতো রাঙা হয়ে উঠল। তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, কিন্তু তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মোক্তার হরেরাম চৌধুরী। এ প্রশ্নে আপত্তি জানালেন। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিচারককে বুঝিয়ে বলা হল। বাদীপক্ষের উকিল বিচারককে বললেন, আমি প্রমাণ চাইছি, নৃসিংহদেব কোনোদিন প্রতিবাদীকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। বিবাহ করলেও তাঁর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেননি। সেই জন্যই তাঁর সন্তানাদি হয়নি। প্রতিবাদীর প্রতি বিরাগবশত তিনি স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে বঞ্চিত করতেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

হরেরাম বলেন, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা ধর্মাবতার।

উকিল বলেন, সত্য-মিথ্যা আপনি কেমন করে জানবেন মোক্তারবাবু? সাক্ষীকে বলতে দিন।

বিচারক বলেন, ঠিক কথা। সাক্ষীকে বলিতে দিন।

আদালত উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে। উকিলবাবু পুনরায় বলেন, বলুন রানিমা। এ-কথা কি সত্য যে, রাজা-মশাই জীবনে কোনোদিন আপনাকে নিয়ে এক শয্যায় শয়ন করেননি?

রানী শঙ্করী দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্নকর্তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ইংরাজ বিচারককে বললেন, এ তোমার কেমন বিচার সাহেব? সত্যের মর্যাদা রাখতেই আমি এখানে সাক্ষ্য দিতে এসেছি, এজাহার দিতে এসেছি। আমার ব্যক্তিগত দাম্পত্য-জীবনের কথা হাটের মাঝখানে ব্যক্ত করতে নয়। আমি শুনেছি ইংরাজ জাতি সুসভ্য। তুমি বল—সেটা কি আমি ভুল শুনেছি?

ইংরাজ বিচারক বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু সাক্ষী যে তাঁকেই সম্বোধন করে কিছু বলেছে তা বুঝলেন। দোভাষীকে প্রশ্ন করেন : What does the lady say?

দোভাষী রানি শঙ্করীর বক্তব্য নির্ভুল অনুবাদ করে শোনালো।

বিচারক নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, সওয়াল-জবাব থাক। আপনি একটি এজাহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সে কথাই বলুন।

রানিমা বলতে থাকেন, সাহেব, তুমি আমার সন্তানের বয়সি। হয়তো তুমি আমারই বয়সি জননীকে দেশে ফেলে এখানে ন্যায়বিচার করতে এসেছ। হয়তো তাঁর কথা মনে করেই তুমি অবাক হয়ে ভাবছ—মা হয়ে কেন আমি সন্তানের বিরুদ্ধে লড়ছি। নয়? সেই কথাটাই আমি বুঝিয়ে বলতে এসেছি। তুমি শুনতে চাও?

দোভাষী অনুবাদ করে শোনাতে বিচারক বললেন, আপনি বলুন, মা?

মা! এতক্ষণে মনে বল পেলেন শঙ্করী। স্থির অচঞ্চল বঙ্গভাষে তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন পরিস্থিতিটা। বললেন, সবার আগে তোমাকে বুঝে নিতে হবে একজন ইংরাজ বিধবার সঙ্গে একজন ভারতীয় হিন্দু বিধবার কী পার্থক্য! ভারতীয় হিন্দু-বিধবার কাছে অর্থ নিরর্থক—সে একাহারী, বিপুল বিত্তের অধিকারী হলেও সে তা ভোগ করতে পারে না—শাড়ি-গহনা, আমোদ-প্রমোদ বিলাস-বৈভব তার নিষিদ্ধ। কোনো মঙ্গলকার্যে সে উপস্থিত থাকতে পারে না—কোনো শুভকার্যে সে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অর্থের প্রতি তার মোহ থাকার কথা নয়। ধর আমার কথা। আমি জামিদারি চাইনি, চেয়েছি মন্দিরের সেবাইতের অধিকার। যদি সমস্ত সম্পত্তিটাই পেতাম, তাহলেও আমার জীবনযাত্রার কোনো পার্থক্য হত না। আমি সেই একবেলা আহার করতাম, ফল-মূল-ছানা-দুধ। রঙিন বা পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতে পারতাম না, গহনা পরতে পারতাম না। যাক সে কথা। কিন্তু আমি তো সেজন্য মামলা লড়ছি না। আমি শুধু মা হংসেশ্বরীর পূজা করবার অধিকারটুকুর জন্যই এ মামলা লড়ছি।

বললেন, হংসেশ্বরী কে, তা তুমি বুঝবে না সাহেব। তোমার কাছে হয়তো সে পুতুল। তা 'মা মেরী'র মূর্তিও তো পুতুলই। মনে কর না কেন—আমার স্বর্গত স্বামী সেই মা-মেরীর নামে একটা গির্জা বানিয়ে দিয়ে গেছেন, আমি সেই মা মেরীর অছি।

আরও বললেন, শুনেছি—ওপক্ষের উকিলবাবু নাকি বলেছেন—এ অর্থ আমার স্বামীর স্বোপার্জিত নয়! এ নাকি আমার বংশের সাতপুরুষের সঞ্চিত অর্থ। কথাটা সত্য নয় সাহেব! তুমি বুদ্ধিমান, বুঝে দেখ—অর্থ সঞ্চিত হয় কী ভাবে? আয় বৃদ্ধি করে অথবা ব্যয় সংকোচ করে। আমরা ঐ দ্বিতীয় পন্থায় সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে এ অর্থ সঞ্চয় করেছি। তখন কোথায় ছিল ঐ বাদী? ঐ কৈলাসদেব? আমরা যদি জমিদারদের চিরাচরিত প্রথায় বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতাম, তাহলে তো ঐ দেবদেউল গাঁথা হত না। খোঁজ নিলে তুমি জানতে পারবে—আমার সতীন, আমার বড়দি মহামায়া দেবী তাঁর সমস্ত যৌতুক, সমস্ত অলঙ্কার ঐ তহবিলে জমা দিয়েছিলেন—

বাদীপক্ষের উকিল বাধা দিয়ে বলেন, সেটা গল্পকথা। তার কোনো প্রমাণ নেই, কেউ সাক্ষী নেই—

—নেই! রুখে ওঠেন শঙ্করী! বলেন, সেদিন সেকথা গোপন ছিল, এখন বাঁশবেড়ের প্রতিটি মানুষ জানে—কী ভাবে রাতারাতি রাজকোষের সঞ্চয় ছয় থেকে সাত লক্ষে উঠে গিয়েছিল! দিলীপ দেওয়ান জানে, নীলমণি স্যাকরা জানে—

উকিলবাবু বাধা দিয়ে বলেন, দিলীপ দেওয়ান আপনার পক্ষের লোক, নীলমণি স্যাকরা স্বর্গগত। আপনি যে মিথ্যা বলছেন না—

—কী! আমি মিথ্যা বলছি! ঘুরে দাঁড়ালেন রানিমা। বললেন, বেশ! ঐ তো বসে আছে কৈলাস! এ মামলার বাদী। তাকে উঠে আসতে বলুন। সে এসে ধর্মাবতারকে বলুক—তার মা মিথ্যাবাদী! বলুক — সে তার জ্ঞানমতো জানে না তার বড়মায়ের সর্বস্ব আছে ঐ মন্দিরে!

হাবিলদার-মামা কৈলাসকে একটা কনুয়ের গোত্তা মারেন। কৈলাস মুখটা তুলতে পারে না।

ধমকে ওঠেন শঙ্করী, মুখ লুকোলে তো চলবে না বাবা কৈলাস। তুমি বাঁশবেড়ের রাজা-মহাশয়। মাথা সোজা করে উঠে দাঁড়াও। বল, ধর্মাবতারকে। ধর্মসাক্ষী করে বল।

মায়ের আদেশমতো কৈলাস উঠে দাঁড়ালো। দুটি হাত জোড় করে বললে, ধর্মাবতার! মন্দিরের উপর থেকে আমি দাবী প্রত্যাহার করছি। ছোটমা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। ওঁকে এবার রেহাই দিন হুজুর।

উঠে আসে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে নিরলঙ্কার মায়ের মণিবন্ধ। বলে, নেমে এস মা! সাবধানে পা ফেল, পড়ে যাবে তুমি!

এ সাবধানবাণীর প্রয়োজন ছিল। শঙ্করীর দুই চোখে তখন জল ভরে উঠেছে। কাঠের সোপান তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না আদৌ। তা হোক। দৃষ্টি না থাক—ছেলে তো আছে। অন্ধ বৃদ্ধার সেই তো যষ্টি!

বিনোদ মজুমদারের একটা সুবিধা ছিল, যা ছিল না কৈলাসদেব রায়ের। বিনোদের কাশীশ্বরী ছিল না, স্ত্রীর হাবিলদার-মামা ছিল না। তাই গোকুলের পদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করায় আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, কাহিনির যবনিকাপাত ছাড়া। কিন্তু কথাসাহিত্যে যেখানে যবনিকাপাত ঘটে জীবনী-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেখানে সমাপ্তি ঘটে না। তাই 'বৈকুণ্ঠের উইলে' পাঠক যে প্রশ্ন তুলবার অবকাশ পাননি, সেই কৈফিয়তই এখন দিতে হবে নৃসিংহদেবের উইলের প্রসঙ্গে।

কৈলাসদেব ফিরে গেলেন কলকাতায়; শঙ্করী দেবী বংশবাটিতে। আদালতের সেই ক্ষণিক মুহূর্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসের জন্য ঘরে-বাইরে কৈলাসকে কী পরিমাণ গঞ্জনা সইতে হয়েছিল তা আমরা জানি না; কিন্তু রাজবাড়ির ইতিহাস পড়ে মনে হয়েছিল দীর্ঘ জীবনের অযুত-নিযুত মুহূর্তের মধ্যে জীবনের ঐ খণ্ডমুহূর্তটির জন্যই তিনি বংশবাটির রাজা-মহাশয়ের পরিচয় রেখে গিয়েছেন—প্রমাণ রেখেছেন, নৃসিংহদেব তাঁকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করবার সময় মানুষ চিনতে ভুল করেননি।

এর পরেই নানা কারণে কৈলাসদেব মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতা শহর; ডাক্তার-বদ্যির অভাব নেই। রীতিমতো সাহেব ডাক্তার দিয়ে দেখানো হল তাঁকে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দিন দিন শয্যালীন হয়ে পড়লেন কৈলাসদেব। বংশবাটিতে বসে রানিমা কোনো খবর পেলেন না। কেউ জানায়নি তাঁকে।

তারপর একদিন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের একটি নিদাঘ সন্ধ্যা। প্রায় জনহীন প্রকাণ্ড নির্বান্ধব রাজবাটিতে ছাপ্পান্ন বছর বয়সের বৃদ্ধা রানিমা সন্ধ্যাপিদিমটি জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বারান্দার একান্তে। তাঁর হাতে তখনও সন্ধ্যাদীপ। অস্পষ্ট আলোয় দেখলেন, উঠোনের একপাশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ, বৃদ্ধ এবং বেশ দশাসই চেহারা। অন্দরমহলে ও ঢুকলো কেমন করে? ভয় পেয়েছেন যতটা বিরক্ত তার চেয়েও বেশি। ওখান থেকেই বলেন: কে? কে ওখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

লোকটা আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল। বললে, পরণাম রানিমা। হামি। হামি মহাবীর পরসাদ আছি।

—মহাবীর প্রসাদ! কে তুমি? তোমাকে তো চিনি না! এলে কেমন করে অন্দরমহলে?

—গোস্তাকি মাফ করবেন রানিমা। বিনা এত্তেলাতেই এসেছি। লেকিন আপনি হমাকে পহ্চানতে পারলেন না? আমি মহাবীর পরসাদ আছি।

—না বাবা। তোমাকে আমি চিনতে পারলাম না; কে তুমি মহাবীর প্রসাদ?

লোকটা বললে, অনেক দিন হইয়ে গেল রানিমা। আপনি ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হামি ঠিক এইখানে খাড়া ছিলাম। আপনি পুকার দিলেন 'কে তোমাদের সর্দার আছে?' আমি পরণাম করে বললাম—'হামি মহাবীর পরসাদ হাজির আছি, রানীমা—'

মনে পড়ে গেল শঙ্করী দেবীর। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার এক সন্ধ্যার কথা।

বললেন, মনে পড়েছে মহাবীর। কোথায় ছিলে এতদিন? তোমাকে তো আর কখনও দেখিনি।

—লেকিন হামি আপনাকে দেখেছি রানিমা—হুগলি আদালতে। হামি আজও রাজ-সরকারেই আছি। আপনাদের কলকাতার মোকামে দারোয়ান আছি।

—তুমি কলকাতা থেকে আসছ? কেউ পাঠিয়েছে তোমাকে?

—নেহি রানিমা, কেউ পাঠায় নাই। হামি ছুটি নিয়ে এলাম। আপনার চরণে কুছু নিবেদন আছে, রানিমা।

—বস তুমি। আমি আসছি।

মাথার পাগড়িটা খুলে বারান্দার একান্তে বিছিয়ে মহাবীর প্রসাদ বসে। অনন্তবাসুদেবের বৈকালি ভোগ ঢাকা দেওয়া ছিল ঘরে। রানিমা একটি পদ্মপাতায় সেই ফলমূল-মিষ্টান্ন নিয়ে এসে ওর সামনে ধরে দিলেন। এটাই ছিল তাঁর নৈশ আহারের আয়োজন। বললেন, প্রসাদ গ্রহণ কর। তারপর শুনব কী তোমার আর্জি।

মহাবীর প্রসাদ যে-কথা শোনালো তাতে একটু অবাক হলেন রানিমা। সে জানালো, কৈলাসদেবের মরণান্তিক অসুস্থতার কথা। আরও জানালো, বৌরানিমা সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই রকমই ঘোষিত হয়েছে। একঘরে মৃত্যুশয্যায় রাজা-মহাশয় কৈলাসদেব, অন্য ঘরে এয়োস্ত্রীদের ভিড়। মহাবীর প্রসাদ ছুটে এসেছে রানিমাকে খবর দিতে।

রানিমা প্রাঙ্গণের একদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকেন। উঠোনে ঝোপঝাড় জঙ্গল হয়েছে। কে কাটায়? মনে পড়ল—এখানে ছিল না একটা প্রকাণ্ড কাঞ্চন গাছ? এমন চৈত্রসন্ধ্যায় বেগুনিফুলের গুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে কত কথা বলত কলমুখর গাছটা। কোথায় গেল অমন ঝাঁকড়া গাছটা?

—রানিমা!

সংবিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, আমি কী করতে পারি মহাবীর?

—রাজা-মশাই তো চললেন, বৌরানিমাও সহমরণে যাইবেন, লেকিন কুমারবাবুর কী হোবে? আপনি তাঁকে লিয়ে আসুন।

কুমারবাবু! হ্যাঁ, তাই তো! তার কথা মনেই ছিল না। কুমার দেবেন্দ্রদেব রায়। কৈলাসের পুত্র। কখনও চোখে দেখেননি, কিন্তু সাত বছর বয়স হল তারও। বললেন, আমি চাইলেই বা তারা দেবে কেন মহাবীর?

—দেবে রানিমা। রাজা-মহাশয়ের তাই হিঞ্ছা। লেকিন মামাবাবু রাজি হচ্ছেন না।

আবার উঠে দাঁড়ালেন। আহ্! শান্তি কি ওঁকে দেবেন না ভগবান? এই নির্বান্ধব পুরীতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আর হংসেশ্বরীর সেবা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার সুযোগও দেবেন না? আবার সেই তিক্ত সংগ্রাম। তা হোক, তবু হার মানতে পারেন না বংশবাটির রানি শঙ্করী। কুমার দেবেন্দ্রদেব তাঁর পৌত্র। সে-ই যে এখন এ বংশের শেষ পিদিম। মনস্থির করলেন। ডেকে পাঠালেন দেওয়ান দিলীপ দত্তকে। তিনিও এখন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। এসে বললেন, ডেকেছেন মা?

—হ্যাঁ বাবা—আমি একবার কলকাতা যাব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।

মহাবীর প্রসাদ আনীত সংবাদ বিস্তারিত জানিয়ে তিনি বললেন, কাল সকালেই যাব। নৌকোর ব্যবস্থা কর।

মাথা চুলকে দিলীপ বললেন, কিন্তু সেখানে হাবিলদার-মামা আছেন। ওঁরা যদি আপনাকে ঢুকতে না দেন? অপমান করেন?

শঙ্করীকে জবাব দিতে হল না। মহাবীর দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। একপদ অগ্রসর হয়ে এসে বলল, দেওয়ান্‌জি! হমার হাতে একটি লাঠি আছে, ঔর হাবিলদার-মামার ঘাড়ে ভি একঠৌই মাথা আছে। উ চিন্তা আপনি করবেন না।

কোর্ট অব ডাইরেক্টরের রায়। এর উপর আপিল চলে না। মেনে নিতে হল দেওয়ানজিকে।

পরদিন অপরাহ্ণে বজরা এসে ভিড়ল কালীঘাটের ঘাটে। হ্যাঁ, ঐ যে দেড় হাত চওড়া পয়ঃপ্রণালীটা আজও বয়ে যায় কালীঘাট মন্দিরের পিছন দিয়ে, ঐখানেই। যে আমলের কথা, তখন ওখানকার ঘাটে দেড়-দুশো মহাজনি নৌকো সব সময় বাঁধা থাকত। বজরা থেকে অবতরণ করে রানিমা ধুলো-পায়ে সর্বপ্রথমেই গেলেন মায়ের মন্দিরে। সমস্ত দিন উপবাসে আছেন, মায়ের পুজো দেবেন বলে। পূজান্তে মহাবীর ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এল। পাথর-বাঁধানো সড়ক দিয়ে গাড়ি চলল সেই গলিটার দিকে, আজ যার নাম 'রানি শঙ্করী লেন'।

ঘোড়ার গাড়িতে খড়খড়ি পাল্লা লাগানো। পর্দানসীন ব্যবস্থা। তবু তাতে চোখ লাগালে রাজপথের দৃশ্য দেখা যায়। সে পথে গোযান, ছ্যাকরাগাড়ি, এক্কা, উট এবং হাতি দেখা যায়। শঙ্করী কিন্তু ওসব কিছু দেখছিলেন না। নিজের চিন্তাতেই তিনি ডুবে ছিলেন।

গাড়ি এসে থামল একটি বাড়ির সামনে। জীবনে প্রথম এ বাড়িতে পদার্পণ করলেন রানিমা। সদর দরজা পার হয়েছেন কি হননি পথরোধ করে দাঁড়ালেন একজন। অবগুণ্ঠনবতী যথারীতি দেখতে পেলেন—জরাজীর্ণ একজোড়া জঙ্গিবুট। যতই ঘোমটা টানুন, হাবিলদার-মামা তাঁকে ঠিকই চিনেছেন, বোধ করি তাঁর পিছন পিছন দিলীপ দত্তকে দেখে। বললেন, কী চাই?

দিলীপ বললেন, রানিমা এসেছেন রাজা-মশায়ের কাছে।

হাবিলদার-মামা বলেন, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু রাজা-মহাশয় অসুস্থ। বদ্যির বারণ, বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করার। আগেই একটা এত্তেলা পাঠানো উচিত ছিল আপনাদের।

এবার জবাব দিল মহাবীর প্রসাদ : এটা কী আজীব বাত শুনালেন মামাবাবু? রানিমা কি বাইরের লোক আছেন? উনি তো 'মা' আছেন?

—তুই! তুই কোথায় ছিলি এ দুদিন?

—রানিমাকে আনতে গিয়েছিলম। লেকিন রাস্তা ছোড়েন। এক পা এগিয়ে আসে মহাবীর।

হাবিলদার-মামা অবস্থাটা বুঝে সরে দাঁড়ান, কিন্তু দুরন্ত ক্রোধে বলে বসেন, তুই এত বড় নেমকহারাম? বেইমান!

শঙ্করী ততক্ষণে অতিক্রম করেছেন পথরোধকারীকে। মহাবীরও অনুগমন করেছিল। এ কথায় সে ঘুরে দাঁড়ায়। লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে বললে, নিমক তুমিও কুছু কম খাওনি মামাবাবু, এ রাজা-

মশাইদের! লেকিন এক বাত বলুঁ বাবুজী? তুমনে মুঝকো নোকরি দি-থি, ইস্‌লিয়ে মুঝে পহ্‌লা গালি মানলি। অব দোস্‌রা দফে তুমনে মু খোলা তো—

না, হাবিলদার-মামা দ্বিতীয়বার আর মুখ খোলেননি।

কাশীশ্বরীও যেন ভূত দেখল : আপনি?

শ্বশ্রূমাতা অবাক বিস্ময়ে দেখছিলেন তাঁর পুত্রবধূকে! শেষ যখন দেখেন তখন সে কিশোরী, এখন তার বয়স ঊনচল্লিশ। ঘরে দশ-বারোজন পুরনারী—এয়োস্ত্রী সবাই। ওঁদের কাউকেই চেনেন না শঙ্করী। কাশীশ্বরী উঠে এল। প্রণাম করল শাশুড়িকে।

—কৈলাস কোথায়?

—ওপরের ঘরে। আসুন আপনি।

—না। এমন হুট করে যাব না। উত্তেজনায় হঠাৎ একটা ভালমন্দ হয়ে যেতে পারে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি একটু একটু করে ওকে খবরটা জানাও।

তাই হল। বোঝা গেল কৈলাস এতদিন পরে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উত্তেজনাটা সহ্য করতে পারবেন। তাই পারলেন তিনি। তাঁর দু-চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। শঙ্করী সমস্ত সন্ধ্যাটা বসে রইলেন তাঁর মাথার কাছে নাতিকে কোলে নিয়ে। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

একপ্রহর রাতে কাশীশ্বরী এসে বললে, এবার আসুন আপনি। কাপড় ছেড়ে জপতপ সেরে নিন। সারাদিন উপবাসে আছেন, বললে মহাবীর। দুটি প্রসাদ মুখে দিন।

কৈলাস ঘুমিয়ে পড়েছিল। শঙ্করী উঠে এলেন। কাশীশ্বরী ওঁকে প্রদীপ দেখিয়ে নিয়ে গেল তার ঠাকুরঘরে। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো পুজোর ঘর। সামনে একটি সিংহাসনে পটের ছবি—হংসেশ্বরীর! প্রণাম করলেন রানিমা। হরিণচর্মাসন পাতাই ছিল—কোশাকুশি, ফুল, বিল্বপত্র, দীপ-ধূপ সব আয়োজনই করা আছে। তবু পুজোয় বসলেন না রানিমা। খপ করে চেপে ধরলেন বধূমাতার হাতখানা। বললেন, দোরটা বন্ধ করে এখানে বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বৌ-রানিমা অবাধ্য হল না। দ্বার রুদ্ধ করে এসে বলল, কী কথা?

—বস আগে। এখানে।

কাশীশ্বরী বসল শাশুড়ির কোল ঘেঁষে। শঙ্করী ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমার ওপর রাগ করে আছ? কিন্তু আমি যে ওর মা।

—না। রাগ করে থাকব কেন? উনি যে যাবার আগে আপনাকে দেখতে পেলে খুশি হবেন তা বুঝতে পারছিলাম, সংকোচে আপনাকে ডাকতে পারিনি। অপরাধ তো আমরা কম করিনি। খোকার অন্নপ্রাশনে—

—থাক বৌমা। আজ আনন্দের দিনে সে-সব পুরনো কথা থাক। তুমি যে অভিমান করে নেই—

—অভিমান তো আপনারই করার কথা, মা—

—শোন। যে কথা বলতে তোমাকে ডেকেছি। এ কী অনাসৃষ্টি কথা শুনছি বৌমা? তুমি নাকি বলেছ—কৈলাসের সঙ্গে, মানে তুমি নাকি ...

—ঠিকই শুনেছেন। আপনি এসে পড়েছেন, এখন তো আর কোনো চিন্তাই রইল না। খোকাকে কার হাতে দিয়ে যাব সেটাই শুধু চিন্তা ছিল।

—কিন্তু কেন? তোমার কী বা এমন বয়স? কৈলাস কিছু পরিণত বয়সে যাচ্ছে না?

—এই তো হিন্দু সতীস্ত্রীর একমাত্র উদ্ধারের পথ মা। ভুল বুঝবেন না আমাকে, আপনাকে ব্যথা দিতে এ কথা বলছি না। আপনি যে সতী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন তার জন্য আমরাই দায়ী। আজ এতদিন পরে সেজন্য যাবার আগে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা না হই।

ঘরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল। তার শিখার দিকে তাকিয়ে শঙ্করী বললেন, বৌমা, জ্ঞানত কখনও আমি মিছে কথা বলিনি। তোমাকে এখন একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবে?

ভ্রূকুঞ্চিত হল কাশীশ্বরীর। বললে, কী এমন কথা?

— পুজোর ঘরে, মা হংসেশ্বরীর পটের সামনে বসে আমি যা বলছি তা আমার অন্তরের বিশ্বাস। এ ভুল। এ নিদারুণ ভুল। এ কোনো শাস্ত্রীয় বিধান নয়। আমি জানি, আমি জেনেছি। এক মহাপণ্ডিতের গ্রন্থ-পাঠে আমি স্থিরনিশ্চয় বুঝেছি—এ একটা নিষ্ঠুর প্রহসন। তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়।

উদ্দেশ্যে দুটি যুক্তকর কপালে ঠেকালেন।

কাশীশ্বরী সবিস্ময়ে বলে, কী ভুল! কীসের কথা বলছেন আপনি?

—সহমরণপ্রথা। না বৌমা, তোমাকে সতী হতে দেব না আমি।

ছিলে-খোলা ধনুকের মতো ছিটকে সরে গেল কাশীশ্বরী। বললে, মা! এ কী বলছেন? আপনি তো আমার মতো নিরক্ষরা নন! এমন অশাস্ত্রীয় কথা—

—ঐ একফোঁটা লেখাপড়া শিখেছি বলেই পড়েছি রাজা রামমোহনের লেখা 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ'। তাতেই জেনেছি, এ প্রথা শাস্ত্রীয় বিধান নয়।

কাশীশ্বরী শুধু বললে, আপনি পুজো করুন মা, আমি যাই।

—দাঁড়াও! আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়লেন শঙ্করী। বললেন, বৌমা, এ তোমার শাশুড়ির আদেশ। তোমার বাড়িতে অযাচিত এসেছি,—এ আমার প্রণামী!

মাথা খাড়া রেখে কাশীশ্বরী বললে, শাশুড়ি যদি অশাস্ত্রীয় আদেশ দেন, তা মানতে পারি না আমি। আপনি ওঁর মা, কিন্তু ধর্ম তার চেয়েও বড়!

মাথা খাড়া রেখেই দৃপ্ত পদক্ষেপে দোর খুলে বের হয়ে গেল কাশীশ্বরী। সে জানতেও পারল না পরমুহূর্তে ভূশয্যায় লুটিয়ে পড়লেন রানি শঙ্করী। জীবনে অনেক অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন—এমন হতাশ বোধ করেননি কখনও!

কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার খেলার ধরনটাই ঐরকম। শঙ্করী জীবনভর বারে বারে জেতা খেলা হেরেছেন, আজ তাই তাঁর হারা খেলাই জিতিয়ে দিলেন। মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরে এলেন কৈলাসদেব রায়—যে-ভাবে একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন বড়রানিমা। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। মাসছয়েক রানিমা ছিলেন সেইবার কলকাতায়—নিরলস সেবায়, যত্নে, শুশ্রূষায় যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন পুত্রকে। তারপর একদিন ছেলে ছেলেরবৌ নাতিকে নিয়ে বজরা করে ফিরে চললেন বংশবাটি। অনেক অনেকদিন পর দেওয়ানজি মালগুদাম থেকে বার করালেন শত শত মৃৎপ্রদীপ। সেগুলি কী-জানি কেন কেনা হয়েছিল, জ্বালা হয়নি। বৃদ্ধা মোতির মা সারাদিন ধরে একা হাতে সলতে পাকালো। বজরা যখন সাঁঝের বেলায় বংশবাটির ঘাটে লাগলো, তখন নৌকো থেকেই দেখা গেল রাজবাড়ির কার্নিসে কার্নিসে রোশনাই! দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পরে আজ রাজবাড়ি হাসছে।

১৮২৯ থেকে ১৮৩৮— নয় বৎসর। এই একটি দশক রানি শঙ্করীর জীবনে এসেছিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। ব্যাটা-ব্যাটাবৌ-নাতি। অন্দরমহলে মোতির মা, বার-মহলে দেওয়ান দিলীপ দত্ত আর মাঝমহলে লাঠি হাতে মহাবীর প্রসাদ। না, জঙ্গি শাসন নয়। হাবিলদার-মামা একটা মাসোহারা নিয়ে কাশী চলে গিয়েছেন। শতাব্দী পার হয়ে গেল প্রায়, অথচ তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি রাজাবরোধের অন্তরালের জীবনে। ঠিক তেমনি ভাবেই সাঁঝের বেলায় তুলসী বেদীতে প্রদীপ দেওয়া হয়, ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে খাসগেলাসের আলো। অন্দরমহলের প্রাঙ্গণে জুঁই-বেল-দণ্ডকলস ফোটে আর ঝরে। থোকা থোকা জোনাকি জ্বলে ঝোপে-ঝাড়ে, এক আকাশ তারা মিটমিট করে তাকায়। ডাকে শেয়াল, প্রহরে প্রহরে। বাজে শঙ্খ ঘণ্টা বাসুদেবের মন্দিরে—বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বৈকালি, সান্ধ্য পূজা, শয়নারতি। এবং অশোকবনে বিরহিণী জানকীকে দেখে আজও হনুমান বলছেন—এবার মহাবীর প্রসাদের কণ্ঠে—'বচনু ন আও নয়ন ভরে বারি। অহহ নাখ তেঁহ নিপট বিসারী।'

তাই বলে কি বদল হয়নি? হয়েছে। এ ফুলের গাছ, এ জোনাকির ঝাড়—এরা সবাই নবাগত। নতুন যুগের রাজা-মহাশয় বারমহল থেকে অন্দরমহলে যখন আহারাদি করতে আসেন বৌরানিমা একই ভঙ্গিতে পাখা হাতে সামনে বসে থাকেন, একই ভঙ্গিতে রসিকতা করেন—'এটা খাও, ওটা খাও,

না খাও তো আমার মাথা খাও'। শঙ্করীর মনে হয়—ঠিক যেন মা গঙ্গার মতো। রূপ তাঁর অপরিবর্তিত—কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যে জলরাশি যেখানে ছিল পরমুহূর্তে সে সেখানে নেই। বিরহিণী সীতার আর্তিতে একই করুণ মূর্ছনা; কিন্তু পাত্রের রূপ বদল হয়েছে। সীতা এখন গুরুপাদপদ্মনিরতা! গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন, বীজমন্ত্র পাননি। তা হোক, দুঃখ করে সেদিন বলেছিলেন—'কেন এলেন আপনি একটা সুখস্মৃতি ধ্বংস করে দিতে?' এখন বুঝতে পারেন—না, সে সুখস্মৃতিতে মালিন্য লাগেনি একতিল। কাব্যতীর্থ তাঁর প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নেননি! তিনি চিরসত্যাশ্রয়ী।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছেদ পড়ল রানি শঙ্করীর এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দঘন জীবনে। হঠাৎ মারা গেলেন কৈলাসদেব রায়। সাতান্ন বছর বয়সে। সজ্ঞানে রানি শঙ্করীর কোলে মাথা রেখে কাশীশ্বরী সহমরণে গিয়েছিলেন কি না এ প্রশ্নটাই অবৈধ। কারণ যে বৎসর ওঁরা বংশবাটিতে ফিরে আসেন সেই বৎসরই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করেছিলেন নব্যভারত-আত্মা রাজা রামমোহন রায়।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল আইনের নির্দেশে।

আরও দু বছর পরে ১৮৪০এ উনিশ বৎসর বয়সের তরুণ দেবেন্দ্রদেবের সঙ্গে বালিকাবধূ শ্রীমতী মৃন্ময়ীর বিয়ে দিলেন রানিমা। নাতি আর নাতবৌকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরে। না, নিজের ঘরে নয়। সে ঘরে ফুলশয্যা পাতা চলে না। সে হিসাবে ঘরটা অপয়া। বড়রানিমায়ের সেই সাবেক পালঙ্কটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজিয়েছেন। ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছেন। কার্নিসে আজও দীপাবলী। বরবধূকে পাশাপাশি বসিয়ে বৃদ্ধা বলেন, মুখখানা একটু তোল তো নাতবৌ।

মৃন্ময়ী মুখটা একটু তুলল! শঙ্করী তার ঘোমটা খুলে দিয়ে হঠাৎ তার ওষ্ঠে চুম্বন করলেন, বললেন, এমনি করে চুমু খেতে হয়। বুঝলে?

দেবেন্দ্রদেব মুখ টিপে হাসে। মৃন্ময়ী মরমে মরে যায়—ঠান্‌দির উৎকট রসিকতায়। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাবধূ। কাশীশ্বরী দাঁড়িয়েছিলেন চৌকাঠের কাছে। বললেন, আপনি এবার আসুন মা, ওদের ঘুমোতে দিন। সারা দিন ধকল তো বড় কম যায়নি। এবার ওরা ঘুমোক।

—ঘুমোবে! তুমি বলছ কি বৌমা? আমাদের যেন আর ফুলসেজ হয়নি—বলেই চমকে ওঠেন। সব কথা মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। নিজের জীবনের কথা। তাই তো! সে সব কথা তো মনেই ছিল না। নাতবৌকে উনি চুম্বনের কায়দা শেখাতে গিয়েছিলেন! ছি ছি ছি! কী লজ্জা! আটষট্টি বছরের বৃদ্ধা যে আজও জানেন না—পুরুষমানুষ চুমু খেলে নারীর শরীরে কী জাতের রোমাঞ্চ হয়!

ভাগ্যে সে কথা কেউ জানে না!

কাশীশ্বরী আবার তাগাদা দেন, আসুন আপনি!

—না বৌমা। আমার কাজ এখনও মেটেনি। তুমি যাও, এই তোরাও যা সব। বর-বউ এবার শোবে।

কে একজন মুখরা বলে ওঠে, ওরা শোবে, তা তুমি যাবে না ঠান্‌দি? তুমি কি পালঙ্কের নীচে আড়ি পাতবে নাকি।

—সে আমি বুঝব। যা তোরা! নাতির দিকে ফিরে বলেন, তুই একটু বাইরে যা। নাতবৌয়ের সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে। আধঘন্টা পরে আসিস।

রানিমায়ের হুকুম। খেয়ালি মানুষ তিনি। হয়তো কিছু কৌতুক বাকি আছে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো পুরললনার দল হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। দেবেন্দ্রদেবও উঠে পড়ে। বলে, বেশি দেরি করো না ঠাক্‌মা। আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

—ওরে আমার রে! অত ঘুম পেয়ে থাকে তবে আমার খাটে শুগে যা।

সকলকে ঘর থেকে তাড়িয়ে শঙ্করী ভিতর থেকে দোর বন্ধ করেন। বলেন, নাতবৌ, কিছু কথা আছে। এস, সবার আগে ওঁকে প্রণাম কর।

মৃন্ময়ী দেখল, ঠাক্‌মা একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে নির্দেশ করছিল। অলক্তকচর্চিত যুগল-চরণের ছাপ। শঙ্করী বলেন, উনি আমার বড়দি, তোমার বড়ঠাক্‌মা। মহামতি ছিলেন। আগে ওঁর আশীর্বাদ নাও।

মৃন্ময়ী গড় হয়ে সেই পটের সামনে প্রণাম করল। শঙ্করী ওকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন পাশের

ঘরে। বললেন, আমি আর এত রাতে ছোঁব না, স্নান করতে হবে। ঐ তারের ঢাকাটা খোল দিকি?

আদেশমতো একটা তারের জালতি খুলে ফেলে মৃন্ময়ী। তাতে নানান জাতের আহার্য। শঙ্করী বলেন, এ হচ্ছে রাজবাড়ির কুলাচার ; ফুলসেজের রাতে রাজা-মশাইকে রানি সামনে বসে খাওয়াবেন। এটাই নিয়ম। নাতিকে এই অন্নব্যঞ্জনের পাত্র ধরে দিবি। এই নে পাখা।

বালিকাবধূ বললে, পাখা কী হবে ঠান্‌দি, এটা তো মাঘ মাস।

—হোক, সেটাও নিয়ম। শোন, তিন রকম মাছ আছে; ঐ জামবাটিতে আছে মহাপ্রসাদ। ঐ থালায় আছে মিষ্টান্ন—জনাইয়ের মনোহরা, ধনেখালির খইচুর, চন্দননগরের তালশাঁস আর শ্রীরামপুরের 'গুঁফো সন্দেশ'—বলতে বলতেই তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

মৃন্ময়ী বললে, তুমিই বসিয়ে খাওয়াও না ঠান্‌দি। খাইয়েদাইয়ে বরং—হঠাৎ লজ্জায় সে থেমে পড়ে।

সবলে ওকে বুকে টেনে নেন শঙ্করী। বলেন, হ্যাঁরে নাতবৌ, তোর কি ভয় করছে?

ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে নাতবৌ শুধু বললে, হুঁ।

—দুর পাগলি! ভয় আবার কিসের? আমাকেও তো—

মাঝপথেই থেমে গেলেন। মৃন্ময়ী মুখ তুলে বললে, তোমার কত বছর বয়সে ফুলশয্যা হয়েছিল ঠান্‌দি?

সজ্ঞানে নাকি রানি শঙ্করী কখনও মিছে কথা বলেন না। এবারেও পারলেন না। বলেন, আর একদিন সব কথা তোকে বলব নাতবৌ। শুধু তোকেই বলব।

* * *

যে বছর সাগরদাঁড়ির জমিদার রাজনারায়ণের প্রতিভাশালী পুত্র খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন সেই বৎসরই জন্ম হল পূর্ণেন্দুদেব রায়ের—অর্থাৎ রানি শঙ্করীর প্রনাতি। দেবেন্দ্রদেব এবং মৃন্ময়ীর সন্তান!

আবার শিশু এসেছে সংসারে। না, আবার কেন? এই তো প্রথম। সদ্যোজাত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরার যে তৃপ্তি সেটা এই একাত্তর বছর বয়সে প্রথম অনুভব করলেন বংশবাটির ছোটরানিমা। পুত্র কৈলাসদেবকে পেয়েছিলেন তাঁর তরুণ বয়সে; পৌত্র দেবেন্দ্রদেবকে পেয়েছিলেন তাঁর সাত বছর বয়সে। এই প্রথম, জীবনে প্রথমবার, সূতিকাগারে প্রবেশ করে একটি সদ্যোজাত মানবকে তাঁর পঞ্জর-বিলীন অনাস্বাদিত স্তনযুগলের উপর চেপে ধরলেন।

এখন তিনি স্থবিরা। চোখে ভাল দেখেন না। বালাপোশ গায়ে শীতের সকালে বসে থাকেন বারান্দার একান্তে, যেখানে এসে পড়েছে একমুঠো রোদ। মালা টপকিয়ে জপ করেন। বীজমন্ত্র পাননি—'রাধামাধব' মন্ত্র জপ করেন। শাক্তবাড়ির বউ—হংসেশ্বরীর মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন! এ মন্ত্র তাঁকে কেউ দেয়নি। মাঝে মাঝে ছায়ামূর্তি সামনে দিয়ে চলে যায়। চোখের সামনে হাতটা তুলে রোদ-আড়াল করে বলেন, কে রে? কে যায়?

যে যায়, সে সাড়া দেয় না। আপনমনে গজগজ করে, জপ করছ, জপ কর না বাপু! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, এখনও সব দিকে নজর!

তা বটে! তা বটে! এখন উনি অকারণ, বাহুল্য। কে আসে কে যায়—সে খোজে ওঁর কী প্রয়োজন? যাঁর আসার কথা, তিনি তো এলেন না। কে জানে কোথায় দেহ রাখলেন! রাধামাধব! রাধামাধব!

তিন কুড়ি সাতের খেলা সাঙ্গ করেছেন। এ দুনিয়ায় হেসেছেন, কেঁদেছেন, ডুব খেয়েছেন, জল ভরেছেন। বাকি আছে বিদায় নেওয়া। জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বলতেন, ঠাকুর! এদের সব রেখে যেন হাসতে হাসতে যেতে পারি! এইটুকুই শেষ প্রার্থনা! খেলা তো সাঙ্গ হল, এবার তোমার কোলে টেনে নাও!

কাটল আরও আট-ন বছর। তিল তিল করে ভেঙে পড়ল দেহযন্ত্র। শঙ্করী এখন অশীতিপরা। চলৎশক্তিরহিতা। চোখে ভাল দেখেন না, কান কিন্তু খুব সজাগ, মস্তিষ্কও ঠিকই আছে। চিন্তাশক্তির পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ। মোতির মা অনেক দিন গেছে, মোতিও গেছে। মোতির মেয়ে এখন ওঁর দেখ্‌ভাল করে, ও ঠাক্‌মা। দুটি চালভাজা খাবা?

—চালভাজা! দূর পাগলি! দাঁত কই রে আমার যে, চালভাজা খাব!

—তবে দুধটুকু খাও। সকাল থিকে মুয়ে যে কুটোটি কাটনি গো?

—আমার আবার খাওয়া! রাধামাধব! রাধামাধব!

কিন্তু সেই রাধামাধবের বোধ করি এখনও তৃপ্তি হয়নি। সমস্ত জীবনভর দুঃখের বেশে তিনি নানাভাবে ঘুরে-ফিরে এসেছেন। বারে বারেই তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন রানি শঙ্করী। বারে বারে পাঁজর গুঁড়িয়ে গেছে, তবু ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাননি। এই আশি বৎসর বয়সে সেই অলক্ষ্যচারী নিষ্ঠুর বিধাতাপুরুষ আবার একটি কুলীশ-কঠিন বজ্র ছুঁড়ে মারলেন ওঁর স্তনবসিতবপু লক্ষ করে।

রাজবাড়ির সবাই ঐ নিকষা বুড়ীকে উপেক্ষা করত, শুধু একজন ছাড়া ; ওঁর আদরের ছুটকি। হ্যাঁ, ছুটকি! নাতবৌ-এর নূতন নামকরণ করেছিলেন তিনি! তুই আমাকে 'বড়দি-মা' বলে ডাকবি—আমি তোকে 'ছুটকি' বলে ডাকব। তোর সঙ্গে সতীন পাতালাম।

বোধ করি শঙ্করী এটা মেনে নিতে পারেনি—বংশবাটির রাজবাড়ি থাকবে অথচ সেখানে কোনো 'ছুটকি' থাকবে না! মহামায়া যেমন নবযৌবনবতী শঙ্করীর ভিতর নিজের দ্বিতীয়সত্তাকে আরোপ করতে চেয়েছিলেন, শঙ্করী দেবীও তেমনি ঐ নাতবৌ-এর মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চাইলেন। নিজের জীবনের ব্যর্থতা সার্থক করতে চেয়েছিলেন ঐ নূতন ছুটকির সাহায্যে। ভগবান শঙ্করীকে রূপ দিয়েছিলেন অপরিমিত—এই আশি বছর বয়সেও তাঁর গায়ের রং পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মতো, টুকটুকে ঠোঁট দুটি আজও পাতলা টসটসে। বলিরেখাঙ্কিত মুখে এখনও অদ্ভুত একটা দীপ্তি। মাথার চুল ধবধবে সাদা—কিন্তু এখনও গোছা-গোছা। রূপই দিয়েছেন—দেননি স্বামীসুখ, দেননি সন্তান। ওঁর এই দ্বিতীয় সত্তা, এই নতুন ছুটকি, সে অভাব পূরণ করেছে। একাশি বছরের 'পুরনো ছুটকি' আর একবিংশতিবর্ষীয়া 'নতুন ছুটকি' দুই সখী। মৃন্ময়ীকে খুলে বলতে পেরেছিলেন তাঁর সব বঞ্চনার ইতিহাস—অকপটে। সব, সব, স—ব কথা। নৃসিংহদেবের কথা, এবং, হ্যাঁ, কাব্যতীর্থের কথাও। মৃন্ময়ী অনায়াসে প্রশ্ন করতে পেরেছিল—তুমিও তাঁকে ভালবেসেছিলে তো বড়দি-মা?

দৃষ্টিহীন দুটি চোখ মেলে বৃদ্ধা বলতেন : সজ্ঞানে আমি মিছে কথা বলি না ছুটকি। কেন এই বুড়িকে লজ্জা দিচ্ছিস?

—অথচ তাঁর কাছে কোনো দিন স্বীকার করতে পারনি?

—তাই কি পারি? তিনি কত উঁচুতে।

আবার ছুটকিও তার দাম্পত্যজীবনের গোপন ইতিহাস অকপটে খুলে ধরত ঐ বৃদ্ধার কাছে। উনি চোখে দেখেন না, ওঁর কাছে আর চক্ষুলজ্জা কী? তাছাড়া মৃন্ময়ী বোধকরি বুঝতে পেরেছিল—ঐ অনিন্দ্যকান্তি সৌন্দর্যের দেবীপ্রতিমা এই অশীতিপর স্থবিরতাতেও সে বিষয়ে কৌতূহলী। তাই তাঁকে সব কথা খুলে বলতে সংকোচ করত না। বলত, তোমার নাতি আজকাল ভারি অসভ্য হয়েছে বড়দি। কাল রাতে কী হয়েছিল জান?—

খোলাখুলি নয়, আকারে-ইঙ্গিতে আভাস দেয়।

যেন কত বড় অভিজ্ঞ। ঠান্‌দি বলতেন, তুই যা ভাবছিস তা নয়। অমন 'বিপরীত কাণ্ড'ও হয়। ঐ কুলুঙ্গিতে একটা পুঁথি আছে। পেড়ে নিয়ে আয়। পড়ে শোনা, তুই তো বাংলা পড়তে পারিস। তুই পড়ে শোনা, আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব অখন।

—কী পুঁথি?

—'বিদ্যাসুন্দর'। রায়গুণাকরের লেখা।

*　　　*　　　*

তারপরেই নেমে এল বিনা মেঘে বজ্র!

মাত্র তিনদিনের জ্বরে মারা গেলেন একত্রিশ বছরের তরুণ দেবেন্দ্রদেব রায়।

ওঁরা স্থির করলেন বৃদ্ধাকে এ শোকটা পেতে দেবেন না। উনি আর কদিন! বৃদ্ধাকে তাই বলা হল মৃন্ময়ী তার বাপের বাড়ি গিয়েছে—হঠাৎ তার বাপের এখন-তখন অবস্থার খবর এসেছিল রাত্রে। দেবেন্দ্রদেব রাত্রেই রওনা হয়ে গিয়েছেন সস্ত্রীক। ঠান্‌দিকে বলে যেতে পারেননি।

শঙ্করী নির্বাক শুনে গেলেন। ওঁরা জানেন না, রাধামাধব ওঁর পাঁচটি ইন্দ্রিয় কেড়ে নিয়ে নতুন একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দান করেছেন। তারই মাধ্যমে বৃদ্ধা বুঝতে পারলেন কারচুপিটা। চোখ গিয়েছে, কিন্তু কান? তিনি যে শুনতে পান, কাশীশ্বরী গুমরে গুমরে কাঁদে। ন বছরের পূর্ণেন্দুর পদধ্বনি যে শুনতে পান তিনি। বড়দিদার ঘরের সামনে দিয়ে সে ছুটে পালায়। আর শুনতে পান ছুটকির চাপা দীর্ঘশ্বাস। চোখে দেখেন না, মনের চোখে দেখতে পান—তার পরনে উঠেছে সাদা থান, তার সীমন্ত জুঁইফুলের মত সাদা। তার তেইশ বছরের ব্যর্থ যৌবনের হাহাকার মনের মধ্যে নতুন করে অনুভব করেন—দ্বিতীয় ছুটকির বেদনা বিদ্ধ হয় প্রথমা ছুট্‌কির পাঁজরসর্বস্ব বুকে। মুখে স্বীকার করেন না! করতে পারেন না। এতদিনে বুঝতে পারেন, কেন তিন তিনটি বছর মূক হয়ে ছিলেন মহামায়া। এ লজ্জা যে তাঁরই। নিকষা রাক্ষসীর মতো অজর অমর আয়ু নিয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন—আর ভরা সংসার ফেলে দেবেন্দ্র চলে গেল ড্যাংডেঙিয়ে। না, ড্যাংডেঙিয়ে নয়, চুপিসাড়ে। অন্দরমহলে প্রকাশ্যে 'হরিবোল' পর্যন্ত দেয়নি শববাহকেরা। পাছে ঠান্‌দি টের পান। সারাদিন অশ্রুকে জমিয়ে রাখেন শঙ্করী—সারা রাতভর বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদেন : ঠাকুর! আজও কি আমার সময় হয়নি?

তারপর একদিন। কার্তিক মাস। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল রানি শঙ্করীর। চমকে উঠলেন তিনি। ঐ তো তিনি ডাকছেন : "রাই জাগো, রাই জাগো, ডাকে শুকসারী।" বলে, "কত নিদ্রা যাও তুমি—"

কার্তিকের প্রত্যুষে প্রভাতফেরি করে যাচ্ছে বৈষ্ণবী। রানি শঙ্করীর মনে হল, না, প্রভাতফেরি নয়। তিনিই ওঁকে ডাকছেন। শুকসারী নয়, তাঁর শ্যামই ডাকছেন—রাই জাগো, রাই জাগো! আর কত ঘুমোবে?

বুকে একটা বেদনা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে তিনি বুঝতে পারেন, মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। ঘটাকাশ এবার পটাকাশে মিলবে। মুক্তির ডাক অন্তর থেকে শুনতে পাচ্ছেন। ডাকলেন তিনি, পুঁটু! ও পুঁটু! ওঠ্ মা!

মোতির মেয়ে পটেশ্বরী পাটি পেতে মাটিতে শুয়েছিল। এই ঘরেই শোয় সে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বলে, ঠাম্মা ডাকতিছ?

—হ্যাঁ। বৌমাকে ডেকে নিয়ে আয়। জরুরি!

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করেন কাশীশ্বরী, কী হয়েছে মা? ডাকছেন?

—হ্যাঁ মা। এতদিনে সময় হয়েছে। আমি তাঁর ডাক শুনতে পেয়েছি। এবার যাব আমি।

—কী বলছেন আপনি! শরীরগতিক খারাপ লাগছে? কবিরাজ-মশাইকে ডাকব?

—তাঁকে তো ডাকবেই। না, ওষুধ পাঁচন আর খাব না আমি। তবে তিনি নাড়িটা দেখে বলে যান, কতক্ষণ এ যন্ত্রণা সইতে হবে। আমার মনে হ্চ্ছে, সূয্যি ডোবার আগেই—

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কাশীশ্বরী—শঙ্করী আবার ডাকলেন, আর একটা কথা, বৌমা। শোন। এদিকে এস।

ঘনিয়ে আসেন কাশীশ্বরী। শঙ্করী ওর হাতটা চেপে ধরে বলেন, শেষ সময়ে আর ছলনা করো না মা, ছুটকিকে পাঠিয়ে দাও। শেষ দিনটা তাকে নিয়ে—

—ছুটকি? মানে বৌমা?

—হ্যাঁ। আমি সব জানি রে। স্বীকার করতে পারিনি। কোন লজ্জায় করব? আমি বেঁচে রইলাম, আর দেবেন ড্যাংডেঙিয়ে—

কাশীশ্বরী জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধাকে। এতদিনে তাঁর সঞ্চিত কান্নাটা কাঁদতে পারলেন তিনি। শঙ্করীর কাছে এসে, কাছে পেয়ে, তাঁকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। শ্রদ্ধা করেছিলেন। শঙ্করীকে না ভালবেসে থাকা যায় না।

মৃন্ময়ীও এল। সেও কাঁদল বুকফাটা কান্না। তারপর বললে, বড়দি, তোমার কি ভয় করছে?

চাকা পালটে গেছে। এবার মৃন্ময়ীই তাঁকে অভয় দিতে বসেছে। শঙ্করী বললেন, দূর পাগলি, আমি

তো তাঁর কাছে যাচ্ছি। সেখানে তোর ঠাকুর্দা আছেন, বড়দি আছেন, দেবেন আছে, কৈলাস আছে—তারা সবাই যে আমার প্রতীক্ষা করছে। কে জানে, হয়তো তিনিও আছেন আমার প্রতীক্ষায়।

—কে? তোমার গুরুদেব! কাব্যতীর্থমশাই?

ম্লান হাসলেন রানি শঙ্করী। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বংশবাটির ছোটরানিমা।

সেখানে কিন্তু ভুল হয়েছিল শঙ্করী দেবীর। কাব্যতীর্থমশাই এখনও আছেন এ ধরাধামে। সাতাশি বছরের বৃদ্ধ। জরাজীর্ণ নন তা বলে। এখনও তাঁর দৃষ্টি ঠিক আছে, এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। তা বলে তাঁর কি পরিবর্তন হয়নি? হয়েছে। অর্থ শতাব্দী পূর্বে তিনি যখন বংশবাটির খেয়াঘাটে রামমোহনের বজরায় চেপেছিলেন তখন তাঁর মস্তক ছিল মুণ্ডিত, অর্কশিখায় বিদ্ধ ছিল শ্বেতকরবী, কপালে ছিল শ্বেত-চন্দনের টিপ, মুখ খেউরি করা—নিরাবরণ ঊর্ধ্বাঙ্গে ছিল শুধু যজ্ঞোপবীত। আজ তাঁর একমাথা সাদা চুল, একমুখ দাড়ি—ললাটে চন্দনের পরিবর্তে ত্রিবলী, ঊর্ধ্বাঙ্গে পিরাণ এবং তার উপর কম্বল। সমগ্র ভারতভূখণ্ড পরিক্রমা করেছেন পদব্রজে। কন্যাকুমারিকা থেকে জ্বালামুখী, দ্বারকাধাম থেকে কামাক্ষা। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেননি আদৌ। কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন কাশীধামে। তারপর থেকে পথে পথেই কেটেছে। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকদণ্ড তিনি কাটিয়ে গিয়েছেন জন্মভূমিতে—সেই যেদিন নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছিলেন, রানি শঙ্করী সহমরণে যাচ্ছেন শুনে। জন্মভূমি তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নৃসিংহদেবের চিতায় অগ্নি-সংযোগের পূর্বেই।

নৌকা ঘাটে এসে লাগল। অতি বৃদ্ধ শঙ্করদেব এগিয়ে এলেন গলুইয়ের কাছে। মাঝি বললে, হুঁশিয়ার বুড়াবাবু, ঘাট পিছল হৈ!

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, গোটা সংসারটাই তো পিছল, মাঝি-ভাই।

পদস্পর্শ করার পূর্বে সেই ঘাটের গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে ললাটে লেপে দিলেন। তারপর নামলেন এক-হাঁটু জলে। বংশবাটির খেয়াঘাটে।

চিনতেই পারছিলেন না। এই সেই বংশবাটির খেয়াঘাট? সেই জড়াজড়িকরা তেঁতুল-বটটা গেল কোথায়? আর দোবেজির সেই ছাপড়া-ঘেঁষে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছটা? দোবেজির ছাপরাটাই বা কোথায়? না, ঘাটওয়ালা রামাওতার দোবেকে চেনে না, নামই শোনেনি কখনো।

ঘাটের ধারে ধারে সর্ষের ক্ষেত! ফুল ধরতে শুরু করেছে। বাঁ দিক দিয়ে মন্দিরে যাবার হাঁটা পথটা ছিল। সেখানে এক এড়ো-এড়ি পাকা পাঁচিল। কাব্যতীর্থ একজন পথচারী প্রৌঢ়কে বললেন, মন্দিরে যাবার পথটা কোনদিকে?

—কোন মন্দির?

এ আবার কী প্রতিপ্রশ্ন! পঞ্চাশ বছর পূর্বে মন্দির বলতে ঁঅনন্তবাসুদেব মন্দিরই বোঝাতো। জবাব না পেয়ে প্রৌঢ় পুনরায় বলেন, মায়ের মন্দিরে যাবেন? হংসেশ্বরী মন্দির?

—হংসেশ্বরী! মায়ের মন্দিরের নাম তো স্বয়ম্ভরা।

—হ্যাঁ, সে মন্দিরও আছে। সবই কাছাকাছি। ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে যান। মশায়ের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে? নিবাস?

—তীর্থযাত্রী বাবা। পথই আমার ঘর।

বৃদ্ধ এগিয়ে চলেন। তাহলে 'হংসেশ্বরী' নামে একটি মন্দিরও হয়েছে ইতিমধ্যে তাঁর গ্রামে! তা হোক। তিনি প্রথমে যাবেন ঁঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে। যে দেব-দেউলের পুরোহিত ছিলেন তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব ত্রিপুরেশ্বর ন্যায়রত্ন মশাই। সর্বতীর্থ পরিক্রমা সেরে কাব্যতীর্থ শেষপর্যন্ত ফিরে এসেছেন স্ব-গ্রামে। একটিই বাসনা আছে—এই গঙ্গাতীরের শ্মশানঘাটে যেন তাঁর শেষকৃত্য হয়। এই ঘাটে শুয়েছেন ন্যায়রত্ন, ভট্টশালী, বিদ্যালঙ্কার। আরও একশো বছর আগে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঠাকুরের গুরু অর্থাৎ তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার। শুধু তাই নয়, এই শ্মশানঘা... ণ্যতীর্থে

স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ করেছিলেন সেই মহীয়সী নারী—যাঁর 'কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে' কাব্যতীর্থ নাকি—রাজারামের হিসাবে—ঘর থেকে পথে ছিটকে পড়েছিলেন।

ঁঅনন্তবাসুদেব মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন শঙ্করদেব। এই দেবালয়টিই হচ্ছে তাঁর পিতার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের লীলাক্ষেত্র। এর প্রতিটি শিলায়, প্রতিটি সোপানে, প্রতিটি ধূলিকণায় তাঁর পিতৃস্মৃতি বিজড়িত। 'পিতরি প্রীতীমাপন্নে প্রিয়তে পরমেশ্বরঃ'—না, সুপরিচিত শ্লোকটির ভ্রমাত্মক আবৃত্তি করেননি তিনি—অনুপ্রাসের অনুরোধে সজ্ঞান রূপান্তরও নয়; এর মূল আরও গভীরে নিহিত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ভূতলেই—মন্দির চত্বরে না উঠেই। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মন্দিরের তরুণ পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখে। তাঁর হাতে কুশীপাত্র। বললেন, চরণামৃত নিন বাবা!

হাত দুটি জোড় করলেন শঙ্করদেব, বললেন, মার্জনা করবেন।

—মার্জনা করব? অর্থাৎ চরণামৃত নেবেন না?—পুরোহিত যারপরনাই বিস্মিত।

শঙ্করদেব নীরব। প্রত্যুত্তর করতে পারলেন না।

—আপনি হিন্দু তো?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে?

—বাধা আছে।

আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তরুণ পুরোহিত বলেন, ভিনদেশের যাত্রী দেখছি, আপনার পরিচয়?

কাশফুলের মতো সাদা মাথাটা নেড়ে কাব্যতীর্থ বলেন, না। ভিনদেশি নই, পুরোহিত মহাশয়। এই গ্রামেই আমার জন্ম, আমার বাল্যভূমি; এই মন্দিরেরই পুরোহিত ছিলাম গত শতাব্দীতে। আমার নাম শ্রীশঙ্করদেব কাব্যতীর্থ।

পুরোহিত স্তম্ভিত। বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার নাম তো আমার জানা। তাহলে চরণামৃত প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? অন্তেবাসীর মতো নীচে দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন? উঠে আসুন উপরে।

—আপনি রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনেছেন?

—নিশ্চয়ই। যাঁর উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হল।

—আমি তাঁরই শিষ্য। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করি না।

এবার পুরোহিত বজ্রাহত। দম নিয়ে বলেন, কেন ঠাকুরমশাই? জাত দিলেন কেন?

—জাত দিয়েছি বলে আমি মনে করি না। আমি হিন্দুই আছি, ব্রাহ্মণই আছি, উপবীত ত্যাগ করি নাই— আমার গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কিন্তু যাক সে-কথা, ঘাটে একজন বললেন, মা হংসেশ্বরীর মন্দিরের কথা। সেটা কোথায়?

পুরোহিত অভিমান করে বলেন, আপনি তো ব্রহ্মজ্ঞানী, তাহলে মায়ের মন্দির দর্শন করতে চাইছেন কেন? জাত যাবে না?

হাসলেন কাব্যতীর্থ। বললেন, আমি জুম্মা মসজিদ দেখেছি দিল্লিতে, সেন্ট পল্‌স্ চার্চ দেখেছি কলকাতায়, স্বর্ণমন্দির দেখেছি অমৃতসরে, থুপারাম স্তূপ দেখেছি সিংহল দ্বীপে গিয়ে। হংসেশ্বরী মন্দির দর্শনেও আমার জাত যাবে না ভাই।

পুরোহিতের কৌতূহলই জয়লাভ করল। বললেন, ঐ তো সেই মন্দির।

তাই তো! পিতৃস্মৃতির মধ্যে মগ্নচৈতন্য ছিলেন বলে এতক্ষণে নজরে পড়েনি। ঁঅনন্তবাসুদেবের গা-সই-সই উঠেছে নূতন দেব-দেউল— হংসেশ্বরী শ্রীমন্দির।

—বাঃ! অপূর্ব! আমার স্বগ্রামে এতবড় দেব-দেউল—হংসেশ্বরীর শ্রীমন্দির। আমি খবরই রাখি না! কে তৈরি করলেন এ মন্দির?

—রাজা-মহাশয় নৃসিংহদেব রায়। বর্তমান রাজার প্রপিতামহ।

কাব্যতীর্থ ততক্ষণে পাঠ করতে থাকেন মন্দিরগাত্রের প্রস্তর-ফলকটি :

"শকাব্দে রস-বহ্নি মৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বর সমং হংসেশ্বরী রাজিতং।।

ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মাণে।।”

পাঠ্যান্তে বিস্ময়াবিষ্ট কাব্যতীর্থ বলেন, তার অর্থ?

পুরোহিত বিস্মিত হন কাব্যতীর্থের বিহ্বলতায়। বলতে থাকেন শ্লোকটির বঙ্গার্থ।

—আঃ! আমি অন্বয়-ব্যাখ্যা চাইছি না। আমি জানতে চাইছি, নৃসিংহদেবের আরব্ধ মন্দির তদাজ্ঞানুগা শ্রীশঙ্করী কী ভাবে সমাপ্ত করতে পারেন?

—কেন? এর মধ্যে অনুপপত্তি কোথায়?

—কী আশ্চর্য! ছোটরানিমা তো স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন।

পুরোহিতের মুখে এতক্ষণে হাসি ফোটে : ও বুঝেছি। আপনি বুঝি তাই শুনেছেন? হ্যাঁ, এমন একটা কথা প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে রানিমা তাঁর অভিমত পরিবর্তন করেন। সহমরণে যাননি তিনি।

চমকে ওঠেন কাব্যতীর্থ : কী! কী বললেন আপনি? সহমরণে যাননি শঙ্করী?

পুরোহিত বলেন, সে অনেক কথা।

—অনুগ্রহ করে বলবেন? আমি—আমি—কী বলব? অত্যন্ত আগ্রহী—

পুরোহিত সংক্ষেপে অর্ধশতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন—কীভাবে থানাদারের কাছে ফৌজ প্রার্থনা করে রানিমা কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছিলেন—কীভাবে তিনি দেশের রানি হয়েও একঘরে হয়ে থাকেন, কীভাবে স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূরণ করেন, এবং কেমন করে দীর্ঘস্থায়ী মামলায় পুত্রের সঙ্গে বিবাদে সর্বস্বান্ত হন, হুগলি-আদালতে ইতিহাস রচনা করে আসেন বংশবাটির রাজান্তঃপুরিকা—পর্দানসীন বিধবা।

কাব্যতীর্থের শীর্ণ গণ্ড বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিল। থামতেই বলেন, তারপর? তারপর কী ভাবে তাঁর দেহান্ত হল?

—দেহান্ত হবে কেন? কাল রাত্রেও শয়নারতির পর আমি তাঁকে ভোগ পৌছে দিয়ে এসেছি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফ দিয়ে উঠে পড়েন শঙ্করদেব।

রাজবাটির সিং-দরোজায় মহাবীর প্রসাদ তাঁকে রুখল, জারাসে ঠাহ্‌রিয়ে! কাকে চান বুড়া বাবুমশায়?

—আমি রানিমার সাক্ষাতে এসেছি। ছোটরানিমা, বুড়িমা, রানি শঙ্করী।

মহাবীর দার্শনিক উদাসীনতায় বললে, দেরি হইয়ে গেছে বাবুমশায়। বুড়িমাকে আজ সকালে লিয়ে গেল যে!

হ্যাঁ, আজ সকালেই এই সিং-দরোজা দিয়ে তাঁকে শেষবারের মতো নির্গত হতে দেখেছে মহাবীর। ডুলিতে নয়, শববাহীদের স্কন্ধে। শ্মশানঘাটের দিকে। মহাযাত্রায় সে অংশ নিতে পারেনি। শূন্য পুরী পাহারা দিচ্ছে! উঃ! কত লোক হয়েছিল! সংকীর্তন করতে করতে তারা নিয়ে গিয়েছে তাদের রানিমাকে। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে হাসতে হাসতে বিদায় নিয়েছিলেন রানীমা, তাঁর অতিসাধের রাজবাড়ি থেকে। অন্তর্জলিযাত্রা।

জ্ঞান আছে? এখনো জ্ঞান আছে! অস্নাত অভুক্ত পথশ্রমে ক্লান্ত অশীতিপর বৃদ্ধ ছুটতে থাকেন শ্মশানের দিকে। সব কিছু বদলে যায়, শ্মশান বদলায় না। সেখানে পৌঁছতে পথ ভুল হয় না। কার্তিকের অপরাহ্ণেও বৃদ্ধের ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটে উঠল।

মহাশ্মশান জনারণ্যে পরিণত। কাতারে কাতারে মানুষ। বংশবাটির অতি জনপ্রিয়া রানিমা সসম্মানে বিদায় নিচ্ছেন। সেই রানিমা, যাঁকে ওরা একদিন একঘরে করেছিল; সেই রানিমা, যিনি ঘোমটা খুলে আদালতের কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে বংশবাটির আবালবৃদ্ধবনিতা লজ্জায় অধোবদন হয়েছিল! তিল তিল করে এতদিনে তিনি আবার সম্মানের তুঙ্গশীর্ষে উঠে গিয়েছিলেন! বংশবাটির মানুষ এতদিনে বুঝেছে—তারাই ভুল করেছিল; রানিমা নয়। তাঁর মহাপ্রয়াণে জনসমাগম হবে না?

গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার একদিকে চিকের আড়াল। সেখানে

সমবেত হয়েছিল পুরললনার দল। রানি শঙ্করী একটি পালঙ্কে শায়িতা। তাঁর অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাতীরে, অর্ধ অঙ্গ গঙ্গানীরে। না, অর্ধ অঙ্গ নয়, শুধু সেই বলিরেখাঙ্কিত দুটি চরণ ডুবে আছে জলে। ছোট ছোট ঢেউ এসে আদর করছে পায়ের পাতায়—ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল। একদল কীর্তনিয়া সেই অন্তিম শয্যাটি ঘিরে হরিসংকীর্তন করছে। পরিক্রমা করছে পালঙ্ক। গঙ্গার দিকে পরিক্রমা করার সময় তাঁদের জলে নামতে হচ্ছে। কিছু দূরে বসে একজন পণ্ডিত শ্রীমদ্ভগবৎগীতা পাঠ করছেন :

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।"

বহুপঠিত শ্লোকটিতে কিন্তু আজ সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন না কাব্যতীর্থ। শঙ্করীর আত্মা দেহরূপ-বস্ত্র ত্যাগ করে দেহাতীত আবরণে আবৃত হবে ঠিকই; কিন্তু এ বংশবাটিতে যে স্থানটি শূন্য হয়ে গেল তা তো পূর্ণ হবে না। আত্মার নিত্যতা যেমন ধ্রুবসত্য, দেহীর অনিত্যতাও তেমনি অনস্বীকার্য! বংশবাটিতে নতুন নতুন রানি আসবে—কিন্তু কোনোদিন কি ফিরে আসবে সেই যৌবনচঞ্চলা ছুট্‌কি, ছোট-রানিমা?

কবিরাজমহাশয় মাঝে মাঝে এসে নাড়ির গতি পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। তাঁর দক্ষিণ হস্তে একটি সাবেক বালুকা-ঘড়ি। বলছেন, তাঁর গণনা অভ্রান্ত—সূর্যাস্ত মুহূর্তে ঐ মহীয়সী মহিলার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। রানি শঙ্করীর মাথার কাছে বসে আছে নতুনযুগের নতুন রাজা-মহাশয়, দশমবর্ষীয় বালক পূর্ণেন্দু দেব রায়, ওঁর প্রনাতি। মাঝে মাঝে গঙ্গোদক দিচ্ছে ওঁর বিশুষ্ক ওষ্ঠে। দু-এক ফোঁটা গলায় যাচ্ছে ; অধিকাংশই কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রানিমার বাম অঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছে। তবু পূর্ণ জ্ঞান আছে, এখনো। বাকরোধ হয়নি। একজন ব্রাহ্মণ ওঁর কর্ণমূলে 'তারকব্রহ্ম নারায়ণ' মন্ত্রোচ্চারণ করছেন।

কাব্যতীর্থ সমস্ত পরিবেশটা দেখে নিলেন একবার। পরিচিত একটি মানুষকেও দেখতে পেলেন না। কেমন করে পাবেন? তিনি যে গত শতাব্দীতে দেশত্যাগ করে গেছেন। এই জনারণ্যের মধ্যে মাত্র একটি মানুষই তাঁর পরিচিত—ঐ পালঙ্কে শায়িতা অশীতিপরা মৃত্যুপথযাত্রিণী। তাহলে এই জনারণ্য ভেদ করে কেমন করে পৌঁছবেন তাঁর কাছে! কী পরিচয়ে? এঁরা তাঁকে কাছে যেতেই বা দেবেন কেন? তাছাড়া মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়িয়ে রানি শঙ্করীই যে তাঁকে চিনতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কী? তাই বলে ফিরে যাবেন? এতদূর এগিয়ে এসে? হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। চিতা নিভে গেলে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে যাবেন। আজ অমর্তলোকে ঐ রানিই যে তাঁর অগ্রজা হতে বসেছেন!

কাব্যতীর্থের কোন ভূমিকা তো এখানেই নেই :

"বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁম ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।।"

"অনন্তর এই প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হবে। হে চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃত এবং কর্তব্য বিষয় স্মরণ কর।"

কী এখন ওঁর কর্তব্য? দূর থেকে শুধু ঐ মৃতপথযাত্রিণীর আত্মার সদগতি কামনা করা? অগ্নিদেবকে অনুরোধ করা—হে অগ্নি! তুমি ওঁকে সুপথে নিয়ে যাও। হে দেব! তুমি তো আমাদের সমস্ত কর্ম জানো। ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে এই বৃদ্ধের যে অন্তর্লীন সম্পর্ক তা তো অন্তত তোমার অবিদিত নাই? তাই এই চরম মুহূর্তে প্রার্থনা করছি, আমাদের যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা মার্জনা করো প্রভু! তোমাকে বারংবার প্রণাম!

'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যাস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।।"

—বুড়াবাবুমশায়! মা আপনারে ডাক্‌তিছেন!

চমকে ওঠেন কাব্যতীর্থ। একটি আট-দশ বছরের বালিকা! বলেন, আমাকে? কে ডাকছেন? কেন?

শঙ্করদেব মেয়েটির অঙ্গুলি-নির্দেশের সংকেত অনুযায়ী দেখলেন—ঘেরাটোপের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিধবা বধূ। বছর বাইশ-তেইশ বয়স, থান পরা, নিরাভরণা। দেখেই মনে হল, ঐ যে বিধবা মেয়েটি আজো এ পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের আনন্দ আস্বাদন করছে তা শুধু তাঁর

সেই বয়স্যের আশীর্বাদে। বয়স্য-পথপ্রদর্শক-গুরু! পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন কাব্যতীর্থ: তুমি আমাকে ডাকছিলে, মা?

মেয়েটি অবগুণ্ঠন অল্প অপসারিত করে নির্নিমেষ নয়নে তাঁকে দেখছিল। বললে, আপনিই কি শঙ্করদেব কাব্যতীর্থমশাই?

শঙ্করদেব স্তম্ভিত। স্বগ্রামে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। এই তরুণী বিধবাটির জন্ম তাঁর দেশত্যাগের বহু বহু দশক পরে। তাহলে সে কেমন করে চিনতে পারল তাঁকে? পরম করুণাময়ের এ কী লীলা! বললেন, হ্যাঁ মা। কিন্তু....কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে?

—আমি যে জানতাম, আপনি আসবেন। এত দেরি করলেন কেন?

শঙ্করদেব সবিস্ময়ে বলেন, তুমি জানতে আমি আসব! তুমি কি অন্তর্যামী! তুমি কে?

—আমি ছুট্‌কি! বংশবাটির ছোটরানিমা।

শঙ্করদেব বজ্রাহত। সব ভুল হয়ে গেল তাঁর। স্থান-কাল-পাত্র। অর্ধশতাব্দীর বিস্তার যেন বিন্দু হয়ে, ছায়া হয়ে 'না'-হয়ে মিলিয়ে গেল! কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে তিনি কি শতাব্দীর ও-প্রান্তে পৌঁছে গেলেন? শঙ্করী কি বৃদ্ধা হয়ে যায়নি? শঙ্করী কি অনন্তযৌবনা? দেহাতীত আত্মার মতো অজর অমর?

—আসুন আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি যে আপনার পথ চেয়েই এখনও বেঁচে আছেন!

—তিনি। তিনি কে?

—বাঃ! আমার ঠাকুমা—রানি শঙ্করী। তিনি যে আপনার প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেয়েটির পিছন পিছন এগিয়ে আসেন শঙ্করদেব। না, বাধা পেতে হল না। বুঝলেন, এ মেয়েটি একালের রানিমা, একালের ছুট্‌কি!

মৃন্ময়ী ওঁর হাত ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল রানিমার পালঙ্কের পাশে। নিজে বসল অপর পার্শ্বে। তাঁর কর্ণমূলে বললে, বড়দি, চোখ চেয়ে দেখ। তিনি এসেছেন!

শঙ্করী চোখ চাইলেন। বললেন, এতক্ষণে?

আশ্চর্য! বিশ্বনিয়ন্তার এ কী অপূর্ব লীলা! অসমবয়সি দুই সখীর কাছে শতাব্দীর ওপার থেকে নিতান্ত দৈবক্রমে অন্তিম মুহূর্তে শঙ্করদেবের এ প্রত্যাগমন কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। যেন পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতোই তিনি এতক্ষণে এসে পৌঁছেছেন—আসার কথাই ছিল, পথে কিছু দেরি হয়েছে, এই যা!

—কই তিনি?

—ঐ তো তোমার ডান পাশে।

হাত দিয়ে ধরে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল।

শঙ্করী তাকিয়ে আছেন, কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না। দৃষ্টি না থাক, স্পর্শেন্দ্রিয় সক্রিয়। ধীরে ধীরে শঙ্করদেবের সারা গায়ে বলিরেখাঙ্কিত ডান হাতটা বুলোলেন। বললেন, কিন্তু এ তোমার কী রূপ ঠাকুর? তোমার শিখা কই? তোমার গায়ে পিরান, মুখে দাড়ি!

কাব্যতীর্থ অনেকটা সহজ হয়েছেন। হেসে বললেন, তুমিও যে অনেক বদলে গেছ শঙ্করী! তোমার সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণ কই? সেই 'মধ্যক্ষামা' গঠন কই? হরিণনয়নের দৃষ্টি কই?

—এই তো। আমার সবাই আছে। কিছুই হারায় না—

মৃন্ময়ীকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। মৃন্ময়ী সলজ্জে নয়ন নত করে। হরিণনয়ন!

—কিন্তু একটা কাজ যে বাকি আছে ঠাকুর! ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছিলে। গুরুদক্ষিণা নিয়ে গিয়েছ, বীজমন্ত্র তো দাওনি। দাও। আমার কানে কানে বলে দাও। না হলে পারের কড়ি গুণে দেব কেমন করে?

শঙ্করদেব অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। এ প্রশ্ন উঠে পড়বে তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি যে এখন বিধর্মী! তিনি নিজে তা মনে করেন না, কিন্তু লোকে তো তাই ভাবে। রাজা রামমোহনের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—না, দীক্ষা-নেননি, তবু রাজা রামই যে ওঁর নয়নে পরিয়েছেন জ্ঞানাঞ্জনশলাকা। এত সব তত্ত্বকথা তো অল্প সময়ে বোঝানো যাবে না ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণীকে। অথচ কুলগুরুর অধিকারে

এমন অবস্থাতে বীজমন্ত্রদানও যে অত্যন্ত অধর্মের কাজ হবে। শুধু অধর্ম নয়, মিথ্যাচার—যে মিথ্যাকে ওঁরা দুজনেই আজন্ম পরিহার করে গিয়েছেন।

—কী ঠাকুর! মন্ত্র দেবে না তুমি?

—আমি তো শক্তিমন্ত্র দেব না শঙ্করী!

শঙ্করী মৃদু হাসলেন। গত শতাব্দীতেই তো এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি।

—না, বৈষ্ণব মন্ত্রেও দীক্ষা দিতে পারব না। আমি আজ আর পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী নই। সেই মহামানব রাজা রামমোহনের প্রভাবে আমি এখন গুণাতীত পরমব্রহ্মের উপাসক। কালী নয়, শিব নয়, হংসেশ্বরী নয়, রাধামাধব নয়!

অনেকক্ষণ চোখের পাতা পড়ল না শঙ্করীর। দু চোখ বেয়ে শুধু দুটি জলের ধারা নেমে এল। বিশীর্ণ একটি হাত বাড়িয়ে শঙ্করদেবের হাতটি ধরলেন। অস্ফুটে বললেন, একবার ভুল করেছি। দ্বিতীয়বার করব না। রাজারামের কাছ থেকে যে সম্পদ পেয়ে তুমি সব ছেড়েছ তারই খুদকণা আমার কানে কানে বল। সেই মন্ত্রই দাও। তোমার হাত ধরেছি। পারানির কড়ি কটি গুণে দেবার পাথেয় তোমার হাত থেকেই নেব যে আমি। আর তো হাত ছাড়ব না ঠাকুর।

—কোনো দ্বিধা নেই?

—কিসের দ্বিধা? 'তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

শঙ্করদেবও দ্বিধামুক্ত হলেন। অবলীলাক্রমে মৃত্যুপথযাত্রিণীর শীর্ণ কণ্ঠ আলিঙ্গন করে ধরলেন। ঘনিয়ে এল তাঁর মুখ, ওঁর মুখের কাছে। কর্ণমূলে অতি সন্তর্পণে, অতি নিভৃতকূজনে দিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের বীজমন্ত্র।

পারানির কড়ি!

যেন ফুলশয্যা-রাত্রে কানে কানে বলা—'তোমাকেই ভালবাসি!'

ব্রাত্য

উৎসর্গ

শ্রীকালিদাস সান্যাল

ও

শ্রীমতী কল্পনা দেবীকে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্মৃতিস্বরূপ

প্রথম প্রকাশ : 1959

রচনাকাল : 1958

প্রবীণ ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর হঠাৎ মনে হল দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বুঝিবা ব্যর্থই হয়ে গেছে। খোলা খবরের কাগজটা পড়ে আছে অপঠিত, আধখাওয়া কফির কাপের কোনায় মাছির জটলা। সিগারের আগুনটা যে বহুক্ষণ হল নিভে গেছে দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর বুঝি তা জানতে পারেনি এখনও। উদাস দৃষ্টি মেলে পরমানন্দ তাকিয়েছিলেন জানলার বাইরে। সকালের রৌদ্র বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। নন্দ-বেয়ারা এসে কফির কাপটা তুলে নিয়ে গেল। একবার ইতস্তত করে খাবারের প্লেটটার সামনে দাঁড়িয়ে, তারপর কী মনে করে সেটাও তুলে নেয় হাতে।

হঠাৎ কী ভেবে ওকে ফিরে ডাকলেন চৌধুরীসাহেব। নন্দ নিশ্চয়ই এটা আশা করেনি—থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। পরমানন্দ হেসে বলেন—ওটা নিয়ে যাচ্ছিস কেন রে? খাইনি আমি কিছু।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নন্দ জবাবে বলে—একেবারে জুড়িয়ে গেছে স্যার, আমি আবার করিয়ে আনছি।

—ওই টোস্ট আর পোচটা শুধু নিয়ে যা। ফ্রুটস-এর প্লেটটা রেখে যা বরং। আর পারিস তো কফি আর একবার করে পাঠিয়ে দিস।

কৃতার্থ হয়ে গেল নন্দ। খাবারের প্লেটটা আবার টিপয়ে নামিয়ে রেখে চলে যায় সে।

কয়েকটা আপেলের টুকরো তুলে মুখে দিলেন। ইচ্ছা করছে না—তবু খেতে হবে। প্লেটটাকে শেষ করতে হবে। না হলে ওরা মনে করবে সাহেব একেবারে ভেঙে পড়েছেন—অন্নজল ত্যাগ করেছেন বুঝিবা। খেতে কিন্তু বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করছে না—জানলা দিয়ে ওগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে প্লেটটা খালি করে রেখে দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা করার উপায় নেই। ধরণীর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। ঠিক ধরে ফেলবে চালাকিটা। এখনই বাগান সাফ করতে এসে লক্ষ্য হবে তার। মন দিয়ে খেতেই শুরু করেন শেষ পর্যন্ত।

তারপর হঠাৎ কী একটা কথা মনে হওয়ায় আবার থেমে যান।

সত্য কথাই কি বলেনি নীলা? এই তো একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে তিনি কী করছেন? ক্ষুধা নেই বিন্দুমাত্র—তবু খাচ্ছেন। কেন? কারণ তিনি গোপন করতে চান তাঁর মানসিক বিপর্যয়ের সংবাদটা। তিনি পছন্দ করছেন না—কেউ বুঝতে পারুক যে নীলার অবর্তমানে পরমানন্দের কর্মময় জীবনে বিন্দুমাত্র ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। না হয়নি! হতে পারে না! যে মেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বাপকে ত্যাগ করে চলে যায় তার জন্য কোনো দুঃখ নেই পরমানন্দের, কোনো ক্ষোভ নেই। নীলার অনুপস্থিতিতে একচুল বিচ্যুত হবে না তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের গতি। তাই প্রাতরাশের টেবিলেই তিনি রেখে দিতে চান সেই সিদ্ধান্তের প্রথম স্বাক্ষর।

তা যেন বুঝলাম। তবু একটা কিন্তু রয়ে গেল যে। মেনে নিলাম তোমার যুক্তি,—কিন্তু তা সত্ত্বেও ও যুক্তির মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেল না কি?

গত পনেরো-বিশ বছর ধরে তিনি এমন নিঃসঙ্গভাবে প্রাতরাশ সমাধা করেননি। টিপয়ের উপরে কফির পট আর দুটি কাপ নামিয়ে রেখে চলে যেত নন্দ। শ্রীমন্ত ঠাকুরের হেঁসেল থেকে নিয়ে আসত টোস্ট আর পোচ। তিনি ইজিচেয়ারটায় এলিয়ে বসতেন। বেতের হেলান-দেওয়া চেয়ারটায় এসে বসত নীলা। কফির ডিক্যানটার থেকে কফি ঢেলে দুধ মেশাত, নিজের কাপে ফেলত টুকটুক করে সুগার-কেক, আর তাঁর কাপে স্যাকারিন। এর পর টোস্টে মাখন লাগাতে শুরু করলেই পরমানন্দ উৎকর্ণ হতে উঠতেন একটা ছোট্ট ধমকের জন্যে—কাগজটা এখন রাখ দিকিনি, খেয়ে নিয়ে যত ইচ্ছে পড়ো কোন মিটিঙে কোন মহাপ্রভু কী দেশাত্মবোধের বাণী ঝেড়েছেন। এখনই হয়তো ননীকাকা এসে টেনে নিয়ে যাবেন—আর খাওয়া হবে না তোমার।

অগত্যা চশমাটা খুলতে হয় তাঁকে। নামিয়ে রাখতে হয় খবরের কাগজটা।

আজকের প্রাতরাশটা এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি নয়। এ একটা ব্যতিক্রম। শুধু ওধারের বেতের চেয়ারটা শূন্য আছে বলেই নয়—বৈসাদৃশ্যটা আরও ব্যাপক। আজকে কফির পট আসেনি, আসেনি মিল্ক-পট, সুগার-পট। এসেছে তৈরি কফি। এটা শ্রীমন্ত ঠাকুরের কেরামতি নয়—নন্দ-বেয়ারার দূরদৃষ্টির পরিচয়। সে বুঝেছে তৈরি কফি পাঠানোই আজ যুক্তিযুক্ত। তাই আজ টোস্টের ওপরেও আগে থেকেই লাগানো আছে মোলায়েম মাখনের আস্তরণ। যেন এই প্রসঙ্গে কোনোক্রমেই না মনে পড়ে যায়—দিদিমণির কথা। কাল রাত্রি থেকে এ বাড়িতে যে একটি লোক কমে গেছে এ সত্যটা ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় গোপন রাখতে চায়।

কিন্তু যে কথা ভাবছিলেন। খেতে তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে না—তবু খাচ্ছেন। ক্ষুধা না থাকার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ সময় এ খাদ্য তাঁর নিয়মিত তালিকাভুক্ত। তবে এ অরুচি কেন? নিঃসংশয়ে নীলার অনুপস্থিতিই এর কারণ। সত্যটা অনস্বীকার্য, অন্তত নিজের কাছে। তা হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যে তিনি খাচ্ছেন সেটা তো শুধু লোক দেখানো। অর্থাৎ প্রতিটি গ্রাসের বক্তব্য—'তোমরা দেখো, আমি খাচ্ছি-দাচ্ছি, দিব্যি আছি। তোমাদের দিদিমণি থাক না থাক, আমার ভারি বয়েই গেল!' কথাটা মিথ্যা—তবু এ মিথ্যার আবরণের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন শুধু লোক-দেখানোর জন্য। আর তাও কে সে লোক? না, ওই শ্রীমন্ত ঠাকুর, নন্দ-বেয়ারা, আর ধরণী মালি! এদের চোখে একটা মিথ্যাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসেই কি তিনি খাচ্ছেন না আপেলের টুকরোগুলো?

—এ যদি তুমি আদর্শের জন্যে করতে বাবা, তা হলে আমি মেনে নিতাম...কিন্তু তা তো নয়...তুমি শুধু সুনামের মোহে, শুধু প্রতিপত্তির লোভে, শুধু পদমর্যাদার মুগ্ধ মোহাবেশে ছুটে চলেছ এ পথে...কী করা উচিত তা আর তুমি ভাব না...কী করলে ওরা তোমার যশোগান করবে সেই চিন্তাতেই তুমি বিভোর।...তোমার অস্তিত্ব পর্যন্ত তুমি বিকিয়ে দিয়েছ ওদের ভালো-লাগা-না-লাগার বিচারে।

খাবারের প্লেটটা সরিয়ে রাখলেন পরমানন্দ।

নীলা অন্যায় করেছে। নীলার গৃহত্যাগে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, হতে পারেন না, হওয়া উচিত নয়। তবু এই যে অক্ষুধা, এই যে খাওয়ার অনিচ্ছা, এটা নিঃসংশয়ে নীলার অনুপস্থিতিজনিত। মিথ্যা দিয়ে কখনও কাউকে তিনি ভোলাননি। আজও ভোলাবেন না। নিজের মনকে আগে জয় করতে হবে। তারপর সেই কুলিশকঠোর মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেবেন আর পাঁচজনকে।

নন্দ এসে কফির কাপটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ ত্যাগ করে পরমানন্দ তাকে বলেন—থাক, নিয়ে যা। ভালো লাগছে না এ-সব।

নন্দ বোধ হয় চমকে ওঠে। ঠিক লক্ষ করেননি উনি। নন্দর দিকে আর তাকিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তবু অনুভব করেন খাবারের প্লেট আর কফির কাপটা নিয়ে সে চলে যায়। যাবার সময় সে কি তাকিয়েছিল তার মনিবের দিকে! কী ছিল সে দৃষ্টিতে?

জীবনের চল্লিশটা বছর আজ এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে ওঁর চোখের সামনে। কী তিনি সত্যি চেয়েছিলেন জীবনে? কী পেয়েছেন, কী পাননি, আর কী পেয়ে হারিয়েছেন? এতদিন তো সব আঘাত সব ক্ষয়ক্ষতি নির্বিচারে বুক পেতে গ্রহণ করেছেন। কোনো দুর্ঘটনাতেই তো এমন শূন্য মনে হয়নি জীবন। আর কী সব দুর্ঘটনা! সে-সবের তুলনায় নীলার এই সিনেমাসুলভ সংলাপ, এই নাটকীয় তিরোভাব তো হাস্যকর। নাটকে আর নভেলেই এ-সব ঘটে এতদিন এটাই ভেবেছিলেন। আজ তাঁর জীবনেই ঘটল এটা। অবাধ্য মেয়েটা বলে কিনা—তিনি চ্যুত হয়েছেন তাঁর আদর্শ থেকে। ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা থাকা উচিত! নিজে থেকে চলে না গেলে হয়তো তাড়িয়েই দিতেন ওকে!

কিন্তু!

যৌবনে আর প্রৌঢ়ত্বে নিয়তির নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন তিনি বারেবারে। তাহলে আজ এত সামান্য আঘাতে এতটা বিচলিত বোধ করছেন কেন? অন্তরে কি সত্যই দুর্বলতা এসেছে? ডাঃ পরমানন্দ চৌধুরীর অন্তরে দুর্বলতা! মনে মনেই হাসলেন তিনি। পূর্বপক্ষ আর উত্তরপক্ষ হঠাৎ চুপ করে গেল ওঁর মনের মধ্যে, থামাল তাদের ঝগড়া।

দশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে।

*　　　　　*　　　　　*

শহরের সবচেয়ে নামকরা সার্জেন ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর বাড়িটা জনপদের পশ্চিম প্রান্তে। কলকোলাহলমুখর প্রাণচঞ্চল শহরের মাঝখানে তিনি বাড়িটা করেননি ইচ্ছা করেই। তবু ভিড় জমে থাকে সামনের লনে সকাল থেকে। গাড়িতে, রিকশায়, সাইকেলে আসে রোগীরা অথবা তাদের আত্মীয়েরা। দোতলা বাড়ি—সামনে প্রকাণ্ড লন। কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। মরশুমি ফুলই বেশি। একসার টবে নানা জাতের ক্যাকটাস। আছে একটা জবা, আর একটা কাঞ্চনও। সামনের লাল কাঁকরের পথটা এসে পোর্টিকোর নীচে আশ্রয় খোঁজে। ফটকের উপর মর্নিং-গ্লোরি লতাটা নীলাম্বরী পরে প্রথমেই স্বাগত জানায়। গেটের ধারেই, অর্থাৎ প্রায় রাস্তার ওপরেই, একসার ঘর। রোগী দেখার ঘর, ডিস্‌পেন্সিং রুম, অপারেশন থিয়েটার, আর ছোট ছোট কেবিন। এ ছাড়াও আছে একটা ল্যাবরেটরি। রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্রাদি পরীক্ষা তো বটেই, এমনকি এক্স-রে নেবার ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে। ছোটখাটোভাবেই শুরু করেছিলেন আমেরিকা থেকে সার্জেন হয়ে ফিরে আসার পর। চেয়েছিলেন শহরের একান্তে নিরিবিলিতে বিকিয়ে দেবেন জীবনটা। ছোট্ট সংসারের বেড়া-দেওয়া পরিধিতে সীমিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে আত্মগোপন করবার একটা শম্বুকবৃত্তি তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল এই অন্তেবাসীর জীবনের দিকে। শুধু শহর কেন—দেশের সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্ক রাখেননি। বাড়িখানাও বানিয়েছিলেন ওদেশী ছাঁদে। না হলে রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের এই যুগে কেউ কখনও বানায় অমন ঢালু ছাদের বাংলো বাড়ি? ছায়া-থমথম নির্জনতায় শহরতলির এই বাড়িটা যেন আর পাঁচখানা স্বগোত্রের সঙ্গে তফাত রচনা করতেই গায়ে জড়িয়েছে লাল ইঁটের পয়েন্টিং-করা কুর্তা; ওল্ড-ইংলিশ স্থপতিপর্যায়ের খিলানে খিলানে যেন ভুরু কুঁচকেই আছে; —স্কাইলাইট আর চিমনিতে যেন সে ভৌগোলিক বন্ধনটাকেও অস্বীকার করতে চায়। পথ-চলতি মানুষের স্বতই মনে হয় বুঝিবা কোনো ইংরাজ দম্পতির আবাসস্থল—কোনো রিটায়ার্ড সিভিলিয়ানের ডেরা।

কথাটা আধা-সত্য। ইংরাজ না হলেও আমেরিকান। দম্পতি না হলেও তার আধখানা। পরমানন্দ যেদিন গেটওয়ে-অফ-ইন্ডিয়ার তলা দিয়ে ফিরে এসেছিলেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সেদিন তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন দুটি বিদেশী মহিলা। মিস ও'নীল অবশ্য তাঁর প্রাগ্‌বিবাহ পর্যায়ের সংজ্ঞা, এদেশের মাটিতে পা দেবার পূর্বেই তাঁর নামান্তর হয়েছিল—মিসেস অ্যারিঅ্যাডনি চৌধুরী। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন পরমানন্দ। ঠিক ছাত্রাবস্থায় নয়—তখন তিনি যুক্ত ছিলেন শিক্ষানবীশ হিসাবে একটা হাসপাতালের সঙ্গে—যে হাসপাতালে নার্স হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন তাঁর ভাবী জীবনসঙ্গিনীর গড-মাদার মিস গ্রেহাম। নার্স গ্রেহামই ছিলেন সে দ্বন্দ্ব-সমাসের হাইফেন। তাঁরই মাধ্যমে চৌধুরীর হয়েছিল ও'নীলের সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় ও পরিণামে পরিণয়।

ও'নীলের পূর্বপুরুষেরা আমেরিকায় এসেছিলেন আয়ার্ল্যান্ড থেকে। ওঁর মা ওঁকে মৃত্যুশয্যায় দিয়ে যান মিস গ্রেহামের হাতে। তখন কতই বা বয়স ওঁর? মিস গ্রেহাম ওঁকে মানুষ করেছিলেন—নিজের মেয়ের মতোই। ব্রোঞ্জের ক্রুশচিহ্নটার মতোই তাঁকে সর্বদা বুকে বয়ে বেড়াতেন। ওঁর বাপ ছিলেন নাবিক—সমুদ্রযাত্রা থেকে তিনি আর ফিরে আসেননি। পরমানন্দের হাতে তাঁকে সমর্পণ করে পরম আনন্দ না পেলেও পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন গ্রেহাম। মেয়ে-জামাইকে বিদায় জানাবার সময় জামাই জিদ ধরে বসল মিস গ্রেহামকেও সঙ্গে যেতে হবে। শুনে হেসেই বাঁচেন না গ্রেহাম। বলেন—এতদিন আমেরিকায় থেকেও তুমি খাঁটি ভারতীয় রয়ে গেলে চৌধুরী! না হলে শাশুড়িকে কেউ হনিমুনে সঙ্গী হতে বলে?

চৌধুরী কিন্তু সে যুক্তি শোনেননি। মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসার পর এই প্রৌঢ়া আজীবনকুমারীর নিঃসঙ্গ জীবনের গ্লানিকর অবসাদটা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাই একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে এদেশে।

বাবা-মা দুজনেই তখন গত হয়েছেন। পরমানন্দের পিতা অঘোরানন্দ ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। সুতরাং গ্রামের বাস তাঁদের উঠেছিল একপুরুষ আগেই। ভারতবর্ষে এসে কোনো বড়

শহরে বসতে পারতেন ডাক্তার চৌধুরী, কিন্তু কী জানি কেন, এই শহরটাকেই বেছে নিলেন উনি। শহরের সামাজিক জীবন থেকে একান্তে সরে থাকতে চান বলেই জনপদপ্রান্তে বানালেন এই বাংলোটা। এ বাড়ির ভিতের গাঁথনিতে রয়ে গেছে মিস গ্রেহামের স্বাক্ষর। আমেরিকান ডলারই ভারতীয় মুদ্রার বকযন্ত্রে চোলাই হয়ে রূপায়িত হল ইট-কাঠ-চুন-সুরকিতে। অবশ্য পরবর্তী যোজনা যা কিছু—তা পরমানন্দের উপার্জনেই।

এত অল্প সময়ে এতটা পশার হবে এ যেন কল্পনাই করা যায়নি। অবশ্য ওঁর উন্নতির মুলে ছিল বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির কারখানাটা। শহরের এ প্রান্তে হু-হু করে বেড়ে উঠল কারখানাটা। এল নানাদেশী লোক—ভারতীয় কর্মী আর বিদেশী অফিসার। সাহেবী কেতার মানুষ চৌধুরী-ডাক্তারের সঙ্গে সাহেব মহলের অন্তরঙ্গতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারখানার কোয়ার্টার্স ছেড়ে মেমসাহেবদের একমাত্র বেড়াতে আসার স্থল ছিল এই বাংলোটা। চৌধুরী গোটা কারখানাটার পারিবারিক চিকিৎসক হয়ে পড়লেন ক্রমে। আউট-হাউসটা ভেঙে বড় করে অপারেশন থিয়েটার বানাতে হল। তৈরি করতে হল নার্সিং হোমের কেবিনগুলো। ওঁর হাসপাতালটা যেন কারখানার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গায়ে গায়ে বেড়ে উঠল—বড় হয়ে উঠল।

আজ এই নার্সিং হোমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ডাক্তার চৌধুরীর—মালিক তো ননই। নার্সিং হোম তার নিকটতম প্রতিবেশী—তার প্রতিষ্ঠাতার—সঙ্গে সব সম্পর্ক আজ চুকিয়ে দিয়েছে। ওটা ফ্যাকটরির সম্পত্তি—অবশ্য কারখানার অন্যতম ডিরেকটর আজ ডাক্তার পরমানন্দ।

আজ থেকে দশ বছর আগে কিন্তু সম্বন্ধটা ছিল অন্যরকম। তখন একনিষ্ঠকর্মী ডাক্তারটি ছিলেন এই সেবাসদনের প্রাণস্বরূপ। গুটিতিনেক জুনিয়ার ডাক্তার সহযোগী ছিলেন তাঁর। পরমানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এর চিকিৎসা বিভাগে। মিস গ্রেহাম ছিলেন নার্সিং-ব্যবস্থার কর্ণধার—আর সমস্ত কিছুর হিসাবনিকাশ থেকে শুরু করে এর সামগ্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা ছিল মিসেস চৌধুরীর নখদর্পণে। উদয়াস্ত ওঁরা তিনজনেই মেতে থাকতেন সেবাসদনের সেবায়। সকাল-সন্ধ্যায় মিসেস চৌধুরী এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন আর্ত রোগীদের। কখনও ওদের শিয়রে বসে গল্প করতেন, কখনও সান্ত্বনা দিতেন, কখনও নিয়ে আসতেন ফুল-ফল।

না, ভুল হল পরমানন্দের। দশ বছর আগেকার যে দিনগুলির কথা আজ তাঁর মনে পড়ছে তখন মিসেস চৌধুরীর যাতায়াত ছিল না হাসপাতালে। তার বহু পূর্বেই তিনি বিদায় নিয়েছেন এই দুনিয়া থেকে। মিসেস চৌধুরীর মৃত্যু হয়—মনে আছে ডাক্তার চৌধুরীর—যে বৎসর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলি হয় সেই বছর। ওই উৎসবে চৌধুরী-সাহেব কয়েক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন নার্সিং হোমের আলোকসজ্জা আর আতশবাজির আয়োজনে।

মিসেস চৌধুরী সুতরাং সেদিন ছিলেন না এ সংসারে। ছিল অসীম আর নীলা। অসীম তখন বোধহয় থার্ড ইয়ারের ছাত্র; আর নীলা মনে হচ্ছে সে বৎসরই ম্যাট্রিক দেবার আয়োজনে ব্যস্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের অপেক্ষায় উইংস-এর পাশে প্রতীক্ষা করছে। উনিশ শ' বেয়াল্লিশের আগস্ট মাসের শেষাশেষি, না কি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ? জাপানী আক্রমণের উৎকণ্ঠায় সারা দেশ তখন কণ্টকিততনু। মিত্রশক্তি সংহত করতে চাইল ভারতবর্ষের জনশক্তিকে। সংঘাত বাধল ভারত সরকারের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের। বোম্বাইয়ের জনসভায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সমবেত হলেন। কর্মসূচি ঘোষণা করার পূর্বেই সরকার চেপে ধরল জননায়কদের কণ্ঠনালী। রাতারাতি কারারুদ্ধ হলেন সবাই। মহাত্মা, জওহরলাল, আজাদ, সরোজিনী। সমস্ত ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ গণআত্মা নিরুদ্ধ আক্রোশ চাপতে না পেরে ফেটে পড়ল একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে। জাতীয় কংগ্রেসের কী নির্দেশ ছিল, তা আর জানা গেল না। গুজব রটল মুখে মুখে। লুণ্ঠিত হল রাজকোষ, অধিকৃত হল থানা আর ডাকঘর। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মূর্ছিত হয়ে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদল বলে—এ কখনও মহাত্মার নির্দেশিত পথ নয়। এ হিংসার রক্তস্রাবী পথ কখনও আন্তরিক অনুমোদন পেতে পারে না তাঁর। আর একদল বললে—এই হচ্ছে বিক্ষুব্ধ অপমানিত ভারতবর্ষের গণআত্মার আদেশনামা—এবং যেহেতু মহাত্মাই এই জনগণমনের অধিনায়ক তাই তাঁরও অনুমোদন আছে এ গণবিক্ষোভে।

পরমানন্দের অন্তঃপুরেও এসে লাগল এই বিতর্কের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। শান্ত রাজভক্ত পরিবারটির মধ্যে দেখা দিল দুটি বিভিন্ন শিবির। স্কুলের দশম বার্ষিক শ্রেণীর দোলায়িতবেণী কিশোরী নীলার ধ্রুব বিশ্বাস—এ বিপ্লব জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। অসীম তা অস্বীকার করে। নীলা সর্বান্তঃকরণে বর্জন করতে চায় ভারত সরকারকে—মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে। অপরপক্ষে অসীম উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। জাতীয়-রক্ষী-বাহিনী না কী যেন একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে যুক্ত। শাসনশৃঙ্খলা যাতে ভেঙে না পড়ে, জাপানী আক্রমণের এই সংকটমুহূর্তে যাতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অক্ষত রাখা যায়, তাই স্থানীয় এস. ডি. ও.-সাহেব আয়াঙ্গার শহরের রাজভক্ত প্রজাদের নিয়ে গড়ে তুললেন একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান। অসীম তারই একজন মেজ না সেজ ধরনের অফিসার। খাকি পোশাক পরে, মাথায় হেলমেট চাপিয়ে সেই কোন ভোরে উঠে চলে যায় প্যারেড গ্রাউন্ডে। দল বেঁধে কখনও বের হয় আবার রাজপথে। হাতে ঝাণ্ডা আর ফেস্টুন : আমাদের হাতে অস্ত্র দাও।

—আমাদের হাতে অস্ত্র দাও! মনে মনে হাসতেন পরমানন্দ।

ভাই-বোনে কেবলই তর্ক চলে সারাদিন। ওরা কখনও কখনও সালিশ মানে বাবাকে। পরমানন্দ জবাব দেন না। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করেন প্রাতরাশের টেবিলে। মিস গ্রেহামও এ প্রসঙ্গে একেবারে নীরব থাকতেন।

ক্রমশ পরমানন্দ লক্ষ করলেন, ব্যাপারটা নিছক কৌতুকের সীমারেখা অতিক্রম করতে চলেছে। বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পরিস্থিতিটা। জীবনে কোনোদিন কখনও তিনি ছেলেমেয়েদের ওপর নিজের মতামত আরোপিত করেননি; তাই মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন শুধু। মুখে কিছুই বলতেন না, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ঘটনাগুলি কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না। আর এ ঘটনাগুলো যে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে— এটাও অনুমান করতে পারেন উনি।

নীলা আর অসীম দুজনে দুজনকে এড়িয়ে চলে। পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটিকে হঠাৎ একদিন দেখা গেল খদ্দরমণ্ডিত বেশে। ব্যাপারটা একেবারে অচিন্তনীয়। বিলাতী কেতার মানুষ রাজভক্ত পরমানন্দ চৌধুরীর অন্তঃপুরে খদ্দর! এ যেন পরম বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায় পাঁঠার মুড়িঘণ্ট! সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলে সে যখন এসে বসল সবুজ রঙের খদ্দরের শাড়ি পরে, তখন চমকে উঠেছিলেন উনি। চোখ তুলে একবার দেখেই মনোনিবেশ করলেন কাঁটা-চামচে।

ড্রইং আর ডাইনিং রুম দুটো পাশাপাশি। মাঝখানে একটা বড় আর্চওয়ালা ফোকর। দরজা নেই। মোটা পেতলের রড থেকে ঝুলছে একটা ভারী নেভি-ব্লু পর্দা। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল পর্দার ওপর আর্চওয়ের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফোকরটা দিয়ে ড্রইং রুমের দেওয়ালটা দেখা যায়। সেই দেওয়ালের বড় ছবিটার ওপর নজর পড়ল পরমানন্দের। দিল্লী-দরবারের ছবি। প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ দিল্লীর দরবারে এসেছেন। ডাইনিং রুমের বিভিন্ন আসবাবের ওপরেও নজরটা বুলিয়ে নিলেন। স্বদেশী জিনিস কই নজরে এল না তো কিছু। ক্রকারিস বিলাতী, ফ্রিজিডেয়ার বিলাতী, মায় মীটসেফটা পর্যন্ত বিলাতী ফার্নিচারের দোকানের সীলমোহর নিয়ে এসেছে ললাটে। এর মাঝখানে চৌধুরীতনয়ার এ বিদ্রোহিণীর বেশ শুধু বিসদৃশ নয়, বিপ্লবাত্মক। পরমানন্দ মনে মনে ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বাইরে তাঁর অশান্ত সমাহিত মূর্তিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। মিস গ্রেহাম একবার চোখ তুলেই মনোনিবেশ করলেন কফির পটে। প্রতিদিন এ কাজটা ছিল নীলার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত; আজ কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল সে।

অসীম বলে—শীত তো এখনও তেমন পড়েনি, এরই মধ্যে গরম জামা বার করেছিস যে নীলা?

নীলা ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নত করে দৃষ্টি। বলে—এটা গরম জামা নয়, খদ্দর।

—ওই একই কথা!

পরমানন্দ খবরের কাগজটা দিয়ে একটা ব্যবধান রচনা করলেন—যেন কাগজের দুর্গে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন তাঁর বিদ্রোহী আত্মজার আসন্ন প্রত্যুত্তরের তিক্ততা থেকে।

নীলা কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল—জামা মোটা-সরুর তো কোনো মাপ নেই দাদা—ওটা আপেক্ষিক। আমার গায়ে এটা খুব মোটা কাপড়ের মনে হচ্ছে না। আবার হয়তো অনেক মোটা চামড়ার লোকের গায়ে বিলাতী সিল্কের জামাও অসহনীয় মনে হতে পারে।

অসীম অহেতুকভাবে তার সিল্কের পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে খুলতে বলে—তা ভালো, নরম চামড়া তোদের, এ চেঞ্জ-অফ-ক্লাইমেটের সময় ওই চটের জামা পরাই ভালো।

নীলা বলে—চেঞ্জ-অফ-ক্লাইমেট নয় দাদা, চেঞ্জ-অফ-কন্ডিশন্স,...চেঞ্জ অফ আইডিওলজি।

পরমানন্দের গলায় কি রুটির টুকরোটা আটকে গেল! হঠাৎ কেশে উঠলেন উনি।

—তোমাকে আর এক পীস কেক দেব নীলা?—প্রশ্ন করলেন মিস গ্রেহাম। উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়া।

নীলা বেণীসমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানায়। খাওয়া তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। শাড়ির আঁচলটা সামলে নিয়ে সে চলে যায় ড্রইং রুমের দিকে। রেডিওতে সকালবেলাকার খবর পরিবেশিত হচ্ছিল সে ঘরে। হঠাৎ আর্তনাদ করে থেমে গেল সেটা। বোঝা গেল নীলা থামিয়ে দিল তার যুদ্ধপ্রচারের প্রচেষ্টা।

পরমানন্দ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন—ইট্স্ এ ব্যাড ওমেন!

মিস গ্রেহাম কোনো জবাব দেননি। দিয়েছিল অসীম। হেসে বলেছিল—তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ বাবা। এ বয়সে ও রকম ভাবালুতা একটু-আধটু সবারই হয়। কদিন? শীতকালের কটা মাস কাটুক—তারপর খদ্দর ছাড়তেই হবে। তা ছাড়া এখন সিনেমা বন্ধ—পার্টি হয় না—ফ্যাকটরির ক্লাবেও কোনো ফাংশান হচ্ছে না—এখন খদ্দর চলতে পারে কিছুদিন। তাই বলে মেয়েমানুষ কখনও শাড়ি-গয়নার মোহ ছাড়তে পারে?

পরমানন্দ ওকে চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেন। নীলা পাশের ঘরেই আছে। দুটি ঘরের মাঝখানে খোলা আর্চওয়ে দিয়ে এ পাশের কথা ও পাশ থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। অভিমানিনী মেয়েটির কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন চৌধুরী। অসীম চুপ করে।

পরমানন্দের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, অনতিবিলম্বেই তা বুঝতে পারা গেল। হঠাৎ ঘরে এসে ঢোকে বৈশাখী; মিস গ্রেহামকে উদ্দেশ্য করে বলে—গ্র্যানী, শিগ্গির আসুন—নীলা খেপে গিয়ে কী করছে, দেখুন।

ওঁরা সকলেই উঠে এসেছিলেন প্রাতরাশের টেবিল থেকে। বাড়ির ভিতর দিকের উঠোনে নীলা খাণ্ডবদাহন শুরু করেছে। আলমারি খুলে নিজের সমস্ত বিলাতী শাড়ি একত্র করে তাতে আগুন দিয়েছে। নন্দ-বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে বোকার মতো বারান্দার ও প্রান্তে। কোমরে হাত দিয়ে নীলাও দাঁড়িয়ে আছে সে অগ্নিকুণ্ডের সামনে—যেন ওই হোমাগ্নির আলোক-উত্তাপে তার চিত্তশুদ্ধির আয়োজন চলেছে গোপনে গোপনে।

মিস গ্রেহাম ছুটে এসে চেপে ধরেন নীলার হাত—এ কী করছ নীলা! দুদিন পরে তোমার যে অনুশোচনার অবধি থাকবে না।

নীলা ছাড়িয়ে নেয় হাতখানা, বলে—আমি দুঃখিত গ্র্যানী; জানি তোমার মনে আঘাত লাগবে। তবু এটা আমার কর্তব্য।

অগ্নিস্তূপের ভিতর থেকে কয়েকটা মূল্যবান শাড়ি বাঁচাবার জন্য ছুটে যায় অসীম আর বৈশাখী। পরমানন্দ বাধা দেন তাদের : ও জিনিসগুলো ওর নিজস্ব।

ধীরপদে ড্রইংরুমে ফিরে আসেন উনি।

মিস গ্রেহাম এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছেন নীলাকে। চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আজ তাঁর হঠাৎ মনে হল—যে পক্ষিশাবককে এত যত্ন-আদরে মানুষ করে তুলেছেন, আজ সে মুক্তপক্ষ নীলাকাশচারী। নীড়ের সঙ্গে সম্পর্কটা সে অস্বীকার করতে চায়। নীলা আর গ্রেহাম আর নাতনী-দিদিমা নয়—দুটি ভিন্নদেশী নারী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের! নেভার দ্য টোএন্ শ্যাল মীট্।

পরমানন্দ ওঁকে বলেন—আশা করি তুমি ওকে ক্ষমা করেছ—ও যা কিছু করছে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে না ভেবেচিন্তেই করছে।

—বাট্...বাট্...সাম অফ্ দেম আর হার মাদার্স মেমেন্টো।

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন গ্রেহাম। সত্য কথা। যে শাড়িগুলি জাত্যভিমানের বিদ্বেষ-বহ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল—সেগুলি যে শুধু বিলাতী মিলের তৈরি সেটাই তো শেষ কথা নয়। সেগুলি যে অন্য

একটি অভারতীয় রমণীর স্মৃতিবিজড়িত। ওই শাড়িগুলি আহরণ করে এনেছিল যে নারী সে ছিল একদিন এই চৌধুরী পরিবারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী;—শুধু তাই নয়, এগুলি সে দিয়ে গিয়েছিল তারই আত্মজাকে। নীলা আজ শুধু গোটা পশ্চিম খণ্ডকে অপমান করেনি—সে ধূলায় টেনে এনে নামিয়েছে তার মাতৃস্মৃতিকে। মিস গ্রেহামের মানসকন্যা মিসেস অ্যারিঅ্যাডনি চৌধুরীর দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটল আজ এ বাড়িতে—এবং এবারকার মৃত্যুটা অপঘাতজনিত। পাকা আমটির মতো টুকটুকে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে বুড়ি মেমের।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা পরমানন্দের। কিন্তু বাধা তিনি দিতে পারেননি নীলাকে। কারও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

স্কুল-কলেজ বন্ধ। আদালত-দোকান দীর্ঘদিন রুদ্ধদ্বার। শহরের বুকে চলেছে বিভীষিকার রাজত্ব। কখনও বন্দুকের আওয়াজ, লাঠি, মেদিনীবিকম্পিতকরা সদর্প সবুট পদক্ষেপ—কখনও বন্দেমাতরম্-মন্ত্রোদ্ভাসিত নিরস্ত্র জনতার মিছিল।

ড্রেসিং-গাউন-পরা পাইপমুখো চৌধুরীসাহেব দ্বিতলের ব্যালকনিতে অশান্ত চরণক্ষেপে পদাচরণ করে চলেন। তিনি কোনো পক্ষে নেই। এ সংগ্রামের গতি তিনি দ্রষ্টা সঞ্জয়ের মতো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ করে চলেছেন শুধু। কোনো মতামত প্রকাশ করেন না কারও কাছে এ বিষয়ে। কালপ্রবাহের উপকূলে বসে শুধু নিরীক্ষণ করে চলেছেন কালের গতি। সে প্রবাহে, লক্ষ করেছেন চৌধুরী, তাঁর পুত্রকন্যাও যাত্রা করেছে পালতোলা নৌকায়। দুজনে দু-মুখে। একজন ভাঁটিতে, একজন উজানে।

ছেলেরা দল বেঁধে একদিন দেখা করতে এল ওঁর সঙ্গে। শহরের কয়েকজন নামকরা বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন দলে।

—কী চাই?

—এতদিন যা করেছেন করেছেন, এবার আপনাকেও চালটা পালটাতে হবে।

—অর্থাৎ?

—স্বদেশী জিনিস আপনার বাড়িতে কোনোদিন আসেনি। সমস্ত বিলাতী জিনিস। এ-সব আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

—রিয়ালি? তা আমি যে-সব জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত তা আপনাদের দেশী কারখানায় বানিয়ে দিতে পারবেন তো?

—না পারি ব্যবহার করবেন না তেমন জিনিস। দেশী জিনিসটাকে ত্যাগ না করে বদ অভ্যাসটাকেই ত্যাগ করুন না কেন।

—আমি এ কৃচ্ছ্রসাধনের বিনিময়ে কী পাব?

—স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি।

হো হো করে হেসে ওঠেন পরমানন্দ!

শেষে হাসি থামিয়ে বলেন—এ প্রতিশ্রুতি তো নতুন নয়। প্রতিবারেই কতকগুলি ছেলে জেল খেটেছে—বেশ কিছু মরেছে গুলি খেয়ে—অথবা ফাঁসিকাঠে! কত সংসার ছারখার হয়ে গেল। আবার সে প্রতিশ্রুতি কেন? হিমালয়ের চেয়ে বড় কিছু তো নজরে পড়ছে না—তা সে হিমালয়ান ব্লান্ডারও তো হয়ে গেছে একদফা!

দলের সামনে যে ছেলেটি ছিল—রুক্ষচুল, খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, সে বলে—সেবার প্রতিশ্রুতি কেন রক্ষা করা যায়নি জানেন? কারণ সেবারকার সংগ্রামের সংবাদটা আমরা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। আমাদের দেশে, জানেন তো, একজাতের শিক্ষিত মানুষ আছেন যাঁরা বছরে মাত্র দুদিন খবরের কাগজের পাতা ওলটান। রাজার জন্মদিনে আর নববর্ষে। তাঁদেরই মহানুভবতায় আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেছে বারে বারে।

যে সময়ের কথা তখন অনেকেই আশা করত আগামী বারে ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরীর নাম দেখা যাবে লিস্টে। খোঁচাটা তাই অনেকেই বেশ উপভোগ করলে।

শহরের আর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন,—আপনি আমাদের শহরের একজন নামকরা

লোক। আপনার ঘরে আজকের দিনেও যদি ওই ছবিখানা টাঙানো থাকে তবে সেটা এ শহরেরই অপমান!

পরমানন্দ জবাবে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যান। হঠাৎ লক্ষ হল একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে নীলা দিল্লী দরবারের ছবিখানি নামিয়ে রাখছে। পরমানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে জনতার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে নীলার ওপর। সদ্য স্নান করে এসেছে বোধ হয়—খোলা চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গ শুভ্র খদ্দরে বিমণ্ডিত।

কে একজন আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—বন্দেমাতরম্!

বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার কণ্ঠে ওঠে প্রতিধ্বনি।

পরমানন্দ হাত দুটি বুকের কাছে যুক্ত করে বলেন : আশা করি আপনারা তৃপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, ভদ্রভাষায়—এবার আপনারা যেতে পারেন।

সেই ছেলেটি বলে : আর একটা কথা। ওই যে বিদেশী মহিলাটি আপনার বাড়িতে আছেন—ওঁকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

—কেন?

—কুইট-ইন্ডিয়া হচ্ছে আমাদের মন্ত্র। উনি বিদেশিনী।

—উনি মানুষ।

কে একজন বলে—কবি বলেছেন "দেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া—"

—বটে! আমি তো জানতাম কবি বলেছেন "জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি—সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

সামনের ছেলেটি উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে—আমরা এখানে কবির লড়াই শুনতে আসিনি। আপনি ওঁকে তাড়াবেন কিনা বলুন।

—না! আর শুধু না নয়, ও ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে আমি আপনার কোনো অভদ্র ইঙ্গিত বরদাস্ত করতে রাজি নই। আপনারা এবার আসতে পারেন।

—আপনি পছন্দ না করলেও এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা চালাতে হবে। আপনি ওঁকে তাড়াতে রাজি না হলে বাধ্য হয়ে—

—ব্যস্!

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের টানা ড্রয়ার খুলে কালো রঙের ছোট্ট জিনিসটা উনি তুলে নিলেন হাতে : আউট, আউট য়ু ভ্যাগাবন্ড্স্!

—ভ্যাগাবন্ড্স্! আচ্ছা দেখা যাবে! লোকগুলো গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল।

মিস গ্রেহাম এসে বলেন—তুমি কেন ওদের বললে না যে আমাকে কোনো ইংরাজ অথবা আমেরিকান আশ্রমে পৌঁছে দিলে আমি দেশে ফিরে যেতে রাজি আছি।

পরমানন্দ ওঁকে সান্ত্বনা দেন, বলেন—এরা সব কাউয়ার্ডস্। আর ভিড়বে না এদিকে। ওদের কথায় কিছু মনে কোরো না।

—তা আমি জানি। কিন্তু শুধু বাইরেই তো নয়—ঘরেও যে আমি অবাঞ্ছিতা বিদেশিনী।

পরমানন্দ এ কথার জবাব দিতে পারেননি।

* * *

সে লোকগুলো সত্যিই আর ফিরে এল না। তবে দেখা করতে এলেন ননীমাধব রায়। বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির বড়বাবু রাজভক্ত প্রজা তিনিও— পরমানন্দের দীর্ঘদিনের বন্ধু। প্রথম থেকেই লেগে আছেন ফ্যাকটরিটার সঙ্গে। ওরই কল্যাণে ননীমাধবের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিটাও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। ইংরাজ অফিসারদের ঠিকমতো তোয়াজ করে আখের গুছিয়ে নিতে ভুল করেননি তিনি। শহরের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানিতে বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। কোম্পানির আদিপর্ব থেকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন ওপরে—এমনি একাদিক্রমে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকলে স্বর্গারোহণ পর্বে সত্যই স্বর্গে গিয়ে পৌঁছবেন একদিন! শুধু চৌধুরীর সঙ্গে নয়—চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। সরকারি মহলে, থানায়, এস. ডি. ও.-সাহেবের

খাস কামরায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা এত্তেলাতেই ঢুকে পড়েন তিনি। আর্দালিগুলো পর্যন্ত এমনই চিনে গেছে তাঁকে।

রায়মশাই এসে সদুপদেশ বর্ষণ করতে শুরু করেন চৌধুরী-সাহেবের ওপর। প্রতিবেশীর ছেলেটা যখন বখে যাবার পথে পা বাড়ায় তখন সে সংবাদটা তার অভিভাবককে জ্ঞাপন করে সদুপদেশ দিতে আসার মধ্যে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আছে। ননীমাধব কিন্তু সত্যই হিতৈষী ছিলেন এ পরিবারের। উনি চৌধুরীকে জানালেন সব কথা। অসীমকে নাকি একটা আধময়লা পায়জামা পরে রীতিমতো কুলি বস্তিতে আজকাল ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের এ আচরণ ক্ষমা করা যায় না। বেশ ঘনিয়ে বসে শুরু করেন উনি—সেদিন তো, বুঝলে, বড়-সাহেব আমাকে ডেকে বলেই বসলেন, 'রায়, তুমি ডক্টর চৌধুরীকে আমার নাম করে বুঝিয়ে বলো—এটা বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে। একটা সফিস্টিকেটেড ঘরের ছেলে শেষকালে কুলি ব্যারাকে গিয়ে ধর্মঘটের ইন্ধন জোগাবে?' আমি বললাম, বুঝলে, 'এ তুমি কী বলছ সাহেব? চৌধুরী আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ওদের সংসারের নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত আমার নখদর্পণে। ও-সব গান্ধাইট ফুলিশনেস ওদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না। অসীমকে তুমি চেন না সাহেব। এস. ডি. ও. ওকে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কী যেন একটা করে দিয়েছেন। অসীম করবে ধর্মঘটের আয়োজন? ইম্পসিবল্! অ্যাবসার্ড। এই জনযুদ্ধ জেতবার জন্য ওদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ওদের পার্টি কখনও নেমকহারামি করবে না, দেখো!' সাহেব, বুঝলে, মনে হল মেনে নিল আমার কথাটা। আর তা ছাড়া কথাটা তো মিথ্যাও নয়। কিন্তু আমি কী বলি জানো? জনযুদ্ধের কাজ করতে চাও তো ভদ্রভাবে করো না কেন? কাজটা তো ভালোই। আখেরে উপকার হবেই। বেটারা নির্ঘাত যুদ্ধ জিতবে— সুতরাং যারা সাহায্য করবে তাদেরই হবে পোয়া বারো—আর যারা এই বিপদের সময় পেছন পেছন ফেউ ডেকে বেড়াল তাদের দফা রফা হবে যুদ্ধ থামলে!

পরমানন্দ বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আপনমনে কী একটা কথা ভাবছিলেন তিনি। সেটা লক্ষ্য হল ননীমাধবের। হঠাৎ গলাটা খাটো করে উনি বলতে শুরু করেন—আমি কিন্তু তোমাকে অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম ভাই। জানি না, তুমি কীভাবে নেবে কথাটা। তবু, বুঝলে, যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি তাই কথাগুলো বলছি।...তুমি নীলাকে এবার সামলাও।

ননীমাধবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে নীলা আজকাল রীতিমতো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে নাকি। খদ্দর পরে ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে। সেদিন নাকি ছাত্রদের কোনো একটা মিটিঙেও তাকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। ননীমাধব আরও বলেন—থানার ও. সি. মজুমদার সেদিন আমাকে বললে, বুঝেছ, তোমাকে একটু টিপে দিতে। বলে, তোমার ঘরের দিল্লী দরবারের ছবিখানা নাকি সে-ই সবার সামনে টেনে নামিয়েছে। তা, আমি বললুম—তা ছাড়া আর কী করতে পারত সে। হাজারখানেক লোক গিয়ে যদি কারও বাড়িতে চড়াও হয় তো মানুষে আর কী করবে? অত যদি আধিক্যেতা তোমাদের তাহলে শহরে যে কজন রাজভক্ত প্রজা আছে তাদের বাড়ির সামনে পেট্রল-গার্ড বসাও তোমরা। দেখি, কে এসে ছবি নামায়। না কী বলো?

এবারও জবাব দিলেন না পরমানন্দ।

—ছবিখানা আর টাঙাওনি দেখছি।

—না।

—ভালোই করেছ। ও হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর আবার টাঙালেই চলবে। আমার বাইরের ঘর থেকেও, বুঝলে, রাজারানির ছবি দুটো খুলে এনে শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়েছি। আর একটা কথা ভাই, কিছু মনে কোরো না, ওই গ্রেহাম বুড়িকে কিছুদিনের জন্য কোনো বিলাতী হোটেলে-মোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না?

পরমানন্দ হেসে বলেন—না, যায় না।

কেন যায় না সে প্রশ্নটা আর করলেন না ননীমাধব। তবু অন্য প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপন করেন উনি। বস্তুত নীলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ননীমাধব অনেকদিন আগে থেকেই ভাবছেন। আকারে-ইঙ্গিতে জিনিসটা বুঝিয়েও দিয়েছেন চৌধুরীকে। মনে হয় তাঁর আগ্রহ আছে ওতে। না থাকবেই বা কেন? দীপক সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয় পাত্র। নীলা যদি পুত্রবধূরূপে আসে একদিন ননীমাধবের সংসারে

তাহলে কোনো পক্ষের আপত্তি নেই। সুতরাং ননীমাধব নীলার প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপন করেন—কিন্তু নীলুমাকে তুমি একটু সাবধান করে দিয়ো ভাই।

পরমানন্দ এতক্ষণে পেশ করেন নিজের বক্তব্য—তুমি ভুল করছ ননীমাধব। আমার বাড়িতে আমি ডিকটেটর নই—এ ডেমোক্রাটিক সংসারে আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল মেনে এসেছি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়েছি, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে তাদের—যে পথে তারা চলতে চায় চলুক, আমি বাধা দেব না। তবে কোন পথে চলার কী ফলাফল তা আমি ওদের বুঝিয়ে দিই। অপরের মত মাথা নত করে জীবনে কখনও মেনে নিইনি, অপরের উপরে কখনও নিজের মতামতও চাপাতে চাই না আমি।

ননীমাধব জেরা শুরু করেন : অপরের কথায় ছবিখানা কেন নামালে তাহলে দেওয়াল থেকে?

—ছবিখানা আমি নামাইনি।

—কিন্তু তুমিই তো গৃহকর্তা, তোমার অমতে তো—

—না! আগেই বলেছি, এ সংসারের ডিকটেটর নই আমি। এ বাড়ির দেওয়ালে কোন ছবি টাঙানো হবে—সেটা যদি একমাত্র আমার হুকুমেই স্থির করা হয়—তাহলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর মানলাম কোথায়?

এইসব ছেঁদো কথা বরদাস্ত হয় না ননীমাধবের। প্র্যাকটিক্যাল মানুষ তিনি। এ যেন বাড়াবাড়ি। ঘর-সংসার তো তিনিও করছেন—তিনিও তো সন্তানের জনক। তবে এ-সব পাগলামি নেই। ছেলেমেয়ে হল দুষ্টু ঘোড়া, মুখে সব সময় কড়া লাগাম লাগিয়ে ছপটি উঁচিয়ে না থাকলেই ওরা বেচালে চলবে! এই তো দীপক,—অসীমেরই সহপাঠী। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রতিটি বন্ধুর নামগোত্র হদিস-হিসাব ননীমাধবের নখদর্পণে। বাপের অমত তো দূরের কথা—বাপ অপছন্দ করতে পারেন এমন কোনো কিছুর দুঃস্বপ্ন দেখবার সাহস নেই দীপকের। কিন্তু কী অদ্ভুত ওই লোকটি। নিজের ভালোমন্দ বোঝেনা। অনুধাবন করেনা সন্তানের মঙ্গল হবে কিসে! সে কথাই বোঝাতে যান উনি—কিন্তু ওটা তুমি ভুল করছ না কি চৌধুরী? ওরা অপরিণতবুদ্ধি। নিজের ইচ্ছায় ওদের চলতে দিলে ওরা তো ভুল পথেও যেতে পারে।

পরমানন্দ জবাবে বলেন—আমার বাবার সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি। যে পথে আমি চলতে চেয়েছিলাম তিনি সে পথে আমাকে চলতে দেননি। তাঁর মতটাও এদিকে গ্রহণ করতে পারিনি আমি মনেপ্রাণে। ফলে না রাম না রহিম, কোনো আদর্শই টিকিয়ে রাখতে পারিনি। সে ভুল আমি করব না আমার সন্তানের বেলায়!

ননীমাধব প্রশ্ন করেন—কী চেয়েছিলেন তোমার বাবা?

—আমি বড় ডাক্তার হব জীবনে।

—আর তুমি কী চেয়েছিলে?

হাসলেন চৌধুরী ডাক্তার। ননীমাধব বুঝতে পারেন আরও বড় কিছু হবার আদর্শ ছিল নিশ্চয়ই পরমানন্দের। সে লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারেননি। পাছে হাস্যকর মনে হয় তাই সে কথা নিকট বন্ধুর কাছেও আজ স্বীকার করতে পারছেন না। তাই বলেন—কিন্তু তুমি তো তোমার বাবার ইচ্ছা পূরণ করেছ। জীবন তো তোমার ব্যর্থ হয়নি ভাই। কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই তো তোমার জীবনে।

এবারেও হেসে নীরব রইলেন পরমানন্দ।

ননীমাধব বুঝতে পারেন মনের কোনো গোপন কন্দরে ব্যর্থতার বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার চৌধুরী। ধন-সম্পত্তি, প্রতিপত্তি, যশ—সবই পেয়েছেন প্রচুর, তবু তৃপ্ত নন তিনি। আরও বড় কিছু হতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। কী সে? আই. সি. এস. চাকরি? কাউন্সিলারশিপ? প্রসঙ্গটা পালটে নেন উনি আপাতত—আচ্ছা চৌধুরী, আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—বলো।

—মহাত্মা গান্ধী কি বলে গেছেন এইসব হাঙ্গামা করতে? এ কি সম্ভব? তোমার কী মনে হয়?

—আমি জানি না কিছু।

—আহা, তা তো বটেই। আমি বলছি, তোমার কী মনে হয়? আমাদের এখন কী করা উচিত?

—তোমার বিবেক যা বলে।

হঠাৎ চটে ওঠেন ননীমাধব—এইজন্যেই তোমার উপর রাগ হয় চৌধুরী। প্রাণ খুলে কথা বলো না কেন তুমি?

আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি!

*   *   *

দিন কেটে যায়।

অসীম একদিন বাপের হাতে এনে দিল একতাড়া কাগজ—এগুলো নীলার বিছানার তলায় পাওয়া গিয়েছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হয় পরমানন্দের। নিষিদ্ধ প্রচার-পুস্তিকা। দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ করার নির্দেশ আছে তাতে। কর্মসূচির একটা লম্বা ফিরিস্তি। তলায় কংগ্রেসের বড় বড় নেতার নাম। আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস থেকে ছাপা।

অসীম উত্তেজিত হয়ে বলে—নীলাকে তুমি সাবধান করে দাও বাবা। তা ছাড়া আজকাল ও যে-সব জায়গায় যাতায়াত করে—যাদের সঙ্গে মেশে—তাতে আমার সন্দেহ হয় ও আমাদের বংশের নাম ডোবাবে। ওদের পার্টির কয়েকটি ছেলেও আসে এ বাড়িতে নীলার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে।

পরমানন্দ বিচলিত হয়েছিলেন কিনা বোঝা যায় না কিন্তু উত্তেজিত তিনি হয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন তিনি অসীমকে—তুমি কী করে জানলে? তুমি নিজে দেখেছ?

—না, আমি নিজে দেখিনি, বৈশাখী দেখেছে।

পরমানন্দ বৈশাখীকে ডেকে পাঠালেন। এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নীলার চেয়ে বয়সে দু-এক বছরের বড়ই হবে। দেখলে কিন্তু নীলাকেই বড় বলে মনে হয়। নীলা ধীর, গম্ভীর—বয়সের অনুপাতে গাম্ভীর্য তার বেশি। এদিকে বৈশাখী চঞ্চলস্বভাবা, ওর খঞ্জন নয়ন দুটি সর্বদাই চঞ্চল হয়ে ঘুরছে আশেপাশে। এ পরিবারেরই মানুষ বৈশাখী। পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় সে পরমানন্দের হাসপাতালের বেতনভুক নার্স; কিন্তু তা ছাড়াও তার একটা আলাদা পরিচয় আছে। সে পরিচয়ে বৈশাখী পরিবারভুক্ত লোক। আরও একটা পরিচয় আছে বৈশাখীর—কিন্তু সে পরিচয় অসীম আর বৈশাখী ছাড়া আর কেউ জানত না।

পরমানন্দ দু-একটি প্রশ্ন করলেন ওকে। তারপর তাকে বিদায় দিয়ে ডেকে পাঠালেন নীলাকে। এসে দাঁড়াল নতনয়না মেয়েটি। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী দেখলেন পরমানন্দ। তারপর বললেন—এ কাগজগুলো তোমার বিছানার তলা থেকে পাওয়া গিয়েছে।

নীলা একবার চোখ তুলেই মুখটি নীচু করে। মুখটা রক্তশূন্য হয়ে যায় ওর।

—এ-সব জিনিস অমন অসাবধানে রাখতে নেই। যাও।

ভয়ে নীল-হয়ে-যাওয়া নীলার হাতের মধ্যে গুঁজে দেন কাগজের বান্ডিলটা। নীলা চলে যায় দ্রুতপদে।

অসীম অনেকক্ষণ কোনো কথা খুঁজে পায় না। শেষে বলে—এটা কি ঠিক হল? শেষে ওকেই দিলে কাগজগুলো?

—তুমি যে বললে ওগুলো নীলার।

অসীমের বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বলে,—কিন্তু ওকে সাবধান করে দিলে না? শাসন করলে না?

—সাবধানই তো করে দিলাম। আর শাসন আমি কাউকে করি না। তোমরা বড় হয়েছ, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে। নিজের বিবেক অনুযায়ী তোমরা যে যার আদর্শে চলবে এই আমি চাই।

—তার মানে নীলার এ-সব অপকীর্তিতে তোমারও গোপন সমর্থন আছে?

—না; নেই। যেমন নেই তোমার 'জাপানকে রুখতে হবে' যুক্তিতে। কিন্তু এ বাড়িতে কারো ব্যক্তিস্বাধীনতায় আমি হাত দিতে চাই না। যে যার কর্তব্য করে যাব আমরা।

অসীমের কণ্ঠে এবার রূঢ়তার আমেজ—বুঝলাম! এটা জানা ছিল না আমার। তুমিও তা হলে ওই দলে!

—খোকা!

—বেশ! কিন্তু আমার যদি মনে হয় নীলার এই খবরটা আমার পুলিশে দিয়ে আসা উচিত—তাহলে আশা করি তুমি আপত্তি করবে না। আমার সে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না আশা করি।

পরমানন্দ মৃদু হেসে বলেন—না।

—ভালো কথা।

দুমদুম করে পা ফেলে অসীম চলে যায়।

মনে মনে এবার একটু বিচলিত হয়ে পড়েন পরমানন্দ। পাগল ছেলেটা সত্যিই একটা কেলেঙ্কারি করে বসবে না তো? বিশ্বাস হয় না তাঁর। অসীম ছেলেমানুষ নয়। এ কাজের ফলাফল কী ভয়াবহ হতে পারে এ কথা না বুঝবার নয়। নিজের ওই বয়সটার কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বাপের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ বেধেছিল তাঁরও। অসীমকে যতটা স্বাধীনভাবে পথ চলতে দিচ্ছেন তিনি অতটা স্বাধীনতা জোটেনি নিজের বেলা। যা কিছু করতে হত—তা গোপনেই সারতে হত। ডাক্তারি পড়বার জন্য যখন তিনি প্রবাসযাত্রা করেন তখনও তাঁর বাবা জানতে পারেননি কেন তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন ডাক্তারি পড়তে। কোনোদিনই তা আর জানতে পারেননি।

* * *

দিন কেটে যায়। বাড়ির আবহাওয়াটা অসহনীয়। নীলা আর অসীম পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। প্রাতরাশের টেবিলে মিস গ্রেহামের কাছে শুনতে পান অসীম আগে খেয়ে নিয়েছে অথবা নীলা পরে খেতে আসবে। বস্তুত দুজনের কারো সাক্ষাৎ পান না পরমানন্দ। এ বাড়িতে এটা রীতিবিরুদ্ধ। দিনের মধ্যে দুবার এক টেবিলে আহার-গ্রহণের একটা অলিখিত আইন অলঙ্ঘনীয় বলে মেনে নিয়েছিল এ সংসার। সকাল সাতটায় প্রাতরাশ এবং রাত্রি সাড়ে আটটায় ডিনার। মধ্যাহ্ন আহারটা অবশ্য একত্র সম্ভব ছিল না। ছেলেমেয়েরা সকালে খেয়ে স্কুলে-কলেজে চলে যেত—চৌধুরী খেতে আসতেন বেলা দ্বিপ্রহরে। এখন শুধু প্রাতরাশ নয়, রাত্রের ডিনার টেবিলেও একত্র আহারটা ঘটে ওঠে না দেখা যাচ্ছে। অসীমের রাত হয়—কোনোদিন নটা-দশটা, কোনোদিন বা আরও গভীর রাত্রে। নীলা যেন নিজেকে একেবারে গুটিয়ে ফেলেছে। পরমানন্দকে দুজনেই পরিহার করে চলেছে।

গ্রেহাম বুড়ি মাঝে মাঝে এসে বলে—এবার আমাকে ছেড়ে দাও চৌধুরী। তোমার হাসপাতাল আমার মতো বুড়িকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে এখন। এখন আমি অন্য কোথাও চলে যাই।

পরমানন্দ প্রতিবাদ করেন। বুড়ি মেম তখন আসল কথাটাই ভেঙে বলে—আমাকে ভুল বুঝো না চৌধুরী, আমার অবস্থা হয়েছে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। এখানে আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

চৌধুরী আর আপত্তি করতে পারেন না। বেশ, শেষ জীবনটা তিনি যেখানে যেভাবে কাটাতে চান সেই মতোই ব্যবস্থা করা যাবে না হয়। যুদ্ধের ডামাডোলটা একটু কমলেই ওঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

* * *

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল চৌধুরীর। নিজেকে আবিষ্কার করলেন নিঃসঙ্গ প্রাতরাশের টেবিলে। ...ক্রিরিং ক্রিরিং...উঠতে হল অগত্যা।

সিল্কের ড্রেসিং গাউনটার পাকানো কর্ডটা আলগা করে মাজায় বাঁধতে বাঁধতে চলে আসেন আর্চওয়ের তলা দিয়ে ড্রয়িং রুমে। রিসিভার থেকে তুলে নিলেন টেলিফোনটা।

—চৌধুরী!

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল উদ্‌বিগ্ন ননীমাধবের উৎকণ্ঠ ব্যস্ততা—বেশ যা হোক। আটটা বেজে গেল—তোমার পাত্তা নেই। কী করছ? দেরি করছ কেন?

পরমানন্দ প্রতিপ্রশ্ন করেন—কেন? কোথায় যাব?

—কোথায় যাবে?—ননীমাধব আর্তনাদ করে ওঠেন—সে কী হে? কাল রাত্রে ক পেগে থেমেছিলে বলো তো? এখনও খোলসা হয়নি মাথা?

বিরক্ত বোধ করেন চৌধুরী। কাল রাত্রে সত্যিই মাত্রাতিরিক্ত পান করেছেন নীলা চলে যাবার পর। কিন্তু সেজন্য বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি ওঁর। এ নেশা ওঁর নূতন নয়। বললেন—বাজে কথা বোলো না। কোথায় যেতে বলছ এখন?

ওঁর কণ্ঠস্বরে ননীমাধব কিন্তু বিচলিত হন না। বলেন,—সকালবেলা উঠে এনগেজমেন্ট প্যাডটাও দেখনি খুলে? কেমন? শোনো, মুখস্থ বলে যাচ্ছি আমি—সকাল সাড়ে আটটায় বোর্ড-অফ ডাইরেকটর্সের মিটিঙ—সাড়ে দশটায় জিতেনবাবুর বাসায় যাওয়ার কথা আছে—তাঁকে সঙ্গে করে এগারোটায় তারিণীদার বাসায়—মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ আছে তোমার সেখানে—ও বেলায় ধরো, মিউনিসিপ্যাল হলে সাড়ে তিনটের শোকসভাতে গিয়ে একটা কাঁপা-কাঁপা গলায় ভাষণ দিতে হবে—সেখানে থেকে সাড়ে চারটায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে। মনে পড়ছে কিছু? তারপর ধরো...

ছি ছি ছি। কী মারাত্মক ভ্রান্তি। সব কথা মনে পড়ে যায় পরমানন্দের। তাঁর দিনগুলি কি আর তাঁর নিজের? আপন খেয়ালখুশিতে ফেলে-আসা দিনগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে তন্ময় হয়ে যাবার অবকাশ কোথায়? প্রতিটি ঘন্টা প্রতিটি মুহূর্ত যে কঠিন কর্মসূচির শৃঙ্খলে বন্দি! সামনের আয়নাটায় প্রতিবিম্ব পড়েছে নিজের। চমকে ওঠেন দেখে। দাড়ি কামানো হয়নি, স্নান হয়নি, জামাকাপড় বদলানো হয়নি। আশ্চর্য, এ-সব না সেরেই তিনি প্রাতরাশের টেবিলে এসে বসেছিলেন? জীবনে অনেক ভুল করেছেন তিনি—ভুলের মাশুলও দিয়ে এসেছেন কড়াক্রান্তি হিসাবে; কিন্তু, মনে হল ডাক্তার চৌধুরীর, এত বড় ভ্রান্তি বুঝি এই প্রথম। ঘড়ির কাঁটার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দৈনন্দিন কর্মসূচি আজ বুঝি প্রথম আগল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অনিয়মের অরাজকতায়। নাঃ! এ দুর্বলতাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না।

—কী হল, তুমি আসবে না, না আমিই যাব তোমার ওখানে?

—না, না, আমিই যাচ্ছি—গাড়ি বার করতে বলছি।

—যাক, গাড়িটা ফেরত পেয়েছ তা হলে?

—ও না, গাড়ি তো এখানে নেই। তাহলে তুমিই বরং এসো, আমি ততক্ষণ তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো?

জবাব না দিয়ে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। নন্দ এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। তাকে বলেন একগ্লাস ঠান্ডা জল দিতে। ফ্রিজিডেয়ার খুলে জলের বোতল আর গ্লাসটা বার করে আনে নন্দ। ঢকঢক করে একগ্লাস ঠান্ডা জল খেয়ে নিলেন প্রথমেই।

তৈরি হয়ে নিতে অবশ্য সময় লাগল না। যন্ত্রের মতো কাজ করে গেলেন উনি। চাবি টিপে দেবার পর মেটিরিয়ালগুলো যেমন 'কাটার' থেকে 'ক্রাশার' যন্ত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—আর অনায়াস গতিভঙ্গে শেষ পর্যন্ত সুদৃশ্য মোড়কে বার হয়ে আসে ফিনিশড প্রডাক্ট হিসাবে—কারখানার অন্যতম ডাইরেকটরও তেমনি মিনিট পনেরোর মধ্যে দাড়ি কামিয়ে, স্নানাদি সেরে সুদৃশ্য মোড়কে আপাদমস্তক মুড়ে এসে বসলেন ড্রয়িং রুমের শো-কেসে। বাথরুমেই নন্দ ইতিমধ্যে রেখে এসেছিল মীটিঙে যাবার পোশাক—খদ্দরের পাঞ্জাবি, খদ্দরের ধুতি আর বিদ্যাসাগরী চটি। কী জানি কেন সাদা খদ্দরের টুপিটি আর আজকাল ব্যবহার করেন না উনি।

সারাদিনের মতো তৈরি হয়ে এসে বসলেন বাইরের ঘরে। নন্দ ফ্যানটা খুলে দিয়ে যায়। টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে হ্যান্ডলুমের শান্তিনিকেতনী কাজকরা হ্যান্ডব্যাগটা। ওর গর্ভে আছে তাঁর ডায়েরি, কলম, চেকবই, লেটারহেড-প্যাড, নোটবই আর আছে তাম্রপাত্রের আধারে গোটা চারেক বর্মা চুরুট, একটা তোয়ালে, সাবান আর কিউটিকুরা পাউডার এক কৌটো। ঘামাচিতে বড্ড ভোগেন উনি।

অল্প পরেই ননীমাধবের হিন্দুস্থানখানা এসে দাঁড়াল পোর্টিকোর নীচে। ননীমাধব এসে প্রবেশ করেন। এসেই তাড়াহুড়া শুরু করেন—অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুঝেছ, ভয়ানক লেট করে ফেলেছ তুমি...আরে গাড়িটা যে এখনও ফেরত পাওনি তা আমাকে বলনি কেন?—তারপর হঠাৎ চোখ দুটো ছোট করে কণ্ঠস্বর নীচু করে রসিকতার ভঙ্গিতে বলেন—ওটার আশা ত্যাগ করো ভাই, বুঝলে,

দেশের সেবায় তো অনেক কিছুই দান করেছ তুমি—মনে করো ওটাও গেছে ওই খাতে। আর একখানা গাড়ি কেনো তুমি।

পরমানন্দের গাড়িটা আজ মাসাবধিকাল আছে তারিণীবাবুর হেপাজতে। তারিণীবাবু এ জেলার প্রায় সকলেরই তারিণীদা। বৃদ্ধ মানুষ—আজীবন কুমার; জেলার নামকরা জননেতা। বহুবার জেল খেটেছেন—বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন জীবনে। চেষ্টা নয়—শুধুমাত্র ইচ্ছা করলেই একটা দামী গাড়ির শুধু দাম নয়, বনেটের সামনে পতাকাওয়ালা গাড়িই হয়তো তিনি জোগাড় করতে পারতেন সরকার থেকে—কিন্তু তা তিনি করেননি। এই নিরলস অক্লান্ত দেশকর্মীটি আজও আঁকড়ে আছেন রাজনীতিকেই। ইতিহাসে চিরকাল একশ্রেণির ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকেন যাঁরা রাজ্যচালনা করেন না কিন্তু রাজাদের চালান—তাঁদের বলে 'কিং-মেকার'। তারিণীদা এ জেলার সেই শ্রেণির শীর্ষস্থানীয় জননায়ক। জনসেবার কাজে তাঁকে জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উদয়াস্ত ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়। আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে ছোটাছুটিটা বেড়ে গেছে তাঁর। পরমানন্দ একই রাজনৈতিক দলভুক্ত। তাই নিজের গাড়িটা দিয়ে রেখেছেন তাঁর তারিণীদাকে। প্রতিদানে,—না প্রতিদানে কিছুই চাননি তিনি।

পরমানন্দ ধীরে ধীরে বলেন—নীলা কাল রাত্রে চলে গেছে।

ব্যস্তবাগীশ ননীমাধব বলেন—ও। তা আর দেরি করছ কেন? ওঠো, চলো যাই।

পরমানন্দ আবার উচ্চারণ করেন কথাগুলি—আমার কথাটা তুমি কানে তোলনি ননীমাধব। নীলা কাল রাত্রে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

এবার অর্থগ্রহণ হয় ননীমাধবের। বসে পড়েন একটা সোফায় : ত্যাগ করে চলে গেছে? মানে?

—মানে, আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে আমরা অন্যায় করলে ত্যাজ্যপুত্র হতাম; এখন যুগ পালটে গেছে। এখন বাপ অন্যায় করছে মনে করলে ছেলেমেয়েরা তাদের ত্যাজ্যপিতা করে।

ননীমাধব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন; তারপর বলেন—এ রকমটা যে একদিন ঘটবেই তা আমি জানতাম। তোমাকে কতবার সাবধান করেছি আমি—অত আশকারা দিও না। তুমি কান দাওনি।...যাই হোক, ও জন্যে ভাবনা কোরো না। রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। যাবে আর কোথায়?

—না, তাহলে তো তুমি খবর পেতেই। কোনো বান্ধবীর বাড়ি গিয়ে উঠেছে বোধহয়।

—না! আমার মনে হয় সে গিয়ে উঠেছে পি নাইন ব্যারাকে।

চমকে ওঠেন ননীমাধব—না, না, এতটা নীচে নামতে পারে না কখনও নীলা।

—তুমি 'উদয়ের পথে' সিনেমাটা দেখেছিলে?

—না। কেন?

—ওরা একে নীচে নামা বলে না—বলে, ওপরে ওঠা।

—না, না, কী আবোল-তাবোল বকছ যা তা। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। এ বাড়ির মেয়ে কখনও আমাদের কুলিব্যারাকে গিয়ে উঠতে পারে? যাক, এ নিয়ে অবহেলা করাটা ঠিক নয়। মীটিঙ সেরেই সোজা চলে যাব জীবনবাবুর ওখানে। সেখান থেকে তারিণীদার বাসায় কাজ সেরেই দুপুরে একটু ফুরসত পাব। তখন খোঁজ করা যাবে। বাড়াবাড়ি হবার আগেই মিটিয়ে ফেলতে হবে ব্যাপারটা। ওঠো এখন। আটটা পঁচিশ হয়ে গেছে।

ননীমাধবের সঙ্গে পরমানন্দও এসে ওঠেন গাড়িতে।

হিন্দুস্থানখানা চলতে থাকে কর্দমাক্ত পথে—পদাতিকদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে।

* * *

আবার চিন্তার মধ্যে অবগাহন করতে থাকেন পরমানন্দ। ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই ভাবছিলেন তিনি। কোথায় যেন চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? ঠিক মনে আসছে না। জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে বড় অতর্কিতে। এগুলি মাহেন্দ্রক্ষণ। যেমন করে বাঁক নিচ্ছে গাড়িটা জীবনপথও এমনি হঠাৎ বাঁক নেয় এমন লগ্নে। সে রকম দুর্লভ মুহূর্ত বহুবার এসেছে তাঁর জীবনে। এই তো মাস-কয়েক আগে এসেছিল একটা চরম মুহূর্ত এই পথেই। সেদিনও এমনি জোরে ছুটছিল গাড়ি। তিনি ছিলেন ড্রাইভারের পাশের সীটে, পিছনের সীটে বসেছিল নীলা। হঠাৎ ফ্যাকটরির গেটের কাছে তাঁর মোটরের গতিপথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একটা লোক। ড্রাইভার অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ব্রেক না

কষলে হয়তো চাপাই পড়ত লোকটা। নীল পায়জামা পরা একজন কারখানার মজুর, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাফশার্টের গায়ে মবিলের মানচিত্র। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়তেই গেট থেকে ছুটে এসেছিল গুর্খা দারোয়ান—ধরেছিল লোকটাকে। পরমানন্দও মুখ বার করে ধমক দিতে যান—দেখতে পাও না! চাপা পড়ে মরতে যে!

—এ ছাড়া তো আপনার সঙ্গে দেখা করার উপায় ছিল না।

লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন পরমানন্দ। মুহূর্তে মাথাটা টেনে নিয়ে ড্রাইভারকে বলেন—চালাও!

গাড়ি কিন্তু চালানো যায়নি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে গাড়িটাকে। সকলেই কারখানার মেহনতী মানুষ। যাদের ভালো করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি গ্রহণ করেছেন কোম্পানির পরিচালন-দায়িত্ব। হাফপ্যান্ট আর লুব্রিক্যান্ট-লাঞ্ছিত হাফশার্টের মিছিল।

লোকটা কাছে এগিয়ে এসে বলে—আপনাকে এভাবে আটকাতে হল বলে দুঃখিত। আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল—কারখানায় আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আপনার বাড়ির দরজা থেকে তিন দিন ফিরে এসেছি। কাজেই পথের মাঝখানে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করছি।

—এখন আমার সময় নেই। পরে দেখা কোরো। ড্রাইভার!

—কবে, কখন, কোথায় বলে যান।

লোকটাকে এড়াবার জন্য উশখুশ করছিলেন পরমানন্দ। কী বলবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না।

পিছনের সীট থেকে নীলা বলে ওঠে—ও কে বাবা?

পরমানন্দ সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটাকেই বলেন—কাল সকাল দশটায় অফিসে দেখা কোরো।

ওরা তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করে।

নীলা কিন্তু একই প্রশ্ন করে আবার—লোকটা কে বাবা?

—কী জানি! কারখানারই কোনো মজুর হবে বোধহয়।

নীলা চুপ করে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে একটা পরমান্দের।

*　　　*　　　*

তিনি কিন্তু ভুল করেছিলেন।

নীলা চিনতে পেরেছিল ওই লোকটাকে। কাল রাত্রে সে কথা জানতে পারেন পরমানন্দ। মনে পড়ে যায় গতকাল রাত্রে নীলার সঙ্গে উষ্ণ বাক্যবিনিময়—

—মিথ্যা কথা আমি বলি না নীলা।

—আগে বলতে না! কিন্তু...কিছু মনে কোরো না বাবা, কয়েক মাস আগে কারখানার গেটে যে লোকটি আমাদের গাড়ি আটক করে তাকে কি তুমি সত্যিই চিনতে পারনি সেদিন?

*　　　*　　　*

গাড়ি এসে দাঁড়ায় কারখানার গেটে। গেট খুলে দেয় গুর্খা দরোয়ান। লোহার মোটা মোটা গরাদ দেওয়া বিরাটকায় গেট যেন লৌহকারার প্রবেশপথ—গায়ে তার কাঁটাতারের নামাবলী। মুখব্যাদান করে অনায়াসে গিলে ফেলে কালো রঙের হিন্দুস্থানটাকে। মুখ বন্ধ করে আবার। সশস্ত্র প্রহরা বসেছে গেটের পাশে। লক-আউট চলছে কারখানায়।

ওঁদের গাড়িটা অ্যাসফল্টের সড়ক বেয়ে এসে দাঁড়ায় গাড়ি-বারান্দার নীচে।

বোর্ড-অফ-ডাইরেকটর্সের জরুরি মিটিঙ। কলকাতা থেকে এসেছেন অন্যান্য ডাইরেকটররা। অধিকাংশই উত্তর-ভারতের লোক। ওঁদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি কর্ণধার পরমানন্দ। ননীমাধব বর্তমানে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছেন। বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা শ্বেতাঙ্গ অধিপতিরা এখন ইতিহাসের মহানেপথ্যে সরে গিয়েছেন। ভারতীয় ধনপতিরা এসে অধিকার করেছেন ওঁদের শূন্য আসন। রাস্তা আর পার্কের নাম বদল করলেও ইংরাজ কোম্পানির নাম সচরাচর বদলাতে ইচ্ছুক হন না ভারতীয় ব্যবসাদারেরা। হাজার হোক, বিলাতী নামটারও একটা মোহ আছে! অনেক

কিছু বদলে গিয়েছে কোম্পানির। অনেক পুরনো লোক বাতিল হয়ে গেছে—এসেছে নতুন লোক। শিথিলতর হয়েছে শাসনব্যবস্থা, কারখানায় প্রস্তুত জিনিসেরও হয়েছে অবনতি—যদিচ সেটা স্বীকার করেন না ওঁরা! সে আমলের যে কয়জন মুষ্টিমেয় লোক আছেন ননীমাধব তাঁদের মধ্যে একজন। বেতনভুক পর্যায়ে বস্তুত সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত। দীপকও ঢুকেছে এ কারখানায়—সেও একজন ছোটসাহেব। এঁদের সঙ্গে পরমানন্দের যথেষ্ট হৃদ্যতা, ঘনিষ্ঠতা। বস্তুত ননীমাধবের সঙ্গে পরমানন্দ একটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও স্থাপন করতে পারেন—কারখানায় এমন গুজবও রটেছে। এ ক্ষেত্রে পরমানন্দকেও সহজে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পান না। না হলে নিজ অংশের শেয়ারগুলি বিক্রি করে দিয়ে বহু পূর্বেই সরে আসতে হত চৌধুরী ডাক্তারকে।

পরমানন্দের সঙ্গে কোম্পানি আজ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এর সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির ছোট তরফের ওয়ালটন হ্যারিস সাহেব মনস্থির করেন বাকি জীবনটা তাঁর ডিভনশায়ারের বাড়িতেই কাটাবেন। ওয়ালটন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। বস্তুত চৌধুরী ছিলেন তাঁর জীবনদাতা। প্রতিদানে ওয়ালটন সাহেব স্বদেশযাত্রার প্রাক্কালে প্রায় নামমাত্র মূল্যে দিয়ে গিয়েছিলেন শেয়ারের একটা গোছা। ওয়ালটনের স্ত্রী ছিলেন মিস গ্রেহামের বান্ধবী। ফলে চিকিৎসার জন্য কোনো ফী গ্রহণ করেননি চৌধুরী। নিতে হল তাই শেয়ারের বান্ডিলটা। সৌভাগ্যের নবতম সূচনার এই হল আদি ইতিহাস। প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি—এর পর তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ জেলার বাইরেও—বড় ডাক্তার বলে নয়—বড় ব্যবসায়ী বলে।

যে প্রতিষ্ঠানটিকে একদিন তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলেন রক্তের বিনিময়ে, সেই হাসপাতাল, সেই সেবায়তন, তার ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি সবকিছু তিনি বিক্রি করে দিলেন কোম্পানিকে। নগদ টাকা অবশ্য পেলেন না—হাতে এল আর এক গোছা শেয়ার। এটা প্রয়োজন ছিল—না হলে ডিরেকটর হতে পারছিলেন না তিনি। নীলা আপত্তি করেছিল—বোকা মেয়েটা ভেবেছিল বুঝি কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেকটর হওয়াই লক্ষ্য তাঁর—বুঝি অর্থোপার্জনের মোহে তিনি হাসপাতাল বিক্রি করে বেশি লাভজনক কারবারে বিনিয়োগ করতে চাইছেন তাঁর সম্পত্তি। সে বোঝেনি এর পিছনেও আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা। তিনি ছেড়ে দিলেন বলে তো আর হাসপাতাল উঠে গেল না; কিন্তু তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন বলেই এতগুলি মেহনতী মানুষের ভালো করবার ক্ষমতা পেলেন তিনি।

ননীমাধব আর পরমানন্দ যখন এসে পৌঁছলেন তখন অন্যান্য সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। সৌজন্য বিনিময় হল—কিন্তু আন্তরিক আবেগ নেই সে কুশলপ্রশ্নের আদানপ্রদানে। সকলেরই মুখ গম্ভীর। শ্রমিকেরা ধর্মঘট ঘোষণা করেছে; লক-আউট চলেছে কারখানায়।

চতুষ্কোণ টেবিলটার চারদিকে ওঁরা ঘিরে বসেছেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এ কারখানার ইতিহাসে এজাতীয় ঘটনা অভূতপূর্ব। মফস্বলের এ অঞ্চলে এতদিন এ-সব হাঙ্গামা ছিল না—তা ছাড়া ননীমাধবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এ বিষয়ে। বিদ্রোহের কোনো শিশুতরু মাথা তুলছে দেখলেই যথোচিত ব্যবস্থা করতেন তিনি।

যৌবনে একমাথা ঘন কালো চুল ছিল ননীমাধবের। তা নিয়ে রীতিমত গর্ব ছিল ওঁর। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই কানের পাশে দু-এক গোছা করে পাকতে শুরু করল। রায়মশাই তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়েছিলেন। পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে নাতি-নাতিনী সুবাদ বাধিয়ে লাগিয়ে দিলেন বালখিল্য বাহিনীকে। কাঁচা চুলের অরণ্য থেকে বেছে বেছে তামাটে রঙের চুলগুলোকে একটি একটি করে সমূলে উৎপাটিত করত ওরা। বিনিময়ে ঘুষ জোগাতে হত ননীমাধবকে—কখনও লজেন্স, কখনও তাম্রখণ্ড, কখনও বা সিনেমা দেখানোর প্রতিশ্রুতি।

কারখানাতেও একই পদ্ধতি চালিয়ে এসেছেন তিনি। নিকষ কালো সরল মানুষগুলোর মধ্যে এক-আধটা লোকের গায়ে যদি দেখা যেত তামাটে অথবা লালচে রঙের আমেজ অমনি সোন্না দিয়ে চেপে ধরতেন তাকে। সমূলে উৎপাটিত করতেন লালের আমেজ-মাখানো মানুষটিকে। এ জন্যও নতুন ধরনের লজেন্স জোগান দিতে হত এক শ্রেণির লোককে।

কিন্তু ননীমাধবের এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেই গোপনে এসে শিকড় গাড়ল কোনো অলক্ষ্য ফাটলে এক শিশু-মহীরুহ। অনতিবিলম্বেই নজর পড়ল ম্যানেজারবাবুর— তামাটে নয়, লোকটির রঙ রক্তের

মতো লাল! বিষবৃক্ষকে সমূলে তুলে ফেরার ব্যবস্থা হল। হয়তো কঠিন হত এই অবাঞ্ছিত শ্রমিকনেতাকে ছাঁটাই করা, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লোকটা ছিল চোর। ওর সেকশনে কতকগুলো যন্ত্রের পার্টস চুরি গেল আর হাতেনাতে ধরাও পড়ে গেল লোকটি। রেজিস্টার থেকে নাম কাটা গেল—নোটিশ দেওয়া হল কুলি-ব্যারাকের ঘর ছেড়ে দেওয়ার। ননীমাধব আশা করেছিলেন—ওই লোকটাকে কারখানার এলাকা থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারলে মজদুর-মহলের ধূমায়িত অশান্তির বহ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে আসবে। ভুল ভেবেছিলেন উনি। ওকে চুরির অভিযোগে বরখাস্ত করার পর উলটো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল শ্রমিক মহলে। এত অল্প দিনের মধ্যেই লোকটা যে কুলি বস্তিতে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা আন্দাজ করতে পারেননি ওঁরা। লোকগুলো যেন খেপে গেল মুহূর্তে। রাতারাতি মিটিঙ করল ওরা, তৈরি করল একটি লম্বা ফিরিস্তি। তাদের প্রথম ও প্রধান দাবি হল বরখাস্ত মজুরটিকে কাজে পুনর্বহাল করা এবং অন্তর্বর্তী দাবি ইউনিয়নের স্বীকৃতি—আর শেষ দাবি যে কোথায় গিয়ে থামবে তা আজ ওঁদের আন্দাজেরও বাইরে। অল্পেই ঘোলাটে হয়ে উঠল ব্যাপারটা। দোষ দুপক্ষেরই আছে। এঁরা ধর্মঘটের আশঙ্কা করে কয়েকজনকে সামান্য অজুহাতে সাসপেন্ড করলেন—ওরাও বিনা-নোটিশে অনুপস্থিত হল কাজে। ফলে অচিরেই ঘোলাটে হয়ে উঠল পরিস্থিতি। বর্তমানে এসে ঠেকেছে এ পক্ষের ধর্মঘটে আর ও পক্ষের লক-আউট ঘোষণায়। পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে আজ ওঁরা মিলিত হয়েছেন এই জরুরি মিটিঙে।

পরমানন্দ কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না। আজ যেন কী হয়েছে তাঁর। শুধু রোমন্থন করে চলেছেন অতীত ইতিহাস। গত রাত্রে নীলার সঙ্গে যে কঠিন বাক্যবিনিময় হয়েছে—বস্তুত বাদানুবাদ হয়েছে—তার কথাই মনে পড়ছে বারবার। কোন আকাশস্পর্শী স্পর্ধায় সেই একফোঁটা মেয়েটা তাঁর মুখের উপর বলে গেল—তিনি আদর্শচ্যুত। তিনি ব্রাত্য।

আদর্শ! ওই ছোট্ট কথাটির জন্য নির্যাতন তো তিনি কম ভোগ করেননি। আর শুধু তিনি কি একা? চৌধুরী পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ। যুগে যুগে আদর্শগত পার্থক্যে একই গৃহের অভ্যন্তরে রচিত হয়েছে ভিন্নমতাবলম্বী শিবির। পিতার সঙ্গে পুত্রের, পুত্রের সঙ্গে কন্যার, পুত্রকন্যার সঙ্গে তাদের মাতামহীর নীতিগত পার্থক্যের জন্য সংঘাত বেধেছে। কিন্তু কই, কেউ তো কখনও এমন নির্লজ্জভাবে অপরকে আক্রমণ করেননি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করেছেন। আদর্শগত বিরোধের চরমতম আঘাত সহ্য করেছে অসীম, করেছেন তিনি—তবু অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের দুজনেরই। রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানুষে-মানুষে যে আত্মিক বন্ধন তা অবিকৃতই ছিল। আজ তা হলে সেই পারিবারিক ইমারতের ভিত্তিমূলে এমনভাবে ফাটল আত্মপ্রকাশ করছে কেন? রাজনৈতিক মতের পার্থক্যে একজন কেন অপরজনের সান্নিধ্যে পর্যন্ত অসহ্য বোধ করছে?

বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের মিটিঙে ওদিকে আলোচনা চলেছে ঘোরালো হয়ে। একপক্ষ চাইছেন ধর্মঘটের প্রথমাবস্থাতেই ওদের ডেকে এনে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে—অপরপক্ষ চাইছেন কঠোর হস্তে ওদের দমন করতে—যাতে কোনোদিন আর মাথা তুলতে না পারে। পরমানন্দের কিন্তু এ-সব কথায় কান নেই। তিনি ডুবে আছেন অতীত জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলিতেই।

* * *

ওঁর মনের পর্দার ওপর তখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে একটি শারদ প্রভাত। যে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর সেই সর্বনেশে রাজনীতিই চুপি চুপি এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেই শরৎরাত্রির শেষপ্রহরে। বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসবার আগেই ওঁর বাবা-মা গত হয়েছেন। বিদেশী মেয়েকে বিবাহ করায় আত্মীয়স্বজনও সম্পর্ক রাখেননি তাঁর সঙ্গে। ভালোই হয়েছিল একপক্ষে। কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের ইতিবৃত্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা পড়েছিল। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না। পরমানন্দের জীবন গতি পরিবর্তন করল আবার।

সেদিনও উঠেছিল প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়। বিশাল বনস্পতিকে ধরে যেমন করে ঝাঁকানি দেয় হঠাৎ-আসা কালবৈশাখী তেমনি করেই নাড়া দিয়েছিল তাঁকে, কিন্তু না, সেদিন তিনি পরাজিত হননি। সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি মহীরুহকে। নিষ্ঠুর বাতাসের তাড়নে নিঃশেষিত হয়েছিল

অরণ্যঅধিপতির সবুজ পাতার সম্ভার—ছিন্ন হয়েছিল কচি কিশলয়; কিন্তু রিক্তপত্র শাখার আন্দোলনে বিদ্রোহী বনস্পতি প্রতিবাদ জানিয়েছিল তবুও। তারপর নামল বজ্র। লুটিয়ে তিনি পড়েননি—কিন্তু দাউদাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল উদ্ধতশির পাদপ।

বিস্মৃতির কুয়াশা কেটে গিয়ে সেই ঘটনাগুলিই মনে পড়ছে আজকে। অক্টোবর মাস। বেয়াল্লিশ সালেরই কথা। নীলাকে যেদিন খদ্দরে মণ্ডিত অবস্থায় প্রাতরাশের টেবিলে প্রথম দেখা গিয়েছিল তারই মাসখানেক পরের কথা। সন্ধ্যা থেকে অকাল-বর্ষণ চলেছে। সারা রাতই মেঘলা করে রয়েছে—টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে মাঝে মাঝে। সমস্ত রাত্রি ভালো ঘুম হয়নি। আগের দিন অসীমের আচরণে বিরক্ত বোধ করেছেন তিনি। অসীম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বাড়ির শাসনশৃঙ্খলাকে সে মেনে চলছে না। কাল থেকে ছেলেটা বাড়ি ফেরেনি। কে জানে কোথায় রাত কাটাচ্ছে হতভাগা ছেলে। ইটালিয়ান কম্বলটার উত্তাপও সহ্য হচ্ছিল না। বিনিদ্র রজনীর গ্লানিতে ভারাক্রান্ত মনে অবসন্ন দেহটা নিয়ে অতি প্রত্যুষেই তিনি শয্যাত্যাগ করেছিলেন। পুবের বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় এসে বসেন। ধরান একটা সিগার। হঠাৎ মনে হল নীচে জবাগাছটার তলায় নীলা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। চমকে ওঠেন উনি। তখনও ভালো করে ফরসা হয়নি পুব আকাশটা। অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নূতন দিন—তার রাঙা লিপির আমন্ত্রণ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে-বাতাসে। সেই রাঙা রেখার আলিম্পন আঁকা হয়েছে যেন তাঁর কিশোরী কন্যাটির মুখেও। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরিচিত তরুণ যুবক। সর্বাঙ্গ কালো একটা কম্বলে ঢাকা। বছর বাইশ বয়স হবে। নীলার হাতে একটা ফুলের সাজি। রোজই এ সময়ে ফুল তুলতে ওঠে ও। মিস গ্রেহাম আর মিসেস অ্যানী চৌধুরীর প্রভাবটা তার ওপর কার্যকরী হয়নি। স্কুলের দিদিমণিদের কাছ থেকেই সে অনুপ্রেরণা পেয়েছে বেশি। ঠাকুর-দেবতা-বার-ব্রতে তার অগাধ বিশ্বাস। সাধনার পথে সে খিচুড়িমার্গী। তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও তার তৃপ্তি হয়নি—দিদিমার কাছ থেকে আরও অনেকগুলি দেবদেবীর হদিস পেয়েছে সে—মেরীমাতা, জিসাস্, সেন্ট জন, মায় মোসেস, জ্যাকব, সলোমন পর্যন্ত! ফলে চাল-তোলা মঙ্গলবারে ডিনার টেবিলে তাকে ডাকলে সে মনে মনে শিউরে ওঠে—পাপ-স্খালনের জন্য বুকে আঁকে ক্রুশচিহ্ন। এ-সব অভ্যাস তার কমে এসেছে—বড় হওয়ার পর। এই অক্টোবরের ভোরবেলাতেই তার স্নান সারা হয়েছে। পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে ভিজে চুল। পূজার ফুল তুলছে অ্যারিঅ্যাডনি-তনয়া নীলা। হাসি আসে চৌধুরীর।

শুধু সন্তান নয়—কারো ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পরমানন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অপরের আচরণ সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল ছিল না তাঁর। সেদিন কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করতে পারেননি। নীলা কি বিপ্লবী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছে? না হলে এই বাঘের বিবরে কোন সাহসে মাথা গলায় ওই ছোকরা অকুতোভয়ে? এ দুর্জয় সাহস কী করে সংগ্রহ করল লোকটা? চকিতে মনে হয় পরমানন্দের—ওই লোকটার আগমনের দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় ওই ছেলেটি বিপ্লবী দলভুক্ত—এসেছে নীলার কাছে তার প্রশ্রয় পেয়েই। অথবা ওদের সাক্ষাৎকারের পেছনে আছে কোনো বিদেহী দেবতার ইঙ্গিত। যৌবনের অন্য এক আকর্ষণের উন্মাদনায় ও এসে দাঁড়িয়েছে নীলার অত কাছে। এ ছাড়া তার ওই গোপন আবির্ভাবের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। উৎকর্ণ হয়ে ওদের কথোপকথনে মনোনিবেশ করেন তিনি।

নীলা বলছিল : এ সময়ে বাবা রোগী দেখেন না। আপনি এভাবে এসেছেন কেন?

না! ছেলেটিকে নীলা তাহলে চেনে না। কোনো অতনু দেবতার অনুপ্রেরণাতেও ওরা এখানে মিলিত হয়নি। তবে কেন এসেছে ও?

নীলা তখন বলছিল : আটটার পর তাঁর চেম্বারে আসবেন। ওই ঘরটায়।—হাত বাড়িয়ে সে বাইরের দিকের নার্সিং হোমটা দেখিয়ে দেয়।

—আটটা? আটটা পর্যন্ত বাঁচব তো? দেখুন, আপনি একবার দয়া করে ওঁকে গিয়ে বলুন যে বিশেষ কারণে তাঁর চেম্বারে আসা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। উপায় থাকলে আটটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতাম, কিন্তু—

বাধা দিয়ে নীলা বলেছিল—সারারাত বাবার ঘুম হয়নি। তাঁকে এ সময়ে আমি জ্বালাতন করতে পারব না।

—জ্বালাতন! না, বিরক্ত তিনি কখনও হবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন। বহুদূর থেকে আসছি আমি তাঁর সন্ধানে। আপনি আপনার বাবাকে যতটা চেনেন তার চেয়ে অনেক বেশি আমি চিনি তাঁকে। আপনি একবার দয়া করে তাঁকে খবর দিন।

কে ওই ছেলেটা? পরমানন্দ পেছনের স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে বাগানে নেমে আসেন।

নীলা বিরক্ত হয়ে বলে : আপনার সঙ্গে তর্ক করার আমার সময় নেই।

ছেলেটি হেসেছিল। না, অস্ফুট আলোয় হাসিটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পাননি। তবু অনুমান করতে পারেন বিচিত্র একটা হাসি হেসে ও বলেছিল : আশ্চর্য! পুণ্যের লোভে এই দুরন্ত শীতে স্নান সেরে পূজার ফুল তুলতে এসেছেন—ডাক্তার পরমানন্দের কন্যা আপনি—অথচ অদৃষ্টের কী বিড়ম্বনা, একটা হতভাগ্য মুমূর্ষু মানুষের প্রাণদানের পুণ্যটাও আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করছেন—

এর পর আর তিনি স্থির থাকতে পারেননি। ছেলেটার সামনে এসে বলেছিলেন—কী চাও?

চমকে উঠেছিল নীলা।

ছেলেটি আপাদমস্তক তাঁকে দেখতে থাকে। বলে : আপনিই?

—হ্যাঁ, ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরী, যাকে তুমি আমার মেয়ের চেয়েও ভালো করে চেনো। বলো, কী চাও তুমি।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলে—ভিতরে চলুন, বলছি।

ওর পতনোন্মুখ দেহটা বাপে আর মেয়েতে ধরাধরি করে নিয়ে আসে ড্রইংরুমে। বসিয়ে দেয় একটা গদি-আঁটা সোফায়।

চৌধুরী বলেন : এবার বলো, কেন এসেছ তুমি আমার কাছে।

ছেলেটি ইতস্তত করে বলে : আপনাকে নিভৃতে বলতে চাই।

—এখানে নিভৃতই আছ তুমি—বলো।

ও চুপ করেই থাকে। হঠাৎ উঠে পড়ে নীলা। ত্বরিতবেগে চলে যায় ঘর ছেড়ে। ছেলেটি ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। তারপর হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে ফিরে তাকায় ডাক্তার চৌধুরীর দিকে। আস্তে আস্তে কম্বলটা উঁচু করে বাঁধন খুলে দেখায় দক্ষিণ জানুর ক্ষতচিহ্নটা। ভ্রূকুঞ্চিত হয় চৌধুরী ডাক্তারের। ক্ষতচিহ্নটার জাত আন্দাজ করেন মুহূর্তমধ্যে। ছেলেটি কিন্তু কোনো ইতস্তত করে না আর। স্পষ্টই স্বীকার করে অকুতোভয়ে : গুলিটা আপনি বার করে দিন ডাক্তারবাবু। পালাতে হয়তো পারব না, তবু আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্রটাও যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন একজোড়া সুস্থ সবল পা-ও কি পাব না আমি? আপনার মতো সার্জেন দেশে থাকতে?

ওর দুর্জয় সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন পরমানন্দ। বলেন : কী করে এমন হল?

এত যন্ত্রণার মধ্যেও ছেলেটি হাসলো। বললে : আপনাকে বলব না যে গেম-বার্ডস শিকার করতে গিয়ে ভুল করে লেগেছে। অথবা ডাকাত ধরতে গিয়ে লেগেছে।

—তোমার নাম কী? আসছ কোথা থেকে?

একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—এ প্রশ্নটা করা কি উচিত হচ্ছে আপনার?

—নিশ্চয়! রোগীর নাম-ধাম না জেনে, কেস-হিসট্রি না জেনে তো রোগীর দায়িত্ব নিতে পারি না আমি।

এক মিনিট দুজনেই নীরব। তারপর ছেলেটি আবার বলে—আমি জানি আপনার বিপদের কথা। আপনার দায়িত্বের কথা। অপারেশন হয়ে গেলে একটা রাতও থাকব না আমি এখানে। আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে শহরের প্রান্তে। সেখান থেকে আমি একা এসেছি। ওরা আমার জন্য দু দিন অপেক্ষা করবে—তার ভিতর ফিরে না গেলে ওরা ধরে নেবে যে আমি হয় ধরা পড়েছি নয় মারা গিয়েছি। আপনি একটা দিন শুধু আমাকে আশ্রয় দিন। গুলিটা বার করে দিলেই আমি ফিরে যাব ওদের কাছে—এ জন্মে কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না, কে বার করে দিল বুলেটটা।

ড্রইংরুমে বড় ওয়ালক্লকের পেন্ডুলামটার একাধিপত্য পরবর্তী নীরব মুহূর্তের নৈঃশব্দ্যের ওপর। পরমানন্দ তারপর বলেছিলেন—তা আমি পারি না। আমি তোমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক নই। আমার সন্তান আছে, সংসার আছে। তোমাকে ধরিয়ে আমি দেব না। কিন্তু আশ্রয়ও দিতে পারব না। এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও আমার বাড়ি থেকে।

ছেলেটি স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওর মুখভঙ্গি থেকে বোঝা যায় এটা সে একেবারেই আশঙ্কা করেনি। বলেও সে কথা—এটা যে হতে পারে তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম কোনোক্রমে আপনার এখানে এসে পৌঁছতে পারলেই আমার মুক্তি।

—কিন্তু এটাই তো আশঙ্কা করা উচিত ছিল তোমার। আমার পরিচয় তো শহরসুদ্ধ লোকের অজানা নেই। আমি বিলাত-ফেরত, বিলাতী কেতার মানুষ। মেম বিয়ে করেছি—আগামী বারে রায়বাহাদুর হব আমি—শোননি? তোমার বরং ভাবা উচিত ছিল আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব!

মাসকয়েক আগে ওই বয়সেরই আর একটি উদ্ধত যুবকের একটা বাঁকা ইঙ্গিতের জবাব দিলেন নাকি ডাক্তার চৌধুরী?

ছেলেটি শান্তস্বরে শুধু বলে—শহরসুদ্ধ লোক আপনার যে পরিচয় জানে—আমি তার কিছু বেশি জানি। না হলে সেই মহিষাদল থেকে এতদূর আসতাম না আপনার খোঁজে।

—কোন মহিষাদল? মেদিনীপুর মহিষাদল?—তারপরই হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠেন—না না, আর কোনো কথা নয়। তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কী প্রয়োজন? তুমি চলে যাও!

—যাব তো বটেই—তাড়িয়ে দিলে যেতে তো হবেই; কিন্তু একটা কৌতূহল চরিতার্থ না করে তো যেতে পারছি না ডাক্তারবাবু। আমি ভুল ঠিকানায় আসিনি তো? যেখান থেকে আজ আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাই কি ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরীর বাড়ি?

পরমানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ নাম কী করে জানল ও লোকটা? দুরন্ত কৌতূহল হয় জানতে—কোন সূত্রে ওই নামটা সংগ্রহ করেছে ছেলেটা। পরশুরাম যে তাঁরই একটা নাম—এটা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। শতাব্দীর একপাদকাল কেউ ও নামে ডাকেনি তাঁকে। যে-সব খাতাপত্র, চিঠি অথবা ডায়েরিতে ওই নামের উল্লেখ ছিল তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বিশ-পঁচিশ বছর আগে। সে যুগে তাঁর ওই নামটা জানত মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। আর তাদের অধিকাংশই আবার জানত না তাঁর আসল নাম। কিন্তু নাঃ, এ কৌতূহল চরিতার্থ করতে গেলেই ঘনিষ্ঠ হতে হবে ছেলেটির সঙ্গে; হয়তো জড়িয়ে পড়বেন আবার। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়; আত্মসংবরণ করেন তিনি, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন : দ্বিতীয় আর একটি কথা উচ্চারণ করলে আমি থানায় খবর দিতে বাধ্য হব।

ওকে যেন সহ্য করতে পারছেন না আর। হয়তো সংযম ভেঙে পড়বে—হয়তো জড়িয়ে পড়বেন আবার। রিসিভার থেকে টেলিফোনটা তুলে নেন হাতে। ফোন করবার উদ্দেশ্যে নয়—এও একটা হুমকি। পরমানন্দ কি ভয় পেয়েছেন? না কি শুধু উত্তেজিত হয়েছেন? হাতটা কাঁপছে কেন তাঁর?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বসে পড়ে আবার সোফায়। বলে : করুন টেলিফোন! সত্যিই আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই ডাক্তারবাবু। কী হবে এই পোড়া দেশের জন্য বেঁচে? এ দেশ আর পরশুরামের দেশ নয়। এ এখন রামরাজ্য—দেশজননী সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পরমানন্দে রাজৈশ্বর্য ভোগ করছেন—পরশুরামের কুঠারটায় ধরছে মরচে।

—তুমি যাবে কি না?

—না।

যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করে সোফায় এলিয়ে দেয় ক্লান্ত দেহটা। কম্বলটা জড়িয়ে নিয়ে গুটি মেরে শুয়েই পড়ে একেবারে।

ও কি অনুমান করেছে পরশুরামের অন্তরের দুর্বলতা?

—তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না যে তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারি আমি?

চোখ বুঁজেই ও জবাব দেয় : কেন পারব না? এমন কী দুঃসাহসিক কাজ সেটা আপনার পক্ষে?

—তবে চলে যাচ্ছ না কেন?

—চলে যাবার ক্ষমতা নেই বলে—

বিচিত্র হাসি হাসে ছেলেটা। এবার সে হাসিটা স্পষ্ট দেখতে পান উনি। বলে : বাঁচতে তো এমনিতেই পারব না। এই হতভাগা ঠ্যাঙখানাকে কাঁধে করে এতটা পথ এসেছি—আবার সে পথে ফিরে যাবার আর ক্ষমতা নেই। তার চেয়ে আপনি টেলিফোন করুন ডাক্তারবাবু। তবু আপনার দেশসেবার একটা পুরস্কার দিয়ে যেতে পারব ধরা পড়ার আগে। হাজার হোক, আপনিও তো এ হতভাগা দেশের জন্যে কম করেননি একদিন। তবু বুঝব আমার ধরা পড়ায় পরশুরাম চৌধুরী একটা খেতাব পেলেন।

—কে পরশুরাম চৌধুরী? আমি চিনি না তাঁকে—

—একশবার! আপনি কী করে চিনবেন তাঁকে! আপনি বিলাতফেরত বিলাতী কেতার মানুষ—আপনি তো তাঁকে চিনবেন না ! অথচ ওই পরশুরামই একদিন বলেছিলেন শচীশ নন্দীকে—পাঠকদার স্বপ্ন আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। বলেছিলেন তিনি আমেরিকা থেকে জার্মানিতে যাবেন পালিয়ে। সেখান থেকে সংগ্রহ করবেন বিপ্লবের সরঞ্জাম। পরশুরাম অবশ্য জার্মানি যাননি। তার আগেই চট্টলার পাহাড়ে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এতদিন জানতাম জ্যোতির্ময় পাঠক আর শচীশ নন্দীই বুঝি আত্মাহুতি দিয়েছেন সে ব্যর্থ প্রচেষ্টায়;—কিন্তু না। আজ দেখছি পরশুরাম চৌধুরীও ওই সঙ্গে স্বর্গগত হয়েছেন!

পরমানন্দ ওর কাঁধ দুটি ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বলেন—কে? কে তুমি? কী করে জানলে এ-সব কথা?

—বাবার ডায়রিটা পুলিশের হাতে পড়েনি। মায়ের কাছ থেকে সেটা আমি পেয়েছিলাম। তাই আমার বড় ভরসা ছিল ডাক্তারবাবু —এ শুধু আপনিই পারবেন। সেজন্যেই যে মেদিনীপুর থেকে এত দূর ছুটে এসেছি।

—তুমি...তুমি জ্যোতির্ময়দার ছেলে?

—না! আমার বাবার নাম শচীশ নন্দী। উনিশ শো ত্রিশে চট্টগ্রামে মারা যান তিনি...

* * *

—ডাক্তার চৌধুরী এ বিষয়ে কী বলেন?

নিজের নামটা কানে যাওয়ায় যেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠেন পরমানন্দ। হ্যাঁ, ডিরেকটর্স বোর্ডের মিটিঙে উপস্থিত আছেন তিনি। অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করেন। আলোচনাটা কীসের তা তিনি বিন্দুমাত্র জানেন না। একবর্ণও শোনেননি। হঠাৎ লক্ষ্য হয় ঘরসুদ্ধ সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

পরমানন্দ গম্ভীরভাবে বলেন : আপনারা পাঁচজনে যা স্থির করবেন তাই মেনে নেব আমি।

—আমরা তো একমত হয়েছি—ভয় আপনাকেই, আপনার তো আবার নানান আদর্শের বাতিক আছে।

ম্লান হাসেন চৌধুরী সাহেব।

—দ্যাট্স্ সেট্ল্ড দেন। কাম্ টু দ্য নেক্সট আইটেম অভ দি অ্যাজেন্ডা প্লীজ।

আবার শুরু হয়ে গেল আলোচনা। ধর্মঘটী মজুরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্ধারণ করতে থাকেন ওঁরা।

পরমানন্দ যথারীতি ডুবে যান অতীত চিন্তায়।

* * *

নিপুণ হস্তে অস্ত্রোপচার করেছিলেন সেদিন ডাক্তার চৌধুরী। সে কথা জানতে পেরেছিল বাড়ির তিনটি প্রাণী। পরমানন্দ গোপন করতে চেয়েছিলেন সকলের কাছ থেকেই। চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু কিশোরী আনাড়ি নীলার সহায়তায় অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। বৈশাখীকে ডাকতে হয়েছিল ফলে। আর মিস গ্রেহামকে লুকিয়ে এ বাড়িতে কোনো কিছু করা সম্ভব ছিল না। ভালো করে সকাল হবার আগেই নিয়ে এসেছিলেন হতচেতন ছেলেটিকে ভিতর বাড়িতে। নার্সিং হোমে ওকে রাখা নিরাপদ নয়। বাড়ির ভিতরেও ওকে লুকিয়ে রাখা কঠিন। পরমানন্দ ওকে আশ্রয় দিলেন বৈশাখীর ঘরে। পশ্চিম দিকের ঘরখানা ছেড়ে বৈশাখী এসে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিল নীলার শয়নকক্ষে।

নীলা অবাক হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ছেলেটি যে টেররিস্ট, আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী, এটুকু সে আন্দাজ করেছিল অনায়াসে। তা ছাড়া পরমানন্দ সে কথা তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—সাবধান করে দিয়েছিলেন ওকে সংবাদটা গোপন রাখতে। মিস গ্রেহাম সমস্ত বুঝেও নীরব রইলেন। বৈশাখীকে ডেকে পরমানন্দ বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটার গুরুত্ব ও গোপনীয়তা।

কদিন ছিল ছেলেটি? দিন তিন-চার হবে বোধ হয়। ঠিক মনে নেই আজ। শুধু এইটুকু মনে আছে—অপারেশনের পরে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। সমস্ত জীবনীশক্তিটুকু সে নিঃশেষ করে এসেছিল আহত অঙ্গটাকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে পৌঁছনোর পথে। পরদিনই প্রতিশ্রুতিমতো সে চলে যেতে চেয়েছিল। অনুমতি দিতে পারেননি চৌধুরী ডাক্তার।

—কিন্তু কথা ছিল আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে না ফিরলে ওরা ধরে নেবে আমি মারা গেছি অথবা ধরা পড়েছি।

—তুমি ঠিকানা বলো—আমি খবর দিয়ে আসছি।

—আপনি নিজে যাবেন সেখানে?

—কেন, বিশ্বাস করতে পারছ না আমায়?

ছেলেটি হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল—আমার কটু কথাগুলো আপনি ভুলতে পারেননি দেখছি।

ওর সেবার ভার পড়েছিল নীলার ওপর। বৈশাখীকে নার্সিং হোমে তার দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে নীলাকেই নিতে হল সে দায়িত্ব। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে সে পথ্য আর ওষুধ পরিবেশন করে। টেম্পারেচার রাখে। নিরলস অতন্দ্র সেবায় সে পরিচর্যা করে চলে আগন্তুকের। ওদের অন্তরালের জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছিল জানা সম্ভব নয় পরমানন্দের পক্ষে। তবে একটা জিনিস তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। নির্জন কক্ষের গোপনীয়তায় ওই কিশোরী নার্স আর তার রোগী পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। পরমানন্দ একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। এত অল্প সময়ে এত সামান্য পরিচয়ে কী করে এত আকৃষ্ট হল নীলা ওই ছেলেটির দিকে? হয়তো বীরপূজার একটা সেন্টিমেন্টই ওর মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হবার মতো একটা ক্ষেত্র পূর্বেই তৈরি করে রেখেছিল। বিপ্লবাত্মক মতবাদের প্রতি নীলার যে একটা অন্ধ আকর্ষণ জন্মেছিল তা ঠিকমতো বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি চৌধুরীবাড়ির শৃঙ্খলায়িত বাতাবরণে। ওর দাদা, ওর বাবা, ওর দিদিমা ওকে বেঁধে রেখেছিল এতদিন। হঠাৎ ওর মনের নিরুদ্ধ কামনা মূর্তি পেল এবার। ওই বাইশ বছরের তারুণ্যের মধ্যেই সে দেখতে পেল বিপ্লবের একটা মূর্ত প্রতীক। এত কথা হয়তো তাঁর খেয়াল হত না—হল বৈশাখীর কথায়।

অপারেশনের পর তৃতীয় দিনে বৈশাখী এসে বললে—কাকাবাবু, এবার ওঁকে পাঠিয়ে দিন।

কথাটার মর্ম প্রথমটা অনুধাবন করতে পারেননি। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কার কথা বলছ তুমি?

—অরুণাভবাবুর কথা।

—অরুণাভ? কে সে?

—ওই যে ছেলেটি আমার ঘরে আছেন আজ কদিন।

—ও! ওর নাম বুঝি অরুণাভ? তা কেন, হঠাৎ ওকে সরিয়ে দিতে বলছ কেন? অসীম কি ফিরে এসেছে বাড়িতে?

—না, তিনি ফেরেননি।

—অসীম কোথায় গিয়েছে জানো? হপ্তাখানেক হয়ে গেল আজ নিয়ে।

—না, এক সপ্তাহ নয়, পাঁচ দিন, ছয় রাত্রি—কোথায় গিয়েছেন জানি না।

পরমানন্দ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পুত্রের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। এতদিন ধারণা ছিল, সেজন্য তাঁর উদ্বেগই এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশি—তিনি বাপ। হঠাৎ অনুভব

করলেন—না, তাঁর চেয়েও অধীরতর উৎকণ্ঠায় আর একজন অপেক্ষা করছে অসীমের প্রত্যাবর্তন। তিনি দিনসাতেক পুত্রকে না দেখে বিচলিত হয়েছেন—কিন্তু বৈশাখী প্রতীক্ষা করছে পাঁচ দিন ছয় রাত্রি।

—ওঁর হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না—শেষকালে নীলার না সর্বনাশ করে যান।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল পরমানন্দের। কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। বিপ্লবপন্থীদের মর্মকথা তাঁর অজানা নয়। ও পথের অভিজ্ঞতা তাঁরও আছে। এই পথে যারা পা বাড়ায় তারা কখনও কোনো ছোট কাজ করে না। শচীশ নন্দীর ছেলে আর যাই করুক এত বড় উপকারের প্রতিদানে সে নীলার কোনো ক্ষতি করে যেতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের ওপর এটুকু সংযম যার নেই সে কখনও এভাবে দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে? কিন্তু নীলা যে দিবারাত্রির সমস্তটা সময় ওর শয্যাপার্শ্বে লীন হয়ে আছে এটাও লক্ষ করেছেন তিনি। তা ছাড়া তিনি প্রতিদিন লক্ষ করেছেন—যখন রোগীকে পরীক্ষা করতে যান, ড্রেসিং করে দেন ক্ষতস্থানটা, তখন কী অসীম আগ্রহে নীলা জানতে চায় রোগীর উন্নতির কথা। সেটাকে নারীর কোমল স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বলেই মনে করেছিলেন এতদিন—তার বেশি কিছু নয়।

পরমানন্দ জবাবে বলেছিলেন : কিন্তু ওকে এখন পাঠাতে পারি না আমি। আর কিছুদিন না গেলে ও উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

—তাহলে নীলাকে সরিয়ে ওঁর সেবার ভার আমার ওপরে দিন। নার্সিং হোম থেকে কদিন ছুটি দিন আমাকে।

আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল পরমানন্দের। বাড়িতে দুটি রমণী, একটি বহিরাগত তরুণ যুবক। বিদেহী দেবতা কি এই সুযোগে একটা ত্রিভুজ রচনা করে বসলেন চৌধুরীবাড়ির অন্তঃপুরে? তখনও পরমানন্দ জানতেন না বৈশাখীর সঙ্গে অসীমের সম্পর্কটা। সেটা জেনেছিলেন অনেক পরে। সেটা প্রথম নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যেদিন ঝড়ের পরে বর্ষণক্লান্ত দুর্যোগরজনীতে নেমে এসেছিল প্রচণ্ড বজ্র তাঁর উদ্ধত শিরে।

উনি ব্যবস্থাটা অগত্যা পালটে দিলেন। নীলাকে বোঝানো হল রোগীকে অভিজ্ঞ নার্সের হাতে রাখাই বাঞ্ছনীয়। নার্সিং হোম থেকে দিনতিনেকের ছুটি মঞ্জুর হল বৈশাখীর। সে আশ্রয় নিল তার নিজের শয়নকক্ষে—রোগীর পাশে।

পরের দিন আরও ঘোরালো হয়ে উঠল পরিস্থিতিটা। অসীম ফিরে এল পরের দিন। দিনসাতেক পরে বাড়ি ফিরছে সে। জলে কাদায় মলিন দেহ, অস্নাত রুক্ষ চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে লঘুপায়ে সে এসে হাজির হল বৈশাখীর ঘরে। রক্ষীবাহিনীর কাজেই তাকে বাইরে যেতে হয়েছিল হঠাৎ। যাবার সময় বাড়িতে কোনো খবর দিয়ে যেতে পারেনি তাড়াতাড়িতে। বাবা নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন—নীলা আছে উদ্বিগ্ন হয়ে—সেজন্য উৎকণ্ঠা নেই অসীমের। তার ভয় ছিল বৈশাখীকে। বিনা সংবাদে এ কদিন তার অজ্ঞাতবাসের জন্য নিশ্চয়ই মর্মান্তিক অভিমান করে আছে বৈশাখী। প্রথমেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। দুটো মিষ্টি কথায় তার অভিমানকে করতে হবে দ্রব। বৈশাখীর ঘরটা বাড়ির একান্তে পশ্চিম কোনার পিছন দিকে। পা টিপে টিপে সকলের অলক্ষিতে অসীম এসে দাঁড়ায় ওর দ্বারের পাশে। দ্বার খোলাই ছিল—ভেজানো। টোকা না দিয়েই বৈশাখীর ঘরে ঢুকবার অধিকার ছিল অসীমের—ওদের সম্পর্কের জোরে। ওকে চমকে দেবে বলেই হঠাৎ দ্বার খুলে ঘরে ঢোকে। তারপর তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় চৌকাঠের ওপরেই।

বৈশাখীর খাটে শুয়ে আছে একটি অপরিচিত যুবক। খাটের পাশেই বিছানায় বসে আছে বৈশাখী—যুবকটির মাথা দক্ষিণ বাহুতে আলিঙ্গন করে ধরে বাঁ হাতে ওর মুখের কাছে ধরে রেখেছে কী একটা পানীয়। আধশোওয়া লোকটা বৈশাখীর নরম বুকে মাথা হেলান দিয়ে তার হাতের গ্লাস থেকে পান করছে—পানীয়টা কী তা বোঝা গেল না। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে অসীম। ওরা দুজনেই মুখ তুলে তাকায়। বৈশাখীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ধরা পড়ার ছাপ সে মুখে স্পষ্ট। যেটুকু সন্দেহ ছিল অসীমের—তা নিরসন হল ভয়ে-সাদা-হয়ে-যাওয়া বৈশাখীর চোখের দৃষ্টিটায়! ছেলেটিও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে ওর আকস্মিক আবির্ভাবে।

—আয়াম সরি!

দ্বার ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে অসীম।

পরমুহূর্তেই বের হয়ে আসে বৈশাখী : কখন এলে?

অসীম প্রতিপ্রশ্ন করে—ভাগ্যবানটি কে?

বৈশাখী কৌতুক বোধ করে ওর প্রশ্নের ধরনে। অসীমের ঈর্ষাবহ্নিতে নূতন সমিধ সরবরাহ করে : আমার একজন ফ্রেন্ড!

—ফ্রেন্ড! তোমার ফ্রেন্ড! মানে?

—ফ্রেন্ড শব্দের অর্থ জানো না? তাই তো—মানে, তোমাদের অভিধান অনুযায়ী যাকে বলে কমরেড!

অসীম জ্বলে উঠেছিল একথায়। বলে—রসিকতা রাখো। কিন্তু এ-সব বৃন্দাবনলীলা বাড়ির বাইরে হওয়াই ভালো নয় কি? এ বাড়ির একটা স্যাংটিটি আছে। নিজের বিছানায় বয়ফ্রেন্ডকে ডেকে আনার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এজন্যে হোটেলে তো সস্তায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। নীলার চোখের সামনে এ বাড়তি রোজগারটুকু না করলেই নয়!

—বাড়তি রোজগার?—বৈশাখীর অস্ফুট কণ্ঠে ফুটে ওঠে ওর অবমানিত আত্মার আর্তি।

—না তো কী! নার্সদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম—কিন্তু তুমিও যে কোনো অনাত্মীয় যুবকের মাথা অমনভাবে বুকের ওপর টেনে নিয়ে ঢলামি করতে পারো—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বৈশাখী ভুলে যায়—মুহূর্তপূর্বে সে নিজেই অসীমের ঈর্ষাবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল মজা করার জন্য। কঠিন স্বরে সে বলে—ও, তাই বুঝি! এ বাড়িতে অনাত্মীয় কুমারী মেয়ের মাথা বুকে টেনে নিয়ে বৃন্দাবনলীলা করার অধিকার যে একমাত্র অসীমবাবুরই আছে তা জানা ছিল না আমার।

অসীম একলহমা স্থির থেকে ধীরকণ্ঠে বলে : আমার ধারণা ছিল সে অধিকার তুমি আমাকে দিয়েছিলে—ভালোবেসেই—তখন তোমার বয়ফ্রেন্ডদের কথা জানতাম না আমি। ভুলটা ভেঙে গিয়েছে আমার—আমার পূর্ব আচরণের জন্য তাই মাপ চাইছি!

অসীম যাবার জন্য পা বাড়ায়। হাতটা চেপে ধরে তার বৈশাখী।

—কী পাগলামি করছ! দেখছ না ও পেশেন্ট—উঠে বসতে পারে না, তাই ওইভাবে খাইয়ে দিচ্ছিলাম ওকে।

—পেশেন্ট! কেন, কী হয়েছে ওর?

—ওর পায়ে একটা অপারেশন করা হয়েছে।

—তা এ ঘরে কেন? নার্সিং হোমে কি বেড নেই?

—ওকে এ ঘরে এনে রেখেছেন কাকাবাবু।

—কেন?

—তা কী করে জানব—তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।

অসীম একমুহূর্ত কী ভাবে। তারপর বলে : কী হয়েছিল ওর পায়ে?

—ডাকাতের গুলি লেগেছিল!

—সত্যি বলছ? আমি কিন্তু বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছিল বৈশাখী জানলার ধারে, বলে—ওই দেখো পায়ের ব্যান্ডেজ।

লোকটা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। অসীম চমকে ওঠে ওকে দেখে। এতক্ষণে ভালো করে লক্ষ করে সে বৈশাখীর পেশেন্টকে। এ তার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে, কোথায় দেখেছে? তারপরের মুহূর্তেই মনে পড়ে গিয়েছিল—এই মুখের ফোটো দেখেছে সে। চিনতে পারে লোকটাকে। বৈশাখীর হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে এসে হাজির হয় পরমানন্দের সামনে।

পিতা-পুত্রের সে সাক্ষাৎটাও নাটকীয়।

—বৈশাখীর ঘরে যে ছেলেটি আছে ও কে?

চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে পরমানন্দ প্রতিপ্রশ্ন করেন—এ কদিন কোথায় ছিলে?

—রক্ষীবাহিনীর কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। কতকগুলো হুলিগান এসেছে এই এলাকায়। রেল-লাইনের ফিশ-প্লেট তুলে ফেলছে, টেলিগ্রাফের তার উপড়ে ফেলছে—তাই আমাদের ডিউটি পড়েছিল পাহারা দেওয়ার...কিন্তু আমার কথাটা আপনি শুনতে পাননি।

—শুনেছি, ও ঘরে আছে একটি পেশেন্ট—ওর পায়ে একটা অপারেশন করেছি আমি।

—কিন্তু ও তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। ডাকাতের গুলি নয়—মহিষাদল থানা লুট কেসে ওই ছেলেটির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

—ডাকাতের গুলি লেগেছে—এ কথা কে বলেছে তোমাকে?

—বৈশাখী।

পরমানন্দ একবার ইতস্তত করেন। অদূরে বসে নীলা একটা উলের সোয়েটার বুনছিল। ঘর পড়ে যায় তার কয়েকটা কাঁটা থেকে। মিস গ্রেহাম উলের গুলি পাকিয়ে দিচ্ছিলেন ফেটি খুলে। জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায় বাণ্ডিলটা।

পরমানন্দ দ্বিধাসংকোচ ঝেড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত বলেন—বৈশাখী ভুল বলেছে। ডাকাতের গুলি লাগেনি ওর।

—তুমি তাহলে সব জানো?

—জানি!

—জানো? তবু আশ্রয় দিয়েছ ওকে?

ধীরকণ্ঠে পরমানন্দ বলেন—তোমার রাজনীতিতে আমি কোনোদিন হস্তক্ষেপ করিনি। আমার চিকিৎসা ব্যাপারেও আমি আশা করব তুমি হস্তক্ষেপ করতে আসবে না।

অসীম বলে : এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। সেদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি কেন তুমি নীলাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে কাগজগুলো। তোমাকে উপদেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু তুমি কি জানো, যে ছেলেটিকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ সে একজন কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারীকে খুন করে এসেছে? সে খুনি আসামি?

—খোকা!—থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পুত্রকে। বলেছিলেন, আমার বিচার তুমি করতে বোসো না, আমার রাজনীতি তুমি বুঝবে না।

অসীম উত্তেজিত হয়ে বলেছিল : আজ তোমাদের গান্ধীজী জেলের বাইরে থাকলে এইসব নৃশংস কাজের প্রথম প্রতিবাদ তিনিই করতেন। এদিকে জাপান ডিমাপুরে এসে পড়েছে—ফ্যাসিস্ট-বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের জনশক্তি আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—আর তোমরা শুধু অন্তর্ঘাতী সংগ্রামে সে জনযুদ্ধকে সাবোটাজ করছ।

মিস গ্রেহাম শুধু বলেছিলেন— প্লীজ অসীম...

অসীম কর্ণপাতও করেনি, সমান তালে বলে চলে : কতকগুলো ফন্দিবাজ এজেন্ট-প্রভোকেটর মিথ্যা গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছে আর তোমরা অন্ধের মতো...

—শাট আপ!—গর্জন করে উঠেছিলেন আগ্নেয়গিরির মতো পরমানন্দ : তোমার যা কর্তব্য মনে হয় তা করতে পার। কিন্তু এই অন্ধ বৃদ্ধের চোখ ফোটাবার চেষ্টা কোরো না। যাও—

—আমার এক্ষেত্রে যা কর্তব্য তা করলে তার কী পরিণাম হবে জানো? সহ্য করতে পারবে তা?

অপরিসীম ধৈর্যে দ্বারের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে শুধু বলেছিলেন—যাও!

মুহূর্তখানেক অসীম দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল হয়ে তা সত্ত্বেও। তারপর বললে—বেশ যাচ্ছি! যা কর্তব্য মনে করছি তাই করব আমি।

চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় অসীম।

পরমানন্দ আবার বলেন—দাঁড়াও! যা করতে চাও তার ফলাফল ভেবে নিয়ে কোরো। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না। এর পরিণাম সহ্য করবার শক্তি তোমার আছে কিনা ভেবে দেখো একবার।

'তোমার' কথাটার ওপর ঝোঁক পড়ে তাঁর।

মাথা খাড়া রেখেই চলে যায় অসীম।

মিস গ্রেহাম ওকে ফিরে ডাকেন। কর্ণপাত করে না সে।

নীল হয়ে বসে থাকে নীলা।

*　　　　*　　　　*

হনহন করে স্বল্পালোকিত করিডোরটা দিয়ে অসীম চলেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে জামায় টান পড়ে ওর। অসীম দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কোথায় চলেছ?

অসীম আপাদমস্তক একবার দেখে নিল বৈশাখীকে। ছোপ-ছোপ জংলা রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। এলো করে বাঁধা ঢলকা খোঁপা ভেঙে পড়েছে কাঁধের ওপর। সেই ভাঙা খোঁপাতেই গোঁজা আছে একটা আধফোটা রক্তগোলাপ। একটু আগে বৈশাখীর শয়নকক্ষে রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাখা ফুলদানিটাতে যে রক্তগোলাপের গুচ্ছ দেখে এসেছিল—তারই একটা।

—কোথায় চলেছ? আবার প্রশ্ন করে বৈশাখী।

—আয়াঙ্গারের বাংলোয়।

—আয়াঙ্গার কে?

—এস. ডি. ও.।

বৈশাখীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বলে—কী পাগলামি করছ তুমি! জানো এর কী পরিণাম হতে পারে?

অসীম ভ্রূ কুঁচকে প্রতিপ্রশ্ন করে—কীসের কী পরিণাম হবে?

—তুমি যদি ওর কথা বলে আসো গিয়ে তাহলে কাকাবাবুর অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ?

—কেন? ডাকাতের-গুলি-লাগা পেশেন্টের চিকিৎসা করায় তো কোনো অপরাধ হয় না।

—ছেলেমানুষি কোরো না অসীম। ছেলেটির পরিচয় তুমি জানো!

—জানি নাকি? তাহলে ডাকাতের কথা মিথ্যা করে বলেও তোমার বয়ফ্রেন্ডের পরিচয়টা গোপন রাখতে পারনি তুমি?

বৈশাখী উত্তরে বলে, -না, মিথ্যা কথা আমি বলিনি। তুমিই বুঝতে পারনি। ইংরাজ শাসককে এ বাড়ির একটি প্রাণী ছাড়া সকলেই ডাকাত বলে মনে করে।

অসীম বলে—রাজনীতির তর্ক তোমার সঙ্গে আমি করব না বৈশাখী। ইংরাজ শাসকদের মিত্র বলে আমিও মনে করি না—কিন্তু এ কথাও আমি ভুলতে পারি না যে প্রভু হিসাবে ইংরাজদের চেয়ে জাপানীরা বেশি মনোরম হবে না। কিন্তু যাক ও কথা—ছাড়ো আমাকে, যেতে দাও।

অসীমের পাঞ্জাবির একটা প্রান্ত তখনও ধরা ছিল বৈশাখীর মুঠিতে। সে বুঝতে পারে অসীমকে ছেড়ে দিলে সে একটা সর্বনাশ করে বসবে এখন। বৈশাখীর ওপরেই তার রাগটা হয়েছে সবচেয়ে বেশি,—না হলে কখনও 'বৈশাখী' বলে সম্বোধন করত না তাকে, ডাকত 'সাকী' বলে।

বৈশাখী বলে—এ বাড়ির মধ্যে যদি ও ধরা পড়ে তাহলে আমরা সকলেই ধরা পড়ব—এটা ভেবে দেখেছ?

—ধরা তো তুমি পড়ে গিয়েছ বৈশাখী। নতুন করে আর কী ধরা পড়বে তুমি?

—আমার কথা হচ্ছে না, কিন্তু তুমি কি অন্তত কাকাবাবুর কথাটা ভেবে দেখেছ?

—বাবার কোনো বিপদ নেই এতে—তিনি আমাকে যে কথা বোঝাতে চেয়েছেন সেই কথায় বলবেন। তিনি ওকে চিনতে পারেননি। ভেবেছিলেন সত্যিই বুঝি ডাকাতের গুলি লেগেছে ওর পায়ে। তারপর যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছেন ছেলেটি পলাতক রাজদ্রোহী সেই মুহূর্তেই তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এস. ডি. ও.-র কাছে। এতে তাঁর বিপদটা কোথায় তা তো বুঝছি না আমি।

বৈশাখী ওর হাত দুটি ধরে মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে—তোমার পায়ে পড়ি অসীম, এ কাজ তুমি কোরো না।

ভুরু কুঁচকে ওঠে অসীমের—ব্যঙ্গের এক চিলতে একটা হাসিও খেলে যায় ওর ওষ্ঠে, বলে—কিন্তু কেন বলো তো? এত কাতরভাবে প্রার্থনা করার আসল কারণটা কী?

—আমার ভয় করছে! আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই নিয়ে। কাকাবাবু ভীষণ আহত হবেন।

—হওয়াই উচিত। তিনি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। সেটাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু কর্তব্য কর্ম করার অধিকার তো তাঁর একলার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। আমাকেও করতে হবে—যা আমি করণীয় মনে করছি। তুমি আমাদের বাড়ির আবহাওয়ার কথা জানো না। আমার আইডিওলজি আমি অনুসরণ করলে বাবা কখনোই কিছু মনে করবেন না।

—তবু আমি তোমাকে মিনতি করছি অসীম...তা ছাড়াও মানে,...ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না তোমাকে আমার মনের আশঙ্কা...আমি মিনতি করছি অসীম...প্লীজ!

অসীম আর হাস্য সংবরণ করতে পারে না, বলে—নবাবপুত্রী! এ উত্তম!

—কী উত্তম অসীম?

—নিশীথে একাকিনী বন্দিসহবাস নবাবপুত্রীর পক্ষে উত্তম!

—এ সব কথার মানে?

—মানে আয়েষা বেগমের এ অনুরোধ রক্ষা করা আপাতত ওসমানের পক্ষে অসম্ভব।

ওর হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অসীম।

বৈশাখীর সঙ্গে অসীমের এ সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ করেননি পরমানন্দ। এ শুধু তাঁর অনুমান। এবং সেইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ। তিনি যদি জানতে পারতেন যে অসীম আদর্শপ্রণোদিত হয়ে সংবাদ দিতে গিয়েছিল এস. ডি.ও.-র বাংলোতে তাহলে বোধকরি তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারতেন। ক্ষমা না করলেও অন্তত এটুকু সান্ত্বনা তাঁর থাকত যে দুর্ঘটনাটা শুধুমাত্র পিতা-পুত্রের আদর্শগত বিরোধজনিত। কিন্তু আসলে কি তাই? অসীম কি খবর দিতে ছুটেছিল এস. ডি. ও.-কে ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে? শুধু ক্ষণিক উন্মাদনায় কি এ কাজটা করে বসে ও? অবশ্য এ কথা নিশ্চিত যে তার ফলাফলটা যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে এ ছিল ওই নাবালক রাজনীতিকের দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। বোকা ছেলে! সে তার বাপকে চিনতে পারেনি।

* * *

—একটা সই লাগবে ডাক্তারসাহেব।

টাইপকরা একখণ্ড কাগজ কে যেন বাড়িয়ে ধরে ওঁর সামনে। কীসের কাগজ ওটা? কে জানে। পরমানন্দ শুধু এইটুকুই দেখলেন একসার সই রয়েছে তাতে। অন্যান্য সব ডাইরেক্টরের দস্তখত করা আছে। না পড়েই একটা সই করে দিলেন পরমানন্দ। কাগজখানা চলে গেল পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের হাতে।

তন্ময়তা ভাঙেনি পরমানন্দের। তিনি ভাবছিলেন সেদিন সন্ধ্যার কথা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ডাক্তার চৌধুরী নিজেই ড্রাইভ করে ফিরছিলেন বাংলোয়। কাঁকরবিছানো লাল পথ দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে। ডাক্তার চৌধুরী গাড়ি থেকে নামলেন। একা। নেমেই দেখেন সন্ধ্যার অনালোকে বাইরে কয়েকখানি চেয়ার পাতা। বসে আছেন আধা-অন্ধকারে কয়েকজন ভদ্রলোক। অনুমান তাহলে তাঁর ঠিকই হয়েছিল। অসীম আছে, আছে নীলাও, এবং মিস গ্রেহাম। সেদিকে অগ্রসর হতেই এস. ডি. ও. মিস্টার আয়াঙ্গার বলেন—গুড ইভনিং ডক্টর চৌধুরী।

প্রত্যভিবাদন করে চৌধুরী-সাহেব এসে বসেন একটা বেতের চেয়ারে। মিস গ্রেহাম কয়েক গ্লাস পানীয় প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। নির্বিকার মূর্তি তাঁর। নীলা বসে আছে একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ হাতে! চাঁদ উঠেছে শুক্লা সপ্তমী কি অষ্টমীর। তারই ম্লান আলোয় রক্তশূন্য দেখাল নীলার মুখ। চোখাচোখি হতেই মনে হল কী একটা কথা বলবার জন্য সে যেন ছটফট করছে। চৌধুরী আন্দাজ করেন কথাটা কী। আয়াঙ্গার সাহেবকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন তিনি—অসীম কী কাণ্ডটা করে বসে আছে। অসীম বসে আছে সামনের চেয়ারটায়—মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি।

—কতদূর ঘুরে এলেন?

—এই তো।—অস্পষ্ট জবাব দিলেন উনি সৌজন্যরক্ষার্থে। মিস গ্রেহাম প্রশ্ন করেন—তাঁকেও একটা পানীয় দেওয়া হবে কিনা। ডাক্তার চৌধুরী সম্মতি জানান।

আয়াঙ্গার-সাহেব আর কালবিলম্ব না করে সোজা নেমে আসেন আসল বক্তব্যে—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর চৌধুরী। উপযুক্ত সময়েই আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন অসীমবাবুকে দিয়ে। সমস্ত বাড়িটাই আমরা ঘিরে রেখেছি। অপারেশন করে আপনি ভালোই করেছেন—আর তা ছাড়া ওর পরিচয় তো শুনলাম আপনি প্রথমে বুঝতেই পারেননি। সুতরাং আপনার কোনো আশঙ্কা নেই। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। কোথায় আছে আপনার পেশেন্ট?

পরমানন্দ একটু ইতস্তত করে বলেন—নীলা, আমার চুরুটের প্যাকেটটা প্লীজ।

মিস গ্রেহাম উঠে পড়েন—আমি দেখছি।

—প্লীজ লেট হার সেন্ড ইট।

নীলা ধীরপদে উঠে যায়। ইঙ্গিতটা সে বুঝতে পেরেছে। চুরুটের প্যাকেটটা তাকে আনতে বলা হয়নি—পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। নন্দ চুরুটের বাক্সটা এনে নামিয়ে রাখে টেবিলে। তার থেকে একটা বার করে নিপুণভাবে ধরান ডাক্তার-সাহেব। বাক্সটা এগিয়ে দেন আয়াঙ্গারের দিকে। তিনিও ধরান একটা।

—কোন পেশেন্টের কথা বলছেন আপনি?

—যার খবর দিয়ে আপনি আপনার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে।

—আই থিঙ্ক য়ু আর মিস্টেক্‌ন্। আমি তো কোনো খবর পাঠাইনি। অসীম, এ-সব কী শুনছি?

অসীম চমকে ওঠে। কী বলবে তা বুঝতে পারে না। পরমানন্দ যে এটাকে বেমালুম অস্বীকার করে বসতে পারেন এটা তার স্বপ্নেরও অগোচর। সে ভেবেছিল আয়াঙ্গার-সাহেব যখন হাতেনাতে আসামিকে ধরে ফেলবেন—তখন পরমানন্দের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ থাকবে না। তাঁর গায়ে কোনো আঁচড় লাগার কথা নয়। তিনিই ছেলেকে পাঠিয়েছেন আয়াঙ্গার-সাহেবের কাছে, গোপনে সংবাদ দিয়ে। তিনি বিপ্লবীটিকে আশ্রয় দেননি—আটকে রেখেছেন শুধু পুলিশ আসা পর্যন্ত। সুতরাং পরমানন্দের এতে বিপদ নেই বিন্দুমাত্র, বরং সরকার থেকে পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু কার্যকালে ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম। সদলবলে আয়াঙ্গার-সাহেব এসে ঘিরে ফেললেন বাড়িটা। চৌধুরী-সাহেবকে পাওয়া গেল না বাড়িতে। গাড়ি নিয়ে একাই কোথায় রোগী দেখতে গিয়েছেন তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতেই বাড়ি সার্চ করা হয়ে গিয়েছে। ছেলেটিকে পাওয়া যায়নি। নেই, কোথাও নেই—সেই ছেলেটা।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আয়াঙ্গার বলেন—ডক্টর চৌধুরী! আগুন নিয়ে খেলা করবেন না আপনি। অরুণাভ নন্দী এ বাড়িতে এসেছিল—চার-পাঁচ দিন এখানে ছিল—তার সন্দেহাতীত প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অসীমবাবু সব কথা স্বীকার করেছেন আমার কাছে। আর আপনার বাড়ি সার্চ করেই পাওয়া গেছে এই অকাট্য প্রমাণ।

এক বান্ডিল কাগজ তিনি বার করে রাখেন সামনের টেবিলে। নিষিদ্ধ প্রচারপত্রের একতাড়া কাগজ। আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস থেকে ছাপা। নীলার বিছানার তলা থেকে যে কাগজগুলো একদিন উদ্ধার করেছিল অসীম।

—আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে এগুলি আপনার পুত্র অথবা কন্যার সম্পত্তি। সুতরাং অরুণাভ নন্দী আপনার বাড়িতে এসেছিল এটা আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

কী জবাব দেবেন বুঝতে পারেন না চৌধুরীসাহেব।

এস. ডি. ও. আয়াঙ্গার কণ্ঠস্বর নীচু করে বলেন—ডক্টর চৌধুরী, আমি জানি ছেলেটিকে আপনি বাঁচাতে চাইছেন। হঠাৎ অসীমবাবুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে এখন আবার কেন তাকে বাঁচাতে চাইছেন তা অবশ্য জানি না। কিন্তু এখন আর উপায় নেই ডাক্তারসাহেব।

পরমানন্দ তখনও নীরব থাকেন।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনিই অসীমবাবুকে পাঠিয়েছিলেন কিনা। সম্ভবত আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই খবর দিতে গিয়েছিলেন অসীমবাবু; তাই নয়?

অসীম তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে—না না, আমাকে উনিই পাঠিয়েছিলেন।

আয়াঙ্গার মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন—সম্ভবত কথাটা সত্য নয়—তবু আমি তাই ধরে নিতে রাজি আছি। কারণ আমি চাই না ডক্টর চৌধুরী এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিব্রত হন। নাও প্লীজ—কোথায় আপনার পেশেন্ট?

এতক্ষণে মনস্থির করেছেন পরমানন্দ। বলেন,—বলছি, বসুন, আমি আসছি এখনি।—উঠে পড়েন চৌধুরীসাহেব।

—এক্সকিউজ মী! আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না আপনি।

—অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট দেন?

আয়াঙ্গার আর একবার নিম্নকণ্ঠে উচ্চারণ করেন তাঁর শেষ সাবধানবাণী—অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনাকে অ্যারেস্ট করা। আমি তা করিনি। কারণ আমি ভুলতে পারছি না সেই রাত্রিটির কথা—যে রাত্রে আমার বেবি টাইফয়েড-ক্রাইসিস পার হয়েছিল। আপনি সারারাত্রি ছিলেন আমার বাসায়। তবু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে ডক্টর চৌধুরী। আমি আপনাকে শেষবার প্রশ্ন করছি—গাড়ি করে কোথায় পৌঁছে দিয়ে এলেন আপনার পেশেন্টকে?

—এর জবাব না পেলে আমাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?

—অ্যান্ড উইথ নো রিগ্রেট। কারণ আত্মরক্ষার পূর্ণ সুযোগ আপনাকে বারে বারে দেওয়া হয়েছে।

—ওয়েল, দেন ডু অ্যারেস্ট মী। আপনাকে প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

চীৎকার করে ওঠে অসীম—বাবা!

—ইট্‌স্ টু লেট খোকা! ভুলে যেও না—আমাদের কৃতকর্মের ফলাফল সহ্য করবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নীলা রইল, তোমার গ্র্যানী রইল!

আয়াঙ্গার-সাহেবের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে পরমানন্দ বলেছিলেন—আমি প্রস্তুত বন্ধু!

*　　*　　*

ননীমাধব বলেন—চলো, এবার ওঠা যাক। ওঃ! সাড়ে দশটা বাজে! চলো, চলো।

যন্ত্রচালিতের মতো ননীমাধবের সঙ্গে আবার এসে বসলেন মোটরে। এতক্ষণে আবার বর্তমানে ফিরে এসেছেন তিনি। মনে পড়ে যায়—ধর্মঘটের জন্য জরুরি মিটিঙে এসে বসেছিলেন তিনি। মনে পড়ে যায় নীলা চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু এ কী হচ্ছে? এতবড় জরুরি মিটিঙে উপস্থিত থাকলেন পুরো দুটি ঘন্টা অথচ তিনি কিছুই জানেন না। কী সিদ্ধান্ত হল ডাইরেকটরদের সমাবেশে? লকআউট চলতে থাকবে? একবার মনে হল ননীমাধবকে প্রশ্নটা করেন। তারপর নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হল। নাঃ, এ রকম মানসিক অবস্থায় ছোটাছুটি করে বেড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। আগে তাঁকে স্থির হতে হবে। তারপর কাজ।

—এখান থেকে সোজা জিতেনদার ওখানে যাবে তো?

—না, আমি একবার গুরুদেবের আশ্রমে যাব।

—সে কী? সাড়ে দশটায় জিতেনদার বাসায় জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কিশলয় গাঙ্গুলিরও সেখানে আসবার কথা। এত বড় একটা সিরিয়স এনগেজমেন্ট!

সব কথা মনে পড়ে যায় পরমানন্দের। কিশলয়বাবু ভোটযুদ্ধের একজন যোদ্ধা। পরমানন্দের কনস্টিটুয়েন্সি থেকেই অবতীর্ণ হচ্ছেন বিপক্ষ শিবির থেকে—তাঁর পেছনে সম্মিলিত কয়েকটি দলের শক্তি। এই আসনে হয় তিনি অথবা কিশলয়বাবু নির্বাচিত হবেন। আরও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন, অধ্যাপক গিরীন্দ্র বসু। সকলে মনে করেছিল তিনিই নমিনেশন পাবেন পরমানন্দের বদলে। দীর্ঘদিন জেলে জেলে কেটেছে তাঁর। আকৈশোর দেশসেবায় যুক্ত আছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁর বদলে পরমানন্দকেই নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। গিরীন্দ্রবাবু অকৃতদার সন্ন্যাসী মানুষ। ভোটযুদ্ধে পাড়ি দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নেই। ফলে সকলেই মনে করে এ আসনের জন্য হবে একটা দ্বৈরথ সমর। ধুরন্ধর কয়েকজনের প্রচেষ্টায় কিশলয়বাবুর নাম প্রত্যাহারের একটা সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। কথা আছে জিতেনবাবুর মধ্যস্থতায় আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে কয়েকটি শর্তে

কিশলয়বাবু সরে দাঁড়াতে রাজি আছেন। জিতেন বাঁড়ুজ্জে কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত নন। স্থানীয় বারের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ক্রিমিনাল সাইডের সবচেয়ে নামকরা আইনজীবী। ভোটপ্রার্থীদের যদিও ঠিক ক্রিমিনাল পর্যায়ভুক্ত করার কোনো নজির নেই—তবু ওই জিতেন বাঁড়ুজ্জের মাধ্যমেই একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করছেন দুপক্ষ। এ কথাও আছে যে, জিতেনবাবুর বাসায় যদি দুপক্ষ একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তখন সকলে আসবেন তারিণীদার কাছে। ওঁরা সকলেই জানেন যে তারিণীদা ভোটযুদ্ধে যদিও নিজে নামেননি তবু তিনিই সুইচ-বোর্ড কন্ট্রোল করেন—সে পরিচয়ে পরমানন্দ ল্যাম্পপোস্ট মাত্র।

—তোমার গুরুদেবের কাছে যেতে চাইছ কেন?

—যদি ও তাঁর কাছে গিয়ে থাকে?

—কে? নীলা? পাগল হয়েছ! সে যাবে তোমার গুরুদেবের কাছে? তোমার গুরুদেবকে কত ভক্তি করে সে তা মনে নেই? সেবারকার কথা ভুলে গিয়েছ নাকি?

—কিন্তু তাহলে কোথায় গেল ও? ব্যারাকে খোঁজ নেব?

—সে-সব পরে হবে। এখন চলো তো জিতেনদার ওখানে—

স্টিমারের সঙ্গে বাঁধা গাধাবোটের মতোই ননীমাধবের সঙ্গে চললেন পরমানন্দ। জিতেন বাঁড়ুজ্জের বাসায় হবে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা। নাম প্রত্যাহারের শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে—সুতরাং প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। কিশলয়বাবু তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক, বাঘাডাঙা কলোনির সলিড ভোট তাঁর মূলধন। তা ছাড়াও আছে কয়েকটি বিরুদ্ধ পার্টির সম্মিলিত শক্তি। যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা তাঁরও অল্প নয়। অথচ তিনি সরে দাঁড়ালে পরমানন্দের জয়যাত্রার পথ নিরঙ্কুশ। ফলে কিশলয়বাবু আদৌ সরে দাঁড়াতে রাজি হবেন কিনা বলা শক্ত—হলেও তাঁর শর্তগুলি খুব সহজপাচ্য হবে না। কিন্তু সম্মত তাঁকে করাতেই হবে। পরমানন্দকে যেতেই হবে অ্যাসেমব্লিতে। না হলে দেশের কতটুকু সেবা তিনি করতে পারবেন এখান থেকে? যে আইনের বলে দেশ চালিত হবে সেই আইন যেখানে জন্ম নেবে, বিভিন্ন খাতে সরকার কত টাকা ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত করবেন তা যেখানে স্থির করা হবে, সেখানে যেতেই হবে তাঁকে। তাঁর দেশসেবাকে বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত করে দিতে হবে। আইনসভার মহাযজ্ঞে ঋত্বিক না হতে পারলে তাঁর দেশসেবার বাসনা তৃপ্ত হবে না। এতদিন পরে পার্টি তাঁকে নমিনেশন দিয়েছে—দুর্লভ এ সৌভাগ্য। এত বড় সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি না করতে পারেন তবে আর ভবিষ্যতে আশা নেই। পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন তিনি কিশলয়বাবুকে রাজি করাতে—উঠতেই হবে তাঁকে সাফল্যের শিখরচূড়ায়। ওখানেই যে যাত্রা শেষ হবে তাঁর তাই বা কে বলতে পারে? যেতে পারেন ক্যাবিনেটেও একদিন!

...আর হতভাগা মেয়েটা বলে কিনা তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট। তিনি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ছুটে চলেছেন একমুখো। দেশের কথাই তাঁর কাছে নাকি শেষ কথা নয়—নিজের কথাই তিনি শুধু ভাবেন। নিজের কী কথা? কোন স্বার্থ? অন্যায়ভাবে তিনি কি জীবনে একটি রজতখণ্ডও উপার্জন করেছেন? অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজ তিনি যুক্ত। অনেক ক্লাবের পেট্রন, কয়েকটির উপদেষ্টা, কিছুসংখ্যকের কোষাধ্যক্ষ। একটি পয়সাও কখনও এদিক-ওদিক হয়েছে তাঁর হাতে? তবে? স্বার্থ! কোন স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে তিনি অরুণাভ নন্দীর সন্ধান দিতে অস্বীকার করেছিলেন সেদিন? আয়াঙ্গারকে যদি সেদিন তিনি বলে দিতেন সেই সন্ধ্যায় কোন পথের কোন বাঁকে কাদের জিম্মায় নামিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সেই অসুস্থ মানুষটাকে তাহলে এত নির্যাতন সহ্য করতে হত না তাঁকে।

নির্যাতন! কী অপরিসীম যন্ত্রণাময় সে দিনগুলো!

দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক ছিলেন তিনি। রাজদ্রোহের অপরাধে তখন প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল না। নিরাপত্তার আইনেই আটক ছিলেন দীর্ঘদিন। অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল বৃদ্ধের ওপর—তবু একটি কথাও বার হয়নি তার মুখ দিয়ে। হ্যাঁ, অসীম ঠিকই বলেছে। অরুণাভ নন্দী নামে একটি ছেলে আশ্রয় নিয়েছিল তাঁর বাড়িতে। তাঁর পায়ে তিনি অপারেশনও করেছিলেন। সন্দেহ হওয়ায় ছেলেকে পাঠিয়ে এস. ডি. ও.-কে খবর দিয়েছিলেন। তারপর কী করে সে তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল তা তিনি জানেন না। এই তাঁর জবানবন্দি।

অসীম পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। ঘরে-বাইরে অপমানের চূড়ান্ত হল তার। সেই নাকি বাপকে ধরিয়ে দিয়েছে। তবু অসীমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই বিচার উঠল আদালতে। বোকা ছেলে! কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বের হয়ে পড়ল সাপ। সন্ধানী পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উদঘাটিত হল পরশুরাম চৌধুরীর জীবনবৃত্তান্ত। প্রমাণিত হল পরশুরাম আর পরমানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। যেটুকু আশা ছিল পরিত্রাণের নির্মূল হল তা। যারা ওর 'জাপানকে রুখতে হবে' চীৎকারে ছিল বিরক্ত তারা বললে অসীমই প্রকাশ করে দিয়েছে বাপের বিপ্লবী জীবনের গোপন ইতিহাস। কথাটা পরোক্ষভাবে সত্য। বিচারের প্রচেষ্টা না করলে হয়তো তাঁর যৌবনের ইতিহাস এমনভাবে জানাজানি হয়ে পড়ত না। চিহ্নিত হয়ে পড়লেন পরমানন্দ—বিপ্লবীর সহকারী বলে নয়—স্বয়ং রাষ্ট্রদ্রোহী বলে।

ধরা পড়েছিল অরুণাভও। সে কিন্তু তার জবানবন্দিতে অস্বীকার করেছিল পরমানন্দের পরিচয়। না, তার পায়ের ওপর পরমানন্দ অপারেশন করেননি। কে করেছিল? তা সে বলবে না।

অসীমের অবস্থাটা কল্পনা করা শক্ত নয়। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তখন অতীত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। লালকেল্লায় ঐতিহাসিক বিচার তখন চলছে আজাদ হিন্দ নেতাদের। জাপানকে রুখবার জন্য কয়েক বছর আগে যারা উঠে-পড়ে লেগেছিল—তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করা কষ্টকর বোধ করছে। অসীমের অবস্থা আরও করুণ। বাড়িতে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। নীলা তো নয়ই, মিস গ্রেহামও নয়। বৈশাখী পর্যন্ত ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নন্দ-বেহারাও ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। মামলার জন্য তদ্বির-তদারক সমস্ত করতেন ননীমাধব। বন্ধুর কর্তব্যে ত্রুটি হয়নি তাঁর। এমনকি এজন্য রাজরোষে পড়বার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিরত হননি বন্ধুকৃত্য থেকে। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল নীলা। মিস গ্রেহাম শয্যা গ্রহণ করলেন। এই শয্যাগ্রহণই তাঁর শেষ শয়ন। দেশে আর ফিরে যেতে পারেননি তিনি। দীপক আসত সকাল-সন্ধ্যায়। নীলার সঙ্গে পরামর্শ করত। মামলা-সংক্রান্ত কথাবার্তা হত। কখনও বসত মিস গ্রেহামের শয্যাপার্শ্বে। বৈশাখীকে ডেকে হয়তো দুটো পরামর্শ দিত। তারপর যাবার সময় বারান্দা থেকেই দেখে যেত অসীম বসে আছে নিজের ঘরে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে। কখনও কখনও সিঁড়ির মুখে মুখোমুখি দেখা হয়েছে দুজনের। দীপক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে নীরবে। দীপক অসীমের সহপাঠী ছিল একদিন!

যেদিন মামলার দিন পড়ত সেদিন দেখা যেত অসীমকে আদালতের কামরায়। কেউ তাকে ডেকে নিয়ে যেত না, কেউ তার সঙ্গে একসঙ্গে ফিরত না। ও নিজেই খবর রাখত মামলার দিন কবে পড়েছে। ঠিক সময়ে ম্লান মুখে এসে দাঁড়াত জনারণ্যের একান্তে। হয়তো কেউ চিনে ফেলত তাকে—ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে ওরা কী যেন বলাবলি করত। কী যে ওরা আলোচনা করে তা আন্দাজ করতে পারত অসীম—তাই চোখ তুলে তাকাত না কখনও। তবু না গিয়েও পারত না, ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেত সামনের একখানা বেঞ্চিতে ননীমাধব, দীপক আর নীলা বসে আছে উকিলবাবুর কাছে। দেখত চোখ তুলে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোকটাকে! একদৃষ্টে চেয়ে থাকত সেদিকে। তারপর কোর্ট বন্ধ হলে জনারণ্যে মিশে যেত—পাছে ওকে কেউ ডাকে একসঙ্গে বাড়ি যেতে। যদি চোখাচোখি হয়ে যায় নীলা অথবা ননীমাধবের সঙ্গে।

একদিন সাহসে ভর করে সে গিয়ে হাজির হয়েছিল ননীমাধবের বাসায়। ননীমাধব ওর মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অসীম কাঁদেনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল সে। নিজের ঘরে বসে থাকত দিনরাত। কদাচিৎ বার হত ঘর থেকে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সঙ্গোপনে উদ্‌যাপিত হত তার স্বেচ্ছাবন্দি জীবনের দিনগুলি। নন্দ তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেত চা, খাবার, ভাতের থালা। একসঙ্গে ডিনার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহুদিন। খাবার অভুক্ত পড়ে থাকলেও কেউ এসে অনুযোগ করত না। উঠিয়ে নিত যেত অভুক্ত থালাখানা। বাপের মামলায় সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তাকেও। কী বলেছিল তার মনে নেই। মাটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন চলে মামলা। নীলা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, বৈশাখী না থাকলে বোধহয় মারাই পড়ত বেচারি। নীলার সঙ্গে কথা বলার জন্য ছটফট করত অসীম। দিন দিন ম্লান-হয়ে-আসা ছোট বোনটির চেহারা দেখে হু-হু করে উঠত অসীমের সারা অন্তঃকরণ—কিন্তু উপায় নেই। ছোট বোনটির মাথায় হাত বুলিয়ে দুটো সান্ত্বনার কথা বলার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত।

তারপর মামলার রায় বের হল একদিন!

রাজদ্রোহী পরশুরাম চৌধুরীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! ওই বৃদ্ধের!

অবিচলিত চিত্তে সে আদেশ গ্রহণ করলেন পরমানন্দ।

অসীম ছিল আদালতে। থরথর করে কেঁপে উঠল সে দণ্ডাদেশ শুনে। বসে পড়ল ধুলার ওপরেই। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এল পৃথিবী!

সম্বিৎ যখন ফিরে এল তখন আদালত জনশূন্য। ঝাড়ুদার ঝাঁট দিচ্ছে বারান্দাটায়। একটা পেয়াদা শ্রেণির লোক একগোছা চাবি হাতে ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে চলেছে। তারই ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে অসীমের। ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকায় সে। কোথায় গেল এতগুলো লোক? সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবী জুড়ে। রাস্তায় জ্বলে উঠেছে বিজলী বাতি।

অসীম উঠে দাঁড়ায়। ঝাড়ুদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চাবি হাতে পেয়াদাটা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। আদালতের কার্নিসে একজোড়া পায়রার নিভৃত কূজন ছাড়া চরাচর স্তব্ধ। মাতালের মতো টলতে টলতে চওড়া সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নেমে আসে। অনেকক্ষণ তাহলে বসে ছিল সে ওই ধুলার ওপর। আজ আদালতে নীলা এসেছিল—ছিলেন ননীমাধব আর দীপক। তারা কখন গেল? যাবার সময় নিশ্চয় তারা দেখেছিল দ্বারের পাশে মাটিতে বসে আছে অসীম। আশ্চর্য! আজকের দিনেও তারা প্রয়োজন বোধ করল না তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার। কেন? সেও কি ওই পরমানন্দের সন্তান নয়? তার বুকের ভেতরটাও কি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না আজ? সে কি ইচ্ছা করে এই সর্বনাশ ডেকে এনেছে! এ যে নিয়তির একটা চরম নিষ্ঠুর পরিহাস তা কি কেউ একবার ভেবে দেখবে না! না, অসীমের চোখ দিয়ে কেউ দেখল না একবার বিয়োগান্ত নাটকের এ দিকটা!

হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে অসীম এসে পৌঁছয় সেই পরিচিত পয়েন্টিং-করা লাল বাড়িটার সামনে। প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দুর্গের আকারের ওই বাড়িটা। আলো জ্বলছে না সামনের কোনো জানলায়। কোথাও কোনও প্রাণের সাড়া নেই। সদ্যোবিধবার মতো মূর্ছাতুর প্রাসাদটা আজ মৌন—স্তব্ধ। গেট খোলাই ছিল। চিরদিনের মতো গেটের ডান পাশে দারোয়ানের ছোট্ট ঘরটার সামনে চারপাইয়ে বসেছিল দারোয়ান উদাস দৃষ্টি মেলে। ব্যতিক্রমের মধ্যে আজ আর সে উঠে দাঁড়াল না তার ছোট হুজুরকে দেখে। হয়তো ওইটুকু অসম্মানের মধ্যেই বেচারী জানাতে চাইল তার প্রতিবাদ। অপমানটা বাজল না অসীমের। সে লক্ষ করেনি এ-সব। লাল কাঁকর-বিছানো পথটাও যে ওর প্রতি পদক্ষেপে অব্যক্ত ভাষায় প্রতিবাদ জানাল তাও কানে বাজে না তার। অবশেষে এসে পৌঁছয় গাড়িবারান্দার তলায়। ভেতরে প্রবেশ করতে মন হল না। বসে থাকে দ্বারের পাশে মেজের ওপরেই।

বাড়ির গাড়িটা এসে পৌঁছয় অল্প পরেই। ধরাধরি করে ওরা নামাল নীলাকে। আদালত থেকে ফিরছে সে। এত দেরিতে? হবে না? দণ্ডাদেশ শুনে নীলা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। আদালত থেকে তাই ওকে নিয়ে যাওয়া হয় ননীমাধবের বাড়িতে। সেটা আদালত থেকে কাছে। এতক্ষণ সেখানেই ছিল সে। অল্প সুস্থ হওয়ার পর ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে। দীপক আর ননীমাধবের সাহায্যে টলতে টলতে নীলা নেমে এল গাড়ি থেকে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। কাপড় ও ব্লাউসের অনেকটা ভেজা। মুখ আর মাথাও। বোধহয় জলের ঝাপটা দেওয়া হয়েছিল—শুকোয়নি এখনও। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের লাল। কোনোদিকে তাকায় না নীলা। লক্ষ্য হয় না অসীমকে। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের সঙ্গে যেন মিশে যেতে চায়। ওকে কেউই গ্রাহ্য করে না। নীলাকে ওরা নিয়ে এসে শুইয়ে দেয় ড্রইংরুমের একটা সোফায়।

অসীম ভয়ে ভয়ে নন্দকে প্রশ্ন করে—ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

নন্দ একবার থেমে পড়ে। কী যেন বলতে যায়। তারপর কিছু না বলেই চলে যায় ভেতরে।

অসীম বসেই থাকে বাড়ির প্রবেশপথের ধারে।

এ বাড়িতে সে অপ্রয়োজনীয়। শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়—অবাঞ্ছনীয়। এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার। সম্পর্ক নেই বা কেন? সবাই জানে সে-ই এ চরম সর্বনাশের মূল! সমস্ত জেনেশুনেও নাকি বাপ্‌কে ধরিয়ে দিয়েছে সে! কলঙ্কের বোঝা নিয়ে কেমন করে দাঁড়াবে অসীম দুনিয়ার সামনে? এত বড় লজ্জার বোঝা বহন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব?

দীপক বেরিয়ে আসে একটু পরেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। কে জানে কোথায় গেল ও।

অসীম মনে মনে বলতে থাকে : তুমি তো জানতে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কেন এমন করে দলিত-মথিত করে রেখে গেলে আমাকে? কেন সমস্ত অপরাধের বোঝা এমন করে তুলে নিলে নিজের মাথায়? কেন গোপন করেছিলে আমাদের কাছে তোমার যৌবনের ইতিহাস? কেন, কেন, কেন...?

...আচ্ছা, বাবা এখন কী করছেন? খুব কি ভেঙে পড়েছেন? দণ্ডাদেশ উচ্চারিত হবার পর সে যেমন ধুলার ওপর বসে পড়েছিল তিনিও তেমনি করে ভেঙে পড়েছিলেন? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! অর্থাৎ লৌহকপাটের ওপারেই ফেলতে হবে তাঁকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস! তাঁর পায়ের ওপর মুখ রেখে জীবনের শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবার সুযোগ আর আসবে না অসীমের জীবনে!...আচ্ছা, চুরুট না খেয়ে কেমন করে আছেন তিনি। রাজবন্দিদের কি চুরুট খেতে দেয়? ওঁকে কি সেই ডোরাকাটা জামা একটা পরিয়ে দিয়েছে! শিউরে উঠল অসীম। স্পষ্ট দেখতে পেল অসীম বাপের সেই মূর্তিটা। নীল-সাদা ডোরাকাটা একটা হাতকাটা জামা, আর হাফপ্যান্ট পরা ডাক্তার পরমানন্দ চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন লোহার গরাদ দুটো ধরে—দুই গরাদের ফাঁকে চেপে ধরেছেন গলাটা।

আর্তনাদ করে ওঠে অসীম—বাবা!

হঠাৎ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মতো।

কতক্ষণ ওইভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। গাড়ির শব্দে আবার মুখ তুলে তাকায়। গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে দীপক নেমে আসে। পাশ দিয়ে চলে যায় ওরা ভেতরে। ওকে অন্ধকারে ওভাবে বসে থাকতে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাক্তারবাবু : এ কে? এমনভাবে বসে আছেন কেন ওখানে?

—ও অসীম। ডাক্তার চৌধুরীর ছেলে।

—আই সী! দ্যাট সান্?

—হ্যাঁ, আপনি ভেতরে আসুন।

ওরা চলে যায়।

দ্যাট সান্! সেই ছেলে! যে ছেলে পিতৃঋণ শোধ করেছে বাপকে জেলে পাঠিয়ে! যে ছেলে...

না! আর পারবে না অসীম। একটা কিছু এখনি করতে হবে।

হঠাৎ ওর বাহুমূল ধরে কে যেন আকর্ষণ করে।

—কে? ও, বৈশাখী!

—ওপরে যাও!

—কেন?

—পথের ওপর এমনভাবে বসে থেকে একটা সীন কোরো না!

—ও!

টলতে টলতে উঠে যায় অসীম দোতলায় নিজের ঘরে।

* * *

নামো এবার।

নেমে আসেন পরমানন্দ ননীমাধবের অনুরোধে। জিতেন বাঁড়ুজ্জের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছেন ওঁরা। এইবার শুরু হবে রাজনৈতিক বুদ্ধির লড়াই। সাদরে ওঁদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসান জিতেনবাবু। বড় ঘর। চতুর্দিকে আলমারি-ভর্তি আইনের বই। পেছনের দেওয়ালে বিরাট বড় একটা বাঁধানো ফোটো। সম্ভবত জিতেনবাবুর স্বর্গগত পিতৃদেবের। তিনিও নামকরা উকিল ছিলেন বোধহয়। উকিলের পোশাকেই তোলা ছবি। কিশলয়বাবুও এসেছেন। একক। আবার মামুলি সৌজন্য-বিনিময়ের পালা। কিছু সময় অল্প, সুতরাং সোজা আলোচনা শুরু করতে হয়। পাটোয়ারী বুদ্ধিতে কিশলয়বাবু কিন্তু কম যান না। তবে পরমানন্দের পক্ষেও আছেন ননীমাধব। তিনি লক্ষ করেছেন পরমানন্দের ভাবান্তর। এজাতীয় সেন্টিমেন্টাল লোক নিয়ে ভারি মুশকিল। ননীমাধবই আলোচনা চালান বন্ধুর পক্ষ থেকে।

কিশলয়বাবু পশ্চাদপসরণ করতে গররাজি নন এবং শর্তও তাঁর মাত্র একটি। সমাজ-

উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য এ জেলায় একটি গ্রামনগরী স্থাপনের কথা। দুটি স্থানের মধ্যে চূড়ান্ত নির্বাচন এখনও সমাপ্ত হয়নি। রতনপুর আর বাঘডাঙা। রতনপুর এককালকার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমানকার ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম। বড় বড় মোটা থামওয়ালা ছোট-ছোট পাতলা ইটের প্রাসাদ হৃতগৌরব জমিদারদের শেষ স্মৃতি বহন করছে। সেখানকার ভূতপূর্ব রায়সাহেব আর রায়বাহাদুর জমিদারেরা তদ্বির-তদারক করছেন রতনপুরেই গ্রামনগরী প্রতিষ্ঠা করার। অপরপক্ষে বাঘডাঙা হচ্ছে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ-গড়ে-ওঠা গ্রাম—পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্‌বাস্তু এসে বসেছে সেখানে দলে দলে। কিশলয়বাবু এই জনপদের প্রতিষ্ঠাতা। অল্পমূল্যে এই ডাঙাজমিটি তিনি ক্রয় করে উদ্‌বাস্তু পত্তন করেছেন। কিশলয়বাবু এবং তাঁর পার্টি চান এই বাঘডাঙাতেই প্রতিষ্ঠিত হোক প্রস্তাবিত গ্রামনগরী। কিশলয়বাবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি আছেন যদি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাঁদের পছন্দমত বাঘাডাঙাতেই নতুন গ্রামনগরী গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হবে।

দেশবিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে কিশলয়বাবু যুক্ত ছিলেন—এখনও আছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অনেক পরিবার এসে বসেছে বাঘডাঙায়। একটা অবলা আশ্রমও করেছেন ওখানে কিশলয়বাবু—মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদের নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় মেতে আছেন উনি। কো-অপারেটিভও গড়ে তুলেছেন একটা ওদের নিয়ে। বাঘডাঙা সমাজ-উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল নির্বাচিত হলে এই উদ্‌বাস্তু নরনারীগুলির অশেষ উপকার হয়। গ্রামনগরীর অচ্ছেদ্য অংশরূপে আসবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি, কমিউনিটি হল, বাজার, ছোটখাট শিল্পপ্রচেষ্টা। জমজমাট হয়ে উঠবে অঞ্চলটা। এ-সবই জানেন পরমানন্দ। কিশলয়বাবু যে ওই উদ্‌বাস্তু নরনারীগুলির স্বার্থে এতবড় আত্মত্যাগ করছেন এতে মনে মনে খুশিই হলেন তিনি। তবু বলেন : কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেবার কতটুকু অধিকার আছে আমার? আমি যদি রিটার্নডও হই—তবু আমার ইচ্ছায় তো সি. ডি. পি. টাউনশিপের স্থান নির্বাচন হবে না।

কিশলয়বাবু হেসে বলেন : অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ? আপনার ক্ষমতা কী? আপনি তো ল্যাম্পপোস্ট মাত্র!

—তাহলে এ অন্যায় অনুরোধ করছেন কেন?

—ডাক্তার চৌধুরী, আমি ছেলেমানুষ নই। রাজনীতি করে আমারও চুল পেকেছে। ওই লোকগুলো ল্যাম্পপোস্টকেই ভোট দিয়ে আসে কেন জানেন? কারণ তারা জানে যে ওই চলৎশক্তিহীন একেবারে খাড়া ল্যাম্পপোস্টগুলোর সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ আছে এক গোছা তারের। সে তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ বয়ে যায় তাতে ৪৪০ ভোল্ট কারেন্ট। শুধু এখানেই শেষ নয়—সে তার আবার যুক্ত আছে কে. ভি. লাইনের সঙ্গে। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে মেন গ্রিট সিস্টেমের। ল্যাম্পপোস্ট নড়ে বসতে পারে না—কিন্তু তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে যে বৈদ্যুতিক তার—তার ক্ষমতা অসীম।

পরমানন্দ কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগে ননীমাধব বলেন—তাহলে সেই প্রাইম-মুভারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কী করে আমরা প্রতিশ্রুতি দিই বলুন ?

—সে তো বটেই। তবে আপনারা না পারলেও আপনাদের কিং-মেকার-অভ-দি-ডিস্ট্রিক্ট এ বিষয়ে আমাকে কথা দিতে পারেন। অন্তত একটা ট্রাঙ্ক কল করার পর তিনি জানাতে পারেন।

হা-হা করে হাসতে থাকেন কিশলয় গাঙ্গুলি।

—বেশ, তবে তাঁর কাছেই চলুন যাওয়া হোক। পরমানন্দ বলেন।

বাধা দিয়ে ননীমাধব বলেন—কিন্তু তাহলে আপনাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কিশলয়বাবু। আরও একটি কাজ আপনার করতে হবে এই সঙ্গে।

—বলুন।

—আমাদের ফ্যাক্টরির ধর্মঘটটা তুলে নিতে হবে। বাঘডাঙা বিষয়ে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পেলে আপনাকে বিনা শর্তে ধর্মঘটটা বন্ধ করতে হবে।

—এ আপনি কী বলছেন ননীমাধববাবু! আপনাদের কারখানার স্ট্রাইকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

পরমানন্দের কাছে কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারখানার শ্রমিকেরা কোনো রাজনৈতিক

দলভুক্ত নয়। ওদের কোনো স্বীকৃত মজদুর ইউনিয়নও নেই। সুতরাং কিশলয়বাবু কেমন করে এজাতীয় প্রতিশ্রুতি দেবেন? সে কথাই হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই ননীমাধব বলে ওঠেন—মিস্টার গাঙ্গুলি, ছেলেমানুষ আমরাও নই। আপনি তো সামান্য চড়াই পাখি। কতটুকু ক্ষমতা আপনার? তবু ওই সংস্কৃত শ্লোকটাই বলছে নাকি যে সামান্য টিট্টিভ পক্ষীও সমুদ্রকে ব্যাকুল করে তুলতে পারে! আপনার পার্টি টাকা না ঢাললে একাদিক্রমে বাইশ দিন স্ট্রাইক চালাতে পারে কোনো শ্রমিকদল—যাদের ইউনিয়ন পর্যন্ত নেই? অবশ্য আপনি বলতে পারেন নিজ দায়িত্বে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়—তা, কী বলে ভালো, আপনাদেরও একজন লীডার-অভ-দি-অপোজিশন পার্টিমেকার আছেন এ জেলায়—তাঁর সঙ্গেই না হয় একটু কথাবার্তা বলে নিন টেলিফোনে।

কিশলয়বাবুর হা-হা-করা হাসিটা এতক্ষণে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ননীমাধবের কণ্ঠে।

ভালোমানুষ জিতেন বাঁড়ুজ্জে বলেন—একটু চা হোক এবার?

কেউ কর্ণপাত করে না কথাটায়।

কিশলয় বলেন—আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে মশাই। আমি এই রকম খোলাখুলি কথাই ভালোবাসি। এককালে ফ্লাশ খেলতাম, জানলেন, কিন্তু ব্লাইন্ড খেলিনি কোনোদিন। পাওয়া মাত্র তাস তিনখানা টিপে টিপে দেখে নিতাম—তারপর হাত বুঝে স্টেক করতাম।

—আপনি খেলেন না কি তেতাশ? তাহলে আসবেন না আমাদের বোর্ডে। আমরা তো রোজই সন্ধ্যার পর...

ননীমাধবকে থামিয়ে দিয়ে কিশলয়বাবু হেসে ওঠেন : সীয়ারাম, সীয়ারাম! ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা বিপক্ষ শিবিরের লোক। আমরা সর্বহারার দলে আর আপনারা হচ্ছেন ক্যাপিটালিস্ট বুর্জোয়া শ্রেণির লোক। আপনাদের ক্লাবঘরের দরজায় মাথা গলাতে দেখলে যে আমাদের আর লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

—আহা, সেইজন্যেই তো ক্লাবঘরে একটা পেছনের দরজা বানানো হয়েছে।

দুজনেই হেসে ওঠেন আবার।

—কিন্তু যে কথা হচ্ছিল। আপনাদের স্ট্রাইকের কথা। হ্যাঁ, ওটার ব্যবস্থাও হতে পারে—কিন্তু একেবারে মৌফতসে ওটা কী করে আশা করেন আপনি ননীবাবু? বাঘডাঙার এক্সচেঞ্জে আমি উইথড্র করতে রাজি আছি। দ্য ডীল ইজ্ কমপ্লীটেড। এই একই ট্র্যানজাকশনে যদি আপনাদের ধর্মঘটটাও জুড়ে দিতে চান তবে আমার তরফেও একটা এন্ট্রি হওয়া উচিত, নয় কি? ফর এভরি ডেবিট দেয়ার শ্যুড বি এ ক্রেডিট—না হলে ব্যাল্যান্স শীট মিলবে কেন—অ্যাঁ?

যেন চরম রসিকতা হল একটি। দুজনেই আবার হেসে ওঠেন।

অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন পরমানন্দ। এ কী মেছোহাটায় এসে পড়েছেন তিনি! দুজনেই দেশসেবা করতে চান—অথচ রাষ্ট্রের আইনে একজনই পেতে পারেন সে অধিকার। সুতরাং একজন যাবেন আইনসভায়—অপরজন তাঁকে স্থান ছেড়ে দেবেন। যিনি স্বার্থত্যাগ করছেন তিনি কতকগুলি সুবিধা পাবেন; কিন্তু সে সুবিধা আদর্শগত, নীতিগত হবে এটাই পরমানন্দের আশা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো সেই নৈর্ব্যক্তিক স্থূলতামুক্ত থাকছে না।

—বেশ বলুন, কেমন করে ব্যাল্যান্স শীট মেলানো যায়? প্রশ্ন করেন ননীমাধব।

কিশলয়বাবু চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ থেকে বার করেন একটি নীল কাগজের ব্লু-প্রিন্ট। বাঘডাঙা মৌজার সেট্‌ল্‌মেন্ট ম্যাপ। প্রস্তাবিত গ্রামনগরীর এলাকাটায় একটা লাল দাগ দেওয়া। তার ভেতরে রেল-লাইনের বরাবর সমান্তরাল লম্বা একটি ফালি জমির ওপর নীল পেন্সিলের ডোরা কাটা।

কিশলয় গাঙ্গুলি বলেন—প্রস্তাবিত টাউনশিপের সীমানা হচ্ছে এই লাল-পেন্সিলের অংশটা। তার ভেতর এই নীল-পেন্সিলের দাগ দেওয়া এই কটা প্লট ডি-রিকুইজিশন করিয়ে দিতে হবে।

—কতটা জমি হবে ওটা?

—দাগ নম্বর ১১০৭ থেকে ১১১৩, একুনে তেতাল্লিশ একর।

—ব্রেভো! হেসে ওঠেন ননীমাধব। বেশ, চলুন তাহলে, আর দেরি করা নিরর্থক।

ওঁরা উঠে পড়েন। সদলবলে রওনা হয়ে পড়েন তারিণীদার আস্তানার উদ্দেশ্যে।

* * *

কিছুই ভালো লাগছিল না পরমানন্দের। কোথায় যেতে পারে মেয়েটা? সত্যিই কি কুলিব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সে? এতটা নীচে সে নেমে যাবে? সকলেই চেনে তাকে—ডাক্তার চৌধুরীর কন্যা বলে। ওখানে গিয়ে যদি আশ্রয় নিয়ে থাকে তাঁর বিদ্রোহী আত্মজা তাহলে লোকসমাজে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে? মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করে তুলেছেন। ফিলসফিতে এম. এ. পাস করেছে নীলা। বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—নীলা রাজি হয়নি। কারণটা জানা ছিল না এতদিন—সম্প্রতি জেনেছেন। অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল প্রথমটা। তারপর বুঝেছেন এ দুনিয়াতে বিশ্বাসের অতীত সত্যই কোনো কিছু নেই হয়তো। কৈশোরে যে মেয়েটির দেব-দ্বিজে ভক্তির ছিল বাড়াবাড়ি—পরবর্তী জীবনে সেই হয়ে উঠেছিল নাস্তিকতার কালাপাহাড়। অথচ কী আশ্চর্য, শৈশবে কৈশোরে সে মানুষ হয়েছিল বিজাতীয় আবহাওয়ায়। মায়ের ও দিদিমার প্রভাবে তার পক্ষে বার-ব্রত-পূজা-অর্চনার দিকে ঝোঁকাটা সে যুগেই ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মেতেছিল ওই-সব নিয়ে। হয়তো তার ওই-সব ব্রতপূজার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হত বলেই সে বেশি জোর দিয়ে করত সেগুলো। বরাবরই একটা বিদ্রোহের ভাব ছিল তার রক্তে। স্কুলের দিদিমণিদের কাছ থেকে শেখা গঙ্গাস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে বাথরুমে সে জল ঢালত মাথায়। আজও স্পষ্ট মনে আছে পরমানন্দের—বাথরুমের দরজা ভেদ করে বেরিয়ে আসত শীতে-কাঁপুনি-ধরা নীলার কাঁপা কণ্ঠ—'মাতর্গঙ্গে তে যো ভক্তঃ'।

আরও একদিনের ঘটনার কথা মনে পড়ছে আজ। তখন বোধহয় নীলা ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ত। ফিফ্‌থ ক্লাস তো নয়, ওরা বলত ক্লাস সিক্স। অর্থাৎ ম্যাট্রিক দেবার তখনও বছরচারেক বাকি। একদিন হাউ-হাউ করতে করতে নীলা এসে হাজির বাপের দরবারে। কী ব্যাপার? না, দাদা আমার পুন্যিপুকুর নষ্ট করে দিয়েছে! কী পুকুর? না, পুন্যিপুকুর। পুন্যিপুকুর আবার কী রে বাবা? অনুসন্ধান করতে হয় ব্যাপারটা। তদন্তের পর বোঝা গেল বাগানের এককোনায় আছে একটা ছোট্ট গর্ত। তার চারপাশে কিছু শুকনো ফুল, বেলপাতা। আর পুকুরের মাঝখানে কিছু মুরগির পালক—মাটিচাপা দেওয়া। জরুরি আদালত বসেছিল সেদিন বাড়িতে। বাদী নীলা, আসামি অসীম, সাক্ষী নন্দ-বেয়ারা আর বিচারক স্বয়ং পরমানন্দ। আসামি দোষ অস্বীকার করে বসায় মামলাটা বাঁকা পথ ধরল। জবানবন্দিতে আসামি বলে—হ্যাঁ, মুরগি একটা কেটে খেয়েছিল বটে ওরা কজন বন্ধু মিলে। বেওয়ারিশ মুর্গি, কার তা জানে না,—উড়ে এসে পড়েছিল বাগানে। তার ঠ্যাং আর পালকগুলো তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করার প্রয়োজন বোধ করেছিল ওরা। তৈরি গর্ত পাওয়ায় পরিশ্রমটা লঘু হয়েছিল তাদের। পুন্যিপুকুর কী তা তারা জানে না। তা তো স্বয়ং বিচারকও জানেন না। বাদী তখন বিচারককে বুঝিয়ে দেয় পুন্যিপুকুরের মাহাত্ম্য। কী যেন শোলোকটা? মনে নেই এতদিন পরে। খালি একটা কথা মনে আছে—'আমি সতী লীলাবতী!' ওই কথাটা তাঁর বেণীদোলানো মেয়েটির মুখে শুনে হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন সেদিন। বিচারকের এই ব্যবহারে আদালত অবমাননার ভয় না করে বাদী সেদিন সভাত্যাগ করেছিল প্রতিবাদে।—বেশ! বুঝলাম! তুমিও তাহলে ওই দলে! বারবার ওকে ফিরে ডেকেছিলেন। ফেরেনি অভিমানিনী মেয়েটি—না! শুনব না আমি তোমার কথা। তুমিও ওই দলে!

তুমিও ওই দলে!

কোন দলে? সেদিন বালিকাবয়সী নীলা বলেছিল—তুমি ওই দলে। অর্থাৎ দাদার মতো নাস্তিকদের দলে—যারা পুন্যিপুকুরের মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী। শুনে হেসেছিলেন তিনি। আরও বছরপাঁচেক পরে ওই একই অভিযোগ এনেছিল অসীম।—বলেছিল—'তুমিও তাহলে ওই দলে!' অর্থাৎ নীলার দলে, বিপ্লব-অনুরাগীদের দলে। সেবারও তিনি হেসেছিলেন। আজ আবার নীলা বলছে ওই কথাই—তুমিও ওই দলে। এবার ওই দল হচ্ছে স্বার্থপর আত্মভোগীদের দল।

এবারও হেসে উড়িয়ে দেবেন পরমানন্দ।

চিরদিন তিনি একটিমাত্র দলেই আছেন—সত্যধর্মের দলে। বিবেকবুদ্ধি যা ভালো বলে বুঝেছে—তাই সবলে আঁকড়ে ধরেছেন। একচুলও বিচ্যুত হননি নিজের দৃঢ়মত থেকে। সে কথা নীলা জানে। তাই এ কথাও তার বোঝা উচিত ছিল যে, হুমকি দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। নীলা যদি তাঁকে ত্যাগ

করে ওই কুলি-বস্তিতেই গিয়ে আজ আশ্রয় নেয়—তো নিক। সেই ভয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করবেন না নিজ আদর্শ থেকে। যে পথে বৃহত্তর মানবসমাজের, প্রভূতের কল্যাণ করতে পারবেন—সেই পথেরই অভিযাত্রী আজ তিনি। মেয়ের হুমকিতে সে পথ ত্যাগ করে আসার মানুষ তিনি নন।

প্রথম যৌবনে লক্ষ্য ছিল, বন্ধনদশা থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধার করবেন। বিদেশী শাসনভার থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করবেন দেশকে। একদল বিপ্লববাদীর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর; তখন তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। ওঁর বাবা হঠাৎ টের পেয়ে গেলেন। পিতা-পুত্রে একটা সম্মুখযুদ্ধ হবার উপক্রম হল। পরমানন্দের বাবা কলকাতার এই পরিবেশ থেকে ছেলেকে সরিয়ে নেবার জন্যই তাকে বিলাত পাঠালেন। খুশি হয়েছিলেন তাতে পরমানন্দ। দলপতি জ্যোতির্ময় পাঠক বলেছিলেন—এ শাপে বর হল, আমরা বিশ্বস্ত একটি লোককে ভারতের বাইরে পাঠাতে চাইছিলাম। ভালোই হবে—তোমাকে দিয়েই কাজটা হবে—অথচ খরচ দেবেন তোমার বাবা!

তারপর দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেল দেশের ইতিহাসে। ভারতজোড়া বিপ্লবজাল মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পাঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম—জাল গুটিয়ে অনেককেই ধরে ফেলল ওরা। কেউ মরল গুলি খেয়ে, কেউ ফাঁসির মঞ্চে। অত্যন্ত সুকৌশলে অতীত জীবনের ইতিহাসকে লুকিয়ে ফেললেন পরমানন্দ অপ্রকাশের অনালোকে। শতাব্দীর দীর্ঘ পঞ্চমাংশ তাঁর জীবনে রাজনীতির কোনো স্থান ছিল না। ছিল না প্রকাশ্যে—কিন্তু অন্তরের নিভৃতলোকে নিশ্চয়ই বয়ে চলেছিল বিদ্রোহের ফল্গুধারা। হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতোই একদিন পাষাণকারা ভেদ করে বের হয়ে এল সে। উপায় ছিল না। শচীশ নন্দীর ছেলের সন্ধান বলে দেওয়া অসম্ভব ছিল সেদিন তাঁর পক্ষে। পঁচিশ বছর আগে গীতা হাতে দলপতির কাছে যে গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ভাঙতে পারেননি তিনি। কারারুদ্ধ ছিলেন দীর্ঘদিন। হয়তো বাকি জীবনটাই কেটে যেত সেই অন্ধকারার অন্তরালে। অন্তত সেদিন মনে হয়েছিল এটাই অনিবার্য নিয়তি। দেশ স্বাধীন না হলে এই পরিণতিই ছিল অবধারিত।

জেলে থাকতেই দুঃসংবাদটা পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে তাঁকে কাবু করতে পারেনি—পুলিশী অত্যাচারে তিনি ভেঙে পড়েননি—মাথা সোজা রেখেই গ্রহণ করেছিলেন মিস গ্রেহামের হার্টফেল করার সংবাদ। কিন্তু এ সংবাদটা বজ্রাঘাতের মতো দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণ!

অসীম শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল!

নীলাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন ননীমাধব। সে রাজি হয়নি। এ বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। মিস গ্রেহাম গত হয়েছেন, অসীম নেই, বাবা নেই, বৈশাখী কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। পুরনো আমলের লোক একমাত্র মাটি কামড়ে পড়ে আছে নন্দ-বেয়ারা। বোধকরি নিয়মমতো মাহিনা না পেলেও সে চলে যেত না। দৈনন্দিন আহার না জুটলেও। এ বাড়ির অনেক সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সে ছিল নীরব সাক্ষী। দিদিমণিকে সে ছেড়ে যায়নি।

নীলা অসীম ধৈর্যে নিজেকে সংহত করেছিল। অসীমের মৃত্যুর পর প্রথম কয়েক মাস সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংযত করে তোলে। পড়াশুনা শুরু করে আবার। বাবা ফিরে আসবেন না—আর কেউ নেই তার। নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। ধাপে ধাপে পার হয়ে গেল কলেজের সোপানশ্রেণি। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্ধকারার অন্তরাল থেকে যেদিন বার হয়ে এলেন পরমানন্দ, সেদিন নীলাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে নীলার। দেহে এবং মনে। অনেক বড় হয়ে গিয়েছে—অনেক ভারিক্কে। বৃদ্ধ বাপকে সে ছোট্ট শিশুর মতোই টেনে নিল নিজ ক্রোড়ে।

তাঁর অবর্তমানে নীলার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পেয়েছিলেন নন্দ বেয়ারার কাছ থেকে, কিছুটা ননীমাধব অথবা দীপকের মারফত। নীলা ঘোর নাস্তিক হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর আনন্দঘন কোনো সত্তার কথা সে স্বীকার করতে নারাজ। যে সর্বশক্তিময় সত্তা তার সুখের সংসারকে ছারখার করে দিয়েছে—তার বাবাকে করেছে নির্যাতন—তার নিরপরাধ ভাইকে নিষ্ঠুর নিয়তির নিষ্পেষণে দলিত মথিত করে ঠেলে দিয়েছে অবমাননাকর মৃত্যুর মুখে—তাকে মঙ্গলময় বলে স্বীকার করে না নীলা, করবে না কখনও।

কিন্তু পরমানন্দ তখন একটা অবলম্বন খুঁজছেন। জীবনের তিনপোয়া অংশে ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি থাকেন ভালো,—না থাকেন বয়ে গেল—ভাবটা ছিল এই। এখন কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন তিনি। ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিলেন সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাঁর অবর্তমানে নার্সিং হোম উঠে যায়নি। ননীমাধবের তত্ত্বাবধানে সেটা চলছে ঠিকই। তাঁর নিজস্ব সংসারেও তিনি বাহুল্যমাত্র। শেয়ারের ডিভিডেন্ড আর বাড়িভাড়া থেকে সংসার-রথচক্রে ঠিকমতো রসদ জোগান দেয় নীলা। কোথাও সংসার তাঁকে দেখে বললে না—এই যে এসো! কোনো দায়ঝক্কি নেই বৃদ্ধের। সকালে খবরের কাগজ পড়তে পারো, দুপুরে নিদ্রা যাও না কেন? বিকালে একটু সান্ধ্য ভ্রমণ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রাত্রে—না, এই বয়সে বেশি রাত জাগা ভালো নয়—সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ো বরং। ব্যবস্থাটায় প্রথমে আহত বোধ করেছিলেন। তারপর মনে হল—এই তো দুনিয়া। একদিন তিনি ছিলেন এ সংসারের কেন্দ্রস্থলে—তিনিই ছিলেন এর কর্ণধার। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে নতুন ব্যবস্থা—এই তো স্বাভাবিক। আবার কেন সে-নতুন ব্যবস্থায় আঘাত হানবেন উনি? পরমানন্দ অন্তরে অন্তরে বিদায় নিলেন সংসার থেকে।

এই সময়েই তিনি দীক্ষা নেন গুরুদেবের কাছে। উদাসীন সন্ন্যাসী মানুষ। সাক্ষাৎ পান হরিদ্বারের আশ্রমে। কোনো জাগতিক বন্ধন নেই। দৃষ্টি তাঁর কোন দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তে ফেরানো। তাঁর সঙ্গে কথা বলে অদ্ভুত সান্ত্বনা পেলেন পরমানন্দ— অভিভূত হয়ে পড়লেন। মনে হল ইনিই তাঁকে দেখাবেন পথ। গুরুদেবের উপদেশমতো সাধনমার্গের পথে শুরু হল তাঁর নূতন অভিযাত্রা। অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পেলেন তাঁরই প্রসাদে। নূতন লক্ষ্যের দিকে নূতনতম অভিযান। জানতে হবে তাঁকে—যাঁকে পাওয়ার পর অন্য সমস্ত পাওয়াকে মনে হয় তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। গুরুদেবের আশ্রম শহরের অপর প্রান্তে। গুটি তিন-চার অনুরাগী শিষ্য আছে—তাদের আছে অনুসন্ধিৎসা, আছে নিষ্ঠা—নেই আড়ম্বর, নেই উপকরণের বাহুল্য। সন্ধ্যাবেলা ওদের সঙ্গেই এসে বসতেন গুরুদেবের কাছে। বর্ষায় ও শীতে খড়ে-ছাওয়া মেটে ঘরের প্রদীপজ্বালা আধো-অন্ধকারে; অন্যান্য ঋতুতে বাগানের ছাতিমগাছ তলায়। গুরুদেবের কণ্ঠে ছিল ঈশ্বরদত্ত মাধুর্য—গানই করুন, কথকতাই করুন, অথবা পাঠই করুন গীতা অথবা উপনিষদ—তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ত শ্রোতা। সংস্কৃতটা ভালো জানা নেই পরমানন্দের—তাই যখন ভাষ্য না করে শুধু ব্রহ্মসূত্র আওড়ে যেতেন তখন অর্থগ্রহণ হত না—কিন্তু অভিভূত হয়ে থাকতেন তখনও! ছন্নছাড়া জীবনে শান্তি পেলেন তিনি।

নীলাকেও তিনি নিয়ে আসতে চাইতেন এই সুশান্ত পরিবেশে। পরমানন্দ জানতেন নীলার মনের দুঃখের দাহন—তাই তাকেও আনতে ইচ্ছা হত সঙ্গে করে। নীলা রাজি হত না। এ নিয়ে মতান্তর হয়েছিল পিতা-পুত্রীর; মনান্তর হতে পারেনি। কারণ সংসারের চতুঃসীমায় অপরের মতকে সহ্য করবার যে অলিখিত আইন ছিল সেটা অতিক্রম করেনি কোনো পক্ষই। কালাপাহাড় কন্যা ও ভক্ত পিতার মধ্যে কোনো ফাটল দেখা দেয়নি এইজন্য। এই কারণে একজন অপরের সান্নিধ্য ত্যাগ করার কথা কল্পনা করেননি।

দিন কেটে যায়।

হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করলেন পরমানন্দ বানপ্রস্থ নেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি হয়নি তাঁর। জাগতিক প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে যায়নি। কর্মযোগ ত্যাগ করে ভক্তিযোগে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টাটা তাঁর ঠিক হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সফল হয়েছে তাঁদের স্বপ্ন; কিন্তু কই, দেশজননীর অভাব-অনটন তো দূর হয়নি। অনাহার, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা তো তেমন করেই চেপে ধরে আছে হতভাগ্য দেশের কণ্ঠনালি। তবে বৈরাগ্যসাধনের পথে কেন মুক্তির সন্ধানে তিনি মুমুক্ষু আজ? নানান প্রতিষ্ঠান থেকে এই নির্যাতিত দেশকর্মীটির আহ্বান আসতে শুরু করল। হিন্দু সৎকার সমিতি হবে, মেয়েদের স্কুল হবে, হরিজন পল্লীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তি গাড়া হবে;—সবাই ডাকে পরমানন্দকে। তাঁর গলায় পরিয়ে দেয় ফুলের মালা—প্রশস্তি পড়ে শোনায়। তাঁকে পুরোভাগে রেখে চলতে চায় ওরা। এ আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করবেন কীসের জোরে? ক্রমে ক্রমে কখন বন্ধ হয়ে গেল গুরুদেবের আশ্রমে যাতায়াত—নিজের অজান্তেই নেমে এলেন তিনি সমাজসেবার কাজে,—সেখান থেকে আর এক ধাপ—সক্রিয় রাজনীতিতে।

এই সময়েই বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির একগোছা শেয়ার চলে এল তাঁর হাতে। পরমানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন শিল্পের উন্নয়ন না করতে পারলে অর্থনৈতিক বন্ধনদশা ঘুচবে না দেশের। আত্মনিয়োগ করলেন তিনি শিল্পক্ষেত্রে। একনিষ্ঠ সেবায়, অনলস পরিশ্রমে অনতিবিলম্বেই অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। প্রতিষ্ঠা হল; শুধু নির্যাতিত দেশকর্মী বলে নয়—ভূতপূর্ব রাজবন্দি বলে নয়— প্রতিষ্ঠাবান শিল্পপতি বলে।

কিন্তু একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে—এটা ভুলতে পারেননি। নীলাকে সংসারী করা হয়নি। বয়স হয়েছে মেয়ের—শিক্ষাও শেষ করেছে সে। মনোনীত পাত্রটি অবশ্য বরাবরই রয়েছে হাতের মুঠোয়। শুধু দু হাত এক করে দেওয়া। শুধু পরমানন্দ আর ননীমাধবই নয়—নীলাও নিশ্চয় পছন্দ করে ওকে। না হলে এ দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে কখনও এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশত না। বন্ধু বলতে একমাত্র সেই আসে নীলার কাছে।

কথাটা একদিন পাড়লেন তিনি। নীলা শুধু বললে—সে হবার নয়।

—হবার নয়! কেন? অমতটা কার? তোমার না দীপকের?

—ওটা অবান্তর প্রশ্ন। দীপক জানে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া অসম্ভব।

এর পর দীপককেই প্রশ্নটা করতে হয়েছিল। স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি কি নীলাকে তোমার যোগ্য মনে করো না?

জবাবে দীপক বলেছিল—নীলাকে অযোগ্য মনে করবে এমন পুরুষমানুষ তো কই আজও নজরে পড়ল না। কিন্তু এ হবার নয় জ্যাঠামশাই।

—হবার নয়! কেন?

—কারণ নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে।

পরমানন্দ চুপ করে গিয়েছিলেন। নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে! অর্থাৎ নীলা অন্য একটি যুবকের প্রতি আসক্ত। কে সে? সমস্ত পরিচিত দুনিয়া তন্নতন্ন করে হাতড়াতে থাকেন। না, সম্ভাব্য কাউকেই মনে পড়ে না। কিন্তু তাই বা স্থির-নিশ্চয় হন কী করে তিনি? তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নীলা অতিবাহিত করেছে জীবনের রক্তঋতুর দিনগুলি! কে জানে কোন রক্তিম ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে সেই জীবনবসন্তে। পরমানন্দ কেমন করে জানবেন জীবনের কোন মধুপ এসেছিল গোপনে সে যৌবনের মৌবনে।

...আজ আর ওটা অজানা নয়! আজ তিনি জানতে পেরেছেন কার প্রত্যাশায় শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিল তাঁর আত্মজা। কিন্তু এ যে অসম্ভব আজ! ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলের সঙ্গে কুঁচবরণ রাজকন্যের বিবাহ হত যে যুগে তা গত হয়েছে ঘিয়ের প্রদীপজ্বালা সন্ধ্যাবেলাগুলোর সঙ্গেই। মিরাকল-এর যুগ এ নয়। জীবনটা নাটক নয়—নভেল নয়। অসম্ভবের স্থান নেই জীবনে। আর সবচেয়ে বড় কথা তফাতটা অর্থনৈতিক নয়—তা হলে সহজেই সমাধান করতে পারতেন, জাতের নয়—তাহলে উপেক্ষা করতেন। বাধাটা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, জীবনদর্শনে— বাধাটা নীতিগত। ওরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাসিন্দা। একজন কারখানার সর্বশক্তিমান ডিরেকটার-তনয়া—অন্যজন সেখানকার পদচ্যুত মেহনতী মানুষ—চুরির দায়ে যাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ছি ছি ছি ছি!

* * *

পরমানন্দ প্রায় জোর করেই নেমে গেলেন মাঝপথে। ননীমাধবকে বললেন তারিণীদার কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে। তিনি গুরুদেবের আশ্রমটা ঘুরে একটু পরেই আসবেন ওখানে। ননীমাধব প্রথমটা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন সঙ্গে যাবার জন্য—কিন্তু একগুঁয়ে বন্ধুর প্রকৃতি তাঁর জানা ছিল ভালোরকমই। তাই শেষ পর্যন্ত বলেন—না হয় চলো তোমাকে আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে যাই।

না, তাতেও আপত্তি পরমানন্দের। এটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারবেন তিনি। অগত্যা পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা মেঠো রাস্তাটা যেখানে বাঁক ঘুরে যাত্রা করেছে ওই নির্জন আশ্রমটির দিকে, সেই পথের মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে ওঁরা চলে যান।

মুক্তির নিঃশ্বাস পড়ে একটা। একটু নির্জন অবকাশই খুঁজছিলেন এই মুহূর্তটিতে। ভালোই হয়েছে। নীলা যদি এখানে এসে থাকে ভালোই—না হলেও দীর্ঘদিন পরে আজ গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা

করে মনটা হালকা করে নেবেন। এই শান্ত মনোরম বাতাবরণে মনটাকে স্নিগ্ধ করে নেবেন। নীলা কি এখানে এসেছে? সম্ভবত নয়। নীলা এখানে আসবার মেয়ে নয়। সে সহ্য করতে পারে না ওঁর গুরুদেবকে। একদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রায় জোর করে ওকে নিয়ে এসেছিলেন গুরুদেবের কাছে। আশা করেছিলেন ওঁর প্রভাবে হয়তো অবিশ্বাসের অচলায়তন ভেঙে পড়বে নীলার। তা কিন্তু বাস্তবে হয়নি। রীতিমতো সমকক্ষের মতো তর্ক করেছিল নীলা, শুধু তর্ক নয়—খানিকটা উপেক্ষা, খানিকটা ব্যঙ্গও ছিল সেই তর্কের সঙ্গে। গুরুদেব অবশ্য কিছু মনে করেননি—কিন্তু লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন পরমানন্দ।

বেলা বারোটা বাজে। অন্যমনস্ক হয়ে কাঁচা সড়কটা ধরে পায়ে পায়ে চলেছেন তিনি আশ্রমের দিকে। আশেপাশে নজর পড়ল হঠাৎ। আশ্চর্য মিষ্টি লাগল পরিবেশটা। শহরতলীর মাধুর্যে মোহিত হয়ে গেলেন যেন।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অভ্ররৌদ্র বন্দি হয়েছে ঘন কাঁঠালপাতার ঠাসবুননিতে—মাঝে মাঝে পথের ধুলায় পড়েছে পাতার ফাঁক দিয়ে চুরি করে আসা টাকা-টাকা রোদের ছাপ। ধুলোর গন্ধ এসে মিশেছে বনতুলসীর সৌরভে। পথের ধারে নয়ানজুলির বদ্ধ জলের ঘিয়ে রঙের কাদায় গা এলিয়ে নিশ্চিন্ত আবেশে পড়ে আছে একটা মিশকালো মোষ। রাস্তার ওধারে মেঠো ঘরে ঘুম নেমে আসছে কোনো দামাল ছেলের আধবোজা চোখের পাতায়—গাঢ় কালো নিথর ঘুম। ওর মায়ের সুরেলা কণ্ঠের ঘুমপাড়ানিয়ার সঙ্গে সঙ্গত জমিয়েছে বিরলপত্র বাবলা গাছের ঘুঘুটা।

এমন কিছু বিরলসন্ধান দুর্লভ দৃশ্য নয়। পথের ধারে এমনি করেই চিরকাল ফুটে আছে এ দৃশ্য শহরতলীর দেশে। তবু যেন হুহু করে উঠল ওঁর মনের মধ্যে। কেমন যেন বঞ্চিত মনে হল নিজেকে—কে যেন এই পল্লীর শান্ত দৃশ্যটিকে সরিয়ে রেখেছিল তাঁর দৃষ্টি থেকে। দ্রুতগতি মোটরের জানলায় এ দৃশ্য ধরা দেয়নি এতদিন তাঁর কাছে। এতদিন উপকরণের দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন তিনি—ঐশ্বর্যের ঠুলি এঁটে দিয়েছিল কে যেন তাঁর চোখ দুটিতে।

পায়ে পায়ে উনি এসে পৌঁছলেন আশ্রমে।

গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হল না কিন্তু। তিনি সকালের ট্রেনে কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারল না। যাবার আগে না কি একখানা চিঠি লিখে গেছেন পরমানন্দের নামে। চিঠিখানাও পেলেন না। সেখানা নিয়ে নাকি ছোট মহারাজ সকালবেলাতেই বার হয়েছেন—তাঁকেই চিঠিখানা পৌঁছে দেবার জন্য। এখনও ফিরে আসেননি।

পরমানন্দকে মৃগচর্মের একটি আসন এনে দিল আশ্রমের একটি ভৃত্য। গুরুদেবের সেবার জন্য তিনিই বহাল করেছেন ছেলেটিকে—মাহিনাও তিনিই দেন। আর কেউ নেই আশ্রমে। উনি বসে অপেক্ষা করতে থাকেন। যদি ফিরে আসেন ইতিমধ্যে ছোট মহারাজ।

সৌম্য শান্ত আশ্রমের বাতাস। ছোট্ট একটা বাগান পাঁচিলঘেরা আঙিনায়। হ্যাঁ, পাঁচিলটা তিনিই খরচ করে গেঁথে দিয়েছেন। সিমেন্ট দিয়েই গেঁথে দেবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু কালোবাজার ছাড়া ও দ্রব্যটি পাওয়ার উপায় নেই। কারখানার এক্সটেনশনটার বেলায় যা করেছেন করেছেন—তাই বলে ওই ভাবে জোগাড়-করা সিমেন্ট দিয়ে তো তিনি আশ্রমের পাঁচিল গাঁথতে পারেন না! তাই চুন-সুরকি দিয়েই গেঁথে দিয়েছেন প্রাচীর। কী যেন ভাবছিলেন! হ্যাঁ বাগান—সুন্দর ফুলের বাগান! পূজার ফুলের জন্য অসুবিধা হয় না আর গুরুদেবের। ...বড্ড গরম লাগছে! বিজলি নেই আশ্রমে—সুতরাং ফ্যানও নেই। পরমানন্দ ইলেকট্রিক কনেকশন করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—কত আর খরচ হত? আর, হত তো হত। পরমানন্দের মতো শিষ্য থাকতে গুরুদেব কষ্ট পাবেন গরমে?

কিন্তু গুরুদেবই রাজি হননি।

পরমানন্দ খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুলে আরাম করে বসেন। এই আশ্রমেও আজকাল আর আসা হয়ে ওঠে না তাঁর। অথচ বছর কয়েক আগে ঝড়বৃষ্টিমথিত কোনো একটি সন্ধ্যাবেলায়ও যদি এখানে না আসতে পারতেন তো মনে হত একটি দিন বৃথা গেল। আর আজ বোধহয় কয়েক মাস পর আসছেন তিনি এ আশ্রমে। সরে গেছেন, উপকরণের দুর্গে বন্দি হয়ে পড়েছেন নিজের অজান্তেই। শেষ কবে এসেছিলেন এ আশ্রমে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—নমিনেশন যেদিন পেলেন সেদিন এসেছিলেন গুরুদেবকে প্রণাম করতে। মনে পড়ল সেদিনকার ঘটনাটা।

সেদিন নিভৃতেই পেয়েছিলেন গুরুদেবকে জনান্তিক অবকাশে। সামনের ওই যে তালাবন্ধ ঘরটা দেখা যাচ্ছে ওইখানে একটা প্রদীপ জ্বেলে বসে বসে কী একখানা গ্রন্থ পড়ছিলেন তিনি। পরমানন্দ এসে বসলেন তাঁর পায়ের কাছে, প্রণাম করলেন। গ্রন্থখানি মুড়ে রেখে গুরুদেব জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন শিষ্যের দিকে।

লজ্জিত বোধ করেছিলেন সেদিন সে দৃষ্টির সামনে। নীরব দৃষ্টির জিজ্ঞাসা—কী ব্যাপার? দীর্ঘদিন পরে এমন হঠাৎ?

পরমানন্দ বলেছিলেন নমিনেশন তিনিই পেয়েছেন। এবার ভোটযুদ্ধে নেমে পড়বেন। তাই সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিতে যাবার আগে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছেন।

মনে আছে, গুরুদেব হেসে বলেছিলেন—হঠাৎ অ্যাসেম্‌ব্লিতে যেতে বাসনা হল যে?

সত্য কথাই স্বীকার করেছিলেন তিনি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে চান নিজ কর্মক্ষেত্র। এই শহরের ছোট্ট গণ্ডীর চতুঃসীমায় তাঁর দেশসেবার ঐকান্তিকতাকে তিনি সীমিত হতে দেবেন না। সমগ্র দেশের ভালোমন্দ নির্ভর করে যে আইনসভার নির্দেশে সেখানকার মণিকার হবেন তিনি—সে আহ্বান তিনি শুনতে পেয়েছেন—আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের নিমন্ত্রণ এসেছে—আরও বড়ধরনের কাজ!

—এখানকার কাজ কি তোমার শেষ হয়ে গিয়েছে?

কী শিশুর মতো সরল প্রশ্ন! কাজের কি শেষ আছে, যে শেষ হবে? এখানকার কাজ তো আছেই—আরও গুরুতর কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চান তিনি। কর্মযোগী পরমানন্দকে দেশ ডাকছে নির্দেশ দেবার জন্য, সে আমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে তাঁর কর্ণকুহরে। তাই রাজি হয়েছেন ইলেকশনে দাঁড়াতে। নূতন যাত্রাপথে অভিযাত্রার মঙ্গলমুহূর্তে তিনি উপদেশ নিতে এসেছেন গুরুদেবের পায়ের তলায় বসে।

উপদেশ দিয়েছিলেন গুরুদেব। কিন্তু খুব ভালো লাগেনি সেদিন কথাগুলি। বস্তুত তিনি আহতই হয়েছিলেন। কী ভাবেন আসলে গুরুদেব! হঠাৎ ও কথা বললেন কেন? পরমানন্দের অন্তরবাসী নির্লিপ্ত ত্যাগব্রতীর স্বরূপটা কি গোপন রইল গুরুদেবের মর্মভেদী দৃষ্টিতেও—তিনি কি দেখলেন শুধু অহমিকায় ভরা মোহান্ধ একজন ক্ষমতালিপ্সু সাধারণ ভোগীকেই? সেদিন তিনি নীরবে উঠে গিয়েছিলেন প্রণাম সেরে—খানিকটা আহত হয়েই। আজ মনে হয়, কিছুটা প্রয়োজন বোধ হয় ছিল তাঁর সেই উপাখ্যান পরিবেশনে। নীলাও তো ওই একই কথা বলে গেল।

—স্বার্থ বলতে আমি স্থূল কিছু বোঝাতে চাইছি না বাবা। টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি হচ্ছে স্থূল স্বার্থ—হয়তো সে লোভকে তুমি জয় করেছ—করেছ কিনা তা তুমিই জানো! আমি 'স্বার্থ' শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহার করেছি। অপরের চোখে নিজেকে মহৎরূপে প্রতিপন্ন করাও স্বার্থেরই অভিব্যক্তি। প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, সুনাম—এগুলোও কি স্বার্থ নয়, অহমিকার প্রকাশ নয়?

গুরুদেবের কাহিনীটা আবার মনে করতে লাগলেন। না, ভোলেননি তিনি। ভালো কথক ওঁর গুরুদেব। সামান্য উপাখ্যানও বাচনভঙ্গির গুণে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে ওঁর শ্রীমুখে। সেদিনকার গল্পটা মনে পড়েছে।

বলেছিলেন—প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। ফুল-ফল-পশু-পক্ষীতে সুন্দর সুষমায় পূর্ণ হয়ে উঠল সৃষ্টি। ক্রমে সৃজন করলেন মানুষ। ষোলো কলার ষোড়শ কলা যেন! নিপুণ চিত্রকর যেমন অনিমেষ নয়নে চেয়ে দেখে তার সদ্য-শেষ করা আলেখ্য—তেমনি একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলেন বিশ্বকর্মা তাঁর সুসমাপ্ত শিল্পকর্মের দিকে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। কী অপূর্ব তাঁর এ সৃষ্টি! তুষারশুভ্র ধ্যানস্তিমিত গিরিশৃঙ্গমালার স্তব্ধ গাম্ভীর্য, সমুদ্রমেখলা বেলাভূমির স্বর্ণসম্ভার, গহন অরণ্যের যোগমগ্ন মুনি, মৌন শান্ত জনপদ—অপূর্ব, অপূর্ব! মানুষের মুখে মাধুর্য, বুকে স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা। মায়ের বুকে মধুক্ষরা স্নেহধারা, বাসরঘরের দ্বারপ্রান্তে নববধূর লজ্জাজড়িত চরণক্ষেপ—আর শিশুর নিষ্পাপ সরল দৃষ্টি! তাঁর সৃষ্ট জগৎ বুঝি স্বর্গকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। নিজের প্রভূত সাফল্যে বিশ্বকর্মার মনে দেখা দিল অহঙ্কার। মনে হল, যে শিল্পচাতুর্য তিনি দেখিয়েছেন তা বুঝি স্বয়ং পরিকল্পনাকার প্রজাপতি ব্রহ্মার কল্পনাকেও অতিক্রম করে গেছে। জগৎ সৃষ্টির কাজ সুসম্পন্ন করার সংবাদ নিয়ে বিশ্বকর্মা এলেন ব্রহ্মলোকে—স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে।

ভগবান প্রজাপতি বললেন—সৃষ্টি শেষ হয়েছে?

করজোড়ে বিশ্বকর্মা নিবেদন করলেন—হ্যাঁ প্রভু। আমার শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ থাকতে আমি কখনও তৃপ্ত হতে পারি না। কোথাও কোনো খুঁত রাখিনি আমি। শ্রেষ্ঠ সাধনায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

ব্রহ্মা বললেন—মূঢ়! এত অল্পেই তোমার অহঙ্কার হয়েছে! মোহান্ধ হয়েছ বলে এতদূর থেকে ওই শিল্পকর্মের দোষত্রুটি তোমার নজরে আসছে না। তাই ওই পৃথিবীতেই তোমাকে নির্বাসিত করলাম। যাদের তুমি তৈরি করেছ—তাদের মধ্যে গিয়ে তুমি জন্ম নাও। তাদের জীবনের অপূর্ণতার বিষয়ে অবহিত হও—সেটা সংশোধনের চেষ্টা করো।

বিশ্বকর্মা মর্মাহত হলেন ; আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, তা হলে কি কোনদিন আর স্বর্গরাজ্যে ফিরে আসতে পারব না?

—যেদিন 'অহং'-জ্ঞান থেকে তোমার মুক্তি হবে—যেদিন বুঝতে পারবে নিজের ক্ষমতার সীমানা আর জাগতিক দুঃখ অতিক্রমণের উপায়—সেদিন স্বর্গরাজ্যের দ্বারে এসে করাঘাত কোরো। আমি তোমায় পরীক্ষা করব। উত্তীর্ণ হলে ফিরে পাবে স্বর্গবাসের অধিকার।

নির্বাসিত হলেন বিশ্বকর্মা। জন্ম নিলেন সাধারণ মানুষের ঘরে। দেখলেন তাঁর সৃষ্ট জগতে কোথায় কোথায় অপূর্ণতা রয়েছে। রোগ-শোক-মৃত্যুকে দেখলেন, লোভ-হিংসা-কামকে উপলব্ধি করলেন। সংসারের শত দুঃখকষ্টের মধ্যে জাগতিক যন্ত্রণার উপলব্ধি হল তাঁর। দূর থেকে যা মনে হয়েছিল চাঁদের মতো সুন্দর, কাছে এসে দেখলেন সেটা সমতল নয় মোটেই—সেখানে আছে উবড়োখাবড়া গর্ত প্রতি পদক্ষেপে—চাঁদের কলঙ্ক!

বিশ্বকর্মা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। কঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে কঠিন তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন। দীর্ঘ তপস্যার পর উপলব্ধি হল পরমব্রহ্মের পদে পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে পারলেই এগুলি থেকে মুক্তি সম্ভব।

ফিরে গেলেন তিনি স্বর্গদ্বারে। করাঘাত করলেন সিংহদরজায়। ভিতর থেকে প্রশ্ন হল— কে তুমি?

বিশ্বকর্মা বললেন—আমি বিশ্বকর্মা, পৃথিবী সৃজন করেছি। আমার সে সৃষ্টিকার্যের অপূর্ণতার কথা আমি জানতে পেরেছি। সেই অপূর্ণতার হাত থেকে মুক্তির উপায়ও উপলব্ধি করেছি। দ্বার খুলুন প্রভু।

অবরুদ্ধ স্বর্গদ্বার উন্মোচিত হল না।

বিশ্বকর্মা বিস্মিত হলেন। নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে। উত্তীর্ণ হতে পারেননি পরীক্ষায়। ফিরে এলেন তিনি। কঠিনতর তপস্যা করলেন। অন্নজল ত্যাগ করলেন—শুধু বায়ুভুক হয়ে সাধনায় মগ্ন রইলেন এক কল্পান্ত। ধীরে ধীরে নিজের ভুল আবার বুঝতে পারলেন। হ্যাঁ, ভুলই হয়েছিল তাঁর। 'আমি পৃথিবী সৃজন করেছি' এ জ্ঞান তো তখনও ছিল! আমি কে?

আবার ফিরে গেলেন স্বর্গের প্রবেশ তোরণে। করাঘাত করলেন দ্বারে।

ভিতর থেকে প্রশ্ন হল—কে এসেছ?

বিশ্বকর্মা বললেন : আমি বিশ্বকর্মা—আপনি আমাকে নিমিত্ত মাত্র করে যে পৃথিবী সৃজন করেছেন—তার ভিতর আমার ভুলে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। তাই আমার দোষে আপনার সৃষ্ট জগতে দেখে এলাম রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথের সন্ধান আমি পেয়েছি প্রভু। দ্বার খুলুন।

দ্বার অবরুদ্ধই রইল।

স্তম্ভিত হলেন বিশ্বকর্মা। এ কী! এখনও কি পূর্ণজ্ঞান হয়নি তাঁর? ফিরে এলেন মর্তে। এবার যে তপশ্চর্যা করলেন তার আর তুলনা নেই। বায়ু পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। নির্বিকল্প সমাধিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন যুগযুগান্ত। কঠিনতম যোগাভ্যাসে জ্ঞানমার্গের শিখরচূড়ায় উঠলেন অবশেষে। বুঝলেন কোথায় ভুল হচ্ছিল। যে জাগতিক দুঃখকষ্টকে তাঁর শিল্পকর্মের ত্রুটি বলে মনে হয়েছিল—আসলে তাও বিশ্বনিয়ন্তার সুপরিকল্পিত জগৎব্যবস্থার একটি পর্যায়। মায়ায় বদ্ধ মানুষ, অহংবোধের বেড়াজালে আবদ্ধ জীব এগুলিকে দুঃখকষ্ট বলে মনে করে মাত্র। অসীম নিয়ে যাঁর কারবার তাঁর হিসাবে লাভও নেই, লোকসানও নেই— না-যোগ, না-বিয়োগ, কিছুতেই তাঁর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। পূর্ণের পুঁজি থেকে গোটা পূর্ণ বিয়োগ দিয়ে দিলেও সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকবে। তিনি বুঝলেন শুধু আনন্দই আছে-আর কিছু নেই। তবে সে আনন্দের মূল উৎস—সেই সচ্চিদানন্দই!

বিশ্বকর্মা এবার দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে এসে দাঁড়ালেন স্বর্গদ্বারে। করাঘাত করামাত্র ভিতর থেকে অর্গল মোচনের শব্দ শোনা গেল। আশান্বিত হলেন বিশ্বকর্মা। দ্বার কিন্তু খুলল না; ভিতর থেকে প্রশ্ন হল– কে এসেছ?

–আমি বিশ্বকর্মা! প্রভু, আমি মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছি। এবার আর কোনো ভুল নেই। শুনুন–

সশব্দে অর্গল পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল কার যেন পদধ্বনি। বিশ্বকর্মার বক্তব্য পর্যন্ত শুনলেন না এবার প্রজাপতি ব্রহ্মা!

পরমানন্দ আর স্থির থাকতে পারেননি। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন– কেন? এবার কী ভুল হল বিশ্বকর্মার?

হেসে বক্তা বললেন–সেই কথাই ভাবলেন বিশ্বকর্মা। কোথায় ভুল হচ্ছে? কেন প্রশ্নের সমাধান পর্যন্ত শুনতে রাজি হলেন না প্রজাপতি ব্রহ্মা? ধীরে ধীরে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একখানি হাসি ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে। পুনরায় আঘাত করলেন তিনি দ্বারে।

যথানিয়মে ভিতর থেকে প্রশ্ন হল : কে এসেছ?

বিশ্বকর্মা হেসে বললেন : প্রভু। তুমি এসেছ!

আর কিছু বলতে হল না। দ্বার খুলে গেল!

পরমানন্দ ব্যগ্র উদ্দীপ্ত দু চোখ মেলে বসে থাকেন।

গুরুদেব বলেন : পরমানন্দ, এই হচ্ছে অহং থেকে মুক্তি। বিশ্বকর্মা শেষ পর্যায়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি অতি অকিঞ্চিৎকর, সমস্তই সেই অনাদি-অনন্তের লীলা। এ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সাফল্যেও তাঁর কৃতিত্ব নেই--এর আপাত দোষত্রুটিতেও নেই তাঁর লজ্জিত হবার কোনো কারণ। এ পর্যন্ত তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন–বাকি ছিল যেটুকু বোঝা যে তিনি নিজেও ওই সৃষ্টিকর্তারই একটি শিল্পকর্ম। তিনিও এ জগৎব্যাপারের একটি নিমিত্তরূপে সৃষ্ট হয়েছেন ওই প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায়। তিনিও তাই তাঁরই অংশ। তাই যখন 'আমি এসেছি' এ ভ্রান্তি পর্যন্ত অপনোদিত হল–তখনই তিনি স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাবার অধিকার পেলেন।

পরমানন্দ, এই হচ্ছে জ্ঞানযোগীর শেষ শিক্ষা। এই হচ্ছে অহংজ্ঞান থেকে প্রকৃত মুক্তি!

*　　　*　　　*

—সাহেব!

তন্দ্রার ঘোর থেকে জেগে ওঠেন যেন পরমানন্দ : কে?

–এটা খেয়ে নিন স্যার!

–কী ওটা?

–ডাবের জল।

আশ্রমের যে ভৃত্যটি ওঁকে মৃগচর্মের আসনে সমাদর করে বসিয়েছিল, মাসান্তে যে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় মাহিনা, সেই ছেলেটিই নিয়ে এসেছে কালো একটি পাথরের গেলাসে ডাবের জল। অত্যন্ত তৃষ্ণা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওটা গ্রহণ করেন। পানীয়টিতে শরীর শীতল হল।

হঠাৎ হাসি পেল পরমানন্দের। তাঁর পরিধানে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি–পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি–মৃগচর্মের আসনে তিনি বসে আছেন এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। তবু তাঁর পরিচয় হল 'সাহেব', 'স্যার'! উপকরণের যে দুর্গে তিনি বন্দি হয়ে আছেন এত সহজে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। শুধু বাইরের খোলসটাকে বদলালে যে কোনো লাভ হবে না– এই শিক্ষাই যেন দিতে এসেছিল ওই চাকরটি একগ্লাস ডাবের জল নিয়ে। যাঁর আশ্রমে এসে বসে আছেন এ তাঁরই সংঘটন। আনন্দস্বরূপ মাধবের পায়ে পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে হবে– অহংজ্ঞান থেকে মুক্ত হতে হবে একেবারে ওই বিশ্বকর্মার মতোই। না হলে মুক্তি নেই!

আশ্রমের ভৃত্যটিকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ছোট মহারাজ কখন বেরিয়েছেন?

–ঠাকুর দিদিমণিকে নিয়ে রওনা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি বেরিয়েছেন স্যার।

–দিদিমণি! কোন দিদিমণি?

– কেন, আমাদের দিদিমণি–নীলা দিদিমণি। কাল রাতে তো তিনি এখানেই ছিলেন। আজ এখানেই ছিলেন। আজ খুব ভোরে উঠে ঠাকুরের সঙ্গে কোথায় চলে গেলেন।

—নীলা কাল রাত্রে এখানে ছিল! আজ সকালে উঠে চলে গিয়েছে গুরুদেবের সঙ্গে! কোথায় গিয়েছে?

—তা তো জানি না স্যার। ছোট মহারাজ জানেন। সেই তো চিঠি নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি—আপনার ওখানেই গেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন পরমানন্দ। বুকের একটা পাষাণভার নেমে গেল। যাক, মেয়েটা তাহলে ওখানে যায়নি। তা কি যেতে পারে! হাজার হোক তাঁরই মেয়ে তো। মুখে গরম গরম বললেও সত্যিই কখনও লজ্জার মাথা খেয়ে ওই চোর-মাতাল-বদমায়েশগুলোর আড্ডায় গিয়ে রাত্রিযাপন করতে পারে?

—কাল রাত্রে সে কোন ঘরে ছিল?

চাকরটি ওঁকে নিয়ে যায় গুরুদেবের পাশের ঘরটিতে। ছোট্ট একখানি ঘর। একপাশে একটি চৌকি পাতা। গদি-তোষক নেই, শুধু সতরঞ্চির ওপর একটি সাদা চাদর পাতা। খেয়াল হল গদির কথা যখন অন্যমনস্কের মতো বসলেন চৌকিটাতে। বালিশটার মাঝখানে একটু বসে গিয়েছে। কোলে তুলে নিলেন সেটা—মাথার তেলের একটি মৃদু সৌরভ। বিছানায় পড়ে রয়েছে একটা লোহার কাঁটা। খোঁপায় গোঁজার মাথার কাঁটা। তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখেন সেটাকে। অনেকদিন আগে তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে রাত্রিবাস করতেন। এ ঘরেই থাকতেন তিনি তখন। চাকরটাকে বললেন : এ ঘরে গদি-আঁটা যে পালঙ্কটা ছিল—সেটা কোথায়?

—গুদামঘরে আছে স্যার!

—ও!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। আশ্চর্য। নীলা শেষ পর্যন্ত কাল রাত্রে আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল! এ কথা কল্পনাও করেননি তিনি। কী করে করবেন—তিনি তো জানতেন গুরুদেবকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না নীলা। ঈশ্বরবিশ্বাসী ওই উদাসীনের প্রতি তার ছিল একটি তীব্র অনীহা। একবার জোর করে মেয়েকে আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। নীলা আসতে চায়নি, তিনিই বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলেন। নাস্তিক কন্যাটিকে সাধুসঙ্গে সংশোধিত করতে চেয়েছিলেন। লাভ হয়নি। সে এসে মুখে মুখে তর্ক করেছিল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

—আপনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন?

—না মা!

—তবে যাকে জানেন না, যাকে উপলব্ধি করেননি, তার কথা পাঁচজনকে বলেন কেন? যা আছে কি নেই—তা আপনি নিজেই জানতে পারেননি—তার দিকে লোককে আকৃষ্ট করেন আপনি কোন অধিকারে?

—আমি তাঁকে পাইনি; কিন্তু তিনি তো অলভ্য নন। তাঁকে পাওয়া যায়।

—কেমন করে জানলেন?

—এমন মহাপুরুষ আছেন যিনি তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের স্বরূপ সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অনুভব করেছেন।

— কে সে? উদাহরণ দিন।

—আমাদের দেশের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা তাঁকে জেনেছিলেন, মা। যাঁরা উপনিষদের সামগান গেয়ে গেছেন—সেই দ্রষ্টা আর্যঋষিরা। যাঁরা বলতে পেরেছিলেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

—আর আমি যদি বলি তাঁরাও প্রকৃত সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানতে পারেননি? যদি বলি তাঁরা দল ভারী করবার উদ্দেশ্যে অনৃতভাষণ করেছিলেন?

শিউরে উঠেছিলেন পরমানন্দ। এ কী ভয়ঙ্কর কথা উচ্চারণ করল নীলা তর্কের ঝোঁকে। উদাসীন সন্ন্যাসী কিন্তু তিলমাত্র বিচলিত হন না, বলেন—তোমার এ কথা মনে হওয়ার হেতু?

— হেতু এই যে ওই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরাই বলেছেন 'যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্'—মন দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। বলেছেন 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ, ন বিদ্ম ন বিজানীমো'—তিনি অজ্ঞেয়, তিনি অবাঙমানসগোচর—সুতরাং হঠাৎ ভেলকি লাগাবার জন্য উপনিষদ্‌কার যদি বলে বসেন

'বেদাহমেতং'–তা তো আমি মেনে নেব না। আমি তাঁকে প্রশ্ন করব–কোনটা মিথ্যা আর কোনটা সত্য?

–দুটোই সত্য নীলা। দুটোই আপেক্ষিক সত্য। একটি সত্য তোমার-আমার প্রতি প্রযোজ্য– যারা সাধনার শেষ সোপান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি তাদের কাছে তিনি 'যন্মনসা ন মনুতে', আবার আর্যঋষিদের কাছে...

বাধা দিয়ে নীলা বলেছিল : সত্য আপেক্ষিক জাগতিক বিষয়বস্তুর। যেখানে বিচার্য বিষয় নিত্যসত্য – সেখানে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন আসে না। যিনি অমৃতের পুত্রদের ডেকে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন–তোমরা শোনো, আমি তাঁকে জেনেছি, তাঁর নাগাল পেলে তাঁরই তৈরি কেনোপনিষদের আর একটি মন্ত্র তাঁকে আমি শোনাতাম– 'যদি মন্যসে সুবেদেতি – দভ্রমেবাপি, নূনং তং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্।।' তুমি যদি মনে কর যে আমি তাঁকে জেনেছি– তাহলে আমি বলব সে জ্ঞান তোমার দভ্র– অল্পমাত্র; কারণ ব্রহ্মের যে রূপ উপলব্ধিগোচর তা সামান্যতম অংশমাত্র– অতএব তোমার ব্রহ্মজ্ঞান, যা নিয়ে তুমি 'বেদাহমেতং' বলে বড়াই করছ, তাও মীমাংসার অপেক্ষা রাখে।

নীলার সামনেই পরমানন্দ গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন : অপরাধটা আমারই। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ও এসে এভাবে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে বসবে। আমি বুঝতে পারিনি যে আপনার উপদেশ শুনতে আসার যোগ্যতাও অর্জন করেনি নীলা।

গুরুদেব হেসে বলেছিলেন–তুমি ভুল করছ পরমানন্দ। নীলা তোমার চেয়েও আর এক ধাপ এগিয়ে আছে সাধনমার্গে। ওর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে চৌম্বকবৃত্তি। যে আকর্ষণে জীবাত্মা ছুটে যায় পরমাত্মার দিকে সেই শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ওর অন্তরে–শুধুমাত্র বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে চুম্বকখণ্ড। একদিন নেমে আসবে চরম আঘাত – দিক-পরিবর্তন করবে ওর মনের চুম্বক– বিকর্ষণ পরিণত হবে আকর্ষণে। সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষাতেই আমি প্রহর গুণব নীলা-মা। তাই আজ তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।

নীলার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে অপ্রত্যয়ের একচিলতে হাসি। ব্যঙ্গবিদ্রূপের কি? হাতদুটি এক করে সে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ায়। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে না।

গুরুদেব বলেছিলেন–আর কিছু বলবে আমায়?

–বলব। শুধু বলব 'নেদং যদিদমুপাসতে!'

মাটির সঙ্গে লজ্জায় মিশে গিয়েছিলেন পরমানন্দ, বিদ্রোহী আত্মজার এই স্পর্ধায়।

গুরুদেব এবারও হেসে প্রত্যুত্তর করেছিলেন– আর আমি বলব :

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।।

দুঃখের আগুনে আমাদের অন্তরের সমস্ত কলুষ তুমি পুড়িয়ে ছাই করে দাও, হে অগ্নিদেব। আমাদের কুটিল মনের সমস্ত পাপের সন্ধানই তো তুমি জানো – এ থেকে আমাদের তুমি মুক্ত করো–তোমাকে আমরা বারংবার প্রমাণ করছি।

যুক্তকর তিনি ললাটে স্পর্শ করেছিলেন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে।

সেই নীলা কি শেষ পর্যন্ত এখানে এসেছে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে? চরম আঘাতটা সে পেল কখন–না হলে চুম্বকখণ্ড দিক পরিবর্তন করে কেমন করে? কোন দুঃখের আগুনে ওর অন্তঃকরণের সমস্ত কুটিল পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গেল?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। না, আর অপেক্ষা করা চলে না। বেলা একটা বাজে। উঠলেন। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে আবার নেমে পড়লেন রৌদ্রদীপ্ত পথে। বাড়িতেই ফিরে যেতে হবে তাঁকে। ছোট মহারাজের সঙ্গে এই মুহূর্তে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন।

খর রৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল। কী ক্লান্তিকর এই পথটা। এখনও

হয়তো বাবলা গাছের ঘুঘুটা চুপ করেনি—মেঠো ঘরের ঘুমপাড়ানিয়ার রেশ নিঃশেষিত হয়নি স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অনলবর্ষী আকাশে বাতাসে। মিশকালো মোষটা তখনও পড়ে ছিল গা এলিয়ে নয়ানজুলির ঘিয়ে রঙের কাদায়। পরমানন্দের কিন্তু দৃষ্টিগোচরই হল না এ-সব। মিহি খদ্দরের সুবাসিত রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কাঁচা পথটা পার হয়ে এসে উঠলেন পিচগলা বড় রাস্তায়।

—এই রিকশা !

বাঁচা গেল। আর হাঁটতে হবে না তাহলে। বাড়িই ফিরে চললেন অবশেষে।

একটা কথা তাঁর বার বার মনে হচ্ছে আজকে। রিকশায় বসে কথাটা ভালো করে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন। দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। যাতে হাত দিয়েছেন—সোনা ফলিয়ে ছেড়েছেন। অদ্ভুত দৃঢ়তাও ছিল তাঁর চরিত্রে। যা ভালো বুঝেছেন তাই করে এসেছেন আজীবন। কিন্তু তবু— নিশ্চয়ই কোথাও ফাঁকি ছিল। নিশ্চয়ই নিষ্ঠার অভাব ছিল তাঁর। এতদিন মনকে বলে এসেছেন— পেয়েছি! পেয়েছি! যা পেতে চেয়েছি জীবনে তা লাভ না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হইনি কোনোদিন! .... আজ হঠাৎ মনে হল সত্যিই কি তাই? — কী পেয়েছেন তিনি? কিছুই তো পাওয়া হয়নি। প্রথম যৌবনে মিশেছিলেন বিপ্লবীদের দলে— দেশোদ্ধারের মহান উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প করেছিলেন; কিন্তু কী হল? প্রবাসে গিয়ে সে পথ ছাড়তে বাধ্য হলেন। শল্য-চিকিৎসার ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এলেন ভালোমানুষের মতো! তারপর স্থির করলেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলবেন জীবনে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে রীতিমত সংসারী হবেন তিনি। দেশের সেবা করবেন—আরোগ্য-নিকেতনে। রোগীর রোগমুক্তিতে, আর্তের সেবায় তৃপ্ত হবে তাঁর দেশসেবার কামনা। মিস গ্রেহাম আর অ্যানির সাহচর্যে গড়ে তুললেন এক অপরূপ আরোগ্য-নিকেতন। বুকের পাঁজরের চেয়েও ভালোবাসলেন তাকে। প্রতিজ্ঞা করলেন এই হবে তাঁর স্বপ্ন, সাধনা! পারলেন? এখানেও ব্যর্থ হলেন তিনি। আরোগ্য-নিকেতন আজ কোম্পানির সম্পত্তি। নার্সিং হোম আজও আছে, কিন্তু তাঁর স্বপ্নসাধনার শেষবিন্দু পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। রাজনীতিকে পরিহার করবার সঙ্কল্পও রক্ষিত হল না। কারাজীবন শেষ করে এসে স্থির করলেন ধর্মকর্মে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। মেতে রইলেন কিছুদিন গুরুদেব আর তাঁর আশ্রম নিয়ে। কিন্তু টিকে থাকতে পারলেন না। ফিরে যেতে হল কর্মক্ষেত্রে— রাজনৈতিক চক্রে। এখন তিনি পুরোপুরি ভোগী। মুখে বলেন বটে যে দেশসেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য— কিন্তু সত্যিই কি তাই?

— হ্যাঁ নিশ্চয়ই!

পূর্বপক্ষের জবাব দিতে উত্তরপক্ষ উঠে বসল কোমর বেঁধে ওঁর মনের মধ্যে।

— কেন নয়? এই যে দিনের মধ্যে বারো-চোদ্দ ঘন্টা তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়—এর কী উদ্দেশ্য? কেন তিনি যুক্ত আছেন বার্টন অ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির সঙ্গে? ডিভিডেন্ডের লোভে? এককালে ম্যানেজিং ডাইরেকটরশীপ হাতে আসবে এই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে? তা তো নয়। তিনি চাইছেন এটাকে একটা আদর্শ কারখানাতে রূপান্তরিত করতে। কুলি-ব্যারাকে ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা আছে কটা ফ্যাকটরিতে? কিন্তু আছে সে ব্যবস্থা ওঁদের এখানে। তিনিই এটা বাধ্য করেছিলেন বোর্ডকে মেনে নিতে। ওদের চীপ ক্যান্টিনটাও তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। কোম্পানি সাবসিডি দেয় ক্যান্টিনকে। কেন দেয়? কে সে ব্যবস্থা করেছে? মনে পড়ছে, ওই স্বল্পমূল্যের ক্যান্টিনটি যেদিন খোলা হয় সেদিন অনেক বড় বড় লোক এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। ক্যান্টিনের সঙ্গে ক্লাবঘরও আছে— সেখানে আছে রেডিও, সংবাদপত্র, নানা রকম খেলার সরঞ্জাম, ব্যায়ামাগার। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অভ্যাগতরা। এমন কুলি-ব্যারাক সত্যই দেখা যায় না কোথাও। ঝকমক করছে পরিষ্কার পাকা রাস্তা, পাকা নর্দমা, রাস্তায় বিজলীবাতি— ক্লাবঘরে শ্রমিকেরা ক্যারাম খেলছে, তাশ খেলছে, ঢোল, খঞ্জনি, করতাল দেওয়া হয়েছে ওদের। ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করছে স্বাস্থ্যবান শ্রমিকেরা। সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সেদিন পরমানন্দকে— তিনিই এ-সব করিয়েছেন কোম্পানিকে দিয়ে। যারা এ কারখানার প্রাণ সেই মেহনতী মানুষরাই যদি ভালোভাবে না বাঁচতে পারল তবে কী দেশের সেবা করছেন তিনি এ কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে?

সেই দেশসেবাকেই বিস্তৃততর করে দেবেন তিনি অ্যাসেমব্লিতে গিয়ে— এই ছিল কামনা।

মনে আছে নীলা এই সেদিন বলেছিল– আচ্ছা বাবা, তুমি তো সারাদিন খদ্দর পর না, তাহলে মিটিঙে যাবার সময় এগুলো বার করে পর কেন?

রুক্ষস্বরে উনি প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন : কেন, তাতে কী হয়েছে?

–তুমি কি এটাকে একটা অন্যায় মনে করো না? এটা কি একটা লোকদেখানো 'শো' নয়?

– না নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে ইউনিফর্ম পরতে হয় বলে সৈনিকেরা কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনেও ইউনিফর্ম পরে থাকে না। বিচারালয়ে গাউন আর হুইগ পরতে হয় বলে সারাদিন সেটা পরিধান করে থাকার কোনো যুক্তি নেই।

রিকশাখানা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় ওঁর বাড়ির সামনে। নন্দ বেয়ারা ছুটে আসে কাছে।

– আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?

– হ্যাঁ স্যার, আশ্রম থেকে ছোট মহারাজ এসেছিলেন। তা আমি বললাম, আপনি কাকাবাবুর গাড়িতে বেরিয়েছেন– শুনে উনি সেখানেই গেলেন।

– সেখানে মানে?

–কাকাবাবুর বাসায়।

–হুঁ! একখানা চিঠি রেখে গেছেন কি?

– আজ্ঞে না।

–ইডিয়ট!

নন্দ চমকে উঠে। বুঝতে পারে না গালাগালটা কার ওপর বর্ষিত হল। পরমানন্দ রিকশাওয়ালাকে বলেন : ঘোরাও!

– আপনার লাঞ্চ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে নন্দ।

– ছোট মহারাজ যদি আবার আসেন তবে চিঠিখানা চেয়ে রাখিস।

–রাখব স্যার। আপনি খেয়ে যাবেন না?

– না, চলো।

রিকশা বেরিয়ে এল আবার রাস্তায়। চলল ননীমাধবের বাড়ির দিকে। হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন। দুটো পাঁচ। আশ্চর্য! এখনও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না মেয়েটার! কালরাত্রে সে আশ্রমে ছিল– কতকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আজ সকালে উঠে কোথায় গেল? আত্মীয়বন্ধু কারও কথা মনে পড়ল না পরমানন্দের যেখানে গিয়ে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে পারে নীলা। এক ছিল ননীমাধবের বাড়ি। কিন্তু সেখানে সে যায়নি। গেলে উনি সংবাদ পেতেন।

...হ্যাঁ, আর একটা সম্ভাবনা আছে। পি-নাইন ব্যারাক। কথাটা মনে হতেই আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে ওঁর। মনে পড়ে গেল সেই উদ্ধত ছেলেটির বিদ্রোহী মূর্তি। একমাথা রুক্ষ চুল। পরিধানে একটা নীল পায়জামা। চেককাটা একটা হাফশার্ট গায়ে– কাঁধের কাছে ফেঁসে গেছে। শার্টের নীচে যে গেঞ্জি নেই–তা বোঝা যায় ওই ছিন্ন অংশটা দিয়ে। চেককাটা হ্যান্ডলুমের সস্তা কামিজটায় লেগেছে ছোপ-ছোপ মবিল কিংবা গ্রীজ–চটচট করছে সেটা। একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দু হাতে ময়লা।

অফিস ঘরে ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল ওই অপরূপ মূর্তিটা।

–কাল আমার গাড়ি আটক করে কী বলতে চেয়েছিলেন?

লোকটা চেপে বসে ভিজিটার্স চেয়ারে। আশ্চর্য সাহস তো! উনি ইচ্ছা করেই 'আপনি' বলে কথা বলেছিলেন। সম্মান দেখাতে নয়–কারখানার কোনো মেহনতী মানুষের সঙ্গেই এ ভাষায় তিনি কথা বলেন না। লোকটা যদিও পদচ্যুত কর্মী, কারখানার মজুর আর সে নয়; কিন্তু সেজন্যও 'আপনি' বলে কথা শুরু করেননি তিনি। তিনি শুধু একটু দূরত্ব রাখতে চেয়েছিলেন মাত্র–পাছে 'তুমি' বলে কথা বললে সে পূর্বপরিচয়সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। লোকটা এই সুযোগে অম্লানবদনে বসে পড়ল সামনের চেয়ারে। বসে যখন পড়েইছে তখন আর উঠতে বলা যায় না।

–আমার ওপর অবিচার করা হয়েছে। তাই আপনার কাছে আমি সুবিচার চাইতে এসেছি। আমাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে অন্যায়ভাবে।

–না। তোমার কেসটা আমি নিজে দেখেছি। এ অপরাধে কর্মীকে পদচ্যুত না করলে কারখানা

চালানো যায় না। তোমার বিরুদ্ধে চুরির চার্জ আছে—এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

—আপনি এটা বিশ্বাস করেন?

—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। মেশিন পার্টসগুলো তোমার ঘর সার্চ করবার সময় পাওয়া গেছে। অন্তত দশ-পনেরো জন সাক্ষী ছিল সার্চ করার সময়। অন্য কেউ চুরি করে তোমার ঘরে ওভাবে সেগুলি লুকিয়ে রাখতে যাবে কেন? এর চেয়ে ডাইরেক্ট এভিডেন্স আর কী হতে পারে?

—এভিডেন্সের কথা হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন, আপনি এটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছেন কিনা? আপনি আমার পূর্ব-ইতিহাস জানেন—তাই জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব?

—করি। বিশ্বাস করি। অভাবে স্বভাব নষ্ট – কথাটার তুমি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—শুধু অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয় না ডক্টর চৌধুরী— প্রাচুর্যেও সেটা নষ্ট হয়ে থাকে— তারও উজ্জ্বলতম প্রমাণ আমি দেখাতে পারি। কিন্তু সে কথা যাক। আমি বলছিলাম— যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই চুরির কেসটা সাজিয়েছেন সে উদ্দেশ্য কিন্তু এতে সিদ্ধ হবে না।

– তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে আশা করি। তুমি যেতে পারো।

– না হয়নি। আমি শেষবারের মতো আপনাকে জানাতে এসেছি আমাদের মাথায় পা দিয়ে এভাবে চিরকাল আপনারা চলতে পারবেন না। আমাকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কারখানা থেকেও কৌশলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন আপনি। কারখানার আপনি মালিক, আমাকে যে কোনো অজুহাতে আপনি তাড়াতে পারেন, কিন্তু তা হলেও এ শহর ছেড়ে আমি চলে যাব না। এতে আপনার এবং আপনার বন্ধুর কারও উদ্দেশ্যই সফল হবে না।

ওর দুর্জয় স্পর্ধা দেখে মনে মনে হেসেছিলেন। মুখে বলেছিলেন —তাই নাকি? তা কে আমার বন্ধু? আর আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই বা কী?

– আপনার বন্ধু ননীমাধব মনে করেছেন আমাকে তাড়াতে পারলে মজদুর ঐক্য ভেঙে পড়বে—ইউনিয়ন গঠনের দাবিটা চাপা দিতে পারবেন। আর আপনি ভেবেছেন আমাকে আপনার কন্যার চোখের আড়ালে—

—শাট আপ! য়ু স্কাউন্ড্রেল! বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে।

– যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই আপনাকে। বিদ্রোহী মজদুরই বলুন আর বিদ্রোহী আত্মজাই বলুন—মিটমাট করবার দিন আপনাকে ফিরে ডাকতে হবে এই অরুণাভ নন্দীকেই!

ইলেকট্রিক কলিং বেলটার গলা টিপে ধরেছিলেন পরমানন্দ। একটানা আর্তনাদ করে চলেছিল কলিং বেলটা—মৃত্যুযন্ত্রণায়। এক সঙ্গে তিনজন বেয়ারা এসে ঢুকল ঘরে-সাহেবের খিদমত করতে। ওরা এসে দেখে সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুইং-ডোরটার দিকে। ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাউপাতার মতো কাঁপছে সেটা। আর কেউ নেই ঘরে।

ওই হতভাগাটার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নীলা! এ কি বিশ্বাস্য?

ননীমাধবের বাড়িতে এসে দেখেন গৃহকর্তা তখনও ফিরে আসেননি। দীপক ছিল। সে বলে— এ কী, আপনি? একা?

—হ্যাঁ, ছোট মহারাজ এসেছিলন আমার খোঁজে?

দীপকের কাছে জানা গেল তিনি এখানেও এসেছিলেন পরমানন্দের সন্ধানে, দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন। চিঠি? না কোনো চিঠি রেখে যাননি।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। সকাল থেকে পাগলের মতো কেবল ছোটাছুটিই করে বেড়াচ্ছেন। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন : তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, বোসো।

সামনের সোফাটায় বসে দীপক প্রতিপ্রশ্ন করে—আপনার আহারাদি হয়েছে তো?

—না, এবার বাড়ি গিয়ে খাব।

– সে কী, তারিণীদার ওখানে না আজ আপনার মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা? বাবা তো তাই বলে গেলেন।

ঠিক কথা। মনে পড়ে গেল পরমানন্দের। বাড়িতে সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। দীপককে

বলেন—তুমি তারিণীদাকে একটু ফোন করে জানিয়ে দিও— একটা বিশেষ জরুরি কাজে আমি আটকে পড়েছি। যেতে পারব না।

— বেশ, বলে দেব। আমার সঙ্গে কী কথা আছে বলছিলেন?

—হ্যাঁ, নীলা কি কাল রাতে অথবা আজ সকালে এখানে এসেছিল?

—কই না তো, কেন বলুন তো?

—নীলার সঙ্গে তোমার শেষ কখন দেখা হয়েছে?

— তা চার-পাঁচ দিন হবে। কেন?

একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—অনেকদিন আগে তুমি বলেছিলে নীলার মন অন্যত্র বাঁধা আছে। জিনিসটা আমি আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই।

এইবার চুপ করে থাকার পালা দীপকের। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর জানলার বাইরে কোনো দুর্নিরীক্ষ্য দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে আত্মগতভাবে বলে যায় বক্তব্য তার : জিনিসটা আরও আগে হয়তো আপনাকে জানানো উচিত ছিল আমার। আকারে-ইঙ্গিতে অবশ্য জানিয়েছি। স্পষ্ট করে বলিনি—দুটো কারণে, প্রথমত আমি ভেবেছিলাম আপনি সবই জানেন—কিছুই অজ্ঞাত নেই আপনার কাছে। দ্বিতীয়ত আমি মনে করেছিলাম প্রসঙ্গটা আমার তরফে সঙ্কোচের, লজ্জার। কিন্তু পরে ভেবে মনে হয়েছে, সত্যিই আমার লজ্জা পাওয়ার কিছু ছিল কি? আমি নীলাকে ভালোবাসতে পেরেছিলাম—এটা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে লজ্জার কথা নয়। সে পারেনি, সেটাও আমার অপরাধ নয়। কিন্তু ওর মন কোথায় বাঁধা আছে তা অনেক অনেক দিন আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম আমি। আপনাকে জানানো কর্তব্য ছিল আমার। জানাইনি, কারণ আমি আশা করেছিলাম, ওর মন বদলে যাবে। সে মানুষটা নেপথ্যে রয়ে গেল চিরকাল— তার এক সপ্তাহের উপস্থিতির প্রভাব আমি কাটিয়ে উঠতে পারব না, এক যুগের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, অকৃতকার্য হয়েছিলাম আমি। তারও কারণ ছিল। অসীমের শূন্য স্থানটা পূর্ণ করার একটা অবচেতন প্রেরণা ছিল নীলার মনের অন্তরতম কোণে। আমাকে তাই এনে বসিয়েছিল সেই শূন্য আসনে। তাই আমার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে, বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে, প্রীতি-সৌহার্দ্যের আদান- প্রদান চলেছে, কিন্তু সেই নেপথ্যবাসীকে একচুল বিচ্যুত করতে পারিনি আমি। এ-সব আপনাকে কেমন করে বলি? তবু হয়তো সব কথা একদিন খুলে বলতাম—যদি না শেষদিকে খবর পেতাম অরুণাভের প্রতি আপনাদের সাম্প্রতিক আচরণের কথা। বাবার কাছে আমি শুনলাম দীর্ঘ কারাবাসের পর সাত রাজ্য ঘুরে অরুণাভ এখানে এসে পৌঁছেছিল। সে নাকি প্রথমেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে—কিন্তু আপনি দেখা করেননি। আপনার বাড়ির দরজা থেকে অরুণাভ ফিরে যায়। যে ছেলেটির জন্যে আপনি সব কিছু একদিন ত্যাগ করেছিলেন, কেন তাকে আপনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না, তা আমি আজও জানি না। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি দুরন্ত অভিমানেই এই অপমান করেছিলেন তাকে। ওই ছেলেটির জন্যেই আপনার সুখের সংসার ভেঙে গিয়েছিল—ওর জন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে অসীমকে—তাই ওকে সহ্য করতে পারেননি আপনি। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সেটা আসল কারণ নয়—আপনি ওকে নীলার সান্নিধ্যে আসতে দেননি। তাই ভেবেছিলাম-আজ আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করছেন সেটা বাহুল্য মাত্র। তবু প্রশ্ন যখন আজ আপনি করেছেন তখন আমাকে ধরে নিতে হবে যে নীলার মন কোথায় বাঁধা পড়েছে তা আপনার অজানা। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই সব জানতাম। নীলার সঙ্গে ওর গোপন পত্রালাপ চলত কিনা আমি জানি না, শুধু এটুকুই জেনেছিলাম যে অপেক্ষা করবে বলে ওরা পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুত ছিল। মাত্র সাত দিনের সান্নিধ্যে কেমন করে ওরা এত দ্রুত এত গভীরভাবে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারল তাও আমার ধারণার বাইরে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে সেদিন থেকে ওর মন দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মতো একমুখে প্রতীক্ষা করছিল অরুণাভের প্রত্যাবর্তনের। তার পরের ঘটনা আপনি ভালো করেই জানেন, হয়তো আমার চেয়ে বেশিই জানেন। অরুণাভ আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারেনি, কিন্তু ঢুকেছিল কারখানায়। নাম লেখায় সে ফ্যাকটরির মজদুর লিস্টের রেজিস্টারে। শুধু যে রোজগারের ধান্দাতেই সে এসেছিল এ কথা মনে করি না। অবশ্য তার আসল লক্ষ্যটা কিসের ওপর ছিল সে কথাও ঠিক জানি না। সম্ভবত অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা দুটির ওপরই ছিল তার

সমান লোভ। জিনিসটা ঘনিয়ে উঠছিল অলক্ষ্যে। প্রথম নজরে পড়ে বাবার। তিনিই তাকে প্রথম চিনতে পারেন। অবশ্য তার আগেই তাকে চিনতে পেরেছিল নীলা। সে যাই হোক, দেখলাম বাবা ওকে তাড়াবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর কী কথাবার্তা হয় তা আমি জানি না, কিন্তু দেখলাম ছেলেটিকে তাড়ানোর ব্যবস্থাটা পাকা হল। চুরির দায়ে ধরা পড়ল শ্রমিকনেতা। বাবার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকে না—প্রমাণিত হয়ে গেল অরুণাভ নন্দী একজন চোর।

পরমানন্দ ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন : এ কথার মানে? তুমি কি বলতে চাও চুরির কেসটা সাজানো? ননীই ওটা সাজিয়েছে?

—বাবা সাজিয়েছেন কি আপনি সাজিয়েছেন তা নিশ্চিত কেমন করে বলব বলুন—তবে এটা তো আপনিও স্বীকার করবেন যে অরুণাভ নন্দী আর যাই করুক চুরি করবে না!

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন বৃদ্ধ।

নীরবতা ভঙ্গ করে দীপকই আবার; ক্ষোভম্লান কণ্ঠে যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে ওঠে: আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন বুঝতে পারি যে শুধু শ্রমিকবিদ্রোহ এড়াবার জন্যে বাবা এ কাজটা করেননি—তিনি এ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছেন আরও জঘন্য স্বার্থের খাতিরে। তার মধ্যে নিজেকে জড়িত বুঝতে পেরে আমি নীলার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারি না।

— তুমি কী বলতে চাইছ দীপক?

আমি বলছি—এই চুরির কেসটা সাজানোর ব্যাপারে আপনার যে অবদান তার তবু একটা অর্থ হয়। —নীলাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য, হয়তো সেইজন্য এ অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছেন আপনি। কিন্তু বাবা? তিনি ওকে তাড়াতে চেয়েছেন শ্রমিকবিদ্রোহের কথা ভেবে নয়—আমার জন্যে! এ লজ্জা আমি ভুলি কী করে?

পরমানন্দ ধীরে ধীরে বলেন—নীলা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দীপক!

— চলে গেছে! মানে? কখন? কোথায়?

ওর কাছে বুকের ভার নামাতে থাকেন পরমানন্দ। উনি বুঝতে পেরেছেন এ ছেলেটি সত্যিই ভালোবাসে নীলাকে। দীপক চুপ করে শোনে সব কথা।

পরমানন্দ শেষে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার কি মনে হয় ও অরুণাভের ওখানে গিয়েছে?

—অসম্ভব নয়।

— তবে সেখানেই চললাম আমি।

দীপক উত্তেজিতভাবে ওঁকে বাধা দেয়—অমন কাজও করবেন না জ্যাঠামশাই। ওরা ধর্মঘট করেছে—এখানে-ওখানে মিটিঙ হচ্ছে। আপনাকে একলা পেলে ওরা ভালোমন্দ কিছু একটা করে বসতে পারে। আপনি বরং বাড়ি ফিরে যান। আমি খোঁজ নিচ্ছি লোক পাঠিয়ে।

* * *

ননীমাধবের বাড়ি থেকে আবার রিকশা চেপে বেরিয়ে পড়েন উনি। অনলবর্ষী সূর্য তখন ঢলে পড়েছেন পশ্চিম দিগন্তে। চারটে বেজে গেছে। ক্লান্ত দেহটা রিকশায় এলিয়ে দিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তার আর পারম্পর্য থাকছে না। কখনও মনে পড়ছে অসীমকে—কখনও বৈশাখীকে, কখনও অ্যানির মুখখানা ভেসে উঠছে মনের পটে। নীলা? না, নীলার কথা আর তিনি ভাববেন না। যে মেয়ে তার বাপের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে কুলি-ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আর।

অরুণাভ তাহলে সত্যিই চুরি করেনি! এটা তাহলে ননীমাধবের একটা কারসাজি! ননীমাধব তাহলে ঠিকই চিনেছিলেন পরমানন্দকে! তাই আসল কথাটা তাঁর কাছেও গোপন রেখে গেছেন। প্রথমটা রাগ হয়েছিল ননীমাধবের ওপর— এই হীন কাজের জন্যে। এখন কিন্তু আর রাগটা নেই—মনে হচ্ছে ওই ননীমাধবই তো একমাত্র লোক যে সম্মান করেছে তাঁর আদর্শনিষ্ঠাকে। সাহস করে বলতেও পারেনি সাজানো চুরির কেসের কথাটা। কিন্তু অরুণাভ চুরি করুক আর নাই করুক— সে জন্য তো তাঁর আপত্তি নয়। তাঁর আপত্তি হচ্ছে অন্য কারণে। আজ তিনি আর অরুণাভ নন্দী এক নৌকার যাত্রী নন। তিনি চলেছেন ভাঁটিতে আর অরুণাভ উজানে। তিনি চাইছেন দেশের শিল্প-উন্নয়নের পথ প্রশস্ত

করতে। শ্রমিক আর মালিক হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুলবে নতুন নতুন শিল্পসম্ভার। বিদেশী মুদ্রা আহরণ করতে হবে! নামতে হবে বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত হবে শ্রমিক-মালিকের যৌথ প্রচেষ্টায়। এ জন্যে অবশ্য স্বার্থত্যাগ করতে হবে দু পক্ষকেই। শ্রমিককে দিতে হবে জীবনধারণের উপযুক্ত পরিবেশ। শুধু জীবনধারণ নয়– উন্নততর জীবনযাপনের। ওদের জীবনের মান উন্নয়ন করতে হবে। তাই তো উনি ব্যবস্থা করেছেন কুলি-ব্যারাকে পাকা রাস্তা, পাকা নর্দমা,–ব্যবস্থা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষার, স্বাস্থ্যরক্ষার। শ্রমিকও দেখবে বৈকি মালিকের স্বার্থ। ওঁর কারখানার লোকেরাও ওঁকে দেবতার মতো ভক্তি করে। চীপ ক্যান্টিন খোলার দিন ওঁকে ওরা পরিয়ে দিয়েছিল একটা মোটা গাঁদাফুলের মালা।

অরুণাভ কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখছে জিনিসটা। সে চায় ধর্মঘট করে, চাপ দিয়ে, শ্রমিক ইউনিয়ন পাকিয়ে মালিককে শায়েস্তা করতে। বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সে স্বীকার করে না। শ্রমিক আর মালিক যেন খাদ্য আর খাদক! আশ্চর্য! সে কোনো আপস চায় না– সে শুধু লড়তেই চায়। আর এই লড়াইয়ের জন্য যদি কারখানাটা বন্ধও থাকে কিছুদিন– দেশের শিল্প-উৎপাদন ব্যাহত হয়– তাতেও সে দুঃখিত নয়।

এই আদর্শগত বিভেদের জন্যই আজ তিনি ক্ষমা করতে পারেন না অরুণাভকে। সহ্য করতে পারেন না তার উদ্ধত বিদ্রোহীর ভঙ্গিটা।

– এই রোখো! রোখো!

দাঁড়িয়ে পড়ে রিকশাটা। রিকশাওয়ালাকে বলেন হুডটা তুলে দিতে। পড়ন্ত রোদে বড় কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। রিকশাওয়ালা হুডটা তুলে দেয়। গাড়িটা চলছিল পশ্চিমমুখো; সূর্য দিগ্বলয়ে হেলে পড়েছেন। হুড তুলে দেওয়াতেও রোদটা আটকাল না। সামনে থেকে রোদ লাগছে। রিকশাওয়ালা সামনের পর্দাটা ফেলে দেয়। ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়লেন উনি। হঠাৎ একটা কথা মনে হল তাঁর। রিকশাওয়ালাকে বললেন বাঁ দিকের রাস্তায় ঘুরে যেতে। কুলিবস্তিতেই যাবেন তিনি একবার। ঘেরাটোপের মানুষকে আর কে চিনবে? বরং রিকশা থেকে নামবেনই না; রিকশাওয়ালাকে দিয়েই খোঁজ নেবেন।

বাঁ দিকের কাঁচা সড়কে নামল রিকশাটা। এঁকেবেঁকে চলল কুলি-ব্যারাকের দিকে। এ পথে তিনি কখনও আসেননি ইতিপূর্বে। আসবার প্রয়োজনও হয়নি। তিনি ওপরতলার বাসিন্দা–নীচের মহলের খবরদারির প্রয়োজন হলে লেবার-স্ট্যাটিসটিক্স-এর প্রোফর্মাটাই দেখেন। সেই চার্ট থেকেই জানতে পারেন লেবার ব্যারাকের সংবাদ। আজ এখানে তাঁকে আসতে হয়েছে প্রাণের দায়ে। মনে পড়ছে ঠিক এ পথে না এলেও এ পাড়ায় একদিন এসেছিলেন তিনি, যেদিন চীপ ক্যান্টিনটা খোলা হয়। তিনি একা নন–অনেক গণ্যমান্য অতিথিই এসেছিলেন সেদিন। রাস্তাগুলো ছিল ঝকঝকে–নর্দমাগুলো ছিল পরিষ্কার। কিছু দূরে দূরে বসানো ছিল সাদা-কালো ডোরাকাটা ড্রাম–অর্থাৎ ডাস্টবিন। সমস্ত এলাকাটা লাগছিল যেন চিত্রকরের আঁকা একখানা সুন্দর ছবি। মনে আছে সেদিন মনে মনে তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন। বস্তিজীবনের যে চিত্র দেশী-বিদেশী উপন্যাসে পড়া ছিল–তার সঙ্গে আসমান-জমিন পার্থক্য লক্ষ করেছিলেন তাঁদের কারখানার। খুশি হয়েছিলেন।

আজ বুঝতে পারছেন ভুলটা।

রাজ্যের আবর্জনা এসে জমেছে পথে। নর্দমাগুলো ভরে আছে নীলচে কালো থকথকে কাদা-জলে। একটা কালভার্ট মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের ওপর। নামতে হল অগত্যা। জলপ্রবাহ আটকে গেছে এখানে। একটা কুকুর চাপা পড়েছে লরিতে। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয় চার-পাঁচ দিন পূর্বেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে বেচারির–যদিচ তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়নি এখনও। পথে লোকজন নেই। কয়েকটা শকুন এসে নেমেছে এই সুযোগে। অনেক মড়াকাটার অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে ডাক্তার চৌধুরীর গা গুলিয়ে উঠল। খালি পেটে আছেন বলে কি? হর্ন দিতে দিতে একখানা ময়লা-ফেলা লরি এসে পড়ল প্রায় ঘাড়ের ওপর। রিকশাটা কাদায় নেমে পাশ দিল। পাশ দিয়ে চলে গেল লরিটা। কয়েকটা কাদামাখা শালপাতা উড়ে এসে পড়ল রিকশায়–ওঁর খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবিটায় যেন রসিকতা করেই এঁকে দিল একটা কলঙ্কচিহ্ন। পরমানন্দ লক্ষ করে দেখলেন ময়লা-ফেলা লরিটার

তলদেশ প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাস্তায় দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থের একটা ধারাচিহ্ন আঁকা পড়ে যাচ্ছে—গাড়িটার পেছন পেছন। সম্ভবত গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পূর্বেই লরি ভারমুক্ত হবে!

এই তা হলে তাঁর কুলি-ব্যারাকের জীবনালেখ্য?

রিকশাটা দাঁড়িয়ে পড়ে একটা পথের বাঁকে। রিকশাচালক জানায় পি-নাইন ব্যারাকে এসে গিয়েছে গাড়ি। উনি তাকেই বলেন সামনের বাড়ির কড়া নাড়তে, লোক ডাকতে।

অল্প পরে লোকটা ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে। এ বাড়ির বাসিন্দার চাকরি গিয়েছে। নোটিশ পেয়েছিল কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। কদিন আগে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

কী আশ্চর্য! এই সহজ কথাটা খেয়াল হয়নি তাঁর !

অল্পবয়সী দুটি ছোকরা এগিয়ে আসে রিকশা দেখে। খড়িওঠা রুক্ষ দেহ—ময়লা ভর্তি সারা গায়ে। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন—নিম্নাঙ্গে খাকি ধূলিমলিন হাফপ্যান্ট। এসে বলে : ওস্তাদদাকে খুঁজছেন?

—ওস্তাদদা? সে কে? আমি খুঁজছিলাম অরুণাভ নন্দীকে— এই বাসাতেই থাকত না?

—হ্যাঁ, ওকেই আমরা ওস্তাদদা বলি। ওস্তাদদাকে কোম্পানি তেড়িয়ে দিয়েছে। ওই শালা ম্যানেজার আর ওই হারামজাদা চৌধুরী ডাক্তারের দমবাজি।

চমকে ওঠেন পরমানন্দ। বলেন : চৌধুরী ডাক্তার কে?

— কে জানে, হবে কোন...

কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। ও ছোকরা কি জানে ওই অশ্লীল শব্দটার অর্থ? ছেলেটি আবার বলে— তা আপনি বুঝি পার্টি অফিস থেকে আসছেন? ওস্তাদদার কাছে?

— হ্যাঁ, কোথায় থাকে অরুণাভ বলতে পারো?

—জানব না? আবে এ রিকশালা, সুন্!

ওরা রিকশাচালককে হদিসটা বাতলে দেয়। পরমানন্দ তখন অবাক হয়ে ভাবছিলেন এদের কথা। কতই বা বয়স ওদের? এখন থেকেই মনুষ্যত্বকে গলা টিপে ধরা হয়েছে। লেখপড়া শিখবে না, ভদ্র কথা, ভদ্র আচার কাকে বলে জানবে না কোনোদিন। এই বিষবাষ্পের শ্বাসরোধী বাতাবরণে তিলে তিলে নীল হয়ে যাবে ওই অমৃতের পুত্রেরা। জীবনের চরম শিক্ষাই হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ম্যানেজার ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে নিকট কুটুম্ব আর মালিক...

এই তাঁর কীর্তি!

এর জন্যে মনের গভীরে তিনি পোষণ করেন অহঙ্কার! শিল্পোন্নয়ন করছেন দেশের! গঠন করছেন জাতি! শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়ন— একমাত্র লক্ষ্য তাঁর!

রিকশাওয়ালা বেঁকে বসল। সেই কোন সকালে ওঁকে রিকশায় তুলেছে। এখনও একটা পয়সা হাতে পায়নি। ঘুরে মরছে সারা শহর। সে আর যাবে না। ওকে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হোক এবার।

—কত ভাড়া হয়েছে তোমার? প্রশ্ন করেন পরমানন্দ।

— তা টাকা তিনেকের কম নয়।

একখানা পাঁচটাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলেন : চলো— ওই যে কী বস্তির কথা বলল ওরা — ওখানে চলো।

রিকশাওয়ালা নরম হয়। আবার প্যাডলে উঠে বসে। এঁকেবেঁকে ফিরে চলে। পিছন থেকে বস্তির ছোকরাটি মন্তব্য করে তার দোস্তকে : মালদার লোক মাইরি; দেখলি কেমন ঝড়াক্‌সে নিকলে দিলে কড়কড়ে নোটখানা!

* * *

রিকশাখানা যখন এসে পৌঁছল বস্তিটায় সূর্য তখন ক্লান্ত দেহে এলিয়ে পড়েছেন পশ্চিম দিগ্বলয়ে। আঁকাবাঁকা পথের দুধারে মেটে ঘর, খাপড়ার চাল। পথের পাশে টিউকলের সামনে লম্বা কিউ। জলে থিকথিক করছে সেখানটা। ঘিনঘিনে এলাকাটা পার হয়ে হঠাৎ একটা ফাঁকা মাঠে এসে পৌঁছল রিকশাটা। এখানেই বোধহয় মিটিঙ হবে। কীসের মিটিঙ? অনেক মেহনতী মানুষ জড়ো হয়েছে মাঠে। কয়েকটা ফেস্টুন দেখা যাচ্ছে। এঁকেবেঁকে আছে বলে লেখাগুলো এখন পড়া যাচ্ছে না।

দরমা-চাটাইয়ের ওপর খবরের কাগজ এঁটে তার ওপর লাল কালিতে কী যেন লেখা আছে। বাঁশের খুঁটের মাথায় ওই দাবিটাকেই নিয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছে মীটিঙে। ময়দানের মাঝখানে খানকয়েক চৌকি পাতা। পাশে একটা বংশদণ্ডে উড়ছে একটা নিশান। রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে পতাকাটা পরমানন্দের দিকেই।

রিকশাওয়ালাই খোঁজ নিতে নিতে এসে হাজির হল বাড়িটার সামনে। বাড়ি অবশ্য গৌরবে। আসলে খোলার চালার একটা কামরা। সেখানেও অনেক লোক জটলা করছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখন। রিকশা দেখে জনতা পথ দেয়। ত্রিচক্রযান এসে থামল চালাখানার সামনে।

—ওস্তাদ? হ্যাঁ, এই বাড়িই। হ্যাঁ, আছেন ভেতরে। কে এসেছেন?

পর্দা সরিয়ে রিকশা থেকে নেমে আসেন পরমানন্দ।

ওরা যেন ভূত দেখল। একটা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সোজা উঠে গেলেন খোলার ঘরখানিতে। প্রথমেই নীচু চালাতে একটা ঠোক্কর খেলেন মাথায়। সেটাও গ্রাহ্য করলেন না।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। হ্যারিকেন জ্বলছে একটা। জনা আট-দশ লোক নিম্নস্বরে কী যেন আলোচনা করছে। আগন্তুককে দেখে চমকে ওঠে সবাই।

ঘরে কোনো আসবাব নেই। একপাশে দড়ির একটি খাটিয়া—তার নীচে মাটির একটা কলসির মুখে চাপা দেওয়া এনামেলের একটি গ্লাস। ওপাশে একটি টিনের সুটকেস। দেওয়ালে দুখানা ছবি—একটি সুভাষচন্দ্রের, অপরখানা লেনিনের। দরমার দেওয়ালে কঞ্চির গোঁজে টাঙানো আছে একটি হ্যান্ডলুমের ময়লা হাফশার্ট। মেঝেতে তালপাতার একটি চাটাই পাতা। তার ওপরেই বসেছিল লোকগুলো পা মুড়ে। অরুণাভও ছিল ওদের মাঝখানে—পরনে তার পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি।

— কাকে চাই?

— তোমাকেই। কয়েকটা কথা ছিল।

— বসুন।

পরমান্দ চাটাইয়ের ওপরেই পা মুড়ে বসে পড়েন। লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়— সরে বসে।

—বলুন, কী বলতে চান—নির্বিকার কণ্ঠ অরুণাভের। তার সামনে খোলা একটি খাতা অথবা বই—তারই পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে কথাটি।

পরমানন্দ প্রত্যুত্তরে বলেন : শুধু তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার —নিভৃতে।

বইটা মুড়ে রেখে দেয় অরুণাভ। মুখোমুখি তাকায় এতক্ষণে পরমানন্দের দিকে। সোজা প্রশ্ন করে—ফ্যাকটরির ধর্মঘট সম্বন্ধে কথা কি? তা হলে এঁদের সকলের সামনেই কথা বলতে হবে।

— না, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটি ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই। কারখানার স্ট্রাইকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

—ও!

অরুণাভ তার অনুচরদের বলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে। অধিকাংশই উঠে দাঁড়ায়। অল্পবয়সী একটি ছেলে হঠাৎ বলে বসে—ওস্তাদ, এ কাজ তুমি কোরো না। ওদের কারসাজি বুঝতে পেরেছি আমরা।

—বাদল, তুমি বাইরে যাও।

ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওঁদের দুজনের দিকে। তারপর বলে— ওস্তাদ! আগুন নিয়ে খেলা কোরো না তুমি। এতগুলো মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললে তার ফল ভালো হয় না। এত সহজ কথাটাও বুঝতে পারব না আমরা ভেবেছ?

—বাদল! তুমি যাবে কিনা। —মুষ্টিবদ্ধ হয় অরুণাভের হাত।

বাদল একবার আশেপাশে তাকিয়ে নেয়। লক্ষ করে দেখে অনেকেরই নীরব সমর্থন আছে তার ঔদ্ধত্যে। পাশ থেকে মোটা ভাঙা ভাঙা গলায় রহমৎ বলে ওঠে— লেকিন ওস্তাদ। তুমিই হিসাব জুড়ে লেও ভাই— উর কুনো গোস্তাকি হল কিনা। তুমার সাথে মালিকের আর কুন কথা আছে? ই লোগদের মনে ধোঁকা লাগল তো কি ফিন অ্যান্যায় হল?

অরুণাভ উঠে দাঁড়িয়ে বলে : বড়ভাই। এটুকু বিশ্বাস যদি না থাকে তোমাদের তবে কেন আমার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলে? যদি মনে করে থাক– একলা পেয়ে এক টুকরো রুটির লোভ দেখিয়ে ওরা আমাকে ধোঁকাবাজি দেবে তবে আমাকে এ কাজের ভার দেওয়া ঠিক হয়নি। তুমি আজ বিশ বছর আছ এ কারখানায়– তোমাকে আমি বড়ভাই বলেছি– তোমাকে না জানিয়ে কোনও গোপন শর্তে মালিকের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারি?

রহমৎ তার প্রায় সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে– খামোশ। ব্যস, খুব। আ যাও ভাইসব।

অধিকাংশ লোকই বেরিয়ে যায় এ কথায়। শুধু বাদলের অগ্নিবর্ষী অক্ষিতারকা দুটি তখনও জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। রুখে ওঠে সে : বড়ভাই, আমি ঘরপোড়া গোরু। এর আগে পাঁচঘাটে জল খেয়েছি আমি। এ ব্যাপার আমার জানা আছে। আমি যাব না।

রহমৎ তার হাম্বরধরা লৌহকঠিন হাতখানা বাড়িতে দেয় সামনের দিকে। গেঞ্জি না হয়ে শার্ট হলে বোতামগুলো থাকত যেখানটায় বাদলের একমুঠো জামা সেখান থেকে আটকে পড়ে রহমতের বজ্রমুষ্টিতে। মুখে কিছু বলে না রহমৎ; বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দেয় দ্বারের দিকে।

– ঠিক হ্যায়। – বেরিয়ে যায় বাদলও।

অরুণাভ ঝাঁপের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলল : বলুন এবার।

–তুমি কি আশা করো এভাবে ধর্মঘট করে কোম্পানিকে জব্দ করতে পারবে?

–ধর্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে আবার ওদের ফিরে ডাকতে হয়।

–ও আচ্ছা। –সামলে নেন পরমানন্দ নিজেকে। তারপর একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা সোজাসুজি করে বসেন–নীলা কোথায়?

– আমি জানি না।

– জানো।

চোখ তুলে অরুণাভ ওঁর দিকে তাকায়। বলে – চোখ রাঙাবেন না, এটা আপনার কারখানা নয়।

– সে আজ তোমার এখানে আসেনি?

–না।

–না? আমি বিশ্বাস করি না।

– সে আপনার মর্জি।

– তোমাকে আমি পুলিশে দিতে পারি– তা জানো? জেল খাটাতে পারি– সেটা মনে আছে?

– আছে, কারণ যে পরিমাণ অর্থ থাকলে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলে পোরা যায় তা আপনার আছে, তা জানি। কিন্তু আপনি হিসাবে একটু ভুল করছেন; জেলখাটা জিনিসটাকে আজ আপনি যতটা ভয়াবহ মনে করছেন–আমি তা করি না। তাই তো সেদিন বলেছিলাম, অভাবেই শুধু স্বভাব বদলায় না ডক্টর চৌধুরী, প্রাচুর্যেও বদলায়।

–আমি নিশ্চিত জানি–আমার বাড়ি থেকে চলে আসার পর সে তোমার এখানে এসেছিল।

–ঠিকই জানেন আপনি। সে এসেছিল–তবে আজ নয়–কাল রাত্রে। গভীর রাত্রে।

–তারপর?

–তারপর আর কী জানতে চান বলুন?

হঠাৎ ভেঙে পড়েন কুলিশকঠোর পরমানন্দ–আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন –অরুণ, আমি মিনতি করছি। তুমি জানো আমি কী জানতে চাইছি। বাপ হয়ে আর কীভাবে প্রশ্ন করতে পারি আমি?

অরুণাভ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে–হ্যাঁ জানি; আপনার প্রশ্নের উত্তরে তাই জানাচ্ছি ননীমাধববাবুর পক্ষে কোনো বাধা নেই আপনাকে বৈবাহিক বলে স্বীকার করায়।

নৈঃশব্দ্যের একাধিপত্য পরের কয়েকটি মুহূর্তের ওপর। নীরবতা ভেঙে অরুণাভই আর একটু টুকরো খবর অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় পরমানন্দের ঔৎসুক্যের সম্মুখে–কাল রাত্রে সে এখানে থাকেনি–চলে গিয়েছিল আপনার গুরুদেবের কাছে। আজ সকালে সেখান থেকেও চলে গিয়েছে–কোথায় তা আমি জানি না। আর কিছু জানতে চান?

– সে আজ সকালে সেখান থেকে চলে গিয়েছে তা তুমি জানলে কী করে?

টাঙানো কামিজটার পকেট থেকে একটা বন্ধ ভারী খাম বার করে সেটা অরুণাভ ছুঁড়ে দেয় পরমানন্দের দিকে, বলে—আজ সকালে আমার লোক এটা দিতে গিয়েছিল— জেনে এসেছে সে ওখানে নেই।

ভারী খামটার ওপর গোটা গোটা অক্ষরে নীলার নাম লেখা। নাড়াচাড়া করে বন্ধ খামটা পরমানন্দ ফেরত দেবার উপক্রম করেন। অরুণাভ বাধা দিয়ে বলে— ওটা আপনার কাছেই রাখুন। যদি কোনোদিন নীলার সন্ধান পান—তাকে দেবেন।

তারপর মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে বলে—আপনিও পড়ে দেখতে পারেন, যে প্রশ্ন আপনি করতে পারলেন না, তার জবাব পাবেন ওটায়।

চিঠিখানা অগত্যা গ্রহণ করতে হয় পরমানন্দকে।

—আর কিছু বলবার আছে কি?

—হ্যাঁ, একটা কথা। একদিন তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করতে। মেদিনীপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এতদূর এসেছিলে শুধু আমাকে বিশ্বাস কর বলেই। তোমার সে বিশ্বাসের সে শ্রদ্ধার কণামাত্রও কি অবশিষ্ট নেই আজ?

ভেবেছিলেন খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন; কিন্তু জবাব দিতে মুহূর্ত বিলম্ব হল না অরুণাভের। বললে—না। কারণ আপনি আর সেই মানুষ নন—আপনি আদর্শচ্যুত, আপনি ব্রাত্য।

—এই জন্যেই কি নীলার আশ্রয় হয়নি কাল এ বাড়িতে?

—না। সেটার কারণ বুঝতে পারবেন আমার চিঠিখানা পড়লেই। কিন্তু এবার আসুন আপনি। আমাদের মিটিঙ শুরু হবে এইবার। ওরা অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

পরমানন্দ উঠে পড়েন। দ্বারের দিকে পা বাড়ান।

—দাঁড়ান। আপনাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।

—প্রয়োজন হবে না।

—হবে। না হলে হয়তো আপনি সুস্থ শরীরে ফিরে যেতে পারবেন না এ পাড়া থেকে। যেতে হবে হাসপাতালে।

পরমানন্দ এতক্ষণে একটা জবাব দিতে পারেন—হাসপাতাল জিনিসটাকে আজ তুমি যতটা ভয়াবহ মনে কর অরুণ, আমি ততটা করি না। সঙ্গে যাবার দরকার হবে না তোমার।

জামাটা গায়ে দিতে দিতে অরুণাভ বলে : একদিন ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরী আমার চিকিৎসা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি—নিজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে— তাই আপনি না চাইলেও আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। আমি জানি বাদলরা ওত পেতে বসে আছে আপনার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে। চলুন।

পরমানন্দ ওর প্রসারিত হাতটি গ্রহণ করে হঠাৎ বলে বসেন—পরশুরাম চৌধুরীর ঋণ তুমি আজও মনে করে রেখেছে অরুণ?

ওঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুণাভ বলে— ডাক্তার পরশুরাম চৌধুরীকে কোনো বিপ্লবী চেষ্টা করেও ভুলতে পারবে না— তিনি আমার যে উপকার করেছেন তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। শুধু আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তিনি অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন; তিনি আমার পিতৃবন্ধু, তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি আমি! যেমন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি হবু এম. এল. এ. ডাইরেক্টর পরমানন্দ চৌধুরীকে— যিনি মজদুর-উত্থান দমন করতে অনায়াসে মিথ্যা চুরির কেস সাজান, যিনি সাধারণ মানুষকে ঢুকতে দেন না তাঁর বাড়ির ফটকের ভেতর!

পরমানন্দের মুঠি আলগা হয়ে যায়। পাশাপাশি পথে নেমে আসেন ওঁরা। রিকশায় বসেন পরমানন্দ। রিকশার পাশে পাশে চলতে থাকে অরুণাভ। বড় রাস্তা পর্যন্ত ওঁকে এগিয়ে দিয়ে অরুণাভ ফিরে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তখন। — শহরতলীর বস্তি অঞ্চল। রাস্তায় জ্বলছে বিজলী বাতি। কারখানা এলাকার জনাকীর্ণ পথ। সিনেমার শো শুরু হচ্ছে। বিকৃত যান্ত্রিক আর্তনাদে পরিবেশিত হচ্ছে হিন্দি গান। রিকশাটা ভিড় বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে চলল শহরের অপর প্রান্তে।

বুক ঠেলে একটা কান্না আসছে। হেরে গেছেন। নিঃসংশয়ে হেরে গিয়েছেন তিনি চূড়ান্তভাবে। শুধু নীলার দৃষ্টিতে নয়—শুধু অরুণাভের চোখেই নয়—সারা দুনিয়ার কাছে আজ তিনি আদর্শচ্যুত, তিনি পতিত। মজদুর-নেতা আজ আন্তরিক ঘৃণা করে তাঁকে! রহমৎ আর বাদলেরা তাঁর পথের পাশে আজ ওত পেতে থাকে। এমনকি বস্তির ওই বালকটা পর্যন্ত অশ্লীল বিশেষণ যুক্ত করে উচ্চারণ করে তাঁর নাম। কারখানার বস্তিজীবন আজ তিনি নিজের চোখে দেখে গেলেন— এই তাঁর কীর্তি! এত বড় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেও তিনি তৃপ্ত হননি। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুন কীর্তির সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগেছেন এবার। বিনিময়ে কিশলয়বাবুর কয়েক শত একর জমির মূল্য বিশগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামনগরীটা গড়ে তুলতে হবে এমন এলাকায় যেখানে সমস্ত জমির মালিক তাঁরই মতো আর একজন নিঃস্বার্থ দেশকর্মী! এই এঁদের দেশসেবা! এই তাঁদের মতো সমাজসেবকদের কুম্ভীরাশ্রু কৃষক-মজুরদের জন্য। দীপক পর্যন্ত মনে করেছে পরমানন্দই চুরির কেসটা সাজিয়েছেন। সত্যরক্ষার জন্য একদিন যিনি অন্ধকূপের অন্তরালে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, একমাত্র পুত্রকে যিনি সত্যধর্মের যূপকাষ্ঠে স্বহস্তে বলি দিয়েছেন সেই পরমানন্দকে আজ কী চোখে দেখছে দুনিয়া! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তাঁর। ঠিকই বলেছে নীলা—আর কোনো সংশয় নেই। তিনি আদর্শচ্যুত, তিনি ব্রাত্য।

* * *

রিকশা এসে থামল বাড়ির সামনে।

নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। বাইরের দরজার পাশে বসে আছে নন্দ বেয়ারা।

সমস্ত বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। কত দিনের কত আনন্দঘন ইতিবৃত্ত জড়িয়ে আছে বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ওই কদম গাছটার ডালে একদিন দোলনা ঝুলিয়েছিলেন। তখন নীলাও হয়নি। শুধু অসীম এসেছে সংসারে। ফুটফুটে এতটুকু একটা বাচ্চা। দোলনায় বাচ্চাকে শুইয়ে অ্যানি দোল দিত। আর ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইত— নার্সারি লালেবাই। ঘাসের ওপর বেতের ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে উনি চুরুট খেতেন আর বই পড়তেন। এই বড় লনটায় কতদিন শীতকালে হয়েছে 'ওপন এয়ার বুফে লাঞ্চ'। অ্যানি আর মিস গ্রেহাম প্রাণান্ত পরিশ্রম করত অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে। কী মধুর সে-সব দিনগুলি। বিবাহবার্ষিকীতে বরাদ্দ ছিল একটা সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েরা বড় হবার পর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হত ওদের জন্মদিনে। অর্ধশতাব্দীর স্মৃতিবিজড়িত লাল পয়েন্টিং করা বাড়িটার সামনে আজও একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। সারাদিন অভুক্ত তিনি। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল বিকেলে— এখন যেন সে বোধটাও নেই। শুধু ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে পা দুটো।

নন্দ এসে ওঁকে ডাকে— ঘরে যাবার জন্য।

ঘর? না থাক। ইচ্ছা করছে না আর এখন উঠতে। নন্দকে বলেন বাগানের আলোটা জ্বেলে দিতে। ওখানে বসেই তিনি ভারী খামটা খুলে ফেলেন। বার হয়ে পড়ে অরুণাভর অবরুদ্ধ বাণী :

"নীলা,

এইমাত্র তোমাকে তোমার বাবার গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারিনি। পারা সম্ভবও নয়। দীর্ঘ এক যুগ প্রতীক্ষা করে আছি তোমার আগমনের, সেই তুমি এসে দাঁড়ালে আজ আমার দরজায়; অথচ এমন দুর্ভাগ্য আমার, দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিতে হল তোমাকে। তাই সব কথা বুঝিয়ে বলার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না—সম্ভবত শোনার মতো মানসিক স্থৈর্যও ছিল না তোমার। তাই এ চিঠি দিচ্ছি।

"তোমাকে আমার বাসার দ্বার থেকে ফিরে যেতে হয়েছে। উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে তুমি এসেছিলে এই দরমার ঘরে— বাকি জীবনের দিনগুলি এখানে বিকিয়ে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই—কিন্তু আমিই তা হতে দিইনি। তাই আমার কাছে তোমার একটা কৈফিয়তও পাওনা বৈকি।...

"ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। দুনিয়াটা আমার কাছে তখন ছিল অত্যন্ত সীমিত। বাবা ছিলেন—তুমি তো জানোই—বিপ্লবী। ইংরাজকে তাড়াবার মন্ত্রণায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। প্রাণ দিলেন ওই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই। আমার মাকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন ছোট। সব কথা মনে নেই। তারপর জ্ঞান হওয়ার পর কখনও তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। আমাকে তিনি গল্প শোনাতেন— শিবাজীর গল্প, রানা প্রতাপের গল্প, গুরু গোবিন্দর কথা,

ক্ষুদিরামের কাহিনী। স্বামীকে হারিয়ে যে তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েননি এটা প্রমাণ করতেই যেন আমাকে ওই পথের নির্দেশ দিলেন। আশ্চর্য মানুষ তিনি। তাঁরই হাতে গড়া মানুষ আমি। তারপর একদিন তিনিও অস্তমিত হলেন আমার জীবনদিগন্ত থেকে। তাঁর একটা কথা মনে আছে আমার : 'যারা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না—যারা বাধ্য করছে আমাদের কুকুর-বেড়ালের মতো জীবনযাপন করতে— তাদের কখনও ক্ষমা করিস না অরু।' পরে ওই কথাগুলোই পড়েছিলাম 'পথের দাবী'তে।

"নীলা, আমার মা সম্ভবত ইংরাজ-শাসকদের উদ্দেশ্য করেই ও কথা বলেছিলেন— অন্তত সে যুগে আমি সেই অর্থেই গ্রহণ করেছিলাম তাঁর উপদেশ। ক্রমে আমার চিন্তাশক্তির প্রসার হয়েছে—আজ মনে হয় কথাটা দেশ-কালের অত ক্ষুদ্র আবরণে আবদ্ধ নয়। তাই আজ ইংরাজ শাসকদের অবর্তমানেও আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। আজ তোমার বাবা এবং আমি সে সংগ্রামে বিপক্ষ শিবিরের সৈনিক।

"আজ তুমি ওপরতলার বাসিন্দা আর আমি থাকি নীচের মহলে। জানি, তুমি বলবে— স্বেচ্ছায় ওই ওপরের মহল ছেড়ে নেমে এসেছ তুমি আমার সমতলে। পরমানন্দের প্রাসাদ ছেড়ে যখন পরমদুঃখীর কুটিরে এসে দাঁড়িয়েছ তখন ফিরে যাবার পথ যে তুমি রুদ্ধ করে দিয়েই এসেছে সেটা বোঝা শক্ত নয়। আমি অবাক হয়ে যাই তোমার বাবার কথা ভেবে। ভদ্রলোকের সবই ছিল— সবই খুইয়েছেন; অথচ আশ্চর্যের কথা, আদর্শের কারবারে আজ যে তিনি দেউলিয়া এ খবরটাও তিনি জানেন না। সম্পদের সঙ্গে আদর্শের, চরিত্রের বোধহয় একটা নিত্যবৈরী আছে। কী একটা নাটকে পড়েছিলাম নায়কের বাইরের ঘরে টাঙানো থাকত বাইবেলের একটা বাণী : 'সূচের ছিদ্রপথে উট গলে যেতে পারে— কিন্তু কোনো বড়লোক কখনও স্বর্গে যেতে পারে না।' সম্পদ, প্রতিপত্তি, সম্মান মানুষের আদর্শকে পিষে মারে। অথচ মানুষ জানতেও পারে না যে সে আদর্শচ্যুত হয়েছে। তোমার বাবারও আজ সেই দশা। তুমিও তাঁর সাহচর্যে সে কথা বুঝবার মতো বোধশক্তি হারিয়েছ। আজ সাময়িক উত্তেজনাতে সব ছেড়ে তুমি আমার দ্বারে এসেছ দাঁড়িয়েছ এটা সত্য; কিন্তু জীবনটা তো নাটক নয়!

"সিনেমায় আর রঙ্গমঞ্চে যেটা বেশ স্বাভাবিক, জীবনে তাই অবাস্তব। তুমি যখন গতকাল রাত্রে একা এসে দাঁড়ালে আমার দরজায়, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যদি পঞ্চম অঙ্কের শেষ যবনিকা নিশ্চিত পড়বে জানতাম তাহলে আমিও তোমার হাত দুটি ধরে ভাবতে পারতাম 'এতদিন পরে এসেছে কি তার আজি অভিসার রাত্রি।' এটা নাটক হলে কোনো কথা ছিল না। নাটকের দর্শক খুশিমনে বাড়ি যেত। কিন্তু জীবনের দর্শক জানে নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। নিষককালো অমারাত্রির অন্ধকারে তোমার এ অভিসারের রোমান্টিকতার পরেও আছে সকালবেলার চড়া রোদ! সকাল হলে তুমি দেখতে পাবে এখানকার চৌকিতে গদি নেই, আছে ছারপোকা। —কফির কাপের বদলে আছে মাটির ভাঁড়ে জোলো চা; ঈভনিং-ইন-প্যারী অথবা ক্যান্থারাইডিন নয়—পচা নর্দমার দুর্গন্ধে বাতাস এখানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে।

"রাগ কোরো না নীলা। দোষ তোমার নয়। তুমি এ জীবনে অভ্যস্ত নও। তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি গড়ে উঠেছে অন্য পরিবেশে। ঝোঁকের মাথায় তুমি সব ত্যাগ করে আসতে চাইছ; কিন্তু কাল সকালে তোমার অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। কাল না হোক কালে এ কথা তোমার মনে হবেই। এই একটি মুহূর্তের ভুলের বোঝা বয়ে চলতে হত তোমাকে আজীবন। কারণ এ ঘরে একটা রাত্রি যাপন করা মানেই বাকি জীবনের রাত্রিগুলির মৃত্যুপরোয়ানায় সই দেওয়া।

"ভুল বুঝো না আমাকে। আমি আজও তোমাকে তেমনিই ভালোবাসি। বছরদশেক আগে বিদায় দেবার সময় বলেছিলাম, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।' আজও বিদায় দেবার সময় বলছি ওই একই কথা। এ কথা বলছি না যে আমার সঙ্গে জীবন যুক্ত করা তোমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তবে তার জন্য প্রস্তুতি চাই, শুধু মানসিক নয়, শারীরিকও। ঝোঁকের মাথায় সেটা যেন না হয়। আমি তোমাকে অনুরোধ করব—নিজের মন তুমি ভালো করে যাচাই করে দেখো। যদি তোমার বাবার মেকি দেশসেবায় সত্যিই অতিষ্ঠ বোধ করে থাকো, যদি ঐশ্বর্যের বেড়া ভেঙে নেমে আসতে চাও এই সংগ্রামময় জীবনের সমতলে, তাহলে কিছুদিন তোমাকে এ পথে চলবার

শিক্ষানবিশি করতে হবে। আমি বলব স্বেচ্ছা-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে হবে কিছুদিন তোমাকে। তোমার বাবার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে পারবে না। তোমার পরিচিত সমাজ থেকে এভাবে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে যদি কয়েক মাস আমার জীবনের সুখ-দুঃখের আস্বাদ নিতে পারো এবং তারপরেও অবিচলিত রাখতে পারো তোমার আজকের সঙ্কল্প, তাহলেই সার্থক হবে আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বরণ করে তুলব সেদিন আমার জীবনলক্ষ্মীকে।

"আরও একটা কথা। তুমি উচ্চশিক্ষিতা। ফিলসফিতে এম. এ. পাস করেছ তুমি। আমি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র ছিলাম যখন ধরা পড়ি। তারপর কলেজে শিক্ষালাভ ঘটেনি আমার। সহরাজবন্দিদের কল্যাণে সমাজদর্শন, অর্থনীতি বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি মাত্র। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার শিক্ষাগত একটা প্রভেদ আছে। এ কথাটাও তুমি বিচার করে দেখো।

"শেষ কথা। তোমার সঙ্গে আমার একট প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে। তুমি নাস্তিক,– তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। দিনান্তে একবার তাঁকে স্মরণ না করলে মনে বল পাই না। আমি বিশ্বাস করি তিনি আছেন আনন্দঘন কল্যাণময়রূপে। এখানেও আমাদের অমিলটা অত্যন্ত ব্যাপক। যুক্তিতর্ক দিয়ে তোমাকে স্বমতে আনতে পারব না– তুমিও পারবে না তোমার নাস্তিকতার গোলাবর্ষণে আমার এ বিশ্বাসদুর্গকে বিধ্বস্ত করতে।

"জানি না ক্ষমা করতে পারলে কিনা আমাকে।

"এ চিঠির প্রত্যুত্তর আমি আশা করছি না। আমি বিশ্বাস করব তুমি আত্মসমীক্ষণান্তে ফিরে আসবে ঠিক যেখান থেকে ফিরে যেতে হল সেখানে। যদি স্থির করো যে আসবে না– তবে সে কথাও আমাকে জানিও না। সে কথায় আমার প্রয়োজন নেই– কারণ অন্য কোনো জীবনসঙ্গিনী আমার কল্পনার বাইরে। না হয় অহেতুক আশাতেই কাটুক না আমার বাকি জীবন। ইতি

অরুণাভ।"

—স্যার!

—হ্যাঁ।

—আপনার তো আজ খাওয়া হয়নি সারাদিন।

নন্দর এ প্রশ্নের জবাবে এবার স্বীকার করেন পরমানন্দ — না, সারাদিনে কোনো আহার্য জোটেনি তাঁর।

—আপনার খাবার আনব?

—আন। হ্যাঁরে, ছোট মহারাজ আসেননি আর?

নন্দ জানায় যে ইতিমধ্যে ছোটমহারাজ এসে দিয়ে গেছেন একখানি চিঠি।

নন্দ খাবার আনতে যায়।

দ্বিতীয় চিঠিখানি খুলে বসেন পরমানন্দ। গুরুদেব লিখছেন :

"পরমকল্যাণীয়েষু,

নীলা-মার জন্য চিন্তা করিও না। সে আমার সহিত তীর্থভ্রমণে যাইতেছে। মানস পর্যন্ত যাইবার ইচ্ছা আছে। তোমাকে জানাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না—কারণ তুমি জানিলে এরূপ কপর্দকহীন অবস্থায় আমাদের তীর্থযাত্রা সম্ভব হইত না। অপরপক্ষে তীর্থভ্রমণের রাজসিক ব্যবস্থা হইলে আমাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। আমার না হইলেও নীলার হইত।

আশীর্বাদক। ইতি—"

চিঠিখানি শেষ করে মিনিটদশেক স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন পরমানন্দ। মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তুষারাচ্ছাদিত এক সানুদেশ; সুদুর্গম যাত্রাপথে চলেছেন দুজন পথিক দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে— একজন জ্ঞানবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, অপরজন অভিমানক্ষুব্ধ তাঁরই আত্মজা। চুম্বকখণ্ড তাহলে দিক পরিবর্তন করেছে; বিকর্ষণ রূপান্তরিত হয়েছে ঐকান্তিক আকর্ষণে! উপকরণের দুর্গপ্রাকার থেকে মুক্তি পেয়েছে নীলা। ঠিকই বলেছিলেন গুরুদেব—নীলা এগিয়ে গিয়েছে সাধনমার্গে তাঁকে পেছনে ফেলে।

উঠে পড়েন উনি। মনস্থির করেছেন এতক্ষণে! লেটার প্যাডটা বার করে সর্বপ্রথমেই লিখে ফেলেন একখানা চিঠি। শেষ করে আবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। খামটা বন্ধ করে উঠে যান ওপরের

ঘরে। সুটকেসটা টেনে নিয়ে গুছিয়ে তুলতে থাকেন জামাকাপড়। প্যান্ট, শার্ট, টাই, গরম জামা, ড্রেসিং গাউন, শেভিং সেট, একে একে গুছিয়ে তোলেন। তারপর হঠাৎ কী ভাবেন কয়েকটা মুহূর্ত। আবার খালি করেন সুটকেসটা। নাঃ এ-সব নেবেন না তিনি। কিট-ব্যাগটায় ভরে নেন খানকয়েক ধুতি। খান দুই কম্বলও নেন, একটা লেডিজ গরম ওভারকোট। ব্যাস, আর কিছু নয়।

বেশি সময় লাগল না গুছিয়ে নিতে। টাইম-টেবিলটা দেখেন একবার। হ্যাঁ, ট্রেন একটা আছে। এখনি বের হলে ধরতে পারবেন। এখনই যাবেন তিনি। টনকপুর স্টেশনে দেখা পাবেন ওঁদের নিশ্চিত।

খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে নন্দ উঠে এসেছে দোতলায়—ডাইনিংরুম খালি দেখে।

—ও-সব এখন থাক। তুই শিগগির একটা ট্যাকসি দেখ!

—আপনি আগে খেয়ে নিন। —নন্দ এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলে। কিন্তু পরমানন্দ তার চেয়েও দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন—বিরক্ত করিস না নন্দ। যা বলছি কর। ট্রেনটা আমায় ধরতে দে।

নন্দ তার মনিবকে চেনে। আর কোনো কথা না-বলে বেরিয়ে যায় ট্যাকসি ডাকতে। বারান্দাটায় পায়চারি করতে থাকেন পরমানন্দ অস্থির পদবিক্ষেপে! না, হার তিনি স্বীকার করবেন না। ভুল মানুষ-মাত্রেরই হয়। সে ভুলকে স্বীকার করে নেওয়ায় লজ্জা নেই। ভুলকে সংশোধন করা, তাকে জয় করাই মনুষ্যত্ব। পরমানন্দও প্রমাণ দেবেন তিনি আদর্শচ্যুত নন— আদর্শের জন্য তিনি আজও সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

ট্যাকসিতে উঠবার সময় পেছনে এসে দাঁড়াল কালো রঙের হিন্দুস্থানখানা। নেমে এলেন হর্ষোৎফুল্ল ননীমাধব সুসংবাদটা দিতে— কংগ্র্যাচুলেশন্স! সব ঠিক হয়ে গেছে ভাই— কিশলয় গাঙ্গুলি হ্যাজ উইথড্রন— তোমার পথে আর কোনো বাধা নেই—

বাধা দিয়ে পরমানন্দ বলেন— বেশি কথা বলার আমার সময় নেই ননীমাধব। আর আঠারো মিনিট মাত্র বাকি আছে ট্রেন ছাড়ার, আমি চললাম। এই চিঠিখানা তারিণীদাকে দিও—

ননীমাধবকে বস্তুত কোনো প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ না দিয়েই রওয়া হয়ে গেলেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

মুহূর্তখানেক ননীমাধব দাঁড়িয়ে থাকেন স্থাণুর মতো। তারপর অসীম কৌতূহল নিয়ে খামটা খুলে পড়তে থাকেন চিঠিখানা।

আশ্চর্য কাণ্ড। পরমানন্দ তাঁর তারিণীদাকে জানাচ্ছেন অনিবার্য কারণে তিনি নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। কারণটা কী তা লেখেননি। তবে শেষ দিকে লিখেছেন "অধ্যাপক গিরীন্দ্রবাবু আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি। দীর্ঘতর দিন তিনি যুক্ত ছিলেন আমাদের পার্টিতে। এখানে নমিনেশন না পাইয়া তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়াছেন। গিরীন্দ্রবাবুর বদলে আপনারা আমাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এজন্য নয় যে আমি যোগ্যতর ব্যক্তি। কারণটা অর্থনৈতিক। এ ভোটযুদ্ধে পাড়ি দিতে আমি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিব—অধ্যাপক বসু-মহাশয়ের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর নহে। অপ্রিয় হইলেও কথাটা সত্য। শেষ মুহূর্তে আমার এই আকস্মিক পশ্চাদপসরণে আপনারা বিব্রত বোধ করিতে পারেন—তাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পার্টি-ফান্ডে জমা দিবার জন্য একটি ক্রস চেক এইসঙ্গে রাখিয়া গেলাম। আশা করি অতঃপর আপনারা আর গিরীন্দ্রবাবুকে অপাংক্তেয় মনে করিবেন না।

ক্ষমাপ্রার্থী ইতি।।"

বিস্মিত বিমূঢ় ননীমাধব স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চিঠিখানি হাতে করে। এ ছেলেমানুষির কোনো মানে হয়!

*　　　　*　　　　*

এখানেই আমার কাহিনী শেষ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এর পরবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিতান্তই বাহুল্য। সংসারাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসেই সেটা অনুমান করতে পারবেন ভেবেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যিনি প্রথম পড়লেন তিনি আমাকে বলে বসলেন যে কাহিনীটি সুসমাপ্ত নয়। আদর্শনিষ্ঠ পরমানন্দ তাঁর আদর্শে ফিরে গেলেন— এটাই নাকি কাহিনীর শেষ কথা হতে পারে না। এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়—অরুণাভের আদর্শের কথা, নীলার বিবাহের কথা।

আমার মতে সে-সব কথা দ্বিতীয় একটি কাহিনীর বিষয়ভুক্ত হতে পারে মাত্র; এবং তা হলেও সে কাহিনীটি পুনরুক্তিদোষে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে শুধু। তবু প্রথম পাঠিকার অনুরোধে কয়েকটি স্থূল সংবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হলাম।

ডাক্তার পরমানন্দকে টনকপুর পর্যন্ত যেতে হয়নি, সাজাহানপুরেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন গুরুদেবের। সে যাত্রায় বেশি কষ্ট পেতে হয়নি তাঁকে। নীলা লক্ষ্মী মেয়েটির মতোই ফিরে এসেছিল তাঁর সঙ্গে।

সেই একদিনের ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লে আজ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হন পরমানন্দ। সারাটা দিন যেন একটা ভূত চেপেছিল তাঁর ঘাড়ে। সেন্টিমেন্টাল হওয়াটা পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন তিনি; সেই একদিনের ছেলেমানুষির খেসারত হিসাবে অ্যাসেম্বলিতে যাওয়া পিছিয়ে গেছে বছর-পাঁচেকের জন্য। শুধু কী তাই? অহেতুক কতকগুলো টাকাও অর্থদণ্ড হল! অবশ্য হতোদ্যম হন নি তিনি মোটেই। কর্মবীর তিনি– এত সহজেই ভেঙে পড়বেন কেন! ক্রমে ম্যানেজিং ডাইরেকটারশীপটাও হাতে এসেছে এতদিনে। প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করে চলেছেন তিনি শ্রমিকদের পেছনে। আগামীবারে মজদুর-মহল্লার সব কটা ভোট তাঁকে পেতেই হবে! এই শুভকর্মে তিনি নিয়োজিত করেছেন উপযুক্ত লোককেই।

অরুণাভ নন্দীই এখন বার্টন এ্যান্ড হ্যারিস কোম্পানির লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। নীলাকে বধূরূপে গ্রহণ করার অর্থনৈতিক বাধাটা এখন আর নেই। মেহনতী মানুষের ভালো করার পূর্ণ দায়িত্ব অরুণাভের ওপরই ন্যস্ত করেছেন ম্যানেজিং ডাইরেকটর। মজদুরদের জন্য ক্লাবঘরে এসেছে নতুন রেডিও, মজদুর-মণ্ডলীর আসর শুনতে ওরা গোল হয়ে বসে। মেহনতী মানুষদের প্রভিডেন্ট-ফান্ড খোলার আয়োজন হচ্ছে, অসুস্থ মজুরও যেন মারা না পড়ে সে ব্যবস্থা হচ্ছে। আরও কত পরিকল্পনা রয়েছে। অরুণাভ বয়স্কদের জন্য নৈশ স্কুলও খুলতে চেয়েছিল, কিন্তু ওটাতে আপত্তি আছে কর্তৃপক্ষের। পরে অরুণাভও বুঝতে পেরেছে লেখাপড়া শিখিয়ে আর কী লাভ হবে ওদের– ওরা তো আর কেরানি হয়ে উঠবে না কোনোদিন! শিক্ষা ওদের কাছে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ! অরুণাভ আজও মনে-প্রাণে মজদুরদরদী! যদিও অফিসার হওয়ার পর মজুরদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মেলামেশাটা এখন সম্ভবপর নয়, তবু মোটা অঙ্কের মাহিনা থেকে মাঝে মাঝে সরু-মোটা অঙ্কের চাঁদাই তাকে দিতে হয় পার্টি-ফান্ডে।

আগামী বিশ্বকর্ম পূজায় মজদুরদের চিত্ত বিনোদনের জন্য একটা নাটক সে মঞ্চস্থ করবে মনস্থ করেছে। অশ্রুতপূর্ব তার মৌলিক পরিকল্পনা! মজদুর, মসীজীবী এবং দু-একজন অফিসার পর্যন্ত নাকি একই মঞ্চে অভিনয় করবে এবার। সাম্যের এক চূড়ান্ত স্বাক্ষর সে রেখে যাবে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে! ডাঃ পরমানন্দকে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার পরিকল্পনার কথা। খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন পরমানন্দ; বলেছিলেন, থিয়েটার আমিও এককালে খুব করতাম, কিন্তু এমন চিন্তা আমার মাথাতেও আসেনি।

অরুণাভ বলেছিল : তাহলে প্রধান চরিত্রটা আপনিই করুন না।

—নাটকটা কী?

—তারাশঙ্করবাবুর 'দুই পুরুষ', —আপনি নুটুবিহারীটা করুন।

পরমানন্দ হেসে বলেছিলেন : ও চরিত্রটাও এককালে আমি করেছি, তবে কী জানো—আমাদের যুগ গত হয়েছে। তোমরাই এখন ও-সব করো। আমরা পেছনে আছি।

অগত্যা অরুণাভকেই রাজি হতে হয়েছে নুটুবিহারীর চরিত্র অভিনয় করতে। নাটকটা পুরানো; বহুবার এ নাটকের অভিনয় সকলে দেখেছে। তবু নবীন অভিনেতা চরিত্রটা কেমন অভিনয় করে সেটা দেখবার জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে!

নীলা অবশ্য টিকতে পারেনি। সে নাকি আজকাল পণ্ডিচেরিতে থাকে!

অলকনন্দা

উৎসর্গ

শ্রীমতী রানী লাহিড়ী চৌধুরী
অর্থাৎ, ছোড়দিকে—

প্রথম প্রকাশ : 1963
রচনাকাল : 1962

কৈফিয়ত

'অলকনন্দা' বইটি ষাটের-দশকে লেখা।

বস্তুত একই আঙ্গিকে পরপর দুটি গ্রন্থ রচনা করি। 'অলকনন্দা' এবং 'মনামী'। 'আত্মকথা'র ঢঙে। অর্থাৎ লেখক শ্রুতিধরমাত্র—স্টেনোগ্রাফারের মতো ডিকটেশন নিয়ে গেছেন। যা বলবার তা চরিত্ররা নিজেরাই বলেছে। দুটি কাহিনী রচনা করার পরে এই স্টাইলটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার ইচ্ছাটা চলে যায়। স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় অন্য বিষয়ের, অন্য আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকেছিলাম। অলকনন্দা কিছুদিন বাজারে ছিল না। পরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ। তাঁদের ধন্যবাদ।

'ঘরে-বাইরে' পড়তে বসে আমার মনে একটা খটকা জেগেছিল। নিখিলেশ, সন্দীপ আর বিমলা—তিনজনেই কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে আয়ত্ত করল তাদের সৃষ্টিকর্তার অননুকরণীয় রচনাশৈলী? মনে হয়েছিল, সৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি রবিঠাকুরের ভাষার হুবহু নকল করতে অপারগ হত তাহলে প্রতি পরিচ্ছেদের মাথায় কোনটা কার আত্মকথা সেটা জানানোর প্রয়োজন থাকত না। চোখে-দেখার নাটক যেদিন থেকে কানে-শোনার বেতার-নাট্যের রূপ নিল, সেদিন থেকে শুধু বাচনভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর শুনেই আমরা বক্তাকে চিনে-নিতে শিখেছি। ছাপা-উপন্যাসে কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত, হস্তাক্ষরও। কিন্তু বাচনভঙ্গি? ভাষার বিন্যাস? ম্যানারিজম? প্রত্যেকটি চরিত্র যদি নিজের নিজের ঢঙে কথা বলে তাহলেও আমরা চিনে নিতে পারব কোনটা কার 'আত্মকথা'! সেই পরীক্ষাটাই করেছিলাম—ঐ দুটি বইতে।

এই যে বিশেষ রচনাশৈলী—অর্থাৎ লেখক তাঁর সৃষ্ট-চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাষায় পাঠকের সঙ্গে কথা বলবেন—সেটি বাংলা ভাষায় কে প্রথম আমদানি করেছিলেন তা বলার অধিকার আমার নেই। ভাষাবিদ্ ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকেরা সে কথা বলবেন। আমার তো মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে'তে এই আঙ্গিকটা গ্রহণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) অনুসরণে। সেই উপন্যাসেই প্রথম দেখতে পাই বঙ্কিমকে থামিয়ে দিয়ে রজনী-শচীন্দ্র-লবঙ্গলতা-অমরনাথের দল আসর জমিয়ে বসেছিল। ওদের কলকোলাহলে বঙ্কিম একবারও মুখ খুলতে পারেননি। উপন্যাস শুরু হবার আগে এবং টাইটেল-পেজ এর পরে অতি সামান্য পরিসরে লেখকের 'মুখবন্ধ'! দুই অর্থেই।

সেই মুখবন্ধে বঙ্কিম বলছেন, "উপন্যাসের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকা-বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্সকৃত 'The Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে-সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

'যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে'—একশ দশ বছর আগে বঙ্কিমের সেটা খেয়াল ছিল। 'ঘরে-বাইরে'তে সেটা কিন্তু আমরা পাই না। বিমলা, সন্দীপ আর নিখিলেশের চিন্তাধারা, জীবনবোধ, আদর্শের যতই পার্থক্য থাক—তারা তিনজনেই হুবহু—রবিঠাকুরের ভাষায় কথা বলে। বঙ্কিমের চরিত্র সে ভুল করেনি।

পরিচ্ছেদের মাথায় কোনটি কার আত্মকথা যদি লেখা না থাকতো তাহলেও বঙ্কিম-পাঠকের সেটা

বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হত না। অশিক্ষিতা রজনী সমাসবদ্ধপদসমৃদ্ধ বঙ্কিমীভাষায় লিখতে যেমন অসমর্থ ঠিক তেমনি ভাবেই শচীন্দ্রনাথ 'চোখের মাথা খেতে' পারে না। লবঙ্গলতা যে 'অলঙ্কারে' অভ্যস্ত ("আগুনে-সেঁকা-কলাপাতার মতো শুকাইয়া উঠিবে") অমরনাথ সে ভাষায় কথা বলতে পারে না।

তুলনায় সন্দীপ, বিমলা, নিখিলেশ একে অপরের ভাষা হুবহু নকল করে গেছে।

একটা কথা। 'রজনী'র চেয়ে 'ইন্দিরা' বয়সে চার বছরের বড়। বোধ করি সেই ইন্দিরাই প্রথম বিদ্রোহিণী, যে বঙ্কিমকে 'বকলমা' দিতে অস্বীকার করে! ইন্দিরা বঙ্কিমের পঞ্চমা কন্যা। ইন্দিরার যে চারজন বড় বোন ছিল তারা অনেক গুণের অধিকারিণী; কিন্তু এ দিক থেকে ইন্দিরা অনন্যা! 'ফুলমণি' ব্যতিরেকে বাংলা সাহিত্যে ইন্দিরাই প্রথমা! দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী এবং বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী নিজেদের কথা নিজেরা বলতে সাহস পায়নি—'বকলমা'-র নীচে টিপছাপ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা বঙ্কিমকে তারা বলেছিল—'আমাদের কথা আপনিই বরং বলুন'।

ইন্দিরা তা বলেনি। বলেছিল—'আপনি থামুন দেখি! আমার কথা আমি নিজেই বলতে পারব।'

'ইন্দিরা' বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় (১২৭৯, মার্চ, ১৮৭২) প্রকাশিত। বঙ্কিম-কথিত উইল্‌কি কলিন্স্‌-এর 'The Woman in White' প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। অর্থাৎ ইংরাজ-তনয়া ঐ 'শ্বেতাম্বরা' ছিলেন বঙ্কিমতনয়া 'ইন্দিরা'-র চেয়ে মাত্র বারো বছরের বয়োজ্যেষ্ঠা! 'ফুলমণির আত্মকথা'-র নায়িকা আরও ত্রিশ বছরের প্রাচীনা।

একশো পনেরো বছর পরে আজকাল আর উপন্যাসের নায়িকাকে ওভাবে সাহস করে এগিয়ে আসতে দেখি না। তারা আর কথাসাহিত্যিককে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলে না : 'থামুন! আমার কথা আমিই বলব!'

চৈত্র শেষ, ১৩৯৩ নারায়ণ সান্যাল
(1987)

এক

'আই চোজ্ মাই ওয়াইফ, অ্যাজ শী ডিড হার ওয়েডিং গাউন, ফর কোয়ালিটিস্ দ্যাট উড উয়্যার ওয়েল।'—কথাটা গোল্ডস্মিথের। মানে, স্ত্রী যে মন নিয়ে বিবাহের বেনারসিটি কিনেছিলেন, আমিও ঠিক সেই মন নিয়েই আমার জীবন-সঙ্গিনীকে বেছে নিয়েছি—উভয়েরই লক্ষ্য ছিল সেই গুণটি, অর্থাৎ—। দূর ছাই! সব ইংরেজি কথারই কি বাংলা করা যায়? অন্তত আমি তো পারি না। বাংলা ভাষাটার ওপর আমার তেমন দখল নেই। মনে হয়, সব কথা বাংলায় বোঝানো যায় না। মনের ভাবটা কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে টানতে গেলেই তা এদেশের মৌসুমী ভিজে বাতাসে যেন স্যাঁৎসেতে হয়ে যায়। অথচ ঐ কথাই ইংরেজিতে বল, কোথাও বাধবে না।—গ্যালপে গ্যালপে এগিয়ে যাবে কলম। হয়তো ছেলেবেলা থেকে সাহেবদের স্কুলে পড়ে আমার এই হাল। সুনন্দা বেশ বাংলা বলে, সুন্দর চিঠি লেখে। বাংলা-অনার্সের ছাত্রী ছিল সে। যদিও শেষ পর্যন্ত অনার্স নিয়ে পাস করতে পারেনি, তবু ভাষাটা শিখেছে।

সে যা হোক—যে কথা বলছিলুম। সুনন্দাকে আধুনিক পদ্ধতিতেই বিবাহ করেছি। প্রথমে পরিচয়, পরে প্রেম ও পরিণামে পরিণয়! তবু মনে হয় নির্বাচনের সময় আমি তার বাহ্যিক দিকটার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলুম। বিলাতফেরত বড়লোকের একমাত্র পুত্রের, কোম্পানির একচ্ছত্র মালিকের স্ত্রীর যে গুণগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সুনন্দার তার কোনোটারই অভাব ছিল না। তাই তাকে নির্বাচন করেছিলুম। ঠকিনি। বন্ধুবান্ধবেরা এখনও ঠাট্টা করে বলে—'লাকি ডগ্'! চ্যাটার্জি সেদিন মশ্‌করা করে বললে—'তোমার নামের পেছনে বিলাতী অ্যাল্‌ফাবেটের সঙ্গে আরও দুটো অক্ষর এখন থেকে বসাতে পার—এইচ্. পি.।'

আমি বললুম—এইচ্. পি-টা কী বস্তু?

বলে—মিস্টার হেন্-পেক্‌ড!

জবাব দিইনি। চ্যাটার্জি ও কথা বলতে পারে। ও হতভাগা সিউডো-ব্যাচিলার। স্ত্রী ওর সঙ্গে থাকে না। বেচারা।

সত্যিই পছন্দসই লক্ষ্মী বউ একটা...একটা অ্যাসেট! আর উড়নচণ্ডী দ্বিচারিণী হচ্ছে যাকে বলে, 'ব্যাঙ্ক-ক্র্যাশ'! ঠিকই বলেছেন স্যেন্—'ম্যারেজ উইথ এ গুড উয়োম্যান ইজ এ হারবার ইন দ্য টেমপেস্ট অফ লাইফ; উইথ এ ব্যাড উয়োম্যান, ইট ইজ এ টেমপেস্ট ইন দি হারবার।' অর্থাৎ—

অর্থাৎ থাক। মোট কথা সুনন্দা আমাকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারখানার কাজে ডুবে থাকি, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারখানার কাজের চিন্তা আমার মনের সবটুকু দখল করে রাখে। সুনন্দার মতো সতী-সাধ্বী স্ত্রী না হলে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে যেত। কী নিরলস পরিশ্রমে সে আমার কাছে কাছে থাকে। আমার প্রতিটি মুহূর্তকে মধুর করে তোলে। সময়ে চায়ের পেয়ালাটি, কফির কাপ, হাতে-গড়া কেক পুডিং যোগান দিয়ে যায়। সপ্তাহান্তে দু'জনে সিনেমা যাই। রাত্রে নীচে ডানলোপিলো আর পাশে সুনন্দার নরম আশ্রয়ে ওর আবোল-তাবোল বকুনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। স্ত্রীর কর্তব্যে সুনন্দা যেমন ত্রুটিহীন আমিও স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। আমাদের দাম্পত্য-জীবন ছককাটা ঘরে নিয়মের তালে তালে পা ফেলে চলে। এতটুকু বিচ্যুতি সহ্য করি না আমরা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আমার সাতটা বাজে। এই সাতটা পর্যন্ত সুনন্দার ছুটি। ইচ্ছামতো সে বেড়াতে যায়, বই পড়ে, অথবা—অথবা কী করে তা অবশ্য আমি জানি না! অর্থাৎ জানবার চেষ্টা করিনি। কেন করব? সেটা স্বামী হিসাবে আমার অনধিকার চর্চা হয়ে যেত।

সন্ধ্যা সাতটার পূর্ব মুহূর্তটি পর্যন্ত সময়টা তার পকেটমানির সামিল। সে যেমন খুশি তা খরচ করতে পারে। কিন্তু ঠিক সাতটার সময় আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন সে আমাকে রিসিভ করবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে। প্রসাধন সেরে মাথায় একটি লাল গোলাপ গুঁজে একেবারে রেডি!

মাথায় লাল গোলাপ দেবার কথায় একটা পুরানো কথা মনে পড়ল। আমিই তাকে একদিন বলেছিলুম—প্রসাধনের পর খোঁপায় একটা লাল গোলাপ ফুল দিলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। তারপর থেকে প্রতিদিন সে এ কাজটি নিয়মিত করে। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলুম ওর খোঁপায় ফুল নেই। সেদিন অফিসের কী একটা গণ্ডগোলে এমনিতেই আমার মেজাজ খাপ্পা হয়ে ছিল। রাগারাগিটা বোধহয় বেশি করে ফেলেছিলুম। ওর এক বান্ধবী, নমিতা দেবী, বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর সামনে ধমক দেওয়ায় সুনন্দা বড় অপমানিত বোধ করেছিল। রাত্রে নন্দা বললে—তুমি নমিতার সামনে কেন অমন করে বকলে আমায়?

আমি বলি—তোমাকে আমার বলা আছে, সন্ধ্যাবেলায় মাথায় একটা গোলাপ ফুল দেবে। তোমার খোঁপায় ফুল না থাকলে আমার ভাল লাগে না। তুমি ফুল দিতে ভুল গেলে কেন আজ?

নন্দা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—কী করব? আমাদের বাগানে আজ কোনো গোলাপ ফোটেনি যে।

ভাবলুম বলি—এ বাড়িতে একটি গোলাপ নিত্য ফুটে আছে দেখে গাছের গোলাপগুলো ফুটতে লজ্জা পায়। কিন্তু না, তাতে ওকে আশকারা দেওয়া হবে। কর্তব্যে অবহেলা করলে কঠোর হতে হয়। তা সে অফিসের লোকই হোক অথবা বাড়ির লোকই হোক। কড়া সুরে বলি—লিঙ্কন বলেছেন—'নেভার এক্সপ্লেন। য়োর এনিমিজ ডু নট বিলিভ ইট অ্যান্ড য়োর ফ্রেন্ডস্ ডু নট নীড ইট', অর্থাৎ—কদাচ কৈফিয়ত দিও না, কারণ তোমার শত্রুরা তাহা বিশ্বাস করে না এবং তোমার বন্ধুদের তাহাতে প্রয়োজন নাই—

বাধা দিয়ে নন্দা বলে—থাক, অনুবাদ না করলেও বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু বাগানে ফুল না ফুটলে কী করে মাথায় ফুল দেওয়া যায়—সে সম্বন্ধে চশার থেকে ইলিয়টের মধ্যে কেউ কখনও কিছু বলেছেন কি?

আমি কোনো জবাব দিইনি। দিতে পারতুম, দিইনি। জবাবে আমি ওকে মনে করিয়ে দিতে পারতুম—বায়রনের সেই অনবদ্য উক্তিটি—'রেডি মানি ইজ আলাদীনস্ ল্যাম্প্' (নগদ টাকা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ)। মুখে বলিনি, কারণ সেটা ব্যবহারে পরে বুঝিয়ে দেব বলে।

এর পর প্রত্যহ নিউমার্কেট থেকে আমার বাড়ি ফুল সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিলুম।

একটা বিলাতি অর্কেস্ট্রা যেমন ঐকতানে বাজে—এ সংসারের সবকিছুই তেমনি একটা শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের দাম্পত্য-জীবনের মূল সুরটি ধরে রেখেছে। একচুল বিচ্যুতি ঘটবার উপায় নেই। যত কাজই থাক, আমাদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ-সুবিধার ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু ঘটতে দিতুম না। রবিবার সন্ধ্যায় আমার ডায়েরিতে কোনো অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঢুকতে পারেনি। সপ্তাহান্তিক অবসরটা আমি স্ত্রীর সঙ্গে কাটাই। শহরে কোনো একটি প্রেক্ষাগৃহের সবচেয়ে সামনের অথবা সবচেয়ে পিছনের দুটি আরামদায়ক আসন আমাদের প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে। আমার আর্দালী রামলালকে পাঠিয়ে টিকিট কিনে রাখার দায়িত্বটা নন্দার। কী বই দেখবে তার নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণ সুনন্দার উপর ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম প্রথম নন্দা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইত। কোন্ কাগজে কী সমালোচনা বের হয়েছে, কে কী বলেছে আমাকে শোনাতে আসত। আমি ডিভিশন অফ লেবারে বিশ্বাসী। এ বিষয়ে যখন তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে তখন আমি অহেতুক নাক গলাই কেন? সে যেখানে আমায় নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যেতে রাজি। ইবসেনের নোরার মত সে যেন না কোনোদিন বলে বসতে পারে—তাকে নিয়ে আমি 'পুতুল খেলা' করেছি মাত্র। প্রেক্ষাগৃহের সবগুলি আসনের সামনে বসলে বুঝি থিয়েটার দেখছি—সবার পিছনে যখন বসি তখন বুঝে নিই—এ রবিবারে নন্দা আমাকে সিনেমা দেখাচ্ছে।

শুধু এই একটি বিষয়েই নয়—অনেক গুরুতর বিষয়েও আমি তাকে মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ দিই। তার নির্দেশের ওপর অন্ধ নির্ভর করি। এই তো সেদিন কোম্পানি আমার জন্য একজন

অতিরিক্ত লেডি স্টেনো স্যাংশন করল। আপনারাই বলুন, এ বিষয়ে কেউ কখনও স্ত্রীর পরামর্শ নিতে যায়? নিজেই ইন্টারভ্যু নেয়, নিজেই নির্বাচন করে—এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদটা ধর্মপত্নীর কাছে বেমালুম চেপে যায়! আমি এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রম। এবং এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটাই আমার কাছে নিয়ম! আমি সবকটি দরখাস্ত সুনন্দাকে এনে দিলুম। অকপটে বললুম—তুমি যাকে নির্বাচন করে দেবে, আমি নির্বিচারে তাকেই গ্রহণ করব।

পাঠক! তুমি পার এতটা অনাসক্ত হতে?

আমি পারি। নন্দার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। তার অন্যায় আবদার পর্যন্ত আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি। জানি না, দরখাস্তকারিণীরা এ নিয়ে আমার বিষয়ে কী ভেবেছিল! কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে, শুধুমাত্র স্ত্রীর অনুরোধেই অলক মুখার্জি সকলের ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিল? পাঠিকা! তুমি যদি দরখাস্তকারিণী হতে, তাহলে কি বিশ্বাস করতে পারতে যে, তোমার ফটোখানি না দেখেই আর পাঁচখানা ফটোর সঙ্গে তুলে দিয়েছিলুম আমার ধর্মপত্নীর হাতে? অন্য কেউ না জানুক আমি নিজে তা জানি। আর নন্দাও জানে যে, তার একটা খেয়াল চরিতার্থ করতেই আমাকে এই আপাত-অশোভন কাজটি করতে হয়েছিল।

ফটোর বান্ডিলটা তার হাতে দিয়ে ঠাট্টা করেছিলুম—এই নাও। এর থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে খুঁজে বার কর এবার।

সুনন্দা সাগ্রহে ফটোর বান্ডিলটা আমার হাত থেকে নেয়। ডানলোপিলো গদির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বাছতে থাকে ছবির গোছা। হঠাৎ একখানি ফটোতে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ফটোখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—কেমন দেখতে মেয়েটিকে ?

আমি বললুম—কী বললে তুমি খুশি হও?

—সত্যি কথা বললে। মেয়েটি কি খুব সুন্দরী?

—না।

—মেয়েটি কি কুৎসিত?

—না।

—তাও না? তবে কি মেয়েটি মোটামুটি সুন্দরী?

—তা বলা চলে।

হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে সুনন্দা—কোনখানটা ওর সুন্দর দেখলে তা জানতে পারি কি?

কী বিপদ! কী বললে সুনন্দার সঙ্গে মতে মিলবে তা বুঝে উঠতে পারি না। ছবি দেখে মেয়েটিকে সত্যিই কিছু আহা-মরি সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে না। ছিপছিপে একহারা চেহারা। রূপসী না হলেও মুখখানি উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। সুনন্দা আবার বলে—কই, বললে না? ওর কোনখানটা সুন্দর লাগল তোমার?

বললুম—'দি বেস্ট পার্ট অব বিউটি ইজ দ্যাট হুইচ নো পিকচার ক্যান এক্সপ্রেস' (সৌন্দর্যের মর্মকথা সেটাই, যেটা ছবিতে ধরা দেয় না)—

—রাসকিন বলেছেন বুঝি?

—না। বেকন।

—তা আমি তো আর বেকন-সাহেবের মতামত শুনতে চাইনি। আমি শুনতে চাই তোমার কথা।

বললুম—আমার মতামতটা না জিজ্ঞাসা করাই ভালো। সৌন্দর্যের তো কোনও মাপকাঠি নেই—সুতরাং কতটা সুন্দর তা বোঝাতে গেলে তুলনামূলক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। অন্য ছবিগুলো তো আমি দেখিনি। তা কার সঙ্গে তুলনা করব বল?

—অন্য ছবিগুলো তুমি দেখনি? শুধু এই একখানি ছবি দেখেই এত মোহিত হয়ে গেলে? কিন্তু কেন? কী দেখলে তুমি!

আমি বলি—কী আশ্চর্য! তুমি আমার কথাটা বুঝতেই চাইছ না। মোহিত হয়ে যাবার কোনো কথাই উঠছে না। এখানাও তো আমি আগে দেখিনি। তুমি এখন দেখালে, তাই দেখছি। এখন কথা হচ্ছে তুলনা করতে হলে—

বাধা দিয়ে নন্দা বলে—বেশ দেখ, সবগুলো ছবিই দেখ।

ছবির বান্ডিলটা সে ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। অজানা অচেনা একগুচ্ছ মেয়ে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। আমি তাসের প্যাকেটের মতো সেগুলি তুলে রেখে দিলুম টিপয়ে। দেখলাম না চোখ তুলেও। বললুম—না। আমি দেখব না। তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে তাকেই বহাল করব আমি।

—কিন্তু না দেখলে তুলনামূলক বিচার তো তুমি করতে পারবে না!

—না হয় নাই পারলুম।

—তাহলে বরং আমার সঙ্গে তুলনা করে বল। না কি, আমার দিকেও কখন চোখ তুলে দেখনি তুমি?

বললুম—মাপ কর নন্দা, সে আমি পারব না। তোমার সঙ্গে কোনো মেয়ের তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার পাশাপাশি কোনো মেয়েকে বসিয়ে মনে মনে তুলনা করছি—এটা আমি ভাবতেই পারি না। করলেও বিচারটা ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে হয়তো মিস্ য়ুনিভার্সও আমার কাছে পাস-মার্ক পাবেন না।

সুনন্দা লজ্জা পায়। বলে—যাও, যাও। অতটা ভালো নয়।

সুনন্দা জানে, আমি মিথ্যা কথা বলিনি। সে মর্মে মর্মে জানে যে, তার রূপের জ্যোতিতে আমি অন্ধ হয়েই আছি। গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে, দৃষ্টি হয় নত। রূপের প্রশংসা করলেই নন্দার ভাবান্তর হয়। অথচ তার রূপের প্রশংসা আমাকে প্রায় প্রত্যহই করতে হয়।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ জন্যে আমাকে মিথ্যাভাষণ করতে হয় না। বস্তুত সুনন্দা নিজেও জানে যে, সে অপূর্ব সুন্দরী। আমি না বললেও পথচারীরা বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টির লেফাফায় এ বারতা তাকে নিত্য জানায়। আমি অবশ্য তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করি অন্য কারণে। আমি তার রূপের প্রসঙ্গ তুললেই সে লজ্জা পায়—লাল হয়ে ওঠে। যে কারণে বাড়িতে নিত্য ফুলের ব্যবস্থা করেছি ঠিক সেই কারণেই আমি মাঝে মাঝে ওর রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। তখনই মনে পড়ে কবি গ্রেগরীর সেই কথা—'হোয়েন এ গার্ল সিজেস্ টু ব্লাশ, শী হ্যাজ লস্ট দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল চার্ম অব হার বিউটি।' অর্থাৎ, কোনও একটি মেয়ে তার সৌন্দর্যের প্রধান চার্মটি, মানে আকর্ষণটি তখনই হারিয়ে ফেলে যখন থেকে সে—কী আশ্চর্য! 'ব্লাশের' বাংলা কী? লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা? নাঃ! বাংলায় ডায়েরি লেখা এরপর বন্ধ করে দেব। একটা ভালো কথা যদি বাংলায় লেখা যায়!

মোট কথা, সুনন্দা আমাকে জোর করে ধরে বসল, ঐ মেয়েটিকেই চাকরিটা দিতে হবে। কেন, তা বলল না। মেয়েটির দরখাস্তখানি বার করলুম। পর্ণা রায়, বি. এ.। ইতিপূর্বে কোথাও চাকরি করেনি। সম্প্রতি কমার্সিয়াল কলেজ থেকে স্টেনোগ্রাফি পাস করেছে, স্পীডের উল্লেখ করেনি। অপরপক্ষে অন্যান্য প্রার্থিনীদের সুপারিশ ছিল, প্রাক্তন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর ছিল অভিজ্ঞানপত্রে (টেস্টিমোনিয়ালের বাংলা ঠিক হল তো?)। সে কথা নন্দাকে বললুম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। এ রকম বিপাকে পড়লে আপনারা যা করতেন আমিও তাই করলুম—কথা দিই—মোটামুটি যদি ডিক্‌টেশন নিতে পারে, তবে তাকেই রাখব। আমি আমার কথা রেখেছি। না, ভুল হল, আমি যা কথা দিয়েছিলুম তার বেশিই করেছি। মেয়েটি মোটামুটি ডিক্‌টেশনও নিতে পারেনি। তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। কেন? কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি ভিতরে কোনও ব্যাপার আছে। সুনন্দা কি মেয়েটিকে চেনে? তাহলে স্বীকার করল না কেন? আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি করি, সে অন্য কথা বলে এড়িয়ে যায়। একবার বলল—অন্যান্য দরখাস্তকারিণীদের তুলনায় এ মেয়েটির রূপের সম্ভার অল্প। কথাটা, জানি, ডাহা মিথ্যে! না না, অন্যান্য ফটোর সঙ্গে তুলনা করে এ কথা বলছি না। বস্তুত অন্যান্য ছবিগুলি আমি আজও দেখিনি। (পাঠক! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? না হতে পারে, তুমি তো আমার সুনন্দাকেও দেখনি!) সম্ভবত সুনন্দা নিজেও দেখেনি। কারণ আমি জানি, সে ভয় নন্দার কোনোদিন ছিল না, থাকতে পারে না। সে জানে, অলক মুখার্জি আর যাই করুক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর একবার ও বললে—বেকার মেয়েটি যে ভাবে দরখাস্তে করুণ ভাষায় আবেদন করেছে তাতেই সে বিচলিত হয়েছে। এটাও বাজে কথা। কারণ সকলের দরখাস্তের ভাষাই প্রায় একরকম। শেষে বলে—দেখ, অন্যান্য মেয়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, তারা সহজেই অন্যত্র চাকরি জুটিয়ে নেবে। এ

মেয়েটিকে যদি আমি উদারতা না দেখাই, এর পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্ত। এ কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এটাও আসল কথা নয়। আসল কথা, মেয়েটি সুনন্দার পূর্ব-পরিচিত। তবে সেকথা ও স্বীকার করল না কেন?

কারণটাও অনুমান করতে পারি। সুনন্দা জানে আমি আদর্শবাদী। স্ত্রীর পরিচিত কাউকে চাকরি দেওয়ার অর্থ 'নেপটিজ্‌ম', অর্থাৎ আত্মীয়-পোষণ। পর্ণা অবশ্য আমার আত্মীয় নয়, কিন্তু নেপটিজমের বাংলা কি ঠিক আত্মীয়-পোষণ? 'পরিচিত-পোষণ' বলব কি? দূর হোক, বাংলা না হয় নাই করলুম। জিনিসটা তো খারাপ? সুনন্দা জানে, অলক মুখার্জি কখনও নেপটিজমের কবলে পড়বে না—স্ত্রীর অনুরোধেও নয়। সম্ভবত সেই জন্যেই সে আসল কারণটা গোপন করে গেল।

এ প্রায় দেড় মাস আগেকার ঘটনা। ছয় সপ্তাহ আগে কোম্পানির খাতায় একটি নতুন নাম উঠেছে। পর্ণা রায়, বি. এ.। লম্বা একহারা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শ্যামলা রঙ। সমস্ত অবয়বের মধ্যে আশ্চর্য আকর্ষণ ওর চোখ দুটিতে। যেন কোন অতলস্পর্শ গভীরতার স্বপ্নে বিভোর। দিনান্তের শেষ শ্যামলছায়া যেমন দিগন্তের চক্রবালে আপনাতেই আপনি লীন হয়ে থাকে—মেয়েটির অন্তরের সব কথাই যেন তেমনি দুটি চোখের তারায় মগ্ন হয়ে আছে। ওর সে চোখের দিকে চাইলে মনে হয় সেখানে কোনো নিগূঢ় স্বপ্ন নিঃসাড়ে সুপ্তিমগ্ন। তখন মনেও হয় না যে, ঐ ছায়া-ঘন শান্ত দিক্‌চক্রবালেই হঠাৎ ঘনিয়ে আসতে পারে কালবৈশাখীর ভ্রূকুটি। তখন সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় হয়। আবার ঐ চোখেই ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ উঁকি দেয় অস্তসূর্যের শেষ স্বর্ণাভা! তখনও সে চোখের দিকে তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়।

নন্দার চোখ দুটিও সুন্দর। অনিন্দ্য। সমস্ত মুখাবয়বের সঙ্গে অত্যন্ত মানানসই। কিন্তু সে চোখ জ্বলে না। সে যেন হরিণের চোখ—শান্ত, করুণ, উদাস—সরল সারঙ্গ দৃষ্টি। টেনিসনের ভাষায়— 'হার আইজ আর হোমস্‌ অব সাইলেন্ট প্রেয়ার'—সে চোখে যেন উপাসনা-মন্দিরের স্নিগ্ধ সৌম্যতা। আর এই মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে মনে পড়ে শেক্সপীয়ারকে—'এ লাভার্স আইজ উইল গেজ অ্যান ঈগ্‌ল ব্লাইন্ড!' ঈগল পাখিও সে চোখের দিকে চাইলে অন্ধ হয়ে যায়।

এ সব কথাই কিন্তু একেবারে প্রথম দিন মনে হয়নি। পরে হয়েছে। আমি যখন ডিক্‌টেশন দিই ও মাথা নিচু করে কাগজের ওপর দুর্বোধ্য আঁচড় টানতে থাকে। আমি ওর নতনেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেখানেও যেন আমার অজানা ভাষায় কোন দুর্বোধ্য আঁচড় পড়ছে। আমি সে চোখের ভাষা পড়তে পারি না, ও পারে! আবার টাইপ-করা কাগজখানি সই করার আগে আমি যখন পড়তে থাকি ও সামনে বসে থাকে চুপ করে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তখন বুঝতে পারে যে, সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে চাহনি ঈগল দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেবার ক্ষমতা রাখে! আমি অসোয়াস্তি বোধ করি। পড়তে পড়তে যখনই চোখ তুলি—তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

এ সব কথাই কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়নি। ক্রমে হয়েছে।

আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে, সুনন্দার আগ্রহাতিশয্যে এই মেয়েটিকে চাকরি দিয়েছি। সে কথা মনে পড়ল একদিন সুনন্দার কথাতেই। হঠাৎ ও একদিন প্রশ্ন করে বসল—পর্ণা কেমন কাজ করছে?

—পর্ণা কে? আমি প্রতিপ্রশ্ন করি। আমার স্টেনোকে আমি মিস রয় বলেই ডাকি। তার নাম যে পর্ণা সে কথা সে সময়ে আমার খেয়াল ছিল না।

সুনন্দা ফোঁস করে ওঠে—অতটা ভালোমানুষী ভালো নয়; তোমার স্টেনোর নাম পর্ণা নয়?

—ও! মিস্‌ রয়? হ্যাঁ, তা ভালই কাজ করছে। কেন?

—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমার অনুরোধে ওকে চাকরি দিলে তো। তাই জানতে চাইছি, আমার নির্বাচন তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

এই পছন্দ-অপছন্দ কথাগুলি বড় মারাত্মক। তাই ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলি—একদিন বাড়িতে নিয়ে আসব? আলাপ করবে?

সুনন্দা অস্বাভাবিকভাবে চমকে ওঠে। আর্ত কণ্ঠে বলে—না না না! অমন কাজ তুমি কর না।

আমি অবাক হয়ে যাই। বলি—ব্যাপার কী? এতটা ভয় পাওয়ার কী আছে? সে তো আর কামড়ে দেবে না তোমাকে?

সুনন্দা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ছলে বলে—কী করে জানলে?

—জানলুম, কারণ এতদিনেও আমাকে একবারও কামড়ায়নি।

—তাই নাকি। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

আমি বলি—নন্দা, তুমি আমাকে সেদিন মিছে কথা বলেছিলে, মেয়েটিকে তুমি চিনতে।

সুনন্দা এতদিনে স্বীকার করে।

—তাহলে সেদিন বলনি কেন?

এতদিনে সব কথা খুলে বলল সে। বললে—পর্ণা আমাদের কলেজে পড়ত। একই ইয়ারে। খুব গরিব ঘরের মেয়ে। তাই ভেবেছিলাম—যদি বান্ধবীর একটা উপকার করতে পারি। তোমাকে বলিনি, পাছে আমার বান্ধবী বলেই তোমার আপত্তি হয়।

—তাহলে ওকে এখানে আনতে তোমার এত আপত্তি কিসের?

—ও লজ্জা পাবে বলে। তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই—ও ছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ক্লাসে কোনোবার ও ফার্স্ট হয়েছে কোনোবার আমি। দুজনেরই বাংলায় অনার্স ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েটি আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে চাইত। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে হেরে গিয়েছে আমার কাছে। খেলাধুলা, ডিবেট ইত্যাদিতে আমার কাছে হার স্বীকার করেছিল। তাই আমাকে ভীষণ হিংসে করত। আজ যদি সে জানতে পারে—আমারই অনুগ্রহে ওর চাকরি হয়েছে—তখন ব্যথাই পাবে সে মনে মনে। ওদের বাড়ির যে অবস্থা তাতে চাকরি ও ছাড়তে পারবে না—অথচ প্রতিদিনের কাজ আত্মগ্লানিতে ভরে উঠবে ওর।

সুনন্দার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে গোপনে উপকার করতে চায়। যার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিল—পাছে সে লজ্জা পায়, ব্যথা পায়, তাই সে কথা জানাতেও চায় না। ওর সব কথা শুনে স্নেহে শ্রদ্ধায় মনটা ভরে ওঠে। ওর মনের যেন একটা নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শুধু বহিরঙ্গই সুন্দর নয়, ওর অন্তরটাও সোনা দিয়ে মোড়া। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলি—খেলাধুলা, ডিবেট, পড়াশুনা সব ক্ষেত্রেই তো তাকে হারিয়ে দিয়েছিলে—কিন্তু কলেজ জীবনের আসল প্রতিযোগিতার কথাটা তো বললে না?

—আসল প্রতিযোগিতা মানে?

—মদন-মন্দিরের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হয়নি তোমাদের?

ও হেসে বলে—এ তো তোমাদের বিলেতের কলেজ নয়।

আমি বলি—তাহলে ফাইনাল-রাউন্ডের খেলাটা হয়নি। কিন্তু সেমি-ফাইনালের খেলাতে ও তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে নন্দা।

আমার বুক থেকে মুখ তুলে ও বলে—তার মানে?

—মিস্ রয় অনার্স নিয়েই বি. এ. পাস করেছে।

সুনন্দা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—তুমি ওর অরিজিনাল সার্টিফিকেট দেখেছ?

—না, কেন?

—পর্ণা বি. এ. পরীক্ষা দেয়নি।

—কী বলছ যা তা, তাহলে দরখাস্তে ও কথা লিখতে সাহস পায়?

—আমি নিশ্চিতভাবে জানি। আমরা একই ইয়ারে পড়তাম। বেয়াল্লিশ সালে আমাদের পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। পরীক্ষার আগেই ওকে পুলিশে ধরে। তারপর আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত ও ছাড়া পায়নি। ইতিমধ্যে ওর বাবা মারা যান। আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ওর।

আমি বলি—এও কি সম্ভব? পাস না করেই মেয়েটি নামের পাশে বি. এ. লিখেছে?

সুনন্দা বলে—পর্ণার পক্ষে সবই সম্ভব।

—বেশ, খোঁজ নেব আমি।

—না থাক, দরকার কী? অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে পর্ণা। বাপও মারা গেছে। ওর সঙ্গে কলেজে একটি ছেলের খুবই মাখামাখি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, তার সঙ্গেই ওর বুঝি বিয়ে হয়েছে।

দরখাস্ত পড়ে বুঝলাম তা হয়নি। কী দরকার এ নিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করার! অহেতুক চাকরিটা খোয়াবে বেচারি। খাবে কী?

আমি বলি—কী যা তা বকছ নন্দা! এ তো জালিয়াতি রীতিমতো! জেল পর্যন্ত হতে পারে এ জন্য!

—বল কী, জেল পর্যন্ত হতে পারে? কিন্তু প্রমাণ করবে কী করে?

এ আলোচনা এখানেই বন্ধ করে দিই, বলি—এক কাপ কফি খাওয়াতে পার?

পরদিনই মিস্ রয়কে বলি—আপনার ক্রিডেনশিয়ালগুলোর অ্যাটেস্টেড কপিই দেখা আছে আমার। কালকে অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো সব একবার আনবেন তো।

ঈগলদৃষ্টি-দন্থী দৃষ্টি পড়ে আমার মুখের ওপর।

—হঠাৎ, এতদিন পরে?

—হ্যাঁ। তাই নিয়ম। অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো দেখে আপনার সার্ভিস-বইতে সই করে দিতে হবে আমাকে। কাল সব নিয়ে আসবেন। ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানাও।

—ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানা তো কাল আনতে পারব না স্যার। সেটা দেশে আছে। অন্যান্য মূল কাগজ অবশ্য আনব।

কেমন যেন সন্দেহ বেড়ে যায়! সবই আছে কাছে, আর ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানাই দেশের বাড়িতে আছে? কিন্তু যখন ধরেছি তখন শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আমাকে। বাধ্য হয়ে বলি—বেশ, উইকেন্ডে আনিয়ে নেবেন। না হয় দুদিন ছুটিই নিন।

—দেশ মানে স্যার, পাকিস্তান। সে তো আনা যাবে না স্যার।

একথার পর সন্দেহ আর বাড়ে না! এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। মেয়েটি বি. এ. পাস করেনি আদপে। কিন্তু কী দুঃসাহস! সুনন্দার বান্ধবী বলে ক্ষমা করতে পারব না আমি। এ অপরাধ অমার্জনীয়। পুলিশে অবশ্য ধরিয়ে দেব না, কিন্তু চাকরিতেও রাখতে পারব না ওকে। আমার স্টেনো হিসাবে অনেক গোপন খবর ও অনিবার্যভাবে পাবে। যে মেয়ে এত বড় জালিয়াতি করতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। কে জানে, অফিসের গোপন খবর জেনে নিয়ে হয়তো শেষে আমাকেই ব্ল্যাকমেইলিং শুরু করবে। অগত্যা সুকৌশলে এগিয়ে যেতে হল আমাকে।

—আই সী! দেশ মানে পূর্ব-পাকিস্তান! তা কোন ইয়ারে বি. এ. পাস করেন আপনি?

—বেয়াল্লিশ সালে।

—কোন কলেজ থেকে?

—প্রাইভেটে।

—কোনো কলেজে পড়তেন না আপনি?

—পড়তাম। পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিই।

—অনার্স ছিল বলেছিলেন—না?

—হ্যাঁ, স্যার, বাংলায়—সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস সেবার কেউ পায়নি।

—ও। তা কোন কলেজে পড়তেন আপনি?

পর্ণা যে মফস্বল কলেজটির নাম করে সেখান থেকেই সুনন্দা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার তাই প্রশ্ন করি—আচ্ছা, আপনাদের ঐ কলেজে সুনন্দা চ্যাটার্জি বলে একটি মেয়ে পড়ত?

ডিক্টেশনের পেনসিলটা দিয়ে কপালে মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে পর্ণা একটু ভেবে নিয়ে বললে—সুনন্দা! না! মনে পড়ছে না তো? কেমন দেখতে বলুন তো?

—খুব সুন্দরী একটি মেয়ে?

—কই, মনে তো পড়ছে না! সুমিত্রা না সুপ্রিয়া নামে একটা মেয়ে আমাদের ক্লাসে ছিল মনে হচ্ছে—বড়লোকের মেয়ে, একটু পুরুষালিভাব, খেলাধুলা সাইকেল চড়ায় মাতামাতি করত—কিন্তু সুন্দরী তাকে কেউ বলবে না। রঙটা অবশ্য কটা ছিল মেয়েটির, কিন্তু মুখ ছিল গোলগাল, হুলো বেড়ালের মত।

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে আমার! মেয়েটি শুধু জালিয়াতিই নয়, চালিয়াতও। কলেজ জীবনে যে

ছাত্রীটির কাছে সব বিষয়ে হার স্বীকার করতে হয়েছে, আজ তার অস্তিত্বটাই স্বীকার করতে চায় না! মনে মনে বললুম—তুমি জানতেও পারলে না পর্ণা, তোমার যে সহপাঠিনীকে আজ তুমি চিনতে চাইছ না—যার সৌন্দর্যে আজও ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছ, সেই মেয়েটির উদারতাতেই আজ তোমার রান্নাঘরে দুবেলা উনুন জ্বলে!

—তা আপনি এই সুনন্দা চ্যাটার্জিকে চেনেন নাকি স্যার?

আমি এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলি—এই চিঠিগুলো টাইপ করে আনুন!

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তৎক্ষণাৎ চিঠির কাগজগুলো নিয়ে সরে পড়ে।

বুঝলুম, মেয়েটি নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছে। মফস্বলের গভর্নমেন্ট কলেজ। কোয়েডুকেশন ছিল! সুতরাং ছাত্রী ছিল মুষ্টিমেয়। নন্দার কাছে গল্প শুনেছি—তার নাম ছিল 'কলেজ-কুইন'। ফার্স্ট-ইয়ার থেকে ফোর্থ-ইয়ার পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলে, মায় দপ্তরী-বেয়ারাগুলো পর্যন্ত চিনত তাদের কলেজ-কুইনকে। আর মিস্ রয় তার সহপাঠিনী হয়ে তাকে চিনবে না, এ হতে পারে না। পর্ণা নিশ্চয় জানে না যে, ঐ সুনন্দাই তার 'বসের' ঘরণি; জানলে এ সুরে কথা বলত না সে। কিন্তু তা হলেও পর্ণার হিংসুটে মনের কী কদর্য রূপটাই দেখতে পেলুম মুহূর্তে। ওর প্রতি যেটুকু করুণা সঞ্চারিত হয়েছিল তা ভেসে গেল ওরই কথায়। প্রভু-ভৃত্য ছাড়া ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখা চলবে না। কিন্তু না! সে সম্পর্কও ছিন্ন করতে হবে। যে মেয়ে য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রি জাল করতে পারে তাকে অফিসে রাখা চলে না।

রাত্রে সব কথা নন্দাকে খুলে বলি। নন্দা যেন জ্বলে ওঠে—কী বলল সে? হুলো বেড়ালের মত?

আমি বলি—আহাহা, সে তো আর তোমাকে বলেনি।

—আমাকে না তো আর কাকে?

—যাক, আমার কী মনে হয় জান? মেয়েটি সত্যিই পাস করতে পারেনি। তাই বললে, ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানা পাকিস্তানে আছে।

—তাতে আর সন্দেহ কী?

—আমি খোঁজ নিয়ে বার করব!

—কোথায় খোঁজ নেবে?

—তাই তো ভাবছি।

—খোঁজ অবশ্য তুমি য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীতেই পেতে পার। কিন্তু আমি কী বলি জান? থাক্ না। খুঁচিয়ে ঘা করে কী লাভ? দুটো পয়সা করে খাচ্ছে। তুমি বলছ, এতে জেল পর্যন্ত হতে পারে?

—হতে পারে মানে? হবেই।

—তবে থাক। আমরা বরং ধরে নিই পর্ণা সত্যি কথাই বলেছে!

আমি বলি—দেখ নন্দা, স্যার ফিলিপ সিড্‌নি বলেছেন,—'দ্য ওন্‌লি ডিস্‌অ্যাডভান্‌টেজ অফ অ্যান অনেস্ট হার্ট ইজ ক্রেডুলিটি।' অর্থাৎ কিনা, মহৎ হৃদয়ের একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে তার বিশ্বাসপ্রবণতা। তোমার অন্তঃকরণ মহৎ, তাই তুমি অন্ধ বিশ্বাস করতে চাইছ। কিন্তু বিজনেসে অন্ধ-বিশ্বাসের স্থান নেই।

নন্দা মাথা নেড়ে বলে—তা নয় গো। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। সে আমার শত্রুতা করেছে আজীবন, আজও করছে। তা করুক। আমি ওকে ক্ষমা করতে চাই।

ওকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে বলি—'দ্য ফাইন অ্যান্ড নোব্‌ল ওয়ে টু ডেসট্রয় এ ফো ইজ টু কিল হিম্; উইথ কাইন্ডনেস য়ু মে সো চেঞ্জ হিম দ্যাট হি শ্যাল সীজ টু বি সো; দেন হি ইজ স্লেইন!' —বল তো কার কথা?

নন্দা নির্জীবের মতো বলে—জানি না।

আমি বলি—অ্যালেইনের। কিন্তু মিস্ রয় তো আমার 'ফো' নয়, আমার স্টাফ। আমাকে খোঁজ নিতেই হবে। অন্যায় যদি সে করে থাকে তাহলে শাস্তিও পেতে হবে তাকে। বিশেষ, জেনে হোক না জেনে হোক, সে তোমাকে অপমান করেছে।

নন্দা কোনো কথা বলে না।

পরদিন মিস্ রয় সকল সংশয়ের ওপর যবনিকাপাত করল। ছাপানো গেজেট এনে প্রমাণ করল যে, সে প্রাইভেটে বি. এ. পাস করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান ছিল তার! রাজবন্দি হিসাবে সে পরীক্ষা দিয়েছিল।

সংবাদটা সুনন্দাকে দিলুম। এবারও সে কোনো কথা বলল না।

দুই

কাজটা বোধ হয় ভালো করিনি। অবশ্য এখন আর ভেবে কী হবে? কেন এ কাজ করলাম? কিন্তু করব নাই বা কেন? এইতো স্বাভাবিক। ভাগ্য বিড়ম্বনায় আজ ও বেচারি নেমে গিয়েছে অনেক নিচে। দু-মুঠো অন্নের জন্য বেচারিকে কত দরখাস্ত করতে হয়েছে। আর আমি আজ উঠে এসেছি ওর চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে। অথচ একদিন আমরা একই ক্লাসে বসতাম। একই বেঞ্চিতে। আমি ওকে দয়া না করলে কে করবে?

যেদিন অলক দরখাস্তের বান্ডিলটা আমাকে এনে দিল সেদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, ওর মধ্যে আছে একটি দীন আবেদন—মিস্ পর্ণা রায় করুণ ভাবে ভিক্ষা করছে একটি চাকরি— মিসেস্ সুনন্দা মুখার্জির স্বামীর কাছে? জানলে ও নিশ্চয়ই এখানে দরখাস্ত করত না। করত না? নিশ্চয়ই করত! যে রকম নির্লজ্জ আর হ্যাংলা প্রকৃতির মেয়ে ও—ঠিক এসে ধরনা দিত আমার কাছে। সোজাসুজি এসে ধরত আমাকে। কী বলতাম? বলতাম—'আমি দুঃখিত। চাকুরিপ্রার্থিনীদের যোগ্যতা বিচারের ভার যাঁর উপর তিনিই দেখে নেবেন। এ বিষয়ে কোনো অনুরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' ম্লান হয়ে যেত ওর মুখটা। কিন্তু না, ও যদি জানতে পারত যে, যে ছিল কলেজ-জীবনে তার চরমতম শত্রু সেই সুনন্দা চ্যাটার্জির স্বামীই হচ্ছেন এই অলক মুখার্জি—তাহলে হয়তো ও এই চাকরির জন্য দরখাস্তই করত না। আমার তো বিশ্বাস আজও যদি সে ওকথা জানতে পারে তাহলে চাকরিতে ইস্তফা দেবে। তাই জানতে ওকে আমি দেব না। অর্থাৎ ভালো করে একদিন ওকে জানিয়ে দেব সেকথা।

সেদিন দরখাস্ত দেখেই ওকে চিনতে পেরেছিলাম। নিঃসন্দেহ হলাম ছবি দেখে। কিন্তু পর্ণা রায় এখনও 'মিস্' কেন? তাহলে গৌতম ব্যানার্জি কোথায় গেল? তা ছাড়া পর্ণা পাস করল কেমন করে? বছর পনেরো আগেকার কথা মনে পড়ছে। কী মধুর ছিল দিনগুলো! বোমার হিড়িকে আমরা সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছি মফস্বলের একটা শহরে। সে বছরই আমি আই. এ. পাস করলাম। বাবা কিছুতেই আর আমাকে কলকাতায় রাখবেন না। তাঁর বিশ্বাস জাপানিরা নাকি আমারই মাথায় ফেলবে বলে বোমা জমিয়ে রেখেছে! তা ছাড়া কলকাতার বাড়িও তখন তালাবন্ধ। বাধ্য হয়ে নাম লেখালাম মফস্বলের সেই কলেজে।

শহরের একান্তে একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ। তার উল্টো দিকে ক্রিশ্চান মিশনারী স্কুল। মাঝখান দিয়ে কালো পীচমোড়া রাস্তাটা চলে গেছে কলেজের দিকে। না, ভুল বললাম! আমরা যখন পড়তাম তখনও রাস্তাটা ছিল লাল-খোয়াবাঁধানো ধুলোর রাস্তা। প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গেলাম, সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। ক্লাস নিচ্ছিলেন বি. আর. ডি. জি.। পুরো নামটা আজ আর মনে নেই। কলেজের সব অধ্যাপককেই আমরা নামের আদ্যক্ষর দিয়ে উল্লেখ করতাম। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলাম। দেখলাম, সারা ক্লাসটা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আজ না হয় আমার বয়স হয়েছে—তখন আমি ছিলাম—যাকে বলে ডাকসাইটে সুন্দরী। ক্লাস ছুটি হতে মেয়েরা সব যেচে ভাব করতে এল আমার সঙ্গে। ক'দিনেই লক্ষ্য করলাম ছেলেগুলো আমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরঘুর করছে। হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেলে পাঁচটা ছেলের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়—কে আগে কুড়িয়ে দিতে পারে। অল্পদিনেই শুনতে পেলাম, আমার নতুন নামকরণ হয়েছে—'কলেজ-কুইন'!

কলকাতা কলেজের অভিজ্ঞতা ছিলই, বরং মফস্বলের ছেলেরা একটু মুখচোরা। তা হোক, তবু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেল আমার কথা—শুধু সুন্দরী বলে নয়, ভালো ছাত্রী বলে, বেস্ট

ডিবেটার বলে, টেবিল-টেনিস চ্যাম্পিয়ান বলে। আমার অপ্রতিহত গতির সামনে কেউ কোনো দিন এসে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। আমি কলেজে আসতাম একটি লেডিজ-সাইকেলে চেপে। প্রথম দিন ক্লাস ছুটি হবার পর দেখি চাকায় হাওয়া নেই। বুঝলাম কেউ দুষ্টুমি করেছে। কয়েকটি ছেলে গায়ে পড়ে সহানুভূতি জানাতে এল। পাম্প করে দেবার প্রস্তাব করল কেউ কেউ। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে অস্বীকার করলাম। কলেজ থেকে অদূরে ক্রিশ্চানপাড়ার মোড়ে ছিল একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। সেখানে পাম্প করিয়ে নিলাম। দোকানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম সেটা মাসিক এক টাকায় জমা রাখার। দু-একবার ক্লাসের বোর্ডে কলেজ-কুইনের নামে অহেতুক উচ্ছ্বাস-মাখানো দু-এক লাইন কবিতা পড়েছি। গ্রাহ্য করিনি। বুঝতাম, এগুলো আমার প্রাপ্য। কই, আর কারও নামে তো কবিতা লেখা হয় না!

এই প্রসঙ্গে আলাপ হয়ে গেল একদিন গৌতম ব্যানার্জির সঙ্গে। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। সেদিন একটু দেরি করে এসেছি। শুনলাম, আমি আসার আগে নাকি ক্লাসে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে! গিরীন ঘোষ বলে একজন গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। সে নাকি বোর্ডে আমার নামে কী সব লিখছিল। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বুঝি নজরে পড়ে গৌতমের। সে ক্লাসে ঢুকে গিরীনকে বারণ করে। তখনও ছাত্রীবাহিনীর চালচিত্র পেছনে নিয়ে অধ্যাপকের মূর্তির আগমন ঘটেনি ক্লাসে। গিরীন রুখে ওঠে—'আমাদের থার্ড-ইয়ার ক্লাসে তো কেউ আপনাকে মাতব্বরি করতে ডাকেনি।'

গৌতম ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্র! সে বলে—'ওসব থার্ড-ইয়ারও বুঝি না—এসব থার্ড-গ্রেড ইয়ার্কিও বুঝি না। ফোর্থ ইয়ারে ওঠেননি বলেই কিছু অভদ্রতা করবার মতো নাবালক নন আপনি।'

অল্প কথা-কাটাকাটির পরেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। গিরীনরা ছিল দলে ভারী। গৌতমই মার খেয়েছে বেশি।

গৌতম ছেলেটিকে চিনতাম—ফোর্থ-ইয়ারের সেরা ছেলে। সব দিকেই বেশ চৌকস। যেমন দেখতে, তেমনি পড়াশুনায়। আলাপ ছিল না ওর সঙ্গে—না থাক, ঠিক করলাম ছুটির পরে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানাব। ছুটির পর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, গৌতম ফার্স্ট-এইড নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছে।

দেখা হল পরের দিন। সে দিনটার কথাও ভুলব না। থার্ড পিরিয়ড অফ্ ছিল। বসেছিলাম মেয়েদের কমনরুমে। ঘরটা প্রফেসরদের ঘরের সংলগ্ন। কলেজপ্রাসাদের একান্তে। জানলা থেকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ খেলার মাঠটা। মাঠের ওপাশে মিশনারী স্কুলের গির্জা। ক্রিশ্চানপাড়ার ঘরগুলি দেখা যায়। জানলার পাশেই একটা অশোকগাছ। বসন্ত চলে গেছে, তবু আজও ওর বসন্তবিদায় পর্ব শেষ হয়নি—ডালে ডালে লেগে আছে আবীরের ছোঁওয়া। গরম পড়তে শুরু করেছে। খেলার মাঠের ওপর তাপদগ্ধ প্রান্তরের দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে উঠছে আকাশের দিকে। কোথায় একটা হতভাগ্য কোকিল স্থান-কাল-পাত্র ভুলে একটানা ডেকে চলেছে এই তপোবনে! একপাল মোষ চলে গেল ধুলো উড়িয়ে—গলায় বাঁধা ঘণ্টার ঠন্ ঠনাঠন্ স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অলসতার সঙ্গে সুন্দর ঐকতান রচনা করল। মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। কমনরুমটা খালি। মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বাগানে ঘুরছে। কোনো কোনো ভাগ্যবতীর আবার বান্ধবীর বদলে বন্ধুও জুটে গিয়েছে। অশোকতলায় একটু দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ওদের। হঠাৎ নজরে পড়ল ফোর্থ-ইয়ারের গৌতম কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে ল্যাবরেটারি থেকে। উত্তেজিতভাবে কী একটা আলোচনা করতে করতে ওরা চলে যাচ্ছে লাইব্রেরীর দিকে। এতদিন ভালো করে লক্ষ্য করিনি ভদ্রলোককে। আজ দেখলাম! ফর্সা রঙ—চুলগুলো পেছনে ফেরানো, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা। গায়ে একটা সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি, হাতাটা গোটানো। হাতে ল্যাবরেটারির খাতা, কাঁধে অ্যাপ্রন। বেয়ারাটার হাতে একটা স্লিপ দিয়ে ডেকে পাঠালাম।

বেয়ারাটা চলে যেতেই কেমন যেন লজ্জা করে উঠল। কেন এ কাজ করলাম? ভদ্রলোককে আমি চিনি না, মানে আলাপ নেই। এভাবে ডেকে পাঠানোটা কি ঠিক হল? কমনরুমের ও প্রান্তে ইতিমধ্যে কয়েকটি মেয়ে এসে বসেছে। তাই বেরিয়ে এলাম করিডোরে। দেখি বেয়ারার হাত থেকে ও কাগজটা নিল; ঝুঁকে পড়ল ওর বন্ধুরা কাগজটা দেখতে। আলোচনাটা থেমে গেছে ওদের। একজন কী একটা কথা বললে, ওরা সমস্বরে হেসে ওঠে। আর একজন গৌতমের পিঠে একটা চাপড় মারে। গৌতমকে

খুব গম্ভীর মনে হচ্ছে। ও চশমাটা খুলল, রুমাল দিয়ে কাঁচটা মুছে ফের চোখে দিল। কী যেন জিজ্ঞাসা করল বেয়ারাটাকে, সে হাত দিয়ে আমাকে দেখাল।

গৌতম ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আমার দিকে।

—'আপনি আমাকে ডাকলেন?'

—হ্যাঁ, মানে, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবু মনে হল আপনাকে ডেকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

—'ধন্যবাদ! হঠাৎ খামকা আমায় ধন্যবাদ দেবেন কেন?'

—'কাল নাকি আপনি আমারই জন্যে আহত হয়েছিলেন?'

—'আপনার জন্য? কই জানি না তো!'

চমকে উঠলাম। ও অস্বীকার করতে চায় কেন ঘটনাটাকে? খবরটা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি—কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই জোর দিয়ে বললাম—'কাল গিরীনবাবুর সঙ্গে আপনার—'

—'ও হ্যাঁ, তা তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

—'আমার নামেই গিরীনবাবু বোর্ডে লিখছিলেন—'

—'তাই নাকি, তা আপনার নামটা কী?'

—'সুনন্দা চ্যাটার্জি।'

—'কই ও নাম তো লেখেনি গিরীন!'

—'না, নামটা না লিখলেও আমাকেই মীন করেছিল।'

—'কী করে জানলেন? আমার যতদূর মনে আছে কোনো মেয়ের নামই সে লেখেনি। লিখেছিল 'কলেজ-কুইনের' নামে দু-লাইন কবিতা। তা আপনি কেন ভাবছেন যে, আপনাকেই মীন করেছিল?'

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে ওর ন্যাকামি দেখে। যেন কিছুই জানে না! বললাম—'আমি কী ভাবছি সেটা কথা নয়—ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে ভেবেছিল যে আমাকেই মীন করা হয়েছে।'

—'ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে মোটেই তা ভাবেনি। সবাই ভেবেছিল—ঠিক আপনি যা ভেবেছেন। কারণ প্রত্যেক মেয়েই ভাবে সেই বুঝি 'কলেজ-কুইন'। আর মেয়েদের এই রকম ভ্রান্ত ধারণা আছে বলেই ছেলেরা ঐ রকম অসভ্যতা করে। ছেলেদের অসভ্যতাটা প্রকাশ্যে, কিন্তু তাতে ইন্ধন যোগায় মেয়েরাই। সিল্কের শাড়ি পরে আর একগাদা রঙ মেখে সঙ সেজে কলেজে আসতে তাদের সংকোচ হয় না বলেই ছেলেরাও বাড়াবাড়ি করে।'

এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কী করে অপমান করা যায়? আমার পরিধানে সেদিন ছিল সিল্কের শাড়ি। প্রসাধনটা নিখুঁত না হলে আমি বাড়ির বার হই না—কলেজেও আসতে পারি না।

রাগে অপমানে আমার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। একটা কথাও বলতে পারি না। ঘন্টা পড়ে গিয়েছিল। দলে দলে সবাই বেরিয়ে আসছে ক্লাস থেকে। গৌতম হয়তো আরও কিছু বলত, হঠাৎ আমার ওপাশ থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলে—'কী হচ্ছে গৌতম! তুমিও কাণ্ডজ্ঞান হারালে নাকি? মেয়েদের কমনরুমের সামনে দাঁড়িয়ে—'

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—'আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি পর্ণা। আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।'

স্লিপ কাগজটা পর্ণার দিকে বাড়িয়ে দেয় সে। পর্ণা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতেই গটগট করে গৌতম চলে যায়। পর্ণা আমার দিকে ফিরে বলে—'কিছু মনে করবেন না। গৌতম একটু অন্য জাতের ছেলে। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি।'

আমি বলি—'মাপ চাইবার কী আছে? আর তা ছাড়া গৌতমবাবুর হয়ে আপনিই বা মাপ চাইবেন কেন?'

পাশ থেকে মীরা সেন বলে—'তাতে কোনো দোষ হয় না। গৌতমবাবুর হয়ে মাপ চাইবার অধিকার আছে পর্ণার; ওরা দুজনে বুসম্-ফ্রেন্ড।'

পর্ণা ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়; বলে—'হ্যাঁ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা, সে কথা অস্বীকার করি না;

এবং সে কথা তোমরা বললেও আমি আপত্তি করব না, তবে আমি আশা করব ভদ্রতর বিশেষণ ব্যবহার করবে তোমরা আমাদের বন্ধুত্বটা বোঝাতে!'

পর্ণা মেয়েটিকে ইতিপূর্বে ক্লাসে দেখেছি—লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য করে দেখবার মতো কিছু ছিল না বলেই সম্ভবত দেখিনি ওকে। ও আমারই মতো এসেছে কলকাতার কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে। পাতলা একহারা চেহারা। শ্যামলা সাধারণ বাঙালিঘরের মেয়ে। আশ্চর্য, ঐ মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে গৌতম ব্যানার্জি!

মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার স্বীকার করতে হল ফার্স্ট টার্মিনালের রেজাল্ট বের হবার পর। ওরও ছিল বাংলায় অনার্স। ও না থাকলে আমিই প্রথম হতাম ক্লাসে। সেই দিন থেকে শুরু হল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে হোক ওর চেয়ে বেশি নম্বর পেতেই হবে। ক্রমশ পড়াশুনা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওর সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধতে শুরু হল। ক্লাসের মধ্যে দেখা দিল দুটি শিবির। সুনন্দা চ্যাটার্জি আর ক্লাসে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী থাকল না। শাড়ি-গহনা, রুজ-লিপস্টিক, লেডিজ-সাইকেল এবং সর্বোপরি আমার রূপের সম্ভার সত্ত্বেও ক্লাসের সব মেয়েকেই আমার দলে রাখতে পারলাম না। কারণটা সহজেই অনুমেয়। ওদের দলে টানবার জন্য যেগুলো ছিল আমার অস্ত্র, সেইগুলোকেই আবার ঈর্ষা করত অনেকে। তারা যোগ দিল বিপক্ষ শিবিরে। সেদিন থেকে আমার ব্রত হল পদে পদে ওকে জব্দ করা, অপদস্থ করা, পরাস্ত করা।

আজ জনান্তিকে এই ডায়েরির পাতায় স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারিনি। কোনো ক্ষেত্রেই তাকে হারাতে পারিনি—অথচ সব বিষয়েই আমি ছিলাম শ্রেষ্ঠতর! আশ্চর্য মেয়েটা। পাতলা ছিপছিপে শ্যামলা সাধারণ মেয়ে। রঙিন শাড়ি কেউ তাকে কোনোদিন পরতে দেখেনি। এক হাতে একগাছি চুড়ি, অপর হাতে রিস্টওয়াচ। চুপ করে বসে থাকে ক্লাসে,—নোট নেয় না—কমনরুমে আসে না। লাইব্রেরীতে দেখা যায় ওকে প্রায়ই—একা বসে বই পড়ছে। আমি মনে মনে তাল ঠুকি—কিন্তু ওকে হারাব কী করে? ও টেবিল-টেনিস খেলতে আসে না। স্যোসালে গান গাইবে না—শাড়ি সজ্জা-সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় পর্ণা আমাকে ওয়াক-ওভার দেয়। সম্মুখ-সমরে কিছুতেই নামবে না সে। অপরিসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও ভারত সম্রাট আলমগীর যেমন পার্বত্য-মূষিকের কাছে বারে বারে ঘা খেয়েছিলেন—আমারও হল সেই হাল! আজ তাই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি আমার দরবারের মাঝখানে! এখানে ছোট দরজার মধ্যে দিয়ে আমার রাজসভায় তাকে প্রবেশ করতে হবে—মাথা আপনিই নত করতে হবে ওকে।

কিন্তু প্রতিশোধের কথা পরে। প্রথমে পরাজয়ের কথাগুলি অকপটে স্বীকার করতে হবে ডায়েরির পাতায়। প্রথম খণ্ডযুদ্ধের কথা বলেছি,—টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা। দ্বিতীয় পরাজয়ের কাহিনীটা আরও মর্মন্তুদ। হঠাৎ কী করে খবর রটে গেল পর্ণা রাজনীতি করে। সে যুগে রাজনীতি করতে হত গোপনে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখনও রুদ্ধকারার অন্তরালে। শুনলাম, ছাত্র-য়ুনিয়নের নির্দেশ এসেছে একদিন হরতাল হবে; কারণটা আজ আর মনে নেই। কলকাতায় বুঝি গুলি চলেছে; তারই প্রতিবাদে হরতাল হচ্ছে। আমাদের কলেজেও ছাত্র য়ুনিয়ান ছিল। তারা ধর্মঘট ঘোষণা করল একদিনের জন্য। পর্ণা নাকি ছিল এই ধর্মঘটের একজন গোপন পাণ্ডা। কলেজ থেকে আমরা দলে দলে বেরিয়ে এলাম! অশোকগাছতলায় বিরাট ছাত্র সমাবেশ হল। গৌতম ছিল ছাত্রনেতা; সেই সভাপতিত্ব করল। আমি ভালো বক্তৃতা করতে পারতাম। ডিবেটিং-এ প্রাইজ চিরকাল বাঁধা ছিল আমার। ঠিক করলাম আজ পর্ণাকে হারাতে হবে। দেখি, কার বক্তৃতায় লোকে অভিভূত হয়। ও বসেছিল সভাপতির পাশেই—প্রায় গা-ঘেঁষে ! সভা শুরু হতেই গৌতম আজকের ধর্মঘটের কারণটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল। তারপর সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বলতে বলল। যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—কেউই প্রথমটা এগিয়ে আসে না। এই সুযোগ। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম—'আমি কিছু বলতে চাই।'

গৌতম চোখ থেকে চশমাটা খোলে। স্বভাবসিদ্ধভাবে কাচটা মোছে। পর্ণার সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর ও বলে—'বেশ তো, বলুন।'

মনে আছে, ঝাড়া তিন কোয়ার্টার বক্তৃতা করেছিলাম। ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্, নাজিজম্, ফ্যাসিজম, কংগ্রেস, গান্ধী, সুভাষ বোস, জনযুদ্ধ—কাউকেই বাদ দিইনি। ঘন ঘন হাততালিতে মুখরিত

হয়ে উঠল সভাস্থল। সে কী উদ্দীপনা ছাত্রদের মধ্যে! আমার পরনে ছিল লালরঙের একটা শান্তিপুরী শাড়ি, লাল ব্লাউজ, কপালে একটা লাল টিপ। বাতাসে আমার আঁচল উড়ছে, অবাধ্য কোঁকড়া চুলগুলো কপালের ওপর থেকে বারে বারে ঝুঁকে পড়ে। হাত নেড়ে বক্তৃতা করেছিলাম—'মনে রাখবেন—এ যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়।'

দীর্ঘ বক্তৃতার পর যখন আসন গ্রহণ করি, তখন মুহুর্মুহু করতালিতে সকলে আমাকে অভিনন্দিত করল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে বসে পড়ি। পাশ থেকে কে একজন বলল—'এর পর আর কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না বোধহয়।'

সত্যিই কেউ এল না। গৌতম বলল—'সুনন্দা দেবী যে সব কথা বললেন, যদিও আদর্শগত ভাবে আমি তার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নই, কিন্তু রাজনৈতিক তর্ক আমরা এখানে করতে আসিনি। যেখানে আমরা একমত শুধু সেখানেই হাত মেলাব আজ আমরা। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ কি না সে প্রশ্ন আজ নাই তুললাম! আজকে আমাদের প্রতিবাদ ব্রিটিশ বুরোক্রাসীর বিরুদ্ধে। যাই হোক, সুনন্দা দেবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করছি আমি।'

পর্ণা সাহস করে বক্তৃতা দিতেই ওঠেনি!

ভেবেছিলাম সর্বসমক্ষে এতবড় পরাজয় আর হতে পারে না পর্ণার। জীবনের সব ক্ষেত্রে তাকে হটিয়ে দিয়েছি—সে মেতে ছিল রাজনীতি নিয়ে। আজ সেখান থেকেও গদিচ্যুত করলাম তাকে।

ভুল ভাঙল পরদিন। গৌতম আর পর্ণাকে পুলিসে অ্যারেস্ট করেছে! আর আমার দীর্ঘ তিন-কোয়ার্টারব্যাপী বক্তৃতাটা গোয়েন্দা পুলিস গ্রাহ্যই করেনি!

ওরা অবশ্য ছাড়া পেয়েছিল কয়েকদিন পরেই। পুলিস কেস চালায়নি। তা চালায়নি—কিন্তু আমাকে পুলিস অহেতুক অপদস্থের চূড়ান্ত করে গেল!

আমি নতুন উৎসাহে জ্বলে উঠলাম। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলাম। অন্তত একবারও যদি আমাকে ধরে নিয়ে যেত পুলিসে! কিন্তু হতভাগা গোয়েন্দা পুলিসগুলোর যদি এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞান থাকে!

তবুও ফল ফলল আমার পরিশ্রমের। গৌতম আমাকে একদিন ডেকে বলল—'শুনুন, সেদিন বক্তৃতায় আপনি 'জনযুদ্ধ' সম্বন্ধে কয়েকটা মন্তব্য করেছিলেন। সে নিয়ে সেদিন আমি কোনো কথা বলিনি। আপনার আপত্তি না থাকলে বিষয়টা আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।'

আমি বললাম—'আপত্তি কী? বেশ তো, আসবেন আজ বিকালে আমাদের বাড়িতে, আলোচনা করব।'

এই সূত্রে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হল গৌতমের সঙ্গে। অতি ধীরে বিস্তার করলাম জাল। সে জালে ধরা না দিয়ে উপায় নেই। আঠারোটি বসন্তের আশীর্বাদে আমার সে জাল তখন ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারত! গৌতমেরও তখন সেই বয়স—যে বয়সে ছেলেরা পালতোলা নৌকা দেখলেই পা বাড়িয়ে দেয়। তারপর কোথায় কোন কূলে তরী ভিড়বে সে খেয়াল রাখে না—নিরুদ্দেশ যাত্রা হলেও পরোয়া করে না। তিল তিল করে জয় করেছিলাম ওকে—আমার উদ্দেশ্য ছিল পর্ণার কবল থেকে ওকে মুক্ত করা। সাধ্য কী সেই পাতলা ছিপছিপে মেয়েটির ওকে আটকে রাখে! তারপর কখন নিজের অজান্তেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এ তো আর অভিনয় নয়—সত্যিই ওকে ভালবেসে ফেলেছি! একদিন যদি বিকেলে ও না আসত, মনে হত সন্ধ্যাটা বুঝি বৃথা গেল! পর্ণাকে হারানোই ছিল প্রধান লক্ষ্য—লক্ষ্য করলাম, গৌতমকে হারানোর ভয়টাই হয়ে উঠল প্রধান। প্রসাধনটা আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম। শাড়ি-গয়নার আড়ম্বর আর ছিল না আমার সাজপোশাকে। বুঝেছিলাম, গৌতম তাই ভালবাসে। আমার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিল ও। আমার সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে নানা কথার রটনা হল কলেজে। ভ্রূক্ষেপও করলাম না আমরা। এ নিয়ে পর্ণা কী একটা কথা বলতে এসেছিল গৌতমকে, শুনলাম এই প্রসঙ্গে ওদের মনোমালিন্য ঘটেছে—এবং ফলে দুজনের কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

এই পর্যায়েই পর্ণার সঙ্গে বাধল আমার নতুন সংঘাত। কলেজ-য়ুনিয়ানে একটি আসন সংরক্ষিত ছিল ছাত্রীদের জন্য। কলেজ ম্যাগাজিনের সহ-সম্পাদকের আসন। নির্বাচন প্রতিযোগিতায় দেখা গেল

দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী—সুনন্দা চ্যাটার্জি আর পর্ণা রায়। ইলেকশনের ব্যাপারে পর্ণা আর গৌতমের মনোমালিন্যটা দেখা দিল প্রকাশ্য শত্রুতার রূপে। দু পক্ষ থেকেই প্রচারকার্য চালানো হচ্ছিল—যেমন হয়ে থাকে। গৌতম বেপরোয়া ছেলে, সে প্রকাশ্যেই খরচ দিয়ে আমার নামে পোস্টার ছাপাল। মাইক ভাড়া করে এনে প্রচার চালাল—রেস্তোরাঁয় ভোটারদের করাল আকণ্ঠ ভোজন। বড়লোকের ছেলের খেয়াল! অপরপক্ষ, অর্থাৎ পর্ণার দল, খানকয়েক হাতেলেখা প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দিল এখানে ওখানে। হঠাৎ গৌতমের বুঝি নজরে পড়ে, কোথায় একটা পোস্টারে আমার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে অশ্লীল কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে। গৌতম গিয়ে পর্ণাকে সোজা এ নিয়ে অভিযুক্ত করে। উত্তরে পর্ণাও কয়েকটি গরম গরম কথা বলে জানিয়ে দেয় যে, তার রুচি অত নীচ নয়—সে এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না। গৌতম বিশ্বাস করে না। ফলে ওদের ঝগড়াটা আরও দৃঢ়মূল হয়ে যায়।

গৌতম ছিল ছাত্রমহলের বড় দরের পাণ্ডা। সুতরাং জয় সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, গৌতমের অ্যাকাউন্টে চর্ব-চূষ্য খেয়ে এসে ওর বন্ধুরা ভোট দিয়ে আসবে পর্ণাকে! কিন্তু তাই দিয়েছিল ওরা। ভোট-গণনার পর দেখা গেল অর্থব্যয় আর অপমান ছাড়া কিছুই জমা পড়েনি আমার অঙ্কে!

অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র ছিলাম আমরা দুজন। ছাত্র এবং ছাত্রীমহলে। ওরা পর্ণার সপক্ষে ভোট দিয়েছিল—তার আসল কারণ—কোনো ক্ষেত্রে অপর প্রার্থীর 'রূপের দেমাক', কোনো ক্ষেত্রে অপর প্রার্থীর পক্ষে সুপারিশকারীর 'বড়লোকি চাল'!

দিনতিনেক কলেজে যেতে পারিনি, লজ্জায় সংকোচে।

চতুর্থ দিন গৌতম এসে বলল—'ক'দিন বাড়ি থেকে বের হইনি। কলেজের কী খবর?'

আমি বললাম—'সেকি! আমিই তো ভাবছি তোমার কাছ থেকে খবরটা জেনে নেব। আমিও আজ তিন দিন কলেজে যাইনি যে।'

ও হাসল। ভারি ম্লান, অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল ওকে। বলল—'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, শেষ পর্যন্ত হেরে যাব আমরা। তোমার ভারি ইচ্ছে ছিল ম্যাগাজিনের সহ-সম্পাদিকা হবার, নয়?'

আমি বললাম—'সে কি তুমি বোঝ না? আমি বোধ হয় আমার একখানা হাত কেটে ফেলতে রাজি ছিলাম এ জন্যে।'

ও চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলে—'চললাম।'

আমি বলি—'সেকি! এরই মধ্যে?'

—'হ্যাঁ, কাল কলেজে দেখা হবে।'

পরদিন কলেজে ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। টিফিন-আওয়ার্সে আমাকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপ্যাল। বললেন—'তোমাকে আমি ম্যাগাজিন-কমিটির সাব-এডিটর নমিনেট করেছি।'

আমি চমকে উঠে বলি—'সে কী স্যার, আমি তো ইলেক্‌শনে হেরে গেছি। এখন আবার নমিনেশন কিসের?'

প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর হয়ে বলেন—'সব কথা তো বলা যাবে না, পর্ণা রিজাইন দেবে।'

বুঝলাম সরকারি নির্দেশ এসেছে নিশ্চয়ই এই মর্মে। পর্ণার নাম লেখা আছে কালো খাতায়। কলেজ-ম্যাগাজিনে তাকে রাখা যাবে না। পেছনের দরজা দিয়ে এভাবে ঢুকতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু অধ্যক্ষের নির্দেশ এড়াতে পারলাম না। রাজি হতে হল আমাকে। য়ুনিয়ানের নব-নির্বাচিত সভ্যদের মিলিত গ্রুপ ফটো তোলা হল—আমাকে বসানো হল মধ্যমণিরূপে প্রিন্সিপ্যালের পাশেই।

এর প্রায় দিনসাতেক পরে অপ্রত্যাশিতভাবে পর্ণা এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। ওর দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

—'আমার সঙ্গে? বেশ বলুন!'

ও কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বলে—'আপনি গৌতমকে ছেড়ে দিন!'

হো-হো করে হেসে উঠি আমি। এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। ওর অপ্রস্তুত ভাবটা রসিয়ে

রসিয়ে উপভোগ করি, চিবিয়ে চিবিয়ে বলি—'গৌতম কি আমার বাঁধা গরু যে, গেরো খুলে দিলেই আপনার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে?'

এক মুহূর্ত ও জবাব দিতে পারে না। তারপর সামলে নিয়ে বলে—'আপনার কাছে এটা নিছক খেলা—কিন্তু আমার কাছে এটা কতটা মর্মন্তুদ তা আপনি আন্দাজ করতে পারেন না!'

—'কী করে পারব বলুন? আমার তো 'বুজম্-ফ্রেন্ড' নেই!'

এবার বিশেষণের জ্বালাটা গলাধঃকরণ করতে হল ওকে। বলল—'আমি অযাচিতভাবে আপনার কাছে এসেছি—এভাবে অপমান করলেও অবশ্য আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু—'

মনে হল সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা। ভদ্রতায় বাধছে।

বললাম—'কিন্তু আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন? অবশ্য আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসার অধিকার আছে কিনা সেটা আপনারই বিচার্য।'

ও বলল—'এতদিন বলতে আসিনি। সম্প্রতি আমি আপনার একটা উপকার করেছি—এবং আমার দান আপনি অম্লানবদনে হাত পেতে গ্রহণ করেছেন, তাই বিনিময়ে আমার সাহায্য চাইবার অধিকার জন্মেছে বলেই বিশ্বাস করেছি আমি।'

একটু অবাক হয়ে বলি—'ঠিক বুঝলাম না তো, আপনি আমার কোন উপকারটা করেছেন?'

—'কলেজ-য়ুনিয়ানে সহ-সম্পাদিকার পদটা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

—'ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলুন।'

—'হ্যাঁ, বাধ্য হয়েছি—কিন্তু সে তো আপনারই স্বার্থে।'

—'আমারই স্বার্থে! বলেন কী? প্রিন্সিপ্যাল কি আমারই স্বার্থে আপনাকে রিজাইন দিতে বাধ্য করেছিলেন?'

—'প্রিন্সিপ্যাল তো বলেননি।'

—'তবে?'

—'আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে গৌতম। কারণটা সে আমাকে বলেনি, শুধু বলেছিল আমি পদত্যাগ না করলে সে দুঃখিত হবে। কারণটা না বললেও সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আপনিও পেরেছেন আশা করি। তার অনুরোধই আমার কাছে আদেশ। তাই সরে দাঁড়িয়েছি আমি।'

আমি বজ্রাহত হয়ে যাই। ছি ছি ছি! গৌতমের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! এইভাবে সে আমাকে ঢুকিয়েছে কলেজ য়ুনিয়ানে! কোন লজ্জায় এরপরে কথা বলব পর্ণার সঙ্গে?

ও বলে—'আপনি কি প্রতিদানে ছেড়ে দেবেন ওকে?'

আমি বিরক্ত হয়ে উঠি—'কী বকছেন ছেলেমানুষের মতো! আমি কি আঁচলে বেঁধে রেখেছি ওকে? এ কি কেউ ছেড়ে দিতে পারে? এ কেড়ে নিতে হয়।'

ও এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—'এ যুদ্ধ-ঘোষণায় আপনার কোনও বীরত্ব নেই কিন্তু। যুদ্ধেরও একটা 'আইন' আছে, সমানে সমানেই সেটা হয়ে থাকে। আপনি কি অন্যায় যুদ্ধ করছেন না?'

—'অন্যায় যুদ্ধ মানে?'

—'মানে আপনার হাতে আছে ঈশ্বরদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র; তপস্যা করে তা পাননি আপনি—এ আপনার সহজাত কবচ-কুণ্ডল! আর আমি নিরস্ত্র। দুর্ভাগ্য আমার, গৌতমের চোখ আজ চকমকির ফুলঝুরিতেই অন্ধ—'

—'ঘিয়ের প্রদীপটার দিকে ওর নজর পড়ছে না, কেমন? কিন্তু সেজন্য আমাকে দোষ দিয়ে কী হবে বলুন? প্রদীপের কালির দিকে যদি গৌতমের নজর না পড়ে তবে তাকে দোষ দেবেন; এবং ঈশ্বর যদি আপনাকে রূপ না দিয়ে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করবেন। আর 'অন্যায় যুদ্ধের' কথা বলছেন আপনি—জানেন না, জীবনের দুটি ক্ষেত্রে আইন বলে কোনো কিছু নেই—"

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, তাই। দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন ল্যভ অ্যান্ড ওয়র।'

—'ও আচ্ছা। মনে থাকবে উপদেশটা। নমস্কার!'

—'নমস্কার!'

এর পর আর কোনোদিন কথা হয়নি পর্ণার সঙ্গে।

পর্ণা অবশ্য চেষ্টাই করেনি গৌতমকে ছিনিয়ে নিতে—আমার ইন্দ্রজালের মোহ ভেদ করে। সে জানত তা অসম্ভব। সর্বান্তঃকরণে সে নেমে পড়ল রাজনীতিতে! দিনরাত মেতে রইল ছাত্র-আন্দোলনে। কাটল আরও মাসছয়েক। তারপর আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার মাসখানেক আগে একটি ছাত্র-শোভাযাত্রা পরিচালনা করবার সময় গ্রেপ্তার হল সে। লাঠি চার্জ করেছিল পুলিস। গুরুতর আহত অবস্থায় ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল পর্ণাকে রাজপথ থেকে। গৌতম ততদিনে পাস করে কলকাতায় পড়তে গেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পর্ণা আহত হওয়ার কথা শুনে সে ফিরে আসে। পুলিস-হাসপাতালে দেখা করতে যায় গৌতম। সেখানে তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল জানি না। কিন্তু সেখান থেকে সে বেরিয়ে এল—যেন একেবারে অন্য মানুষ। পর্ণা ছাড়া পেল না। পরীক্ষাও দেওয়া হল না ওর। বিনা বিচারে আটক হয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে বদলে গেল গৌতমও। মাসতিনেকের মধ্যে তাকেও ধরে নিয়ে গেল পুলিসে।

আর ওদের কোনও খবর পাইনি।

কালে থেমে গেছে কালযুদ্ধ। আশা করেছিলাম, রুদ্ধকারার এ পাশে এসে ওরা হাত মিলিয়েছে। আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলাম জীবনের ওই করুণ অধ্যায়টাকে।

অলকের কাছে তাই সেদিন মিস্ পর্ণা রায়ের দরখাস্তটা দেখে বুঝতে পারিনি প্রথমটা। ভাবতেই পারিনি ওদের বিয়ে হয়নি। নিঃসন্দেহ হলাম ফটোটা দেখে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চাপা হাসিটি লেগে আছে বিষাক্ত ঠোঁটের কোনায়। ফটোর মধ্যে থেকে ওর শ্বাপদ দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে!

কিন্তু কাজটা কি ভালো করলাম? সত্যিই কি ওর উপকার করবার জন্য আমার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল? তা তো নয়। মনের অগোচরে পাপ নেই। ওর নামটা দেখেই কেমন যেন মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ফটোটা দেখে আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি। একদিন চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম—যুদ্ধ আর প্রেমের অভিধানে 'অন্যায়' বলে শব্দটির স্থান নেই। ও বলেছিল—'মনে থাকবে উপদেশটা'। মনে রেখেছিল সে। কেড়ে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত গৌতমকে। নিজে অবশ্য পায়নি—কিন্তু আমাকেও পেতে দেয়নি। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন। তাই কি আজ ইচ্ছা জেগেছে পার্বত্য-মূষিককে আমার রাজ-দরবারে হাজির করতে?

আজ অবশ্য মনের সে মেঘ সরে গেছে। আজ আমি পুরোপুরি সুখী। কী পাইনি আমি? এর চেয়ে কী বেশি দিতে পারত আমাকে গৌতম? অলকের চরিত্র গৌতমের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। ও আমাকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসে। গৌতমের ভালবাসাও ছিল তীব্র; কিন্তু বোধ হয় নিখাদ ছিল না। তার প্রেম ছিল ঘড়ির দোলকের মতো। পর্ণা আর সুনন্দার মধ্যে প্রতিনিয়ত দুলত তার অস্থিরমতি ভালবাসা। আর আমার স্বামীর প্রেম যেন দিগদর্শন-যন্ত্র। জোর করে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেও আমারই দিকে ফিরে আসবে তার একমুখী প্রেম।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি মনের কোনো একটা কোণা খালি রয়ে গিয়েছে। কী-যেন পাওয়া হয়নি। কিসের যেন অভাব। বড় যেন ছককাটা জীবন আমাদের। গৌতমের সঙ্গে প্রায়ই আমার মতের মিল হত না। আমি যদি উত্তরে যেতে চাই—ও দক্ষিণমুখী রাস্তা ধরত। আমি যদি বলতাম —এস গল্প করি, ও বলত—না, চল বরং সিনেমা যাই। আবার আমি যদি বলি—আজ সিনেমা যাব, ও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসত—আজ বরং নদীর ধারে বেড়ানো যাক। মতের এই অমিলের মধ্য দিয়েই হত আমাদের মিল। ও ইংরেজি ছবি দেখতে পছন্দ করত—আমি ছিলাম বাংলা ছবির পোকা। এই নিয়ে আমাদের লেগে থাকত নিত্য খিটিমিটি। অলকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার উপায় নেই—ওর কোনো ছবি ভালোও লাগে না, খারাপও নয়। অন্তত মতামত প্রকাশ করে না ভুলেও। জিজ্ঞাসা করলে বলে—'তোমার কেমন লেগেছে?' আমি ভালো-খারাপ যাই বলি, ও বলে— 'আমারও তাই।' এক-একদিন কেমন যেন গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু ও সব তাতেই সায় দিয়ে যায়।

দুঃখ করে একদিন বলেই ফেলেছিলাম—'তুমি আমার সব কথায় সায় দিয়ে যাও কেন বল তো? তোমার নিজস্ব কোনও মত নেই?'

ও বলল—'কেন থাকবে না, নিজস্ব মতোটা এ ক্ষেত্রে তোমার অনুকূলে।'

রাগ করে বলি—'এ ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই।'

ও হেসে বলে—'সেকথা ঠিক।'

—'কিন্তু কেন?'

—'শুনবে? তবে শোন—'ইফ মেন উড কন্সিডার নট সো মাচ হোয়্যারিন দে ডিফার অ্যাজ হোয়্যারিন দে এগ্রি, দেয়ার উড বি ফার লেস অব আনচ্যারিটেব্‌ল্‌নেস অ্যান্ড অ্যাংরি ফিলিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড!'

এবার আমাকে বলতে হবে—'বেকন বলেছেন বুঝি?'

আর ও বলবে—'না এডিসন!'

আচ্ছা, এইভাবে একটা মানুষ সারা জীবন কাটাতে পারে? জীবনে যা কিছু ভালবাসতাম সবই আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর ভগবান! এত সহজে, এত অপ্রতিবাদে, এত অনায়াসে আমাকে সব দিলে কেন? কিছু বাধা, কিছু ব্যতিক্রম, কিছুটা ফাঁকিও কেন রাখলে না তুমি? শাড়ি-গহনায় আমার লোভ ছিল এককালে—কিন্তু এমন বাক্সভরতি জিনিস তো আমি চাইনি। আমার দুঃখটা আমি বোঝাতে পারি না। নমিতাও অবাক হয়ে যায়—বলে, বুঝি না কী চাও তুমি সত্যি। কী করে বোঝাব?

এই তো সেদিন, আমি, নমিতা আর কুমুদবাবু মার্কেটে গিয়েছিলাম। নমিতার একটা মাইশোর জর্জেট পছন্দ হল, কিনতে চাইল। আপত্তি করলেন কুমুদবাবু। বললেন—'এই তো সেদিন একটা ভাল শাড়ি কিনলে ওমাসে।' নমিতা চুপ করে গেল। আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে। ও কেন এমন করে আমার ইচ্ছায় বাধা দেয় না! ধমকও ও দেয়, কিন্তু সে আমার ইচ্ছাতে বাধা দিতে নয়—সে অন্য কারণে—কেন আমি রুটিন-বাঁধা পথে চলছি না, তাই। কেন মাসে মাসে নতুন শাড়ি কিনছি না, নতুন গহনা গড়াচ্ছি না, তাই! মার্কেট থেকে ফিরবার পথে নমিতা একটি কথাও বলল না—আমার ভীষণ হিংসে হচ্ছিল ওকে। মনে হচ্ছিল—কী সৌভাগ্য নমিতার! এই শাড়ির ব্যাপার নিয়ে আজ রাত্রে ওদের মান-অভিমানের পালা চলবে—আর শেষ পর্যন্ত কুমুদবাবুকে হার স্বীকার করতে হবে। পরের দিন সেই শাড়িটিই কিনে এনে মান ভাঙাতে হবে নমিতার। অতটা না হলেও অন্তত ইংরেজি উদ্ধৃতি শুনতে হবে না নমিতাকে মধ্যরাত্রের নির্জনতায় এই অভিমানের জন্যে!

প্রসাধন জিনিসটা আমার চিরকাল ভাল লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত আমার এককালে। আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আমার মাথা ধরে। রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই তাসের দেশের হরতনের বিবিটি সাজতে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে আমার! গোলাপ ফুল জিনিসটা যে এত কদর্য, তা স্বপ্নেও ভেবেছিলাম কোনোদিন?

সিনেমা দেখাটাও! প্রতি রবিবারের সন্ধ্যাটি বন্দি থাকতে হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে! প্রাণান্তকর বিড়ম্বনা! কোনোদিন অসময়ে এসে বলেনি—'দুখানা টিকিট কেটে এনেছি, চটপট তৈরি হয়ে নাও! অন্তত একথাও কোনোদিন বলেনি—'এ রবিবার একটা জরুরি কাজ আছে আমার। এবার থাক লক্ষিটি, সোমবার নিয়ে যাব তোমাকে।'

আমি যা চাই, তাই পাই। কিন্তু বড় হিসেবি সেই পাওয়াটা। বাঁধা পশুকে শিকার করায় আর যাই হোক শিকারের থ্রিল নেই! বাঁধা-মাইনেয় নেই সেই শিহরণ, যা পাওয়া যায় হঠাৎ-পাওয়া বোনাসে! আমি ভালবাসি মুখ বদলানো হিসাবে মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ হবে, ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ঘটবে, চলবে মান-অভিমানের পালা কয়েকটা দিন—তারপর হবে গভীরতর মিলন! কিন্তু যা চাই তা কি চেয়ে পাওয়া যায়? এ কথা কী বলে বোঝানো যায়? ভয় হয় বলতেও! ও যা মানুষ হয়তো বলে বসবে—'বেশ তো, এবার থেকে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় আমি সব বিষয়ে ডিসেগ্রি করব তোমার সঙ্গে!'

আপনারা হয়তো ভাবছেন বাড়াবাড়ি করছি। অলকের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক এমন

ছেলেমানুষি করতে পারে? পারে। বিশ্বাস না হয় শুনুন। একদিন আপত্তি করেছিলাম রবিবার সন্ধ্যায় সিনেমা যেতে, বললাম—'আজ এসো দুজনে ছাদে গিয়ে গল্প করি।'

ও বলল, 'সপ্তাহে একদিন আমোদ করা উচিত। আমাদের প্রোগ্রাম আছে রবিবারে সিনেমা যাওয়ার।'

বললাম—'বেশ তো ন'টার শো'তে যাব।'

—'ওরে বাবা, রাত বারোটা পর্যন্ত আমি সিনেমা দেখতে পারব না। আর তা ছাড়া তুমি আমার সঙ্গে ঠিক ছ'টায় যাবে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ!'

'এত রুটিন-বাঁধা দাম্পত্য-জীবন ভালো লাগে তোমার?'

এর উত্তরে কী বলল জানেন? ও বলল 'নাথিং ইন্সপায়ার্স কনফিডেন্স ইন এ বিজনেসম্যান সুনার দ্যান পাংচুয়ালিটি!'—কথাটা ম্যাথুসের!

আপনারা বলতে পারেন এর উত্তরে আমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল—'তোমার-আমার সম্পর্কটা কি বিজনেসের?'

স্বীকার করছি, সে প্রশ্ন আমি করিনি। কারণ ওর সঙ্গে এতদিন ঘর করে বুঝেছি, এ কথা বললেই শুনতে হবে আর একটা জ্ঞানগর্ভ বাণী—বিবাহও যে একটা বিজনেস—একটা কন্ট্রাক্টমাত্র, সে সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত মুহূর্তে। শেক্সপীয়র, শ' অথবা জেমস জয়েস—কে যে ওর পক্ষ থেকে সওয়াল করতেন তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে, আমার যুক্তি যেত ভেসে!

তাই তো সেদিন যখন ওর জামা-কাপড় কাচতে দেওয়ার সময় পকেট থেকে দুটো সিনেমা-টিকিটের কাউন্টারপার্ট বের হল তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি। আরও অবাক হলাম এই জন্যে যে, টিকিট দুটি রাত্রের শো'র ! গত বৃহস্পতিবার রাত্রের। মনে মনে হিসাব করে দেখি, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে নমিতার ননদের বিয়েতে গিয়েছিলাম। রাতে বাড়ি ফিরিনি। ও যায়নি, অফিসের কী জরুরি কাজের জন্যে। টিকিট দুখানা হাতে করে আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। অলক মুখার্জি রাতের শো'তে সিনেমা দেখেছে? বৃহস্পতিবার রাত্রে? যে বৃহস্পতিবার কাজের চাপে সে সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে পারেনি সস্ত্রীক! সমস্ত দিন ছটফট করতে থাকি। কখন ও বাড়ি ফিরবে, কখন ওকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হব। হঠাৎ মনে হল দ্বিতীয় টিকিটটা কার? ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই শিউরে উঠলাম। এমন প্রকাশ্যে চমকে উঠলাম যে, মলিনা ঘর মুছতে মুছতে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—'দিদিমণি যে জেগে জেগে দেয়ালা দেখছ গো!'

মলিনা আমার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে। অনেকদিনের লোক।

পুরানো খবরের কাগজটা খুলে দেখলাম, সেদিন ঐ 'হলে' 'ফল অব বার্লিন' বইটার শেষ শো হয়েছে। ওটা আর এখন কলকাতায় দেখানো হচ্ছে না। আমরা ওটা দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরতেই প্রশ্নটা করলাম। সোজাসুজি না করে বললাম—'এ রবিবার চল 'ফল অব বার্লিন' দেখে আসি।'

—'বেশ!'

—'বইটা তোমার জানাশোনা কেউ দেখেছে নাকি? কী বলছে লোকে?'

ও নির্বিকারভাবে বলল—'তুমি জানো, সিনেমার খোঁজ আমি রাখি না।'

—'ও হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু বইটা তো তুমি নিজেই দেখেছ?'

—'আমি? কী বই?'

আমি টিকিটের ভগ্নাংশ দুটি ওর সামনে মেলে ধরে বলি, 'এই বই!'

—'ও সেই সিনেমাটা? সেই হিটলারের মতো দেখতে একটা জোকার আছে যেটাতে? হ্যাঁ ভালোই লেগেছে বইটা। চল না রবিবারে যাওয়া যাবে—'

—'কিন্তু তুমি তো দেখেছ সিনেমাটা!'

—'তাতে কী হয়েছে—না হয় আবার দেখব।'

—'তা তো বুঝলাম—কিন্তু এই জরুরি কাজেই বুঝি সেদিন রত্নার বিয়েতে যেতে পারলে না?'

হো হো করে হেসে ওঠে অলক। বলে—'কথাটা তোমায় বলতে ভুলেই গেছি। সত্যিই জরুরি

কাজ ছিল সেদিন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম। তারপর আর কাজ ছিল না। এক বন্ধু জোর করে ধরে নিয়ে গেল সিনেমায়। ঐটাই নাকি লাস্ট শো ছিল। তেমন করে ধরলে কী করি বল?'

—'ও! তেমন করে ধরলে বুঝি নাইট শো'তেও সিনেমা দেখা যায়? তা এমন করে কোন বন্ধুটি তোমায় ধরল শুনি?'

—'সে তুমি চিনবে না। আমার একজন পোলিশ বন্ধু। আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত গ্লাসগোতে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পথে। ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। বলল—মুখার্জি, যুদ্ধটা আমরা কেমন উপভোগ করেছি চল দেখিয়ে আনি তোমায়। নিকলস্-এর সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে ওর কথা ঠেলা যায় না। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ইয়া জোয়ান, শিশুর মতো সরল এদিকে।'

বুক থেকে পাষাণভার নেমে যায়। নিজেকেই ধমক দিই—ছি ছি, কী ছোট মন আমার! কেমন করে আমি ভাবতে পারলাম ও কথা? অলকের মন স্লেটের তৈরি নয় যে অত সহজেই আঁচড় পড়বে। সে মন শক্ত গ্রানাইটে তৈরি, সাধ্য কী পর্ণার যে সেই পাথরের ওপর দাগ কাটে?

তিন

এ কাজ কেন করলুম? আমার মনে তো কোনো পাপ ছিল না। তাহ'লে সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করলুম না কেন? নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছি। মিথ্যা জিনিসটা খারাপ, সত্য গোপন করাও অন্যায়, কিন্তু সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বলার মতো পাপ বোধকরি আর নেই। আমি সত্যের পোশাকে মিথ্যাকে সাজিয়েছি! যদি খোলাখুলি বলতে পারতুম—হ্যাঁ, মিস্ রয়কে সঙ্গে করেই আমি রাত্রের শো'তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম, তা হলেই সত্যরক্ষা হত। ধর্মপত্নীকে অকপটে সত্য কথা বলাই আমার উচিত ছিল—কারণ আমার মন ছিল নিষ্কলুষ। হোরেস মান এক জায়গায় ভারি সুন্দর একটি কথা বলেছেন—'ইউ নিড নট টেল অল দ্য ট্রুথ আনলেস টু দোজ হু হ্যাভ এ রাইট টু নো ইট অল। বাট লেট অল ইউ টেল বি—ট্রুথ।' অর্থাৎ সমস্ত সত্যি কথাটা তাদেরই খুলে বলবে যাদের গোটা সত্যটা জানবার অধিকার আছে। তবু যেটুকু বলবে তা সত্যি করেই বল। আমার বিষয়ে সব কথা জানবার অধিকার আছে নন্দার। সে আমার জীবন-সঙ্গিনী। সুতরাং কী অবস্থায় সে রাত্রে পর্ণাকে নিয়ে সিনেমা যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে কথা খুলে বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। এমন পি. সি. সরকারি ঢঙে চট করে টিকিট দুটো আমার নাকের ওপর মেলে ধরল নন্দা যে, আমি নার্ভাস হয়ে পড়লুম। তাড়াতাড়ি সাড়ে ছয়ফুট লম্বা আমার কাল্পনিক বন্ধু নিকলসের আড়ালে আত্মগোপন করে বসলুম। নাঃ! কাজটা ভালো করিনি।

অথচ ঈশ্বর জানেন, আমার মনে কোনো পাপ ছিল না।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, আমাদের কারখানায় যেন কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর করাল ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা আমাদের নিষ্কলুষ। মিলেমিশে কাজ করছি আমরা, বাবার আমল থেকে। কোনোদিন ওরা বিদ্রোহ করেনি—ধর্মঘট হয়নি। এমন কি আজও পর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি এ কারখানায়। ওরা দিব্যি যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, টিকিট পাঞ্চ করায়, সপ্তাহান্তে প্রাপ্য নিয়ে ফিরে যায় বস্তিতে। বিড়ি ফোঁকে, তাড়ি খায়, বউ ঠ্যাঙায়, আর মন দিয়ে কাজ করে কারখানায় এসে। হঠাৎ এ তাসের দেশে এসে পৌঁচেছে কোনো সাগরপারের ঢেউ। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মানুষগুলো। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাই না—কিন্তু অনুভব করি, ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। বড় পুকুরে বেড়া জাল পড়লে মাছেরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু যখন জাল ক্রমশ গুটানো হয় তখন তারা কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে, জল যেন ভারী ভারী লাগে। আমারও অবস্থাটা হয়েছে ঐ রকম। শ্রমিকদের মুখে কেমন একটা উদ্ধত বিদ্রোহের ছায়া লক্ষ্য করছিলাম ক'দিন ধরে। কে তার ইন্ধন জোগাচ্ছে তা টের পাই না—কিন্তু পরিবর্তন একটা যে হয়েছে তা অনুভব করতে পারি। সেই ধূমায়িত বিদ্বেষবহ্নি হঠাৎ একদিন প্রকাশ্য রূপ নিল একজন

ফোরম্যানের অবিমৃশ্যকারিতায়। নিঃসংশয়ে ফোরম্যান সেনগুপ্তই দোষী; কিন্তু ফ্যাক্টারির অলিখিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হল শ্রমিকটিকেই। একজন সামান্য মেহনতি মানুষ যদি ফোরম্যানের গায়ে হাত তোলে তবে শাস্তি না দিয়ে কী করি? এ না করলে ডিসিপ্লিন থাকে না। সেনগুপ্তকেও কঠিন ভাষায় ধমকে দিলুম। ফের যদি কুলি বস্তিতে গিয়ে মেয়েছেলেদের দিকে নজর দেয় তাহলে বরখাস্ত করতে বাধ্য হব আমি।

কিন্তু আশ্চর্য! পাথরে-কোঁদা কালো কালো মানুষগুলো আমার বিচারে সন্তুষ্ট হল না। ওরা দল পাকাল। জোট বেঁধে আমাকে এসে জানাল, আমার বিচার তারা মেনে নিতে রাজি নয়। নন্দ মিস্ত্রির জরিমানা মাপ করতে হবে এবং সেনগুপ্তকে তাড়াতে হবে! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ যে নতুন কথা! শ্রমিকেরা দাবির একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করল। সে আবেদনপত্রের ভাষা দেখেই বুঝতে পারি ভিতরে বাইরের লোক আছে। অফিসের কর্তা-ব্যক্তিরা পরামর্শ দিলেন—দৃঢ় হাতে বিদ্রোহ দমন করতে হবে। আমি কিন্তু জানতুম, বাধা দিতে গেলেই সংঘাতটা বিরাট আকার ধারণ করবে। অঙ্কুরেই একে বিনাশ করতে চাই। বাধা দিয়ে নয়, দরদ দেখিয়ে। 'উইথ কাইন্ডনেস্ হি ইজ টু বি স্লেন!' কারখানায় আমার কয়েকজন ইনফর্মার ছিল—যেমন সব কারখানাতেই থাকে। তারা খবর আনল যে, একজন শ্রমিকনেতাকে ওরা কোথা থেকে ধরে এনেছে অবশ্যম্ভাবী ধর্মঘট পরিচালনার জন্য। একখণ্ড ছাপানো কাগজও এনে দিলে তারা! সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা সংখ্যা। নাম 'দেওয়ালের লিখন'। এ কাগজের নামই জানতুম না। তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার কারখানার ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ফোরম্যান সেনগুপ্তের ঘটনাটা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে সম্পাদক আমায় বাপান্ত করেছেন! স্থির করলুম, আর অগ্রসর হতে দেওয়া নয়। শ্রমিকদলের তিনজনের ডেপুটেশনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে রাজি হয়ে গেলুম।

তিনজন শ্রমিক প্রতিনিধি যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেদিন লক্ষ্য করে দেখি, ওদের ভেতর একজন আমার অচেনা। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই অন্য একজন বললে—উনি স্যার একজন শ্রমিক-নেতা, আমাদের তরফ থেকে উনিই কথাবার্তা চালাবেন।

আমি বলি—কিন্তু এ কথা তো ছিল না! শ্রমিক-মালিকে বোঝাপড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির তো থাকার কথা নয়।

ভদ্রলোক বলেন—এটাই কিন্তু প্রচলিত রীতি মিস্টার মুখার্জি। এরা শ্রমিক আইনের খুঁটিনাটি জানে না, কিসে তাদের ভালো হবে তাও সব সময় বোঝে না। আপনার তরফে কোনো আইনের প্রশ্ন উঠলে আপনি সলিসিটারকে জিজ্ঞাসা করতে ছুটবেন—ওদের তরফেও কেউ উপদেষ্টা থাকলে আপনার আপত্তি কেন?

বললুম—বেশ, ওরা যদি চায় তবে আপনিও থাকুন। কিন্তু একটা কথা, আলোচনার আগেই আমি ওদের দুজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেতে চাই যে, আপনি ওদের হয়ে যে-সব কথা দেবেন তা মানতে ওরা বাধ্য থাকবে।

বাকি দুজন সমস্বরে বলে ওঠে—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

তারপরই আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

দেখলুম ভদ্রলোক তীক্ষ্ণধী। কথা বলতে জানেন। শুনতেও। সমস্ত সমস্যাটা সহজ কথায় গুছিয়ে উপস্থাপিত করলেন। সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন স্পষ্ট ভাষায়।

একটু পরে আমি বলি—আলোচনায় যে সব সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমার মনে হয়, সেগুলি এখনই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আপনি কী বলেন মিস্টার—

—ব্যানার্জি। সে তো ঠিক কথাই।

—তাহলে আমার স্টেনোকে ডাকি?

—ডাকুন।

বিজলী বোতাম টিপতেই বেয়ারা এসে দাঁড়াল। তাকে পাঁচ প্লেট খাবার আর কফি আনতে বলি—আর ডেকে দিতে বললুম স্টেনোকে। অল্প পরেই মিস্ রয়ের আবির্ভাব ঘটল দ্বারপথে।

ডিক্‌টেশনের খাতা-পেন্সিল হাতেই সে এসেছে—কিন্তু নিজের আসনে এসে বসল না। সুইং-ডোরের এপারে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে শ্রমিকনেতা মিস্টার ব্যানার্জির দিকে।

লক্ষ্য করলাম, মিস্টার ব্যানার্জি এতক্ষণ তাকে দেখতে পাননি। চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক চমকে ওঠেন। অজান্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। অস্ফুটে তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে একটি মাত্র শব্দ—পর্ণা!

মুহূর্তমধ্যে দুজনেই আত্মসংবরণ করে। পর্ণা এগিয়ে এসে বসে তার নির্দিষ্ট আসনে। নতনেত্রে খাতা খুলে পেন্সিল হাতে প্রতীক্ষা করে। যেন কিছুই লক্ষ্য করিনি আমি, এইভাবে ঘূর্ণমান বিজলী পাখাটার দিকে তাকিয়ে বলে গেলুম—'দি ফলোয়িং ডিসিশন্‌স্ ওয়্যার মিউচুয়ালি এগ্রিড আপন ইন এ জয়েন্ট ডিস্‌কাশন হেল্ড ইন দি চেম্বার অব...'

লক্ষ্য করলুম, দীর্ঘ দেড়ঘন্টার কনফারেন্সে দুজনের মধ্যে আর দৃষ্টি বিনিময় হয়নি। মিটিং শেষ হল। বেয়ারাকে ডেকে বলি—এঁদের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

শ্রমিক নেতা ব্যানার্জিকে বলি—আপনারা ও ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। এটা টাইপ হয়ে গেলে সই করে এক কপি দিয়ে যাবেন, আর এককপি নিয়ে যাবেন।

নমস্কার বিনিময়ের পালা সাঙ্গ হলে ওরা চলে গেল।

পর্ণাও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—ক' কপি ছেপে আনব?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলি—আপনি মিস্টার ব্যানার্জিকে চিনতেন?

একটু ইতস্তত করে পর্ণা স্বীকার করে।

—কী সূত্রে ওঁর সঙ্গে আলাপ?

—আমরা একই কলেজে পড়তাম।

—আই সী! তাহলে বন্ধু বলুন!

পর্ণা হেসে বলে—হ্যাঁ; খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম এককালে!

—তারপর দীর্ঘদিন অসাক্ষাতে সে বন্ধুত্বের ওপর মরচে পড়েছে, কেমন?

পর্ণা হাসল। জবাব দিল না। আগের প্রশ্নটাই করল আবার—ক'কপি ছেপে আনব স্যার?

আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা খেলছে। পর্ণা বলেছে, এককালে ওরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সুনন্দা বলেছে, ওর সঙ্গে কলেজে একটি ছেলের খুব মাখামাখি হয়েছিল। এই কি সেই? একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বলি—বসুন।

পর্ণা আবার বসে পড়ে তার আসনে। আমার চেয়ার থেকে অদূরে। আমি জানলার বাইরে তাকাই। বর্ষার আকাশে মেঘ করেছে, এলোমেলো বাতাস বইছে। এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে। আমার কিন্তু তখন সেদিকে নজর নেই—আমি শুধু ভাবছিলুম, এই মেয়েটিকে কাজে লাগানো যায় না? মাতাহারিকে আমি দেখিনি, কিন্তু তারও নিশ্চয় ছিল এমন ঈগলদৃষ্টি-দগ্ধকারী চাহনি। দেখাই যাক না। বললুম—'দ্য লস্ অব এ ফ্রেন্ড ইজ লাইক দ্যাট অব এ লিম্ব; টাইম মে হীল দ্য অ্যাঙ্গুইশ অব দ্য উন্ড, বাট দ্য লস্ ক্যানট বি রিপেয়ার্ড!'—কে বলেছেন বলতে পারেন?

দাঁত দিয়ে পেনসিল কামড়াতে কামড়াতে ও বলে—পারি! সাউদে!

চমকে উঠি! একবারে এমন নির্ভুল উত্তর কখনও শুনিনি। সুনন্দা এতদিনেও একটি নির্ভুল উত্তর দিতে পারেনি। বরং প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়। মনে মনে মেয়েটির ওপর খুশি হয়ে উঠি। সে ভাব গোপন করে বলি—তাহলে বন্ধুটিকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিচ্ছেন কেন?

মিস রয় মিটিমিটি হেসে বলে—তাহলে আমিও একটা প্রশ্ন করব স্যার? বলুন এটা কার কথা—'ইফ এ ম্যান ডাজ নট মেক নিউ ফ্রেন্ডস্ অ্যাজ হি পাসেস থ্রু লাইফ, হি উইল সুন ফাইন্ড হিমসেল্‌ফ লেফ্‌ট অ্যালোন।'

উৎসাহের আতিশয্যে পেন্সিল-সমেত পর্ণার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলি—স্‌প্লেন্ডিড! ডক্টর জনসন!

পরমুহূর্তেই হাতটি ছেড়ে দিয়ে বলি—আয়াম সরি!

পর্ণা একটু লাল হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে—না, না, দুঃখিত হবার কী আছে?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আছে, মিস্ রয়। উৎসাহের আতিশয্যে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলুম। ব্যাপারটা কী জানেন? কোটেশান-খেলা আমার একটা হবি। এমন একটা অ্যাপ্ট কোটেশন পেলে আমি একবেলা না খেয়ে থাকতেও রাজি আছি। কিন্তু তাহলেও, আই মাস্ট অ্যাডমিট, এতটা আপসেট হওয়া উচিত হয়নি আমার।

পর্ণা ধীরে ধীরে বলে—আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের—কিন্তু একটা জায়গায় দেখছি আমাদের অদ্ভুত মিল আছে। সময়োপযোগী কোটেশান পেলে আমিও অনেক কিছু না পাওয়ার দুঃখ ভুলে থাকতে পারি। সুতরাং সামাজিক ব্যবধান সত্ত্বেও—

আমি বাধা দিয়ে বলি—বার বার ও কথা কেন? আপনি বলতে চাইছেন কমন হবির সূত্র ধরে উই মে বি ফ্রেন্ডস্।

পর্ণা বলে—অবশ্য আপনার তরফে বাধা থাকতে পারে।

—কী বাধা?

—প্রাচ্যের একজন পণ্ডিত বলেছেন, 'নেভার কনট্যাক্ট ফ্রেন্ডশিপ উইথ ওয়ান দ্যাট ইজ্ নট বেটার দ্যান দাইসেল্ফ!'

এবার আর কোনো সংকোচ না করে ওর হাতখানি ধরে আমি বলেছিলুম—কনফ্যুশিয়াস্।

পর্ণার হয়তো ধারণা তার উদ্ধৃতি-পটুতায় খুশি হয়ে আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। সুনন্দা শুনলে নিশ্চয়ই একটা মারাত্মক কদর্থ করত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল আরও গভীর। নন্দাকে প্রশ্ন করে জেনেছি, কলেজ জীবনে যে-ছেলেটির সঙ্গে পর্ণার মাখামাখি হয়েছিল তার নাম গৌতম ব্যানার্জি। অতএব পর্ণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে গৌতমবাবু যে সহজেই কাত হয়ে পড়বেন এটা অনুমান করতে পারি। ভয় ছিল, পর্ণা যদি রাজি না হয়। খুব কৌশলে ঘুরিয়ে প্রস্তাবটা উত্থাপন করলুম পর্ণার কাছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝে নিল আমার মতলব। রাজি হয়ে গেল এককথায়। আমিও নির্বোধ নই। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের দাবিতেই এ কাজ করতে সে সম্মত হয়নি। সে জানে, আমাকে খুশি করতে পারলেই তার উন্নতি। মসীজীবী একটি অনূঢ়া মেয়ের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। চাকরির উন্নতিতেই ওদের চতুর্বর্গ! কয়েকদিনের ভেতরেই সে শ্রমিক-নেতা ব্যানার্জির সঙ্গে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালিয়ে নিল। শ্রমিক নেতার গতিবিধি, ওপক্ষের যাবতীয় সংবাদ সে আমাকে গোপনে সরবরাহ করে। সাতদিনের ভেতরেই সে এমন কয়েকটি গোপন খবর আমাকে এনে দিল যে আমি স্তম্ভিত। সেদিন একখণ্ড লম্বা কাগজ এনে আমার হাতে দিয়ে বলে—দেখুন স্যার।

—কী এটা?

—গ্যালি প্রুফ। আগামী সপ্তাহে এটা ছাপা হবে 'দেওয়ালের লিখনে।'

আমাকে ন্যাকা সাজতে হয়—'দেওয়ালের লিখন' আবার কী?

—শ্রমিক নেতা ব্যানার্জির সাপ্তাহিক।

—উনিই সম্পাদক?

—হুঁ।

—আপনি এ লেখা কোথায় পেলেন?

—কেন? ওর কাগজের অফিসে।

আশ্চর্য ধূর্ত মেয়ে। কী কৌশলে হস্তগত করেছে কাগজখানা! ভারি সুবিধা হল সেখানা পেয়ে! তাড়াতাড়ি শুধরে নিলুম ত্রুটি। এমনকি পরের সপ্তাহে লেখাটি বারই হল না ওই পত্রিকায়। তার আগেই আমরা সামলে নিয়েছি।

স্থির করলুম, ওকে তৎক্ষণাৎ পুরস্কৃত করতে হবে। তাকে ডেকে বলি—এই অফিস-অর্ডারটা টাইপ করে দিন।

পর্ণা অর্ডারটা পড়ছিল। তার কর্মদক্ষতায় খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ তার বেতন আরও পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন। ভেবেছিলুম, ও খুশিয়াল হয়ে উঠবে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণই লক্ষ করি না। আদ্যন্ত পাঠ করে সে আমাকে কাগজখানা ফিরিয়ে দিল। বললে—এটা আপনি করবেন না স্যার।

—কেন?

—এটা করলেই গৌতম সতর্ক হয়ে যাবে। ওর ধারণা, আপনি আমার ওপর খুশি নন। তাই বিশ্বাস করে অনেক কথা সে আমাকে বলে। ধর্মঘট ভেঙে যাবার পর কার কার বেতন বৃদ্ধি হল, সে খবরটা কি ওরা পাবে না ভেবেছেন?

ওর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে গেলুম। এতটা দূরদৃষ্টি ওর থাকতে পারে তা ভাবতেই পারিনি। সুনন্দা হলে নিশ্চয় খুশির পাখনা মেলত। তাই বললুম—কিন্তু আপনি আমাদের এত উপকার করলেন, আমরা কি কিছুই প্রতিদান দিতে পারব না?

—আপনাদের উপকার করবার জন্য তো আমি এ কাজ করছি না—

—তবে সংবাদগুলি সংগ্রহ করে আনছেন কেন?

—আপনি চাইছেন বলে।

—বন্ধুকৃত্য?

—বন্ধু বলে আর স্বীকার করে নিলেন কই?

—নিইনি?

—কই নিয়েছেন? আজও আপনি আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলেন।

হেসে বলি—বেশ, এবার থেকে আর তোমাকে 'আপনি' বলব না পর্ণা। কিন্তু তাহলে তোমাকেও যে 'তুমি' বলতে হয়।

পর্ণা মুহূর্তকাল কী ভাবল, তারপর বলে—সে হয় না। আপনি অফিস্-বস্। আপনাকে সবার সামনে 'তুমি' বললে অন্য সবাই কী ভাববে?

আমি নিম্নস্বরে বলি—বেশ, সবার সামনে না হয় নাই বললে। আড়ালে অন্তত বল।

হঠাৎ কী-জানি-কেন পর্ণা ভীষণ লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় আসন ছেড়ে। বলে—আমি যাই।

কালো মেয়েও যে ব্লাশ করে এই প্রথম দেখলুম। আমি চট করে ওর হাতটা ধরে বলি— কই, 'তুমি' বলবে কিনা বলে গেলে না?

পর্ণা এবার একঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল। দ্রুতচ্ছন্দে আঁচল সামলে ঘর থেকে চলে গেল। দ্বারের কাছে একবার থমকে দাঁড়ায়, সুইং-ডোরের ওদিকে মুখ বাড়িয়ে কী দেখে আমার দিকে ফিরে যাবার সময় বলে গেল—বলব গো, বলব!

পর্ণা চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলুম। মনের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। কাজটা কি অন্যায় হচ্ছে? আমি কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি? অফিসের মালিক ও কর্মীর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকার কথা, আমি কী তার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছি? আমার অন্তরে কি পর্ণা সত্যিই কোন আলোড়ন তুলেছে? অসম্ভব। আমার মনে কোনও কুচিন্তা নেই। নন্দা আমার মনপ্রাণ ভরে রেখেছে। সেখানে অপর কারও প্রবেশাধিকার নেই। পর্ণা যদি পুরুষমানুষ হত, তাহলে তার সঙ্গে এই বন্ধুত্বে তো কোনো আপত্তির কথা উঠত না। ওকে আমি শুধু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়ে গেছে আমার। কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। পর্ণা না শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুল বোঝে। আমার নিজের দিক থেকে অবশ্য আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পর্ণা তো এর অন্য অর্থ করে বসতে পারে। সুতরাং সাবধানের মার নেই।

যা আশা করেছিলুম তা হল না। বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। শ্রমিক-ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা না থাকায় ওপক্ষ সাময়িক সন্ধি করেছিল মাত্র। খবর পেলুম, ওরা আবার গোপন পরামর্শ শুরু করেছে।

প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পূজার দিন আমাদের কারখানায় একটা বার্ষিক উৎসব হয়। অফিসারেরা বড় রকম চাঁদা দেয়, কোম্পানিও কিছু দেয়। প্রাঙ্গণে ম্যেরাপ বেঁধে কর্মীরা অভিনয় করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন, প্রেস-রিপোর্টাররা আসেন। এ বছরও সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত বিলি হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। মনে হয় বিশ্বকর্মা পূজার আগেই ওরা ধর্মঘট ঘোষণা করে আমাদের অপদস্থ করতে চায়! সংবাদটা গোপনে পেলুম। পর্ণাকে সংবাদ সংগ্রহের কাজে

লাগালুম; কিন্তু সে এ বিষয়ে কোনো খবর আনতে পারল না। তার ধারণা, ওরা তাকে আর বিশ্বাস করছে না। তার বেতনবৃদ্ধির একটা প্রস্তাব যে হয়েছিল,—এ খবর নাকি ওপক্ষ জানতে পেরেছে।

এরকম অবস্থায় সচরাচর যা হয়—আমার কাজকর্ম হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। অফিসের পরেও অনেক চিঠিপত্র লিখতে হয়। পর্ণাকে আটকে রাখতে বাধ্য হই। দেওয়ালেরও কান আছে। এ অবস্থায় আর কাউকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। বিশ্বস্ত দু-একজন কর্মচারীও থাকে। আর থাকে পর্ণা। একের পর এক ডিক্‌টেশন দিয়ে যাই। বাড়ি ফিরতে কোনোদিন দশটা কোনোদিন এগারোটা বেজে যায়।

গত বৃহস্পতিবারের কথা। সমস্ত দিন ছোটাছুটি করে অফিসে এসে যখন পৌছালুম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। কর্মচারীরা কেউ নেই—ঝাড়ুদার ঘরগুলি ঝাঁট দিচ্ছে আর দারোয়ান দোবেজী এক গোছা চাবি হাতে নাকে পাগড়ির একপ্রান্ত চেপে ধরে অপেক্ষা করছে। পর্ণার সঙ্গে লিফ্‌টের মুখেই দেখা হয়ে গেল। ও বাড়ি যাচ্ছিল। ওকে বললুম—একবার অফিসে যেতে হবে। খানকয়েক জরুরি চিঠি আছে।

পর্ণা মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বলে—কাল ফার্স্ট-আওয়ারে করে দেব।

—না না, কাল দশটার মধ্যে সে চিঠি বিলি হওয়া চাই। চল চল।

পর্ণা বলে—আজ আমারও একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে স্যার। আজ ছেড়ে দিন।

আমি কণ্ঠস্বর নিচু করে বলি—'ছেড়ে দিন' কেন? বল, 'ছেড়ে দাও'; কিন্তু ছেড়ে দিতেই যদি বলবে তবে ধরা দিলে কেন?

পর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—হাশ্‌! দ্য লিফ্‌টম্যান!

তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে লিফ্‌ট-এ উঠে পড়ে।

লিফ্‌টম্যান লোকটা বিহারি, সম্ভবত সে আমাদের কথোপকথনের অর্থ বোঝেনি। তবু মনে হল, এতটা অসতর্ক হওয়া আমার উচিত হয়নি।

লিফ্‌টটি আকারে খুবই ছোট। পর্ণার এলো খোঁপাটি আমার টাইয়ের গায়ে লাগছে। ও কি ক্যান্থারাইডিন মাখে? মাথাটা আমার নাকের খুব কাছে। গন্ধ পাচ্ছি একটা। সেটা প্রসাধনের, না—ব্রাউনিঙের একটা লাইন মনে আসছিল—কিন্তু তার আগেই লিফ্‌টটা এসে থামল নির্দিষ্ট স্থানে। নামতে হল।

পর্ণাকে ডিক্‌টেশন দিলুম। অনেকগুলি চিঠি ও রিপোর্ট। কাজ শেষ করতে রাত আটটা বাজল। লিফ্‌ট তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জনবিরল ডালহৌসী-স্কোয়ার। পর্ণা তার কাগজপত্র গুছিয়ে উঠে পড়ল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নেমে আসি। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বললুম—চল, তোমাকে আমার গাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি। কোথায় তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না?

ও বলে—অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সন্ধ্যা ছ'টায়, এখন আর কী হবে?

বললুম—আমি দুঃখিত। এতে তোমার কোনো ক্ষতি হল না তো? আশা করি কাল আবার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হতে পারবে?

—না, কাল আর হবার উপায় নেই। কাল সে এখানে থাকবে না।

—এখানে থাকবে না? কোথায় যাবে?

—বিলেতে।

আমি সত্যিই দুঃখিত হলুম। বলি—এ কথা আগে বলনি কেন পর্ণা?

ও হো-হো করে হেসে ওঠে,—বলে, অত রোম্যান্টিক কিছু নয়। কাল বিলেতে ফিরে যাবে 'ফল অব বার্লিন' ছবিটা।—বলে একখণ্ড সিনেমার টিকিট সে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

শুনলুম, আজ কলকাতায় এই ছবিটির নাকি শেষ শো হচ্ছে। এর টিকিট যোগাড় করা নাকি অত্যন্ত দুরূহ। পর্ণা অনেক পরিশ্রমে আজ সন্ধ্যার শো'র একখানি প্রবেশপত্র কিনেছিল। আমার জন্য এইমাত্র সেই টিকিটখানি ও ছিঁড়ে ফেলে দিল।

বলি—বেশ তো রাতের শো তো আছে।

ও বলে—শো আছে, টিকিট নেই।

গাড়ি তখন চৌরঙ্গীতে পড়েছে। ডাইনে বাঁক ঘুরতেই ও বলে—এদিকে কোথায়? আমি থাকি মানিকতলায়।

উত্তর না দিয়ে লাইট-হাউসের সামনে গাড়িটা পার্ক করি। রাত তখন সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার শো তখনও ভাঙেনি। রাত্রের শো-তেও হাউস-ফুল। কিন্তু 'রেডি মানি ইজ্ আলাদীন্স্ ল্যাম্প।' অল্প সন্ধান নিয়েই ফিরে এসে পর্ণাকে বলি একখানা টিকিট যোগাড় হয়েছে।

ও বলে—না, থাক, রাতের শো'তে একা একা সিনেমা দেখতে সাহস হয় না আমার। বিশেষত এ পাড়ায়। মানিকতলা পৌঁছাতে রাত একটা বাজবে। অত রাতে একা ট্যাক্সিতে—না থাক।

কী করব ভাবছি।

শো'-কেসে লাগানো ছবিগুলি পর্ণা দু-চোখ দিয়ে গিলছে। দুধের স্বাদ বেচারি ঘোলে মেটাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি নিজে সিনেমা দেখতে ভালবাসি না। শুধু স্ত্রীকে সঙ্গদান করতে রবিবারের সন্ধ্যাটা কোনো অন্ধকার ঘরে কাটিয়ে আসি। কিন্তু এই মেয়েটি তার স্বল্প-মাহিনার ভিতর থেকে কয়েকটি মুদ্রা কোনোক্রমে বাঁচিয়ে এই প্রবেশপত্রটি সংগ্রহ করেছিল। আমি তার সেই সান্ধ্য-আনন্দটুকু দস্যুর মত কেড়ে নিয়েছি—নিজের স্বার্থে। মেয়েটি আমার অশেষ উপকার করে গেছে দিনের পর দিন—অথচ প্রতিদানে আমি তাকে কী দিয়েছি? প্রতারণা ছাড়া?

পর্ণা বলে—এবার যাওয়া যাক, বৃষ্টিটাও থেমেছে।

বলি—একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

অল্প পরে উচ্চতম মূল্যের দু-খানি কালোবাজারি টিকিট কিনে ফিরে এলুম। একখানি তার হাতে দিতেই বললে—একি! বললাম যে, একা একা রাতের শো'তে সিনেমা দেখি না আমি।

—রোজ রোজ একা দেখ, আজ না হয় দোকাই দেখলে।

দ্বিতীয় টিকিটখানি ওকে দেখালুম।

—কিন্তু, কিন্তু মিসেস্ মুখার্জি হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়বেন আপনার দেরি দেখে।

—পড়বেন না। কারণ মিসেস্ মুখার্জি আজ বাড়ি নেই। আর 'আপনার' নয়, 'তোমার'।

—ও, তাই বুঝি আজ পাখা গজিয়েছে?

দুজনেই হেসে উঠি। রাত্রের শো শুরু হতে তখনও অনেকটা দেরি আছে। তাই দুজনে চৌরঙ্গীর একটা বারে ঢুকলুম। শেরি খেতেও আপত্তি ওর। অগত্যা ওর জন্যে খাবার অর্ডার দিতে হল। মাঝের 'হলে' বসতে সাহস হল না। কী জানি, পরিচিত কেউ যদি দেখে ফেলে। একটি ছোট কেবিনের নির্জনতায় আত্মগোপন করি।

পর্ণা বলে—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—কেন?—এক পাত্র খেয়েই যদি মাতলামি শুরু করি?

—তা নয়। যদি আমাদের কেউ দেখে ফেলে? আমাদের সম্পর্কটা বাইরের লোক দেখলে কী ভাববে?

আমি বলি—বাইরের লোকে কী ভাববে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু ভিতরের লোকে কী ভাবছে?

একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পর্ণা বলে—এ কথার মানে?

—মানে, তুমি কী ভাবছ?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পর্ণা বলে—যা ভাবা স্বাভাবিক তাই ভাবছি।

মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কী বলতে চায় পর্ণা? সে কি ভাবছে আমি তার প্রেমে পড়েছি? সেটাই কি স্বাভাবিক ওর কাছে? আমার আচরণ কি তাই বলছে নাকি ওকে? অথবা ও বলতে চায়, বড়লোকের ছেলে যেভাবে তার স্টেনোর সঙ্গে নিষ্প্রেম ফ্লার্ট করে, আমি তাই করছি? কিন্তু ওকে প্রশ্ন করে কী হবে? আমি নিজেকেই সেই প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবো? সত্যি, কেন আজ এ রকম কাণ্ডটা করছি? বন্ধুত্ব? পর্ণা যদি আমার পুরুষ স্টেনো হত তাহলে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা আজ করতে পারতুম? একসঙ্গে সিনেমা দেখা? এক সঙ্গে পানাহার? তা হলে? ওর নারীত্ব সত্তাই কি আমাকে টেনে এনেছে এখানে? কিন্তু আত্মসমীক্ষা পরে করা যাবে। আপাতত পর্ণা এই সিচুয়েশানটা কী ভাবে নিচ্ছে সেটা জানা দরকার। বললুম—হ্যাঁ, কিন্তু স্বাভাবিক কোনটা?

পর্ণা কাঁটা ও ছুরি ন্যাপকিনের প্লেটে ঠুকতে ঠুকতে বলে—আমিও তো ঠিক সে কথাই ভাবছি। স্বাভাবিক কোনটা। তোমার-আমার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের, কিন্তু তোমার আজকের আচরণে মনে হচ্ছে যে, কথাটা তুমি ভুলে বসে আছ। সে কথাটা মনে করিয়ে দিলেও শুনতে পাবে না তুমি!

আমি বলি—'ইফ দাউ আর্ট এ মাস্টার, সামটাইম্‌স্ বি ব্লাইন্ড!'—কার কথা?

পর্ণা বলে—পরের লাইনটা হচ্ছে—'ইফ এ সার্ভেন্ট, সামটাইম্‌স্ বি ডেফ!'—তুমি আজ প্রভু হয়েও অন্ধ আর আমি দাসী হয়েও বধির!

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি—কিন্তু ঐ 'দাসী' কথাটা ঠিক স্যুট করছে না।

—ও! ওটা বুঝি একমাত্র মিসেস্ মুখার্জির বলার কথা?

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—তার কথা থাক।

—ও! কিছু মনে করবেন না!—সামলে নেয় পর্ণা।

সুর কেটে যায়। ঠিক ঐ পরিবেশে কী জানি কেন সুনন্দাকে নিয়ে ওর ঠাট্টাটা আমার ভাল লাগেনি। আমার স্বরটা বোধহয় কড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই ওরও সুর গেল বদলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বয়টা দিয়ে গেল পানপাত্র আর খাবার।

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে আমি আবার আলাপটা শুরু করি—মানিকতলার বাসায় কে আছে তোমার?

আমার দিকে আয়ত দুটি চোখ মেলে পর্ণা বলে—তার কথাও থাক!

বুঝি, অভিমান করছে ও। তাই ভিন্ন সুরে বলি—বেশ, তাহলে এস আমরা এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করি যাতে দুজনেরই ইন্টারেস্ট আছে।

—যথা?

—যথা 'দ্য গেম অফ কোটেশনস্'।

—বেশ বলুন।

পাত্রে পানীয় ঢালতে ঢালতে চালতে বললুম—ঠিক এই মুহূর্তে, বেন জন্‌সনের একটা উদ্ধৃতি আমার মনে পড়ছে। কী উদ্ধৃতি বলতে পার?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল পর্ণা। তারপর বলল—পারি!

—না, পার না। আচ্ছা বল দেখি।

চটুল হাস্যে পর্ণা বললে—নিশ্চিত পারি। কিন্তু বলতে পারব না।

—পারি, অথচ পারি না?

—মানে মুখে বলতে পারব না।

—বেশ লিখে দাও।

মানিব্যাগ খুলে একটা নাম-লেখা কার্ড আর কলমটা ওর দিকে এগিয়ে দিই। কলমটা খুলে ও বলল—একটা শর্ত, আজ রাত্রে এটি তুমি দেখতে পাবে না।

বললুম—বেশ।

সে শর্ত আমি রাখিনি। নির্জন সিনেমা 'হলে' ওকে বসিয়ে দিয়ে আমি আবার বেরিয়ে এসেছিলুম। দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল জানতে, বেন জনসনের কোটেশানখানা ও স্পট্ করতে পেরেছে কিনা। লাইট-হাউসের বারে দাঁড়িয়ে বার করলুম সেই কার্ডখানা। আশ্চর্য মেয়ে! ঠিক স্পট্ করেছে সে। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যে কথা আমার মনে পড়েছিল—'লীভ বাট এ কিস্ ইন দ্য কাপ, অ্যান্ড আই'ল নট লুক ফর ওয়াইন।'

সিনেমা দেখে রাত একটার সময় ওকে নামিয়ে দিলুম মানিকতলার মোড়ে। বললুম—একটা কথা পর্ণা! কাগজখানা আমি দেখেছি! লোভ সামলাতে পারিনি।

পর্ণা কোনও জবাব দেয় না।

নির্জন পথের ধারে ওকে নামিয়ে দেবার সময় বলি—কেমন করে আন্দাজ করলে তুমি?

ও বললে—কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে আজ রাতে ওটা দেখবে না!

—সেটা কথা নয়; কথার কথা।

ও নেমে যাবে বলে দরজাটা খোলে। আমি ওর হাতটা চেপে ধরে বলি—কিন্তু আমার মনের কথা কেমন করে জানতে পারলে তুমি?

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পর্ণা বলে—একটু চেষ্টা করলেই তা জানা যায়। এই মুহূর্তে কবি ডনের একটা উদ্ধৃতি আমার মনে জেগেছে—তাও কি তুমি আন্দাজ করতে পার না?

ও পাশ থেকে মোড়ের পুলিসটা এগিয়ে আসছে! আমি বলি—সেটা কি আমার প্রশ্নের জবাব?

—হ্যাঁ!

—কী? বল। আর সময় নেই। আমি হার স্বীকার করছি।

ও বললে—'বেটার ডাই দ্যান্ কিস্ উইদাউট লাভ্।'

হাতটা ছেড়ে দিলাম ওর।

এসব কথা সুনন্দাকে বলা যায় না। ভেবেছিলুম ওকে শুধু বলব—শ্রমিক-বিদ্রোহ দমনের অস্ত্র হিসাবেই পর্ণাকে ব্যবহার করছি আমি। সেজন্য তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। তাকে খুশি রাখা প্রয়োজন। এর ভেতর অন্যায় কিছু নেই—কোনও নৈতিক সীমারেখা আমরা অতিক্রম করিনি। সুনন্দার প্রতি আমি কোনো কারণেই অপরাধী নই। একদিন যখন বিদ্রোহ মিটে যাবে তখন সুনন্দাকে সব কথা না হয় বুঝিয়ে বলব। আমি নিজের কাছে যখন খাঁটি আছি তখন সুনন্দাকে যেচে কৈফিয়ত দিতে যাবার কী প্রয়োজন? সাবধানে পর্ণাকে ব্যবহার করব। আগ্নেয়াস্ত্র সাবধানে, গোপনে রাখাই বিধি; কিন্তু ব্যবহারের পর নিক্ষিপ্ত বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন্ জঙ্গলে গিয়ে পড়ে কে আর তার সন্ধান রাখে? আর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে? তখনও বুলেটের আর দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণের ক্ষমতা থাকে না।

কদিন ধরে এসব ভাবছিলুম। সুনন্দাকে কী বলব না বলব স্থির করার আগেই হঠাৎ সুনন্দা আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল।

অগত্যা অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়াস্ত্রটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া আমার আর পথ রইল না।

আর একটা কথা।

আমি কি সত্যিই সমালোচনার ঊর্ধ্বে? আমার সব ব্যবহারই কি নৈতিক সীমারেখার ভেতরে ছিল? কবি ডনের চাবুক না পড়লে সে রাত্রে কি নিজেকে সংযত করতে পারতুম? আমি ভেবেছিলুম, ওর মনে যে উদ্ধৃতিটা জেগেছে সেটা লে হান্টের—'স্টোল্ন কিসেস্ আর অলওয়েজ সুইটেস্ট!' মনের অগোচরে পাপ নেই। অন্তত আমার মনে তখন এই উদ্ধৃতিটাই জেগেছিল।

এসব কথা নন্দাকে বলা যায় না। তবু কিছুটা ওকে বলতে হল। কারখানায় আমার ইনফর্মার আছে, তেমনি নন্দারও কেউ আছে নাকি? মিশির? রামলাল? পর্ণা সংক্রান্ত কয়েকটি বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই মত বদলালুম। 'লেট অল য়ু সে বি হাফ-ট্রুথ!' বললুম, পর্ণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করব স্থির করেছি। 'দেওয়ালের লিখনের' প্রুফ কেমন করে সে জোগাড় করেছিল তাও বললুম। শুনে ও গুম মেরে গেল।

কিন্তু গত শনিবার যে কাণ্ডটা ঘটেছে তারপর আমি নিজেই হালে পানি পাচ্ছি না। ঘরে-বাইরে কত দিকে নজর রাখতে পারে একটা মানুষ?

শনিবারে আমার আসানসোল যাবার কথা ছিল। বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম রাতে আর ফিরব না। কিন্তু অফিসের গণ্ডগোলে মত বদলাতে হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজকর্ম করতে হল অফিসে বসেই। ছুটির পর পর্ণাকে বললুম—চল, কোথাও চা খাওয়া যাক।

ও বলে—না আজ থাক। আজও আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—সিনেমা শো?

—না। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—কোন পাড়ায়?

—বেলেঘাটায়।

—বেশ চল, আমার গাড়িতেই পৌঁছে দিই।

—চল।

ওকে নিয়ে বেলেঘাটার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি। ট্রাফিক পুলিস হাত দেখিয়েছে। গাড়িটা গীয়ারে রেখে অপেক্ষা করছি। আমার পাশেই এসে দাঁড়াল একটা দোতলা বাস। সেদিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। লেডিস সীটে বসে আছে একটি মেয়ে। সাধারণ একটা ছাপা শাড়ি—বেশ ময়লাই, গায়ে কোনো গহনা নেই। বসে আছে জানলার ধারে। তার পাশে একজন পুরুষও আছে মনে হল। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি একবার মাত্র তাকাল—আর চমকে উঠলুম আমি!

সুনন্দা!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বেলেঘাটার বাসে ময়লা শাড়ি পরে বসে আছে সুনন্দা! অলক মুখার্জির স্ত্রী! পেছনের গাড়ির প্রচণ্ড হর্নে যখন সংবিৎ ফিরে এল ততক্ষণে দোতলা বাসটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভুলে গেলুম গন্তব্যস্থল। ঐ বাসটার পিছনে ছুটতে থাকি আমি। কিন্তু বৃথাই। পরের মোড়ে সবুজ আলোর সঙ্কেত পেয়ে সে বেরিয়ে গেল; কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই এল লাল বাতির নিষেধ। অল্প পরেই অবশ্য বাসটাকে ওভারটেক করলুম। সে সীটে বসে আছে অন্য দুজন।

কোথায় নেমে গেল ওরা? দ্রুত বেগে ফিরে এলুম বাড়িতে। যা ভেবেছি তাই। সুনন্দা অনুপস্থিত। সেই যে দুপুরে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি। কোথায় গেছে কেউ জানে না। অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অপেক্ষা করতে হল। রাত নটা নাগাদ ফিরে এল সে। আমাকে দেখে সে যতটা চমকে ওঠে তার চেয়ে আমি চমকে উঠি অনেক বেশি। সুনন্দার পরিধানে একখানা মাইশোর জর্জেট, আভরণের কমতি নেই তার দেহে।

—এ কি, আসানসোল যাওনি তুমি?

—না। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—তুমি নেই, তাই একটু আড্ডা দিয়ে এলাম।

—ও! কোথায়?

—নমিতাদের বাড়ি! খেয়ে এসেছ, না খাবে?

খেয়ে আমি আসিনি; কিন্তু খাবার স্পৃহাও চলে গিয়েছিল। বললুম—খাব না, তুমি খেয়ে নাও।

পরদিন ফোন করেছিলুম নমিতাকে। আশ্চর্য! সে বলল—হ্যাঁ, নন্দা তো এসেছিল কাল। সারাটা দুপুর ছিল এখানে। কেন বলুন তো?

—না, এমনিই?

কিন্তু নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করি কী করে?

পর্ণা আর নন্দা। ভেবেছিলুম দুজনকেই আমার আয়ত্তের মধ্যে পেয়েছি। দুজনেই আমার হাতের পুতুল মাত্র। আজ মনে হচ্ছে সেটা আমার ভুল ধারণা। আমিই বোধহয় ওদের হাতের পুতুল! ঠিকই বলেছেন ভিক্টর হুগো—'মেন আর উইমেন্স্ প্লে-থিং; উয়োম্যান ইজ্ দ্য ডেভিল'স্!'

চার

কোথায় যেন গল্প শুনেছিলাম, একজনের মনের মধ্যে শনি প্রবেশ করেছিল। সে দেখলে, তার ঘরের সামনে দিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে। মেয়েটিকে সে বাড়িতে আনবার জন্যে আমন্ত্রণ করল। মেয়েটি বলে—'তুমি আমাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ? কিন্তু শুনে রাখ বাপু, আমি হচ্ছি অলক্ষ্মী—যার সংসারে একবার আমি ঢুকি তাকে আমি ছারখার করে দিই।'

লোকটি বলে—'আমিও তাই চাই। জানো না, আমার শনির দশা চলেছে, আমার সুবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। এসো মা, আমার ঘরে এসো।'

আমারও যেন সেই দশা!

দিব্যি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কেটে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘাড়ে যেন শনি চাপল। আমাকে বলল—'ঐ দেখ, পথ দিয়ে অলক্ষ্মী যাচ্ছে, ওকে ডেকে নিয়ো এসো!'

মনের মধ্যে সুবুদ্ধি বলে উঠল—'ওরে, অমন কাজ করিস না। ও তোর সুখের সংসার ছারখার করে দেবে।'

আমি তখন বধির হয়েছিলাম, সুবুদ্ধির উপদেশ আমি শুনিনি।

বড্ড বেশি বিশ্বাস করতাম অলককে। বড় গর্ব ছিল আমার। আমার ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটার ভেতর যে অপূর্বসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার নিত্য সাক্ষাৎ হয়, ওর ওপর বড় বেশি আস্থা রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার ও-প্রান্তে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় গোলাপফুল গুঁজে যে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রোজ মিটিমিটি হাসে, তার প্রেমে বুঝি পাগল হয়ে আছে অলক। একটা কালো কুৎসিত শ্লেট-পেনসিলের সাধ্যও হবে না সে গ্র্যানাইট-প্রেমের গায়ে আঁচড় কাটতে। কিন্তু কেন এ কথা ভাবলাম? অসম্ভবকে কি ইতিপূর্বেই সম্ভব করেনি পর্ণা? গৌতমকে কি ছিনিয়ে নেয়নি আমার আঁচলের গিঁট খুলে?

কিন্তু কেন এসব ভাবছি পাগলের মতো? সবই হয়তো আমার কপোলকল্পনা। অলক তো বলছে, বিশ্বকর্মা পূজার আগে ঐ নোংরা একগুঁয়ে মজুরগুলো নাকি ধর্মঘট করতে চায়! এই জন্যই তার কাজ বেড়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে রোজ রাত হচ্ছে। হোক রাত, ও তো অফিসেই থাকে। সেটা পরীক্ষা করে জেনেছি। রাত ন'টা বাজলেই অফিসে টেলিফোন করি। সাড়া পাই। ও বলে, আর একটু দেরি আছে। পর্ণাও কি থাকে ওখানে অত রাত পর্যন্ত? জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হয়। কিন্তু থাকলেই বা কী? অফিসে আরও লোক থাকে, দোবেজী থাকে। হাজার হোক সেটা অফিস। অত ভয় কি আমার?

ভয় কি সাধে! আমি যে জানি, ও হচ্ছে—বিষকন্যা!

ও এসেছে আমার সুখের সংসারে আগুন দিতে।

সেদিন অলকের মন বুঝবার জন্যে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—'তুমি বলেছিলে পর্ণাকে একদিন বাড়িতে আনবে, কই আনলে না তো?'

ও বললে—না, ভেবে দেখলাম সেটা উচিত হবে না। হতে পারে এককালে সে তোমার সঙ্গে পড়ত—কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে তার আসমান-জমিন ফারাক। এই তফাতটা বজায় রাখাই ভালো। আর তা ছাড়া মেয়েটি খুব সুবিধেরও নয়, তোমার মুখের ওপরই বলছি—লাই দিলেই হয়ত মাথায় উঠতে চাইবে।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। পর্ণাকে তাহলে ঠিকই চিনেছে ও। হাজার হোক অলক মুখার্জি গৌতম নয়! অত সহজে গলে যাবার মতো মাখনের মানুষ নয় সে।

তবু আমার মন যেন কাঁটা হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ছায়া দেখলেই আমার মনে হয় এ বুঝি গ্রহণের পূর্বাভাস। বিষকন্যার বিষের নিশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাই মাঝে মাঝে। কত সামান্য কারণে আঁতকে উঠি। সেদিন গাড়ির ভেতর একটা সেন্ট-সুরভিত লেডিস-রুমাল কুড়িয়ে পেয়ে ঐভাবে আঁতকে উঠেছিলাম। অলক যখন বললে যে, সে আমারই জন্য রুমালটা কিনেছিল— তারপরে কখন পকেট থেকে পড়ে গেছে জানে না, তখন নিশ্চিন্ত হই।

কিন্তু মদের মাত্রাটা আজকাল আবার বাড়িয়েছে। লক্ষ্য করেছি, যখনই ওর মনে দ্বন্দ্ব আসে ও মাত্রা বাড়ায়। আমার অসুখের সময় যেমন হয়েছিল। কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়েছিল সেবার! এবার অবশ্য মাত্রা বাড়াবার সংগত কারণ আছে। শ্রমিক-ধর্মঘট! কিন্তু অলক তো বারে বারে বলেছে, সে সব মিটমাট হয়ে যাবে। সেটুকু বিশ্বাস আমারও আছে। বিশ্বকর্মা পুজোর আগেই সব মিটমাট হয়ে যাবে। পূজার পরেই এবার ছাঁটাই করতে বলব ওর স্টেনোকে। অলকই তো বলেছে অতি অপদার্থ মেয়েটা। কী দরকার ওকে রাখার? ওকে ডেকে এনেছিলাম একদিন সুযোগমতো অপদস্থ করব বলে—সেটা সেরে নেব এবার। বেশিদিন ওকে রাখা দুঃসাহসের কাজ হবে। সব কথা বরং অলককে খুলে বলি। দরকার হয় গৌতমের কথাও। বিয়ের আগে যদি গৌতমকে ভালবেসে থাকি—সে কি আমার অপরাধ? আজকালকার ছেলে-মেয়েদের প্রাক্‌বিবাহ জীবনের ইতিহাসে অমন এক-আধটা অধ্যায় থাকেই। শুনলে অলকের মূর্ছা যাবার কোনো কারণ নেই। এত বছর ঘর করার পর এ নিয়ে নতুন করে মান-অভিমানের কোনো অর্থ হয় না। আর হলেও বাঁচি। অন্তত তাতেও এই একঘেয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্য আসবে। না হয় থাকলই দুদিন অভিমান করে। তবু সব কথা খুলে বলতে হবে—আর অনুরোধ করব, ঐ মেয়েটাকে ছাঁটাই করতে। অনুরোধ কেন? বাধ্য করব। আমার কথা ও কোনোদিন ঠেলতে পারে না, পারবেও না!

কিন্তু তার আগে বিশ্বকর্মা পুজো!

বছরে এই একটি দিন! শাড়ি-সজ্জার এক প্রদর্শনী! কারখানার মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ করা হয়। সামনে গদি-আঁটা খানকয়েক চেয়ার খালি থাকে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। অভিনয় শুরু হওয়ার আগে হয় পুরস্কার বিতরণী। বাৎসরিক স্পোর্টসে যারা প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। মঞ্চের ওপর সাজানো থাকে নানান উপহার। গদি-আঁটা চেয়ারে আমাকে গিয়ে বসতে হয় মঞ্চের ওপর। পাদপীঠের জোরালো আলোয় ঝলমল করতে থাকে আমার সর্বাঙ্গ! একে একে নাম ডাকে কেউ। আমি হাতে তুলে দিই পুরস্কার। ওরা হাত পেতে নিয়ে যেন ধন্য হয়ে যায়। নত হয়ে নমস্কার জানায়। সে নতি, আমি জানি, শুধু কারখানার মালিকপত্নীকে নয়—সে নতি ওরা জানায় সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। বার্ষিক স্পোর্টসে ওরা যে আপ্রাণ দৌড়ায়, লাফায়, সে কি শুধু ঐ পুরস্কারের লোভে? মোটেও নয়! দৌড়বার সময় ওদের মনে পড়ে এই মুহূর্তটির ছবি—যে মুহূর্তটিতে ওরা আসে আমার সেন্টসুরভিত সান্নিধ্যে, হাত পেতে প্রসাদ নিতে।

এবারও আমি গিয়ে বসব ডায়াসে। এবার পরে যাব সবুজ রঙের নাইলনটা। পান্নার জড়োয়া সেটটা পরব সেদিন। মাথায় দেব জুঁইয়ের একটা মালা। আগে থেকে অলককে বলে রাখব, যেন পর্ণাকে নেওয়া হয় অভ্যর্থনা-কমিটিতে। পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওকে। আমার পক্ষে তাকে চিনতে পারা শক্ত। কারখানায় কত কর্মী, আমি কী করে চিনব? পর্ণা নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে যাবে! হঠাৎ বুঝতে পারবে—যে ধনকুবেরের অধীনে চাকরি পাওয়ার আশায় সে একদিন আবেদনে লিখেছিল—এই অসহায় দরিদ্র রমণীকে দয়া করে কাজটি দিলে প্রতিদানে কর্মক্ষেত্রে সে সকল শক্তি প্রয়োগ করবে—সেই 'অফিস-বস', সেই বড়সাহেবের সঙ্গে রীতিমতো 'লাভ-ম্যারেজ' হয়েছে সুনন্দা মুখার্জির! মনিব-গিন্নি! কথাটা ভাবলেও হাসি পায়। পর্ণা নিশ্চয়ই গম্ভীর হয়ে যাবে। হঠাৎ মাথা ধরার অছিলায় সরে পড়তে চাইবে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার অজুহাত ছাড়া তার আর উপায় কী? কিন্তু ওগো পর্ণা দেবী! আলমগীর যে ভুল করেছিলেন আমি তা করব না! অসুস্থতার অজুহাতে তোমাকে আমার কারাগার থেকে পালাতে দেব না! সে না অভ্যর্থনা-কমিটির লোক! দায়িত্ববোধ নেই ওর? পর্ণাকে ডেকে বলব—'আপনি বুঝি—'; না— 'আপনি' কেন? বলব—'তুমিই বুঝি ওর স্টেনো? আই সী! এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও না ভাই।' বলব—'আমার ড্রাইভারকে একটু ডেকে দাও না লক্ষ্মীটি—না না বিউইকটা নয়—ওটা তোমার সাহেবের—আমার ড্রাইভার আছে আমার গাড়িতে—হ্যাঁ, ঐ কালো পন্টিয়াকটায়— থ্যাঙ্ক য়ু!'

পর্ণা নিশ্চয়ই আজও জানে না, তার বড়সাহেবের মেমসাহেবটি কেমন মানুষ। রূপের প্রশংসা শুনে থাকবে সহকর্মীদের কাছে। নিশ্চয়ই তার কৌতূহল আছে প্রচণ্ড। হয়তো বেচারি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এই সুযোগে মনিব-গিন্নিকে একটু 'লুব্রিকেট' করতে। চাকরি জীবনে 'অসহায় দরিদ্র রমণীর' তোষামোদই তো উন্নতির একমাত্র সোপান। বিশ্বকর্মা পুজোর আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। অলকের ব্যস্ততার আর সীমা নেই। শুনেছি, ব্যস্ততার কারণ পুজো নয়—শ্রমিক য়ুনিয়ানের গণ্ডগোলের জন্যই। কিছুদিন হল শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে। এরা মাঝে মাঝে ছাঁটাই করছে অবাঞ্ছিত শ্রমিক নেতাকে, ও পক্ষ করছে টোকেন-ধর্মঘট অথবা অবস্থান-ধর্মঘট। অবস্থাটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। অলক অবশ্য বারে বারে বলছে, শ্রমিক উপস্থিতির লালকালির দাগটা এখনো সমান্তরালই আছে—কিন্তু ও নাকি গোপনে সংবাদ পেয়েছে, চার্টের দাগটা যে কোনোদিন অতল খাদের দিকে হুমড়ি খেয়ে সোজা নেমে যেতে পারে। কিন্তু ভয় তো আমার ধর্মঘটকে নয়!

সেদিন বলেছিলাম—'সন্ধ্যার পর বাড়িতে বসেই কাজ করলে পার?'

ও বলে—'কেন, ভয়টা কিসের? তোমার বান্ধবীকে তো? যখন তোমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তেন তখন তাঁর কী মূর্তি ছিল জানি না, কিন্তু এখন তাঁর চেহারাটা যদি একবার দেখতে বুঝতে পারতে যে, তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

আমি বলি—'আ হা হা! আমি যেন তাই বলছি!'

ও আমাকে আদর করে বলে—'যার ঘরের কোণে এমন ভরা পাত্র—ঝরনাতলার উছল পাত্রটার দিকে তার নজর যায় কখনও?'

কী কথার ছিরি! আজকাল আবার মাঝে মাঝে বাংলায় উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে

খুশি করার জন্য। এর চেয়ে ইংরেজি বুকনিও ছিল ভালো। অন্তত যা বলতে চায়, তার মানে বোঝা যায়। উপমান-উপমেয়ের তফাত যে বোঝে না—সে কেন এমনভাবে চাল দিয়ে কথা বলতে যায়? রবিবাবুর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলার ফ্যাশন যেন একটা মুদ্রাদোষ আজকালকার ছেলেমেয়েদের!

কিন্তু যে কারণেই হোক, অলক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। ও স্বীকার করল, পর্ণাকে সে ব্যবহার করতে চায় কাঁটা তোলার কাজে। একখণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিয়ে বললে— মেয়েটা কাজের আছে। এই কাগজের অফিস থেকে এক শিট গ্যালি-প্রুফ চুরি করে এনেছে। কাগজটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। চার পাতার একটা সাপ্তাহিক। বিজ্ঞাপন কিছুই নেই। ভাঙা টাইপ, খেলো কাগজ। প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। অর্থাৎ যে ধরনের কাগজ নিত্য বের হয়, নিত্য বন্ধ হয়। কিন্তু আমার দৃষ্টি আটকে গেল সম্পাদকের নামটায়। সম্পাদক—গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়!

আমি ডুবে গিয়েছিলাম অতীতের আমিতে। অলকের কথা আর কানে যায়নি আমার। কলেজ জীবনে আমরা এই নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি—আমরা একটা কাগজ বার করব। আমি আর গৌতম। আমি তার প্রুফ-রীডার-কাম ম্যানেজার, গৌতম তার পাবলিসিটি অফিসার-কাম এডিটর। আমাদের পুঁজি অল্প, কিন্তু আদর্শ বিরাট। বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করব না আমরা। মেহনতি মানুষদের কথা থাকবে তাতে। কৃষককে, শ্রমিককে যারা শোষণ করছে তাদের মৃত্যুবীজ বপন করে যাব আমরা ঐ কাগজে। হয়তো সে চারাগাছের মহীরুহ-রূপ দেখতে পাব না আমরা; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল সে গাছ একদিন ফল দেবেই! আমাদের সেই কল্পলোকের পত্রিকার নামকরণ আমিই করেছিলাম—"দেওয়ালের লিখন।" আগামী দিনের হুঁসিয়ারি থাকবে আমাদের সেই কাগজে। যাদের চোখ আছে তারা পড়ে নাও—"রাইটিং অন দ্য ওয়াল!"

আশ্চর্য! সেই কাগজ এতদিনে বার করেছে গৌতম। আর তার চেয়েও বড় কথা, সে আমার দেওয়া নামটাই বজায় রেখেছে। তা রাখুক, তবু আমি বলতে বাধ্য—গৌতম আদর্শচ্যুত। লক্ষ্যভ্রষ্ট, ব্রাত্য সে। যারা সত্যিকারের সর্বনাশ ডেকে আনছে দেশের, কোটি কোটি টাকা ফরেন এক্সচেঞ্জ ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে গৌতমের কলম রুদ্ধবাক। তার যত তর্জন-গর্জন এই অলক মুখুজ্জেদের মতো চুনোপুঁটির ওপর। অলক ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয় না, কালোবাজারি করে না, শ্রমিকের স্বার্থ সব সময়েই দেখে—তবু তার ওপরেই ওর যত আক্রোশ। কেন? সে কি জানে যে, তার সুনন্দাকে ছিনিয়ে নিয়েছে ঐ অলক? না, তা তো সে জানে না। জানার কথা নয়। তাহলে?

আর পর্ণা? তার কথা তো জলের মত পরিষ্কার। গৌতম ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে কালনাগিনীর স্বরূপ। পাত্তা দেয়নি পর্ণাকে, তাই আজও মিস্ পর্ণা রায় চাকরি করে জীবনধারণ করছে। পর্ণা তাই গৌতমের ওপর প্রতিশোধ নিতে বসেছে। তার খবর গোপনে বেচে আসছে অলকের কাছে। এ কথা গৌতমকে জানিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু না। তাতে অলকের ক্ষতি।

ঠিক করলুম, অলককে অবাক করে দিতে হবে। যে কাজ পর্ণা পারে তা যে আরও সুচারুরূপে সুনন্দা পারে, এটা অলকের কাছে প্রমাণ করা চাই। না হলে এখানেও হার হবে আমার।

যে কথা সেই কাজ। পত্রিকা অফিসের ঠিকানাটা লিখে নিলাম এক টুকরো কাগজে। মতলব ঠিক করাই আছে। সোজা চলে গেলাম নমিতাদের বাড়ি। মনগড়া এক আষাঢ়ে গল্প শোনাতে হল তাকে। আমার এক গরিব বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাই ভাল শাড়িটা তার কাছে রেখে, গহনাপত্র খুলে রেখে যাব সেখানে। নমিতা বুদ্ধিমতী। বলে—বান্ধবী না হয়ে যদি বন্ধুই হয়, আমার আপত্তি কী?

আমি বলি—তোর মন ভারি সন্দেহবাতিক।

নমিতা হেসে বলে—কিন্তু মিস্টার মুখার্জি কোথায়?

—আজ আসানসোলে গিয়েছে। কাল ফিরবে।

—তাই বুঝি আজ বান্ধবীকে মনে পড়েছে?

আমি আর কথা বাড়াতে দিই না।

বেলেঘাটার বাসে চেপে মনে হল—কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাকে যদি এ বেশে কেউ দেখে ফেলে? আমাদের সমাজে বড় একটা কেউ বাসে চাপে না। সেদিক থেকে ভয় নেই। কিন্তু ওর কারখানার কত লোক আমাকে চেনে, যাদের আমি চিনি না। বাসের ঐ কোনায় ঐ যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন,

তখন থেকে দেখছি উনি আমাকে লক্ষ্য করছেন। সে কি শুধু আমার রূপের জন্য? না কি আমার পরিচয় জানেন উনি? অবাক হয়ে ভাবছেন—মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মিসেস্ মুখার্জির। কিন্তু না। অত শত ভাবতে গেলে আমার চলে না। আমি তো আমার যমজ বোনও হতে পারি। ওরা কি জানে, অলক মুখার্জির শালীকে দেখতে ঠিক তার স্ত্রীর মতো কিনা?

বাস চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে। ক্রমে লোকজনে বাসটা বোঝাই হয়ে গেল। নামব কী করে রে বাবা? ফুটবোর্ডে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষ ঝুলছে যে! কী করে বাসে-ট্রামে মেয়েরা যায়? শালীনতা রক্ষা করাই দায়।

বাসের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। বাইরে জনতার স্রোত। আজ ওদের সঙ্গে একটা একাত্মতা অনুভব করছি। আজ আমি ওদেরই একজন। আজ আমার পরনে সাধারণ মিলের শাড়ি, হাতে কাঁচের চুড়ি—গলায় প্যাক কোম্পানির মেকি হার, কানে পুঁতির দুল! আজ আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। চাকরি করি, রেশনের দোকানে লাইন দিই, সন্ধ্যাবেলায় ছোট-ছোট মেয়েদের নিয়ে অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ঘরে প্রাইভেট ট্যুইশানি করি।

—বেগবাগান, বেগবাগান!

একদল মানুষ নামছে, একদল উঠতে চাইছে। কী অমানুষিক প্রচেষ্টা! কেউ কারো তোয়াক্কা রাখে না। ধাক্কা দিয়ে, ঠেলা দিয়ে মানুষ উঠছে অথবা নামছে। আমিও কি নামবার সময় ও রকম কনুইয়ের গুঁতো মারব নাকি? পারব?

—টিকিট?

কন্ডাকটার এসে দাঁড়িয়েছে ভিড়ের মধ্যেও।

ছোট্ট হাত ব্যাগ খুলে বার করে দিই নোটটা, বলি—বেলেঘাটার মোড়ে নামব।

—তা নামুন না, কিন্তু দশ টাকার নোটের ভাঙানি নেই। খুচরো দিন।

—কত?

—পঞ্চাশ।

ব্যাগ হাতড়ে দেখি খুচরো মিলিয়ে বিশ পয়সার বেশি নেই।

কন্ডাকটার ধমকে ওঠে—ভাঙানি না নিয়ে ওঠেন কেন? এই ভিড়ে দশ টাকার ভাঙানি কোথায় পাই আমি?

কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি এসে পড়ে আমার ওপর। নানা রকম মন্তব্য।—আহা, নেই বলছেন ভদ্রমহিলা, বিশ পয়সারই টিকিট দাও না ভাই।

—দয়া-দাক্ষিণ্য করার আমি কে স্যার? স্টেটবাস তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ছাড়ব কোন আক্কেলে?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তবু আমার হয়ে সুপারিশ করেন—আহা মেয়েছেলে—

ও পাশ থেকে একজন অল্পবয়সি ছোকরা ফোড়ন কাটে—মেয়েছেলে বলে তো মাথা কেনেননি। বাসে-ট্রামে দশ টাকার নোট যে ভাঙানো যায় না তা জানা নেই ওঁর? আজই বাসে নতুন চড়েছেন নাকি?

আর একজন বলেন—এ এক চাল! টিকিট ফাঁকি দেওয়ার ফিকির!

বৃদ্ধ তবু আমতা আমতা করে বলেন—তবু, মেয়েমানুষ—

—আরে মশাই, আপনার অত দরদ কেন? বয়স তো অনেক হল দাদু!

শুধু আমার নয়, বৃদ্ধেরও কান লাল হয়ে ওঠে সে কথায়!

কন্ডাকটার তাগাদা দেয়—এক টাকার নোট নেই?

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—না! সবই দশ টাকার!

ছোকরা ফোড়ন কাটে—হায়! হায়! দেবী চৌধুরাণী রে! সবই মোহর!

ভেতরে ভেতরে জ্বলছি তখন আমি। কন্ডাকটরকে বলি—এই দশ টাকার নোটখানাই তুমি রাখ, ভাঙানি দিতে হবে না।

সবাই একটু হকচকিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বলেন—সে কী! না হয় আমিই দিয়ে দিচ্ছি ক'টা পয়সা!

ছোকরা বলে—হ্যাঁ, ওঁর ঠিকানাও বরং জেনে নিন। একদিন পয়সাটা নিয়ে আসবেন! একটু চা-টাও খেয়ে আসবেন।

ও পাশের একজন ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলেন—আঃ! কী হচ্ছে!

ছোকরা বলে—নভেল হচ্ছে দাদা! 'বাস টিকিটের ইতিকথা'!

আমার স্টপেজ এসে গিয়েছিল। উঠে পড়লাম। ভিড় ঠেলে নেমে পড়ি বাস থেকে। জানলা গলিয়ে দশ টাকার নোটখানাই ছুঁড়ে দিই কন্ডাকটারকে। বলি—ভাঙানি হলে ঐ ছোকরাকে দিয়ে দিও। ওর অশ্লীল রসিকতার দাম।

বাস ছেড়ে দেয়।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তবু ঠিকানা খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছানো গেল সেই একতলার স্যাঁৎসেতে ঘরখানায়।

'দেওয়ালের লিখন' পত্রিকার অফিস। ছোট্ট ঘর। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। বিজলি বাতি। অসঙ্কোচে আরশোলা ঘুরছে টেবিলে, মেঝেতে। নড়বড়ে একটা টেবিল। হাতল-ভাঙা খানদুই চেয়ার। টেবিলের ওপর একরাশ কাগজ, প্রুফ, মাটির ভাঁড়ে বিড়ির টুকরো। সামনের চেয়ারে বসে আছে যে মানুষটি তাকে দেখলাম দীর্ঘদিন পর। চোখ তুলে সেও দেখল আমাকে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল!

ঘরে আরও একজন লোক ছিল। বৃদ্ধ, চোখে চশমা। তাতে মোটা কাচ। সুতো দিয়ে বাঁধা কানের সঙ্গে। সেও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উপভোগ করলাম দৃষ্টিটা। হাতদুটি বুকের কাছে জড়ো করে বলি—এটাই কি 'দেওয়ালের লিখন' কাগজের অফিস?

গৌতম কথা বলতে পারে না, প্রতি-নমস্কার করতেও ভুলে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকই আমার কথার জবাব দেন—হ্যাঁ মা। কাকে খুঁজছেন?

—সম্পাদককে।

—ইনিই।

আমিই বসে পড়ি সামনের চেয়ারটায়।

—নমস্কার! আপনিই গৌতমবাবু?

গৌতম সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, কী চান?

—কাগজে আপনারা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম—প্রুফ-রীডার চাই। তাই—

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—কাগজে বিজ্ঞাপন? কোন কাগজে?

এবার থতমত খেয়ে যেতে হয় আমাকে। একান্তভাবে আশা করেছিলাম, আমার মনগড়া কাহিনীটা গৌতম মেনে নেবে। অন্তত তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এভাবে আমাকে জেরা করবে না। কী বলব ভেবে পাই না।

—কই, আমরা তো কোনো বিজ্ঞাপন দিইনি! কাটিংটা এনেছেন?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—কিন্তু—

একটা বিড়ি ধরিয়ে গৌতম বলে—মাপ করবেন। ঠিকানা ভুল হয়েছে আপনার। আমরা কোনো বিজ্ঞাপন দিইনি।

আমি উঠে পড়ি। সপ্রতিভভাবে বলি—তা হবে! বিরক্ত করে গেলাম, মাপ করবেন আমাকে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গৌতম বলে—বিজ্ঞাপন দিইনি, কিন্তু প্রুফ-রীডারের সত্যিই প্রয়োজন আছে আমাদের। আপনি কি এর আগে প্রুফ-রীডিং করেছেন?

এবারে সত্যি কথাই বলি—কলেজ ম্যাগাজিনে এককালে করেছি। দুদিনেই শিখে নিতে পারব।

—অ। লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। সে কথার জবাব না দিয়ে বলি—এক গ্লাস জল পাব?

বৃদ্ধ শশব্যস্তে বলেন—নিশ্চয়ই। বসুন, দিচ্ছি।

যা ভেবেছিলাম তা হল না। বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করতে হল না। ঘরের ভেতরেই ছিল কুঁজো-গ্লাস। অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল এনে দিলেন তিনি।

গৌতম বলল—চা খাবেন?

—খেতে পারি।

—রতনবাবু, মোড়ের দোকান থেকে—

—এক্ষুনি আনছি স্যার—

বৃদ্ধ চলে যেতেই আমি ধমকে উঠি—সব জেনেশুনেও এভাবে আমাকে জেরা করার মানে?

গৌতম হেসে বলে—সব আর জানি কই? বড়লোকের মেয়ে; বি. এ. পাস করলে। বিয়ে করেছ—অথচ তোমার এই হাল!

বললাম—সব কথাই বলতে চাই। চাকরিটা হবে কিনা বল?

—সত্যিই চাকরির দরকার তোমার?

—এখনও সন্দেহ আছে?

—না। কিন্তু তোমার স্বামী—

—স্বামীর কথা থাক।

—তা না হয় থাক, কিন্তু আমার কাগজের যা আর্থিক অবস্থা—

কথাটা ওর শেষ হল না। বৃদ্ধ ফিরে এলেন দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে।

গৌতম বললে—এর বেশি আমরা দিতে পারব না, আপনি রাজি?

বললাম—রাজি না হয়ে উপায় কী? তবে কাজ দেখে পরে না হয় কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

—সে পরে দেখা যাবে। আপনি কি এখানে বসেই দেখবেন? প্রুফ দেব?

—আজ বরং নিয়ে যাই। কাল এনে দেব।

—বেশ রতনবাবু, তিন নম্বর পাতার গ্যালিটা এঁকে দিন।

রতনবাবু একগাদা কাগজ এনে দিলেন আমার হাতে।

চা খাবার পর গৌতম বৃদ্ধকে বলে—আমি একটু বের হব। যদি প্রকাশ আসে বসতে বলবে। আমি ঘন্টাখানেকের ভেতরেই ফিরে আসছি।

দুজনেই বেরিয়ে পড়ি অফিস থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি ফুটপাথ ধরে। একটু দূরে এসে বলি—মাত্র একঘন্টার সময় নিয়ে এলে?

গৌতম বলে—চল, ঐ পার্কটায় বসি।

—চল।

পার্ক ঠিক নয়। ফাঁকা মাঠ। এখনও বাড়ি ওঠেনি। বর্ষার জল জমে আছে এখানে ওখানে, তবু ওরই মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় দুজনে বসি। গৌতম বলে—তারপর? তোমার কী ব্যাপার? এ হাল হল কী করে?

বলি—সে তো দীর্ঘ ইতিহাস। বিয়ে করেছি সে তো দেখতেই পাচ্ছ। স্বামীর রোজগারটাও আন্দাজ করতে পার। আর কী জানতে চাও বল?

—বাবা বেঁচে আছেন?

—না।

—ভায়েরা দেখে না?

—দেখতে চাইলেও আমি দেখতে দেব কেন?

—ল্যভ-ম্যারেজ?

হেসে বলি—না, লোকসান-ম্যারেজ!

—থাক কোথায়?

—ঐ প্রশ্নটার জবাব আমি দেব না।

—ভালো কথা, ফর্মা পিছু দু টাকা করে দেব তোমাকে। তাতে কুলোবে?

আমি আবার বলি—রাজি না হয়ে উপায় কী? তবে কাজ দেখে পরে না হয় কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

একটু ইতস্তত করে গৌতম বলে—আজ কিছু আগাম নেবে?

মানিব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বার করে। আমি বলি—না! একটা টাকাই দাও এখন!

ফেরার ভাড়া। আর এ টাকাটাও আমি দান নিচ্ছি না। তোমার কাগজের নাম দিয়েছি আমি। এ তারই মজুরি।

গৌতম ম্লান হাসল।

বলি—তোমার খবর কী?

—কী খবর জানতে চাও?

—বিয়ে করেছ?

—করেছি।

হেসে বলি—বউ পছন্দ হয়েছে?

গৌতমও হেসে বলে—আমি যদি তোমার ভাষায় বলি—স্ত্রীর কথা থাক।

—আমি বলব, তা না হয় থাক।

গৌতম একটু ইতস্তত করে বলে—পর্ণার খবর জান?

হঠাৎ কেমন যেন রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম—গৌতম, তুমি যদি চাও—তোমার স্ত্রী এবং আমার স্বামীর গল্পও করতে পার তুমি—কিন্তু ঐ মেয়েটির নাম আর আজকের সন্ধ্যাটায় নাই বা আলোচনা করলাম।

গৌতম হেসে বলে—তার মানে তুমি আজও তাকে হিংসে কর?

আমি বলি—না। তার মানে তুমি আজও তাকে ভুলতে পারনি!

গৌতম প্রতিবাদ করে না।

আর করে না বলেই আমার মনের সুর কেটে যায়।

বিরক্ত হয়ে বলি—কী যে তুমি দেখেছিলে ঐ মেয়েটার মধ্যে—

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—কিন্তু এই মাত্র তুমি বললে আজ সন্ধ্যাটায় ওর কথা আমরা আলোচনা করব না।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—হ্যাঁ, তুমি চাও মুখে আমরা ওর কথা আলোচনা করব না। অথচ মনে মনে শুধু তুমি ওর কথাই ভাববে।

গৌতম আবার হেসে বলে—তুমি একটুও বদলাওনি। দি সেম ওল্ড জ্যেলাস্ ইয়াং লেডি!

আমি বলি—বরং কাজের কথা বল শুনি। পত্রিকা কত ছাপছ? ফিনান্স কী রকম? বিজ্ঞাপন নেই দেখলাম। পাচ্ছ না, না নিচ্ছ না? কোনও ফিচার দিতে চাও?

গৌতম বলে—কাগজের কথা আজ আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না।

বলি—তাহলে তো মুশকিল। আমার স্বামীর কথা নয়, তোমার স্ত্রীর কথা নয়, তোমার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের ধ্রুবতারার কথা নয়, এমন কি কাগজের কথাও নয়! তাহলে কী আলোচনা করব আমরা? আজকের ওয়েদার? সিনেমা? রাজনীতি? ক্রিকেট খেলা?

গৌতম সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—তোমাকে দেখে আজ আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। সত্যি করে বলত সু, কেন তুমি এসেছ আমার কাছে?

বললাম—কী আশ্চর্য! সে তো আগেই বলেছি, চাকরির চেষ্টায়।

একটু চুপ করে থেকে গৌতম বলে—আমার বিশ্বাস হয় না। কেমন করে তুমি নেমে এলে এত নীচে?

—নেমে এলাম না উঠে এলাম?

গৌতম ধমক দিয়ে ওঠে—সিনেমার ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা কর না সু! এ দুনিয়ায় বাঁচতে হলে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পার না তুমি। তোমার বাপের যথেষ্ট পয়সা ছিল। ভালো ঘরে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা—শিক্ষায়, বিদ্যায়, রূপে—

বাধা দিয়ে আমি বলি—এ যুগের ছেলেরা অন্ধ হলে আমি কি করতে পারি গৌতম? রূপের জাল তো বিস্তার করেও ছিলাম। কিন্তু জাল কেটে রুই-কাতলাগুলো বেরিয়ে গিয়ে যদি কাগজের সম্পাদক হয়ে বসে, তাহলে আমি কী করতে পারি?

লক্ষ্য করে দেখি, গৌতম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। একটা চোরকাঁটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে অন্যদিকে চেয়ে বসে আছে!

বলি—কী ভাবছ বল ত?

—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—বল না, কী কথা।

—কেন তুমি আজ এসেছ আমার কাছে? কী চাও তুমি সত্যি সত্যি?

ডায়েরি লিখতে বসে আমার মনে হচ্ছে—প্রশ্নটা কঠিন। অথচ কী তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিয়েছিলাম আমি। এখন নিজেকেই যদি ফের ঐ প্রশ্নটা করি, তাহলে নিজেকে কী কৈফিয়ত দেব? কেন গিয়েছিলাম আমি গৌতমের কাছে? দুঃসাহসিকার মতো! সে কি আমার অভিসার? ময়লা শাড়ি আর কাচের চুড়ি পরে একটি বেলা ওর সমতলে গিয়ে দাঁড়াবার সখ? যে জীবনকে পাইনি তাকে কয়েকটা খণ্ড-মুহূর্ত ধরে উপভোগ করবার 'ভাইকেরিয়াস্' তির্যক আস্বাদন? এ কি আমার প্রাচুর্যের হাত থেকে সাময়িকভাবে পালাবার জন্য 'এস্কেপিজম'? না কি সত্যিই গিয়েছিলাম গৌতমের কাগজের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে? আমি অলকের যেমন ক্ষতি করতে পারি না, তেমনি সজ্ঞানে গৌতমেরও কি ক্ষতি করতে পারি? এত কথা তখন আমি ভাবিনি। মুখে-মুখে তৈরি জবাব দিয়েছিলাম—সে তো আগেই বলেছি, টাকার জন্য!

হয়তো বিশ্বাস করল গৌতম, হয়তো করল না। বলল, বেশ, তাই মেনে নিলুম। কিন্তু আজ আর নয়, এবার উঠতে হবে আমায়।

—আর একটু বস না।

—না, কাজ আছে। একজন লোকের আসার কথা আছে।

—গৌতম, প্লীজ!

তবু ও উঠে পড়ে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—তোমার এ কথাটা ঠিক আগের কথার সঙ্গে খাপ খেল না। তুমি এসেছিলে টাকার জন্য। টাকা তোমাকে দিয়েছি, আরও দেব। কিন্তু অহেতুক সময় নষ্ট করে কী হবে বল?

মনে মনে হাসি। এ তাহলে অভিমান। যাক, ওর অভিমান ভাঙাবার সুযোগ পরে পাব। আপাতত আমিও উঠে পড়ি।

গৌতম বলে—আবার কবে আসছ?

—কালই।

—না, কাল এস না। আমি থাকব না। তুমি বরং প্রুফটা ডাকে পাঠিয়ে দিও।

ও চলে যাবার উপক্রম করতে বললুম—আমার ঠিকানাটা তোমায় দিতে পারছি না, তবে এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে আমি পাব।

নমিতার ঠিকানা একটা কাগজে লিখে গুঁজে দিই ওর হাতে।

গৌতম চলে গেল। আশ্চর্য, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

পাঁচ

এতদিনে নিঃসন্দেহ হয়েছি, এ ডেনমার্কে কোথাও কিছু একটা পচেছে। কিন্তু কোথায়? প্রথমে ভেবেছিলুম সেটা ফ্যাক্টরিতে, পরে মনে হল, না—সেটা আমার মনের ভেতর। এখন মনে হচ্ছে, তাও না—পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে সুনন্দার মনে। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কুমুদ।

যদি নিজের চোখেই আগে দেখা না থাকত তাহলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। হয়তো বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যেত। তবু আমাকে বিস্ময়ের অভিনয় করতে হয়—তুমি ভুল দেখেছ কুমুদ! তাই কখনও হয়?

কুমুদ অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—প্রথমটা আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু নমিতা আমার কাছে স্বীকার করেছে!

—কী স্বীকার করেছে? ও বেশে সুনন্দা কোথায় যায়?

—কোথায় যায় তা সে জানে না—কিন্তু যায়।

—ওকেই জিজ্ঞাসা করব?

চমকে ওঠে কুমুদ—পাগল! তাছাড়া নমিতা আমাকে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে তোমাকে বলতে। তা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হলুম। তোমাকে যে বলেছি, তাও নমিতার কাছে স্বীকার করব না আমি।

একটু চুপ করে থেকে বলি—তোমার কী মনে হয়?

কুমুদ বলে—আমার কী মনে হয় সে আলোচনা করার আগে বরং মিসেস্ মুখার্জি নমিতার কাছে যে কৈফিয়ত দিয়েছেন সেটাই বলি—

—বল।

—মিসেস মুখার্জি নাকি তাঁর এক গরিব বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যান।

—দ্যাটস্ অ্যাবসার্ড! তাহলে আমার কাছে গোপন করবে কেন?

—ঠিক তাই। ও কথা নমিতাও বিশ্বাস করেনি, আমিও না।

—তাহলে?

—তাহলে স্টেটমেন্টটাকে একটু সংশোধন করতে হয়। ঐ বান্ধবীর স্ত্রীয়াম্ ঈপ্‌টাকে বাদ দিতে হয়।

আমি চুপ করে থাকি।

কুমুদই ফের বলে—দেখ অলক, আমরা যে সমাজে বাস করি তাতে এ নিয়ে হৈ-চৈ করার কিছু নেই। আজ যদি আমি জানতে পারি নমিতা তার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের কোনো বন্ধুর সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাহলে আমি সুইসাইড করব না। কিংবা আজ যদি মিসেস্ মুখার্জি জানতে পারেন তুমি তোমার লেডি-স্টেনোকে নিয়ে একটু ফুর্তি করেছ কোনও হোটেলে উঠে—

—লেডি স্টেনো? মানে? চমকে উঠি আমি।

—আহা, একটা কথার কথা। তোমার কন্‌ফিডেনশিয়াল স্টেনো পুরুষ কি স্ত্রী তাই তো জানি না আমি। আমি বলছি, এ সব আমাদের সমাজে এমন কিছু ভয়াবহ না। কিন্তু তবু বলব, ঐ সব সাজ-পোশাক বদলানো, ট্রামে-বাসে যাওয়া, এ সব ঠিক নয়। হয়তো এত কথা আমি বলতুমই না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি জড়িয়ে পড়ায়—আই মীন মিসেস্ মুখার্জি আমার বাড়িটিকেই তাঁর 'সেন্টার অব অ্যাক্টিভিটি' করায় সব কথা বলতে হচ্ছে। পাছে তুমি না ভেবে বসো আমরাও পার্টি-টু-ইট।

—কিন্তু আমি কী করি বল ত?

—তোমাকে দুটি পরামর্শ দিতে পারি আমি। একটা শর্ট টার্ম, একটা লং টার্ম!

—বল।

—ইম্মিডিয়েট স্টেপ হিসাবে আমি বলব, সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মাস দু-তিন কোনও টুরিস্ট-স্পট ঘুরে এস, সস্ত্রীক।

কথাটা মনে লাগে। বলি—ঠিক বলেছ! অগস্টিনের একটা কথা আছে '—দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এ গ্রেট্ বুক, অব হুইচ দে হু নেভার স্টার ফ্রম হোম রীড ওনলি এ পেজ!'

আমার কথায় কান না দিয়ে কুমুদ বলে— আর আমার লং টার্ম সাজেশন হচ্ছে, বছরখানেকের মধ্যেই কোনো একটা মেটার্নিটি হোমে একটা কেবিন ভাড়া কর।

অবাক হয়ে বলি—তার মানে?

—তার মানে, ফর হেভেনস্ সেক, স্টপ্ দিস্ ফ্যামিলি-প্ল্যানিং নুইসেন্স!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলি—দুটোই দামি কথা বলেছ তুমি। এই বিশ্বকর্মা পুজো আর স্ট্রাইকের হাঙ্গামাটা মিটে গেলেই একটা লম্বা ছুটিতে বেরিয়ে পড়ব। এখানে জীবন বড় একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে। আর, আর—ও-কথাও ঠিকই বলেছ। বাড়িতে ছেলেপিলে ছাড়া আর মানাচ্ছে না। হয়তো একটা বাচ্চা কোলে এলে এ সব খেয়াল ঘাড় থেকে নামবে। সাউদে ঠিকই বলেছেন— 'কল নট দ্যাট ম্যান রেচেড, হু, হোয়াটেভার ইল্‌স্ হি সাফার্স, হ্যাজ এ চাইল্ড টু ল্যভ।'

কুমুদ আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলে—আমার আর একটি সাজেশন আছে বন্ধু; অ্যান্ড দ্যাটস্ এ রীয়াল পীস অব্ অ্যাডভাইস্।

—বল!

—স্টপ্ প্লেয়িং দ্যাট অফুল গেম অব কোটেশান্স! ঐ কোটেশানের ভূত তোমার ঘাড় থেকে না নামলে, আমি বলে দিচ্ছি, একদিন ডাইভোর্স মামলার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তোমাকে।

আমি জবাব দিইনি। কুমুদের লেখাপড়া কম। টাকা আছে অগাধ—পৈতৃক সম্পত্তি; কিন্তু পেটে নেই বিদ্যে। বায়রনের ভাষায় ওর হচ্ছে 'জাস্ট এনাফ অব লার্নিং টু মিস-কোট।' ও এ খেলার মর্ম কী বুঝবে? জুতসই একটা উদ্ধৃতি দিতে পারা একটা বড় আর্ট! বেইলি বলেছেন, 'দেয়ার ইজ নো লেস ইনভেন্শন ইন অ্যাপ্টলি অ্যাপ্লাইং এ থট ফাউন্ড ইন এ বুক দ্যান ইন বিইং দ্য ফার্স্ট অথার অব দ্য থট!' কুমুদ তার মর্ম কী বুঝবে?

কুমুদ না বুঝুক, পর্ণা বোঝে। কথার পিঠে চমৎকার কথা সাজাতে পারে সে। মোহিত করে দেয় একেবারে।

কিন্তু!

নিজের মনকে আজ জিজ্ঞাসা করবার সময় এসেছে—আমি কোথায় যাচ্ছি? এ কী ভীষণ খেলায় মেতে উঠেছি আমি! মনকে চোখ ঠেরেছিলুম, কিন্তু মনের অগোচরে যে পাপ নেই। আমি কি জড়িয়ে পড়ছি? পড়েছি? এতদূর এগিয়ে গেলুম কিসের টানে? এগিয়ে যেতে দিলুম ওকে? যন্ত্র হিসাবে যাকে ব্যবহার করব মনে করেছিলুম—সে তো যন্ত্র নয়। সে যে রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ। তারও যে একটা সত্তা আছে। শুধু তারই বা কেন, আমারও যে একটা সত্তা আছে। আমার মনের একটা কোনা কি এতদিন খালি ছিল—যা ভরিয়ে তুলতে পারেনি সুনন্দা? কথাটা ভাবতেও বুকে বাজে। কিন্তু কথাটা বোধহয় সত্যি। না হলে এতটা অভিভূত আমাকে করতে পারত না ঐ একফোঁটা একটা কালো মেয়ে। সে ধরা দিল না, অথচ ধরে রাখল আমাকে।

আর নয়। এবার সাবধান হতে হবে। না হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে আমার এ সুখের নীড়। ঠিকই বলে নন্দা—ও মেয়ে বিষকন্যা। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে একেবারে। অথচ কী আশ্চর্য! সব জেনে সব বুঝেও আমি কিছুতেই সাবধান হতে পারি না, সংযত হতে পারি না।

এবার নন্দার ব্যাপারটায় চোখ খুলে গেছে আমার। লম্বা ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব যেদিকে দুচোখ যায়। ধর্মঘটের এ হাঙ্গামাটা মিটলেই আমার ছুটি। কারখানা থেকে ছুটি, দুশ্চিন্তা থেকে ছুটি, আর ছুটি মেয়েটির নাগপাশ থেকে। ছুটিতে যাবার আগে মেয়েটিকে বরখাস্ত করে যেতে হবে। ও মেয়ে সব পারে! যে আমার কাছে টাকা খেয়ে শ্রমিকদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারে, সে আর কারও কাছে টাকা খেয়ে আমার সর্বনাশও করতে পারে। আর কিছু না পারুক আমাকে ব্ল্যাকমেইলও তো করতে পারে।

কিন্তু না, এ আমি অন্যায় করছি। পর্ণা সে জাতীয় মেয়ে নয়। তাকে বিশ্বাস করেছি আমি। অফিসের অনেক গোপন খবর আজ সে জানে। আমিই জানিয়েছি। নির্ভয়ে জানিয়েছি। দুটি কারণে। সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। প্রথমত, সে শ্রমিকদের কাছে আমার গোপন কথা বলতে পারবে না। কারণ সে যে ওদের গোপন সংবাদ আমাকে সরবরাহ করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার কাছে আছে। সে কথা আমি ওদের জানালে এ অফিসে তাকে চাকরি করতে হবে না। শ্রমিকরাই তাকে কেটে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়। বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই শ্রমিক য়ুনিয়ানে। দ্বিতীয়ত, আমি পর্ণার প্রেমে না পড়লেও সে নিঃসন্দেহে আমার প্রেমে পড়েছে। যৌবনের মাঝামাঝি এসেও সে অনূঢ়া। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমার মতো ছেলে ওর কাছে স্বপ্নকথা। রূপকথার রাজপুত্র। ও জানে আমি বিবাহিত—তা হোক, তবু পুরুষের সঙ্গ, পুরুষের কাছ থেকে ফ্ল্যাটারি শুনবার জন্যে যে ঐ অতিক্রান্ত-যৌবনা মেয়েটি আজ লালায়িত। অগাধ সম্পত্তির মালিক, রাজপুত্রের মতো চেহারার একটি ছেলে যদি ঐ আকৈশোর উপেক্ষিতার কানে নিত্য গুঞ্জরণ করে যায়, তাহলে তার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করার অবকাশ কোথায়? পর্ণাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। নিজের স্বার্থেই আটকে রাখতে হবে ওকে।

ছয়

পরশু উৎসব। ভাদ্রের ভরাগঙ্গায় শেষ দিনটির জোয়ার আসতে আর তিন দিন বাকি। কাল থেকে ও বাড়ি ফেরেনি। যা আশঙ্কা করেছিলাম। শ্রমিক-মহলের ধূমায়িত অসন্তোষ হঠাৎ বিস্ফোরণের রূপ নিয়েছে। বেআইনি কাজ করেছে ওরা। মরবে ওরাই। বিনা নোটিসে ধর্মঘট শুরু করেছে হঠাৎ। শেষ সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেছে অলক। তা তো করবেই।

ধর্মঘট আজ তিন দিনের শিশু।

কালও কোনোরকমে কাজ চলেছিল। আজ নাকি বয়লারে আগুন পড়েনি। রামলালের কাছে যা শুনলাম তা ভয়াবহ ব্যাপার। সমস্ত দিন স্তব্ধ গাম্ভীর্যে কারখানাটা যেন অপেক্ষা করে আছে—কালবৈশাখীর পূর্বাহ্ণে যেন বিশাল বনস্পতির মৌনতা।

কাল থেকে অলক বাড়ি ফেরেনি। কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যত কাজই থাক, রাতটা সে বাড়িতেই কাটায়। কাল গেছে একটা ব্যতিক্রম। টিফিন-ক্যারিয়ারে করে অফিসেই খাবার পৌঁছে দিয়ে এসেছে রামলাল। রাত্রে কেন ফিরলনা বুঝতে পারছি না। সারাটা রাত কী এমন কাজ থাকতে পারে? আজ সমস্ত দিনে পাঁচবার টেলিফোন করেছি। প্রতিবারেই শুনতে হয়েছে— বড়সাহেব অফিসে নেই। অফিসে নেই তো কোথায় আছেন? সন্ধ্যাবেলায় আবার একবার ফোন করলাম—সেই একই জবাব—'সরি, মিস্টার মুখার্জি এখন অফিসে নেই।'

—'কোথায় আছেন তিনি?'

—'বলতে পারছি না।'

বিরক্ত হয়ে বলি—'আপনি কে কথা বলছেন?'

যেন প্রতিধ্বনি হল—'আপনি কে কথা বলছেন?'

ধমক দিয়ে উঠি—'আমি মিসেস্ মুখার্জি, আপনি কে?'

ধীরে ধীরে ওপাশ থেকে ভেসে এল—'আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি মিস্টার মুখার্জির স্টেনো। মিস্টার মুখার্জিকে এখন পাবেন না।'

কানে কে যেন সীসে ঢেলে দিল। টেলিফোনের এক প্রান্তে সুনন্দা মুখার্জি, অপর প্রান্তে পর্ণা রায়! মনে হল, ও যেন বলতে চায় অলককে আমি পাব কি না পাব তা নির্ভর করছে ওর মর্জির ওপর। আমি যেন একটা ভিক্ষা চাইছিলাম ওর কাছে—সেটাই প্রত্যাখ্যান করছে ও, স্পষ্ট ভাষায় বলছে—'মিস্টার মুখার্জিকে এখন পাবেন না।' মনে হল কথাটার মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্রূপ আছে— কণ্ঠস্বর অনুসারে যেন ভাষাটা হওয়া উচিত ছিল—'মিস্টার মুখার্জি কি আমার বাঁধা গরু, যে আঁচল খুলে দিলেই আপনার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে?'

ভীষণ একটা কড়া জবাব দিতে গেলাম। কী স্পর্ধা মেয়েটার, লাইন কেটে দিয়েছে!

সমস্ত সন্ধ্যাটা ছটফট করতে থাকি। সময় যেন আর কাটে না। সন্ধ্যার ডাকে এল একখানা চিঠি। হাতের লেখা অপরিচিত। ইচ্ছে করছে না খুলতে। মাথা ধরেছে আজ। কিন্তু হাতেও কোনো কাজ নেই। গল্পের বই পড়তেও ইচ্ছে করছে না। শেষপর্যন্ত খুলেই ফেললাম চিঠিখানা। আদ্যন্ত পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! চিঠি লিখেছে গৌতম। লিখেছে :

"তোমার পাঠানো প্রুফ পেলাম। বলেছিলে, আবার একদিন আসবে। এলে না। ভালই করেছ। যে কথা আজ চিঠিতে লিখছি, তা বোধহয় তোমার মুখের ওপর বলতে পারতুম না। তুমি বোধহয় খুব অবাক হয়ে গেছ আমার চিঠি পেয়ে, নয়? কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি জানতে না যে, আমি জানতুম—তোমার বর্তমান ঠিকানা। তোমার পরিচয়। অনেক দিনই জানি!

"সেদিন তোমাকে দেখে যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম—তার কারণ শুধু এই। আমি ভাবছিলুম—ক্যাপিটালিস্ট অলক মুখার্জির স্ত্রী এ-বেশে, এ-ভাবে কেন এসেছেন আমার দ্বারে!

"বারে বারে তা আমি জানতে চেয়েছিলুম। বারে বারে তুমি মিছে কথা বলেছিলে।

"আমি তখন ভাবছিলুম—তোমার এই অদ্ভুত আচরণের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত তুমি এসেছিলে অলকবাবুর স্বার্থে। হয়তো তাঁরই নির্দেশে। এসেছিলে জানতে আমাদের কাগজের কথা।

আমাদের আগেকার একটি সংখ্যার গ্যালি প্রুফ চুরি যায়। তাতে তোমার স্বামীর প্রভূত সুবিধা হয়েছিল। সেই জন্যই তোমাকে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বাস কর সু (এ নামে এই শেষ বার সম্বোধন করলুম তোমাকে, মাপ কর আমাকে) এ কথা মনে করতে সেদিন রীতিমতো কষ্ট হয়েছে আমার। যে মেয়েটির সঙ্গে একসঙ্গে রাত জেগে পোস্টার লিখতুম কলেজ জীবনে, স্বপ্ন দেখতুম পুঁজিবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে কাগজ বার করব বলে—সেই মেয়েটিই আসবে বন্ধুর বেশে বিশ্বাসঘাতকতা করতে—এটা ভাবতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল আমার। তোমার স্বামী এবং আমি আজ ঘটনাচক্রে বিপক্ষ শিবিরে; তবু আমি ভাবতেই পারি না, তুমি আমার স্বার্থে তোমার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার, অথবা তাঁর স্বার্থে আমার সঙ্গে।

তাই কিছুতেই ও কথাটা মেনে নিতে পারিনি।

"সেদিন আমার স্ত্রীর কথা আলোচনা করিনি, আজ করছি। ঘটনাটা সমস্ত খুলে বলেছি আমার স্ত্রীকে। তাঁর বিশ্বাস, তুমি এসেছিলে শুধু ঐ কারণেই। শাঁখা-সিঁদুর সম্বল করে তুমি গুপ্তচরের বৃত্তিতে নেমেছিলে!

"দেখ, 'স্পাই' কথাটা শুনলেই কেমন যেন লাগে। তবু একটা আদর্শের জন্য, নিঃস্বার্থ দশের মঙ্গলের জন্য যখন মানুষ এই আপাতঘৃণ্য বৃত্তিতে নামে তখন তাকে ঘৃণা করা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের শত শহীদদের আমরা স্মরণ করি, কিন্তু আমি একটি মেয়েকে জানি যে বিপ্লবীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ দিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছিল দারোগাবাবুর কাছে। এক রাত আটকে রেখেছিল সেই নারীমাংসলোলুপ পশুটাকে। স্বাধীনতার পরে যারা জেলে আটক ছিল তারা গদি পেল, পারমিট পেল, চাকরি পেল—পেল খেতাব আর সম্মান; কিন্তু ঐ একটি রাত যে হতভাগী দারোগাবাবুর ঘরে আটকে ছিল সে ঘর পেল না, বর পেল না—মা ডাক শুনল না জীবনে। তাকে ঘৃণা করি এত বড় নীতিবাগীশ আমি নই!

"কিন্তু আমার আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমাকে তো সে সম্মান দেওয়া যাবে না সু। তাই আজও বিশ্বাস করতে পারছি না—সেদিন তুমি এসেছিলে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করবার সদিচ্ছা নিয়ে।

"আর একটি সমাধান হতে পারে এ সমস্যার। তুমি সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছুটে এসেছিলে আমার কাছে অন্য এক প্রেরণায়। সেটা সামাজিক কারণে অন্যায় কি না জানি না। তবু হাজার বছরের কাব্য-সাহিত্য আমাদের শিখিয়েছে একে ক্ষমা করতে। 'প্রেম' এমন একটা জিনিস যাতে অমার্জনীয় অপরাধেরও ধার ক্ষয়ে যায়। বিশ্বাস কর সু, আমি বিশ্বাস করেছিলুম—তুমি তারই প্রেরণায় ছুটে এসেছিলে আমার কাছে,—তোমার স্বামীকে লুকিয়ে, তোমার পরিচয় গোপন করে।

"কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। সে বিশ্বাসটুকুও তুমি আমাকে আঁকড়ে থাকতে দিলে না। তুমি দ্বিতীয়বার এলে না আমার সেই ভাঙা অফিস ঘরে। ডাকের সাহায্যে শুধু আমার কাগজের প্রুফ পাওয়াতেই তোমার আগ্রহ দেখলুম। তাই এই চিঠি।

"সেদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, আমার বউ পছন্দ হয়েছে কিনা। তখন জবাব দিইনি, এখন দিচ্ছি। হ্যাঁ, দাম্পত্যজীবনে আমি পুরোপুরি সুখী। তোমার সব কথা তাকে খুলে বললুম, এ চিঠিও দেখিয়েছি তাকে। তুমিও ইচ্ছে করলে অলকবাবুকে আমার চিঠি দেখাতে পার।

"ঈশ্বর তোমাকে শান্তি ও সুমতি দিন। ইতি—"

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ইচ্ছা করছে কাচের ডিনার সেটটা আছড়ে আছড়ে ভাঙি! হেরে গেছি, একেবারে নিঃশেষে হেরে গেছি। এরপর আর লোকসমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? লোকসমাজে কেন—আয়নার সামনে দাঁড়াব আর কোন লজ্জায়? ঘরে-বাইরে দাঁড়াবার যে একটুখানি ঠাঁইও আমার রইল না। এমন অবস্থাতে পড়লেই কি মানুষ আত্মহত্যা করে বসে?

না। আত্মহত্যা আমি করব না। কিছুই খোয়া যায়নি আমার। অলককে বলব, লম্বা ছুটি নাও। চল, আমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। পর্ণার নাগপাশ থেকে ওকে উদ্ধার করতে হবে। পর্ণাকে তাড়াতে হবে ওর অফিস থেকে, ওর জীবন থেকে। কিন্তু!

পর্ণাকে ওর জীবন থেকে তাড়াতে পারলেই কি সব সমস্যার সমাধান হল? আজ যে আমি ঐ সঙ্গে নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি। সুন্দরী স্ত্রীর একান্ত প্রণয় উপেক্ষা করে অলক যদি মরীচিকার পেছনে ছুটে

থাকে তো তাকে দোষ দেব কেমন করে? আমিও তো ঐ পাপে পাপী! আমিও গৌতমের প্রেসে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম ঐ একই প্রেরণায়। আমার মনে হয়েছিল, অলক যে সুনন্দার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে সে সুনন্দা আমার আমি নয়—সে একটা রক্ত-মাংস-চামড়ায় গড়া পুতুল। সে পুতুলটাকে আমি চিনিমাত্র। সে আমি নই। সে পুতুলটা সাজতে ভালবাসে, সাজাতে ভালবাসে, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মাথায় গোলাপ ফুল গুঁজে সে কফির পেয়ালা হাতে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়। জোলো প্রেম করে। সে কেক বানায়, উল বোনে, সামাজিক পার্টি-ডিনারে হাজিরা দেয়, অলক মুখার্জির স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু সে তো পুরোপুরি 'আমি' নই। আমার মধ্যে যে সত্যিকার নারীসত্তাটা আছে তাকে তো অলক মুখার্জি কোনদিন ঘোমটা খুলে দেখবার চেষ্টা করেনি। সে-আমি যে প্রেমের ভরা বন্যায় নিঃসম্বল যাত্রায় প্রেমিকের হাত ধরে যাত্রা করতে রাজি; সে-আমি যে দয়িতের জন্য সব কৃচ্ছ্রসাধন হাসিমুখে স্বীকার করতে উন্মুখ। অলক মুখার্জি তো সে-আমিকে চিনবার চেষ্টা করেনি,—সে সুযোগও পায়নি সে। আমার সেই সত্তাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঐ গৌতমের ছাপাখানার অফিসে। হ্যাঁ, আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার তখন মনে হয়েছিল, পারলে ঐ গৌতমই পারবে আমার সে প্রেমের মর্যাদা মিটিতে দিতে। ঠিকই ধরেছে সে। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাইনি তার দ্বারে। আমি গিয়েছিলাম সেই প্রেরণায় যে প্রেরণাতে শ্রীরাধিকা ঘর ছেড়েছিলেন! কিন্তু সে কথা কোনোদিন জানতে পারবে না গৌতম; আমি নিজের কাছেও সে কথাটা এই মুহূর্তের আগে স্বীকার করিনি।

গৌতম লিখেছে, দাম্পত্য জীবনে সে সুখী! কেন লিখেছে? সেটা তো মিছে কথা। আমাকে আঘাত দেবার জন্যই লিখেছে। ভেবেছে, সে সুখী, একথা শুনলে আমি ঈর্ষার জ্বলে-পুড়ে মরব। কারণ তার বিশ্বাস, আমি তার কাছে গিয়েছিলাম শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করতে। তার প্রতি ভালবাসার টানে নয়। এও তোমার ভুল, গৌতম। সে ভুল ভেঙে দেবার সুযোগও আমার আছে। কিন্তু তা আমি দেব না। তুমি সুখীই থাক। তোমার সুখেই আমার সুখ। উঃ! মাথার যন্ত্রণাটা আবার বাড়ছে।

চাকরটা এসে খবর দিল শম্ভুচরণবাবু এসেছেন।

শম্ভুবাবু আমার শ্বশুরের আমলের মানুষ। কারখানায় অলকের ডানহাত। শুনেছি আমার শ্বশুর যখন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এই কারখানা খুলবার স্বপ্ন দেখেন তখন সকলে তাঁকে বারণ করেছিল। এই শম্ভুচরণ তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বন্ধু ছিলেন দুজনে। তারপর অবশ্য শম্ভুচরণ বন্ধুর অধীনেই কাজ নেন। সেই অবধি তিনি রয়ে গেছেন এ কারবারে। অলক অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তাঁকে। কর্মচারী হলেও তিনি যে পিতৃবন্ধু এ কথাটা আমার স্বামী ভুলতে পারে না। প্রতি বছরই বিশ্বকর্মা পুজোর দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি এভাবে বাড়িতে এসেছেন বলে মনে পড়ে না তো।

নেমে এলাম বাইরের ঘরে।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন শম্ভুবাবু। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সম্মুখের সোফাটায় বসে বলি—কী খবর শম্ভুকাকা, হঠাৎ এত রাতে?

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বলেন—মায়ের বিশ্রামের কি ব্যাঘাত ঘটালুম?

আমি বলি—মোটেই না; কিছু জরুরি খবর আছে মনে হচ্ছে?

—তা আছে। কিন্তু তার আগে একটা কথা মা। আমাদের কথাবার্তা কি আর কেউ শুনতে পাচ্ছে?

আমি উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলাম। তাঁর কাছে ফিরে এসে বসি; বলি—এবার বলুন।

বৃদ্ধ টাকের ওপর হাত বুলিয়ে আমতা আমতা করে বলেন—তোমাকে সব কথা খুলে বলব বলেই এসেছি মা।—কিন্তু স্বীকার করছি—সঙ্কোচও হচ্ছে একটু। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

আমি বলি—মনে করার মত কথা না বললে, মনে করব কেন?

—কিন্তু মনে করার মতো কথাই যে বলব আমি, মা।

—তা হলেও বলুন।

আবার একটু ইতস্তত করে বলেন—আমার বরখাস্ত হয়ে গেছে, শুনেছ বোধকরি।

চমকে উঠি আমি। বলি, কই, না?

—অলক তাহলে তোমাকেও কিছু বলেনি দেখছি।

—না। কিন্তু হঠাৎ আপনাকে বরখাস্ত করার কারণ?

—সেটাই বলতে এসেছি। সঙ্কোচও সেইজন্য। প্রথমত এ কথা ঠিক, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার পক্ষে বিকল্প চাকরি জোগাড় করা অসম্ভব। সংসারে তোমার কাকিমা ছাড়াও আমার একটি বিধবা মেয়ে আছে। তাদের কেমন ভাবে খাওয়াব-পরাব জানি না।

বুঝতে পারি, সেইজন্য দরবার করতে এসেছেন উনি। এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর আমি নাক গলাই না—জানি, আমার স্বামী কখনও কোনো অন্যায় করেন না। এক্ষেত্রেও না জেনেও আমি স্থির-নিশ্চয় —নিশ্চিত শম্ভুচরণবাবু এমন কোন অপরাধ করেছিলেন যার ক্ষমা নেই। নাহলে কারখানার শৈশবাবস্থা থেকে যে কর্মচারী এর সঙ্গে যুক্ত, যে ওর পিতৃবন্ধু, যার চাকরি যাওয়া মানে একটি পরিবারের নিশ্চিত অনশন-মৃত্যু—তাকে এভাবে পদচ্যুত করত না অলক। সে জাতের মানুষ নয় আমার স্বামী।

বৃদ্ধও সেই কথাই বলেন। বললেন—তোমার জানার কথা নয় মা, তোমার শ্বশুর জানতেন সে সব কথা। অলক তখন বিলাতে। লেখাপড়া করছে। তোমার শাশুড়ি ঠাকরুন মারা গেলেন। তখন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ চলছে—অলক আসতে পারল না। আমাকেই সব কাজ করতে হল। অলকের বাবা শুধু আমার অন্নদাতাই ছিলেন না—তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি বোধহয় মাসছয়েক কারখানায় বার হননি। চাবিকাঠি পর্যন্ত ধরে দিয়েছিলেন এই বুড়োর হাতে। আমি পরলোকে বিশ্বাস করি মা;—আমি জানি, ওপর থেকে তিনি দেখেছেন আমি নিমকহারামি করেছি কিনা!

কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখটা মোছেন উনি।

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কিন্তু আপনাকে বরখাস্ত করার কারণ তো কিছু একটা আছে?

গলাটা সাফ করে নিয়ে তিনি বলেন—তা আছে। আমাকে অলক আর বিশ্বাস করে না। আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক।

আমাকে চুপ করে থাকতে হয়।

বৃদ্ধ আপনমনেই বলতে থাকেন—কারখানার কিছু গোপন খবর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। সব কথা তোমাকে বলতে পারব না আমি। কিন্তু সে সব খবর অলক আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। জানার কথা নয়। তাই ও মনে করে—

মাঝপথেই থেমে পড়েন উনি।

আমি পাদপূরণ করে দিই—সেটা কি অস্বাভাবিক? আপনিই বলুন?

বৃদ্ধ চোখ দুটি আমার মুখের ওপর তুলে বলেন—হ্যাঁ অস্বাভাবিক! এতে আর্থিক ক্ষতি অবশ্য আমার নয়, অলকের। কিন্তু এতে অলক যতটা আঘাত পেয়েছে তার অনেক বেশি পেয়েছি আমি! এ যে আমার নিজে হাতে গড়া কারখানা, মা।

আমি বললাম—কিন্তু, আপনি তো নিজেই বলছেন যে, আপনারা দুজন ছাড়া সে সব খবর আর কেউ জানত না। দ্বিতীয়ত, আপনাদের শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই এ খবরগুলো উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করতে রাজি, নয় কি?

—তা তো বটেই!

—তবে আর অলককে কী দোষ দেব? সে তো ঠিকই করেছে। আমি তো আপনার হয়ে কোনো সুপারিশ করতে পারব না।

বৃদ্ধ একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ, মা। আমি তোমার কাছে দরবার করতে আসিনি। তুমি আমার হয়ে সুপারিশ কর, এ কথা বলতেও আমি আসিনি—

আমি বললুম—তবে কি বিদায় নিতে এসেছেন?

বৃদ্ধ বলেন—হ্যাঁ, তা বলতে পার। যাবার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে বৈ-কি। কিন্তু শুধু সে জন্যও আসিনি। তোমাদের ছেড়ে চলে যাবার আগে তোমাকে বিশেষ করে কয়েকটি কথা বলে যাওয়া কর্তব্য মনে করছি আমি। না হলে তোমার শ্বশুর, আমার সেই অন্নদাতা বন্ধুর কাছে আমার অপরাধ হবে।

আমি চুপ করে বসে থাকি।

বৃদ্ধ বলেন—দেশে আমার সামান্য জমি আছে। সেখানেই গিয়ে উঠব। কোম্পানির দেওয়া বাড়ি আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। দেশের বাড়িতে গুটিকয়েক ছেলেকে পড়াব স্থির করেছি। মনে হয়, কোনো রকমে ভদ্রভাবে দিন কেটে যাবে আমার। শেষদিনের বড় বেশি বাকিও তো নেই।

তারপর আমার বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন—বুঝেছি মা, এ সব কথা তোমার ভাল লাগছে না। তবে ও কথা থাক। কিন্তু যে কথা না বলে যেতে পারছি না, সেটা যে বলতেই হবে।

—বলুন?

—অলকের নতুন স্টেনোটি কি তোমার বান্ধবী?

আমি অবাক হয়ে যাই। এ কথা শম্ভুবাবু কেমন করে জানলেন! একটু বিস্ময়ের অভিনয় করে বলি—কার কথা বলছেন আপনি?

—অলকের নূতন স্টেনো—পর্ণা রায়—কি তোমার সহপাঠিনী ছিল?

বুঝতে পারি, অস্বীকার করাটা বোকামি হবে, তাই বলতে হল—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমাকে সব কথা জানতে হয় মা। না হলে এত বড় কারখানার কোথায় কী হচ্ছে কেমন করে খবর রাখব বল ? তা মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি কত দূর কী জান, বল ত।

—কত দূর কী জানি মানে?

—ওর স্বভাব চরিত্র-সম্বন্ধে, ওর জীবনের সম্বন্ধে?

—বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন করছেন আপনি?

—করছি, কারণ করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তোমার শ্বশুর আজ উপস্থিত থাকলে তিনিই এ প্রশ্ন করতেন।

আমি একটু রুক্ষ স্বরে বলি—কিন্তু আমার শ্বশুরকে যে জবাব আমি দিতাম, তা—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলে ওঠেন—'তা আমার স্বামীর বরখাস্ত-করা কর্মচারীকে আমি দিতে বাধ্য নই,'—এই তো?

আমি চুপ করে থাকি। অপমানে ওঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন—আমারই ভুল মা, আমারই ভুল। তোমার কাকিমাও বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, চাকরিই যখন রইল না, তখন এ সব কথার মধ্যে আমাদের না থাকাই ভাল। বেশ তোমার ভালমন্দ তুমিই বুঝে নিও। আমি বরং চলি—

উঠে দাঁড়ান উনি।

আমি একটু ইতস্তত করে বলি—উনি কি আজ আসবেন না?

লাঠিখানা তুলে নিতে নিতে উনি বলেন—বোধহয় না। এলে আর কেন গাড়ি পাঠিয়ে পর্ণাকে নিয়ে যাবেন?

—কে নিয়ে গেল? কোথায়?

বৃদ্ধ যেন এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, বলেন—এইমাত্র আসানসোল থেকে গাড়ি এসেছিল—ওঁর স্টেনোকে নিয়ে আবার গাড়ি সেখানে ফিরে গেল।

আমি সচকিত হয়ে বলি—সে কী! কেন?

—সে কথাই তো আলোচনা করতে এসেছিলুম মা; কিন্তু তুমি দেখছি এ বরখাস্ত-করা কর্মচারীকে বরদাস্ত করতে নারাজ!

গরজ বড় বালাই! ওঁকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলি—আপনি অহেতুক আমার ওপর রাগ করছেন। আমি যে সব কথা বলিনি তাই আমার মুখে বসিয়ে খামখা আমাকে দোষারোপ করছেন। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলুন কাকাবাবু। আমিও দেখি আপনার জন্য কিছু করা যায় কিনা।

আবার বসে পড়েন বৃদ্ধ। বলেন—না, আমার জন্য কিছু আর করার নেই। সে অনুরোধও আমি করব না। কিন্তু তুমি এবার নিজের ঘর সামলাও, মা। আমার ঘর ভেঙেছে, তা ভাঙুক—আমার জীবনের বাকিই বা কী আছে? কিন্তু তোমাকে যে অনেকটা পথ এখনও চলতে হবে।

বুকের মধ্যে দুরদুর করে ওঠে। বলি—কেন, আপনি কি তেমন কিছু আশঙ্কা করেছেন?

—তা করছি। সে সব কথা আগে বলতে আমার সঙ্কোচ হত না। আজ তোমার মনে হতে পারে, আমি বুঝি প্রতিশোধ নিতেই কতকগুলো মিছে কথা বানিয়ে বলে যাচ্ছি—

—না না না। আমি তা মনে করব না। আপনি বলুন। সব কথা আমাকে খুলে বলুন। উনি কি পর্ণাকে নিয়ে—

—হ্যাঁ তাই। সন্দেহটা আমার অনেকদিনই হয়েছিল। কানাঘুষা অনেক কিছুই শুনেছি। বিশ্বাস করিনি; বিশ্বাস করতে মন চায়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা দুজনেই ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে পড়ছে। আশ্চর্য! যার ঘরে এমন সতীলক্ষ্মী বউ—

লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমার। কিন্তু ও বৃদ্ধের কাছে আর লজ্জা করে কী হবে? বলি—কেমন করে এমন হল কাকাবাবু?

—কেমন করে হল তা বলা বড় শক্ত মা। বোধ করি পুরুষমানুষের ধর্মই এই। যা হাতের কাছে অনায়াসে পাওয়া যায় তাতে তার তৃপ্তি নেই। তা বড়লোকের সমাজে এটা তেমন কিছু নয়, আমিও এটাকে অতটা গুরুত্ব দিতুম না; দিতে হচ্ছে অন্য কারণে। এ মেয়েটির সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আমার ভয় হয়েছে এ শুধু তোমার ঘরেই নয়; তোমাদের কারখানাতেও আগুন জ্বালাবে! একটি গোপন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। অলককে সে কথাই বলতে গেলুম—কিন্তু সে যেন নেশার ঘোরে আছে। আমার কথায় কান তো দিলেই না, অহেতুক অপমান করে বসল আমাকে।

আমি বলি—আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

—অসম্ভব কিছুই করতে বলি না। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থ বধূ যা করে থাকে তাই করবে। অলককে সরিয়ে নিতে হবে পর্ণার সান্নিধ্য থেকে। ও মেয়েটি সর্বনাশা, ওকে তাড়াতে হবে।

আবার বলি—কিন্তু আপনি যদি আমাদের ছেড়ে যান, তাহলে কেমন করে আমি তা পারব বলুন? আপনাকে তো যেতে দেওয়া যাবে না।

—কিন্তু রাখবে কেমন করে মা? সে সব বরং থাক। আপাতত আমি যাই। যে অলক্ষ্মী ওর উপর ভর করেছে, ঘাড় থেকে সে অলক্ষ্মী নামলে ওর শুভবুদ্ধি আপনিই জাগ্রত হবে। তখন হয়তো সে আবার আমাকে ডেকে পাঠাবে। ওকে আমি সন্তানের মতোই স্নেহ করি। তখন আমি অভিমান করে দূরে সরে থাকব না।

—পর্ণা যে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, এ খবর আপনি কেমন করে জানলেন?

—ঐ যে বললাম, এ সব কথা আমাদের জানতে হয়। এত বড় কারখানাটা যাকে চালাতে হয়, তাকে অনেক খবর সংগ্রহ করতে হয়।

—ওঁকে আপনি বলেছিলেন সে কথা? উনি বিশ্বাস করেননি?

—তার বুদ্ধি যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মা। তাকে ঐ মেয়েটি সম্মোহিত করে ফেলেছে।

কেমন যেন মাথা কাটা গেল আমার।

বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি স্থাণুর মত বসেই রইলুম।

সারারাত ঘুম হল না। আবোলতাবোল চিন্তায় সমস্ত রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছি। কেন এমন হল? অলক আর সুনন্দা দুটি সুখী প্রাণী। আদর্শ দম্পতি। ভেবেছিলাম, একটি মেয়ে জীবনে যা যা কামনা করতে পারে সবই আমার করতলগত হয়েছে। সম্মান, প্রতিপত্তি, বিলাস, বৈভব—রূপবান, স্বাস্থ্যবান স্বামীর একান্ত প্রণয়। কী নয়? নিজের পছন্দমত শাড়ি গাড়ি কিনেছি। নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রাসাদোপম বাড়িটি তৈরি করিয়েছি। কোন ঘরে কী রঙের টাইল বসবে, কী রঙের প্লাস্টিক ইমালশান রঙ হবে, কী ধরনের পর্দা হবে—সব আমি স্থির করে দিয়েছি। এমনকি গেটের পাশে আলোর টোপরা-পরা বাড়ির ঐ নেমপ্লেটে কী লেখা হবে তাও স্থির করে দিয়েছি আমি। মনে আছে এ প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে যে রহস্যালাপ হয়েছিল। বাড়ি যখন শেষ হয়ে এল অলক বললে—এবার এ বাড়ির একটা নামকরণ করতে হয়।

আমি বলেছিলুম—কর। বাড়িটার কোথায় কী করতে হবে তা আমিই নির্ধারণ করেছি, অন্তত নামটা তুমি দাও।

ও বলেছিল—বাড়ির নামকরণ সম্বন্ধে ডক্টর জনসন কী বলেছেন জান?

আমি বলি—ডক্টর জনসনের উপদেশ থাক। তুমি চটপট একটা নামকরণ কর দেখি।

—সে কি হয়। তুমি বাংলার ছাত্রী। নাম দিতে হয়, তুমিই দেবে।

মনে আছে, আমি বলেছিলাম —তবে নাম দাও 'অলকাপুরী'!

ও লাফিয়ে উঠে বলেছিল—কক্ষনও নয়! অলকের নাম থাকবেই না, ওর নাম হোক 'নন্দালয়'।

তাতে আমার ঘোর আপত্তি। শেষ পর্যন্ত মধ্যপথে রফা হল আমাদের। নামটা আমিই দিলাম অবশ্য—'অলকনন্দা'।

অলক আর সুনন্দা দুটি নাম একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে গেল পাষাণের ফলকে।

হার রে নাম! সেদিন দূর থেকে কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত অলকনন্দার ধারাকেই দেখেছিলাম। আজ দেখলাম খাড়া প্রেসিপীস্! অলকনন্দার খাদ! সে খাদ অলকের সোনাতেও ছিল, সুনন্দার সুবর্ণেও ছিল। সংসারের উত্তাপে প্রেম কোথায় থিতিয়ে পড়েছে। ওপরে ভাসছে শুধু খাদ!

কিন্তু কেমন এমন হল? অলককে নিয়ে আমি সুখী না হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার মনের অনেকখানি ছিল ফাঁকা। প্রাপ্তির প্রাচুর্যে সে ফাঁকটি ভরেনি। প্রেমিকের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনের সুযোগ আমি পাইনি, দাম্পত্য-কলহের স্বাদ আমাকে পেতে দেয়নি অলক,—স্বামীর ক্ষুধার অন্ন জোগাতে নিজের মুখের গ্রাস লুকিয়ে ধরে দেবার যে বিমল আনন্দ তা থেকে সে আমাকে চিরবঞ্চিত করেছিল। তা ছাড়া আমার ভেতরে চিরকালই লুকিয়ে ছিল একজন দুঃসাহসিকা। সে বেপরোয়া, সে দুর্মদ, সে অভিসারিকা। তার খোঁজই জানে না অলক। তাই অন্য কোনো আকর্ষণে দাম্পত্য জীবনচক্রের আবর্তন থেকে কেন্দ্রাতিগ বেগে ছুটে যাবার একটা তির্যক বাসনা আমার মনে জাগলেও জাগতে পারে। গৌতমের প্রেমে সম্মোহিত হবার উপাদান ছিল আমার রক্তের স্বাক্ষরে। কিন্তু সে কেন এমন লুটিয়ে পড়ল ঐ সামান্যার মোহে? কী আছে পর্ণার, যা আমার নেই? কোন স্বাদে অলক বঞ্চিত আমার কাছে?

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। স্থির করলাম, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। অলক যদি একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা না দেয় তাহলে আমিই বা সে দায় একা বয়ে বেড়াব কোন দুঃখে!

পরদিন সকালে উঠেই ছুটলাম গৌতমের ছাপাখানায়।

এবার আর আটপৌরে শাড়ি নয়, স্বাভাবিক সাজে। ভড়ংও নেই, আড়ম্বরও নেই। যে বেশে সেই কলেজ জীবনে দেখা হত আমাদের, সেই বেশে। ট্যাক্সি করেই যেতে হল। বাড়ির গাড়ি ও-পাড়ায় নিয়ে যাবার কী দরকার? গৌতম ছিল না তার ছাপাখানায়। ছিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি সেদিন আমাদের দু কাপ চা এনে দিয়েছিলেন।

কথাবার্তা শুনে মনে হল তিনি এখনও আমার পরিচয়টা জানেন না। গৌতম কখন আসবে তা তিনি বলতে পারলেন না।

বললাম—কোথায় গেলে তাঁর দেখা পেতে পারি?

—বাসাতেই থাকেন এ সময়। অবশ্য এখন আছেন কিনা জানি না।

—বাসা কোথায়?

—যাবেন আপনি? বেশি দূর নয়। এই গলিটা দিয়ে কিছুদূর গেলেই একটা বাঁশের পুল পাবেন। সেটা পার হয়েই ডানহাতি করোগেট টিনের চারচালা বাড়ি। যাকে শুধাবেন, সেই পথ বাতলে দেবে।

—আর কে কে আছেন তাঁর বাসায়?

—তিনি, তাঁর স্ত্রী আর একটি ছেলে। স্ত্রী অবশ্য আজ নেই। কাল কোথায় যেন গিয়েছেন।

—কোথায় গিয়েছেন?

—তা তো জানি না। কাল রাত্রে এখানে এসে বললেন যে, দুচার দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন। গৌতমবাবু তখন এখানেই ছিলেন কিনা।

—ও!

—চলুন, আপনাকে বরং দেখিয়ে দিই।

কৌতূহল প্রবল। তার ওপরে গৌতমের স্ত্রী আজ বাড়ি নেই। এ সুযোগ ছাড়া হবে না। দেখে আসা যাক ওর সংসারের স্বরূপ। সংসারের প্রেমে সে নাকি মশ্‌গুল হয়ে আছে!

ভদ্রলোক দরজায় শিকল তুলে তালা লাগালেন। দুজনে পথে নামি। নোংরা গলি। যেখানে-সেখানে নির্বিচারে ময়লা ফেলা আছে। পথ জুড়ে শুয়ে আছে রোমন্থনরত নিশ্চিন্ত গো-শাবক। নির্বিচারে উলঙ্গ

দুটি শিশু পথের ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে বসেছে। একটা ঠেলাওয়ালা পথের আধখানা আটক করে পড়ে-পড়ে ঘুমাচ্ছে। মুখের ওপর গামছা ফেলা। দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সামনের বাড়ির বউটি আঁচল দিয়ে সারা গা ঢেকে একটা এনামেলের পাত্রে আঁজলা ছাই নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল পথে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এত সুন্দরী মেয়ে বোধহয় এ সব পাড়ায় আসে না। বউটি ছাই ফেলতে ভুলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। এ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি অভ্যস্ত। এতদিন ভাবতুম এ আমার রক্ষাকবচ—সহজাত কবচকুণ্ডল। হার রে রূপ! সে দেমাক আমার গিয়েছে।

—সাবধানে পার হবেন।

বাঁশের পুলের কাছে এসে গেছি। আমি চাই না যে, ও ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আসেন। তাই তাঁকে বিদায় করবার জন্য বলি—এবার আমি যেতে পারব। ঐ বাড়িটা তো?

ভদ্রলোক মনে হয় ক্ষুণ্ণ হলেন। আমার পাশে চলতে বেশ একটা আনন্দ বোধ করছিলেন বোধ করি। কিন্তু আমার কথার জবাবে তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

—হ্যাঁ, আসুন।

ছোট্ট দুকামরা বাড়ি। টিনের চালা, মুলিবাঁশের ছেঁচা-বেড়ার দেওয়াল। মেঝেটা অবশ্য পাকা। সামনে একটু বাগান। তাতে নানান ফুলের গাছ। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধুমালতীর গেট। সন্ধ্যামণি, বেলি, জুঁই, দণ্ডকলস আর রজনীগন্ধার চারা। আমার দিকে পেছন ফিরে গৌতম বেড়া বাঁধছিল। খালি গা। পরনে একটা পায়জামা। গলায় মোটা পৈতে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তার একহাতে একখানা কাটারি, অন্য হাতে আধলা বাঁশ। গেটটা খুলতেই মুখ তুলে তাকায়। অবাক হয়ে যায় গৌতম। উঠে দাঁড়ায়, বলে—তুমি?

হেসে বলি—হ্যাঁ আমিই—কিন্তু ভেতরে আসব তো?

—কেন আসবে না?

—আমি যে নিরস্ত্র, আর তুমি সশস্ত্র! বিশ্বাসঘাতককে খতম করতে কতক্ষণ?

—ছিঃ! কী যা তা বলছ? এস, ঘরে এস—

দা-খানা ফেলে হাতের ধুলো ঝেড়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়ায়। বেতের মোড়া একখানা টেনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—বস।

একটু অভিনয় করতে হল। বলি, আসতে বলেছ এসেছি; কিন্তু বসতে তো তুমি বলবে না। গৃহস্বামিনীকে ডাক—তিনি অনুমতি করলেই বসতে পারি।

গৌতম হেসে বলে—তিনি উপস্থিত থাকলে তাই হত। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে নেই।

—আয়াম সরি! বাজারে গেছেন নাকি?

—না, তিনি কলকাতাতেই নেই আজ।

—ও হো! তবে তো আমার আসাটাই আজ ব্যর্থ হল।

—তাই নাকি! তাহলে তুমি আমার কাছে আসনি দেখছি।

—না তোমার কাছে নয়, তোমাদের কাছে এসেছিলাম আজ। দেখতে এসেছিলাম কী মন্ত্রে তিনি বশ করেছেন তোমায়।

গৌতম হাসল। জবাব দিল না।

—তোমার ছেলেটি কোথায়?

—ছেলের খবর পেলে কার কাছে?

বলি—গৌতম, আমি তো প্রশ্ন করিনি, তুমি আমার স্বামীর খবর কার কাছে পেয়েছিলে।

গৌতম সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বলে—বল্টু স্কুলে গেছে।

—স্কুল? সে কোথায়?

—ঐ তো! প্রাইমারি স্কুল। এখনই আসবে সে। চা খাবে?

—খেলে তোমাকেই বানাতে হবে তো?

—কেন? তুমিও বানাতে পার।

—পারি? তবে চল।

এলাম ভেতরের ঘরে। ছোট বাড়ি, দুখানি মাত্র ছোট্ট ঘর। ভেতরে একটি বারান্দা। তারই একান্তে রান্নার আয়োজন। কাঠের উনুন। দেওয়ালে লটকানো একটি প্যাকিং বাক্স। তাতে রান্না করার নানান উপচার। মশলার কৌটা, আচার, নুনের কেঠো। একটা ঝুড়িতে কিছু আনাজ। আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, কচু আর আদা। মাটিতে কলসিতে মোটা চাল। ছোট্ট একটি বঁটি, চাকতি-বেলুন, শিল-নোড়া। গৌতম বললে—সরো, উনুনটা জ্বেলে দিই।

—থাক মশাই, আমিই পারব।

—না পারবে না—ফুঁ দিতে দিতে শুধু শুধু চোখে জল আসবে।

হেসে বলি—শরৎবাবুর বইতে পড়নি রান্নাঘরের ধোঁয়া বাঙালি মেয়েদের চোখের জল লুকোবার একটা ভাল অছিলা?

—তোমারও কি কোটেশান খেলার বাতিক আছে নাকি?

চমকে উঠে বলি—তার মানে?

গৌতম অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলি—শুনেছি মিস্টার মুখার্জি নাকি অ্যাপ্ট কোটেশানের ভারি ভক্ত।

—সেটাও শুনেছ? এত কথা শোন কার কাছে?

গৌতম আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দেয়। বলে—আমি তো প্রশ্ন করিনি সু—আমার ছেলের কথা তুমি কার কাছে শুনেছ!

হেসে বলি—কুইটস্। নাও সরো, উনুনটা ধরাই।

কিন্তু কী লজ্জা! কিছুতেই জ্বালতে পারি না কাঠের উনুনটাকে। গৌতম একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এতক্ষণে এগিয়ে এসে বলে—নাও, খুব হয়েছে। বরং এইটা জ্বেলে নাও।

জনতা স্টোভ একটা টেনে আনে কোথা থেকে।

দু-কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এসে বসলাম ওর ঘরে! সেইটা মনে হয় ওদের শয়নকক্ষ। এটাই বড় ঘর। দুখানা চৌকি পাতা। ধবধবে সাদা চাদর। বালিশ-ঢাকায় কাজ করা। ছোট একটি টিপয় টেনে আনল গৌতম। চায়ের কাপ দুটি রাখল তার ওপর। আমি বলি—টিপয়ও আছে?

গৌতম হেসে টেবিল-ঢাকাটা তুলে ফেলে। কেরোসিন কাঠের বাক্স একটা। সুদৃশ্য টেবিল-ঢাকায় তার ভোলটাই পাল্টে গিয়েছে। গৌতম হেসে বলে—অত কৌতূহল দেখিও না সু! নিম্নমধ্যবিত্তের সংসার খুঁটিয়ে দেখতে চেয়ো না। কোনোক্রমে ওপরের ঐ কোঁচার পত্তনটি বজায় রেখেছি আমরা। ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন!

আমি হেসে বলি—সে সর্বত্রই! পোশাকের তলায় সবাই উলঙ্গ!

আবার একটু চুপচাপ।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ওর গৃহস্থালির আয়োজন। উপকরণ সামান্যই—কিন্তু কী সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে। মনে হল, সুন্দর গৃহস্থালির একটি অনিবার্য উপকরণ হচ্ছে 'অভাব'! প্রাচুর্যের মধ্যে কিছুতেই এ মাধুরী ফুটিয়ে তোলা যাবে না। ঐ যে ছেঁড়া শাড়ির পাড় দিয়ে মোড়ার ওপর আসন তৈরি হয়েছে, ঐ যে মাটির ঘটে আলপনা দিয়ে স্থলপদ্ম রাখা আছে, ঐ যে ছেঁড়া ধুতি বাসন্তী রঙে ছুপিয়ে জানলার পর্দা করা হয়েছে—ও জিনিস কিছুতেই পাওয়া যাবে না সুনন্দা মুখার্জির ড্রইংরুমে। কারণ ওর মূল সুরটাই হচ্ছে অভাবের মাঝখানে ফুটে ওঠা রুচিবোধ। তাজা পদ্মফুলের অনিবার্য আনুষঙ্গ যেমন পাঁক, এই গৃহস্থালির মূল সুরটিও যেন তেমনি—অনটন। এমনটি করে ঘর সাজাতে পারব না আমি কোনোদিন—এ কি আমার কম দুঃখ! জোর করে মাটির ঘট নিয়ে গেলে তাতে উপহাসের হাওয়াটাই লাগবে, অনাবিল হাসির সুরটা ফুটবে না।

—কী দেখছ অত চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

—দেখছি মিসেস্ ব্যানার্জির কোনো ফটো আছে কিনা দেওয়ালে।

—হতাশ হতে হবে তাহলে তোমাকে। তাঁর কোনো ফটো এ বাড়িতে নেই।

আমি বলি, বুঝেছি। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

গৌতম হেসে বলে—নো কোটেশনস্ প্লীজ! আমি ওটা একদম সইতে পারি না।

—তুমি দেখছি অলকের একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা!

—তা বলতে পার!

আবার কিছুটা চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে আবার আমাকেই বলতে হয়—তোমার চিঠি পেয়েছি কিনা প্রশ্ন করলে না তো?

—প্রশ্ন না করলেও বুঝতে পারছি, তা তুমি পেয়েছ।

—তবু ঢুকতে দিলে বাড়িতে? ভয় নেই?

—ভয় কিসের?

—যদি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করি?

গৌতম হেসে বলে—সে জন্যে তো তুমি আসনি।

—তবে কেন এসেছি?

—তা তুমিও জান, আমিও জানি—কী দরকার সেই কথাটা উচ্চারণ করে। সেটা অকথিতই থাক না। তাতে তার মাধুর্য বাড়বে।

কেমন যেন লজ্জা করে ওঠে। মুখটা আর তুলতে পারি না। নিচু মুখেই অস্ফুটে বলি—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—বল।

—আমাদের গেছে যা দিন, তা কি একেবারেই গেছে? কিছুই কি নেই বাকি?

গৌতম স্মিতমুখে চুপ করে বসে থাকে।

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কই, জবাব দিলে না?

—ভাবছি, এত কোটেশন দিচ্ছ কেন আজ। ধার করা কথা ছাড়া নিজের কথা কিছু বলতে পার না?

—মানে?

—মানে, তোমার ও কথার জবাবে একটি মাত্র কথাই তো বলা চলে—'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'!—কিন্তু তুমি-আমি তো তোতাপাখি নই সু!

অপ্রস্তুত হতে হল। বলি—বেশ, স্থূলভাবেই প্রশ্ন করছি—মিসেস্ ব্যানার্জি কি তোমার মনের সবটুকুই ভরিয়ে রেখেছেন—কিছুই কি নেই বাকি?

গৌতম একটুক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর বলে—এ প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কি আমার পক্ষে শোভন? থাক না ও কথা!

আমি হেসে বলি—আমার প্রশ্নের জবাব তুমি দিলে না গৌতম; কিন্তু তোমার চোখ-মুখ বলছে সে কথা! তোতাপাখির কথা নয়, আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সেই তারা, যা লুকিয়ে রেখেছিলে তোমাকে, তোমার দিনের আলোর গভীরে।

গৌতম একটু সচকিত হয়ে বলে—সুনন্দা, আজ তোমার মন নিজের এক্তিয়ারে নেই। আমি বুঝতে পারছি, কোনো কারণে তুমি আঘাত পেয়েছ মিস্টার মুখার্জির কাছে। কিন্তু আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না, যার জন্যে পরে অনুতাপ করতে হয়।

হঠাৎ যেন রক্তে দোলা লাগল আমার! মনে হল, কিছুই খোয়া যায়নি। পর্ণার কবল থেকে একদিন যেমন মোহজাল বিস্তার করে ছিনিয়ে এনেছিলাম গৌতমকে, আজও তেমনি ওকে এক মুহূর্তে ছিনিয়ে আনতে পারি এই অচেনা অজানা মিসেস্ ব্যানার্জির নাগপাশ থেকে। আমার উষ্ণ যৌবন, দীপ্ত নারীত্বকে অস্বীকার করতে পারবেনা গৌতম! একটু ঝুঁকে পড়ে বলি—অনুতাপ কিসের গৌতম? তুমি ঠিকই বলেছ—একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েই ছুটে এসেছি আমি। কিন্তু তুমি কি একটা মুহূর্তের জন্যও সে ক্ষতচিহ্নে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পার না? এমন কিছু আমাকে দিতে পার না যা নিয়ে—

কথাটা শেষ করতে পারি না। গৌতম উঠে দাঁড়ায়—বলে, প্লীস সু। আমিও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। এভাবে আমাকে প্রলুব্ধ কর না।

আর স্থির থাকতে পারি না আমি। আসন ছেড়ে আমিও উঠে দাঁড়াই; বলি—তাহলে আজ আমাকে এমন কিছু একটা দাও—

এবারও শেষ হয় না কথাটা। আমাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গৌতম আমার পেছন দিকে তাকায়।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াই। দেখি, পিঠে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে হাফ-প্যান্ট পরা একটি বছরছয়েকের ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। জুলজুল চোখে চেয়ে দেখছে আমাকে। হঠাৎ কী হল আমার। মুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম তাকে। বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম সজোরে। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম তার গাল দুটো।

গৌতম স্মিতহাস্যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আমার কাণ্ড।

সাত

'ল্যভ ইজ লাইক দ্য মুন; হোয়েন ইট ডাজ নট ইনক্রিজ, ইট ডিক্রিজেস্।' কোটেশানটা কার, ঠিক এই মুহূর্তে মনে আসছে না। কিন্তু কথাটা একেবারে খাঁটি। অর্থাৎ প্রেম ঠিক চাঁদের মতো— যখন বৃদ্ধি পাওয়ার আর উপায় থাকে না, তখন তা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে।

আমার ক্ষেত্রে কথাটা অদ্ভুতভাবে ফলেছে।

অলক আর সুনন্দা। আমরা এক আদর্শ দম্পতি। দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিলুম এই 'অলকনন্দা'। তুষারদ্রব সুরগঙ্গা। এ অলকনন্দার ধারা ছিল নির্মল, পবিত্র, স্বর্গীয়। পার্থিব মলিনতার স্পর্শ লাগেনি এর গায়ে। আমাদের দুজনেরই মন ছিল কানায় কানায় ভরা—দুজনকে নিয়ে।

মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথে শুনেছি অলকনন্দার অববাহিকা ধরে চলতে হয়। যাত্রীদল অন্যমনে পথ চলে—লক্ষ্য তার মহাতীর্থের দিকে—সারা পথে অলকনন্দার উপলমুখর কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে চলে; সারা পথ দেখতে দেখতে যায় স্বচ্ছতোয়া রজতশুভ্র জলধারার প্রবাহ। দূর থেকে অলকনন্দা ওদের উৎসাহ যোগায়, প্রেরণা দেয়। কিন্তু ক্ষণিক বিচ্যুতিতে যদি ঐ খাড়া খাদের দিকে যাত্রীর পদস্খলন হয়, তখন ঐ অলকনন্দা ভয়ঙ্করী মৃত্যুর মত করাল গ্রাসে টেনে নেয় তাকে।

ফেনিল আবর্তে অবলুপ্ত হয়ে যায় তীর্থযাত্রীর শেষচিহ্ন।

আমাদেরও হয়েছে তাই। খেয়াল-খুশিতে পথ চলতে চলতে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি অলকনন্দার খাদের সম্মুখে। আমরা দুজনেই! জানি না, পদস্খলন কার আগে হবে।

সুনন্দার কথা ঠিক জানি না। নিজের কথাটা জানি। এতদিন আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম নন্দার প্রেমে। শশীকলার মতোই দিন দিন তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে চলছিল; কিন্তু তারপর যেমন হয়। মন যখন পূর্ণিমায় কানায় কানায় ভরে গেল তখনই দেখলাম—মনের অনেকটাই ফাঁকা। আর তারপর— 'হোয়েন ইট ডাজ নট ইনক্রিজ, ইট ডিক্রিজেস!'

এটা বোধহয় পুরুষের ধর্ম। যা পাওয়া গেছে তার ওপর আর মোহ থাকে না—যা পাওয়া গেল না, মনটা তাকে নিয়েই মেতে ওঠে! রবিঠাকুরের কী একটা লাইন আছে না? 'যাহা পাই না তাহা চাই না'—না ঐ-জাতীয় কিছু?

আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই, পর্ণা আমার মনে আবর্ত তুলেছিল। হয়তো তার জন্য কিছুটা দায়ী আমার স্বাভাবিক পুরুষের ধর্ম, কিছু হয়তো তার বিচিত্র মোহবিস্তারের কায়দা— হয়তো বা কিছুটা সুনন্দার সাম্প্রতিক ব্যবহার।

ভেবেছিলুম, মনের এ পরিবর্তনটুকু গোপন করে যাব। বস্তুত আমার চেতন মনের কাছে প্রথমাবস্থায় অবচেতন মনও এটা গোপন রাখতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তো চিরকালই কোনো কিছু থাকে না। আর এ এমন একটি জিনিস যা চিরকাল লুকিয়েও রাখা যায় না। হার্বার্ট ঠিকই বলেছেন—'এ ল্যভ অ্যান্ড এ কাফ্ ক্যানট বি হিড।' প্রেম আর সর্দি-কাশি লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। সুনন্দা কিছুটা আন্দাজ করেছে এতদিনে।

যেদিন বুঝলুম—সুনন্দা আন্দাজ করেছে, সেদিন থেকে আরও যেন বেপরোয়া হয়ে পড়েছি। সেই বেলেঘাটার মোড়ে মধ্যরাত্রে শোনা 'ডনের' উদ্ধৃতিটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না!

কিন্তু আপাতত আমার মনের কথা থাক। তার চেয়ে বড় বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে বাস্তবে। যার জন্য ছুটে আসতে হয়েছে এই বর্ধমানে।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছি, আমাদের কারখানা থেকে গোপনতম খবর কেমন করে জানি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এতদিন পর্ণা ও-তরফের গোপন খবর সরবরাহ করত আমাকে। সেটা বন্ধ হয়ে

গিয়েছে অনেকদিন। পর্ণা বলে, তার সেই পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের পর থেকেই। যেমন করেই হোক, ও-পক্ষ সে খবরটা পেয়ে গিয়েছিল—এবং তারপর থেকেই শ্রমিক নেতা ব্যানার্জি আর পাত্তা দেয় না পর্ণাকে। এখন আবার গোপন খবরের উজান বইতে শুরু করেছে। কে আছে এর মূলে? পর্ণাকে সন্দেহ করতে মন সরে না। সে এখন পুরোপুরি আমার এক্তিয়ারে। সে আমাকে ভালবাসে। গৌতমের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে আরও ঘনিয়ে এসেছে আমার কক্ষপুটে। কুমারী মেয়ে যখন কাউকে ভালবাসে তখন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। যতদিন না আমার কাছ থেকে প্রতিহত হচ্ছে ততদিন সে এ কাজ করবে না।

তাহলে কে?

অনেক চিন্তা করে শেষ সিদ্ধান্তে এলাম অবশেষে। আমি ছাড়া এ সব গোপন খবর আর আর একটি মাত্র প্রাণী জানতেন। তিনি শম্ভুচরণবাবু। বাবার আমলের লোক। তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম। তাঁকে সন্দেহ করাও অত্যন্ত কঠিন। তবু তাই করতে হল। জানতে পারলাম, আমাদের এমন কয়েকটি গোপন খবর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে যা আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। পর্ণাও নয়! শম্ভুবাবু নিজেই সে সব চিঠি টাইপ করেছেন—স্টেনোর মাধ্যমে ছাপা হয়নি সেগুলো। চিঠিগুলি যে কনফিডেনশিয়াল ফাইলে থাকে তার চাবি অবশ্য মাঝে মাঝে পর্ণাকে দিতে হয়েছে— কিন্তু সে ফাইল পর্ণা পড়ে দেখেনি নিশ্চয়।

অগত্যা চরম অপ্রিয় কাজটা করতে হল শেষ পর্যন্ত। বরখাস্ত করলাম শম্ভুবাবুকে। ভদ্রলোক বোকার মতো তাকিয়ে থাকলেন অর্ডারখানা হাতে করে। আমাকে তিনি 'খোকা' বলে ডাকতেন বাবার আমলে। এখনও অবশ্য 'স্যার' বলেন না—মুখার্জি-সাহেব বলেন।

বিহুলের মতো বললেন—এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?

গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম—দেখুন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। এটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধান্তের মত, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বোম্বাইয়ের ডীলটা আপনাতে-আমাতে হয়েছে। লং-হ্যান্ড-এ সমস্ত করেসপন্ডেন্স আমি লিখেছি, টাইপ করেছেন আপনি। তৃতীয় কোনো লোকের এ খবর জানার কথা নয়। সুতরাং এ খবর লিক হলে দায়ী হবেন হয় আপনি, নয় আমি। যেহেতু আমি মালিক এবং ক্ষতিটা আমার, তাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকে না! কিন্তু আপনি? বায়রনের ভাষায় 'দেয়ার ইজ নো ট্রেটর লাইক হিম্ হুজ ডোমেস্টিক ট্রিসন্ প্ল্যান্টস্ দ্য পনিয়ার্ড উইদিন দ্য ব্রেস্ট দ্যাট ট্রাস্টেড টু হিজ ট্রুথ।' বুঝলেন?

শম্ভুবাবু জবাব দিতে পারেননি। জবাব ছিল না যে। তখন নিজে থেকেই বললাম—আপনি কোম্পানির যে ক্ষতি করেছেন তাতে আপনার প্রতি কোনো করুণা দেখানোর কথা নয়। তবু আপনার পাস্ট সার্ভিসের কথা মনে করে আপনাকে এক মাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে আপনি আর আসবেন না অফিসে। য়ু আর ডিস্‌মিসড্।

ভেবেছিলাম নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে অফিসটাকে। শম্ভুবাবুর মত কর্মদক্ষ বিশ্বাসী লোক জোগাড় করা কঠিন—তবু ডান হাতেও যখন গ্যাংগ্রিন হয়, মানুষ তাও তো কেটে ফেলে।

ছোটাছুটি বেড়ে গেল। মাথার ওপর খড়্গ ঝুলছে। শত্রুপক্ষের হাতে ট্রাম্পকার্ডখানা চলে গেছে। নিশ্চয়ই এখনও তা সরকারি মহলে পৌঁছায়নি। না হলে এনফোর্সমেন্ট পুলিস এতক্ষণে হানা দিত আমার অফিসে। নিশ্চয়ই ও পক্ষ একবার ব্ল্যাকমেইলিং করবার চেষ্টা করে দেখবে খবরটা পেশ করার আগে। তাই তার আগেই ছুটে এসেছি বর্ধমানে। বড়কর্তাদের কাছে আগেভাগে সাফাই গেয়ে রাখলে যদি কিছু হয়। শুনলাম, সরকারি বড়কর্তা বর্ধমানে এসেছেন ইন্সপেকশনে, উঠেছেন সার্কিট হাউসে। তাই আমিও ছুটে এলুম এতদূর।

কিন্তু সে চেষ্টাও সুবিধের হল না। বড়কর্তার সময়ই হল না।

বর্ধমানের উত্তরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বিস্তৃত জমি নাইন্টিনাইন ইয়ার্স লিজ নিয়েছি আজ বছরচারেক। ইচ্ছা ছিল এখানে নতুন একটি কারখানা গড়ে তুলব। ফরেন এক্সচেঞ্জ জোগাড় করতে পারিনি—নানান তালে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে সে পরিকল্পনা। শুধু জমিতে প্রবেশ করবার মুখে এই ছোট্ট বাংলো বাড়িটি বানিয়েছি। বর্ধমানে এলে আমি এখানেই উঠি। এবারও তাই উঠেছি।

কাল বিকেলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সারাদিন খাটাখাটনিতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছি। গাড়িতে ক্লান্তিনাশক ঔষধাদি আমার বরাবরই থাকে। ড্রাইভার যোগীন্দর সিং সেগুলো নামিয়ে দিয়ে গেল। জুত করে বসেছি, এমন সময় এখানকার দারোয়ান এসে খবর দিল, কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রথমটা অবাক হলুম। এখানে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে? যাই হোক তাদের ডেকে পাঠালুম।

তিনজন লোক এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক বলা ঠিক হবে না। অথচ ঠিক ছোটলোকও নয়। ময়লা জামা-কাপড় পরা, অথচ পায়ে জুতো অথবা চটি। কে এরা? বসতে বলব কি না স্থির করবার আগেই দেখি ওরা দিব্যি জাঁকিয়ে বসল।

—কী চাই? জানতে চাইলাম আমি।

মুখপাত্র হিসাবে যে ছোকরা কথা বলল তার বয়স অল্প। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। পরনে পায়জামা, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবি, চুলগুলো অবিন্যস্ত, মুখে বসন্তের দাগ। বললে—আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা ছিল।

বলি, এর চেয়ে নির্জন স্থান আমার জানা নেই, কিন্তু কে আপনারা?

ছোকরা পরিচয় দিল। নিজের নয়, পার্শ্ববর্তী লোকটির। তাকিয়ে দেখলাম তার দিকে। বছর পঞ্চাশ বয়স, চিবুকে ছোট্ট নূর, চোখে গগল্স এই ঘরের ভেতরেও। শুনলাম তাঁর নাম আবদুল গণি। তিনি নাকি বার্নপুর অঞ্চলের নামকরা শ্রমিক নেতা।

ভদ্রলোক হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলেন—আপনার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি, কিন্তু আপনার নাম শুনেছি। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা যেতুম; কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন শুনে এখানেই এলুম।

বলি, সে প্রসঙ্গ তো হল—কিন্তু কেন এসেছেন সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেললেই ভাল হয় না?

ছোকরা বললে, আপনার যেন একটু তাড়াতাড়ি আছে মনে হচ্ছে স্যার?

বলি, তা আছে। আপনাদের যা বক্তব্য তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই আমি খুশি হব।

মিস্টার গণি বলেন, খুব সংক্ষেপেই সেরে ফেলি তাহলে। প্রথম কথা, আপনার কারখানার শ্রমিকদের কোনও য়ুনিয়ান নেই; কিন্তু তারা আমাদের শ্রমিক য়ুনিয়ানের সঙ্গে অ্যাফিলিয়েটেড হতে চায়—

আমি হেসে বলি, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না। আমাদের কারখানায় য়ুনিয়ান থাকলে তারা অন্য কোথাও অ্যাফিলিয়েশন চাইতে পারত—কিন্তু যার মাথা নেই সে কেন মাথাব্যথার ওষুধ খুঁজতে আসবে?

গণি বলেন, ওরা মাথাব্যথার ওষুধ খুঁজতে আমাদের কাছে আসেনি, মাথা খুঁজতেই এসেছে। ওদের ঘাড়ের ওপর যে মাথা আছে এটা আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতেই আমাদের সাহায্য চাইছে।

বাধা দিয়ে বলি, এ সব আলোচনা আমি আপনাদের সঙ্গে করতে চাই না। আমার কারখানায় য়ুনিয়ান নেই বটে, কিন্তু তাদের মুখপাত্রদের ডেলিগেশনের বক্তব্য আমি শুনেছি। তাদের আর কোনো বক্তব্য থাকলে তারাই জানাবে। আপনাদের কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

গণি একটু হেসে বলেন, মিস্টার মুখার্জি, তবু আমাদের বক্তব্যটা আপনাকে শুনতে হবে। তাতে আপনারই মঙ্গল।

বিরক্ত হয়ে বলি, প্লীজ মিস্টার গণি, আপনারা এবার উঠুন। আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহার আমি করতে চাই না, কিন্তু আমাকে বাধ্য করবেন না আপনারা। আমি এখন বিশ্রাম করতে চাই।

মিস্টার গণি বলেন, যে জন্যে আপনি বর্ধমানে ছুটে এসেছেন আমরা কিন্তু সেই বম্বে ডীলটার বিষয়েই আলোচনা করতে এসেছি!

আমার মুখে কথা ফোটেনি।

গণি দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, বলেন—কী বলেন? বিশ্রাম করবেন, না আলোচনা করবেন?

মনস্থির করে নিয়ে একটু বিস্ময়ের ভান করে বলি, কোন বম্বে ডীল? কিসের কথা বলছেন আপনি?

গণি আবার বসে পড়েছিলেন। আমার বিস্ময় প্রকাশের অভিব্যক্তিতে কৌতুক বোধ করে

বলেন—ও হো, আপনার মনেই পড়ছে না বুঝি? আই সী! তা হবে। হয়তো এ জাতীয় কারবার প্রতি সপ্তাহেই একটা-দুটো করছেন, তাই মনে পড়ছে না। আচ্ছা একটু রেফারেন্স দিলেই মনে পড়বে। আপনার কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নম্বর xiv/64 থেকে গত মাসের তেশরা 713/Con/xivL64 নম্বরে যে চিঠিখানা ইন্সিওর্ড ডাকে ইস্যু করা হয়েছে, সেইটির কথা বলছি আমি। যে চিঠির জন্যে আপনি আপনার বাপের আমলের কর্মচারী শম্ভু দত্তকে বরখাস্ত করেছেন। একটু একটু মনে পড়ছে এবার?

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। মুহূর্তে স্থির করি কী করব। অস্বীকারই করতে হবে। এরা হয়তো কিছুই জানে না, শুধু কোনো সূত্রে হয়তো নম্বরটা জানতে পেরেছে। গম্ভীর হয়ে বলি—মিস্টার গণি, আপনার সঙ্গে পাগলামো করার সময় আমার নেই। আপনারা যেতে পারেন।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ফোলিও ব্যাগ খুলে একখণ্ড কাগজ আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলেন—হস্তলিপি-বিশারদ যখন কোর্টে বলবেন এ-লেখা মিস্টার অলক মুখার্জির, তখন তাঁকেও কি পাগল বলবেন আপনি?

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমার লং-হ্যান্ড-এ লেখা চিঠিখানির ফটোস্টাট কপি! সর্বনাশ!

—ভুল এভাবেই হয় মুখার্জি-সাহেব! টাইপ হয়ে যাবার পর টাইপড় ডুপ্লিকেটখানা ফাইলে রেখে অরিজিনালখানা ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল আপনার। দেখুন দেখি কাণ্ড! কোনো কর্মচারীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েও জেলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আর উপায় রাখেননি!

মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—সরকার আপনাকে কন্ট্রোল্ড কমোডিটিজের পারমিট দিচ্ছে আপনার ফ্যাক্টরীর জন্যে। বম্বের কালোবাজারি মহাজনের কাছে তা বেচে দেবার জন্য নয় নিশ্চয়!

কী বলব ভেবে পাই না।

গণি ঘনিয়ে আসেন—দেখুন স্যার, ব্ল্যাকমেলিং করতে আমরা আসিনি। আপনার ফ্যাক্টরীর কোন লোক এ সব কথা আপনাকে বলতে এলে লজ্জায় আপনার মাথা কাটা যেত। তাই তাদের হয়ে আমরাই কথাবার্তা বলতে এসেছি। ওদের ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলো মেনে নিলে এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য হবে না।

আর ইতস্তত করে লাভ নেই। বলি—বেশ, কিন্তু এখানে তো সে সব কথা হতে পারে না। আপনারা কাল আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করুন। সেখানেই যা হয় স্থির করা যাবে।

—এটা শুভ প্রস্তাব। আশা করি কেমন করে এ চিঠি বেরিয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না আপনি।

একটু রুক্ষস্বরে বলি, এটা আপনার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার গণি?

—আচ্ছা, তবে ও প্রসঙ্গ থাক।

ওরা উঠে পড়ে। নমস্কার করে বিদায় নেয়। যাবার আগে বলে—কাল ক'টার সময় ফ্রি থাকবেন আপনি? এ সব কথা তো আবার সর্বসমক্ষে—

বাধা দিয়ে বলি—কাল সন্ধ্যা সাতটায়। অফিসেই।

—আচ্ছা, নমস্কার।

ওরা চলে যেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা কথা মনে হল আমার। ভুল করেছি আমি। শম্ভুবাবু নয়। অন্য কেউ। যার মাধ্যমে এ চিঠি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে সে এখনও আছে আমার কারখানায়। না হলে আবদুল গণি কেন ব্যস্ত হয়ে উঠবে ও বিষয়ে? কেমন করে এ খবর বেরিয়ে গিয়েছে তা নিয়ে আমি অনুসন্ধান চালালে ওর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ার কী আছে,—যদি অপরাধী হন শম্ভুচরণবাবুই?

শম্ভুচরণ দত্ত নয়,—সর্বনাশী মিস্ পর্ণা রয়!

সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেল। হাতঘড়িতে দেখলাম বিকেল পাঁচটা। আজ রাত্রেই এর ফয়শালা করতে হবে। তৎক্ষণাৎ যোগীন্দর সিংকে ডেকে পাঠালাম। নির্দেশ দিলাম কলকাতা চলে যেতে। পর্ণাকে নিয়ে আসতে বললাম। অফিসে একটা ট্রাঙ্ককল করে বলে দিলাম মিস্ রয়ের বাড়িতে খবর পাঠাতে। সে যেন তৈরি হয়ে থাকে। অত্যন্ত জরুরি দরকার। গাড়ি যাচ্ছে, সে যেন তাতে চলে আসে!

হিসাব করে দেখলাম রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসবে গাড়ি। কিন্তু আসবে তো পর্ণা? সে কি

আন্দাজ করেনি যে, আমি সব খবর পেয়ে গেছি? এ ভাবে তাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সে অনুমান করতে পারবে। সেই যদি অপরাধী হয় তাহলে সে নিশ্চয় জানে যে, আজ এখানে আমার কাছে আবদুল গণি আসবে প্রস্তাব নিয়ে। তারপরেই যদি আমি গাড়ি পাঠাই, তখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারবে আমার উদ্দেশ্য কী। কোনো একটা অছিলা করে সে সরে দাঁড়াবে। হয় তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে না, অথবা তার শরীর খারাপ হবে কিংবা—আচ্ছা পর্ণার হোম-অ্যাড্রেস যা কোম্পানির খাতায় দেওয়া আছে সেখানে সে থাকে তো? এজাতীয় মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বেশ বুঝতে পারছি মাত্রাতিরিক্ত পান করা হয়ে গেছে। এ বোধ ঠিকই আছে যে, আজ রাত্রে আমার পক্ষে মাতাল হওয়া মারাত্মক; মাথা ঠিক রাখা দরকার। কিন্তু কিছুতেই যেন নিজেকে সামলাতে পারি না। একটানা ঘড়ির টিকটিক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই বিশ্বচরাচরে। মাঝে মাঝে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে দ্রুতগামী মালবোঝাই লরী চলেছে। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছি। রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো যাবার সময় যখন বাঁক ঘুরছে তখন হেডলাইটের ক্ষণিক আলোয় মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে ঘরের ভেতরটা—খোলা জানলা দিয়ে আসছে ওদের আলোর আক্রোশ!

পর্ণার সঙ্গে বোঝাপড়ার আজকেই শেষ!

পর্ণা যদি অলক মুখার্জির চরম সর্বনাশ করে থাকে তাহলে পর্ণা রায়কেও আজ রাত্রে কেউ চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

ক্রমশ রাত বাড়ছে।

মাঝে একবার এখানকার বেয়ারাটা খবর নিতে এল নৈশ আহার দিয়ে যাবে কিনা। আমার কিন্তু খাবার চিন্তা মাথায় উঠেছে তখন।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গাড়ি ফিরে আসার আওয়াজ পেলুম।

উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারি না। বেরিয়ে আসি বাইরের বারান্দায়। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে।

যোগীন্দর সিং নেমে এল গাড়ি থেকে। আর কেউ আসেনি।

সেলাম করে একটি খাম এগিয়ে দিল সে।

ছোট্ট চিঠি। পর্ণা লিখেছে—মধ্যরাত্রে 'বসের' বাগানবাড়িতে যাবার কথা নেই তার চাকরির শর্তে। তাকে যেন আমি ক্ষমা করি। কাল সকালে সে আসছে। গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। সকাল নটার মধ্যে সে ট্রেনেই এসে পড়বে। আমি যেন তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করি।

আবার স্বীকার করতে হল অত্যন্ত ধূর্ত মেয়ে ঐ পর্ণা রায়!

আট

সমস্তটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। অলক আজকেও ফিরবে না নাকি? কিন্তু পর্ণাকে টেলিফোন করে ডেকে পাঠিয়েছে কেন? দুজনে কী করছে ওরা?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ক্রমে সন্ধ্যা। তারপর আবার ঘনিয়ে এল রাত। এ কী কাণ্ড, অলক কি আজকের রাতটাও বাইরে কাটাবে? সত্যিই বর্ধমানে গেছে তো? আর কে কে আছে সেখানে? হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে টেলিফোন। উঠে গিয়ে ধরলাম। হ্যাঁ, অলকই ফোন করছে। না, ট্রাঙ্ক লাইন নয়। অফিস থেকে।

—কে, সুনন্দা? হ্যাঁ, অলক বলছি। শোন, তুমি এখনই চলে এস এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফিসে! জরুরি দরকার। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি।

অবাক হয়ে বলে—কী বলছ যা তা? আমি অফিসে যাব কী? তুমি বাড়ি আসবে না? কোথা থেকে বলছ তুমি?

—অফিস থেকেই বলছি। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার। গাড়ি যাচ্ছে। রামলালও যাচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

আমি আর কিছু বলার আগেই ও লাইন কেটে দেয়। এর মানে কী? অন্য কেউ এ-ভাবে ফোনে ডাকলে মনে হত কোনো অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে হয়তো। কিন্তু ওই তো কথা বলল। তাহলে ওর কিছু

হয়নি। এমনভাবে আমাকে অফিস ডেকে নিয়ে যাবার মানে? আমি কি কখনও ওর অফিসে গিয়েছি, যে এভাবে মাঝরাতে আমাকে সেখানে ডেকে পাঠাচ্ছে?

গৌতমের ব্যাপারটা কি ও জানতে পেরেছে? কোন সূত্রে? নমিতা বা কুমুদবাবু কি বলেছেন? বেশ, তাই যদি হবে, তাহলে সে ব্যাপারে ফয়শালা করবার রঙ্গমঞ্চ তার অফিস নয়। বাড়িতে এসে সে কৈফিয়ত দাবি করতে পারত।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়ায় পোর্টিকোর সামনে।

কাপড়টা পাল্টে নেমে আসি। রামলালকে জিজ্ঞাসা করি—কী হয়েছে রামলাল? সাহেব আমাকে ডাকছেন কেন?

রামলাল প্রত্যাশিত জবাবই দেয়। সে তা জানবে কেমন করে? ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে পারি, বর্ধমান থেকে গাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যায়। তারপর থেকে কী যেন মিটিং হচ্ছে বন্ধ ঘরের ভেতর। কারখানার সামনে এসে পৌঁছাল গাড়ি। দারোয়ান আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানায়। রাইফেলধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে গেটে। কারখানার বাইরের দেওয়ালে ধর্মঘটি শ্রমিকদের হাতে-লেখা পোস্টার। সাদা কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টারগুলো দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল যেন। একেই কি বলে 'দেওয়ালের লিখন'? মনে পড়ে গেল কলেজের দেওয়ালে একদিন ঐ কথাই নিজে হাতে লিখেছিলাম আমি পোস্টারে। গৌতমরা রাতারাতি সেগুলি এঁটে দিয়ে এসেছিল কলেজের প্রাচীরে। সেই ভুলে যাওয়া বেয়াল্লিশ সালে। ঐ 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—'।

অলকের অফিসঘরে ইতিপূর্বে কখনও আসিনি। মস্ত বড় ঘর, মাঝখানে সেগুনকাঠের বিরাট পালিশ করা টেবিল। কাগজ-চাপা থেকে প্রত্যেকটি জিনিস ঝক্‌ঝক্ করছে ফ্লুরেসেন্ট আলোয়। সবই উজ্জ্বল—শুধু মাঝখানে বসে আছে অলক—যেন বাজে পোড়া বটগাছ! সারাদিন বোধহয় স্নান হয়নি, রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। টাইয়ের বাঁধনটা আলগা করা। এত হাওয়ার নীচেও লক্ষ করলাম ওর কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অলক আজ দাড়ি কামায়নি! পাশ থেকে দুজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন আমাকে। ঠিক মনে নেই, বোধহয় প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। অথবা হয়তো যন্ত্রচালিতের মতো হাত দুটো উঠে এসেছিল বুকের কাছে। ওঁরা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। পার্কার কলমটার উল্টো দিক দিয়ে অলক সম্মুখস্থ একটা চেয়ারে নির্দেশ করে। আমি বসি।

মুহূর্তের নীরবতা ভেঙে অলক বলে ওঠে—এ অসময়ে তোমাকে ডেকে আনার কারণটা জানতে নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে তোমার। অবাক হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, আমিও কম অবাক হইনি। তোমাকে আমি এখানে ডেকে আনিনি—এনেছেন এঁরা—

এতক্ষণে লক্ষ হয় ঘরে আরও দুজন লোক আছেন। একজন পুরুষ একজন মহিলা! ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বহুবচন নয়, মিস্টার মুখার্জি, একবচনে বলুন। আমি ওঁকে এখানে আনতে চাইনি। এনেছেন মিসেস্ ব্যানার্জি। আমি এর ভেতরে নেই। সুতরাং আপনার আপত্তি না থাকলে আমি বরং বাইরে অপেক্ষা করি।

আমি তাঁর দিকে ফিরতেই ভদ্রলোক আমাকে হাত তুলে নমস্কার করেন। অলকের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তিনি বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

গৌতম!

ঘরে ক্ষণিক স্তব্ধতা। আমার মনটা ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে আসছে। গৌতম এখানে কেন? কী বলছিল সে অলককে এতক্ষণ? আমার কথা? বেশ তো, তাহলে স্থানত্যাগ করে পালিয়ে যাবার কী আছে? অলক কি আমার কৈফিয়ত তলব করতে চায়? তাই যদি হবে তবে প্রধান সাক্ষীর তো বিচারালয়ে উপস্থিত থাকারই কথা। কিন্তু অলকের এ কী ব্যবহার! আমার বিরুদ্ধে তার যদি কোনো অভিযোগই থাকে তাহলে তা নিয়ে আলোচনা করার এই কি পরিবেশ, না সময়?

অলক একটা সিগারেট ধরায়। কাঠিটা অ্যাশট্রেতে রাখে। সেটাতে বোধহয় জল ছিল না। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে কাঠিটা। আগুনটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবু অ্যাশট্রের অন্ধ কোটরে কাঠিটা যে নিজেরই বারুদের আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে তা অনুভব করা যায়। দেশলাই কাঠিগুলো এত মূর্খ

কেন? কেন বোকার মত মাথায় তুলে রেখেছে একফোঁটা বারুদ? আর যদি রেখেই থাকে তাহলে তা আবার ঘষে জ্বালতে যাওয়া কেন? এখন নিজেই পুড়ে মরছে!

কী আবোলতাবোল ভাবছি?

হঠাৎ অলক বলতে শুরু করে—আজ সকালে আমরা একটা উড়ো চিঠি পেয়েছি। আমি ছিলুম না এখানে। ফিরে এসে এইমাত্র সে চিঠি পড়েছি। তাতে শ্রমিকপক্ষ থেকে আমাকে শাসানো হয়েছে যে, তাদের দাবি যদি মেনে না নিই তাহলে আমাদের কয়েকটি গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হবে। চিঠিটায় আমাদের কনফিডেন্সিয়াল ফাইলের লেটার নম্বর ও তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের ইন্‌কাম ট্যাক্স রিটার্নের গলতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই তথ্যগুলির প্রকাশ কোম্পানির পক্ষে মর্যাদাহানিকর এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে সন্দেহটা পড়ে আমার কন্‌ফিডেনশিয়াল স্টেনো মিস্‌ রায়ের ওপর, আই মিন মিসেস্‌ ব্যানার্জির ওপর;—বাই-দ্য-ওয়ে, তোমাকে এঁর সঙ্গে এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি আমার স্টেনো মিসেস্‌ পর্ণা ব্যানার্জি!

এবারও নমস্কার করতে ভুলে গেলাম আমি। ও হাত দুটো বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গি করল—আমার মনে হল, আসলে হাত দুটিতে যে বালা ও রিস্টওয়াচের বদলে শাঁখা ও নোয়া রয়েছে এইটেই সে হাতদুটি তুলে দেখাল। একতিলও বদলায়নি সে এ ছাড়া।

—যদিও মিস পর্ণা রায় নামে ইনি আমাদের অফিসে পরিচিত, কিন্তু আজ শ্রমিক নেতা শ্রীগৌতম ব্যানার্জি হঠাৎ দাবি করে বসেছেন এই শাঁখা-সিঁদুরহীন আমার স্টেনোটি তাঁর ধর্মপত্নী— আই মীন অধর্মপত্নী, কারণ এঁদের মতে ধর্ম জিনিসটা সমাজের পক্ষে আফিঙের নেশার মতো পরিত্যাজ্য। না কী বলেন মিসেস ব্যানার্জি?

পর্ণা সে কথায় কান দেয় না। আমার দিকে ফিরে সবিনয়ে বলতে থাকে—মাফ করবেন মিসেস্‌ মুখার্জি—রাত করে আপনাকে কষ্ট দিতে হল! অলকের ধারণা ও-পক্ষকে আমিই গোপন সংবাদগুলি দিয়েছি। তাই আজ ও হঠাৎ আমায় কৈফিয়ত তলব করে। আমি জানি, আমার উত্তরের মর্মোদ্ধার করতে পারবেনা ও;—আমার ধারণা বরাবরই আমাকে তুমি ভুল বুঝে এসেছ অলক।

ওর দিকে ফিরে এই শেষ কথাটা বলেই আবার আমার দিকে ফেরে—ও, আপনার স্বামীকে নাম ধরে ডাকছি বলে অবাক হচ্ছেন বুঝি...না, না, অধিকার-বহির্ভূত কিছু করছি না আমি। অলক আমাকে তুমি বলতে পারমিশান—আই শুড সে—বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে!

আবার আমাকে ছেড়ে ওকে আক্রমণ করে—নাকি মিসেস্‌ মুখার্জির সামনে আবার তোমাকে 'আপনি-আজ্ঞে' করতে হবে? অফিসে সবার সামনে যেমন করি?

অলক গর্জে ওঠে—কী সব আবোলতাবোল বকছেন আপনি!

—ও 'আপনি'! বুঝেছি, বুঝেছি, এইটুকু ইঙ্গিত বুঝবার মত বুদ্ধি আছে আমার! বেশ, আমিও না হয় 'আপনিই' বলব সুনন্দা দেবীর সামনে! হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বুঝলেন মিসেস মুখার্জি, ছাত্রীজীবন থেকেই আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। সে যুগে ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন, এ যুগে অর্থনৈতিক। সে যুগে অনেকে এসে যোগ দিয়েছিল আমার সঙ্গে, তারা বেশ গরম গরম বক্তৃতা দিত। আজকাল তারা সুযোগ পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে—শুধু তাই নয়, 'অন্যায় যে সহে'-র দল ত্যাগ করে 'অন্যায় যে করে'-র দলে নাম লিখিয়েছে। তাতে অবশ্য আমার দুঃখ নেই। আমি একই পথে চলেছি। আপনার স্বামীর অধীনে চাকরি করার দীনতা আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে পার্টির নির্দেশে। এ তথ্যগুলি ও পক্ষকে আমিই সরবরাহ করেছি; কারণ...

অলক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে—'ইউ ট্রেচারাস্‌ ওয়েঞ্চ!'

পর্ণা নির্বিকারভাবে বলে—শেক্সপীয়র!

এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হয় আমার, অবাক হয়ে বলি—মানে?

পর্ণা আমার দিকে ফিরে হাসি গোপন করে বলে—কী আশ্চর্য! আপনি এ খেলা জানেন না? একে বলে 'কোটেশান-খেলা'। এই খেলার মাধ্যমেই আমরা হাতে-হাত মিলিয়েছি যে! অলক একটা উদ্ধৃতি দেয়—আই মীন, অলকবাবু একটা উদ্ধৃতি দেন—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলে দিতে হয় কোথা থেকে কোটেশান দেওয়া হল। ঠিক ঠিক বলতে পারলেই হাতে হাতে পুরস্কার পাই। অবশ্য কী জাতীয় পুরস্কার তা আর নাই বললাম, অলক লজ্জা পাবে তাহলে!

অলক ঘরময় পায়চারি করছিল। আমাদের কথোপকথন তার কানে যাচ্ছে বলে মনে হয় না। নিজের আসনে এসে বসে এতক্ষণে। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটাকে অ্যাশট্রের গায়ে ঘষে ঘষে থেঁতলে দেয়। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে—বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য আমরা আপনাকে মাসে মাসে মাইনে দিয়েছি? এই কি আপনার ধারণা?

—ঠিক তাই। ধারণা করা অন্যায় নয় নিশ্চয়ই। আমার আর কী কোয়ালিফিকেশন আছে বলুন? স্টেনো হিসাবে আমার যোগ্যতা যে কতখানি তা আর কেউ না জানুক আপনি-আমি তো জানি! লোকে স্টেনো রাখে চারটি কারণে। হয়, সত্যি ডিক্‌টেশান নিতে—তা আমি পারি না। নয়, অফিসের শোভাবর্ধন করতে,—আমার ক্ষেত্রে সেটাও ঠিক নয়, কারণ আমার ফটো দেখেই পছন্দ করেছেন আপনি। এতদিনে তোমার মনের ভাব অবশ্য অন্য রকম হয়েছে, কিন্তু ফটো দেখেই নিশ্চয় গলে যাওনি তুমি। তৃতীয়ত, স্ত্রীর উপরোধ। কিন্তু মিসেস মুখার্জি আমাকে চেনেনই না যে সুপারিশ করবেন। আর স্টেনো রাখার চতুর্থ কারণ হতে পারে তাকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করানো। যেহেতু প্রথম তিনটি কারণ আমার ক্ষেত্রে অচল, তাই আমার ধারণা হয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যই আমাকে মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয়।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল তো অলক, আমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে কেন? সে কি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ বলেই, নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে?

অলক চিৎকার করে ওঠে—শাট আপ! ইউ ইনফার্নাল ভাইপার!

একগাল হেসে পর্ণা বলে—প্যারাডাইস লস্ট! মিল্টন!

থরথর করে কাঁপতে থাকে অলক, ভূকম্পনে উদ্‌গীরণ-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো। অথবা স্বর্গচ্যুত 'বিয়েলজিব্যাব'-এর মতো।

পর্ণা একটু অপেক্ষা করে, আবার গম্ভীরভাবে বলতে থাকে—অলক, তোমার হাতে আছে অগাধ অর্থ, শ্রমিক-মালিকের যুদ্ধে তুমি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করছ তোমার ক্ষমতা। ফ্যাক্টরীতে লক-আউট ঘোষণা করে, ছাঁটাই করে, ধর্মঘটি কর্মীদের পাওনা না দিয়ে তুমি আর্থিক পীড়ন করে চলেছ—অন্যায়-যুদ্ধ চালাচ্ছ তোমার তরফ থেকে। সুতরাং এ-পক্ষ অন্যায়-যুদ্ধ করলে রাগ করছ কেন? আর তা ছাড়া জান তো, জীবনের দুটি ক্ষেত্রে 'অন্যায়' বলে কোনো শব্দের স্বীকৃতি নেই! এ বিষয়ে আমি চমৎকার একটা কোটেশান শুনেছিলাম ছাত্রীজীবনে। সেটা আজও ভুলিনি আমি—'দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়্যার!' বলতে পার কার কোটেশান?

অলক জবাব দেয় না।

পর্ণা আমার দিকে ফিরে বলে—আপনি জানেন?

জবাব দেবার ক্ষমতা তখন আমারও ছিল না।

—এটা 'ল্যভ' না 'ওয়্যার' ঠিক জানি না, সম্ভবত দুটোই। সুতরাং এখানে অন্যায়-যুদ্ধ করায় আমার বিবেকে কোনো দাগ পড়েনি।

আবার সংযম হারায় অলক, বলে—বিবেক! তোমার মতো রাস্তায়-পাওয়া নষ্ট মেয়ের বিবেক বলে আবার কিছু থাকে নাকি?

পর্ণা চমকে ওঠে! ঠিক এ ভাষায় গালাগালি শুনবার জন্য বোধকরি প্রস্তুত ছিল না সে। চাবুক সেই চালাচ্ছিল এতক্ষণ, ডাইনে-বাঁয়ে—কিন্তু শালীনতার সীমা অতিক্রম না করে, রুচির মাত্রা না ছাড়িয়ে। পর্ণার শ্বাপদ চোখ দুটি জ্বলে ওঠে।

অলক উত্তেজিতভাবে বলে—যাক, অনেক অর্থ তুমি নিয়েছ কোম্পানির, এখন বল—কত টাকা পেলে এই যুদ্ধ থেকে তুমি সরে দাঁড়াতে পার?

আমি তখন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছি। নীচে, কত নীচে নেমে গেছে ঐ মেয়েটা! একদিন একই ক্লাসে পড়তাম আমরা, বসতাম একই বেঞ্চিতে। আমার অন্তরাত্মা বলে উঠল—বল পর্ণা, এখানে অন্তত একবার বল—টাকা দিয়ে আদর্শকে কেনা যায় না!

হায়রে আমার দুরাশা। অম্লানবদনে পর্ণা বলল—পাঁচ হাজার টাকা।

পকেট থেকে চেকবই বার করে অলক।

—মাফ করবেন, মুখার্জি-সাহেব। চেক নেব না, বাউন্স করতে পারে। ক্যাশ টাকা চাই!

এতক্ষণে আত্মসংবরণ করেছি আমি! প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে বলি—টাকা পেলে আপনারা বুঝি সব পারেন?

পর্ণা হেসে বলল—আপনি বুঝি বায়রন পড়েননি? অলকের একটা ফেভারিট কোটেশান শোনেননি?—'রেডি মানি ইজ অ্যালাদীনস্ ল্যাম্প'?

ততক্ষণে আয়রন চেস্ট খুলে পাঁচ তাড়া নোট বার করে এনেছে অলক। পাঁচ বান্ডিল নোট টেবিলের ওপর রেখে বলে—এগুলো নেবার পরেও যে তুমি ব্ল্যাকমেলিং করবে না তার প্রমাণ কী?

—তাই কি পারি?

—পার, সব পার তুমি! তোমার মত চরিত্রহীন নষ্ট মেয়েমানুষ না পারে কী?

আমার ভীষণ কান্না পায়। ছি ছি ছি। মাত্র পাঁচটা হাজার টাকার শোকে অলক এমন অভিভূত হয়ে পড়ল? শালীনতাবোধ বলে কি কিছুই অবশিষ্ট নেই তার? কিন্তু এ টাকার শোকে নয়— অপমানের জ্বালায়। স্ত্রীর সামনে তার চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করায় ভদ্রতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে অলক!

পর্ণার চোখদুটি জ্বলে ওঠে। শ্বাপদ চক্ষু! কয়েক মিনিট চুপ করে কী ভাবে, বোধহয় সামলে নেয় নিজেকে। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসে ও। বলে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না অলক?

ও গর্জে ওঠে—বাড়াবাড়ি! তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক নষ্ট চরিত্রের মেয়ে—

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় পর্ণা। বলে—'বিশ্বাসঘাতকতা' তুমি কাকে বল অলক? বিশ্বাসঘাতক কে নয়? আমার সঙ্গে রাত বারোটায় 'ফল অফ বার্লিন' দেখে এসে যখন স্ত্রীর কাছে পোলিশ বন্ধুর গল্প বলেছিলে তখন ও শব্দটার মানে তুমি জানতে? শুধু তাই নয়—আবার হেসে হেসে সে গল্প যখন আমার কাছে ফলাও করে বলেছিলে তখনও কি মনে ছিল, আমি রাস্তায়-পাওয়া নষ্ট মেয়েমানুষ?

অলক জবাব দিতে পারে না। বাকরোধ হয়ে গিয়েছে যেন তার। পর্ণা হেসে বলে—ভয় নেই; ব্ল্যাকমেলিং আমি করতে পারব না। যতই কেন না নষ্ট চরিত্রহীন হই। তোমার মৃত্যুবাণ যেমন রইল আমার হাতে, তেমনি আমার মৃত্যুবাণও যে রয়ে গেল তোমার কাছে। নিজ নিজ স্বার্থে আমরা পরস্পরকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারব না। বাঙালি গৃহস্থঘরের বধূ আমি, বিখ্যাত শ্রমিক নেতার স্ত্রী বলে শ্রমিকমহলে সবাই আমাকে চেনে—তা ছাড়া তোমার-আমার অন্তরালের জীবনকথা যেমন সুনন্দা দেবী জানেন না, তেমনি গৌতমও তো জানে না। সব কথা কি মুখ ফুটে তাকেই বলতে পেরেছি ছাই? সুতরাং আমার যে চিঠিগুলি তোমার কাছে রয়ে গেল, সেল্ফ-এক্সপোজারে তোলা আমাদের সেই আলিঙ্গনবদ্ধ ফটো...আর তা ছাড়া হোটেলের রেজিস্টার খাতায় আমাদের সই—সেই যে হোটেলে আমরা দুজনে সারারাত...

—ইউ শাট্ আপ! মিথ্যা কথা! বানিয়ে বানিয়ে কী সব যা-তা বকছ তুমি?

পর্ণার ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে একটা অদ্ভুত টান। বলে—আর কোনো লাভ নেই অলক, মিসেস্ মুখার্জি সব কিছুই আন্দাজ করতে পারছেন। আর তা ছাড়া অতটা লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই তোমার। সুনন্দা দেবীও কিছু গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপত্রটি নন। না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। শাঁখা-সিঁদুর পরে বাসে-ট্রামে বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় যেতেন উনি! 'বিশ্বাসঘাতক' তো আমি একা নই—তুমি, আমি, সুনন্দা দেবী—আমরা সব্বাই।

অলক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে—গেট আউট!

পর্ণা বলে—থাক, দারোয়ান ডাকতে হবে না। যাচ্ছি। কিন্তু এখনও একটা কাজ যে বাকি আছে স্যার। আমাদের শ্রমিক য়ুনিয়ানের চাঁদার খাতায় একটা সই দিতে হবে আপনাকে!

টেবিলের ওপর চাঁদার খাতাখানা মেলে ধরে বলে—একশো টাকার নম্বরী নোট, বেহিসাবি এত টাকা আমার ব্যাগে থাকাটা ঠিক নয়।

—ড্যাম ইট! ঘসঘস করে সই করে দেয় অলক।

চার বান্ডিল নোট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় পর্ণা। পরিত্যক্ত নোটের বান্ডিলটার দিকে ঘৃণাকুঞ্চিত আঙুল তুলে অলক বলে—ওটা?

—ওটা আমার দুশ' টাকা হিসাবে পাঁচ মাসের মাইনে। ওটা তুলে রাখ!

কাঁপতে কাঁপতে অলক আবার গর্জে ওঠে—আই সে, টেক ইট!

যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল পর্ণা। এ কথায় ঘুরে দাঁড়ায়।

বলে—না! তোমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, তার মূল্য ঐ হাজার টাকাই! সে মূল্য আমি মিটিয়ে দিয়ে যাব!

তারপর আমার দিকে ফিরে বলে—আমরা সবাই তো বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু জেনে রাখুন মিসেস্ মুখার্জি, পার্টির নির্দেশে আমি এখানে যা কিছু করেছি তা আমার স্বামী জানেন—তাঁর কাছে কিছুই লুকোইনি আমি। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন!

ঠিকভাবে কিছুই আর চিন্তা করতে পারছি না।

ওর শেষ কথাগুলিই মনে পড়ছে কেবল!

ওর ঐ শেষ বিষ-উদ্‌গীরণটা কি একটা মিথ্যা কাহিনীর ওপর প্রতিষ্ঠিত? চিঠি-ফটো-হোটেল —সব—সবই কি অলীক কাহিনী?

আমার চরিত্রবান স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে পরাজয়ের জ্বালা ভুলবার জন্যেই কি এই অন্তিম দংশন করে গেল কালনাগিনী? অথবা আমিই ছিলাম তার লক্ষ্যস্থল? আমাকেই বিষজর্জরিত করে গেল সে এই কুহকী মায়ার ছলনায়?

কিংবা হয়তো, হয়তো কিছুই মিথ্যা বলেনি সে!

বিষকন্যার বিষে বুঝি নীল হয়ে গেল এ সোনার সংসার!

কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে সে কি সত্যিই পারবে গৌতমকে সব কথা খুলে বলতে? দারোগাবাবুর কাছে সারারাত স্বেচ্ছায় আটক ছিল যে মেয়েটি সে কি পারত, বিয়ে হলে, তার স্বামীকে সে রাত্রের সব কথা বলতে?

জানি, এ সব প্রশ্নের উত্তর কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না!

তা না যাক, তবু বলব আমার অঙ্কে শুধুই লোকসান জমা পড়েনি। এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল —ওর, আমার, আমাদের দুজনেরই। বৈচিত্র্য চেয়েছিলাম না আমি? তা সে বৈচিত্র্যও এসেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবনে, চরম সর্বনাশীর বেশে। তাতে আমরা দুজনেই বুঝতে শিখেছি, আমাদের দুর্বলতা কোথায়। বড় বেশি জাঁক হয়েছিল আমাদের। ঠিক কথা, এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল।

উঠে এলাম অলকের কাছে। ওর হাতটা তুলে নিয়ে বলি—চল, বাড়ি চল।

ও কী যেন ভাবছিল। চমকে উঠে বলে—অ্যাঁ?

বলি—এতটা বিচলিত হচ্ছ কেন? আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিনি। ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ওঠ, চল।

—কোথায়?

—কোথায় আবার কী? বাড়িতে। তোমার 'অলকনন্দা'য়।

অলক আমার মাথাটা টেনে নিয়ে বলে—তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

আমি হেসে বলি, অলক, বল দেখি—কে বলেছেন—'দে হু ফরগিভ্ মোস্ট শ্যাল বি মোস্ট ফরগিভন্'?

আমার হাত দুটি ধরে অলকও হেসে ফেলে।

বলে—বেইলি।

মনামী

উৎসর্গ

শ্রীসবিতা সান্যাল

সুচরিতাসু—

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর 1989

কৈফিয়ত

'মনামী' বইটি ষাটের দশকে লেখা। বস্তুত একই আঙ্গিকে সে-সময় পরপর দুটি বই লিখি, 'মনামী ও 'অলকনন্দা'। আত্মকথার ঢঙে। অর্থাৎ লেখক শ্রুতিধর মাত্র—চরিত্ররা নিজ-নিজ বক্তব্য বলে গেছে; লেখক 'ডিকটেশন' নিয়ে গেছেন শুধু। এই স্টাইলে বই লেখার বাসনা, দু'খানি গ্রন্থ রচনার পরেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় অন্য বিষয়, অন্য আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকি।

'ঘরে-বাইরে' পড়তে বসে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। নিখিলেশ, সন্দীপ আর বিমলা—তিনজনেই কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে আয়ত্ত করল তাদের সৃষ্টিকর্তার অননুকরণীয় রচনাশৈলী? মনে হয়েছিল, সৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষার হুবহু নকল করতে অশক্ত হত তাহলে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাথায় কোনটা কার 'আত্মকথা' সেটা জানানোর প্রয়োজন হত না। চোখে দেখার নাটক যেদিন থেকে কানে শোনার বেতারনাট্যের রূপ নিল, সেদিন থেকে আমরা শুধু বাচনভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর শুনেই বক্তাকে চিনে নিতে শিখেছি। ছাপা-উপন্যাসে কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত, হস্তাক্ষরও, কিন্তু বাচনভঙ্গি? ভাষার শৈলী? ম্যানারিজম? প্রত্যেকটি চরিত্র যদি নিজের নিজের ঢঙে কথা বলে তাহলেও আমরা চিনে নিতে পারব কোনটা কার 'আত্মকথা'! সেই পরীক্ষাটাই করতে চেয়েছিলাম এই দুটি বইতে—প্রথমে 'মনামী', পরে 'অলকনন্দা'য়।

এই যে বিশেষ রচনাশৈলী—অর্থাৎ লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাষায় কথা বলছেন—তার প্রথম প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'তে (প্রথম প্রকাশ : 1877)। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম রজনী-শচীন্দ্র-লবঙ্গলতা-অমরনাথের দলের কলকণ্ঠে বঙ্কিম নির্বাক হয়ে পড়েন। কাহিনি শুরু হবার আগে এবং 'টাইটেল-পেজ'-এর পরে সামান্য পরিসরে লেখকের 'মুখবন্ধ'। উভয় অর্থেই!

সেই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভালো লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এই উপন্যাসে যে-সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

'যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে'—একশ দশ-পনের বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা খেয়াল ছিল। 'ঘরে-বাইরে'র লেখকের কিন্তু সে-কথা খেয়াল ছিল না! বিমলা, সন্দীপ আর নিখিলেশের চিন্তাধারা, জীবনবোধ, আদর্শের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তারা আত্মকথা রচনা করেছে এক অনবদ্য, অননুকরণীয় ভাষায়—সে-ভাষার মালিক একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি সে-ভুল করেনি। অশিক্ষিতা রজনীর ভাষা সমাসবদ্ধ পদসমৃদ্ধ নয়, যেমন শচীন্দ্রনাথ রজনীর ভাষায় 'চোখের মাথা খেতে' পারে না। লবঙ্গলতা যে অলঙ্কারে অভ্যস্ত ('আগুনে-সেঁকা কলাপাতার মতো শুকাইয়া উঠিবে') অমরনাথ সে-ভাষার কথা বলতে পারে না। তুলনায় সন্দীপ, বিমলা, নিখিলেশ একে অপরের ভাষা হুবহু নকল করেছে।

একটা কথা। 'রজনী'র চেয়ে 'ইন্দিরা' বয়সে চার বছরের বড়। ইন্দিরাই প্রথম বিদ্রোহিণী, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বকল্‌মা' দিতে অস্বীকার করে! ইন্দিরা পঞ্চম আত্মজা। ইন্দিরার যে চারজন বড় বোন ছিল, তারা অনেক গুণের অধিকারিণী; কিন্তু এ দিক থেকে ইন্দিরা অনন্যা। 'ফুলমতী' ব্যতিরেকে বাংলা সাহিত্যে ইন্দিরাই বোধকরি প্রথমা। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' আর 'বিষবৃক্ষ'র নায়িকা

নিজেদের কথা নিজেরা বলবার সাহস পায়নি—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এজলাসে এসে সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে বলেছিল—"বকল্‌মা লিখিয়া দিলাম। ধর্মাধিকার! আপনিই আমাদের পিতৃস্থানীয়! আমাদের যাহা বক্তব্য আপনিই তাহার রচনা করুন!"

ইন্দিরা তা বলেনি। বলেছিল তার নিজের ভাষায়—'আপনি ব্যস্ত হইবেন না! না হয় আপনার মতো পণ্ডিতের ভাষা নাই হইল—আমার কথা আমি নিজেই বলিতে পারিব।'

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ 1872) 'ইন্দিরা' প্রথম প্রকাশিত। বঙ্কিম-কথিত উইল্‌কি কলিন্স-এর 'The Woman in White' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 1860 খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ইংরাজতনয়া ঐ 'শ্বেতাম্বরা' বঙ্কিমাত্মজা 'ইন্দিরা' অপেক্ষা দ্বাদশবর্ষের বয়োজ্যেষ্ঠা! 'ফুলমণি' আরও ত্রিশ বছরের প্রাচীনা।

তারপর শতবর্ষ অতীত। নারীমুক্তি, উইমেন্স-লিব ইত্যাদি কতো নতুন-নতুন কথা শুনতে পাই। কিন্তু ফুলমণি-ইন্দিরা বা রজনীর মতো বাংলা সাহিত্যের কোনো নায়িকাকে তো আজ আর দেখতে পাই না ওভাবে সাহস করে এগিয়ে আসতে, কথাসাহিত্যিককে ধমক দিয়ে বলতে : "আপনি থামুন! আমার কথা আমিই বলতে পারব!"

নারায়ণ সান্যাল

১০/৬/৮৯

তোমরা তো অনেক লেখাপড়া শিখেছ, অনেক বই পড়েছ। আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে? একটা মানুষের মধ্যে কি দুটো মন থাকতে পারে? একই মানুষ দু-রকম হতে পারে? কেমন জান? কখনও মনে হবে সে যেন তোমার কত আপনার, আদরে সোহাগে সে তখন পাগল করে দেবে তোমাকে। মনে হবে তোমা-বই সে আর কিছু জানেই না। এই বিশ্বাস নিয়ে যেই তুমি খুশিয়াল হতে শুরু করেছ—অমনি লক্ষ্য করলে তার হাবভাব সব বদলে গেল। সে অন্য দিকে চেয়ে আছে—সে যেন আমাকে চেনেই না। তোমার ডাকে আর সে সাড়া দেবে না তখন। এমন কি তোমার মনে হবে হয়তো সে তোমাকে ঘৃণা করে; তোমাকে পাছে ছুঁতে হয় তাই সে তোমাকে এড়িয়ে চলে!

এরকম ঘটনা তোমাদের জীবনেও হয়? হলে, তোমরা কী কর? কী করে ফিরিয়ে আনো সেই হঠাৎ-বদলে-যাওয়া মানুষটির ভালোবাসা? আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে। শুধু কৌতূহল নয়, তোমরা আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েরা এ অবস্থায় পড়লে কী কর জানতে পারলেও একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

আমি ভাই লেখাপড়া শিখিনি। ইংরাজি অক্ষরই চেনা হয়ে ওঠেনি। বাংলা অবশ্য পড়তে পারি—যদি ওঁর মত পণ্ডিতি-ভাষার কটমট বাংলা না হয়। জানি, তোমরা বলবে—এখানেই গোল বেধেছে। সুবিমলও তাই বলে। কারও সে কথা বলার দরকার নেই গো। আমি নিজেই তা জানি। উনি অধ্যাপক, কলেজে পড়ান। কী পড়ান? তা জানি না ভাই, জিনিসটা আমি আজও বুঝিনি। ঘোড়ার ডাক্তারে পশুপাখির চিকিৎসা করে;—ওঁকে তা কখনও করতে দেখিনি। আমার মেনি বেড়ালটা একদিন সারা বাড়ি বমি করে বেড়াচ্ছিল; ওঁকে বল্লাম একটু ওষুধ দিতে। তাতে বল্লেন—"আমি কি ঘোড়ার ডাক্তার?"

তাতেই জানলাম, পশুপাখিকে বাঁচাবার বিদ্যেটা উনি শেখেননি। শুধু মারতে শিখেছেন। ব্যাঙ, খরগোশ, গিনিপিগ কেটেকুটে বাহাদুরি দেখাতে জানেন। এ বিদ্যায় কার যে কী লাভ হয় তা জানি না। কোনওদিন জানবার চেষ্টাও করিনি।

জানি, তোমরা বলবে এজন্যেই ওঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। উনি অধ্যাপক, পণ্ডিত মানুষ। আমি লেখাপড়া না-জানা গাঁয়ের মেয়ে। আমাদের যে মিল হবে না এটাই তো স্বাভাবিক। শুধু তাও নয়। আমার আরও অনেকগুলি গুণ আছে! নিজেই স্বীকার করছি। আমি কালো। সুন্দরী মোটেই নই। অতি সাধারণ গাঁয়ের মেয়ে। এখন আমার উনত্রিশ চলছে। কাজেই বুঝতে পারো, ওঁকে বেঁধে রাখার কোনো সম্বলই নেই আমার হাতে। কিন্তু একটা কথা তোমরা আমায় বুঝিয়ে দেবে? উনি তো সবই জানতেন। বিয়ের আগেই তিনি আমাকে দেখেছিলেন, আমার সব কথাই শুনেছিলেন, তাহলে সব জেনেশুনেও পাড়াগাঁর এই লেখাপড়া না-জানা সাধারণ মেয়েটিকে কেন বিয়ে করলেন তিনি? উনি সুপুরুষ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। অনায়াসে লেখাপড়া-জানা সুন্দরী একটি মেয়েকে ঘরে আনতে পারতেন। কে বলেছিল তাঁকে বাহাদুরি দেখাতে? আমি তো এ সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন!

আচ্ছা খুলেই বলি সব কথা গোড়া থেকে।

আমার বাবা ছিলেন গ্রামের পুরোহিত। এমন শান্ত সরল মানুষ হয় না। ছেলেবেলাতেই মা মারা যান। ছোট ভাইবোনগুলিকে মানুষ করতে করতে, আর বাবার সংসারে হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে কখন যে বড় হয়ে উঠলাম তা নিজেও জানতে পারিনি। সংসারের কোনকিছুই বাবার নজরে পড়তো না। কোথা দিয়ে কী করে আমি সংসারটা চালিয়ে নিতাম তার খবরও তিনি রাখতেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হল যে, আমার বয়স হয়ে গেছে। বিয়ে দেওয়া দরকার। বাবার অবশ্য নিজে থেকে খেয়াল হয়নি। সেরকম মানুষই নন তিনি। পূজা-আর্চা আর বাসুদেবের সেবা নিয়েই তাঁর জীবন কেটে

যেত। বোধহয় ভবেশকাকাই এদিকে তাঁর নজর টেনে এনেছিলেন। ভবেশকাকা অবশ্য আমার নিজের কাকা নন; ওঁর স্ত্রী ছিলেন বাবার শিষ্যা। মায়া খুড়িমা মারা যাবার পর ভবেশকাকার মেয়ে মনু বাবার কাছে মানুষ হচ্ছিল। তার জন্যে মাঝে মাঝে কাকা আসতেন। তিনিই বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমার দিকে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল বাবার আপ্রাণ চেষ্টা—আমাকে পাত্রস্থ করতে হবে। জীবনের সতেরোটা বছর যে কথাটা জানতে পারিনি হঠাৎ সেটা আবিষ্কার করলাম। অর্থাৎ আমি সুন্দরী নই। বাবা মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের নিয়ে আসতেন; সারাদিন আমি নিজের হাতে মিষ্টি গড়তাম। তারপর সন্ধেবেলা নিজে হাতেই সাজগোজ করে তাঁদের সমুখে গিয়ে বসতাম দুরুদুরু বুকে। যে কথাটা জেনেছিলাম অনেক চোখের জলে—সেটাই আর একবার শুনতে হত—আমি নাকি কালো, আমি সুন্দরী নই। যেন কথাটা এমনই দামী যে, ওটা আর একবার শুনবার জন্যে সারাদিন উনুনধারে বসে গোকুলপিঠে বানাবার দরকার ছিল আমার!

তিন-চার বছর কেটে গেল এই ভাবেই। বাবার বয়স বেড়ে গেল এই কয় বছরে। হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেলেন। চুলগুলো সব হুহু করে পেকে গেল। পূজা-আর্চাতেও যেন মন দিতে পারেন না ঠিকমত। পাগলের মতো ছোটাছুটি করেন। সম্ভব-অসম্ভব বাছবিচার নেই। পাত্রের সন্ধান পেলেই তাঁদের ধরে আনতেন। আমাকে দাঁড়াতে হত তাঁদের সামনে সেই কঠিন পরীক্ষায়।

আমার বয়স যখন একুশ তখন বাবা কোথা থেকে সন্ধান পেলেন শহরের উকিলবাবু তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন। দুটো পাশ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। দুশো টাকা মাইনে পায়! মনু বুঝি উকিলবাবুর ছেলেকে দেখেছিল শহরে থাকতে। সে এমন বর্ণনা দিল যে, বাবা মনে করলেন এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে বলেই এতদিন সব সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। আমার কোষ্ঠি দেখে যে তিনি নিজেই বিচার করে বসে আছেন, আমার শিবের মতো স্বামী হবে! মনু আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। তবু এমনি পাকা মেয়ে—আমার কানে কানে এসে বলে—তবে এ বিয়ে হবে না রাধাদি। পীতাম্বর উকিলের ছেলেকে আমি দেখেছি। ও কখনও শিব নয়—শিবের ব্যাটা কার্তিক!

আমি বলি—হতভাগী, এতই বকে গেছিস তুই!

বাবা আমার মানা শুনলেন না। ওখানেই কথা তুললেন। জানি, তোমরা হাসছ, বাবার পাগলামির কথা শুনে। এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত! কিন্তু আমার বাবাকে সে সময়ে দেখলে আর হাসতে পারতে না, করুণা হত।

উকিলবাবু নেহাতই শহুরে মানুষ। গাঁয়ে এসে মেয়ে দেখতে রাজি হলেন না। বাবাও একেবারে নাছোড়বান্দা। ওঁর এক যজমানের ভাইপো বুঝি শহরের কলেজে নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন। তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আমাকে এনে হাজির করলেন তাঁর বাসায়।

সেদিনকার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। না থাকার কারণ নেই। ঐ দিনটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল যে। অধ্যাপকমশাই শুনে ভেবেছিলাম—ইয়া রাশভারী লোক হবেন বুঝি। ওমা, এ যে নেহাত অল্পবয়সি। বিয়ে-থা করেননি—একা থাকেন। আমাদের আদর করে আশ্রয় দিলেন। তাঁর জ্যেঠামশাইয়ের চিঠিখানা পড়ে বল্লেন—"বেশ তো। আপনারা আমার এখানেই উঠুন। আমার বাড়িতে অবশ্য স্ত্রীলোক কেউ নেই। আপনার মেয়েকেই বলুন এ ক'দিনের জন্যে সব দেখেশুনে নিতে।"

বলে, আমার দিকে ফিরে বলেন,—"কোনো লজ্জা কর না। সংসারে কী আছে না আছে নিজে দেখেশুনে নাও। যা দরকার হয় আনিয়ে নেবে।"

তখনই চাকরকে ডেকে তার হাতে একটা নোট দিয়ে বলেন, "দিদিমণি যা যা চাইবে এনে দিবি।"

আমি কিছু বলিনি। মাটির দিকে চেয়েই বুঝতে পারি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। বাবার দুঃসাহস দেখে মনে মনে তিনি হাসলেন নিশ্চয়।

সেদিনটা ছিল রবিবার। ওঁর কলেজ ছিল না।

চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করে কী কী বাজার আনতে হবে। আমি তখন স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলাম। রান্নাঘরে এসে দেখি মশলাপাতি সবই বাড়ন্ত। আলু-পটল আছে—আর আছে একফালি কুমড়ো একটা বেতের টুকরিতে। বললাম, যা হোক নিয়ে এস।

হঠাৎ দেখি অধ্যাপকমশাই বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে বললেন,—"আচ্ছা, চলরে নটবর, আমিও যাই তোর সঙ্গে।" আমার দিকে ফিরে বললেন—"এ কদিন তোমার হাতে কিছু ভালোমন্দ খেয়ে নেওয়া যাক্। আমার নটবরটি একেবারে কলির দ্রৌপদী। তবু মুখটা বদলানো যাবে আজকে, আর তাছাড়া....."

বলেই ইংরেজিতে কী যেন ফোড়ন কাটলেন। লজ্জায় বাঁচি না। বলেই হেসে উঠলেন। আমি হাসব না চুপ করে থাকব বুঝতে পারি না। এক লাইন মাত্র কথা? কী হতে পারে? মুখটা নিচু করেই থাকি। আমি যে বুঝতে পারিনি সেটা গোপন করি। ওঁরা দুজনে বেরিয়ে যান বাজারে। বাবা তো সেই সাত-সকালে এসেই বেরিয়ে গেছেন উকিলবাবুর বাসায়। ও-বেলায় ওঁরা আমাকে দেখতে আসবেন।

তেল মেখে স্নান করতে এসে দেখি—ও হরি, স্নানঘর বলে কিছু নেই। আমাদের গাঁয়ের বাড়িতেও অবশ্য স্নানের ঘর নেই, কিন্তু সেখানে ওটা দরকার হয় না। খিড়কি পুকুরের ঘাটে নিরিবিলিতে গা খুলে স্নান করতে কোনো সঙ্কোচ হয় না। বেনেবউ পাখি দুটো আর কাঠবেড়ালি ছাড়া কোনো দিন কোনও জনমনিষ্যির সাড়া পাইনি কখনও। এখানে উঠোনের মাঝখানে একটা টিউকল; দুপাশে দোতলা- তিনতলা বাড়ি। সব জানলাই খোলা। কে কখন জানলায় এসে দাঁড়াবে কে বলতে পারে? মাগো! এখানে কি স্নান করা যায়! আগে খেয়াল হলে স্নানের নামও করতাম না। কিন্তু তেল মেখে ফেলেছি। কী করি?

লক্ষ্য করলাম রান্নাঘরে নালি আছে। সেই ভালো। দু-বালতি জল টেনে এনে রান্নাঘরেই স্নান সেরে নিলাম। ভালোই হল। রাজ্যের এল্লোৎ জমা হয়েছিল, ধোয়া হয়ে গেল ঐ জলে।

স্নান সেরে উঠে আবার নতুন বিপদ; বড় চিরুনি আনিনি। অধ্যাপকমশায়ের ছোট নতুন চিরুনিতে কি আমার চুল আঁচড়ানো যায়! এই সময় চুপিচুপি একটা কথা বলে রাখি ভাই—ঐ একটা জিনিসই আমার ছিল গর্ব করার মতো। পোড়া মুখেই বলতে হচ্ছে। কী করব? এ কথাটা যিনি আগে প্রায়ই বলতেন, আজকাল তাঁর সেটা নজরেই পড়ে না।

যাক্ যা বলছিলাম। চুল ভালো করে আঁচড়ানো গেলো না। উনি ফিরে এলেন বাজার করে। বড় বড় গল্দা চিংড়ি এনেছেন আর মাংস।

অনেকদিন ভালোমন্দ পদ রাঁধিনি। ভালো করেই রাঁধবার চেষ্টা করলাম। ভারী দুঃখিত হচ্ছিল বাবার জন্যে। তাঁর খাওয়া হল না। তিনি ফলার করলেন। তরকারির থলি থেকে যখন পেঁয়াজ বের হল তখনই জানি, বাবা একটা ছুতানাতা করে উপোস করবেন। নির্ঘাত পাঁজিতে একটা কিছু উপোসের তিথি বের হবে। অধ্যাপকমশাই কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এমন রান্না নাকি উনি কখনও খাননি! বাবাকে বললেন—"আপনি তো খেয়ে দেখতে পেলেন না।"

বাবা হেসে বললেন—"আমি ওর রান্না রোজই খাই। ভালো হয়েছে?"

উনি বলেন, "গ্র্যান্ড !"

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। ভারি ভালো লাগলো।

দুপুরবেলায় একটু শুয়েছি কি না শুয়েছি বাবা তাগাদা শুরু করলেন, "রাধা ওঠ, গা ধুয়ে নে।"

বেলা তখন তিনটে। হাসিও পায়, কান্না পায়।

বাবা আর উনি বসেছিলেন পাশের ঘরে। ওঁদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল এ ঘর থেকে। অধ্যাপক-মশাই ইতস্তত করে বাবাকে বললেন, 'আপনার মেয়ের জন্যে শাড়ি, ব্লাউজ, আর ইয়ে, প্রসাধনের জিনিস সব এনেছেন তো?'

বাবা বলেন—"এনেছ বোধহয়।"

"—বোধহয়—না না আপনি ওঁর কাছে গিয়ে জেনে আসুন।"

এ যে মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি দেখি! যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই। বাবা ও-ঘর থেকেই ডাকাডাকি শুরু করেন। কী করি, মাথা নিচু করে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"—ইনি বলছেন, তোর শাড়ি-জামা, পাউডার-মাউডার সব এনেছিস তো।"

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই। চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করে বলি—"হ্যাঁ"।

অধ্যাপকমশাইও বোধহয় বিব্রত বোধ করেন। কৈফয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলেন—"মানে আমার বাড়িতে তো দ্বিতীয় লোক নেই—তাই ভাবলাম....অর্থাৎ এঁরা শহরের মানুষ তো। ওঁদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। ওঁরা আবার একটু বেশি রঙচঙ মাখাই পছন্দ করেন।"

শহুরে মানুষদের কাণ্ডকারখানা যে আলাদা—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে অমন করে কেউ বলে ওকথা? আচ্ছা ভাই, তোমাদেরও তো বিয়ের আগে দেখতে এসেছিল; যতই কেন না লেখাপড়া শেখ—একদিন সেজেগুজে ঘাড় গুঁজরে বসতে হয়েছিল তো তাঁদের সামনে? কিন্তু কীভাবে সাজলে একটি বাইরের লোকের চোখে নিজেকে উৎরে যাওয়ার মতো ভালো ঠেক্‌বে—সে নিয়ে কখনও মতামত নিতে হয়েছে অন্য একজন বাইরের লোকের কাছে? চোখ ফেটে জল আসে আমার। উনি বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারেন। লজ্জা পান। বাবার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগল মানুষ তো। পীড়াপীড়ি করেন আমার সাজার সরঞ্জাম ওঁকে দেখিয়ে নিতে। উনিও তো শহুরে মানুষ। উনি দেখে দিলে যেন ভরসা পান বাবা। আমি কোনও কথা বল্লাম না। যা কিছু এনেছিলাম সঙ্গে করে এনে ঢেলে দিলাম ওঁদের দুজনের সামনে। শান্তিপুরে সবুজ ডুরে শাড়ি,—নীল জ্যাকেট আর সস্তা দামের স্নো-পাউডার—যা ছিল আমার সম্বল।

বেশ বুঝতে পারি, সেগুলো অধ্যাপকমশায়ের পছন্দ হয়নি। হবে কোত্থেকে? এসব সস্তা জিনিস শহুরে বাবুদের পছন্দ হবার নয় যে। আসবার সময় মনু তার মুখে মাখার কতকগুলো হাবিজাবি পুঁটুলি বেঁধে এনে দিয়েছিল। আমি নিইনি সেসব। ওসবে কী হবে? কখনও মেখেছি নাকি ওসব ছাইভস্ম? শেষকালে আরও ভূত সাজব। আর তাছাড়া কী দরকার অতসব হাঙ্গামায়? জানি তো, এ শুধু বাবার একটা খেয়াল মেটানো বই তো নয়।

উনি বাবাকে বলেন—"এতে হবে না! আমি ভালো জিনিস জোগাড় করে আনছি। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনি। একি আমার-আপনার কাজ?"

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে উনি বের হবার উপক্রম করেন। অসৈরণ সইতে পারি! ভীষণ রাগ হয় আমার, এ কী অত্যাচার! একদিনের জন্যে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন—যথেষ্ট। অত পীরিত দেখাতে কেউ তো ডাকেনি ওঁকে।

সদর খুলে বেরুবার মুখে ডাকি—"শুনুন"।

সেই প্রথম কথা বল্লাম ওঁর সঙ্গে!

উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"কিছু বলবে আমাকে?"

"—হ্যাঁ। আপনি আর লজ্জা বাড়াবেন না আমার। এঁরা লেখাপড়া-জানা শহুরে-সুন্দরী মেয়ে চান। তবু বাবা আমাকে টেনে এনেছেন। বাবা বুড়ো হয়েছেন। ওঁর এ পাগলামির তবু মানে হয়। আপনিও ওঁর সঙ্গে এ মাতামাতিতে যোগ দেবেন না। আরও একটি ভদ্রমহিলাকে ধরে এনে সঙ সাজাবেন না আমাকে।"

বলেন, "কেন, ভদ্রমহিলা এলে তোমার আপত্তি কিসের?"

বলি, 'অপমানটা যত কম লোকের সামনে হয় ততই ভালো।"

শশব্যস্তে বেরিয়ে আসেন বাবা। বলেন—"কী, কি হয়েছে?"

কিছু না বলেই উনি বেরিয়ে যান।

ওঁদের সব চেষ্টাই কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে গেল আমার রূপের আগুনে। আমার কপালে ঘি না থাকলে ওঁরা ঠক্‌ঠকিয়ে কী করবেন? উকিলবাবুরা এসে চোখ দিয়ে আমাকে চেখে চেখে দেখলেন। নিজেদের মধ্যে চোখ ঠারাঠারি হল।

আমি পাশের ঘরে উঠে গেলে একজন বাবাকে বল্লেন—"আপনি বলেছিলেন মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা?"

বাবা বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণাই তো বলব। ফর্সা বলা চলে না ওকে।"

ভদ্রলোক হেসে বলেন—"কেন চলবে না? মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কী নাম রেখেছেন মেয়ের?"

বাবা বলেন—"রাধারানি।"

উকিলবাবু হেসে বলেন, "তবেই দেখুন, নামটা পর্যন্ত সাহস করে রাখতে পেরেছেন, আর লোককে বলছেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা! এ মেয়ে তো গোরোচনা গোরী!"

বাবা এত সরল যে, এর পরেও প্রশ্ন করেন, "আপনাদের তা হলে পছন্দ হয়েছে?"

উকিলবাবু বলেন, "সেটা পরামর্শ করে পরে জানাব। আপনি কিন্তু ভট্টাচার্যমশাই, মেয়েকে এভাবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বলবেন না। মেয়েটির মধ্যে শ্রী আছে। যে সংসারে যাবে, মা রক্ষাকালীর মতো আলো করে রাখবে সে-ঘর!"

ওঁরা চলে যেতে বাবা অধ্যাপকমশাইকে বলেন—"ওদের পছন্দ হয়েছে, কী বল?"

উনি তখন জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। বলেন, "না, ওঁদের পছন্দ হয়নি।"

বাবা বলেন, "হয়নি? কিন্তু উনি যে বল্লেন মেয়েটিকে ফর্সাই মনে হল! ওর মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী আছে। যে সংসারে যাবে লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো...."

আমি বাধা দিয়ে বলি—"সন্ধ্যার লোকালটা এখনও পাওয়া যাবে। তুমি একটা গাড়ি ডাকো বাবা।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বেরিয়ে যান, যাবার ব্যবস্থা করতে।

বারান্দায় দুখানি চেয়ারে আমরা দুজনে বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সূর্য অস্ত গেছে এই খানিকটা আগে! বাড়িটা পশ্চিমমুখো। আমাদের সামনেই আকাশটা যেন সোনায় আর আবিরে মাখামাখি হয়ে গেল। বাইরে পুরুষমানুষের সঙ্গে এমনি একা গল্প করার অভ্যেস নেই। আমি ইতস্তত করে উঠতে যাব, হঠাৎ বলে ওঠেন, "মাত্র একদিনের পরিচয় তোমাদের সঙ্গে, তবু তোমরা আসায় এই একটা দিন বেশ আনন্দে কাটল।"

আমি চুপ করে বসে থাকি।

ঠিক এই সময় একটুকরো মেঘের আড়াল থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে এল সূর্য। ম্লান একটা আলো এসে পড়লো বারান্দায়। হঠাৎ বোঝা গেল সূর্য অস্ত যায়নি এতক্ষণ। সেদিকেই চেয়ে থাকি।

উনি বলেন—"এইটাকে বলে কনে-দেখা আলো। এ আলোয় নাকি...." হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে থেমে যান কী ভেবে।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না! বলি, "রক্ষাকালীকে অন্তত লক্ষ্মীঠাকরুনটি বলে ভুল হয় না।"

বলেই বুঝতে পারি ভুলটা। ছি, ছি, কেন নির্লজ্জের মতো বলতে গেলাম ও-কথা। সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে আসে।

উনি ও-প্রসঙ্গ কিন্তু তুললেন না। বাঁচা গেল। বল্লেন, "আর হয়তো কোনদিন দেখাই হবে না তোমাদের সঙ্গে।"

অনেকটা সহজ বোধ করছি প্রসঙ্গটা বদলে যাওয়ায়। উত্তরে বলি, "কেন হবে না? হয়তো খুব শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।"

—"সেকি, কেন?"

—"এবার শহরে মেয়ে দেখাবার দরকার হলে বাবা এখানেই এনে তুলবেন।"

উনি বলেন, "এরপরেও লোকের সামনে বের হবে তুমি?"

বলি, "কেন হব না? এঁরা তো তবু ভদ্রভাবে ঘুরিয়ে বলেছেন। এর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন অনেকে। ও আমার সয়ে গেছে। এই নিয়ে এগারবার হল।"

অধ্যাপকমশাই যেন চমকে ওঠেন, "এগারো বার! তুমি বলছ কী!"

এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি আমাদের। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? মনুও বিশ্বাস করেনি। বারবার খুঁচিয়েছে আমাকে। পারলে দুটো মিথ্যা কথা বানিয়েও বলতাম মনুকে—কিন্তু তাও যে পারি না। সত্যিই আর কোনো কথাবার্তা বলিনি আমরা। এরপরেই বাবা গাড়ি নিয়ে আসেন। আমরা চলে আসি ওঁর বাড়ি থেকে। বরং এর পর যে কথা বলব তা বিশ্বাস করা আরও কঠিন। আমারই কি ছাই বিশ্বাস

হয়েছিল প্রথমে? মনে হয়েছিল কেউ ওঁর নাম নিয়ে রসিকতা করছে বাবার সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাবা চিঠি পেলেন—অধ্যাপকমশাই আমাকে বিয়ে করতে চান। পণ নেবেন না, শুধু শাঁখা আর সিঁদুর!

বাবা তো পাগল হয়ে উঠলেন। আমি কী করব ভেবে পেলাম না। একবার মনে হল অধ্যাপকমশাইকে চিঠি লিখে বারণ করি, কিন্তু অতবড় অধ্যাপককে কী করে লিখব? কী লিখব? লিখব কি যে, আমি ওঁর উপযুক্ত নই? তাঁর পায়ের তলায় বসার সৌভাগ্যও আমার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এসব কথা গুছিয়ে লেখার মতো ক্ষমতাই ছিল না আমার। বাবা তো সেইদিনই চলে গেলেন শহরে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল! মনু এসে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে—"বল্ না দিদি, আর কী কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?"

সন্ধ্যাবেলা বাবা ফিরে এলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলেন—"বলিনি তোকে? মন দিয়ে শিবপূজা করলে শিবের মতো স্বামী হয়?"

বাবার বুকের মধ্যেই থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম। তাহলে একথা সত্যি? এতদিনে ভগবান সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন। বাবা পীতুঠাকুরকে প্রণাম করি।

* * *

আট বছর আগে এসেছিলাম এ-সংসারে। তৃতীয় প্রাণী ছিল না তখন। সুবিমল এ-সংসারে এসেছে তার অনেক পরে। আমরা দুটিতে এ-শহর থেকে ও-শহরে বদলি হই। ঘর ভাঙি আর গড়ি। প্রথম প্রথম কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতাম না এ-সংসারে। মনে হত চুরি করে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি বুঝি এ-বাড়িতে। এ-সংসারে যিনি সত্যিকারের গিন্নি, তিনি যেন কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছেন। টক্‌টকে রঙ, ঘুরিয়ে কাপড় পরে, ঠোঁটে-গালে রঙ মাখে, কখনো অর্গানে বসে গান গায়, কখনও ওঁর হাত ধরে বেড়াতে যায়। এখন সে নেই কি না, তাই সুযোগ বুঝে টুক করে আমি ঢুকে পড়েছি তার সংসারে। যেই সেই সুয়োরানি ফিরে আসবে, অমনি ধরা পড়ে যাবে আমার চুরিবিদ্যে! তখন এ হতভাগী দুয়োরানির ব্যবস্থা হবে—'হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা'।

সুয়োরানি কিন্তু ফিরে এল না বাপের বাড়ি থেকে। আমার সঙ্কোচ, আমার লজ্জা উনি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য মানুষ! অনেক ভারী ভারী কথা বলতেন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে। সব কথার মানেই বুঝতে পারতাম না; তবে আন্দাজে বুঝে নিতাম অনেক কিছু। নিজেকে ছোট ভাবতে নেই.....নিজেকে ছোট করলে ঈশ্বর অপমান করা হয়। এমনি কত সব ওজনদার কথা!

ক্রমশ বুঝতে শিখলাম—সত্যিই আমাকে উনি ভালোবাসেন। 'যার যাতে মজে মন'। কিন্তু কেন মজল? আমার কী দেখে উনি ভুললেন? বিয়ের পর একটা ছোটখাটো ঘরোয়া আয়োজন করেছিলেন উনি। ওঁর বন্ধুবান্ধবীরা সব দল বেঁধে এসেছিল। কয়েকজন ছাত্রীও। তারা কী চমৎকার সব দেখতে। আর কী অদ্ভুত সাজপোশাক করে। পরে অবশ্য ওঁর কাছে শুনেছিলাম—ওদের আসল গায়ের রঙ না কি ওরকম নয়। রঙচঙ মেখে পটের বিবি সেজেছে। তা সে যাই হোক, ওদের মাঝখানে আমাকে নিষ্প্রভ লাগছিল। ওদের সঙ্গে মিশতে পারিনি। তেলে-জলে কি মিশ্ খায়? উনি অবশ্য সব সময় আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে নিতেন। পরে উনিও বুঝলেন—আমি ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চাই। তারপর থেকে আমরা দুজনেই শুধু মেতে থাকতাম দুজনকে নিয়ে।

উনি বলতেন—"জানো, ওরা বলে আমি নাকি বৌ-পাগলা। বিয়ের পর আর নাকি ঘর থেকে বারই হই না!"

আমি বলতাম—"তা বলুক। যে কদিন আমাকে ভালো লাগে সেই কদিন না হয় শুধু আমাকে নিয়েই থাকলে।"

উনি অবাক হয়ে বলতেন—"এ কথার মানে?"

—"মানে বোঝ না? আমাকে আজ তোমার ভালো লাগছে। কেন লাগছে, তা জানি না। আমার কী আছে বলো? কী দিয়ে চিরকাল ধরে রাখব তোমার এই ভালোবাসা? না রূপ, না গুণ! তবু আজ তুমি আমাকে ভালোবাসো। হয়তো দুদিনেই তোমার মন বদলে যাবে। তখন আর ফিরেও চাইবে না আমার দিকে। তাই, যে কদিন তোমার এ-ভুল না ভাঙে সে কদিন তুমি থাকবে আমার, শুধু আমারই!"

উনি ব্যথা পান। একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—"তুমি জান, এজাতীয় কথায় কত ব্যথা পাই! কেন এ-সব কথা ভাব তুমি? আমি তো রূপ-গুণের বিচার করে তোমায় বিয়ে করিনি।"

আমি হেসে বলি—"তবে কিসের বিচার করে বিয়ে করেছ?"

উনি গম্ভীর হয়ে যান। অমনি শুরু হয়ে যায় মাস্টারমশাইয়ের ভারী ভারী কথা। যার মানে নেই, অথচ বেশ গালভারি—ভালো লাগে শুনতে। কী যেন সব বলেন? হ্যাঁ, একবার বলেছিলেন, "রূপ ছড়িয়ে আছে সারা দুনিয়ায়। দেখবার চোখ চাই। রূপকে মুঠোয় বন্দি করা যায় না। গেলেও তা শুকিয়ে যায় হাতের উত্তাপে—নয়তো পারার মতো মুঠি ফসকে পালায়। আমি তোমার মধ্যেই পেয়েছি অমৃত-রূপের সন্ধান, সাদা চোখে তা দেখা যায় না—সন্ধানীতেই শুধু দেখতে পায়।"

আমি বলি—"কিন্তু আমি কী দেব তোমায়? কী আছে আমার?"

উনি বলতেন—"তোমার সবই আছে—নেই শুধু একটি জিনিস—নিজের হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা।"

আচ্ছা, এসব গালভারি কথার কোনো মানে হয়? না হোক, কিন্তু বেশ লাগে! অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, উনি সাধারণ মানুষের মতো নন। ওঁর বিচার অন্যরকম। আমার মধ্যে তিনি এমন একটা কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, যেটার কথা আমি নিজেই জানতাম না। বুক ভরে উঠত তৃপ্তিতে, আমার মতো স্বামীর ভালোবাসা কজন পায়? বুঝি, এ সংসারে আমার মৌরসীপাট্টা হয়েছে। কোনো রূপসী এসে ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে আমাকে এ সিংহাসন থেকে নড়াতে পারবে না। দুনিয়া থেকে অনেক উঁচুতে আমরা দুজনে যেন একটা ছোট্ট পাখির বাসা বাঁধছিলাম—যার সন্ধান কেউ জানত না, যার নাগাল কেউ পেত না।

কিন্তু কোথা দিয়ে কী-যেন হয়ে গেল। কী যে হল তা বুঝিনি সেদিন—আজও বুঝি না। হয়তো বৃহস্পতির দশা পার হয়ে শনির দশায় পড়লাম। উনি একেবারে বদলে গেলেন। বছরতিনেক বিয়ে হয়েছে তখন আমাদের। ওঁর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলাম হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে। সেই উনি প্রথম আমার দেহ নিয়ে খোঁটা দিলেন। এর আগে আমার শরীর নিয়ে কখনও অনুযোগ করেননি। বরং আমিই যখন আমার রূপ নিয়ে, রঙ নিয়ে রসিকতা করেছি উনি বিরক্ত হয়েছেন। হাসপাতাল থেকে একা ফিরে এলাম কাঁদতে কাঁদতে। স্বপ্নেও ভাবিনি—একা ফিরে আসতে হবে। সে এল, অথচ আমার বুক জুড়ে এল না। চোখেই দেখতে দিল না তাকে হাসপাতালের ওরা। কাঁথা তৈরি করে রেখেছিলাম,—রুপোর ঝুমঝুমি কিনে রেখেছিলাম আলমারিতে। উনিও ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। ওঁর দিকে চেয়ে নিজের মনকে শক্ত করলাম। জানি তো, খোকনের জন্যে কতটা প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন উনি। কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে ওঁর। উনি আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। আমাকে যেন সহ্য করতে পারেন না আর। মনে মনে ভাবি, কেন এমন হল? ভগবানকে ডাকি—"হে ঠাকুর, খোকনকে কেড়ে নিলে, এখন কি ওঁর ভালোবাসাও হারাতে হবে? কী অপরাধ করেছি আমি?"

শেষে একদিন উনি বললেন সে-কথা। আমাকেই উনি দায়ী করেছেন এই দুর্ভাগ্যের জন্যে। আমার পাপেই নাকি খোকন এল না আমার বুক জুড়ে! কী ভীষণ কথা! আমার পাপে খোকন মারা গেল! আমি প্রতিদিন কায়মনে বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন সুস্থ সবল সন্তান আসে আমার কোল জুড়ে। কতদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, খোকন শুয়ে আছে আমার পাশটিতে! প্রতি ষষ্ঠিতে পুজো দিয়েছি। বার-ব্রত-উপোস সবই করেছি—যেমন যেমন লিখে পাঠিয়েছিলেন বাবা। তবু আমারই হল দোষ? বাবা বলতেন—'বাপ-মায়ের পাপেই শিশুমৃত্যু।'

আমি তো জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। তবে? উনিও তো কখনও কোন পাপ কাজ করতেন না। তাহলে?

তখনও আসল কথাটা জানতাম না!

আমার তখন ধারণা ছিল, বুঝি ডাক্তারবাবুরা অসাবধান হওয়াতেই খোকন চলে গেছে। ডাক্তারবাবু নিজের দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। বললাম সে-কথা ওঁকে। শুনে উনি আরও বিরক্ত হন। উনি যে আমার কথা না শুনেই রায় দিয়ে বসে আছেন! আমিই দোষী!

বাধ্য হয়ে মেনে নেই। কী করব তাছাড়া? উনি পণ্ডিত মানুষ। চোখের জলে ভেসে বলি—"ওগো, না-হয় আমারই দোষ, কখনও অন্যায় করব না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

শুনে আরও বিরক্ত হন উনি।

কেমন যেন আর সহ্য করতে পারেন না আমাকে। দূরে দূরে সরে থাকেন। সর্বদাই এড়িয়ে চলেন, কাছে গেলে সরে যান। আগেকার মতো আদর করা, সোহাগ করা তো দূরের কথা—আমার খাটে এক সঙ্গে শুতেও আসতেন না। ওই যে কথায় বলে না 'যখন আদর জোটে, ফুট-কলাই দিয়ে ফোটে; যখন আদর ছোটে, ঢেঁকি দিয়ে কোটে', ওঁরও তখন সেই বৃত্তান্ত।

ডবল-বেডের বড় বিছানা ছিল আমাদের। আজ তিন বছর আমরা এখানেই দুজনে শুই। উনি কিছুদিন আগে একটা ছোট খাট বানিয়েছিলেন। বলতেন, "খোকন হলে তুমি ওকে নিয়ে বড় খাটে শোবে, আর আমি শোব ছোট খাটে।"

আমি বলতাম, "কেন, তিনজনেই বড় খাটে শোব।"

উনি আপত্তি করতেন, "না, তাহলে খোকনের অসুবিধা হবে। আমি আলাদাই শোব। ভয় নেই, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত বড় খাটেই শোব তিনজনে। ঐ যে তুমি কী ছড়া কাট না, 'হলে সুজন তেঁতুল পাতায় দুজন'!"

খোকন অবশ্য এলো না। উনি কিন্তু ছোট খাটেই গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঘুম আসার আগে তো দূরের কথা—ভুলেও আমার বিছানার দিকে আসতেন না। সুজন যে আর সুজন নেই!

বুঝলাম, আমার কপাল ভেঙেছে। এটা আশঙ্কা করেই ছিলাম এতদিন।

উনিই বারে বারে বুঝিয়েছিলেন যে, রূপ-যৌবনের বিচারে আমাকে উনি ভালোবাসেননি। বোকার মতো সেটা বিশ্বাস করেছি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বুঝতে পারি নিজের ভুল। বাচ্চা হবার পর আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল চেহারা। আয়নায় দেখে নিজেরই করুণা হত। উনি বলতেন, "তোমার শরীরে ত্রুটি আছে।" ওগো, এ আর কী নতুন কথা শোনাচ্ছ তুমি? কী করতে পারি। আমার এ রূপে যদি তিনি আকৃষ্ট না হন—যদি শরীরের ত্রুটিগুলোই শুধু নজরে পড়ে তবে দোষ দেব কাকে? উনি তখনও সুন্দর, সুপুরুষ। ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে নিজেরই লজ্জা হত। উনি আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইতেন। কী লজ্জা, এই চেহারা নিয়ে ওঁর পাশাপাশি কখনও পথে বার হওয়া যায়?

বুঝতে পারি, আমার মধ্যে ঐ যে কী একটা জিনিস ছিল—যা আমি জানতাম না—অথচ উনি দেখতে পেতেন—সেইটা আমাকে ছেড়ে গেছে। তাই আর উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। ভুলেও চোখ তুলে তাকান না আমার দিকে। বাইরের ঘরে রাত জেগে পড়াশুনা করেন। আমি একা বিছানায় পড়ে কাঁদি। তারপরে কখন নিঃসাড়ে একা শুয়ে পড়েন নিজের খাটে। আমি টের পাই, সাড়া দিই না,—কী হবে লজ্জা বাড়িয়ে।

মাঝে মাঝে মন মানত না। বিদ্রোহ করেছি তখন। মাঝরাতে ডেকে তুলেছি ওঁকে, জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। যেন একটা কলের পুতুলের ঘুম ভাঙলো। ভেতরের মানুষটার ঘুম আর ভাঙলো না।

কালে সবই সয়ে যায়। হয়তো ওঁরই এই হেলাচ্ছেদ্দাও মেনে নিতাম শেষ পর্যন্ত। হয়তো ওঁর কথাই বিশ্বাস করতাম—আমারই অজানা পাপে খোকনকে মেরে ফেলেছি আমি। এমনকি হয়তো ওঁর এই ঘেন্না, এই অশ্রদ্ধা সত্ত্বেও ওঁকে আমি ভালোবাসতাম বাকি জীবন। কেন বাসব না? আমি সত্যিই ওঁর উপযুক্ত নই। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আসল কথাটা জেনে ফেললাম একদিন।

সেবার উনি কলকাতা থেকে সুন্দর একজোড়া খরগোশ নিয়ে এলেন। কী চমৎকার সাদা ধবধবে রঙ। কুঁচ ফলের মতো লাল একজোড়া চোখ। একেবারে বাচ্চা। বুঝতে পারি আমার জন্যই এ-দুটি এনেছেন উনি। দখল করলাম খরগোশ-জোড়াকে! ঘাসপাতা খাওয়াতাম নিজের হাতে। চাকরটাকে দিয়ে কাঠের খাঁচা বানালাম। তারের জালতি লাগিয়ে দিলাম।

উনি হেসে বলেন, "বা-রে, এ দুটোকে কি আমি তোমার খেলার জন্যে এনেছি নাকি? তুমি যে একেবারে দখল করছ খরগোশ-জোড়াকে?"

মনে মনে হাসি; বুঝি গো মশাই সবই বুঝি। এটুকুও কি বুঝব না? পুরুষমানুষে আবার খরগোশ পোষে নাকি? লোকে খরগোশ কেনে বাড়ির ছেলেমেয়ের জন্যে। আর কেনে তারা, যাদের বউ ছেলেমেয়ে নাড়াচাড়া করতে পায় না! আমিও তাই মিথ্যা অভিমান দেখিয়ে বলি, "বেশ, চাই না!"

উনি বলেন, "আচ্ছা বেশ, একটা তোমার একটা আমার। তুমি যেটাকে ইচ্ছে পছন্দ করে নাও।"

আমি তাতেই রাজি। আমি বড়টাকে পছন্দ করি, লাল ফিতে এনে গলায় ঘুন্টি বেঁধে দেই। নিজের হাতে কপির পাতা খাওয়াই। পোষ মানল কিন্তু ছোটটাই বেশি। আমার হাত থেকে চুক্‌চুক্‌ করে ভিজে ছোলা খেয়ে যেত। ওদের নিয়ে একবারে মেতে উঠলাম! কী করব বল ভাই? ছেলেপিলে নেই, বইপড়া আসে না, স্বামীর মন পাই না—মেতে রইলাম খরগোশ-জোড়াকে নিয়ে। খাওয়ানো, নাওয়ানো, সপ্তাহে একদিন খাঁচা সাফ করা। উনি যেন ভুলেই গেলেন ওদের কথা। দুটোই মানুষ হতে থাকে আমার হেপাজতে।

হঠাৎ একদিন উনি কী যেন লক্ষ্য করলেন। পৃথক খাঁচায় দুটি আলাদা রাখার ব্যবস্থা করলেন! এতদিনে নিজের খরগোশের ওপর দাবি জানালেন। আমার ওপর কড়া হুকুম জারি করা হল—ওদের নাওয়ানো, খাওয়ানো—কোন কিছুই নাকি করতে পারব না আমি। মনে মনে হেসে আর বাঁচি না। 'রঙ্গ কতই দেখব আর। ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!' নিজের ঘড়ি-কলম-মানিব্যাগ কোথায় যার হুঁস থাকে না,—উনি মনে করে ওদের খেতে দেবেন, স্নান করাবেন, জল দেবেন। বেশ, দেখা যাক দৌড়টা কত।

যা ভেবেছিলাম; ছোট খরগোশটার খাবারে কম পড়ছিল। বেচারি ছটফট করে খিদের জ্বালায়। খাবার দিতে গিয়ে দেখি খাঁচায় তালা লাগানো রয়েছে। ভারী রাগ হল। চাকরটাকে পাঠিয়ে দিলাম কলেজে, চাবি চেয়ে নিয়ে আসবে।

চাবি এল না, উনি ফিরে এলেন। আমি তখন একটা একটা করে ভেজানো ছোলা খাওয়াচ্ছি ওকে, তারের জালতির ফাঁক দিয়ে। উনি এসেই আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। প্রায় পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলাম! চাকরটার সামনেই ধমকে উঠলেন আমাকে।

ওঁর এ মূর্তি কখনও দেখিনি। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ থম্‌থম্‌ করছে। কঠিন স্বরে বলেন—"তোমাকে বলিনি, ওকে কিছু খেতে দেবে না? কেন খেতে দিয়েছ ওকে?"

চোখ ফেটে জল এল আমার। তবু সামলে নিয়ে বলি—"তুমি ওকে খেতে দিতে ভুলে গিয়েছ বলেই দিয়েছি। আমি না খেতে দিলে এতক্ষণ মরেই থাকত ও।"

—"না, মরত না, আর মরে-বাঁচে সে বুঝব আমি। এটাকে কিছু খেতে দেবে না, বুঝেছ?"

ভীষণ রাগ হল আমার। এতদিনে উনি দাবি জানাতে এসেছেন, না বিইয়ে উনি কানাইয়ের মা হয়েছেন। কে বড় করল ও দুটিকে এতটুকু বাচ্চা থেকে? কোথায় ছিলেন তখন উনি? আর আমার সেই পোষা খরগোশ মরে-বাঁচে সে বুঝবেন উনি—আমার বুঝবার অধিকার নেই?

আমি বলি, "হয় তুমি খাঁচা খুলে ওকে খেতে দাও—না হয় আমিই এভাবে খাওয়াব।"

উনি বললেন, "না দেবে না। আমি বারণ করছি।"

বলি—"তোমার বারণ মানি না আমি!"

উনি জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কী যেন বললেন নিজের মনেই—ইংরেজিতে।

আমার রাগ আরও চড়ে যায়! উনি জানেন—আমি ইংরেজি বুঝি না, তাহলে এভাবে চাকরের সামনে আমাকে অপমান করার মানে?

বললাম—"আমি ইংরেজি বুঝি না—তা তুমি জানো—যা বলতে চাও তা সহজ করে বল।"

—"হ্যাঁ, ইংরেজি বোঝ না, বাঙলাও জান না—তুমি বোঝ অন্য একরকমের ভাষা! তাই তোমার বোধগম্য ভাষাতেই বলে যাচ্ছি—এটাকে কিছু খেতে দেবে না—আমার মাথার দিব্যি দেওয়া রইল!" বলেই হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে যান।

তোমরাই বল ভাই—এভাবে অপমান করার কি কোন কারণ ছিল? কী এমন অন্যায় কথাটা বলেছি আমি? যার জন্যে এতবড় দিব্যি দিলেন উনি! তিলতিল ক'রে শুকিয়ে মরতে থাকে বাচ্চা খরগোশটা। কী করতে পারি? গুমরে মরি নিজের মনেই। ওঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। সারারাত গুম মেরে পড়ে থাকি। উনিও নিজে থেকে ভাব করতে আসেন না। আসবেন না, জানতাম। আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচেন। ঝগড়া হওয়ায় নতুন ছুতো হয়েছে। জো পেয়ে গেছেন উনি। ওঁর তো মজাই!

পরদিন চাকরটা ফাঁস করে দিল—উনি অফিস যাওয়ার সময়। শুনে উনি এসে দাঁড়ালেন আমার খাটের কাছে। ঘুমিয়ে থাকার ভান করে মিট্‌কি মেরে পড়ে থাকি।

—"কাল থেকে কিছু খাওনি শুনলাম।"

আমি চুপ।

উনি বসে পড়েন আমার খাটের পাশে। চোখের উপর থেকে জোর করে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, "আমায় মাপ কর তুমি। হঠাৎ রাগের মাথায় রূঢ় কথা বলেছি। ওঠো লক্ষ্মীটি, খেয়ে নাও।"

আমার অবস্থা তখন 'এইবার ডাকিলেই খাইতে যাইব।' এত মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনি না। আমার রাগ জল হয়ে গেল। বলি—"তাহলে চাবিটা দাও, ওটাকে খাইয়ে আসি।"

উনি বলেন, "না, ওকে কিছু খেতে দিও না। ওর বাচ্চা হবে। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বাচ্চার পরিণতি কীভাবে ব্যাহত হয় তাই পরীক্ষা করছি আমি।"

আমি অবাক হয়ে যাই। ছোটটা মাদি খরগোশ? ওর বাচ্চা হবে? কিন্তু ভরপেট খেতে পাবে না সে? কেন? ওঁর একটা নিষ্ঠুর খেয়াল মেটাতে হবে বলে? আমি দৃঢ়স্বরে বলি—'এ হতে পারে না।'

উনি বলেন, "দেখ, তোমার মত আর পথ আমার মত আর পথ থেকে ভিন্ন। সে কথা জেনেই বিয়ে করেছিলাম তোমাকে। ভেবেছিলাম, প্রেমের ত্রিবেণীতে গিয়ে মিলবে আমাদের জীবনের ভিন্নমুখী ধারা। তা তুমি হতে দিলে না। আমি তোমার বারব্রত-ছুঁৎমার্গ মেনে নিলাম, মানিয়ে নিলাম। তুমি কিন্তু বিজ্ঞানকে স্বীকার করতে পারলে না একতিলও; নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছ, অসহনীয় করে তুলেছ আমার জীবনকেও। আমি বুঝিয়েছি, যুক্তি দিয়ে স্বমতে আনবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আমি জবরদস্তি করতে পারতাম, করিনি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তোমার সংস্কারাচ্ছন্ন রুচিকেই সম্মান জানিয়ে এসেছি। আমার অনুরোধ—আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও তুমি হাত দিতে এস না! এ তুমি বুঝবে না।"

আমি আর্তকণ্ঠে বলেছিলাম, "এর আগেও তুমি এরকম পরীক্ষা করেছ?"

—"হ্যাঁ, কেন?"

—"না খেতে পেলে বাচ্চার কী ক্ষতি হয় কেমন করে জানতে পার?"

—"অতি সহজে। ল্যাবরেটারিতে ডিসেক্ট করে।"

—"ডিসেক্ট কী?"

—"পেট কেটে!"

কথা ফুটল না আমার মুখে। অনেকদিনের একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এত নৃশংস আমার স্বামী? ঐ এলোভুলো মানুষটি! যে দয়া করে বিয়ে করেছে গাঁয়ের এক সাধারণ মেয়েকে, বিনাপণে? এ পাপের স্পর্শ লাগবে না আমার সংসারে? ওপরে ভগবান নেই, তিনি কি অন্ধ? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, নিজের পাপের ফল উনি চাপাতে চাইছেন আমার ঘাড়ে। আমার অপরাধেই নাকি খোকন এল না আমার বুক জুড়ে। উনি খেতে না দিয়ে খরগোশটাকে আধমরা করবেন,—তারপর নিয়ে যাবেন কলেজে, পেট চিরে বার করবেন বাচ্চাটাকে। দেখবেন, ওঁর নৃশংসতার কতদূর ফল হয়েছে। এরপর কোনওদিন সুস্থ সবল সন্তান আসতে পারে আমার কোলে?

কদিন শুধু গুমরে গুমরে কেঁদেছি। এ লজ্জার কথা, এ দুঃখের কথা কাকেই বা বলি! মাদি খরগোশটা তিলতিল করে শুকিয়ে মরে। আগের মতো আর ছটফট করে না। নিঃঝুম মেরে পড়ে থাকে সারাদিন। আহা বেচারি! উনি কী বুঝবেন, কী কষ্ট হচ্ছে ওর! পেটে ছেলে ধরার কষ্ট তো জানেন না। তার ওপরে উপোস! নিরুপায় হয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম। তিনিই বিপদে চিরকাল পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। বাবা জবাবে লিখলেন, "স্বামীর আদেশ পতিব্রতা সাধ্বী রমণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে। কিন্তু ধর্ম তাহারও উপর। যে জীব তোমার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাকে রক্ষা করাও তোমার ধর্ম। তোমার স্বামীকে এ পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত করাও তোমার কঠিন কর্তব্য। স্বামী মাথার দিব্য দিয়া খাওয়াতেই বারণ করিয়াছেন,—তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াও তুমি কৌশলে খাঁচা খুলিয়া দিতে পারো। বাসুদেব রক্ষা করিলে কৃষ্ণের জীব মাতৃত্ব লাভ করিবে।"

খাঁচা খালি দেখে উনি আগুন হয়ে ফেটে পড়েছিলেন। আমি কিন্তু মিছে কথা বলিনি; বলেছিলাম, "আমার কর্তব্য আমি করেছি। ওকে তিলেতিলে মরতে দিতে পারি না আমি।"

উনি ভীষণ রাগ করেছিলেন। আমার সঙ্গে কথাই বলেননি অনেকদিন। তা না বলুন, আমার দুঃখ

নেই। কথায় বলে না 'যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে'—কথাটা পাপকাজের বেলাতেই নয়, পুণ্যকাজের বেলাতেও খাটে। আমার এ পুণ্যকাজের ফল হয়েছিল। তখন তখনই নয়—পাঁচ বছর পরে। অবশ্য আরও কারণ ছিল। ঁপীতুঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন বাবা! মাদুলিও পাঠিয়েছিলেন একটা। আশ্চর্য সে মাদুলির ক্ষমতা। যেদিন ধারণ করলাম সেদিন উনি যেন একেবারে বদলে গেলেন। তোমরা নিশ্চয় মাদুলিতে বিশ্বাস কর না? কিন্তু আমার কথা শুনলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবে না। যে লোক আমার দিকে পাঁচ বছর চোখ তুলে তাকায়নি, মাদুলি পরার সঙ্গে সঙ্গে সে যে এমনভাবে বদলে যেতে পারে তা কি বিশ্বাস হয়। ঁপীতুঠাকুরের প্রসাদী খাওয়ার পরেই খোকন এল আমার পেটে। বাবাকে লিখলাম ঁপীতুঠাকুরের পূজা দিয়ে মাদুলি পাঠাতে। ভারি ভয় ছিল মনে মনে। উনি একেবারেই ছেলেপিলে ভালোবাসেন না। ছেলের জন্যে আমি মাথা খুঁড়ে মরছি—আর উনি শুধু চেষ্টা করেছেন কি করে আমি মা না হই! তাই যা কিছু পূজা-অর্চনা মানসিক সব আমাকে লুকিয়ে করতে হত। খোকন যে আসবে একথা ওঁকে জানাইনি। যে রকম বদমেজাজি লোক, যদি চটে ওঠেন। যদি জানতে পারেন ঁপীতুঠাকুরের দোর ধরে আমিই এটা করছি—তাহলে কি আর উনি আমাকে আস্ত রাখবেন? কিন্তু লুকিয়েই বা রাখব কতদিন? বলতে তো হবেই একদিন। এমনিভাবে নিজের মনেই ভেবে মরছি এমন সময় বাবা মাদুলি আর পূজার ফুল পাঠালেন।

উনি বলেন, "মাদুলি কিসের?"

আমি বলি, "পরে বলব।"

সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যাবেলা স্নান সেরে নিয়মমত মাদুলি ধারণ করলাম। যেমন নির্দেশ ছিল। রাত্রে সাহসে ভর করে মরিয়া হয়ে বলেই ফেল্লাম।

শুনে অবাক হয়ে গেলেন উনি। প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চান না—শেষে যখন শুনলেন চারমাস হয়ে গিয়েছে তখন....

থাক ভাই। সব কথা তো আর বলা যায় না। কিন্তু তোমরা যা আশঙ্কা করছ তা মোটেই হয়নি। উনি একটুও রাগ করেননি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, রাতারাতি মাদুলির এতটা ফল হবে। অদ্ভুত খুশি হয়ে উঠলেন তিনি—আদরে, সোহাগে একেবারে পাগল করে দিলেন আমাকে। পাগল একেই বলে। এতদিন চেষ্টা করছিলেন যেন আমি মা না হতে পারি। পাঁচটা বছর এই নিয়ে কত কষ্ট সহ্য করেছি। আমি নাকি স্বাভাবিক নই, আমার বুক জুড়ে সন্তান এলে নাকি উনি ভীষণ দুঃখিত হবেন। আর যেই শুনলেন যে আমি মা হতে চলেছি অমনি....

হাসছ তো। জানি হাসবেই। ওঁর পাগলামি দেখে আমিও হেসেছিলাম সেদিন। এলোভুলো মানুষটি একেবারে হিসাবের গুরুঠাকুর হয়ে উঠলেন। কারও বউয়ের যেন আর বাচ্চা হয় না। ওই যে বলে না, 'আদেখ্‌লের ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল' ওঁরও সেই বৃত্তান্ত। পরদিনই কলকাতা নিয়ে গেলেন আমাকে। ডাক্তার দিয়ে দেখানো হল। শিশি-শিশি ওষুধ, ছুঁচ-ছুঁচ ইন্‌জেকশান! কী কাণ্ড! সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন নাও, নিয়মমাফিক খাও। রোজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে হয়। এত অত্যাচার কখনই সইতাম না; কিন্তু একটা কারণে আমি কোনও আপত্তি করিনি। কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা হয়। মাদুলি ধারণ করার পর থেকে উনি হঠাৎ রাতারাতি বদলে গেলেন। যেন সে মানুষই নয়। যেন আট বছর আগেকার দিনগুলো, সেই বিয়ের পরেকার টাটকা দিনগুলো ফিরে এসেছে আবার! মাঝেকার এই পাঁচটা বছর যেন স্বপ্নকথা। কই, উনি তো আমার কোন ইচ্ছাই এড়িয়ে যান না। তবে কি ভুল বুঝেছিলাম?

কিন্তু সুখের দিনগুলো কী ছোট! ক'মাস আগে যখন দ্বিতীয়বারের মত হাসপাতালে যাই, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম ফিরে এসে দেখব আবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে? মাদুলিটা কি কোনও অনাচারে নষ্ট হয়ে গেল? না হলে এমনভাবে আবার উনি বদলে গেলেন কেন খোকন হবার পর? সারাদিন আবার উনি বই নিয়ে পড়ে থাকেন বাইরের ঘরে।

মাঝে মাঝে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে,—"ওগো দয়াময়, এ তোমার কেমন ব্যবহার? দয়া করে বিয়ে করেছিলে আমাকে। দয়া করে ভালোবেসেছ কখনও কখনও—আবার মাঝে মাঝে এমন ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দাও কেন?"

হাসপাতালে যাবার আগে ছিলাম সুখের সুয়োরানি—সোনার চাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এসে দেখছি কখন অজান্তে আবার দুয়োরানি হয়ে গেছি! কেন? কী অপরাধ হল আমার? এ যেন একেবারে গল্পকথা। গল্পের রাজা যেমন রাতারাতি রাখাল হয়ে যায়—আমারও তাই হল—

'কালকে ছিল সোনার পিঁড়ে। আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।'

ওঁকে আমি বুঝতে পারিনি। পারবও না কোনওদিন। একদিকে উনি স্নেহশীল, দয়াময়, কোমল ভাবুক মানুষ। তখন অল্প আঘাতে ওঁর চোখে জল আসে। তখন গাঁয়ের কালো কন্যেকে এনে বসান সোনার সিংহাসনে। আদরে-সোহাগে তাকে পাগল করে দেন। তখন সে সুয়োরানির শাড়ি-গহনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করতে থাকেন। তারপর কোথা থেকে দিয়ে কী হয়। উনি বদলে যান একেবারে। যেন অন্য মানুষ। নৃশংস নির্দয়, যেন পাথরে গড়া। তখন জ্যান্ত ব্যাঙ, গিনিপিগকে টেবিলে চিৎ করে ফেলে হাতে-পায়ে পিন ফুঁড়ে—উঃ! তখন ভুলেও আমার দিকে তাকান না। কাছে গেলে সরে যান—যেন অস্পৃশ্য অশুচি আমি। সেই মুহূর্তে বোধহয় দুনিয়ার ঘৃণ্যতম পাপও উনি করতে পারেন অম্লানবদনে!

বিশ্বাস কর না? আমি প্রমাণ দেব। আমার কাছেই তিনি এমন ঘৃণিত পাপের প্রস্তাব করেছিলেন যে, শুনলে শিউরে উঠবে তোমরা। কে বলবে পণ্ডিত অধ্যাপকের এমন বিকৃত রুচি থাকতে পারে। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে এ-কথা বলতে পারে। আর শুধু বলা নয়, সেই অধর্মের পাপকাজে আমাকে সহায়তা করতে বলেছিলেন। খোদার ওপর খোদগিরি করবেন উনি। ভগবানের বিধানকে পাল্টে দেবেন। চন্দ্রসূর্য যেন এখনও উঠছে না। কত অনুরোধ-উপরোধ। একআধদিন নয়—প্রতি রাত্রে! সে কাজের কী সব সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত কিনে এনেছিলেন। স্বামীর কথার কখনও অবাধ্য হইনি। এবার হতে হল। কী করব? ধর্ম সবার ওপরে। আমি তাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ওঁর পাপ-প্রস্তাব! কী প্রস্তাব? সে কথা ভাই মুখ ফুটে বলতে পারব না আমি!

দুই

কোন একটি উপন্যাস পড়িতে পড়িতে যদি হঠাৎ দেখি তাহার ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, শব্দের বানান সমস্তই অতর্কিতে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে শুরু করিল—তখন আমরা কী করি? কাণ্ডজ্ঞানহীন গ্রন্থকারকে ইচ্ছামত গালি দিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাই। কারণ উপন্যাস রচনার একটা সর্বজনস্বীকৃত প্রচলিত রীতি আছে। সে রীতি লঙ্ঘন করিলে লেখককে শাস্তি পাইতে হইবে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কী করিব! কোনও একটি লোককে লইয়া ঘর করিতে করিতে যদি সহসা অনুভব করি তাহার সুর বদলাইয়া গেল—তখন তো তাহাকে মুড়িয়া রাখিতে পারিব না। অনুরাধা নামের যে গ্রাম্য পণ্ডিতের অরক্ষণীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলাম তাহার পৈত্রিক নাম—রাধারাণী। সেটা সেকালের নাম। আমার পছন্দ হয় নাই। তাই একটু নূতনতর নামের মোড়ক দিবার প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু নামের পরিবর্তন কি মানুষটার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? কতটুকু জানিতাম তাহাকে বিবাহের সময়ে? উপরের মলাটের শুচিশুভ্র প্রচ্ছদপট আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বইটি ঘরে আনিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ভালো লাগিল। তাহার পর হঠাৎ এক পরিচ্ছেদে আসিয়া নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি। হঠাৎ দেখি উপন্যাসটির ভাব-ভাষা বিষয়বস্তু সমস্তই অতর্কিত আঘাতে ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিয়াছে। বই বন্ধ করিবার উপায় নাই। বাকি পরিচ্ছেদগুলিও পড়িতে হইবে। ভালো লাগুক আর না লাগুক—পরীক্ষার পূর্বে রাত্রি জাগিয়া ছাত্র যেমন নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া যায় তেমনি করিয়া হইলেও এ পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িতেই হইবে আমাকে।

এই কথাই ভাবিতেছিলাম কাল রাত্রে আমার পাঠগৃহে। জীবনকে আমরা খণ্ড খণ্ড রূপে দেখি। যে কোনো ঘটনা, যে কোনো মানুষকে আমরা বিচার করি এই একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে। আমার দৃষ্টিপথে যেটুকু গোচর সেটুকু আমার নিকট তাহার পরিচয়। তাই এত ভুল বোঝাবুঝি। মতে ও পথের পার্থক্য লইয়া দুনিয়ার এত মাথা ফাটাফাটি। অধিকাংশ মানুষই আত্মবিশ্বাসে কাজ করে। আর অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো সত্যের আংশিক উপলব্ধি লইয়া দৃষ্টিহীনদের মতান্তর। আমার জীবনের

ব্রত—সত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিব। যেটুকু আপাতদৃশ্যমান তাহার অতীতেও সত্য থাকিতে পারে! তাই সহসা কোন সিদ্ধান্তে আসিতে চাহি না। অনুরাধাকেও বুঝিবার চেষ্টা করি, বুঝাইবারও।

বারান্দার বড় ঘড়িটায় একটানা কয়েকটা বাজিয়া গেল—ঢং ঢং ঢং ঢং। কয়টা বাজিল? প্রথম হইতে গোনা হয় নাই। এগারোটা? না বারোটা? টেবিলের ড্রয়ারটা টানিয়া হাতঘড়িটা দেখিতে গেলাম। ড্রয়ারে ঘড়িটা নাই। গেল কোথায়, এখানেই তো থাকে। এখানে ওখানে খুঁজিতে থাকি, হঠাৎ নজরে পড়িল দেওয়ালের একটা পেরেকে টাঙানো আছে হাতঘড়িটা। উঠিতে হইল। ঘড়িটা টেবিল ল্যাম্পের নিকট আনিয়া দেখি সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। অর্থাৎ থামিয়া আছে। দম দিতে ভুলিয়াছি। আজকাল বড় ভুল হইতেছে। পূর্বে তো এইরূপ ভুল হইত না। অনুরাধার এইবারকার অসুখের পর হইতেই বেশি ভুল হইতেছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন তিলমাত্র ভুল হইলে ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একটা এক্সট্রা ভুল করায় অঙ্কে পুরা একশ নম্বর পাই নাই। মনে আছে ভুলটা জানিতে পারিয়া সারারাত ঘুম হয় নাই।

দম দেওয়া শেষ হইল। এইবার কাঁটা ঘোরাইতে হয়। কিন্তু কয়টা বাজে, এগারোটা না বারোটা? বাহিরে আসিয়া বারান্দার আলোটা জ্বালিলাম। মধ্যরাত্রে অধ্যাপক গৃহস্বামীকে তাহার খবরদারি করিতে দেখিয়া বড় ঘড়িটা যুক্তকর কপালে ঠেকাইল।

ড্রয়ারে ঘড়িটা রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। অনুরাধা নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফিনকি দিয়া জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গুমট গরম। বাহিরে একটানা ঝিল্লিস্বর। তাহা ভিন্ন বিশ্বচরাচরে আর কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। শব্দ আছে। বারান্দার বড় ঘড়িটার। একটানা যান্ত্রিক শব্দ—টক্, টক্, টক্, টক্। হিসাব রাখিয়া চলিয়াছে—সীমিত জীবনের সময়ের অপব্যয়।

দোতলার খোলা ছাদে ক্যাম্পখাট পাতিয়া সুবিমল ঘুমাইতেছে। ঐ এক আশ্চর্য ছেলে। ঘরে শুইলে ওর নাকি ঘুম হয় না। বর্ষা ও শীতের কয়টা মাস বাদ দিয়া সারাটা বৎসরই মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রিযাপন করে।

বড় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। দুই দিকে দুইখানি খাট পাতা। এদিকে একখানি ড্রেসিং টেবিল—তাহার উপর সামান্য কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য। পায়ের দিকে আলমারিতে অনুরাধার জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা, গহনা থাকে। উন্মুক্ত জানলা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অস্পষ্ট, আলোকে ঘরের সবকিছুই দেখা যাইতেছে। নিঃশব্দে খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গেঞ্জিটা খুলিয়া মশারি উঠাইয়া শুইতে যাইবার পূর্বে একটু থামিলাম—ভারি ইচ্ছা করিতেছে, ওর খাটের কাছে আসিয়া একবার দেখি। বিনিদ্র অনুর মুখখানা দেখিবার একটা অদম্য বাসনা জাগিতেছে। ইতস্তত করি। না, কাজ নাই। অনুরাধার ঘুম বড় সজাগ।

সন্তর্পণে খাটে উঠিতে যাইব, ও-খাট হইতে অনু বলিয়া উঠে—বনপর্বটা শেষ হল?

চমকিয়া উঠিলাম—কী শেষ হল?

—বনপর্ব!

এবার বুঝিতে পারি। কিছুদিন ধরিয়া যে বিরাট নিবন্ধটা লিখিতেছি অনুরাধা তাহাকে 'মহাভারত' বলে বটে।

বলিলাম—তা অষ্টাদশ-পর্বের মধ্যে বনপর্বের কথাই বা মনে পড়ল কেন? ওটা আকারে বড় বলে?

—না, একজনের বনবাসের ব্যবস্থা করছ বলে।

আমি হাসিয়া লঘু করি—আমার প্রবন্ধ লেখায় কাকে আবার বনে যেতে হচ্ছে? তোমাকে নাকি? কই সেরকম তো লক্ষণ দেখছি না।

অনুরাধা ছড়া কাটে,—পিসিমা বলতেন, "মনের দুখে যাসনে বনে, বন আছে তোর ঘরের কোণে। ভাতার যখন ঘুরায় মুখ, ঘরেই বনবাসের সুখ।"

আশ্চর্য সঙ্কলন অনুরাধার। কোথা হইতে এইসব উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ করে? আর সময়মতো মনেও পড়ে এইসব আধা-অশ্লীল ছড়া! লোক-সমাজে অনুরাধার যাতায়াত নাই। আমাকে নানা রকম নিমন্ত্রণ

রাখিতে হয়। কলেজ সোস্যাল, রি-ইউনিয়ান, সভা-সমিতি। অনুরাধা আমার সহিত কখনও যায় না। এক-আধবার পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম—দেখিলাম, ও এ পরিবেশে অসোয়াস্তি বোধ করে। আজকাল অনু আমার সহিত বস্তুত কোথাও যায় না। সুবিমলই ওর একমাত্র সঙ্গী। জানি না, সে এই ছড়াগুলি কী ভাবে গ্রহণ করে।

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না, ঘুমাব কেন? এইমাত্র তো শুলাম।

—তবে কথা বলছ না যে?

—কী বলব?

—তা ঠিক। নির্জন ঘরে স্ত্রীকে বলবার মতো কী কথা থাকতে পারে মানুষের? পাঁচজনের সামনে তবু দু-কথা বলা যায়। একা ঘরে অহেতুক কথা বলে লাভ কী? এখানে চুপ করে থাকলে তো কেউ ভাববে না, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মিল হয়নি।

—কী আজে-বাজে বকছ অনু? কেন এসব কথা ভেবে মিথ্যে কষ্ট পাও?

—মিথ্যে? তুমি বলতে চাও এ আমার মিথ্যে অভিযোগ? তুমি কোনোদিন আমাকে সত্যিকারের ভালোবেসেছ?

মধ্যরাত্রে এ কী কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিল অনুরাধা? কী জবাব দিব? কয়মাস ভিন্ন কক্ষে শুইতাম—এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না। গভীর রাত্রে ধর্মপত্নীর এজাতীয় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বিবাহের পূর্বেও অনুরাধার স্বাস্থ্য এমন কিছু ভালো ছিল না। গোল বাধিল সন্তান হওয়ার সময়। প্রথম সন্তান হওয়ার সময় জানা গেল তাহার শারীরিক ত্রুটি আছে। আমি খুব সাংসারিক নই। প্রথমাবস্থাতেই যদি ডাক্তার দেখাইতাম, তাহা হইলে হয়তো আমাদের প্রথম সন্তানটিকে বাঁচাইতে পারিতাম। ত্রুটি আমারই। সেদিনকার সব কথা মনে পড়ে। হাসপাতালের চওড়া বারান্দাটায় পায়চারি করিতেছিলাম। হঠাৎ লেবার-রুম হইতে সার্জেন বাহিরে আসিয়া আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন—জননী আর সন্তান দুইজনকেই বাঁচানো সম্ভবপর নহে। আমি কাহাকে চাই?

অনুরাধা প্রায়ই বলে মৃত্যুই তাহার কাম্য। তাহা হইলে আমি নাকি নিষ্কৃতি পাই। সেদিন কিন্তু সন্তান অপেক্ষা তাহার জননীকেই চাহিয়াছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে কথা বলতে কি বিরক্ত বোধ হয়?

—কেন এমন করে বলছ অনু? তুমি তো জান—কত ভালোবাসি তোমাকে?

—ছাই বাস। আজ চার মাসের মধ্যে কোনওদিন এসে বসেছ এ খাটে?

—বসিনি? রোজ সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি তোমার পাশে বসে। আর্নড-লীভ সব ফুরিয়ে ফেলেছি! তুমি বলছ কী অনু? কলেজে আমার বদনাম হয়ে গেছে এই জন্যে। কমলবাবু সেদিন বলছিলেন—আরে মশাই বাচ্চা তো আমাদেরও হয়, কিন্তু সেজন্যে এমন আঁতুড় আঁকড়ে পড়ে থাকি না।

অনুরাধা একটু যেন নরম হয়। বলে—ওসব বাজে কথা, কে বলছিলেন বললে?

—কমলবাবু। হিস্ট্রির। তাছাড়া তুমিও তো সেদিন কী যেন ছড়া কাটলে—ঘটিহীনের ঘটি হল, ঘটি ঘটি জল খেল—না কী যেন!

অনুরাধা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে—ঘটিহীন কী গো? বল আদেখ্‌লের। এতবার শোন তবু মনে থাকে না তোমার?

এই জন্যেই ওকে এত ভালোবাসি। এত অল্পতেই ও সন্তুষ্ট হয়। একটু রসিকতা, একটু মিষ্টি কথা, আর ও একেবারে খুশিয়াল হইয়া ওঠে। বোটানি-জুলজির বিদ্‌ঘুটে ল্যাটিন নাম লইয়া যাহার কারবার, তাহার পক্ষে এটা যে একটা ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতিও হইতে পারে—এটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধিও তাহার নাই।

—তা, তুমি এখানে এসে ব'স না। এত চেঁচিয়ে কি কথা বলা যায়?

—চেঁচাতে হবে কেন। এই তো পাশাপাশি খাট।

—তার মানে তুমি আসবে না!

—শুয়ে পড়েছি যে।

—বুঝেছি, থাক।

অনু চুপ করে। আমার ঘুম আসে না। বুঝিতেছি, অনু অভিমান করিতেছে। তা করুক, এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে। আমি উঠিব না, ওঠা উচিত নহে। ওর শয্যায় গিয়া গল্প করিতে বসা বিপদজনক।

কিন্তু এভাবে চলিবে কী করিয়া বাকি জীবন?

প্রথম সন্তানটিকে জীবিত পাই নাই। আমি সে জন্য দায়ী। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অপরাধ আমার। আমি সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন করি নাই। জীবনের ত্রিকোণমিতিতে একবার আলফা স্থলে বিটা লিখিলে আর রক্ষা নাই। সে অঙ্ক আর মিলিবে না। অনুরাধার দেহাভ্যন্তরে নবজীবনের স্পন্দন শুনিতে পাইয়াই আমার কর্তব্য ছিল বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া। সে ব্যবস্থা করি নাই! তখন গুরুত্বটা বুঝি নাই। যখন বুঝিলাম তখন আর উপায় নাই! স্ত্রী-পুত্রের একজনকে বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিল। প্রথমাবস্থাতেই যদি ডাক্তার দেখাইতাম তাহা হইলে তখনই জানিতে পারিতাম যে, স্বাভাবিক প্রসব সম্ভবপর নহে। তখন নিশ্চয়ই মফস্বলের ভরসা ত্যাগ করিয়া কলকাতায় আসিতাম। সিজারিয়ান করানো চলিত—এবার যেমন করানো হইল।

.....হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। অনু কাঁদিতেছে। বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছে। নিদ্রিত হইবার ভান করি।

এ কী বিপদে পড়িয়াছি। এর সমাধান কোথায়? কত জটিলতাই না আসে জীবনে! অনুরাধাকে সত্যিই আমি ভালোবাসি। প্রথমদিন যেমন বাসিতাম আজও তেমনি বাসি। না থাক তাহার রূপ, না থাক যৌবনের মাদকতা—তবু এই শান্ত পল্লিবালিকাটিকেই একদিন নিজে পছন্দ করিয়া জীবনসঙ্গিনী করিয়াছিলাম। হ্যাঁ, ভালোবাসিয়াই। অনু আজও বলে—না, না, তুমি কোনোদিনও আমাকে ভালোবাসনি, শুধু দয়া করেছ! কে চেয়েছিল তোমার দয়া?

দয়া? অসম্ভব নয়! হয়তো অনুকম্পাই জাগিয়েছিল প্রথমে। না, সত্যকে অস্বীকার করিব না। অনুকম্পাই আছে আমার দাম্পত্য জীবনের আদি-কাণ্ডে। অরক্ষণীয়া পূর্ণযৌবনা মেয়েটির প্রতি একটা মমতা জাগিয়াছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত সরল গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির প্রতি একটা কারুণ্যই বোধ করি আমার প্রেমের গঙ্গোত্রী; কিন্তু সেই মনোবৃত্তিই তো একমাত্র উপাদান নহে। আদিকাব্যের প্রথম শ্লোকও তো জন্মগ্রহণ করিয়াছিল করুণার উৎসমুখে—কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্যে সেই কারুণ্যরসই তো একমাত্র উপজীব্য নহে। ঐ একহারা মেয়েটি যখন আসিয়া আমার সংসার-তরণির হাল ধরিয়া বসিল, তখন তাহারই ভিতর দেখিয়াছিলাম গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণময়ী মূর্তি।

তিল তিল করিয়া জয় করিয়া লইয়াছিলাম অনুরাধাকে। ওর লজ্জা, ওর সঙ্কোচ ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়াছলাম। হীনম্মন্যতা ছিল ওর চরিত্রের একটি দুর্বলতা। সেটা সে জয় করিতে শিখিল। ঐ ভীরু এণাক্ষীর কোমল হাতটি ধরিয়াই অতিক্রম করিয়াছিলাম যৌবরাজ্যের এক গোপন সিংহদ্বার। অজানিত মহাদেশের পথের সন্ধান পাইয়াছিলাম ওরই সাহচর্যে। বিবাহের অনতিকালের মধ্যে অনুরাধার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছিল। শুধু মনে নহে—দেহেও। কৃশ তনু কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। স্বচ্ছসলিলা শীতের নদী যেন রূপান্তরিত হইল ভাদ্রের ভরা-গাঙে। জৈবিক কারণ আমার অজানা নহে। গ্রন্থিরস-মাহাত্ম্য আমাকে পড়াইতে হয়, তবু মনে হইল এ শুধু ভালোবাসারই দান এ শুধু। কুমারী মেয়েটির অনাদৃত যৌবন যেই সম্মানিত হইল—অমনি যেন তাহার জীবনের বাগিচায় বসন্ত আসিয়া পৌঁছিল।

তারপর দেখিলাম তাহার অপর একরূপ। মাতৃত্বের রূপ। অধ্যাপক অবনীমোহনের প্রদীপ হইতে সে একটি নূতন দীপশিখা জ্বালিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। সে প্রদীপ জ্বলে নাই। জন্মমুহূর্তেই চিরতরে নিভিয়া গেল। তাহার জন্য আমি নিজেকে দায়ী করি। অনুরাধা কিন্তু আমার যুক্তি স্বীকার করে নাই। সে বিজ্ঞানকে মানে না। সে দোষারোপ করিল এক অদৃশ্য শক্তির উপর। ভগবান, নিয়তি, কর্মফল—ঐ জাতীয় কিছু। আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক ভাসিয়া গেল। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সে কর্ণপাত করিল না। সে কথা বুঝিবার মতো শিক্ষাই ছিল না তাহার। এখানেই শেষ হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ঘটনাস্রোত তো থামিয়া থাকে না।

ওর দেহের অভ্যন্তরে যে অস্থির বিকৃতি আছে—ওর পক্ষে যে স্বাভাবিক ভাবে জননীত্ব লাভের

উপায় নাই—এই মূল-সত্যটাকে সে ছড়া কাটিয়া উড়াইয়া দিল। পেল্‌ভিক্‌ গার্ডল্‌ কী, তাহার ন্যূনতম অথবা স্বাভাবিক ব্যাস কত এ সকল কথা সে শুনিতেই চাহিল না। ও দোষারোপ করিল সার্জেনের উপর। তা করুক—কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যও সে সাবধান হইতে অস্বীকার করিল। এখানেই আসিল প্রথম জটিলতা।

নানা যুক্তি দিয়া, আলোচনা করিয়া, বই পড়িতে দিয়া তাহাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু অনুরাধার আজন্ম সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে পারি নাই। আমার পরামর্শে সে কর্ণপাত করে নাই। এ কী অত্যাচার! ভগবানের ব্যবস্থার উপর মানুষ হস্তক্ষেপ করিবে? ঈশ্বরের দুনিয়া নাকি চলে অঙ্কশাস্ত্রের মত কঠিন নিয়মে—সেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ পাপ!

আশ্চর্য যুক্তি ওর। ধরা যাক্‌ ঈশ্বর নামে সত্যিই একজন অলক্ষ্যবাসী ম্যাথমেটিসিয়ান আছেন। ওর যুক্তি, তিনি যখন যোগ করিতে চাহেন তখন তাঁহাকে বাধা দিলে পাপ হইবে। অথচ সে ভদ্রলোক যখন বিয়োগ অঙ্ক কষিতে বসেন তখন ঔষধ, ইন্‌জেকশন, অক্সিজেন সিলিন্ডার আনিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে ধূলিসাৎ করিলেও কোনো পাপ হইবে না!

আজ আট বৎসর হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে। ইহার ভিতর প্রথম তিনটি বৎসর কাটিয়াছিল নিরুপদ্রবে। চতুর্থ বর্ষে অনুরাধার ক্রোড়ে আসিল প্রথম সন্তান। না, ভুল বলিলাম। অনু সেই শিশুকে ক্রোড়ে পায় নাই। বস্তুত সে সন্তানকে ও চক্ষেই দেখে নাই। দেখিতে চাহিয়াছিল—ডাক্তার অনুমতি দেন নাই। কী লাভ সেই খণ্ডিত কর্তিত মাংসপিণ্ডটিকে দেখাইয়া? অনুশোচনা বাড়ানো বই তো নয়! আমি দেখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথা তাহার নিকট স্বীকার করি নাই।

এইদিন হইতেই আমাদের জীবনের জটিলতা শুরু হইল। ওর দেহে যে আঙ্কিক ত্রুটি আছে, এই সহজ সত্যটাকে সে স্বীকার করিল না। বলে,—আমার চেয়ে কত রোগা-পটকা মেয়ে কোলে ছেলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল—আর যত দোষ এই নন্দ ঘোষ। আসলে ডাক্তারবাবু নিজের ভুল আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। নিজে জানেন না নাচতে, দোষ হল উঠোনের।

প্রতিবাদ করিয়াছি, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছি—কোনো ফল হয় নাই। এ প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আর উত্থাপনই করিতাম না।

কিন্তু জীবনের গতি তো থামিয়া থাকে না! অতীতের বিশ্লেষণ বন্ধ করা যায়—কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কা? বর্তমানের আচরণ? তাহাকে তো এড়ান যায় না। জীবন তো উপন্যাস নয়—যে ভালো না লাগিলে বই বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিব। অভিমান করুক—রাগ করুক, অনুর নিরাপত্তার কথাটা তো উপেক্ষা করিতে পারি না। চার-পাঁচ বৎসর অমোঘ দুর্দৈবকে দিনক্ষণ হিসাব করিয়া প্রতিহত করিয়াছিলাম! তারপর একদিন অনুরাধারই জয় হইয়াছে। মোট কথা আমি হারিয়া গেলাম। ওর দেহের অভ্যন্তরে আবার দেখা দিল নূতন জীবনের উন্মেষ। খুশিয়াল হাসিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! মাথা দোলাইয়া ছেলেমানুষের মত বলিল—দেখলে তো? বলেছিলাম না? খোদার ওপর খোদগিরি করবে তোমরা! এখন কী? পারল তোমার বিজ্ঞান কিছু করতে?

কী জবাব দিব? বিজ্ঞান চলে ক্ষুরধার সঙ্কীর্ণ পথে। তিলমাত্র বিচ্যুতিকে সে দণ্ড দেয় ক্ষমাহীন কঠোরতায়! অনুরাধা কোনওদিন আমাকে বিজ্ঞানসম্মত পথে চলবার অধিকার দেয় নাই। এতদিন যে দুর্ঘটনা ঘটে নাই এটাই বিস্ময়! এসব কথা কাহাকে বুঝাই? আট বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি—ওসব যুক্তিতর্ক বৃথা! এবার আর ভুল করি নাই। বিশেষজ্ঞকে দিয়া যথাসময়ে অনুকে পরীক্ষা করাইলাম। নিয়মমতো সেবা-যত্নের ব্যবস্থা হইল। আশঙ্কা ছিল এত ঔষধপত্র, এত নিয়মের নির্দেশ সে মানিতে রাজি হইবে না—কিন্তু আশ্চর্য, সে অতি সুশীলা হইয়া উঠিল। তাহার এ পরিবর্তনের কোনো অর্থ বুঝিলাম না—হয়তো বিজয়ের আনন্দেই সে অধীর।

....নাঃ! আর তো পারা যায় না! অনুর কান্নার বেগ বাড়িয়াছে। এত জোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে যে সত্য সত্য নিদ্রিত হইলেও আমার ঘুম ভাঙিবার কথা—কপট নিদ্রাকে আর জিয়াইয়া রাখা চলে না।

অস্ফুটে ডাকিলাম—অনু!

ও সাড়া দেয় না। কান্নার বেগটা শুধু বাড়ে।

—কী হল, সাড়া দিচ্ছ না যে?

তবু নিরুত্তর! উঠিয়া বসিলাম। ইতস্তত করিয়া অগত্যা বলি—বেশ আমি তোমার বিছানায় যাচ্ছি, কিন্তু কথা দাও.....

আমাকে বক্তব্য শেষ করিতে দেয় না! হঠাৎ আর্তকণ্ঠে ফাটিয়া পড়ে—থাক, থাক দয়াময়—তোমাকে আসতে হবে না।

এরপরে আর এ পৃথক শয্যায় পড়িয়া থাকা চলে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মশারি তুলিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করি।

অনু উঠিয়া বসে। বলে—তুমি এ-খাটে এলে সত্যি বলছি আমি বেরিয়ে যাব ঘর থেকে; আমি চেঁচাব কিন্তু। আমি ঠাকুরপোকে ডেকে তুলব।

বাধ্য হইয়া পুনরায় শুইয়া পড়ি। অনুও শোয়। কান্নার শব্দটা থামিয়াছে। হয় চুপ করিয়াছে, অথবা নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। ঢং করিয়া বারান্দার ঘড়িতে একটা শব্দ হইল। সাড়ে বারোটা না একটা? বুঝিতে পারিলাম না।

আমার ঘুম চড়িয়া গিয়াছে। কী করিয়া এই কঠিন সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহাই ভাবিতেছি। অনু ফলাফল দেখিয়া বিচার করিতে অভ্যস্ত। উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করিতে সে নারাজ। যে কয়েকমাস তাহার দেহের গোপন কারখানায় নব জীবনের অঙ্কুরোদ্‌গম হইতেছিল—সেই কয়মাস সে অবোধ আনন্দে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে। এখন আর আমাকে সে ঐ ভাবে পায় না। এর যে জৈবিক কারণ তাহা সে কিছুতেই বুঝিল না। লাভের সময় খুশিয়াল আনন্দে ছেলেমানুষি করিত, লোকসানের সময় কাঁদিয়া ভাসাইল—অথচ একবারও খাতা-পেন্সিল লইয়া কষিয়া দেখিল না, কেন এই লাভ—কীসের এ লোকসান। ওদের এই এক সুবিধা। জীবনের ট্রায়াল-ব্যালান্স না মিলিলে আমাদের নিদ্রা হয় না। ওদের ও বালাই নাই। গোঁজামিলের অজস্র ফল্‌স ভাউচার আছে। প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করিলেই হইল—ভগবান আছেন, অদৃষ্ট-নিয়তি-কর্মফল আছে, না হউক ব্রাহ্মণের অভিশাপ অথবা পূর্বজন্মের সুকৃতিকে কে ঠেকাইবে? আমার আচরণের পরিবর্তনটার জৈবিক কারণ সে দেখিল না। দেখিবে কী করিয়া, ওর মনে যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে—ওর রূপহীনতাই আমার বীতরাগের কারণ।

এবার সে সুস্থ-সবল সন্তান লইয়াই হাতপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যটি ভাঙিয়াছে। অবশ্য ডাক্তারের মতে কয়েকমাস সাবধানে চলিলে, নিয়মমত আহারাদি করিলে, পরিশ্রম না করিলে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। সুতরাং আমাকে দ্বিগুণভাবে সাবধান হইতে হইল।

অনু খোকনের জন্য একটি বেবি-কট কিনিতে বলিল। আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। আমি নিজের জন্য পৃথক খাট বানাইয়াছি। বেবি-কটের আর প্রয়োজন ছিল না। ও কিন্তু কর্ণপাত করিল না, সুবিমলকে দিয়া খোকনের জন্য ছোট দোলনা খাট আনাইল। অনুর দুগ্ধ খোকনকে খাওয়ানোতে নিষেধ ছিল—তাই রাত্রে একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তাহাকেই শিখণ্ডী করিয়া আমি অন্তরালে আত্মগোপন করিলাম। অনু তাহাকে সহ্য করিতে পারিত না। অনবরত সে আমাকে বুঝাইত সে ভালো হইয়া গিয়াছে—খরচ করিয়া ধাত্রীটিকে রাখা নিরর্থক। আমি সম্মত হই নাই। শেষে একদিন সুবিমলও আসিয়া তাহার বৌদির পক্ষে সওয়াল শুরু করিল! সচরাচর সুবিমল এ সকল কথার মধ্যে থাকে না। সহসা তাহাকে অনুর পক্ষ লইয়া সুপারিশ করিতে দেখিয়া কিছু বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। সুবিমল আমার নিজের ভাই নহে। সম্পর্কটা এমন কিছু নিকটও নহে। গ্রাম সম্পর্কে ওর বাবাকে আমি মামা বলিয়া ডাকি। ওর বাবা আজন্ম গ্রামের মানুষ। সম্পন্ন গৃহস্থ। লেখাপড়ায় সুবিমল বরাবরই ভালো। যখন কলেজে পড়িতে চাহিল তখন তিনি ছেলেকে হস্টেলে-মেসে পাঠানোর অপেক্ষা আমার নিকটে রাখাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিলেন। আমি অনুর সহিত পরামর্শ করিলাম। বলিলাম—ও বরং এখানে থেকেই পড়ুক। তবু তোমার একজন সঙ্গী হবে।

অনু আপত্তি করিয়াছিল। অপরিচিত পুরুষমানুষ বাড়িতে আসিয়া থাকিবে, সে কেমন করিয়া সম্ভব! বুঝাইলাম, বাইরের লোক তো নয়—সে তোমার দেওর।

—দেওর! কেমন ভাই হয় তোমার?

সম্পর্কটা বুঝাইতে গিয়া বেগ পাইতে হয়। অনু হাসিয়াই খুন, বলে—বুঝেছি, বুঝেছি, সইয়ের মায়ের বকুলফুলের....

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—আহা তা কেন, ওর বাবা আমার মামা হন!

—কী রকম মামা? তোমার মায়ের কীরকম ভাই?

বিব্রত হইয়া বলি—অত জেরার কী দরকার, আপন ভাই নয়। গ্রাম্য-সম্পর্কে মায়ের ভাই হন।

ও বলে—সে কথা বল্লেই হয়, 'ওর গোয়ালে বিয়ালো গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।"

সেই সুবিমল আজ অনুর একান্ত ভক্ত, সেবক, বন্ধু। সুবিমলও যখন আসিয়া তাহার বৌদির সহিত আমার বিরুদ্ধে তর্ক জুড়িল তখন বাধ্য হইয়া ধাত্রীটিকে বিদায় দিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ সেই সাবেক সমস্যাটির সহিত পুনরায় মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল। আজ চার-পাঁচমাস পরে নির্জন কক্ষে স্ত্রীর সহিত শুইতে আসিয়াছি এবং আসিয়াই আমার বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

...ঢং ঢং করিয়া বারান্দার ঘড়িতে দুইটা বাজিল। তাহা হইলে তখন দেড়টা বাজিয়াছিল। নাকি ইতিমধ্যে আরও বার দুই বাজিয়াছে, খেয়াল করি নাই। সে যাহাই হউক, এখন রাত দুইটা। কিন্তু ঘুম কি আজ আর আসিবে না? অনু নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমাইয়াছে। না, ঘুমোয় নাই—মশারির ভিতর হাতপাখা নাড়িতেছে।

হঠাৎ খোকন কাঁদিয়া ওঠে!

উঠিতে হইল। ওর খাটের সংলগ্ন বেবি-কট। খোকনকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইলাম। কাঁথাটা ভিজা। ও, তাই ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। শিশুকে বাম স্কন্ধে লইয়া কাঁথাটা পরিবর্তন করিয়া পুনরায় শোয়াইয়া দিই।

—ওকে আমার কাছে দাও।

—কেন? ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে। শুইয়ে দিয়েছি, আর কাঁদবে না।

—হ্যাঁ কাঁদবে। ওর ক্ষিদে পেয়েছে, দাও আমার কাছে!

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকি। আবার সেই একগুঁয়ে মেয়েটি অবুঝের মতো তর্ক করিতেছে। খোকনের জীবনযাত্রা ঘড়ির কাঁটার নির্দেশ মানিয়া চলে। অসুস্থা অনুর বুকের দুগ্ধ সে খায় না, একথা বিস্মৃত হওয়ার কোনো কারণ নাই; তাহা হইলে এ জিদের অর্থ কী? তবু সে কথা না বলিয়া অন্য কথা বলি—একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে, তুলতে গেলেই উঠে পড়বে।

—বেশ তুমি শোও গিয়ে, আমি তুলে আনছি—যাও!

অনু উঠিবার উপক্রম করে। মশারি তুলিয়া বাহিরে আসে।

—কেন তুমি মাঝে মাঝে এমন অবুঝ হও বলতো? খোকন কি তোমার বুকের দুধ খায়, যে মাঝরাতে টেনে তুলছ ওকে?

—এতদিন খেতো না, এবার থেকে খাবে। তুমি নিজে যা খুশি কর, ওকে কেন বঞ্চিত কর?

—কেন বঞ্চিত করি তা তুমি জান না? ডাক্তারবাবু বলেন—

—তোমার ঐ ডাক্তারবাবুর নাম কর না আমার কাছে। খুনে অসভ্য ডাকাত একটা।

—কিন্তু ঐ ডাক্তারবাবুর দৌলতেই খোকনকে পেয়েছ, এটা ভুলে যেও না। এটুকু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত তোমার।

—কৃতজ্ঞতা! তুমি বুঝি মনে করেছ তোমার ঐ অসভ্য ডাক্তারবাবুর দৌলতে পেয়েছি আমার খোকনকে? ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাক। কী করে খোকনকে পেয়েছি জান?

হাসিও পায়, কান্নাও আসে। এত বড় সত্যটাকে ছড়া কাটিয়া উড়াইয়া দিবে অনু? সে কি কোনোদিনই বুঝিবে না, ঐ সদ্যোজাত বিস্ময়কে দুনিয়ায় আনিবার কৃতিত্বটা একান্তই বিজ্ঞানের! কে অসম্ভবকে সম্ভব করিল? আমার বঞ্চিত পিতৃত্ব, অনুর তৃষ্ণাতুর মাতৃত্বকে কে সার্থক করিল? অনুরাধা? আমি? তাহা তো নহে। এ শুধু উন্নত শল্যশাস্ত্রের দান! খোকন ম্যাক্‌ডাফের মতো জননীর সন্তান নহে, জুলিয়াস সিজারের মতো চিকিৎসক তাহার জনক।

—কী করে পেয়েছি জান খোকনকে?

—কী করে?

—এতদিন বলিনি তোমাকে। আজ বলতে বাধ্য হলাম। খোকনকে পেয়েছি বাবা ঁপীতুঠাকুরের দয়ায়। বাবা পুজো দিয়ে প্রসাদী পাঠিয়েছেন, তাইতেই খোকন এল আমার বুকে।

প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। বলিলাম, তা হবে।

—জানি, জানি, বিশ্বাস করবে না তুমি। তাই জানি বলেই এতদিন বলিনি তোমাকে। আজ তুমি ডাক্তারবাবুর কথা তুল্লে তাই রাগের মাথায় বলে ফেল্লাম। ডাক্তারবাবুর আদেশ! তাই খোকন কোনোদিন মায়ের দুধ পাবে না। অনেকদিন ওসব বুজরুকি শুনেছি, আর আদিখ্যেতা ভালো লাগে না। দাও এখন খোকনকে।

তবু প্রতিবাদ করিতে হয়—তোমার শরীর এখন অসুস্থ। ও দুধ খেলে খোকনের শরীর খারাপ করবে! লক্ষ্মীটি, কথা শোন।

—কক্ষনো করবে না! মায়ের দুধ খেলে নাকি ছেলের শরীর খারাপ করবে? রাখ তোমার ডাক্তারের ফুটানি। বাবা কী বলেন জান?

এই আর এক বিড়ম্বনা! এই বিজ্ঞানের যুগে অভ্রান্ত সত্য নাকি একজনই বলিয়া থাকেন। তিনি অর্ধশিক্ষিত একজন গ্রাম্যপণ্ডিত। আমার পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়! তবু এসময়ে আর রাগারাগি করিলাম না, বলিলাম—কী?

—মায়ের বুকের দুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য নেই। সন্তানের কাছে তাই অমৃত।

—ঠিকই বলেন তিনি—যদি মা সুস্থ থাকে!

—আমার কিছু অসুখ নেই।

কী জবাব দিব! চুপ করিয়া থাকি।

হঠাৎ অনুরাধা সুর বদলায়। বলে—আচ্ছা তুমি কী বলত! আমার কাছে আসতে চাও না, তাই আমার একটা মনগড়া অসুখের ছুতো দেখাও। আমাকে দেখতে পার না, তাই আমার চলন বেঁকা হয়েছে। বেশ তো, আমি আপত্তি করিনি, কিন্তু খোকনকে কেন সেজন্যে বঞ্চিত করছ? আর অসুস্থ অসুস্থ বলছ, আমার কষ্টটা তো দেখবে! ব্যথায় টন্‌টন্ করছে, অথচ খোকনকে তোমরা কাছে আসতে দেবে না।

এ কথায় বিচলিত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করি ব্রেস্ট-পাম্পটা দিব কিনা।

অনুরাধা চাপা গর্জন করিয়া উঠে—না থাক্, চাইনা ওসব!

মিষ্টি করিয়া বলি—সত্যিই ব্যথায় টন্‌টন্ করছে।

—তবে কি আমি মিথ্যা কথা বলছি! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি—বেশ!

সহসা বেড সুইচটা জ্বলিয়া উঠে। সবুজ আলোর আবছায়ায় ঘরটা ভরিয়া যায়। বিকচ-উরসা, আলুলায়িত-কুন্তলা মেয়েটির চোখ সেই অস্ফুট আলোকেই জ্বলিতেছে দেখিলাম।

আমার সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বহিয়া যায়! বাইরে একটা দমকা শীতল হাওয়া ওঠে। বেড সুইচটাও নিভিয়া যায়! সর্বাঙ্গে শীতল স্পর্শ।

*　　　*　　　*

বাহিরের ঘড়িতে আড়াইটার সঙ্কেত। স্তব্ধ রাত্রের নৈঃশব্দ্যের উপর ঐ একটা ঘণ্টারই দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন। বড় ঘড়িটা যেন ধিক্কার দিয়া উঠিল। সেও যেন মর্মাহত আমার ব্যবহারে। মধ্যরাত্রে পাঠনিরত অধ্যাপককে মাত্র আড়াই ঘণ্টা পূর্বে সে হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিয়াছিল, এজন্য যেন এখন সে অনুতপ্ত। রক্তমাংসে গড়া এই সাধারণ মানুষটাকে ব্যঙ্গ করিতেই বুঝি এতক্ষণে ঢং করিয়া উঠিল।

তিন

আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটা দেখছি সেখান থেকে সমস্ত দৃশ্যটা দৃষ্টিগোচর নয়। তাই অনেক কেন'র জবাব জানিনা আমি—জানা সম্ভব নয়। তবু ওঁদের দাম্পত্য-জীবন যে স্বাভাবিক পথে চলছে না—এটুকু আমিও বুঝতে পারি। আর আমি তো এ সংসারে তিন বছর আগে এসেছি—যারা পরে এসেছে, নীরজা অথবা বামুনদি—ওরাও এ সত্যটা উপলব্ধি করেছে। না করলেও অনুমান করেছে। মিল ওঁদের হয়নি—এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু কেন? নিঃসংশয় মানসিক গঠনের বৈষম্যই এর মূল কারণ। অধ্যাপক অবনীমোহন জ্ঞানমার্গের পথচারী। তিনি ধীর, গম্ভীর, অপ্রমত্ত। বিজ্ঞান একটা দুরতিক্রম্য বাতাবরণ রচনা করে রেখেছে তাঁর চারিধারে। তিনি নাস্তিক; বিজ্ঞানই তাঁর ধর্ম। ঈশ্বর তাঁর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ; এই বিশ্বপ্রপঞ্চের গোপন কেন্দ্রলোকে স্পিনোজা-বর্ণিত কোনো সর্বশক্তিমান অজ্ঞেয় সত্তাকে তিনি মেনে নিতে রাজি নন। জীবনের গোপনতম আদি-রহস্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আইপীসে। সত্য তাঁর কাছে অস্বীকার্য—যতক্ষণ না 'ডিসেক্ট' করে আর স্লাইড তুলে তুলে তাকে যাচাই করে নেন বীক্ষণাগারে। সত্য যখন স্বীকৃত হয়—তখন দেখা যায় কেটে-কুটে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে জীবনের প্রাণচাঞ্চল্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মৃত্যু-মন্দিরের গর্ভগৃহে। তিনি বলেন—জীববিজ্ঞান তাঁর ধ্যেয়; আমি মনে করি জীববিজ্ঞান নয়, মৃত্যুবিজ্ঞান!

অসংখ্য প্রাণীর জীবনস্পন্দন তাঁর কাছে স্বীকৃত—তারা আজ তাঁর বীক্ষণাগরে স্পিরিটের শিশিতে পেয়েছে সমাদরের স্থায়ী সিংহাসন। কাদম্বিনীর মতো তাদের মরে প্রমাণ দিতে হয়েছে যে, তারা বেঁচে ছিল। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে না দেখলে জীবনকে তিনি দেখতে পান না। ওদিকে বৌদি জীবনকে গ্রহণ করেছে তার পরিপূর্ণতায়। বিচার করেনি, বিশ্লেষণ করেনি, স্বীকার করেছে আনত মস্তকে। বুদ্ধি দিয়ে দাদা যা পেতে চাইছেন—তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে বৌদি তার বিশ্বাসের জোরে।

এরা ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ওদের পথ আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, যান বিভিন্ন, এমনকি পাথেয় পর্যন্ত এক দেশের মুদ্রা নয়। তবু ইচ্ছা থাকলে এই দুই ভিন্নমুখী ধারা মিলিত হতে পারত জীবনের এক পাদপীঠে। কজন স্বামী আর স্ত্রী মত আর পথ এক সুরে বাঁধা থাকে? তবু তারা ফিরে ফিরে আসে একই সঙ্গমে। দ্রুতছন্দ তবল্‌চি কোথায় যাবে বীণাকারকে পেছনে ফেলে? ফিরে তাকে আসতে হবেই তেহাই অতিক্রম করে, একই সমের মাথায়। মোটা চামড়াই হোক, আর সরু তারই হোক—তবলা আর বীণা যে একই রাগ-রূপের সন্ধানে অভিযাত্রী। দাদা আর বৌদির জীবনে আপাত-পার্থক্যটা এতদূর প্রসারিত যে, ভয় হয় কোথাও বুঝি ওঁরা হাত মেলাতে পারবেন না। কোনো অর্থ হয় না এ যুক্তির। এশিয়া আর আমেরিকা মহাদেশের মাঝখানে থাকুক না কেনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বিস্তৃতি—রাতের আঁধারে ওরা চুপিচুপি হাত মেলাতে পারে বেরিং প্রণালীর সঙ্কীর্ণতায়। কিন্তু ওঁরা শুধু দূরেই সরে গেলেন, কাছে সরে আসেননি।

আমি একান্তভাবে দায়ী করি দাদাকেই—অধ্যাপক অবনীমোহনকেই।

কী প্রয়োজন ছিল তাঁর পল্লি-প্রান্তের সেই আশ্রম-মৃগীর প্রতি শরসন্ধানের? ব্রাহ্মণের অশিক্ষিতা অরক্ষণীয়া কুমারী কন্যাকে উদ্ধার করবার মহানুভবতা দেখাতে কেউ তো তাঁকে প্ররোচিত করেনি! বৌদি হ'চ্ছে কলসি। পদ্মনিধি থেকে শীতল জল ভরে এনে ঘরের কোণে রেখে দাও—সে সংসারের সকল তৃষ্ণাতুরকে তৃপ্ত করবে। সে মাটির ঘট। তার গায়ে আলপনার নকশা আঁক, মেটে ঘরের কুলুঙ্গিতে বসিয়ে দাও তাকে—মাথায় দাও একগোছা স্থলপদ্ম—দেখবে কী বাহার! এ সরল কথাটা দাদা বুঝলেন না। সস্তা বাহাদুরি দেখাতে তিনি ঐ মাটির পাত্রের ওপর চড়ালেন সোনালি রাঙতার মোড়ক—ওকে তাঁর সৌধশীর্ষের মঙ্গল-কলস করলেন। রৌদ্রে-জলে-ঝড়ে গৃহচূড়ার মঙ্গল-কলস ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, তার নকল রাঙতার মোড়ক পড়ছে খুলে, কিন্তু সে মুখ ফুটে আর্তনাদও করতে পারছে না। এত বড় সম্মানের আসনের অমর্যাদা হবে যে!

বৌদি এ জীবনে অনভ্যস্ত—ভুল না হওয়াটাই তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু দাদা কেন পারেন না সে ভুল মানিয়ে নিতে? রাধাবৌদিকে দেখেশুনেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। বৌদির শিক্ষার অপূর্ণতা অথবা প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কারের কথা তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর ভাষায় বলতে পারি

এগুলি ছিল তাঁর প্রাকপরীক্ষার পূর্বস্বীকৃত অভ্যুপগম—হাইপথেটিক্যাল ডাটা। তাহলে হঠাৎ বীতকাম হয়ে উঠলেন কেন তিনি জীবনে? কী অধিকার ছিল তাঁর বৌদির জীবনটা এভাবে ব্যর্থ করে দেবার? নাকি রাধারানী বৌদি ওঁর খাঁচাবদ্ধ খরগোশ গিনিপিগের সমগোত্রীয় একটি জীব? একটি পরীক্ষা চলছিল বৌদিকে নিয়েও—পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গেল না। অতএব রিজেক্‌টেড স্পেসিমেনটিও ফেলে দেবেন তিনি ল্যাবরেটরির লিটার বিনে?

তিন বছর আগে এসেছিলেম এ সংসারে। শৈশবে মাকে হারিয়েছি, বড় বোন নেই। রাধাবৌদির অকৃত্রিম স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছে আমার জীবন। এ যে কত বড় পাওয়া তা যে পায়নি তাকে বোঝানো যাবে না, যে পেয়েছে তাকে বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। কী অদ্ভুত এই মানুষে-মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন! তিন বছর আগে ওকে চিনতেম না—অথচ আজ যেন সে আমার জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। রাধাবৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যখন ভাবি তখন অবাক হয়ে যাই। ওকে আমি মায়ের মত দেখি না, আমার চেয়ে ক'বছরেরই বা বড় ও! বড় বোনের সঙ্গে এ জাতীয় হাসিঠাট্টা চলে না। ও আমার বান্ধবীর পর্যায়ভুক্ত নয়—কারণ ওর আদেশ আমি মাতৃআজ্ঞার মত মেনে চলি। তাহলে রাধাবৌদি আমার কে? মাঝে মাঝে মনে হয়, ভারতবর্ষ বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে নর ও নারীর বিভিন্ন এবং বিচিত্র সম্পর্ক স্বীকৃতি পেয়েছে। য়ুরোপ একটিমাত্র সম্পর্ক জেনেই খুশি, আমরা নর ও নারীর সম্পর্ককে অত ক্ষুদ্রায়তনে সীমিত করিনি। য়ুরোপখণ্ডের কোনও ভদ্রলোক কি ভাবতে পারেন যে, কোনও উৎসবে তাঁর স্ত্রী তাঁর ভাইকে যেদিন আমন্ত্রণ করবেন সেদিন তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে যাবেন বোনের বাড়ি এবং গিয়ে দেখবেন ভগ্নীপতি গেছেন তাঁর বোনের কাছে ভাইফোঁটা নিতে? ঐ একটি বিশেষ দিনে সে কারও স্বামী নয়—সে একজনের ভাই। জৈষ্ঠ্যের এক চিহ্নিত দিনে যেমন তার পরিচয়—স্বামী নয়, ভাই নয়, জামাতা। নীলের দিনে আবার সে শুধু মায়ের ছেলে!

এ সংসারে তেমনি আমার পরিচয় রাধাবৌদির দেওর! ওর দান শুধু অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি এতদিন। প্রতিদান দিতে পারিনি! তাই ওর অপমানে মনে মনে জ্বলতে থাকি। অনাদৃত বৌদির অভিমানক্লিষ্ট মুখখানা দেখে রাগ হয় দাদার ওপর। কিন্তু কী করব? ওর যেখানে ব্যথা সেখানে বাইরে থেকে আমরা কেউ সান্ত্বনার চন্দন লেপন করতে পারব না। দীর্ঘদিন ধরে দূর থেকে লক্ষ্য করে আসছি ওদের বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন। যেন কোন বিদ্রোহী দেবতার অনবধানতায় একটা সৌখিন চিনেমাটির ফুলদানি দু-টুকরো হয়ে গেছে। বাইরে থেকে খাঁজে খাঁজে ওদের জোর করে মেলাতে চাও? ওরা মিলবে না, ভেঙে পড়বে ভেতরের জোর না থাকায়। এ ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য হল, যা জানতেম তা বুঝি সত্য নয়! আমার অনড় বিশ্বাসের পাহাড়ের তলায় হল অতর্কিত ভূকম্পন। স্পষ্ট অনুভব করলেম, ওদের অন্তরলোকের কোন অগোচরে গড়ে উঠেছে মিলনের সেতু। লুটিয়ে পড়া তরুলতা যেমন ধীরে ধীরে এসে জড়িয়ে ধরে জানলার গরাদ, তেমনি করে বৌদি এসে আঁকড়ে ধরলেন লৌহকঠিন অধ্যাপক স্বামীকে। দুই মহাদেশ যেন হাত মেলাল এক অদৃশ্য যোজকে। এটা কী করে সম্ভব হল, ভেবে কূলকিনারা করতে পারিনি। কিন্তু পরিবর্তনটা সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। ভাঙা ফুলদানির জোড়ার দাগ আর নজরে পড়ে না। দাদার বইয়ের আলমারির তালায় মরচে ধরে গেল। পড়ার ঘরে আর বসেনই না। তারপর কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! সন্ধ্যাবেলা দাদা পদব্রজে সস্ত্রীক সান্ধ্যভ্রমণে বার হলেন! একদিন নয়, পরপর কদিনই। ব্যাপার কী? বৌদি যেন শেলীর ভরতপক্ষী—পার্থিব দেনাপাওয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে সে যেন উঠে গেছে কোন ঊর্ধ্বলোকে, গান গাইতে গাইতে। ঠাট্টা করে একদিন বললেম : বৌদির যেন নতুন করে বিয়ে হল মনে হচ্ছে।

— আহা-হা!—রাঙিয়ে ওঠে রাধাবৌদি।

আমি ঘনিয়ে এসে বলি, কী ব্যাপার বল তো বৌদি? আমার দাদাটিকে এতদিন বই-পাগলা বলেই জানতেম—বই নিয়ে তাঁকে মাতামাতি করতে দেখেছি—সেটা অভ্যস্ত; কিন্তু ইদানীং সন্ধির কোন সূত্র অনুযায়ী হ্রস্ব-ইকারের স্থলে হ্রস্ব-উকার প্রয়োগ হল?

বৌদি এত ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না, বলে কী বলছ, স্পষ্ট করে বল।

— বুঝলে না? বই-পাগলা হঠাৎ বৌ-পাগলা হয়ে উঠল কেমন করে? রবিবার দশটার মধ্যে

খাওয়া-দাওয়া মেটানো তো আইনভুক্ত নয় এ সংসারে। এগারোটার মধ্যে শয়ন-কক্ষে অর্গল? অনর্গল এত কী ইয়ে চর্চা চলে তোমাদের?

কপট ক্রোধে বৌদি ধমক দেয়, দাঁড়াও, তোমার অসভ্যতা ঘোচাচ্ছি। তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তা খেয়াল আছে? এক-আধ নয়, চার বছরের বড়।

— তাতে কী? আমি কি মিছে কথা বলছি নাকি?

— মিথ্যে-সত্যি বোঝাপড়া ক'র তোমার দাদার সঙ্গে। আজ কলেজ থেকে ফিরে এলেই বলে দেব সব কথা!

আমি আতঙ্কিত হবার অভিনয় করি, দোহাই বৌদি! আমি তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালাব!

আমার ভয়তরাসে মুখখানা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে ও।

কারণটা জানা গেল অনতিবিলম্বে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম। এই তাহলে ওদের বিড়ম্বিত জীবনের গূঢ় রহস্য? না হবেই বা কেন? আজ সাত-আট বছর ঘর করছেন ওঁরা—অথচ সে ঘর কলমুখরিত হয়নি কোন শিশুর কাকলিতে। একবার নাকি এসেও ফিরে গেছে। এবার দাদাকে খুব ব্যস্ত মনে হল। সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক্তার দেখানো, প্রত্যহ বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। বুঝলেম নিজের ভুল, চীনেমাটির ফুলদানিটা আসলে ভাঙেনি কোনও দিনই। ফুল ছিল না ঘরে—তাই অনাদৃত পড়ে ছিল ওটা, ঘরের কোণে ধুলো বালির মধ্যে।

বৌদি ফিরে এল হাসপাতাল থেকে—কোথায় ভাবলেম, এবার নিবিড়তর হবে ওদের মিলন—হল তার বিপরীত। আবার সব গুলিয়ে গেল আমার। কোন দূর দিগন্তে দুর্যোগের ঘন মেঘ কখন অতর্কিতে ঘনিয়ে উঠল জানতেও পারলাম না। শুধু লক্ষ্য করে দেখলেম, এক রবিবারে দাদা তেল দিয়ে মরচেধরা আলমারির তালাগুলো খোলবার চেষ্টা করছেন। তাঁর অঙ্গে পুনর্বার উঠল বিজ্ঞানের নির্মোক। বৌদি নির্বাসিত হল আবার শয়নকক্ষের অশোকবনে।

বিরোধ শুধু হল সামান্য একটা অজুহাতে। ধাত্রীটিকে নিয়ে। সেটিকে বিতাড়নের ব্যবস্থা হল। আমাদের যৌথ যুক্তির গঙ্গাস্রোতে ভেসে গেলো দাদার আপত্তির ঐরাবত।

কিন্তু যা আশা করেছিলাম তা হল না। মিলল না আর ওদের হাত, কাজে কিম্বা খেলায়। বিপরীত পথযাত্রী দুটি জাহাজকে যেমন মনে হয় মিলনের অধীর আগ্রহে ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে, তারপর কাছাকাছি এসে তারা পাশাপাশি পাশ কাটায়—আর ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে;—ওঁরা তেমনি করলেন। অকূল সংসার সমুদ্রে এত কাছাকাছি এসে ওঁরা পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন—বিপরীত মুখে। বিদেহী দেবতার এ কী বিচিত্র লীলা!

সেদিন সকালবেলা আমি আর দাদা একসঙ্গে খেতে বসেছি। আমাদের আহার-পর্বটা আপাতত বৌদির শয়নকক্ষে। এখানে খাওয়া-দাওয়াটা সারলে তবু গৃহকর্ত্রী একটু দেখাশোনা করতে পারেন। ঘরে টেবিল আছে, সেখানে বসে খেলে হাঙ্গামাটা কমে; কিন্তু রাধাবৌদির ব্যবস্থাপনায় অনাচারের বাষ্পমাত্র অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই মাটিতে জল ছিটিয়ে ঠাঁই করেছে নীরজা, বামুনদি রেখে গেছেন দুথালা ভাত। পাশাপাশি আমরা দু'ভাই খেতে বসেছি। বৌদি বসে আছে সামনে মাটিতেই খোকনকে কোলে নিয়ে। বিজলি পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর—তবু বৌদির হাতে অকারণে একখানি তালপাতার পাখা। অকারণ আমাদের তরফে—বোধকরি বৌদির তরফে নয়।

বৌদি বলে, ভাবছিলাম মনুকে একখানা চিঠি লিখে দিই। চলে আসুক এখানে।

দাদা মুখ তুলে প্রশ্ন করেন: মনু কে?

— মনামী। মনে নেই তোমার?

— ও হ্যাঁ। তোমার যেন কী রকম বোন হয়। বিয়ের সময় দেখছি।

— পরেও দেখেছ তাকে। সুনুর বিয়েতে এসেছিল।

— তা হবে! মনে নেই। তা হঠাৎ তাকে চিঠি লেখার মানে?

— অনেক দিনই আনব আনব মনে করেছি, হয়ে ওঠেনি। এখন তো ওর কলেজের ছুটি হল, কিছুদিন এসে ঘুরে যাক্ না।

— কলেজে পড়ে বুঝি?

— হ্যাঁ, কলকাতায় একটা বোর্ডিং-এ থেকে।

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, বেশ, তা লিখে দাও।

দাদা না চিনলেও আমি চিনেছি মেয়েটিকে। এর অনেক কথা অনেক প্রসঙ্গে শুনতে হয়েছে আমাকে বৌদির কাছে। মেয়েটির একটি আলেখ্যই আঁকা হয়ে আছে আমার মনের ক্যানভাসে। সে ছবি ম্লান হবার উপায় নেই। সুযোগ আর সুবিধা পেলেই কিছুদিন পর পর বৌদি বসে যায় ইজেল-ব্রাশ নিয়ে পোর্ট্রেটটাকে মেরামত করতে। নিজের জীবনে বৌদি যা কিছু পায়নি—তাই সে অসঙ্কোচে আরোপ করে এই বোনটির ওপর। বুদ্ধিতে এমন মেয়ে নাকি হয় না। বৌদির সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা অবশ্য নেই। ওর বাবার একজন বড় যজমানের মেয়ে। সম্পর্কটা রক্তের নয়—রাগের, অনুরাগের। মনু ছেলেবেলা থেকেই পিতৃমাতৃহীনা। বৌদিকে ডাকত দিদি বলে। এখন সে সাবালিকা, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী। কলকাতায় থেকে পড়ে। কতবার কত প্রসঙ্গে এই মেয়েটির রূপগুণের সুখ্যাতি শুনতে হয়েছে বিস্তারিত। ঠাট্টা করে বলেছি : তুমি যা বলছ বৌদি, তাতে তো তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল মেনকা, রম্ভা, অথবা তিলোত্তমা। এমন বিদঘুটে নাম হল কেন তাঁর?

— ও যখন হয়, তখন ভবেশকাকা বিলেতে। তিনিই ফিরে এসে ঐ নাম রাখেন।

আমি বলি, তা রাখুন, কিন্তু বিলাতি নামেই মেয়ে কিছু মেমসাহেব হয়ে উঠবে না।

বৌদি চোখ বড় বড় করে বলে, তাই ওঠে ঠাকুরপো। নেহাত শাড়ি পরে থাকে বলে ওকে বাঙালি বলে চেনা যায়। না হ'লে—

আমি বলি, থাক্ থাক্।

— তুমি দেখনি, তাই বিশ্বাস করছ না। দেখলে বুঝতে।

তারপর মুখ টিপে হেসে বলে, তোমার মতো ছেলেকে মুখে লাগাম দিয়ে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে।

আমি আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ভান করি। বলি, বানান করে বল বৌদি, কী বলছ, চরিয়ে না চড়িয়ে?

বৌদি খিলখিল করে হেসে বলে, দুই-ই। রূপ দেখে যখন মাথা ঘুরে যাবে, তখন চড় না চালালে ঠিক মতো চরানো যাবে কী করে?

আমি হেসে বলি, থাক বৌদি, সুন্দরী মেয়েতে কাজ নেই আমার। ওরা সব পটের বিবি—দেওয়ালে অথবা আলমারিতেই ওদের মানায় ভালো। আমার ঘরে যে আসবে সে যেন তোমার মত শান্ত লক্ষ্মীশ্রী নিয়েই আসে। তীব্র বিলিতি সেন্টের চেয়ে কালাগুরুর গন্ধই আমার ভালো লাগে বেশি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বৌদি। ঠাট্টার বাষ্পটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হয় নিমেষে; বলেঃ ও বাহাদুরিটা নাইবা দেখালে ঠাকুরপো! গরিব-ঘরের সাধারণ ছেলেদের ওপর ও ভারটা থাক না। তোমরা, রাজপুত্রেরা, আর হাততালি নাইবা কুড়োলে ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়ে ঘরে এনে।

জবাব দিতে পারিনি। বুঝি, অনবধানতায় আঘাত করে বসেছি ওর বেদনতন্ত্রীতে।

কদিন পরে কলেজ যাওয়ার সময় বৌদি আমায় ডাকে : আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো?

আমি এগিয়ে আসি : এভাবে প্রশ্ন করার মানে?

— তোমার ছুটি কটায়?

— রোজ যা হয়, চারটে দশে।

— শেষ ঘণ্টাটা কামাই করতে পার না?

— পারি, যদি তুমি হুকুম কর। কেন, কী করতে হবে?

— আজ সাড়ে চারটের লোকালে মনু আসবে। ওঁকে স্টেশানে পাঠাব যে ভেবেছিলাম; কিন্তু ওঁর বুঝি কী কাজ আছে বিকালে। তুমি যেতে পারবে? মনু অবশ্য চালাক মেয়ে—নিজেই হয়ত খোঁজ করে চলে আসতে পারবে। তবু আমাদের কারও স্টেশানে যাওয়া উচিত; নয়?

একটু ইতস্তত করে বলি, কিন্তু তোমার বোনকে আমি চিনব কী করে?

বৌদি মুখ টিপে হেসে বলে : চারটের লোকালে কি একগাড়ি মেনকা-রম্ভা নামবে বলে আশঙ্কা হয় তোমার?

— তার মানে?

— কথাটা তুমিই বলেছিলে একদিন। অনেকদিন অবশ্য দেখিনি মনুকে। এখন দেখতে কেমন হয়েছে জানি না। তবে রম্ভা কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক, নজরে তোমার পড়বেই। টিপে না দেখলেও বুঝতে পারবে মনে হয়।

আমি রাগ করে কী একটা কথা বলতে যাই। হঠাৎ বৌদি আমার হাত দুটি ধরে বলে, রাগ করনা ভাইটি। তোমার সঙ্গে যে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক।

— হোক, তাই বলে একজন বাইরের ভদ্রমহিলাকে নিয়ে—

— সে আমারই তো বোন। তা কী করব বল ভাই, সেই ঠান্‌দিদের আমলের মানুষ। আমার ঠাট্টা-তামাসাগুলো একটু সেকেলে তো হবেই। এজন্যে তুমি তোমার দাদার মতো যেন আমাকে ঘেন্না কোরো না—

ব্যথিত হয়ে বলি, এমন করে বোলোনা বৌদি, ছিঃ!

হঠাৎ আমার ভাবান্তরে বৌদিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয় কথাটা : তাছাড়া মেয়েদের কামরা থেকে একা মেয়েছেলে নামবে—সে তুমি দেখলেই চিনতে পারবে।

অগত্যা রাজি হয়ে যাই।

— দেখ, যদি কলেজ কামাই করলে কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে না হয় থাক।

— না অসুবিধা আর কী। ঠিক আছে।

বৌদি মুখ টিপে হাসে আবার।

— হাসছ যে?

— ওমা, কই হাসলাম?

— না, তুমি হেসেছ।

— আর একদিনের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

— কোনদিন?

— অনেকদিন আগেকার কথা। মনে আছে তোমার? মনসাতলায় দিয়াশিনী মায়ের ভর হয়। সেখানে নিয়ে যেতে বলেছিলাম তোমাকে, তুমি রাজি হওনি। পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে।

বললাম, দেখ বৌদি, তুমি যা ভাবছ তা নয়। মনসাতলায় তোমাকে নিয়ে যেতে চাইনি অন্য কারণে। দাদা এসব পছন্দ করেন না।

— জানি ঠাকুরপো! কিন্তু আমি যা কিছু পছন্দ করি—তোমার দাদা তো তাই অপছন্দ করেন। আমার ইচ্ছে বলে কি কিছুই থাকবে না?

— কেন থাকবে না? এই যে তুমি তোমার বোনকে আনতে চাইলে—দাদা তো এককথায় রাজি হ'য়ে গেলেন।

বৌদি ম্লান হাসে : কেন রাজি হয়েছেন জানো? ওঁর সেই মহাভারত লেখার সুবিধা হবে বলে। কলেজ ছুটি হ'লেই তুমি বাড়ি যাবে, এখন একা বাড়িতে আমার সময় কাটতে চাইবে না—হয়ত সারাদিন বিরক্ত করতে চাইব ওঁকে। তাই আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে মনুর আসায় ওঁর আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। যত ভাবো তোমার দাদা গোবেচারি লাজুক, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

আমি হেসে প্রতিবাদ করি : এতো মজা মন্দ নয়। দাদা গররাজি হলে তখন বলতে তোমার কোনো ইচ্ছাই মেনে নেন না তিনি।

— সব কথা তোমাকে যে বলা যায় না ঠাকুরপো।

চুপ করে যাই, তারপর বলি : তবে আনছ কেন তোমার বোনকে?

— কী করব? সময় তো কাটাতে হবে। যে লোক ভালোবাসে না তার কাছে যাওয়ার যে কী বিড়ম্বনা....

হঠাৎ থেমে যায় বৌদি। আমিও অপ্রস্তুত। এজাতীয় খোলাখুলি কথা বৌদি কখনও বলে না! হঠাৎ সামলে নিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, ওমা সওয়া দশটা বেজে গেছে; যাও যাও, তোমার দেরি হয়ে যাবে!

* * *

সাইকেল রিক্সাটা স্টেশন চত্বরে প্রবেশ কয়ার আগেই এসেছে ট্রেনটা। মানুষজন সার বেঁধে বেরিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। বিব্রত বোধ করি। আর একটু আগে আসা উচিত ছিল। এখন বৌদির বোনকে খুঁজে বার করা মুশকিল। লেডিজ কামরা থেকে একা মেয়ে কে নেমেছে তা আর জানতে পারা যাবে না! স্টেশনবাসটার গলায় ফার্স্ট গিয়ারটা আটকে গেছে, ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টর হাঁকছে—জজকোর্ট—হাইস্ট্রীট—কদমতলা—

জনবহুল স্টেশন চত্বরটার চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে আরও অসহায় মনে হল। অল্পবয়সি মেয়ে অবশ্য নজরে পড়েছে অনেক! গায়ে গায়ে লেগে মানুষ চলেছে। সাইকেল-রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি অথবা বাসে উঠছে। কেউ রওনা দিচ্ছে পায়ে হেঁটেই। কে একা এসেছে, কে সঙ্গীর সাথে চলেছে বোঝা দুষ্কর। আমার বিক্সাওয়ালার সাথে যাতায়াতের দরদাম করাই ছিল। তাকে অপেক্ষা করতে বলে চারদিক খামোখা একবার ঘুরে আসি। বৃথা চেষ্টা। ফিরে এসে রিক্সায় বসে বলি : নে চল্।

স্টেশন এলাকা থেকে বড় রাস্তায় পড়েই দেখি মোড়ের পুলিসের নির্দেশে দাঁড়িয়ে গেছে রিক্সার সারি! যেন একটা সরীসৃপ বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রিক্সা দাঁড়িয়েছে একের পিছে এক, একের পাশে আর এক। আমার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো একখানি ত্রিচক্রযান। বসে আছে একটি মেয়ে। আড়চোখে দেখেই চম্‌কে উঠলাম। এ নয় তো? বছর বিশেক বয়স। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। বাঙালি মেয়ের পক্ষে এতটা উগ্র ফর্সা রঙ যেন বিধাতার একটা বাড়াবাড়ি। বিকালের পড়ন্ত রোদটা ঠেকাতে একটা হাত রেখেছে চোখের ওপর আড়াল করে। যেন হাতির দাঁত কুঁদে বার করা হয়েছে হাতখানি। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখের পাশ দিয়ে কুণ্ডলায়িত একটা কুন্তলচূর্ণ অসোয়াস্তিকর ভাবে দুলছে; আধুনিকতার একটা সপ্রতিভ ছাঁদ ওর সর্বাঙ্গে। মেয়েটিও গ্রীবা হেলনে আমাকে লক্ষ্য করল যেন একবার। চোখাচোখি হল। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেম না। ওর ঠোঁটের কোণায় খেলে গেল একচিলতে চাপা হাসির বিদ্যুৎ। আমি তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। এরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকার যে অন্য একটা অর্থও হতে পারে তা মনে ছিল না। হঠাৎ মেয়েটি লক্ষ্য করলে আমার হাতের বইখাতাগুলো—একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে : আপনি কি এখানকার কলেজে পড়েন?

ওর চোখে-মুখে চাপা হাসিটা তখন লেগে আছে।

—হ্যাঁ, কেন?

—প্রফেসর রায়ের বাসাটা চেনেন? বাইওলজির—

কথাটা তার শেষ হয় না। আমি অস্ফুটে বলি : মনামী!

মেয়েটির মুখে বিস্ময়। অপরিচিত পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিটা সম্ভবত তার সয়ে গেছে। কিন্তু নিজের নামটা এভাবে শোনা তার অভ্যাস নয় বোধকরি। ভ্রূ কুঁচকে ওঠে ওর। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। এসব লক্ষ্য করিনি সে সময়। পরে ঘটনাটার কথা যখন ভেবেছি, তখন মনে পড়েছে এসব।

ও বলে : আপনি আমাকে চেনেন বুঝতে পারছি। আমি আপনাকে চিনি না।

আমি কিছু বলার আগেই সামনে—পিছনে রিক্সার সারি একদল রাজহাঁসের মতো কলস্বরে ডেকে ওঠে—গতির নির্দেশ পেয়েছে ওরা!

আমার রিক্সাটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে নেমে আসি। বলি, প্রফেসর রায়ের ছোট ভাই আমি। আপনার সন্ধানেই স্টেশনে এসেছিলাম।

মনামীর কুঞ্চিত ভ্রূযুগল অবশ্য সরলায়িত হয় না। সম্মুখের দিকে চেয়ে ও নির্বিকারভাবে বলে, ও কিন্তু জামাইবাবুর কোন ভাই ছিল শুনিনি তো কখনও।

—সেটা জামাইবাবুর ভায়ের দুর্ভাগ্য। বৌদির যে বোন আছেন এটা টীকা-টিপ্পনী সমেত আমার জানা আছে বহুকাল।

—বুঝলাম। কিন্তু আপনি তো ইতিপূর্বে আমাকে কখনও দেখেননি, চিনতেন কী করে যে রিসিভ করতে এসেছেন?

—শুনেছিলাম, হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে খুঁজে নেওয়া যায়।

ওর ঠোঁটের কোণার সেই চিকচিক হাসিটা ফিরে আসে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গেই মিলিয়ে যায় ভ্রূর কুঞ্চনরেখাটা। রুপালি পর্দায় যেন ফেড ঈন—ফেড আউট। দাঁত দিয়ে আবার ঠোঁটটা কামড়ে কী যেন ভাবতে থাকে। আমি বলি, দুখানা রিক্সার ভাড়া মিছিমিছি গুনে কী হবে। আপনি এটায় এসে বসুন। একসঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাই। থাক, থাক, আমিই ভাড়াটা মিটিয়ে দিচ্ছি ওকে।

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি মনামী বলে : ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।

—আচ্ছা, না হয় বাড়ি গিয়ে হিসাবটা মিটিয়ে দেবেন আমাকে।

পকেট হাতড়ে একটা দোয়ানি বার করে ওর রিক্সাওয়ালার প্রসারিত করে অর্পণ করার উদ্যোগ করি। ও বুঝে নিয়েছিল সোওয়ারি তার সাথি পেয়েছে।

মনামী হঠাৎ রূঢ় কণ্ঠে ওর রিক্সাওয়ালাকে ধমকে ওঠে, থামলে কেন? চলো তুমি।

রিক্সাওয়ালা নিজেকে সামলে নেয়। আমিও। ও প্যাডলে চড়ে বসে বলে, কিন্তু কোনদিকে যাব তা তো বলবেন?

মেয়েটি আবার ধমকে ওঠে, ভাড়া করার সময় যে বললে তুমি খুঁজে নিতে পারবে?

অপমানটা নিরাবরণ। বুঝলাম, আধুনিকতার যে বিজ্ঞপ্তিটা আঁটা রয়েছে ওঁর সর্বাঙ্গে সেটা মজ্জার সঙ্গে মেশা নয়—সজ্জার মতোই আরোপিত। প্রগতি ওঁর রুজ-পাউডার-লিপস্টিকেই সীমিত। একা পথে বার হন বটে তবে অনাত্মীয়ের সঙ্গে এক রিক্সায় চড়লে এঁদের আজও জাত যায়। খুরওয়ালা জুতো খুটখুট করে একশ্রেণীর অতি-আধুনিক জীবকে আজকাল ঘুরতে দেখা যায় হকার্স কর্নারে আর মার্কেটে—যাঁদের কনুইয়ের গুঁতো থেকে আত্মরক্ষার্থে পথচারীরা স্বতই তৎপর—অথচ সত্যিকারের আধুনিকতার প্রমাণ দেবার ডাক এলে দেখা যায় যাঁদের সব ফুটানিই সঙ্কুচিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ক্ষুদ্রায়তন হাত-বটুয়ায়—ইনি তাঁদেরই সমগোত্রীয়া। মনে মনে হাসি। রিক্সাওয়ালাকে বলি, কী হে, বলেছিলে একথা? বাড়ি খুঁজে নেবে?

রিক্সাওয়ালাও তিরিক্ষে মেজাজ দেখায়। দেখাবে না কেন? ধমকটা এবার তো আর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে বর্ষিত হয়নি। বলে, বাড়ি তো বাবু খুঁজে নিতে পারি, কিন্তু কোন পাড়ায় যাবেন তা তো উনি বলবেন? গোটা টাউন তো ওঁকে টেনে টেনে দাবড়ে বেড়াতে পারি না!

ওর সওয়ারি গর্জে ওঠে, কোন পাড়ায় যাব, আর কোন বাড়িতে যাব দেখিয়ে দিলে খুঁজতে পার তুমি? খুব বাহাদুর তো?

আমি রিক্সাওয়ালাকেই উপদেশ দিই, শোন্, পুরুষমানুষ সওয়ারি তুললে জিজ্ঞাসা করিস, কোথায় যাবে। কোন পথে, কোন পাড়ায় যাবে। একা মেয়েছেলে দেখলে কখনো ও কথা জিজ্ঞাসা করবি না। মায় কার বাড়ি যেতে চায় তাও জানতে চাইবি না। মুখ দেখে বুঝে নিতে হবে। না হলে ওঁদের একা পথে বার হওয়ার বাহাদুরিটা ম্লান হয়ে যায়। বুঝলি?

রিক্সাওয়ালাটা যেন ডেন্টিস্টের কাছে এসেছে চিকিৎসা করাতে!

—আয় বাবা, আর ঝকমারি বাড়াসনে! আমার পিছু পিছু আয়!

আগুপিছু দুখানা রিক্সা চলতে থাকে আবার। এ আঘাত মেয়েটির স্বোপার্জিত। রঙটা কটা বলে পথচারীদের বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত, হয়তো মনে করে দুনিয়ায় সব ছেলেই ওর সঙ্গে ভাব করতে চায়। ওর গা ঘেঁষে বসতে পেলে বুঝি পৃথিবীর তাবৎ হাপিত্যেস ছেলের দল মোক্ষলাভ করবে। ভুলটা তার ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার, আজকের অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পথ চলতে হ'লে প্রতিটি আধুলি কিভাবে বাঁচে তা আমাদের খেয়াল করতে হয়। পথের সাথি কে হল এ নিয়ে এ যুগের ছেলেদের মাথাব্যথা নেই। হোক সে সুন্দরী তন্বী, হোক না কেন পঙ্গু বৃদ্ধা। প্রমোদ ভ্রমণে লক্ষ্যটা থাকে উপলক্ষ্য, সেখানে সঙ্গী-সাথির সান্নিধ্যটাই বড় কথা। দুনিয়ার ওমনিবাসে আমরা যে আজকাল ঝুলতে ঝুলতে দশটা-পাঁচটা করছি, এখানে আমরা খেয়ালও করি না কে চলেছে আমার পাঁজর ঘেঁষে। পথ আমাদের দুর্গম। এ পথে চলতে আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে, ঝরঝর করে ঝরছে ঘাম। সেই স্বেদেই আবার পিচ্ছিল হচ্ছে পথ। এ পথে যদি একসাথে পা ফেলতে চাও তাহলে এগিয়ে এস। দৃঢ়মুঠিতে ধর আমাদের কঠিন কব্জি। আর তা যদি না পার, তবে পথে বেরিও না সোনামণি! আলতা পায়ে, সিঁদুর লেপ্টে, শাঁখা-নোয়া-ঘোমটা সমেত—ঐ তোমাদের ফুটানির হাত-

বটুয়া আঁকড়ে অপেক্ষা কর ঘরের কোণে। আমাদের একলা চলতে দাও, পথে নেমে পায়ে পায়ে জড়িয়ে জিব কেটো না। ভয় নেই, ফেলে পালাব না তোমাদের। সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে গজমতীর হার এনে যে ঘরের কোণের রাজকন্যার গলাতেই দোলাতে হয়—এ শিক্ষা ঠিকই পেয়েছি ছেলেবেলায়, মা-ঠাকুরমার কাছে। অতটা ক্ষমতায় কুলায় না বটে—তবে হাঁউ-মাউ-খাঁও করে বড়বাবুর হাত থেকে মাসকাবারি জীয়নকাঠিটা যখন ছিনিয়ে আনি তখন তোমাদের পায়েই ঢেলে দিই তা। দিই না? থাকো' তোমার ঘরের কোণেই। জার্মানির কারখানায়, চীন কিম্বা রাশিয়ার যৌথ-খামারে আর প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যেমন করে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছিল পুরুষের কাঁধে কাঁধ ঘষে, পার তো তেমনি করে এগিয়ে এস; আর তা যদি না পার, তবে সুস্থির হয়ে গিয়ে বস ঘরের কোণে—যেমন বসে থাকতেন তোমার মা, আমার ঠাকুরমা। হাত-বটুয়ার ভ্যানিটি আর খুরওয়ালা জুতোর এ্যাম্বিশান সম্বল 'উইমেন্‌স্ লিব্'-এর কপচানিটা বন্ধ থাক্!

—এই রোখ্‌কে।

পর পর দুখানি রিক্সা এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। পিছনের রিক্সাওয়ালাকে বলি, এই বাড়িই।

মেয়েটি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস হাতে গটগট করে চলে যায় ভিতরের দিকে। ভঙ্গিটা গট্‌গটের—আওয়াজটা যদিও খুটখুটের। আমি নামলেম কিনা ফিরেও দেখে না। ওর রিক্সাওয়ালা বলে, আর দুআনা?

ও ঘুরে দাঁড়ায়।

সত্যিই গর্ব করার মতো রূপ আছে মেয়েটির। মুখটা থমথম করছে এখনও। বলে, স্টেশনে যে তুমি বললে দশ আনা নেবে?

—তখন কি জান্তাম এ্যাদ্দুর আসতে হবে? বাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কত রেট!

আমি ততক্ষণে এক টাকার একটা নোট আমার রিক্সাওয়ালার হাতে দিয়ে চলতে শুরু করেছি বাড়ির দিকে।

—ওই দেখুন উনি একটাকা দিলেন।

ও আবার দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। বটুয়া হাতড়াচ্ছে খুচরো পয়সার সন্ধানে। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বিমূর্ত স্বগতোক্তি করি, ওকে আমি কলেজ থেকে স্টেশন ঘুরে আসার ভাড়া দিয়েছি আট আনা হিসাবে।

তারপর রিক্সাওয়ালাকে বলি, একা মেয়েছেলে পেয়ে দু-আনা ঠকিয়েছিস। আর ঠকাসনে বাবা। অধর্ম হবে। কেন জুলম করছিস?

মনামী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হাতটা টেনে নেয়। চলতে থাকে আবার। রিক্সাওয়ালা বলে, জুলুম কেন করব স্যার? এ তো চেয়ে নিচ্ছি, বক্‌শিস।

আমি বলি, সে কথা আলাদা।

মনামী আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। বটুয়া হাতড়ে বলে, আর পাবে না! ভাঙানি নেই—

আমি সেই দোয়ানিটা রিক্সাওয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলি, নে বাবা, তোরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক!

উঠে যাই ওপরের ঘরে।

চার

কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সামলে নিলুম। শোধ নেওয়া যাবে সুযোগমতো!

ব্যাগটা নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল রাধাদির সঙ্গে! কী রোগা হয়ে গেছে রাধাদি!

—ওমা, তুই এসে গেলি? একলা? ঠাকুরপো যায়নি স্টেশনে? ওমা, কী সুন্দর হয়েছিস তুই আজকাল। বাড়ি খুঁজে পেলি কী করে?

এতগুলো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমিও প্রতিপ্রশ্ন করি—জামাইবাবু কোথায়? তোমার বাচ্চা?

বাচ্চাটা ছিল ছোট একটা বেবি-কটে। তুলে নিলুম। সুন্দর ফুটফুটে। কে বলবে রাধাদির বাচ্চা!

—ওমা, কী চমৎকার হয়েছে! চিবুকটা ঠিক তোমার মতো।

রাধাদি বলে—একটু রোগা হয়ে গেছে।

বলি—উঃ, কতদিন পরে দেখা হ'ল।

ও হেসে বলে—তা বটে। 'গাঙে গাঙে দেখা হয় তো বোনে বোনে হয় না।'

হেসে বললুম—তোমার স্বভাবটা আজও বদলায়নি। ঠিক তেমনি ছড়া কাটো দেখি।

ঘরোয়া গল্পে দুজনে মেতে উঠি। একটু পরেই জামাইবাবু ফিরলেন।

বললুম, চিনতে পারেন?

—পারি, না পারার কারণ নেই।

—কে বলুন তো?

—নামটা যে বলতে পারব না।

—কেন? আমি কি আপনার ভাশুর?

—না, কিন্তু এম-এসসি পড়ার সময় সখ করে কিছুদিন ফ্রেঞ্চ শিখেছিলাম। তোমার নামটা বলতে ভয় পাই—পাছে ভুল বুঝে বস।

দুজনেই হেসে উঠি। রাধাদি বলে—কী ব্যাপার?

জামাইবাবু আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—তোমার বোনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ।

রাধাদি প্রশ্ন করে—কী রে?

কী বলব? এড়িয়ে গিয়ে বলি—সে তুমি বুঝবে না।

রাধাদি গম্ভীর হয়ে যায়। জামাইবাবু একটু গল্প করে উঠে যান জামাকাপড় ছাড়তে।

দুদিনেই লক্ষ্য করলুম সংসারের চাকায় জং ধরেছে। মসৃণতা নেই তার গতিচ্ছন্দে। দিদির মন নেই সংসারে। বাচ্চাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাছাড়া সব বিষয়েই কেমন আনমনা। উদাসীন। ঘরের এখানে-ওখানে ঝুল জমেছে। ময়লা পড়েছে। কেউ সাফ করায় না। জামাইবাবুর এসব খেয়াল নেই। কোন পুরুষমানুষেরই বা থাকে! সংসারের সঙ্গে তাঁর দু-তরফা সম্পর্ক। আহার ও নিদ্রা। বাকি সময়টুকু সংসার এবং তাঁর অক্ষিতারকার মাঝখানে থাকে একটা ব্যাফল-ওয়াল। ইট নয়, অক্ষর দিয়ে গাঁথা বিজ্ঞানের বই।

জঞ্জাল আমার ধাতে সয় না। ঘরদোর সাফ করলুম কদিন ধরে, ঝাড়লুম ঝুল। ফ্যানের ব্লেড সাফ করলুম সাবান দিয়ে। জানলাগুলোর পর্দা কিনে আনা গেল জামাইবাবুর সাহচর্যে! টাঙানো হল সেগুলি। ছবিগুলো একদিন ঝাড়ামোছা করা গেল। দিদির অবশ্য সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। দুর্বল। চেয়ে চেয়ে দেখলে আমার মালিন্য-বিদায়ের পালা—সপ্রশংস দৃষ্টিতে।

রবিবার। জামাইবাবু বললেন—আজ আমি বাজার করব। মাংস খাওয়া হয়নি অনেকদিন। মুখ বদলাতে চাই। মনু মাংস রাঁধতে জান?

আমি বললুম—মাংস আর একদিন হবে। আজ আপনার আলমারির বইগুলো রোদে দেব। একা হাতে পারব না। সাহায্য চাই।

উনি বলেন—বেশ তো, চল। হাতে হাতে বইগুলো নামিয়ে ফেলি।

গাছকোমর করে কাপড় সাঁটি। র‍্যাক থেকে উনি বই পাড়তে থাকেন। বিছিয়ে দিই সেগুলো রোদে।

রাধাদি এসে দাঁড়ায়, বলে—আমিও লেগে যাব নাকি তোমাদের সঙ্গে?

জামাইবাবু বাধা দিয়ে বলেন—থাক বাপু! তুমি আর ঐ শরীর নিয়ে এর মধ্যে এস না। সুবিমলকে বরং ডেকে দাও।

রাধাদি জবাব দেয় না। ডাকতে চলে যায়। কেউই ফিরে আসে না কিন্তু। আমরা দুজনেই নামিয়ে ফেলি বইগুলো শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ জামাইবাবু বলেন—কই, সুবিমল তো এল না?

আমি নিরুত্তর। জানতুম ও আসবে না। ঈর্ষা, না অভিমান?

জামাইবাবু বলেন—তুমি তো কদিনেই ঘরদোরের চেহারাটা বেশ পালটে ফেলেছে। রুচিবোধ থাকলে সামান্য জিনিসেই কেমন ছিমছাম থাকা যায়। এই সেন্সটা তোমার দিদির নেই। নিজের দেহ থেকে শুরু করে কোনো কিছুই প্রপার অর্ডারে সাজিয়ে রাখার দিকে উৎসাহ নেই।

আমি দিদির পক্ষ নিয়ে বলি—করবে কোত্থেকে বলুন। ওই তো ওর স্বাস্থ্য। ঘরদোরের যত্ন সে নেবে কখন?

—কিন্তু স্বাস্থ্যও তো ভেঙেছে ঐ একই কারণে। শী ডাজন্ট কেয়ার ঈভন ফর হার হেল্‌থ।

—এটা আপনি অন্যায় বলছেন। আফটার অল শী এলোন কান্ট বি রেস্‌পন্সিবল ফর হার প্রেজেন্ট স্টেট অফ হেলথ্‌।

—শী এলোন ইজ্‌। সেইটেই তো সব চেয়ে দুঃখের কথা মনামী। তোমার দিদিকেই না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ।

এ কথার জবাব না দেওয়াই শোভন।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর যে মিল হয়নি এটা বোঝা যায়। আমারও নজরে পড়ে সেটা। এরকমটা না দেখলেই অবাক হতুম। এটা কিন্তু জামাইবাবু অন্যায় বলেছেন। রাধাদির স্বাস্থ্য ভাঙার জন্য সে একা দায়ী হতে পারে না। মাতৃত্ব। সুতরাং অধ্যাপক অবনীমোহনও দায়ী।

সে যাই হোক, দিদির একটা বিরাট ত্রুটি আছে। অমার্জনীয় অপরাধ। জামাইবাবুর মন রাখবার একটুও চেষ্টা করে না। বোকামী! যত যাই বলি না কেন, পুরুষের ভালোবাসা কেড়ে নিতে হয় জোর করে। সে কী ভালোবাসে, কী পছন্দ করে এটাও জানতে হয়। নইলে কী দিয়ে বাঁধবে তাঁকে? হ্যাঁ, ঈশ্বরদত্ত সম্পদ যদি তোমার থাকে তো সে আলাদা। তোমাকে দেখেই যদি সে—'দেহি পদবল্লব' বলে লুটিয়ে পড়ে তবে অবশ্য তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু রূপ তো সকলের নেই। তাই সামলে চলতে হয়। জামাইবাবু একটু ছিমছাম ভালোবাসে। দিদির পাউডারের কৌটোয় পাউডারও—দিদির ভাষায়—'বাড়ন্ত'! আজ না হয় তার শরীর ভেঙেছে—সুস্থ থাকলেও নাকি জামাইবাবুর সঙ্গে পথে বার হত না, ওঁর ছাত্ররা কী ভাববে! বাড়াবাড়ি। কী আবার ভাববে? ভাববে যে, অধ্যাপকমশাই সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছেন। দুদিনের জামাইবাবুর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিলুম আমি—আর আজ আট বছরেও দিদি তাঁকে চিনল না। নিজে থেকে তো বোঝেই না, ভালো করতে গেলেও কান দেবে না। সেদিন বললুম—চুলগুলো কী করে রেখেছ দিদি, হয় আমার মত ছেঁটে ফেল, নয় জট ছাড়িয়ে যত্ন নাও। এস বেঁধে দিই।

বললে—থাক ভাই। আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের সাজন-গোজন চলুক।

সত্যি দুঃখ হয় জামাইবাবুর জন্যে। অবশ্য দায়ী তিনি নিজেই। সম্পূর্ণ ভাবে। কী দরকার ছিল এই ফলস্‌ শ্যিভালরির? সোসাইটিতে কি মেয়ে ছিল না ওঁর আমলে? উনি জীবনকে দেখতে চান চার দেওয়ালের বাইরে। বৃহত্তর পটভূমিকায়। সেখানে দিদি এসে ওঁর পাশে দাঁড়াতে পারে না। দুধের স্বাদ উনি ঘোলে মেটান। আমাকে টেনে নিয়ে যান বেড়াতে। সিনেমায়। মার্কেটে অথবা জলসায়। আমি আপত্তি করি না। ভালোই লাগে নতুন সোসাইটিতে মিশতে। আরও একটা কারণে সেজেগুজে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগে। একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ জানলা দিয়ে লক্ষ্য করে আমাদের। মনে মনে হাসি;—অভিমান, না ঈর্ষা?

প্রথমদিন থেকেই ও এড়িয়ে চলেছে আমাকে। লোকটা অসভ্য। প্রথমদিনই ওকে চিনে নিয়েছি। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়েছিল কেমন! ব্রুট! দুচক্ষে দেখতে পারি না এই হ্যাংলামি। এক লহমার আলাপে ও মনে করেছিল ওর পাশে বসব রিক্সায়। দুঃসাহস। ও এখন ভোল পালটেছে। ভুলেও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। এ চালও বুঝি আমি! অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। ও এমন ভাব দেখায় যেন বাড়িতে যে একটা লোক বেড়েছে এটা ওর খেয়ালই নেই। খেয়াল যে তোমার আছে এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও আছে আমার ঘটে। তুমি নিজেই তো স্বীকার করেছ বাছা, 'হাজার লোকের মধ্যে সে কথা খেয়াল হয়।'

দিদি সেদিন প্রশ্ন করলে—ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর কোনো আলাপ হয়নি?

বললুম—কেন হবে না? হয়েছে।

—তবে ওর সঙ্গে কথা বলিস না যে?

—বলব না কেন? তবে অহেতুক বকবক করার তো কোনও কারণ নেই। ভালো কথা, কলেজের তো ছুটি হয়ে গেছে। তোমার পাতানো দেওরটি বাড়ি যাচ্ছেন কবে?

—কেন, ওকে তাড়ালে তোর কী লাভ?

—না, তাড়াবার কথা হ'চ্ছে না। তবে লোক যত কমে সংসারটা ততই হালকা হয়। আমার ঝামেলা কমে। উনি অহেতুক এখানে মাটি কামড়ে কেন পড়ে আছেন তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

দিদি হাসে। বলে,—হয়তো লোভনীয় কোনো কিছুর সন্ধান পেয়েছে এখানে। তাই বাড়ি যেতে মন সরছে না।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বলি—সেইটে তাহলে বুঝিয়ে দিও তোমার দেওরকে। এখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। এ বড়ই কঠিন ঠাঁই।

দিদি ওকে কিছু বলেছে কিনা বোঝা গেল না। লোকটা কিন্তু নড়বার নাম করে না। আমাকে যে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা করে সেটা জানানোর জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র। সেদিন বিকেলে দিদির সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ ও ঘরে ঢোকে। নিজের একটা বুশকোট দেখিয়ে বলে—বৌদি, এ বোতামগুলি তুমি লাগিয়ে দিয়েছ?

দিদি লক্ষ্য করে বলে—না তো? কেন?

ও হাসে। বলে—তবে বোধহয় ধোপানীই লাগিয়ে দিয়েছে। আর ধোপানী ছাড়া এমন রুচি হবে কার? সাদা বুশকোটে হলদে রঙের বোতাম!

হাতে ছিল একটা ব্লেড। পটপট করে বোতামগুলো কেটে রেখে দিল আমাদের দুজনের সামনে। হাসতে হাসতে চলে যায় নিজের ঘরে।

দিদি জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে, তুই লাগিয়ে দিয়েছিলি?

বলি—দায় পড়েছে ওর জামায় হাত দিতে।

ধোপাবাড়ি থেকে জামাকাপড়গুলো এলে ভাঙা বোতাম মেরামত করে রাখি। অবশ্য ওর জামাতে হাত দিতে ভারী গরজ আমার। এটাকে বোধহয় জামাইবাবুর জামা বলেই মনে হয়েছিল। কী জানি, মনে নেই। মনে নেইই বা কেন? নিশ্চয়ই তাই। না হলে ছুঁতেই ঘৃণা হত আমার। সমস্ত বাড়ি ঝাড়ামোছা করেছি—বাকি আছে একখানি মাত্র ঘর। ও ঘরখানাতে ঢুকিও না আমি।

কিন্তু ওর স্পর্ধা দিন দিন সীমাহীন হয়ে উঠেছে। নির্লজ্জতাও। সেদিন রাত্রে জামাইবাবু আর ও একসঙ্গে খেতে বসেছিল। দিদির ঘরেই। আমি পরিবেশন করছি। কথায় কথায় নারী-প্রগতির কথা উঠল। জামাইবাবুর সঙ্গে আমি প্রায়ই তর্ক করি। আক্রমণটা চলে পুরুষ জাতটার ওপর; লক্ষ্য করি তীরগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না! সম্পর্কটা মধুর হওয়ায় বেশ ঠেশ দিয়ে বলি জামাইবাবুকে। পার্শ্ববর্তী লোকটির গায়ে সেগুলি বেঁধে! ও কিন্তু ভুলেও একটা কথা বলে না। যেন ব্রহ্মচারীর আহার। কথা বলা বারণ। নীরবে আহার করে যায়। শেষ করে বলে—আমার হয়ে গেছে দাদা, উঠি! কী নাকেমুখে গুঁজে খায় লোকটা। আশ্চর্য!

সেদিন আলোচনাটা বেশ মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। বিষয়টা ছিল মেয়েদের সমান অধিকার সম্পর্কে। নারী-প্রগতি। জামাইবাবু বলেন—কিন্তু সমান অধিকার তো তোমরা চাও না? অবস্থাবিশেষে তোমরা সমান অধিকার দাবি কর বটে, কিন্তু বেগতিক দেখলেই লেডিজ ফার্স্ট!

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললুম—লেডিজ ফার্স্ট কথাটা আমাদের নয় জামাইবাবু! ওটি পুরুষের উক্তি! কয়েক শতাব্দী আগে 'নাইটহুড শ্যিভালরি' বলে একটা জিনিস ছিল—সেটার মানে অবশ্য আপনারা বুঝবেন না আজকাল—অভিধানে দেখে নেবেন; সেই শ্যিভালরি বস্তুটাই আজকের পুরুষমানুষের বেলায় এসে ঠেকেছে ঐ লেডিজ ফার্স্ট ম্যাক্সিমে। ওটা আমাদের দাবি নয়—আপনাদের অযাচিত দাক্ষিণ্য!

জামাইবাবু হেসে বলেন—'নাইটহুড-শ্যিভালরি' শব্দটা চেনাচেনা লাগছে বটে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, সে যুগের লেডি-ল্যভেরা নাইটদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করতেন না। তাঁরা ছিলেন অবলা সবলা; দস্তানা-খোলা নগ্ন পাঞ্জা দেখে তাঁরা মূর্ছা যেতেন! তোমরা তো তা মানো না।

—মানি নাই তো। কেন মানব? সব বিষয়েই আমরা পুরুষদের সমান হব।

—তাহলে ঐ লেডিজ ফার্স্ট ম্যাক্সিমটা শুধু 'অযাচিত' হয়ে থেমে আছে কেন, 'প্রত্যাখ্যাত' অথবা 'অগ্রাহ্য' বিশেষণে বিভূষিত হয় না কেন? সুযোগ পেলে নিতে তো ছাড়না দেখি।

—কেন ছাড়ব? ভগবান আপনাদের সবলতর করে গড়েছেন। শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, দৈহিক ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের তা দেননি।

—দেননি নাকি? কী একচোখামি। আমি তো এত কথা জানতাম না।

আমি বলি, তর্কের মাঝখানে কৌতুক করে তারাই যারা কোণঠাসা হয়। হার যদি স্বীকার করতে লজ্জা পান, তাহলে না হয় আমিই থামি।

—না না, বল কী বলছিলে।

—বলছিলুম যে, দৈহিক ক্ষমতায় আমরা অপমানের সমান হতে পারি না! সেটা ঈশ্বরের বিধান নয়। আর সব বিষয়েই আমরা সমান হব। পাখির গান গাওয়ায় কৃতিত্ব নেই—সেটা ঈশ্বরের দান। আমাকে তিনি স্বর দিয়েছেন; আমি যদি গান গাই তবেই আমার কৃতিত্ব! লেডিজ ফার্স্টের সুযোগটা আমরা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারি। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু ভেবে দেখবেন, 'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে, তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।' ওটুকু বাদ দিলে আপনাদেরই পৌরুষ হানি হয়—আমাদের হয় না।

লম্বা বক্তৃতায় ঘরটা থম্‌থম্ করত। সেটা ঘটতে দিল না সুবিমল। হঠাৎ বিষম খেয়ে বসল এই সময়। দিদি ছুটে আসে হাতপাখা হাতে। ওকে বাতাস করতে। সুবিমল সামলে নেয়। বলে থাক থাক বৌদি। তুমি অমন পাখা হাতে তেড়ে এস না। ভয় হয়, এও বুঝি মেয়েদের ব্যাকরণ-বহির্ভূত একরকমের পৌরুষ প্রকাশ।

দিদি থতমত। জামাইবাবুর হো-হো করা হাসি। তারপর হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় সামলে নেন। কথাটার মোড় ঘোরাতেই বোধ করি বলেন—আচ্ছা ধরা যাক ট্রামবাসের লেডিজ সিটের কথা। তুমি কি মনে কর মেয়েদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত?

আমার কান ঝাঁঝাঁ করছিল। সুবিমলের বিষম খাওয়াটা চালাকি, একটা অভিনয়। বুঝি সব। কিন্তু তর্ক করতে বসে চটতে নেই। ঠকতে হয় তাতে। গম্ভীর হয়ে বলি—হ্যাঁ, মনে করি।

—কেন? পৃথিবীর অন্য কোথাও তো মেয়েদের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হয় না। যতদূর মনে পড়ে দিল্লি-বোম্বাইতেও নেই। বাঙালি মেয়েদের বেলাতেই বা আইনের ঠেকা দিতে হবে কেন?

বিদ্রূপের হাসি হেসে বলি—একটু ভুল হল আপনার। আইনের ঠেকাটা বাঙালি মেয়েদের জন্য নয়।—বাঙালি ছেলেদের জন্য প্রয়োজন।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য শহরে পুরুষেরা বেশি শিক্ষিত, বেশি ভদ্র। মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে তারা নিজেরাই আসন ছেড়ে দেয়। বসতে বলে। কথাটা হয়তো নতুন লাগবে আপনাদের,—ওরা একে বলে কার্টসি। এটিকেট। বাঙ্‌লাদেশের ছেলেরা ও বস্তুটা শেখেনি। তাই তাদের ভব্যতাজ্ঞানের অভাবের পরিপূরক ওই আইনের ঠেকা।

—কিন্তু তোমরা যে সমান অধিকার চাইছ সব ক্ষেত্রে। আমাদের সাথে গা ঘেঁসে দাঁড়াতেই বা পারবে না কেন? দুনিয়ার আর পাঁচটা জাতের মেয়েরা তো তা পারে।

—পারি আমরাও। পারছিও। তবে তফাতটা কোথায় জানেন। অসুবিধা হচ্ছে আমাদের গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ানোটা এদেশের ছেলেরা দুর্লভ সৌভাগ্য মনে করে বলে। স্টেট বাসগুলোর সামনের দরজাটা লেডিজ গেট বলে সেই গেটে লোক ঝুলতে ঝুলতে চলে। অথচ পিছনের গেটের কাছে বসার জায়গা হয়তো খালি আছে! ইংলন্ডে অথবা জার্মানিতে এ দৃশ্য আপনি দেখতে পাবেন না।

—তুমি কি মনে কর লেডিজ সিটের ব্যবস্থা উঠে গেলে আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েদের বসতে দেবে না।

—হ্যাঁ, তাই মনে করি। অনুমান নয়। এর প্রমাণ আছে। লেডিজ সিট ভর্তি হয়ে যাবার পরও যখন মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে তখন তো আপনারা ভদ্রতা দেখান না।

—দেখাই। আমি আসন ছেড়ে দিই তাঁদের। অনেকেই দেয়।

—আবার অনেকেই দেয় না। বেশির ভাগই দেয় না।

হঠাৎ ঘুরে জামাইবাবু সুবিমলকে প্রশ্ন করেন—তুমি কী কর?

সুবিমল চমকে ওঠে—অ্যাঁ, আমি আপনাদের কথা ঠিক শুনছিলাম না। প্রশ্নটা কী?

বেশ বুঝতে পারি, আমাদের কথাই একমনে শুনছিল ও। ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার ভান করছে। যেন এসব ছেলেমানুষি তর্কাতর্কিতে সে কানই দিচ্ছে না। জামাইবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। ও বলে—এসব ক্ষেত্রে আপনার মতো হঠাৎ কলকাতা-আসা মফস্বলবাসী আর নিত্য দশটা-পাঁচটার অফিস যাত্রীরা মেয়েদের সঙ্গে একটু ভিন্ন আচরণ করেন।

জামাইবাবু বলেন—কে কী করেন তা তো জানতে চাইছি না। তুমি কী কর তাই বল।

—আমি? আমি এ রকম ক্ষেত্রে মহিলাটির জাত নির্ণয় করি। যদি দেখি মেমসাহেব তবে আসন ছেড়ে দিই—যদি দেখি বাঙালিনী তাহলে ছাড়ি না।

অবনক্সাস! এতক্ষণে ওর সেই বিষমখাওয়া বিকট হাসিটা আমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়। জামাইবাবুকে বলি—ওঁর দোষ নেই, স্বাধীনতার পরেও অনেকের এজাতীয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স রয়ে গেছে।

সুবিমল একবার মুখ তুলে তাকায়। কী যেন বলতে চায়। তারপর এতবড় বক্রোক্তিটাও হজম করে। আহারে মন দেয়। দিদির আর সহ্য হয় না। এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল সে। হঠাৎ যোগ দেয়। বলে—তুমি বলছ কি ঠাকুরপো, মেয়েটি যদি বুড়ি হয় তবু বাঙালি বলেই তাকে বসতে দাও না?

—না দিই না।—নির্বিকার কণ্ঠে ও বলে।

—হেতুটা! প্রশ্নটা জামাইবাবুর।

—হেতুটা এই যে, বিদেশি ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা ট্রামে-বাসে ভ্রমণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। দ্বৈতআসনের আধখানা খালি থাকলে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষকে বসতে বলে। বাঙালি মেয়েরা তা বলে না। তাঁদের একজনকে বসতে দিলে দুজনকে দাঁড়াতে হবে। একবার এসপ্ল্যানেডের মোড়ে আমি একটি আধুনিকা বাঙালি মেয়েকে সিট ছেড়ে দিই। বাকি আধখানা আসন খালিই পড়ে থাকে। আমরা দুজনেই নামলাম হাজরার মোড়ে। একটা সিনেমা হাউসে ঢুকে পর পর টিকিট কেটে পাক্কা আড়াই ঘন্টা সিনেমা দেখলাম পাশাপাশি। আবার বাড়িও ফিরলাম এক বাসে। তাঁর দ্বৈত আসনের আধখানা খালি সিটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে। এ শুধু কলকাতা শহরেই সম্ভব।

জামাইবাবু বলেন—সেই মহিলাটিকে অবশ্য আমি সাপোর্ট করছি না, কিন্তু সব মেয়েই কিন্তু এরকম নয়।

ও হেসে বলে—সব বাঙালি মেয়েই এই রকম, এ আমি অনেক দেখেছি।

—তবু, কালীঘাটের স্টপেজ থেকে আধুলি মাপের সিঁদুরের টিপ এঁটে যে সব প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা মহিলা ট্রামে বাসে ওঠেন—

—না, তাঁদের জন্যও সিট ছাড়ি না আমি। পথে যখন বেরিয়েছেন তখন পথ চলার দায়িত্ব নিতে হবে; পুরুষমানুষের পাশে বসতে যদি তাঁর আজও সংস্কারে বাধে, তবে ট্যাক্সি অথবা রিক্সায় বাড়ি যান, নিদেন হেঁটেও যেতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মন থাকাটা অপরাধ নয়। কিন্তু ঐ মন নিয়ে বিংশ শতাব্দীর অবদান এই ট্রামে-বাসে চলার সুযোগ নেবার কোনও অধিকার নেই তাঁদের। তার ওপর আরও অন্যায় করেন তাঁরা, যাঁরা ঐ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মন নিয়ে ঘোরাফেরা করেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির বেশভূষায়!

বুঝলাম, এ সবগুলিই আমার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেই প্রথমদিনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কিন্তু ওর যুক্তি অকাট্য নয়। আমার তূণেও আছে এর চোখা চোখা জবাব। কিন্তু প্রত্যুত্তর করার আগেই ও রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়ে।

কাওয়ার্ড!

পাঁচ

লৌহখণ্ড মাত্রেই চুম্বক। চৌম্বকবৃত্তি প্রতি লৌহখণ্ডের ভিতর আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুম্বক কণিকা ছোট ছোট কুণ্ডলীতে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করে। তাই বাহির হইতে প্রতি লৌহখণ্ডই যে চুম্বক এ সত্য বুঝা যায় না। বিশেষ প্রণালীতে সেই আত্মসন্তুষ্ট কুণ্ডলীগুলিকে একমুখী করিতে হয়, তখন তাহার ভিতর আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। লৌহখণ্ড চুম্বকে রূপান্তরিত হয়।

মানুষ মাত্রেই চুম্বকখণ্ড। তাহার চৌম্বকবৃত্তিও সামান্য লৌহখণ্ডের মত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষ বয়সে, বিশেষ পরিবেশে সেই আত্মসন্তুষ্ট মানুষের মনে আকর্ষণী শক্তি জাগিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টি, শ্রবণ, মনন একমুখী হইয়া যায়—নিকটবর্তী লৌহখণ্ডকে তখন সে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে। সন্নিকটবর্তী লৌহখণ্ডের প্রতি রোমকূপেও জাগিয়া উঠে অনুরূপ আকর্ষণী শক্তি।

মনামী এবং সুমিবমলের অবস্থাও আজ ঐরূপ। দুর্ভাগ্যবশত কোন বিদেহী দেবতার অভিশাপে উহারা পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। ফলে আকর্ষণের পরিবর্তে উহাদের অন্তরে জাগিয়াছে বিকর্ষণী শক্তি—'রিপালশন্'।

মনু মেয়েটি প্রাণচাঞ্চলা, শতাব্দীর পঞ্চমাংশ যে আনমনে পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না। হাসিতে খুশিতে সে যেন সর্বদাই উচ্ছল। মেয়েদের এই রূপটি আমি ভালোবাসি। নদী যেখানে হ্রদের রূপ ধরিয়াছে সেখানে আপাতদৃষ্টিতে তাহার শান্ত স্বচ্ছ রূপ মনোহর করে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে বাকি থাকে না যে, তাহার তলদেশে শুধুই পাঁক, শুধুই ক্লেদাক্ত দাম। যেখানে সে স্রোতস্বিনীর মতো উপলখণ্ডের উপর নূপুরের আঘাত হানিয়া ছুটিয়া চলে সেখানে তাহার অঙ্গে মালিন্য লাগিতে পারে না।

মনু বেড়াইতে ভালোবাসে। দোকানে দরদস্তুর করিয়া সওদা করায় তাহার শখ। প্রায় প্রত্যহই আমাকে লইয়া বাহির হয়। একাও যাইতে পারে, কিন্তু কলেজের পর সন্ধ্যাটা আমিই বা কী করি? দুইজনে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু কিনিয়া আনি। বালিশ-ঢাকা, টেবিল-ক্লথ, প্রসাধনের সাজ-সরঞ্জাম।

অনু আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। বেশ বুঝিতেছি, মনুর প্রতি আমার এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বটা সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। না পারাই স্বাভাবিক। নিজের সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন, মনুর সৌন্দর্যটাও কিছু চোখে না পড়িবার মতো নহে। অনু নিশ্চয় 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' পড়ে নাই, তবু গত শতাব্দীর সন্দেহবাতিক সংস্কার তাহার মজ্জায় মজ্জায় জড়িত। তাই, এই যে মনুর সহিত হাসি গল্প করিতেছি, তাহাকে সঙ্গে করিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে যাইতেছি, আমার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সারাংশ লইয়া আলোচনা করিতেছি—এগুলি সে সহ্য করিতে পারে না। তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইতেছে। হউক;—আমিও তাহাই চাই। সে বুঝিতে শিখুক প্রাক্‌বিবাহযুগের পৈতৃক অন্ধ-সংস্কারকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে আমাকে হারাইবার সম্ভাবনা আছে। আমার পাশটিতে আসিয়া স্থান দখল করিতে হইলে সংস্কারকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে! হয় কেক্‌টিকে খাও, নয় তুলিয়া রাখ। খাইলে রাখা যায় না, রাখিলে খাওয়া যায় না। মনামী এ সংসারে দুদিনের অতিথি, দুদিন পরে চলিয়া যাইবে। এ সংসারে তাহার কোন শাশ্বত ভূমিকা নাই। কিন্তু এই একটি দৃশ্যের অভিনয়েই সে দর্শক-মনে স্থায়ী চিহ্ন আঁকিয়া যাক। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রাখিয়া যাক আধুনিকা নারীর একটি সুন্দর উদাহরণ। নিজের চেষ্টায় অনুকে আধুনিকা হইতে হইবে। লক্ষ্য করিতেছি, মনুকে সে আজকাল আর সহ্য করিতে পারে না। ওর ধারণা—এই মেয়েটি আসিয়াই আমার মনে ভাঙন ধরাইয়া দিয়াছে। ভুল বুঝুক ক্ষতি নাই। এ ভুল সহজেই ভাঙিতে পারিব; কিন্তু এই সূত্রে সে বুঝিয়া রাখুক যে, ঘরের কোণে পানীয় জল সংরক্ষিত না থাকিলে তৃষ্ণার্ত মানুষ ঝরনাতলায় উচ্ছল পাত্রের সন্ধানে বাহির হইবেই।

আমি তো অনুর নিকট আকাশকুসুম দাবি করি নাই। যেখানে সে অপূর্ণ সেখানে সাধ্যমত পূর্ণতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাকে আমি পার্টিতে লইয়া যাইতে চাহি নাই, নাইট ক্লাবের পরিবেশে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহি না; কিন্তু আমার কোনো সহকর্মী বন্ধুর সম্মুখে চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া যুক্তকরে নমস্কার করা কি এতই কঠিন? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে চাহিয়াছিলাম সে রাজি

হয় নাই। কোনোদিনই আমার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহে নাই। আমার পায়ের তলায় আসন সংগ্রহ করাই ছিল তাহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু জীবনসঙ্গিনীকে আমি তো চরণের শৃঙ্খলরূপে পাইতে চাহি না।

অনুরাধা আমাকে ভালোবাসে—তীব্রভাবে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসা কি অপরের চোখে নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু? তুমি আমাকে ভালোবাস, তাই আমার চোখের সম্মুখে তুমি ফুল লইয়া ফুটিতে চাও, আকাশে রামধনুর মতো উঠিতে চাও। কিন্তু অনুরাধা তাহা চাহে নাই। রূপে যাহারা ভুলাইতে চাহে না, তাহাদেরও অন্যদিকে পরিশ্রম করিতে হয়—হাত দিয়া যদি দ্বার না খুলিতে চাও খুলিও না—অন্তত গান গাহিয়া সে দ্বার খুলিতে হইবে। অনুরাধার হয়তো বিশ্বাস—গান গাহিবার প্রয়োজন নাই—দ্বার আপনিই খুলিবে! মন্ত্রপাঠ করিয়াছি না? এক সঙ্গে সপ্তপদ চলিয়াছি না? কালো কোকিল যদি বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে পারিত তাহা হইলে হয়তো সৃষ্টিকর্তা তাহাকে ঐ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরটি দিতেন না। এই হইতেছে অনুর থিওরি।

তাহা ভিন্ন সেই আদিম সমস্যাটিকে উপেক্ষা করার উপায় নাই। তাহার সহিত সকল ব্যবধান যখন তিল তিল করিয়া মিলাইয়া আসে—আমাদের বিবাদ কলহের অবসানে যখন স্তব্ধ রাত্রির সঙ্গোপনে আমরা সন্ধির প্রস্তাব মানিয়া লই—তখনই সেই আদিম সমস্যাটা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। অনুর দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আমাকে উঠিয়া পড়িতে হয়—যাহাকে কাছে টানিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করি তাহাকেই শেষে জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেই। অনু কাঁদিতে শুরু করে, আমি লাইব্রেরি ঘরে উঠিয়া যাই। এক-আধ রাত্রি নহে—এ নাটকের শততম রজনী কবে যে নিঃশব্দে অভিনীত হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কেহই জানি না। এ সমস্যার হাত হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু অনুরাধা সে কথায় কর্ণপাত করে না। ধর্মের এক অদ্ভুত বিকৃত ব্যাখ্যায় জীবনকে সে জটিলতর করিতেছে। ওকে বুঝাইয়াছি, বই পড়িয়া শুনাইয়াছি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছি—কোনও ফল হয় নাই।

শেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম খোকন হওয়ার মাসখানেক আগে।

ঐসময় অনুকে নিবিড় করিয়া পাইয়াছিলাম। সকল বাধা-বন্ধন দূর হইয়াছিল। তাহাকে তখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে আর কোন বাধা ছিল না। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটিয়াছে, এখন কয়েক মাস সাবধানতার প্রশ্নই ওঠে না। তাই গল্প করিতে করিতে আমাকে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হয় না। দাম্পত্য-কলহ যেন স্বপ্নকথা হইয়া উঠিল। অনু অবশ্য কার্য-কারণের সন্ধান করে নাই। আমি যে তাহাকে দূরে ঠেলিতেছি না—আমি যে তাহার সহিত একত্রে হাসিতেছি, গল্প করিতেছি, রাত্রে একই শয্যায় শুইতেছি ইহাতেই সে সন্তুষ্ট। 'এফেক্ট' লইয়াই তাহার কারবার, 'কজ'-এর সন্ধান সে করে না।

মনে আছে, সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুকে লইয়া গিয়াছিলাম আনন্দময়ীতলায়। স্থানীয় ভূতপূর্ব রাজার পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবীপ্রতিমা। দেবীমন্দিরে ইতিপূর্বে কখনও যাই নাই। সেদিন গিয়াছিলাম। অনু পূজা দিল। পুরোহিতের নির্দেশে দুইজনে যুগলপ্রণাম করিলাম। আশীর্বাদী ফুল অঞ্চলে বাঁধিয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন সে খুশিয়াল, আনন্দে অধীর।

বাড়িতে আসিয়া অনু বলে—তুমি হঠাৎ এমন বদলে গেলে যে?

আমি বিস্মিত হইয়া বলি—বদলে গেলাম! মানে?

আমার কোলে মাথা রাখিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়ে। আমার আঙুল নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলে—তুমি বুঝতে পার না। আমি তো বুঝি। তুমি একেবারে বদলে গেছ। সবদিক থেকে। আগে আমাকে দূরে দূরে ঠেলতে, এখন একেবারে নয়নের মণি হয়ে গেছি। আগে ঠাকুর-দেবতা একেবারেই মানতে না—আমার লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদটা পর্যন্ত খেতে চাইতে না; আজ নিজে থেকে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গেলে—

আমি হাসিয়া বলি—তোমার যা ভালো লাগে আমাকে তা করতে হবে বইকি। তেমনি আমিও যা চাই তা তোমাকে পারতে হবে।

আমার চিবুকে একটু নাড়া দিয়া খুশিয়াল অনু বলে—এ ছেলে বাঁচলে বাঁচি! বেশ, এখন আমার একটা হুকুম শোন দেখি, লক্ষ্মী ছেলের মতো। ওদিকে ফিরে বস। আমি বেড়াতে যাবার কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।

আমি ভালোমানুষের মতো পিছন ফিরিয়া বসিলাম। অনু গলার হারটা খুলিয়া আলমারিতে রাখে। আলনা হইতে সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি লইয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। আবার সাবধান করিয়া দেয় আমাকে—এদিকে চাইবে না কিন্তু!

হাসি পায়। অনু আবার ছেলেমানুষ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের উষাযুগে যে সকল ছেলেমানুষি মানাইত, আজ দীর্ঘ আট বৎসর পরে সেগুলি যে অত্যন্ত বেমানান, এ বোধও বোধকরি ওর নাই। না হইলে বারে বারে আমাকে এভাবে সাবধান করিবার অর্থ কী? কপট ক্রোধ, মান-অভিমান, ছদ্ম-তাড়না—সবই ফিরিয়া আসিতেছে তাহার স্বভাবে। প্রথম প্রথম অনুরাধা ছিল অত্যন্ত লাজুক। ওর লজ্জা ভাঙিতেই অনেকদিন লাগিয়াছিল। বিবাহের পূর্বেই সে আমার সাথে কথা বলিয়াছিল; অথচ আশ্চর্য, ফুলশয্যার রাত্রে সে আমার চোখে চোখ রাখিয়া কথা পর্যন্ত বলিতে পারে নাই। শুধু সেই একরাত্রিই নহে, আজও তাহার লজ্জা যেন সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। বাতাস উঠিলে যেমন লজ্জাবতীর পাতাগুলি চকিতে মুদ্রিত হইয়া যায়—আজও মধ্যরাত্রে বেড্‌সুইচ জ্বালিলে সে চাদরের তলায় তেমনি আত্মগোপন করে।

রাত্রে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া আশ্লেষশয়না অনু বলে—তুমি ভারি অসভ্য! কেন পেছনে ফিরলে তখন?

আমি বললাম—এটাই যে মেয়েদের আসল রূপ!

—কোনটা?

—আসন্ন মাতৃত্বের রূপ!

—যাও! ভারি অসভ্য তুমি।

—জীবনরহস্যের আদি সত্য নগ্ন—সেটাকে সমাজ একান্ত করে রাখে; তাই সে অসভ্য। অসভ্য, কিন্তু অসত্য নয়!

জানি, এ সকল গুরুগম্ভীর কথা ও বুঝিতে পারে না। তবু আচ্ছন্নের মতো শুনিয়া যায়। অভিভূত হয়। ওর ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলি—তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, দেবে?

আমার এই কাতর কণ্ঠস্বরে অনু চমকিয়া ওঠে। আমার আনত মস্তক টানিয়া লয়। কবোষ্ণ সিক্ত স্পর্শ অনুভব করি ওষ্ঠপুটে। অনু কানে কানে বলে—কী না দেওয়া আছে বল তোমাকে? কী কেড়ে নিতে বাকি রেখেছ? এতদিন তুমি হাত বাড়িয়ে নাওনি তাই—আমার দেওয়ার ইচ্ছা তো কম ছিল না।

—কথা দাও, যা চাইব দেবে?

—না, আগে তুমি বল।

—না, আগে কথা দিতে হবে।

অনু মিটিমিটি হাসিতেছে। এ যেন এক মজার খেলা। গুরুগম্ভীর বাক্যবিন্যাস নয়, এ খেলায় ও যোগ দিতে পারিতেছে। কী চাহিতে পারি আন্দাজ করিতেছে। সহসা একটা কথা আমার মনে পড়িল। হঠাৎ অনুভব করিলাম, অন্যায় করিতেছি। অনুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া বাধ্য করিতেছি। এ-ও তো অত্যাচারের নামান্তর। স্নেহের অত্যাচার! অনুর নিকট যাহা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি তাহা নারীর এক অপূর্ব সম্পদ। প্রকৃতিদত্ত ধন। একবার হারাইলে তাহা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো এ সম্পদ কাড়িয়াই লইতে পারি—প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা আমার সাধ্যাতীত। বিজ্ঞান অপূর্ব; কিন্তু বিজ্ঞান অপূর্ণ! যে দ্রব্য দান করিতে পারি না তাহা গ্রহণ করিবার কী অধিকার আছে আমার?

—আমি আগে কথা না দিলে বলবে না? বেশ তাহলে—

আমি বাধা দিয়া বলি—আচ্ছা থাক।

—কী হল?

—না; আগেই কথা দিতে হবে না। আমি কী চাইছি, তা বলছি! কেন চাইছি তা-ও বুঝিয়ে দেব। তুমি কথাটা চিন্তা করে দেখ, বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী যদি রাজি হও ভালো—না হও জোর করব না।

—বেশ বল।

—তোমাকে আগেই বলেছি যে, তোমার শরীর স্বাভাবিক নয়। পেল্‌ভিক গার্ডল বলে একটা হাড়

আছে তোমার মাজার কাছে—

বাধা দিয়ে অনু বলে—ওসব বাজে কথা বাদ দাও। কাজের কথা কী আছে বল।

আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই আমার সহধর্মিণী!

কী আমার ধর্ম?

বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। অজ্ঞেয়কে জানা। প্রাক্‌বিশ্বাসের সহজ পথে নহে—'নেতি নেতি' করিয়া বিচার মার্গে। জীববিজ্ঞান আমার ধ্যেয়। জীবকোষের আদিম রহস্যলোক হইতে যাত্রা করিয়াছি প্রাণময় চৈতন্য গঙ্গোত্রীর উৎস সন্ধানে। কঠিন সে মানস-তীর্থের যাত্রাপথ।

আর আমার সহধর্মিণী? যে এই যাত্রাপথে আমাকে অনুপ্রেরণা দিবে, সেই সখী, সচিব।

সহযাত্রিণী? সে বিশ্বাসই করে না এ ধর্মমঙ্গল!

—কই বললে না!

—হ্যাঁ বলি। তোমাকে অনেকদিন আগেই বলেছি যে তোমার শরীর—। অনু উঠিয়া বসে; রুদ্ধস্বরে বলে—হ্যাঁ, শুধু অনেকদিন আগেই নয়, চিরদিন বলছ। এইমাত্র একবার বলেছ। কেন মনে কর, ভুলে গেছি আমি? ভুলিনি, ভুলবার উপায় নেই। নিত্যি ত্রিশদিন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাই। তাই তো অতবড় একটা আয়না এনে টাঙিয়ে রেখেছ ঘরে। আমি কি বুঝিনা? আমার শরীর যে অপ্সরীর মতো নয়, তা আমি জানি। তুমি দিনে পাঁচবার করে মনে না করিয়ে দিলেও জানি! তোমার আগেও অনেকে এ কথা আমাকে বলেছে। এক-আধজন নয়, এক-আধবার নয়, বুঝলে? এগারোবার।

শেষদিকে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্তম্ভিত হইয়া যাই। কী কথার কী প্রতিক্রিয়া! শুধু শিক্ষার অভাব! সত্যকে গ্রহণ করিতে পারার শিক্ষা থাকা চাই। ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বাক্যের বিকৃত অর্থ হইবেই। শরীর শব্দের অর্থ গাত্রচর্মের ঔজ্জ্বল্য নহে, মুখের সুষমা আর কবরীর দৈর্ঘ্য নহে। অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসের সমষ্টি এই দেহসৌধ। এ সৌধের কোনো খিলানে ফাটল ধরিলে, কোনো দেওয়ালের বুনিয়াদ বসিয়া গেলে গৃহকর্তার অধোবদন হইবার কোনো কারণ নাই। যে বাস্তুকার ডিজাইন করিয়াছে, যে তত্ত্বাবধায়ক পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, যে মিস্ত্রি গাঁথিয়াছে—লজ্জা পাইতে হয় তাহারাই পাইবে! উপমাটা যদি আরও প্রসারিত করা যায় তবে বলিব—গৃহকর্তার কর্তব্য ত্রুটি ধরা পড়িবার পরেই শুরু হইল! সুসময়ে যদি মেরামতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন তিনি, তাহা হইলেই তাঁহার অপরাধ। অনুর পেল্‌ভিক-গার্ডেলের মাপ ছোট, সে অপরাধ কাহার? অনুর নহে নিশ্চয়। তাহার মনে বাসনা-কামনা দিতে ভুল হয় নাই, তাহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ সুধারস সঞ্চারে ত্রুটি হয় নাই—শুধু ভুল হইল পেল্‌ভিক-গার্ডেলের মাপে? পাঁচতলা বাড়িতে সিঁড়িই ব্যবস্থা নাই। নাই তো নাই। স্থানাভাব না থাকিলে এখন সিঁড়িঘর গাঁথিয়া তোল; সে ব্যবস্থা অসম্ভব হইলে দ্বিতল-ত্রিতলের স্বপ্ন ভুলিয়া যাও। একতলাতেই স্থান সঙ্কুলানের বিকল্প ব্যবস্থা কর। কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

অনু ততক্ষণে বালিশে মুখ লুকাইয়াছে—কে বলেছিল তোমাকে দয়া করতে? আমি তো এ স্বর্গসুখ চাইনি! যাদের শরীর ভালো তাদের কাউকে বিয়ে করলেই পারতে? এখন আর দুঃখ করে কী হবে? 'সেধে-পেড়ে ভাব, আর মেজে-ঘষে রূপ',—ও তো আর হবার নয়!

আমি উঠিবার উপক্রম করি, বলি—আমার অন্যায় হয়েছে। আর ও কথা বলব না। তুমি ঘুমোও।

অনু আমার হাত চাপিয়া ধরে, বলে—কী হল? উঠছ কেন? বলবে না?

—বলতে আর দিলে কই? তোমার দেহের অভ্যন্তরে একটা অস্থির গঠনে ত্রুটি আছে। এটা ধ্রুব সত্য। ফলে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সহজে তোমার মা হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা। এটা তোমার অপরাধ নয়, তবু সেকথা বললে যদি তোমার রাগ হয়— তবে না হয় তা বলব না।

—আচ্ছা বল, আমি আর কাঁদব না।

—না, থাক এখন।

—না, তোমার পায়ে পড়ি, বল।

অগত্যা বলিতে হয়। অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হয়। বিষয়বস্তুটা যে কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে বোঝা সহজ। অল্প কথাতেই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু আমাকে অতি ঘুরপথে অগ্রসর হইতে হয়। রূপকের

সাহায্যে আসল বক্তব্য ঘুরাইয়া বলিতে হয়। অনুর আঙ্গিক ত্রুটি ঔষধে সারিবার নহে। সুতরাং মাতৃত্ব তাহার পক্ষে বিপদজনক। সে মা হইতে চলিয়াছে। এবার বিপদের ঝুঁকি লইতেই হইবে। প্রথম হইতেই সেই জন্য যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি। অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়া তাহাকে নিয়মিত পরীক্ষা করাইতেছি! সিজারিয়ান অপারেশন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন শল্য-চিকিৎসক। ওর ওই স্বাস্থ্যে বারে বারে সে ঝুঁকি লওয়া চলে না। এ বিপদের হাত হইতে চির-পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে আর সন্তান না আসে। এই কারণে অস্ত্রোপচার আইনসম্মত এবং বাঞ্ছনীয়। সেই পরামর্শই দিয়াছেন চিকিৎসক। আর্থিক সঙ্গতির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া শূন্য উদর যেমন আপন বুভুক্ষার কথা জানান দেয়, তেমনি অস্থির এই ত্রুটির সহিত কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া মানবের জৈবিক প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিবেই। দুইটি একান্তবাসী নরনারীর পক্ষে প্রকৃতির এ অমোঘ দাবিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। দেহের দ্বারে সেই আদিম প্রবৃত্তি অহরহ আসিয়া হাঁক দিবে—অয়ম্ অহং ভো। হয় তৎক্ষণাৎ উগ্র সন্ন্যাসীকে মুষ্টি ভরিয়া ভিক্ষা দিয়া বিদায় কর—না হইলে শাপগ্রস্ত তোমার আর মুক্তি নাই। বিকৃতি দেখা দিবে জীবনে। সে বিকার কখনও দেখা দিবে মনে, কখনও দেহে। রোগাক্রান্ত হয় মানুষ, অনিদ্রা, জ্বর—কখনও বা মূর্ছারোগ। এমন-কি উন্মাদ হইয়া যায় শাপগ্রস্ত মানুষ!

অনু সাগ্রহে শুনিতে থাকে। এত আগ্রহ করিয়া সে আমার বক্তৃতা কখনও শোনে না। হয়তো বিকালে দেবীর মন্দিরে যে অভিনয় করিয়াছি তাহাতেই সে অভিভূত হইয়া আছে। হয়তো আজ তাহাকে রাজি করাইতে পারিব। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ নাই; কিন্তু এভাবে যুক্তিমার্গে তাহা হইবার নহে। তাহাকে স্বমতে আনিতে হইলে তাহার বোধগম্য ভাষায় অগ্রসর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নহে।

অনু বলে—আমাকে কী করতে বল?

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক অদ্ভুত মনগড়া কাহিনির জাল বুনিয়া চলি। বলিলাম—ছেলেবেলায় কাকার সঙ্গে একবার যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম, বুঝলে। সব কথা মনে নেই, গল্পটা মনে আছে, শোন। কোনো এক চম্পাইনগরে না উজানি গাঁয়ে বাস করত নাগারি বিষবদ্যি। মনসাবিদ্বেষী চাঁদ সদাগরের সে বুঝি ছিল প্রধান চেলা। সে ছিল সাপের রোজা। শিবের ভক্ত ছিল নাগারি, বলত—বাবা আমার নীলকণ্ঠ, আমি তাঁর পূজা করি; সাপের বিষে নাগারির কোনো ক্ষতি হত না। নাগরাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। এ বড় লজ্জার কথা। নাগারি রোজা হয়ে সকলের বিষ ঝেড়ে দেয়, অথচ সে নাগদেবী মনসার পুজো করে না! সাপেরা সবাই দল বেঁধে মনসার কাছে দরবার করতে গেল। মনসা তো শুনে রেগে আগুন। কী, এত বড় স্পর্ধা! তিনি নাগরাজ তক্ষককে বললেন—যাও, দংশন কর নাগারির শিশুপুত্রকে। তক্ষক মাথা হেঁট করলেন, বললেন—'মা, তা হবার নয়। শিবের বরে নাগারি সাপের বিষকে জয় করেছে!' এত বড় লজ্জার কথা। শোধ না নিলে মান থাকে না মনসার। কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন মনসাদেবী এলেন মহাদেবের দরবারে। ....ভোলো মহেশ্বর তখন ভাঙের নেশায় বিভোর। বললেন—'এ আর বেশি কথা কি? নাগারি লোকটা আমার খুব ভক্ত, আমার কথা ঠেলবে না। যাও মনসা, তুমি তাকে আমার নাম করে বল যে, আমি তাকে বলেছি তোমাকে পুজো করতে।'

মনসা তো তাই চান। নাচতে নাচতে তিনি এসে হাজির হলেন নাগারির বাড়িতে। বিষবদ্যি তখন ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজার আয়োজন করে আসনে বসতে যাচ্ছে। মনসা বললেন—'ওগো বদ্যি, আজ আর মহাদেবের নয়—আমাকে পুজো করবে।'

সব কথা শুনে ক্ষোভে লজ্জায় বিষবদ্যি প্রায় পাগল হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই—ইষ্ট-আদেশ! মহাদেব ভিন্ন অন্য কাউকে পূজা দেবে না বলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা বুঝি আর রাখা যায় না!

মনসা বলেন—'কই গো বদ্যি, অর্ঘ্য দাও!'

দুঃখে ক্ষোভে বাঁ হাতে খড়্গখানা তুলে নিয়ে নাগারি ডান হাতের কব্জিতে করলে প্রচণ্ড আঘাত। কাটা হাতখানা ঠিকরে গিয়ে পড়ল গৌরীপটে। নাগারি বলে—'দেখতেই পাচ্ছ ঠাকুরুন, আমার ডান হাত নেই! বাঁ হাতের অশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নেবার রুচি যদি এখনও থাকে তবে সামনে এসে দাঁড়াও। আমি ইষ্ট আদেশ পালন করি!'

অনু সাগ্রহে বলে, তারপর?

কেমন যেন নিজের কাছেই লজ্জা করিতেছে। এ কী মিথ্যার কুহক রচনা করিতেছি! সত্যাশ্রয়ী বৈজ্ঞানিকের এ কী ব্যবহার? অন্ধ বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা—এ দুইজনের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ। আমার গল্পের নায়ক যেমন মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গর্ব করিত, আমিও কি তথ্যাভিলাষী বৈজ্ঞানিক বলিয়া তেমনি নিজেকে পরিচিত করি না? লক্ষ্যই কি সব—পথ কি কিছুই নহে? তবে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য এ কোন পথে ছুটিয়াছি উন্মাদের মতো?

—কই বল?

—হ্যাঁ, বলি! হঠাৎ মহাদেবের নেশা ছুটে গেল। বললেন—'আমার গায়ে এত রক্ত কেন?' পার্বতী ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'হায় হায়, এতক্ষণে তোমার নেশা ছুটল। নাগারি ওদিকে কী কাণ্ড করে বসে আছে দেখগে!'

মহাদেব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে এসে হাজির হলেন নাগারির বাড়ি, বলেন—'এ তুই কী করেছিস? আমার গায়ে রক্ত ছিটিয়েছিস!'

বিষবদ্যি বলে—'এ যে তোমারই আদেশ প্রভু! যে হাতে তোমার পুজো করেছি, সে হাতে তো আর কাউকে পুজো দিতে পারব না।'

মহাদেবের মাথা হেঁট হয়ে গেল! অনুতপ্ত হয়ে বলেন—'নেশার ঘোরে আমার ভুল হয়ে গেছে রে। আমারই দোষ। বেশ, তুই আমাকেই দে তোর অর্ঘ্য। বাঁ হাতেই দে! তাই হাত পেতে নেব আমি!'

নাগারি শিউরে ওঠে! লুটিয়ে পড়ে বাবার চরণে। চীৎকার করে ওঠে—'ও আদেশ কোরো না ঠাকুর! সে আমি পারব না। বাঁ হাতে তোমাকে অর্ঘ্য দেব!'

শিব আর কী করেন? একটু ভেবে বলেন—'বেশ, তোকে কিছু করতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি। আমি রইলাম তোর বেলগাছের তলার অনাদিলিঙ্গ বিগ্রহে। তোকে দিতে হবে না, আপনিই ঝরে পড়বে বেলপাতা আমার মাথায়। বাঁ-হাতে গঙ্গাজলও আনতে হবে না তোকে—গঙ্গা উজান বয়ে আসবে নিজেই তোর বাড়িতে। আর তোকে দেব সুরভী গাভী। দুইতে হবে না—তার দুধ আপনি ঝরে পড়বে আমার মাথায়।'

গল্পের উপসংহারে বলিলাম—বিষবদ্যির দ্বারে বাঁধা পড়লেন ভক্তের ভগবান।

অনু আমার কোঁচার খুটে চক্ষু মার্জনা করিয়া বলে—হঠাৎ এ গল্প আমাকে শোনালে কেন?

—বলছি। নাগারি বিষবদ্যি নিজের অঙ্গচ্ছেদ করেছিল দেবতার ত্রুটি শোধরাতে। তার নিজের কোনো দোষ ছিল না। দোষ ছিল দেবতার। নেশার ঘোরে অন্যায় আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। তাই অক্লেশে নাগারি তার একটি অঙ্গ বলি দিয়েছিল। তোমার দেহেও যে ত্রুটি আছে তার অপরাধ তোমার নয়, সেটা বিশ্বকর্মার ভুল; তোমাকেই শোধরাতে হবে নিজের একটি অঙ্গ বলি দিয়ে। তাহলে দেখবে মঙ্গলের দেবতা শিব বাঁধা পড়েছেন তোমার দোরে।

অবাক বিস্ময়ে অনু চাহিয়া থাকে।

এইবার রহস্যজাল ছিন্ন করিবার সময় আসিয়াছে। রূপক ছাড়িয়া বাস্তবে আসি। সব কথা বুঝাইয়া বলি। এইবার সন্তান প্রসবের সময় তাহার দেহের ভিতর একটি ক্ষুদ্র অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। সমস্তই হইবে অজ্ঞানাবস্থায়। সে জানিতেও পারিবে না। কিন্তু তাহাতেই সে নিরাপদ হইবে। তার অবশিষ্ট জীবন মিলনমধুর হইবার পথে আর কোন বাধা থাকিবে না। লাইব্রেরি ঘরে আমাকে ইজিচেয়ারে শুইয়া আর বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হইবে না। সন্তান-সম্ভাবনার আর ভয় থাকিবে না। ইহা ভিন্ন বাহ্যিক জীবনে আর কোনো পরিবর্তনই হইবে না তাহার।

অনু তীব্র আগ্রহ লইয়া সব কথা শুনিতেছিল। তাহার অন্তরে যে ঝড়ের নেপথ্য আয়োজন হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি থামিতেই উচ্ছ্বসিত রোদনে সে ভাঙিয়া পড়ে। আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলে—কেন, কী করেছি আমি! কেন এত বড় শাস্তি দিচ্ছ তুমি আমাকে? ওগো, তুমি তো নেশা-ভাঙ কর না! সকলেই স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করবে, কেবল আমিই পারব না!

ওর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিই—বুঝাইয়া বলি সব কথা। সন্তান তো তাহার হইতেছে, হইবে। তাহার সন্তানকে যদি সুস্থ সবল এবং জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় তবেই এ অস্ত্রোপচার করা হইবে। নচেৎ নহে। একটি সন্তানের জননী না করিয়া তো আমি তাহাকে এ অনুরোধ করিতেছি না। তাহাকে

বলিয়া বুঝাই—আমি শুধু পুর্বেই অনুমতি চাহিয়া রাখিতেছি। তাহার অনাগত সন্তানকে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যাইবে না। উপর হইতে পেট কাটিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এ বিপদের ঝুঁকি তো বারেবারে লওয়া যায় না।

উচ্ছ্বসিত রোদনে ফুলিতে ফুলিতে অনু বলে—না, না, না। কালো হই, কুচ্ছিৎ হই—তবু আমি মেয়েমানুষ। তবু মা হতে যাচ্ছি আমি। রূপ নেই, গুণ নেই—কী দিয়ে তোমায় ধরে রাখব? হয়তো এইটুকু দিয়েই বেঁধে রাখতে পারব তোমাকে। সেই সম্বলটুকু তুমি জোর করে কেড়ে নিও না। জানি, আমাকে তুমি ভালোবাসতে পারনি; আর যা শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নেব, শুধু এ শাস্তি দিও না আমাকে! ওগো, দুটি পায়ে পড়ি তোমার!

সেই আমার শেষ চেষ্টা! তারপর আর ও চেষ্টা কখনও করি নাই!

ছয়

শরৎবাবু কোথায় যেন লিখেছিলেন—'হায় রে মানুষের মন। এ যে কিসে ভাঙে আর কিসে গড়ে তার কোন তত্ত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথচ এই মন লইয়া মানুষের অহঙ্কারের অবধি নাই। যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, যাহাকে চিনিতে পর্যন্ত পারা যায় না, কেমন করিয়া আমার বলিয়া তাহার মন যোগান যায়?'

কথাগুলো মনে পড়ে আমার নিজের কথা ভাবলে। আমার মনটাও যে ওরকম পাগলামি করে বসতে পারে, তা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছি? এইসব এনামেলকরা অতি আধুনিক গায়ে-পড়া মেয়ে এতদিন ছিল আমার দুচক্ষের বিষ! আমি আকৈশোর যে নারীর স্বপ্ন দেখে এসেছি তার মধ্যে মদিরতা নেই, চকমকির ঠোকাঠুকি নেই, ছিল অচঞ্চল মাণিক্যের দীপ্তি। আমি যাকে স্বপ্ন দেখতেম, তার সিঁথিমূলে ভোরবেলাকার পুব আকাশের আভাস, তার মণিবন্ধে কুন্দশুভ্র শঙ্খবলয়। কট্‌কি শাড়ির লাল পাড় যার রাঙাচরণে আশ্রয় খোঁজে, আলতার রেখা যার পায়ে লোটায়, লজ্জায় লাল হয়ে যে মেয়ে দীপশিখার মতো জ্বলে—জ্বালায় না।

বৌদির বোনটিকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। হাবে-ভাবে, আচারে-ব্যবহারে এ শুধু রাধাবৌদিরই নয়, আমার মানসী প্রতিমারও বিপরীত মেরুর বাসিন্দা! জোর করে মনকে সরিয়ে নিয়েছি ওর দিক থেকে। মেয়েটি অত্যন্ত আত্মসচেতন। সুন্দরী মেয়েরা হয় দুজাতের। একদল থাকে তাদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে অচেতন। তারা তাদের সৌন্দর্যের কথা জানতে পারে না যতদিন না বাইরে থেকে কেউ এসে নাড়া দেয়। আর একদল ডুবে থাকে আত্মসচেতনতার মধ্যেই। মনামী এই দ্বিতীয় জাতের সুন্দরী। নিজ রূপলাবণ্যের সম্বন্ধে তার সচেতনতা প্রায় ভব্যতার সীমা ছাড়াতে চায়। ও হচ্ছে ধানুকী জাতের মেয়ে, যারা সর্বদা চায় তাদের ঘিরে থাকুক একদল স্তাবক—তাদের ওরা কাছে টানে দূরে ঠেলবার আনন্দের সন্ধানে। মূর্খ স্তাবকদল আঘাত পায়, তবু ফিরে ফিরে আসে মুগ্ধ পতঙ্গের মতো জ্বলেপুড়ে মরতে। মনামী বোধহয় আশা করেছিল, আমি নাম লেখাব তাদের খাতায়। ও আমাকে চিনতে পারেনি। আমি তাই সচেতন হই, সাবধান হই। প্রথমদিনেই ওকে কঠিন আঘাত করেছি—আমি জানি, মার খেয়ে হজম করে যাবার মেয়ে ও নয়। সে সুযোগ খুঁজছে আমাকে ফিরে আঘাত করবে বলে। সে সুযোগ ওকে আমি দেব না। তাই এড়িয়ে চলি সুকৌশলে। এ জাতের রূপ-সচেতন মেয়ে—যাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাদের রূপের বেদীমূলে অর্ঘডালি ঢেলে দেবার জন্য সারা দুনিয়া প্রহর গুনছে রুদ্ধ নিশ্বাসে, তাদের সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয়—যখন কেউ তাদের উপেক্ষা করে।

আমি ওকে দেখেও দেখতাম না।

ও ছটফট করতে থাকে। এ অবজ্ঞাই যে ভীষণ অপমান! তাই ভাব করবার জন্যে, আলাপ করবার উদ্দেশ্যে ও অনেকবারই এগিয়ে এসেছে। আমি অন্যমনস্কের মতো শুধু সরে গেছি উপেক্ষা করে।

আমার আছে লেখার বাতিক। পড়ার টেবিলে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা ছড়ানো থাকে। কলেজ থেকে ফিরে একদিন মনে হল সেগুলো নাড়াচাড়া করা হয়েছে। বইগুলো একধারে সারিবদ্ধভাবে সাজানো, ক্যালেন্ডারে কার্ডটা নির্ভুল নির্দেশ দিচ্ছে, জামাকাপড়গুলো আলনায় উঠেছে। সন্দেহ হল,

আমার অবর্তমানে ঘরে কেউ আসে। সে সন্দেহ দৃঢ়তর হল বুশ-কোটটায় নতুন বোতাম দেখে। বাধ্য হয়ে ঘরে তালা দিয়ে যেতে শুরু করলাম তারপর থেকে।

আমি আর দাদা যখন খেতে বসি ও তখন এমন সব আলোচনা শুরু করে যাতে স্বতই আমি যোগ দিতে ইচ্ছুক! ও হয়তো চায়—বাকযুদ্ধে আমিও অংশ গ্রহণ করি, ওদের দ্বৈরথ সমরকে ত্রিভুজাকৃতি করতে চায়। তাহলে তৃতীয় বাহুটিকে ছেড়ে ও আমার সঙ্গেই সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারে। আর 'দ্বন্দ্ব' শব্দটার তো একটি মাত্র অর্থ নয়।

সেদিন উঠেছিল আধুনিক কথা-সাহিত্য নিয়ে। ও বললে—আজকাল বাজারে যা চলছে তাকে সৌখিন মজদুরি বলতে হয়।

দাদা বলেন—কী রকম?

— কীরকম জানেন? আপনার নজরে পড়ল বস্তিজীবন নিয়ে লেখা একখানা উপন্যাস হঠাৎ ভীষণ চালু হয়ে গেল বাজারে। এক সপ্তাহে তিনটে সংস্করণ হয়ে গেল! আপনি খেয়াল করে দেখলেন না যে, তিনটি সংস্করণেই একই ছাপার ভুল, একই ভাঙা-টাইপ; ভাবলেন সত্যি বুঝি এক সপ্তাহে তিনবার করে ছাপতে হচ্ছে বইটা। আপনার লোভ হল, স্থির করলেন বস্তিজীবন নিয়ে রাতারাতি আপনিও একখানা বই লিখে ফেলবেন। একদিন সন্ধেবেলা সিগারেট টানতে টানতে ঘুরে এলেন কোন বস্তির সীমান্ত ঘেঁসে। আড়চোখে দেখেও এলেন ওদের জীবনের এক খণ্ড-অংশ। বুঝবার মন দিয়ে দেখলেন না কিন্তু; কারণ মনটা পড়েছিল গ্লেজড্-কিড্ জুতোজোড়ায়, বস্তির কাদা থেকে রক্ষা করতে হচ্ছিল যেটাকে। ফিরে এসে লিখে ফেললেন একটা আটশ-হাজার পাতার মহা-উপন্যাস।

দাদা বলেন—বুঝলাম। হঠাৎ তোমার মতে বস্তির জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখবে শুধু বস্তির মানুষ।

— অন্তত দীর্ঘদিন যে গিয়ে বস্তিতে বসবাস করেছে। জীবন দিয়ে যে জীবনকে দেখেছে। পরের মুখে ঝাল খায়নি। এই সেদিন কোথায় যেন একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম শেক্সপীয়ারের ওপর। লেখক রোমিও-জুলিয়েট সম্বন্ধে লিখতে বসে মন্তব্য করেছেন প্রথম দর্শনে প্রেম হতে পারে না। বিনা পরিচয়ে প্রথম দর্শনেই যদি পরস্পরের মনে আকর্ষণ জন্মায় তবে তার জৈবিক প্রেরণার একটা কারণ থাকতে পারে—কিন্তু তাকে ভালোবাসা বলা যায় না।

একটু হাসির আভাস খেলে যায় দাদার ঠোঁটের কোনায়, বলেন—যদিচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, আমি লেখকের সঙ্গে একমত নই, তবু তোমার মতটা কী?

মনামী অকারণেই কেন যেন রাঙিয়ে ওঠে। ঠিক অকারণেই কি? কী ভাবল সে? তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, আমার বক্তব্য হচ্ছে—আপনার যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তখন সেকথা বলার বা লেখার অধিকারও আপনার আছে। প্রবন্ধ লেখকের সম্ভবত অভিজ্ঞতা নেই। সে সৌভাগ্য যখন তাঁর হয়নি, তখন এটা লিখে পাণ্ডিত্য জাহির না করাই উচিত ছিল তাঁর। নিজে যা প্রত্যক্ষ অনুভব করিনি, ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে যা বুঝিনি, পরের মুখে ঝাল খেয়ে সে বিষয়ে লিখতে যাওয়াকে আমি অনধিকার চর্চা মনে করি।

দাদা বলেন, ঠিক কথা। তবে লেখাটা আমি পড়িনি। তোমার থিয়োরি হিসাবে তার সমালোচনা করাটাও আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। তা ছাড়া বাঙলা ভাষায় আমি না লেখক, না পাঠক! এই তো একজন উদীয়মান লেখক আছেন, ইনি কী বলেন?

একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ আমার মুখের ওপর মেলে প্রতীক্ষা করে মনামী। শুধু জ্বলজ্বলেই নয়, আমি জানি চাপা কৌতুক উপচে পড়ছে ওর দুচোখে।

দাদা ভেতরের কথাটা জানতেন না। প্রবন্ধটা আমারই লেখা। বেরিয়েছে এ মাসেই, একটা পত্রিকায়—তার কমপ্লিমেন্টারি কপিটা পড়ে আছে আমার টেবিলে। গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনারা যা বলতে চাইছেন আমি তার সঙ্গে একমত।

মনামী যেন নিভে যায়। আমার কাছ থেকে কঠোর প্রতিবাদ আশা করেছিল সে। আমার জবাবে ভাববাচ্য ছেড়ে এবার সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করে, অর্থাৎ আপনি মনে করেন, লেখকের যে বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—যে আনন্দ অথবা দুঃখের বিষয় তিনি নিজের জীবনে অনুভব করেননি, সে কথা লিখবার তাঁর অধিকার নেই?

—নিশ্চয়ই নেই!

—তাহলে আপনি এও স্বীকার করেছেন যে, ঐ প্রবন্ধকারের অন্যায় হয়েছে, 'ল্যাভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' সম্বন্ধে ও-রকম মন্তব্য করা?

—একশোবার! তবে কী জানেন, এসব মৌলিক গবেষণার কথা তো সব সাহিত্যিক জানতে পারেন না—তাই নরকে না গিয়েও দান্তে তার অপূর্ব বর্ণনা দিচ্ছেন, বহু কনফার্মড ব্যাচিলার দাম্পত্যজীবনের নিখুঁত ছবি আঁকছেন, আর দুনিয়ার তাবৎ মূর্খ লেখক মৃত্যু যন্ত্রণার ছবি আঁকবার জন্য কলম হাতে আমৃত্যু অপেক্ষা করছেন না! কিন্তু দশটা-দশ হয়ে গেছে দাদা। এবার ওঠা যাক।

*　　　　*　　　　*

কিছুতেই ধরা দিইনি ওর জালে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন আমাকে বারে বারে সর্তক ক'রে বলে দিচ্ছিল যে—ও শুধু অপমান করবার জন্যে, প্রথমদিনের আঘাতটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে। একদিন সিনেমার তিনখানা টিকিট কিনে এনেও সাধ্য-সাধনা করল। রাজি হইনি।

কিন্তু কী আশ্চর্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে ওর বিরুদ্ধে সজাগ রেখেও এ অঘটন ঘটল। স্বীকার করতে লজ্জা হয় নিজের কাছে; কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করি কী করে? যতই নিজেকে নিরাসক্ত রাখতে চাই, যতই নিজেকে বোঝাই ওরা ভিন্ন জাতের মেয়ে—ওরা ভালোবাসে না, ভালোবাসতে জানে না; ওরা ভালোবাসার অভিনয় করতে জানে—প্রেমিক ওদের কাছে অপাংক্তেয়, ওরা খোঁজে স্তাবক, ফ্ল্যাটারার ততই মনটা পাগলা মেহেরালির মতো ওর দুর্বার আকর্ষণে পড়ে ছুটে আসে। সব ঝুট হ্যায় জেনেও সেসব ছেড়ে চলে যেতে পারে না। মনকে শাসন করি, চোখকে বেঁধে রাখি, তবু কখন আবিষ্কার করি অন্যমনস্ক নিজেকে—পাশের ঘরের চুড়িবালার জলতরঙ্গে বিভোর। অভ্যস্ত গানের কলির মতো ও ঘর-করনার কাজ করে যায়—যেন এ-ঘরের সঙ্গে ওর আজন্মের পরিচয়। এঘর ওঘর ঘোরাঘুরি করে, এটা ওটা সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে, ফুলদানির জলটা বদলায়, বিছানার চাদরের কুঞ্চনটা মুছে নেয় হাতের তালুতে, যেন কতদিনের অভ্যাস। দাঁত দিয়ে ফিতে কামড়ে ধরে বেণী পাকায় না সে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে শাসন করে না খোঁপাকে—অপরাহ্ণবেলায় ঝামাঘসা পায়ের পাতায় আঁকতে বসে না আলতার রেখা; সব দিক দিয়েই সে আমার মানসী প্রতিমার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা; তবু আশ্চর্য, আমার ভালো লাগে ওকে।

প্রেম এ নয়, হতে পারে না। কেন পারে না তা আলোচনা করেছি আমার প্রবন্ধে। প্রেম মানে একটা বোঝাপড়া। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দুটি বাদ্যযন্ত্র যেন একসুরে, একতালে একটা ঐক্য সঙ্গীত গাইতে রাজি হয়। গান শুরু করার আগে তাই পর্দা কষতে হয়, তবলায় মৃদু আঘাত করতে হয় হাতুড়ি দিয়ে। এ বোঝাপড়া না থাকলে, ঐকতান হবে না। যে মুহূর্তে ভেঙে পড়বে এ বোঝাপড়া, সেই মুহূর্তে তাল কাটবে সঙ্গীতের। মানুষের জীবনও তাই। সপ্তপদীর ভিতরেই যাচাই হয়ে যায় এরা একতালে পা ফেলে চলতে পারবে কিনা। মনামীর সঙ্গে আমার কোনো বোঝাপড়া হয়নি, মন জানাজানি হয়নি—তবু ওকে নিবিড় করে কাছে পেতে চাই কেন? একি শুধু জৈবিক আকর্ষণ?

কিন্তু সত্যিই কি প্রেম একটা বোঝাপড়া? একটা কন্ট্রাক্টের সূচি-প্রস্তুত প্রণালী? তোমাকে খেতে দেব, পরতে দেব, তোমাকে শাড়ি-গহনা কিনে দেব, সিনেমা দেখাব—তুমি কী দেবে? না, তোমাকে রেঁধে দেব, ধুতিতে নাম লিখে দেব, তোমার ছেলেমেয়ে মানুষ করে দেব। এই চুক্তিনামার তপশিল প্রস্তুতের মিষ্টি করে দেওয়া নামই কি প্রেম?

সমুদ্রের আকুতি সঙ্কুচিত হয়ে আশ্রয় নেয় শঙ্খের বুকে—শুকনো ডাঙায় দাঁড়িয়ে ঐ শঙ্খধ্বনির মধ্যেই শুনতে পাই সাগরের অন্তর্জ্বালার নির্ঘোষ—তেমনি এই ছোট্ট সংসারের ঘরকরনার মধ্যে ধরা পড়েছে মনামীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আর্তি; শের আফগানের গৃহাবরোধে যেমন সীমিত সঙ্কুচিত হয়ে প্রহর গুনছিল বিশ্ববিজয়িনীর সম্ভাবনা।

আমি ভয় পাই। ভয় নিজের জন্য নয়, দাদার জন্যে। আরও ঠিক হয়, যদি বলি, বৌদির জন্যে। আমি লক্ষ্য করি লকগেটের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ভেবেছিলাম, ঘোলাজলের প্লাবনে ভেসে যেতে দেব না এই সুখী পরিবারটিকে। আমি বুঝেছি, মনামীই ভাঙন ধরাবে বাঁধের গায়ে। তাই মাঝে মাঝে মনে হত এই জলধারাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়া যায় না? আমার জীবনের শুকনো ক্ষেতে এ সোনা

ফলাতে পারে না? কিন্তু সে চেষ্টা করে দেখবার অবকাশ পেলেম না। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে সে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে গেল।

ভেসে গেলেন অধ্যাপক অবনীমোহন—যেন ভাগীরথীর জলকল্লোলে ঐরাবত!

কী লজ্জা! এর চেয়ে যে আমার ধরা দেওয়া ভালো ছিল। আমাকে আঘাত করে, অপমান করে, দলিত মথিত করে তৃপ্ত হত ওর অশান্ত আত্মা। এ কী করল মনামী! ও কি সত্যিই দাদাকে ভালোবাসে? তার ডবল বয়সেই ঐ অধ্যাপকটিকে? এ কখনো সম্ভব? কিন্তু আর কী অর্থ হতে পারে এ ব্যবহারের?

আর আশ্চর্য মানুষ ঐ রাধাবৌদি। সমস্ত নাটকটা তার চোখের উপর অভিনীত হচ্ছে, অথচ সে যেন একজন নির্বাক দর্শক। তারও যে রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এটা তার খেয়ালই নেই। না, ভুল হল; খেয়াল তার আছে, বোঝে সব! উপায় নেই বলে চুপ করে থাকে।

মনে আছে খোকন হওয়ার আগে দাদা যখন আসন্নসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যেতেন তখন একটা কবিতা অনুবাদ করতে শুরু করি। প্রথম স্তবকটায় যেন দাদার মর্মকথাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।—

Thou wast all that to me, Love
For which my soul did pine—
A green isle in the sea of love
A fountain and a shrine,
All wreathed with fairy fruits & flowers
And all the flowers were mine.

লিখেছিলাম :

আমার নিখিলে তুমি লীন ছিলে, প্রিয়া
আত্মা আমার তোমারেই শুধু চায়,
প্রাণময় দ্বীপ সাগরের নীলে, প্রিয়া
তুলসীমঞ্চ আমারই এ আঙিনায়।
যে ফুলে ও ফলে সেজেছ পরীর বেশে
সে ফুল যে ফোটে আমারই এ বাগিচায়।।

তারপর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনামীকে নিয়ে দাদা কোথায় বের হলেন। রোজই আজকাল যান। আমার ঘরের সামনে দিয়েই কাঞ্চিভরম্ শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আড়চোখে চেয়ে চলে গেল মনামী। যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছে! আমি ধীরে ধীরে উঠে যাই বৌদির ঘরে, দুটো হাল্কা গল্প করে কিছুটা সময় কাটাতে। গিয়ে দেখি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বৌদি। ভর সন্ধ্যাবেলায় এমন করে সে শোয় না কখনও। ডাকলেম, কী হয়েছে বৌদি!

আমার ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে বসে,—চোখটা মোছে—কিন্তু সাহস করে আলোটা জ্বালে না। সে জানত আবছা অন্ধকার ছাড়া তার রাঙা চোখদুটো মেলে এখন আমার দিকে তাকাতে পারবে না। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারেই দেখলেম, সেই ম্লান বিষণ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি। বাসা ভেঙে যাওয়া ঝড়ের পাখির দৃষ্টি যেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসি নিজের ঘরে। ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে ফেলি অসমাপ্ত কবিতার পাতাটা। প্যালগ্রেভ খুলে এডগার এলেন পোর কবিতাটা বার করেই চম্‌কে উঠি! কী অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স! পরের স্তবক দুটি যেন রাধাবৌদিরই অন্তর-নিংড়ানো আর্তি! কিন্তু কেন ভেঙে যায় মানুষের স্বপ্ন? কেন ফুলভারে আনত চারাগাছের ওপর উদ্যত হয় অশনি :

Ah dream too bright to last !
Ah Starry Hope ! that didst arise
But to be overcast !
A voice from out the future cries
'Oh! Oh!—but over the past
(Dim gulf !) my spirit hovering lies
Mute, motionless, aghast !
For, alas, alas ! with me
the light of life is o'er !

"No more—no more—no more—"
(Such language holds the Solemn Sea
To the Sands upon the Shore!)
Shall bloom the thunder-blasted tree
Or the sticken eagle soar.

রাত জেগে অনুবাদ করলেম স্তবক দুটি :

হায়, সে স্বপন অকালে গিয়াছে টুটে
সহিতে পারেনি মধু-মাধুরীর ভার;
আশার তারকা যেমনি আকাশে ফুটে
ভাগ্য গগনে ঘনাল অন্ধকার।
'চল সম্মুখে—দাঁড়াবার ঠাঁই নাহি—'
অনাগত ঐ ফুকারিছে অবিরত
কুয়াশা-মলিন অতীতের পথ চাহি
অন্তর মোর মূক, মূঢ়, অভিহত।।
হায়! জীবনের দীপ নিভে গেছে তাই
'নাই—নাই—নাই' আজি নিখিলের ভাষা
তীরকে ডাকিয়া ঢেউগুলি বলে—'নাই,
এ পারেতে নাই ও পারের ভালোবাসা।'
বজ্র-আহত তরুতে ফোটে না ফুল
বন্দি বিহগে বৃথাই ওড়ার আশা।।

সাত

এ যে একদিন ঘটবেই এ তো জানাই ছিল। বিয়ের পর যখন প্রথম আসি তখন তো সব সময়েই এ জন্যে কাঁটা হয়ে থাকতাম। তা হলে এত কষ্ট পাই কেন? বোধহয় অনেকদিন ঘর করতে করতে ভেবেছিলাম পাকা সোনাই বেঁধেছি আঁচলে। কষে দেখবার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনও। ওই যে বলে না 'সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিত্তল হল।'—আমারও হয়েছে সেই বৃত্তান্ত। এতদিন কষ্টি-পাথর পাইনি বলেই পিটুলি গোলা খেয়ে দুধের স্বাদ পেয়েছি। ঝড়ের মতো মনামী এসে ভেঙে ফেললো আমার তাসের ঘর।

সবই তো জানতাম, সবই তো সহ্য করছি;—কিন্তু একটু রেখেঢেকে এগুলো হলে তো এত লজ্জায় পড়তাম না। ঠাকুরপো কী ভাবছে? আর কী নির্লজ্জ মেয়ে ঐ মনু। খাল কেটে নিজেই কুমির এনেছি আমি। মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি। প্রথমদিনেই যখন উনি ওকে দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'তোমার নাম ধরে তো ডাকতে পারব না' তখনই লক্ষ্য করেছিলাম, ওঁর চোখের সেই বিহ্বল চাহনি। তখন অবশ্য ও-কথাটার মানে বুঝিনি। বুঝেছিলাম পরে, ঠাকুরপোকে ওর নামের মানে জিজ্ঞাসা করে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মনুকে নিয়ে বেড়াতে যান। কোথায় ঘোরেন তা ওঁরাই জানেন। কী গল্প চলে তাও জানি না। সেদিন রবিবারে যখন উনি বললেন, 'আজ মাংস আনব। মনু, তুমি মাংস রাঁধতে জানো!' তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন আগেকার আর একটা রবিবারের কথা। সেদিনও অধ্যাপক মশায়ের মাংস খেতে শখ হয়েছিল। বলেছিলেন, 'আমার নটবরটি হচ্ছেন কলির দ্রৌপদ্রী। আজ একটু মুখ বদলানো যাবে।'

আজও বোধহয় ওঁর আবার মুখ বদলাবার শখ হয়েছে!

মনু অবশ্য মাংস রাঁধতে রাজি হল না। জানেই না রাঁধতে। শিখবে কোত্থেকে? থাকে তো হোস্টেলে—আর তাছাড়া শিখবার চেষ্টা না থাকলে ও বিদ্যা কি আপনি হয়? এ তো আর বই মুখস্থ করা ফটং ফটং নয়। ও শুধু সাজতেই শিখেছে। যে আগে রাঁধে সে পরে চুলও বাঁধে; কিন্তু যে আগেই চুল বাঁধে সে আর পরে রাঁধে না। মনু তাই এড়িয়ে গিয়ে ঘরদোর গোছাবার কথা বলল। উনি সেটা

খেয়াল করলেন না! খেয়াল হবে কোথা থেকে; মাংস খাওয়াটা তো আসল কথা নয়—আসল কথা দুজনে খুন্‌সুটি করা। কোমরে আঁচল সেঁটে মনু এল ওঁর হাতে হাতে বইগুলো রোদে দিতে। এতদিন আমিই সেগুলি ঝেড়ে-পুঁছে রেখেছি—টানাটানি করে রোদ খাইয়েছি, ন্যাপথালিন দিয়েছি আলমারিতে। আজই না হয় আমার শরীর ভেঙেছে; কিন্তু চিরদিনই কিছু শুয়ে-বসে কাটেনি আমার। কিন্তু কই, হাতে হাতে বইগুলো এগিয়ে দিতে কেউ তো আসেনি! আজও যখন আমি ওঁদের সাহায্য করতে গেলাম উনি বলে উঠলেন—"থাক, থাক, তুমি আবার ঐ শরীরে এ রোদে এস না!"

জানি গো জানি, আমার কাছে-থাকাটা ভালো লাগবে না তোমাদের। বেশ তো, তোমরাই কাজ কর না হাতে হাত মিলিয়ে। আমি পড়ে থাকি আমার ঘরের কোণে। উনি সুবিমলকে ডেকে দিতে বললেন। ঠাকুরপোকে ডাকতে যাই। সে বলে "থাক বৌদি, আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। ওঁরা নিজেরাই পারবেন। তুমি বরং বস, একটা গল্প পড়ে শোনাই।"

কী একটা গল্পের বই পড়ছিল সে। জোরে জোরে পড়তে থাকে। বসে শুনতে হয়। মন লাগে না। কিন্তু। আবার ফিরে এসে চাকরটাকে বাজারে পাঠাই সের-খানেক মাংস আনতে। আমার কাজ আমি করে যাই। দেখি রোদ্দুরের তাপে মনুর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। একটা চুলের গুচ্ছ এসে পড়েছে চোখে। উনি হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, "অনুর কোনও রুচিজ্ঞান নেই।" তারপরেই দুজনের মুখে ফুটতে থাকে ইংরেজির খই! ওরা হয়তো জানে আমি কাছে-পিঠেই আছি। তাই সাদা বাঙলায় কথা বলে না ওরা! আমি কি বুঝি না? পা টিপে টিপে ফিরে আসি নিজের ঘরে। হ্যাঁ, নেই, নেই—এরকম রুচি নেই আমার। কী রুচির ছিরি!

মনকে শক্ত করলাম। পাথরে মাথা ঠুকে লাভ নেই। এ যে হবে তা তো জানাই ছিল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম মনে হত এ সংসারের আসল গিন্নি বুঝি বিদেশে গেছেন। তাঁর শূন্য আসনে দুদিনের জন্যে এসে বসেছি বুঝিবা। সেই তিনি আজ ফিরে এসেছেন। যার ধন তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! যেখানে সত্যিকারের ভালোবাসা নেই, সেখানে জোর করে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যাওয়া বোকামি। তাতে শুধু বেদনাই নয়—অপমানও আছে। নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিলাম ঘরের মধ্যে। শুধু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—ওঁকে ডেকে বলি, "ওগো, তোমাকে যে তৃপ্তি দিতে পারিনি তা তো জানিই—তোমাকে মুক্তি তো দিয়েছি! কিন্তু আমার চোখের সামনেই কেন পাখা ঝাপটে বিক্রম দেখাচ্ছ? উপেক্ষা সইতে পারি, কেন অপমান যোগ দিচ্ছ তার সাথে? তুমি কি চেয়ে দেখ না, নীরজা, বামুনদি পর্যন্ত করুণার দৃষ্টিতে দেখে আমাকে?" ওরা সবাই জেনে ফেলেছে—আমি এ বাড়ির কেউ নই। কী লজ্জা! চোখ তুলে কারও দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারি না। কলেজের ছুটি তো হয়ে গেছে! ঠাকুরপো দেশে ফিরে গেলেও যে বাঁচতাম। তবু একটা লোকের কাছ থেকে অন্তত আড়াল করে রাখতে পারতাম এই দুঃখের ইতিহাস। দুনিয়ার একটা লোক অন্তত জানতো যে রাধারাণীই এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

রঙচঙ মেখে সঙ সাজা আমার দু চোখের বিষ। পারতপক্ষে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়াই না। ভুলে থাকতে চাই—আয়নার ভেতরের ঐ রোগা কালো মেয়েটাকে। আয়নার সামনে গেলেই ওদিক থেকে ঐ মেয়েটাও এসে দাঁড়ায়....আর মনে পড়ে যায়, আমি কালো—আমার রূপ নেই! লক্ষ্য করলাম আমার ড্রেসিং টেবিলটার তাকে ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছে হরেক রকমের শিশি কৌটো। মনু ঐ আয়নার সামনে দিনে কতবার যে দাঁড়ায়! কখনও মাথার চুলগুলো গুছিয়ে নেয়, কখনও পাউডার-মাউডার মাখে, কখনও নখে রঙ লাগায়—মিষ্টি লজেঞ্চুসের গন্ধ সে রঙে! শুধু সকাল-সন্ধ্যা স্নানের পরেই নয়—যখন তখন মুখখানাকে মেরামত করছেই। রঙ-বেরঙের যে শিশি-কৌটোগুলো জমেছে টেবিলে তার মধ্যে দুটি আমার সাবেকি আমলের। আলতার শিশিটা আর রুপোর সিঁদুর কৌটো। উনি একবার একটা সেন্টের শিশি কিনে দিয়েছিলেন। সেটাও আছে। সীল খোলা হয়নি বলে উপে যায়নি। সেদিন লক্ষ্য করলাম তার পাশেই রয়েছে একটা নীল রঙের ছোট সেন্টের শিশি—একফালি চাঁদ আঁকা।

মনুকে বলি—"এই সেন্টের শিশিটা তো শেষ হয়নি। আবার একটা সেন্ট কিন্‌লি কেন?"

ও অবাক হয়ে বলে—"আমি আবার সেন্ট কিনলাম কখন? ও এইটে? তুমি ভেবেছ বুঝি এগুলো

আমি কিনেছি? ও হরি! এসব জামাইবাবু কিনে আনেন। আমাকে বলেছেন প্রসাধনবিদ্যা তোমাকে শিখিয়ে দিতে। আচ্ছা, রাধাদি, গরমের দিনেও তুমি পাউডার না মেখে থাক কী করে? আর এই একমাথা চুল কী জট করে রেখেছ এস বেঁধে দিই।"

বললাম, "থাক ভাই, আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের সাজন-গোজন চলুক।"

ও বলে, "তা কী করে হবে। এসবগুলো যে তোমার জন্যেই কিনেছেন উনি।"

আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলি, "না, আমার জন্য নয়।"

ও বোধহয় খেয়াল করে না। হাসতে হাসতে বলে, "তবে কি আমার জন্যে? পাগল হয়েছ নাকি? আমার জন্যে কিনলে এই নামের রুজ-লিপ্স্টিক কখনও কিনতেন উনি?" বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

রসিকতাটা বুঝতে পারিনি। পরে ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও বুঝিয়ে দেয়নি। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল শুধু। মরুক গে। ও কথা আর ভাবব না।

এতদিন সময় কাটতে চাইত না। সারাদিন শুয়েবসে কী করি? উনি চলে যেতেন কলেজে। ঠাকুরপোও। আমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে শুতাম। আর শুয়েই তো কাটে সারাদিন। হয়তো রেডিয়েটা খুলি। বই পড়ার বাতিক কোনওদিনই নেই। নইলে হয়তো কাটতো ভালো। রেডিয়োটা একঘেয়ে লাগে। কেবল বক্তৃতা, তার আবার অর্ধেক বোঝাই যায় না। মাথার ওপর ঘুরতে থাকে বিজলি পাখাটা। তার একটানা ভোঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজটা বেশ ঘুমপাড়ানি। ছেলেবেলায় পিসিমা আমাদের ঘুম পাড়িয়ে চরকায় বসতেন। ঠিক তেমনি আওয়াজ। ঐ পাখাটা আমায় ছেলেবেলার ঘুমপাড়ানিয়া গান শোনায়। নীরজা এসে জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে যায়। চারদিক নিঝুম নিথর হয়ে আসত। হয়তো রাস্তায় হেঁকে যায় একটা ফেরিওয়ালা। না দেখেই আমি ওদের চিনতে পারি। অনেকে আবার হাঁকে না—বিচিত্র শব্দ করে। ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্—লোকটা চাবিতালা সারায়। ঝোলা গোঁফ, মাথায় পাগড়ি একটা লোক যায় ঠিক দুপুরবেলায়। এ্যালুমিনিয়ামের একটা থালা বাজিয়ে ঝাঁকা মাথায় একটা পশ্চিমা কুলি যায় পিছন পিছন—আলমনিয়াম বর্ত্তনবালাআ! ওদের সক্কলকে আমি চিনি। কখন কে আসবে মুখস্ত আছে আমার। দূর আকাশে সাঁতার-দেওয়া চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসত কখনও আচমকা। কখনও জেগে উঠত খোকন। উঃ, কী দুষ্টু যে হয়েছে। যখনই ঘুম আসবে তখনই খেলা শুরু হবে ওর! আর কলবল করে কত কথা! ঐ যে বলে না 'ছেলে ছেলে করবি, এমন ছেলে দেব যে গলায় গেঁথে মরবি।' আমারও হয়েছে সেই দশা। ঠিক সময় বুঝে ঘুম ভাঙবে ওঁর! আবার থাবড়াতে থাকি। টুলটুলে মুখটা টেনে আনি বুকে। তারপর আবার কখন চুকচুক করে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম নেমে আসত আমারও চোখে। গাঢ়, কালো নিথর ঘুম। ঘুম ভাঙতো একেবারে পড়ন্তবেলায়, কলে জল আসার শব্দে। নীরজা এসে খুলে দিত জানলাগুলো। পড়ন্ত রোদ্দুর বাঁকা হয়ে ঢুকতো ঘরে। তখনই উৎকীর্ণ হয়ে উঠতাম। একটু পরেই পরিচিত একটা জুতোর মশমশ শোনা যেত সদরে। উনি ফিরে আসতেন।

....হাসি পায়, যখন মনে হয় এই নিঃসঙ্গ জীবন আমার ভালো লাগেনি; তাঁতির তাঁতবোনার ব্যবসা পছন্দ হয়নি, চাষ করা শখ হল তার; এঁড়ে গোরু কিনে আনল। সময় কাটাবার জন্য মনুকে আনার কথা আমিই নাকি প্রথম তুলেছিলাম। হ্যাঁ, সময় কাটছে বটে আজকাল। বুকের ভেতর কেটে কেটে বসে যাচ্ছে প্রতিটি কঠিন ঘন্টা, প্রতিটি কঠোর দণ্ড!

* * *

সেদিন বিকেলে দরজায় কে কড়া নাড়তে উঠে এসে সদর খুলে দেখি যজ্ঞেশ্বর। ওঁর কলেজের বেহারা। একখণ্ড চিঠি এনেছে, বললে—"উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন।"

চিঠি খুলে দেখি ইংরেজি হরফ!

ওকে অপেক্ষা করতে বলে ঘরে ফিরে এলাম। বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে। আজ দিন-পনের এই একটা ব্যথা শুরু হয়েছে। কাউকে বলিনি—আর বলেই বা কী হবে? বসে পড়ি একটা চেয়ারে। দম বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ব্যথাটা যেন কমে আসে। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াই। এখন কী করি? ঠাকুরপোও কলেজ থেকে ফেরেনি। কাগজটা মুঠোর মধ্যে পাকাতে থাকি। মনু এসে বলে, "কী দিদি?"

কাগজখানা এগিয়ে দিই ওর দিকে। আমার স্বামীর মনের কথা আমি বুঝতে পারিনি—ও অনায়াসে বুঝে নিল। বললে—"জামাইবাবু লিখেছেন আজ সন্ধ্যার শো'তে তিনখানা টিকিট কেটেছেন। আমরা দুজনে যেন পাঁচটার মধ্যে তৈরি হ'য়ে থাকি।"

আমি বলি—"আবার সিনেমার টিকিট।"

মনু হেসে বলে, "হ্যাঁ, আবার সিনেমার টিকিট!"

গতকালকেই এ নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল। মনু তিনখানা টিকিট কেটে এনেছিল—কিন্তু ওর যাওয়া সম্ভব হল না। কী বুঝি জরুরি মিটিং ছিল। ঠাকুরপোও কিছুতে রাজি হল না। পুরুষমানুষ ছাড়া আমিও যেতে রাজি হইনি! মনু শেষ পর্যন্ত রাগ করে ছিঁড়েই ফেললে টিকিট তিনটে! আজ তাই উনি নিজেই টিকিট কিনেছেন!

ওকে বলি, "একখানা টিকিট কম কাটতে লিখে দাও। আজ বিষ্যুদবার, আমার লক্ষ্মীপুজো আছে!"

মনু আমার হাত দুটি ধরে বলে, "তোমার দেওরকে বল না দিদি—দুটো বাতাসা ফেলে পাঁচালিটা পড়ে রাখবে।"

—"সে হয় না। আর তাছাড়া কালকেই তো বলেছি—ইংরেজি বই আমি বুঝতে পারি না।"

—"আমি গল্পটা না হয় তোমায় বলে দিচ্ছি।"

—"কেন বিরক্ত করছ আমাকে?"

মনু আর পীড়াপীড়ি করে না! একখণ্ড কাগজে কী লিখে ফেরত দেয় বেহারার হাতে।

সন্ধ্যাবেলায় উনি ফিরে বলেন, "টিকিট তিনটে ফেরত দিয়ে রাতের শো'র করে এনেছি। তুমি লক্ষ্মীপুজো সেরে নাও—নটার শো'তেই যাব তিনজনে।"

আমি বললাম, "আমার শরীর ভালো নেই—বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হচ্ছে। ঠাকুরপোকে নিয়ে যাও বরং।"

উনি বোধহয় বিশ্বাস করলেন না। একদৃষ্টে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! তারপর মনুকে বলেন—"বুকের মধ্যে যখন ব্যথা হ'চ্ছে তখন আর পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। বেশ, তুমি বরং সুবিমলকেই তৈরি হয়ে নিতে বল।"

মনু বলল—"সেটা আপনিই বলুন, আমি বরং তৈরি হয়ে নিই ততক্ষণ।"

উনি ঠাকুরপোর ঘরের দিকে চলে যান। মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলেন—"সুবিমল যাবে না।"

শুনে মনু বেঁকে বসল। কিন্তু কোনো আপত্তিই শুনলেন না উনি। তা শুনবেন কেন? এতো আরো ভালো হ'ল। উনি জোর করে মনুকে পাঠিয়ে দিলেন কাপড়টা পালটে আসতে! রাত্রের শো'র এখনও অনেক দেরি; কিন্তু ওঁরা বোধহয় সান্ধ্যভ্রমণ সেরে সিনেমা দেখবেন—তাই তাড়াতাড়ি! মনু কাপড় ছাড়তে গেল। উনি চুপ করে বসে রইলেন ওঁর খাটে। দুজনে প্রায় দশ মিনিট বসে আছি। একটা কথা নেই। আমার বুকের মধ্যে সেই মোচড় দেওয়া ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। দম বন্ধ করে সহ্য করছি, আর মনে মনে মাথা খুঁড়ছি—কী লজ্জা! কেন ওঁকে বলতে গেলাম বুকের ব্যথার কথাটা? উনি তো বিশ্বাসই করলেন না! একটু শুতে পারলে হয়তো আরাম হত—কিন্তু ওঁরা রওনা হওয়া পর্যন্ত দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করতে হবে—ভেঙে পড়লে চলবে না।

মনু ফিরে এল। একটা আগুন রঙের শাড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে সাপটে ধরেছে ওর সারা দেহ। ঘরে ঢুকেই বলে "আমি রেডি!"

উনি হেসে বল্লেন, "রেডই, তবে পুরোপুরি রেড হলে না কেন? তুমিও যে সঙ্গদোষে গাঁইয়া হয়ে উঠেছ আজকাল। এই আগুন রঙের মাইশোর জর্জেটের সঙ্গে ঐ জ্যাকেটটা মানায় নাকি। যাও যাও, লাল-ব্রোকেডের ব্লাউজটা পরে এসো।"

মনু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "বাপরে বাপ! আপনি তো সায়েন্সের প্রফেসর। এসব দিকে এত নজর কেন?"

উত্তরে উনি ইংরেজিতে কী বল্লেন! ওরা দুজনেই হেসে ওঠে। মনুর সেই খিলখিল হাসির ধমক যেন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে ধরে নিঙড়োতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বুজে মনে মনে কাতরাতে থাকি। ওরা চলে যায়। আর লজ্জা নেই। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ি বিছানায়। বালিশটা টেনে নিই বুকের তলায়।

কাঁদতে কষ্ট হচ্ছে, বুকের ব্যথাটা বাড়ছে—কিন্তু এতক্ষণ ধরে রাখা চোখের জলকে এখন মুক্তি না দিলেই বাঁচবই বা কী করে? বেড-সুইচটা নিভিয়ে দিই। অন্ধকার ঘরে প্রাণভরে এখন কাঁদব আমি। এতক্ষণ ওদের সামনে যে ভেঙে পড়িনি এটুকুই সান্ত্বনা।

কতক্ষণ কাঁদছিলাম জানি না। হঠাৎ মাথায় একটা নরম হাতের স্পর্শ লাগায় চমকে উঠি।

—"কে?"

—"আমি!"

—"কী হয়েছে ঠাকুরপো?"—আমি উঠে বসি।

ঠাকুরপো কখনও এমন সাড়া না দিয়ে আমার ঘরে আসে না! তাছাড়া অন্ধকার ঘর, আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ এভাবে ও এসেছে কেন?

ও বসে পড়ে আমার পায়ের কাছে। বলে, "ভাবছি এবার ছুটিতে আর বাড়ি যাব না। বাবাকে তাই লিখে দিয়েছি। ছুটিটা এখানেই থাকছি, বুঝলে?"

আমি অন্ধকারেই ঘাড় নেড়ে জানাই বুঝেছি।

—"আর একটা কথা বৌদি। কিছু মনে কর না, আমি যখন ছুটিতে এখানেই থাকছি তখন কথা বলার লোকের তো আর তোমার অভাব হবে না। তোমার বোনকে এবার ফিরে যেতে বল।"

মনে আছে, মনুকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "ঠাকুরপোকে তাড়িয়ে তোর কী লাভ?" আজ কিন্তু ওকে সেই কথাটা বলতে পারলাম না।

ঠাকুরপো আল্‌তো করে ডানহাতটা আমার পায়ের পাতায় রাখে। বলে—"তুমি ভুল করে আমাদের যুগে এসে পড়েছ বৌদি। কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষ তুমি, সেই সত্যযুগের। তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?"

কী জবাব দেব? আমি তো সবই বুঝি, সবই জানি; কিন্তু যে বন্যাকে বাঁধতে পারব না তার সামনে বালির বাঁধ দিয়ে কী হবে?

সুবিমল বলে, "এখন তুমি বুঝবে না, কিন্তু একদিন দেখবে আজকের এই ভুল তোমার সংসারটা তেতো করে দেবে।"

এত দুঃখেও হাসি আসে। ঠাকুরপো আমাকে শেখাবে সংসারের তিক্ততা! হেসে বলি, "তুমি তো এত লেখাপড়া শিখেছ ঠাকুরপো। বলতে পার—সবচেয়ে তেতো কী?"

ও বলে "কী?"

—"নিম তেতো, নিশিন্দে তোতো, তেতো মাকাল ফল,—কিন্তু তার চেয়েও কী তেতো জান?"

ঠাকুরপো বলে, "কী আবোল-তাবোল বকছ? কী বলতে চাও বল না?"

"বলবার আমার কিছুই নেই ভাই; কিন্তু কী করতে পারি বল?"

ও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অনেকটা ভারী গলায় বলতে থাকে—"আমার মাকে কখনো চোখে দেখিনি। আমার বড় বোনও নেই। মেয়েদের স্নেহ-ভালোবাসা কাকে বলে জানতেম না এতদিন। তোমাকে পেয়ে আমার মনের জোর বেড়ে গেছে; তুমি তো জান না, ধ্রুবতারার সন্ধান পেয়েছি আমি তোমার মধ্যে। কোনো অন্যায়, কোনো লোভ, পাপ যখন আমায় প্রলোভন দেখায় আমি তখন হেসে বলি—তোরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবি না। বৌদির আশীর্বাদ আছে আমার রক্ষাকবচ! আমার সেই বৌদির শুভাশীর্বাদের বেড়া ডিঙিয়ে তোরা আমাকে স্পর্শ করতে পারবি না।"

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলি—"হঠাৎ একথা কেন ঠাকুরপো?"

ও বলে, "তোমাকে এভাবে তিলে তিলে মরতে আমি দেব না বৌদি! আমি যে দেখতে পেয়েছি তোমার সর্বনাশের ছায়া। ওই সর্বনাশীকে না তাড়ালে তোমাকে হারাতে হবে।"

পাগল ছেলে! ওরে, কতটুকু ক্ষমতা আছে আমাদের? কলকাঠি যিনি নাড়ছেন তাঁর ইচ্ছায় কি বাধা দিতে পারবি? তোর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে তুই কি তাঁর বিধান পর্যন্ত পালটে দিতে চাস্?

—"তুমি ওকে তাড়াও বৌদি।"

আর এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। ও সবই বুঝেছে। তাছাড়া আমারও একজন সহায় দরকার। একজনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে না পারলে আমিও বুঝি বুক ফেটে মরে যাব। জানি, এ রোগের

ওষুধ নেই। কিন্তু সান্ত্বনা তো আছে। এই একজন আছে—এর কাছে অন্তত মনটা হালকা না করলে বাঁচি কী করে? বলি—"সবই তো বুঝতে পার ঠাকুরপো, বল কী করতে পারি আমি?"

—"না। সবটা আমি বুঝতে পারিনি। তাইতো আমি উপায় খুঁজে পাইনি। আসল গলদটা কোথায় তা আজও আমি জানি না। তোমাদের দুজনকে আজ তিন-চার বছর ধরে দেখছি। অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছি বটে—তবে আরও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। আমার কাছে সব কথা খুলে বলতে পারবে? কোন সঙ্কোচ না করে?"

একটু অপেক্ষা করে বললাম—"বলব। উনি আমাকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু পরে ওঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে ওঁর মনের মিল হতে পারে না। আমার পূজা-অর্চনা বার-ব্রতে ওঁর বিশ্বাস নেই, আবার উনি যেরকম ভাবে আমাকে চান আমিও সেরকম হতে পারি না। সেরকম রঙ-চঙ মেখে ওঁর হাত ধরে পথে বের হতে পারি না। তাই আমাকে নিয়ে উনি তৃপ্তি পান না।"

ঠাকুরপো অসহিষ্ণুর মতো বলে, "এসব তো আমি জানিই; কিন্তু আরও কারণ আছে কিছু—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। হয়তো সঙ্কোচ করে বলতে পারছ না. পারলে ভালো করতে। আমাকে কেন ছোট ভাইয়ের মতো নিতে পারছ না বৌদি? কেন সত্যি কথাটা, আসল কথাটা, এড়িয়ে যাচ্ছ?"

—"আসল কথা আর তো কিছু নেই ভাই।"

—"আছে। আর সেই কথাটা জানি না বলেই সব কথার অর্থ বুঝতে পারি না। এতদিন কেন খোকন আসেনি তোমাদের সংসারে? আজই বা এল কেন? খোকন আসার আগে আর পরে দাদার কোনো পরিবর্তন তুমি লক্ষ করেছ কিনা?"

আমি চুপ করে থাকি। তোমরাই বল ভাই—এর কি কোনো জবাব আছে? আর থাকলেও তা কি ওকে বলা যায়? ঠাকুরপো যদি সত্যিই আমার ভাই হত তা হলেও কি বলা যেত? বোন হলেও কি বলা সম্ভব?

ঠাকুরপো হঠাৎ আমার পা দুটি চেপে ধরে বলে, "তুমি আমার বৌদি নও—তুমি আমার না-দেখা মা। মনে কর এ ঘরে আমি নেই! নিজের মনেই কথা বলছ তুমি। সব কথা শুনব বলেই আলোটা জ্বালিনি। তুমি আমায় সব কথা বল। আমি নিশ্চিত জানি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছেই তোমাদের জীবনে। আজ দাদা ঐ মেয়েটিকে নিয়ে মেতেছেন এর নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। দাদা তোমাকে প্রাণের চাইতেও ভালোবাসতেন—একথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। আজ নিশ্চয়ই তিনি তোমার কাছে এমন কোনো আঘাত পেয়েছেন যাতে তাঁর মন অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছে। তিনি যেন ইচ্ছে করেই আঘাত দিচ্ছেন তোমাকে! একথা কি সত্যি নয়?"

আমি নির্জীবের মতো বলি—"কী জানি?"

"তুমি কি দাদাকে কোনো আঘাত দিয়েছ? তাঁকে কি দূরে ঠেলে দিয়েছ খোকন আসার পর?"

সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলি—"ঠিক উল্টো। খোকন কোলে আসার পর থেকে উনিই আমায় এড়িয়ে চলেন।"

—"তিনি কি সন্তান চাননি?"

বললাম, "না, কোনোদিনই তিনি চাননি যে আমি মা হই।"

ঠাকুরপো একটু চুপ করে থেকে বলে, "আশ্চর্য! আমার মনে হয়েছিল তুমি মা হতে চলেছ জেনে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।"

—"তা সত্যি, উনি খুব খুশি হয়েছিলেন সেকথা শুনে।"

ঠাকুরপো প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে, "কী আবোল-তাবোল বকছ! এই বলছ তিনি কোনোদিন সন্তান চাননি, আবার বলছ খোকনের আগমন-সংবাদে তিনি খুশি হয়েছিলেন—কোনটা সত্যি?"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"কী বল্‌ব ভাই। দুটো কথার একটাও মিথ্যে নয়। ওঁকে কোনোদিনই আমি বুঝতে পারিনি। পারবও না কোনোদিন।"

ও বিরক্ত হয়ে বলে, "কিন্তু আজকের ওঁকে তো বুঝতে পারছ? যত শীঘ্র পার তোমার বোনটিকে বিদায় করার ব্যবস্থা কর।"

ওকে বোঝাই, সেটা এখন অসম্ভব। মনুকে সারা ছুটি এখানে এসে থাকবার জন্যে ডেকে এনেছি। এখন কি বলা যায়? তাছাড়া ওকথায় উনি যদি রাজি না হন! না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

—"তুমি যদি না বলতে পার, তবে আমিই বলব দাদাকে। তাতে উনি যা ইচ্ছে ভাবুন।"

—"ছি ভাই, সেটা বিশ্রী দেখাবে। উনি কী ভাববেন?"

—"তা জানি না, তবে বর্তমানে যা চলছে সেটাও এমন কিছু সুশ্রী নয়। কিন্তু এভাবে ওকে সর্বনাশ করতে দেব না আমি।"

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, "সবই কপাল আমার, কী মনে করে ওকে আনলাম, আর কী হয়ে গেল। ওকে কেন এনেছিলাম জান? ঐ মেয়েটা একদিন আমার হাতে মানুষ হয়েছিল। তখন ওর বাবা বিলেতে। ওরা থাকত আমাদের পাশের বাড়ি। আমার বাবা ছিলের ওর মায়ের গুরুদেব। ভাবি এক, আর হয় আর এক। তোমরা দুজনে মুখ ফিরিয়ে চাইলে না। চাইলেন আর একজন!"

ঠাকুরপো ধীরে ধীরে বলে, "তুমি আজ মন খুলে অনেক কথা বলেছ আমায়। আমিও সব কথা স্বীকার করব তোমার কাছে। কলেজে-পড়া এইসব অতিআধুনিক মেয়েদের কাউকে যে ভালোবাসব তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন। তবু তা সম্ভব হল—হয়তো তোমারই ঐকান্তিক ইচ্ছায়। আমি অবাক হয়ে ভাবতেম কী করে এ সম্ভব হল। কিন্তু এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বৌদি—যাকে সেদিন স্টেশনে এক ঝলক দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম—আজ তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি।"

আমি প্রশ্ন করি, "তোমার সঙ্গে ওর স্টেশনে দেখা হয়েছিল?"

প্রশ্নটা বোধহয় ও শুনতে পায় না অথবা খেয়াল করে না। আপনমনেই বলে যায়। কত কী আবোত-তাবোল। ও নাকি কী একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। এখন বুঝেছে সে যা জানত তা ভুল। স্টেশনে মনুকে দেখেই ওর ধারণাটা পালটেছে কিন্তু এখন ওর মন ভেঙে গেছে। যাকে এত ভালোবাসত আজ তাকে শুধু ঘৃণাই করে—আর কিছু না। বল্‌তে বল্‌তে ওর গলা ভার হয়ে আসে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার কথা কিছু বলতে যাই! ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্বলে ওঠে বিজলি বাতিটা। চমকে উঠি আমরা দুজনেই। ঠাকুরপো প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ে আমার খাট থেকে।

আলোর সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী। আর তার পেছনে আগুন রঙের শাড়ি পরা মনামী। তার খোঁপাতে একটা লাল গোলাপ! অথচ সিনেমা যাওয়ার সময় এটা ওর মাথায় ছিল না। কোথা থেকে এল ফুলটা? কে পরিয়ে দিল ওর খোঁপায়? কখন? না কি কেউই পরায়নি? এই তিন-চার ঘন্টার মধ্যে এমন কিছু ঘটে গেল নাকি, যাতে আপনিই ফুটে উঠেছে ঐ লাল গোলাপটা ওর কালো চুলের মাঝখানে?

আট

ওরা যেন ভূত দেখল! হঠাৎ আলোয় চমকে ওঠে আচমকা। সুবিমল লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খাট থেকে! রাত বারোটা! নাটকীয় দৃশ্য বটে! নারকীয়ও বলা চলে। বুঝলুম আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটু। অশোভন। তবু কে যেন পা দুটো শক্ত করে ধরে রাখে মাটির সঙ্গে।

জামাইবাবুর ভ্রূতে জেগেছে একটা কুঞ্চন। স্বাভাবিক। দৃশ্যটা স্পষ্টতই অপ্রত্যাশিত—তাঁর তরফেও। এ-সময়ে সুবিমল অন্ধকার ঘরে এভাবে উপস্থিত থাকতে পারে এটা তাঁর ধারণার বাইরে। আমারও।

সুবিমল কোনও কথা বলে না। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চলে যায়। আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যে বলি—তুমি তো গেলে না রাধাদি; কী গ্র্যান্ড বই! যদি দেখতে তবে বুঝতে।

জামাইবাবু গম্ভীর স্বরে বলেন—তুমি শুতে যাও মনু, রাত অনেক হয়েছে।

ফিরে এলুম নিজের ঘরে। একতলার খোলা ছাদে ক্যাম্প খাট ফেলা। সুবিমল শুয়ে পড়েছে। ছি ছি ছি। এটা যেন কল্পনাই করা যায় না। এতদিন কী সব ভুল বুঝেছি! এই জন্যেই কি দিদি-জামাইবাবুর মিল হয়নি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? জামাইবাবু এতদিন এটা বুঝতে পারেননি? আর পেরে থাকলে ঐ লোকটাকে সহ্য করেছেন কেন? ঘাড় ধরে পথে বার করে দিচ্ছেন না কেন?

কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! ঘরে ঢুকে খিল দিলুম দোরে। আয়নার সামনে দাঁড়াই। পোশাকটা বদলাব। লক্ষ্য হল আয়নার ভেতরে লালে-লাল মেয়েটিকে। টান মেরে খুলে ফেলি সব। লাল শাড়ি, ব্লাউজ, লাল গোলাপ! আলোটা নিভিয়ে দিই। কাচা কাপড়টা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ি বিছানায়। আশ্চর্য! চোখ ছাপিয়ে জল আসে কেন? কাঁদছি নাকি! কী কেলেঙ্কারী! গলার মধ্যে থেকে একটা বোবা কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। একি কাণ্ড! আমার কাঁদার কী কারণ থাকতে পারে? কেন এ চোখের জল? পরাজয়ের লজ্জা, ব্যর্থতার বেদনা!

কী ভাবছি পাগলের মতো? ইচ্ছে হ'ল উঠে বসে নিজের গালেই চড় মারি। ঠাস ঠাস করে। কীসের পরাজয়? কীসের ব্যর্থতা? ওকে জব্দ করতে গিয়েছিলুম, পারলুম না। ঠকে গেছি নিঃসন্দেহে। আর কিছু না। তার জন্যে তো কাঁদার প্রয়োজন নেই। আমি তো সত্যিই ওকে ভালোবাসতুম না!

ভালোবাসা! মনামী চ্যাটার্জী ভালোবাসবে ঐ গেঁয়ো ভূতকে! সিলি! সে কথা নয়, কিন্তু.....

আমি সুন্দরী। জানি সে কথা! না জেনে উপায় নেই। অনেকের কাছে অনেকবার শুনেছি কথাটা। যারা মুখে বলে না তারা জানিয়ে যায় চোখের ভাষায়! জানতুম, রূপমুগ্ধ পুরুষের দুনিয়া প্রতীক্ষা করছে আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। প্রশ্রয়ের সঙ্কেত। স্টেশনে ওর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ। ও দেখল এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। আমি দেখলুম ওর চোখে সেই প্রত্যাশিত দৃষ্টি। বুঝলুম, ভক্তদলের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হল ফের। সে কী গায়ে-পড়া আলাপ! "বৌদির যে বোন আছেন এটা অনেকদিন থেকেই জানি।" "হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে নেওয়া যায়।" ফ্ল্যাটারার! এক রিক্সায় বসিনি বলে নাকি ওঁর মানহানি হয়েছে! বেশ, দেখা যাবে মানীর মান কতদিন থাকে। দুদিনেই ভাব করতে আসবে ছুঁকছুঁক করে।

আশ্চর্য! লোকটা যেন ভ্রূক্ষেপই করল না আমাকে। কোনওদিন যেচে একটা কথা বলতে এল না! প্রথমটা আমিও ওকে এড়িয়ে চলতুম। কিন্তু উপেক্ষায় ফল হল না। ভীষণ রাগ হল। ভাবলুম শিক্ষা দিতে হবে। মনামী চ্যাটার্জীকে এভাবে উপেক্ষা করা যায় না। এ অপমান সে সইবে না! তাহলে বৃথাই এ রূপ। এ সৌন্দর্যের পুঁজি। ঠিক করলুম—ওর সঙ্গে যেচে ভাব করব! আলাপ করব গায়ে পড়ে। ওকে বুঝতে দেব যেন ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি, আকণ্ঠ। যখন সেটা স্থির বিশ্বাস হবে তখন ও এগিয়ে আসবে। কোনও এক আবছা সন্ধ্যায় ও আসবে মিনমিনে গলায় মিঠে মিঠে বুলি শোনাতে। কলকণ্ঠে হেসে উঠব তখন। বলব—আপনি বুঝি মনে ভেবেছেন আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। হাউ ফানি! এই প্রতিশোধ নেব বলেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ হয়েছিলুম! পিন দিয়ে ফুটো করতে মজা লাগে বলেই না বেলুনগুলো ফোলাই। শান্তনু রায়, প্রফেসর কে. জি. বি.-র চুপসে যাওয়া মুখগুলো মনে পড়ে। কেমন যেন চোয়ালটা ঝুলে পড়ে। বোকা বোকা চাহনি! রিডিক্লাস!

কিছুতেই ছেলেটা ফাঁদে পা দিল না। অত্যন্ত সতর্ক সে। হয়তো আন্দাজ করেছিল আমার মতলব। তাই আমি যেখানে এক পা এগিয়েছি ও সেখানে পিছিয়ে গেছে সাত পা। আর কী হতে পারে তাছাড়া? আমাকে ওর ভালো লাগে না, এটা বিশ্বাস হয় না। সে অসম্ভব।

রোখ চেপে গেল। একফোঁটা একটা ছেলের কাছে এভাবে হার মানতে হবে? জাল পাতলুম নানাভাবে। আশ্চর্য নিরাসক্ত ভাব দেখায় ও। কিন্তু আমি মানব কেন? আমি যে দেখেছি ওর চোখের তারায় সেই মুগ্ধ দৃষ্টি। ধরা ওকে দিতেই হবে। নতুন পথ ধরলুম। তর্ক বাধাতুম জামাইবাবুর সঙ্গে—ওর উপস্থিতিতে, বাঁকা ইঙ্গিতে আঘাত করতুম ওকে। ও নিশ্চুপ। শুনে যেত শুধু। যেন পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি। ওর জামায় বোতাম লাগিয়ে দিলুম—ছিঁড়ে ফেলল পটপট করে। ঘরটা সাজাতে গোছাতে দিলে না। বেশ, আমিও দেখব, এ তেজ কতদিন থাকে। ওকে আড়ালে ধরতে হবে। কিন্তু নির্জন-সাক্ষাৎ ও হতে দেবে না কিছুতেই। সরে গেছে বারেবারে। সেদিন জামাইবাবু সকাল সকাল খেয়ে নিলেন। দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে। বামুনদি রান্নাবান্না সেরে নিতেই ছুটি দিয়ে দিলুম তাঁকে। রান্নাঘরে ওর ভাত বেড়ে নীরজাকে দিয়ে ডাকতে পাঠালুম। ও দ্বার পর্যন্ত এসে দেখলে নির্জন ঘরে আমি ভাত আগলে বসে আছি। ও ফিরে গেল। নীরজা এসে বলে—দাদাবাবু ওঁর ভাতটা ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বললেন, দাও!

ও আমাকে কোন সুযোগ দেবে না। কোনও রকমেই না। কাল জামাইবাবুর একটা জরুরি কাজ ছিল সন্ধেবেলায়। আমি যেন ভুলে গেলুম সেকথা। তিনখানা সিনেমার টিকিট কিনে আনলুম।

জামাইবাবু যেতে পারবেন না শুনে একটু চমকে উঠতে হল। দিদিকে বললুম—তবে তোমার দেওরকে নিয়ে চল। টিকিটটা নষ্ট করে কী লাভ? দিদি ওকে বললে। অনেক করে। রাজি হল না। ধনুক-ভাঙা পণ যেন। শেষে দিদিও বেঁকে বসল। আমি রাগ করি। সিনেমা যাবার সাজপোশাক হয়ে গিয়েছিল। মায় প্রসাধনের শেষপর্যায়ে কাজলের তিলটিও আঁকা সারা চিবুকে। হন্‌হন্‌ করে চলে গেলুম ওর ঘরে। ও কী লিখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়। টেবিল ল্যাম্পটা ঘুরিয়ে দেয়। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে আমার মুখে। হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করি। বলি—আলোটা সরান। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

ও হাসলে, বলে—কোথায় সরাই বলুন—আলোও যে ঐ কথাই বলছে!

চমকে উঠি, বলি, —কী বললেন?

মুহূর্তে ও সামলে নেয় নিজেকে! হঠাৎ বলে ফেলেছে কথাটা। গম্ভীর হয়ে বলে—কী বলতে এসেছিলেন?

আমিও গম্ভীর স্বরে জবাব দিই—তিনখানা সিনেমার টিকিট কেটেছিলুম। ভেবেছিলুম জামাইবাবু যেতে পারবেন। কিন্তু তিনি জরুরি কাজে আটকা পড়েছেন। আপনি না গেলে দিদিও যাবে না।

—বেশ আপনি টিকিট তিনখানা দিন, আমি বদলে কালকের করে আনি।

—কেন, আপনারও কোন জরুরি কাজ আছে না কি?

—বিন্দুমাত্র না।

—তবে যেতে পারবেন না কেন?

—আমি সিনেমা দেখি না!

—ও! কারণটা জানতে পারি না?

—পারেন। একবার একটি অনাত্মীয়া মহিলার পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখেছিলাম। তারপর বেরিয়ে এসে তাঁর পাশাপাশি বসে ট্রামে করে বাড়ি ফিরতে পারিনি! সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছি—হয় সিনেমা 'হল্'-এ পৃথক মহিলা আসনের ব্যবস্থা হোক—না হয় ট্রামে-বাসে লেডিজ সিট উঠে যাক। এ দুইয়ের একটাও যতদিন না হচ্ছে ততদিন সিনেমা দেখব না।

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। রাগ করে ছিঁড়ে ফেললুম টিকিট তিনখানা! কান্না পেয়েছিল। কিন্তু কাঁদিনি। কেন কান্না পেয়েছিল তা বুঝিনি। আজ বুঝছি।

আযৌবন শুধু আঘাতই করেছি। আঘাত পাওয়াটা যে কেমন তা কোনোদিন অনুভব করিনি। আমার একসন্ধ্যা সান্নিধ্যের জন্যে কতজনকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে দেখেছি। আর ও লোকটা একদিনও চোখ তুলে তাকাল না। অপমান। কাল রাত্রে মনে হয়েছিল সেই অপমানের জ্বালাতেই চোখে জল আসছে বুঝিবা! আজ বুঝেছি ভুলটা।

কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা। ঐ অপদার্থ সামান্য লোকটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি! ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে অভিনয় শুরু করেছিলাম। কখন ভেতরে ভেতরে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছি তা জানতেও পারিনি। পেলুম একটি আঘাতে। ওকে দিদির শিয়রে অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে দেখে। মনের অগোচরে পাপ নেই। নিজের কাছ থেকে আর কী লুকোব? নিজের মনে তো জানি নিঃশেষে হেরে গেছি আমি।

কিন্তু ওর কী দেখে ভুললুম? রূপ? শিক্ষা? বিত্ত! ওর চেয়ে আমাদের ফোর্থ ইয়ারের শান্তনু সোম অনেক বেশি হ্যান্ডসম। ইংরাজির অধ্যাপক কে. জি. বি. অনেক বেশি পণ্ডিত। রায়বাহাদুরের ছেলে অনেক বড় সম্পত্তির মালিক। এদের তো অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছি। কখনও কঠোর হয়ে, কখনও হেসে ব্যঙ্গ করে। এ ছাড়া কত অসংখ্য ছেলের চোখে দেখেছি আমার আহ্বানের অপেক্ষা করা দুঃসাহসের কম্পন। গ্রাহ্যও করিনি। মনে আছে কে. জি. বি. যেদিন গদগদ কণ্ঠে প্রথম প্রেম নিবেদন করলেন, সেদিন বলেছিলুম—আমাকে এবার ট্রান্সফার নিতে হবে স্যার।

—কেন?

—কারণ আই. এ.-টা না পাশ করতেই আপনি যে পরের ডিগ্রিটা পাইয়ে দিতে চাইছেন। এরকম লাফিয়ে চলা কি ভালো?—

—হেলেন, নূরজাঁহা অথবা ক্লিওপেট্রাও কিছু বাঁধা ধরা পথে চলেননি; তুমিও না হয় একটু উল্টো-পাল্টা চললে!

হেসে বলেছিলুম—উল্টোপাল্টা পথে ছুটতে তো আমিও চাই মাস্টারমশাই; কিন্তু কোথায় আমার প্যারিস, জাহাঙ্গীর অথবা অ্যান্টনি? সন্ধান যে পাই না। চোখ চাইলেই হয় কলমধারী কেরানি অথবা ইংরাজির ইস্কুল-মাস্টার!

আজ মনে পড়ছে অনেকের কথাই। অনেক দিনের অনেক পাপ জমা হয়ে আছে। অভিশাপ। অনেকের অভিশাপ সঞ্চিত হয়েছিল আমার জীবনে। তাই যে মনামীর কাছে হার মেনেছিল আই. সি. এস.-তনয়া ডলি দত্ত, ট্রান্সফার নিয়েছিল ডরোথি ডিক্রুজা—সেই দিগ্বিজয়ী মনামী চ্যাটার্জী মরল গোষ্পদে! আমাকে উপেক্ষা করে ও গিয়ে হাত পেতেছে রাধাদির কাছে।

সব দিক দিয়েই হেরে গেলুম। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে আমার। শেষ দিকে ওর মনে ঈর্ষা সঞ্চার করতে চেয়েছিলুম। ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে, ওর চোখের সামনে দিয়ে বেড়াতে যেতুম জামাইবাবুর হাত ধরে। এটা দৃষ্টিকটু জানি। ভেবেছিলুম দিদিকে ও শ্রদ্ধা করে। ভক্তি করে। অন্তত তাকে রক্ষা করতেও ও ছিনিয়ে নেবে আমাকে, জামাইবাবুর কাছ থেকে। তাই জ্বালা ধরিয়ে দিতে চেয়েছি ওর মনে। হায় রে! তখন কি জানতুম যে ও দিদিকে ভক্তি করে না—ভালোবাসে। জামাইবাবুকে আড়ালে নিয়ে যাওয়ার ওর লোকসান হয়নি। লাভ হয়েছে! সুযোগ বেড়েছে!

রাত অনেক। সমস্ত চরাচর থমথম করছে। বাড়িটা ঝিমোচ্ছে অন্ধকারে। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরে কথাবার্তা চলছে। চাপা কণ্ঠে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলুম খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, দিদি-জামাইবাবুর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। উঠলুম। দরজাটা খুলি। এসে দাঁড়ালুম বারান্দায়। ঢং ঢং করে দুটো বাজল। দিদির চাপা কান্নার আওয়াজ। হঠাৎ দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন জামাইবাবু। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ি একটা থামের আড়ালে। জামাইবাবু সোজা চলে গেলেন বাইরের ঘরে। নৈঃশব্দ্য! লাইব্রেরি ঘরের বাতিটা জ্বলল না। বোধ হয় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছেন। দিদির ঘরেও আলোটা জ্বলল না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিশ্বচরাচর স্তব্ধ। নিদ্রাচ্ছন্ন। কী জানি কী ভেবে পা বাড়াই লাইব্রেরি ঘরের দিকে। হয়তো দুটো সান্ত্বনার কথা বলতুম জামাইবাবুকে! হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনতুম দিদির ঘরে! ঠিক কী ভেবেছিলুম জানি না। হয়তো কিছুই ভাবিনি। একপা অগ্রসর হতেই কাঁধের উপর একটা স্পর্শ পেলুম। অতর্কিত শীতল স্পর্শ!

সুবিমল!

আমি একেবারে অবশ। শেষ রাতের ঘোলাটে চাঁদের ম্লান আলোয় ওকে আবছায়া দেখা যায়। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। গাছ-কোমর করে কোঁচার খুঁটটা মাজায় জড়ানো। সুগঠিত স্বাস্থ্যবান দেহ। বাম স্কন্ধের উপর থেকে ওর সেই দরাজ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক চিলতে পৈতে। কোথায় যেন একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল। হঠাৎ এ কী হল! যে লোক এড়িয়ে গেছে আমাকে দিনে-রাতে, উপেক্ষা করেছে, অবজ্ঞা করেছে, মাঝরাতে সে এভাবে ধরা দিল! সমস্ত শরীর আমার থরথর করে কেঁপে ওঠে। মনে হল, একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে এইমাত্র উঠলুম। এক-আধদিনের নয়। এ আমার আযৌবনের দুঃস্বপ্ন। আমার সমস্ত অভিমান দূর হয়ে গেল। সব গর্ব সব অভিমান নিঃশেষ। সে-ই হার মেনে ধরা দিল; কিন্তু আমার আর কলকণ্ঠে হেসে ওঠা হল না। দুচোখ ছাপিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে বোবা কান্নাটা। ওর বুকে মাথাটা আশ্রয় পাবার আগেই ও বলে—আপনার শোবার ঘরটা এদিকে।

চমকে উঠে বলি—মানে?

—মানে, আপনি যে-পথে চলেছেন ওটা ভুল পথ। ওদিকে লাইব্রেরি। ওখানে দাদা একা আছেন। এখন মধ্যরাত্রি। আপনার শয়নকক্ষ এদিকে।

শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলি—ও! তাই নাকি? আর এ-ঘরে যখন আপনার বৌদি একা শুয়ে কাঁদছেন—তখন আপনার শয়নকক্ষ বোধ করি এটিই।

শাট্ আপ! গর্জে ওঠে সুবিমল। স্থান কাল পাত্র ভুলে। জ্বলে ওঠে বারান্দার লাইটটা।

—কে ঠাকুরপো, মনু? কী করছিস তোরা ওখানে এত রাত্রে?

জবাব দিই না। দ্রুতপদে চলে আসি ঘরে।

যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালেই ফিরে যাব। এখানে আর নয়। এখন বাকি রাতটুকু ঘুম হলে হয়।

নয়

বাকি রাতটুকুও চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। বিনিদ্র নয়নে সোনালি চুমকি বসানো বিশ্বজোড়া কালো চাঁদোয়ার নীচে অনড় হয়ে পড়ে রইলেম। মনে হচ্ছিল এই যে আকাশ-জোড়া অন্ধকার এও তো জীবনেরই এক প্রকাশ! দিনের প্রখর আলোয় যখন প্রাণচঞ্চল জগৎ জেগে উঠবে তখন মনে হবে এই অনন্ত অন্ধকারের আলো-আড়াল-করা ইশারাটা বুঝি অহেতুক পাগলের প্রলাপ। কিন্তু এই তারা-ভরা আকাশের তলায় মনে হচ্ছে কেবল আলো, কেবল আনন্দ, কেবল উচ্ছ্বাস নিয়েই জীবন নয়। সে আরও ব্যাপক, তার অর্থ আরও গভীর। সে এই রাত্রির মতো গূঢ়, অন্ধকারের মতই নিঃসীম। কোথায় কোনো এক সুবিমলের জীবনের ব্যর্থ প্রেমের উৎস শুকিয়ে গেল, কোন পূজার জন্য চয়িত ফুল ব্যভিচারীর লালসায় ইন্ধন জোগানো, কোথায় কোন পাখির যত্নে-গড়া বাসা ভেঙে গেল ঝড়ের ক্ষ্যাপামিতে—তাতে এই জগৎ-জোড়া সৃষ্টিতত্ত্বের কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয় না। মনামীকে ভালোবেসেছিলেম; সে আমাকে ভালোবাসতে পারলে না। না হয় নাই পারলে; তাই বলে কি জগৎ-সংসার কালো হয়ে উঠবে? ঐ যে প্রেয়সীর চোখের কালো তারার মতো ঐ তারাটা অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে আছে—ওর দীপ্তি তো একবিন্দুও কমেনি এতে।

মনুকে আমি দোষী করিনে। আমার মতো কতো ছেলে হয়তো প্রেমভিক্ষা করেছে ওর কাছে। সৌন্দর্যের সিংহাসনে ও রাজেন্দ্রাণী। অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জরণ করে ফেরে ওর যৌবনের মৌবনে। কিন্তু দাদার প্রতি এ ওর কী ব্যবহার! ঈর্ষার কথা নয়;—আমি শুধু ভাবছি—কেন এভাবে ও ভেঙে দিচ্ছে একটা গড়া সংসার। কাল সকালেই দাদাকে বলব মেয়েটাকে বিদায় দিতে। হয়তো উনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবেন। কারণ জানতে চাইবেন। কী বলব? কিন্তু হয়তো তিনি কোনো কথাই জানতে চাইবেন না। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে অধ্যাপক অবনীমোহনও যথেষ্ট সচেতন।

নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। ধীরে ধীরে পুব আকাশটা রাত্রির ঘন কালো যবনিকা অতিক্রম করে সামনে এসে দাঁড়ায়, জ্বলে ওঠে প্রভাতসূর্যের পাদপ্রদীপ। শুরু হয়ে যায় বিশ্বজোড়া দৈনন্দিন অভিনয়। নানা সুরে একদল ঘুম ভাঙা পাখির ঐকতানের আবহসঙ্গীত। পূর্ব আকাশের রঙ্গমঞ্চে যেই জ্বলে উঠল হাজার বাতির স্পটলাইট, অমনি প্রেক্ষাগৃহের চন্দ্রাতপে হাজার বাতি নিভে গেল একে একে। বিদায় নিল তারা। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে শেষরাত্রের। আমি উঠে পড়ি। খোলা ছাদে পায়চারি করতে থাকি। সারারাত একফোঁটা ঘুম হয়নি। মাথাটা ভার ভার লাগছে। হঠাৎ লক্ষ্য হল মনামীর ঘরে বাতি জ্বলছে। ভোর রাতে কী করছে ও? অনেকক্ষণ জ্বলছে আলোটা। বাইরে তখন বেশ আলো ফুটেছে। ঘরের ভেতর বোধহয় যাই-যাই করেও ঘুমকাতুরে অন্ধকার আঁকড়ে রয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই ওর ঘরের দিকে।

ও কী গোছগাছ করছিল। আমাকে এভাবে উঠে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রশ্নভরা চোখ তুলে তাকায়। ওরও বোধহয় ঘুম হয়নি সারারাত্রি। চোখের কোলটা কালো হয়ে আছে। ওর মশারিটা তোলা। খাটের ওপর সুটকেস। কয়েকটা শাড়ি পাট করে তুলছিল তাতে। দুজনেই নীরব। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি, আপনার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে উঠে এলেম। কয়েকটা কথা বলার ছিল আমার। আসতে পারি?

—আসুন—টুলটা ঠেলে দেয় আমার দিকে।

আমি বসি না। ইতস্তত করি।

ও একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওকে। নরম শরীর। একরাত্রির জাগরণ-ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখদুটো লাল। কেঁদেছে? কাঁদবার তো কোনো কারণ নেই। না কি রাত্রি জাগরণে? ভারী মায়া হ'ল। কাল রাত্রে কী করে এই মেয়েটির সম্বন্ধে বৌদিকে বলেছিলাম—ওকে শুধু ঘৃণা করি! কই আমার সুগোপন প্রেমের গায়ে তো একবিন্দু মালিন্য লাগেনি। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটা পাখির হালকা পালকের মতো শুধু ভেসে ভেসে বেড়াতে থাকে।

ধীরে ধীরে বলি : কাল রাত্রের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে মাপ করবেন।

—কোন্ ব্যবহারে?

—আশা করি বুঝতেই পারছেন।

—না পারিনি। কাল রাত্রে আপনার অনেকগুলি আচরণই লজ্জা পাওয়ার হেতু হতে পারে। ঠিক কোনটা 'মীন' করছেন বুঝতে পারছি না।

বুঝলেম সমস্ত বুঝেও বাঁকা ইঙ্গিতটা করতে ছাড়ছে না। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে মনটা ভেসে বেড়াচ্ছিল, এতক্ষণে সেটা স্থির হল। একটু সামলে নিয়ে বলি, সে যাই হোক, এরপর ছুটির বাকি দিন কটা আপনি অন্যত্র কাটাতে গেলেই ভালো হত না কি?

ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। এটা বোধ হয় ওর একটা মুদ্রাদোষ। কিন্তু কী সুন্দরী লাগে যখন অভিমানে, রাগে অথবা অপমানে ও অমনি করে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়ায়! ও বলল, আর একটু পরিষ্কার করে বললে খুশি হতুম।

বললেম, পরিষ্কার অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু কী জানেন, সেটা আপনার পক্ষে লজ্জার, আর আমার পক্ষে সঙ্কোচের। আপনি বুদ্ধিমতী, অনায়াসেই বুঝতে পারেন একটি বিবাহিত নরনারীর সংসার এভাবে ভেঙে দেওয়াটা পাপ।

ও হেসে বলে, তাই নাকি! আমি না হয় বুদ্ধিমতী, কিন্তু আপনাকেও কিছু আকাট মূর্খ বলে তো মনে হয়নি আমার। কথাটা কি আপনারও বোঝা উচিত নয়?

—মানে? কী বলছেন আপনি?

—মানেটা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারি। তবে কী জানেন, কথাটা আপনার পক্ষে নির্লজ্জতার, দিদির পক্ষে কলঙ্কের আর আমার পক্ষে ন্যক্কারজনক। তাই এ সকালবেলায় ও আলোচনাটা থাক।

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। বলি, মিথ্যা দিয়ে এভাবে সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না, মনামী। ভেবেছ, মিথ্যা দোষারোপ করে খানিকটা কর্দম নিক্ষেপ করলেই আমি সঙ্কোচে সরে দাঁড়াব? আমাকে তুমি ভুল চিনেছ। আমি সে জাতের ছেলে নই। তুমি কী ইঙ্গিত করে নিজের অপরাধ গোপন করতে চাইছ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তুমি বলেই এতটা ভাবতে পেরেছ—আর কেউ হলে একথাটা ভাবতেও পারত না।

মনামী আহত নাগিনীর মত মাথা খাড়া করে দাঁড়ায়। বলে, সুবিমলবাবু, ঠিক ঐ কথাগুলিই আমি বলতে চাই। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না। আমি স্বীকার করতে ভয় পাই না। হ্যাঁ স্বীকার করছি মুক্তকণ্ঠে—অবনীমোহনবাবুকে আমি ভালোবাসি। তিনি পুরুষমানুষ, আমি কুমারী কন্যা—আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসি সেটা না অন্যায়, না পাপ। তিনি যদি আমাকে বিবাহ করতে চান,—আমি রাজি আছি। এই আমার কৈফিয়ত। এবার আপনি জবাবদিহি করুন দেখি! আপনি এমনি জোর গলায় স্বীকার করতে পারেন আপনার আচরণ? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, যার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নির্জন মধ্যরাত্রের অন্ধকারে একই শয্যায়—

—সুবিমল!

চমকে পিছন ফিরে তাকাই। মনামী নির্বাক। দাদা এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বারপ্রান্তে।

—তোমাকে ডাকছেন একবার তোমার বৌদি।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসি। দাদা কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন? কতখানি শুনেছেন আমাদের কথোপকথন? বৌদির ঘরে এসে বৌদিকে দেখে শিউরে উঠলেম। একরাত্রে এ কী পরিবর্তন হয়েছে বৌদির! বসে পড়ি ওর পায়ের কাছে। বৌদির চোখে লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে বুকে-পিঠে, কোলের ওপর। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল। আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, আমার একটা কথা রাখবি ভাই?

বললেম, তুমি বললে কোন্ কথাটা কবে রাখিনি বল?

—তুই বাড়ি যা। আর....আর বাড়িতে বলিস, এখানে থাকলে তোর পড়াশুনার অসুবিধা হয়। ছুটির পর তাই হস্টেলে এসে উঠতে হচ্ছে তোকে।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলি, বৌদি, দাদাও কি তবে ভুল বুঝলেন?

বৌদি আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। ফুলে ফুলে কী কান্না তার।

ধীরে ধীরে চলে এলেম ঘরে। দাদার ওপর যেটুকু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট ছিল তাও মুছে গেল নিঃশেষে। 'উইনসম ম্যারো' না হলে যাঁর সান্ধ্যভ্রমণ ভালো লাগে না, বাজার উজাড় করে যিনি 'ঈভ্‌নিং ইন

প্যারি' সেন্ট আর 'কিস্‌মি' লিপস্টিক কিনে আনছেন, তাঁর যোগ্য ব্যবহার বটে। হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

যেতেই যদি হয় তবে এখনই যাব। নিঃশব্দে, যেমন করে ঐ ভোরের তারাটা মিলিয়ে গেল চুপিসাড়ে। এ সংসারে আমার কীসের বন্ধন? আমি কে? মনামীরই একটি পূর্বতন সংস্করণ—অতিথিমাত্র। কোনো জোর নেই আমার। অথচ কী অদৃষ্টের পরিহাস, বোধহয় পাঁচ মিনিটও হয়নি—এই আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেম মনামীর দ্বারে, এ বাড়ির শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে। জোরের সঙ্গে দাবি জানিয়েছিলাম—ওকে চলে যেতে হবে। তখন কি স্বপ্নেও জানতেম—থাকবে ও-ই, যেতে হবে আমাকে?

জানি, বাসিমুখে এভাবে চলে গেলে বৌদি দুঃখ পাবে, হয়তো কাঁদবে! কিন্তু এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকা অসম্ভব! মনামীর সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগেই, তার দাঁত-দিয়ে-ঠোঁট-কামড়ানো বাঁকা হাসি আর বিদ্রূপভরা বক্র কটাক্ষের উদয়ের আগেই অস্তমিত হতে চাই। বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কী? কয়েকটা বই জামা-কাপড় সুটকেসে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পথচলতি রিকশা ডাকি একটা। বাকি জিনিস থাক, পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কী অনায়াস এই বিদায়ের পালাটা। কেউ জানে না—এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। রিকশায় উঠবার আগে একবার পেছন ফিরে দেখলেম বাড়িটার দিকে। উঠোনের ওপ্রান্তে বামুনদি হাতপাখা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করছে উনানে। নীরজা বারান্দা মুছছে জল-ন্যাকড়া দিয়ে। বারান্দার ঘুলঘুলিতে দুটো ব্যস্তবাগীশ চড়ুই এই সাতসকালেই খড়কুটো নিয়ে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। ওরা বাসা বাঁধছে। হয়ত একটু পরেই ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নীরজা আসবে আমার ঘরে। আমাকে না দেখে ভাববে, এক্ষুনি আসবে দাদাবাবু। প্লেট দিয়ে কাপটা ঢাকা দেবে; জুড়িয়ে না যায়। বেলা না-বাড়া পর্যন্ত ওরা জানতেও পারবে না, আমি চলে গেছি। চিরদিনের জন্যেই চলে গেছি। কিন্তু চায়ের কাপটা কতক্ষণ গরম থাকবে? তিন বছরের জমানো উত্তাপ যদি এক মুহূর্তেই শীতল হয়ে যায় তাহলে চায়ের অন্তিম গতিটা অনুমান করা কি শক্ত?

দশ

বিষৌধির এক এই বিষম বিপদ। এইজন্য বিচক্ষণ কবিরাজ সহজে এইসব মারাত্মক ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহেন না। তিল-পরিমাণ মাত্রাধিক্য হইলে হিতে বিপরীত হয়। এ যেন কালনাগিনী লইয়া খেলা দেখানো। এক মুহূর্ত অসতর্ক হইলেই করাল দংশন করিবে। মানুষের অন্তরবাসী রিপুগুলিও বিষ। অনুরাধার অন্তরের অন্তিম রিপুটিকে ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করিতে গিয়াছিলাম। হয়তো মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। রোগিণী সে তীব্র মাৎসর্য বিষ-দংশন সহ্য করিতে পারিল না। বিষক্রিয়া দেখা দিল।

ভাবিয়াছিলাম, অনুরোধে-উপরোধে যাহা সম্ভব হয় নাই ঈর্ষান্বিত হইয়া অনু তাহাতে অনুমতি দিবে। সে বুঝুক যে, তাহার পূজা-ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে আমি জীবনকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব না। তাহাকেও আমি আমার ল্যাবরেটরির ভিতর টানিয়া আনিব না। আমাদের কর্মজগৎ পৃথক হউক ক্ষতি নাই, নর্ম-জগৎ যেন এক হয়। ভীরু পারাবতটির মতো যে আমার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাকে শৃঙ্খল পরাইয়া আমার সংসারের বীতংসে আবদ্ধ করায় আমার তৃপ্তি নাই—মুক্ত নীলাকাশে তাহাকে উড়াইয়া দিব আমি। প্রভাতী পূর্ব-আকাশের রৌদ্রঝলমল দিগন্তে সে মিলাইয়া যাউক। আবার দিনান্তে ফিরিয়া আসুক আমার বক্ষে। এই আমি চাহিয়াছিলাম। সে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন মনামী আসিয়া দেখা দিল আমাদের সংসারে। আমি মনুকে সাজাইলাম, তাহাকে আমার নিত্যযাত্রী-সহচরী করিলাম, আলাপে-গল্পে তাহাকে লইয়া মাতিয়া রহিলাম। তিল তিল করিয়া অনুর অন্তরে মাৎসর্য-বিষের ইঞ্জেকশন দিতেছিলাম। ভলুমেট্রিক টেস্টের সময় যেমন একচক্ষু ব্যুরেটের দিকে সতর্ক রাখিয়া অন্য চক্ষু দিয়া লক্ষ্য করি রাসায়নিক দ্রবণের বিক্রিয়া, তেমনি মনামীর সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করিতে করিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম অনুকে! স্পষ্ট অনুভব করিলাম বিষক্রিয়া শুরু হইয়াছে। মনামীকে সে ঈর্ষা করিতেছে; যে কোন মুহূর্তে সে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। যে কোন উত্তেজক মুহূর্তে প্রবল ধাক্কায় মনামীকে সরাইয়া সে আমার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইবে।

কিন্তু কোনো অসতর্ক ক্ষণে বিষের মাত্রা নিরাপদ সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গেল। ভলুমেট্রিক টেস্টে যেমন হয়। অনু মরিয়া হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইলাম, কিন্তু ততক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ সুবিমলকে ঐভাবে অনুর শয্যা হইতে লাফাইয়া নামিতে দেখিয়া প্রথমটা চমকিয়া উঠিলাম। এর অর্থ কী? দৃশ্যটির একটি মাত্রই অর্থ হয়। সহজ সরল অর্থ। মনামী নিঃসংশয়ে সেই অর্থই করিয়াছে। আমি কিন্তু অত সহজে ভুলি নাই। জানি, এক অলক্ষ্যচারিণী আজীবন আমার জীবন-পথে ফাঁদ পাতিয়া চিরকাল আমার প্রতিকূলতা করিয়াছে।

তাই অত সহজে ভুলি নাই। বৈজ্ঞানিকের মতো বিশ্লেষণী মন লইয়া বিচার করিলাম। প্রথম অর্থ সরল। অন্য নারীর প্রতি আসক্ত স্বামীর উপর প্রতিশোধ লইতে উদ্যত বঞ্চিত নারীর পক্ষে এ আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু নারীটি এ ক্ষেত্রে অনুরাধা। তাহাকে যে আমি মর্মে মর্মে জানি। ও যে লক্ষহীরার যুগের মানুষ। যুগে যুগে স্বামীর ব্যভিচারকে ওরা অদৃষ্টের অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিশোধের চিন্তাও ওদের মনে আসে না।

দ্বিতীয়ত, সুবিমল ও অনুর প্রকৃত সম্পর্কটা আমার অজানা নহে। দুটি প্রায় সমবয়সী নরনারীর সম্পর্কটা আর দিদি-ভাইয়ের পর্যায়ে নাই—প্রায় জননী-সন্তানের সীমারেখা স্পর্শ করিতে চলিয়াছে। জানি, এ দুনিয়ায় বিশেষ বয়সের নর-নারীর ভালোবাসা ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায়। কিন্তু তাহারও প্রকারভেদ আছে। সুবিমল এবং তাহার বৌদির মধ্যে সেরূপ কোনো সম্পর্ক যদি গড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিত—তবে আমি তাহা লক্ষ করিতাম।

তৃতীয়ত, আমি যেরূপ অনুর অন্তরে ঈর্ষা সঞ্চারে প্রয়াসী—অনুও যদি সেই উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথে একটা ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া থাকে? কিন্তু অনুরাধার পক্ষে এতটা চাতুরি অবিশ্বাস্য!

তাহা হইলে?

আর একটি জিনিস লক্ষ করিলাম। আমার রূঢ় কণ্ঠস্বরে মনামী যখন শুইতে চলিয়া গেল তখন লক্ষ করিয়া দেখিলাম অনুর মুখে ধরা-পড়ার কোন সঙ্কোচ নাই। আশ্চর্য। কেন নাই? সুবিমল অপরাধীর মতো মাথা নিচু করিয়া উঠিয়া গেল, মনু দৃশ্যটার গুরুত্ব বুঝিয়াছিল বলিয়াই অস্বাভাবিক লঘু কণ্ঠে সিনেমার গল্পের অবতারণা করিল, আমার ভ্রূকুঞ্চনটাও স্পষ্ট—শুধু অনুরাধার উপরে এই অস্বাভাবিক দৃশ্যপটের কোনো প্রতিক্রিয়া হইল না।

মনু শুইতে গেল। আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনুর মুখোমুখি বসিলাম। অনু বলিল—তোমাকে কয়েকটা কথা বলব, শোনার সময় হবে?

বললাম—হবে, আমারও কয়েকটা কথা বলার আছে যে।

অনুই তাহার বক্তব্য প্রথম পেশ করিল। সে আমাকে মুক্তি দিতে চায়। সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহাকে লইয়া তৃপ্ত নহি। আমি যাহা চাই তাহা সে আমাকে দিতে পারে না। অহেতুক সে আমার সুখের কাঁটা হইয়া থাকিবে না। সে স্থির করিয়াছে সুবিমলকে লইয়া কালই তাহার পুরোহিত পিতার নিকট চলিয়া যাইবে।

এ কথায় নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি তাহার মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচ নাই; তবু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা টানিয়া বলিলাম—তাহলে একেবারে কালই বাপের বাড়ি যাবার নাম করে তুমি সুবিমলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাইছ, আর সবুর সইছে না।

আমার বাঁকা ইঙ্গিতটা ব্যর্থই হইল। ও বলিল, হ্যাঁ কালই।

আরও স্পষ্ট ভাষায় না বলিলে ও বুঝিবে না। তাই বলি—তোমাদের দুজনের যে এখানে অসুবিধা হচ্ছে তা জানি, কিন্তু বাপের বাড়ি যাবার নাম করে এভাবে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার ফলাফলটা ভেবে দেখেছ?

অনু অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকে! এতবড় স্থূল আঘাতে আহত না হওয়াই অসম্ভব। বাণবিদ্ধ মুমূর্ষু হরিণীর মতো বলে—এ কথার মানে?

—মানেটাও বুঝিয়ে বলতে হবে? মধ্যরাত্রে নির্জন ঘরে এখনই যে দৃশ্যটা দেখলাম—তার তো অন্য মানে হয় না অনু!

অনু শিহরিয়া উঠিল। তারপর আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। মেঘকৃষ্ণ আলুলায়িত কুন্তলদামে আবৃত হইল আমার চরণযুগল। বারবার পায়ের উপর মাথার আঘাত করিয়া বলিল—তুমি কী করে ভাবলে এ কথা? ছি-ছি-ছি। আত্মহত্যা করলেও এ দুঃখ আমার ঘুচবে না। ওগো, তুমি কেমন করে একথা বিশ্বাস করলে? বেশ, আমি কিছু চাই না। তুমি মনামীকে নিয়েই সুখে থাকো। আমি একলাই পড়ে থাকব ঘরের কোণে। কালই ঠাকুরপোকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আর সে ফিরে আসবে না।

বুঝিলাম, মাত্রা বেশি হইয়া গিয়াছে। বাহুমূল ধরিয়া ওকে উঠাইলাম। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে টানিয়া আনি। চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি উঁচু করিতেই দেখি তাহার সমস্ত মুখে একবিন্দু রক্ত নাই। সিক্ত চক্ষুর পল্লব দুটি নিমীলিত। একফালি তন্দ্রালু চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল তাহার সে মুখে। কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর ম্লান আলোক! কে বলে অনুরাধার রূপ নাই! রূপ কি কেবল লালসার ইন্ধন? অস্তরবির শেষ আশীর্বাদ লইয়া বর্ষণোন্মুখ সায়াহ্নের মেঘ যেমন জলের ভারে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িবার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণে—তেমনিভাবে ফুলিতে থাকে আমার বুকের কাছে অনুরাধার অশ্রুভারনম্র আনত মুখখানি। একটু আকর্ষণ করিলেই যেন ভাঙিয়া পড়িবে। তাহার আনত আঁখির পল্লবে হৈমন্তী প্রভাত-শিশিরবিন্দুর মতো সূক্ষ্ম জলকণা।

ধীরে ধীরে একটি সত্য যেন সেই মুহূর্তে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল! মনে হইল যে পথে ছুটিতেছিলাম সেটা ভ্রান্ত পথ। এ অসম্ভব প্রয়াস আর করিব না। পূর্ণকুম্ভ তো রহিয়াছে আমার গৃহকোণেই—তবে আর কেন মিথ্যা মৃগতৃষ্ণিকার মোহে অন্ধের মতো ছুটাছুটি করিতেছি। অনুরাধা স্ত্রীলোক, সে দুর্বল—তাহাকে আমার পথে টানিয়া আনিবার এ সঙ্কল্প কেন ত্যাগ করি না? আমি কেন তাহার পথে চলিতে শিখি না? অনুর অপূর্ণ অংশটাই বা কেন আমার নিকট বড় হইয়া থাকিবে—যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া কেন ধন্য হই না? অপর নারীর প্রতি আমাকে আসক্ত জানিয়াও এই যে আমার প্রতি একনিষ্ঠ রহিয়াছে এই কি তাহার প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? নিয়ন-আলোর ঔজ্জ্বল্যটা অধিক, কিন্তু আরতির প্রদীপের শান্ত দীপ্তি সে পাইবে কেমন করিয়া?

অস্ফুটে বলিলাম—তুমি আমাকে ক্ষমা কর অনু! আজ থেকে অবসান হোক আমাদের দুঃস্বপ্নের। দেখ, আর তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না। তোমাকে নিয়েই তৃপ্তি পাব আমি।

—কিন্তু মনু?

—মনু? হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠি। সব কথাই ওকে খুলিয়া বলিতে আর কোনো লজ্জা, কোনো সঙ্কোচ অনুভব করি না। ওকে বুঝাইয়া বলিলাম, মনুকে আমি ছোট বোনের মতোই দেখি। তাহার সহিত আমার সম্পর্কটা অনু-সুবিমলের সম্বন্ধের মতোই পবিত্র। স্ত্রীর মনে ঈর্ষা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই যে মনুকে লইয়া খেলা করিতেছিলাম—সে কথাও স্বীকার করি।

ওর চোখদুটিতে বিশ্বাসোন্মুখ প্রাণের প্রতিচ্ছায়া—বলে—সত্যি বলছ?

—এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি!

এই তো অবনীমোহন। উন্নতি হইতেছে দেখিতেছি! তুমি তোমার ধর্মপত্নীর ভাষাতে কথা বলিতেও শুরু করিয়াছ ইতিমধ্যে! এত দ্রুত পরিবর্তন! মনে মনে হাসিলাম। অনু বিশ্বাস করিল। তবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

হাসিয়া বলি—না, বাসে না। ও তোমার ভুল ধারণা।

অনু দৃঢ়স্বরে বলে—না ভুল নয়। আমি স্থির জানি। মেয়েদের চোখ এ বিষয়ে ভুল করে না।

সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বহিয়া যায়। সত্য না কি? একচক্ষু হরিণের মতো শুধু অনুর উপরেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি; বিপদ যে অন্য পথেও আসিতে পারে একথা ভাবি নাই। কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব? কখনই নহে। মনামী এ যুগের মেয়ে, পুরোপুরি আধুনিক। বহু পুরুষের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। তাহার মন পাথরের মতো কঠিন। আমার দু-একটা আঁচড়ে সেই লৌহকঠিন মনে কোনো আঘাত লাগার সম্ভাবনা নাই।

তবু সাবধানের মার নাই, বলিলাম—কাল তা হলে মনুকে কলকাতা পাঠাই?

—সেই ভালো। ঠাকুরপোকেও বাড়ি যেতে বলি এবার।

আমি হাসি—না। তোমার ঠাকুরপোর বাড়ি যাবার আর দরকার নেই।

—তা হোক। আমরা দুজনে না-হয় ছুটিটা একাই কাটাই।

—দুজনে একা একা? তা বেশ, কালই তাহলে মনুকে কলকাতায় রেখে আসব।

—তোমার যাবার আবার কী দরকার? ও তো একাই যেতে পারে।

—তা হয়তো পারে, কিন্তু সেটা খারাপ দেখাবে। তাছাড়া আমারও কলকাতায় কয়েকটা কাজ আছে।

অনু আমাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরে—ওগো না, আমি আর কিছুতেই ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে দেব না।

ও আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ওর দোষ নাই। কিন্তু সে কথায় কান দেওয়া চলে না। মনুকে আমিই রাখিয়া আসিব; তাহাকেও কয়েকটা কথা বলা দরকার। কৌশলে তাহার মনটা বুঝিয়া লইতে হইবে! সম্ভবত সে মনে কোনো দাগ পড়ে নাই; যদি পড়িয়া থাকে দুটি মিষ্টি কথার প্রলেপে সে দাগটি এখনই মুছিয়া ফেলা দরকার। আজ হইতে আমাদের দাম্পত্যজীবন নূতন পথে চলিবে; অনুর কোনো অপূর্ণতা কোনো অভাবকেই আর আমি স্বীকার করিব না। যাহা পাইয়াছি, তাহাই শান্ত মনে গ্রহণ করিব। যাহা পাই নাই তাহার কথা মন হইতে চিরবিসর্জন দিব!

ওর মাথায় হাত বুলাইয়া বলি—সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

—কিন্তু ঘুম যে আমার আসছে না!

অনু আমাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরে।

শিহরিয়া উঠি। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে সেই আদিম সমস্যার কথাটা।

নূতন পথে চলিবার উপক্রম করিতেই দেখি সে পথের সম্মুখে রহিয়াছে অনড় পর্বত!

* * *

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমি উঠিয়া পড়ি। অনু বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে থাকে। কাঁদুক। আমি ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম! রাত্রি দুইটা বাজে! উপায় নাই—বাকি রাতটুকু আমাকে বাহিরের ঘরের ইজিচেয়ারে শুইয়া কাটাইতে হইবে! আজীবন ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ভাগ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। আজও তাহার নিকট নতি মানিব না। আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। কালই যাইব। আমাকে সুখী হইতে দিবে না বলিয়া যেন এক অলক্ষ্যচারিণী প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে। তার নির্দেশেই যেন অনু রাজি হয় না—ও সমস্যার সমাধানে। না হয় নাই হইল। ও পক্ষের এ ব্রহ্মাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত অস্ত্র আছে বৈজ্ঞানিকের তূণীরে। আমি তাহার সন্ধান রাখি। অন্তিমে জয় লাভ করিবই।

আজ অবশ্য তোমার নিকট নতি স্বীকার করিতেছি! হ্যাঁ, আমার জীবনে আরও একটি মিলনরজনী তুমি ব্যর্থ করিয়া দিলে বটে! কিন্তু এই আমার যুদ্ধাবসান নহে। হে অলক্ষ্যচারিণী! রাত্রি প্রভাতে তোমার এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিব—দেখি এ হার-জিতের খেলায় কে হারে, কে জেতে। নিয়তি, না বিজ্ঞান!

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিলাম—সে কোনও প্রত্যুত্তর করে না। রাত্রিশেষের পাণ্ডুর চন্দ্রহাসে সে মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

এগারো

ফিরে এলুম। দিদিকে কিছু বলা হয়নি। ভালেই করেছি। তখন আমার মনটা ছিল চঞ্চল। স্পর্শকাতর। হয়তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারতুম না।

পারলেও সে-কথা হয়তো বুঝত না দিদি। তারও মনের সে অবস্থা ছিল না। পৌঁছেই একখানা চিঠি দিতে হবে দিদিকে। সব কথা স্বীকার করব অকপটে। ভেবেছিলুম চির-অপরাজিতা মনামী চ্যাটার্জীর এ ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসটা গোপন করে রাখব। তা সম্ভব নয়। অন্তত একটি লোকের কাছে সব কথা স্বীকার করতে হবে। সে রাধাদি। কেন যে জামাইবাবুকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম, গায়ে পড়ে

গল্প করতুম, তা বলতে হবে। বলতে নয়, লিখতে। হয়তো ওদের দুজনের মধ্যে আমাদের নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সেটা মিটিয়ে দিতে হবে। জামাইবাবুকে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রথমটা ভয় হয়েছিল সুবিমলকে বলা আমার শেষের কথাগুলো তিনি শুনেছেন বুঝি বা। কিন্তু না। তিনি শোনেননি কিছু। ট্রেনে ফেরার পথে কথাটা তুললুম।

—আজ সকালে আপনি আমার কয়েকটা কথা হয়তো শুনতে পেয়েছেন—

—কী কথা? কখন?

—যখন আপনি সুবিমলকে ডাকতে এলেন তখন।

—আমি তো শুনিনি কিছু! কী এমন কথা?

সামলে নিই নিজেকে। যদি নাই শুনে থাকেন তবে আর সে কথা তুলে লাভ কী? সত্যকে স্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে একটা চরমতম মিথ্যাকে যে প্রচার করেছি এটা তাহলে ওঁর অজ্ঞাত। বাঁচা গেল।

জামাইবাবু চলন্ত জানলার বাইরে চেয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ বলেন—কিন্তু হস্টেলে গিয়ে এ রকম হঠাৎ ফিরে আসার কী কারণ দেখাবে?

বললুম—হস্টেলে ফিরবই না আমি। শেয়ালদা থেকে সোজা হাওড়া গিয়ে পুরীর টিকিট কাটব।

—সে কী?

হেসে বলি—এবার ছুটিতে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে পুরীতেই যাবার কথা। ওরা দল বেঁধে গিয়েছে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল। ঠিকানা তো জানাই আছে, ভাবছি হঠাৎ গিয়ে ওদের অবাক করে দেব।

জামাইবাবু বলেন—কিন্তু এভাবে স্টেশনে তোমাকে ছেড়ে যাওয়াটা—

প্রশ করি—আপনি কলকাতায় কোথায় উঠবেন?

—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

—তাহলে চলুন কলকাতায় পৌঁছে কোথাও খেয়ে নিই। তারপর আমাকে একেবারে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নেবেন।

জামাইবাবু তাতে রাজি হয়েছিলেন। আবার বলেন—আজ সকালবেলা তুমি চলে আসতে চাইলে কেন? রাত জেগে স্যুটকেস গুছিয়েই বা রেখেছিলে কেন?

আমি একটু কৌতুক করে বলি—যদি বলি আপনাদের দুজনকে একটা অপ্রিয় কথা মুখ ফুটে বলার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিতে?

জামাইবাবুর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। কী যেন বলতে যান। বাধা দিই। বলি—ঠাট্টাও বোঝেন না? এত বেরসিক কেন?

উনি ম্লান হাসেন। আবার চুপচাপ! দুজনেই বুঝি, বেশি কথাবার্তা না চালানোই ভালো। যা ঢাকা আছে তা থাক না প্রচ্ছন্ন। কাজ কি তাকে নাড়াচাড়া করে?

আমি জানতুম, কলকাতার সেই হস্টেলের পরিচিত পরিবেশটা এখন আমার ভালো লাগবে না। তার চেয়ে করবীদের ওখানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফুর্তিতে, হৈচৈতে কটা দিন ক্ষইয়ে দিতে চাই।

মনে আছে, সমীর বোস যেদিন মৃণালকে প্রত্যাখ্যান করে, সেদিন সারারাত সে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। সিলি! মৃণাল আমার রুমমেট। অতসী অত ভালো ছাত্রী, যে বছর অমূল্যবাবুর বিয়ে হল, হতভাগী সে বছর ফেল করল কেঁদে কেঁদে। আমি কাঁদবও না, ফেলও করব না। খাব, দাব, নাচব, বেড়াব। এই দশটা দিন জীবনের ইতিহাস থেকে মুছে দেব। একমাত্র সান্ত্বনা একথা কেউ জানে না। না, সুবিমলও নয়; তার কাছেও আমার লজ্জা নেই। ও যদি ঘুণাক্ষরেও জেনে ফেলত? তাহলে? তাহলে বোধহয় আত্মহত্যা করতে হত আমাকে। কী লজ্জা! বাঁচা গেল। কেউ কোনদিন জানবে না মনামীও একজনকে ভালোবেসেছিল। আর সে তাকে ভালোবাসেনি! এই কথাটা ক্ষইয়ে দেব পুরীতে। সমুদ্রসৈকতে ছুটোছুটি করে, দৌড়ে, সমুদ্রস্নান করে। কেউ ধরতেও পারবে না। মনামী চ্যাটার্জী যা ছিল তাই থাকবে চিরকাল।

কিন্তু! স্বীকার করতেই হবে একজনের কাছে। রাধাদি! তাকে লিখে দেব—একথা যেন কাউকে না জানায়। কাউকে না। না। জামাইবাবুকেও না।

যা ভেবেছিলাম তা কিন্তু হল না। আশ্চর্য! পুরীর সমুদ্রতীর বিস্বাদ লাগল। মনে হল, কী-এক নিরুদ্ধ অন্তর্জ্বালায় ঐ অশান্ত সমুদ্রটা দিনরাত্রি গুমরাচ্ছে। কী-একটা কথা বুঝি পাক খাচ্ছে ঐ বেদন-নীল বুকের সুগভীরে। সেকথা মুখ ফুটে বলার নয়। তাই ফুলে ফুলে উঠছে ওর অন্তরাত্মা। আছড়ে-আছড়ে বোবা কান্নায় আর্তনাদ করে উঠছে—সে কথা যে বলা যায় না!

ওরা দল বেঁধে সাগর-স্নান করে এল—আমি নিশ্চুপ বসে রইলুম পাড়ে। ওরা বালির ঘর বানায়, আর ভাঙে। ওখেলা আবার নতুন করে খেলব কেন? ওরা ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, কোনারক ঘুরে এল। অসুস্থতার অজুহাতে সঙ্গ এড়ালুম।

করবী বলে—তোর কী হয়েছে বল্‌তো মনু?

—কী আবার হবে?

—প্রেমে-ট্রেমে পড়িসনি তো?

—বিশ্বাস হয়?

—হয় না। তুই বলেই হয় না। কিন্তু লক্ষণগুলো তো ভালো ঠেকছে না।

সেদিনই স্থির করলুম পালাতে হবে পুরী থেকে। ওদের কাছ থেকে। নিজের এই মতিচ্ছন্ন মনের কাছ থেকে। এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবে মনটা; এখানে আমি বেমানান। কলকাতার নির্জন সিঙ্গল-সিটেড কোণটা আকর্ষণ করতে থাকে। সেখানে ছুটিতে কেউ নেই, কিছু নেই। তবু কাঁদবার অবকাশ আছে। কী লজ্জা! আমি মনামী চ্যাটার্জি কিনা কোন গাঁইয়ার চিন্তায় এমন গুমরে গুমরে মরছি।

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। সব সময়েই মনে পড়ে ওর কথা। কী দেখে ভুললুম? কী ছিল ওর? কিছু না। না, ছিল। ওর ছিল সতেজ প্রত্যাখ্যান। সদম্ভ বীতরাগ। এটা অনাস্বাদিতপূর্ব। অনেকের অনেক কূজন শুনেছি। তারা ছিল সুলভ। তাই তারা মনে দাগ কাটেনি। এ দুর্মূল্য নয়—দুর্লভ। পাত্রবাজারের কষ্টিপাথরে কষলে ওর দাম অল্প। কানাকড়ি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কই বল, আর লক্ষ্মীর প্যাঁটরাই বল—খুঁজলে কানাকড়িটির সন্ধান পাবে না। সৌন্দর্যের চাবিকাঠি পেয়েছিলুম জন্মলগ্নে। সে চাবিতে অনেক আয়রন চেস্ট খুলে দেখেছি—জড়োয়া গহনা মণিমাণিক্য, মোটা পাশবুক দেখেছি। কিন্তু কানাকড়ির সন্ধান তো কোথাও পাইনি। রুপোকে যেমন ব্যঙ্গ করে কানাকড়ির ওই কানা চোখটা, লোকটা তেমনি ব্যঙ্গ করে গেল আমার রূপকে। অসহ্য! কোনওদিন ভুলেও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। দেখেনি আমার দিকে চেয়ে।

না। ভুল বললাম। ও বলেছিল—হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে নেওয়া যায়। বলেছিল—আলো বলছে আলোরই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু তুমি কি আলোর চেয়েও উজ্জ্বল? তোমার চোখে তো ধাঁধা লাগল না? সেখানেই ওর দাম। ও যদি চোখ তুলে আমার দিকে না তাকাত তাহলে অশ্রদ্ধাই হত আমার। বলতুম—জড়। সে সব লক্ষ্য করেছে। সব দেখেছে তার কবির চোখে। কিন্তু ধরা দেয়নি। হারেনি।

ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল আঘাত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে কাছে টানছিলুম। ধনুকছিলার প্রেম যেমন তিরের প্রতি। ওকে ফাঁদে ফেলে অপমান করব বলেই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়েছিল। ও নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছিল। এতই যদি বুঝলে তবে বাকিটুকু বুঝলে না? দস্যু রত্নাকরের মরা-মরা জপমন্ত্রটুকুই শুধু শুনতে পেলে? কখন অগোচরে মন্ত্রের বদল হল তা কি আমিই টের পেয়েছি? যখন জানতে পারলুম, তখন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এমনিই হয়। মোবারকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশনামা জারি হবার আগে টের পায় না জেবউন্নিসা যে শাহজাদীরাও ভালোবাসে।

সেই রাত্রেই রাধাদিকে চিঠি লিখলুম। রাত অনেক হয়েছে। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অশান্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গোঙানির আওয়াজটা ভেসে আসছে। আর আসছে একটানা একটা জোলো হাওয়া। অশ্রুজলের মতো ভিজে লোনা হাওয়া। করবী ঘুমোচ্ছে পাশের খাটে। কী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে ও। দীর্ঘ পত্র লিখে চলি পাতার পর পাতা।

লিখলুম, তোমাদের ওখানে গিয়ে বিপর্যয়ই বাধিয়ে এলুম। ইচ্ছে করে নয়। ঘটনাচক্রে! তুমি হয়তো ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে কোনোদিন। এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। জানি! তবু আমি বিশ্বাস করব, আশা করব, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। সর্বান্তঃকরণে। কারণ আমার বিরুদ্ধে তোমার যা অভিযোগ তার এক কণাও সত্য নয়। প্রমাণের প্রয়োজন হয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে। সত্য তার চেয়েও বড়। সে আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। তাই প্রমাণ দাখিল করতে না পারলেও সত্যটা মেনে নিও। আমার অনেক আচরণ তোমার চোখে দৃষ্টিকটু লেগেছে। তোমার অভিধানে সে আচরণের সংজ্ঞা—অপরাধ। আমার অভিধানেও ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করে না। তবে জেনে-শুনে এ অপরাধ কেন করলুম? এ প্রশ্নটার জবাবদিহি করতেই বসেছি।

বিশ্বাস কর রাধাদি, আজ যে কথা লিখছি তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। শুনতে অবাক লাগবে, তবু এর প্রতিটি বর্ণ সূর্যোদয়ের মতো সত্য। তোমার চেয়ে বেশি হতভাগী আমি। আমার এত রূপ যদি ভগবান না দিতেন, তোমার মতো লেখাপড়া না শিখতে পেলেও আমি খুশি থাকতুম—যদি তোমার মতো ভালোবাসা পেতুম। আমার নির্লজ্জতা মাপ কর। আমি সত্য কথা লিখব বলে বসেছি। সত্য স্বতই নগ্ন। যত মন্দ হই, যত নির্লজ্জতাই প্রকাশ পাক, যেন মিথ্যাবাদী বোলো না আমায়।

তোমাকে আমি হিংসে করি। রাগ করলে? আমার উপায় নেই। কেন করি জান? তোমার সৌভাগ্যকে। কানাকড়ির বিনিময়ে তুমি মানিক সওদা করেছ! ভগবান তোমায় দিয়েছিলেন কানাকড়ি—দুনিয়ার হাটে এসে নিয়তির খেয়ালে তাই দিয়ে তুমি কিনে ফেললে সাতরাজার ধন মানিক। আর আমি? আমি মানিক হাতে হাটে এলুম। তার বদলে কানাকড়িটাও কিনতে পারলুম না!

জানি না সব কথা বুঝছ কি না। দোহাই তোমার, ভুল বুঝ না। তোমার কর্তাটিকে সাত রাজার ধন মানিক বললুম, তার মানে এ নয় যে, সেই মানিক পাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ আছে আমার। ও মানিক তোমার। তোমার আঁচলেই বাঁধা থাক। আমি চেয়েছিলুম কানাকড়ি। তাও পেলুম না।

পাকা হাটুরে আমি। কেনা-বেচার অভিজ্ঞতাও আছে। রাগ কর না শুনে যে, অনেক হিরে-জহরৎ ডান হাতে কিনে বাঁ হাতে বেচেছি। এ-হাটের ধন ও-হাটে! অনেক পাথর কুড়িয়েছি পথ চলতি সড়কে। সত্যি-মিথ্যে, আসল-মেকি যাচাই করিনি। খোলামকুচির মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছি। এও মানি, আসল মণিমুক্তোও নিগ্রহ সয়েছে আমার হাতে। কিন্তু আমি তো হিরে জরহত চাইনি। আমি যে খুঁজছিলাম পরশ-পাথর। যার নিজের কোন দাম নেই। যা অমূল্য। যার বাজার-দর সাত-পয়জার! অথচ যার পরশে লৌহ-কঠিন অন্তরের কলুষ যায় ধুয়ে। সোনা হয়ে ওঠে।

কিশোর বয়সে নিজের প্রেমে পড়েছিলুম। তখন যৌবন ভালো করে আসেনি দেহে-মনে। আয়নায় নিজেকে দেখতুম। হাসলে কেমন লাগে, ঘাড় বেঁকালে কেমন লাগে। পাশে চাইলে কেমন দেখতে হয়। বয়স বাড়ল। বুঝলুম—আয়নার মধ্যেকার ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়া কিছু নয়। ওজন্যে আমার জন্ম নয়। সেই শুরু হল পরশ-পাথরের সন্ধান। ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে খুঁজে ফিরে এসে দেখি লৌহ-কঠিন মনটায় কাঁচা সোনার রঙ ধরেছে। আশ্বিনের সোনালি রোদটুকুর মতো আমার বর্ষণক্লান্ত মনের আঙিনায় কী যেন ঝিকঝিক করে উঠল! চমকে উঠলুম। কখন ছুঁড়ে ফেলেছি পরশ-পাথর? ক্ষ্যাপার দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু। কোন লজ্জায় ফিরে যাব—"ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর?" আমি যে টের পেয়েছি কোন পথের বাঁকে, কোন সড়কের ধারে তাকে ফেলে এলুম। কোন মুখ নিয়ে ফিরে গিয়ে দাঁড়াব তার কাছে?

আচ্ছা, ভক্ত যেমন ভগবানকে খোঁজেন—ভগবানও তো তেমনি ভক্তকে চান? তবে ভগবান কেন নিজেই এসে দাঁড়ান না ভক্তের দ্বারে? বলতে পার? পরশপাথর দুর্লভ, কিন্তু পাকা জহুরিই কি সুলভ? পরশপাথরও কি অহল্যার মতো উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে না—কে তাকে চিনে নেবে বলে?

আমার অনেক কথার মানে বুঝবে না তুমি। না বোঝ ক্ষতি নেই। একটা সহজ কথা সোজা করে বল্‌ছি। অনেক পুরুষকে অনেকবার আমন্ত্রণ করেছি জীবনে। সেসব ছিল ছলনার আয়োজন। একজনকে আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে আমন্ত্রণ করতে চাই আমার জীবনের ভোগে। তোমার মারফত খবর পাঠানো যেত। পারলুম না। লজ্জায়। অভিমানে! তবে আর একজনকে এই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করছি।

কথাটা জানিও তাঁকে। জামাইবাবুকে। আগামী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তাঁর নিমন্ত্রণ রইল আমার হস্টেলে। জানি, অনেক দেরি আছে। তবুও ঠিক মনে রেখে অপেক্ষা করব সেদিন তাঁর জন্যে।

জানি না ক্ষমা করতে পারলে কিনা! প্রণাম নিও দুটি পায়ে....

* * *

রাত্রেই খামটা বন্ধ করে রেখেছিলুম। পরদিন সকালে প্রথম কাজ হল ওটা ডাকে দেওয়া। মুখ-হাত ধোওয়া হল না। বেরিয়ে পড়লুম! অছিলা তৈরিই ছিল—সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখব। চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে নিশ্চিত। মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। পাছে দিনের আলোয় দ্বিতীয়বার পড়লে ছিঁড়ে ফেলি—তাই রাতেই খামটা বন্ধ করেছিলুম। ডাকবাক্সে না ফেলা পর্যন্ত যেন নিজেকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কী যেন লিখেছিলুম? সব কথা মনে পড়ছে না। এটুকু মনে আছে ভাষাটা হয়েছিল দুর্বোধ্য। আবোল-তাবোল। হয়তো রাধাদি পড়ে মানেই বুঝবে না। চিঠিখানা যেন আর কাউকে না দেখায় সে কথাও লিখেছি? ঠিক মনে পড়ছে না। লিখেছি নিশ্চয়ই। তা না লিখে কখনও চিঠি শেষ করতে পারি?

জানতুম জবাব আসবে না। ও চিঠির মানেই বুঝবে না রাধাদি। জবাব দেবে কি? তবু মনে আছে চিঠির মাথায় পুরীর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলুম। পরদিনই কলকাতা ফিরে যাবার কথা। কিন্তু হয়ে উঠল না। পরদিনও না। তারপরের দিনও কী-একটা বাধা উপস্থিত। পরে বুঝলুম, চিঠিটার জবাব পাবার দুরাশা আঁকড়ে পড়ে আছে পাগলা মনটা! নানান অজুহাতে যাওয়াটা তাই পিছিয়ে দিচ্ছি। আপনমনেই একা একা ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা হানা দিই ডাকঘরে।

মনটা এ কী ক্ষ্যাপামি শুরু করল? সমুদ্রের ধারে নির্জনে বসে কী-সব উল্টোপাল্টা ভেবে চলি। হয়তো রাধাদি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখবে না। হয়তো চিঠিটার মানেই বুঝবে না। চিঠিখানা যখন পৌঁছাবে তখন, ধরা যাক, জামাইবাবু বাড়ি নেই। রাধাদি তৃতীয়বার চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে বলে উঠল—কী পাগল!

সুবিমল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। মুখ না ঘুরিয়েই বলে—কে পাগল, আমি না দাদা?

—তোমরা দুজনে তো বটেই, কিন্তু আমি বলছিলাম মনুর কথা। দেখ না, কী-সব হিজিবিজি লিখেছে। মানে বোঝা যায় না একবিন্দু।

যেন নিজের কোনো কৌতূহল নেই! শুধু বৌদির অনুরোধেই হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নেয়। পড়ে যায় সবটা। যে চিঠির অর্থ রাধাদির কাছে গ্রীক, ওর কাছে তা প্রাঞ্জল। রাধাদির কাছে যে কথাগুলো ছিল মূক, ওর কর্ণকুহরে তাই মুখর হয়ে ওঠে। কী যেন লিখেছিলুম আমি? সব কথা মনে নেই। তবু বেশ বুঝতে পারি, ও বুঝবে। হয়তো জবাব আসবে চিঠির। রাধাদির কাছ থেকে নয়। তবু আসবে উত্তর।

তাই কি ঐ ভাষায় লিখেছি? সত্যিই কি রাধাদিকে লিখেছি আমি চিঠিখানা? তাই কি রাতের লেখা চিঠিখানা খাম বন্ধ রেখেছিলুম, পাছে দিনের আলোয় সঙ্কোচ হয়। ছি ছি!

আরও দিনদশেক অপেক্ষা করলুম। কিন্তু বৃথাই। বুঝলুম জবাব আসবে না। পরাজয় পূর্ণ হল। মৃত্যু তো হয়েই ছিল। শ্রাদ্ধশান্তির পালাও চুকল। হয়তো না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছে রাধাদি। অথবা পড়েছে! বুঝতে পারেনি। ফেলে দিয়েছে। কিম্বা হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে। হয়তো পড়েছে সুবিমলও। ঠোঁটের কোণটা বেঁকে গেছে। হয়তো বিদ্রূপ করে বলেছে—বেশ তো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঙলা লেখেন ভদ্রমহিলা। অতি আধুনিক পত্রিকাগুলোয় লেখেন না কেন? কাব্যজ্ঞান টনটনে। উপমান আর উপমেয়গুলো লক্ষ্য করেছ বৌদি? উনি পাকা জহুরি, আর ওঁর মনের মানুষ হচ্ছেন কানাকড়ি। উনি রূপের মানিক হাতে হাটে এলেন কানাকড়ি খরিদ করতে—আর কানাকড়ি ওঁর উঁচু নাকে ঝামা ঘসে দিল!....

হো হো করে হেসে ওঠে সুবিমল!

রাধাদি বলে—আসল ব্যাপারটা কী? কে ওর মনের মানুষ? কে নাকে ঝামা ঘসে দিল ওর?

ও হেসে বলে—বাদ দাও না! যত সব ফ্লার্ট!

* * *

কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে; এ আঘাত আমার প্রাপ্য। অনেক হতভাগ্যের মনে আঘাত দিয়েছি। আঘাত পেতে কেমন লাগে জানতুম না। জানলুম। এ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। এ অপমানের বোঝা বইতে সঙ্গীহীন নির্জন ঘরের আবছা আড়ালের দরকার। তল্পিতল্পা বাঁধি। পরদিনই কলকাতা। তখনও ছুটির অনেকটা বাকি।

হস্টেলে ফিরেই পেলুম একখানা ভারী খাম! প্রতীক্ষায় পড়ে আছে। হস্তাক্ষর অপরিচিত। খামটা খুললুম। বেরিয়ে পড়ে একটা দীর্ঘ পত্র। দীর্ঘতর। সুবিমল লিখেছে আমাকে। বুকের মধ্যে গুড়গুড় ক'রে উঠল। কাঁপতে থাকে হাতটা। মনে হল ঘরে বুঝি যথেষ্ট আলো নেই। সরে এলুম জানলার কাছে। চিঠিখানা মেলে ধরি। অক্ষরগুলো যেন নাচতে থাকে। কয়েকটা মিনিট কাটে। মনটা সংযত করি। তারপর পড়তে শুরু করি। কোনো সম্বোধন নেই সে পত্রে। জানি, ও কী লিখেছে! ঠিক জানি না। আন্দাজ করতে পারি। আমার মনের কথা ও নিশ্চয় বুঝেছে। না হলে এ দীর্ঘ পত্র লিখত না। এই তো প্রথম লাইনেই লিখেছে—'বৌদিকে লেখা আপনার চিঠিখানা এসে পৌঁচেছে।' এখনও 'আপনি'? এক লাইন পড়েই মুড়ে রাখি চিঠিটা। কেন একটা ছোট্ট সম্বোধন দিয়ে শুরু করল না চিঠিটা। ও তো জেনেছে আমার মনের কথা। আমাকে লেখা এই ওর প্রথম চিঠি। এর মুখবন্ধে কি একটা ছোট্ট সম্বোধন করতে পারত না সে? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমার। চিঠিখানা আবার মেলে ধরি। এক নিশ্বাসে পড়ে যাই—

বৌদিকে লেখা আপনার চিঠিখানা এসে পৌঁচেছে! আপনার পরিশ্রমটা বৃথা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সেটা তাঁর হাতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আপনার চিঠি এখানে এসে পৌঁছাবার আগেই এ সংসারের সমস্ত বালাই নিয়ে আমার বৌদি চলে গেছেন চিরশান্তির রাজ্যে—যে দেশে স্বামীর উপেক্ষা সইতে হয় না, যেখানে রূপের তুলাদণ্ডে মনুষ্যত্বের বিচার হয় না, যেখানে অতিথি গৃহস্থের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় না।

জানেন নিশ্চয়ই, আমার বৌদির আধুনিক শিক্ষালাভ ঘটেনি। তিনি আলোকপ্রাপ্তা নন, তিনি ছিলেন গতযুগের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙলার পল্লিবধূ। শেষ সময়ে তিনি এক অদ্ভুত বায়না ধরে বসলেন,—স্বামীর পদধূলি চাই। সেটা নাকি তাঁর অনন্ত যাত্রাপথের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পাথেয়। আলোকপ্রাপ্তা কেউ শুনলে নিশ্চয়ই বলতেন—রিডিক্লাস! তাঁর স্বামী এদিকে তখন বিশেষ জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলেন অন্যত্র। কী কাজ, কোথায় কাজ, বিস্তারিত লেখা নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী না থাকলেও দেবর ছিল। সাধ্যমতো সে চেষ্টা করেছিল তার সব-দিক-দিয়ে-ফুরিয়ে-যাওয়া বৌদিকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু জীবনীশক্তি ভিতর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর। বাঁচবার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বাঁচবার ইচ্ছা; সেটাই ছিল না তাঁর। ছিল মৃত্যুকে মাত্র কয়েক ঘন্টা ঠেকিয়ে রাখার বাসনা, যাতে ঐ পায়ের ধুলোটা এসে পৌঁছায়। ডাক্তার এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন পণ্ডশ্রম করছি আমরা। যাতে তাড়াতাড়ি ওঁর ভবযন্ত্রণার হাঙ্গামাটা চুকে যায়, তাই কলকাতা যেতে হল আমাকে—আমার পূজ্যপাদ দাদার পা থেকে এক খামচা ধুলো নিয়ে আসতে। আপনার হস্টেলের ঠিকানা সংগ্রহ করা গেল। জানতেম, মেয়েদের হস্টেলে তিনি নেই—তবু আপনার কাছে সন্ধান পাব আশা করা অন্যায় নয়। আপনার হস্টেলে এসে শুনি—ছুটি হবার পর সেই যে আপনি বেরিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি। আপনাকে পৌঁছে দেবার নাম করে অধ্যাপক অবনীমোহন, যিনি আমার বৌদিকে বিবাহ করার অধিকারে আমার দাদা হয়েছেন—তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসেন নয়দিন পরে। খবরটা হয়তো বাহুল্য আপনার কাছে—তবু লিখতে হচ্ছে ভদ্রতাবোধে। আমার পক্ষে ধরে নেওয়া শোভন, এ সংবাদটা আপনার অজানা।

কলকাতায় আপনাদের দুজনকে সম্ভব-অসম্ভব বহু স্থানে ব্যর্থ সন্ধান করে যখন ফিরে এলেম তখন বৌদির শেষাবস্থা। আরও ঘন্টা ত্রিশেক বেঁচে ছিলেন। ইতিমধ্যে আপনার অথবা দাদার কোনো খবর এল না। হয়তো আপনারা দুজনেই কোনো কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তাই সংবাদ দিয়ে উঠতে পারেননি।

আপনার কতটা জানা আছে জানি না। ঘটনার পারম্পর্য না লিখলে ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না। অধ্যাপকমশাই যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শ্যালিকাকে কলকাতায় রেখে

আসতে যাচ্ছেন। পরেরদিনই তাঁর ফেরার কথা। তিনি যে আসলে শ্যালিকাকে নিয়ে পুরী যাচ্ছেন প্রমোদভ্রমণে, এটা অজানা ছিল তাঁর স্ত্রীর। পরদিন স্বামী ফিরে না আসাতে তিনি ব্যস্ত হলেন। অশিক্ষিতা সন্দেহবাতিক মেয়েমানুষের যেমন হয়;—কেঁদে ভাসালেন। বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যান তার পরদিন। আমি শহরে ছিলাম, ছাত্রাবাসে। খবর পয়ে হাজির হই। ডাক্তার এসে ধমক দিলেন আমাকে। ওঁর হার্ট যে এত দুর্বল, মাসাধিক কাল বুকে একটা বেদনা বোধ করছেন, এটা নাকি আমার জানা উচিত ছিল। নিশ্চয় ছিল—আমি জানব না তো কে জানবে? তাঁর স্বামী, তাঁর বোন? যাই হোক—চিকিৎসাপত্র যেটুকু সম্ভব, করার ত্রুটি হয়নি। উপরন্তু কাজ হল দৈনন্দিন ডাকঘরে হাজিরা দেওয়া! আপনাদের দুজনের কারও একখণ্ড চিঠির প্রত্যাশায় আরও কটা দিন বেঁচে ছিলেন।

যাবার আগে বৌদি আমাকে দুটো কাজের ভার দিয়ে গেছেন। বৌদির কোনো আদেশ কখনও অমান্য করিনি। তাঁর শেষ অনুরোধ আমাকে বাধ্য করেছে আপনাকে এই চিঠি লিখতে; নইলে, বিশ্বাস করুন মনামী দেবী, আপনাকে চিঠি লিখবার মত রুচি আমার কোনোকালেই হ'ত না!

শেষ সময়ে বৌদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মুখটা নিচু করে বলি, কিছু বলবে?

চোখের ইঙ্গিতে জানালে—হ্যাঁ। বামুনদি আর নীরজাকে হাত নেড়ে চলে যেতে বললে। ওঁর শেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেম আমরা তিনটি প্রাণী, দুজন বেতনভুক পরিচারিকা, নীরজা আর বামুনদি, আর অন্নভুক আমি। ওঁর বাবাও সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেননি।

বৌদি অস্ফুটে বলেছিল : মনুকে বল ঠাকুরপো, তার ওপর আমার একটুও রাগ নেই। ও ওঁকে ভালোবাসে—তার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি? তাকে বোলো, আমার যা কিছু প্রিয় জিনিস, সব তাকে দিয়ে গেলাম—ওঁকেও, খোকনকেও।

চীৎকার করে বলতে যাই : এ আদেশ কর না বৌদি। অন্তত খোকনকে দিয়ে যাও আমাকে। বলতে পারলেম না। কিছুতেই সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে, এ-যুগের আধুনিকারা সব সইতে পারে—সতীনের সন্তানকে নয়। কিছুতেই বলতে পারলেম না—বৌদি, তোমার শাড়ি, গহনা, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, তোমার সব শখের জিনিস, তোমার অধ্যাপক স্বামীকে দিয়ে যাও তাকে; শুধু খোকনকে দাও আমাকে। ওকে আমি মানুষ করি।

ওঁর বোধহয় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, বললেম, আর কথা বল না বৌদি, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

হাসল। বলে, কষ্ট কিসের? এ তো দিব্যি যাচ্ছি। ওঁকে বোলো, আমাকে নিয়ে উনি সুখী হননি। উনি যেমনটি চান, আমি তা হতে পারিনি। মনু ওঁর চাহিদা মেটাতে পারবে, জানি তো। ওঁকে বোলো মনুকে বিয়ে করতে। এ আমার শেষ অনুরোধ।

মনামী দেবী, এই শেষ অনুরোধটা আজও পালন করা হয়নি। এই কাজটির ভার গ্রহণ করে আমাকে যদি মুক্তি দেন নিশ্চিন্ত হই। বর্তমানে অবনীমোহন অসুস্থ, এখনই কথাটা তাঁকে জানানো সম্ভব নয়। অথচ অপেক্ষা করার মতো সময় আমার নেই; এ বাড়িতে এক মুহূর্তও তিষ্ঠতে ইচ্ছে করে না। কাজটা আমার কাছে খুব কঠিন, অপ্রিয় কর্তব্য;—হয়তো অনেক সহজ আপনার তরফে। শুধু সহজেই নয়, আরও কিছু। দয়া করে এ উপকারটুকু করবেন আমার?

দাদা যেদিন ফিরে এলেন, সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। আমিই দরজা খুলে দিই! আমাকে দেখে চমকে ওঠেন উনি, বলেন : কী হয়েছে সুবিমল, তোমার বাবা....

আমি মহাগুরুনিপাতের অশৌচ পালন করেছিলেম। বৌদির মধ্যেই আমার না-দেখা মায়ের সন্ধান পেয়েছি আমি, মুখাগ্নিও করেছি সেই অধিকারে। বলি, বাবা ভালো আছেন।

—তবে, তাহলে এ কী চেহারা তোমার?

নীরজা এসে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণে। ডুকরে কেঁদে উঠল সে। খবরটা শুনে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন উনি। জ্ঞান হতে দেরি হল। রক্তচাপ বরাবরই ছিল, ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ভয় দেখালো। বাঁ হাত, বাঁ পা নাড়তে পারেন না, কথাও জড়িয়ে যায়। অবশ্য ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠছেন! এ অবস্থায় বৌদির শেষ ইচ্ছেটা তাড়াতাড়ি জানিয়ে কর্তব্য সমাধান করা সম্ভব নয়।

একদিন আপনি গর্ব করে বলেছিলেন—অধ্যাপক অবনীমোহন পুরুষমানুষ, আপনি কুমারী কন্যা, পরস্পরের প্রতি আপনাদের প্রেম সামাজিক অপরাধ নয়। কথাটা সেদিন বিশ্বাস করতে বেধেছিল। সে যাই হোক, একথাও আপনি বলেছিলেন যে, অবনীমোহন যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে সামাজিক

অধিকার নিয়ে আপনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে রাজি। আজ অবনীমোহনের কণ্ঠনালী রুদ্ধ, তাই তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন না আপনি। কলকাতা যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় একটা সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন এ প্রশ্নটা তাঁকে করিনি—জিজ্ঞাসা করার রুচি ছিল না। কিন্তু আপনার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে হল—নইলে যে আমার মুক্তি হবে না। বললেন, সে পুরীতে আছে। বর্তমান ঠিকানা জানি না। তারপর এল আপনার চিঠি, কিন্তু যাঁর চিঠি তিনি নেই। তাই সেটা খোলা হয়নি। অবনীমোহন ফিরে এসেছেন, এতদিনে আপনারও পুরী ভ্রমণ শেষ হয়েছে অনুমান করে হস্টেলের ঠিকানাতেই এই চিঠি দিলাম।

চিঠি শেষ করার আগে প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জাতীয় কিছু জানানোর একটা প্রচলিত রীতি আছে। অথচ কী বিড়ম্বনা দেখুন, ঘৃণামিশ্রিত একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতির কথা লিখলে অনৃতভাষণ হবে! আপনি তো কঠোর সত্যকে ভালোবাসেন—অন্তত সেদিন সেইরকম একটা কথা শুনেছিলাম মনে পড়ছে। আশা করি চলিত রীতি লঙ্ঘন করে হঠাৎ এভাবে চিঠি শেষ করায় কোনও অপরাধ নেবেন না। ইতি।

—সুবিমল

* * *

ট্রেন থেকে নেমে দেখি, সুবিমল দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। রওনা হওয়ার আগে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমি নামতেই ও হাত তুলে ভদ্রতা বাঁচানো একটা আলতো নমস্কার করে। কুলি ডাকবার অছিলায় সেটা না দেখতে পাওয়ার ভান করি। ও যে আমাকে রিসিভ করতে স্টেশনে আসবে এটা আশা করিনি।

সেই স্টেশন চত্বর। এখানেই একদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। অশুভ লগ্নে। মাত্র কদিন আগে। আজ আবার সেখানেই দেখা হল। স্থান কাল পাত্র অভিন্ন। অথচ সবই বদলে গেছে। আদ্যন্ত। সেদিন ঐ লোকটা ছিল আলাপ করার জন্য উন্মুখ। চোখে ছিল মুগ্ধ মোহাঞ্জন। মনে অদম্য কৌতূহল। আজ সেই মানুষটি পাথরের মতো নিষ্প্রাণ! ঘৃণামিশ্রিত তীব্র অনীহা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নাকি ওর নেই। আর আমি? আমার পরিবর্তন? সেদিন অবজ্ঞাভরে দেখেছিলুম এক মুগ্ধ ভক্তকে। করুণার ভিখারিকে। আর আজ চোখ তুলে চাইতে পারছি না ওর দিকে! ঐ লোকটাকে আমি ভালোবাসি। আর কোনো ভুল নেই। কোনো সন্দেহ নেই। ঐ পাথরে-গড়া মানুষটার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। সব কথা ওকে বলব। অকপটে। যদি সে হেসে ওঠে শুনে? যদি কৌতুক করে? ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে? সে হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আর যদি সে সত্যই ক্ষমা করে আমাকে? বুঝব, সে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। ওকে আমার চাই। একান্ত করে চাই। উজাড়-করে-দেওয়ার সান্নিধ্যে চাই!

প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসি পায়ে পায়ে। কুলির পেছন পেছন। ও-ও। কলকাতার বাইরে এলেই একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়ে! মুক্ত প্রকৃতি। আকাশটা কী নীল! মনটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

—আপনি তাহলে এদের দায়িত্ব নিচ্ছেন তো?

বিরক্ত হই। এ কথাটা কি এখনই না বললে চলছিল না? এমন সুন্দর সকালে কি ঐ কথাটাই মানুষের মনে আসে? জবাব না দিয়ে রিকশা ডাকি। স্যুটকেসটা তুলে দিতে বলি কুলিকে। ওকে বলি—উঠুন।

পরমুহূর্তেই একটা শ্লেষাত্মক কড়া জবাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই প্রশ্নটা করেছি আমি। তার জবাবটাও মনে মনে তৈরি করে রেখেছি। ও কিন্তু সেদিক দিয়েও গেল না। গম্ভীর হয়ে শুধু বলে—আমি তো যাব না।

—যাবেন না? মানে?

—মানে আপনি এঁদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জানলে ডাউন ট্রেনে ফিরে যাব আমি। সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে এসেছি।

—ও!

আমার চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে! প্রচণ্ড একটা কান্নার চাপে বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। দেবে না—ক্ষমাসুন্দর নতুন অধ্যায়ের সূচনাতেই ও ভেঙে দিল আমার তাসের ঘর!

একটুকরো কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমার ঠিকানাটা রাখুন। খোকনের দায়িত্ব নিতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।

সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিমান গিয়ে পড়ে ঐ কাগজের টুকরাটার উপর। কুচিকুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ছেড়ে দেই।

রিকশাওয়ালাকে বলি—চল।

বারো

পুরা একটা বছরও কাটেনি।......

অথচ এরই মধ্যে বৌদির মুখখানা আর ঠিকমতো মনে পড়ে না। এমনই হয়। একদিন মনে হত—ওদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি অচ্ছেদ্য বন্ধনে। রাধাবৌদির নশ্বর দেহটা যেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সেদিন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল জীবন। অথচ সেই বৌদির কথা এখন দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না। দুরন্ত অভিমানে ওদের ত্যাগ করে চলে এসেছি একদিন। তারপর আর ওদের সংবাদ রাখিনি। মনামী কি দাদার সেবার ভার গ্রহণ করেছিল? সে যে বৌদির শেষ অনুরোধটা রাখেনি, এটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। অবনীমোহনের প্রতি তার আচরণ দেখে মনে হত ওরা দুজনেই বুঝি পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আমি জানি, ওটা সত্য নয়। সত্যিকারের ভালোবাসলে মনামী কখনও বৌদির চোখের সামনেই অমন হ্যাংলাপনা করতে পারত না। প্রেমের সংজ্ঞা সে কথা বলে না। সেটা ওদের চোখের নেশা। সে নেশা হয়তো—হয়তো কেন—নিশ্চয়ই ছুটে গেছে এতদিনে। ও বাড়িতে আর কোনওদিন যাইনি। খবর পেয়েছিলাম দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে হয়েছে অধ্যাপকমশাইকে। নীরজার সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়েছিল—তার কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল—নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে দাদা নাকি পশ্চিমে গেছেন। যাওয়ার সময়েও সেই মেয়েটি সঙ্গে ছিল। অর্থাৎ তখনও ওদের চোখের নেশার ঘোর কাটেনি ঠিকমতো!

তা যেন হল, কিন্তু আমার তো চোখের নেশা নয়। আমি কেন এ মূর্খামি করলেম? কথাটা অনেকদিন ভেবেছি মনে মনে—জবাব পাইনি। এইসব খুরওয়ালা লালমুখো প্রগতিচারিণীদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওরা কথায় কথায় চটুল ভঙ্গি করে, ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে বিদ্যা জাহির করে, ওরা চায়ের কেটলির মতোই সরবে ফোটে—কদমফুলের মতো নীরবে ফোটে না। অথচ সব জেনে-শুনেই ওকে ভালোবেসেছিলেম!

কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলি? যাকে কাছে পেতে চাই, যাকে আদর করতে চাই, যাকে মন উজাড় করে দিতে চাই—তাকেই তো? সে অর্থে কি মনামীকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি কোনওদিন? ওর সঙ্গে কেমন যেন একটা গোপন প্রতিযোগিতা চলছিল আমার—ওকে শুধু হারিয়ে দিতে ইচ্ছে হত—তর্কে, ব্যবহারে। পীড়ন করতে ইচ্ছে হত। সে পীড়ন শুধু মানসিক নয়—রুজমাখা গালে টেনে চড় মারতেও ইচ্ছে হয়েছে কখনও কখনও। যৌবনভারে দেহটি হিন্দোলিত করে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে যখন দাদার হাত ধরে বেড়াতে যেত আর আড়চোখে তাকাত আমার দিকে—তখন ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ধরি আমি ওকে, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে দিই ওর হাড়-পাঁজরা। ওকে জব্দ করলেই খুশি হতেম আমি—যেনতেনপ্রকারেণ! নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করেছি—এ আবার কী স্যাডিস্ট ভালোবাসা? তবু এ প্রেম! এই জন্যেই হয়তো প্রেমকে বলা হয়েছে বিচিত্রগতি। অনুকম্পার উৎসমুখ থেকে যদি প্রেমের ভগবতী নেমে এসে থাকে অবনীমোহনের প্রথম যৌবনে, তাহলে আমার জীবনে তা নেমে এল টেনে-চড়-মারার একটি বাসনা থেকে!

চড় অবশ্য মারিনি। মারিনিই বা বলি কেন, মেরেছি; হাতে নয়, কলমের মুখে। চড় মারা আর কাকে বলে?

কিন্তু নিজের কাছে আর কী লুকাব? যে আঘাত করেছি তাকে, তার চতুর্গুণ আঘাত পেয়েছি নিজে। সে কেড়ে নিয়েছে আমার রাত্রের নিদ্রা—দিনের শান্তি। নিরালায় কখনো মনের ক্যানভাসে আঁকতে বসেছি ওর ছবিটা! হঠাৎ সচেতন হয়ে চাবকে শাসন করেছি মনকে।

তবু আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে ওর কথা; তখন মনে হয় কোথায় কী যেন একটা ভুল হয়ে

গেছে। হয়তো যা জানতেম তা ঠিক নয়। ভাবতে ভালো লাগে—সেও আমার কথা ভাবে, সঙ্গীহীন অবকাশে তারও মনে পড়ে আমার কথা। আমার জীবনে সকালের আকাশে সূর্যাস্তের এই যে স্বর্ণাভা, আমার প্রেমের এই যে বর্ণচ্ছটা—এর সংবাদ সে পাবে না কোনওদিন। সে আছে একেবারে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে—একশ আশি ডিগ্রি লঙ্গিচ্যুড তফাতে। তাই এ সংবাদ সে জানে না; কিন্তু কে বলতে পারে হয়তো ওর জীবনের পূর্বগগনে এই একই সূর্যের উদয় হচ্ছে এখন। হয়তো অনুরাগের উদয়ভানু সে আকাশেও আঁকছে ওর অন্তদ্যুতির কনকাভা। কে জানে! আমাদের মাঝখানে এক কালরাত্রির ব্যবধান। বিপুলা এ পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে যদি হঠাৎ এই অস্তরবি চেপে ধরে ঐ বালার্কের হাত, তখন সে কী করবে?

ঘটনাটা ঘটল প্রায় একবছর পরে! একদিন অপ্রয়োজনীয় নোট, বাজে কাগজ, পুরাতন চিঠি সব ছিঁড়ে ফেলছি বসে বসে—ট্রাঙ্কের তলা থেকে হঠাৎ বার হল একটা ভারী খাম। বৌদির নাম লেখা। চিনতে কষ্ট হল না—এ খাম খোলা হয়নি। যাঁর উদ্দেশ্যে চিঠিখানি লেখা তাঁকে দেওয়া যায়নি, যিনি লিখেছেন তাঁকে ফিরিয়ে দেবারও অবকাশ মেলেনি। চিঠিখানা তাই এতদিন পড়ে আছে মুখ বন্ধ করে। ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়তে পারি না। জানি অন্যায়, তবু দুর্বার কৌতূহলকে রোধ করা গেল না। পরের চিঠি পড়তে নেই; কিন্তু এ চিঠি যাঁকে লেখা হয়েছে শুধু তিনিই নন, যে লিখেছে সে-ও আমার কাছে মৃত। একদিন যে মেয়েটিকে ঘিরে নানা স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠত—সে আজ অবলুপ্ত আমার জীবন থেকে। সুতরাং এতে আর অন্যায় কী? এত ভারী খামে কী লিখেছিল মনামী? খুলে ফেলি খামটা।

....বজ্রাহত হয়ে যাই চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়ে। এও কি সম্ভব? মনামী অবনীমোহনকে কোনওদিন ভালোবাসেনি এটা বিস্ময়কর নয়, কিন্তু এই চিঠির পরকলায় ওর অন্তরের অনাড়ম্বর শুভ্র আলো রূপায়িত হল প্রেমের যে বিচিত্র বর্ণালিতে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত। আমার তরফ থেকে শুধু অবজ্ঞা আর উপেক্ষা পেয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অনেক দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে-সব ঘটনার যেন অন্য একরকম অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। ও কখনো আমাকে কাছে টেনেছে, কখনো দূরে ঠেলেছে; উপেক্ষা করেছে, প্রলুব্ধও করেছে। কখনো নির্জন অবকাশ খুঁজেছে, ভাতের থালা আগলে রেখে ডেকে পাঠিয়েছে নীরজাকে দিয়ে, কখনো সর্বসমক্ষেই করেছে বাঁকা ইঙ্গিতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সবই সত্য, সবই আমার জানা। শুধু তার ভাষ্য ছিল ভুলে-ভরা। যখন দুরন্ত অভিমানে দূরে ঠেলত—মনে ভেবেছি রূপের দম্ভ। আবার যখন সুনিভৃতে কাছে টানত—ভাবতেম আমাকে প্রলুব্ধ করে অপমান করতে চায় বুঝি। আজ সঙ্গীহীন ঘরের এই আবছা-আঁধারে সেইসব স্মৃতির টুকরোগুলো ফিরে আসছে নতুন রূপ নিয়ে, নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে।

মনে আছে, একবার বাগান করার শখ হয়েছিল। পাশের বাড়ির বাগানে রঙবেরঙের মরশুমি ফুলের সম্ভার দেখে বৌদির ইচ্ছে হল কিছু সিজন ফ্লাওয়ার লাগানোর। পরিচর্যার ক্রুটি হয়নি। জল দেওয়া, সার দেওয়া, গোড়া খুঁড়ে দেওয়া। রোজ সকালে ব্যগ্র হয়ে লক্ষ্য করেছি ফুল ধরেছে কিনা। আশপাশের বাগানে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল, শুধু আমাদেরই চারাগাছেই কোনও কলি ধরল না। বৌদি রাগ করে বললে, তোমাকে ঠকিয়েছে ঠাকুরপো, যত জংলি বাজে গাছের বীজ দিয়েছে তোমাকে। শেষে পাশের বাড়ির মালি যখন ঝরা-ফুলের চারাগুলো উপড়ে ফেলতে থাকে তখন দেখা গেল আমাদের চারাগাছেও এসেছে অসংখ্য কুঁড়ি। তারা কিন্তু ফুটতে পেল না। বসন্ত তখন বিদায় নিয়েছে। চৈতালি ঘূর্নি হাওয়ায় কুঁকড়ে গেল গাছের পাতা। ফুটবার আগেই আমাদের এত সাধের ফুলগুলি ঝল্সে গেল।

সেই অপঘাত যেন আবার ঘটল আজ। জীবনে বসন্ত এল, ফুলও ফুটল, শুধু সময়টা সিন্‌ক্রোনাইজ করল না! জংশনে এসে বদলী করে যে ট্রেনটা ধরব—সেটা আগেই এসে ছেড়ে গেছে।

এই চিঠি লিখে কী মন নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল মনামী! ও হয়তো জানতো বৌদির গোপন উদ্দেশ্য। অনেক হাসি-রহস্যের ধারাপাতে ঝরে পড়েছে বৌদির মনের মেঘ। হয়তো ওর আশা ছিল—বৌদির হাত ঘুরে এ চিঠি আমার হাতেই এসে পড়বে। এ চিঠি সে কি সত্যিই বৌদিকে লিখেছিল? ঐ ভাষায়? শুধু সম্বোধনটা আমাকে নয় বলেই কি এ চিঠির মালিকানা থেকে আমি বঞ্চিত?

আর এ চিঠির কী উত্তর সে পেয়েছিল!

*　　　　*　　　　*

স্থির করলেম, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। চৈতালি ঘূর্ণি হাওয়ায় প্রায় এক বছর আগে যে ফুলটি শুকিয়ে গিয়েছিল—তার বীজ হয়তো এখনও আছে অবিকৃত। নূতন করে যত্ন নিলে হয়তো আবার হবে অঙ্কুরোদ্‌গম। শুরু হল নূতন পথের অভিসার।

অনেক অন্বেষণ করে অবশেষে ওঁদের অনুসন্ধান পাওয়া গেল পশ্চিমের এক অখ্যাত পল্লিপ্রান্তে। বিচিত্র পরিবেশ! বড় লাইনের স্টেশন থেকে গাড়ি বদল করে খেলাঘরের রেলগাড়ি চেপে যেতে হয়। গ্রামের একদিকে শোন নদের বিস্তীর্ণ সোনালি আঁচল, আর পারে অড়হর খেত। সবুজ শস্যের কোল ঘেঁষে একফালি জল-চিক্-চিক্ নীল পাড়। বিরাট নদীর বাকিটা কাদাখোঁচার পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত বালুর বিস্তৃতি। গ্রামের অন্যদিকে দিগন্ত-অনুসারী ধ্যান-স্তিমিত রোহিতাশ্ব পর্বত। এঁকে-বেঁকে ঢেউ তুলে গেছে চুনারের দিকে—কোনো দুর্নিরীক্ষ দিগন্তে। নদী-পাহাড়ের সযত্নলালিত একচিলতে ঝিমন্ত জনপদ। গম, অড়হর, ভুট্টা আর আখের খেতে মাঝে মাঝে মেটে ঘর। দেওয়ালে সাদা খড়িমাটির আলপনা—বাজুবাঁধা বলিষ্ঠ হাতের শিল্পপ্রয়াস। মনে হয় প্রাচীন অনার্য ভারতের সহস্রাব্দীর নিদ্রা এখানে ভাঙেনি। বিজ্ঞানের চেষ্টায় অবশ্য ত্রুটি নেই; প্রকৃতির এই শান্তিনিকেতনে মানুষ কী করে সন্ধান পেয়েছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে চুনের সম্ভার। কেটে কেটে তুলছে ছোট ছোট ট্রলিতে। ঠেলে ঠেলে বোঝাই দেয় মালগাড়িতে। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পাখির দল আকাশে ওড়ে পাখা ঝাপটে। দূরদূরান্তে গড়িয়ে যায় আওয়াজটা—মিলিয়ে যায়। আবার শান্ত প্রকৃতি ঢুলতে থাকে আসন্ন ঘুমের আমেজে।

এখানকার চুনের কোয়ারির ম্যানেজার হচ্ছেন মিস্টার ত্রিবেদী। এককালে ছাত্র ছিলেন দাদার। অকৃতদার যুবক। তাঁরই তিন কামরার বাংলোতে আপাতত এসে বাস করছেন ওঁরা। খবরটা সংগ্রহ করেছি কলেজ থেকে! এখানেই ওঁদের বায়ুর পরিবর্তনের আয়োজন। আমি গিয়ে প্রণাম করতে একেবারে চমকে ওঠেন দাদা। বেশ বদলে গেছেন, আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। কানের দুপাশের চুলগুলিতে পাক ধরেছে। রোগা হয়ে গেছেন যেন। হাত দুটি ধরে পাশে বসান। আমি এদিক-ওদিক চাইতে থাকি। মনামীও যে ওঁকে শুশ্রূষা করতে এখানে এসেছে এ খবর জেনেই এসেছি, কিন্তু তাকে দেখছি না কেন? প্রশ্নটা তুলতে সঙ্কোচ হয়! এদিকে দীর্ঘদিনের এত কথা জমা হয়ে আছে যে, দাদা কোথা থেকে শুরু করবেন, তাই যেন স্থির করতে পারেন না। বলেন, কেমন করে সন্ধান পেলে?

বলি, নিজের গরজে।

—তাই নাকি? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসিসনি তো?

বললেম, ধরেছেন ঠিকই! এবার তো ফিরে যেতে হবে। আপনি গিয়ে না দাঁড়ালে যে কিছুই হবে না।

দাদা হাসেন; হাসিটা স্পষ্টই ম্লান। শেষ যেদিন ওঁদের সংস্রব ত্যাগ করে চলে আসি সেদিন তাঁকে কোনো কথা বলে আসিনি। বৌদির মৃত্যুদৃশ্যটি তখন ছিল মনের কপাটে কুলুপ এঁটে। যাওয়ার আগে তাই অধ্যাপক দাদাকে একটা সামান্য সম্ভাষণও করে যাইনি।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, বেশ যাব। কবে বিয়ে?

—তারিখ অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও!

—শুধু পাত্রী স্থির হয়েছে, কেমন?

আমি সলজ্জে ঘাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

—এ খবরে সবচেয়ে যে খুশি হত সে নেই। আমাকে যেতে হবে বৈকি। যাব। তবে মনুকে রাজি করাতে হবে, সে ভার তোমার।

আমি মনে মনে হেসে বলি, নিশ্চয়ই, তাকেই রাজি না করাতে পারলে যে কিছুই হবে না। মুখে বলি, সে কই?

—শহরে গিয়েছে ফিরবে সন্ধ্যা নাগাদ।

শহরে যাবার একমাত্র রাজপথ খেলাঘরের প্যাসেঞ্জার গাড়ি। এখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। হাটে সব কিছুই পাওয়া যায়—চাল, ডাল, কুঁহড়া, বদি, রামতরুই, ভেলি গুড় আর মেঠাই। কিন্তু ডেংচি বাবুদের চাহিদা সব বিচিত্র যে। চাই গায়েমাখা সাবান, টুথপেস্ট, মাথার তেল। শহর থেকে এ-জাতীয়

জিনিস সচরাচর সরবরাহ করেন টি. টি. আই. বাবু। কিন্তু মনুর পছন্দ হয়নি এ ব্যবস্থা। বাজারের সওদার ব্যাপারে পরের ওপর বরাত দিয়ে অপেক্ষা করার মেয়ে সে নয়। অগত্যা মাসে একবার তাকে শহরে যেতেই হয়।

খোকনকে কোলে নিয়ে দাঁড়ায় বাচ্চা চাকরটা। ওকে কোলে নিতে যাই। খোকন আসে না। সে চেনে না আমাকে!

দাদার সঙ্গে গল্পগুজবে সময়ে কেটে যায় ক্রমে। ত্রিবেদী-সাহেব এখনও ফেরেননি অফিস থেকে। এখানকার জীবনযাত্রার কথা ওঠে। পাথর কেটে ওরা কেমন রুজি-রোজগার করছে। চুনের ব্যবসার কথা। আখের চাষ হয় পাহাড়ের সানুদেশে, নদীর কিনারে কিনারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। সারা শীতকাল সারি সারি ওয়াগন চালান যায় ডালমিয়া নগরের চিনির কলে। দূরের ঐ পাহাড়টা হচ্ছে রোটাস। ওর মাথায় আছে রোহিতাশ্বের দুর্গ। হিন্দু আমলের দুর্গ। অনেক মূর্তি আছে। শেষ পাঠানরাজ সম্রাট শের শাহ্ নাকি ঐ কেল্লাটাকেই সংস্কার করে কাজে লাগান। এপাশের ঐ দলছাড়া পাহাড়টার নাম মুরলী। ওর ধারে-কাছে কোথায় বুঝি সালফারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভূগর্ভে। নতুন সম্পদের সন্ধানে দিবারাত্র কাজ হচ্ছে। গাঁয়ের আশেপাশে বাঘের ডাক শোনা যায়। ময়ূর দেখা যায় গাছের ডালে। হরিণের পাল এসে শস্য খেয়ে যায়। বুনো শুয়োরের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে ওরা মাচায় বসে ক্যানেস্তারা পেটে সারারাত।

আজেবাজে কথায় সময় কেটে যায়। বুঝতে পারি, মনামীর কথা, বৌদির কথা, আলোচনা করতে চান না বলেই এসব অবান্তর কথার অবতারণা করে চলেছেন তিনি একটানা। সন্ধ্যা এগিয়ে আসে শান্ত পায়ে। দাদা বলেন, সাতটার ট্রেন আসার সময় হল, নন্‌কু স্টেশনে যা।

নন্‌কু খোকনকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আমি বলি, তার চেয়ে আমিই ঘুরে আসি না কেন স্টেশন থেকে?

দাদা বলেন, না, নন্‌কুই যাক। ওর সঙ্গে হয়তো মাল আছে।

আমি বাধা দিয়ে বলি, মনামী যদি মালটা একা এতদূরে আনতে পারে, তবে বাকি পথটুকু আমরাই আনতে পারব। আমিই যাই।

দাদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন বলতে যান। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেন, বেশ যাও।

তখনই বেরিয়ে পড়ি। ছোট্ট স্টেশন। শহরের দিক থেকে একজোড়া ন্যারোগেজ লাইন পাহাড়ের দিকে যাবার পথে এই স্টেশনে এসে দুদণ্ড জিরিয়ে নিয়েছে। দেহাতি লোক আসছে একে একে। মাথায় পাগড়ি, কাঁধে কম্বল, হাতে লাঠি। কারও বা গায়ে মেরজাই। বাঁ হাতে ঝোলানো জুতোজোড়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে ধুলো ঝেড়ে পায়ে দেয়। এটাই এখানকার রীতি। লোকালয়ের কাছাকাছিই শুধু জুতোজোড়া চরণাশ্রিত হয়। রেললাইনটাও এ নিয়ম মেনে চলে দেখছি। স্টেশন চত্বরের কাছাকাছি এসে সিঙ্গল লাইন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। লোকালয় পার হয়ে আবার দুজনে মিশে গিয়েছে এক হয়ে। দিনের আলো শেষ হয়েছে। আবছা চাঁদের আলোয় দেখি লোকজনের যাতায়াত। স্টেশনের রেলবাবুটি গলাবন্ধ কোটের ওপর কানঢাকা টুপি চড়িয়ে কাউন্টারে এসে বসেছেন : কাঁহা যাইব? তিলথুবাজার? সাড়ে তিন আনে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা রঙা আলোর রেখা। জঙ্গলে আগুন দিয়েছে। আকাশে শুক্লা সপ্তমী কি অষ্টমীর চাঁদ। নৈঃশব্দ্যের চাদর মুড়ি দিয়ে দিগন্ত যেন ঝিমুচ্ছে। আকাশে তারার চুমকি। ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলছে অসংখ্য জোনাকি।

ট্রেনটা এসে দাঁড়ায়। চারখানি মাত্র বগি। লোকজন ওঠা-নামা করে। তা নামুক, এখানেও একগাড়ি মেনকা-রম্ভা নামছে না। অনায়াসে চিনে নিতে পারি ওকে—আবছা আলোয়।

ওর পরনে একখানা সাদা শাড়ি, লাল পাড়। গায়ে পুরোহাতা সার্জের হালকা নীল ব্লাউজ। ক্লোক পরেছে তার ওপর। বাঁ হাতে একটা ব্যাগ—বাণিজ্যসম্ভারের প্রাচুর্যে সেটা উপচীয়মান। আমি হাত বাড়িয়ে বলি, ওটা বরং আমার হাতে দাও।

ও অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝতে পারি, জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

বলি : কী দেখছ মনু অমন করে? ব্যাগটা আমাকে দাও।

এতক্ষণে বলে : তুমি!

ব্যাগটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমি চলতে থাকি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমায় অনুসরণ করে। স্টেশনটা পার হয়ে লাইন ধরে বাংলোর দিকে পা বাড়াই। আবছায়া পথ, নির্জন, চুনাপাথর বিছানো। গ্রামটা রেললাইনের উল্টোদিকে। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা তাই এ পথে কেউ আসেনি। স্টেশনের কলকোলাহলটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। দুদিকে খাড়া চুনা-পাথরের স্তূপ—মাঝখান দিয়ে ট্রলি চলার সরু পথ। যেন দুনিয়া থেকে পথটা আমাদের দুজনকে আড়াল করে রাখতেই রূপ নিয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে মনু ডাকে : শুনুন!

এটাই প্রত্যাশা করেছিলেম মনে মনে। থেমে পড়ি। ও কয়েক পা এগিয়ে আসে, ব্যবধানটা কমে যায়। একটু দূরত্ব রেখে বলে, আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন?

বনপথের আবছায়ায় ওকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—তবু মনে হল যেন বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে মনামী। আগের সেই উদ্ধত ভাবটা নেই—

ভিতর থেকে একটা বেদনা তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। বললেম, তোমাকে নিতে এসেছি 'মন্‌আমি'।

—নিতে এসেছেন! মানে?

বোধহয় এমন একটা পরিবেশের অভাবেই কথাটা বলা হয়নি এতদিন। চার দেওয়ালের রুদ্ধ আবহাওয়ায় বোধহয় স্ফুরিত হবার অবকাশ পায়নি। এই মুক্ত প্রকৃতির আঙিনায়, এই আবছা আলো-আঁধারের প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন নিরুদ্ধ কথাটা। ওর বেপথুমান কোমল করমুঠি গ্রহণ করে বলি : এ কথার তো একটাই মানে হয় মনু।

ও যেন পাথর হয়ে গেল!

'তুমি সুন্দর! আমি ভালোবাসি!'—এ দুটি কথা যুগে যুগে বলেছে মুগ্ধ মানব, কালে কালে শুনেছে রোমাঞ্চিত-তনু মানবী। কিন্তু এমন দুর্লভ পরিবেশ আসে কজনের ভাগ্যে? নীরব কটি মুহূর্ত শ্যামলী অন্ধকারের ঘোমটা টেনেছে, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো সলজ্জ চরণে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। আকাশের লক্ষকোটি জানলায় আড়ি পেতেছে বধূমিতা তারার দল—দেখছে মিটমিটিয়ে এই মিলনদৃশ্য! মনে হল, এখানে এমন একটা কথা বলা দরকার যা এই সঙ্গীতের ঐক্যতানে অনায়াসে মিলে যায়। আমার হাতের মধ্যে পায়রার নরম বুকের মতো ওর হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আমি অস্ফুটে বলি : জীবনের পরম লগ্ন এমনি হঠাৎই আসে, মনামী। কোন পথের বাঁকে যে তার সাক্ষাৎ মিলবে তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না; কিন্তু যেই সেই পরম শুভক্ষণটি এসে হাজির হয় অমনি তাকে বরণ করে নিতে হয়।

যেন আপাদমস্তক শিউরে ওঠে ও। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এসব আপনি কী বলছেন! আমি, আমি তো.....

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলি : বৃথা চেষ্টা। তুমি ধরা পড়ে গেছ মনু। আর তো এড়িয়ে যেতে দেব না তোমাকে। পরশপাথর দুর্লভ, কিন্তু পাকা জহুরিই কি সুলভ? তোমার জীবনের ভোগে তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছ—অভিমান করে ফিরিয়ে দিলেও তো আর আমি ফিরে যাব না। আমি যে জেনে ফেলেছি—তুমি আমার, একান্ত আমারই!

একবার বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও লুটিয়ে পড়ে আমার বুকে।

একটুকরো ছুট্ মেঘে ঢাকা পড়েছিল চাঁদটা। ঠিক সময় বুঝে সরে দাঁড়ায়। আবছা আলোয় হেসে উঠল চরাচর। আমি ওর মুখটা জোর করে আমার দিকে তুলে ধরে ডাকি : মনু? মন-আমি!

অস্ফুটে ও বলে : উঁ?

সৃষ্টির আদিম সন্ধ্যায় এমনি পরিবেশেই ধরা দিয়েছিল আদিমতমা নারী প্রথম পুরুষের বাহুবন্ধনে। ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলছে লক্ষ-কোটি জোনাকি; আকাশে জ্বলছে অগুনতি তারা। এমন দুর্লভ লগ্নেই কণ্ঠলগ্না প্রিয়ার কর্ণমূলে বলা যায় সেই চির-নূতন চির-পুরাতন কথাটি। কিন্তু মন যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন কথার ভারও সহ্য হয় না। কর্ণকুহরের বঙ্কিমপথ ত্যাগ করে তখন মনের গোপন কথার অভিসার হয় অধরোষ্ঠের সোজাপথে!

মনামী শিউরে ওঠে। ছিটকে সরে যায়! তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে যায় বাঙলোর দিকে। মনে মনে হাসি। ধরা পড়ার লজ্জা। পরিপূর্ণ অন্তরে অনুসরণ করি তাকে।

বাঙলোর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার টেনে বসে আছেন দাদা। গায়ে গরম ওভারকোট। একজন ভদ্রলোকও বসে আছেন সামনের বেতের চেয়ারটা দখল করে। সম্ভবত ইনিই গৃহস্বামী মিস্টার ত্রিবেদী। মাঝখানে গোল টেবিলের ওপর জ্বলছে সবুজ শেড দেওয়া একটা সেজবাতি। আমাকে বোধহয় দেখতে পায়নি ওরা। মনামীকে আসতে দেখেই ত্রিবেদী বলেন, বৌদির আজকে কী কী বাজার হল?

বৌদি!

সেজবাতির আলোয় একঝলক দেখে নিই ত্রিবেদীর বৌদিকে। লালপাড় শাড়ির ঘোমটা মাথায়; সীমন্তে সিঁদুর, হাতে শুভ্র শঙ্খবলয়।

দাদার কয়েকটা কথা ভাসা ভাসা কানে আসে। সম্ভবত ত্রিবেদীর সঙ্গে তখন আমার পরিচয়-পর্ব চলছিল, কারণ ভদ্রলোক হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করলেন আমাকে। প্রতিনমস্কার করেছি কি? মনে নেই; আমি তখন লক্ষ্য করছিলেম মনামী বৌদিকে—দ্রুতপদে সে চলে গেল ভেতরে, প্রায় টলতে টলতেই!

আমার মনে পড়ল সেই কথা কটাই, জীবনে বসন্তও এল, ফুলও ফুটল, শুধু সময়টা সিন্‌ক্রোনাইজ করল না!

তের

সমস্ত জীবন ধরিয়া শুধু ভুলেরই ফসল বুনিয়া গেলাম! আশ্চর্য, আজীবন ভুলকে এড়াইবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সজাগ রাখিয়া ফিরিতেছি। অনুরাধাকে সুখী করিতে পারি নাই; দুরন্ত অভিমান বুকে লইয়া সে চলিয়া গেল। হয়তো শেষ মুহূর্তেও সে আমাকে ক্ষমা করিয়া যাইতে পারে নাই। সে এই বিশ্বাস লইয়া বিদায় লইল যে, আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি—তাহার ধারণা আমি মনুর সহিত প্রমোদভ্রমণে দিন কাটাইতেছিলাম। এতদিন ভাগ্যকে স্বীকার করিতাম না, আজও অবশ্য করি না—কিন্তু কী আশ্চর্য যোগাযোগ!

মনামীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আমি আমার চিকিৎসক বন্ধুর শরণাপন্ন হইলাম। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে বন্ধুর নার্সিংহোমে একটি সিট খালি পাওয়া গেল। পরদিন অনুকে সব কথা লিখিয়া আমি নার্সিংহোমে ভর্তি হইলাম। দিনকয়েক মাত্র ছিলাম সেখানে; অনুর জবার না পাইয়া আমিই দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দিনসাতেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার অলক্ষ্যে কী সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

মানুষের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অভিযান। কার্য-কারণের পাকা ইটের গাঁথনি যে বিজ্ঞানভবনের, দৈব-ভাগ্য-নিয়তি সেখানে অপাংক্তেয়। জোয়ারভাটা হইতে চন্দ্রগ্রহণ সবকিছুই দৈবের আওতায় ছিল একদিন—আজ বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দৈবের রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইতেছে। যাহা কিছু কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত করিতে পারি না তাহাকেই আমরা কর্মফল ভাগ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। বস্তুত তাহা আমাদের জ্ঞানসীমার অতীত কিছু মাত্র। এ কথা চিরদিন বিশ্বাস করিয়াছি, আজও করি। কিন্তু অলক্ষ্যচারিণী কোনো এক নিষ্ঠুরার যেন কোনো কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। যতই তাহার জাল ছাড়াইয়া বাহিরে আসিতে চাই, ততই নূতন জালে জড়াইয়া পড়ি। অনুরাধা শল্যশাস্ত্রের নিকট হইতে হাত পাতিয়া বর্ম সংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইল না—মাতৃত্বের সম্ভাবনা হইতে নিজেকে চিরবঞ্চিত করিতে রাজি হইল না। তখন আমিই অগ্রসর হইয়া আসিলাম। পিতৃত্বের অধিকার হইতে নিজেকে চিরবঞ্চিত করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—নারায়ণী সেনা ধ্বংস করা আমার বৃথাই। কার্য-কারণের অতীত ঐ অদৃশ্য শক্তিটা—তাহাকে ভাগ্যই বল, দৈবই বল আর নিয়তিই বল—আমাকে ভুলাইয়া অন্যত্র সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল! এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা বধ করিয়া আসিয়া দেখি সপ্তরথীর আক্রমণে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় একটি প্রাণ অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। ডাকের গণ্ডগোলে অনু নাকি আমার চিঠি পায় নাই।

বুঝিলাম চূড়ান্তভাবে হারিয়া গিয়াছি।

তবু আত্মসমর্পণ করি নাই। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। রক্তচাপ ছিলই, অনুর মৃত্যুসংবাদে স্ট্রোক হইল। তিন-চার মাস শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। একেবারে শেষ হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহা হইলে ও-পক্ষের তৃপ্তি হইবে কেন? আমাকে পঙ্গু করিয়া, অর্ধমৃত করিয়া জিয়াইয়া না রাখিলে যেন তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় না। অনুরাধা দুরন্ত অভিমান বুকে লইয়া চলিয়া গেল—সুবিমল সমস্ত সম্পর্ক মুহূর্তে ছিন্ন করিয়া দিল, যাইবার পূর্বে সামান্য বিদায় পর্যন্ত চাহিতে আসিল না। যেদিন মনামী আসিল; সেদিনই সুবিমল চলিয়া যায়। তবু ভাঙিয়া পড়ি নাই; চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলাম। নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। ঘরসংসার আর হইবার নহে—শুধু খোকনকে মানুষ করিয়া তুলিব। উন্নত মস্তকেই বহন করিব এ মহাবঞ্চনাকে—পরাজয় মানিব না।

ঈশ্বরকে কোনোদিন স্মরণ করি নাই। জীবনরহস্যের যে তীর্থপথের অভিযাত্রী আমি, ঈশ্বর সেখানে অসিদ্ধ—প্রমাণাভাবে! যতদূর মনে পড়ে, জীবনে একবার মাত্র ঈশ্বরের মন্দিরে মাথা নত করিয়াছি। সস্ত্রীক প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম আনন্দময়ীতলায়। কিন্তু সে প্রণামের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। সে শুধু অনুরাধাকে ভুলাইবার জন্য একটা ছলনার আয়োজন।

আজও ঈশ্বরকে ডাকি না।

কিন্তু কী অদ্ভুত ঘটনার বিন্যাস! ঘটনাগুলি কাকতালীয়বৎ ঘটিতেছে, অথচ ঠিক যেন মনে হয়—অতি সুকৌশলী এক নাট্যকার একের পর এক দৃশ্যপটের পরিকল্পনা করিয়া চলিয়াছেন। মনামী আমাকে শুশ্রূষা করিতে আসিল। তাহাকে যেন চেনা যায়না। অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার। অনুরাধার মৃত্যুর সহিত সেও যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে একথা বুঝিতে তাহার বাকি ছিল না। প্রথমাবস্থায় আমি শিশুর মতো অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সমস্ত দায় মনু নিজে গ্রহণ করিল। অভিজ্ঞ নার্সের মতো আমার পরিচর্যা শুরু করিল। তাহাকে নূতন রূপে দেখিলাম। আশ্চর্য দুনিয়া! ঐ প্রসাধন-লাঞ্ছিতা অতি আধুনিকতার অন্তরেও বাঙলাদেশের সেবাপরায়ণা একটি নারী যে এতদিন লুকাইয়া ছিল এ সত্য যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। নিরলস অতন্দ্র সাধনায় সে তিলে তিলে আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। সে যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। অপর্ণা উমার মতো সে যেন সাধনায় লীন হইয়া আছে। রোগশয্যায় অসহায়ভাবে শুইয়া শুইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতাম। তাহার স্বেদসিক্ত শান্তশ্রী মুখখানি অপূর্ব সুন্দর—কিন্তু আমি যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম। কেন সে এমন প্রাণঢালা সেবার মধ্যে আত্ম-উৎসর্গ করিতেছে? সুবিমলকে একদিন অসতর্ক মুহূর্তে যে কথাগুলি মনামী বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িত—অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিত।

অনায়াসে সে আমার গৃহস্থালির কাজকর্ম নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। কেহ তাহাকে সে ভার দেয় নাই—যেন আপন অধিকার মতোই সে সবকিছুই করিতেছে। কোথাও কোনো জড়তা নাই—এমনই স্বচ্ছন্দ তাহার পদক্ষেপ। এমন অধিকারবোধ কোথা হইতে পাইল সে?

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া একদিন বলিলাম—এখন তো অনেক ভালো হয়ে গেছি, এবার তুমি বরং কলকাতায় ফিরে যাও। তোমাদের কলেজ তো অনেকদিন খুলে গেছে।

ও বলে—যাক। আমরা দু-একদিনের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় আপনাকে কিছুদিন নিয়ে গিয়ে রাখতে।

ডাক্তারবাবুর সহিত এ সকল পরামর্শ কখন হইয়াছে জানি না। আমি ব্যাপারটা তুচ্ছ করিতে চাহিলাম। মনু শুনিল না। বস্তুত এসকল বিষয়ে সে আমার সহিত কোনো পরামর্শ করাও প্রয়োজন বোধ করে না। হুকুমের সুরে একদিন ঘোষণা করিল—কাল আমরা রওনা হচ্ছি।

—কোথায়?

—বান্‌জারী।

—বান্‌জারী! সে আবার কোথায়?

শুনিলাম, আমার অসুস্থতার সময় যেসকল ছাত্র, বন্ধু, সহকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রেরা দেখা করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে ত্রিবেদীর সহিত সমস্ত ব্যাপারটি সে পাকা করিয়া ফেলিয়াছে। ত্রিবেদী কয়েক বৎসর পূর্বে আমার ক্লাসে পড়িত, বর্তমানে কোনো একটা লাইম-কেয়ারির ম্যানেজার হইয়াছে শুনিয়াছি।

মনু তারপর আমাকে এই পাণ্ডববর্জিত বান্‌জারী গ্রামে আনিয়া ফেলিল। তাহার প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করিতাম। আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল! অনুরাধার কথায় একদিন রাত্রে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, পরদিন সকালে মনুর মুখ হইতেই এক অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মনোভাব জানিতে পারি। এও জানি যে, মনু ঘরণী হইবার মেয়ে নহে; তাহার আকর্ষণে যে লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিবে শিখাসন্ধানী পতঙ্গের মতোই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অধুনা মনুর ভিতরে এই পতঙ্গলোভী শিখাটিকে আর দেখিতে পাই না। আমার সম্মুখে সে আজকাল আর দীর্ঘ সময় প্রসাধনে ব্যয়িত করে না। তনু-দেহখানি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া তুলিবার বাসনাটা প্রায় তিরোহিত। আগে কখনও সামনে আঁচল রাখিয়া এমন সাধারণভাবে তাহাকে শাড়ি পরিতেই দেখি নাই।

পুরাতন প্রসঙ্গটাই আবার একদিন পাড়িলাম—এখানে এসে আমি তো অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারব। এবার তুমি বরং ফিরে যাও, কেমন?

মনু স্টোভে কী একটা জ্বাল দিতেছিল,—বলিল—আপনি আমাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত কেন বলুন তো এত?

আমি হাসিয়া বলি—একদিন তো যেতেই হবে। এখনও ফিরে গেলে নন্‌-কলেজিয়েট হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারবে। কেন তবে মিছিমিছি জীবনের একটা বছর নষ্ট করবে?

ফুটন্ত পাত্রটার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি মনুর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠে; বলে—জীবনের একটা বছর বাঁচাতে গিয়ে বাকি বছরগুলিকে খোয়ানোই কি বুদ্ধিমানের কাজ?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট; না বুঝিতে পারার কোনো কারণ নেই। তবু না বুঝিবারই ভান করিতে হয়। আমি উপায়ান্তরবিহীন। মনুর সাময়িক খেয়ালের স্রোতে গা ভাসাইতে পারি না। হয়তো এটা তাহার সাময়িক খেয়ালও নহে;—খুব সম্ভব এ তাহার সুচিন্তিত অভিমত। অন্তর তাহার একনিষ্ঠ নিরলস সেবা—তাহার দেহ-মনের ঐকান্তিক পরিবর্তন, খোকনের প্রতি তাহার সুগভীর স্নেহ ঐরূপ একটি সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। কিন্তু সংসারী হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। শল্যচিকিৎসকের অস্ত্রে সে সম্ভাবনা চিরনির্মূল করিয়াছি।

তাই বলি—হাসির কথা নয় মনু, তুমি আমার জন্য যা করেছ তার প্রতিদান আমি কোনোদিন দিতে পারব না। কিন্তু তাই বলে এভাবে তো তোমার জীবনটা নষ্ট হতে দিতে পারি না। তুমি ফিরে যাও।

মনু অনেকক্ষণ পরে বলিল—বেশ, কিন্তু খোকনের কী হবে?

—হ্যাঁ, ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে অবশ্য।

—ওকে যদি আমি নিয়ে যেতে চাই, দেবেন?

—তুমি নেবে? সে কী করে সম্ভব?

—আপনার আপত্তি থাকলে তো অসম্ভব বটেই। নইলে নয়।

স্পষ্টতই সে অভিমান করিয়াছে। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। তাহার মনের গোপন কথা না বুঝিবার কোনো কারণ নাই, তাহার আচরণে সে সবকিছুই বলিয়াছে। সুতরাং মনুর বিশ্বাস, তাহার সব কথা বুঝিয়াও আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। কিন্তু আমি তো ক্রীড়নক মাত্র। বলিলাম—মনু, খোকন তোমার হাতেই মানুষ হয়েছে, ওকে ছেড়ে যেতে তোমার খুবই কষ্ট হবে। বুঝি সে কথা। কিন্তু একটু বুঝে দেখ লক্ষ্মীটি, ওকে কি চিরদিন তুমি আঁকড়ে রাখতে পারবে? আজ তুমি একাই স্থির করছ, দুদিন পরে এর জন্য তোমাকে অপরের অনুমতি চাইতে হবে। তোমাদের জীবনে হয়তো এটাই হবে বাধা।

মনু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর অঞ্চলের প্রান্তটা অহেতুক আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে অস্ফুটে বলিল—আর আমি যদি এমনই কাউকে জীবনের সঙ্গী করি যে খোকনকে আমারই মতো ভালোবাসে?

বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না; তবু বলি—সে হয় না মনু, সে অসম্ভব।

—অসম্ভব? কেন অসম্ভব?

—কেন অসম্ভব তা বলতে পারব না। কিন্তু যা আশা করছ, তা হবার নয়; আমি তাতে রাজি হতে পারি না—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো মনু উঠিয়া দাঁড়ায়—কী? কী বুঝেছেন আপনি?

—এ কথার অর্থ তো পরিষ্কার মনু। তাছাড়া খবরটা আমার কাছে নতুন নয়। অনেকদিন আগে তুমি সুবিমলকে জোর গলায় বলেছিলে, 'হ্যাঁ অবনীমোহনবাবুকে আমি ভালোবাসি, তিনি বিয়ে করতে চাইলে আমি রাজি আছি।' তোমার ধারণা, সেদিনের সে কথাটা আমি শুনিনি—কিন্তু সে ধারণাটা তোমার ভুল। তাছাড়া যে ঐকান্তিক সেবায় তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে তাতেও প্রতিমুহূর্ত বুঝতে পেরেছি এই নিরলস সেবার উৎস কোথায় হওয়া সম্ভব। তোমার এতবড় ভালো-বাসাকে উপেক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। স্বীকার করি তোমাকেও আমি ভালোবাসি; কিন্তু ক্ষমা কর আমাকে—তোমাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—এ কী, তুমি কাঁদছ?

মনু আমার কথার প্রত্যুত্তর করে নাই। উদ্‌গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া সে ছুটিয়া পালায়। এছাড়া কিই বা সে করিতে পারিত? এভাবে ধরা পড়িয়া তাহার অন্তর লজ্জায়, ক্ষোভে, অনুশোচনায় বুঝি জ্বলিয়া যাইতেছিল। যে নারী গোপনে ভালোবাসে তাহার অনেক জ্বালা। বুকের পাষাণভার তাহাকে সঙ্গোপনে বহিতে হয়। প্রতিটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাহাকে লুকাইয়া ফেলিতে হয়। যদি কখনও তাহার অন্তরতম কথাটি কেহ প্রকাশ্য আলোকে টানিয়া আনে তখন আর সে নিজেকে সামলাইতে পারে না। তদুপরি সেই মুহূর্তেই যদি তাহার সদ্যস্ফুট প্রেমের কুসুমটি তাহারই প্রেমাস্পদ পদদলিত করে, তখন অঞ্চলে চক্ষু ঝাঁপিয়া অন্তরালে যাওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর কী?

কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়।

যে কোনো পুরুষ মনামীকে পাইয়া ধন্য হইবে। সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, সে আমার খোকনকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে এবং সর্বোপরি আমিও তাহাকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি; তবুও আমি তাহাকে গ্রহণ করিবার অধিকার হারাইয়াছি। এও সেই অদৃশ্যচারিণীর এক কঠিন শস্ত্রপাত।

তিন-চারদিন সে আমার সম্মুখে আসিল না। কী করিয়া তাহার দিন কাটিত জানিতাম না। আমার ঔষধ, আমার পথ্য সকলই সময়মতো পাইতেছি, স্পষ্ট বুঝিতে পারি সে আমার চতুর্দিকেই রহিয়াছে—শুধু সম্মুখে আসে না! অবশেষে সে নিজেই একদিন আসিয়া ধরা দিল।

—কেন এটা অসম্ভব?

—আমি তো বলেছি মনু, কারণটা তোমাকে বলতে পারব না, কিন্তু তোমাকে বিবাহ করার অধিকার আমার নেই।

ও আমার খাটের পাশে বসিয়া পড়ে, বলে—এটাই বোধহয় বাকি ছিল জামাইবাবু। আপনার কাছে আজ স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে না—জীবনে এমন একদিন গেছে যখন আমার চতুর্দিকে দেখতে পেতুম উন্মুখ সতৃষ্ণ চাহনি! আমার কাছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পেলে ওরা লুটিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল আমার দাক্ষিণ্যের দ্বারে। আর আজ আমি নিজে থেকে যার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াচ্ছি সেই ফিরিয়ে নিচ্ছে মুখ! কিন্তু এ দুর্বহ ভার যে আমি আর বয়ে বেড়াতে পারছি না জামাইবাবু!

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগিতেছিল তাহাকে। আমি ওর মাথার উপর একটি হাত রাখিয়া বলি—এত হতাশ হয়ে পড়ার তো কিছু নেই মনু! যারা তোমাকে পেলে ধন্য হত তারা আজও তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি তাদের মধ্যে ফিরে গেলেই তা দেখতে পাবে।

—কিন্তু তাদের কাউকে তো আমি ভালোবাসিনি। তাদের নিয়ে কৌতুক করেছি, খেলা করেছি, কিন্তু ভালোবাসিনি। জীবনে একবারই মাত্র ভালোবেসেছিলুম, একজনকেই আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলুম আমার জীবনে; কিন্তু সে আমার মুখের দিকে ফিরেও চাইলে না.....

আমি ওর হাতদুটি তুলিয়া লইলাম। কী সান্ত্বনা দিব? তবু বলিলাম—সেও তোমাকে তেমনি ভালোবাসে; কিন্তু সে হতভাগ্য যে আজ নতুন করে জীবন শুরু করতে অক্ষম।

মনামী অনুরাধা নহে; লজ্জায় জড়সড়ো হওয়া মেয়ে সে নহে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাহার। তারপর বলে—আপনার এ কথার কোনো মানে হয় না।

—কেন মানে হয় না?

—আপনি বাইওলজির প্রফেসর। এত সেন্টিমেন্টাল হওয়া তো আপনার সাজে না।

আমি হাসিয়া বলি—বাইওলজির অধ্যাপক বলেই বিবাহের বাইওলজিকাল কারণটা উপেক্ষা করতে পারি না।

—এ কথার অর্থ?

—অর্থটাই তো অনর্থ!

কিন্তু মনু কিছুতেই আমাকে এড়াইয়া যাইতে দিবে না। শেষ পর্যন্ত তাহাকে বলিলাম—পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে যে কোনো মুহূর্তে পুনরায় রোগের আক্রমণ হইতে পারে। এ রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে বাঁচিবার আশা অল্প। সে ক্ষেত্রে খোকনের কী হইবে তাহা ভাবিবার কথা। মনু যুক্তি দেখায় খোকনের মা নাই, সে ক্ষেত্রে পিতৃহীন হইবার আশঙ্কা থাকিলে তাহাকে নূতন মায়ের আশ্রয়ে রাখিবার ব্যবস্থাই তো যুক্তিযুক্ত। হাসিয়া বলিলাম—কিন্তু নূতন মায়ের সঙ্গে যে নূতন ভাইও আসিতে পারে?

—এটাই কি আপনার একমাত্র আপত্তি?

—যদি বলি তাই?

—উত্তরে যদি সে বিষয়ে আপনাকে আগেই নিশ্চিন্ত করে দিই?

আমি বলি—ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা!

মনু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বড় পরিশ্রান্ত লাগিতেছিল তাহাকে। যেন সে একটা আশ্রয় খুঁজিতেছে। জীবনের ভার যেন সে আর বহিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে বলিল—আমি জানতুম এই নিয়ে রাধাদির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয়নি। রাধাদি আমাকে বলেছিল সে কথা। কেন যে আপনি সন্তান চান না তা অবশ্য বলেনি; কিন্তু তবু এই নিয়েই যে আপনাদের মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটেছিল তা জানি। আমি প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি সন্তান আমি চাই না, চাইব না কোনওদিন।

অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এ আবার কী নূতন জালে জড়াইতেছি। মনুকে সব কথা বলা যায় না। তবু কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলি—পুরানো কথা ঘেঁটে লাভ নেই মনু। অনুরাধার সঙ্গেই সেসব ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখন কেন নতুন করে সংসারের জালে নিজেকে জড়াইতে চাই না তা তো বুঝতেই পার। তুমি যা বলছ তা ক্ষণিক উত্তেজনায় অবিবেচকের মতো বলছ। তুমি জান না, আমি তো জানি—দুটি একান্তবাসী বিবাহিত নরনারীর ঐ অনিবার্য পরিণামকে এড়ানো যায় না। গেলেও সে বড় কঠিন পথ। শখ করে কেন এ পথে আসবে? আমার জীবনই না হয় বিড়ম্বিত, তোমার তো স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনো বাধা নেই।

মনু উদাসকণ্ঠে বলে—আর এভাবে নিজেকে বয়ে বেড়াতে পারি না! রক্তের মধ্যে নোঙর ফেলার ডাক শুনতে পাচ্ছি। নাই বা পেলুম স্বামীর ভালোবাসা, তবু আশ্রয় তো পাব। আমি একটু শান্ত হয়ে জিরুতে চাই শুধু।

—আজ হয়তো ঐটুকুই তোমার কাম্য; কিন্তু দুদিন পরে বুঝতে পারবে শুধু বিশ্রামে মানুষের মন ভরে না! সে ব্যাঘাত চায়, সে পরিশ্রমও চায়! নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম মেয়েদের মন ভরাতে পারে না—সে শিশুর জ্বালাতন কামনা করে, সন্তানের উপদ্রবের জন্য তার মনের অন্তরে থাকে গোপন বাসনা। 'মা' বলে কেউ কোনোদিন তোমাকে ডাকবে না—না, এত বড় বঞ্চনা আমি ঘটতে দেব না তোমার জীবনে।

মনু খোকনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—সে দুঃখ আমার নেই। খোকনমণি আমার সে দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছে! আমি তাকে পেয়েই মা হয়েছি।

শিশুকে বুকে চাপিয়া সে কোন দুঃখকে ভুলিতে চায়? স্নেহের অত্যাচারে সদ্য-ঘুমভাঙা খোকন মনুর বুকের মধ্যেই কাঁদিয়া উঠে।

চোদ্দ

পুরুষকে ভোলাবার, তাকে মোহিত করবার শক্তি আমার আছে—এটুকু জেনেই তৃপ্ত ছিলুম এতদিন। আর কিছু চাইনি। পরাজয়কে চিনতুম না। চারপাশে যাদের দেখতুম, তারা ছিল আমার রূপের পূজারী। অভ্যস্ত ছিলুম তাতেই। তারপর হঠাৎ চাকা ঘুরে গেল। বদলে গেল সব! মনে হল ফুরিয়ে গেলুম বুঝি! আমাকে উপলক্ষ্য করেই সর্বনাশ নেমে এল রাধাদির সংসারে। আমিই তার মৃত্যুর কারণ। ভাবলুম, যা গেছে তা আর ফিরবে না। যেটুকু বাকি আছে তাও না হারাই! জামাইবাবুর সেবায় আত্মনিয়োগ করলুম কায়মনোবাক্যে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পরিচর্যার ফাঁক রাখিনি। প্রাণ ঢেলে সেবা করেছি। মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি রাধাদির কাছে।

অত বড় মানুষটা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল। শিশুর মতো। ওঁকে সেবা করতে গিয়েই কথাটা বুঝতে শিখলুম। পুরুষকে ভোলাবার জন্য নয়—তার সেবা করতেই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। কাদের ওপর বাণ নিক্ষেপ করে এসেছি এতদিন? ওরা এত অসহায়! বুঝলুম, হারিয়ে জেতা যায় না—হেরে জিততে হয়। এ সত্যটা এতদিন বুঝিনি। এ বোঝার ভুলই ক্রমে হয়েছিল ভুলের বোঝা।

কিন্তু পরশপাথর জীবনে দুবার আসে না! ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি যদি না বাজল—তাহলে আর আশা নেই। আজ জেনেছি, ধরতে গেলেই ঠকতে হয়। ধরা দিতে গেলে সহজে ধরা যায়।

মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হত নিজের ওপর। কী এমন হয়েছে যার জন্য গুমরে গুমরে মরছি। প্রেম এ নয়, হতে পারে না। ওকে আমি ভালো করে চিনিই না। ওর প্রেমে এমন পাগলিনী রাই হব কোন দুঃখে? দানে আর গ্রহণে অনুরাগের অঙ্কুরোদ্‌গম। ওর সঙ্গে আমার স্বাভাবিক আলাপচারী হয়নি একদিনও। প্রেমকূজন তো স্বপ্নকথা। যে কটি কথা বলেছি আঙুলে গুণে বলা যায়। সব কটিই উষ্ণ-বাক্য বিনিময়। অনুরাগের উত্তাপ নয়। রাগের। তা হলে? অথচ গলার কাঁটা নেমে যাওয়ার পরেও যেমন খচখচ করে বাধে—তেমনি একটা ব্যথা যেন গিয়েও যেতে চায় না।

কোনওদিন একটা খবর নিল না সে। ভেবেছিলুম একদিন না একদিন নিশ্চয় জামাইবাবুকে চিঠি দেবে। অন্তত খোকনের খবরটাও নেবে! অর্থাৎ খোকনের খবর নেওয়ার অছিলাতেই নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করবে। সে চেষ্টা সে করল না। রাগের মাথায় ওর ঠিকানাটাও ছিঁড়ে ফেলেছি। ফলে শুধু হেরেই গেলুম নয়—হারিয়েও গেলুম।

জামাইবাবু বারে বারে বলেন ফিরে যেতে। কিন্তু ফিরব কোথায়? পড়াশুনা? কী হবে? মা সরস্বতীকে কবেই বা স্মরণ করেছি? শরণ নিয়েছি? কলেজটা তো ছিল একটা অ্যাম্‌ফিথিয়েটার। ধনীর দুলালীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেটা ছিল মল্লভূম। কেড়ে নিতুম সহপাঠিনীদের মুখের গ্রাস। খেতুম না কিন্তু। খেলায় হারজিত আছে। ভোগ নেই। এ যে খেলা! এ খেলার রসদ ছিল যথেষ্ট। ছিল তনুদেহ, স্তবকে স্তবকে। সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর ছিল ব্যাঙ্কের এক খোপে। সেটা আমার বাবার আশীর্বাদ। কিন্তু শুধু দিলেই তো হয় না—নেবারও অধিকার থাকা চাই। তাই আশীর্বাদ আমার কাছে হয়ে উঠল অভিশাপ। যদি এত রূপ আমার না থাকত, এত টাকা না থাকত—তাহলে হয়তো আমার ইতিহাসটা এত করুণ হত না। হয়তো ট্যুইশানি করে ম্যাট্রিক পাশ করতুম। হয়তো কলেজে পড়ার সুযোগ হত না। নোঙর ফেলতুম কোথাও না কোথাও। কেরানি, ইস্কুলমাস্টার অথবা রেল-বাবুর বেড়া দেওয়া সংসারে! রাধাদির মতো হতুম সে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। নিজস্ব ঘরকন্না। যত ছোটই হোক। মাসান্তে বাঁধা মাইনের একটা খাম পেতুম! ডাইনে-বাঁয়ে লগি ঠেলে, গলুইয়ের জল ছেঁচতে ছেঁচতে ফুটো খেয়া নৌকাটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতুম এ মাসের পার থেকে ও মাসের ঘাটে। আগামী মাসের পয়লা তারিখের পারঘাটায়! তবু সে জীবন কাম্য। এমন আগাগোড়াই ফাঁকা নয়। ফাঁকি নয়।

এ স্বপ্ন এতদিন দেখিনি, আজ দেখছি। রাধাদির সংসারে অ্যাকটিং করতে এসে চোখ খুলেছে। কী পাইনি তার হিসাব মেলাচ্ছি! যে জীবনটাকে উপেক্ষা করেছি, ব্যঙ্গ করেছি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছি তুড়ি মেরে—আজ তারই জন্যে বুকের পাঁজরায় হাহাকার জেগেছে।

সরমার কথা মনে পড়েছে আজ। সরমা নন্দী। আমার হস্টেলের প্রতিবেশিনী। ঠিক পাশের বাড়ির। একতলার এককামরার অন্ধকূপের বাসিন্দা। আমার সঙ্গে ওর তফাত একতলা-দোতলার নয়। আসলে আশমান-জমিন্। তবু পরিচয় হল। আলাপও। ওর স্বামী বুঝি কোনও প্রেসের কম্পোজিটার। সরমার বয়স আর কত হবে—এই আমারই বয়সি। হয়তো দুচার বছরের বড়। অথচ দেখলে মনে হত—বুড়ি। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি! তিন চারটে বাচ্চা। রোগা-পটকা—টিংটিঙে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করত মেয়েটা। আমার দোতলা-ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেত ওদের গৃহস্থালি। সেই গবাক্ষপথেই আলাপ। মেয়েটা ভরপেট খেতে পেত না। তবু হাসিটি লেগেই আছে। তেবাড়ানো গাল! বাচ্চাগুলো অষ্টপ্রহর বাদুড়ঝোলা ঝুলত ওর আঁচল ধরে! অবাক হয়ে ভাবতুম—ও হাসে কেমন করে? ঐ নরককুণ্ডটাতে মানুষ হাসতে পারে? মনে আছে একদিন সন্ধ্যায় ও আমাকে ডেকে পাঠাল। ডেকে পাঠাল নয়, ডেকে নামাল। নেমে এলুম দ্বিতল থেকে। গেলুম ওর অন্ধকূপের ঘরে। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে থাকে। তেলচিটে মাদুর, ছেঁড়া কাঁথা। পাগলের চোখের তারার মতো ঘোলাটে ইলেকট্রিক বালব। পশমের

কাজ করা একটা শেলাই বাঁকা করে টাঙানো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাঁচটা ঝাপসা। রবিবাবুর কী একটা লাইন লেখা। কাঁচটা সাফ না করলে পড়া যাবে না। মনে হল কাঁচটা মুছলে নিশ্চয় দেখা যাবে রবিবাবুর নয়, দান্তের একটি লাইন বুঝি লেখা আছে, ইংরেজিতে যা—'অ্যাবানডন অল হোপ ঈ হু এন্টার হিয়ার।'

কোথাও কিছু নেই একবাটি পায়েস এনে হাজির। আমি তো অবাক। সরমা বলে—আমার বান্ধবী তো কেউ নেই—তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া। আজকের দিনে তাই আপনাকে ডেকে পাঠালুম।

বললুম—কেন, আজকে কী?

সরমা হাসে। উঠোনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। সেখানে লুঙ্গি-পরা ওর কম্পোজিটার-স্বামী নারকেলের ছোবড়া ছাড়াতে ব্যস্ত। তার মুখেও মিটিমিটি হাসি। সরমা বলে—আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

ওর বড় মেয়েটার জ্বর। কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার কাছে দেওয়ালে একটা ফোটো—ওদের স্বামী-স্ত্রীর। সেই চিরাচরিত একজন-বসা একজন-দাঁড়ানো কম্পোজিসান। ক্যামেরাম্যানের ধমকে-ফোটানো আঁৎকে-ওঠা হাসিটা আট বছরেও ঝাপসা হয়ে যায়নি। লক্ষ হল ফোটোটার ওপর একটা বেলফুলের মালা উদ্বন্ধনে ঝুলছে।

মনে মনে সেদিন হেসেছিলুম। পায়েসটা গলাধঃকরণ করতে প্রাণান্ত। বিস্বাদ! মনে মনেই বলেছিলুম—প্রভু, তুমি ওদের ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী বলছে, কী করছে!

আজ সেই কথাটাই মনে পড়ছে। ওর সঙ্গে জীবন বিনিময়ে নিশ্চয়ই আজও রাজি নই! কিন্তু অতখানি উপেক্ষা কি আজ করতে পারি তাকে? আজ যদি তার দশম বিবাহবার্ষিকীর নিমন্ত্রণ পাই? কী জানি! বিশ্বাসের জোর কমে গিয়েছে।

এতদিন ভাবতুম—সুবিমল নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। আর এও জানতুম তার ভুলটা ভাঙবে একদিন। সে ক্ষমা করবে আমাকে। আমার অতন্দ্র একনিষ্ঠ সেবা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাই সেদিন যখন জামাইবাবু বললেন—'তোমার জীবনে যখন নূতন সাথি আসবে তখন খোকনকে নিয়ে কী করবে তুমি?' তখন অনায়াসে বলতে পেরেছিলুম, 'আমি এমন সাথিকে বেছে নেব যে আমারই মতো খোকনকে ভালোবাসে।' আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ঐ খোকনের জন্যই সুবিমল আমাকে ডেকে নেবে। সেদিন দেখেছি তার রুদ্ররূপ। বিদ্বেষের আগুনে মদনভস্ম হতে দেখেছি। কিন্তু অপর্ণা উমার তপস্যা কখনও ব্যর্থ হতে পারে? রুদ্রদেবতা কি ভিখারির বেশে এসে দাঁড়াতে পারে না? উমার দ্বারে? অন্নপূর্ণার?

জামাইবাবু ভিতরের কথা জানতেন না। তিনি ভুল বুঝলেন। মারাত্মক ভ্রান্তি। প্রথম শুনে চমকে উঠেছিলুম। সামলাতে পারিনি। তারপর কেমন অবসাদ এল জীবনে। ক্ষতি কী? আলেয়ার পিছনে কেন ছুটে মরি? নোঙর ফেলার ডাক শুনতে পাচ্ছি রক্তের মধ্যে। বুঝতে পারি, সুবিমল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। একবছর হতে চলল! সে আশা ত্যাগ করেছি। তবে আর সে মরীচিকার পিছনে ছুটি কেন? পরশপাথর জীবনে দুবার আসে না। প্রেমও। সুতরাং নিষ্প্রেম সংসারের কর্ত্রী হওয়াই আমার নিয়তি। তবে এই হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকাটা কী দোষ করল? একেই বাঁচাই না কেন? আমারই প্রগল্ভতায় এ সংসারের এ চরম দুর্দশা। তবু রাধাদি আমাকে ক্ষমা করে গিয়েছে। খোকনকে দিয়ে গিয়েছে আমাকে। ও আমাকেই মা বলে জানে। ওকে ছেড়ে যেতে সত্যিই পারব না আমি।

এতদিনের এত খেলার শেষ হল। কুমারী মনামী চ্যাটার্জীর অভিশপ্ত জীবনের হল অবসান। বেঁচে রইল খোকনের মা!

*　　*　　*

ডায়েরি লিখছি। গল্প নয়! তাই অসঙ্কোচে সব কথা লিখতে পারি। নইলে মনে হত কোনো দুঃসাহসী কাঁচা লেখকের লেখা এ এক অলীক কাহিনি। না হলে এই ঘটনার মাসছয়েকের ভেতরেই ফিরে আসে সুবিমল?

আর সে কী আগমন? সে যে আবির্ভাব! আমাকে কিছু বলতে দিল না। কিছু বুঝল না, শুনল না। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সে এল। অতর্কিতে অভিভূত করে ফেললে আমাকে। কিছু ভোলবার কিছু

গোপন করার অবকাশ পেলুম না। সে পড়ে এসেছিল শিলালিপি। আমার বুকের পাঁজরায় খোদাই করে লেখা শিলালিপি! অসঙ্কোচে টেনে নিল বুকে। আর তারপর—ছি-ছি। এই আচরণের ইঙ্গিতমাত্রে চড় খেয়েছিল একদিন শান্তনু সেন—মিস্ চ্যাটার্জীর হাতে। অথচ আজ মিসেস রায়ের হাত উঠল না। পালিয়ে এলুম কোনোক্রমে। হায় রে! পালাব কোথায়? পালাব কার কাছ থেকে?

উনি বলেন—সুবিমলের বিয়ে স্থির হয়েছে! ও আমাদের নিতে এসেছে মনু।

বুঝি সব। তবু অবাক হবার ভান করে বলি—তাই নাকি সুবিমলবাবু? কনগ্র্যাচুলেশন্স্। এ খবরটা তো এতক্ষণ বলেননি। কবে বিয়ে? কোথায়? কার সাথে?

সুবিমল হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। উঠে পড়ে! বলে—ঐ যাঃ, পাঁচটা বেজে গেল! বৈজুপ্রসাদ বোধহয় বেরিয়ে গেল এতক্ষণ।

বৈজুপ্রসাদের শিকারের নেশা। সুবিমল ওর পেছন পেছন অকারণে ঘুরে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে।

উনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফেরার জন্য। সুবিমলের বিয়ে। মামা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চল, গুছিয়ে কলকাতা ফেরা যাক। ত্রিবেদী ঠাকুরপোও সায় দেয় এ যুক্তিতে। আমি রাজি হয়ে যাই। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে সম্মত হলুম। সুবিমলের বিয়ে যে হবে না শীঘ্র, তা আমি বুঝেছি। আর কেউ না বুঝলেও। কলকাতা যেতে চাই ভিন্ন কারণে। এই পাড়াগাঁয়ে এ অবস্থায় পড়ে থাকা ঠিক নয়। আমি রাধাদি নই। ও ভুল আমি করব না। একেবারে প্রথম অবস্থাতেই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তৃতীয় মাস চলছে। এই সময়টাই বিপদজনক। খবরটা উনি জানেন না। জানাইনি! জানি, এটা উনি চান না। এ নিয়ে রাধাদির সঙ্গে ওঁর মতের অমিল হয়েছিল। রাধাদি বিজ্ঞানের নির্দেশ মেনে চলেনি। আমি চলেছিলুম। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল।—সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও। আমি মা হতে চলেছি! এবার ওঁকে বলা দরকার। জানি, শুনে খুশি হবেন উনি। না হবেন কেন? যে কারণে তিনি এটাকে এড়াতে চেয়েছিলেন—সে কারণটা নেই। উনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। আজকাল বাইরেও ঘোরাঘুরি করেন একটু-আধটু।

আমাদের কলকাতা যাওয়ার দিন স্থির হয়। বাঁধাছাঁদা সারা। স্থির করলুম এবার খবরটা ওঁকে বলতে হবে। আর লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়। আর লুকাবই বা কেন? আমি তো বুঝি। বিয়ের আগে বলেছিলুম—সন্তান চাইব না কোনোদিন, কিন্তু যে কারণে বলেছিলুম সে কারণটা যে এখন নেই! দানের আনন্দ কি কেবল গ্রহীতার? দাতার নয়? ওর মনে এ বঞ্চনার জন্য কোনো খেদ নেই? ক্ষোভ নেই?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময় ওকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হল। বললুম—তোমাকে এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

বললে—ও কিছু নয়। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মনু?

—বল।

—তুমি কি আমাকে বিয়ে করে ঠকে গিয়েছ?

—একথার মানে?

—না, এমনই মনে হল কথাটা।

—না, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। হঠাৎ এ কথা তোমার মনে হল কেন?

—আচ্ছা, তুমি কি....মানে সুবিমলের কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে জান?

—না।

—তুমি যখন মাসতিনেক আগে কলকাতা গিয়েছিলে তখন কি তোমার সঙ্গে সুবিমলের দেখা হয়েছিল?

—না তো; কিন্তু এ কথা কেন?

—একটা জিনিস আমি বুঝতে পারিনি। সুবিমল তোমাকে আর আমাকে দায়ী করেছিল তার বৌদির মৃত্যুর জন্যে। যেদিন তুমি আসবে বলে 'তার' করলে, সেদিনই সে চলে যায়। তুমি জানো নিশ্চয়, অনুরাধার মৃত্যুর জন্য সে তোমাকেই দায়ী করেছিল?

—জানি। তাই কী?

উনি নিশ্চুপ। অন্ধকার। আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। ওঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। একটু চুপ

করে থেকে বললেন—তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। তুমি অনু নও! সত্যি কথাটা সহ্য করতে পারবে। তোমার প্রতি সুবিমলের একটা দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলাম। একেবারে প্রথম অবস্থায়। তারপর সে অনুরাগ রূপায়িত হয়েছিল তীব্রতম ঘৃণায়। যেদিন তুমি ফিরে এলে, সেদিন দুঃসহ ঘৃণাভরে সে আমাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করেছিল। তোমাকে সত্যি বলছি মনু, হঠাৎ সেদিন এখানে যখন সুবিমল ফিরে এল, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। ও তোমাকে স্টেশন থেকে আনতে গেল, আর আমি বসে বসে ভাবছিলাম—কেমন করে ওর এ পরিবর্তন হল! কী কারণে? একবার মনে হল, তুমি যখন কলকাতা গিয়েছিলে তখন তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে থাকবে।

আমি শুধু বলি—না, কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। হলে, ফিরে এসে গল্প করতুম তোমাকে।

—চিঠিপত্রের কোনো আদান-প্রদান হয়নি?

হঠাৎ রাগ হয়ে যায় আমার। উঠে বসে বলি—কী বলতে চাইছ তুমি স্পষ্ট করে বলবে?

ও আমার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে। বলে—রাগ করছ কেন? সুবিমলের সঙ্গে তোমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, অন্যায়ও নয়। তার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখিও এমন কিছু অমার্জনীয় অপরাধ নয়। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম—তোমার প্রতি ওর মনোভাবটা হঠাৎ বদলে গেল কেন?

আমি অবিচলিতভাবে বলি—দেখ, একটু আগেই তুমি বলছিলে যে আমি রাধাদি নই। কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে কেন? সুতরাং ঠেস দিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই।

ও বলে—তুমি আমার কথাটা সহজভাবে নিতে পারনি। আমি কিন্তু সরলভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম। আরও পরিষ্কার করে বলছি। আমার মনে হয় সুবিমল তোমাকে ভালোবাসে। সে বোধহয় জানত না যে, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তাই নিজের বিয়ে স্থির হওয়ার সম্ভাবনা দেখে একবার শেষ সন্ধান নিতে এসেছিল।

—হতে পারে। সেটা আমার অপরাধ নয়।

—নয়ই তো। এমনকি কলকাতায় থাকার সময় যদি তোমার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকে—অথবা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়ে থাকে—তা হলে সেটাও অপরাধ হত না!

—না, সেটা অপরাধ হত। চিঠি লেখাটা নয়, লিখে তোমার কাছে না বলাটা। বিবাহিত জীবনের একটা কোড আছে, সেটা লঙ্ঘন করা হত।

—তাই নাকি?

হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে আপাদমস্তক। মনে হল উনি বিদ্রূপ করলেন। শ্লেষ! আমার অতীত জীবনের প্রতি এ একটা কটাক্ষ। প্রাক্‌বিবাহ জীবনের অনেক গল্প করেছিলুম ওকে। নিজের ওপরেই রাগ হয়। এ কী ভুল করে বসেছি। মারাত্মক ভ্রান্তি! লোকটা যতদিন অসুস্থ অসহায় ছিল ততদিন তো বেশ ভালো লাগতো তাকে। যেই একটু শক্তি ফিরে পেয়েছে অমনি আঘাত করতে চাইছে। এজন্যেই কি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল রাধাদির জীবন? কী জানি!

বললুম—এ নিয়ে আর যে-ই বিদ্রূপ করুক—তুমি কর না। বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠতার বিষয়ে ব্যঙ্গটা তোমার মুখে মানায় না ঠিক।

এ তীক্ষ্ণ আঘাতেও আহত হল না লোকটা। হেসে বললে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আমি করিনি মনামী। তোমার মনটা কোনো কারণে চঞ্চল আছে—তাই ভুল বুঝছ আমাকে।

চঞ্চল আছে! কোনো কারণে চঞ্চল আছে! অর্থাৎ সুবিমলের উপস্থিতি। এ অপমানের একটা কড়া জবাব দিতে যাই, কিন্তু তার আগেই ও বলে—তুমি বোধহয় অনুরাধার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে আঘাত দিতে চাইছ। আর কেউ না জানলেও—তুমি তো জানো—সে সময় আমি তোমার কাছে ছিলাম না।

—তা জানি। কিন্তু সে সাতটা দিন তুমি কার কাছে ছিলে তাও তো বলনি আমাকে। প্রশ্নটা যে তোমাকে কখনও করিনি তাও নয়। কিন্তু জবাবটা এড়িয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক মনে করেছ তুমি। সন্তোষজনক কৈফিয়ত থাকলে নিশ্চয় তুমি আমাদের জানাতে তোমার এক সপ্তাহের অজ্ঞাতবাসের প্রকৃত তথ্য।

একটু চুপচাপ। তারপর ও বলে—আশ্চর্য আমার ভাগ্য! জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপের আগে চিন্তা করেছি, বিচার করেছি, যুক্তি দিয়ে যেটা করণীয় মনে হয়েছে তাই করেছি। অথচ মনে হয়, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে গিয়েছে বারে বারে। অভিশপ্ত আমার জীবন। সারাজীবন ভুল এড়াতে গিয়ে শুধু ভুলই করে গেলাম। কৈফিয়ত? হ্যাঁ, সেই সাতদিনের অজ্ঞাতবাসের একটা কৈফিয়ত আমার দেবার আছে—তুমি বিশ্বাস কর—কোনো অন্যায় কাজ আমি করিনি। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—আর আমি অন্যত্র ফুর্তি করে বেড়াচ্ছি—ঠিক অত বড় পাষণ্ড আমি নই।

আমি জবাব দিই না। একটু পরে আবার বলে—কিছু বললে না যে?

—কী বলব?

—কেন কৈফিয়তটা দিলাম না আমি?

আমি নিশ্চুপ। উনি আবার বলেন—কেন সে কথা তোমাকে বলতে পারছি না জান? যদি প্রথম দিনই বলতাম—দুঃখ ছিল না। কিন্তু এতদিন পর ওকথা বলা আর সম্ভব নয়—কথাটা, মানে আমার পক্ষে সঙ্কোচের—

আমি বলি—তাহলে থাক না।

ও উত্তেজিত হয়ে বলে—না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি জীবদ্দশায় তোমার কাছে সে কথা আর বলে যেতে পারব না। প্রথমদিন যখন বলিনি, তখন আর বলা যাবে না। কিন্তু মুক্তি দেবার দিন তো এগিয়ে আসছে মনু। বেশ বুঝতে পারছি আমার মেয়াদ আর বেশিদিন নয়। মুক্তি পাওয়ার পরে আমার ডায়রিটা পড়ে দেখ। আমি লিখে গিয়েছি সে অজ্ঞাতবাসের দিনপঞ্জি। দুঃখ এটুকুই যে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলাম তোমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়ে। আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনটা জড়িয়ে!

শেষদিকে ওর গলাটা ধরে আসে। চুপ করে পাশ ফিরে শোয়। মনে হয় ও বড় ক্লান্ত। দুঃখ হয়। রাগ পড়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বলি—সারাজীবন ভুল করেছ কিনা জানি না, অন্তত একটি কাজ তুমি ভুল করনি। আমাকে বিয়ে করে। বিশ্বাস কর তুমি। আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে তোমাকে পেয়ে—

—সত্যি বলছ তুমি? ওর কণ্ঠস্বর অন্ধকারের ভেতর কাঁপতে থাকে। যেন একটা অবলম্বন খুঁজছে।

—সত্যি! এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যার স্থান নেই। আজ আমার কোনো মোহ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই! আলেয়ার পেছনে ছুটেছি সারাজীবন। অসংখ্য স্তাবককে দেখেছি পথের দুপাশে—হয়ত সুবিমলও ছিল আমার রূপের ভক্ত। আর হয়তো কেন—এটা আমি জানিই। কিন্তু জীবনকে আজ আমি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পেয়েছি। তোমাকে সেবা করে, তোমাকে ভালোবেসে আমি নারীজীবনের এক নতুন অর্থ জেনেছি। আমার তৃষ্ণা মিটে গিয়েছে।

আমাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বলে—কিন্তু তবুও যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়ে গেল মনু?

—না, আর কোনো ফাঁক নেই—কোনো ফাঁকি নেই।

—তোমাকে মা হতে দিইনি।

আমি অস্ফুটে ওর কানে কানে বলি—দিয়েছ; তা তুমি নিজেও জান না।

একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে—একথা তুমি অনেকবার বলেছ। খোকনকে তুমি নিজের ছেলের মতো গ্রহণ করেছ; কিন্তু আমি তো বুঝি মনু, সেটা কত বড় মিথ্যা। আমি জীববিজ্ঞানী। তোমার নিজের সন্তান হতে দিইনি! কোনও স্ত্রীই ক্ষমা করতে পারে না স্বামীর এত বড় অত্যাচারকে!

আমি হেসে বলি—আমিও হয়তো করতুম না; কিন্তু আমার সে ইচ্ছা যে অপূর্ণ নেই। আমার দেহ-মন যে আজ ভরে উঠেছে তোমার দানে—

ও বাধা দিয়ে বলে—জানি, জানি। সেকথা তুমি অনেকবার জানিয়েছ। কিন্তু ওটা তোমার মনগড়া কথা। খোকনকে নিয়েই নাকি তুমি তৃপ্ত; এটা অহরহ বলে চলেছ তুমি। কিন্তু আমি জানি ওটা তোমার অন্তরের কথা নয়, হতে পারে না।

—তবে কী আমার অন্তরের কথা?

—আর পাঁচটা মেয়ে যা চায়। মা হতে। গর্ভধারিণী মা। অস্বীকার করলেও আমি তা মানব না। আমি যে দেখেছি তোমার চোখের কম্পনে তোমার মনের ছবি। তবু তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছ?

মনে মনে কৌতুক বোধ করি। ও এখনও জানে না। ওর সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আমি নারী জীবনের সেই চরম তীর্থপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। খবরটা জানাতে যেটুকু ভয় ছিল তাও ঘুচে গেল এ কথায়। আমাকে বঞ্চিত করে সেও দুঃখিত। শুধু ও-ই নয়—আমিও যে দেখেছি ওর চোখের তারায় বেদনার্ত মনের ছবি। হেসে বলি—তবু তোমাকে ক্ষমা করেছি। চিরকাল করব।

ও যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যেন কী একটা কথা বলতে যায়। উঠে বসে বলে—তবে শোন। তোমাকে তাহলে একটা খবর দেবার আছে। সে কথা শুনেও যদি মনে কর যে, আমাকে ক্ষমা করা যায়—

আর সহ্য হয় না। আমি বাধা দিয়ে বলি—অত ভণিতায় আর দরকার নেই। তার চেয়ে আমিই বরং একটা খবর বলি। তুমি চুপটি করে শোন। তারপর সময়মতো আমাকে জানিও এত নাটকীয়ভাবে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা।

ওর মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কথাটা বলি।

বলেই ওর বুকে মুখ লুকোই।

অনেকক্ষণ ওর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কেমন যেন খারাপ লাগে। হতে পারে এটা ও চায়নি। ওর সাবধানতা সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই না হয় ঘটতে চলেছে ঘটনাটা। তবু আমার জীবনে এই তো প্রথম অভিজ্ঞতা! একটা মৌখিক অভিনন্দনও কি আশা করতে পারি না আমি?

—কথা বলছ না যে?

তবু নীরব।

—তুমি কি দুঃখিত হয়েছ?

কথা বলে না। ওর নীরব অবজ্ঞায় মনের ভেতর মুচড়ে ওঠে। ভীষণ কান্না পায়। অভিমান। আশ্চর্য মানুষ। একেবারে পাষাণ। দাঁতে দাঁত চেপে শেষবারের মত প্রশ্ন করি—ঘুমুলে নাকি? এবারেও সাড়া নেই। আমি এপাশ ফিরে শুই। বৃথাই তর্ক করছিলুম এতক্ষণ। ভীষণ স্বার্থপর লোকটা। ফাঁকিই দিতে চেয়েছিল আমাকে! আমি ফাঁকে পড়িনি শুনে মর্মাহত হয়েছে। আর কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করে না। কখন ঘুমিয়ে পড়ি অঘোরে।

ভোর রাত। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ও টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে কী লিখছে! বাইরে তখন সবে আলো ফুটেছে। আমি উঠলুম। ও যে লক্ষ্য করছে সেটা বুঝতে পারি একবারও মুখ তুলে না তাকানোতে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। দেখি সুবিমলও উঠেছে। ঐ সাত-সকালেই পায়চারি করছে বাগানে।

কাছে গিয়ে বললুম, বেড়াতে যাবেন?

ও চমকে চোখ তুলে তাকায়। তারপরে বলে, চলুন।

গেট খুলে বেরিয়ে আসি বাইরে। গেটটা বন্ধ করার সময় লক্ষ করি ও টেবিলে বসে আছে। তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, একদৃষ্টে। আশ্চর্য মানুষ!

পনেরো

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে বসলেম চেয়ারে টেনে নিয়ে। হাতঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখি—আধঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে। বারান্দার ওপাশে একফালি একটা রাস্তা চলে গেছে ফটকটার দিকে। উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গণ। গেটের পাশেই একটা অশ্বত্থগাছ। তার মাথায় পড়ন্ত রৌদ্রের শেষ স্বর্ণাভা। ডালে ডালে পাখির কলকাকলি। অসংখ্য পাখি এসে আশ্রয় নিচ্ছে রাতের জন্য! আশ্চর্য, কলকাতা শহরে সারাদিন এত পাখি কোথায় থাকে? অশ্বত্থগাছের তলাটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। দুটি মেয়ে বসে আছে ওখানে। দু-একবার ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওরা বোধ-হয় ভাবছে—এ লোকটা এভাবে বসে আছে কেন? আর কতক্ষণ থাকবে?

আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে তা কি আমিই জানি? মেয়েদের হস্টেল। এখানেই কদিন আগে পৌঁছে দিয়েছি মনামী বৌদিকে! আর আজ তার নাম লিখে স্লিপ পাঠিয়েছি ভেতরে। ঝি এসে বলে গিয়েছে—বসুন, উনি তৈরি হয়ে আসছেন। সেই আশ্বাসবাণীটুকু সম্বল করে আধঘন্টা ধরে বসে আছি। কী করছে সে এতক্ষণ? আজও ফিরে যেতে হবে নাকি প্রতিদিনের মতো?

কলকাতায় এসে ওর পুরানো হস্টেলেই ওকে পৌঁছে দিয়েছিলেম। এছাড়া আর কোথায়ই বা তোলা যেত তাকে? কলকাতায় আমার আস্তানা একটা ছাত্রাবাস—সেখানে ওকে তোলা যায় না। প্রায় বছরখানেক পরে মনামী ফিরে এল ওর পুরানো বোর্ডিং-এ।

মনামী বৌদির বান্ধবীরা নিশ্চয় একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল! ওর বিয়ের কথাই জানত না এরা কেউ। হঠাৎ কেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সে, তাও হয়তো ওরা জানে না। একটি বছর পর সেই মেয়েটি যে এভাবে ফিরে আসতে পারে তা বোধহয় ওদের স্বপ্নেরও অগোচর।

ওকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—তুমি এখন কী করবে?

ও একমুহূর্ত বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল; তারপর বললে—তাই তো, আমি এখন কী করব?

বুঝতে পারি তখনও সে প্রকৃতিস্থ হতে পারেনি।

মনামী ভেতরে চলে গেলে কতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করেছিলেম খেয়াল নেই। হঠাৎ লক্ষ্য করি এক ভদ্রমহিলা হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলছেন—আমি এ হস্টেলের সুপার। মনামী আপনার কে হয়?

আমি প্রতিনমস্কার করে বলি—উনি আমার বৌদি!

—ও, বসুন।

দুজনেই বসি আমরা। উনি প্রশ্ন করেন—কী হয়েছিল আপনার দাদার?

বললেম—হাই ব্লাডপ্রেসার ছিলই। হঠাৎ স্ট্রোক হয়। ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমের একটা ছোট গাঁয়ে গিয়েছিলেন হাওয়া বদলাতে। লোকাল ডাক্তার কয়েকটা ইন্‌জেকশান দিলেন—কিন্তু কিছুই হল না।

ভদ্রমহিলা সমবেদনা জানান। মনুষ্যজীবনের নশ্বরতার বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী দান করেন। আমি বলি—যিনি গেছেন, তাঁর কথা আমি আর ভাবছি না। আমি ভাবছি বৌদির কথাই। কী করে যে এ শোক থেকে সামলে উঠবেন, তাই ভাবছি!

—কতদিন হল এ দশা হয়েছে?

—আজ প্রায় দিন পনেরো!

—এ অবস্থায় তাহলে ওকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

আমি বুঝিয়ে বলি, শ্বশুরবাড়িতে উঠবার মতো স্থান নেই। দাদার অন্যান্য ভাইয়েরা আছেন। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানেই রয়ে গিয়েছেন। এদিকে আমি থাকি হস্টেলে। সবশেষে আসল কথাটাও জানাই সুপারকে। বলি—তাছাড়া মনামী বৌদি ইজ ক্যারিইং!

উনি বললেন—হাউ প্যাথেটিক!

সেদিন আর কোনো কথা হয়নি ওঁর সঙ্গে। আচ্ছা, আমার কাছে সংবাদটা শুনে উনি অমন চমকে উঠেছিলেন কেন? প্যাথেটিক? কিন্তু কেন? কী কারণে এটা দুঃখবহ মনে হয়েছিল তাঁর? মনামীর বুক জুড়ে যে শিশুটি আসবে, তার গোপন পদধ্বনি একমাত্র সেই শুনতে পেয়েছে! সেই শিশুটিই কি ওর একমাত্র সান্ত্বনা নয়? আমার মা-দিদিমা এ খবর পেলে বলতেন—ঐ খুদকুঁড়োটুকু থেকে হতভাগিনীকে বঞ্চিত কোরো না ঠাকুর। সেকথা সুপার বললেন না; তিনি সংক্ষেপে শুধু বললেন—হাউ প্যাথেটিক! কারণ উনি মনামীর দুনিয়ার মানুষ। ওঁর মনে হয়েছে—বিধবা মনামীর কাছে এই অনাগত শিশুটিই নূতন সাথি আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই ঘটনাটা ওঁর কাছে শুধু দুঃখদায়ক।

দাদার শেষ সময়ে রাধাবৌদির বাবা এসেছিলেন। দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে আনতে হয়েছিল! আমার ইচ্ছা ছিল না! আমি এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেম না। শ্রদ্ধা না থাকার কারণও ছিল। রাধাবৌদির শেষ সময়েও তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেম; কিন্তু তিনি সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেননি। পরে শুনেছি, দেরি হওয়ার কারণ, যে সময়ে টেলিগ্রাম পৌঁছায় তখন তিনি সঙ্কল্প করে বুঝি কার বাড়ি পূজায় বসেছিলেন। পূজা শেষ না করে ট্রেন ধরেননি। ফলে মেয়ের সঙ্গে

দেখা হয়নি তাঁর। কন্যার মরণাপন্ন অসুখের খবর পেয়েও যে পুরোহিত দুটো চাল-কলা-নৈবেদ্যের লোভ সামলাতে পারে না তার ওপর শ্রদ্ধা না থাকাটাই স্বাভাবিক। সে যাই হোক, দাদার অনুরোধে তাঁরে আনানো হল। তিনি যেদিন এলেন তার আগের দিন থেকেই দাদা কথা বলছেন না। আমরা ভেবেছি তাঁর বাকরোধ হয়ে গিয়েছে বুঝি। তা যে হয়নি তা বোঝা গেল বৃদ্ধ এসে পৌঁছানোতে। বৃদ্ধ এসে ওঁর শিয়রে বসলেন। দাদা বললেন—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি অনুরাধাকে অনাদর করিনি কখনো। তার ভালোই করতে গিয়েছিলাম আমি সব সময়ে। কিন্তু সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর নিয়তি আমাকে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার ভুলের মাশুল আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যাব! কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করে যান—না হলে তার কাছে গিয়েও আমি শান্তি পাব না!

বৃদ্ধ বললেন—তোমার কোনো অপরাধ নেই, আমি জানি। সব ঁবাসুদেবের ইচ্ছায় হয়েছে। তাঁকে স্মরণ কর তুমি।

দাদা চুপ করে শুয়ে থাকেন চোখ বুজে।

ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন। মনামী বৌদি পাথর হয়ে গিয়েছে এ আঘাতে। আমরা ঘিরে রয়েছি মৃত্যুপথযাত্রীকে। বৃদ্ধ আবার বলেন—তাঁর নাম কর তুমি।

এইবার চোখ খুলে তাকালেন দাদা। অস্ফুটে বললেন—আপনি তো জানেন, ঈশ্বরকে আমি মানি না।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—আমি জানি, তুমি তাঁকেই মানো!

মৃত্যুপথযাত্রীর ভ্রূতে জেগে ওঠে একটা কুঞ্চন! বললেন—আপনি কি বলতে চান, এই শেষ সময়েও মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছি আমি?

দাদার হাত দুটি তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলে ওঠেন—না, বাবা না। তুমি মিথ্যা কথা বলছ না; কিন্তু অভিমান করে বলছ।

—অভিমান! কার ওপর অভিমান?

—যাকে খুঁজেছ তুমি সারাজীবন তোমার ল্যাবরেটারিতে।

—আমি ঈশ্বরকে খুঁজিনি—জীবনরহস্যকে খুঁজেছি।

বৃদ্ধ হেসে বলেন—একই কথা। তিনিই যে জীবনের জীবন, আলোর আলো! আমাদের মতো সাতজন্মে তাঁর কাছে যেতে চাও না বলেই না শত্রুভাবে ভজনা করেছ তাঁকে! জীবনের রহস্যকে খুঁজেছ তুমি সারাজীবন—পাওনি! কিন্তু আমি তো জানি, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের আদিমতম রহস্যকে খুঁজে পাবে তুমি!

দাদা চমকে উঠে বলেন—পাবো?

আশ্চর্য! শেষ সময়ে তিনি মনামীর দিকে চেয়ে দেখলেন না, খোকনের দিকে চেয়ে দেখলেন না—তারাভরা আকাশের দিকে একবারও চেয়ে দেখলেন না বিদায় নেবার আগে। তখনও অন্তিম আগ্রহে তিনি জানতে চাইছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অনুদ্ঘাটিত রহস্যের হদিস মিলবে কি না।

বৃদ্ধ বললেন—নিশ্চয়ই পাবে—তিনিই যে পরম প্রাপ্তি! তাঁকে ডাক।

প্রাপ্তি বলতে কে কী বুঝলেন কী জানি। চোখ বন্ধ হয়ে গেল বৈজ্ঞানিকের; বললেন—আমি যে ওভাবে ডাকতে শিখিনি।

বৃদ্ধ ওঁর কানে কানে বললেন—বিজ্ঞান তোমাকে যে ভাবে শিখিয়েছে সেইভাবেই ধ্যান কর তাঁকে; অসীম শক্তির উৎসরূপে চিন্তা কর তাঁকে, তাঁর 'বিশ্বরূপ' দেখ মনে মনে। যে অসীম শক্তি গড়েছে এই অনাদ্যন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে, অণু থেকে নীহারিকা চলছে যাঁর নির্দেশে—সেই শক্তিকে ধ্যান কর।

সন্ধি হয়ে গেল বিশ্বাস আর যুক্তির। সুর করে গীতায় একাদশ অধ্যায় আবৃত্তি শুরু করলেন বৃদ্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীর নিমীলিত নয়ন দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের দুটি ধারা। কখন মৃত্যু হল তাঁর, তা আমরা জানতে পারিনি!

মনে মনে প্রণাম করেছিলেম সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে। বুঝতে পারি অন্যায় করেছিলেম! কতখানি ধৈর্য থাকলে কন্যার এত বড় দুঃসংবাদ পেয়েও অবিচলিত চিত্তে আরব্ধ পূজা সম্পন্ন করা যায় তা উপলব্ধি করেছিলেম সেদিন!

*　　　*　　　*

কিন্তু মনামী কি আর আসবে না? ও কি ভুলে গেল আমার কথা? অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। ট্রাম-রাস্তার ধারেই এই বোর্ডিং। রাস্তার কলকোলাহল ভেসে আসছে। ঘড়ঘড় করে অফিসফেরতা ট্রাম চলেছে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে। অশ্বত্থগাছতলায় যে মেয়ে দুটি বসেছিল তারা উঠে গেল। যাবার সময় আমার দিকে আড়চোখে কী যেন দেখল। ওরা বোধ হয় জানে আমি মনামীর কাছে এসেছি। মনামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও কি জানে? কিন্তু সম্পর্কটা কতদূর জানে? অমন বিশেষ ভঙ্গিতে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল? হয়তো কতকগুলো অবান্তর কথা ওরা শুনেছে মনামীর কাছে। মনুর কথাবার্তা সুসংবদ্ধ নয়—কেমন যেন মাথাখারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে দাদা মারা যাবার পর। হয়তো আবোল-তাবোল কিছু বলে থাকবে ওদের!

ঝি এসে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে যায়। তাকে বলি—কী হল? তুমি ওঁকে খবর দিয়েছিলে তো?

ঝি বিরক্ত হয়ে বলে—খবর দেব না কেন? উনি চুপ করে বসে আছেন।

—আর একবার গিয়ে বল বরং।

ঝি একটু ইতস্তত করে বলে—ওকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাও বাবু। এখানে থাকলে ও বদ্ধপাগল হয়ে যাবে!

ঝি আবার খবর দিতে যায়!

আজ নিয়ে চারদিন। রোজই এসে বসে থাকি। ভেতরে স্লিপ পাঠাই। অপেক্ষা করার নির্দেশ আসে। বসে থাকি চুপচাপ। তারপর শেষ পর্যন্ত আর দেখা করে না। এক-একবার ভাবি আর আসব না। কিন্তু ওর এই আচরণে রাগ করতে পারি না—ও প্রকৃতিস্থা নয়। সুতরাং ওর এই আচরণে রাগ করে সরে যাওয়ার অর্থ মনকে একটা মনগড়া কৈফিয়ত দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো মাত্র।

বাইরের দিক থেকে বোর্ডিং সুপার এলেন। রাশভারী গম্ভীর চেহারা। কালো পাড় সাদা মিলের শাড়ি। কাঁধের কাছে ব্রোচ দিয়ে আটকানো। ডান কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, বাঁ হাতে বেঁটে ছাতা। আমাকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করেন—ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। কয়েকটা কথা ছিল।

আমি শশব্যস্তে বলি—বলুন।

—দেখুন, মনামীকে এখানে রাখা সম্ভব হবে না! আপনি ওকে নিয়ে যান।

আমি ইতস্তত করে বলি—কিন্তু আপনি তো জানেন সব কথা। ওঁকে কোথায় নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

একটু বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বলেন—সেটা আপনাদের ঘরোয়া সমস্যা। আমাদের বোর্ডিং-এ যেসব মেয়েরা থাকে তাদের অধিকাংশই ছাত্রী। আপনার বৌদি ফিরে আসার পর আমি লক্ষ করছি একটা বিশ্রী গুজব ছড়াচ্ছে। ও ঠিক প্রকৃতিস্থা নয়—না হলে নিজেই এ গুজবটা রটাত না। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কিনা জানি না।

আমাকে স্বীকার করতে হয়—আমি কিছুই জানি না।

—তাহলে ক্রমশ জানবেন!

ঝি ফিরে আসে। তার হাতে মনু একখণ্ড চিঠি পাঠিয়েছে, আর একখানা বাঁধানো খাতা। চিঠিটা খুলে পড়ি। সুপার প্রশ্ন করেন—কী লিখেছে?

—লিখেছেন আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। কাল আসতে বলেছেন।

—সেই ভালো। কাল একেবারে ব্যবস্থা করেই আসবেন। ওকে নিয়ে যাবেন।

আমি সংক্ষেপে বলি—যাব।

উঠে পড়ি। গেটের কাছে দেখি সেই মেয়ে দুটি তখনও বসে আছে বাগানে। আমাকে উঠে আসতে দেখে ওরা যেন কী বলাবলি করল। যেন আমার মধ্যে রহস্যঘন কোনো কিছুর সন্ধান পেয়েছে ওরা।

ট্রামে উঠে মনামীর চিঠিখানা আবার পড়লেম! কই, অসংলগ্ন তো কিছু নেই। ওকে আমি প্রথম যে চিঠিখানি লিখি তাতে কোনো সম্বোধন ছিল না—আজ বছরখানেক পরে ওর কাছ থেকে প্রথম যে

জবাব পেলেম তাতেও কোনো সম্বোধন নেই। ও লিখেছে—"তুমি রোজই আসছ। দেখা করতে পারছি না। অথচ তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। ভীষণ দরকার। কিন্তু কী করে বলব সে কথা? এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। একবারের জন্য আমাকে নির্জনে কোথাও নিয়ে যেতে পার? যেখানে প্রাণভরে কাঁদবার সুযোগ আছে? কেন তুমি আস ফিরে ফিরে? আজও আমাকে ঘৃণা করতে পার না? একদিন তো পেরেছিলে! কোথায় গেল তোমার সেই সুতীব্র ঘৃণা? আর এসো না। আগুনে হাত বাড়িও না। হাত পুড়ে যাবে। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। জীবনে আমার বিতৃষ্ণা। কেন? সে কথা বুঝবে এই খাতাখানা পড়লে। শেষ কখানা পাতা পড়বার পরেও কাল যদি এখানে আসবার রুচি থাকে তবে এসো—সঙ্গে নিয়ে এসো একপুরিয়া বিষ।"

বাড়ি এসে খাতাট খুলে বসি। দাদার ডায়েরি, দীর্ঘ জীবনের দিনপঞ্জিকা। পড়তে পড়তে রাত ভোর হয়ে আসে। কলেজ জীবন থেকে শুরু হয়েছে। ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে জীববিজ্ঞানকে বেছে নিলেন। বাল্যেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন। জীবনের উষাযুগ থেকেই ভাগ্যদেবী ওঁর প্রতিকূলতা করে চলেছেন। দিনলিপির প্রতি ছত্রে দাদা সেই নিষ্ঠুর নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করে গিয়েছেন। কখনও তার কাছে নতি স্বীকার করেননি। প্রাইভেট ট্যুইশনির লগি মেরে পার হয়েছেন ছাত্রজীবন। জীবনরহস্যের আদিতত্ত্বের সন্ধানের জন্য গবেষণা করার একটা বৃত্তিও পেয়েছিলেন—কিন্তু অর্থাভাবে সে কাজ ছেড়ে প্রফেসারি নিতে হয়েছে। তবু তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছেন অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে। বাসনা ছিল কলকাতায় বদলি হয়ে ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরির সুবিধা নিয়ে আবার গবেষণা শুরু করবেন। নিয়তি কিন্তু বরাবর পেছন থেকে টেনে রেখেছে তাঁকে। যেন একটা ভারী পাথরের বোঝা পিঠে নিয়ে বিজ্ঞানসমুদ্র সাঁতরে পার হওয়ার সঙ্কল্প ছিল তাঁর। রাধাবৌদির সঙ্গে তাঁর মতান্তরের ইতিহাস পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়। বারে বারে মনে মনে বলি—হে স্বর্গগত আত্মা, তুমি আমাকে মার্জনা কর। না বুঝে অনেক অবিচার করেছি তোমার প্রতি।

নরনারীর স্বাভাবিক জীবন সম্ভব ছিল না ওঁদের—বৌদির আঙ্গিক ত্রুটির জন্য। অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান চলত। তা হতে পারেনি বৌদির অন্ধ সংস্কারের বাধায়। ভাগ্যদেবীর এ আঘাতও দাদা বুক পেতে গ্রহণ করেছিলেন—পরাজয় স্বীকার করেননি। যেদিন মনামীকে নিয়ে কলকাতা যান তার আগের রাত্রে তাহলে কেউই ঘুমাননি। পরদিন কলকাতায় গিয়ে বিশেষজ্ঞের শরণ নিলেন। পুরুষকার দিয়ে তিনি দৈবকে জয় করতে চাইলেন। অস্ত্রোপচার করালেন নিজ দেহ। পিতৃত্বের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত করলেন নিজেকে।

...এই পর্যন্ত পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি! এ কী করে সম্ভব? তাহলে আবার তিনি বিবাহ করেন কোন অধিকারে? আর সবচেয়ে বড় কথা মনামী কেমন করে.....

আবার পাতা উল্টে যাই। একসঙ্গে অনেকগুলি।

"আবার কি ভুল করিলাম? মনামী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে কোনোদিন সন্তানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু প্রতিজ্ঞাই কি সব? নিজের মনটাকেই কি আমরা চিনি? উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ একটা কথা দেয়—তারপর সারাজীবন সেই প্রতিজ্ঞার জের টানিতে টানিতে তাহার জীবন দুর্বহ হইয়া পড়ে। কে বলিতে পারে মনুর মনও একদিন পরিবর্তিত হইবে না? কেমন করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলাম, সেও অনুর মতো সন্তানের জন্য একদিন পাগল হইবে না? মৌখিক প্রতিশ্রুতি? তাহার মূল্য কী? মনুর যদি হিস্টিরিয়া হয়, যদি ডাক্তারে বলেন সন্তান না হইলে সে সুস্থ হইবে না? তখন কী করিব? কেন সব কথা তাহার নিকট অকপটে স্বীকার করি নাই? লজ্জা? সঙ্কোচ? কিসের সঙ্কোচ বৈজ্ঞানিক?"

"অবনীমোহন। পাপ স্বীকার কর! তুমি মনামীর রূপে মুগ্ধ মোহাবিষ্ট হইয়াছিলে—যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলে সেও তোমাকে ভালোবাসে তখনই তুমি মনগড়া এক সঙ্কোচ খাড়া করিয়া কপটতার আশ্রয় লইয়াছ। নহিলে তোমার পুরুষত্বহীনতায় সঙ্কোচের তো কোনো স্থান নাই! মনামীর রূপের মোহে তুমি উন্মাদ হইয়াছিলে, তাই সাহস করিয়া সব কথা তাহাকে বলিতে পার নাই। অন্যায় করিয়াছ! এখন তাহার ফলভোগ কর।"

"....কিন্তু এসব কথা কেন চিন্তা করিতেছি? মনুর তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সে তো সন্তান চাহে নাই। খোকনকে লইয়াই সে তৃপ্ত। হয়তো সে কোনোদিন জানিতেও পারিবে না, পিতৃত্বের

অধিকার হইতে আমি চিরবঞ্চিত। তাহাকে ভুল বুঝাইবার জন্য অপ্রয়োজনেও সাবধানতার অভিনয় করিতেছি।”

নিস্তব্ধ রাত্রি। একফালি আকাশে একমুঠো তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জানলার ধারে। দূরে গির্জার ঘড়িতে রাত্রিশেষের সঙ্কেত। নিশাচর একটা ট্যাক্সি হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে গেল দ্রুতবেগে। প্রত্যেকটি পাতা পড়বার মতো ধৈর্য নেই। চলে আসি শেষ পৃষ্ঠায়।

“কাল রাত্রি সত্যিই কালরাত্রি। কালরাত্রে মনু একটি অদ্ভুত সংবাদ দিল। বুঝিলাম চূড়ান্তভাবে হারিয়া গিয়াছি। কিছুদিন হইতেই এ সন্দেহটা জাগিয়াছিল। মনামী আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হয় নাই। সুবিমল আসিবার পরে কারণটা বুঝিলাম। মনামী তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। তবে এ ভুল সে কেন করিল? আমি উত্থানশক্তিরহিত। ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকি। মনামী সুবিমলকে লইয়া এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখাইয়া আনে। চুনের কোয়ারি, সালফারের খনি, মুরলী পাহাড়। কখনও যায় বান্‌জারী পাহাড়ের উপর হরীতকী গাছের ছায়ায় বুড়োবুড়ির পীঠস্থানে, কখনও শোনের ধারে চখাচখীর পাড়ায়। আমি বৈকালিক পড়ন্ত রৌদ্রে রোহিতাশ্ব পর্বতের দিকে চাহিয়া নিশ্চুপ বসিয়া থাকি। মনে মনে বলি—হে অলক্ষ্যচারিণী, তোমাকে প্রণাম করি। কী অপূর্ব নাটকটি রচনা করিয়াছ! একদিন অনুরাধা রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিত, আর আমি মনামীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। অনুরাধার অন্তর্জ্বালা সেদিন আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম—তাই আজ আমাকে আনিয়া ফেলিয়াছ এই রোগশয্যায়। মনামী সেদিনের মতো আজও বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হয়। আমি রোহিতাশ্ব পর্বতের উপর ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির দিকে চাহিয়া প্রহর গনি। আজ মনে হইতেছে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি শ্রবণা নক্ষত্র নহে, বিজ্ঞান আমাকে ভুল শিখাইয়াছে। ঐটি হইতেছে অনুরাধার নির্নিমেষ নয়ন! মিটিমিটি করিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, বলিতেছে—কেমন জব্দ!

“মনু বলিয়াছে কলিকাতায় তাহার সহিত সুবিমলের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেন সে এ মিথ্যা কথা বলিল? সে তো জানে না, কলিকাতায় গিয়া সে সুবিমলের সান্নিধ্যে আসিয়াছিল এ কথা জানিতে পারিলেই আমি শান্তি পাই! যে অনাগত শিশুটি মনামীর দেহের সুগোপনে তিলতিল করিয়া বাড়িতেছে সে যে সুবিমলেরই দান এ কথা জানিতে পারিলেই আমি আজ নিশ্চিন্ত হই! নহিলে কী বিশ্বাস লইয়া যাইব? ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির কাছে গিয়া কী জবাবদিহি করিব? মনুকে, খোকনকে কাহার কাছে দিয়া যাইব?

“উপায় নাই। আমার মিথ্যাচার বুমেরাঙের ন্যায় আমার উপরেই ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ তাই একথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হারাইয়াছি।”

* * *

....রাত্রি শেষ হয়ে গেল। আর উৎসাহ নেই। ডায়রি বন্ধ করে রাখি। মনামী কেন এ ডায়েরি আমাকে পড়তে দিল? অবনীমোহন না জানলেও মনামী তো জানে কার অজাত সন্তানকে বহন করছে সে। কে সে? না, ও কথা আর ভাবব না।

মনামী আমার কাছে বিষের পুরিয়া চেয়েছে। বিষ সংগ্রহ করা সহজ; কিন্তু অমৃতের সন্তান আমরা—অমৃতের সন্ধান দিতে পারি না কি? পারব না তাকে বলতে—কে তোমার সন্তানের পিতা সেকথা জানতে চাই না। সমাজে তার পরিচয় হোক অবনীমোহনের সন্তান বলে। এসো তুমি আমার জীবনে।

কিন্তু যদি ভুল বুঝে থাকি? যে অজ্ঞাত ব্যক্তিটির সন্ধান আমরা কেউ পাইনি মনামী যদি তার প্রতীক্ষাতেই থাকে?

মনামী আজ অপ্রকৃতিস্থা। খোকনকে তাই নিয়ে গেছেন তার দাদামশাই। বোর্ডিং-এর সুপার বলেছেন—মনামীর নাম নিয়ে স্ক্যান্ডালাস গুজব ছড়াচ্ছে। কী করে ছড়ায়? হয়তো সে-ই কিছু বলছে। হয়তো বলছে—অবনীমোহনের সন্তানকে সে ধারণ করছে না। ও পাগল হয়ে যেতে বসেছে। ওর পক্ষে সবই সম্ভব। হয়তো ওরা আমাকেই সন্দেহ করছে! হয়তো সেই জন্যেই হস্টেলের মেয়ে দুটি

কাল আমার দিকে অমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। কী লজ্জা! কী করে আবার গিয়ে দাঁড়াব সেখানে? কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। মনামীকে একদিন আমি ভালোবেসেছিলেম। আজও বাসি। এই বিপদের মধ্যে অর্ধোন্মাদ মনুকে ফেলে পালাতে পারব না আমি। হস্টেলে ওরা ওকে রাখবে না। হতভাগিনীর আশ্রয় কোথায় এ দুনিয়ায়? যার জন্যে আজ ওর এ অবস্থা সে হয়তো সরে দাঁড়িয়েছে। ত্রিবেদী? না, ও কথা ভাবব না আমি!

বিকেলে আবার এসে দাঁড়ালেম হস্টেলের ভিজিটার্স-রুমে। ঝি আমাকে দেখে বিরক্ত হল। চলে গেল ভেতরে। বসে রইলেম একখানা চেয়ার দখল করে। ছোট্ট ঘর, মাঝখানে একটা গোল টেবিল। দেওয়ালে খানকয়েক ছবি।

কিন্তু ঝি তো আজ কোনো স্লিপ নিয়ে গেল না। খবর দিতেই গেল তো? হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। দরজার পর্দার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে দেখে। ভাবখানা যেন, আমি যে বসে আছি তা জানা ছিল না ওর! লক্ষ্য করে দেখলেম—কালকের সেই মেয়ে দুটিরই একজন।

আমি বলি—মনামী রায়কে কাইন্ডলি একটু খবর দেবেন?

মেয়েটি বলে—কী বলব? কে এসেছেন বলব?

—বলবেন ওঁর দেওর এসেছে।

—দেওর? মনু বুঝি আপনার বৌদি হয়?

দরজার ওপাশে অনেকগুলি কলকণ্ঠের চাপা হাসি। মেয়েটিও হেসে ফেলে। তারপর অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলে—আচ্ছা বসুন, খবর দিচ্ছি।

দ্রুতপদে মেয়েটি পালিয়ে বাঁচে। পর্দার ওপাশে দ্রুতচ্ছন্দ কতকগুলি স্লিপারের খসখসানি। সেই সঙ্গে চাপা হাসি। আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

একটু পরেই আসে মনামী। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। মনে হচ্ছে মাথা ঘসেছে বুঝি সাবান দিয়ে। রুক্ষ অবিন্যস্ত তৈলতৃষিত চুল উড়ছে হাওয়ায়। পরনে একখানি সাদা চুলপেড়ে ধুতি—বোধহয় দাদার! সর্বাঙ্গে একতিলও স্বর্ণালঙ্কার নেই। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি! হঠাৎ বলে—এই যে, তুমি এসেছ! সুবিমল, তুমি ওদের বুঝিয়ে বল যে, কোনো অন্যায় কোনো পাপ আমরা করিনি। ওরা বিশ্বাস করে না।

স্পষ্ট বুঝতে পারি দরজার ওপাশে রীতিমতো একটা জনতা। সর্বাঙ্গে কালঘাম ছুটতে থাকে। ওর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলি—কী আবোল-তাবোল বকছেন?

ও চমকে উঠে বলে—অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ! কিন্তু তোমার না আজকে বিষের পুরিয়া আনার কথা? এনেছ?

আবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলি—আবার পাগলামি করছেন?

—পাগলামি। খিলখিল করে হেসে ওঠে বিধবা মেয়েটি।

—পাগল নয় কে? আমি একা পাগল? রাধাদি পাগল ছিল—ফর শী এক্সপেকটেড চাইল্ড ফ্রম অ্যান ইম্পোটেন্ট। উনিও পাগল—ফর, হি থট দ্যাট আয়াম ক্যারিং য়োর চাইল্ড। তুমিও পাগল—ফর ইউ ডিড ল্যভ্ মি! না, না, অস্বীকার কোরো না। আজ যতই ঘৃণা কর না, একদিন তুমিও আমাকে ভালোবাসতে।

আমি ওর হাত ধরে আবার একটা প্রচণ্ড ধমক দিই—তুমি পাগলামি না থামালে আমি চলে যেতে বাধ্য হব!

—ও. কে.! আমি চুপ করলুম।

ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি একখানা চেয়ারে। চাপা কথাবার্তা ভেসে আসছে পর্দার ওপাশ থেকে। কী করি এখন? কোথায় নিয়ে যাব এই অর্ধোন্মাদকে? মনামী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। আস্তে আস্তে বলে—সুবিমল, ডু ইউ বিলিভ ইন ইম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শান?

ওর কথা শেষ হবার আগেই ঘরে আসেন একজন ভদ্রমহিলা। পরিচয় দেন ডেপুটি সুপার বলে। আমাকে জানান যে, সুপার ওঁকে বলে গিয়েছেন, আমি যেন মনামীকে নিয়ে যাই।

আমি বলি—নিতেই এসেছি, ওঁর জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিন।

—আপনাকে একটা বন্ডে সই করে দিতে হবে।

—দেব, নিয়ে আসুন কাগজ।

মনামী আমার দিকে ফিরে বলে—তুমি কি আমাকে নিয়ে এ অবস্থায় ইলোপ করতে চাও?

আমি ডেপুটি সুপারের দিকে ফিরে বলি—আপনি অনুগ্রহ করে একটু তাড়াতাড়ি করলে বাধিত হব। বুঝতেই পারছেন, উনি অপ্রকৃতিস্থা। পর্দার ওপাশে যাঁরা ভিড় করে আছেন ওঁদের এ প্রলাপ শুনতে হয়তো মজা লাগছে—কিন্তু এ বিড়ম্বনা থেকে আমি তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চাই।

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উনি উঠে যান।

ট্যাক্সি ডেকে পথে বেরিয়ে মনে হল—কোথায় যাই! কোনো একটা হোটেলে উঠতে হবে। বিবেকানন্দ স্ট্রিট দিয়ে ট্যাক্সিটা গিয়ে পড়ল সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে। আমার বুকপকেটের কাছে তৈলতৃষিত রুক্ষ চুলের বোঝা সমেত মাথাটা গুঁজে মনামী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জানি, এভাবে ওকে নিয়ে হোটেলে ওঠা ঠিক নয়। আমিও সমাজবদ্ধ জীব। বাবা এটাকে ক্ষমা করবেন না—কিন্তু কী করতে পারি আমি? মনামী একান্তভাবে আমাকে আশ্রয় করেছে। পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে আমার ওপর। ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কতই না সোজা! এখনি ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে গিয়ে বসতে পারি পার্কের ঐ বেঞ্চিতে। যদি তাকে বলি—এখানে বসে থাক, আমি আসছি—তাহলে ও বসেই থাকবে। আমি চরিত্রবান আদর্শ ভালোছেলের মতো ফিরে যেতে পারি। তারপর? তারপর আমার চরিত্রে কেউ আর কোনোদিন কলঙ্কের সন্ধান করবে না। যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল ওদের হস্টেলে তার হাত থেকে চিরমুক্তি পাওয়া যায়। মনামীর ভবিষ্যৎও সহজেই অনুমেয়। ও হয়তো ঘুমিয়েই পড়বে পার্কের বেঞ্চিতে। তারপর এমন একটি সুন্দরী বিকৃতমস্তিষ্কা যুবতীর একটা সুব্যবস্থা করে দেবেই কলকাতা শহর!

আমার বুকে মাথা রেখে ও বলে—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল লাল আলোর নির্দেশে। বললেম—আপাতত কোনো একটা হোটেলে উঠব আমরা।

—ডায়রিটা পড়েছ নিশ্চয়?

—পড়েছি।

—তারপরেও আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে উঠতে চাইছ? শেষে যে তোমাকেই দায়ী করবে সকলে!

মনামীর দৃষ্টিতে ক্লান্তির আবেশ বিহ্বলতা ছিল, কিন্তু পাগলামির ঘোলাটে কুয়াশাচ্ছন্নতা ছিল না। অবাক হয়ে বলি—তুমি কি পাগল হওনি সত্যি? মাঝে মাঝে এমন পরিষ্কার কথা বল কী করে?

ও খিলখিল করে হেসে বলে—তুমি বিশ্বাস করবে সুবিমল, আমি জানি না কার সন্তানকে বহন করছি প্রতিনিয়ত।

আবার পাগলামি শুরু হল দেখে ওকে থামিয়ে দিই, বলি—আচ্ছা, আচ্ছা, সেসব কথা পরে হবে।

—তুমি বিশ্বাস করছ না? কিন্তু এ আমার পাগলামি নয়। অন্য কোনো পুরুষ আসেনি আমার জীবনে।

ধমক দিয়ে উঠি—অ্যাবসার্ড!

আহত নাগিনীর মতো উঠে বসে মনামী বলে—এই রোখ্কে!

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। আমি চমকে উঠে বলি, কী হল?

—উই মাস্ট পার্ট কম্পানি। তুমি আমাকে অপমান করেছ।

দরজা খুলে নেমে পড়ে মনামী! আমাকেও নামতে হয়। ওর হাতটা ধরতেই দেখি থরথর করে কাঁপছে সে। কাঁদছে! ওকে আকর্ষণ করি; ও গাড়িতে কিছুতেই উঠবে না! কলকাতার জনবহুল রাস্তা। লোক জমে যায় অচিরে। একটি আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব সুন্দরী বিধবাকে একটি ছেলে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলছে। দৃশ্যটা নাটকীয়। এর কদর্থ হতে সময় লাগে না। হয়তো এখনই কিল-চড় বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে আমার ওপর। হঠাৎ একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলেন—কী হচ্ছে মশাই?

আমি কিছু বলার আগেই মনামী বলে—ইনি আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছেন—উড্ ইউ হেল্প মি?

—নিশ্চয়ই! আসুন আমার সঙ্গে।

ভিড় ঠেলে ভদ্রলোক একটি ডিস্পেনসারিতে নিয়ে গিয়ে বসান মনামীকে। আমার ওপর কয়েকটি মুষ্টিবদ্ধ হাত উদ্যত হয়েছিল। আমার পালাবার কোনো লক্ষণ না থাকায় তারা আত্মসংবরণ করে। ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলে আমিও দোকানে উঠে যাই!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডাক্তার। তাঁরই ডাক্তাখানা। চেয়ারে বসে লক্ষ করছিলেন এতক্ষণ। পরিস্থিতিটা বিপদজনক হবার সম্ভাবনা দেখে উদ্ধার করেছেন আমাদের। ওকে নিয়ে গিয়ে বসান একটা চেয়ারে, ফ্যানটা খুলে দেন। দরজার কাছে সরে এসে সমবেত জনতাকে চলে যেতে বলেন। ক্রমে ভিড়টা পাতলা হয়ে যায়। মনামী ফ্যানের হাওয়ায় ক্লান্ত চোখ বোজে। মাথাটা হেলে পড়ে। ভদ্রলোক তখন আমার দিকে ফিরে বলেন—এখন বলুন—কী ব্যাপার?

আমি বলি, উনি আমার বৌদি। দিনকুড়ি আগে আমার দাদা মারা গিয়েছেন। সেই থেকে মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেম।

—তাহলে উনি যেতে চাইছেন না কেন?

—উনি প্রকৃতিস্থা নন।

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন—দেখুন, হয়তো আপনি যা বলছেন, তা সবই সত্য; তবু এক্ষেত্রে ওঁর কথাটা না শুনে আমি আপনাদের যেতে দিতে পারি না। উনি একটু সুস্থ হলে ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।

বললেম—বেশ তো, অপেক্ষা করছি আমি।

উনি মনামীকে দেখে এসে বলেন—আশ্চর্য, উনি ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ট্যাক্সিটাকে বরং ছেড়ে দিন। শী নিডস্ রেস্ট।

বাধ্য হয়ে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেম। ডাক্তারবাবু অমায়িক ভদ্রলোক। ক্রমে আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। অনেক কথাই জানালেম ওঁকে। উনি শুনে বললেন—আমার মনে হয় ক্রমশ সামলে উঠবেন উনি! সবচেয়ে দরকার দেখা যাতে সন্তানটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে আনা যায়। এখন ঐটিই ওঁর একমাত্র অবলম্বন। ঐ তো বয়স! সমস্ত জীবনই পড়ে আছে সামনে। একটা বাচ্চা থাকলে তবু নেড়ে-চেড়ে সময় কেটে যাবে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আমার একটি মেয়ে আছে। বিয়ের বছরেই বিধবা হয়েছে। তারও যদি এমন একটা বাচ্চা থাকত!

আমি বললেম—আপনি ওঁকে পরীক্ষা করে দেখবেন? ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট কনফাইনমেন্ট তো, প্রথম থেকে সাবধান হওয়া ভালো।

—নিশ্চয়ই। ঘুম ভাঙুক, ওকে পরীক্ষা করে দেখব।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মনামীর ঘুম ভাঙে। ডাক্তারবাবু বলে—ইনি আপনার দেওর?

মনামী মুচকি হেসে বলে—কেউ কেউ তাই বলে বটে, কিন্তু ও নিজে কী বলে?

আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে।

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে ভাবেন। তারপর বলেন—তোমাকে আমি পরীক্ষা করব, এ ঘরে এস।

—কেন, কী হয়েছে আমার?

—তুমি মা হতে চলেছ।

—দ্যাট আই নো!

—সুতরাং তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে তোমার সন্তান সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করে।

—বাট হুজ বেবী ইজ ইট?—প্রশ্ন করে মনামী।

—কেন, তোমার।

মনামী আরও কিছু বলতে যায়; কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলি—তর্ক কর না, ওঁর কথা শোন। ডাক্তারবাবুর কথা শুনতে হয়।

—অল রাইট।

ওঁর সঙ্গে মনামী চলে যায় ভেতরে—রুগী দেখার ঘরে!

আমি চুপ করে বসে থাকি। কতক্ষণ সময় পার হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। আকাশপাতাল কত কী ভাবছি একা বসে। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন, পেছন পেছন মনামী।

সে প্রশ্ন করে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সে প্রশ্নের মধ্যে কোনো জড়তা নেই—কোনো পাগলামি নেই। সহজ সরল প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন—ঠিকই আছে মা, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

হাসিটা ম্লান দেখায়। মনামীর হাসিটাও।

আমি মনামীকে বলি—এবার একটা ট্যাক্সি ডাকি?

ও ক্লান্তভাবে বলে—ডাকো।

ট্যাক্সি এলে ওকে উঠিয়ে দিই। আবার মালপত্র তোলা হয়। মনামী জানলায় মাথা রেখে বসে থাকে চুপ করে। আমি ম্যানিব্যাগটা বার করতেই ডাক্তারবাবু আমার হাতটা চেপে ধরেন।

আমি বলি—সে কী? আপনি রীতিমতো পরীক্ষা করেছেন ওকে—

একটু অন্তরালে ডেকে নিয়ে বলেন—মেয়েটার দুঃখ বুকে বেজে আছে সুবিমলবাবু। ভেবেছিলাম আপনার বৌদির কেসটা হাতে নেব—

কেমন যেন করুণ দেখায় প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুকে।

বলি—বেশ তো, আপনিই ডেলিভারির ব্যবস্থা করবেন।

—তার প্রয়োজন হবে না।

আমি বলি—কেন?

উনি ম্লান হাসেন, বলেন—জানি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন আপনি! আপনার বৌদিকে কথাটা বলিনি। অত্যন্ত শক পাবেন ভয়ে। এ শোকটা আগে সামলাতে দিন—তারপর বলবেন—

আমি অবাক হয়ে বলি—কেন, কী হয়েছে?

—দি স্যাডেস্ট পার্ট অফ্ দ্য স্টোরি ইজ দ্যাট শী ইজ নট ক্যারিয়িং! ভুল ধারণা হয়েছিল ওঁর। ওঁর গর্ভে সন্তান নেই!

ট্যাক্সিতে ফিরে এসে দেখি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে মনু। হয়তো ভাবছে, তার বিড়ম্বিত জীবনের সমস্যার সমাধান তো হলই না, এমনকি ব্যাখ্যাও কিছু খুঁজে পাওয়া গেলনা। বিচক্ষণ ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সংবাদটা তৎক্ষণাৎ বলে ফেললেম ওকে। চমকে ওঠে ও। অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে একটা মুহূর্ত। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলে বেচারি। এ অশ্রু ওর মুক্তির আনন্দের!

ট্যাক্সি তখন ছুটে চলেছে সামনের দিকে। সামনে চৌরঙ্গীর মোড়। এখনি হয়ত পাঞ্জাবি চালক পেছন ফিরে জানতে চাইবে কোনদিকে মোড় ঘুরবে, ডাইনে, বাঁয়ে—না সামনে?

কী বলব ওকে?

দুর্লভ 'দুর্লভ'

উৎসর্গ

পঞ্চাশোর্ধ্ব-সঙ্গীতজ্ঞ

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র

'কৃষ্ণনগরীয়ানেষু'

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর 1976

যে দুর্লভ প্রতিভার কথা লিখতে বসেছি, তাঁর কথা জানতে পেরেছিলাম নিতান্ত ঘটনাচক্রে। ফুলদি হঠাৎ টেলিফোনে জানালেন, তাঁর গুরুদেব আমাকে একদিন দেখা করতে বলেছেন।

ফুলদির বিয়ে হয়েছে সাঁত্রাগাছির মৈত্রবাড়ি। ওঁর গুরুদেবকে অনেকবার দেখেছি। তিনি হচ্ছেন মৈত্রবাড়ির কুলুপুরোহিত এবং অনেকেরই মন্ত্রগুরু। বেশ জাঁকিয়ে কালীপূজা হত মৈত্রবাড়িতে। এখনও হয়। ছেলেবেলায় বহুবার কালীপূজা দেখতে গিয়েছি, বলিদানের সময় তিনতলার চিলেকোঠায় দু-কান বন্ধ করে একটা আর্তনাদকে ঠেকাতে চেষ্টা করেছি, বিসর্জন পাড়ি দিয়ে একেবারে ভাইফোঁটা সেরে ফিরেছি! পূজা করতেন ফুলদির গুরুদেব—শ্রীপবনচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাই তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে আধুলির মাপে লাল-সিঁদুরের ফোঁটা, দশাসই দেহাবয়ব এবং নাটমন্দির-কাঁপানো দরাজ হাসি। যজন-যাজন ছাড়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনও করতেন। উত্তর কলকাতার কোন একটি হাই স্কুলে নাকি সংস্কৃতের হেড-পণ্ডিত ছিলেন। ছেলেবেলায় রীতিমত ভয় করতাম তাঁকে—হয়তো তাঁর প্রকাণ্ড দেহের জন্য, নয়তো ঐ লাল-ফোঁটা, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি আমার মনে একটা ভীতির সঞ্চার করত। ক্রমশ বয়স বেড়েছে, বুঝতে শিখেছি—অতি অমায়িক মানুষ তিনি। ফুলদি যে-সময়ে টেলিফোন করে ঐ খবরটা আমাকে জানালেন সে সময়ে আমার মাথায় 'পাষণ্ড-পণ্ডিত' উপন্যাসটা বীজের আকারে অঙ্কুরিত হতে চাইছে। সংস্কৃতজ্ঞ প্রশান্ত পণ্ডিতকে ছেলেরা আড়ালে ডাকে 'পাষণ্ড পণ্ডিত'। ছেলেরা কেন, বড়রাও বুঝতে পারে না পাষণ্ড-পণ্ডিতের অন্তঃস্তলে ফল্গুধারার প্রবাহ। কাহিনীটা দানা বাঁধেনি, চরিত্রটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছি; তাই ফুলদির টেলিফোন পেয়ে আর কালবিলম্ব করলাম না। সংস্কৃত পণ্ডিত মানুষটির একান্ত সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগটা হারাতে আমি রাজি নই। কেন তিনি আমার খোঁজ করছেন জানি না, পরের রবিবার সকালে গিয়ে হাজিরা দিলাম তাঁর শিবনারায়ণ দাস লেনের ভদ্রাসনে।

*　　　*　　　*

বৃদ্ধ একটি বালাপোষ জড়িয়ে আধাশোয়া হয়ে বসেছিলেন তাঁর ঘরজোড়া সাবেকি পালঙ্কে। আমাকে দেখতে পেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন,—এই যে বাবাজী এসে গেছ! স্মরণমাত্রই উপস্থিত—এ্যাঁ? পিতৃদত্ত নামটা সার্থক! কী বল?

আমি বালাপোষের তলায় হাত চালিয়ে তখন ওঁর চরণ-যুগলের সন্ধান করছি।

—বস, বাবাজী, বস! ওরে—ওর জন্যে একটা চেয়ার নিয়ে আয়।

ওঁর ছেলে একটি চেয়ার নিয়ে আসে। হেসে বলে, ভাল আছেন তো? কী লিখছেন এখন?

ততক্ষণে পালঙ্কের নীচে রাখা একটি বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়েছি। বৃদ্ধ অনুযোগ করতে থাকেন, বুড়ো হয়ে পড়েছি বাবা, আজকাল আর ঘরের বার হই না বলতে গেলে। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। তোমরাও কাজের মানুষ। তবে যে তুমি আহ্বানমাত্র এসেছ, তাতেই—

আমি বাধা দিয়ে বলি, কী আশ্চর্য! আপনি ডাকলে সাড়া দেওয়াও তো একটা কাজ!

—তা তো বটেই, তা তো বটেই! স্বয়ং নারায়ণও ভক্তের ডাকে ছুটে আসেন, তুমি তো আসবেই—

বেশ কিছুক্ষণ খোশগল্প হল। সেকালের কথা সব। আমি চোখের সামনে দেখছি, দশাসই চেহারার ভট্টাচার্য-মশাইকে, আর মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি বাজে-পোড়া রোগা একহারা তালঢ্যাঙা পাষণ্ড-পণ্ডিতকে, যে পাষণ্ড-পণ্ডিত তখনও জন্মলাভ করেননি।

গল্পগুজবের ফাঁকে চা-মিষ্টান্ন এল। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে শেষমেশ বললাম, এবার বলুন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

বৃদ্ধ বললেন, তোমাকে একটা উপকার করতে হবে বাবা।

—বলুন। সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয় করব।

—আমার পিতৃব্য-মহাশয়ের এটা জন্ম-শতবর্ষ। তাঁর কয়েকজন শিষ্য ও ভক্ত মিলে এজন্য একটি স্মারক পুস্তিকা বার করবেন বলে স্থির করেছেন। তাতে তোমাকে একটা লেখা দিতে হবে।

একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলি, স্মারক-গ্রন্থে তো মামুলী গল্প-কবিতা মানাবে না—

উনি বাধা দিয়ে বলেন, না না, গল্প-কবিতা আমরা চাইছিও না। তাঁর সম্বন্ধেই দু-চার কথা লিখতে হবে আর কি।

অর্থাৎ ফরমায়েসী জীবনী! তিনি দয়ালু ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন, পিতা-মাতাকে যথারীতি ভক্তি করতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। বাঁধা ফর্মূলা। যাঁকে জানি না, চিনি না, নামটা পর্যন্ত শুনিনি তাঁর সম্বন্ধে ইনিয়ে-বিনিয়ে পাতা দু-তিন লিখে ফেলতে হবে। সাল-তারিখ, পিতার নাম, জন্মস্থান ইত্যাদি তথ্য নিশ্চয়ই উনি সরবরাহ করবেন—শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিশ্চয় তাঁরও জীবিকা ছিল যজন ও যাজন। শিষ্য ও ভক্তের উল্লেখ তো এইমাত্র শুনলাম, ফলে অনুমান করতে পারি তিনিও মন্ত্র-দীক্ষা দিতেন, গুরুগিরি করতেন। সত্য-মিথ্যার ভেজাল দিয়ে অমন একখানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আন্দাজী জীবনী লেখা এমন কিছু কঠিন নয়—যে কোন কিশোর রচনা-সংকলন থেকে কয়েকটি নামধাম বদল করে কপি করার কাজ! অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম এককথায়! বললাম, ঠিক আছে। লিখে দেব। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আপনার জানা আছে বলুন।

আমি খাতা-কলম বাগিয়ে বসি।

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রায়-ধূসর-হয়ে যাওয়া একটি আলোকচিত্রের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। অনুমান করতে পারি, সে আলোকচিত্রটি ওঁর পূজ্যপাদ পিতৃব্যের। তারপর উনি বললেন, আমার খুড়ামশায়ের নাম দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর আমলে তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য মার্দঙ্গিক।

মার্দঙ্গিক! হায় ঈশ্বর! যজন-যাজন নয়? গুরুগিরি নয়? কালীপূজা নয়?

একটু অবাক হয়ে সেই প্রশ্নই করলাম : মার্দঙ্গিক। মার্দঙ্গিক মানে?

এইচ. ই-স্কুলের প্রাক্তন হেড পণ্ডিতমশাই একটিপ নস্য নিয়ে বললেন: মৃদঙ্গ + ষ্ণিক্ ইতি মার্দঙ্গিক।

আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। বলি, না মানে মৃদঙ্গ....

—হ্যাঁ! মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহুব্রীহি! মৃদঙ্গ মানে—মুরজ, পাখোয়াজ, খোল আর কি!

আমি ফ্ল্যাট! ঢোক গিলে বলি, আজ্ঞে তা বুঝেছি। কিন্তু খোল-মৃদঙ্গ তো বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাওয়া যায়—আপনাদের ঘোর শাক্ত পরিবারে—

বৃদ্ধ বললেন, ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি। দুর্লভচন্দ্র তেমনই এক ব্যতিক্রম—রীতিমত দুর্লভ চরিত্র। তাঁর কাহিনীটা তোমাকে শোনাব বলেই ডেকে পাঠিয়েছি। উপরোধে তোমাকে ঢেঁকি গিলতে হবে না বাবাজী, তাঁর জীবনীটা বিস্তারিত শোন, তারপর যদি সত্যই উৎসাহিত বোধ কর—তাঁর কথা লিখবার জন্য অন্তর থেকে সত্যই কোন তাগিদ অনুভব করে তবেই লিখ। নচেৎ নয়!

এর পর দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কাছে বসে দুর্লভচন্দ্রের জীবনেতিহাস শুনেছি। অভিভূত হয়েছি সে কাহিনী শুনে। খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করেছি তাঁর কথা! নানান সূত্র থেকে।

দুই

আমি মার্গ-সঙ্গীত নিয়ে কোনো পড়াশুনা করিনি, ফলে শ্রুতিনির্ভর এ কাহিনীতে তথ্যগত ভুলত্রুটি থাকতে পারে, তবু সেই আশঙ্কায় পিছিয়ে আসাও ঠিক নয়। যাঁরা প্রকৃত অধিকারী তাঁরা হয়তো সে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে ভবিষ্যতে ওঁর এবং ওঁর কালের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করবেন। স্মারক-গ্রন্থে আমার লেখা চারপৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত জীবনীটাকে আজ আর বোধকরি খুঁজে পাওয়া যাবে না—হয়তো দুর্লভচন্দ্রের কোনও শিষ্য বা গুণগ্রাহীর সংগ্রহে সেই স্মারকগ্রন্থটির কোনো কপি খুঁজে

পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সেদিনের সেই নোট নেওয়া খাতাটা আমার কাছে আজও আছে। তা থেকেই সেই দুর্লভ চরিত্রটির একটা ঔপন্যাসিক রেখাচিত্র খাড়া করা যায়।

পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন অথবা মাতামহ কাশীনাথ তর্কবাচস্পতি—সদ্যোজাত শিশু-সন্তানের নামকরণটি কে করেছিলেন আজ আর তা জানবার উপায় নেই। অনেক অনেকদিন আগেকার কথা—একশ' বছরেরও বেশি। বাঙলা ১২৭৮ সন, ইংরাজী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার সঙ্গে ফাল্গুনী অমাবস্যা তিথিতে স্মার্তপণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাচস্পতির ভদ্রাসনে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর নাম রাখা হল দুর্লভচন্দ্র। শতবর্ষের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আজ মনে হচ্ছে এ নামকরণটি যিনি করেছিলেন তাঁর ছিল অদ্ভুত দূরদর্শিতা। মেকি আর ভেজালের দুনিয়ায় একনিষ্ঠ সাধক দুর্লভচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সত্যই দুর্লভ!

ওঁর আদি পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় সে-যুগের স্বনামধন্য নৈয়ায়িক হলধর ন্যায়রত্নের কথা। রাজসাহী অথবা যশোহর থেকে তিনি যখন হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে চলে আসেন তখন কোম্পানীর আমল। সাঁত্রাগাছি গ্রামের তদানীন্তন জমিদার চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে হলধর সে গ্রামে একটি সীতারামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হলধর ছিলেন চৌধুরীদের কুলপুরোহিত। সেই সীতারামের পূজা আজ দেড়শ বছর ধরে চলে আসছে, এবং ঐ সীতারামের জন্যই অঞ্চলটির নাম রামরাজাতলা। হলধর ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উপাধিতে—সান্যাল। পৌরোহিত্য করার জন্য ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করেন।

হলধরের তিন পুত্র—নন্দলাল, মতিলাল এবং যদুলাল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দলাল বিদ্যারত্ন কালে শ্বশুরমহাশয়ের শিবনারায়ণ দাস লেনের ভদ্রাসনে বাস করতে আসেন। শ্বশুর ছিলেন—আগেই বলেছি—কাশীনাথ তর্কবাচস্পতি। তিনি শীলস্ ফ্রী স্কুলে—বর্তমানে যার নাম মতিলাল শীলস্ ফ্রী স্কুল—হেড-পণ্ডিত ছিলেন। নন্দলাল বিদ্যারত্ন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই এবং জজ-পণ্ডিত ভরত শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা একাধিকবার করেছিলেন।

১৬ শিবনারায়ণ দাস লেনে দুর্লভচন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছে। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। শক্তির উপাসক ওঁরা। সাতপুরুষ ধরে যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন করে এসেছেন। নন্দলালের গৃহেই চতুষ্পাঠী ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র ও বেদান্তের চর্চা হত। বৃহৎ পরিবার। দুর্লভচন্দ্রের ছয় ভাই এক বোন—দুর্লভ ছিলেন অষ্টমগর্ভের সর্বকনিষ্ঠ। পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি—পিত্রালয়ই গুরুগৃহ—ফাঁকি দেওয়ার কোন ছিদ্রপথ নাই। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করতে হত, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিত্য-জ্ঞানোদয়ের আয়োজন করতে হত সূর্যোদয়ের পূর্বেই। উপক্রমণিকার উপলবন্ধুর পথে হাঁটি-হাঁটি পা-পা। দুর্লভচন্দ্রের অগ্রজ পাঁচ ভাই এভাবেই একে একে সংস্কৃত পরীক্ষার সোপান অতিক্রম করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। মধ্যম ভ্রাতা কৈলাশচন্দ্র তো ইতিমধ্যেই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে পিতার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। নন্দলাল বলতেন, কৈলাশই আমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করবে। তা সত্য—পরবর্তীকালে কৈলাশচন্দ্র 'বিদ্যাভূষণ' হয়েছিলেন—উন্নীত হয়েছিলেন ডফ্ কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক পদে।

সুতরাং কনিষ্ঠপুত্র দুর্লভচন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। উপক্রমণিকার পরিখা-বেষ্টিত সংস্কৃত-দুর্গে দুর্লভচন্দ্রকে দুর্গাধিপ করতে চাইলেন নন্দলাল; কিন্তু ফল হল না বিশেষ। দেখা গেল, পাষাণপ্রাচীরের ইন্দ্রকোষে চোখ লাগিয়ে দুর্লভচন্দ্র বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্নমশাই সখেদে লক্ষ্য করলেন নীরস ব্যাকরণ-সূত্র কণ্ঠস্থ করার দিকে পুত্রের আগ্রহ কম—যদিও ধীশক্তিতে সে অন্য কোনো ছাত্রের চেয়ে কম যায় না। পুত্র যদি স্বভাবত মূর্খ হত তাহলে হয়তো সান্ত্বনা পেতেন নন্দলাল; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি পুরোমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও বিদ্যার্জনে তার অনীহা দেখে তিনি আরও ক্ষুব্ধ হতেন। অনেক চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, নাঃ! দুলিটার কিছু হবে না।

দুর্লভজননী ছিলেন অদূরে। বললেন, সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। ওর লেখাপড়া হবে কি না জানি না, কিন্তু আপনি দেখে নেবেন—দুলি আমার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে একদিন।

স্মার্ত পণ্ডিত এ কথায় কোনও সান্ত্বনা পাননি। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সন্তান, ব্যাকরণের প্রথম

ধাপটাতেই যদি সে হোঁচট খায় তখন তার সম্বন্ধে আর কিছু আশা করার যুক্তি খুঁজে পাননি তিনি। বলেছিলেন, ঐ সান্ত্বনা নিয়েই থাক তুমি। আমার আর কোনো ভরসা নেই।

নন্দলাল দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু মায়ের ভবিষ্যৎবাণী একদিন বর্ণে বর্ণে সার্থক করেছিলেন সেদিনের সেই ছোট্ট দুলি। সারা দেশকে একদিন শিবা-পশুপতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল—'বঙ্গালমুলুক মেঁ ভি হৈঁ এক উস্তাদ!'

* * *

দুর্লভচন্দ্রকে প্রথম যিনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর নাম মুরারীমোহন। তিনি ধরতে গেলে নন্দলালের প্রতিবেশী। পাশের গলি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে থাকতেন। সে আমলের বিখ্যাত মার্দঙ্গিক মুরারীমোহন গুপ্ত। উপাধিতে 'গুপ্ত' হলেও প্রতিভায় তিনি ছিলেন স্বয়ং-প্রকাশ। একদিন এসে উপস্থিত হলেন স্মার্ত পণ্ডিতের কাছে, নন্দলালের ভদ্রাসনে। বললেন, দাদা, দুলিটাকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। ওর কান আছে, হাত আছে—ওর হবে!

ছোট্ট দুলির যে একজোড়া কান এবং একজোড়া হাত আছে এটা কোনো নতুন সংবাদ নয়, জন্মাবধি দেখে আসছেন। তাই মুরারীমোহনের কথার তাৎপর্যটা ঠিক ধরতে পারলেন না নন্দলাল। বলেন, ঠিক বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ তুমি?

—দুলি রোজ গিয়ে বসে আমার সঙ্গীত শিক্ষার আসরে। অনেকেই তো আসে, শিখতে আসে—কিন্তু ওর মতো একজনকেও আমার নজরে পড়েনি। শুধু কান আর হাত নয়, ওর নিষ্ঠা আছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি নিশ্চিত বলছি—ওর হবে।

'ওর হবে' এ কথার অর্থ গ্রহণ হয় না নৈয়ায়িকের! তিনি শুধু বলেন, এ তুমি কী বলছ মুরারী? আমার বংশের ছেলে—হলধর ন্যায়রত্নের বংশধর মৃদঙ্গ বাজাবে?

মুরারী হাত দুটি জোড় করে বলেছিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বাজাবে—যদি আপনি অনুমতি করেন।

রুখে ওঠেন স্মার্ত পণ্ডিত, কিন্তু কেন অনুমতি দেব আমি? মাদল বাজিয়ে কোন চতুর্বর্গ লাভ করবে সে? তুমি একটি উন্মাদ!

শান্ত সমাহিত কণ্ঠে মুরারীমোহন যুক্তকরেই বলেছিলেন, এও মহামায়ার এক মায়া বিদ্যারত্নদা! যাকে আপনি বলেন—'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।' উন্মাদ? আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি উন্মাদ! আমরা উন্মাদ! কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি—পরমহংসদেব কি উন্মাদ নন? বামাক্ষ্যাপা উন্মাদ নন? তেমনি হরিদাস স্বামীও উন্মাদ, বৈজু বাওরা—বাওরা! আপনি তন্ত্র-সাধনার মাধ্যমে যাঁকে ধরতে চান, দুলি তাঁকেই মৃদঙ্গের বোলে ধরতে চায়। যত মত, তত পথ! আমার যুক্তকর নিবেদন বিদ্যারত্নদাদা, আপনি ওর সাধনায় বাধা দেবেন না।

গৃহবিগ্রহের দিকে একদৃষ্টে কয়েকটি খণ্ড-মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন সাগ্নিক পণ্ডিত। শেষে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। সম্বিত ফিরে পেলেন যেন। বললেন, তথাস্তু। দুলিকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

তিন

আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মত মার্গ-সঙ্গীতও গুরুমুখী বিদ্যা। তাই দুর্লভচন্দ্রের কথা বলতে হলে তিনি যে ধারার ধারক সেই ধারাটিকে প্রথমে চিনে নিতে হবে। দুর্লভচন্দ্রের প্রসঙ্গে নেমে পড়ার আগেই তাই তাঁর গুরু মুরারীমোহন এবং সেই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের মৃদঙ্গ শিক্ষার আদিগুরুদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে :

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দরবারে সঙ্গীতচর্চা যখন রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল তখন অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হচ্ছে। দিল্লীর গৌরবরবি অস্তমিত হওয়ার আশঙ্কায় দিল্লী দরবারের স্বনামধন্য গায়কগুণীরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লেন—বিভিন্ন সামন্তরাজদের দরবারে আশ্রয় খুঁজতে থাকেন তাঁরা। তানসেন বংশীয়েরা এলেন পূর্বদিকে—কাশী, বেতিয়া,—রেওয়ার রাজা কিংবা অযোধ্যার নবাবের দরবারে আশ্রয় পেলেন কেউ কেউ। আবার কয়েকজন সঙ্গীতসাধক চলে এলেন আরও পূর্বদিকে—বঙ্গদেশে।

এই পূর্বাভিমুখী সঙ্গীতাচার্যদের বলা হয় 'পূরবীয়া'; যেমন তানসেন শিষ্যবংশীয়, যাঁরা রওনা দিয়েছিলেন রাজপুতানার দিকে, পশ্চিমে, তাঁদের বলি 'পছাওয়ালা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও দেখছি দিল্লীর বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ আসছেন পূর্বাঞ্চলের ধনকুবেরদের আশ্রয়ে, কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, বর্ধমানে। এই সময়েই বিষ্ণুপুরে এসে হাজির হলেন তানসেন-ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া উস্তাদ বাহাদুর খাঁ। তাঁর সঙ্গী ছিলেন পাখোয়াজী পীরবক্স। বাহাদুর খাঁকে ঘিরে বিষ্ণুপুরে শুরু হল সঙ্গীতচর্চা। সেই বিষ্ণুপুর ঘরানার আদিগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই, বৃন্দাবন প্রভৃতিও এই ঘরানায় প্রথম যুগের সঙ্গীতাচার্য।

একদিন ধ্রুপদ গানকেই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত বলে মনে করা হত। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম, প্রকৃতির বন্দনা এবং রাজার মহিমাকীর্তন। ধ্রুপদের বাঁধুনি আর রাগবিস্তারের পদ্ধতি খুব সুসংবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট। শান্ত গম্ভীর রসের ধ্রুপদ সঙ্গীতে চপলতার স্থান নেই—সে যেন গজেন্দ্রগমন—মীড়, গমক, আশ্‌য়ের ব্যবহার থাকতে পারে, তানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই মার্গ-সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল নানা কারণে।

আত্মসংযম ও নিষ্ঠার অভাবে সঙ্গীতকে সহজতর করবার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ খেয়াল-জাতীয় গানের দিকে ঝুঁকলেন, কেউ খেয়ালের বৈশিষ্ট্যটুকুও বজায় রাখতে অসম্মত হয়ে নামলেন ঠুংরীর চর্চায়। 'নামলেন' শব্দটা আমি অবশ্য কোনো কদর্থে ব্যবহার করতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি—যাঁর কণ্ঠে অজস্র তান আছে, স্বরকম্পনে যিনি পারদর্শী, তিনি ধ্রুপদ-ধামারের ছন্দবদ্ধ ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে খুশি থাকবেন কেন? বিশেষ, শ্রোতা যদি চটুলতর সঙ্গীতই শুনতে চায়। জেট-যুগে গজেন্দ্রগমনের তারিফ না হলে কাকে দূষব? তা সে যাই হোক, তবু বিষ্ণুপুরের একদল সঙ্গীতসাধক যে দীর্ঘদিন ধরে নির্ভেজাল ধ্রুপদী সঙ্গীতকে সংকীর্ণ ভূখণ্ডে জীবিত রাখতে পেরেছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

না। শুধু বিষ্ণুপুর নয়। বিষ্ণুপুর ঘরানার সমান্তরালে উত্তর কলকাতায় প্রায় সমসময়েই তিল তিল করে গড়ে উঠছিল আর একটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদী-ঘরানা, মূলত বাগবাজার এবং ঠন্‌ঠনিয়া অঞ্চলের কয়েকজন লক্ষপতির পৃষ্ঠপোষকতায়। মার্গ-সঙ্গীতের পূর্ণ ইতিহাস আমরা এখানে আলোচনা করতে বসিনি—তাই একটিমাত্র উদাহরণই দেব—যে উদাহরণ আমাদের পৌঁছে দেবে আমাদের আলোচ্য চরিত্র দুর্লভচন্দ্রে। ঠন্‌ঠনিয়ার জমিদার দুই ভাই ছিলেন নিমাই চক্রবর্তী এবং শ্রীরাম চক্রবর্তী। শুধু সরস্বতী নন, লক্ষ্মীদেবীরও অকৃপণ আশীর্বাদ ছিল দুই ভাইয়ের উপর। দুজনেই সঙ্গীতপাগল। পশ্চিমাগত বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক লালা কেবল-কিষাণকে গুরুত্বে বরণ করে এই দুই ভাই ঠন্‌ঠনিয়াতে খুলে বসলেন এক মার্গ-সঙ্গীত চর্চার আসর। সারা কলকাতার যাবতীয় বিখ্যাত ধ্রুপদীয়ার সমাগম ঘটত চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয়ের আবাসে। নূতন শিক্ষানবিশদের ওঁরা দুই ভাই বিনা পারিশ্রমিকে মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষা দিতেন। এখানেই তাঁরা ক্রমে লক্ষ্য করলেন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের পিছনে ফেলে একজন নিরলস সাধক দ্রুত ব্যুৎপত্তি লাভ করে চলেছেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের একজন তরুণ শিক্ষক। নাম মুরারীমোহন গুপ্ত।

আশ্চর্য চরিত্র। পড়াশুনা করতে গিয়েছিলেন শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সেখানে ওভারসিয়ারি পরীক্ষার শেষ সোপান অতিক্রম করে রীতিমতো ডিপ্লোমা পেয়েছিলেন। শ্রীরামপুর জরীপ কলেজে চাকরি করতে করতে সাব-এঞ্জিনিয়ার পদেও উন্নীত হলেন। কিন্তু কাঁটা-কম্পাস মাপ-জোখ ওঁর ভাল লাগে না। রেঞ্জিং-রড-এর চেয়ে বাঁশের বাঁশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ওঁর ভাল লাগে, থিওডোলাইটের চেয়ে মৃদঙ্গটা আপন করে নিতে ইচ্ছে হয়। সে আমলে এঞ্জিনীয়ারিং চাকুরি ছিল—যাকে বলে হাতের লক্ষ্মী! কিন্তু ঐ! লক্ষ্মী ধরা দিতে এলেন কিন্তু ধরা দিলেন না মুরারীমোহন। উনি তখন আকুল হয়ে বনে বনে ফিরছেন—"কোথায় সে ঊষাময়ী প্রতিমা!"

শেষ পর্যন্ত এঞ্জিনীয়ারিং চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সঙ্গীত-সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। মার্গ-সঙ্গীতের অতলে ডুব দিলেন অরূপরতনের অন্বেষণে। শিক্ষা সমাপন করে এসে বসলেন নিজের ভদ্রাসনে—সেই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পৈত্রিক আবাসে।

রাস্তাটার নাম সার্থক করবার উদ্দেশ্যে নিশ্চয় নয়—কিন্তু প্রকারান্তরে যেন সেই উদ্দেশ্যই দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে শুরু করল : গুরুর প্রসাদী পেতে! দিবারাত্র সেখানে আলাপ চলত।

পূরবী থেকে রামকেলী, ভৈরবী থেকে ইমন। এখানেই এসে বসতেন দুর্লভচন্দ্র কিশোর বয়স থেকে। পিতৃগৃহের গুরুগৃহ নয়। এইটিই তাঁর সত্যিকারের গুরুগৃহ।

পরিণত বয়সে মুরারীমোহন যখন সাধনোচিত ধামে যাত্রা করলেন তখন বিংশ শতাব্দীর বয়স মাত্র চার বৎসর। গুপ্তমশায়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁরা উত্তরকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপালচন্দ্র মল্লিক, সত্যচরণ গুপ্ত, তারকনাথ বসু, নিবারণচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নাম মনে আসছে। গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং লালচাঁদ বড়াল দীর্ঘদিন ঐ আসরে এসে সঙ্গীতচর্চা করেছেন। আর মনে পড়ছে শিবনারায়ণ দাস লেনের দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম। ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিলীয়মান ধারাটিকে যাঁরা ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে এক শতাব্দীর প্রান্ত থেকে অন্য শতাব্দীর সীমান্তে পৌঁছে দিলেন এঁরা সেই সাধকমণ্ডলী। অনবধানতায় হয়তো আরও কোন দিকপালের নাম উল্লেখ করতে ভুলেছি—তবু এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য।

* * *

দুর্লভ ছিলেন মুরারীমোহনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। ছাত্রকে তিনি সঙ্গীতের কারিগরী বিদ্যাটুকুই শেখাতেন না, বলতেন—সঙ্গীত হচ্ছে একটা মাধ্যম। অধরাকে ধরবার একটা অবলম্বন। চরম লক্ষ্য হচ্ছে রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমে তাঁকে পেতে হবে, তাঁতেই লীন হতে হবে। তাই সঙ্গীতসাধককেও হতে হবে সন্ন্যাসীর মত নিরাসক্ত, পবিত্র। শিষ্য হয়তো বলতেন, কিন্তু আপনিই তো বলেছেন—ধ্রুপদ সঙ্গীতের লক্ষ্য হল তিনটি—ধর্ম, প্রকৃতির বন্দনা এবং রাজার মহিমা কীর্তন।

গুরু বলতেন, না। মার্গ-সঙ্গীতের একটিমাত্র লক্ষ্য—ঐ সুরলক্ষ্মী! আর সব বাহ্য—উপাস্য একমাত্র তিনিই। প্রকৃতির মধ্যে অপরূপাকে রূপ পরিগ্রহ করতে দেখি, তাই প্রকৃতির গান গাই। 'একবর্ণা' যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চে 'বহুধা' হয়েছেন— তাই 'ভেঁরো'য় শুনি প্রকৃতির প্রথম জাগরণ-কাকলি, 'ভৈরবী'তে শুনি অসীমের চিরবিরহ বেদনা, 'মূলতানে' পাই রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের শান্ত নিঃশ্বাস, 'পূরবী'তে শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। এই যে বিভিন্ন অনুভূতি এর মূলে কিন্তু সেই—'একবর্ণা'!

কিশোর ছাত্র কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, বলতেন—কিন্তু রাজা! তাঁর মহিমা কীর্তন কেন?

—তিনি আমার নিয়োগকর্তা। সুরলক্ষ্মীকে লাভ করবার যে অভিসার তিনি তার পাথেয় যোগাচ্ছেন বলে। যজমান যেমন যাজককে নিয়োগ করে তিনি তেমনি আমাকে নিয়োগ করেছেন বলে। তাঁর গুণগান করে তাঁর মনোরঞ্জন করি শুধু এই আশায় যে, তিনি সুরের তরণী বেয়ে গায়কের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অধরাকে ধরতে বার হবেন। যেমন 'কানাড়া' চলে ঘনান্ধকারে বিস্মৃতপথ অভিসারিকার মত! সঙ্গীত-সাধনা তো অন্তেবাসীর একান্ত সাধনা নয়—এখানে যে যোগের পথে, মিলনের পথে, হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হয়—যেমন চলে বীণ্‌কারের সঙ্গে মার্দঙ্গিক! যে যজমান শুধু স্তাবকশিল্পীর সন্ধান করেন—যত বড় রাজা-মহারাজাই হোন, তাঁকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে যাবে দুলি!

মৃত্যুর বছর দশ-পনেরো আগের কথা। অর্থাৎ অঙ্কের হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। একদিন মধ্যরাত্রে মুরারীমোহন এসে কড়া নাড়লেন শিষ্যের বাড়িতে। মধ্যরাত্রি নয়, প্রায় শেষরাত্রি। বিদ্যারত্নমশাই সদর দরজা খুলে দিয়ে দেখেন, শেষরাত্রে গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছেন মুরারীমোহন। উদাসীন আনমনা।

—কী ব্যাপার মুরারী? এত রাত্রে?

—দুলিকে একটু ডেকে দিন না দাদা।

ডাকবার প্রয়োজন হল না। শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তরুণ দুর্লভচন্দ্রের। বছর আঠারো-বিশ তখন তাঁর। উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন বাপের পিছনে। খালিগায়ে কোঁচার খুঁট জড়ানো। সেখান থেকেই বলে ওঠেন, কী হয়েছে? ডাকছেন কেন?

—তুমি একবার আমার বাড়িতে এস তো দুলি।

কেন, কী বৃত্তান্ত প্রশ্ন করলেন না শিষ্য। যেমন ছিলেন নেমে এলেন পথে। নন্দলাল বলেন, কোনো বিপদ-টিপদ হয়নি তো?

—আজ্ঞে না। আপনি আবার শুয়ে পড়ুন।

গুরুর পেছন পেছন দুর্লভ এসে উপস্থিত হলেন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে। মুরারীমোহন

তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। লণ্ঠনটা উসকে দিলেন। কাঁধের শালটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলেন মাদুরে। বললেন, মৃদঙ্গটা হাতে নেওতো একবার। বাজাও।

দুর্লভের কাছে শেষরাত্রের এই প্রস্তাবটি অসংযত মনে হল না একতিল। আদেশমাত্র পাখোয়াজটি কোলে তুলে নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন। কিন্তু মুরারীমোহন গান শুরু করতেই চমকে উঠলেন তিনি। হিন্দী নয়, ব্রজবুলি নয়, সংস্কৃত নয়—অতি পরিচিত বাঙলা ভাষা! অথচ গানটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদ! বাহার রাগ। তেওরা তাল। মুরারীমোহন একটুকরো কাগজ দেখে গাইতে থাকেন :

আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,
চাহি তোমারি পানে আনন্দে হে।।
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোকভূলোকে
গগন-উৎসবপ্রাঙ্গণে
চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা,
আঁখি পাইছে অন্ধ হে।।........

গানটি শেষ করে মুরারীমোহন বললেন, কী দুলি? এ গান আগে কখনও শুনেছ?

—আজ্ঞে শুনেছি। বহুবার শুনেছি, কিন্তু এ ভাষায় নয়! মার্গ-সঙ্গীত যে এমন সাদা বাঙলায় গাওয়া সম্ভব না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।

মুরারীমোহন বললেন, আমার ধারণাটা ঠিক উল্টোরকম ছিল। আমার কেবলই মনে হয়, হিন্দী কেন? কেন নয় আমার মাতৃভাষা? তোমাকে কি বলব দুলি—কতবার কত হিন্দী গানকে বাঙলায় অনুবাদ করে গাইবার চেষ্টা করেছি—জুৎ পাইনি। কেমন যেন সব মিইয়ে যায়! ভাষায় কেমন যেন হোঁচট খেতে হয়। শেষমেশ আমি ধরে নিয়েছিলাম—ওটা হবার নয়। হরিদাস স্বামী, তানসেন, যদু ভট্ট, বৈজু বাওরা যে ভাষায় গেয়ে গেছেন সে-ভাষা ছাড়া ধ্রুপদ-ধামার গাওয়া যায় না। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ যেমন দেবভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করে পড়লে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু আজ, জানলে দুলি, আজ এই বাঙলা গানখানি শুনে আমার ধারণাটা পাল্‌টে গেল। শুধু সে ধারণাটুকুই নয়,—আজ আরও একটা অন্ধ-বিশ্বাস আমার ভেঙে গিয়েছে!

—সেটা কী?—জানতে চাইলেন দুর্লভচন্দ্র।

—আমার এতদিন ধারণা ছিল—কথা হচ্ছে সঙ্গীতের শুধুমাত্র সোপান। একটা অবলম্বন। মিছরির ভেতরকার ঐ সূত্রটির মত। সূত্রটা খাদ্য নয়, কিন্তু ওটা না থাকলে মিছরিটা দানা বেঁধে ওঠে না। তেমনি দু-চারটি শব্দ ছাড়া সঙ্গীতসাধনা অসম্ভব। সে শব্দ অর্থবহ হোক বা না হোক। কিন্তু এই গানখানি শুনে আমার সেই ধারণাটাও পালটে গেল। মনে হল 'কথা' সঙ্গীতের অবলম্বন নয়, তার 'দোসর'—যেমন বীণার দোসর হচ্ছে মৃদঙ্গ। বাগর্থ সংপৃক্ত হলে সে সুরের সহায়কই হবে, অন্তরায় নয়। এই একটিমাত্র বাঙলা গান আজ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল।

—কোথায় শুনলেন এ গান?

—জোড়াসাঁকোয়। ঠাকুরবাড়িতে। কিন্তু গানটাকে চিনতে পেরেছ?

—কেন পারব না? এ তো অতি পরিচিত 'আজু বহত সুগন্ধ পবন।' কিন্তু কে বাঙলা গানটা রচনা করেছেন?

—নাম বললে চিনবে? রবিবাবু। মানে রবি ঠাকুর। নাম শুনেছ?

—না। কে তিনি?

—প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি। তোমার চেয়ে বছর-দশেকের বড়ই হবেন। কী সুললিত কণ্ঠ ! কিন্তু আমি বেশি মুগ্ধ হয়েছি তাঁর এই আবিষ্কারে। আমার মনে হচ্ছে এবার যুগান্তর আসছে দুলি। এবার থেকে সাদা বাঙলায় আমরা বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত গাইতে পারব। শুধু ঐটুকুই নয়, রবিবাবু গানটি পরিবেশন করবার আগে এ বিষয়ে দু-চার কথা বললেন। সব কথা ঠিক ঠিক বলতে পারব না, তবে তাঁর মোদ্দা কথাটা ছিল "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্য, ওস্তাদী করবার জন্য নয়। স্বভবনে হিন্দুস্থানী স্বতন্ত্র, সেখানে আমরা তার আতিথ্য ভোগ করতে পারি—কিন্তু বাঙালীর ঘরে সে

তো আতিথ্য দিতে আসবে না, সে নিজেকে দেবে—নইলে উভয়ের মিলন হবে না। আমাদের গানে হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল; অর্থাৎ সৃষ্টির দিক থেকে।”

শিষ্য বললেন, ঠিক কী বলতে চাইছেন? ‘সে নিজেকে দেবে—নইলে উভয়ের মিলন হবে না’—এ কথার মানে কী?

—একটা তুলনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি—মনে কর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পুরুষ, বাঙালী প্রকৃতি। এক্ষেত্রে সঙ্গীতের মিলনোৎসবে এরা যদি পরস্পরে একাত্ম হয়ে যায় তবেই সৃষ্টি হবে নূতন সঙ্গীতসত্তা—সে না বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী, না বিশুদ্ধ বাঙালী—সে সে! ঠিক অনুরূপ ব্যাপারটি ঘটে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে। সঙ্গীত তখনই সার্থক যখন শ্রোতা এবং গায়ক তাদের বাস্তবসত্তাকে হারিয়ে সঙ্গীতের মিলনরাজ্যে একাত্ম হয়ে যায়—পুরুষ ও প্রকৃতির মত!

চার

পাঠক আমাকে মাপ করবেন। প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ে গেল অনেক অনেকদিন আগে শোনা একটি কাহিনী। পরের পিতৃব্যের কাহিনী শোনাতে বসে তাই হঠাৎ নিজের পিতৃব্যের প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। আশা করি এ খণ্ড-কাহিনীর ভেতর দিয়েই মুরারীমোহনের ঐ উপদেশটির তাৎপর্য বোঝা যাবে।

যাঁর কথা বলছি তিনি আমার আত্মীয়, পরম-আত্মীয়! ঈশ্বরেচ্ছায় সেই অশীতিপর সঙ্গীতকেশরী আজও ধরাধামে আছেন—ভগবান করুন সুস্থ শরীরে আরও দীর্ঘদিন তিনি আমাদেরই মধ্যে থাকুন। বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁর কাছে শোনা কাহিনীটির মূল কাঠামো বজায় রেখে এখানে লিপিবদ্ধ করছি। বিশেষ কারণে নাম-ধাম, পাত্র-পাত্রীকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম।

মনে করুন, আমার এ খণ্ডকাহিনীর নায়কের নাম অমৃতনাথ সান্যাল। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা—তখন তিনি ত্রিশ-বছরের যুবা পুরুষ। কিন্তু ঐ বয়সেই সঙ্গীতসমাজে তিনি প্রতিষ্ঠিত। গায়ক বা বাদক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। বস্তুত সঙ্গীতরস পরিবেশনে তাঁর যতটা খ্যাতি তার চেয়ে সমঝদার হিসাবে তাঁর খ্যাতি বেশি। সঙ্গীত তাঁর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বতঃস্ফূর্ত!

যে অর্থে হরিদাস স্বামীর শিষ্য বৈজুপ্রসাদ হচ্ছেন ‘বাওরা’ সে অর্থে কৃষ্ণনগরবাসী আমার খুল্লতাতও উন্মাদ। সারা ভারত পরিক্রমা করেছেন সঙ্গীত-সাধকদের জানতে, চিনতে, শুনতে, বুঝতে। কোথায় কোন প্রান্তে কে একটি নূতন তান, একটি নূতন বাট সংযোজিত করেছেন অমৃতনাথ তা স্বকর্ণে শুনতে ছুটতেন। এমনি ভাবে একবার তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন—ধরুন, বেতিয়ায়। উঠেছেন একজন সঙ্গীতজ্ঞের বাড়িতে—মনে করা যাক মনোহরবাবুর ভদ্রাসনে। মুখে মুখে খবর রটে গেল মনোহরবাবুর বাড়িতে এসে ডেরা-ডাণ্ডা গেড়েছেন অমৃতনাথ। এখানে-ওখানে রোজই আসর বসে। মনোহর তাঁর অতিথিবন্ধুকে নিয়ে হাজিরা দেন সঙ্গীত আসরে। এভাবেই কেটে গেল প্রায় দিন পনেরো।

তারপর একদিন। মনোহরবাবুর এক বন্ধু তেওয়ারীজী বললেন, বাবুজী, আপনি মীনাবাঈয়ের গান শুনেছেন কখনও?

—কোন মীনাবাঈ? গান শুনিনি, তবে নাম শুনেছি এক মীনাবাঈ-এর। এই বেতিয়ারই গায়িকা—তবে শুনেছি আজকাল আর গান করেন না তিনি।

—ঠিকই শুনেছেন। আজকাল আর তিনি গান করেন না। অন্তত গত দশ বছরের ভেতর তিনি কোথাও মুজরো নেননি। অন্ধ হয়ে যাবার পর।

—অন্ধ হয়ে গিয়েছেন? তা তো জানতাম না।

—হ্যাঁ। স্টোভ বার্স্ট করেছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু মুখখানা নাকি বীভৎস হয়ে গেছে তাঁর। আজকাল আর তাই লোকসমাজে বের হতেই চান না। প্রকাশ্যে গানও করেন না।

অমৃতনাথ একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন, অতি দুঃখের কথা। আমারও দুর্ভাগ্য! এখানে এসেই মনোহরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মীনাবাঈ-এর কথা! ইচ্ছা ছিল, তাঁর একটি ভজন শুনে যাব। কিন্তু হল না।

মনোহর বললেন, না। উনি আর আসরে আসেনই না। রাজার ব্যবস্থা করা মাসোহারা আছে। তাতেই কোনোক্রমে চলে যায়।

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল অমৃতনাথের।

কিন্তু দিনতিনেক পরেই ফিরে এলেন তেওয়ারীজী। বললেন, সান্যালমশাই, আপনার ভাগ্য ভাল। সেদিন আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল কোনো সূত্রে তা মীনাবাঈজীর কর্ণগোচর হয়েছে। শুনে তিনি বললেন, অমৃতনাথ আমার গান শুনতে চেয়েছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য। বাইরের লোকের সামনে বের হই না বলে কি ঘরের লোকের সামনেও এ পোড়া মুখখানা বার করব না!

অমৃতনাথের চোখে জল এসে যায়। অচেনা অদেখা অমৃতনাথকে বাঈজী ঘরের লোক বলেছেন—আত্মীয়তা কি রক্তের? আত্মীয়তা 'রাগ'-এর, অনুরাগের।

—বাবুজী! মীনাবাঈ তাঁর গরীবখানায় আগামী পরশু সন্ধ্যায় আপনাকে পদধূলি দিতে বলেছেন। আরও গুটি আট-দশ সঙ্গীতদরদীকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। এই বোধহয় তাঁর শেষ প্রকাশ্য আসর।

মনোহর বলেন, তা কেমন করে হয়? অমৃতবাবু যে কাল সন্ধ্যার মেলে ফিরে যাচ্ছেন। টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

অমৃতনাথ বললেন, না। আমি যাব গান শুনতে। টিকিট ফেরত দিতে হবে।

মনোহর বিস্মিত হয়ে বলেন, কিন্তু আপনি যে বললেন কলকাতায় কী একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

অমৃতনাথ হেসে বলেছিলেন, তা আছে! কিন্তু সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট 'বাইরের লোকের' সঙ্গে, তাই বলে কি ঘরের লোকের ডাক শুনে ছুটে যাব না?

*　　　*　　　*

বেতিয়া জনপদের গ্রামপ্রান্তে ছোট্ট একটি বাড়ি। তারই বৈঠকখানায় আসর বসেছে। ছোট্ট ঘর। দশ-বারো জন মানুষের ঠাঁই হয় কি না হয়। অমৃতনাথকে সসম্মানে নিয়ে গিয়ে আসরের সামনে এনে বসালেন তেওয়ারীজী। তাঁর সঙ্গে মীনাবাঈ-এর দীর্ঘদিনের জান-পহ্ছান। অমৃতনাথ বুঝতে পারেন, তেওয়ারীজীর মাধ্যমেই বাঈজী সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি ওঁর গান শুনতে ইচ্ছুক। সে যাই হোক, একটু পরে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন মীনাবাঈ। শিউরে উঠলেন সবাই। যাঁরা ঐ বাঈজীকে আগে দেখেছেন তাঁরা মনে মনে 'হায় হায়' করে ওঠেন। এককালে সুন্দরী হিসাবে খ্যাতি ছিল মীনাবাঈজীর—সেই মুখখানা এখন কী বীভৎস হয়ে গিয়েছে! মাথা নামিয়ে বাঈজী সকলকে আদাব জানিয়ে বললেন, আপ্ কাঁহা হ্যাঁয়?

বাঈজী অমৃতনাথের চেয়ে বছরপাঁচেকের ছোটই হবেন—পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে তাঁর। বাহুল্যবর্জিত সজ্জা—রাজস্থানী ঢঙে পরা! দৃঢ়নিবদ্ধ কাঁচুলি ও ঘাগরা এবং ওড়না। অমৃতনাথ বুঝে উঠতে পারেননা বাঈজী কাকে খুঁজছেন। কিন্তু ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন তেওয়ারীজী। বাঈজীর হাতখানি তুলে নিয়ে অমৃতনাথের বাহুতে স্পর্শ করান। বাঈজীর সেই দৃষ্টিহীন হাতখানি ওঁর বাহুমূল বেয়ে নেমে এল হাঁটুতে, পায়ে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল ওঁকে। কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন অমৃতনাথ।

বাঈজী বললে, আপ্ মুঝকো আশীর্বাদ নহী কিয়া ক্যা পণ্ডিতজী?

অমৃতনাথ সংক্ষেপে বললেন, করেছি। মনে মনে।

—ক্যা প্রার্থনা কিয়া মুঝকো লিয়ে? দীর্ঘ জীবন?

—না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি তোমার সাধনা যাতে সিদ্ধিলাভ করে।

বাঈজী একমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। তারপর বসল নিজের আসনে। সারেঙ্গী-বাদক তুলে নিল তার যন্ত্রটা। তবলচি হাতুড়িটা তুলে নিয়ে ঠুকঠাক শুরু করল।

তারপর দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘন্টা কেটে গেল। বাঈজী শুরু করল গহরজানের একটি ঠুংরি, খাম্বাজে—

"তনমন কী সুধ বিসর গঈ
কৈসী বজাইরে বাঁসরিয়া

জবসে ভনক শুনি কানন মেঁ
তব সে নীদ নহীঁ মেরে নৈনু মেঁ
কহে গহর পিয়ারী মন তূ ন লীজিয়ো
মুরলী কী ধুন শুনি বাওরিয়া।......"

অমৃতনাথ তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন—কোথায় বসে, কার গান শুনছিলেন, তাঁর মনে হল বাঈজী নয়, এ শ্রীরাধিকার আর্তি। "আমি তনুমনের বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এ কেমন করে বাঁশী বাজালে তুমি! যখন থেকে তোমার বংশীধ্বনি শুনলাম তখন থেকে আমার আঁখিপাতে আর নিদ্রা আসে না। গহর বলছেন, মুরলী শুনে তো উন্মাদিনী হয়েই রয়েছি, আর এ পাগলীর মনকে নিয়ে কী করবে?" তাঁর মনে হল—বুঝি তিনি নিজেই বাঁশী বাজিয়ে ঐ সঙ্গীতজ্ঞাকে উতলা করে তুলেছেন। ওঁর মুরলীধ্বনি শুনে ঐ শ্রীরাধিকা তনুমনের বোধশক্তির কথা ভুলে গিয়েছে, সে বাওরিয়া হয়ে গিয়েছে। উন্মাদিনীর মতো অঝোরধারে কাঁদছে।

চার-পাঁচ ঘন্টা সময় কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে কারও খেয়াল নেই। সেই মারাত্মক দুর্ঘটনার পর—গত দশ বছর ধরে মীনাবাঈ এমন প্রকাশ্য আসরে গান গায়নি; দশ বৎসরের পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-রসধারা আজ রাত্রে যেন লকগেটের বাঁধ ভেঙে উচ্ছলধারায় বয়ে চলেছে। সমস্ত আসর বুঁদ হয়ে গিয়েছে। মধ্যরাত্রে সঙ্গীত শেষ করলেন মীনাবাঈ। সারা আসর 'হায় হায়' করে উঠল। মীনাবাঈ তার অন্ধ দুটি দৃষ্টি সামনের দিকে মেলে প্রশ্ন করল, ক্যা পণ্ডিতজী? আপ্ কুছ নহীঁ বোলা?

সকলেরই দৃষ্টি গেল সেদিকে। অমৃতনাথ যেখানে বসেছিলেন সে স্থানটা শূন্য। সকলে যখন সঙ্গীতরসে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞানহীন, তখন নিঃশব্দে তিনি উঠে চলে গিয়েছেন। ব্যাপারটা বিশ্বাস হল না কারও! একটু এদিক-ওদিক খোঁজখবরও করা হল—কিন্তু না, অমৃতনাথের জুতোজোড়াও নেই—দরজার পাশে হেলান দিয়ে রাখা ছিল যে শৌখীন হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছড়িটা সেটাও অন্তর্হিত। ক্ষুব্ধ হল সবাই অমৃতনাথের অসৌজন্যে—নিমন্ত্রিত অতিথি তিনি; বস্তুত তাঁকে উপলক্ষ্য করেই এ আসরের আয়োজন। এ ক্ষেত্রে গৃহস্বামিনীকে কোন কিছু না বলে এভাবে নীরবে তাঁর স্থানত্যাগ রুচিবিগর্হিত। মনোহর এবং তেওয়ারীজী অমৃতনাথের হয়ে বারে বারে গৃহস্বামিনীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে থাকেন।

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না মীনাবাঈ। যত বড়ই সঙ্গীতাচার্য হোন না কেন, এভাবে কেন তিনি অপমান করলেন বাঈজীকে? যদি তাঁর ভাল নাই লেগে থাকে তাহলেও তাঁর উচিত ছিল সৌজন্যের নির্দেশে আসর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মীনাবাঈ বলে, নহীঁ জী! ম্যায় নেহি মান্‌লি। টাঙ্গা বোলাইয়ে—ম্যয় খুদ যাউঙ্গি পণ্ডিতজীকো পাস। মুঝে সমঝ্না চাহিয়ে কি কেঁও পণ্ডিতজীনে—

ওঁরা বারে বারে বোঝাতে থাকেন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। এত রাত্রে কী হবে অতটা ধাওয়া করে! কাল সারাদিন তো অমৃতনাথ আছেন বেতিয়াতে, সন্ধ্যায় ট্রেন ধরবেন—এ ক্ষেত্রে কাল সকালে বাঈজী অনায়াসে ও সংবাদটা সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? অভিমানক্ষুব্ধ বাঈজী কারও কথা শুনল না—সে জানতে চায়, কোথায় তার ত্রুটি হল। কেন এভাবে আসর ত্যাগ করে গেলেন অমৃতনাথ।

মনোহরের বাসায় টাঙাটা যখন এসে পৌঁছালো তখন রাত একটা। অমৃতনাথ জেগে ছিলেন। আলো নিভিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ বসে ছিলেন। ফেরার পথে এতটা রাস্তা একটানা একা হেঁটে এসেছেন। এখন অপরাধবোধে ভুগছেন। ওরা কী ভাবল? কী কৈফিয়ত দেবেন বন্ধু মনোহরকে? ঠিক তখনই স্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ছিন্ন করে গেটের ভিতর ঢুকল টাঙা। মনোহর ফিরে এসেছেন। কী বলবেন তাঁকে?

অমৃতনাথ উঠে এলেন বাইরের বারান্দায়। এসেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। তেওয়ারীজীর হাত ধরে টাঙা থেকে নেমে আসছে অন্ধ গায়িকা মীনাবাঈ। নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন অমৃতনাথ, কিন্তু যতই নিঃশব্দে অগ্রসর হন দৃষ্টিহীনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল অপরাধী নীরবে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সরাসরি প্রশ্নটায় নেমে এল বাঈজী। বললে, অব্ বাতাইয়ে—ক্যোঁও?

এতক্ষণ অনুশোচনায় ভুগছিলেন, কিন্তু এখন এভাবে মধ্যরাত্রিতে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে কৈফিয়ত চাওয়ায় অমৃতনাথ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। হিন্দীতে বললেন, বাঈজী, আমার অপরাধটা কি এতই গুরুতর যে, এত রাত্রে আমার কৈফিয়ত নিতে এসেছ?

—জী হাঁ! তবে আপনি আসর ছেড়ে উঠে আসার জন্য আমি কৈফিয়ত চাইতে আসিনি—আমি জানতে এসেছি—কেন আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজী হয়ে আমাকে ঝুটা আশীর্বাদ করলেন!

—ঝুটা আশীর্বাদ! তার মানে?

—যার গান শুনে শ্রোতা পালিয়ে বাঁচে তার সঙ্গীত-সাধনা কোনোদিন কি সিদ্ধিলাভ করে?

অমৃতনাথ ম্লান হয়ে গেলেন! এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন?

শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস কর মীনাবাঈ, তোমার গানের কোনো ত্রুটির জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমি উঠে আসতে বাধ্য হয়েছি। ত্রুটি তোমার নয়, আমারও নয়......কীভাবে তোমাকে বোঝাব?

মীনাবাঈজী তার দুটি অন্ধ চোখ মেলে বীভৎস মুখটা বাড়িয়ে ধরে বললে, পণ্ডিতজী, আপনি কি বুঝতে পারেন না—না বুঝে গেলে যে আমারও চলবে না। আজকের এই ঘটনাটা, আজকের এই অসাফল্য জিন্দেগীভর আমার মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে?

অমৃতনাথ অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তারপর মনস্থির করে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ মীনাবহিন্! সব কথা আমাকে অকপটে স্বীকার করে যেতে হবে। না হলে জিন্দেগীভর এ-কথাটা আমারও মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে। শোন! তোমার গান শুনে প্রথম থেকেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন 'দরদ্‌ভরি গানা' আমি বহু-বহুদিন শুনিনি। আমার মনে হচ্ছিল—এটা বেতিয়া নয়, বৃন্দাবন! আমি অমৃতনাথ নই, আমি সেই বংশীওয়ালা! আর তুমিও আগুনে পুড়ে আজ খাঁটি সোনা হয়েছ—তুমি সেই বিরহ-কাতরা গোরোচনা গোরি! আমি.....আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না।.....তারপর যখন তুমি খাম্বাজ-পিলুতে ঠুংরি ধরলে :

বোলো মোরে রাজা
কাঁহা গোঁয়ারি সারা রাতিয়া।
সোতনকে সঙ্গ্ হাসত খেলত তু
হাম সঙ্গ্ করত রুঠি রুঠি বাতিয়া।।

—তখন আমার মনে হল—তাই তো! আমার এমন শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করে আমি কেন ঝুটো মুক্তো নিয়ে পড়ে আছি। সম্মোহিতের মতো আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম—আসরে কেউ খেয়াল করেনি। সেই খণ্ডমুহূর্তেই যদি আমার চেতনা ফিরে না আসত তাহলে হয়তো পরমুহূর্তেই আমি ছুটে গিয়ে তোমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতাম! হয়তো চুম্বন করে বসতাম তোমাকে! বিশ্বাস কর বহিনজী—আমি ভয় পেয়ে গেলাম! কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না দেখতে পেয়ে—অশালীন কিছু করে বসার আগেই—পালিয়ে এসেছি।

দগ্ধাননী মীনাবাঈয়ের দুটি অন্ধ নয়নে তখন নেমেছে দুটি জলের ধারা। মুহূর্তে সে লুটিয়ে পড়ে ব্রাহ্মণের চরণতলে। ওঁর পায়ে অশ্রুআর্দ্র মুখটা নামিয়ে দিয়ে বললে, পণ্ডিতজী! তুমি আজ আমাকে যা দিলে—কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে তার চেয়ে বড় পুরস্কার দিতে পারেনি!

পাঁচ

গুরুজীর দেহান্তে তাঁরই অনুকরণে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাসায় দুর্লভচন্দ্র মার্গ-সঙ্গীতের অনির্বাণ প্রদীপখানি জ্বেলে রাখলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল তিনি শিক্ষানবীশদের বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আত্মসচেতন ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গে বলতেন—বিদ্যাকে দান করা যায়, গ্রহণ করা যায়, ক্রয়-বিক্রয় চলে না। বিলানোই চলে, বেসাতি চলে না।

ভট্টাচার্য মশায়ের গৃহসংলগ্ন কোনো তিন্তিড়ি-বৃক্ষের সন্ধান আমি পাইনি। তাই জানি না সঙ্গীতপাগল বুনো-রামনাথটিকে ব্রাহ্মণী কী রেঁধে খেতে দিতেন। যজন-যাজন অবশ্য করতেন—তার

উপার্জন সামান্যই। তবু ঐ একটি বিষয়ে তিনি আপসহীন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বহুবার বহু বড় জমিদারবাড়ি থেকে মোটা মুজ্‌রো নেবার অনুরোধ এসেছে—সরাসরি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, যাই যদি এমনিতেই যাব, এমনিতে বাজাব। আমাকে বায়না করা যায় না! শুধু নগদ অর্থ নয়, প্রকারান্তরেও অন্য কোন সাহায্য কিংবা পুরস্কার তিনি গ্রহণ করতেন না, বলতেন রাজার-রাজার কাছে হাত তো পেতেই আছি, প্রসাদ নিলে তাঁর কাছ থেকেই নেব—এঁদের কাছ থেকে উচ্ছিষ্ট নেব কেন?

একবার উত্তর কলকাতার একজন সুপরিচিত সঙ্গীতপ্রেমী ধনীর বাড়িতে দুর্লভচন্দ্র সঙ্গত করতে যান। গৃহকর্তা জানতেন যে, দুর্লভ বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় বাজাতে এসেছেন। সঙ্গত শেষ হলে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভট্টাচার্যমশাইকে একখানি বহুমূল্য শাল উপহার দেন। সর্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করলে গৃহকর্তার অসম্মান হয়, তাই দুর্লভ বিনাবাক্যব্যয়ে শালটি গ্রহণ করেন। আসর ভাঙলে দুর্লভচন্দ্রকে গৃহদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন গৃহস্বামী। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল গৃহকর্তার কিশোর পুত্রটি। দুর্লভ চট করে শালটি সেই কিশোরের গলায় জড়িয়ে দিলেন।

গৃহকর্তা ক্ষুব্ধ না হলেও মর্মাহত হয়েছিলেন। বললেন, এটা কেমনতর হল ভট্টাচার্যমশাই?

দুর্লভচন্দ্র ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, রাজযোটক হল এতক্ষণে। ছেঁড়া ধুতি চলবে ঢিলে লয়ে আর শাল চলবে চৌ-দুনে—তা কি বরদাস্ত করি আমি? ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখুন—কী সুন্দর মানিয়েছে!

* * *

একই কারণে রেডিওতে তিনি বাজাতে চাইতেন না। সঙ্গীত সম্মেলন সম্বন্ধেও তাই। অনেক পীড়াপীড়িতে একবার মাত্র কাশীতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে বাজিয়েছিলেন। এ ছাড়া একবার কলকাতার নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেও সঙ্গত করেছিলেন। অথচ ঘরোয়া বৈঠকে বহু আসরে বহুবার ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে বসেছেন মৃদঙ্গ নিয়ে। দুর্লভচন্দ্রের সমসাময়িক এমন কোনো ধ্রুপদীয়া নেই যাঁর সঙ্গে তিনি সঙ্গত না করেছেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজা চক্রবর্তী অথবা মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রাও, লছমীনারায়ণ মিশ্র, অমর ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অযোধ্যারাম পাঠকের সঙ্গে প্রহরের পর প্রহর মৃদঙ্গ সঙ্গত করে গিয়েছেন দুর্লভচন্দ্র। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গেও তিনি বহু আসরে বহুবার সঙ্গত করেছেন। দুর্লভচন্দ্রের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বশ্রী প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ সান্যাল, নরেন্দ্র বাগচি, সুবোধচন্দ্র দে, জিতেন সাঁতরা প্রভৃতি পাখোয়াজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুত্র হরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ঘনশ্যামের উপরেও তাঁর আশীর্বাদ আছে।

নিজের গুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রতি বছর তিনি 'মুরারী সম্মেলন' করতেন। শুধু কলকাতা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ নয়, অনেকবার সর্বভারতীয় সঙ্গীতাচার্যরাও সে আসরে এসে গেয়েছেন, বাজিয়েছেন। শুধু বিভিন্ন আসরে গিয়ে মৃদঙ্গ-সঙ্গত করাই নয়, বিভিন্ন আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে মার্গ-সঙ্গীতের স্বরূপটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন, তার বিবর্তন ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং কড়ি-মধ্যমের সামান্য ইতরবিশেষ নিয়ে প্রহরের পর প্রহর সহযোগী ও শিষ্যদের নিয়ে মেতে থাকতেন।

ওঁর সময়কালেই ধীরে ধীরে ধ্রুপদ-ধামারের ক্রমাবলুপ্তি ঘটতে থাকে; খেয়াল-ঠুংরি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে লোকরঞ্জন সঙ্গীতের পরিচয় বহন করে। পেট্রোল-চালিত মোটর গাড়ির আবির্ভাবে যেভাবে চারঘোড়ার জুড়িগাড়িকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, প্রায় তেমনিভাবেই ডুগি-তবলার আগমনে স্তব্ধ হয়ে গেল মৃদঙ্গ। শেষ জীবনে এ-জন্য দুর্লভচন্দ্র মনে হয় কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

তাঁর ক্ষোভের আর একটি কারণ ছিল এই যে, মার্গ-সঙ্গীতের কট্টর পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারতেন না। সংস্কারবিরোধী কট্টর পণ্ডিতদের মতে ধ্রুপদীয়া-সঙ্গীতের পথ পাথর দিয়ে বাঁধানো—একচুল বিচ্যুতি সে মানবে না; ক্ষমতা থাকে তবে সেই বাঁধা-সড়কের মধ্যেই তোমাকে রাগরূপ সৃজন করতে হবে। দুর্লভচন্দ্র তাঁর যৌবনে শোনা গুরুর উপদেশটি ভুলতে পারেননি—সেই আশ্চর্য শেষরাত্রের অভিজ্ঞতা। শিষ্যদের বলতেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাঠামোটি রেখে তার বাহুল্যকে

বর্জন করে মার্গ-সঙ্গীতকে যুগোপযোগী করতে হবে। শুধুমাত্র শাসনে কখনও সবুজকে জিইয়ে রাখা যায় না। শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠান-শৃঙ্খলে সুরলক্ষ্মীকে এভাবে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে প্রতিমার কাঠামোটাই থাকবে, তাতে প্রাণ থাকবে না।

শিষ্যদের তাই প্রায়ই বলতেন, মূল হিন্দুস্থানী গানের পরিবর্তে রবিবাবুকৃত তার বাঙলা রূপান্তরই তাঁর বেশি ভাল লাগে। 'বহুর বজাও বংশী'র (পূরবী/তেওরা) বদলে 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা' কিংবা 'বুঁদ পবন পুররবাঈ' (হাম্বীর/চৌতাল)-এর পরিবর্তে 'এসেছে সকলে কত আশে।' শুধু সুরানুবাদিত গানই নয়, রবীন্দ্রনাথের যেসব নিজস্ব ধ্রুপদাঙ্গ রচনা সংগ্রহ করতে পারতেন তা শিষ্যদের গেয়ে শোনাতে বলতেন এবং মৃদঙ্গ তুলে নিয়ে তার সাথে সঙ্গত করতেন। 'নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে' (বাগেশ্রী/তেওরা), 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' (বেহাগ/তেওরা), কিংবা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধামার 'হৃদিমন্দির-দ্বারে বাজে' (কেদারা)।

গুরু মুরারীমোহনের দেহান্ত হয়েছিল ১৯০৪-এ। তার পরের বছর থেকেই দুর্লভচন্দ্র গুরুর স্মৃতিতে মুরারী-সম্মেলনের আয়োজন করেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই বার্ষিক অনুষ্ঠান চলেছিল—ছেদ পড়ল দুর্লভচন্দ্রের দেহাবসানে। মুরারী-সম্মেলন শুরু হবার ক-বছর পরে শুরু হয়েছিল বার্ষিক 'শঙ্কর উৎসব'; তার অনুষ্ঠান হত রাধানাথ মল্লিক লেনে শিবচতুর্দশীর সারা-রাত্রি-ব্যাপী। তারও পরে, বস্তুত ১৯২৮ থেকে, শুরু হয় লালচাঁদ উৎসব। এই তিনটি বার্ষিক সম্মেলনই ছিল সঙ্গীতপ্রিয়ের কাছে অবারিতদ্বার—টিকিট কাটতে হত না। এর ভেতর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল দুর্লভচন্দ্রের 'মুরারী-সম্মেলন'। বহু সঙ্গীতাচার্য এসে এখানে মুরারীমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন। এসেছেন ভারতবিখ্যাত তবলিয়া কেরামতউল্লা খাঁ, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, আমীর খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ-সায়েব, সারেঙ্গী ছোটে খাঁ। গায়কও এসেছেন অনেক, ধ্রুপদীয়ারাই বেশী— মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়; পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ বা দুর্লভচন্দ্ররা তো ছিলেনই। এই বার্ষিক সম্মেলন থেকেই আবার বিকশিত হয়েছেন কোনো কোনো শিল্পী—প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সঙ্গীত-সমাজে। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মোহিনীমোহন মিশ্র। ১৯২৮-এর মুরারী-সম্মেলনে আসর মাৎ করে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তিনি।

* * *

আসর বসেছে সন্ধ্যার কাছাকাছি। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীতে আসর ভর্তি। সন্ধ্যা থেকেই আসর জমেছে। পরিণত বয়সী ধ্রুপদীয়া গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তরুণ শিল্পী মধুকণ্ঠী ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান শেষ হয়েছে। তারপর গাইলেন যোগীনবাবু—ধ্রুপদীয়া যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান শেষ করে তাঁরা সবাই আসরেই রয়েছেন। এর পরেই ঘোষক শ্রোতৃবৃন্দকে জানালেন অতঃপর সঙ্গীত পরিবেশন করছেন মোহিনীমোহন মিশ্র। রাত্রি তখন মধ্যযাম অতিক্রম করেছে, প্রায় একটা। ইতিপূর্বে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত গুণীরা আসরের মর্যাদা রেখে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মধ্যরাত্রে উনি কী দিয়ে শুরু করেন? রাগ নির্বাচনে ভুল হল না মোহিনীমোহনের—ধরলেন তান মেজাজী রাগ, দরবারী কানাড়া। আসরে একটা সাড়া পড়ে গেল আলাপ শেষ হবার আগেই।

গান শেষ হল রাত আড়াইটায়।

সমস্ত আসর মোহিনীমোহনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রবীণ ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র সকলের হয়ে অনুরোধ করলেন মোহিনীমোহন যেন আর একখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গায়ক তখন বললেন, মৃদঙ্গের বদলে ডুগি-তবলা হলে ভাল হয়।

পাখোয়াজ যিনি বাজাচ্ছিলেন তিনি দুর্লভচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য। সরে এলেন তিনি। মোহিনীমোহন দেখলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক নিজেই মৃদঙ্গটা সরিয়ে নিচ্ছেন।

মোহিনীমোহন তাঁকে বললেন, মৃদঙ্গের অপসারণে ভট্টাচার্যদা রাগ করলেন না তো?

মৃদঙ্গ-ক্রোড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন নামাবলী গায়ে পণ্ডিতমশাই। বললেন, করেছিই তো! তবে আমি টুলো-পণ্ডিত। বাঙলায় 'রাগ' জানি না, সংস্কৃতে 'রাগ' করেছি!

যারা সামনের দিকে ছিল এবং শুনতে পেয়েছিল তারা বুঝতে পারে স্বল্পভাষী দুর্লভচন্দ্র এভাবেই জানালেন গায়কের দরবারী-কানাড়াটা তাঁর কত ভালো লেগেছে।

মোহিনীমোহন ধরলেন—খেয়াল। মালকোষে। আলাপ করলেন না, একেবারেই গান ধরলেন ত্রিতালের মধ্যলয়ে। কিন্তু তান কর্তবে মালকোষের বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার করে আসরকে মাতিয়ে তুললেন। তাঁর খেয়াল যখন শেষ হল তখন রাত চারটে—ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু আসর যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে! কেউ ওঠেনি—কেউ বাড়ি যাবার কথা ভাবেনি। একই গায়কের কণ্ঠে ধ্রুপদ এবং খেয়ালের এমন যুগ্ম-বিকাশে সবাই মুগ্ধ। তাই খেয়াল শেষ হতেই সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, আর একখানি হোক মোহিনীবাবু।

মোহিনীমোহন যুক্ত করে বললেন আরও অনেক শিল্পীরা রয়েছেন।

যাঁরা এখনও আসরে গান করেননি তাঁরা বসেছিলেন এককোনায়। তাঁরা তিন-চারজনে একসঙ্গে বলে ওঠেন, সেই শিল্পীরাই দাবী করছেন—আর একখানা হোক্!

এবার টপ্পা ধরলেন মোহিনীমোহন। খাম্বাজে। জমজমাট গিটকিরির কাজ শোনালেন এবার। গান শেষ হল যখন তখন ভোরের আকাশে আলো ফুটেছে। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যেও একটা অদ্ভুত সাড়া জেগেছে। এ কী আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! তাঁরা মোহিনীমোহনকে ছাড়লেন না—হোক্, আরও হোক্!

মিশ্রমশায়ের বয়স তখন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ—যুবক নন। রাত একটা থেকে গাইছেন! কিন্তু সমস্ত আসরের সমবেত অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পা শুনিয়েছেন; এবার ধরলেন ঠুংরিঃ কাফি!

সেখানেই শেষ নয়! আসরের সমাপ্তিসূচক গানখানি যখন গাইলেন তখন বেলা সাতটা। এবার ভজন। এমন বহুমুখী প্রতিভায় সারা আসর সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। গোপালচন্দ্র প্রমুখ সমবেত সঙ্গীতাচার্যরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন গায়কের। সেবার সম্মেলনে তিনিই হলেন যাকে বলে 'হিরো।' স্বল্পভাষী দুর্লভচন্দ্র কিন্তু কোনো প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেননি। সেই যে মধ্যরাত্রিতে ধ্রুপদ গানের পর মৃদঙ্গটি নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন তারপর আর মঞ্চে ওঠেননি—শ্রোতৃবৃন্দের সামনের সারিতে ঠায় বসেছিলেন—যেন ধ্যানে বসেছেন, সমংকায়শিরোগ্রীব! মোহিনীমোহন সমাপ্তি ভজনটি শেষ করে যখন শ্রোতৃবৃন্দের দিকে ফিরে নমস্কার করছেন তখন আবার মঞ্চে ফিরে এলেন উনি! মঞ্চের পিছনে টাঙানো ছিল ওঁর গুরু ঁমুরারীমোহন গুপ্তের একটি আলেখ্য। গতকাল সন্ধ্যারাত্রে সেই আলেখ্যে মাল্যদান করে সম্মেলন শুরু হয়েছিল। নামাবলী-গায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমশাই বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন সেই ছবিখানির দিকে। দু-হাতে খুলে নিলেন সেই গোড়ের-মালাটি এবং মোহিনীমোহনের নমস্কারের ভঙ্গিতে আনত মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিলেন সেই বাসিফুলের মালাখানি মিশ্র-মশায়ের কণ্ঠে!

এর চেয়ে বড় 'পুরস্কার' আর কী হতে পারত?

জানি না, মিশ্রমশাই বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বলেছিলেন কি নাঃ

"নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা।।"

ছয়

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।

মুরারীমোহন গুপ্তের ভদ্রাসনে এসেছেন কয়েকজন জ্ঞানীগুণী; তার মধ্যে আছেন লালচাঁদ বড়াল। বিশেষ প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসম্মেলনে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন। কলকাতায় তাঁর বিরাট সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হচ্ছে! এই সভায় কী গান গাওয়া হবে, কে গাইবেন তাই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। লালচাঁদ দুর্লভচন্দ্রের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড় ছিলেন—দুজনেই তখন তরুণ—তেইশ-পঁচিশ। দুজনের আলাপ পরিচয় ছিল, সৌহার্দ্যও ছিল—যদিও দুজনের জগতে আপাতদৃষ্টিতে ব্যবধান আশ্‌মান-জমীন। লালচাঁদ সুবর্ণবণিক, লক্ষপতির

সন্তান, সাহেব-সুবো মহলে ঘোরেন, পিয়ানো বাজান—আর দুর্লভের পরিচয় তো আমরা আগেই জেনেছি। তবু এই দুই মহাদেশ—দুর্লভ এশিয়া ও লাল আমেরিকা, যাঁদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান—তাঁরাই রাগ-সঙ্গীতের বেরিংপ্রণালীতে পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন।

মুরারীমোহন প্রশ্ন করলেন," সভাটা কোথায় হবে?

লালচাঁদ বললেন, শোভাবাজারে। স্যার রাধাকান্ত দেব মশায়ের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্বামীজীর ভাষণ। তার পূর্বে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর একটি অভিনন্দন পাঠ করবেন। কিন্তু তারও পূর্বে একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত চাই। আমাদের ইচ্ছা সেটা ধ্রুপদাঙ্গ শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত হবে। আপনি কী বলেন?

মুরারীমোহন বললেন, ভজনও হতে পারত। তবে যদি ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতই হয় তাহলে আমার পরামর্শ—গানটি হবে বাঙলায়, হিন্দীতে নয়।

লালচাঁদ একটু বিস্মিত হয়ে বলেন, বাঙলায় ধ্রুপদাঙ্গ মার্গ-সঙ্গীত? আছে?

—আছে! সম্বর্ধনা যখন বাঙলাদেশে হচ্ছে, কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে হচ্ছে, তখন আমরা গানটি মাতৃভাষায় গাই—এটাই আমার ইচ্ছা।

লালচাঁদ বললেন, ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত বাঙলাভাষায় গেয়ে শোনাতে পারেন?

—পারি। ধর তো দুলি!

মুরারীমোহন মার্দঙ্গিক। গান করেন না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁকেই গেয়ে শোনাতে হবে। গাইবেন সেই গানখানি "আজি বহিছে বসন্ত পবন (বাহার/তেওরা)" যে গানখানি বছরকয়েক আগে শুনেছেন জোড়াসাঁকোয়—প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতির কণ্ঠে। গুরুর নির্দেশে দুর্লভচন্দ্র মৃদঙ্গটি কোলে তুলে নেন। বাধা দিলেন লালচাঁদ। বললেন, না! ওটা আমাকে দিন। আমি বাজাব।

দুর্লভ আকাশ থেকে পড়েন: আপনি! আপনি মৃদঙ্গ বাজাবেন!

হাসলেন লালচাঁদ। বললেন, আজ তো সবই উল্টোরকম হচ্ছে ভট্টাচার্যমশাই। ধ্রুপদ গান হচ্ছে বাঙলায়, হিন্দীতে নয়; গাইছেন মুরারীদা—যিনি, মার্দঙ্গিক, গান করেন না! এ ক্ষেত্রে মৃদঙ্গ-সঙ্গত করা উচিত দুর্লভচন্দ্রের নয়, লালচাঁদের, যিনি পিয়ানো বাজান!

মুরারী তখন মিটিমিটি হাসছেন। কিন্তু দুর্লভচন্দ্র বললেন, বেশ, বাজান, কিন্তু 'ধা'-টা ঠিক ধরতে পারবেন তো?

লালচাঁদ আবার হেসে বলেন, 'পা' ধরেছি যে গুরুর, 'ধা' ধরতে তিনিই শিখিয়েছেন দুলিবাবু! আমার গুরুকে আপনি চেনেন না, তাই অতবড় কথাটা বললেন।

দুর্লভচন্দ্র কথার পিঠে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন মুরারীমোহন। বললেন, তুমি জান না দুলি, তুমি আমার কাছে আসার আগেই লালচাঁদ আমার কাছে মৃদঙ্গ শিখতে আসত। মৃদঙ্গ দিয়েই লালচাঁদের সঙ্গীত-জীবনের হাতেখড়ি, কিন্তু অভিমানী লালচাঁদের হাতে মৃদঙ্গটা সইল না—তাই আজ ও পিয়ানো বাজায়!—কী লালচাঁদ, ঠিক বলিনি?

লালচাঁদ জবাব দিলেন না। মৃদু হাসলেন।

গান শুরু করলেন মুরারীমোহন—বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীতকার ও পিয়ানোবাদক লালচাঁদ 'ধা' ধরলেন নির্ভুল; তেওড়া-তালে বাজিয়ে গেলেন অনায়াস ভঙ্গীতে, যেন মাদলই তাঁর যন্ত্র, তন্তুবায়ের হাতে তাঁতের মাকু, কুম্ভকারের হাতে চাক!

গান শেষ হলে দুর্লভচন্দ্র বললেন, মৃদঙ্গ বাজনা ছেড়ে দিলেন কেন তাহলে?

লালচাঁদ এবারও হেসে বললেন, সে-কথা তো গুরুই শোনালেন, গুরুভাই! অভিমানে!

—কী রকম?—কৌতূহলী দুর্লভচন্দ্র জানতে চান।

লালচাঁদ বলেন, সে গল্প আর একদিন শোনাব। এখন আসুন, আমরা কাজের কথায় ফিরে আসি।

কাজের কথায় ওঁরা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু দুর্লভচন্দ্র আর সেই করুণ কাহিনীটি শুনে যেতে পারেননি। সে গল্প আর করেননি লালচাঁদ, সে প্রসঙ্গ আর ওঠেনি ওঁদের আসরে।

* * *

লালচাঁদের সেই অকথিত কাহিনীটি আমি কিন্তু শুনেছিলাম আর এক পরিবেশে, আর একজনের কাছে—ঐ ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর পরে। হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তা হোক—আমার জীবনের সেই অভিজ্ঞতাটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ করে যাই:

আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগেকার কথা। এই শতাব্দীর বয়সও তখন ঐ—আটত্রিশ!

আমি তখন হিন্দু স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ি, আজ যাকে আপনারা বলেন ক্লাস এইট। থাকি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। সেখানেই আমার বাবার একখানা বাড়ি ছিল। ১/২ সি-তে। লালচাঁদও ছিলেন ঐ একই গলির বাসিন্দা—গলিটার নাম লালচাঁদের পিতামহের নামে। আর লালচাঁদের দুই পৌত্র দুনিচাঁদ ও সখীচাঁদ ছিল আমার সহপাঠী। দুনি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারত। পরে অনেক ছায়াছবিতে সে পিয়ানো বাজিয়েছে, সুরারোপ করেছে, সঙ্গীত পরিচালনা করেছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন দুনির বয়স তেরো-চোদ্দো। তবু ঐ বয়সেই সে পিয়ানোবাদনে দক্ষতা অর্জন করেছিল।

ছুটির দিন। দুনির বাড়ি যেতে হল। কেজো ভূমিকায়। কয়েকদিন অসুস্থ থাকায় স্কুল কামাই করেছি, পড়া জেনে নিতে। গেটে থাকে দারোয়ান—বিরাট চকমেলানো বাড়ি। দুনির কথা বলতেই দারোয়ান বললে, দুনিবাবু পিয়ানো কামরামে হ্যঁয়, যাইয়ে না উপর!

পিয়ানো-কামরা? ওদের বাড়িতে আবার পিয়ানো-কামরা আছে নাকি? দুনিদের বাড়িতে যখনই গিয়েছি বসেছি নীচের একখানি ঘরে। সে-ঘরে ছিল একটি টেবিল-টেনিস্ (তখন আমরা বলতাম 'পিং-পং') বোর্ড। খেলাটা কলকাতায় নতুন চালু হয়েছে। সেই খেলা খেলতেই যেতাম। এখন দারোয়ানের নির্দেশে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে যেতে হল। সিঁড়ির মুখে একটি সাদা মার্বেলের নারীমূর্তি। মনে আছে কিশোর বয়সের সঙ্কোচে আমি মূর্তিটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি।

দুনি বসেছিল পিয়ানো ঘরে। প্রকাণ্ড একটা পিয়ানোর সামনে টুলে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল সে। এদেশী গৎ নয়—মোজার্ট, বিতোফেন কী অভ্যাস করছিল সে তা সেই জানে! আমার মনে হচ্ছিল একটা ঝড় বইছে সেই ঘরের ভেতর। সার্শি-পাল্লাগুলো যেন থরথর করে কাঁপছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে বাজনা থামিয়ে ঘুরে বসে: কী রে! তুই কখন এলি?

পড়া জিজ্ঞাসার কথা তখন আমি ভুলে গেছি। সবিস্ময়ে দেখছি সেই প্রকাণ্ড পিয়ানো যন্ত্রটা। এত বড় এবং এমন শৌখীন পিয়ানো যন্ত্র আমি আগে কখনও দেখিনি। প্রশ্ন করি, হ্যাঁরে দুনি, এটার দাম কত রে?

—দাম? দাম তো জানি না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—'সাত পয়জার।' তার মানে কী, তা আমি আজও জানি না।

আমিও জানি না। হাজার টাকার নোট হয় শুনেছি। 'পয়জার' কি তেমনি দশ-বিশ হাজার টাকার নোট? দুনি বললে, এটা আমাদের কেনা হয়নি। ঠাকুর্দা উপহার পেয়েছিলেন।

উপহার! এত প্রকাণ্ড উপহার—যার দাম নাকি 'সাত পয়জার'; তা কেউ কাউকে উপহার দেয়? প্রশ্ন করলাম, এত দামী উপহার তাঁকে কে দিয়েছিলেন?

—গভর্নর বাহাদুর!

আমি ভয়ে ভয়ে আবলুশ কাঠের মতো কালো মসৃণ পিয়ানোটার গায়ে একবার হাত ছোঁয়ালুম।

দুনি বললে, আমার ঠাকুর্দার গল্প শুনবি? লালচাঁদ বড়ালের কথা?

আমি বললুম, শুনব। বল!

দুনি আমাকে শুনিয়েছিল তার পিতামহের কাহিনী। পরে লালচাঁদের জীবনীও পড়েছি। তারই চুম্বকসার এখানে লিপিবদ্ধ করি :

* * *

লালচাঁদ হচ্ছেন বিখ্যাত সুবর্ণবণিক প্রেমচাঁদ বড়ালের পৌত্র, সেকালের প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নি নবীনচাঁদ বড়ালের একমাত্র পুত্র। প্রেমচাঁদ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন অনুরাগী ভক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশন হত প্রেমচাঁদের বাড়িতে, সেই সাপ্তাহিক ধর্মসভায় বালক লালচাঁদ মাঝে মাঝে ধর্মসঙ্গীত গেয়ে শোনাতেন। যতদূর জানা যায় বালক লালচাঁদ জোড়াসাঁকোর মূল সমাজ-

মন্দিরে শুনে শুনে সেই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি শিখেছিলেন। এছাড়া প্রেমচাঁদের বাড়িতে সঙ্গীতচর্চার আর কোন পরিবেশ ছিল না।

প্রেমচাঁদের পরবর্তী পুরুষে, নবীনচাঁদের আমলে, সেই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটিও আর খুব নিয়মিত হত না। ফলে বালক লালচাঁদের গান গাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নবীনচাঁদ ছিলেন সাহেবী-কেতার মানুষ, কলকাতা হাইকোর্টের একজন সুপরিচিত এ্যাটর্নি। ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে টেম্পল-চেম্বার্সে তাঁর এ্যাটর্নি-ফার্ম : এন. সি. বড়াল এ্যান্ড পাইন। নবীনচাঁদ ছিলেন কৃতি, ধনবান, অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, লালচাঁদের ছাত্রজীবনে সঙ্গীতচর্চাটা একেবারেই বরদাস্ত হয়নি নবীনচাঁদের! গান-বাজনা, ডুগি-তবলার ধারে-কাছে যেতে দিতেন না একমাত্র পুত্রকে। তাকে ভর্তি করিয়েছিলেন হিন্দু স্কুল, তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

পুত্রের কিন্তু বিদ্যার চেয়ে সঙ্গীতের দিকেই অনুরাগ বেশি। সে আমলে মার্গ-সঙ্গীত বলতে সবাই বুঝত ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত—আমরা এখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে আছি। স্কুলে পড়বার সময়েই হিন্দু স্কুল থেকে পালিয়ে তিনি চলে যেতেন ঠনঠনিয়ায়—বসতেন গিয়ে মুরারীমোহনের সঙ্গীত শিক্ষার আসরে। মুরারীমোহন ঐ বালকের তীব্র আগ্রহ দেখে শেখাতে শুরু করেন। নবীনচাঁদ ব্যস্ত মানুষ, মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করতেন—লালু কোথায়? স্কুল থেকে এখনও ফেরেনি? কোথায় কোথায় ঘোরে?

নবীনচন্দ্রের স্ত্রী, লালচাঁদের জননী, বিখ্যাত ও বদান্য বিত্তশালী সাগরলাল দত্তের কন্যা। তিনি সমস্তই জানতেন—কিন্তু কর্তার কাছে ভাঙতেন না। জানতেন, কারণ লালচাঁদ অকপটে মায়ের কাছে সব কথা স্বীকার করেছিলেন। প্রাণের দায়ে! তাঁর তখন একটি নিজস্ব মৃদঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন—যা পকেটমানি থেকে কেনা যায় না। জননী কর্তাকে লুকিয়ে পুত্রকে অর্থসাহায্য করেছিলেন এবং ঐ সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—ও মাদল-টাদল যেন বাড়িতে নিয়ে আসিস না।

পুত্র জননীকে আশ্বস্ত করেছিল: পাগল!

সেদিক থেকে চাঁদ খালিফা। মৃদঙ্গটি বাড়িতেও আনেননি, কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও রাখেননি—পাছে জানাজানি হয়ে যায়। সেটি গচ্ছিত রাখা ছিল হিন্দু স্কুলের কাছাকাছি একটি মুদির দোকানে। স্কুল ছুটির পর এবং স্কুল ছুটির দিনে 'ইস্কুল যাচ্ছি' বলে তিনি হাজির হতেন সেই মুদির দোকানে। বাইরের দিকে তেল-নুন-চাল-ডাল বিকিকিনি হত আর মুদির গুদামে গুড়ের নাগরি আর কেরোসিন-টিনের খাঁজে ঠাঁই করে নিয়ে বালক লালচাঁদ আপন মনে বাজিয়ে চলতেন—ধা-ধা-ধিন্ ধা! দোকানীকে কিছু দিতে হত না, শুধু সে যখন দুপুর-নাগাদ একটু নিদ্রা দিত তখন লালচাঁদকে মাদলের বদলে দোকানে ঠেকা দিকে হত—খদ্দেরকে যাতে বিমুখ না হতে হয়।

* * *

ক্রমশ একলব্যের সাধনায় লালচাঁদ হয়ে উঠলেন দক্ষ মার্দঙ্গিক। তাঁর বাল্যবন্ধু ছিলেন এন্টালীর হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মধুকণ্ঠী গায়ক, ধ্রুপদ গান শিখতেন বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে। সময়-সুযোগ মতো লালচাঁদ বসেন হরিনাথের সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে চান—গায়ক না হলে লালচাঁদের চলে না, বাদক না হলে যেমন চলে না হরিনাথের। শেষে একদিন হরিনাথ বললেন, লালু, আমি শনিবার একটা আসরে গাইতে যাব, তুই বাজাবি?

লালচাঁদের মনে পড়ল তাঁর পিতৃদেব শনিবারে একটা পার্টিতে যাবেন। ফলে রাত করে বাড়ি ফেরার অসুবিধা নেই। বলেন, যাব।

আসরে বালক লালচাঁদ মৃদঙ্গ বাজিয়ে সকলের প্রশংসা কুড়োলেন। সেদিনই তিনি বন্ধু হরিনাথকে বললেন, আমার খুব ইচ্ছে করে তোর গুরুদেবের সঙ্গে একবার সঙ্গত করি।

হরিনাথ বলেন, বাজাতে তুই ঠিকই পারবি, কিন্তু প্রস্তাবটা আমার করা ঠিক হবে না। তবে ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাধ্যমে কথাটা পাড়া হল অঘোরনাথের কাছে। অঘোরনাথ সম্মত হলেন এবং পরদিন বাদককে আসতে বললেন তাঁর বাড়িতে। অনেক আশা বুকে নিয়ে লালচাঁদ তাঁর নিজস্ব মাদলটি ঘাড়ে করে এসে উপস্থিত হলেন অঘোরনাথের ভদ্রাসনে। কারণটা জানি না, বোধকরি লালচাঁদের বয়সটা দেখেই অঘোরনাথ ঘোষণা করলেন, সেদিন

তাঁর গান গাইবার মেজাজ নেই। লালচাঁদ মর্মাহত হলেন। যাই হোক, পরদিন পুনরায় পাখোয়াজ ঘাড়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন আসরে, কিন্তু সেদিনও চক্রবর্তীমশায়ের গান গাইবার মেজাজ হল না। তৃতীয় দিনে পুনরায় এলেন লালচাঁদ, কিন্তু আবার নিরাশ হতে হল তাঁকে—অঘোরনাথ সেদিনও গাইলেন না।

'—দুত্তোর!' বলে বেরিয়ে এলেন লালচাঁদ! যে বিদ্যা এমনভাবে পরনির্ভর তা শিখবেনই না তিনি। উনি কি ভিখারী? কবে গায়কের মর্জি হবে তবে বাজাবার সুযোগ পাবেন! মুহূর্তে সিদ্ধান্তে এলেন—আর পাখোয়াজ নয়; এবার গান গাইবেন। কণ্ঠসঙ্গীত। ধরে পড়লেন বন্ধু হরিনাথকে, তুই আমাকে শেখা।

হরিনাথ হেসে বলে, দূর! হাত থাকলে পাখোয়াজ বাজানো যায়, কিন্তু গলা থাকলেই গান গাওয়া যায় না। বুঝলি? তোর যা হেঁড়ে গলা—

লালচাঁদ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, হাত থাকলেও পাখোয়াজ বাজানো যায় না হরি! তুই না শেখাস নাই শেখাবি! কিন্তু দেখে নিস গান আমি শিখবই।

এরপর কণ্ঠ-সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকলেন লালচাঁদ। পেশাদার ওস্তাদের কাছে শিখবেন। মনোবাসনার কথা জানালেন জননীর কাছে। তিনি বললেন, শেখ! টাকা দেব আমি, কিন্তু খবরদার! কর্তা না জানতে পারেন।

পুত্র পুনরুক্তি করেছিল: পাগল!

* * *

কিন্তু কর্তা জানতে পারলেন। অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে। কলকাতার সঙ্গীত ইতিহাসে সে একটি চিহ্নিত খণ্ডকাল! যেন বাস্তব ঘটনা নয়, নাটকের একটি দৃশ্য।

কলকাতায় তখন ফ্রীমেসনদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল—লজ এ্যাঙ্কর। সরকারী মহলের তা-বড় তা-বড় হোমড়া-চোমড়া, কিছু ব্যবসায়ী ও ইংরাজ বণিক ছিলেন তার সভ্য। লজের বার্ষিক অধিবেশনটি হত রাজকীয় ব্যবস্থাপনায়। খানাপিনা এবং ঐ সঙ্গে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা। সে-বৎসর লজের 'গ্র্যান্ডমাস্টার' অর্থাৎ চেয়ারম্যান বা সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত এ্যাটর্নী নবীনচাঁদ বড়াল।

লালচাঁদ তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ. এ. পড়েন। পিতা সংবাদ রাখেন না, পুত্র কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সের জনৈক য়ুরোপীয় ফাদারের কাছে নিয়মিত পিয়ানো শিখছেন। শিখছেন ইংরাজি গান। দুটি বিষয়েই তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। ফাদার বললেন, লালচাঁদ, তুমি এবার আমাদের 'লজ'-এর পার্টিতে গাইবে এবং বাজাবে।

লালচাঁদ প্রথমটা জানতেন না সে সভায় পিতৃদেব উপস্থিত থাকবেন, বস্তুত নবীনচাঁদই গ্র্যান্ড-মাস্টার। এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। পরে যখন ছাপানো কাগজ দেখলেন তখন বুঝলেন কী সর্বনাশ হতে চলেছে! কিন্তু উপায় কী? এতদূর অগ্রসর হয়ে কোন লজ্জায় তিনি সব কথা স্বীকার করেন? 'যা থাকে বরাতে' বলে লালচাঁদ চেপে গেলেন।

যথাসময়ে লজ-এর বার্ষিক অধিবেশন বসল। সেবার সভাপতি হয়ে এসেছেন স্বয়ং গভর্নর বাহাদুর। নবীনচাঁদ গ্র্যান্ড-মাস্টার, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সব তদারক করছেন, আর লালচাঁদ এক অন্ধকার কোনায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে আছেন। সহসা ঘোষকের একটা ঘোষণা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন নবীনচাঁদ—এর মানে?

ঘোষক বললেন, এবার আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান : পিয়ানোবাদন। বাজাচ্ছেন মাস্টার লালচাঁদ বড়াল।

লালচাঁদ বড়াল! তার মানে? হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই। অপরিচিত কেউ নয়। সভাস্থলের একান্তে রাখা ছিল প্রকাণ্ড একটি গ্র্যান্ড-পিয়ানো। লালচাঁদ টুলের ওপর বসে সুরের ঝঙ্কার তুললেন। কয়েক মিনিটের ভেতরেই তিনি শ্রোতৃদলের হৃদয় জয় করে ফেললেন অপূর্ব দক্ষতায়, সুনিপুণ আঙুলের কারুকার্যে। ব্যতিক্রম শুধু একজন। তিনি স্তম্ভিত!

বাজনা শেষ হতেই করতালি ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সভাগৃহ। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। গভর্নর-পত্নী নবীনচাঁদকে কাছে ডেকে বললেন, ইওর স্‌ন? হাউ স্‌প্লেন্ডিড। খুব যত্ন নিয়ে শিখিয়েছেন তো!

নবীনচাঁদের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল!

ঘোষক বললেন, এবার ইংরাজি সঙ্গীত—গাইছেন একই শিল্পী।

লালচাঁদ একটি ইংরাজি সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন। এবারও করতালিধ্বনিতে সভাকক্ষ ফেটে পড়ার উপক্রম করল। চীফ-জাস্টিস্ নবীনচাঁদকে বললেন, 'এভরিওয়ান অব আস ইস এনভিয়াস্ অব্ ইউ, বড়াল!—[আজ সবাই তোমার সন্তানভাগ্যকে ঈর্ষা করছে বড়াল।]

এবারও জবাব দিতে পারেননি নবীনচাঁদ।

সভার শেষে আবার একটি দুর্ঘটনা। উদ্যোক্তারা কী যেন বলাবলি করে স্বয়ং গভর্নর বাহাদুরের কাছে এসে একটা দরবার করলেন। শিরঃসঞ্চালনে গভর্নর সম্মতি জানালেন। ঘোষক এগিয়ে এসে বললেন,—তরুণ ভারতীয় বাদক ও গায়ক লালচাঁদ বড়ালের অসাধারণ সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে 'লজ' তাঁকে ঐ পিয়ানোটি উপহার দিতে ইচ্ছুক। লজের তরফে স্বয়ং সম্মানিত প্রধান-অতিথি গভর্নর বাহাদুর এবার সেটি উপহার দিচ্ছেন।

করতালি! করতালি! আর করতালি। লালচাঁদ বারে বারে 'বাও' করছেন। অনুষ্ঠান শেষে পিতাপুত্র বাড়ি ফিরলেন একই গাড়িতে।

সমস্ত পথ নবীনচাঁদ বিস্ফোরণ-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো বসে আছেন। মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধ কলকাতাকে সচকিত করে ওয়েলার ঘোড়া ছুটেছে চৌরঙ্গী থেকে বউবাজারে। পিতাপুত্র মুখোমুখি। কেউ কথা বলছেন না। লালচাঁদ চোরাদৃষ্টিতে এক-একবার চেয়ে দেখছেন বাপের দিকে। বাড়ির কাছাকাছি এসে নবীনচাঁদ প্রথম কথা বললেন, কোথায় শিখেছিস এসব? ঐ বাজনা আর গান?

আয়ত দুটি চোখ পিতার দিকে মেলে লালচাঁদ অকপট সত্যভাষণ করেন : কলেজে! সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে! একজন ফাদারের কাছে!

দারুণ অবাক হয়ে গেলেন নবীনচাঁদ: কলেজে! সেন্ট জেভিয়ার্সে আজকাল গান-বাজনা শেখানো হয়! আচ্ছা, আমি কালই দেখা করব রেকটারের সঙ্গে!

বাড়ি ফিরেই তলব করলেন পরের ঘরের মেয়েটিকে, ওগো শুনছ! তোমার ছেলে পিয়ানো বাজিয়ে গভর্নর বাহাদুরের কাছ থেকে পিয়ানো পুরস্কার পেয়েছে।

জননী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তাই নাকি? কই, লালু কই?

লালু তখন মুখখানা কোথায় লুকাবে ভেবে পাচ্ছে না।

নবীনচাঁদ বলেন, তুমিই ওর মাথাটি খাচ্ছ! শোন। কাল থেকে ও হতভাগাকে আর কলেজে যেতে হবে না। আমার সঙ্গে দপ্তরে যাবে।

লালচাঁদের জননী বুদ্ধিমতী—বোঝেন, এটা রাগের কথা। পুত্রের শিক্ষাদান বিষয়ে নবীনচাঁদ অত্যন্ত সচেতন।

*　　　*　　　*

বাঙলাদেশের সঙ্গীত ইতিহাসে লালচাঁদ বড়াল একটি ধূমকেতু। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম রেকর্ড করেন, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয় (১৯০৭)। এই ছয় বছরের ভেতর তিনি আঠাশখানি গানের রেকর্ড করিয়েছিলেন। প্রায় সবই খেয়াল, টপ্পা-খেয়াল-অঙ্গের, বাঙলা ভাষায়। মাত্র দুটি ছিল কীর্তন, যা তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত : 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব' এবং 'যমুনে! তুমি এই কি সেই যমুনে প্রবাহিণী।' দুখানি হিন্দী গান, বাকি চব্বিশখানি—সিন্ধু, বেহাগ, আলাইয়া, কাফি, রামকেলী, বাগেশ্রী, শঙ্করা, ভূপালী, খাম্বাজ ইত্যাদি।

লালচাঁদ ঐ পাঁচ-সাত বছরের জন্য ছিলেন বাঙলাদেশে অবিসংবাদিত গানের রাজা! রেকর্ড কোম্পানির ব্যবসায়ে ব্যালেন্স-শীটকে তিনি পালটে দিয়েছিলেন—কিন্তু নিজে এক কপর্দক দক্ষিণা নেননি। লালচাঁদ যে আসরে উপস্থিত থাকেন সেখানে সবাই তাঁর গান শুনতে চায়। একবার একটি আসরে তিনি আবির্ভূত হতেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অমনি হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। সে আসরে অঘোরনাথ চক্রবর্তীও উপস্থিত। লালচাঁদের গান শেষ হলে সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আশীর্বাদ করলেন। লালচাঁদ সহাস্যে বললেন, আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার জন্যই আমি গায়ক হয়েছি, না হলে মার্দঙ্গিক হবার কথা আমার।

অঘোরনাথ বলেন, কী রকম?

লালচাঁদ অকপটে সব কথা বলে গেলেন।

লালচাঁদ পিতার সঙ্গে টেম্পল চেম্বার্সেও যেতেন; কিন্তু পাঁচটা বাজলেই উঠে পড়তেন। নানান আসরে তাঁর আমন্ত্রণ থাকত। নবীনচাঁদ একাই অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে কাজ করতেন।

লালচাঁদের অকালমৃত্যুতে, বলাবাহুল্য, প্রচণ্ড শোক পেয়েছিলেন নবীনচাঁদ।

নানান ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন খবর এল, আফগানিস্থানের আমীর লালচাঁদের একটি রেকর্ড শুনে এত অভিভূত হয়েছেন যে, তিনি স্বকর্ণে তাঁর গান শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমীরের সচিব স্বয়ং এলেন ওঁদের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বাড়িতে। লালচাঁদ তখন শয্যাশায়ী; কিন্তু কেউই তখন আশঙ্কা করেনি এ তাঁর মৃত্যুশয্যা। লালচাঁদ আমীরের প্রতিভূকে জানালেন, তাঁকে বলবেন, একটু ভাল হয়েই আমি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব। এ তো আমার সৌভাগ্য!

কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি তাঁর জীবনে। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিন নাবালক পুত্র আর বৃদ্ধ নবীনচন্দ্রকে এ ধরাধামে রেখে একলা-চলার-পথে রওনা হয়ে পড়লেন একদিন।

নবীনচাঁদ সেই শূন্যগৃহে ঐ প্রকাণ্ড পিয়ানোটাকে দেখলেই বুকে একটা যন্ত্রণা বোধ করতেন। তাই ওঁর হিতৈষীরা শেষমেশ সেই পিয়ানোটাকে ওঁর চোখের আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিলেন—মণিরামপুরের বাগানবাড়িতে সেটিকে স্থানান্তরিত করা হল।

....দুনি আমাকে বলল, বাবার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে ছুটির দিনে নবীনচাঁদ লালচাঁদের তিন নাবালক পুত্রকে—অর্থাৎ আমার বাবা-জ্যেঠাদের—নিয়ে ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে সেই মণিরামপুরে চলে যেতেন। তিন বালক পৌত্রের সামনে খুলে ফেলতেন সেই গ্র্যান্ড পিয়ানোর ঢাকাটা। বলতেন, বাজা দেখি, কেমন পারিস?

কিষেণ, বিষেণ, রাইচাঁদ—আট-দশ বছরের বালক—অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। বৃদ্ধ নবীনচাঁদ নিজেই টুংটাং করে শব্দ তুলতেন। এতকাল যিনি সঙ্গীতের ধারে-কাছে যেতেন না সেই বৃদ্ধের শেষ জীবনের সম্বল ছিল ঐ আঠাশখানি রেকর্ড। নাতিদের খেলতে পাঠিয়ে একাই বসতেন মণিরামপুরের বাগানবাড়িতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। রেকর্ড চড়াতেন গ্রামোফোনে। একা একা শুনতেন একমাত্র পুত্রের আর্তি:

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।।
পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না
এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালো-বাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে পারস্য গালিচায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতেন কোটিপতি বৃদ্ধ নবীনচাঁদ। কেউ জানতে পারত না।

সাত

দুর্লভচন্দ্রের পরিণত বয়সের একটি ঘটনার কথা এবার বলি :

ইদানিং তিনি আর বিশেষ গানের আসরে যান না। বয়স হয়েছে সত্তরের ওপর। নিজগৃহে আপন-মনে সঙ্গীত-সাধনা করেন, শিষ্যদের শেখান। এই সময়ে ঘটল একটি ঘটনা।

উত্তরখণ্ড থেকে কলকাতায় এলেন দুই দিগ্বিজয়ী সঙ্গীত-কেশরী। সবাই দুভাইকে উল্লেখ করে শিবা-পশুপতিরূপে, যদিও পশুপতিসেবক মিশ্রই বড় ভাই—শিবসেবকের চেয়ে তিনি বছরতিনেকের বড়। দু-ভাই একসঙ্গে জুরি গান গাইতেন। দু-ভাই একটি বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ ঘরানার উত্তরসাধক। তিনপুরুষে কাশী ও নেপালখণ্ডে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। ওঁদের পিতামহ প্রমচ্ছ মিশ্র একবার

মহারাজা পতিয়ালার দরবারে চল্লিশ-দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার আসরে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়করূপে।

সেই শিব এবং পশুপতি এসেছেন কলকাতায়। কোনো এক সঙ্গীতের আসরে তাঁরা নাকি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন উপযুক্ত সঙ্গতকারের অভাবে তাঁরা তাঁদের কলাকৌশল সম্যক দেখাতে পারছেন না। বস্তুত সেদিন নাকি সেই সঙ্গতের আসরে নামকরা মৃদঙ্গবাদক কেউ উপস্থিত ছিলেন না—যাঁরা ছিলেন তাঁদের অপদস্থ করতে দু-ভাই ইচ্ছা করেই 'সম' পরিষ্কার করে দেখাচ্ছিলেন না; কখনো নয় মাত্রায় কখনো এগারো মাত্রায় এমন করে ছাড়ছেন যে মার্দঙ্গিক তালকানা হয়ে যাচ্ছিল। অথচ শাস্ত্রসম্মত বিচারে গায়ক যে বেতালা হচ্ছেন এমন কথা বলা যায় না, লয়ের হিসাবে তাঁদের ভুল ছিল না। ইচ্ছা করে এভাবে বাদককে অপ্রস্তুত করে দু-ভাই সবিনয়ে আহ্বায়ককে বলেছিলেন, কলকাতায় ভাল সঙ্গতকার নেই একথা কেন আগে জানালেন না বাবুজী, আমরা মার্দঙ্গিক সঙ্গে করে আনতাম।

বলাবাহুল্য অনেকেই ক্ষুব্ধ, অপমানিত হলেন। আসরের পরে তাঁরা যুক্তি করলেন—ঐ দুই সঙ্গীত-কেশরীর গর্ব খর্ব করতে হবে। তাঁরা তিন-চারজনে স্থির করলেন পরবর্তী আসরে তাঁরা এমন একজন মৃদঙ্গ-বাদককে সঙ্গত করতে বসাবেন যাঁর সঙ্গে তাল রাখতে ওরাই হিমসিম খেয়ে যাবে। সবাই একবাক্যে বললেন, এ-কাজ সম্পন্ন করবার মতো শিক্ষা আছে একজনেরই—শিবনারায়ণ দাস লেনের বৃদ্ধ মার্দঙ্গিক দুর্লভচন্দ্র। ওঁরা সদলবলে এসে হাজির হলেন বৃদ্ধের দরবারে।

সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শুনে ভট্টাচার্যমশাই বললেন, আমাকে মার্জনা করতে হবে বাবাসকল। আমি টুলো-পণ্ডিত—যজন-যাজন করি, চাল কলা-নৈবেদ্য খাই, আমি লড়াই করতে পারব না। মার্দঙ্গিক হিসাবে গায়ককে ছাপিয়ে যাওয়ার শিক্ষা আমি পাইনি। তেমন গুরুর কাছে 'নাড়া' বাঁধিনি আমি।

ওঁরা বললেন, তার মানে আপনি বলতে চান, কলকাতার মাথা হেঁট হল কি হল না তাতে আপনার কিছু যায় আসে না!

—না। তা বলিনি আমি। আমি বলতে চাই—সঙ্গীতের আসর কোনো দ্বৈরথ রণাঙ্গন নয়। বাদক আর গায়ক প্রতিযোগী নয়, তারা সহযোগী। একে অপরকে ছাপিয়ে যাবে না, একে অপরকে অনুসরণ করবে। দু'জনের যৌথ প্রচেষ্টায় রাগরূপ মূর্ত হয়ে উঠবে—প্রকৃতি ও পুরুষ যেভাবে সহযোগিতার দ্বন্দ্বে নতুন সৃষ্টিতে মাতে। বুঝলে? 'দ্বন্দ্ব'-শব্দটির দুটি অর্থ আছে। যে দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বসমাসের দ্বন্দ্ব তাকেই মানি আমি! দ্বন্দ্ব মানে লড়াই নয়।

সঙ্গীত-সাধকের এ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের 'দ্বন্দ্ব-সমাসে' ওঁরা তুষ্ট হলেন না। ওঁরা যে প্রথম দিনেই বুঝে নিয়েছেন বহিরাগত সঙ্গীত-অভিমানীদ্বয় সঙ্গীত-সাধক নয়, রাজসিক গীতযোদ্ধা। 'দ্বন্দ্ব' তাদের কাছে বিপরীত অর্থবহ, অনর্থবহ। তবু কিছুতেই বৃদ্ধকে রাজি করানো গেল না।

উপায়ান্তর হয়ে ওঁরা উপস্থিত হলেন আর একজন প্রখ্যাত মার্দঙ্গিকের কাছে—বিখ্যাত সুরকার দেবচন্দ্র বাগচীর ভ্রাতুষ্পুত্র সতীশচন্দ্রের কাছে। তিনি বললেন, পূর্বদিন আসরে আমিও ছিলাম। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি—শিব ও পশুপতি অন্যায় স্পর্ধা প্রকাশ করে কলকাতার সঙ্গীত-সমাজকে অপমান করেছেন। আমি ওঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতে রাজি আছি; কিন্তু আসরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিচারকদের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাঁরা বিচার করে রায় দেবেন—ত্রুটি কার, গায়কের না বাদকের।

সেইমতোই ব্যবস্থা হল। কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের ভারত সঙ্গীত সমাজে আয়োজন করা হল জলসা। সঙ্গীতাচার্য বিশ্বনাথ রাও এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বসলেন বিচারকের আসনে। বহু সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত আছেন সভায় এবং এসে বসেছেন পাখোয়াজ-রাজ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তালাধ্যায়ের গুরু দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য।

গান শুরু করলেন শিব-পশুপতি। জুড়িতে তাঁদের আলাপচারীর পর্যায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু চৌতালে গান আরম্ভ হতেই গণ্ডগোল শুরু হল। প্রথম আবর্তের শেষে সতীশচন্দ্র যেই পাখোয়াজে 'ধা' মারলেন অমনি একযোগে দু-ভাই বলে উঠলেন, এ ক্যা হুয়া! বাবুজীকা 'ধা' তো মোকামমে পৌঁছতাই নহি!

সতীশচন্দ্র শান্ত নির্বিরোধী স্বভাবের মানুষ। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন 'ধা ঠিক মোকামেই

পৌঁছেছে।' গায়করা তা মানতে রাজি নন। তখন 'ধা' নিয়ে যে ধাঁধার সৃষ্টি হল তার আর সমাধান হয় না! ক্রমে শুধু শিল্পীদের মধ্যে নয়, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যেও মতান্তর থেকে মনান্তর শুরু হয়ে গেল। সতীশচন্দ্র বারে বারে বিচারকদ্বয়ের দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা কোনো মতামত দিচ্ছেন না—নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন।

ওদিকে মনান্তর থেকে রীতিমত বচসা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

তখন নগেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, সতীশবাবুর সঙ্গত শাস্ত্রানুসারে নির্ভুল হয়েছে। বাঙলাদেশের এই রীতি সর্বজনস্বীকৃত। কাশীর শিউসহায় মিশ্র, কান্তাপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় ধ্রুপদীয়া এই রীতিতেই গেয়ে গিয়েছেন, কোনদিন কেউ প্রতিবাদ করেননি।

পশুপতি ও শিবও তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বললেন, আমরা নেপাল দরবারে, কাশীতে বড় বড় আসরে যে রীতিতে গেয়েছি সেই প্রথা অনুসারেই এখানে গাইছি। আইয়ে না আপ্ হম দোনা সম্-বিসম্-অনাঘাত দেখা দুঙ্গা! বাবুজিকা ঠেকামে গলদ্ হ্যায়।

সতীশচন্দ্র দুর্লভকে বললেন, বিচারকরা তো কিছু বলছেন না, আপনি কিছু বলুন?

বৃদ্ধ বললেন, আমি আর কী বলব বাবা সতীশ? এঁরা তো গান গাইতে আসেননি, এসেছেন লড়াই করতে। তা আমি বুড়োমানুষ......

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ওদিকে কলহ ও গোলমাল তখন চরম পর্যায়ে উঠেছে। একদল শ্রোতা পাখোয়াজীর প্রতি অপমানকর একটি বাক্য শুনিয়ে দিলেন। তখনই কয়েকজন আস্তিন গোটালেন। বোঝা গেল তর্কটা হাতাহাতিতে নিষ্পন্ন হবে।

একটা পালাও-পালাও রব উঠল।

ঠিক তখনই ঘটল একটা ঘটনা। মল্লভূমের মাঝখানে লাফ এসে দাঁড়ালেন এক বিরাটদেহী ব্যক্তি। হুংকার দিয়ে উঠলেন : এটা হচ্ছে কী?

মুহূর্তের নীরবতা। দীর্ঘদেহী বললেন, আমি জানতে চাই, এটা গানের আসর না লড়াইয়ের আখড়া? এ্যাঁ?

কেউ জবাব দেয় না। তিনি আবার বলেন, জবাব দিলেন না কেউ দেখছি। শুনুন, দু-রকম ব্যবস্থাই আছে। যাঁরা গান শুনতে চান বসে পড়ুন, আর যাঁরা লড়াই করতে চান তাঁরা আসর ছেড়ে আমার সঙ্গে ঐ মাঠে এগিয়ে আসুন।

সভায় তখন সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। গুটিগুটি সবাই একে একে বসে পড়ছে।

শিবা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে বলেন, ইয়ে কোন হ্যায় জী?

—যতীন্দ্রচরণ গুহ! তবে সে নামে কেউ ওঁকে চেনে না। ওঁর ডাকনাম 'গোবরবাবু'। লাইট-ওয়েট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর! আমেরিকা থেকে জিতে ফিরেছেন।

গোবরবাবু শিবা-পশুপতির দিকে ফিরে বললেন, আপ্ শুরু কিজিয়ে ফিন! ম্যয় খাড়া হুঁ। ম্যয় দেখ লুঙ্গা কি 'ধা' ঠিক ঠিক মোকামমে পৌঁছে যায়!

ভয়ে ভয়ে শুরু করলেন দু'জন চৌতালে। সতীশচন্দ্র সঙ্গত শুরু করলেন। মাজায় হাত দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লাইট-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান গোবরবাবু। তাঁর দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে শিবা-পশুপতি স্বীকার করলেন 'ধা' এখন ঠিক মতো মোকামে পৌঁছে যাচ্ছে।

অর্থাৎ রদ্দা মারার প্রয়োজন নেই।

আট

কিন্তু এভাবে কুস্তিগীরের পাহারায় তো সঙ্গীতের আসর হয় না।

আবার কিছুদিন পরের কথা। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সঙ্গীত-সমাজে আবার আসর বসেছে। সেবারও দুর্লভচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করতে এলেন কয়েকজন। যেদিন আসর হবে সেদিনই সকালবেলা ওঁরা এলেন শিবনারায়ণ দাস লেনে।

দুর্লভচন্দ্র তখন নামাবলী গায়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে যজমানের বাড়ি চলেছেন। পথের মাঝেই দেখা হল। ওঁরা বললেন, সেবার আপনি বাজাতে রাজি হননি। এবার কি আপনি রাজি হবেন?

দুর্লভচন্দ্র বললেন, না। ওঁরা যে রীতিতে গাইছেন সেই রীতিতেও আমি বাজাতে পারি; কিন্তু বাজাব না। ওঁরা গান গাইতে আসেননি, এসেছেন ওস্তাদী দেখাতে। ওর মধ্যে আমি নেই।

—বেশ! না বাজান, নাই বাজালেন। আসরে উপস্থিত থাকবেন কি?

—আমি তো এখন পুজো করতে যাচ্ছি বাবাসকল। পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত উপবাসী থাকি। সন্ধ্যাবেলায় একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। বুঝতেই তো পার। বয়স তো কম হল না।

এঁরা কিন্তু নাছোড়বান্দা—সে হবে না ভট্টাচার্য মশাই। আপনাকে বাজাতে তো আর হচ্ছে না। আসতে আপনাকে হবেই। আমরা এসে গাড়ি করে নিয়ে যাব।

দুর্লভ বললেন, গাড়ি-ফাড়ি লাগবে না। ঠিক আছে, পূজা সেরে আমি সোজা যজমানের বাড়ি থেকেই আসরে চলে যাব।

* * *

সন্ধ্যার পর আসর শুরু হল। আসরে প্রবেশ করলেন উপবাসী দুর্লভচন্দ্র। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি উত্তরীয়, বেলের আঠায় মাজা ঋগ্‌বেদী পৈতেটা তার ফাঁক দিয়ে দেখা যোচ্ছে। উত্তরীয়ের তলায় কোনো পিরান নেই। ভ্রূমধ্যে যজ্ঞভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক। উনি যখন আসরে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে তিলধারণের ঠাঁই নেই। ভূকৈলাসের বড়তরফের কর্তা ওঁকে দেখতে পেয়ে আহ্বান করেন, আসুন, আসুন, ভট্টাচার্য মশাই—এগিয়ে এসে বসুন। অনেকদিন পর পদধূলি দিলেন।

অনেকেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিলেন। বৃদ্ধ বসে পড়লেন আসরের সামনের দিকে। শিবসেবক ও পশুপতিসেবক দুই ভাই বসেছেন আসরের কেন্দ্রবিন্দুতে। মাথার ওপরে জ্বলছে দুটি ন-মুখো কারবাইড গ্যাসের ঝাড়। দুজনেরই দরবারী সাজসজ্জা। ঊর্ধ্বাঙ্গে সিল্কের পাঞ্জাবী, পাঁচ-আঙুলে পাঁচটি করে রত্নাঙ্গুরীয়। কে একজন তাঁদের সঙ্গে দুর্লভচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিল—ইনিই বিখ্যাত মার্দঙ্গিক শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য। মুরারীমোহনবাবুর শিষ্য।

দুই-ভাই জোড়াতালি দেওয়া নমস্কার ঠুকে দিলেন। শিবপ্রসাদ বললেন, মুরারীবাবুকে নাম সুনা হ্যয় হম দোনো।

যেন, দুর্লভচন্দ্রের নাম শোনার প্রশ্নই ওঠে না।

শুরু হল গান। সংক্ষেপে আলাপচারী সেরে গান আরম্ভ করলেন। দুর্লভেরই এক শিষ্য সঙ্গত করছিলেন। মিনিট দুই-তিন পরেই দেখা গেল গায়ক বিরক্তি প্রকাশ করছেন। গান থামিয়ে সঙ্গতকারীকে তাল বুঝিয়ে দিচ্ছেন—কী তাল, কী বোল! কিন্তু বারেবারেই তাঁরা বিরক্তি প্রকাশ করছেন। মার্দঙ্গিক গলদঘর্ম হয়ে পড়ছেন ক্রমশ। আসর আর জমছে না। শিবা বললেন, বাবুজী, আপ শ্রেফ্ ঠেকা দেতে চলিয়ে—বজানেকা কোই জরুরৎ নেহি!

হঠাৎ নাসারন্ধ্র দুটি ফুলে উঠল উপবাসী ব্রাহ্মণের। চোখ দুটি ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। বিনা-বাক্যব্যয়ে তুলে নিলেন মৃদঙ্গটা শিষ্যের হাত থেকে। বললেন, নাও, তোমরা ফিরে ফিত্তিসে শুরু কর।

দুর্লভচন্দ্রের হিন্দী শুনে হেসে ফেলেছে গায়ক। তৎক্ষণাৎ কিন্তু গান শুরু করল ওরা।

বারাণসীর এই মিশ্র-ঘরানা তালাধ্যায়ে ভারতের প্রায় শীর্ষস্থানীয়। তার মধ্যে এই দুই ভাইয়ের এক তির্যক বিলাস তাল-লয়ের কূট কৌশলে সঙ্গতকারীকে বেইজ্জৎ করে আত্মসন্তুষ্ট হওয়া। দুর্লভচন্দ্র যখন মেরুদণ্ড সোজা করে মৃদঙ্গ ক্রোড়ে বসলেন তখন ওরা নতুন করে গান শুরু করল। তালাধ্যায়ের সম্রাট দুর্লভচন্দ্র অচিরে বুঝে ফেললেন গায়ক ইচ্ছা করে 'সম' পরিষ্কার করে দেখাচ্ছেন না। এক-একবার এক-এক স্থানে ছাড়ছেন—কখনও নয় মাত্রায়, কখনও এগারো মাত্রায়। এটা নিশ্চয় রীতিবহির্ভূত, কিন্তু ব্যাকরণ-বহির্ভূত তাকে বলা চলে না। অঙ্কের হিসাবে লয়ের সংস্থাপন ত্রুটিহীন। দুর্লভচন্দ্রও চুলচেরা হিসাবে ঠিক-ঠিক জায়গায় 'ধা' মারতে লাগলেন!

গায়ক বুঝলেন, ফাঁকচালে এ দাবাড়ুকে মাৎ করা যাবে না—তাই শুরু করলেন গতির প্রতিযোগিতা। তারপর দীর্ঘ দেড়ঘন্টাকাল সঙ্গীত ও সঙ্গতের এক দুরন্ত সার্কাস! যেন ট্রাপিজের খেলা। গায়ক মার্দঙ্গিককে বার বার শূন্যে নিক্ষিপ্ত করছেন, আর বাদক মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ সমের মাথায় ধরে ফেলছেন অপরদিকের রজ্জু—সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিচ্ছেন—'ধা'! বাগেশ্রী আলাপের

বাগিচাও নেই, শ্রী-ও নেই—শ্রোতৃদল যেন আসরে গান শুনতে আসেননি, তাঁরা যেন ঊর্ধ্বমুখ দর্শক—ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের কখন পদস্খলন হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

সে কী কসরৎ! দ্রুত-অতিদ্রুত আরও দ্রুত তেহাই চলেছে—কিন্তু 'ধা' মোকাম ছেড়ে একতিল সরছে না! কণ্ঠ কোনোক্রমেই যন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারল না। মৃদঙ্গ যেন দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম্-দ্রিম্ বোল তুলে গায়ককে বলছে : ছোট, ছোট আরও জোরে, আরও-আরও জোরে—তা বলে আমাকে পেছনে ফেলতে পারবে না, আমি তোমার কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সাথে সাথে আছি।

শেষ সমে এসে থামল সঙ্গীত। ঠিক খণ্ডমুহূর্তে বোল তুলে মৃদঙ্গও স্তব্ধ হল।

পকেট থেকে সুগন্ধী রেশমী রুমাল বার করে শিবা-পশুপতি তখন কপালের ঘাম মুছছেন।

দুর্লভ তাঁর পাখোয়াজটি ফরাশের ওপর নামিয়ে রেখে কাশীর মিশ্রভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করে তাঁর নিজস্ব খাজা-হিন্দীতে বললেন : কী বাবা ত্রৈরাশিক-ভগ্নাংশ কষনেবালা! তোমাদের কড়াক্রান্তির হিসাব ঠিক ঠিক ট্যাক্‌মে উঠা হ্যায় তো? অঙ্ককা ক্লাস খতম?

দু-ভাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না বৃদ্ধ কী বলছেন।

—মগজ্‌মে স্যাঁদায়া নেই? শোন বাবা জোড়া-বলিবর্দ! বাগেশ্রী রাগ নয়, যা শোনালে তাকে বলতে পার্তা 'বাঘের বিশ্রি বদ্‌রাগ'! সঙ্গীতের চাঁপাকলা দে-কে যত ইচ্ছে বাঘের বিশ্রি পিণ্ডি চটকাও—হাম থোড়াই কেয়ার কর্তা। সমঝা?

কথা না বুঝলেও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ধমকের সুরটুকু ওঁরা বুঝে নিয়েছিলেন। যুক্তকরে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিলেন নিজ অপরাধের—প্রকাশ্য আসরে। বললেন, হাম্ দোনোকে কসুর মাফি কিয়া যায় পণ্ডিতজী। হ্যাঁ—অব্ হম্ মান্ লী কি কলকাত্তামে ভি হ্যাঁয় এক উস্তাদ!

তবু রাগ পড়ল না বৃদ্ধের। বললেন, শালুক চিন্‌তে পারা হ্যায় গোপালঠাকুর! তোদের 'ওস্তাদী' খেতাব ছাড়া আমার ভাত হজম নেহি হোতা, না? তোদের ওস্তাদীতে হম্ 'ইয়ে' করতা! সমঝা?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা। দুর্লভচন্দ্র তখন শিষ্যের দিকে ফিরে বলেন, ও সতীশ, এঁদের বুঝিয়ে দাও তো ব্যাপারটা। হিন্দী আমার আসে না।

শিবা-পশুপতি সতীশচন্দ্রের দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁ, কহিয়ে তো? ক্যা বোলা পণ্ডিতজীনে?

সতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান। পশ্চিমে বহুদিন ছিলেন। বাগেশ্রীর পিণ্ডি চটকানোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, পণ্ডিতজীনে কহা কী গানা তো আপ দোনো আচ্ছাই গায়া হ্যঁয়, লেকিন বাৎচিতোঁমে তো গলদ হ্যয় জরুর।

—কেঁও? কেয়া কসুর হুয়া হমকো?

—সোচিয়ে না—'কসুর' কা ক্যা সওয়াল? আপ্ ভি গানা নেহী গাতে, ম্যায়ভি বজানা নেহি বজাতা। হম্-দোনো তো সিরিফ্ যন্তর হ্যঁয় উস্তাদজী! গানেওয়ালী ঔর বাজানেওয়ালী তো ছিপাকে বৈঠি হ্যঁয়—উন্‌কি তো দেখাই ন যাতি!

নাটমন্দিরের অপরপ্রান্তে মৃন্ময়ী প্রতিমার দিকে হাত তুলে দেখান সতীশচন্দ্র।

শিবা-পশুপতিকে দ্বিতীয়বার স্বীকার করতে হল তাঁদের কসুর। বটেই তো! শুধু মৃদঙ্গটাই তো নয়—মৃদঙ্গবাদকও যন্ত্র, গায়কও যন্ত্র,—যন্ত্রী আছেন অলক্ষ্যে!

নয়

মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র যে-কালের মানুষ সেই কালকে আমি দেখিনি, যে-জগতের মানুষ সেই জগতের সম্বন্ধে আমার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। অভিধানের বাইরে মৃদঙ্গ যন্ত্রটাকেই বা কবার দেখেছি? নিতান্ত ঘটনাচক্রে তাঁর জীবন-ইতিহাস সন্ধান করতে বসেছিলাম—লাভ বৈ লোকসান হয়নি তাতে। ধ্রুপদ-ধামার আজ প্রায় ডোডোপাখীর সমগোত্রীয়। বৎসরান্তে কোনো কোনো মার্গসঙ্গীতের সম্মেলনীতে দেখি জনমণ্ডলীর এক অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এখনও এই ক্ষীয়মাণ সঙ্গীতধারায় তৃষ্ণা মেটাতে আসেন। তাহলে সেই উজাড়-হয়ে-যাওয়া সঙ্গীত-পাগলদের নিয়ে আজ কেন আলোচনা করছি? তার কারণ এ নয় যে, লালচাঁদ গ্রামোফোন কোম্পানীর ব্যালেন্স-শীটকে পালটে লিখেছিলেন, তার কারণ এ নয় যে 'অমৃতনাথ' সর্বভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তার কারণ এ নয় যে

দুর্লভচন্দ্র কোনো গর্বোদ্ধত পণ্ডিতম্মন্যের দর্পচূর্ণ করে কলকাতার সঙ্গীতসমাজকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তার কারণ এই যে, এঁরা সংসারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সুরের তরণী বেয়ে অধরাকে ধরতে বেরিয়েছিলেন, তার কারণ এই যে, জাগতিক লাভ-ক্ষতির বিচার না করে এঁরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াতীত লাভ করবার অতন্দ্র-সাধনায় একনিষ্ঠ ছিলেন। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তাঁদের সেই নিরলস ধ্যানের সাধনাকেই আমরা প্রণতি জানাই।

*　　　*　　　*

মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্রের জীবন যেমন বিস্ময়ের তাঁর জীবনাবসানটিও তেমনি অদ্ভুত। বস্তুত বাস্তব জীবন-কাহিনী বর্ণনা না করে আমি যদি এখানে মন-গড়া গল্পকথা লিখতে বসতাম, তাহলে এই শেষ দৃশ্যটি রচনা করার পূর্বে হয়তো নিজেই থমকে যেতাম। ভেবে দেখতাম—পাঠক আমাকে অতি-নাটকীয়তা দোষে অভিযুক্ত করবেন কি না। মহাকাল অতি-নাটকীয়তাকে থোড়াই কেয়ার করেন! তাই পার্থিব নাট্যকার যেখানে সশঙ্ক-সঞ্চারী, মহাকাল সেখানে অনায়াস ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেন। সেই মহানাট্যকার দুর্লভ-নাটকের শেষদৃশ্যের পরিকল্পনা করলেন পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতদরদী এবং অল বেঙ্গল-মিউজিক কনফারেন্সের স্রষ্টা ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ মশায়ের অট্টালিকায়। তারিখটা : ২৪ শে আশ্বিন ১৯৩৮।

ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, খাশ্-গেলাসের কাল গিয়েছে—এসেছে বিদ্যুৎ। বহুদিন পরে বিরাট আয়োজন করেছেন ঘোষমশাই। কলকাতার তো বটেই, দেশ-দেশান্তরের যাবতীয় সঙ্গীতাচার্য সমবেত হয়েছেন সে আসরে। আসছেন বিখ্যাত পাখোয়াজী শঙ্কররাও ওস্তাদ, গৌরচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর, ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অযোধ্যারাম পাঠক। নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়ও আসছেন। যথারীতি আমন্ত্রণ পেলেন ভট্টাচার্য-মশাই। তখন তিনি ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ। ইদানীং আর সঙ্গীতের আসরে যান না; জরাগ্রস্ত হাত দুটি এবার বিদায় চাইছে! শিষ্যরা এখনও আসে, গান-বাজনার আসর বসে নিজের ভদ্রাসনেই। উনি বাজান না, শোনেন। কিন্তু এমন একটি আসরে যাবার নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারেন তিনি? পরিবারস্থ সবাই বারণ করেছিল, উনি শোনেননি।

বহুদিন পরে মৃদঙ্গাচার্য 'দুলীবাবু'কে দেখে সে-আমলের সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নবীনযুগের অনেক সঙ্গত-দরদী আছেন, যাঁরা দুর্লভচন্দ্রের সুখ্যাতিই শুনেছেন, বাজনা শোনেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওঁকে অনুরোধ করল একটু হাত খেলাতে—ওঁর আঙুলগুলোও নিশপিশ করছিল—কিন্তু শিষ্যেরা রাজি হলেন না।

*　　　*　　　*

রাত্রির মধ্যযাম। আলাপ শুরু করলেন তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। ললিত হলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীশিষ্য মহীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। ললিত শুরু করলেন মিয়া-কি-মল্হারে—'হে আদি অন্ত্!' উস্তাদোঁ কি উস্তাদ মীর মহম্মদ গাজি মিয়া তানসেনজীর প্রিয় রাগিণী। আর স্থির থাকতে পারলেন না দুর্লভচন্দ্র! পার্শ্ববর্তী শিষ্যের হাত থেকে যেন ছিনিয়ে নিলেন মৃদঙ্গটা। পরিচিত হাতের স্পর্শ পেয়ে মৃদঙ্গ শিউরে উঠল—'ধা'!

একটা হর্ষোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ আসরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঢেউ তুলেই মিলিয়ে গেল। যেমন রাগ, তেমনি গায়ক, তেমনি বাদক। জবাব নেই! চৌতালে বোল তুলে মৃদঙ্গ ছুটতে শুরু করল গায়কের পিছু-পিছু—তেহাইয়ের ঘুলঘুলিয়ায় যেন দ্রুতছন্দের নূপুর-ঝংকৃত চরণের লুকোচুরি। ক্রমে দ্রিমিদ্রিমি বোলের ভেতরেই হল মেঘসঞ্চার—চন্দ্রাতপে ঘেরা আলোকোজ্জ্বল আসর যেন ভাবরাজ্যের জলদবিস্তারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—যেন আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে পুষ্করবংশাবতংসের আবির্ভাব ঘটল আসরে! ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক। ধারা শ্রাবণে সুরের ধারায় ভেসে গেলেন সবাই! নবীন সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রবীণ মার্দঙ্গিক একই খণ্ড-মুহূর্তে এসে পৌঁছলেন শেষতীর্থে! সমস্ত আসর হা-হা করে মাথা ঝাঁকালো সমের মাথায়।

কেউ জানতে পারেনি। কেউ নজর করেনি। জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণের স্নায়ুতন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার বাজতে শুরু

করেছে তা মল্‌হার নয়—দীপক! বৃদ্ধের রগের শিরা-দুটি ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। ললিতবাবু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি মাথায় নিয়ে বললেন, আজ আমার জন্ম সার্থক।

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করলেন দু-হাত তুলে। ললিতের হাত-দুটি ধরে কানে কানে বললেন—যেন অত্যন্ত গোপন কথা : ললিত, তুমি পেয়েছ!

'ললিত, তুমি পেয়েছ!'—ব্যস্, আর কিছু নয়! তবু দু-চোখ জলে ভরে এল ললিতের। দুটি হাত জোড় করে বললেন, তাহলে আমাকে আশীর্বাদ করুন! আমার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করুন।

—বল ললিত, বল—কী চাও? আজ আমি দাতাকর্ণ!

—দরবারী কানাড়া ধরব এবার। আপনাকে সঙ্গত করতে হবে।

নামিয়ে রাখা মৃদঙ্গটা কোলে তুলে নিলেন আবার—যেন বীণকার নারদের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসলেন আদি-মার্দঙ্গিক লম্বোদর গজানন!

গভীর নিশীথ। সমস্ত আসর তন্ময়। শুরু হল ওস্তাদের মার—মেজাজী রাগ, সুর ফাঁকতালে দরবারী কানাড়া : বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ!

নীল শিরাওঠা দুটি লোলচর্ম হাত নতুন করে বোল তুলল মৃদঙ্গে। সঙ্গীত দ্রুতলয়ে ছুটছে সুরলোকের শিখর থেকে শিখরে—লাফে লাফে লাফিয়ে উঠছে, যেন রক্তচাপ যন্ত্রে পারদ-সঙ্কেত। উপমা নয়, বাস্তবেই তা উঠছিল অলক্ষ্যে—কেউ জানতে পারেনি, কেউ নজর করেনি।

সাতটি সুর সাতটি পোষা পাখির মতো ডাকছে নবীন-যুগের গায়ক ললিতমোহনের কণ্ঠে—যেন উদয়-ভানুর সাতটি রঙের বর্ণালী। জবাবে বলিরেখাঙ্কিত দশটি আঙুল মৃদঙ্গের মঞ্চভূমে নৃত্যের তালে তালে বোল তুলে ছুটে চলেছে—যেন অস্তসূর্যের শেষ রক্তিম আশীর্বাদ! সারা আসর তন্ময় হয়ে গিয়েছে, 'বুঁদ' হয়ে গিয়েছে, 'ভোঁ' হয়ে গিয়েছে, 'না' হয়ে গিয়েছে!

হঠাৎ, যাঁরা সামনের দিকে বসেছিলেন তাঁদের লক্ষ হল—ভট্টাচার্যমশাই শুধু বাঁ হাতে বাজাচ্ছেন! ডান-হাত স্থির হয়ে গিয়েছে। কেন? এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, দুর্লভচন্দ্রের দক্ষিণাঙ্গ তখন সম্পূর্ণ বিবশ হয়ে গিয়েছে—পক্ষাঘাতের নিষ্ঠুর আক্রমণে। অসীম যন্ত্রণা সর্বদেহ দিয়ে সহ্য করছেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—শুধু পাছে তাল কাটে, পাছে আঁচড় লাগে সুরলক্ষ্মীর গায়ে তাই সেই দৈহিক যন্ত্রণাকে মনোবলে অস্বীকার করে একহাতে ঠেকা দিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ নজর পড়ল গায়কের। বললেন—এ কী?

পরমুহূর্তেই অন্তিম শয়নে ঢলে পড়লেন মৃদঙ্গাচার্য। যেন শেষ প্রণতি জানাচ্ছেন সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। আমরা হলে বলতুম, করোনারি থ্রম্বোসিস। ওঁরা বললেন, সন্ন্যাস!

ঝুঁকে পড়লেন ললিতবাবু : কষ্ট হচ্ছে?

মৃত্যুর শেষ-সীমান্ত থেকে সাড়া দিলেন দুর্লভচন্দ্র। কথা বললেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন, থেম না!

অনুরোধ নয়! আদেশ!

থামতে পারলেন না ললিতমোহন। গাইলেন শেষ কলি : বাজত ঝাঁঝ মৃদঙ্গ!

মৃদঙ্গ তখন বাজছে না কিন্তু। থেমে গিয়েছে!

থেমেছে কি? দুলিবাবুর ক্রোড়চ্যুত আজন্মসাথী সেই যন্ত্রটা—সেই 'মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার'—সে থামেনি। সে অস্ফুটস্বরে বলছে : Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter! Therefore, ye soft Pipes! Play on!

সঙ্গীত-সাধকের এমন মৃত্যুই একান্ত কাম্য—কী বলেন? এমন মৃত্যুই তাঁকে করে তোলে মৃত্যুঞ্জয়ী। এর চেয়ে বড় সম্মান কোন শিল্পী কবে কামনা করেছেন? কীট্‌স-এর ভাষায় : Let me have music dying and I seek no more delight!

(পঞ্চাশোর্ধ্বে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

স্নেহধন্যা

উৎসর্গ

আমার যাবতীয় কিশোরী পাঠিকাকে। তাই বলে দাদুভাইদের কাছে এ বই নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া রিন্টি, নীনা, চিকাই, রাই, রীনু, উইনি, কুর্চি, টুপ্‌সি, টুয়া, রিম্, রেশমী, আর খুদে লায়েলী-বেগমকে তো বটেই।

গ্র্যান্ডপা-দাদু-তথা নানাজি

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি 2002

হ্যাঁ, আমিও তাঁকে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্য থেকে। দিনের পর দিন। তাঁর সামনে বারে বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ছোটবোনের মত, মেয়ের মত—কখনো সুসজ্জিত সামরিক বেশে, কখনো কর্দমাক্ত ধূলিমলিন চীরবসনে সর্বাঙ্গ ঢেকে, আর একবার,—হ্যাঁ, রাজরানীর পোশাকে। সেটা একেবারে শেষ দিন। সেদিন আমার কণ্ঠে ছিল হীরকখচিত শতনরী, সর্বাবয়বে ছিল কেয়ূর, কঙ্কণ-কুণ্ডল আর রতনচূড়, মাথায় ছিল মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট। হাজার বাতির আলোয় হাজার দর্শকের সম্মুখে দেশের রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম রানীর বেশে। বাসি-বিয়ের ভাঙা আসরে যেমন সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে সানাইয়ের করুণ তান, সেদিন তেমনি সেই উৎসবের মধ্যেও বেদনার একটা ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সালঙ্কারা কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে বাপ যেমন তার শিরশ্চুম্বন করে ঠিক তেমনি করেই তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন—'আশীর্বাদ করি এমনি রাজরানীর মত তুমিও একদিন দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দাও!'

দুর্লভ সে মুহূর্তটি আমার জীবনে। আজও চোখ বুজলে দেখতে পাই সেই হাজার বাতির আলো, সেই হাজার দর্শকের মুগ্ধ বিস্ময় আর সেই তুঙ্গশুভ্র হিমাচলের মত একটি ব্যক্তিত্ব! তাঁর সে আশীর্বাদ আজও সফল হয়নি আমার জীবনে—কিন্তু আমি বিশ্বাস হারাইনি। তাঁকে অবিশ্বাস করা যায় না। তাঁর আশীর্বাদ আজও ফলেনি বটে, তবে নিশ্চয়ই একদিন ফলবে।

* * *

কিন্তু সে তো আমার শেষদিনের কথা। আগের কথা আগে বলি। জানিনা এই অখ্যাত অজ্ঞাত বিদেশী মেয়েটির সে অভিজ্ঞতা আপনাদের কোন্ কাজে লাগবে। শুনতে আপনাদের ভাল লাগুক আর না-লাগুক, বলতে আমার খুবই ভাল লাগছে। তাই লিখে চলেছি। জানি, ঐ 'বিদেশী' কথাটায় আপনারা হয়তো আপত্তি করবেন, বলবেন আমি বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়। দু-একটা উচ্ছ্বাসভরা বিশেষণপদও ব্যবহার করে ফেলবেন বুঝিবা। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কথা উঠলে আপনারা সচরাচর যেমন কয়েকটি বাছা বাছা বিশেষণপদ ব্যবহার করে থাকেন। আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমি আদৌ ভারতীয় কিনা।

ভারতবর্ষকে আমি দেখিনি। জন্মেছি সিঙ্গাপুরে—জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর কেটেছে সেখানেই। তারপর আমারই মত আরো কয়েকশ মেয়ের সঙ্গে এসেছিলাম বর্মায়। জর্জ-টাউন—ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট—ট্যাভয়-মৌলমিন হয়ে খাস রেঙ্গুন শহরে। সেখান থেকে আবার একদিন সদলবলে রওনা হয়েছিলাম ইরাবতী-টাঙ্গু-প্যিন্‌মানা হয়ে মান্দালয়ের দিকে। ইচ্ছে ছিল কালেওয়া-টামু হয়ে যাব ইম্ফলে। আর সেখান থেকে আপনাদের দেশ, কলকাতায়। যাব দিল্লিতে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দল সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। যেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম, শুনেছি সেখান থেকে ভারত-সীমান্ত ছিল মাত্র বাইশ মাইল। আমাদের যেসব ব্যাটালিয়ান ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিল আমি সেসব দলে ছিলাম না। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় প্রোথিত জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করবার সৌভাগ্য তাই আমার হয়নি।

আজ আমার বয়স সাতচল্লিশ। প্রৌঢ়া আমি। মাথার চুল সাদা হয়ে যেতে শুরু করেছে, চোখে উঠেছে পুরু লেন্সের চশমা। রেঙ্গুনের একটি মেয়েস্কুলে আমি উর্দু পড়াই। উর্দু ভাষাটা আমি কিন্তু সে-যুগে জানতাম না। নিজে লেখাপড়া শিখেছি ইংরেজি মিশনারি স্কুলে। হিন্দুস্থানী শিখেছি ফৌজে যোগদান করে; আর উর্দু শিখেছি ফৌজ ছেড়ে চলে আসার পর। প্রথম দুটি ভাষা শিখতে হয়েছিল জীবিকার জন্য, আর শেষেরটা বোধ করি শিখেছি 'জীবনের' জন্য। অথচ সেটাই আজ আমার জীবিকার পাথেয়। তা সেসব কথা থাক। বলছিলাম কি, দু-দুটো ভারতীয় ভাষা জানি বলেই তো আর আমি ভারতীয় হয়ে যাব না।

হ্যাঁ, আমার বাবা-মা দুজনেই ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। আপনারা নাকি জায়গাটাকে বলেন তামিলনাড়ু। কর্মোপলক্ষে আমার বাবা এসেছিলেন সিঙ্গাপুরে, বিবাহের কিছুদিন পরেই, আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে। তখনো আমার জন্ম হয়নি। বাবা ছিলেন সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত রবিনসন্স ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট। সৎ কর্মী বলে সাহেবদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। রবিনসন্সে শতকরা আশিজনই ছিল সাহেব, এমনকি সেলসম্যান পর্যন্ত। তার মধ্যে—হংসোমধ্যে বায়স যথা—একমাত্র কালা-আদমি হচ্ছেন আমার বাবা—এ. এম. ভি. নায়ার। সৎ ও সুদক্ষ কর্মী না হলে ওখানে ঐভাবে টিকে থাকতে পরতেন না। নায়ারকে না হলে রবিনসন্স ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের হিসাবের খাতায় দক্ষ ইংরেজ নাবিক চিরদিনই 'একবাঁও মেলে না' হাঁকত। আমরা অবশ্য সাহেবপাড়ায় থাকতাম না। জেনারল হাসপাতালের উত্তর-পূর্বে চায়না টাউনের একান্তে ছিল আমাদের বাড়ি। প্রথমে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, পরে আমার বয়স যখন বছরআষ্টেক তখন বাবা সেই বাড়িটা কিনে নেন। চায়না টাউনে থাকলে কী হয় আমার স্কুলজীবন কেটেছে ঐ অভিজাত এলাকা রাফল্‌স্‌ প্লেসের কাছে-পিঠে। সব শহরেই যেমন হয়, সিঙ্গাপুরেও ছিল একটা অভিজাত এলাকা—সাহেবপাড়া, আর তার চারপাশ ঘিরে দুঃস্থদের বস্তি। আমাদের বাড়িটা যদিও ছিল ঘনবসতিপূর্ণ ঐ চায়না টাউনের সীমান্তে, কিন্তু সেখান থেকে আমি নিত্য স্কুল-বাসে করে চলে যেতাম শহরের কেন্দ্রস্থলে। কোলিয়ার কোয়ের প্রান্তে বিখ্যাত ব্যাটারি রোডের উপর ছিল লাল-ইটের পয়েন্টিং করা কনভেন্ট স্কুল। ধর্মে আমি খ্রিস্টান—সুতরাং খ্রিস্টানদের স্কুলেই ভরতি করা হয়েছিল আমাকে। আমাদের স্কুলে কিন্তু তাই বলে খাস সাহেব-মেমের বাচ্চারা কেউ পড়ত না। সবই আমাদের মতো কালা অথবা বাদামি সাহেব-মেম। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অথবা ইউরেশিয়ান। বিশুদ্ধ ইওরোপীয় রক্ত যাদের ধমনীতে বইত তাদের জন্য খানদানি শিক্ষায়তনের পৃথক আয়োজন ছিল।

তা সে যাই হোক, আজন্ম ঐ সিঙ্গাপুরকেই নিজের দেশ বলে জেনে এসেছি। মালয়ী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশতাম, মালয়ী ভাষাতেই কথা বলতাম ওদের সঙ্গে। বাড়িতে বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপচারী করতে হত ইংরেজিতে। নিজেকে মালয়ী মনে করতাম। ভারতবর্ষ থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা আসত বাবার কাছে, প্রতি বুধবার। মাদ্রাজের একটি পত্রিকা। ঐটুকুই ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র। আর আসত বিচিত্র হরফে লেখা দু-চারখানা দেশওয়ালী চিঠি। আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারতাম না। যাঁরা চিঠি লিখতেন তাঁরা নাকি আমার আন্টি-গ্র্যানি-কাজিন্স্‌। হবেও বা। আমি যে ভারতবাসী সে কথা মনেও নিইনি মেনেও নিইনি। ধারণাই ছিল না আমি ভারতীয়।

বুঝলাম একেবারে হঠাৎ—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উনিশশ বেয়াল্লিশের একত্রিশে জানুয়ারি। প্রায় দুমাস আগে ডিসেম্বরের আট তারিখে কোটাভারুতে নাকি জাপানি সৈন্যের দল অবতরণ করেছিল। সিঙ্গাপুর থেকে মালয় উপদ্বীপের ঐ স্থানটির দূরত্ব শুনেছি মাত্র শ-চারেক মাইল। সংবাদটা সিঙ্গাপুরে কেউ বিশ্বাসই করেনি। প্রথমটায়। অপরাজেয় ব্রিটিশবাহিনীর বিক্রমকে উপেক্ষা করে ঐ বেঁটে-বেঁটে জাপানিগুলো যে মালয় উপদ্বীপে পদার্পণ করবার সাহস পাবে একথা সিঙ্গাপুরে সেদিন কেউ বিশ্বাসই করেনি। জিমখানা ক্লাবে, সী-ভিয়ু হোটেলের বারে, রবিনসন্স ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সংলগ্ন থানা-ঘরে এ খবর যখন গিয়ে পৌঁছাল তখন সবাই হেসেই বাঁচে না। সবাই বলে—কে রটিয়েছে হে এ খবরটা? খোঁজ নাও তো। মারাত্মক প্র্যাকটিকাল জোক!

কিন্তু গুজব নয়। দু-দিনের মধ্যেই এসে গেল আরো চমকপ্রদ খবর। চীন-সমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ দুর্ভেদ্য প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ এবং রিপাল্‌স্‌ নাকি সমুদ্রের অতলান্ত গভীরে তলিয়ে গেছে। কেমন করে? ঐ বেঁটে বেঁটে জাপানিগুলোর কাণ্ড! তবু টনক নড়েনি কারো। সবাই বলাবলি করেছিল—এ নিতান্তই দুর্ঘটনা! ঘটনাচক্রে দুখানা জাহাজ ডুবে গিয়েছে বলেই জাপানিরা কিছু ম্যাজিশিয়ান হয়ে যায়নি। ব্রিটিশ প্রতিরোধকে ভেদ করে জাপানিরা অন্তত কোনোদিন সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছাবে না। পঁচিশ বছর ধরে ব্রিটিশ সেনাপতির দল তিল তিল করে দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সিঙ্গাপুর দূর অস্ত!

তারপর দুটি মাসও কাটেনি। দুরন্ত ঝড়ের মতো জাপানি সৈন্য বস্তুত বিনা বাধায় এসে উপস্থিত হল সিঙ্গাপুরের উত্তরদ্বারে। মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে সিঙ্গাপুর শহরের ভৌগোলিক যোগাযোগ নেই। সিঙ্গাপুর একটি দ্বীপ, তার সমস্ত উত্তর দিক ঘিরে একটি অপ্রশস্ত প্রণালীর উপর নির্মিত হয়েছিল একটি 'কজ্ওয়ে'। শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় সেটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল একত্রিশে জানুয়ারি। সেই যেদিন অনুভব করলাম যে আমি ভারতীয়।

ঐদিনই সিঙ্গাপুর বন্দর থেকে সর্বশেষ জাহাজ রওনা হয়েছিল সমুদ্রের পথে। আমাদেরও ঐদিন সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার কথা ছিল। দুদিন ধরে বাঁধাছাঁদা করে সাত-সকালে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম জাহাজ-ঘাটায়। ফিরে এলাম মধ্যরাত্রে। কোনো জাহাজে আমাদের ঠাঁই হল না। কেন? অপরাধ, আমরা নাকি ভারতীয়। কর্তৃপক্ষ জানালেন—ইংরেজ, ফরাসি ও আমেরিকানরাই সিঙ্গাপুর ত্যাগে অগ্রাধিকার পাবে। তাদের চাহিদা শেষ হলে তারপর ভারতীয় অসামরিক লোকদের কথা চিন্তা করা যাবে। সে চিন্তার অবকাশ জাপানিরা আর ওদের দেয়নি। একত্রিশে জানুয়ারির পর আর একখানি জাহাজও সমুদ্রে ভাসেনি।

এর সাতদিন পরেই, ফেব্রুয়ারির আট তারিখে, জাপানি বোমার আক্রমণে আমাদের বাড়িটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাবা, মা, আমাদের আয়া আর আমার স্প্যানিয়াল কুকুরটা। সে সময় আমি বাড়ি ছিলাম না। তাই একা আমিই বেঁচে থাকলাম ঐ নৃশংস দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে! বিমান আক্রমণ শেষ হবার পর ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম বাড়িতে। যেখানে ছিল আমাদের দ্বিতল বাড়িটা সেখানে প্রকাণ্ড একটা ধ্বংসস্তূপ। আগুন তখনো নেবেনি।

* * *

কী ভুলো মন দেখুন আমার। নিজের কথাই বকে মরছি। কিন্তু আমার কথা তো জানতে চাননি আপনারা। চেয়েছেন তাঁর কথা জানতে। সুতরাং আমার কথা থাক। আমি শুধু প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাইছিলাম যে, আমি ভারতীয় কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আমার। জীবনের বিশটা বছর সে কথা আমার খেয়াল ছিল না। জানলাম প্রথম—যেদিন মাদ্রাজের এই নায়ার পরিবারটিকে জাহাজে ঠাঁই দেওয়া হল না, আমরা ভারতীয় বলে।

জন্মসূত্রে ভারতীয় না হলেও আর একসূত্রে আমি ভারতীয় হতে পারতাম। মেয়েদের জীবনে সে সুযোগও এসে থাকে। আমারও এসেছিল। আজ এই প্রৌঢ় বয়সে স্বীকার করতে আর লজ্জা কী? আমার জীবনে যে মানুষটি প্রথম এনেছিল রঙিন স্বপ্ন—প্রথম ছুঁয়ে গিয়েছিল আমার কুমারী-মন, সে ভারতীয়। কী জানি সেখানেও আজ ভুল করছি কিনা। জানি না। সে নেই। থাকলেও সে বোধকরি আপনাদের সূক্ষ্মবিচারে ভারতীয় হিসাবে চিহ্নিত হত না। কারণ তার ঘর করতে যদি সত্যিই যেতাম আমি, তাহলে আপনাদের নিক্তিধরা বিচারে আমরা হতাম পাকিস্তানি। ভারতীয় নয়! আমি অবশ্য তখন তাকে ভারতীয় বলেই জানতাম। দোষ আমার নয়। সে ছিল সিন্ধুপ্রদেশের লোক। শুনেছি 'সিন্ধু' থেকেই নাকি এসেছে 'হিন্দু' কথাটা। আর তাই সিন্ধুস্থান থেকে 'হিন্দুস্তান'। আমরা তখন যে জাতীয়-সঙ্গীত গাইতাম তাতে বিভিন্ন রাজ্যের লম্বা ফিরিস্তিতে দ্বিতীয় শব্দটি ছিল 'সিন্ধু'। জানি না সেই জাতীয়-সঙ্গীতকেও আপনারা ভেঙে দু-টুকরো করেছেন কিনা।

না, না-জন্মসূত্রে না-বিবাহসূত্রে, কোনোভাবেই আমি ভারতীয় নই। তবু কী উন্মাদ আগ্রহে আপনাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম সেদিন। কী দুর্বার আগ্রহে ছুটে গিয়েছিলাম সেই অচেনা-অদেখা-অজানা ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। জীবনের একমাত্র লক্ষ ছিল সেই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি। মৌলমিন-রেঙ্গুন-ইম্ফল হয়ে ঐ যে পথ চলে গিয়েছে দুর্ভেদ্য আরাকান অরণ্যে ঐ জঙ্গলের ওপারে, ঐ নীল পর্বতমালার অপর পারে আছে সেই স্বর্ণরাজ্য, যার নাম ভারতবর্ষ! আমরা সেই ভারততীর্থের পথিক—ইন্ডিয়ান পিল্গ্রিম্স্—চলেছি সেই লক্ষের দিকে। আপনারা স্বীকার করুন আর নাই-করুন, সেই দুটো বছর আমি নিঃসংশয়ে ছিলাম ভারতীয়। সেই একবছর নয় মাস ছাব্বিশ দিন। তার আগে আমি ছিলাম মালয়ী, তারপর বর্মী! কিন্তু এই দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের জীবনে ঐ কটি দিন—বিশ্বাস করুন—মনেপ্রাণে আমি ভারতীয় ছিলাম। ঝাঁসির রানী বাহিনীর জন্মমুহূর্ত থেকে

নেতাজির শেষ সংবাদ প্রাপ্তি পর্যন্ত। সেই তেতাল্লিশের বাইশে অক্টোবর থেকে পঁয়তাল্লিশের আঠারই আগস্ট পর্যন্ত। আজ যাই হই না কেন, আমার আত্মকথার ঐ চিহ্নিত খণ্ডকালে আমাকে যদি ভারতীয় বলে না ধরে নেন তাহলে এ আত্মকথা হয়ে যাবে উন্মাদের প্রলাপ। প্রহসন!

কোথা থেকে শুরু করব? কী কথা বলব? কত কথাই তো আজ মনে আসছে। কত লোকের বীরত্বের কথা, গৌরবের কথা, মৃত্যুঞ্জয়ী আত্ম-উৎসর্গের কথা। মনে পড়ছে বেলা দত্ত, মিস ভট্টাচার্য, মায়া গাঙ্গুলি, রেবা সেন, শিপ্রা সেন, চিত্রা মুখার্জির কথা। ওরা সবাই আপনাদের দেশের লোক। আমরা বলতুম কলকাত্তাইয়া। এ ছাড়াও ছিল অন্যান্য প্রদেশের মেয়ে—উর্মিলা আয়াঙ্গার, রুক্মিণী খাণ্ডেলকর, সরস্বতীবাঈ আম্মাজীর কথা। আর শুধু মেয়েদের কথাই-বা কেন? আমার জোয়ান ভাইদের কথাও। মনে পড়ছে সেই নাম-ভুলে-যাওয়া মারাঠি ভাইটির কথা, রেঙ্গুনের মিয়াঙ হাসপাতালে ব্রিটিশ বোমারু বিমানের আঘাতে যে প্রাণ হারিয়েছিল, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার মুহূর্তে যে আমাকে বলেছিল—আরতিদি, আমি পারলাম না, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে আপনারা একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছাবেন! মনে পড়ছে, ক্যাপ্টেন সুরযপ্রসাদের সেই অন্তিম অনুরোধ—যদি নেতাজির সঙ্গে দেখা হয় বলবেন, গান্ধী ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন সূরযপ্রসাদের বুকে গুলি লেগেছিল, পিঠে নয়! আর মনে পড়ছে মৌলমিন হাসপাতালে সেই মৃত্যুপথযাত্রী লেফটানেন্টের অন্তিম আর্তনাদ! জেনারল এ-সি-চ্যাটার্জির এ. ডি. সি.—লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদ! আমরা তাকে ঠাট্টা করে ডাকতাম—ছোটলাট! নেতাজির প্রাণ বাঁচাতে—

কিন্তু না। ওদের কথা বলবার জন্য তো আপনি আমাকে ডাকেননি। আমি শুধু তাঁর কথাই বলব। নাজির আহ্‌মেদ তো ভারতীয়ই নয় আজ! তার কথা থাক।

দুই.

শুরু করব উনিশশ পঁয়তাল্লিশের তেইশে এপ্রিল থেকে। কারণ তার আগে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার হয়নি। ঐ তেইশে এপ্রিল থেকে পাঁচই মে মাত্র তেরোটি দিনের অভিজ্ঞতা শোনাব আমি। এই কয়টি দিন তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার দুর্লভ সুযোগ এসেছিল আমার জীবনে, চরম দুর্দৈবের ভেতর দিয়ে। আপনারা তাঁর দেশের লোক। ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন তাঁকে। কিন্তু মাপ করবেন, আপনারা চেনেন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজিকে আপনারা দেখেননি, জানেন না, চেনেন না—কল্পনাও করতে পারেন না। তাই কল্পনায় তাঁর বুকে একগাদা মেডেল লটকিয়ে কাঁধে প্রচুর জরির ঝালর ঝুলিয়ে ইংরেজ সেনাপতির অন্ধ অনুকরণে আপনারা নেতাজির ছবি আঁকেন—ক্যালেন্ডার করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখেন।

আমরা তাঁকে যে বেশে দেখেছি তাতে একটাও মেডেল ছিল না, লাল-নীল জোব্বা পরে সঙ সাজতেন না তিনি। নিতান্ত সাদামাটা খাকি পোশাক ছিল সর্বাধিনায়কের—মাথার টুপিতে দুটি সিকি ইঞ্চি ব্যাসের পেতলের ঝকঝকে বোতাম। ঊর্ধ্বাঙ্গে পুরোহাতা বুশ-কোট, নিম্নাঙ্গে খাকি ব্রিচেস এবং পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা টপবুট। একতিল জৌলুস ছিল না সে পোশাকে—নিতান্ত সাদামাটা ফৌজি পোশাক। ঐ বেশেই তিনি দেখা করেছেন ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচি বা জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে। বর্মার রাষ্ট্রপ্রধান ডক্টর বা ম'-র সঙ্গে। স্বচক্ষে দেখিনি আমরা কেউ, তবে আন্দাজ করতে পারি এমনকি মুসোলিনী, হিটলারের সঙ্গে।

আধখানা দুনিয়া যে নেতাজীকে সসম্ভ্রম স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে আর বাকি আধখানা পৃথিবী যে তাঁর ভয়ে থরহরি কেঁপেছে সে তাঁর পোশাকের জৌলুসের জন্য নয়, অন্য কিছুর জন্য। আপনাদের সেটা ধারণাতেই আসে না। তাঁর মূর্তি গড়তে গেলে আপনারা তাই আউটরামের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু কল্পনাই করতে পারেন না। আমরা, যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে সে যুগে দেখেছি, সেই আমরা তাঁকে কখনো ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখিনি। তাঁকে দেখেছি, জীপে, ওয়েপন-কেরিয়ারে, দেখেছি প্লেনের কক্‌পিটে, ট্রেনের কামরায়, দেখেছি একহাঁটু কাদার মধ্যে ছপছপ করে এগিয়ে যেতে। না, ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল ঘোরাচ্ছেন নেতাজি—এটা কল্পনাতেই আসে না। আপনাদের দোষ নেই।

শিবাজী আর রানা প্রতাপের ভঙ্গি ছাড়া বীরত্বের অন্য ব্যঞ্জনা আপনাদের ধারণাতেই আসে না। তাই আউটরামের ঘোড়ার ল্যাজ ধরে আপনাদের টানাটানি করতে হয়।

যে কথা বলছিলাম।

উনিশশ পঁয়তাল্লিশের সেই তেইশে এপ্রিল।

আমরা তখন রেঙ্গুনে। হার শুরু হয়ে গেছে আমাদের। ইম্ফল-কোহিমা-পালেল অঞ্চলের দিনগুলি ততদিনে ইতিহাসের অধ্যায় হয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ আসছে তোয়াঙ্গু লাইনে জাপানি এবং আজাদিবাহিনীর প্রতিরোধ ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের সাঁজোয়া গাড়ি আর প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে রেঙ্গুনের দিকে। জাপানি সেনাবাহিনীর কষ্টসহিষ্ণুতা আর আজাদি সেনাদলের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্ব আর পাল্লা দিতে পারছে না মিত্রবাহিনীর উন্নত ধরনের সমরোপকরণের সঙ্গে। ইংরেজ যুদ্ধে জিতল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত কল-কারখানায়। আমাদের শুধু হাতবোমা আর রাইফেল। পাল্লার মধ্যে শত্রুদলকে আমরা পাওয়ার আগেই দূর থেকে গর্জে ওঠে ওদের দূরপাল্লার কামান। হাতাহাতি বেয়নেট যুদ্ধে আমরাই ওদের বারে বারে হারিয়েছি—কিন্তু এবার ওরা এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক নিয়ে, ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান তাদের আড়াল করে এগিয়ে আসে। ট্যাঙ্ক ভ্রূক্ষেপ করে না আমাদের বেয়নেটকে। আমাদের একটিও ট্যাঙ্ক নেই, উড়োজাহাজ জাপানিদের যে-কটি ছিল ওরা বর্মা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের লড়াইয়ে—নইলে জাপান দ্বীপপুঞ্জই বিপদাপন্ন হয়ে পড়তে পারে। মোট কথা, শত্রুপক্ষের সমরোপকরণ পরিমাণে অনেক বেশি, তাদের কলকবজা অনেক উন্নত ধরনের। শুধু দেশপ্রেমের উন্মাদনা দিয়ে আমরা কেমন করে এঁটে উঠব ওদের সঙ্গে? আমাদের ধার ভোঁতা হয়ে গেল ওদের ভারে। রেঙ্গুনের পতন যে অনিবার্য, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান, এটা ততদিনে নিশ্চিত বোঝা গিয়েছে।

আমাদের ঝাঁসির রানী বাহিনীর প্রায় তিনশত মেয়ে তখন আছে রেঙ্গুনে। তাদের নিরাপত্তার জন্য দলনেত্রী লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন খুবই চিন্তিত। তিনি অবশ্য, আমি যতদূর জানি, তখন রেঙ্গুনে নেই। আমাদের এই ডিট্যাচমেন্টের কমান্ডান্ট হচ্ছেন লেফটানেন্ট জানকী থিবার্স। জানকীদির মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই তিনি কতদূর বিচলিত হয়েছেন। মনের ভিতর ঝড় বইলেও জানকীদি তা বাইরে প্রকাশ করতেন না। আমি ছিলাম তাঁর দক্ষিণহস্ত। তাই আমি সবই বুঝতে পারতাম। বেশ অনুভব করছি তিনি রীতিমত বিচলিত হয়েছেন, রাত্রে ভাল করে ঘুমোতেও পারছেন না। নিজের জন্য নয়, এতগুলি মেয়ের ভালমন্দের দায়িত্ব যে তাঁরই স্কন্ধে। আর কেউ না জানলেও জানকীদি বেশ ভাল করেই চিনতেন সি-ফোর্থ রেজিমেন্টের হাইল্যান্ডার গোরা আর বিশেষ করে আফ্রিকান হাবসি রেজিমেন্টের অসুরের মতো দানবগুলোকে। নারীসঙ্গবঞ্চিত ঐ নরপশুগুলো কোনোক্রমে যদি রেঙ্গুন শহরে প্রবেশ করতে পারে তবে সর্বপ্রথমেই সর্বনাশ হবে আমাদের বাহিনীর।

ওদের অগ্রগতির পথে বর্মী গ্রাম পড়েছে, সেখানেও নানান বয়সের মেয়েরা আছে—কিন্তু ব্রিটিশ কমান্ডারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে সে বিষয়ে। না, এশিয়াবাসী নিগার মেয়েদের সতীত্বের জন্য তার প্রাণ কাঁদে না—নেহাৎই ফৌজি প্রয়োজনে এ সাবধানতা তাকে অবলম্বন করতে হয়। বর্মী মেয়েদের ওপর নারীসঙ্গলোলুপ সৈন্যদলকে পাশববৃত্তি চরিতার্থ করতে দিলে গ্রামবাসীর সহানুভূতিকেও হারাবে ওরা। অথচ স্থানীয় লোকের সহযোগিতা ছাড়া সে দুর্গম জঙ্গলের পথে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া যায় না। ওরা জানে কোথায় পাওয়া যাবে সৈন্যদলের খাদ্য, পানীয়, ওরাই দিতে পারে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর পথের সঙ্কেত, দুরতিক্রম্য পার্বত্যনদী অতিক্রমণের পথের ইঙ্গিত। ব্রিটিশ সেনাপতি তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সৈন্যদলকে সংযত রাখতে বাধ্য হয়েছে।

আমরা জানি সেই বুভুক্ষু সেনাদল যখন রেঙ্গুন শহরে প্রবেশ করবে তখন এই কৃত্রিম সংযমের বাঁধ যাবে ভেঙে। এখানকার ঝাঁসির রানী বাহিনীর তিনশত মেয়ে তো আর বর্মীগ্রামের মেয়ে নয়—ওদের চোখে আমরা শত্রুপক্ষের লোক। আন্তর্জাতিক ফরমান আছে আমাদের বন্দী করে ওদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়ার। আমরা সৈনিক—ফলে হব যুদ্ধবন্দী। যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে নানান কাজ করানো হয় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে। ফলে আমাদের যদি ট্রাক বোঝাই করে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়

তাহলে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। তারপর কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর আমরা ওদের কোন প্রয়োজন মেটালাম তা আর কে সন্ধান নিতে যাচ্ছে!

আমাদের দলনেত্রী লেফটানেন্ট জানকী থিবার্স এ নিষ্ঠুর সত্যটা মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন, যদিও মুখে তাঁকে স্বীকার করতে শুনিনি কখনো। আমাদের ছাউনিতে এ প্রসঙ্গ উঠলে তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের থামিয়ে দিতেন—বলতেন, সময়মতো সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কী ব্যবস্থা হতে পারে তা তো আমরা ভেবেই পাই না। রেঙ্গুন শহরে তখন আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রধানেরা অনেকেই আছেন। বাহিনীর সামরিক হেড-কোয়ার্টার্স তখন রেঙ্গুনেই। মেজর-জেনারল ভোঁসলে আর জামান কিয়ানী রয়েছেন হেড-কোয়ার্টার্সে, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচারসচিব আইয়ারও আছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্বয়ং নেতাজিও আছেন শহরে। ইংরাজবাহিনী এসে পড়ার আগে এঁদের শহর ত্যাগ করে যেতে হবে। আরো দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়া হবে হেড-কোয়ার্টার্স—হয়তো মৌলমিনে, কিংবা ব্যাংককে, আরো দক্ষিণে সিঙ্গাপুরে। আমাদের সম্বন্ধেও নিশ্চয় চিন্তা করছেন ওঁরা।

আমাদের, অর্থাৎ ঝাঁসির রানী বাহিনীর, সদর-দফতর ছিল একটি স্কুলবাড়িতে। শহরের পতন আশঙ্কা করে অধিকাংশ অসামরিক পরিবার শহরতলি অঞ্চলে অথবা গ্রামাঞ্চলে সরে গিয়েছে। ক্রমাগত বোমার আঘাতে অধিকাংশ পাকাবাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত। স্কুল এমনিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বাড়িটাতেই খোলা হয়েছিল আমাদের সদর-দফতর। স্কুলের খেলার মাঠে হত আমাদের কুচকাওয়াজ, স্কুলের পেটা ঘন্টিতেই আমাদের প্রহর-সঙ্কেত। স্কুলের জিমন্যাশিয়ামে ছিল আমাদের কিচেন। বিভিন্ন ক্লাসঘরে বেঞ্চি জোড়া দিয়ে দিয়ে আমাদের শয়নের আয়োজন—কমান্ডান্ট থিবার্স আশ্রয় নিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে।

দিনসাতেক ধরে ক্রমাগত সংবাদ পাচ্ছি ব্রিটিশবাহিনী তিল তিল করে এগিয়ে আসছে। মধ্যবর্মায় মান্দালয় এবং মিনগ্যানের পতন হয়েছে। মৈখিলা-আমোথিন অতিক্রম করে শত্রুসৈন্য এগিয়ে এসেছে প্যিন্‌মানায়। সেখানকার সুরক্ষিত জাপানি ঘাঁটিরও পতন হয়েছে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে। শেষ খবর যা এসেছে তা হচ্ছে এই যে শত্রু সৈন্য সিত্তাং নদীর পথরেখা ধরে এগিয়ে আসছে টঙ্গুর দিকে। টঙ্গুর পতন সংবাদ যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। টঙ্গু থেকে হাঁটা-পথে রেঙ্গুনের দূরত্ব মাত্র আড়াইশ মাইল—অপ্রতিহত সাঁজোয়াবাহিনীর পক্ষে আন্দাজ দুদিনের পথ।

এই তো গেল পটভূমিকা।

তিন

এবার সেই তেইশে এপ্রিলের কথায় ফিরে আসি। কাল সারারাত ঘুম হয়নি। নানান দুশ্চিন্তায় সরু বেঞ্চিতে কোনোক্রমে এপাশ-ওপাশ করেছি। স্কুলের পেতলের ঘন্টায় জাগর নারী প্রহরী প্রহরের পর প্রহর সময় সঙ্কেত করে গিয়েছে। স্তব্ধ রাত্রির নৈঃশব্দের ওপর সেই ধাতব সঙ্কেত বারে বারে আমাদের যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—রেঙ্গুনের পতন মুহূর্তের অন্তিমক্ষণ এগিয়ে আসছে কাছে, আরো কাছে। একুশটি বছরের নানান অভিজ্ঞতা বিনিদ্র রাত্রে ফিরে এসেছিল আমার কাছে। সিঙ্গাপুরের স্কুলজীবনের খেয়ালখুশির দিনগুলি, আলোকোজ্জ্বল রাফল্‌স্-প্লেসে মায়ের হাত ধরে মার্কেটিঙ করা, রবিনসন্স স্টোর্সের সারি সারি বিলাতি মোমের পুতুলের হাতছানি। মনে পড়ল আমার ঝোলা-কান ছোট্ট স্প্যানিয়াল কুকুরটাকে—শ্যাগি। কী খুনসুটি করত আমার সঙ্গে। কী আনন্দের দিন ছিল সেসব! যুদ্ধের কথা রেডিওতে শুনতাম। বি.বি.সি. অথবা অল ইন্ডিয়া রেডিও। খবরের কাগজেও যুদ্ধের কথা পড়তাম। সিঙ্গাপুর থেকেই প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *ট্রিবিউন*।

পতন হল সিঙ্গাপুরের। আমূল বদলে গেল জীবন। মুহূর্তে হয়ে গেলাম পিতৃমাতৃহীন অনাথ! তারপর উল্কার গতিতে বদলে গেল জীবনের গতি। যে জাপানিরা ছিল শত্রু, বন্ধু হল তারা—যে ইংরেজকে জানতাম মিত্র বলে তারা আমাদের ফেলে পালাল। ক্রমে তারা হল শত্রু। এ পরিবর্তন একদিনে হয়নি—হয়েছে তিলে তিলে। প্রথম বছরখানেক খড়কুটোর মত ভেসে বেড়িয়েছি। তারপর একদিন সিঙ্গাপুরে এলেন সাগরপারের রাজপুত্র। নতুন আশার বাণী শোনালেন বজ্রনির্ঘোষে। নতুন

করে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ্ সরকার, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ—ক্রমে ঝাঁসির রানী বাহিনী। একেবারে প্রথম যুগেই নাম লিখিয়েছিলাম আমি। তারপর ভাসতে ভাসতে আজ এসে পৌঁছেছি রেঙ্গুনের এই স্কুলবাড়িতে। সৈনিক হিসাবে। সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনের দীর্ঘ পথ। কিছুটা এসেছি ট্রেনে, কিছুটা স্টিমারে, কিছুটা পায়ে হেঁটে।

কিন্তু নিদ্রাহীন রাত্রের নিস্তব্ধতায় শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতিটুকুই নয়, হাতছানি দেয় অনাগত ভবিষ্যৎও। এই প্রচণ্ড বিপদ কি অতিক্রম করতে পারব আমরা? রেঙ্গুনের পতন হলেই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না এ কালযুদ্ধ। এ লড়াই চলছে, চলবে—ব্যাঙ্কক থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, প্রয়োজন হলে টোকিও থেকে—যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু সে তো যুদ্ধের শেষ পরিণাম, আমাদের শেষ পরিণাম কী? আমরা, নারীবাহিনীর এই তিনশত সৈনিক, কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব রেঙ্গুন যুদ্ধে? তাই যদি নির্দেশ আসে আমরা দুঃখিত হব না, আমরা খুশি হব। অন্তত এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারব যে, এর পরেও আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলবে, যতদিন না ভারতজননী শৃঙ্খলমুক্তা হন। দেশজননী স্বাধীন হবেনই। অচিরেই হবেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ যে হতেই হবে। কেন? নেতাজি যে বলেছেন!

এইসব চিন্তা করতে করতেই ঘুম চড়ে গিয়েছিল। তারপর ভোররাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে আমার অতীত জীবন ফিরে এল না, ভবিষ্যতের আতঙ্কও নয়। স্বপ্নে দেখলাম আমার বিয়ে হচ্ছে! আলো-ঝলমল বিবাহবাসর। চার্চ নয় কিন্তু। বর আসছে ঘোড়ায় চেপে। দুল্হা! মাথায় তার পাগড়ি, পায়ে নাগরা, গায়ে রঙিন কুর্তা। সানাই বাজছে নহবতখানায়। আমি আড়াল থেকে দেখছি। চিনতে পেরেছি ওকে। ছোটলাট!....

হঠাৎ কে যেন ধাক্কা মারল। ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকা।

—এই আরতি, ওঠ! কখন থেকে রেভিল বাজছে!

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল ভাবিজীর ওপর। কী দরকার ছিল ঘুমটা ভাঙাবার? ঘুম নয়, স্বপ্নটা ভেঙে গেল বলেই মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে আমার। যে স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে দেখছিলাম, যে সৌভাগ্য বাস্তবে আমার জীবনে কখনো হবে না—তেমন দিন আসবেনা জানি, না হয় স্বপ্নের ঘোরেই অনুভব করে নিতাম সে অভিজ্ঞতা। কী ক্ষতি হত তাতে ভাবিজীর?

—চট্ করে তৈরি হয়ে নে। না হলে প্যারেডে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় প্যারেড। ভোর চারটায় তাই রোজ বিউগ্‌ল বেজে ওঠে। প্রথম বিউগ্‌লধ্বনি, রেভিল। আধো-ঘুম আধো-জাগরণে ঐ সামরিক বিষাণটাই আমার চেতনায় বিবাহবাসরের সানাই রূপে বেজে উঠেছিল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য মেয়েদের ইতিমধ্যেই প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ রাতের পোশাক ছেড়ে সামরিক খাকি পোশাক পরতে শুরু করে দিয়েছে। আধঘণ্টার মধ্যেই তাড়াহুড়া করে নিজেকে তৈরি করে নিলাম।

প্রভাতী কুচকাওয়াজ সেরে নিজের ব্যারাকে যখন ফিরে এলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। চারিদিক আলো ঝলমল করছে। স্কুলের বড় হল-কামরাটায় আমাদের আটচল্লিশ জনের বিছানা পাতা। এক-এক দিকে চব্বিশ জন। প্যারেডে যাবার আগেই বিছানা গুটিয়ে রেখে যেতে হয়। মাথার কাছে পাট করে রাখা আছে রাতের বিছানা, কিট ব্যাগ—বেঞ্চির নিচে মগ এবং স্লিপার। প্যারেড শেষ হলে যে যার ব্যারাকে যাবে। দলনেত্রী লেফটানেন্ট থিবার্স তখন পরিদর্শন করবেন বিভিন্ন ব্যারাক। আমি তাঁর দক্ষিণহস্ত। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে আমাকে। মেয়েরা যে যার বিছানার পাশে অ্যাটেনশন-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে খাড়া। দলনেত্রী দেখে নেন সামরিক পরিচ্ছন্নতায় কারো কোনো ত্রুটি হয়েছে কিনা।

প্রথামাফিক পরিদর্শন শেষ করে লেফটানেন্ট থিবার্স আমাদের সকলকে সম্বোধন করে বললেন—আজ বেলা বারোটায় সকলে প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হবে। গোটা ফৌজের চীফ-অফ-স্টাফ আমাদের এই ডিট্যাচমেন্ট পরিদর্শনে আসবেন। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রমের সম্বন্ধে তিনি কিছু নির্দেশও হয়তো দেবেন। তোমরা একঘন্টার নোটিসে রওনা হবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। আর এ ব্যারাকের তিনজন পনেরো মিনিট পর আমার সঙ্গে এসে দেখা কর। সাব-অফিসার আরতী নায়ার, ল্যান্সনায়েক সুভদ্রা জয়সওয়াল আর ক্যাডেট নমিতা সেনগুপ্তা।

লেফটানেন্ট থিবার্স আমাদের 'স্ট্যান্ড-ঈজি' করে চলে যেতেই আমরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। ঘনিয়ে আসে কৌতূহলী মেয়ের দল। কী ব্যাপার? আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চীফ-অফ-স্টাফ মেজর-জেনারেল জে. কে. ভোঁসলের স্থান সর্বাধিনায়ক নেতাজির পরেই। স্বয়ং তিনি যখন পরিদর্শনে আসছেন তখন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশ আছে। সম্ভবত আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রস্তুত হয়ে গেছে। দুটি সম্ভাবনার কথা স্বতই মনে হচ্ছে আমাদের। হয় আমাদের ওপর আদেশ দেওয়া হবে রেঙ্গুন অবরোধে আমৃত্যু সংগ্রাম করে যেতে, অথবা সদলবলে বর্মার দক্ষিণাঞ্চলে হয়তো আমাদের সরে যেতে বলা হবে। যদি পশ্চাদপসরণই করতে হয় তাহলে পদব্রজে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। রেলগাড়ি ট্রাক প্রভৃতি যা কিছু যানবাহন রেঙ্গুনে আছে তা সবই জাপানিদের একান্ত প্রয়োজন—সৈন্য অপসারণের কাজে। মাসের পর মাস রেঙ্গুনেই এতদিন সবকিছু সংরক্ষিত করা হয়েছিল, রেঙ্গুনই ছিল জাপানি যুদ্ধ-প্রয়াসের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। ফলে কোনোরকম যানবাহন যে আমরা পাব এ সম্ভাবনা খুবই অল্প। বড় জোর আই.এন.এ.-র ওপর মহলের কয়েকজন অফিসারের জন্য ওরা হয়তো কিছু ট্রাক পাঠাবে। শত শত মেয়ের অপসারণের উপযুক্ত যানবাহন পাঠানো ওদের পক্ষে অসম্ভব। পায়ে হেঁটে যেতে আমাদের আর কিছু আপত্তি নেই—একটি মাত্র আশঙ্কা এই যে, প্রথমেই আমাদের যেতে হবে শত্রুসৈন্যের অভিমুখে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

একটা ম্যাপ এঁকে বোঝাতে পারলে আরো ভাল হত। রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককে যদি একটি প্লেন উড়ে যায় তবে তাকে যেতে হবে সোজা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে; কিন্তু রেঙ্গুন শহরের দক্ষিণে এবং পূর্বদিকে সমুদ্র—মার্তাবান উপসাগর। তাই হাঁটা-পথে ব্যাঙ্কক যেতে প্রথমেই আমাদের রওনা হতে হবে সিধে উত্তরমুখো—রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ধরে। অন্তত পঞ্চাশ মাইল উত্তরমুখো চলার পর আমাদের বাঁক নিতে হবে একেবারে প্রায় উলটো দিকে—দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ফলে প্রথম পঞ্চাশ মাইল আমাদের যেতে হবে যেদিক থেকে শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে সেদিকেই। উপায় নেই। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে সি-ফোর্থ ব্রিটিশ বাহিনীর বর্তমান অবস্থান রেঙ্গুন শহরের প্রায় আড়াইশ মাইল উত্তরে। পদব্রজে আমাদের ঐ প্রথম পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে অন্তত দু-রাত্রি লাগবে, কারণ দিনের বেলা আমরা পথ চলতে পারব না। সুতরাং এমন হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে যে আমরা দু-রাত্রি ধরে পায়ে হেঁটে যেখানে পৌঁছাব সেখানে দু-দিন ও দু-রাত্রে ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্রিটিশ সাঁজোয়া-বাহিনী উত্তর থেকে এসে হাজির হবে! কারণ দুশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সাঁজোয়া-বাহিনীর এর চেয়ে বেশি সময় লাগবে না! তাই আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে মনে হচ্ছে পশ্চাদপসরণ, বাস্তবক্ষেত্রে হয়তো তা হবে শত্রুব্যূহের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ধরা দেওয়া!

সুরক্ষিত রেঙ্গুন শহরে আমরা প্রতি ইঞ্চি জমি দখলের জন্য ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি—যাকে বলে স্ট্রিট ফাইটিং। ওয়ারস-স্টালিনগ্রাড-মস্কোতে যেমন হয়েছিল। পথের মোড়ে মোড়ে আমরা ব্যারিকেড রচনা করতে পারি। ঘরের ভেতর থেকে জানলা দিয়ে রাইফেলের নল বার করে প্রতীক্ষা করতে পারি—মলোটোভ কক্‌টেল ছুঁড়ে অমিতবিক্রম ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি—অথচ উন্মুক্ত প্রান্তরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্ক ও আর্মার্ড কারের বিরুদ্ধে এসব কোনো প্রতিরোধই সম্ভবপর নয়।

লেফটানেন্ট থিবার্স চলে যাওয়ার পরে সেই কথাই আলোচনা হল আমাদের মধ্যে। ল্যান্সনায়েক সুভদ্রা জয়সওয়াল বলে, সব তো বুঝলাম, কিন্তু এ ব্যাপারটা এতই সহজবোধ্য যে, মেজর-জেনারেল ভোঁসলে অথবা কিয়ানী এটা খেয়াল করেননি তা ভাবাই যায় না।

নমিতাদি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠেন, তা হোক, তবু যদি আমাদের ওপর মার্চ করে রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবার আদেশ আসে তা হলে আমাদের অভিলাষের কথা ওঁদের জানাতে হবে। ফৌজি আদেশ আমরা মানতে বাধ্য কিন্তু আমাদের আশঙ্কার কথা, আমাদের ইচ্ছার কথাও আমরা জানাব। তারপর যা আদেশ হবে তা আমরা নির্বিচারে মেনে নেব। আমার মত, এভাবে মৃত্যুর মুখে বোকার মতো এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমরা রেঙ্গুনেই থাকব, এই স্কুলবাড়িতেই। এখান থেকে শেষ লড়াই করব আমরা। ঝাঁসির রানী বাহিনীর একটি মেয়ে জীবিত থাকতে এই স্কুলদুর্গে ব্রিটিশবাহিনীর কেউ পদার্পণ করতে পারবে না। কী বলেন আম্মাজী?

সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা। সবাই তাঁকে সমীহ্ করে চলে। তিনি আমাদের সকলের আম্মাজি। শুধু বয়সে নয়—একমাত্র দৈহিক ক্ষমতা ছাড়া সব বিষয়েই তিনি আমাদের সকলের ঊর্ধ্বে। সেনাবাহিনীতে যোগদানের আগে তিনি ছিলেন ব্যাংককের একটি মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা। দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। চার-পাঁচটি ভাষা জানতেন। মালয়ী-বর্মী-ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী তো বটেই এমনকি জার্মান ও ফ্রেঞ্চ। সর্বাঙ্গে একটিও অলঙ্কার নেই—তিনি বিধবা। স্বামী আজাদি সৈন্যের উচ্চমহলের অফিসার ছিলেন—সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ভগবৎ-বিশ্বাসী এই ভদ্রমহিলাকে তাই আমরা অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করতাম। তিনি বললেন, লেফটানেন্ট থিবার্স তোমাদের তিনজনকে ডেকেছেন। যদি তিনি আমাদের রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন, তাহলে তোমরা এ ডিট্যাচমেন্টের সুচিন্তিত অভিমতটুকু তাঁকে জানিয়ে দিও। বোলো, এই স্কুলবাড়িতে যতগুলি বুলেট আছে তা শত্রু সৈন্যের ওপর নিঃশেষ হওয়ার আগে আমরা এ দুর্গের পতন হতে দেব না।

আমি বললাম—সবগুলি বুলেটই কিন্তু শত্রুসৈন্যের ওপর বর্ষিত হবে না আম্মাজি।

—কেন? ভ্রূকুঞ্চিত করে ঘুরে দাঁড়ান অধ্যাপিকা সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল।

—আপনি ভুলে গিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব তহবিলে তিনশ বুলেট আছে। আমরা তিনশ জন আছি এখানে। স্বয়ং নেতাজীর ছাড়পত্র।

আম্মাজী ম্লান হাসলেন। একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার খোঁপার ওপর। অস্ফুটে বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্বয়ং নেতাজির ছাড়পত্র।

চার

হঠাৎ কী যেন হল। আটচল্লিশটি মেয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুরো একটি মিনিট। কারো মুখে ভাষা নেই। ওরা জানে, আমরা কী কথা বলতে চাইছি। ওদের সকলেরই মনে পড়ে গিয়েছে সেই ঘটনাটার কথা। প্রায় ছয়মাস আগেকার একটি বিশিষ্ট দিন ফুটে উঠেছে আমাদের মানসপটে। সেদিন আমাদের বাহিনীর একটি মেয়ে শহিদ হয়েছিল। ঝাঁসির রানী বাহিনীর প্রথম শহিদ। বুকের রক্ত দিয়ে সে মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে তিনশ বুলেটের দাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, ঊর্মিলার চোখ দুটিতে জল ভরে এসেছে।

গত বছর অক্টোবর মাসের কথা। তখনো কোহিমা-ইম্ফল-কালাদান উপত্যকার ইতিহাস রচিত হয়নি। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সামরিক সমাবেশ হয়েছিল রেঙ্গুন শহরের সেন্ট্রাল পার্কে। প্রকাণ্ড ময়দান, কিন্তু তিলধারণের স্থান ছিল না মাঠে। প্রায় তিন হাজার আজাদি সৈন্য এই আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে যোগ দেয়। এছাড়া ছিল জাপানি সৈনিক ও অসামরিক লোকেরা। ঝাঁসির রানী বাহিনীতে তখন স্বেচ্ছাসেবিকার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। আরো কয়েক হাজার মালয়-শ্যাম-বর্মা প্রবাসী ভারতীয় মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা হবার জন্য নাম লিখিয়েছে কিন্তু শিক্ষাদান প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাদের দলে নেওয়া যায়নি। আমরা প্রায় শ-পাঁচেক মেয়ে উপস্থিত ছিলাম সেই আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে। আমরা ছিলাম দক্ষিণভাগের অগ্রণী দল।

সামনে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল, মানুষভর উঁচু। তার ওপর উড়ছে তেরঙা ঝান্ডা। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়া—নারকেল গাছের সারি বারে বারে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে নত হয়ে। আকাশে ভাসছে শরৎকালের তুলো-পেঁজা মেঘ। পশ্চাৎপটের সেই সুনীল চালচিত্রের সম্মুখে গর্বোন্নত শির তেরঙা-ঝান্ডার কী বাহার! মণ্ডপের ওপর বসেছেন প্রধান প্রধান জাপানি জেনারেল, কিকানের প্রতিনিধিবৃন্দ—জেনারেল ইয়ামামোতো, ইসোডা এবং কাগাওয়া। বসে আছেন বর্মার রাষ্ট্রপ্রধান ডঃ বা ম', সি-ইন-সি জেনারেল যুঙ-সাঙ এবং পররাষ্ট্রসচিব মঁসিয়ে থাকিন-নু। এ ছাড়া রেঙ্গুন শহরের অনেক বিশিষ্ট অতিথি, নগরপ্রধান, বিশিষ্ট ফুঙ্গি, এবং আজাদি ফৌজের সর্বোচ্চ অফিসারবৃন্দ। সবচেয়ে বড় কথা—মধ্যমণি স্বয়ং নেতাজী।

প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত গীত হল : 'শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা—'

বিরাট জনমণ্ডলী নতমস্তকে ভারতীয় মুক্তিফৌজের জাতীয়-সঙ্গীতকে সম্মান জানাল। আমরা

চর্মচক্ষে অনেকেই দেখিনি ভারতবর্ষকে, মনশ্চক্ষে দেখতে থাকি—'সূরজ বন কর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা—'

তারপর মাইকের সামনে এগিয়ে এলেন নেতাজী। সেদিন বুঝতে পারলাম কী যাদু আছে তাঁর কণ্ঠে—যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ে মুহূর্তে। যুগ যুগ ধরে কত দেশে কত সৈন্যদলকেই তো তাদের সর্বাধিনায়ক উদ্বুদ্ধ করতে বক্তৃতা দিয়েছেন। আলেকজান্ডার-সীজার-হ্যানিবল-নেপোলিয়ান—কে নয়? সকলেই সৈন্যদলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নানানভাবে। বলেছেন, 'আমার পতাকাতলে সমবেত হও, আমি তোমাদের নিয়ে বিশ্ব জয় করব, তোমাদের সামনে খুলে দেব বিজিত রাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডার।' কিন্তু এমন উলটো কথা কে কবে বলেছে? কোন দেশে কোন কালে সৈন্যদের সম্বোধন করে সর্বাধিনায়ক বলতে সাহস পেয়েছেন :

'তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের অজাত সন্তান-সন্ততিকে। তাদের স্বাধীনতা দেব আমি। বিনিময়ে চাইছি আজ তোমাদের বুকের রক্ত।'

কে বলতে পেরেছে—'বন্ধুগণ! সৈন্যগণ! আপনাদের রণনীতি হবে—দিল্লি চলো, চলো দিল্লি! জানি না আমরা কতজন এই মুক্তি সংগ্রাম-সমুদ্র অতিক্রম করে সশরীরে ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছাব। কিন্তু একথা ধ্রুবসত্য যে আপনার-আমার মৃত্যু হলেও অন্তিমে আমাদের বাহিনী জয়যুক্ত হবেই। আমাদের রণক্লান্ত অবশিষ্ট সেনাদল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান অতিক্রম করে অচিরেই একদিন দিল্লির লালকেল্লায় বিজয়কেতন ওড়াবে।'

কে বলতে পেরেছে—'আমি শুধু এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, পরাজয়ে-বিজয়ে সর্বাবস্থায় আমি আপনাদের পাশে পাশে থাকব। আপাতত আমি আপনাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দৈহিক যন্ত্রণা, দুঃসহ অভিযান এবং শহিদের মহামৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারছি না। আমাদের মধ্যে কে কে যুদ্ধাবসানে বেঁচে থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে পাবে সেটা বড় কথা নয়—সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—শতাব্দী-শৃঙ্খলিতা ভারতজননী স্বাধীন হবেনই। আর সেই আজাদি অর্জনে আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত অকপটে দান করে যাব! ঈশ্বর! তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর। আমরা যেন মাথা উঁচু রেখে মৃত্যুবরণের শৌর্য থেকে বঞ্চিত না হই!'

শেষ হল নেতাজীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। হাজার হাজার মানুষ স্তব্ধ, ভাবাবিষ্ট। তাদের চোখে জল। একটি শব্দ উঠছে না কোথাও। আধ মিনিট পরে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে সমস্ত ময়দান সমস্বরে পুকার দিয়ে ওঠে—নেতাজী জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ!

এবার শুরু হবে মার্চ পাস্ট। সৈন্যদল মার্চ করে নেতাজীর সম্মুখ দিয়ে সামরিক অভিবাদন জানিয়ে চলে যাবে। 'লেডিস ফার্স্ট' আইন অনুসারে কিনা জানি না, সবার আগে যাবে ঝাঁসির রানী বাহিনীর পাঁচশ মেয়ে।

লেফটানেন্ট জানকী থিবার্সের কণ্ঠে ধ্বনিত হল— অ্যাটেনশন!

পাঁচশ নারী সৈনিক মুহূর্তমধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়াল।

ফৌজী আদেশ এল—সামরিক অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে মঞ্চের সম্মুখভাগ দিয়ে মার্চ করে চলে যাও।

* * *

রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুনীল আকাশের তলায় কী সুন্দর আয়োজন। রেঙ্গুন শহরের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বাচ্চা দলে দলে সমবেত হয়েছে উৎসবের সাজে। মাঠের বাইরে সুলে ফয়ার ধারে চানাচুর, বেলুন আর আইসক্রীম বিক্রি হচ্ছে। মনে হচ্ছে না যে আমরা একটা মরণপণ যুদ্ধের মধ্যে বাস করছি। মাঠের বাইরে গাছের ওপরেও উঠেছে অনেকে আমাদের মার্চ পাস্ট দেখতে। নারী সেনাবাহিনী এর আগে কখনো দেখেনি বর্মার মানুষ। মাথা উঁচু রেখে বাম হাতে রাইফেল নিয়ে এবং ডান হাতে তাকে স্পর্শ করে আমরা 'আইজ্ রাইট' করলাম। গুড়গুড় করে বেজে উঠল ফৌজী ড্রাম। নেতাজীর একধাপ নিচে দাঁড়িয়ে আছেন ঝাঁসীর রানী বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা ডক্টর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। পেছনের সারিতে মেজর-জেনারেল ভোঁসলে, জামান কিয়ানী, শাহনওয়াজ খান, চ্যাটার্জি প্রভৃতিরা।

এক এক সারিতে আমরা তিনজন। দলের সম্মুখে দলনেত্রী লেফটানেন্ট থিবার্সের হাতে সামরিক পতাকা। তারপরেই ব্যান্ড পার্টি। আমরা তার পেছনে। মরালভঙ্গিতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মাঠের আকাশ-বাতাস মথিত করে জেগে উঠল এক তীব্র আর্তনাদ। জাপানি সাইরেন! বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত! মৌমাছির চাকে যেন ঢিল পড়ল। মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। লোকজন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করছে। অসামরিক দর্শকদের মজা দেখা মাথায় উঠল। প্রাণভয়ে ছুটছে সঙ্গিনীর হাত ধরে, বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে। গেটটার কাছে চাপ ভিড়। ভগবান রক্ষা করেছেন। চাপের চোটে ভেঙে পড়ল বেড়াটা। বন্যা-নিরোধী বাঁধ ভেঙে পড়ার পর যেন জলস্রোত। অদূরের জাপানি বিমানঘাঁটি থেকে এক ঝাঁক জঙ্গী বিমান আকাশে উড়ল। প্যারেড-গ্রাউন্ডকে চক্রাকারে বেষ্টন করে উঠে গেল নীল আকাশের দিকে—মিলিয়ে গেল ক্রমে পূর্ব দিগন্তে শত্রু-বিমানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। মাঠ ভেঙে জাপানি সৈন্যের দল ছুটেছে পরিখার দিকে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। প্রাণধারণের তাগিদে কাজ।

লক্ষ্য করে দেখলাম জাপানি জেনারেল নেতাজীর কর্ণমূলে কিছু একটা নিবেদন করলেন। নেতাজী নির্বিকার প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন অভিবাদন গ্রহণের সামরিক ভঙ্গিমায়। পরমুহূর্তেই দেখলাম মণ্ডপের ওপরটা অর্ধেক খালি হয়ে গেল। জাপানি ও বর্মী সামরিক অফিসারের দল রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছেন পরিখার দিকে। শুধুমাত্র আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সকলে দাঁড়িয়ে আছেন নিস্পন্দ হয়ে।

বিপদসূচক সাইরেনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ থামতেই কানে গেল আমাদের ব্যান্ডপার্টির তালে তালে বাজনা। এতক্ষণ সাইরেনের শব্দে চাপা পড়েছিল সেটা। চতুর্দিকেই ব্যস্ততা, ছোটাছুটি, দৌড়। শুধুমাত্র আমরা কটি প্রাণী সারবেঁধে চলেছি মরাল পদক্ষেপে—আর শুধুমাত্র প্যান্ডেলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার, পাথরের মূর্তির মতো। মাঝখানে নেতাজী।

মিনিট চার-পাঁচের মধ্যেই এসে গেল এক ঝাঁক শত্রুবিমান। বোমারু আর ফাইটার। উত্তর দিক থেকে। প্রথমে মনে হল বহু উঁচুতে রয়েছে তারা। সূর্যসাক্ষী একঝাঁক চিলের মত। তারপর একে একে বিদ্যুৎগতিতে তারা ছোঁ মেরে নেমে এল রেঙ্গুন শহরকে লক্ষ্য করে। আমেরিকান আর ব্রিটিশ বৈমানিকের শ্যেনদৃষ্টিতে নিশ্চয় ধরা পড়েছে সেন্ট্রাল পার্কের এই লোভনীয় জনসমাবেশ। সব খাকি পোশাক! একটি মাত্র বোমার আঘাতে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নিশ্চিহ্ন করে দেবার দুর্লভ সুযোগ হাতছানি দিয়েছে দুঃসাহসী বৈমানিককে। এদিকে জাপানি পাইলটের দলও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এসে পড়েছে ওদের ওড়ার পথে। প্যারেড-গ্রাউন্ডের ওপরের আকাশে অদৃষ্টপূর্ব এক বিমানযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মেশিনগানের গুলি-বিনিময় হচ্ছে ঊর্ধ্ব আকাশে।

সুবুদ্ধি বলে এ দুঃসময়ে পরিখার নিরাপদ আশ্রয়ই একমাত্র কাম্য। অথচ নেতাজী নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। ফলে লেফটানেন্ট থিবার্সও আমাদের 'ডিসপার্সের' অর্ডার দিতে পারছেন না। ঝাঁসির রানী বাহিনীর মেয়েরা অচঞ্চল পদক্ষেপে নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মার্চ পাস্ট করে যাচ্ছে একে একে—সারির পরে সারি। যেন কিছুই হয়নি। যেন বাইরের দুনিয়ার প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই নেই। হঠাৎ একটি ফাইটার শত্রু-বিমান চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতায় দলছুট হয়ে ছোঁ মেরে নেমে এল প্যারেড-গ্রাউন্ডের দিকে। যেন সুইসাইড-স্কোয়াডের পাইলট! মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এসে গেল বিমানখানা—প্রায় সুলে ফয়ার সোনালি চূড়ার গায়ে লাগে আর কি! তীব্র বেগে এগিয়ে এল মেশিন-গানিং করতে করতে। প্যারেড-গ্রাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটি বিমানধ্বংসী অ্যাক্-অ্যাক্ কামানও ক্রোধে গর্জে উঠল তৎক্ষণাৎ। শত্রুবিমানটি এত নিচে নেমে এসেছে যে বিমানধ্বংসী কামানকে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করতে হচ্ছে প্রায় একেবারে জমির সমান্তরালে। তারই একটি গোলা এসে লাগল আমাদের বাহিনীর একটি মেয়ের মাথায়। ডিরেক্ট হিট্! মুহূর্তে কাঁধ থেকে মেয়েটির মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু তাই নয় মুণ্ডুটার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। রক্তাপ্লুত তার দেহটি লুটিয়ে পড়ল মণ্ডপের সম্মুখে। এক অঞ্জলি রক্তের অর্ঘ্যে সে যেন রেখে গেল নেতাজীর উদ্দেশ্যে তার শেষ প্রণতি!

আমাদের লাইন ভাঙল না, কেউ 'আইজ্-রাইট'কে 'আইজ্-লেফট' করে এক নজর দেখেও নিল না ঠিক মণ্ডপের নিচে কাটা-পাঁঠার মতো ঐ যে কবন্ধটা থরথর করে কাঁপছে সেটা কার দেহাবশেষ!

তাল কাটল না পদক্ষেপে কিংবা ড্রামের কাঠিতে। একই ভঙ্গিতে একই ছন্দে আমরা এগিয়ে গেলাম সামরিক অভিবাদন জানিয়ে।

দুটি স্বেচ্ছাসেবিকা স্ট্রেচারে করে কবন্ধটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কেউ ফিরে তাকাল না সেদিকে।

শুনেছি সেই শত্রুবিমানটিতে ছয়-ছয়টি মেশিনগান ছিল। বড় ফাইটার বিমান! ওরা যদি মেশিনগান চালাবার সুযোগ পেত তাহলে নেতাজী এবং ঝাঁসির রানী বাহিনীর মেয়েদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। তাই বিমানধ্বংসী কামানের সৈনিক নিরুপায় হয়েই ওভাবে মাটি-সই করে গোলা ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলে শত্রু বৈমানিক মেশিনগানের বোতামে হাত ছোঁয়াবার সুযোগ পায়নি—বিমানধ্বংসী কামানের ব্যূহ ভেদ করে আত্মরক্ষাতেই ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল তাকে। অর্থাৎ বলা যায় আমাদের দলের সেই মেয়েটি জীবন দিয়ে পরোক্ষভাবে জীবন দিয়ে গিয়েছে আমাদের এবং আমাদের প্রিয় নেতাজীর।

জানি, আপনারা জানতে চাইবেন মেয়েটির নাম। বিশ্বাস করুন, তার নামটা ভুলে গিয়েছি। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ইরাবতী-চিন্দুইন দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে তারপর। তাই সেই মেয়েটির নামটাও আজ ঝরা পাতার চেয়েও অকিঞ্চন। আর ভেবে দেখুন, মনে রাখলেই-বা কী হত? ঝাঁসির রানী বাহিনীর সেই প্রথম শহিদের নামে তো আর আপনারা কোনো শহিদ-মিনার তৈরি করতেন না তথাকথিত 'বিনা-রক্তপাতে-স্বাধীন' ভারতবর্ষে!

* * *

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ এল লেফটানেন্ট থিবার্সকে ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং সর্বাধিনায়ক। আমি ছিলাম দলনেত্রীর দক্ষিণহস্ত—তাই সঙ্গে গিয়েছিলাম, আর তাই সেই জনান্তিক আলাপচারী স্বকর্ণে শুনবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। নেতাজী যে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন তা স্বকর্ণে শুনেছিলাম। এ আমার প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী।

প্যারেড-গ্রাউন্ড তখন প্রায় নির্জন। গেটের সামনে খান দশ-বারো গাড়ির কনভয়। জীপ আর ওয়েপন-কেরিয়ার। সামনের দিকে দ্বিতীয় গাড়িখানার বনেটে সর্বাধিনায়কের পতাকা। দাঁড়িয়ে আছেন পাশাপাশি নেতাজী, মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানী, কর্নেল হবিবর রহমান এবং চীফ-অফ-স্টাফ। আমরা দুজনে গিয়ে দাঁড়ালাম ওঁদের সামনে। সসম্মান সামরিক অভিবাদন করলাম।

নেতাজী প্রশ্ন করলেন ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে। কী নাম, পরিচয়, কোথায় বাড়ি, রেঙ্গুনে কেউ আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অল্পবয়সী একজন তরুণ, অসামরিক বেশে। একটি নোটবইতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শর্টহ্যান্ড নোট নিচ্ছিলেন তিনি। পরে শুনেছি তাঁর নাম ভাস্করণ, কেরালার মানুষ—নেতাজীর স্টেনো। নেতাজী আদেশ দিলেন পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় যেন মেয়েটির অন্তিমকার্য সম্পন্ন করা হয়। বললেন, তাঁকে যেন সমস্ত সময়সূচি পূর্বাহ্ণে জানানো হয় যাতে তিনি নিজে উপস্থিত থাকতে পারেন সৎকারের সময়। তারপর বললেন—ভেবেছিলাম আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ শুরু করলে তোমাদের বাহিনীকে মেমিওতে পাঠিয়ে দেব। সেখানকার হাসপাতালে তোমরা সেবা-শুশ্রূষা করা শিখবে; কিন্তু আজকের ঘটনায় আমি মতটা বদলেছি। তোমাদের দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। এক শ্রেণীর কাজ হবে হাসপাতালে সেবা-শুশ্রূষা করা, দ্বিতীয় দলের কাজ হবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তা হলেও প্রত্যেকটি রানীকে রাইফেল চালানো এবং নার্সিং শিখে রাখতে হবে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের কাছ থেকে তোমরা বিস্তারিত আদেশ পাবে।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে স্যালুট করলাম।

নেতাজী জীপের দিকে ফিরেছিলেন। হঠাৎ কী ভেবে আবার এলেন। বললেন, তোমরা আজ যে দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছ তাতে আমি গর্বিত। আমি বিশ্বাস রাখি তোমাদের এ সাহস শেষদিন পর্যন্ত অটুট থাকবে।

আমরা দুজন অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকি। মেজর-জেনারেল ভোঁসলে একবার চকিতে তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বোধকরি ওঁদের কোনো জরুরি কাজ আছে—দেরি হয়ে যাচ্ছে—এ তারই ইঙ্গিত। নেতাজী কিন্তু সে ইঙ্গিতে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

বরং আমাদের দিকে আর এক পা এগিয়ে এসে বললেন—আমার ভাষণে একটু আগেই বলেছি আজ আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারব না—ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর মৃত্যুই শুধু উপহার দিতে পারি। কিন্তু আজ তোমরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ তারপর তোমাদের এখনই কিছু একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত। তাই নয়?

আমরা দুজনে যেন ব্রোঞ্জে গড়া দুটি নারীমূর্তি।

নেতাজী তাঁর সহকর্মীর দিকে ফিরে বললেন—মেজর-জেনারেল ভোঁসলে!

ক্লিক করে জুতোর নালে নালে শব্দ উঠল। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর চীফ-অফ-স্টাফ অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন সর্বাধিনায়কের আদেশের অপেক্ষায়।

—আমি নিজে সশরীরে পৌঁছাতে পারি আর নাই পারি, কলকাতা শহরে যদি কোনোদিন আজাদ হিন্দ্ বাহিনী প্রবেশ করে তবে এই ঝাঁসির রানী বাহিনীই থাকবে তার পুরোভাগে। এ আমার অপরিবর্তনীয় আদেশ! লিখে রেখ তোমার নোটবইতে!

চীফ-অফ-স্টাফ সামরিক অভিবাদন করলেন।

ভাস্করণ কয়েকটি পেনসিলের আঁচড় টানলেন তাঁর নোটবইতে।

* * *

বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। কলকাতা শহর আমি দেখিনি। শুনেছি, নেতাজী নাকি এককালে তার নগরপ্রধান ছিলেন। শুনেছি, সিঙ্গাপুরের চেয়েও নাকি বড় সে শহর। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম সিঙ্গাপুরের ব্যাটারি রোডের চেয়েও চওড়া অজানা কলকাতার কোনো অচেনা রাজপথ দিয়ে বিজয়োল্লাসে মার্চ করে চলেছে মুক্তিফৌজ। আর তার পুরোভাগে চলেছি রণক্লান্তা রক্তস্নাতা আমরা কজন ভারতীয় নারী—ঝাঁসির রানীর উত্তরসাধক! ওপরের বাতায়ন থেকে, অলিন্দ থেকে মুহুর্মুহু পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দুর্বোধ্য কলকাত্তাইয়া ভাষায় ওরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, আর প্রত্যুত্তরে আমরা বলছি—নেতাজী জিন্দাবাদ! বলছি : জয় হিন্দ্!

সংবিৎ ফিরে পেলাম নেতাজীর কণ্ঠস্বরে। লেফটানেন্ট থিবার্সের দিকে ফিরে উনি বললেন, কই তুমি তো কিছু বললে না?

লেফটানেন্ট থিবার্স সসম্ভ্রমে বললেন, এ অমূল্য দান ঝাঁসির রানী বাহিনীর পরম গৌরব। কিন্তু এদের তরফ থেকে আমার একটি ভিক্ষা আছে—

—ভিক্ষা? ভ্রূকুঞ্চিত হল নেতাজীর। নিজে তিনি কখনো কারো কাছে কিছু চাইতেন না। তাঁর কাছে কিছু চাইলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন। কারণ হৃদয় উদার হলে কী হয়, আর্থিক অসঙ্গতি তাঁর লেগেই ছিল। আপনারা জানেন কিনা জানি না, জার্মানিতে থাকতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নেতাজী ফ্যুরারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের তরফে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। পূর্ব-এশিয়াতেও তাঁকে অর্থকৃচ্ছ্রতায় ভুগতে হয়েছে, তবু তিনি ওরই ভিতর থেকে উনিশশ চুয়াল্লিশ সালে টোকিওতে জার্মান রাষ্ট্রদূতের হাতে আজাদ হিন্দ সরকারের তরফে পাঁচ লক্ষ ইয়েন জাপানি মুদ্রায় পরিশোধ করেছিলেন। ঋণ শোধের প্রথম কিস্তি। ঘটনাচক্রে অবশ্য সেই শেষ কিস্তি—কারণ স্বাধীন ভারত আর বাকিটা শোধ দেয়নি।

যাক, যা বলছিলাম। ভ্রূকুঞ্চিত করলেও নেতাজী বলেন—বেশ, বল।

—আপনার কাছে আমি পাঁচশ বুলেট ভিক্ষা করছি। এ যুদ্ধে কী প্রচণ্ড আয়াসে আপনি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করছেন তা আমি জানি। তবু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনার কাছ থেকে এই পাঁচশ বুলেট ভিক্ষা চাইছি আমি।

নেতাজী বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যেন। চিন্তিত নন, কৌতূহলী। বলেন, এত বুলেট নিয়ে কী করবে তোমরা?

—আমার বাহিনীর প্রতিটি মেয়েকে একটি করে তাজা বুলেট উপহার দেব। সে বুলেট শত্রুর ওপর বর্ষিত হবে না। জীবন্ত ধরা পড়ার উপক্রম হলে সেটা নিজের ওপর ব্যবহার করার ছাড়পত্র চাই আমি!

দৃশ্যটা আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। পুরো একটি মিনিট নেতাজী কোনো জবাব দেননি। দূর দিগন্তের

দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্বাক। তারপর সামরিক নিয়ম লঙ্ঘন করে হঠাৎ জানকীদির মাথার ওপর হাতটা রাখলেন নিতান্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে। অস্ফুটে যেন কিছু বললেন। মন্ত্রোচ্চারণ না আশীর্বাদ? পরমুহূর্তেই শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। টেনে নিলেন হাতখানা। নেতাজীর বর্মের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন দরদী-সমাজসেবক দার্শনিক সুভাষচন্দ্র।

এক লাফে উঠে বসলেন জীপে।

আমাদের দিকে ফিরে স্পষ্ট উচ্চারণ করে শুধু বললেন—গ্রান্টেড!

কনভয় চলে গেল সামনের সড়ক দিয়ে, ধুলোর ঝড় তুলে।

আমরা তখনো স্যালুট করে দাঁড়িয়ে আছি দুজন।

পাঁচ

কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, লেফটানেন্ট থিবার্সের আদেশানুসারে আমরা তিনজন এসে উপস্থিত হলাম তাঁর অফিসঘরে। আমি, ল্যান্সনায়েক সুভদ্রা জয়সওয়াল আর ক্যাডেট নমিতা সেনগুপ্তা। সুভদ্রা আমারই সমবয়সী; নমিতাদি বয়সে আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়। নমিতাদি মৌলমিনে ছিলেন যুদ্ধের আগে। ওঁর স্বামীর ছিল কাঠের ব্যবসা। বর্মা থেকে সেগুন কাঠ চালান দিতেন কলকাতার বাজারে। যুদ্ধের ডামাডোলে ব্যবসা উঠে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নাম লেখালেন আজাদি ফৌজে। স্বামী সুবিনয় সেনগুপ্ত একেবারে প্রথম দলে চলে গিয়েছিলেন সম্মুখ রণাঙ্গনে—সুভাষ ব্রিগেডে। হাকা-ফালম অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে নমিতাদির কাছে তাঁর চিঠি আসত। সেদিনটা নমিতাদির ক্যালেন্ডারে লাল-তারিখের দাগ দেওয়া।

সুভদ্রা আমার বয়সী। আমারই মতো অবিবাহিতা। অথচ মজা হচ্ছে ওর ডাক নাম 'ভাবিজী'। আমাদের রানী বাহিনীর সবাই ওকে ডাকে 'ভাবিজী' বলে। একটি কুমারী মেয়েকে এমন অদ্ভুত নামে কেন সবাই ডাকে জানি না। ও কিন্তু একটুও রাগ করত না। ভারি মিষ্টি স্বভাব ওর। তাছাড়া ঐ ভাবিজীই ছিল আমাদের বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, এক মাথা ঘন কালো চুল—গায়ের রঙ ছিল মেমেদের মতো। আর সবচেয়ে সুন্দর ওর দুটি চোখ। কাজল আমরা কেউই দিতাম না চোখে, কিন্তু বিনা কাজলেই ওর চোখ দুটি কাজল-কালো বলে মনে হত। সব সময়েই সে হাসছে, না হয় গুনগুন করে গান গাইছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার ঐ 'ভাবিজী' নামটা এল কোথা থেকে। সুভদ্রা হাসত, বলত গান্ধী ব্রিগেডের কোনো কোম্পানিতে ওই বুঝি ছিল একমাত্র মেয়ে নার্স। সব জওয়ান ভাইরা ওকে ঐ নামটা উপহার দিয়েছিল। নাম ধরে তো আর ডাকতে পারে না, দিদি-টিদি কিছু একটা পাতাতেই হয়। তা ওরা সবাই দুষ্টুমি করে ওর সঙ্গে 'বৌদি' পাতিয়েছিল। আমি বলতাম, ছেলেদের রুচি আছে—ঐ 'বৌদি' নামটাই তোকে সবচেয়ে বেশি মানায়। এখন দরকার শুধু উপযুক্ত একজন 'দাদা'র।

সুভদ্রা তার কুন্দশুভ্র একসার দাঁত বার করে হাসত, বলত—ঐ দাদাটিই এখনও জোটেনি! কী দুঃখের কথা বল?

আমি বলতাম, বেশ, আমিই না হয় সেটা জোগাড় করে দেব!

ও হেসে বলত—তোর তো সম্বল কুল্লে একজন—ঐ ছোটলাট, পারবি প্রাণ ধরে আমাকে দিয়ে দিতে?

দুম করে এক কিল বসিয়ে দিতাম আমি, ওর প্রশ্নের জবাবে।

আম্মাজী সরস্বতীবাঈ বিধবা। সন্তান-সন্ততি নেই। স্বামী ছিলেন গান্ধী ব্রিগেডের সহকারী কম্যান্ডান্ট মেজর বি. জে. এস. গারেওয়াল। মালয়ের গান্ধী ব্রিগেডের ট্রেনিং ক্যাম্পে এবং ইম্ফল অভিযানের প্রথম পর্যায়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করায় তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। তারপর কোনো এক বিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধে তিনি নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। যুদ্ধাবসানে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিষ্ঠাবান আম্মাজীর স্বামীর সৎকারই হয়নি তাই। উনি ছিলেন দর্শনের ছাত্রী। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। পাষাণের মতো এ আঘাত গ্রহণ করেছেন অবিচল চিত্তে।

*　　　　*　　　　*

আমরা তিনজনে দলনেত্রীর ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। মিসেস থিবার্স আমাদের বসতে বললেন। আয়াকে ডেকে একপট চায়ের অর্ডার দিলেন আর বিস্কুট। জানকীদি বলেন, আপনাদের কেন ডেকেছি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। আজ সকালেই চূড়ান্ত আদেশ এসেছে। রেঙ্গুনের পতন অবশ্যম্ভাবী, তার মানে যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে মাত্র।

নিশ্বাস নেবার জন্য মিসেস থিবার্স একমুহূর্ত থামতেই ল্যান্সনায়েক ভাবিজী বলে ওঠে—আমাদের কিন্তু মনে হচ্ছিল আমরা এখানে থেকে গেলেই ভালো করতাম।

ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে মিসেস থিবার্সের, বলেন—কেন? এমন কথা মনে করার মানে?

—এখানে থাকলে আমরা শেষ-সৈনিক পর্যন্ত লড়াই করতে পারতাম। কিন্তু খোলা মাঠের মাঝখানে সাঁজোয়াবাহিনীর সঙ্গে—

বাধা দিয়ে লেফটানেন্ট থিবার্স বলে ওঠেন—কে বলেছে আপনাদের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? আমরা তো রাতারাতি পশ্চাদপসরণ করছি মাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে তো বলা হচ্ছে না।

আমরা ম্যাপ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা বিছিয়ে আমাদের যুক্তিগুলি পেশ করতে থাকি। কিন্তু মাঝপথেই আমাদের থামিয়ে দিয়ে উনি বলেন, আপনারা ভুল বুঝেছেন। পায়ে হেঁটে আপনাদের যেতে হবে না। জাপানি কিকান অফিস থেকে আমাদের জন্য একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে।

—স্পেশাল ট্রেন? আমরা অবাক হয়ে যাই।

আয়া চারটি কাপ টিপট আর বিস্কুটের একটি থালা রেখে গিয়েছিল। গৃহকর্ত্রী সুনিপুণ হাতে আমাদের চা ঢেলে দিলেন। দুধ আর চিনির পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন—হেল্‌প ইওরসেল্‌ভস্।

নিজেও একটি পেয়ালা টেনে নিয়ে বেশ খোশমেজাজে গল্প করার ভঙ্গিতে বলেন, তাহলে খুলেই বলি। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

লেঃ থিবার্সের কাছ থেকে পরিস্থিতিটা পরিষ্কার করে নেওয়া গেল। নেতাজী স্বয়ং নাকি প্রথমটায় রেঙ্গুন ত্যাগ করে যেতে অসম্মত হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল হয় এখানেই আমৃত্যু যুদ্ধ করবেন, অথবা ধরা দেবেন। শেষে তাঁর সমরসচিবদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি শহর ত্যাগ করে যেতে সম্মত হয়েছেন। জাপান সরকার নেতাজীর জন্য একটি বিশেষ প্লেন পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বিমানযোগে রেঙ্গুন ত্যাগ করতে রাজি হননি। তিনি জানতেন যে, বিমানযোগে যদি তিনি চলে যান তাহলে ঝাঁসির রানীবাহিনীর রেঙ্গুনস্থ্ এই তিনশত মেয়ে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হবে। সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না তিনি। তাই নেতাজী জাপানি মন্ত্রী হাচাইয়ার কাছে সংবাদ পাঠালেন—বিমানের পরিবর্তে তিনি একটি ট্রেন চাইছেন। যাতে রানী বাহিনীর মেয়েদের নিয়েই তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করতে পারেন।

হাচাইয়া রাজি হলেন, কিন্তু তিনি বলে পাঠালেন—জাপান সরকারের ইচ্ছা নেতাজী স্বয়ং তাঁর প্রধান সহচরদের নিয়ে মোটরযোগে রওনা দিন। এই গাড়ির ক্যারাভান আজ সন্ধ্যার মধ্যেই নেতাজীর আবাসে হাজির হবে এবং সন্ধ্যা সাতটায় রেঙ্গুন ত্যাগ করবে। পাঁচখানি রেকসমেত একটি এঞ্জিনও তৈরি থাকবে রাত সাড়ে সাতটায়—রেঙ্গুন স্টেশনের অদূরে লোকোশেডে। রানীবাহিনীকে নিয়ে সে ট্রেন রওনা হবে রাত আটটায়।

নেতাজী এ প্রস্তাবে রাজি হলেন কিন্তু তিনিও আবার বলে পাঠালেন রাত সাতটায় তিনি রওনা হতে পারবেন না। রেঙ্গুন ত্যাগ করার আগে তাঁকে কতকগুলি জরুরি আদেশ দিয়ে যেতে হবে। যারা এখানে থেকে যাবে তাদের কিছু নির্দেশ দিয়ে যেতে হবে তাঁকে। তাই রাত নটার সময় তিনি মোটরযোগে রওনা দেবেন। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে নেতাজী নাকি লিখেছিলেন, যে জাপানি অফিসার কনভয়টিকে ওঁর সদর দফতরে নিয়ে আসবেন তিনি যেন রেঙ্গুন স্টেশন ঘুরে আসেন—কারণ রেঙ্গুন ত্যাগ করার পূর্বে তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে যেতে চান ঝাঁসির রানীবাহিনীকে নিয়ে ট্রেনটি রওনা হয়ে গিয়েছে।

* * *

এই জাপানি মন্ত্রী হাচাইয়ার সঙ্গে ইতিপূর্বেই নেতাজীর কিছু মনোমালিন্য ঘটেছিল। মনোমালিন্য ঠিক নয়। হাচাইয়ার মাধ্যমে জাপান সরকারকে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন নেতাজী। জাপানিরা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক। প্রটোকলের পান থেকে চুনটুকু খসে গেলে তাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। জাপানি বুরোক্র্যাসির এই মাছিমারা মনোভাবের জন্য নেতাজীকে বারে বারে বিব্রত হতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, অথচ জাপানি প্রটোকলের অনড় প্রাচীরে বারবার নেতাজীর উদ্যম ব্যাহত হয়েছে। একটা ছোট্ট অথচ মারাত্মক উদাহরণ দিই। বার্লিন থেকে ডুবোজাহাজে টোকিও রওনা হবার দুঃসাহসিক অভিযান যখন সম্পূর্ণ তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে জাপান সরকার এক নতুন ঝামেলা বাধালো। জাপানি নৌ-সেনাপতি জানালেন যে, যুদ্ধকালে কোনো অসামরিক ব্যক্তিকে জাপানি যুদ্ধজাহাজে নাকি বহন করার আইন নেই। এজন্য বিশেষ অনুমতি চাই। এই আপত্তির কথা যখন জার্মানিতে জাপানি রাষ্ট্রদূত কুণ্ঠিতভাবে পেশ করলেন তখন জার্মানির ব্যারন ভন ট্রট টোকিওতে একটি টেলিগ্রাম করেন 'সুভাষচন্দ্র বসু কোনোক্রমেই অসামরিক ব্যক্তি নন। তিনি ভারতীয় মুক্তিফৌজের সি-ইন-সি'! ব্যস, তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল বুরোক্র্যাটিক জাপান!

এই সবেরই একটা বদলা নিয়েছিলেন নেতাজী। রেঙ্গুনের জাপানি সরকারি অফিস কিকানের কর্ণধাররূপে হাচাইয়া যখন বদলি হয়ে এলেন তখন তিনি নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কার্টসি ভিজিট। প্রটোকলের তাই নির্দেশ। নেতাজীর সেক্রেটারি তাঁকে সসম্মানে পাশের ঘরে বসিয়ে নেতাজীকে খবর দিতে গেল—মহামান্য জাপান সরকারের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রী জেনারেল হাচাইয়া নেতাজীর দর্শনপ্রার্থী। নেতাজী অম্লানবদনে সাক্ষাৎপ্রার্থীর পরিচয়পত্র চেয়ে পাঠালেন। হাচাইয়ার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি জাপানের একজন মন্ত্রী, সবাই তাঁকে চেনে। তাঁর আবার পরিচয়পত্র কী? কিন্তু প্রটোকলের নাকি তাই নির্দেশ। স্বাধীন ফৌজের সর্বাধিনায়কের সামনে যাঁকে হাজির করা হবে তাঁর ক্রেডেনশিয়াল আগে যাচাই হওয়া চাই। হাচাইয়া বলে পাঠালেন পরিচয়পত্র তিনি সঙ্গে করে আনেননি। নেতাজী বলে পাঠালেন তিনি দুঃখিত, সাক্ষাৎ হবে না! স্বাধীন জাপানের প্রতিনিধি সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন স্বাধীনতাকামীর দ্বার থেকে।

* * *

সেই হাচাইয়া! আজ বুঝি ঘটনাচক্রে তাঁর বদলা নেবার সুযোগ এসেছে। কিন্তু তাই-বা বলি কী করে? ওদিকে টোকিও থেকে হাচাইয়ার ওপর গোপন নির্দেশ এসেছে রেঙ্গুনের পতনের আগে যেন নেতাজীকে অপসারণ করা হয়। বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় টোকিওর সুপ্রীম কমান্ড হাচাইয়াকে জানিয়েছেন নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য হাচাইয়াকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই ডামাডোলের বাজারে নেতাজীর যদি ভালো-মন্দ কিছু হয়েই যায় তবে জাপানি জেনারেল হাচাইয়াকে দাঁড়াতে হবে কোর্ট-মার্শালের বিচার-সভায়। তাই গরজ বড় বালাই আজ হাচাইয়ার। তিনি বুঝেছেন নেতাজী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নারীবাহিনীর জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা না হলে নেতাজীকে রেঙ্গুন থেকে সরানো যাবে না। ফলে সেইমতোই ব্যবস্থা করতে হল তাঁকে।

আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বলে লেফটানেন্ট থিবার্স বললেন, আজ বেলা বারটায় চীফ-অফ-স্টাফ নেতাজীর তরফে আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ করতে আসছেন। আমার তো মনে হয় মিনিট পনেরর বেশি তিনি থাকবেন না।

আমি বলি—তাহলে মেয়েদের সব কথা খুলে বলি?

—না! তাহলে তো প্যারেড-গ্রাউন্ডে আমি নিজেই তা বলতাম। ট্রেনের যে ব্যবস্থা হচ্ছে তা এখনো মিলিটারি সিক্রেট। চীফ-অফ-স্টাফ যদি নিজে সে-কথা ঘোষণা করেন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আমি সে দায়িত্ব নিতে পারিনা। কারণ সে অধিকার আমাকে দেওয়া হয়নি। আপনারা শুধু মেয়েদের বলুন একঘন্টার নোটিসে রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবার জন্য সবাই যেন প্রস্তুত থাকে।

ল্যান্সনায়েক ভাবিজী বলে, সে কথা তো আপনি নিজেই বলে এসেছেন।

—তা বলেছি বটে।

—তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন?

খালি চায়ের কাপগুলো উঠিয়ে নিয়ে যেতে আয়া এসেছিল ঘরে। থিবার্স তাই তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। আয়া চলে যাবার পর জানকী দেবী নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসেন। বসেন নিজের আসনে। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলেন, আপনাদের আর একটি গোপন কথা বলব আমি। স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্শিয়াল!

আমরা উৎকর্ণ হয়ে ঘনিয়ে আসি।

লেফটানেন্ট থিবার্স টেবিল থেকে একটি নেল-কাটার তুলে নিলেন। মুখ নিচু করে উখো দিয়ে নখের ডগা ঘষতে ঘষতে অন্যমনস্কের মতো বলেন, জানি, কথাটা শুনে আপনারা দুঃখিত হবেন। কিন্তু উপায় নেই, সামরিক-জীবনে সবকিছুতেই তো আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে—

এও তো দেখছি ভূমিকা। কী বলতে চাইছেন উনি?

—আমাকে গোপনে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহিনীতেই একজন আছেন যাঁর সম্বন্ধে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেনই এমন কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না—কিন্তু যেখানে ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে সেখানে আমাদের সাবধান থাকতেই হবে। বিশেষত গোটা বাহিনীর নিরাপত্তা যেখানে জড়িত। আমি চাই আপনাদের ব্যবহারে আপনারা তাঁকে বুঝতে দেবেন না কিছু। তাঁকে অহেতুক আঘাত দিতে চাই না আমরা; কিন্তু—

বাধা দিয়ে নমিতাদি বলে ওঠেন, কার কথা বলছেন বলুনতো? কে?

লেফটানেন্ট থিবার্স নিঃশব্দে নখের পরিচর্যা করে চলেন।

আমি বলি, আমাদের ব্যারাক থেকেই যখন তিনজনকে ডেকেছেন তখন আশঙ্কা হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ জনের মধ্যে কেউ—

—ইয়েস। অস্ফুটে বললেন থিবার্স!

ভাবিজী বলে, আমাদের অধিকাংশকেই আপনি 'তুমি' সম্বোধন করেন। একমাত্র নমিতাদি আপনার চেয়ে বয়সে বড় বলে তাঁকে আপনি 'আপ' বলেন। তাঁকে ছাড়া অবশ্য আর একজনকেও—

এতক্ষণে আমাদের দিকে চোখ তুলে উনি বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছ সুভদ্রা। আম্মাজী! মিসেস সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল!

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠি—অসম্ভব!

লেফটানেন্ট থিবার্স উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, কমরেডস্! আমি এত ছোট নই যে, একজন শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহিলার নামে অহেতুক বদনাম দেব। আর এটা একটা মহিলা-মজলিশ নয় যে, পরস্পরের নামে কুৎসা রটিয়ে সময় কাটাতে চাইব আমরা। আমরা জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। এখানে বাজে কথা আমি বলব না।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আম্মাজী? ধীর স্থির রাশভারী সেই মহিলাটি! স্বামী মারা যাবার পর যাঁর নাকি তিনকুলে কেউ নেই!

মিনিটখানেক কারো মুখে কোনো কথা নেই!

তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে মিসেস থিবার্সই পুনরায় বলেন, আম্মাজীকে আমিও শ্রদ্ধা করি। শুনেছি তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত। চার-পাঁচটা ভাষা জানেন। স্বভাবও অত্যন্ত ভাল। জনান্তিকে বলতে পারি, কথাটা আমিও বিশ্বাস করি না। তাহলেও এ হচ্ছে সামরিক নির্দেশ। আদেশ অনুযায়ী এ সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করতেই হবে। অযাচিত কোনো গোপন তথ্য তাঁকে আমরা জানাব না এবং দূর থেকে তাঁর কার্যকলাপের ওপর নজর রাখব। সৈনিক হিসাবে এটুকুও যেমন করব, মানুষ হিসাবে তেমনি দেখব যাতে তাঁর আত্মমর্যাদায় কোনোরকম আঘাত না লাগে! কী বল তোমরা?

আমরা একবাক্যে সায় দিয়ে চলে আসছি, হঠাৎ লেফটানেন্ট থিবার্স বলে ওঠেন, আরতি, তোমার সঙ্গে আরো কয়েকটা কথা আছে।

*　　　*　　　*

আমি ফিরে গিয়ে বসি আবার। ওঁরা দুজন চলে যান।

—তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। আমাদের ডিট্যাচমেন্টের শহরত্যাগের যাবতীয় ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। তুমি এখনই একটা ট্যাক্সি নিয়ে জেনারেল পোস্ট-অফিসে চলে যাও। পোস্ট-অফিসের বড় ঘড়িতে ঠিক নটা বেজে সাত মিনিট হলে তুমি টেলিগ্রাফ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাবে। মনে রেখ টেলিগ্রাফ কাউন্টার দুটো আছে। তুমি ইনল্যান্ড কাউন্টারের দিকে যাবে। সেখানে একজন আজাদি সৈন্য তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

একখণ্ড কাগজ ড্রয়ার থেকে বার করে দেখে দেখে বলেন, বয়স সাতাশ, ওজন একশ বাহান্ন পাউন্ড, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি। গায়ের রঙ কালো, গোঁফ-দাড়ি-চশমা নেই। পোশাক ফৌজী, র‍্যাঙ্ক লেফটানেন্ট।

—নাম? জানতে চাইলাম আমি।

—নাম বলা বারণ। তুমি দেখবে তাঁর হাতে সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত একটি ইংরাজি পত্রিকা আছে—ট্রিবিউন। তুমি সোজা গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করবে—ওটা কি আজকের কাগজ? জবাবে ছেলেটি বলবে—না, উনিশ তারিখের। তাহলেই বুঝবে ঠিক লোককে পেয়েছ তুমি।

—আর কোনো পাস্-ওয়ার্ড নেই?

—আছে, ডার্লিং।

—কী?

—ঐ যে বললাম—'ডার্লিং'!

—'ডার্লিং'! আঁতকে উঠি আমি। ফৌজী পাস্-ওয়ার্ড হচ্ছে—ডার্লিং?

লেফটানেন্ট থিবার্স গম্ভীরভাবে বলেন, আয়াম সরি ফর ইউ, আরতি। কিন্তু এ যুদ্ধে জওয়ানরা প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি যুদ্ধের প্রয়োজনে একজন অপরিচিত সৈনিককে 'ডার্লিং' বলতে পারবে না?

আমার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। আমতা আমতা করে বলি, ঠিক তা নয়, মানে—

উনি গম্ভীরভাবেই বলেন, তাছাড়া ভয় কী, তোমার ছোটলাট তো আর জানতে পারবে না যে, আর কাউকে তুমি ডার্লিং বলেছ?

লজ্জায় আমি মুখটা তুলতে পারি না। তারপর কেমন সন্দেহ হল। চমকে মুখ তুলেই দেখি সামরিক গাম্ভীর্যের মুখোশের আড়ালে উনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছেন। আমিও হেসে ফেলেছি ততক্ষণে। ছোটলাটের কথাটা যে উনি জানেন তা জানা ছিল না আমার। লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদের ডাকনাম—এই নারী বাহিনীর জনান্তিকে—ছোটলাট। ওর সঙ্গে আমার পূর্বরাগের কথাটা বাহিনীর অনেকেই জানে, স্বয়ং থিবার্সও যে জানতেন তা আমার ধারণা ছিল না। লেফটানেন্ট আহ্‌মেদের এ ডাকনামের পেছনে একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। নেতাজীর নির্দেশ ছিল ভারত-ভূখণ্ডের কিছু অংশ আমাদের অধিকারে এলে সেখানে একটি অস্থায়ী অসামরিক সরকার গঠন করতে হবে। স্বরাজ ও শহিদ দ্বীপে যেমন অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল মেজর-জেনারেল লোগনাথনের নেতৃত্বে। মণিপুর রাজ্যের এই অস্থায়ী সরকারের গভর্নর হবেন মেজর-জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ আই. এম. এস. অফিসার। মালয়ে যাবার আগে তিনি ছিলেন সুবে বাঙলার পাবলিক হেল্‌থের ডিরেক্টর। লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদ হচ্ছে মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জির এ ডি কং। মেয়েদের বক্তব্য, যদি চ্যাটার্জি একদিন হন মণিপুরের বড়লাট, তাহলে নাজির হবে ছোটলাট, অর্থাৎ আমি তখন হব ছোটলাট-মহিষী!

হাস্যসংবরণ করে আমি বলি—তারপর? আমার পাস্-ওয়ার্ড তো 'ডার্লিং'। তাঁর কী?

—'সুইটহার্ট'!

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। সমস্তটাই কি জানকীদির রহস্য? মিলিটারি পাস্-ওয়ার্ড কখনো এমন রোমান্টিক হয় না। আমি জানি। এসব কী বলছেন উনি?

এবার কিন্তু লেফটানেন্ট থিবার্স হাসেননি একটুও। ঠোঁটের প্রান্তে তো নয়ই, এমনকি চোখের কোনাতে পর্যন্ত কোনো কৌতুকের আভাস নেই। গম্ভীরস্বরে বলেন, সিট ডাউন।

উপবেশন তো নয়, আমি যেন আত্মসমর্পণ করলাম চেয়ারের গর্ভে।

—পাস্-ওয়ার্ড চেক করা হয়ে গেলে তুমি নিশ্চিত মনে সেই আজাদি সৈন্যের সঙ্গে যেতে পার। তোমাকে তিনি প্রথমেই নিয়ে যাবেন জাপানি কিকানের হেড-কোয়ার্টার্সে, সেখান থেকে নির্দেশ নিয়ে তোমরা যাবে স্টেশনে। ট্রেনটাকে সম্ভবত স্টেশনে নিয়ে আসা হবে না। সাইডিং-এর কোনো চিহ্নিত স্থান থেকে ট্রেনে চাপতে হবে আমাদের। ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি সব খবর নিয়ে আসবে। ঠিক কোথায় থাকবে ট্রেনটা, কখানা রেক, তাদের রেক নম্বর কী, ইত্যাদি। যদি কোনো প্রয়োজনে আমাকে টেলিফোন করার দরকার হয় তবে নিজের পরিচয় দিও না—পাস্-ওয়ার্ড উচ্চারণ করবে। আর ট্রেনের কথা কিছু টেলিফোনে বলবে না। ট্রেন-মুভমেন্টটা এখনো টপ মিলিটারি সিক্রেট।

আমি বলি—কিন্তু এতটা সাবধানতার সত্যই কোনো প্রয়োজন আছে কি?

জানকী থিবার্স মৃদু হেসে বললেন—Theirs not to reason why, but to do and die !

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

মিসেস থিবার্স নিজে থেকেই বলেন—অপ্রয়োজনে এত সাবধান কেন হব বল আমরা? ব্রিটিশের চর শহরে অনুপ্রবেশ করেছে। তাই তো হঠাৎ আজ আম্মাজীর ওপর নজর রাখার এই নির্দেশ!

আবার আম্মাজীর প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় আমার কেমন যেন খারাপ লাগল। আম্মাজীকে আমি শুধু শ্রদ্ধাই করি না—ভালোও বাসি। রুক্মিনীদিও তো বিধবা কিন্তু তিনি মাছ-মাংস সবই খান। আম্মাজী নিষ্ঠাবান বিধবা। আমিষ আহার স্পর্শমাত্র করেন না। কঠিন শুদ্ধাচারে থাকেন তিনি।

চলে আসছিলাম, মিসেস থিবার্স আমাকে কিছু বর্মীমুদ্রা দিয়ে বললেন, ট্যাক্সি ভাড়াটা রাখ। দুপুরে বাইরেই খেয়ে নিও। অবশ্য হয়তো সে জন্য কোনো খরচ হবে না তোমার—

—কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

—সাতাশ বছরের একজন ফৌজী জওয়ান অমন পাস্-ওয়ার্ড শুনেও কি তোমায় লাঞ্চ খাওয়াবে না?

এবার কেমন যেন রাগ হয়ে যায় আমার। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাই স্যালুট করে। ভাবিজী আর নমিতাদির সঙ্গে আম্মাজীর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু হাতে সময় কম। আম্মাজীর বয়স পঁয়তাল্লিশ। মাথার চুলগুলিতে পাক ধরেছে। তাঁর স্বামী মেজর গারেওয়াল ছিলেন একটি ব্যাটেলিয়ানের সহকারী কমান্ডান্ট। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতেই সম্মুখযুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। অথচ তাঁরই বিধবা পত্নীকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন! 'জানবান' ছেলেগুলো কোনো কাজের নয়। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চটাকে ঢেলে সাজানো উচিত। কিন্তু ভাবিজী অথবা নমিতাদির সঙ্গে দেখা করার এখন সুযোগ হবে না। ব্যারাকে ফিরে এসে তৈরি হয়ে নিতে অল্প সময় লাগল আমার। তৈরি হয়ে নেওয়া আর কী? শাড়িও পালটাতে হবে না, প্রসাধনও করতে হবে না। সারাদিনের মতো জঙ্গী পোশাক তো সেই সাতসকালেই চড়িয়েছি গায়ে।

ছয়

ঠিক নটা বেজে পাঁচ মিনিটেই জেনারেল পোস্ট-অফিসে পৌঁছেছিলাম। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই গেল আর দুমিনিট। ডান দিকের টেলিগ্রাফ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি খাকি পোশাক-পরা একটি সৈনিক কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে সিঙ্গাপুরের একটি ইংরাজি পত্রিকা—ট্রিবিউন। পাতাটা খুলে মুখটা আড়াল করে রাস্তার দিকে ফিরে কাগজ পড়ছিল ছেলেটি। কাছে-পিঠে আর কেউ না থাকলেও টেলিগ্রাফ কাউন্টারে লম্বা কিউ। ছেলেটির মুখ দেখতে পাচ্ছি না। গোঁফ-দাড়ি-চশমা আছে কিনা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাঁধের ওপর ব্যাজটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। দুটি সমান্তরাল রেখা, নিচে I.N.A.। অর্থাৎ র‍্যাঙ্কটা মিলে যাচ্ছে—ফার্স্ট লেফটানেন্ট। উচ্চতা, ওজন, বয়স, কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে বলি—এটা কি আজকের কাগজ?

মুখ থেকে কাগজখানা না সরিয়ে ওপ্রান্তবাসী বলে—নো ডার্লিং!

চমকে উঠি আমি। তবে তো এ নয়! আমার সঙ্কেত ছিল ছেলেটি জবাবে বলবে—না, উনিশে তারিখের। তাছাড়া 'ডার্লিং' তো আমার পাস্-ওয়ার্ড। ওর নয়।

চারিদিকে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। না, আর কোন খাকি পোশাক পরা আজাদি সৈন্য কাছে-পিঠে নেই। তাহলে? এ লোকটি কি গুপ্তচর? পুরো সঙ্কেত জানে না, শুধু স্থান-কালটুকু জানে? মনে পড়ল দলনেত্রীর সাবধান বাণী—রেঙ্গুনে ব্রিটিশ গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবু ভয়ে ভয়ে পুনরায় বলি—কবেকার কাগজ ওটা?

তা সত্ত্বেও কাগজখানা মুখ থেকে সরাল না ছেলেটি, বললে—আই ডোন্ট নো সুইটহার্ট!

হাত-পা হিম হয়ে আসে আমার। লোকটা 'উনিশে এপ্রিলের' সঙ্কেত নিশ্চয় জানে না। পাস্-ওয়ার্ডগুলো শুনেছে—কিন্তু কার কোনটা বলার কথা তাও জানে না। নিঃসন্দেহে লোকটা গুপ্তচর। আমার জন্য ফাঁদ পেতে বসে আছে। আর তাই মুখ থেকে কাগজখানা সরাচ্ছে না।

আমি পায়ে পায়ে পেছন হটতে যেই শুরু করেছি লোকটা কাগজখানা ফেলে দিয়ে খপ করে চেপে ধরে আমার বাঁ হাতের কবজি। মুহূর্তে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরতে যাই। কিন্তু তার আগেই হো-হো করে হেসে উঠেছে ছেলেটা।

—তুমি? পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাই আমি।

—হ্যাঁ আমিই। কই তোমার পাস্-ওয়ার্ড বলবে না?

—তুমি কবে এসেছ রেঙ্গুনে? কোথা থেকে?

—গতকাল রাত্রে। প্রোম থেকে। কিন্তু এখানে আর নয়। চলে এস।

মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জির ব্যাটেলিয়ানও যে রেঙ্গুনে ফিরে এসেছে এ খবর জানা ছিল না। নাজির আহ্‌মেদের হাত ধরে বেরিয়ে এলাম জেনারেল পোস্ট-অফিস থেকে। সেভিংস ব্যাঙ্ক কাউন্টারে চাপ ভিড়। লোকে টাকা তুলছে ক্রমাগত। রেঙ্গুনের পতন আসন্ন। যার যা পুঁজি আছে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। আহ্‌মেদের কাছেই শুনলাম ব্যাপারটা। জেনারেল চ্যাটার্জির সঙ্গে থিবার্স কাল রাত্রেই দেখা করেছেন। থিবার্স জানতেন নাজিরই আসবে এ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে। তাই বেছে বেছে আমাকে পাঠিয়েছেন। আর থিবার্সই আজকের পাস্-ওয়ার্ড রচনা করে নাজিরকে বলেছিলেন। এবং বলেছিলেন সামরিক গাম্ভীর্যে। রানীবাহিনীর কে আসবে তার নাম নাজিরকে যদিও বলেননি, কিন্তু নাজির বুঝতে পেরেছিল ওঁর অতি-গাম্ভীর্যে।

* * *

পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারপর। এত খুঁটিনাটি কথা আমার মনে থাকার কথা নয়। মনে আছে দুটি কারণে। প্রথমত, দিনপঞ্জি রাখার বাতিক ছিল আমার, আর ডায়েরিটা আমার খোয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, সেটা না থাকলেও আমার এ দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরের জীবনে ঐ তেরোটা দিনের কথা আমি ভুলতে পারতাম না। সেই তেইশে এপ্রিল থেকে পাঁচই মে-র দিনগুলো। তার মধ্যে আবার এই একটিমাত্র দিন আমার কেটেছিল নাজিরের একান্ত সান্নিধ্যে। সমস্তদিন দুজনে ছুটোছুটি করেছিলাম। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। নাজির একখানা সাইকেলে চেপে এসেছিল ডাকঘরে। সাইকেলে করেই ঘুরেছিলাম দুজনে। আমাকে সে বসিয়েছিল সামনের সিটে। জীবনে সেই প্রথম ওর বাহুবন্ধে ধরা দিয়েছিলাম—সেই শেষ! আর সে বাহুবন্ধও সামরিক প্রয়োজনে। আমাকে বেষ্টন করে দুহাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরতে হয়েছিল ওকে। আমরা দুজনে দুজনের কাছে বাক্‌দত্ত ছিলাম। কিন্তু দুজনেরই ইচ্ছা স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের বিয়ে হবে। বর্মামুলুকে নয়। ভারতবর্ষে আমি পৌঁছাতে পারিনি—নাজির অবশ্য পৌঁছেছিল; কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। আমাকে নিয়ে সে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করতে পারেনি ভারতবর্ষের মাটিতে। নাজিরের মৃত্যু হয়েছিল মৌলমিন হাসপাতালে—ঐ পাঁচই মে। আমি আজও অবিবাহিতা।

*　　　*　　　*

যাক আমাদের ঘরোয়া কথা। যে কথা বলছিলাম। সমস্তটা দিন ছুটোছুটি করে যাবতীয় ব্যবস্থা করা গেল। রাত আটটায় কোথা থেকে ট্রেন ছাড়বে দেখে এলাম। দুপুরে নাজির আমাকে এনে হাজির করল একটা খানদানী বর্মী হোটেলে। রয়্যাল লেকের কাছাকাছি, সোয়েডাগন প্যাগোডার অদূরে। বাইরে রাস্তায় প্রচণ্ড ব্যস্ততা। দলে দলে মানুষজন শহর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। পেট্রোলের অভাব, তাই মোটরগাড়ি সংখ্যায় কম। ঘোড়ার গাড়ি, গোযান আর মানুষে-টানা গাড়ি। সবচেয়ে বেশি পদাতিক। বাক্স-প্যাঁটরা বগলে ছেলেমেয়ের হাত ধরে হাজার হাজার মানুষ চলেছে শহরতলির দিকে। যে কোনো মুহূর্তে শত্রুসৈন্য শহরে প্রবেশ করতে পারে। বর্মার কাছে অবশ্য জাপানিও যা ব্রিটিশও তাই। তবু হাতবদলের এই সময়ে সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময়টুকু শহরের বাইরে থাকাই ভাল। রাস্তাঘাটের এ অবস্থা হলে কী হয় হোটেলের ক্যাবারে-রুম দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। জাপানি আর বর্মী জঙ্গী অফিসারদের ভিড় এ-টেবিলে ও-টেবিলে। অনেকের সঙ্গেই রয়েছে বর্মী রূপোপজীবিনী। মৃত্যু নিয়ে যাদের কারবার প্রতিটি মুহূর্তই তাদের কাছে মূল্যবান। জঙ্গী মানুষমাত্রই ক্ষণিকবাদী।

পোর্টিকোর সামনে নাজির সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। বলে, নেমে এস।

—এ কোথায় এলে নাজির? এখানে মধ্যাহ্ন-আহারের কীরকম চার্জ নেবে জানো?

নাজির হেসে বলে, জানি। কিন্তু উপায় নেই, এখানে একজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আজ আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। অত্যন্ত জরুরি আলোচনা আছে তাঁর সঙ্গে।

অগত্যা ওর পেছন পেছন আমাকেও আসতে হল ক্যাবারে-রুমের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড খানা-কামরায়। নাজির খাবারের অর্ডার দিল, বিয়ারেরও। আমার জন্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ।

আমি বললাম, যাঁর সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনি জাপানি না বর্মী?

নাজির গম্ভীর হয়ে বলে, দুটোর একটাও না। ভারতীয়।

—আমার উপস্থিতিতে কোনো অসুবিধা হবে না তো?

—না। কারণ তুমিই আমার সেই মেহ্‌মান!

কী পাগল ছেলে!

হেসে বলি, তাহলে এখানে এলে কেন? সরাইখানা তো আরো ছিল।

—ছিলই তো! বললে নাজির, কপালের ওপর থেকে অশান্ত রুক্ষ চুলগুলো সরাতে সরাতে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে নিম্নকণ্ঠে বললে :

'ফক্‌ৎ তেরি সুরৎ দেখনে কো আতি হ্যয় সাকি
ওয়ার্না পীনে কো তো ম্যয়খানা ঔর ভি হ্যঁয়!
পহ্‌লে তো শেখনে আ'কে দেখা ইধর-উধর
ফির সর ঝুঁকাকর দাখিল-ই-ম্যয়খানা হো গয়ে।'*

অবাক হয়ে বলি : তার মানে?

—তার মানে ফারসি না হলেও অন্তত উর্দুটা তোমার শেখা উচিত। নাহলে আমার মঞ্জিলে তোমার ঠাঁই হবে না।

আমি ঠোঁট উলটিয়ে বলি—তবে চাই না তোমার ঘর করতে। হিন্দুস্থানী শিখতেই আমার জিভ বার হয়ে গিয়েছে, উর্দু কোনোদিনই শিখতে পারব না আমি।

নাজির হেসে বললে, অথচ অমন মিষ্টি, এমন সহজ ভাষা আর নেই।

---

* তোমার রূপের মদিরা-তিয়াসে ফিরে ফিরে আসি সাকি!
আসবাগার তো শহরে ছড়ানো পড়ে আছে কত শত।
তবু এখানেই আসে এই শেখ পাগড়িতে মুখ ঢাকি
চুপিসারে একা আসে বারে বারে নয়ন করিয়া নত।।

আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ফের বলে, সারাটা সকাল সাইকেলে বসে তোমার প্রকাণ্ড খোঁপাখানাকেই শুধু দেখেছি। চুলে কোনো তেলও দাও না তুমি?

আমি হেসে বলি, আমি তো অভিসারে বার হইনি, আর এটা যুদ্ধক্ষেত্র। সুগন্ধ তেল কেউই দেয় না মাথায়—

—তাই তো নিয়ে এলাম তোমাকে এখানে। মুখোমুখি বসব বলে। কলিজা-বিদীর্ণ-করা দুটো মহব্বতের কথা বলব বলে। ফক্‌ৎ তেরি সুরৎ দেখনে কো আতি হ্যায় সাকি—

লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদ সৈনিক; কিন্তু সেই তার একমাত্র পরিচয় নয়, সে কবি। খেয়াল-খুশিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত তরুণ সে। তার হাসি মানেই অট্টহাসি, তার হাঁটা মানেই দৌড়ানো। পাক্কা অ্যাথলেট সে। স্পোর্টসের সময় একরাশ কাপ-মেডেল নিয়ে আসত। আসলে সে সৈনিকও নয়, কবিও নয়, খেলোয়াড়ও নয়—বদ্ধ পাগল।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে—ঐ দেখ! ভুলেই যাচ্ছিলাম। তোমার জন্য দুর্দান্ত একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও, বার করি।

দু-পকেট হাতড়াতে থাকে। নিশ্চয় একটা গহনা কিনেছে। কী পাগল ছেলে—ও কি জানে না যে, কোনো অলঙ্কার আমরা এখন পরতে পারি না?

শেষ পর্যন্ত পকেট হাতড়ে বার করে কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস।

—এই নাও।

—কী ওটা?

—খুলেই দেখ।

সন্তর্পণে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললাম। তবু পরিষ্কার হল না রহস্যটা। বার হল এঁটেল মাটির একটা ঢেলা।

—এটা কী?

নিঃশব্দে ঢেলাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে— ভারতবর্ষের মাটি।

না পাগল নয়, নাজির আহ্‌মেদ, কবিই।

নাজির পৌঁছেছিল বর্মার উত্তর সীমান্তে। প্রবেশ করেছিল ভারতভূমিতে। গহনা নয়, শাড়ি নয়—প্রেমাস্পদার জন্য সে নিয়ে এসেছে এঁটেলমাটির একটা ঢেলা। ভারতবর্ষের মাটি!

জানি, আপনারা হাসছেন। হাসবেনই তো। আপনারা যে প্রতিনিয়ত পদাঘাত করছেন ঐ মাটিকে। আমি কিন্তু সেই মাটির ঢেলাটি হাতে নিয়ে চুপ করে বসেছিলাম সেদিন। চোখে জল এসে গিয়েছিল আমার। আহ্‌মেদ গল্প শুনিয়েছিল, তাদের প্রথম ভারতভূমিতে পদার্পণের গল্প। গল্প নয়, সত্য ঘটনা!

* * *

বর্মাসীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ ভারতভূমিতে প্রথম পদার্পণ করেছিল চুয়াল্লিশ সালের আঠারই মার্চ। তার ঠিক তিনদিন পরে, একুশে মার্চ, নেতাজী বেতারে এ বার্তা ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। ঐ খবর যখন কালাদান-ইরাবতীর উপত্যকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে পৌঁছাল তখন সে কী উৎসাহ, সে কী আনন্দে মেতে উঠল আজাদি সৈনিকের দল। খাদ্য সরবরাহ অপ্রচুর, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, আহত এবং অসুস্থ মানুষ ঔষধপত্র পাচ্ছে না—তবু এ সংবাদে সবাই আনন্দে নাচতে থাকে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে।

জাপানি সেনাপতি ইয়ামামোতো এবং আই. এন.-এ.-র কেন্দ্রীয় দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বর্মা থেকে চামৌলে—আসামে। কর্নেল চ্যাটার্জি তখনো চিন্দুইন নদীর পূর্ব পারে। জুন মাসে তিনি সদলবলে হেড-কোয়ার্টার্সের দিকে যাত্রা করেন; অর্থাৎ স্বাধীন ভারতভূখণ্ডের দিকে। নাজির আহ্‌মেদও ছিল সেই দলে। কর্নেল (তখনও তিনি মেজর-জেনারেল হননি) এ. সি. চ্যাটার্জির ভারতভূখণ্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত, সৈন্যদল পরিদর্শন। দ্বিতীয়ত, মুক্ত ভারতখণ্ডে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

এই সময়ে জাপানিদের সঙ্গে আজাদ হিন্দের সেনাদলের একটা মনকষাকষি শুরু হয়েছিল ঐ বিজিত রাজ্যের অধিকার নিয়ে—শেষ পর্যন্ত নেতাজীর মধ্যস্থতায় এবং জাপানের সর্বময় কর্তা

জেনারেল তোজোর আদেশে যদিও বিরোধটা মিটে গিয়েছিল তবু কর্নেল চ্যাটার্জি সরেজমিনে বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করে সৌহার্দ্যের ভাবটা ফিরিয়ে আনবার বাসনা নিয়েই রওনা হয়েছিলেন সেদিকে।

ভারতভূমিতে প্রবেশ করে আজাদ হিন্দ্ দলের সেনাধ্যক্ষ জাপানি সেনাপতিকে জানান যেহেতু 'মোরে' থেকে বর্মামুলুক শেষ হচ্ছে এবং ভারতবর্ষের শুরু হচ্ছে সুতরাং নববিজিত ভূখণ্ডের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। এতদিন জাপানি এবং আজাদি সৈন্য পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে এসেছে; এবং বিজিত রাজ্যের যাবতীয় ফৌজী শাসনব্যবস্থা জাপানি সেনাপতির নির্দেশেই হচ্ছিল। আজাদি সেনাপতি এতে আপত্তি করেননি—কারণ এতদিন তাঁরা ছিলেন বর্মামুলুকে। কিন্তু ইয়ু নদী অতিক্রম করে 'টামু' ছাড়িয়ে যে মুহূর্তে এই যৌথ সৈন্যদল 'মোরে'তে পৌঁছাল তখনই আজাদি কমান্ডার বললেন, এর পর থেকে যা কিছু জিনিসপত্র জাপানি বা আজাদি সৈন্যের দখলে আসবে তা হবে স্বাধীন আজাদ হিন্দ্ সরকারের সম্পত্তি। প্রয়োজনমতো তা আজাদি সেনাপতি জাপানি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করবেন।

এ প্রস্তাবে জাপানি সেনাধ্যক্ষ সম্মত হতে পারেননি। তিনি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, ইম্ফলের এখনো পতন হয়নি—ইম্ফলের পতন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ ধরা যেতে পারে জরুরি সামরিক অবস্থা রয়েছে। এ অবস্থায় জাপানিরা বিজিত রাজ্যের ওপর দখল ছাড়তে পারে না।

এই নিয়ে দুপক্ষে বেশ মনকষাকষি শুরু হয়ে যায়। হয়তো এ-থেকে গুলি বিনিময়ও শুরু হয়ে যেত—কিন্তু আজাদি সেনাধ্যক্ষ বলে পাঠালেন—এ তর্কের মীমাংসা করতে স্বয়ং নেতাজী এবং জাপানি সেনাপতি ইয়ামামোতোকে রেডিও-টেলিফোন মারফত সংবাদ পাঠানো হোক। কিন্তু জাপানিরা যদি সদ্যমুক্ত ভারতভূখণ্ডে জাপানি পতাকা উত্তোলন করবার চেষ্টা করে তাহলে তিনি আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে জাপানিদের আক্রমণের আদেশ দিতে বাধ্য হবেন। জাপানি সেনাপতি অবশ্য নিপ্পন সরকারের পতাকা ভারতভূমিতে উত্তোলন করবার দুঃসাহস দেখাননি।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই টোকিও থেকে জাপানি ফৌজের সর্বাধিনায়ক এবং প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ঘোষণা করলেন :

> "An inch of land occupied either by Nippon or by I.N.A. on Indian soil will be controlled by the Provisional Government of FREE INDIA".*

সে যাই হোক, কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জির সেনাদলের সঙ্গে লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদও রওনা দিয়েছিল উত্তরমুখো। নাজির বললে, জানো আরতি, সেদিনটার কথা আমি জীবনে ভুলব না। ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি। কালেওয়া থেকে একটি জীপ ও একটি ওয়েপন কেরিয়ার নিয়ে রওনা হলাম ভোর পাঁচটায়। দলে আমরা পনেরো জন। জীপে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন কর্নেল চ্যাটার্জি—পেছনে আমি এবং ওঁর আর্দালি। বেলা নটার সময় ভেলায় করে চিন্দুইন নদী পার হলাম আমরা। বেলা বারোটায় পৌঁছালাম টাঙ্গায়। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজের আয়োজন করাই ছিল। কর্নেল চ্যাটার্জি বললেন, তোমরা খেয়ে এস নাজির। ঠিক একঘন্টা পরে আবার রওনা দেব আমরা।

আমি বলি—আপনিও এখানেই খাবেন তো? আসুন।

—না, আমি কিছু খাব না।

—শরীর ভালো আছে তো, স্যার?

উনি হেসে বললেন, হ্যাঁ, ব্যস্ত হয়ো না—ভালোই আছে শরীর।

আমি বলতে গেলুম—এরপর আর জনবসতি নেই, ঘন জঙ্গল। একেবারে টামু পৌঁছানোর আগে আর কিছু খাবার পাওয়া যাবে না। টামু পৌঁছাতে সেই যার নাম সন্ধ্যা। আর তাছাড়া উনি আসবেন এ খবর আগেই আমরা জানিয়েছিলাম টাঙ্গাতে। এরা খাবার তৈরি করেও রেখেছে।

---

* "ভারতভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি পরিমিত স্থান যে মুহূর্তে নিপ্পনবাহিনী অথবা আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অধিকারে আসবে সেই মুহূর্ত থেকেই তার শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের।"

কর্নেল চ্যাটার্জি মৃদু হেসে বললেন—তোমাকে তো বোঝাতে পারব না নাজির। আজ আমার উপবাস। আমি ব্রত উৎযাপন করছি। আমি ব্রাহ্মণ। যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হলে আমাদের আহার নিষেধ!

আমি স্যালুট করে বললাম, তাহলে আর একঘন্টা সময় নষ্ট করে কী লাভ স্যার? চলুন এখনই রওনা দেওয়া যাক।

—সে কী? তোমরা খেয়ে নেবে না?

হেসে বললুম—যজ্ঞ না করলেও আমরা রমজান করি!

পনেরো জনের মতো খাবার পড়ে থাকল টাঙ্গাতে। আর্দালি-ড্রাইভার পর্যন্ত কিছু মুখে দিল না। সকলেই যেন ব্রত উৎযাপন করছে। দলপতি যেখানে অভুক্ত থাকছেন সেখানে কেউ কি খেতে পারে?

টামুতে গিয়ে পৌঁছালাম যখন তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। টামুতেও খবর দেওয়া ছিল। ওরা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছাতেই দেখি ক্যাম্প-কমান্ডান্ট কর্নেল চ্যাটার্জির জন্য একটি গার্ড-অফ-অনারের আয়োজন করেছেন। কিন্তু কর্নেল চ্যাটার্জি ওদের অপেক্ষা করতে বললেন। টামু থেকে ইয়ু নদী মাত্র তিন মাইল। ইয়ু নদীর ওপারের গ্রাম 'মোরে'। সেটা ভারতভূখণ্ডে। আসাম রাজ্যে। কর্নেল বললেন একঘন্টা পরেই তিনি ক্যাম্পে ফিরে আসবেন। ওদের অপেক্ষা করতে বলে তখনই আমরা রওনা হয়ে পড়ি উত্তর-পশ্চিমমুখো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লাম ইয়ু নদীর তীরে। এখানে একটা সাঁকো ছিল—গাড়ি ওপারে চলে যাবার কথা—কিন্তু গত রাত্রেই শত্রুবিমানের আঘাতে সাঁকোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মেরামতের কাজ চলছে দিবারাত্র। কর্নেল জীপ থেকে নেমে এলেন। ব্রীজ মেরামতের কাজ করছিল যে কোম্পানি তার অফিসার, এঞ্জিনিয়ারিং কোরের ক্যাপ্টেন, এগিয়ে এসে স্যালুট করল কর্নেলকে—জয় হিন্দ্‌!

—জয় হিন্দ্‌! নদীতে জল কত ক্যাপ্টেন?

—ডুবজল নেই স্যার। গলাজল হবে।

কর্নেল চ্যাটার্জি আর বাক্যব্যয় না করে খুলতে থাকেন তাঁর ফৌজী পোশাক। টুপি, জুতো, জামা ব্রিচেস খুলে শুধুমাত্র অধোবাস পরে নেমে গেলেন জলে। আমরাও সকলে জামা-কাপড় খুলে এপারে রেখে তাঁর পিছু পিছু জলে নামলাম। সূর্য তখন পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের দিকে ঢলে পড়েছেন। জল-কাদা ভেঙে এগিয়ে চলেছেন কর্নেল চ্যাটার্জি—ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধুমাত্র উপবীত। যুক্ত করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চলেছেন।

গলা পর্যন্ত ডুবে গেল আমাদের। কর্নেল ইচ্ছা করেই মাথাটা ডোবালেন। বোধ করি স্নানান্তে ব্রত উৎযাপনের একটা নিয়ম আছে ওঁদের—হিন্দুদের। জলের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালেন কর্নেল চ্যাটার্জি। দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীতটাকে জড়িয়ে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে কী একটা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি ওপারের কর্দমাক্ত তটে লুটিয়ে পড়লেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন বন্ধনমুক্তা জননীকে। উন্মত্তের মতো সেই চন্দনাভ কর্দম তুলে লেপন করলেন নিজ ললাটে। তাঁর দুচোখে তখন জলের ধারা।

আমরাও ওপারে পৌঁছে সমবেতভাবে নমাজ পড়লাম।

শিখ ছিল দুজন। গ্রন্থসাহেব থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করল তারা।

তারপর কর্নেল নিজ হাতে সেই কাদামাটি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের ললাটে তিলক পরিয়ে দিলেন। সর্বাঙ্গে মাখলাম সেই নরম ভিজে কাদামাটি। দেশের মাটি।

সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না।

অনেকেই তুলে নিয়ে এল ভারতভূখণ্ডের মাটি। প্রিয়জনকে দেবে বলে। আমিও নিয়ে এসেছি, তোমার জন্য। এই সেই মাটি।

আমি বললাম—মাটি নয়, মা-টি!

সাত

কিন্তু নাজির আহ্‌মেদের পাগলামির কথা থাক। বর্মী হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্তিমিত-আলোকে খানাকামরায় নিভৃত দুটি উন্মাদ একটুকরো মাটি নিয়ে যে মাতামাতি করেছিল, অথবা রণাঙ্গনের একান্তে যে স্বপ্নের জাল বুনেছিল এ কাহিনীর পক্ষে তা অবান্তর। মেজর-জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জির অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মণিপুর-গভর্নরের এ. ডি. কং তার বাক্‌দত্তা বধূর কর্ণকুহরে কী কূজন করেছিল তা নিতান্তই ব্যক্তিগত;—সেই প্রথম ও শেষবার ছোটলাট তার বঁধুকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করে। সেদিনের সেই আধঘণ্টার অবকাশ আমার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

তাছাড়া ওর সেসব পাগলামি আমি সহ্য করতাম, তাই বলে আপনারা কেন তা সইবেন? ওর কবিসত্তা আর সৈনিকসত্তায় জগাখিচুড়ি হয়ে যেত। কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনা ওর সঙ্গে হবার উপায় নেই। পরিস্থিতি যতই কেননা গুরুতর হোক ও সেটাকে দেখবে লঘুভাবে, হয় খেলোয়াড়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, না হয় কবির দৃষ্টিকোণ থেকে। ও কি কোনোদিন সংসারী হতে পারত? টাকা-আনা-পাই-এর মাসকাবারি হিসাব ধৈর্য ধরে করতে পারত? কী জানি! সেদিন তা বিশ্বাসই হত না। সবকিছুকেই সে হালকা করে দেবে তার কবিত্ব দিয়ে।

মনে আছে, কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম—এ যুদ্ধে আমাদের হার হল শুধুমাত্র উন্নত ধরনের অস্ত্রের অভাবে।

বিষয়টা বেদনাবহ। সে যুগে এ প্রসঙ্গ যার কাছেই তুলেছি সে সখেদে স্বীকার করে নিয়েছে। দুটো হা-হুতাশ মেশানো খেদোক্তি করেছে।

নাজির আহ্‌মেদ সেসব ব্যাপারের ধার দিয়েও গেল না, বললে—তুমি সঙ্গে আছ, আবার অস্ত্রের কী প্রয়োজন?

আমি বলি, তার মানে? আমি কি তোমার অস্ত্রের জোগানদার নাকি?

—ঠিক তাই। বার্তানিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য চাই তলোয়ার, শত্রুকে বেঁধে আনবার জন্য চাই শৃঙ্খল, কিন্তু কবি বলছেন, তুমিই হচ্ছ সেই আর্মারী—যুদ্ধোপকরণ ভাণ্ডার!

মাথামুণ্ড কিছুই বোধগম্য হয় না আমার। বলি, কী বলতে চাইছ, বল তো?

আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে ও বলে

"আঁখে নেহি হ্যয়—তীর হ্যয়!
অব্রু নেহি হ্যয়—শম্‌সের হ্যয়!
জুল্‌ফে নেহি হ্যয়—জন্‌জির হ্যয়!"*

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে ব্যারাকে ফিরে এলাম বেলা তিনটায়। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল আম্মাজীর সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল?

চমকে উঠে বলি, কীসের ব্যবস্থা?

—ট্রেনের। কখন ছাড়বে ট্রেনটা?

রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি আমি, বলি কে বলেছে আমি ট্রেনের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উনি বলেন, তাই যাওনি কি?

আমি জবাব না দিয়ে সোজা ব্যারাকের ভেতরে চলে যাই। একেবারে মিসেস থিবার্সের কাছে। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করি, আমরা যে ট্রেনে যাচ্ছি তা কি সকলে জানে?

—না। কেন বল তো?

—চীফ-অফ্‌-স্টাফ সে কথা বলেননি?

—না।

—আপনিও কাউকে কিছু বলেননি?

---

* "নয়ন কোণায় তীক্ষ্ণ শায়ক—ভ্রূযুগল তলোয়ার
সর্পিল বেণী শৃঙ্খল দৃঢ়—বল' কি চাহিব আর?"

—না না; কিন্তু কেন?

বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলি। আম্মাজীর সঙ্গে আমার কথোপকথন। গম্ভীর হয়ে যান থিবার্স।

আমাদের তৈরি হয়ে নিতে সময় লাগল না। সন্ধ্যার আগেই যে-যার কিট-ব্যাগ পিঠে ফেলে রাইফেল কাঁধে আমরা মার্চ করে চলে গেলাম রেঙ্গুন রেলওয়ে স্টেশনের একমাইল উত্তরের সেই রেলওয়ে সাইডিং ইয়ার্ডে। বারোখানি খালি কামরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। এঞ্জিন এলেই রওনা দেওয়া যাবে। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ বাহিনীকে তুলে দিলাম গাড়িতে। সকলেরই বসার জায়গা হল—অবশ্য কিছু বসল মেজেতে কম্বল বিছিয়ে।

লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদও উপস্থিত ছিল স্টেশনে। তার ওপর নির্দেশ ছিল ট্রেনটা রেঙ্গুন ত্যাগ করে গেলে সে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করবে নেতাজীর সদর-দফতরে—'মিঙলাডোন'-এর সামরিক ছাউনিতে। বোধকরি বারে বারে ঘা খেয়ে নেতাজী আর জাপানিদের ওপর ঠিকমতো ভরসা রাখতে পারছিলেন না—তাঁর হয়তো সন্দেহ ছিল কিকানের লক্ষ্য শুধুমাত্র নেতাজীকে রেঙ্গুন থেকে নিরাপদে সরানো। নারীবাহিনীর জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

এরপরই শুরু হল যন্ত্রণা। সাতটা বাজল, আটটা বাজল, নটা বাজল—এঞ্জিনের দেখা নেই। স্টেশন-মাস্টারমশাই কিছুই বলতে পারলেন না। স্টেশন থেকে মিঙলাডোন-এর সামরিক দফতরে টেলিফোন করবার চেষ্টা করল নাজির—কিন্তু যোগাযোগ স্থাপিত হল না। ঠিক রাত নয়টায় নেতাজীর পার্টি রওনা হবে। মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জিও থাকবেন সে দলে। সুতরাং নাজিরকেও যেতে হবে। ক্যারাভান রওনা হবার অন্তত আগের মুহূর্তে তাকে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। অথচ তার ওপর নির্দেশ আছে ট্রেনটি রওনা হয়ে গিয়েছে নিজে চোখে দেখে যেতে। মহা মুশকিলে পড়ল নাজির বেচারা। লেফটানেন্ট থিবার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে বাধ্য হয়েই সে জীপ নিয়ে চলে গেল খবরটা দিতে। প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে মিঙলাডোনে।

*　　　　*　　　　*

পরে নাজিরের কাছে শুনেছি আমাদের অবস্থার কথা শুনে নেতাজী রাগে ফেটে পড়েছিলেন। মেজাজ খারাপ করতে কেউ তাঁকে বড় একটা দেখেনি। সব অবস্থাতেই তিনি শান্ত সমাহিত—সব দুঃসংবাদই তিনি গ্রহণ করতেন অবিচল চিত্তে। সব দুঃখেই তিনি অনুদ্বিগ্নমন। বিরক্তি প্রকাশ করা তাঁর ধাতে নেই। কিন্তু এ খবরে তিনি আগ্নেয়গিরির মতো মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচারসচিব মিঃ আইয়ারকে ডেকে বলেন—আপনি হাচাইয়ার সঙ্গে এক্ষুনি গিয়ে দেখা করুন। প্রয়োজন হলে ইসোডার সঙ্গেও যোগাযোগ করবেন। তাঁদের জানাবেন ঝাঁসির রানী বাহিনীকে স্থানান্তরিত না করা হলে আমি রেঙ্গুন ত্যাগ করব না। তার কী অর্থ সেটা যেন তাঁরা বুঝে নেন। আর বলবেন, এর ফলে যে পরিস্থিতি হবে সেজন্য ওঁদের একদিন জেনারেল তোজোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে!

সসম্ভ্রম অভিবাদন করে আইয়ার-সাহেব তখনই রওনা হচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁকে পিছন থেকে নেতাজী ডাকলেন—আর শুনুন!

আইয়ার ঘুরে দাঁড়ান। দেখেন, নেতাজী উঠে দাঁড়িয়েছেন। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জানলা দিয়ে অন্ধকার ব্ল্যাক-আউট নৈশ আকাশের দিকে। কয়েক সেকেন্ড তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। সর্বাধিনায়ক নেতাজীর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর নয়—অস্ফুটে বললেন তিনি, আর বলবেন, সুভাষচন্দ্র বোস এরপর জাপান সরকারের কাছে আর কোনো সাহায্য কখনো চাইবেন না। এই তাঁর শেষ ভিক্ষা।

ক্রোধ নয়, বিরক্তি নয়, রীতিমত মিনতি ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

আবার মাথা ঝুঁকিয়ে আইয়ার নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

এ দৃশ্য আমি নিজে চোখে দেখিনি। নাজিরের কাছে পরে শুনেছিলাম। নেতাজী কখনো কারো কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। শুধু এই তিনশত ভারতীয় নারীর মর্যাদার কথা ভেবে রাজাকে আজ ফকির সাজতে হয়েছে। হিটলারের কাছ থেকে তিনি অর্থ সাহায্য নিয়েছিলেন—দান নয়, ঋণ—শোধও

করেছিলেন আংশিকভাবে। জাপানের কাছে যুদ্ধোপকরণ নিয়েছিলেন—দান নয়, ঋণ—বুকের রক্ত দিয়ে আজাদি সৈনিক সে ঋণ শোধ করেছে। অর্থ নিয়েছিলেন পূর্ব-এশিয়ার অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে—তাও দান নয়, দাবি করেছেন মাথা উঁচু রেখে। স্বাধীনতার মূল্য। এই প্রথম ও শেষবার সর্বাধিনায়ক ভিক্ষা চাইলেন—শুধু আমাদের জন্য।

*   *   *

আগেই বলেছি, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল আমার। নানান ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছি তাঁর মুখে। শুধু আমি নই, আমরা সবাই। তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হতে দেখেছি, খিন্ন বিষণ্ণ হতে দেখেছি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখেছি। দেখেছি নিরলস পরিশ্রম করতে, আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় আগ্নেয়গিরির মতো তাঁকে থরথর করে কাঁপতে দেখেছি। লক্ষ্য করেছি তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীক রূপ, জীবন-মৃত্যুর প্রতি অসীম উদাসীনতার ব্যঞ্জনা, লক্ষ মানুষের প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দেবার জাদুমন্ত্র, এমনকি ঐ প্রস্তরকঠিন মানুষটির দুচোখে জল ভরে উঠতেও আমি দেখেছি। তাঁকে ধৈর্যচ্যুত হতে নিজে কখনো দেখিনি—তবে নাজিরের কাছে সে বর্ণনাও শুনেছি। একটি দুর্লভ মুহূর্তে তাঁকে লজ্জা পেতেও দেখেছি। সে কথা যথাস্থানে।

শুধু একটিমাত্র অনুভূতির ব্যঞ্জনা—যে অনুভূতি মরমানুষের পক্ষে অনতিক্রম্য—তার বহিঃপ্রকাশ শুধু আমি নয়—আমাদের কেউ কখনো দেখেনি। ভয় পেলে মুখের কী অভিব্যক্তি হয় তা কেউ কখনো ফুটে উঠতে দেখেনি নেতাজীর মুখে।

যাক, যা বলছিলাম।

খবর পাওয়া গেল, যে-এঞ্জিনটি আমাদের গাড়িগুলোকে নিয়ে যাবে, বিকালের দিকে একটি বিমান আক্রমণে সেটি জখম হয়েছে। তাই সময়মতো আমাদের রওনা হওয়া যায়নি। জেনারেল ইসোডা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে সবিনয়ে নেতাজীকে জানিয়েছেন যে, এ ক্ষেত্রে ট্রেনে মেয়েদের অপসারণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। পরিবর্তে তিনি আমাদের জন্য খানকয়েক লরি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আবার ফিরে এলাম আমরা স্টেশন থেকে। রাত তখন এগারোটা। তারপর শুরু হল শবরীর প্রতীক্ষা। বারোটা বাজল, একটা বাজল, গাড়ির খবর নেই। নেতাজী এবং তাঁর প্রধান অনুচরদের অপসারণের জন্যে যে গাড়িগুলির আসার কথা সেগুলি যথাসময়েই এসেছে, সন্ধ্যা থেকে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের ট্রাক না এলে নেতাজী যে রওনা হবেন না এটা কারো বুঝতে বাকি নেই। ফলে সাহস করে সে অনুরোধ তাঁকে কেউ করতেও পারল না। সদর-দফতরে তৈরি হয়ে একটি বেতের চেয়ারে বসে আছেন নেতাজী। পরনে ব্রিচেস, পায়ে টপ্-বুট, মাথায় টুপি। গাড়ি এলেই রওনা হবেন। কিছু দূরে দূরে বসে আছেন অন্যান্য সমরনায়ক। ভোঁসলে, কিয়ানী, আইয়ার, চ্যাটার্জি, স্বামী। নেতাজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মেজর মেনন, এ. ডি. কং রাওয়াত, কনফিডেন্শিয়াল স্টেনো ভাস্করণ এবং খাস চাকর সুনীল, টেবল্-বয় কালি আছে কাছে-পিঠে। এ ছাড়া আরো অন্যান্য অনেকে। প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যচ্ছে। রাত দুটো, আড়াইটে, তিনটে, সাড়ে তিনটে, চারটে! কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষে রাত সাড়ে চারটের সময় কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল ট্রাক এসেছে। চারখানি মোটরগাড়ি তো আগে থাকতেই এসে দাঁড়িয়ে আছে, এবার এসেছে বারোখানি মাথাখোলা ট্রাক।

কর্নেল স্বামী এসে কুণ্ঠিত স্বরে সংবাদটা জ্ঞাপন করলেন নেতাজীকে।

একটা নিশ্বাস পড়ল তাঁর। বাঁহাতের কবজির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। মৃদু হেসে বললেন, ধন্যবাদ! এবার শোওয়া যেতে পারে!

ধীরপদে তিনি উঠে গেলেন শয়নকক্ষের দিকে।

এছাড়া উপায় ছিল না। দিনের আলো ফুটে উঠতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি। আমাদের প্রথমেই যেতে হবে উত্তরমুখো, শত্রুসৈন্যের অভিমুখে। এখন রওনা হলে ঠিক সূর্যোদয়ের সময় আমরা পৌঁছাব রেঙ্গুন-পেগু রোডের সেই মারাত্মক মোড়টায়, যেখানে বিদ্যুৎচমকের মতো ব্রিটিশের ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি দেখা দেবার আশঙ্কা। রাস্তার দুদিকে সেখানে দিগন্ত-অনুসারী শস্যের খেত—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমাদের গাড়ির ক্যারাভান যেখানে হবে শত্রু বৈমানিকের কাছে লোভনীয় টার্গেট।

*　　　*　　　*

পরদিন চব্বিশে এপ্রিল।

বেশ বোঝা গেল মাত্র এই কয়টি ট্রাকে আমাদের সকলের ঠাঁই হবে না। জানবাজদলের ছয়শত পদাতিক সৈন্য মেজর পি. এস. রাতুরির অধীনে মার্চ করে রওনা হয়ে গেল। তারা যাবে ব্যাংককে—সমস্ত পথটাই পায়ে হেঁটে। মৌলমিন থেকে রেলগাড়ি পেলেও পেতে পারে। অবশিষ্ট প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য মেজর-জেনারেল এ. ডি. লোগনাথনের অধীনে রেঙ্গুনেই থেকে গেল। তারা অপেক্ষা করবে ব্রিটিশ সৈন্যদলের। ওরা এলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন অসামরিক রেঙ্গুনবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষার দায় এই বাহিনীর। রেঙ্গুনে তখন ও পরবর্তীকালে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। এই সময়ে বর্মী ডাকাতের দল অসামরিক ভারতীয় অধিবাসীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নারী-ধর্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যাপৃত হয়। তাদের কথা চিন্তা করেই নেতাজী এই সৈন্যদলকে রেঙ্গুনে রেখে যান। লোগনাথন এবং কর্নেল জীবন সিং-এর নেতৃত্বে এই সেনাবাহিনী মাৎস্যন্যায় যুগের কয়টি মাস রেঙ্গুনে যে কীর্তি রেখে গেছে তার জন্য শান্তিপ্রিয় বর্মী ও অসামরিক রেঙ্গুনবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

যাত্রামুহূর্ত চব্বিশ ঘন্টা পিছিয়ে গেল বলে তখন সকলেই মর্মাহত হয়েছিল; কিন্তু আজ যখন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি তখন মনে হয় এ একপক্ষে ভালই হয়েছিল। কারণ ঐ একদিন সময় পাওয়ার জন্যই নেতাজী দুটি বাণী রেখে যাবার সময় পেলেন। একটি ভাষণে তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় ও বর্মী অসামরিক বন্ধুদের সম্বোধন করেছিলেন, দ্বিতীয়টিতে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন রেঙ্গুনে যে সৈন্যদলকে রেখে যাওয়া হল তাদের। হয়তো সে ভাষণ অন্যত্র পাঠ করেছেন আপনারা। তবু এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন বর্ণনার প্রাক্কালে আবার সেটা শোনাই। কারণ এ দুটি বাণীই আমাদের এই দুর্গম যাত্রার পটভূমিকা :

> "বর্মাবাসী আমার ভারতীয় ও বর্মী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে :
>
> "ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! বেদনাতুর অন্তঃকরণ নিয়ে আজ আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমাদের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু এ শুধু প্রথম পর্বই। আরও অনেক সংগ্রাম বাকি রয়ে গেল। প্রথম পর্বের যুদ্ধেই হেরেছি আমরা, হৃদয়কে হারাইনি।
>
> "ব্রহ্মপ্রবাসী আমার দেশের মানুষ! মাতৃভূমির প্রতি আপনারা যেভাবে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে সমগ্র পৃথিবী আজ মুগ্ধ। মুক্তহস্তে ধন-জন-সম্পত্তি আপনারা অকাতরে দিয়ে গেছেন। সামগ্রিক যুদ্ধপ্রচেষ্টার উজ্জ্বল প্রথম দৃষ্টান্ত আপনারা রেখেছেন। কিন্তু প্রতিকূলতার দুরতিক্রম্য বাধায় আপনাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি, আমাদের প্রাথমিক পরাজয় ঘটেছে।
>
> "আপনাদের আত্মোৎসর্গের এই মহান দৃষ্টান্ত—বিশেষ করে ব্রহ্মদেশে আমার কেন্দ্রীয় দফতর অপসারণের পর আপনাদের ভূমিকা—আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
>
> "আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই মনোবলকে কেউ পদদলিত করতে পারবে না। ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে আমি আজ আমার আকুল আবেদন রেখে যাব—সেই দৃঢ় মনোবল আপনারা অমলিন রাখুন, আমি বলব—গর্বোন্নত শিরে আপনারা প্রতীক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন আবার সেই শুভ মুহূর্তের জন্য, যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুযোগ আবার আসবে আপনাদের দ্বারে।
>
> "ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের নাম তার ভিতর স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হবে।
>
> "স্বেচ্ছায় আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি না। আমি চেয়েছিলাম আপনাদের পাশেই অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, আপনাদের সঙ্গে একই ভাবে এ পরাজয়ের হলাহল আকণ্ঠ পান করতে। কিন্তু আমার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক উপদেষ্টাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম নতুন করে পরিচালিত করবার প্রয়োজনে আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ

করে যাচ্ছি আজ। আমি জন্ম-আশাবাদী! ভারতমাতার মুক্তি যে আসন্ন আমার এ দৃঢ়বিশ্বাসের বনিয়াদ আজও একতিলও টলেনি—আমি প্রার্থনা করব, আপনারাও সে বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করুন।

"আমি চিরকাল বলে এসেছি : নিষ্প্রভাত রাত্রি নাই! রাতের শেষ প্রহরের ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়ে আজ আমরা পথ চলেছি : সুতরাং বিশ্বাস রাখুন অরুণোদয়ের মুহূর্ত আমাদের সম্মুখেই :

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই!

"আমার বক্তব্যের উপসংহারে আর একবার ব্রহ্ম সরকার এবং ব্রহ্মপ্রবাসীদের আমার অন্তর-উজাড়-করা কৃতজ্ঞতার কথা না জানিয়ে পারছি না। এই সংগ্রামে তাঁদের অবদান আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্বীকার করে যেতে চাই। এমন একদিন আসবেই যেদিন স্বাধীন ভারত এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবে।

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ
"আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ
"জয় হিন্দ্!

সুভাষচন্দ্র বসু
24.4.45"

এ ছাড়া আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর যেসব সৈন্য রেঙ্গুনে রয়ে গেল, যাদের ওপর আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তিনি, তাদের উদ্দেশ্যেও ঐ একই দিনে তিনি একটি নির্দেশনামা প্রচার করে যান। সেটির আক্ষরিক অনুবাদও এই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে থাক :

"আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নির্ভীক অফিসার ও সেনানীদল!

"অত্যন্ত বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে ব্রহ্মদেশ থেকে বিদায় নিচ্ছি—বিদায় নিচ্ছি সেই পটভূমি থেকে যেখানে চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আপনারা অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে গেছেন, এবং আজও করছেন। ইম্ফলে এবং ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই প্রথম পর্যায়ে আমরা প্রতিহত হয়েছি। কিন্তু এ শুধু প্রথম পর্বই। আমাদের এখনো অনেক অধ্যায় রচনা করতে হবে এ স্বাধীনতা-যুদ্ধের। আমি জন্ম-আশাবাদী, তাই কোনো অবস্থাতেই আমি চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করি না। ইম্ফলের সমভূমিতে, আরাকানের জঙ্গলে-পর্বতে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি অঞ্চলে এবং অন্যান্য সমরক্ষেত্রে আপনাদের মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বগাথা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

"কমরেডস্ : এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আপনাদের সম্মুখে একটিমাত্র আদেশনামা রেখে যেতে চাই; আমার সেই অন্তিম আদেশ—সামরিক বিপর্যয় যখন আসবে তখন সে বিপর্যয়কে বুক পেতে গ্রহণ করুন, কিন্তু দেখবেন আপনাদের হাতের তে-রঙা ঝাণ্ডা যেন উঁচুতে ধরা থাকে। বীরের মতোই বুক পেতে গ্রহণ করুন পরাজয়ের অশনি-আঘাত। দেখবেন সামরিক মর্যাদা এবং বীরের সম্মান যেন ভূলুণ্ঠিত না হয়। ভারতবর্ষের আগামী যুগের মানুষ—যারা আপনাদেরই এই মহান আত্মত্যাগের ফলশ্রুতি হয়ে জন্মাবে,—জন্মাবে দাসরূপে নয়, স্বাধীন নাগরিকরূপে—তারা যেন আপনাদের নাম সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারে, তারা যেন বলতে পারে দুনিয়াকে ডেকে—দেখ, আমাদের পূর্বাচার্যরা মণিপুর, আসাম আর ব্রহ্মদেশের রণক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হয়েও মনোবল হারাননি, সাময়িক বিপর্যয়কে অস্বীকার করে তাঁরা রচনা করে গিয়েছেন অন্তিম সাফল্য ও গৌরবের রাজপথ!

"ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার দুর্বার অটল বিশ্বাস এতে একতিলও বিচ্যুত হয়নি। আমি একান্ত নির্ভরতায় আপনাদেরই হাতে আজ গচ্ছিত করে যাচ্ছি ভারতের জাতীয় পতাকা, ভারতের সম্মান এবং ভারতীয় সৈনিকের ইতিহাসস্বীকৃত মর্যাদা। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের হে অগ্রদূতদল, আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই সেই সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় আপনারা সর্বস্ব দান করতে দ্বিধা করবেন না; প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও সে সম্মান আপনারা রক্ষা করবেন—যাতে অন্যত্র সংগ্রামরত আপনাদের সঙ্গীরা সর্বকালে সে উদাহরণ থেকে সঞ্জীবনী রস আহরণ করতে পারে।

"আমার যদি স্ব-ইচ্ছায় চলবার সুযোগ থাকত তাহলে এ দুঃসময়ে আমি আপনাদের পাশেই থাকতাম এবং সাময়িক পরাজয়ের তিক্ত ফলের আস্বাদ এক পঙক্তিতে বসে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমার মন্ত্রিমণ্ডলী আর ঊর্ধ্বতন সামরিক উপদেষ্টার পরামর্শে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্রত নিয়ে আমাকে আজ ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে। পূর্ব-এশিয়া আর স্বদেশবাসী ভারতীয়দের আমি খুব ভালোভাবেই জানি— আর জানি বলেই এ কথা বলে যেতে পারছি—বিশ্বাস করুন, আপনাদের এ দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা, এ আত্মত্যাগ—এর কিছুই বৃথা যাবে না! সকল অবস্থাতেই তাঁরা এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

আমার নিজের কথা এবার বলি। উনিশশ তেতাল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাব—আমার স্বদেশবাসী আটত্রিশ কোটি ভারতীয়ের মুক্তির জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাব।

সব শেষে আমি আপনাদের কাছে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখব যে, আমার মত আপনারাও আশাবাদী হন—আমারই মত বিশ্বাস করুন—নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই! নীরন্ধ্র তমসার পরপারেই আছে ঊষার অরুণ আলোক।

বিশ্বাস করুন—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, এবং অনতিবিলম্বেই হবে!

"ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন!
"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!
"আজাদ হিন্দ্ মৃত্যুঞ্জয়ী হোক!
"জয় হিন্দ্!

সুভাষচন্দ্র বসু
24 এপ্রিল 1945 সর্বাধিনায়ক, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ"

আট

এই দুটি ঐতিহাসিক দলিল রচনা করা ছাড়াও ঐ একটি দিনে আরো অনেক কাজ করলেন নেতাজী। আমাদের নারীবাহিনীর দলটাকে অনেক ছোট করে ফেললেন। বর্মার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব মেয়ে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল দিনের বেলাতেই তাদের শহরতলি অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের মালয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া বারোটি ট্রাকের মধ্যে মাত্র তিনটি জুটেছে এই নারীবাহিনীর জন্য। ফলে একান্ত স্থানাভাব। ওরা রেঙ্গুনের উপকণ্ঠেই থাকবে। সুযোগমতো যে যার বাড়ি চলে যাবে। যাদের বাড়ি কাছে-পিঠে তাদের সরাসরি বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর যারা মালয় থেকে বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাদের আপাতত ওঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। সংখ্যায় আমরা রইলাম সাতান্ন জন। সারাটা দিন ধরে দেখছি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়ে দলে দলে চলেছে জাপানি সৈনিক। ট্রাকে এবং পায়ে হেঁটে। সমস্ত শহরে এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেলছে ওরা। আমাদের গাড়িগুলোর ওপর গাছের ডালপালা চাপানো হল প্রচুর, যাতে ওপর থেকে সহজে নজরে না আসে।

সন্ধ্যার একটু পরেই রওনা হলাম আমরা। খানছয়েক মোটর এবং বারোটি ট্রাক। তিনখানিতে আমরা। আমাদের ট্রাকে আম্মাজী, ভাবিজী এবং নমিতাদির ঠাঁই হয়েছে। দলনেত্রী থিবার্স বসেছেন সামনের ট্রাকে। ঘন্টাখানেক পথ চলেছি কি চলিনি, শোনা গেল এক ঝাঁক বোমারু-বিমানের শব্দ। মুহূর্তে গাড়ির ক্যারাভান দাঁড়িয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। আমরা ঝুপঝাপ লাফিয়ে নেমে পড়ি ট্রাক থেকে। আশ্রয় নিলাম রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে। এই তো সবে শুরু। প্রতি আধঘন্টা অন্তর এই লুকোচুরি খেলার পুনরাবৃত্তি। ফলে রীতিমতো শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছি আমরা। রেঙ্গুন-পেগু রোড ধরে। সোজা শত্রুব্যূহের দিকে। উত্তরমুখো।

হঠাৎ সামনের দিক থেকে প্রচণ্ড কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। মাথার ওপর কোনো শত্রুবিমান নেই। অর্থাৎ বোমার বিস্ফোরণ নয়। দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ির ক্যারাভান। কী ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দেখলাম সামনের গাড়ি থেকে নেমে মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানী এগিয়ে এলেন

দ্বিতীয় গাড়িখানার দিকে। সেখানায় আছেন আমাদের সর্বাধিনায়ক। আরো কেউ কেউ এগিয়ে গেলেন দ্বিতীয় গাড়িখানার দিকে। অন্ধকারে তাঁদের ঠিক চিনতে পারছি না।

সামরিক কার্যপ্রণালীতে নেতাজী সবসময়েই নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী। সব কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে করার ইচ্ছা তাঁর। তাই যাত্রা-মুহূর্তে তিনি এই ঐতিহাসিক অভিযানের কর্ণধাররূপে সর্বপ্রথমেই চিহ্নিত করলেন মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানীকে। আমাদের সর্বময় কর্তৃত্ব এখন তাঁর। এমনকি স্বয়ং নেতাজী তাঁর নির্দেশে উঠছেন, চলছেন, বসছেন। নেতাজীও আজ জামান কিয়ানীর আজ্ঞাবহ!

জেনারেল কিয়ানী আমাদের ক্যারাভানকে রুখে দিলেন। মোটর সাইকেলে চেপে একটি ছোট্ট প্যাট্রোল-পার্টি রওনা হয়ে গেল সামনের দিকে। ওরা দেখে আসবে ব্যাপারটা। বিস্ফোরণ হচ্ছে কোথায়, কেন? আকাশে যখন শত্রুবিমান নেই তখন ওগুলি ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ির গোলাবর্ষণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ পথে আমাদের আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

আম্মাজী ঝুঁকে পড়ে নিম্নস্বরে আমাকে প্রশ্ন করেন, আমরা কি ব্রিটিশ-লাইনের কাছাকাছি এসে পড়েছি?

আমি জবাব দেবার আগেই ভাবিজী চাপা ধমক দিয়ে ওঠে—কথা বলবেন না। অত কৌতূহল ভাল নয়।

আম্মাজীর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। আর কোনো কথা বললেন না তিনি।

মোটর সাইকেলে চেপে জনাচারেক জওয়ান চলে গেল সোজা উত্তরমুখো। আমরা নিশ্চুপ বসে প্রহর গনি। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। অন্ধকারে গাছগুলো চেনা যাচ্ছে না। হাওয়া নেই একফোঁটা। স্তব্ধ প্রহরীর মত গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে দূরে জোনাকি জ্বলছে। গ্রাম নজরে পড়ছে না কোথাও। আমরা এতগুলি লোক একেবারে নিস্পন্দ বসে আছি। আশেপাশে, কে জানে হয়তো ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে বর্মী ডাকাতের দল, অথবা ব্রিটিশ গেরিলাবাহিনী।

আধঘন্টার মধ্যেই ফিরে এল প্যাট্রোল-পার্টির ছেলে চারটি। না, শত্রুসৈন্য নয়। সামনেই পেগু শহর। জাপানিরা পোড়ামাটি নীতি অনুসারে ওখানকার যাবতীয় সমরোপকরণ, যা তারা স্থানান্তরিত করতে পারবে না, তা বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আবার এগিয়ে চলা শুরু হল আমাদের।

*　　　　*　　　　*

দিগন্ত-অনুসারী প্রান্তরের মাঝখানে পিচমোড়া সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়ির ক্যারাভান। যেন চলন্ত একটা সরীসৃপ। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে এতক্ষণে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি না হয়ে আজ যদি অমাবস্যার ঘনান্ধকার হতো তা হলেই বরং খুশি হতাম আমরা। হে যুদ্ধ, তোমাকে সেলাম! মানুষের কত সুকুমার বৃত্তিকেই না তুমি ধ্বংস করে গেলে। এমন যে চাঁদের আলো তাকেও কুষ্ঠরোগীর মত মনে হচ্ছে আজ। জীবনদানকারী সূর্যের অম্লান আলোককে আমরা ভয় পাই। পূর্ণচন্দ্রকে ঘৃণা করি—আমরা যেন প্রাগৈতিহাসিক আদিম জন্তু—অন্ধকার গর্তের চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুকেই মনে করি না।

গাড়ি চলেছে নাচতে নাচতে। রাস্তার এখানে-ওখানে গর্ত। হেড-লাইট জ্বলছে না। ঠুলি-ঢাকা আবছা আলোয় সামনের পথ দেখা যায় না, তাই বারে বারে গর্তে পড়ছে চাকা। ডাইনে-বাঁয়ে প্রান্তরের ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে আর্টিলারি শেল ফাটার আওয়াজ। রাইফেলের শব্দ, মেশিনগানের নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ। জীবন-মৃত্যু যেন এসে মিশেছে একই সমতলে। আমরা এই মুহূর্তে বেঁচে আছি এও যেমন সত্য তেমনি আগামী মুহূর্তে যে বেঁচে থাকব তার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পৌছালাম পেগুতে। পেগুর বহ্ন্যুৎসবে। সারা শহরটা দাউদাউ করে জ্বলছে। ব্রিটিশবাহিনী যেন ওখানে কিছুই না খুঁজে পায়। সেই প্রজ্জ্বলিত শহরকে বাঁ-হাতে রেখে আমরা আরও উত্তরে এগিয়ে চলেছি—কে জানে হয়তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে। ছেলেবেলায় মুখস্ত করতে হয়েছিল 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড' কবিতাটি, সিঙ্গাপুরের সেই শান্ত কনভেন্ট স্কুলে। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম অমন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা একদিন আমারও হতে পারে? ডাইনে কামান, বাঁয়ে কামান মুহুর্মুহু গর্জন করে উঠছে, আর লাইট ব্রিগেডের আমরা কটি প্রাণী স্থিরলক্ষ্যে ছুটে চলেছি মৃত্যুর মুখবিবরে!

মাঝে মাঝে সড়কের একপাশ ঘেঁষে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে হুড়মুড় করে জাপানি কনভয় আমাদের অতিক্রম করে ছুটে যাচ্ছে। আমরা পশ্চাদপসরণ করছি—ওরা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে—আহত সৈনিককে আনতে, সমরোপকরণ অপসারণের কাজে। তাই ওদের অগ্রাধিকার। আজ এমন একটি বিচিত্র পথে এসে পৌঁছেছি যেখানে আমাদের এবং ওদের লক্ষমুখ এক। এগিয়েই যেতে চাও অথবা পেছিয়েই যেতে চাও—রেঙ্গুন থেকে প্রথমেই যেতে হবে উত্তরমুখো!

পেগু থেকে মাইল কতক উত্তরে এসে আমরা উপনীত হলাম সেই চিহ্নিত তে-মাথার মোড়ে। যে পথে এসেছি, যে পথ গেছে শত্রুসৈন্যের দিকে এবং যে পথে আমরা যাব দক্ষিণ-পূর্ব মুখে—মৌলমিনের দিকে, ব্যাঙ্ককের দিকে।

সেই তেমাথার মোড়টি অতিক্রম করার পর আমাদের সকলেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। আঃ, বাঁচা গেল। এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না, যাচ্ছি বিপরীত দিকে। ট্রাকের চাকার প্রতিটি আবর্তন শত্রুসৈন্যের থেকে আমাদের দূরত্বটা বর্ধিত করবে এখন থেকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমাদের যাত্রাসময় যদি বারো ঘন্টা পেছিয়ে যেত তাহলে সেই তেমাথার মোড়টা আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারতাম না। এখানেই নেতাজীর মৃত্যু হত অথবা তিনি বন্দী হতেন;—কারণ ঠিক পরের দিন দ্বিপ্রহরে ব্রিটিশবাহিনী পেগু শহর অধিকার করে এবং এই সড়ক দখলে নেয়।

আমরা যখন ওয়া শহরের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি তখন পুব-আকাশটা ক্রমশ ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রভাত হচ্ছে। সম্ভবত ওয়ায় পৌঁছাতে পারব না আলো ফুটে ওঠার আগে। কারণ ওয়ায় প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই আমাদের ওয়া নদীটি পার হতে হবে। আমরা রয়েছি ওয়া নদীর পশ্চিম পারে—শহর পূর্ব পারে। এত দ্রুতগতি সুন্দর অন্ধকারকে বিদূরিত করে ক্লেদাক্ত ঊষার আলো ফুটে উঠল যে, আমরা বাধ্য হয়ে ওয়া থেকে মাইলপাঁচেক উত্তর-পশ্চিমে একটি ছোট্ট গ্রামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলাম। আমাদের কিছু মেয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেল গ্রামের পরিত্যক্ত কুটিরে—কিছু স্রেফ গাছতলার 'বিভকে'।

* * *

আমি, ভাবিজী আর রাবেয়া তিনটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা বড় রবারগাছের তলায় এনে বসালাম। বড় ডেকচিতে চায়ের জল বসিয়ে দিলাম। মেয়েরা শুকনো কাঠ আর ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এল—আজ যেন আমাদের বনভোজন! রান্নার আয়োজন করছে অন্যান্য মেয়েরা। প্রকাণ্ড ডেকচি-হাঁড়ি ইত্যাদি আমাদের সঙ্গেই আছে। খাদ্যদ্রব্য যা আছে তাতে দিন-তিনেক চলে যাবে। অসুবিধা হয়েছিল জলের—তাও জওয়ান ভাইয়েরা মিটিয়ে দিল। কোনো পার্বত্য ঝর্না থেকে বালতিতে করে টেনে নিয়ে এল জল। এখন চায়ের আয়োজন করতে আর কোনো অসুবিধা নেই। টিনের দুধ যা আছে তাতে সকলের কুলাবে না—তা না হোক, চা আমরা খাই বিনা দুধে। এক চিমটে নুন দিয়ে। চা নয়, 'ওছা'। ওটা জাপানিদের কাছে শিখেছি। বেশ গুছিয়ে নিয়ে চায়ের আয়োজন করছি, প্রথম বাদ সাধলেন জেনারেল কিয়ানী। তাঁর এ. ডি. কং এসে অনুযোগ করলেন আমাদের উনান থেকে নাকি ধোঁয়া বার হচ্ছে।

ভাবিজী তার আগুনের উত্তাপে রাঙা সুন্দর মুখটা তুলে ধমক দিয়ে ওঠে—কী আপদ! কাঠের উনানে ধোঁয়া বার হবে না?

এ.ডি.সি. ভাবিজীর টকটকে লাল সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে হাসল। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তর্জনী তুলে বললেন—শয়তান বুঝে ফেলবে ভাবিজী!

কী বিপদ বুঝুন। কাঠের উনানে রান্না করতে হবে অথচ ধোঁয়া হলে চলবে না। উপায় নেই। বেশি ধোঁয়া বার হলেই আমরা উনান নিভিয়ে দিচ্ছি। শত্রুবিমান যেন ধোঁয়া দেখে টের না পায় আমরা এখানে আছি। এভাবেই প্রায় ঘণ্টাখানেক কসরৎ করে প্রথম রাউন্ড চায়ের ব্যবস্থা হল। এগুলো দুধের চা। সামান্য কয়েক মগ বানিয়েছি। নেতাজী আর তাঁর প্রধান সহচরদের জন্য। এখানে আবার একটু হাত-সাফাই করতে হবে। পরের রাউন্ড যে বিনা দুধের হচ্ছে এটা ওঁরা যেন টের না পান। তাহলেই ধমক খেতে হবে।

একটু দূরে গাছতলায় কম্বল বিছিয়ে নেতাজী দাড়ি কামাচ্ছেন। জামান কিয়ানী আর ভোঁসলেজী ঘাসের ওপর একখানা মানচিত্র বিছিয়ে কী যেন আলোচনা করছেন। আইয়ার সাহেব গাছতলা ছেড়ে রাস্তার দিকে একটু পায়চারি করছেন। আমি কয়েক মগ চা নিয়ে ওঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—*হঠাৎ* কোথাও কিছু নেই, আকাশ ভেদ করে ছুটে বেরিয়ে এল খানতিনেক ব্রিটিশ ফাইটার বিমান। বোধকরি ওরা আইয়ার সাহেবকেই দেখতে পেয়েছিল—কারণ আমরা সকলেই ছিলাম ঘনপাতায় ছাওয়া গাছের আড়ালে। আইয়ার ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে একনজর তাকিয়েই রুদ্ধশ্বাসে ছুট লাগালেন সামনের দিকে। সামনেই ছিল একটা খড়ের গাদা। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তার ভেতরে। মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি লাইন বেঁধে ধুলোর রেখা টেনে দিয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। আইয়ারজীর হাত-তিনেক দূর দিয়ে। আমার হাত থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা চা। নেতাজী নির্বিকারভাবে দাড়ি কামাচ্ছেন।

বিমানটি বারকয়েক পাক খেল আকাশে। আম্মাজী জল ঢেলে নিবিয়ে দিয়েছেন উনানটা। আইয়ারজী দম বন্ধ করে পড়ে আছেন খড়ের গাদায়। প্লেন তিনটি মিলিয়ে গেল দিগন্তে। সন্তর্পণে খড়ের গাদা থেকে এবার উঠে এলেন এস. এ. আইয়ার—আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রচার-সচিব।

কর্নেল চ্যাটার্জি বলেন, আরতি, চায়ের মগটা আগে আইয়ার ভাইকে দাও। খড়ের গাদায় দমবন্ধ করে বেচারি এতক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আইয়ার-সাহেবের খুব নজর। প্রাণের চেয়েও প্যান্টের ক্রিজ ওঁর কাছে প্রিয়। তিনি পোশাক থেকে খড়ের কুচো বেছে ফেলতে ব্যস্ত ছিলেন, তাড়াতাড়ি বলেন—না না, আমাকে নয়, আগে নেতাজীকে।

নেতাজী রেজারটা নামিয়ে রেখে হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেন, বলেন—আমি জানতাম। যে পিঁপড়ে গুড়ের নাগরি থেকে উঠে আসে বাসায় ফিরে সে আর কিছু খেতে চায় না।

একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি। তারপর বক্রোক্তিটা সকলেই একসঙ্গে বুঝে ফেলে। হো-হো করে হেসে ওঠে সকলে। আইয়ারও হাসতে হাসতে বলেন, যা খিদে পেয়েছে স্যার, গরুর মতো খড়ই চিবোতে ইচ্ছে করছে এখন!

আমি কোনোক্রমে হাসি চেপে সেই অখাদ্য চায়ের মগটা বাড়িয়ে ধরি নেতাজীর দিকে। নেতাজী তাতে একটি চুমুক দিয়ে বলেন, আরতি, তুমিও তো ক্রিশ্চান, নয়?

'তুমিও তো' কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কর্নেল চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে নেতাজী বলেন—আরতিকে দেখলেই আমার ভারতীর কথা মনে পড়ে যায়। রেঙ্গুনের মিস ভারতী জোসেফ। কর্নেল চ্যাটার্জি, চেনেন নাকি মেয়েটিকে?

কর্নেল চ্যাটার্জি মাথা নেড়ে বলেন, না স্যার। রেঙ্গুনের মিস ভারতী জোসেফ? কোথায় দেখেছি বলুন তো?

নেতাজী চায়ের মগে আর একটা চুমুক দিয়ে রহস্যভরা দৃষ্টিতে নমিতাদির দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি চিনতে পার নমিতা?

নমিতাদিও বেশ অবাক হয়ে যান। রেঙ্গুন শহরের মিস ভারতী জোসেফ নামে কাউকেই চিনতে পারি না আমরা কেউ।

নেতাজী হেসে বলেন, অন্তত নমিতা চিনতে পারবে ভেবেছিলাম। আর কেউ তাকে চেনে না।

হঠাৎ সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল বলে ওঠেন, আমি তাকে চিনি, নেতাজী! *পথের দাবীর* ভারতী জোসেফ!

কর্নেল (পরে মেজর-জেনারেল) চ্যাটার্জি অস্ফুটে বলে ওঠেন—ও!

তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে নেতাজী বলেন, নমিতা! অবাঙালিনী একটি মহিলার কাছে হেরে গেলে তো?

নমিতা চকিতে একবার আম্মাজীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে অস্ফুটে বললে, আমি বাস্তবের কোনো ভারতী জোসেফের কথা ভাবছিলাম।

নেতাজী বলেন, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও *পথের দাবীর* নাম তুমিও শুনেছ।

নমিতাদি জবাব দেয় না। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নেতাজীর দিকে। *'পথের দাবী'* নিশ্চয় কোনো গ্রন্থ; কিন্তু সেটা কী জাতীয় গ্রন্থ জানা ছিল না আমার। তবু মনে হল, প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে নমিতাদি, নেতাজীর ঐ প্রশ্নে। যেন কোনো ধর্মনিষ্ঠ খ্রিস্টানকে বলা হয়েছে *'বাইবেলের* নাম তুমিও শুনেছ?'

চায়ের মগটা শেষ হয়েছিল। সেটা নামিয়ে রেখে নেতাজী এবার একটি সিগারেট ধরালেন, কাঠিটাকে নেড়ে নেড়ে নিভিয়ে দিয়ে আবার নমিতাদিকেই বলেন, পড়েছ *পথের দাবী?*

নমিতা সেনগুপ্তার চোখে পলক পড়ছে না। যেন অত্যন্ত অপমানিত হয়েছে সে। যেন সে এবার শোধ নেবে। আমি রীতিমত ঘাবড়ে যাই কিছু না বুঝেই। শেষকালে নমিতাদি বেঁফাস কিছু বলে ফেলবে না তো রাগের মাথায়? নমিতাদি গম্ভীরভাবে বলে, শুধু পড়েছি নয়, মুখস্থ আছে,—শুনবেন?

তারপর কারো কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে অনেকখানি আবৃত্তি করে গেলো মূল বাংলা ভাষায়। আমরা কেউ কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখলাম ধীরে ধীরে নেতাজীর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল—যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ডান হাতে ধরা আছে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। অনেকটা ছাই জমেছে তাতে। যে কোনো সময়ে ওঁর প্যান্টের ওপর ঝরে পড়তে পারে। নেতাজী নির্বাক নিস্পন্দ। নমিতাদি গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে একনাগাড়ে আবৃত্তি করে চলেছে। কবিতা নয়, গদ্য। কী বলছে, জানি না, কিন্তু ওর বাচনভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পাঠ নয়, আবৃত্তি নয়, ঐ ধ্যানস্তিমিত প্রস্তরকঠিন শ্রোতাটিকেই লক্ষ্য করে সে যেন একটি অভিনন্দনবাণী পাঠ করে চলেছে। যেন পাঠ নয়, প্রশস্তি!

অদ্ভুত কটি মুহূর্ত। উন্মুক্ত নির্জন প্রান্তরে জনবসতিশূন্য গ্রামের প্রান্তে কটি রবারগাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে এক আত্মগোপনকারী সেনাদল। সমস্ত চরাচর স্তব্ধ মৌন। মাথার ওপরে দূর নীলাকাশে চক্রাকারে পাক খাচ্ছে শ্যেনসন্ধানী কয়েকটি শত্রুবিমান। আর সেই পরিবেশে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে নমিতা সেনগুপ্তা অশ্রুআর্দ্র কণ্ঠে।

আবৃত্তি সমাপ্ত হল। কর্নেল চ্যাটার্জি একটু সেন্টিমেন্টাল—চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখটা মুছে নেন। এ পাশে ফিরে দেখি আম্মাজীও আঁচলে মুখ মুছছেন। জীবনে সেই প্রথম দেখলাম—নেতাজী লজ্জা পেয়েছেন। হ্যাঁ, আবৃত্তির একটি শব্দও আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এটুকু হলপ করে বলতে পারি যে, তাঁর টকটকে ফর্সা মুখটা যে এমন লাল হয়ে উঠেছে সেটা শুধু উত্তেজনায় নয়, আর কোনো অনুভূতিতে।

আবৃত্তি শেষ হল, শেষ হল না আকাশে-বাতাসে তার অনুরণন। আমরা অধিকাংশই কেউ কিছু বুঝতে পারিনি। যে কজন বুঝেছে তাদের অনুভূতি যেন আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে গেল। নেতাজী প্রথম নড়েচড়ে বসলেন, বললেন—একটু ভুল হয়েছে তোমার। মূলগ্রন্থে লাইনটা ছিল 'সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়'।

সে কথার কেউ জবাব দিল না। না নমিতা, না আম্মাজী, না কর্নেল চ্যাটার্জি; কিন্তু তাঁদের মুখ দেখে আমার মনে হল নেতাজীই উদ্ধৃতিতে ভুল করছেন, নমিতাদি কিছু ভুল বলেনি।

রহস্যটা কী?

এখন বুঝতে পারি। পরে নমিতাদি অনুবাদ করে শুনিয়েছিল প্যাসেজটা। সে বলেছিল :

> "তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, ভিস্তিতে চড়িয়া তোমাকে কাবুলনদী পার হইতে হয়। তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়, কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে কার সাধ্য? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে পার বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

নয়

আহারাদি মিটতে সেই যার নাম বেলা তিনটে। কাল সারারাত ঘুম হয়নি, আজও হবে না। নেতাজী ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন। আমরাও। বেলা চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা মানচিত্র নিয়ে নেতাজী গভীর অভিনিবেশে কী যেন দেখছেন। একটু পরেই তিনি একজন স্টাফ-অফিসারকে ডেকে আদেশ করলেন তিনি যেন মোটর সাইকেল নিয়ে তখনই চলে যান পদব্রজে-আগত জানবান-বাহিনীর কাছে। মেজর রাতুরির পরিচালনায় আমাদের পেছন পেছন হাঁটাপথে তারা আসছে। তাদের জানাতে হবে তারা যেন রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ছেড়ে রেলওয়ে লাইন ধরে আসে। কারণ শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন ইউনিটের সমাবেশ দেখে নেতাজী আশঙ্কা করছেন জানবান দল ঐ তে-মাথার মোড় অতিক্রম করবার আগেই শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ওখানে পৌঁছে যাবে।

পরে শুনেছি, এই নির্দেশনামা যদি তিনি না পাঠাতেন তাহলে আমাদের ছয়শত সৈনিকের মৃত্যু হত অবধারিতভাবে। এ আদেশ পেয়ে মেজর রাতুরি সড়ক ছেড়ে মাঠের রাস্তা ধরেছিলেন। শুনেছি তাঁরা রেঙ্গুন-পেগু সড়ক ত্যাগ করে যাবার কয়েক মিনিট পরেই সেখানে ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের আবির্ভাব ঘটে। এইসব কথা যখন ভাবি আর মনে পড়ে, আমাদের নেতাজী দেরাদুনে, স্যান্ডহার্স্টে বা দুনিয়ার কোনো সামরিক বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করেননি—তখন অবাক হয়ে যাই। কেমন করে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা পাকা সমরনায়কদের খেয়াল হয়নি? এ কি ঈশ্বরদত্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির ব্যঞ্জনা, নাকি অলৌকিক প্রতিভার লক্ষণ?

সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা নবীন উদ্যমে যাত্রা শুরু করলাম। নেতাজী কেবল এদিক-ওদিক ছুটছেন, কোন গাড়ি আগে যাবে, কে পরে যাবে—সমস্ত দেখাশোনা করছেন। এসব কাজের জন্য সুদক্ষ সমরনায়কদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কর্মদক্ষ অফিসার। নিয়মানুবর্তিতায় নেতাজীর প্রগাঢ় বিশ্বাস। নিজেও তিনি জেনারেল কিয়ানীর আদেশে উঠছেন, বসছেন—কিন্তু যেখানে তাঁর অনুচরদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত সেখানে সবকিছু তিনি নিজে চোখে একবার না দেখে নিলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি নামল। আমরা সবাই একেবারে ভিজে গেছি। নেতাজীও। জাপানিদের শত শত লরি ওয়ার দিকে ছুটেছে। ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের সম্মুখে পড়ার আগেই তারা সিত্তাং নদী অতিক্রম করে যেতে চায়। কাদায় গাড়ির চাকা বার বার ফেঁসে যাচ্ছে। চাকার তলায় তক্তা পেতে দিয়ে বড় বড় কাদার দ' পার হতে হচ্ছে। পথে একটা ছোট নালা পড়ল। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি সামনে নেতাজীর গাড়িটা জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। প্রথমটায় আমরা আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখি গাড়িতে নেতাজী নেই—তিনি পাড়ে দাঁড়িয়ে অন্যান্য গাড়ির চালককে নির্দেশ দিচ্ছেন চোরাবালির পথ এড়িয়ে যাবার জন্য। অল্প পরে নেতাজীর গাড়িখানাকে চেন বেঁধে টেনে তোলা হল। আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা। ওয়ার দিকে। ইতিমধ্যে শত শত জাপানি লরিতে রাস্তার উপর রীতিমত জট পাকিয়ে গেছে। শম্বুকগতিতে চলেছি আমরা।

দলপতি কর্নেল কিয়ানীর আদেশে আমাদের লরিগুলিকে পাকা সড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামানো হল। মাঠ পার হয়ে আড়াআড়ি আমাদের নদীর কিনারায় যেতে হবে। কিন্তু একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। পথ কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল। গাড়ির স্টিয়ারিঙ ঠিক থাকছে না। মাতালের মতো ট্রাকগুলো টলছে। লেফটানেন্ট থিবার্স আমাদের গাড়িগুলি থামিয়ে মেয়েদের নেমে পড়তে বললেন। ড্রাইভার বরং খালি গাড়ি চালিয়ে নদীর কিনারায় যাক, আমরা হেঁটেই যাব। কিন্তু সে হাঁটু-সমান কাদার ভিতর কি হাঁটাই যায় ছাই? এতক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গিয়েছে। চার-পাঁচ হাত দূরের মানুষ আর চেনা যাচ্ছে না। সামনের মেয়েটির পদশব্দ লক্ষ্য করে গড্ডলিকা-প্রবাহে হাতড়ে হাতড়ে কোথায় চলেছি কে জানে? বারতিনেক আছাড় খেলাম। সর্বাঙ্গে কাদা লাগল। তা লাগুক; তখনই উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে, না হলে পেছনের মেয়েটি অজান্তে মাড়িয়ে চলে যাবে। অবশেষে এসে পৌঁছানো গেল ওয়া নদীর পশ্চিম পারে। রাত তখন আড়াইটে।

কিন্তু কেমন করে এই সহস্র মানুষ আর শত শত লরি ওপারে যাবে? নদীতে একটি মাত্র ফেরিঘাট—একটিই ভেলা বা বার্জ। নেতাজী নদীর পারাপারের ব্যবস্থাপনা একনজর দেখে নিলেন, তাকিয়ে দেখলেন অপেক্ষমাণ লরির সংখ্যার দিকে। মনে মনে কী যেন হিসাব করে বললেন, লরি এপারেই থাক, আমাদের সাঁতরে ওপারে যেতে হবে। দিনের আলো ফুটলে নদীর এই ঘাট হবে শত্রুবিমানের পক্ষে এক লোভনীয় টার্গেট। রাত থাকতেই আমাদের ওপারে যেতে হবে। মেজর-জেনারেল ভোঁসলে বলেন, আমরা না হয় সাঁতরে পার হব, কিন্তু মেয়েরা?

—নদীর গভীরতা কত?

তৎক্ষণাৎ একটি জওয়ান নেমে গেল জলে। মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে জানাল গভীরতম অংশে ছয় ফুট। তাও ফুট দশেক দূরত্ব। বাকি অংশে কোমর অথবা গলাজল।

লেফটানেন্ট থিবার্সের দিকে ফিরে নেতাজী প্রশ্ন করেন—রানীরা সবাই সাঁতার জানে?

—সবাই।

—তবে সাঁতরেই পার হতে হবে ওদের। রাত ভোর হবার আগেই এখান থেকে সকলকে সরে যেতে হবে। গাড়ি পার হোক আর না হোক। কর্নেল মালিক আর মেজর স্বামী, তোমরা ব্যবস্থা কর যেন রানীর দল নিরাপদে ওপারে যেতে পারে। ওরা পার হলে আমরা যাব।

ঠিক এই সময়েই অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে এলেন জাপানি জেনারেল ইসোডা। অভিবাদন করে বললেন, একটি ছোট নৌকা জোগাড় হয়েছে, নেতাজী দয়া করে এসে নৌকায় উঠুন।

নেতাজী রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, যা-তা বকবেন না, দেখছেন মেয়েরা নদী পার হতে পারছে না...

জেনারেল ইসোডা কুণ্ঠিত হয়ে সরে যান।

লেফটানেন্ট থিবার্স আমাদের ফল-ইন করালেন। আদেশ দিলেন নদীর ভেতর দিয়ে মার্চ করে যেতে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। রাইফেল হাতেই প্রয়োজন হলে সাঁতার দিতে হবে। মেজর স্বামী আর কর্নেল মালিক জলে নেমে গেলেন। নদীর গভীরতম অংশের এপারে একজন ওপারে একজন। দীর্ঘকায় দুই সৈনিক ঐ বিপদজনক অংশটুকুতে আমাদের পার হতে সাহায্য করছেন। বাকি পথ আমরা মাথার ওপর রাইফেল তুলে জল ভেঙে চলে এলাম। জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী। সিগারেট খাচ্ছেন। বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছেন উনি। ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল রাজু এবং মেজর মেনন নাকি বলেছেন এত বেশি সিগারেট খাওয়া ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। ভারি অন্যায় করছেন উনি। কী দরকার বাপু ঐ অখাদ্যগুলো খাবার? শুধু শুধু স্বাস্থ্যনাশ।

আমার সামনেই যাচ্ছিল নমিতাদি। নেতাজীর পাশ দিয়ে তাঁকে অতিক্রম করে যাবার সময় উনি রহস্য করে বললেন—নমিতা, তুমিও ভুল বলেছ, আমিও ভুল বলেছি। আসলে নদীটা কাবুলও নয় পদ্মাও নয়—ওয়া।

নমিতাদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নেতাজী হাসতে হাসতে বলেন, দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, তাই তো তোমাকে সাঁতার দিয়া 'ওয়া' পার হইতে হয়!

যেন চরম একটা প্রতিশোধ নেওয়া হল! ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠলেন উনি!

* * *

আমরা সকলেই নিরাপদে পার হয়ে এসেছি। কয়েকটি মেয়ে অবশ্য জোঁকের অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ভোর হয়ে আসছে। পূর্ব আকাশটা কুষ্ঠরোগীর মতো ফর্সা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শত্রুবিমানের ভয়ে শুকতারাটা দপদপ করে কাঁপছে। নেতাজীর জন্য আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তিনি এখনো নদীর ওপারে রয়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে ব্রিটিশ বিমান এসে পড়তে পারে। এতক্ষণে চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। শত্রুবিমান যদি এসে পড়ে তাহলে নদীর কিনারায় জড়ো করা লরির গাদাটা নিশ্চয় দেখতে পাবে। এই আশঙ্কাতেই নেতাজী

আমাদের রাত থাকতে নদী পার হবার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে কেন ওখানে অমনভাবে পড়ে আছেন?

ভেজা কাপড়ে আমরা নদীর এপারে বসে আছি সকলে। ছোট্ট নদী। ক্রমাগত পারাপার করে ট্রাকগুলি এপারে আনা হচ্ছে। জানি না আমাদের পনেরোখানা ট্রাকের কতগুলি এ পর্যন্ত এ দিকে এসেছে। হঠাৎ কাঁধের ওপর কে যেন অন্ধকারে হাত রাখল। চমকে উঠে পিছনে ফিরে দেখি আম্মাজী।

—কিছু বলছেন? প্রশ্ন করি আমি।

—হ্যাঁ। একটু সরে এস। কথা আছে।

দল থেকে কয়েক পা সরে এলাম। আম্মাজী আমার হাতটি তুলে নিয়ে তার ওপর নিজের শীর্ণ হাতটি বুলোতে বুলোতে অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, আরতি, আমার একটি মেয়ে ছিল। বেঁচে থাকলে সে তোমারই বয়সী হতো। আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবে?

আমি কণ্টকিত হয়ে উঠি। কী প্রশ্ন করতে চাইছেন উনি?

—আমার বিরুদ্ধে কেউ কি কিছু বলেছে?

মিথ্যা বললেই চুকে যেত। কিন্তু কী জানি কেন ঐ শীর্ণকায়া প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাকে সেই মৃত্যুশীতল রাত্রে ডাহা মিথ্যা কথাটা বলতে পারলাম না। ওঁর পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভবপর এটা আমি বিশ্বাসই করি না। তবু সামরিক নির্দেশ অমান্যই-বা করি কেমন করে?

উনি নিজে থেকেই বলেন, থাক! বুঝেছি। কিন্তু আরতি, তুমি কি নিজে বিশ্বাস করেছ? আমি ফিফ্‌থ কলামিস্ট? আমি কুইস্‌লিঙ?

হঠাৎ কান্না পেল আমার। মায়ের বয়সী আম্মাজীকে কী জবাব দেব? রক্ষা পেয়ে গেলাম অন্য একটা ঘটনায়। হঠাৎ ওপারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। উত্তেজনায় আমরা দুজনেই সেদিকে ফিরি। ব্যাপার কী? লেফটানেন্ট থিবার্স আমাকে ডেকে বললেন, আরতি, কর্নেল চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করে এস আগুন কিসের।

ভিজা পোশাকেই আমি ছুটে গেলাম যেখানে ওঁরা রয়েছেন। কিন্তু অতদূর যেতে হল না। নদীর পাড় ভেঙে উপরে উঠতেই দেখা হয়ে গেল নাজির আহ্‌মেদের সঙ্গে। বললাম—কী ব্যাপার? আগুন লাগল কেমন করে?

নাজির তাকিয়েছিল নদীর ওপারের দিকে। মুখ না ঘুরিয়েই বললে, আগুন লাগেনি, লাগানো হয়েছে।

—কেন?

—ভোরের আলো ফুটে উঠছে। বাকি গাড়িগুলো পার করা যাবে না। শত্রুর হাতে পড়বে। তাই পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

—আমাদের পনেরখানা গাড়ির ভেতর ক'খানা এপারে এসেছে?

—ছ'খানা।

—নেতাজীর গাড়ি?

—সেটাও এসেছে।

—নেতাজী কোথায়?

নাজির জবাব দিল না। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল ওপারের দিকে। দাউদাউ করে জ্বলছে ওপারে সারবাঁধা অনেকগুলো গাড়ি। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। সেই চালচিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী—পায়ে কালো টপ্‌বুট, মাথায় টুপি, হাতে সিগারেট। চশমাটা এত দূর থেকেও চকচক করছে।

সকলে পার হয়ে এলে দিনের শেষ খেয়ায় নেতাজী এপারে চলে এলেন। শেষ খেয়া নয়, বলতে গেলে দিনের প্রথম খেয়ায়—কারণ ইতিমধ্যেই ভোর হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

আলো ফুটছে। আর দেরি করা চলে না—আমাদের ডব্‌ল্‌ মার্চ করতে বলা হল। ছুটতে ছুটতেই আমরা কয়েক মাইল পথ চলে এলাম নদীর তীর থেকে। ওয়া শহর এখনো কিছুটা দূরে। সেখানে পৌঁছবার আগেই হয়তো শত্রুবিমান এসে পড়বে। অগত্যা আমরা একটি ছোট গ্রামে ঢুকে পড়লাম। এটাও পরিত্যক্ত গ্রাম। নাম অপিয়া। গ্রামে একটি জীর্ণপ্রায় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। সেখানেই আশ্রয় নিলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় উঠে বসেছি কি বসিনি, একঝাঁক বিমানের শব্দ শোনা গেল। ছোট্ট মণ্ডপে আমাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। নেতাজীও এসে পড়লেন। কর্নেল চ্যাটার্জি বলেন, ঘরের ভেতরে যান স্যার!

নেতাজী বলেন—না! ওটা বেগমমহল! মেয়েরা একটু আরাম করে বসুক ওখানে। এস, আমরা বরং ঐ গাছতলায় যাই।

আমগাছ তলায় একটা খাটিয়া পাতা ছিল। বিনা কম্বলেই তিনি তার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন, আর আশ্চর্য, তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। বিমান আক্রমণ তখনো চলেছে। মুহুর্মুহু মেশিনগানের গুলি ছুটছে।

আধঘন্টাখানেক পরে গুলিবর্ষণ বন্ধ হল। বিনা বাধায় যথেচ্ছাচার করে ব্রিটিশ বৈমানিকের দল মিলিয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর—কিন্তু উপায় নেই। আজ আমার রান্না করার ডিউটি। পালা করে মেয়েদের যেতে হচ্ছে রান্নার ওখানে। মণ্ডপের অদূরে একটা ফাঁকা গোয়ালঘরে রান্নার আয়োজন হচ্ছে। আমরা জনাদশেক মেয়ে গেলাম সেখানে। প্রকাণ্ড হাঁড়ি ও ডেক্‌চিগুলো বাঁশ দিয়ে ধরে নামাতে হয়। হাঁড়ি বা ডেকচির গায়ে এজন্য লোহার কড়া লাগানো আছে। জওয়ান ভাইয়েরা অবশ্য হাজির থাকেই। এসব ভারী কাজে ওরাই এগিয়ে আসে, বলে, হামকো ছোড় দিজিয়ে দিদি! আমাদের কাজ চাল-ডাল ধুয়ে দেওয়া। ভাগ্যে যেদিন তরকারি জোটে—কোয়ার্টারমাস্টার যেদিন কিছু জোগাড় করতে পারেন, সেদিন তার খোসা ছাড়ানো, তরকারিতে নুন মশলা দেওয়া আর পরিবেশন। পরিবেশনের দায়িত্বটা সম্পূর্ণ মেয়েদের। সেখানে জওয়ান ভাইদের আমরা পাত্তা দিই না। ওরা রাগ করে, বলে, এটা আমাদের চালাকি—আমাদের উদ্দেশ্য পাঁচজনকে জানানো যে, রান্নাটা আমরা একাই করেছি।

বেলা দুটো নাগাদ রান্না শেষ হল। আহারাদি মিটতে আরো একঘন্টা। যারা রান্না করছিল এবার তারা ঘন্টাদুয়েক ঘুমিয়ে নেবে। কারণ রাত শুরু হলেই শুরু হবে পশ্চাদপসরণ। আজ ভাত-ডাল ছাড়া একটা নিরামিষ তরকারিও জুটেছে বরাতে। পরমানন্দে খেয়েছে সকলে। সব শেষ করে মণ্ডপে ফিরে এলাম প্রায় সাড়ে তিনটেয়।

প্রথমেই দেখা হয়ে গেল সেকেন্ড নায়েক লছ্‌মি সেগলের সঙ্গে, বললে, আরতিদি, তোমার চিঠি আছে।

চিঠি! এখানে পোস্ট-অফিসই-বা কোথায়, ডাক পিওনই-বা কই? কৌতূহলী হয়ে বলি, কই দেখি!

পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার করে দেখায়। হাতচিঠি। খুলে দেখি দুর্বোধ্য উর্দু হরফ।

—কে দিয়েছে এ চিঠি?

—তুমিই আন্দাজ কর দেখি।

বুঝতে পারি। বলি, নাজির এসেছিল বুঝি?

—এসেছিল মানে? বার বার তিনবার। শেষবার এই পত্রাঘাত করে গিয়েছে।

—কিন্তু এ যে উর্দু হরফ। আমি পড়ব কেমন করে?

—আম্মাজীর কাছে নিয়ে যাও, কিংবা জামান কিয়ানিজীর কাছে।

তা তো আর সত্যিই নিয়ে যাওয়া যায় না। পাগলটা কী লিখেছে কে জানে! শেষমেশ লজ্জায় পড়তে হবে। হঠাৎ দেখি সবাই মুখ টিপে টিপে হাসছে। লছমি, নমিতাদি, ভাবিজী, যমুনাবাঈ। ব্যাপার কী? ওরা হাসছে কেন?

শেষ পর্যন্ত যমুনাই রহস্যটা ফাঁস করে দিল। ওরা ইতিমধ্যেই চিঠির মর্মোদ্ধার করেছে। রাবেয়া পড়ে দিয়েছে চিঠিটা। চিঠি নয়, একটি উর্দু বয়েৎ, কবিতা। রাগে আমার কান গরম হয়ে ওঠে। আমার চিঠি আমি পড়তে পারছি না, আর খোলা হাতচিঠি দুনিয়াভর সবাই পড়ে হাসছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দয়া হয় রাবেয়া খাতুনের, কাগজখানা টেনে নিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে আবৃত্তি করে :

"আয়ে থে তেরি দিদ্‌কো বে-দিদ্ হো চলে
চৌকাঠ্ তেরি চুম্‌কে শহীদ বন্ চলে।।" *

আমি বলি, বদ্ধ উন্মাদ!

ভাবিজী হেসে বলে, তা তো বটেই, কিন্তু তোমাকেও যে উন্মাদিনী করে তুলেছে। কর্নেল চ্যাটার্জির 'বিভক'-এ একবার যাও বরং—শহিদ-ভৃত্যকে ঠাণ্ডা করে এস।

আমি বলি—দায় পড়েছে! আমি এখন ঘুম লাগাব।

শুয়ে পড়ি। কিন্তু সে ওদের দেখিয়ে। চক্ষুলজ্জায়। দায়ই পড়ছে বটে। তিন-তিনবার লোকটা এসেছিল কেন? মেয়েরা যে যার কাজে সরে গিয়েছে দেখে উঠে পড়ি। গুটিগুটি কর্নেল চ্যাটার্জির আস্তানার দিকে চলতে থাকি। অতদূর অবশ্য যেতে হল না। নাজির বসেছিল একটা ঝোপের আড়ালে। নোট বইতে আপনমনে কী যেন লিখছে। আমাকে দেখে মুখ তুলে হাসে। বলি,—কী লিখছিলে? ডায়রী?

—না। কবিতা। শুনবে?

ধমক দিয়ে উঠি আমি, না, শুনব না। এই কি কবিতা শোনাবার সময়? আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলে কেন?

আমার শেষ প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করে আগের প্রশ্নটার সম্বন্ধেই ও মেতে ওঠে। বলে—কবিতার কি সময়-অসময় আছে? জীবনের সব পর্যায়ে একমাত্র কবিতারই তো আছে ছাড়পত্র।

আমি প্রতিবাদ করি—না, নেই। এটা তোমার গুলবাগিচা নয়, এটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে চোখের জলের ঠাঁই আছে, বুকের রক্তের ঠাঁই আছে, কিন্তু ঐ তোমার চাঁদ-ফুল-মদিরা মার্কা প্রেমের কবিতার কোনো ঠাঁই নেই।

কী মিষ্টি হাসল নাজির, বললে—একটু ভুল হল না কি? মানছি, এটা লড়াইয়ের ময়দান, মানছি, এখানে আঁসু আর কলিজা বিদীর্ণ করা খুনেরই অগ্রাধিকার। কিন্তু তোমাকেও সেই সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, তাই বলে আমাদের জওয়ানী আর আমাদের মহব্বতটা মিথ্যা হয়ে যায়নি! আঁসু আর খুন তেড়ে আসছে ট্যাঙ্ক আর আর্মার্ড বাহিনীর মতো—আপাতদৃষ্টিতে জওয়ানী আর মহব্বতের হার হয়েছে—তারা পশ্চাদপসরণ করছে—কিন্তু তারা সে পরাজয় চূড়ান্ত বলে সত্যিই মেনে নিয়েছে কি, আর্তি?

কী জবাব দেব? লম্বা মিল্‌টনিক সিমিলিতে এতগুলো উপমান আর উপমেয় দাখিল করেছে কবি নাজির যে, আমাকে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হচ্ছে।

ও কিন্তু একনিশ্বাসেই বলে চলে—আর ওটাও তোমার ভুল কথা! রোশনাই-গুল্‌বাগিচা আর শরাবই মহব্বতের একমাত্র উপাদান নয়। আঁসুই আমার মহব্বতের নৈবেদ্য, খুনই আমার জওয়ানীর অর্ঘ্য! আজ ওরা একাকার হয়ে গিয়েছে আর্তি—তাই ওদের সবকিছু নিয়েই তো আমার কহানী!

আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার ওপর আলতো করে নিজের বলিষ্ঠ হাতটা বুলোতে বুলোতে দরদভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করে :

দো লব্‌জোঁ মে পুশিদা এক মেরি কহানী হ্যয়
এক লব্‌জ্ মহব্বৎ হ্যয়, এক লব্‌জ জওয়ানি হ্যয়।

---

* "মনটি তোমার ছুঁয়ে যাব বলে বৃথাই এসেছিলাম,
হারালো আমারই চিত্ত!
চৌকাঠ তব চুম্বন করে ব্যর্থ মনস্কাম
শহিদ হয়েছে ভৃত্য।।"

আঁসুকো মেরে লে'-কর দামন প্যে জেরা জাঁচো
জম্ যায়ে তো খুন হ্যয়, বহ্ যায়ে তো পানি হ্যয়।। *

পাগল! বদ্ধ পাগল!

দিনান্তের অস্তসূর্য ক্লান্তদেহে বিদায় নিচ্ছেন পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে। বর্মামুলুকে ওয়াগ্রাম প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছি পরাজিত সৈনিকদলের আমরা দুটি তরুণ-তরুণী। মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি আমরা দুটি প্রাণী—আর মুক্তিমন্ত্র মানে মৃত্যুমন্ত্র! আমাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু তবুও তো অস্বীকার করতে পারছি না জীবনকে—তবু তো বলতে পারছি না, এ জীবনে প্রেম নেই—এ জীবনে যৌবন আমাদের আসেনি!

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, আমাকে খুঁজছিলে কেন?

ম্লান হেসে ও বলে, এই বয়েৎটা শোনাতে।

—এবার তাহলে যাই?

—যাবে? কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলে না?

—আমি তো কবি নই।

—কবি তো আমিও নই আর্তি। ও বয়েৎ তো আমার নয়, আমারই মতো হতভাগ্য এক কবির—আকবর এল্লাহাবাদীর। হয়তো তোমার মতো কোনো মেয়েকে যে হতভাগা ভালবেসেছিল।

আমি ম্লান হাসি।

নাজির কাজের কথায় ফিরে আসে। বলে, ভেবেছিলাম বর্মা অতিক্রম করে মণিপুরে গিয়ে তোমাকে আমার বধূ করে নেব। স্বাধীন ভারত-ভূখণ্ডে। কিন্তু তা যখন আপাতত হবার নয়—

আমি বাধা দিয়ে বলি—কিন্তু এখনই হতাশ হচ্ছ কেন নাজির? স্বাধীন ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই আমরা দুজন গিয়ে পৌঁছাব একদিন।

ও হাসতে থাকে। বলে, সন্দেহ আছে আমার!

আমার ভ্রূ দুটি কুঁচকে ওঠে, নেতাজীর কথায় অবিশ্বাস করছ তুমি?

—না তুমিই ভুল করেছ। নেতাজী এ প্রতিশ্রুতি দেননি যে, আমরা জীবিত অবস্থায় ভারতবর্ষে পৌঁছাব। বলেছেন, আমাদের মৃতদেহের ওপরেই গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতবর্ষের বনিয়াদ। হয়তো ঘটনাচক্রে আমরা দুজনেই ততদিন বেঁচে থাকব—কিন্তু হয়তো দেখা যাবে স্বাধীন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে পঙ্গু নাজির আহ্‌মেদ আর বিকলাঙ্গ আরতি নায়ার।

—হয়তো তাই।

—তবে এভাবে কেন ব্যর্থ হতে দেব আমাদের জীবন? কেন অস্বীকার করব আমাদের যৌবনকে?

—কী লাভ হবে তাতে নাজির? বিবাহিত জীবন তো আর যাপন করা যাবে না এ শিবিরে?

—নাই-বা গেল। তখন তো তোমাকে বুকে টেনে নেবার কোনো বাধা থাকবে না আমার। আজাদ হিন্দ্ সৈনিক হিসাবে তোমাদের ঝাঁসি-বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিক আমার ভগ্নী। তাই এই নির্জনেও আমি তোমাকে—

ঠিক সেই মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়ে উঠল এক ঝাঁক গগনচর শয়তানের আর্তনাদ। আবার ফিরে এসেছে শত্রুবিমান। নাজির মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায়। প্রেমিক রূপান্তরিত হয়ে যায় সৈনিকে। উর্দু কবি হারিয়ে যায় অল-রাউন্ড অ্যাথ্‌লেটে। যে টিপিটার ধারে বসেছিলাম আমরা তার পাশেই একটা অগভীর খাদ। আমাকে সংযত হয়ে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিল না সে। সবলে আমাকে জাপটে ধরে লাফ দিল সেই খাদে। গর্তটা হাতদুয়েক গভীর। দুজনের ঠাঁই হবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। নাজির আমাকে সবলে আলিঙ্গন করে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল সেই অপ্রশস্ত গর্তে। মাথার ওপর চক্রাকারে পাক খাচ্ছে

---

* শুধু দুটি কথা বলে যাব আজ হৃদি-নিঙড়ানো বাণী
আছে শুধু প্রেম আর আছে মোর ক্ষণ যৌবনখানি।
তব অঞ্চলনিকষে কষিলে আমার অশ্রুবারি
রক্তরেখায় রাঙা হয়ে যাবে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি।।

তখন বিমানটা। বৈমানিক তার দূরবীনের কাচে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে ফৌজী পোশাক পরা দুটি প্রাণীকে। বারে বারে ফিরে এসে গর্তটাকে লক্ষ্য করে মেশিনগান চালাতে থাকে। আমাদের কান ঘেঁষে বারে বারে মৃত্যুর হল্‌কা ছুটে গেল—কিন্তু গর্তের ভেতর থাকায় একটাও এসে লাগল না। আমাদের রক্ষা করেছে খাদের পাশের বড় পিংকাডো গাছটা। তার উপস্থিতিতে প্লেনটা খুব বেশি নিচে নেমে আসতে পারছে না।

আরো তিন-চারখানা প্লেন আমাদের ক্যাম্পের আশেপাশে উড়ছিল। B-29। ওরা ইনসেন্ডিয়ারি বোমা ফেলছে। বিস্ফোরণের শব্দে গুমরে গুমরে কেঁপে উঠছে মাটি। ওরা বোধহয় আন্দাজ করেছে আমাদের পশ্চাদপসরণকারী গোটা বাহিনীটাই এখানে আস্তানা গেড়েছে। আমাদের না আছে অ্যাক্-অ্যাক্ গান, না বিমান। তাই অপ্রতিহতভাবে ওরা ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় আধঘন্টা পরে সব শান্ত হয়ে গেল। শ্মশানের স্তব্ধতা যেন। আমরা দুজনে উঠে এলাম গর্ত থেকে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে আমি হাসতে হাসতে বলি—এখনই তুমি বলছিলে ঝাঁসির রানী বাহিনীর সব সৈনিকই তোমার বোন—কোনো মেয়েকে বুকে টেনে নিতে—

বাধা দিয়ে নাজির বলে, না! তুমি না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলেও আমি যা করেছি তাই করতাম। আমার আলিঙ্গন প্রেমিকের নয়, সৈনিকের।

তা আমি জানতাম। তবু চেয়েছিলাম নাজির মিথ্যা কথাই বলুক। তা সে বলল না। হেসে বলি, সৈনিকের বলছ কেন নাজির? বল কমরেডের! ঐ ক্ষণিক অনুভূতিটায় থাক না একটু রোমাঞ্চের স্মৃতি লেগে।

নাজিরও ম্লান হাসল, বললে—বেশ তাই! ওটা সোলজারের আলিঙ্গন নয়, কমরেডের।

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা তখনই ফিরে যাই যে-যার শিবিরে। চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে এসে দেখি সর্বনাশ হয়েছে। বোমার বিস্ফোরণে অনেকেই কম-বেশি আহত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি আঘাত লেগেছে জনাপাঁচেকের। মেশিনগানের একটি গুলি বাম স্কন্ধে লেগে আম্মাজী আহত হয়েছেন। মেজর মেনন তখনই গুলিটা বার করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে আম্মাজী একেবারে শয্যাশায়ী। সকলের শুশ্রূষা করতে আরো কিছুটা সময় গেল। পনেরোখানি ট্রাক নিয়ে আমরা রওনা হয়েছিলাম—বর্তমানে এসে ঠেকেছে ছয়খানিতে। বাদবাকি নদীর ওপারে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ ছয়খানি ট্রাকেই তুলে দেওয়া হল আহতদের। নেতাজীর গাড়িও এপারে এসেছিল; কিন্তু তিনি গাড়িতে উঠতে রাজি হলেন না। রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা রওনা হলাম ওয়ার দিকে।

সেই রাত্রেই আমাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। উপায় ছিল না। ছখানি ট্রাক আহতদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতি। তারা ওয়া পার হয়ে রাত থাকতেই সিত্তাং নদীর কিনারে গিয়ে পৌছাবে। অন্যান্যরা পায়ে হেঁটে অতদূর যেতে পারবে না। তারা অন্য কোথাও দিনের বেলা অপেক্ষা করবে। স্থির হল হাঁটাপথের বাহিনী আশ্রয় নেবে নন্‌খাশ নামে একটি গ্রামে। আহতদের নিয়ে প্রথম দলে যাচ্ছেন জেনারেল ভোঁসলে, চ্যাটার্জি এবং আইয়ারজী। পদাতিক দলের সঙ্গে চলেছেন জেনারেল মালিক, মেজর স্বামী, মেজর মেনন, জামান কিয়ানী আর স্বয়ং নেতাজী। নাজির হচ্ছে চ্যাটার্জির এ.ডি.কং। ফলে তাকে যেতে হল প্রথম দলের সঙ্গে, ট্রাকে। যাত্রামুহূর্তে এক লহমার জন্য সে দেখা করতে এসেছিল। কথা বলার সময় ছিল না। ওর হাত দুটি ধরে সংক্ষেপে বললাম, আমি রাজি! মৌলমিনে পৌছেই!

মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর পাঁচজন উপস্থিত না থাকলে বোধহয় সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করত। অন্তত ওর মুখ দেখে তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। বেচারি শুধু আমার হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে একটু চাপ দিয়েই এক ছুটে বেরিয়ে গেল। হরিণের মত ছুটতে পারে নাজির!

* * *

আমার ধারণা ছিল আমাকে যেতে হবে পদাতিকের দলে। আমি আহত নই, অশক্তও নই; কিন্তু শেষ মুহূর্তে লেফটানেন্ট থিবার্স আমাকে ডেকে বললেন তুমি গাড়িতেই যাবে। আম্মাজীর শুশ্রূষা করার দায়িত্ব তোমার।

কিটব্যাগ আর রাইফেলটা তুলে নিয়ে আদেশমাত্র আমি গাড়ির দিকে চলতে শুরু করি। উনি পিছন থেকে আমাকে ডেকে বলেন, আর শোন!

ঘুরে দাঁড়াই।

—আম্মাজীর সম্বন্ধে যে কথা বলেছি মনে রেখ। সাবধানে থাকবে।

আর সহ্য হল না আমার। রুখে উঠি—একটা প্রশ্ন করতে পারি?

রুক্ষস্বরে থিবার্স বলেন, না! কারণ 'হোয়াই'-এর স্থান নেই সামরিক নিয়মানুবর্তিতায়!

আমি ফৌজী স্যালুট করি। সেটাই ও কথার একমাত্র জবাব।

লরির ভেতরে আহতদের কজনকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তিনজন নার্স বসেছি কোনোক্রমে পা-মুড়ে। লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে গাড়িটা। আম্মাজীর প্রবল জ্বর এসেছে এতক্ষণে। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। গাড়ি চলতে শুরু করে। একটু পরেই মনে হল আম্মাজী কী যেন বলছেন। ঝুঁকে পড়ে ওঁকে ডাকলাম। সাড়া নেই। জ্বরের ঘোরে বিকার। কান খাড়া করেও বুঝতে পারিনা কী বলছেন উনি। মনে হল আমার অজানা ভাষায় তিনি কিছু বলছেন। সম্ভবত জার্মান ভাষায়। লোকে বিকারের ঘোরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলে নাকি? দু-একটা শব্দ বুঝতে পারছি শুধু—নেতাজী, ইন্ডিয়া, কুইসলিঙ ইত্যাদি। বাদবাকি অনর্গল জার্মান অথবা ফ্রেঞ্চ।

আবার বৃষ্টি নামল। মাথা-খোলা ট্রাকে আমরা একেবারে ভিজে গেলাম। একশ তিন ডিগ্রি জ্বর নিয়ে আম্মাজীও। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে। হঠাৎ শব্দ করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার সর্দারজী ট্রাকটাকে রাস্তার একপাশে এনে খাড়া করল। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমেছে। টুপটাপ করে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে দু-চার ফোঁটা। বনেটটা খুলে টর্চের আলোয় সর্দারজী ঠুকঠাক মেরামতি শুরু করল। পাশ দিয়ে ক্রমাগত জাপানিদের ট্রাক আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে. ফিরেও দেখছে না আমাদের কী হয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক পরিশ্রম করে সর্দারজী ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে যা জানাল তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে, এমন একটি পার্টস ভেঙেছে যাতে গাড়ি আর চলবে না। সর্বনাশ! চার-চারটি রোগী নিয়ে আমরা কটি মেয়ে একেবারে অথৈ জলে পড়লাম। অবশ্য ভগবান সহায় ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে। একটু পরেই আমাদের দলের আর একটি ট্রাক এসে পড়ল। তাতে ছিলেন মেজর বি. সহায়—ভগবান সহায়। সমস্ত শুনে উনি বললেন, উপায় নেই—দুটি গাড়ির সব আহতকে আমার ট্রাকে তোল। একজন মাত্র নার্স থাকুক সঙ্গে। বাদবাকি আমরা সবাই হেঁটে যাব।

যেমন আদেশ হল তেমনি আদেশ তালিম করলাম আমরা। একটি গাড়িতে গাদাগাদি করে চাপিয়ে দিলাম আহতদের। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গাড়ির ঝাঁকানিতে এ ওর আহত অঙ্গের ওপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই-বা কী? মেজর সহায়ের নির্দেশে আমরা চললাম পায়ে হেঁটে অন্ধকারের মধ্যে।

দশ

প্রায় শেষরাত্রে এসে পৌছালাম সিত্তাং নদীর তীরে। কোনোক্রমে নদীর ওপারে যেতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত, কারণ এ নদীর ওপরের সেতুটা ভেঙে গেছে। শত্রুসৈন্য সহজে ওপারে যেতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, নদীর ধারে আই. এন. এ.-র একটি অ্যাক্-অ্যাক্ কামানের ঘাঁটি আছে। এখানে শত্রুবিমান বিনা বাধায় হত্যা-উৎসবে যথেচ্ছাচারীর ভূমিকা নিতে পারবেনা। এখানে পৌছে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

তখন কে ভেবেছিল এই সিত্তাং নদীতীরে পর পর তিনটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে আমাদের? বিমানধ্বংসী কামানবাহিনীর একটি জওয়ান পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে গেল মাইলতিনেক দূরের একটি গ্রামে। জেনারেল ভোঁসলের নেতৃত্বে ঝাঁসির রানী বাহিনীর বিচ্ছিন্ন কটি মেয়ে ওখানেই থাকবে একটি দিন। আইয়ারজী ফিরে গেলেন নদীতীরে। নেতাজীর শিবিরে। শুনলাম এইমাত্র তিনিও এসে পৌছেছেন। গাড়ি-বিভ্রাটে আমাদের যে ঘন্টা-দুই আটকে থাকতে হয়েছিল তাতে ওঁরা প্রায় একই সঙ্গে পায়ে হেঁটে এসে পৌছেছেন। আমরা শিবিরে পৌছে দেখি সকলেই খুব গম্ভীর। ফিসফিস করে কথা

বলছে সকলে। যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আত্মীয়-বিয়োগের টেলিগ্রাফ এলে বাড়ির যেমন অবস্থা হয়। ঘটনাচক্রে ভাসিদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাসিদার ভাল নাম ভাস্করণ—নেতাজীর একান্ত-শ্রুতিধর তিনি, কনফিডেন্‌শিয়াল স্টেনো। কেরালার মানুষ। নেতাজীর সিঙ্গাপুরে প্রথম পদার্পণের পর থেকে বরাবর তাঁর সঙ্গে আছেন। আমরা তাঁকে ভাসিদা বলে ডাকতাম।

ভাসিদাকে প্রশ্ন করি—ব্যাপার কী? সবাই এত গম্ভীর কেন ভাসিদা?

প্রায় কানে কানে বলার ভঙ্গিতে ভাসিদা জানাল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সে কাহিনী শুধু করুণ নয়, মর্মবিদারক!

গতরাত্রে এক মর্মান্তিক ভুল বোঝাবুঝিতে একজন জাপানি অফিসার আমাদের এক সৈনিকের হাতে বেয়নেট-বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। জাপানি অফিসারটি নেতাজীর অত্যন্ত স্নেহভাজন, বরাবর ভারতবর্ষের এ স্বাধীনতা-যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই—নেহাৎই ভুল বোঝাবুঝি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শান্ত্রীটিও দীর্ঘদিন যুক্ত আছে সর্বাধিনায়কের নিরাপত্তা-বাহিনীতে—উত্তর-বিহার অঞ্চলের মানুষ, নাম বিশ্বম্ভরদাস পাণ্ডে। অন্ধকার রাত্রে একজনকে নেতাজীর শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে সে চিৎকার করে উঠেছিল—হুকুমদার?

জাপানি অফিসারটি বুঝতে পারেননি সে বলছে, Who comes there? হয়তো তিনি ভেবেছিলেন শান্ত্রীটি অন্য কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। তিনি বিনাবাক্যে এগিয়ে এসেছিলেন শিবিরের দিকে। বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ বেয়নেট উঁচিয়ে ছুটে যায়। জাপানি অফিসার ঘটনাস্থলেই মারা যান!

এ দুর্ঘটনায় জাপানি মন্ত্রী ইসোডা একেবারে মর্মাহত। নেতাজী যে কী পরিমাণ অপ্রস্তুত, বেদনাহত হয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত রাত্রি পদব্রজে এসে ঘর্মক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে, অনাহারে অনিদ্রায় যখন তিনি সবে একটু বসেছেন তখনই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। তাঁরই দ্বারের সম্মুখে বিদ্ধ হয়েছেন তাঁর বন্ধু! সকলে পাথর হয়ে গিয়েছিল। মেজর মেনন আহতকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালেন, অস্ফুটে বললেন— ডেড!

বিশ্বম্ভর তখনো দাঁড়িয়ে আছে রক্তাক্ত বেয়নেট হাতে। ভুলটা বুঝতে পেরে নির্বোধের মতো তাকিয়ে আছে নেতাজীর দিকে।

কে একজন প্রশ্ন করল, বিশ্বম্ভরকে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা।

নেতাজী জামান কিয়ানীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, উনিই এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক!

ফিরে যাচ্ছিলেন নেতাজী। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, ওকে নিরস্ত্র কর।

একজন গিয়ে বিশ্বম্ভরের রাইফেল ও রিভলভার কেড়ে নিল। বন্দী করল ওকে।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল বিশ্বম্ভর।

নেতাজী গিয়ে বসলেন তাঁর আসনে। যেন ধ্যানে বসেছেন। তারপর থেকে একটি কথাও বলেননি কারও সঙ্গে। এমনকি হাত-পা মেলে শুয়েও পড়েননি।

সকাল হয়ে গেল। খবর এল আমাদের একখানি লরীও এপারে আসেনি। একমাত্র নদী পার হয়ে এসেছে নেতাজীর গাড়িখানা। ওয়া নদীতীরে নেতাজী স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গাড়িগুলি একে একে পার করিয়েছিলেন। এবার তিনি স্থির হয়ে বসে থাকলেন একা। মর্মান্তিক অন্তর্দাহে তিনি যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছেন।

ঘন্টাদুয়েক ধ্যানমৌন হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। স্বগতোক্তির মত বললেন, যাক, এদের জন্য কিছু খাবারের বন্দোবস্ত কর এবার।

নেতাজীকে স্বাভাবিক হতে দেখে আমাদের সকলেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। জাপানি অফিসারটির মৃত্যু মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কারো মৃত্যুর জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবারই কি অবকাশ পাওয়া যায়?

*　　　*　　　*

বেলা প্রায় আটটা। আমরা চায়ের আয়োজন করতে ব্যস্ত। আহত কজন, যাঁরা ট্রাকে এসেছেন, তাঁদের কয়েকটি ছোট ছোট চালাঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা ফাঁকা মাঠের চারদিকে চালাঘরগুলি সাজানো। সব কয়টি ঘরেরই মুখ মাঠের দিকে। নেতাজী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মেজর মেনন আর কর্নেল চ্যাটার্জির এ. ডি. সি. লেফটানেন্ট নাজির আহ্মেদের সঙ্গে একে-একে বিভিন্ন চালাঘরে গিয়ে আহতদের পরিদর্শন করছেন। মেজর মেনন একে-একে রোগীদের পরীক্ষা করছেন, নার্স রয়েছে তাঁর সঙ্গে। ব্যান্ডেজ পালটে দিচ্ছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, পথ্যের নির্দেশ দিচ্ছেন। নাজির এসব কাজে তাঁকে সাহায্য করছে না—সে শুধু দেহরক্ষীর মতো নেতাজীর পাশে পাশে থাকছে। আমরা যেখানে বসে চা বানাচ্ছি সেখান থেকে ঐ কুটিরগুলো একশ' গজও হবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওঁদের। পরিদর্শন সেরে ওঁরা তিনজনে মাঝের উঠানটুকু পার হয়ে আসছেন। প্রায় যখন মাঝামাঝি এসেছেন তখন একেবারে অতর্কিতে আকাশ ভেদ করে ছুটে এল দুটো বেছুট ফাইটার শত্রুবিমান। আমরা পাকাবাড়ির আড়ালে আছি, কিন্তু ওঁরা তিনজনেই তখন মাঠের মাঝামাঝি। কর্নেল চ্যাটার্জি এখান থেকেই চিৎকার করে ওঠেন, টেক্ শেলটার! প্লেনস!

নার্সটি ছিল অনেক পেছনে—সে ছুটে ফিরে গেল ওদিকের চালাঘরে। ওঁদের তিনজনের সর্বপ্রথমে ছিলেন মেজর মেনন। প্রাণপণে তিনি দৌড়ালেন আমাদের পাকা ঘরটা লক্ষ করে। মাঝখানে নেতাজী। তিনিও দৌড়াচ্ছেন—কিন্তু আটচল্লিশ বছরের যে প্রৌঢ় মানুষটি সারারাত হেঁটে এসেছেন, টপ্-বুট পরে তাঁর পক্ষে আর কতো জোরে ছোটা সম্ভব? দলের সকলের পেছনে ছিল লেফটানেন্ট নাজির আহ্মেদ। কৃষ্ণসার হরিণের মতো লঘুগতি তরুণ সৈনিক! কলেজে যে হান্ড্রেড-ইয়ার্ডস্-এ পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, ফৌজের হকি টীমে যে ছিল দুর্বার সেন্টার ফরোয়ার্ড! নেতাজীর এ পথটুকু অতিক্রম করতে যতটুকু সময় লাগবে তার ভেতর সে অনায়াসে গোটা মাঠটা বার দুই পারাপার হতে পারে! অথচ চোখের সামনে দেখলাম বড় বড় পা ফেলে সে ঠিক নেতাজীর পাশে পাশে হেঁটে আসছে। নেতাজী দৌড়াচ্ছেন কিন্তু নাজির হাঁটছে! দেহরক্ষী তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছে না। অবিস্মরণীয় কটি মুহূর্ত!

প্রথম প্লেনটা নিচু হয়ে নেমে এল। নেতাজী রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছেন। নাজির ওপর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। চোখটা আড়াল করেছে হাতের তালুতে। প্লেনটা মেশিনগানিং করতে করতে পার হয়ে গেল উঠানটা। নেতাজী আর নাজিরের দশ-পনেরো ইঞ্চি দূর দিয়ে মাটিতে কতকগুলো ছোবল পড়ল। ধুলো উড়ে গেল সরলরেখায়। মেজের মেনন ততক্ষণে এসে পৌঁছেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। নেতাজী আমাদের বারান্দা থেকে তখন আন্দাজ ফুট ত্রিশেক দূরে। আর বড়জোর দশটি পদক্ষেপ!

এই সময় ডাইভ দিয়ে দ্বিতীয় প্লেনটা নেমে এল। বাজপাখির মতো উড়ে এল একই সরলরেখায়। মেশিনগানের ক্রটাক্রট্ শব্দ উঠছে সেই যন্ত্রদানব থেকে, কাছে, আরো কাছে এসে একঝাঁক্ গুলি ছিটিয়ে দিয়ে উঠে গেল আবার উর্ধ্ব আকাশে। ঠিক তার পূর্ব-মুহূর্তেই লাফ দিয়ে নেতাজী উঠে পড়লেন আমাদের বারান্দায়। নাজির পারল না। লুটিয়ে পড়ল তার রক্তাক্ত দেহটা সিঁড়ির গোড়ায়।

ছুটে গেলেন কর্নেল চ্যাটার্জি আর নেতাজী। ধরাধরি করে দাওয়ায় তুললেন ওর রক্তাক্ত দেহটা।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে নাজিরের বাম অঙ্গ।

বুলেট লেগেছে তার বাম জানুতে।

আমার চোখের সামনেই ঘটল ঘটনাটা—আমি পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম শুধু। জ্ঞান নেই নাজিরের। তৎক্ষণাৎ মেজর মেনন আর কর্নেল চ্যাটার্জি ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে থাকেন ক্ষতটা। বুলেটটা বার করে দিতে হবে।

দিনটা কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল জানি না। নাজিরের জ্ঞান ফিরল বিকেলবেলায়। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। বুলেটটা বার করা যায়নি। হাসপাতাল ছাড়া যাবেও না। নিকটতম হাসপাতাল মৌলমিন।

সেখানেই যাচ্ছি আমরা। জানি না ওকে জীবিতাবস্থায় হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা। ওর যখন জ্ঞান ফিরে এল বললাম, কষ্ট হচ্ছে?

দাঁতে দাঁত চেপে বললে—হ্যাঁ। পাটা কি কেটে বাদ দিয়েছে নাকি!

—না না! পা তোমার ঠিক আছে। ঠিক হয়ে যাবে।

অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও নাজির হাসল, বললে—কালই তোমাকে বলছিলাম না, নাজির বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে?

আমি ওর মুখ চেপে ধরে বলি—কর্নেল চ্যাটার্জি কথা বলতে বারণ করেছেন। কিছু হবে না তোমার পায়ে।

ওকে বলছি বটে কিন্তু নিজে বেশ জানি তা হবার নয়। মেজর মেনন বলেছেন, হাসপাতালে পৌঁছে বোধহয় বাঁ পাখানা জানু থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ নাজির আহ্‌মেদ বেঁচে থাকলেও হকি-টীমের সেন্টার-ফরোয়ার্ড আর বাঁচবে না।

* * *

ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। অর্থাৎ এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। সিত্তাং নদী পার হয়ে আমাদের একখানা লরিও আসেনি। হারাধনের সবকটি সন্তানই একে একে খোয়া গিয়েছে পথে। এসেছে একমাত্র সেই গাড়িখানা যেটাকে জাপান সরকার দিয়েছে নেতাজীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। নেতাজী বললেন, আহতদের আমার গাড়িতে তুলে দাও—আমরা সবাই হেঁটে যাব।

একনিশ্বাসে বললেন উনি। অর্থটা অনুধাবন করতে বেশ সময় লাগল আমাদের। এ কিছু বাড়ি থেকে সামনের দোকানে যাওয়ার কথা হচ্ছে না—দূরত্বটা সিত্তাং থেকে মৌলমিন। পথটা দুর্গম, পাহাড়-পর্বতে ঘেরা—সাপ-জোঁক আর গেরিলা সমাকীর্ণ! আজাদ হিন্দ্ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক—মিত্রপক্ষের একনম্বর শত্রু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাগ্যে আজ একটা চারচাকার ভাঙা গাড়িও জোটেনি। যাঁর গলার মালা সাত লাখ টাকা দিয়ে কিনেছে সিঙ্গাপুরের মানুষ—যাঁর উদাত্ত আহ্বানে ফকির হয়ে গিয়েছে কোটিপতি হবিব, করিমভাই আর আদমজী। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক সিত্তাং থেকে মৌলমিন যাবেন পায়ে হেঁটে!

তা হোক, কিন্তু এঁর গাড়িতেই-বা এতগুলি আহতদের স্থান সঙ্কুলান হবে কেমন করে? বড়জোর চারজনকে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া চলে, অথচ অন্তত ছয়জনের উঠে বসবার ক্ষমতা নেই!

অনিবার্যভাবে প্রশ্নটা উত্থাপিত হল। আমি সেখানে উপস্থিত। প্রশ্নটা তুললেন প্রথমে কর্নেল চ্যাটার্জি। নেতাজী কোনো জবাব দিলেন না। বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বাহুবদ্ধবক্ষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অচঞ্চল দীপশিখার মতো। দৃষ্টি তাঁর দূর দিগন্তে নিবদ্ধ। চশমার ভেতর দিয়েও মনে হল তাঁর চোখ দু'টি চকচক করছে।

জবাব দিলেন মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানী। এ অভিযানের কর্ণধার। এ দায়িত্ব তাঁরই। নির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। পোড়-খাওয়া সামরিক অফিসার তিনি। জীবন ও মৃত্যু তাঁর কাছে একদর। বাস্তব যতই রূঢ় হোক সেনাপতিকে বিচলিত হতে নেই। মেজর মেননের দিকে ফিরে দৃঢ় অথচ অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—ডক্‌টর। নির্বাচনের ভারটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম। যে দু'জনের বাঁচবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম—

না, পারলেন না। পোড়-খাওয়া সামরিক অফিসারও পারলেন না শেষ করতে তাঁর এ নিষ্ঠুর আদেশ। অসহায়ভাবে শ্রাগ করলেন একবার। শেষ না করলেও বক্তব্য তাঁর প্রাঞ্জল!

মেজর মেননও সামরিক অফিসার। যুদ্ধক্ষেত্রে কাটা-ছেঁড়ার মধ্যেই দিন কাটছে তাঁর। তবু লাফ দিয়ে উঠে পড়েন তিনি, বলেন—ওয়েল, হাউ ক্যান্ আই—

তিনিও শেষ করতে পারেন না তাঁর প্রতিবাদ।

জেনারেল কিয়ানী হাতঘড়ি দেখে বললেন—আধঘন্টা পরেই রওনা হব আমরা। ডক্‌টর! আমি দুঃখিত; কিন্তু নির্বাচনের জন্য পনেরো মিনিটের বেশি সময় আমি দিতে পারছি না! চারজনকে বেছে দিন!

নেতাজী তখনো নির্বাক নিস্পন্দ।

কিয়ানী তাঁকে ডাকলেন, আসুন আপনি। ডক্টরকে কাজ করতে দিন।

যন্ত্রচালিতের মতো ওঁরা দুজন বার হয়ে গেলেন ঘর থেকে। মেজর মেনন জ্বলন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন ঐ প্রস্তর-কঠিন নিষ্ঠুর সেনাপতির দিকে। তারপর হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে মাটির ওপরেই থপ্ করে বসে পড়েন!

*　　　*　　　*

আমার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় করছে। আমার নীরব উপস্থিতি বোধহয় ওঁরা খেয়ালই করেননি। আমার কি এখন কিছু বলা কর্তব্য? নাজিরের হয়ে, আম্মাজীর হয়ে কি সুপারিশ করব মেজর মেননের কাছে?

—মেনন! মেরা বেটা!

মেজর মেনন মুখ তুলে চাইলেন। এগিয়ে গেলেন রোগিণীর কাছে। তাঁর হাতটা তুলে নিয়ে বলেন, আম্মাজী?

—বৈঠো বেটা।

মেজর মেনন মাটির ওপরেই বসে পড়েন। আম্মাজীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—বলুন মা, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ঘুমের ওষুধ দেব?

—না, কষ্ট নয়। একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

—বলুন?

—তুমি আমার স্বামীর কথা শুনেছ?

—হ্যাঁ। শুনেছি পালেল বিমানঘাঁটির যুদ্ধে মেজর গারেওয়াল নিহত হয়েছিলেন। তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ! সে ছাড়া এ দুনিয়ায় আমার আর কেউ ছিল না, আর কেউ নেই। তুমি... তুমি বরং আমাকে বাদ দাও!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠেন মেজর মেনন। চমকে সরে যান। আম্মাজী কি শুনতে পেয়েছেন জেনারেল জামান কিয়ানীর ঐ নিষ্ঠুর আদেশটা?

—প্লীজ মেজর! আমি তোমার মায়ের মতো। আমি মিনতি করছি!

—না, না, না! চিৎকার করে ওঠেন মেনন! এই ছয়জন রোগীর মধ্যে আপনার অবস্থাই সবচেয়ে ভালো। নিশ্চয় বেঁচে উঠবেন আপনি।

—কিন্তু কী লাভ হবে আমি বেঁচে ওঠায়? কী নিয়ে বাঁচব আমি? আমার বয়স হয়েছে। ওদের সবার চেয়ে আমি বয়সে বড়। ওদের সকলের চেয়ে বেশিদিন আছি এ দুনিয়ায়—

—না! চুপ করুন আপনি!

দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক নারকীয় বীভৎস দৃশ্যের তিনি স্থির অচঞ্চল সাক্ষী—কিন্তু এ মর্মান্তিক দৃশ্যকে তিনি বোধকরি সহ্য করতে পারলেন না। পালিয়ে আত্মগোপন করলেন।

আম্মাজী দেখতে পেলেন আমাকে। ডাকলেন। আমি এগিয়ে যাই অগত্যা।

—আমাকে এক টুকরো কাগজ আর কলম দেবে আরতি?

—কী করবেন?

—একটা চিরকুট পাঠাব নেতাজীকে।

ডায়েরী থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিলাম। কলমটাও। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে একটিমাত্র ছত্র লিখলেন তিনি। তুলে দিলেন আমার হাতে। খুলে পড়বার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম না একবর্ণও। লেখা ছিল : Netaji ! Permettez-moi faire reparation pour le pecher de mon mari.

বললাম, কী লিখেছেন?

আমার মাথাটা টেনে নিয়ে হঠাৎ শিরশ্চুম্বন করলেন। ম্লান হেসে বললেন, তিনি বুঝবেন। যাও, দিয়ে এস।

নেতাজী ছিলেন অদূরেই। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাত্রার আয়োজন করছেন। কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাই সেদিকে। নেতাজীর হাতে কাগজখানা দিয়েছি কি দিইনি প্রচণ্ড একটা শব্দ হল ঘরের ভেতর। সবাই ছুটে ফিরে এলাম। পড়ে আছে আম্মাজীর প্রাণহীন দেহটা। নিজের রাইফেল নিজের চোয়ালে লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন আম্মাজী।

না। ফৌজী আইন লঙ্ঘন করেননি মেজর গারেওয়ালের সহধর্মিণী সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল। ঝাঁসির রানী বাহিনীর প্রত্যেকের জন্য একটি করে বুলেট বরাদ্দ করা ছিল। স্বয়ং নেতাজীর ছাড়পত্র!

লোকে বলে নেতাজী পাষাণ। দুঃখে তিনি অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ! ভুল বলে তারা। আজাদি সৈন্য ভারতখণ্ডে প্রবেশ করেছে শুনে তিনি শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন। আর সেদিন আম্মাজীর মৃতদেহের পাশে ছোট্ট দুর্বোধ্য হরফে লেখা চিঠিখানা হাতে তাঁকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাঁর দুচোখে জল ভরে উঠেছিল!

মেজর মেননকে আর ঐ নিষ্ঠুর আদেশটা পালন করতে হয়নি। পাঁচজনকেই কোনোক্রমে উঠিয়ে দেওয়া হল গাড়িতে।

এগারো

যাত্রা-মুহূর্তে আর এক কাণ্ড ঘটল। সেটাও উল্লেখ করি :

কথা হল এতগুলি আহত রোগীকে নিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, একজন ডাক্তার অন্তত সঙ্গে যাওয়া উচিত। নেতাজী বললেন, মেজর মেনন যাবেন ওঁদের সঙ্গে।

আপত্তি করলেন একসঙ্গে সবাই। জেনারেল ভোঁসলে এবং চ্যাটার্জি। মেজর মেনন হচ্ছেন নেতাজীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ নেতাজীর পাশে পাশে থাকা। বিশেষ, এরপর নেতাজীকে পদব্রজে এতটা পথ যেতে হবে। তাই সমস্বরে প্রবল আপত্তি জানালেন ভোঁসলে, চ্যাটার্জি, আইয়ার, স্বামী। সকলেই একমত। নেতাজীও নাছোড়বান্দা। রীতিমত জিদ করছেন তিনি। পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানী। চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন সকলের কথা, নিজে থেকে একটি কথাও বলেননি। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন : মেজর-জেনারেল ভোঁসলে অ্যান্ড হিজ এক্সেলেন্সি আইয়ার!

সবাই চমকে ওঠেন সে কণ্ঠস্বরে।

ধীর সংযত কণ্ঠে কিয়ানী ওঁদের সকলকে সম্বোধন করে বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি—আপনারা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন—এই অভিযানের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানী। এ অধিকার ফৌজের সর্বাধিনায়ক আমাকে দিয়েছেন। সেই অধিকার-বলে আমি আদেশ করছি—মেজর মেনন নেতাজীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাবেন। ফৌজের সর্বাধিনায়কের জীবন আমি বিপন্ন হতে দিতে পারি না! রোগীদের সঙ্গে কোন চিকিৎসক যাবেন তা আমি দেখব। সে দায় আমার। এর ওপর কেউ যদি কোনো কথা বলেন তাহলে তার পূর্বে সর্বাধিনায়কের কাজ থেকে আমার বরখাস্তের আদেশ এনে যেন সে কথা বলেন।

সকলেই বুঝতে পারেন এ ধমক উনি ভোঁসলে অথবা আইয়ারকে দেননি।

যাঁরা বলেন, নেতাজী ছিলেন ডিক্‌টেটার তাঁরা জেনে রাখুন, এ বজ্রনির্ঘোষের জবাবে সবাই যখন নির্বাক তখন নেতাজীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলে ওঠেন, দলপতির নির্দেশের পরে আর কোনো কথা চলে না।

*　　　　*　　　　*

মোটর গাড়ি রওনা হয়ে যাবার পরেই জেনারেল কিয়ানী আমাদের ফল-ইন করালেন। নেতাজীও এসে দাঁড়ালেন সেই সারিতে। আম্মাজীর মৃতদেহের সম্পূর্ণ সৎকার করার সময় ছিল না। তবু সামরিক মর্যাদায় সংক্ষেপে তাঁর শেষকৃত্যের আয়োজন হয়েছিল। পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার দেহে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। আমরা শেষ সামরিক অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

নতমস্তকে আমাদের দীর্ঘ পথযাত্রা শুরু হল মেজর-জেনারেল জামান কিয়ানীর নির্দেশে। দলের প্রথম সারিতে চলেছেন নেতাজী, জাপানি জেনারেল ইসোডা আর হাচাইয়া। তারপর প্রায় চল্লিশ জন নারী এবং সব শেষে শতখানেক জওয়ান। প্রত্যেকের পিঠেই প্রায় আধমন আন্দাজ বোঝা। পোশাক, চটি, মগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিস। প্রতিটি মেয়েই তা বহন করেছে, করেছেন স্বয়ং নেতাজী। আধঘন্টা-অন্তর এয়ার-রেড অ্যালার্ম শোনা যাচ্ছে—আমরা পরিখার ভেতর অথবা নিকটস্থ ঝোপ-ঝাড়-গর্তে আশ্রয় নিচ্ছি। আবার অল ক্লিয়ার বাজছে। আবার চলেছি আমরা।

এ পথযাত্রার কথা আমি জীবনে ভুলব না। রাতের পর রাত হাঁটতে হয়েছে আমাদের। ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ ভেঙে পড়তে চেয়েছে। জুতোর নিচে গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। কমবেশি সকলেই খুঁড়িয়ে চলেছেন।

পথ, পথ আর পথ। ফুরোয় না যেন। সারা রাত্রে আমরা হাঁটতাম প্রায় দশঘন্টা। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়। প্রতি একঘন্টা হাঁটার পর পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম। ওঁরা বলতেন সে পাঁচ মিনিটও যেন শুয়ে না পড়ি, তাহলে আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। দুটো পা যেন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় দিন থেকে লক্ষ্য করলাম নেতাজী একটু খুঁড়িয়ে চলেছেন। তার পরদিন যখন আমরা আশ্রয় নিয়েছি কিয়াকটও নামে একটি গ্রামের আমবাগানে তখন মেজর মেনন এসে বললেন, আপনি ঐ প্রকাণ্ড জুতো খুলুন দেখি, আমি ভেতরটা দেখব।

নেতাজী মাথা নেড়ে বলেন, দেখার কিছু নেই। পায়ে কিছু হয়নি।

—না হোক। খুলুন স্যার জুতোজোড়া।

হাত বাড়িয়ে মেজর-সাহেব যখন নিজেই তাঁর জুতো খুলতে গেলেন তখন বাধ্য হয়ে নেতাজী আত্মসমর্পণ করলেন। ওঁর অর্ডার্লি সেই প্রকাণ্ড কালো টপ্-বুট জোড়া টেনে খুলে ফেলে। দেখা গেল দুপায়ে বড় বড় ফোস্কা টলটল করছে।

নমিতাদি বলেছিল আপনাদের কোন এপিকে বুঝি আছে কোনো মহাসমরনায়কের জানুতে নাকি বৃশ্চিক দংশন করেছিল, পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় তাই তিনি মুখ বিকৃতি পর্যন্ত করেননি। সে কাহিনী আমি জানি না। কিন্তু গুরু নয়, শিষ্যদের পাছে মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় তাই এতবড় যন্ত্রণার কথাটা তিনি গোপন রেখেছিলেন টপ্-বুটের আড়ালে!

তৃতীয় রাত্রিতে আমরা যখন টলতে টলতে চলেছি তখন সামনের দিক থেকে দ্রুতগতি দুটি গাড়ি ছুটে এল। জাপানি অফিসার স্যালুট করে বললে, এ গাড়ি এসেছে মৌলমিন থেকে নেতাজীর জন্য। তিনি নাকি তাঁর গাড়ি আহতদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

নেতাজী ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, অন্তত আমার এই চল্লিশটি বোনের জন্য ট্রাক পাওয়া না গেলে আমি গাড়িতে যাব না।

জাপানি অফিসারটি সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়ে যায়।

নেতাজী পুনরায় বলেন, আপনি বরং জেনারেল ইসোডা আর হাচাইয়াকে তুলে নিয়ে মৌলমিনে পৌঁছে দিন।

চতুর্থ রাত্রিতে পথচলা সত্যই অসম্ভব হয়ে পড়ল। বোঝা গেল নিছক দৈহিক শ্রান্তিতে আমাদের মধ্যে কিছু লোক মারা যাবে। দুটি পা আর যেন চলে না। শৈশবের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে চলেছি আমরা।

*   *   *

এরপর আর দিনপঞ্জি লিখিনি আমি। সে ক্ষমতা ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, সেই রাত্রেই আমরা উপনীত হয়েছিলাম বিলিন নদীর ধারে। এখানে প্রচণ্ড বর্ষণে আমরা আপাদমস্তক ভিজে গেলাম। বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করার মতো আশ্রয় ছিল না কোথাও। নেতাজীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অথবা বলা যায় হাঁটতে হাঁটতে—সম্পূর্ণ ভিজে গেলেন। রাত্রের অন্ধকারে তবু তাঁর পেছন পেছন হাঁটা যায়—দিনের আলোয় তাঁর দিকে আর চোখ তুলে তাকানো যায় না। এ তিনদিন তিনি দাড়ি কামাননি। স্নান করেননি, চুলে তেলও দেননি। রীতিমত খুঁড়িয়ে চলছেন তিনি। নমিতাদি বলছিল, ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে মহাগুরুনিপাতের অশৌচ পালন করছেন যেন আবার। জানি না তার অর্থ কী। ভাসিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দাড়ি কামাচ্ছেন না কেন উনি? চুলে তেল না দিলে মাথা ধরবে না?

ভাসিদা বলেছিল—সব ফেলে দিয়েছেন উনি। শেভিং সেট, তেল, চিরুনি, বাড়তি জামা-কাপড় সব! বোঝা হালকা করেছেন!

উপায় নেই। তাঁর ব্যক্তিগত বোঝা—, যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি কিট-ব্যাগ বা 'পিঠু'—তা উনি আর কাউকে বইতে দেবেন না। বোধকরি ওঁর মধ্যে যে সৈনিক আছে তাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। নিজের বোঝা উনি নিজে বইবেন! অথচ শরীর আর বইছে না—ফলে উনি ক্রমাগত ওজন কমিয়ে চলেছেন। তবু যীশুর আদেশ মেনে তিনি নিজের ক্রুশকাঠ যেন নিজে বইছেন!

এ কাহিনীর তো শেষ নেই। আগেই বলেছি শেষ দিকে দিনপঞ্জি লিখবার দৈহিক ক্ষমতা ও মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর স্মৃতির ওপর ভরসা করে কিছু লেখা ঠিকও হবে না। মোটকথা একদিন আমরা মৌলমিনে এসে পৌঁছেছিলাম। মৌলমিন থেকে আমাদের জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছিল। নেতাজী মৌলমিনে পৌঁছে একদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর জন্য জাপান সরকার একটি রেল-মোটর পাঠিয়েছিল। পরদিনই তিনি ব্যাঙ্কক চলে গেলেন।

এরপর আমার স্মৃতিকথা নেহাৎই আমার ব্যক্তিগত কাহিনী। তাতে না আছে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কথা, না নেতাজীর। আমি মৌলমিনে এসে পৌঁছেছিলাম পাঁচই মে ভোরবেলা। ঐদিন সন্ধ্যায় মৌলমিন হাসপাতালে লেফটানেন্ট নাজির আহ্‌মেদ মারা যায়। আমাকে সে চিনতে পারল। রুমাল বার করে বারে বারে তার চোখের জল মুছে দিচ্ছিলাম আমি!

*   *   *

আমার কাহিনী শেষ হল। কী বলছেন? সেই রাজরানীর বেশে নেতাজীর পায়ের ধুলা নেবার কাহিনী? না, সেসব কথা থাক। বিশ্বাস করুন, এর পর আর সেসব কথা লিখতে ইচ্ছে করছে না। কত কথাই তো বলা হল না। আমি নিজেও জানি না কত কথা। জানি না আম্মাজী সত্যই গুপ্তচর ছিলেন কিনা, জানি না কী লিখেছিলেন তিনি নেতাজীকে। সেসব কথা তো আপনাদের জানাতে পারিনি। এটাও অকথিত থাক না।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নাজিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমার হাতেই সমর্পণ করেছিলেন। আপনাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হবার পর নাজিরের মায়ের ঠিকানায় তার হাতঘড়ি, কলম ইত্যাদি পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাছে রইল মাত্র দুটি স্মৃতিচিহ্ন। উর্দু বয়েতে ঠাসা তার একটি ছোট্ট নোট-বই। মৌলমিন হাসপাতালের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা ফুলেভরা গুলমোহর গাছের তলায় ওকে কবর দিয়েছিলাম। কবিতার খাতাটা তার ভেতর ফেলে দিতে পারিনি। আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল ও খুশি হবে আমি সেটা নিয়ে এলে। ঐ খাতাটিই আমাকে বাধ্য করেছে উর্দু ভাষাটা শিখতে। এখানকার স্কুলে উর্দুই শেখাই আজ। নাজিরের ঐ খাতাটা আমাকে শুধু জীবনই দেয়নি, দিয়েছে জীবিকাও।

আরো একটা স্মৃতিচিহ্ন আছে। যে রুমালটা দিয়ে ওর ক্ষতস্থান চেপে ধরেছিলাম একদিন। ঐ একটিই রুমাল ছিল আমার সম্বল। ঐ রক্তমাখা রুমাল দিয়েই আবার সেই হাসপাতালে আর একদিন মুছিয়ে দিয়েছিলাম মৃত্যুপথযাত্রীর চোখের জল।

পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারপর। আজ আমি প্রৌঢ়া। তবু সে রুমালটি তেমনই আছে : ওর চোখের জলের আর চিহ্নমাত্র নেই। নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছে। জমে আছে শুধু রক্তের একটা

চাপা কালো দাগ। রাঙা নয় কিন্তু! তবু ঐ রুমালটা যেদিন বাক্সের তলা থেকে বার করে দেখি তখন পঁচিশ বছরের ওপার থেকে শুনতে পাই

দো লব্‌জোঁ মে পুশিদা এক মেরি কহানী হ্যয়
এক লব্‌জ্ মহব্বৎ হ্যয়, এক লব্‌জ জওয়ানি হ্যয়।
আঁসুকো মেরে লে'-কর দামন প্যে জেরা জাঁচো
জম্ যায়ে তো খুন হ্যয়, বহ্ যায়ে তো পানি হ্যয়।।

সংযোজন

1. আরতি নায়ার বাস্তবচরিত্র। যদিও আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখিনি। হিসাবমতো তিনি প্রায় আমার সমবয়সী। 1970 সালে *'নেতাজী রহস্য সন্ধানে'* আমি যখন পূর্ব-এশিয়ায় গিয়েছিলাম তখন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের একজন প্রাক্তন লেফ্টনান্ট আমাকে আরতি নায়ারের দিনলিপির একটা ধূলিধূসরিত কপি দেখায়। সেটি ইংরেজিতে টাইপ করা। প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। এই কাহিনীর সেটাই মূল উৎস।
2. আরতির দিনলিপিতে তার রানীর বেশে নেতাজীর আশীর্বাদলাভের প্রসঙ্গ আছে। সে বর্ণনা অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দিতে জেনেছিলাম। অগাস্ট 1945-এ নেতাজী যখন শেষবার রেঙ্গুন শহর ত্যাগ করে যান তার পূর্বরাত্রে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈনিকেরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল; হিন্দিতে : ঝাঁসির রানী। আরতি রানীর বেশে অভিনয় করে। নেতাজী এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, গ্রীনরুমে এসে আরতির মাথায় হাত রেখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তার বিস্তারিত বর্ণনা আমার *"আমি নেতাজিকে দেখেছি"* গ্রন্থে আছে।
3. সরস্বতীবাঈ গারেওয়াল আত্মহত্যার পূর্বে নেতাজীকে এক লাইনের যে চিঠিখানি ফরাসী ভাষায় লিখে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গানুবাদে তা : "নেতাজি! আমাকে আমার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অনুমতি দিয়ে যান।"...বাস্তবে তাঁর স্বামী সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হননি—বন্দি হয়েছিলেন ইংরেজ সৈন্যের হাতে। আর বিশ্বাসঘাতকতা করে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অনেক গুপ্তকথা ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে জবানবন্দিতে জানিয়েছিলেন। বাহিনীর অন্যান্য সাধারণ সৈনিক তা জানত না। তবু আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে প্রফেসর সরস্বতীবাঈ গারোওয়ালকে বরাবর সন্দেহের চোখে দেখা হত। এই গোপন সংবাদটা জানতেন সরস্বতীবাঈ এবং সর্বাধিনায়ক স্বয়ং নেতাজি! সেজন্যই ওই মহিয়সী মহিলা ঐভাবে নেতাজীর অনুমতি প্রার্থনা করে আত্মহত্যা করেন। অন্যান্য রোগীদের স্বার্থে আত্মদান করেন। এটি বাস্তব তথ্য।
4. এ সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের ঘটনা-পরম্পরা আদ্যন্ত বাস্তবানুগ। কথোপকথন বা বিস্তারিত বর্ণনা লেখকের কল্পনাপ্রসূত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নির্ধারিত স্বাধীনতার বাইরে আমি কোনো বাস্তব তথ্যকে অতিক্রম করিনি। ❑

শার্লক হেবো

উৎসর্গ

সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে

প্রথম প্রকাশ : 1971

গুরুবিদায় পর্ব

শার্লক হেবোর পরিচয় দিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হল বলে আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় কী? এখনও যে হেবো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাই তোমরা তাকে চেন না কেউ। বছর-দশেক পরে যে হেবোর সামনে অটোগ্রাফ খাতাখানা মেলে ধরে তোমাদের সবাইকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে হবে—সেই হেবোরই পরিচয় দিতে হচ্ছে আজ তোমাদের কাছে।

হেবো জন্ম-ডিকেকটিভ। বাংলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোম্‌স্। হেবোকে না চিনলেও শার্লক হোম্‌স্‌কে নিশ্চয় চেন তোমরা। স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি গোয়েন্দা-কুল-তিলক শার্লক হোম্‌সের কাহিনী দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে। হেবোর কাকা মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখেন, তাছাড়া ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু পুলিসের একজন বড় অফিসার। সুতরাং ছেলেবেলা থেকে চোর-ডাকাতের কথা শুনে শুনে তাদের ধরনধারণ ভালই জানা ছিল হেবোর। এ ছাড়া ওর মেজদা লাইব্রেরি থেকে লুকিয়ে ডিটেকটিভ বই নিয়ে এসে বাবা-মা-কাকাদের চোখ এড়িয়ে পড়ার টেবিলেই উপক্রমণিকা আড়াল দিয়ে গোগ্রাসে গিলত। বড়রা কেউ টের পেতেন না, এমনভাবে লুকিয়ে রাখত সে বইগুলো; কখনও পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে, কখনও আলমারির পেছনে, কখনও বা রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে, আচারের শিশিগুলোর পেছনে। হেবো আবার মেজদার নজর এড়িয়ে সেগুলো যথারীতি হস্তগত করত, আর একের পর এক শেষ করে ফেলত। অসংখ্য গোয়েন্দা-গল্প পড়ে পড়ে চোর-ধরা ব্যাপারটা তার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গিয়েছে।

মাথাটা হেবোর এমনিতেই বেশ সাফা। হেডমাস্টারমশাই বলেন, মন দিয়ে পড়লে ও নিশ্চয়ই ক্লাসে ফার্স্ট হত। কিন্তু হেবোকে গোয়েন্দাগিরির ভূতে পেয়েছে—পাস করার জন্য যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু সম্পর্ক সে বজায় রেখেছে পড়ার বইয়ের সঙ্গে। বাকি সময় সে মেতে থাকে তার গোয়েন্দাগিরির মালমশলা নিয়ে। ডিটেক্‌টিভ-সুলভ সবকটা গুণই আছে তার : তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম যুক্তির বিশ্লেষণ, ইনটুইশন, সাহস আর ধৈর্য। এ কাজের যাবতীয় সরঞ্জাম সে একে একে সংগ্রহ করেছে। নোটবই, ডায়রি, মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে উদ্ধার-করা একটা ছেঁড়া মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল চশমার পুরু একটা লেন্স। নোটবইতে সময়ে অসময়ে হেবো অনেক কিছু টুকে রাখে। কোন সমস্যার ক্লু কখন কোথায় দরকার হবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে? মেজদা ওর চেয়ে দু বছরের বড়—'শার্লক হেবো' নামটা সেই দিয়েছে ঠাট্টা করে; পদে পদে সে চায় হেবোকে অপদস্থ করতে। নোটবইয়ের কথা উঠলে মেজদা বলে—হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।'

হেবো রাগ করে না। বিজ্ঞের মতো হাসে শুধু।

মেজদা না মানলেও, হেবো যে সত্যিকারের একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা, তার প্রমাণ সে দিয়েছিল। পর-পর দু-তিনটি রহস্যের কিনারা সে করে ফেলেছিল তার কিশোর বয়সের বুদ্ধিতে। তোমরা হয়ত খবর রাখ, নয় তো রাখ না। তা, তোমরা না জানলেও হেবোর বাড়ির এবং পাড়ার লোকেরা মেনে নিয়েছিল, হেবো একটি হবু-গোয়েন্দা। পলাশপুরে হেবোর দাদু একবার রীতিমতো এক ষড়যন্ত্রের রহস্যজালে মারা পড়তে বসেছিলেন; ব্যাপারটা এতই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত হেবোর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দাকে নিয়োগ করেছিলেন। হেবো তাঁকে প্রবীরকাকু বলে ডাকত। হেবো আর তার প্রবীরকাকু মিলে সে রহস্যের কিনারা করেছিল। মোট কথা সেই থেকে প্রবীরবাবু হেবোকে মোটামুটি শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, যদিও হেবো মাত্র পনের বছরের কিশোর,—ক্লাস টেন-এ পড়ে।

পলাশপুরের রহস্যটা সমাধান হওয়ার পর কোথায় হেবোর বাবা খুশি হবেন তা নয়, তিনি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন—গোয়েন্দাগিরি হেবোকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, যতদিন না সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে। বাধ্য হয়ে হেবো তার গোয়েন্দাগিরির সাজ-সরঞ্জাম তুলে রেখে পড়াশোনায় মন দিয়েছিল।

* * *

কিন্তু ভবিষ্যতে যাকে শার্লক হোম্‌সের মতো বড় গোয়েন্দা হতে হবে, তার কপালে শুধু পড়া মুখস্ত করার ব্যাপারটা কেন লিখবেন ভগবান? মাসকতক পরে আবার একদিন হেবোকে ডেকে পাঠালেন তার কাকা। হেবো ভেবেছিল, আবার বুঝি এক প্রস্থ উপদেশ বর্ষিত হবে তার ওপর। উপায় নেই, এখন মাঝে-মাঝেই তাকে ডেকে কাকা নানান উপদেশ দেন—খোঁজখবর নেন, সে গোয়েন্দাগিরি ছেড়েছে কি না। বই বন্ধ করে হেবো এসে হাজিরা দেয় কাকার ঘরে। কাকা সস্নেহে ডেকে বলেন—'আয় বোস।'

সুরটা যেন অন্যরকম লাগছে? মুখ তুলে হেবো দেখতে পায়—ঘরে বসে আছেন কাকা, কাকীমা আর সেই পলাশপুরের প্রবীরকাকু। প্রবীরকাকু বলেন, 'কেমন আছ হেবো?'

হেবো হাসে, জবাব দেয় না।

কাকা বলেন, 'তোকে একটি জরুরী কাজে ডেকেছি হেবো। মানে আমরা একটা বিপদে পড়েছি। কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। তোর তো এসব বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খোলে, তাই—'

হঠাৎ থেমে পড়েন কাকাবাবু। হেবো মনে মনে উৎফুল্ল হলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করে না।

প্রবীরবাবু আলোচনার সূত্রটা তুলে নিয়ে বলতে থাকেন, 'সত্যি করে বলতে কি, তোমার কাকিমা এ কাজে আমার সাহায্য চেয়েছেন। ব্যাপারটা জটিল; কিন্তু আমি বলেছি, আমার সহকারী হিসাবে যদি শ্রীমান শার্লক হেবো কাজ করে তবেই এ দায়িত্বটা নিতে পারি।'

হেবো একটু অবাক হয়ে বলে, 'কাকিমা? তোমার বিপদ?' প্রবীরকাকু ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, 'না, বিপদটা ঠিক তোমার কাকিমার নয়—তাঁর ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর। ব্যাপারটা এই—'

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা হেবো মন দিয়ে শোনে।

হেবোর কাকিমারা দুই বোন। কাকিমার ছোট বোন মঞ্জুলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরের একজন নামকরা উকিল সুধাকান্তবাবুর একমাত্র ছেলে নির্মলেন্দুর সঙ্গে। সুধাকান্তের অন্য সন্তানাদি নেই। স্ত্রীও দীর্ঘদিন গত। কৃষ্ণনগরের রায়পাড়ায় মস্ত বড় বাড়ি। যথেষ্ট রোজগার করেছেন জীবনে। এখন অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সত্তরের ওপর বয়স। ছেলে নির্মলেন্দুই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শেষ বয়সে তন্ত্র-সাধনার দিকে ঝোঁকটা হয়েছে বৃদ্ধের। শাক্ত-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, পূজা-অর্চনাতেই দিন কাটে। নির্মলেন্দুর সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে হয়েছিল বছর-পাঁচেক আগে। নির্মলেন্দু ছিল দক্ষিণ রেলওয়ের একজন অফিসার। ফলে বিয়ের পর থেকেই মঞ্জুলা বরাবর স্বামীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এখানে-ওখানে ঘুরছে। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি। ছুটিছাটায় নির্মলেন্দু যখন বাড়ি এসেছে তখন মঞ্জুলাও এসেছে, এবং সুধাকান্তের সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি করেনি। বিয়ের মাসখানেক আগেই নির্মলেন্দু চাকুরিতে ঢুকেছিল, আর বিয়ের মাসদুয়েক পরেই সে বদলি হয়ে যায় মাদ্রাজে। ফলে মঞ্জুলার পক্ষে শ্বশুরের ঘর করাটা ঘটেনি।

এখন মজা হচ্ছে এই যে, সুধাকান্তবাবুর ধারণা হল, এই অপয়া বউয়ের জন্যই নির্মলেন্দু তার বাপকে ত্যাগ করে গেল। এ ধারণার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। সুধাকান্তবাবু একজন নামকরা উকিল ছিলেন, যুক্তির ওপর নির্ভর করে কত বড় বড় কেস জিতেছেন তিনি; অথচ এখন একেবারে বিনা যুক্তিতে ছেলেমানুষের মতো তিনি অভিমান করে রইলেন পুত্রবধূর ওপর। বেচারি মঞ্জুলা এ অভিমান ভাঙাবার নানান চেষ্টা করেছে। স্বামীকে ছেড়ে কৃষ্ণনগরে শ্বশুরের কাছে এসে থাকতে চেয়েছে; কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। সুধাকান্ত তো পুত্রবধূর সেবার জন্য কাতর নন, তিনি চাইছেন পুত্রের সান্নিধ্য। অথচ সে বেচারা চাকরি ছেড়ে বারে বারে এতদূর আসেই বা কী করে? শেষ পর্যন্ত নির্মলেন্দু

বলেছিল, 'বাবা, আপনিই কেন আমার ওখানে গিয়ে থাকবেন চলুন না, মাদ্রাজে!' কিন্তু তাতেও সুধাকান্ত রাজি নন। দেশ-ঘর ছেড়ে অত দূরে এই বয়সে তিনি যাবেন না। ফলে পিতা, পুত্র আর পুত্রবধূর মধ্যে একটা মন-কষাকষির সূত্রপাত হল।

হেবো বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু এর মধ্যে কাকিমার বিপদটা কোথায়?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'বলছি, সবটা শোন আগে।'

ঘটনার গতিটা কোন দিকে মোড় নিয়েছে এবার তিনি তা বুঝিয়ে দেন।

মাসচারেক আগে হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্মলেন্দু মারা গিয়েছেন। এ আঘাতে সুধাকান্ত একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন। অথচ তাঁর মাথা খারাপের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। মানসিক স্থৈর্য তাঁর ঠিকই বজায় আছে। তবে, সমস্ত দুনিয়ার ওপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে। সুধাকান্তের অর্থের অভাব ছিল না—যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছেন তিনি সারা জীবনে। তবু সেই টাকা রোজগারের অছিলাতেই ছেলে যে বাপকে ত্যাগ করে গিয়েছিল এটা তিনি ভুলতে পারেননি। ছেলে নেই—টাকার ওপরেই মর্মান্তিক চটে গিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা হয়েছে অর্থই সকল অনর্থের মূল। আর চটে গিয়েছেন তাঁর পুত্রবধূর ওপর। আগে থেকেই অবশ্য চটে ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সেটা মর্মান্তিক আকার ধারণ করেছে।

মঞ্জুলার একটি সন্তান হয়েছিল ইতিমধ্যে। বছরখানেকের ছেলেটিকে নিয়ে সে এসে আশ্রয় চাইল শ্বশুরের ভিটায়। আশ্রয় তিনি দিলেন, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও করতে তিনি রাজি; কিন্তু না পুত্রবধূ না তার অবোধ শিশুসন্তান—কাউকেই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন না।

দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় তিনখানি ঘর। একটি ঘরে থাকেন সুধাকান্তবাবু, দ্বিতীয় ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। সেটায় ছাত্রজীবনে নির্মলেন্দু থাকত। কখনও-সখনও দেশে এলে সস্ত্রীক এই ঘরেই উঠত সে। তৃতীয় ঘরখানিতে বর্তমানে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। মন্ত্রদীক্ষা দিতে তিনি এসেছিলেন একদিন, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। একতলায় রান্না, ভাঁড়ার, বৈঠকখানা ছাড়াও আর একটি বাড়তি ঘর ছিল। সেটাতেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল মঞ্জুলাকে। ঘরটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। এমন একখানা ঘরে তাকে থাকতে দেওয়ার সঙ্গত কারণ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব। সুধাকান্ত নাকি পুত্রবধূর বৈধব্যের বেশটা সহ্য করতে পারেন না। না পারাই স্বাভাবিক। মাত্র পাঁচ বছর আগে যাকে আদর করে নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়ির লক্ষ্মী করে, সে-ই যদি আজ সাদা থান পরে তাঁর সামনে ঘুরে বেড়ায় তাহলে তাঁর কষ্ট হয় বইকি। মঞ্জুলাও তাই মেনে নিল এই দুর্ভাগ্যকে। একতলার ঐ অন্ধ কুটুরিতেই আশ্রয় নিল সে শিশুসন্তানটিকে নিয়ে। বাড়িতে দারোয়ান, ঠাকুর আর পুরনো আমলের ঝি মোক্ষদামাসি আছে। তারাই সব কাজকর্ম সারে। গুরুদেব প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন, এ বেশে মঞ্জুলা যেন তার শ্বশুরের সামনে না যায়।

প্রথমটায় লজ্জায়, সঙ্কোচে আর হতাশায় মাথা নিচু করে এ আদেশ মেনে নিয়েছিল মঞ্জুলা। সুধাকান্তের পুত্রবিয়োগের জন্য যেন সেই দায়ী। সত্যিই তো, এ বেশে সে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর সামনে? কিন্তু দু-দশদিন পরে তার খেয়াল হল—কিন্তু এ তো হতে পারে না! এই বেশ বদলাবার কোনো সম্ভাবনা যখন নেই তখন সে কি চিরকালই ঐ অন্ধ কুটুরিতে পড়ে থাকবে নাকি? শ্বশুরের সেবাযত্ন করবে না?

গুরুদেব কঠিন হয়ে বললেন, 'না! এতদিন যদি পুত্রবধূর সেবাযত্ন ছাড়াই চলে গিয়ে থাকে, তবে আর কটা দিনও চলবে!'

বাধ্য হয়ে এই অপমানকর জীবনযাত্রাকে স্বীকার করে নিয়েছিল মঞ্জুলা। নির্বান্ধব পুরীর একতলার ঐ অন্ধকার ঘরে ইঁদুর আর আরশোলা তাড়িয়ে পড়ে ছিল কোনোক্রমে। সদ্যবিধবার যেন নতুন কোনো কষ্টের বোধই ছিল না। তবু তার মনে একটি আশার বীজ সে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিল—একদিন না একদিন সুধাকান্ত তাকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবেন। কতদিন আর অভিমান করে থাকতে পারবেন তিনি? সুধাকান্ত কি কোনোদিনই বুঝবেন না—যে-দুঃখের আগুনে তিনি জ্বলে-পুড়ে মরছেন সেই একই আগুনে জ্বলছে এ বাড়ির আর একটি উপেক্ষিতা বধূ? তাকে না হলেও অন্তত নির্মলেন্দুর সন্তানটিকে, ফুলের মতো সুন্দর বংশের শেষ প্রদীপটিকে, একদিন তিনি তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব

হাহা-করা বুকে টেনে নেবেনই। খোকন নতুন হাঁটতে শিখেছে। টলমল করে সারা বাড়ি টলে টলে বেড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায় দোতলায়।

কিন্তু তা হবার নয়। গুরুদেব আর তাঁর চেলাটি পালা করে পাহারা দেয় সুধাকান্তের ঘরের সামনে। ওঁদের ভয়ে খোকনকে ওপরে নিয়ে যেতে পারে না কেউ। ক্রমে মঞ্জুলার আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে, আর সে অনুভব করছে যে শ্বশুরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথে একমাত্র বাধা ঐ গুরুদেবটি।

কিন্তু কেন? মঞ্জুলা কোনো কারণ খুঁজে পায়নি।

মঞ্জুলার বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভাই নেই তার। বাবা গত হয়েছেন। মা আছেন মালদায়—জমিজমা থেকে কোনোক্রমে দিন চলে যায় তাঁর। একই দিদি—তিনিই হেবোর কাকিমা। হেবোর কাকা অবশ্য মঞ্জুলাকে তাদের বাড়িতে এনে রাখতে পারতেন; কিন্তু তাহলে শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। ছেলেটিকেও তো মানুষ করে তুলতে হবে।

* * *

মঞ্জুলার চিঠি পেয়ে হেবোর কাকা আর কাকিমা কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুধাকান্তবাবু তাঁদের কোনো আমলই দেননি। প্রথমত তিনি দেখাই করতে চাননি, বলে পাঠিয়েছিলেন—'আপনারা বৌমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি নিচের তলায় আছেন।' কিন্তু হেবোর কাকা নাছোড়বান্দা হয়ে দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। সুধাকান্তবাবু ভালভাবে ওঁদের সঙ্গে কথাই বলেননি। তবু নকুলবাবুর মধ্যস্থতায় মোটামুটি সাক্ষাৎটা হয়েছে।

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'নকুলবাবুটি কে?'

হেবোর কাকিমা বলেন, 'নকুলবাবু তায়ইমশায়ের পুরানো মুহুরি। বলতে গেলে ওঁদের সংসারেরই একজন। তাঁরও সত্তরের কাছাকাছি বয়স। তিনি নির্মলেন্দুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। নির্মলেন্দুকে তিনিও খুব ভালবাসতেন। সেই নির্বান্ধব পুরীতে ঐ নকুলচন্দ্রই মঞ্জুলার একমাত্র ভরসা। খোকনের মধ্যে তিনি নির্মলকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন।'

হেবো বলে, 'যাই হোক, তারপর?'

হেবোর কাকা বলেন, 'আসল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা জানি না সুধাকান্তবাবু কোনো উইল করে রেখেছেন কিনা। করলেও হয়ত তিনি নির্মলের নামে সবকিছু লিখে দিয়ে গিয়েছেন।'

বাধা দিয়ে হেবো আবার বলে, 'আমি আইনের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। যদি তাই করে থাকেন, তাহলে নির্মলবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী-পুত্রই কি সে সম্পত্তি পাবে না?'

'হ্যাঁ, তাই পাবে।' বলেন প্রবীরবাবু, 'কিন্তু তোমার কাকা আশঙ্কা করছেন যে, ঐ গুরুদেবের পরামর্শে সুধাকান্তবাবু নতুন করে উইল করতে চাইছেন। আর সেই নতুন উইলে তিনি মঞ্জুলা দেবীকে আর তাঁর নাবালক সন্তানকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চান।'

হেবো বলে, 'এ তো খুব সর্বনাশের কথা! এ কথা কি আপনাদের অনুমান, না প্রমাণ আছে কিছু?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'এটা এখনও অনুমানের পর্যায়েরই আছে বটে তবে অনুমানের সপক্ষে যথেষ্ট জোরাল যুক্তিও আছে। খবরটা দিয়েছেন নকুলচন্দ্র।'

সে কাহিনীও বিস্তারিত শুনল হেবো।

সুধাকান্তবাবুকে এই পুরাতন ভক্তটি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। নকুলচন্দ্র ছিলেন তাঁর মুহুরি। সুধাকান্তের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে দু-হাতে পয়সা কামিয়েছেন—ছেলেদের মানুষ করেছেন, মেয়েদের পাত্রস্থ করেছেন। দু-জনেই অবসর নিয়েছেন বটে, তবু আজও নকুলচন্দ্র প্রতিদিন আসেন তাঁর 'বড়বাবু'কে দেখতে। সংসারের খবরাখবর নিয়ে, পুরোনো দিনের কথা দুটো-চারটে আলোচনা করে, রাত বাড়লে বাড়ি ফিরতেন। সুধাকান্ত কোন কেসে কেমন করে সওয়াল করেছিলেন, কোন আসামীকে ফাঁসির দড়ির নিশ্চিত আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করেছিলেন, কোন ধড়িবাজ বদমায়েসের কূট কৌশল ব্যর্থ করে তাকে কারাকক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন—বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন নকুলচন্দ্র। আর মনে মনে খুব উপভোগ করলেও সুধাকান্ত বলতেন, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথা থাক, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমাদের সময় হাকিমরা ছিল সত্যিকারের মানুষ। সেই ম্যাকফার্লন সাহেবকে মনে আছে তোমার?'

নকুল বলতেন, 'মনে নেই আবার? ফেয়ারওয়েলের দিন তিনিই না আপনাকে বলেছিলেন, এখান থেকে যেতে আর কোনো দুঃখ নেই, শুধু একটা দুঃখ, তোমার মতো উকিলের জোরাল সওয়াল আর শুনতে পাব না।'

বাধা দিয়ে সুধাকান্ত বলতেন, 'আরে ছেড়ে দাও নকুল! ওসব কথায় আর কাজ কী?'

এই দুটি প্রাচীন বন্ধুর সামাজিক মর্যাদার আসন উঁচু-নিচু কি না বুঝবার উপায় ছিল না। ওঁদের বন্ধুত্বে ভাটার টান পড়ল সুধাকান্ত দীক্ষা নেবার পর থেকে। গুরুদেব নকুলচন্দ্রকে পছন্দ করতেন না। ওঁদের সান্ধ্য আসরে প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। আর দু-জনেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠতেন। ক্রমশ নকুলচন্দ্র অনুভব করেন, তিনি এ বাড়ির কর্তার কাছে অবাঞ্ছিত। তবু দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত সন্ধ্যাবেলায় একবার দেখা দিয়ে যেতেন।

কিছুদিন আগে সুধাকান্তের হঠাৎ খুব জ্বর হয়। নকুলচন্দ্র তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন শহরের নামকরা ডাক্তার অনুকূলবাবুকে। অনুকূলচন্দ্র বয়সে ছোট, কিন্তু পসার খুব আছে তাঁর। ঔষধপত্র পড়তে সামলে নিলেন সুধাকান্ত; কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। দিনসাতেক জ্বর ভোগ করেই একেবারে কাবু হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে নামতে পারেন না। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন সুধাকান্ত। নকুলচন্দ্র সকাল-বিকেল দু-বেলা আসতে শুরু করলেন, খবর নিতে—ব্যবস্থা-পত্র করতে। বয়স হলে কী হবে, নকুলচন্দ্র এখনও বেশ শক্ত আছেন। দোতলায় উঠে গিয়ে তিনি তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে রোজ দেখা করেন। সেদিনও গিয়ে যেই বসেছেন, সুধাকান্ত বললেন, 'নকুল, ঐ লোহার সিন্দুকটা খুলে ডানদিকের ওপরের খোপে একটা বন্ধ খাম আছে, বার করে দাও তো।'

দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা লোহার মজবুত আলমারি। তার চাবিটা সর্বক্ষণ থাকে অসুস্থ সুধাকান্তের বালিশের নিচে। চাবিটা বার করে তিনি নকুলচন্দ্রের হাতে দিলেন। ওঁর চোখের সামনেই ঘটছে সব কিছু। নকুলচন্দ্র চাবি খুলে ওপরের খোপ থেকে একটা সীলমোহর করা খাম বার করে ফিরে এলেন। খাম ও চাবিটা বড়বাবুর হাতে দিতে সুধাকান্ত বললেন, 'সিন্দুকটা আবার খোলা রেখে এলে কেন? ওটা বন্ধ করে চাবিটা দাও আমাকে।'

নকুলচন্দ্র বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম, খামটা আবার তুলে রাখতে হবে।'

—'না, ওটা এখন বাইরেই থাকবে।'

খামটা বালিশের নিচে রাখলেন সুধকান্ত।

সিন্দুক বন্ধ করে নকুলচন্দ্র চাবিটা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, বলে ফেলেন, 'কিন্তু এটা কি ভাল হচ্ছে বড়বাবু?'

চমকে উঠে সুধাকান্ত বললেন, 'কোনটা নকুল?'

—'আমি তো স্যার জানি কী আছে ঐ সীলমোহর করা খামের ভিতরে! বছর দশেক আগে ওটা আমিই তো আপনার সামনে সীলমোহর করেছিলাম। সাক্ষী হিসাবে আমারও সই আছে কাগজটায়।'

সুধাকান্ত কোনো জবাব দিলেন না। গুম মেরে বসে রইলেন। কিন্তু নকুলচন্দ্র পাকা লোক। সাক্ষী নীরব থাকলে তাকে ছেড়ে দিতে নেই, আরও ভাল করে চেপে ধরতে হয়—দীর্ঘদিনের কোর্ট-কাছারির অভিজ্ঞতায় এটুকু জানা ছিল তাঁর। তাই হেসে বলেন, 'আপনি আমার কথার জবাব দিলেন না কিন্তু বড়বাবু।'

সুধাকান্ত ধমকে ওঠেন, 'উইল পালটাব কিনা তাও কি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে নাকি?'

নকুল ম্লান হাসেন। অনেক দুঃখের সে হাসি। বলেন, 'আজ্ঞে না। আপনি মস্ত বড় উকিল, আর আমি সামান্য মুহুরি। আপনারই অন্নে পালিত বলতে পারেন। আমার মতো লোকের সঙ্গে আপনি কেন এসব বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ করবেন? তবে কিনা নিমুকে একদিন কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম—তাই তার ঐ বাচ্চাটার কথা ভেবে—কিন্তু নাঃ! আমার অন্যায়ই হয়েছে।'

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে থাকেন সুধাকান্ত।

নকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আর মুশকিল হয়েছে কি জানেন বড়বাবু—আপনি তো চোখে দেখেন না, ওদের ওপরেই আসতে দেন না; কিন্তু আমি তো দেখতে পাই, খোকনবাবু সারা বাড়িটা টলমল করে হেঁটে বেড়ায়। ঠিক নিমুর মতো দুষ্টু হয়েছে—মায় হাসিটা পর্যন্ত। তাই ঐ ছেলেটির

ভবিষ্যৎ ভেবে...কিন্তু আবার পাগলামি করছি আমি। এ সব কথা আলোচনা করার আমার অধিকারই যে নেই! হ্যাঁ, অন্যায়ই হয়েছে আমার, মাপ করবেন আমাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নকুলচন্দ্র। লাঠিটা তুলে নেন হাতে।

আশ্চর্য, তবু সুধাকান্ত কোনো প্রতিবাদ করেন না। জানলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকেন পাথরের মূর্তির মতো। তিনি যেন ভুলে গিয়েছেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নকুলচন্দ্রের সঙ্গে এ বাড়ির কী সম্পর্ক! প্র্যাকটিসের প্রথম অবস্থা থেকেই তিনি টাকার মুখ দেখেননি। প্রথম যৌবনে তিনিও যেমন শুনতেন কোর্টঘরের কড়ি ও বরগা, মুহুরিবাবুও তেমনি সারাদিন ধরে শুনতেন বটগাছের পাতা। সেই দুঃখের দিন থেকেই নকুলচন্দ্র তাঁর বড়বাবুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছিলেন—সুখে-দুঃখে শতাব্দীর অর্ধাংশ পাড়ি দিয়ে এসেছেন একই নৌকোয়। নিমুর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে ঐ নকুলচন্দ্রকেই একদিন পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বরযাত্রী যেতে পারেননি—একটা বড় কেসের দিন পালটানো যায়নি বলে—ঐ নকুলচন্দ্রকেই বরকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। বৈবাহিককে বলে পাঠিয়েছিলেন—'আমি নগদ চাই না, নমস্কারী চাই না, ননদ পুঁটুলি চাই না—নির্মলের কাকাকে যেন বৌমা গরদের পাঞ্জাবি আর ধুতি দিয়ে প্রণাম করেন।' মঞ্জুলার মা একই গরদের থান থেকে কেটে দু-জোড়া পাঞ্জাবি বানিয়েছিলেন—মঞ্জুলার শ্বশুরের ও খুড়শ্বশুরের নমস্কারী। সেসব দিনের কথা আজ সুধাকান্ত নিঃসংশয়ে ভুলে গিয়েছেন।

নকুলচন্দ্র ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে চান ঘর থেকে। সুধাকান্ত ফিরে ডাকেন না তাঁকে। দরজার কাছে গিয়ে নকুলচন্দ্র দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন সুধাকান্তের গুরুদেব। লাল চেলি পরা, গলায় গরদের চাদর, কপালে আধুলির মাপে একটা সিঁদুরের টিপ। তন্ত্রসাধক তিনি। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি কাপালিক। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে তাঁর। বয়সে ঐ গুরুদেবটি সুধাকান্তের চেয়ে বছর-বিশেক ছোটই হবেন—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তাঁর— তবু তিনি অনায়াসে সুধাকান্তের প্রণাম নিয়ে থাকেন।

নকুলচন্দ্র গুরুদেবকে নমস্কারমাত্র না করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শুনতে পান গুরুদেব তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বেশ জোর গলায় সুধাকান্তকে ধমকাচ্ছেন—'আবার তুমি ঐসব অসৎ কুসঙ্গের সংস্পর্শ করছ? বলেছি না—ওদের দোতলায় উঠতে দেবে না!'

মিনমিনে গলায় সুধাকান্ত কী জবাব দিলেন সেটা আর শুনতে পেলেন না তিনি।

* * *

এতক্ষণ তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে হেবো শুনছিল কেস-হিস্ট্রিটা। প্রবীরচন্দ্র থামতেই বলল, 'বুঝলাম। এখন কী করতে চান আপনারা?'

কাকা বলেন, 'আমি তো আশার কোনোও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'কেন? এখনই নিরাশ হবার কী আছে? আমি তো আশার লক্ষণ ভালই দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত দেখুন, সুধাকান্ত গুরুদেবের হাতে সিন্দুকের চাবিটা দেননি। নিজে উত্থানশক্তি-রহিত, কিন্তু সিন্দুক খোলার কাজটার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন নকুলবাবুর। দ্বিতীয়ত, নকুলচন্দ্র যখন খোকনের কথা বলেছিলেন তখন তিনি উদাস দৃষ্টি মেলে জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তৃতীয়ত, বোঝা যাচ্ছে গুরুদেব ইতিপূর্বেই নকুলচন্দ্রের দোতলার আসা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে নিষেধ অমান্য করেছিলেন সুধাকান্ত।'

কাকা বলেন, 'কী জানি বাপু, অত সূক্ষ্ম বিচার আমি বুঝি না। আমি প্রবীরকে বলছিলুম কাজটা হাতে নিতে। এ সাধারণ মানুষের কাজ নয়। পুলিশের সাহায্যও আমরা পাব না, কারণ সুধাকান্ত বেআইনি কিছু করছেন না। সম্পত্তি সুধাকান্তের নিজের উপার্জন, পৈতৃক নয়। তিনি যদি সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি গুরুদেবকে উইল করে দিয়ে যান তাহলে আইনত আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। মামলা-মোকদ্দমা করে মঞ্জুলা হয়ত তার নাবালক সন্তানের জন্য একটা মোটামুটি খোরপোশ আদায় করতে পারবে—তাও পারবে কিনা জানি না। কিন্তু এত বড় অন্যায়টা সহ্যই বা করে যাওয়া যায় কেমন করে?'

হেবো বলে, 'সে তো ঠিক কথাই। সুধাকান্তকে বাধা দেবার আইনগত অধিকার না থাকলেও নীতিগত অধিকার আমাদের আছে। এ যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম আর কাকে বলে? কিন্তু প্রবীরকাকু কেমন করে কী করবেন?'

কাকা বলেন, 'তা যদি আমি বাতলাতে পারব তাহলে আমিই তো গোয়েন্দা হতুম।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বলে, 'সে কথা ঠিক। তা প্রবীরকাকু, আপনি কী বলছেন?'

—'আমি বলছি, আমাদের কিছু করতে হলে সর্বপ্রথম ঐ দুর্গের ভেতর ঢুকতে হবে। আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ করা অসম্ভব। গুরুদেবটিকে আমি চিনি। গভীর জলের মাছ ব্যাটা। বহু বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করেছে আশ্রমের নামে। তাছাড়া চোরাই মাল পাচারের একটা ফলাও ব্যবসা তার আছে। বহুবার ফাঁদ পেতেছে পুলিশ—ধরা পড়েনি একবারও। অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক। সেও আমাকে চেনে, আমিও তাকে চিনি। ফলে কোনো ছুতোনাতাতেই আমার পক্ষে ঐ ব্যূহে প্রবেশ অসম্ভব।'

হেবো বলে, 'বুঝেছি। ভীমসেনও ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন।'

—'ভীমসেন কে?'

—'মধ্যম পাণ্ডব। দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারেননি তিনি। শেষমেশ আমারই মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন—তুই ঢোক ওর ভেতর।'

কাকিমা ভয় পেয়ে বলেন, 'না বাপু, এ সবের মধ্য হেবোর গিয়ে কাজ নেই। বড়ঠাকুরও বাড়িতে নেই—।'

বাধা দিয়ে হেবো বলে, 'ভয় নেই কাকিমা, অভিমন্যু-বধ পালা অভিনয় করছি না আমরা। বেরিয়ে আমি ঠিকই আসব।'

প্রবীরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তাছাড়া আমি তো থাকবই পিছনে।'

হেবো হেসে বলে, 'সেটা কোনো সান্ত্বনার কথা নয় প্রবীরকাকু, কারণ ভীমসেনও অভিমন্যুকে ঐরকম একটা প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলছি, কাজটা টেক আপ্ করতে পারতাম, সামনে ছুটিও আছে স্কুলের—ক্লাস কামাই হবে না; কিন্তু আমি ওখানে যাব কোন অছিলায়?'

প্রবীরবাবু বলেন, 'আমি সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। নকুলবাবু আমাদের দলে। তিনি সুধাকান্তবাবুকে বলবেন, তুমি তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে। গাঁয়ে থাক—দুদিনের জন্য শহর দেখতে এসেছ।'

হেবো বলে, 'তাতে দুটি অসুবিধা। প্রথম কথা, নকুলবাবু সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। অথচ সুধাকান্তবাবু আজ পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁকে চেনেন। জেরার মুখে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। মনে করুন, নকুলচন্দ্রের এক ছেলে পাঁচ বছর আগে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। তাঁর ভাইপোর পক্ষে এত বড় খবরটা জানা থাকা উচিত। সেই প্রসঙ্গ উঠলে আমি কী বলব? দ্বিতীয়ত, নকুলবাবুর বাড়িও কৃষ্ণনগরে—তাঁর ভাইপো বা ভাগ্নে গ্রাম থেকে শহর দেখতে এলে তাঁর বাড়িতেই উঠবে। সুধাকান্তের স্কন্ধে তাকে নকুলচন্দ্র চাপাতে চাইবেনই বা কেন, আর তাঁর ভাইপোই বা ভাইবোনদের ছেড়ে ঐ নির্বান্ধব পুরীতে থাকতে চাইবে কেন?'

কাকা বলেন, 'সে কথা ঠিক।'

হেবো বলে, 'তার চেয়ে আমার মাথায় আর-একটা আইডিয়া এসেছে। আচ্ছা, নকুলবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন?'

কাকিমা বললেন, 'ঠিক জানি না। তবে ওঁর অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি আছে শুনেছি।'

হেবো বলে, 'ব্যস ব্যস, মা ষষ্ঠী রক্ষা করেছেন। বসুন, আসছি আমি—উপায় বার করেছি।'

বলেই বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। একটু পরে ফিরে আসে একখণ্ড টেস্ট পেপার নিয়ে। পাতা উল্টে কী দেখে নিয়ে বলে, 'নকুলবাবু বলুন, আমার বাবা তাঁর পরিচিত একজন মক্কেল। মামলা-সূত্রে আলাপ। আমি হাঁসখালি উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। আমার সিট পড়েছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। পরীক্ষা দিতে শহরে এসেছি। যেহেতু নকুলবাবুর বাড়িতে মা ষষ্ঠীর কৃপায় সারাদিন চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগে আছে, তাই তিনি আমাকে কয়েকদিনের জন্য সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে এনে রাখছেন। দ্বিতলের অব্যবহৃত ঘরটায় থেকে আমি পড়াশুনা করব ও পরীক্ষা দেব। ব্যাপারটা

বুঝেছেন? আমি তাহলে দোতলাতেই থাকব। সকালবেলা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাব, তারপর লুকিয়ে থাকব বাড়িতেই। যেহেতু আমি পরীক্ষার্থী তাই কেউ সন্দেহ করবে না যে, পরীক্ষা না দিয়ে আমি বাড়িতেই লুকিয়ে আছি।'

* * *

যে কথা সেই কাজ। পরদিন সকালের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে নকুল ও প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গে হেবো রওনা দিল কৃষ্ণনগর। হেবোর বাবা-মা কদিনের জন্য মধুপুরে গিয়েছেন ঈস্টারের ছুটিতে। হেবোরও স্কুল ছুটি; ঈস্টার, মহরম আর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য লম্বা ছুটি। মেজদা একবার হেবোকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। হেবো জবাবে বললে, 'কাকা যেখানে পাঠাচ্ছেন।'

নকুলচন্দ্র হেবোকে নিয়ে এলেন সুধাকান্তের বাড়িতে। ঠিক হল প্রবীরচন্দ্র কাছেপিঠেই কোনো একটা হোটেলে থাকবেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা হেবো গিয়ে তাঁকে দৈনন্দিন রিপোর্ট দেবে। সুধাকান্ত নকুলবাবুর পরিচিত এই ছেলেটিকে কদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন। ব্যূহ প্রবেশে কোনো বেগ পেতে হল না। হেবোর আসল পরিচয়টা নকুলচন্দ্র শুধু জানিয়ে গেলেন মঞ্জুলা দেবীকে। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দিদির কাছ থেকে হেবোর কীর্তিকলাপ ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন তিনি। তবু মঞ্জুলা দেবী খুব যে একটা ভরসা পেলেন তা তাঁর মুখ দেখে মনে হল না।

সুধাকান্তবাবু হেবোকে ডেকে কোনো প্রশ্নই করলেন না। এসব দিকে যেন তাঁর খেয়ালই নেই। হেবো লক্ষ করে দেখে, তাঁর ঘরের সামনে সর্বক্ষণ একটা টিকিওয়ালা লোক বসে পাহারা দেয়। শুনল, লোকটা গুরুদেবের এক চ্যালা—নাম কেবলানন্দ।

ঘরটার তালা খুলে যে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল সে বাড়ির ঠাকুর। হেবো তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখে নেয়। দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা চওড়া বারান্দা, ডানদিকে, অর্থাৎ পূর্বদিকে, দুখানি ঘর। আর সিঁড়ির বাঁয়ে পশ্চিম দিকে আর একখানা কামরা। পূর্বদিকের প্রথম ঘরখানা এতদিন তালা বন্ধ পড়েছিল। পাশের ঘরখানিতে আছেন অসুস্থ গৃহকর্তা। সিঁড়ির ওপাশের পশ্চিমের ঘরখানায় গুরুদেব তাঁর সেই চ্যালাটিকে নিয়ে থানা গেড়েছেন! অর্থাৎ ঐ পশ্চিমদিকের ঘরখানাই হচ্ছে শত্রুপক্ষের শিবির।

হেবো খুশি হয় মনে মনে। এতে তার সুবিধাই হয়েছে। ঠিক পাশের ঘরেই আছেন সুধাকান্ত। দুটি ঘরের মাঝখানে আছে একটি দরজা, ওপাশ থেকে বন্ধ। দরজার গায়ে বিলিতি খড়ির কায়দায় গা-তালা লাগানো। গা-তালায় চাবির যে ফুটো আছে তাতে চোখ লাগালে ও-পাশের ঘরের খানিকটা নজরে আসে—খাটের একটু অংশ। লোহার সিন্দুকটা অবশ্য দেখা যায় না। সেটা ঘরের অন্য প্রান্তে। হেবো মনে মনে স্থির করল—প্রথমেই তাকে একখণ্ড সাদা কাচ যোগাড় করতে হবে। ঐ ছিদ্রপথে তাকে বারে বারে চোখ লাগাতে হবে; আর গুরুদেবটি যে রকম ঝানু লোক, তাক বুঝে কাঠির খোঁচা মেরে হেবোকে কানা করে দিতে পারেন। একতলার যে ঘরটায় মঞ্জুলা দেবী থাকেন সেটাও দেখল। সেটাও অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে।

ঠাকুর, দারোয়ান, ঝি—সকলকেই লক্ষ্য করে দেখল। মনে হল না ওরা কোনো পক্ষে যোগ দিয়েছে। অন্তত ও-পক্ষে যে নয় সেটা বোঝা যায়, কারণ সবাই দেখা যাচ্ছে খোকনকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সবাই গুরুদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। এগুলো শুভ লক্ষণ, ওরা বোধহয় বেইমানি করবে না। অবস্থা বেগতিক হলে ওরা এ-পক্ষেই যোগ দেবে। গুরুদেবটিকেও ভাল করে লক্ষ করল। কাপালিক বা তান্ত্রিকদের মতো দেখতে নয় মোটেই। প্রকাণ্ড তাঁর বপুখানি, মেদের মৈনাক! মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। পেল্লায় একটি ভুঁড়ি, কপালে সব সময়েই একটা লাল সিঁদুরের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক বলতেই যেমন বাজে-পোড়া তালগাছের মতো পাকানো চেহারার কথা মনে পড়ে, এঁকে দেখে তা মনে পড়ে না মোটেই—বরং মনে হয় কৃষ্ণনগরের আহ্লাদি-পেহ্লাদি পুতুলের একজন জোড়া ভেঙে এসেছে বুঝি। মেদবহুল ঐ চেহারার মধ্যে দেখবার মতো বস্তু হচ্ছে তাঁর চোখদুটো। প্রায় সব সময়েই ফুলোফুলো, গালের চর্বির তলায় ঢাকা থাকে, কিন্তু সময়-বিশেষে যেন জ্বলে ওঠে।

প্রথম দর্শনেই হেবোর ওপর যেন তাঁর স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠল। হেবো ছদ্ম-ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বলেই বোধহয়। গুরুদেব বললেন, 'কল্যাণ হোক! তোমার নামটি কী বাবা?'

—'আজ্ঞে ভাল নাম বটুকনাথ বটব্যাল, ডাক নাম বটু।'

—'ভাল, ভাল। তা বাবা বটু, তুমি বুঝি হাঁসখালি ইস্কুলের ছাত্র? সায়েন্স, না হিউম্যানিটিজ?'

—'আজ্ঞে সায়েন্স।'

—'খুব ভাল। এটা তো সায়েন্সেরই যুগ! আচ্ছা এস তুমি। মন দিয়ে পড়াশুনা কর।'

গুরুদেবের চেলাটি হাবাগোবা ধরনের; কিন্তু বুদ্ধিতে কম হলে কী হবে, লোকটার গায়ে অসুরের শক্তি, আর বুলডগের মতো একরোখা। সম্ভবত লোকটা উৎকলবাসী। সুধাকান্তের দরজার সামনে থানা গেড়ে বসে আছে যেন একটা ব্লাড-হাউন্ড কুকুর! গুরুদেব ওকে ডাকেন, 'বাবা কেবল' বলে—নাম নাকি কেবলানন্দ।

নিজের ঘরে এসে হেবো তার বইপত্র খুব আড়ম্বর করে সাজিয়ে রাখল টেবিলের ওপর, আর পিছনের একটা কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখল তার গোয়েন্দাগিরির সরঞ্জাম—নোটবই, ডায়েরি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, মাপবার ফিতে।

প্রথম দিনটা গেল পরিস্থিতিটা ঠিকমতো আঁচ করে নিতে, এ নাটকের চরিত্রগুলিকে ভালমতো সমঝিয়ে নিতে। হেবো বুঝেছে—তার প্রথম, প্রধান ও একমাত্র কাজ হচ্ছে পাশের ঘরের ওপর নজর রাখা। যতদূর জানা গিয়েছে সুধাকান্ত তাঁর পুরাতন উইলটি লোহার সিন্দুক থেকে বার করেছেন, সেই উইল-মতে নির্মলেন্দুবাবুরই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়ার কথা। যেহেতু নির্মলেন্দু গত হয়েছেন, সুতরাং আইনমতে নির্মলেন্দুর স্ত্রী মঞ্জুলা দেবী ও নাবালক পুত্র এখন সেই সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ভাবগতিক দেখে অনুমান করা যেতে পারে, সুধাকান্ত উইলটি বার করে রেখেছেন সেটা পালটাবার জন্য। আগের উইলটি যদি তিনি নষ্ট করেন তাহলেও ভাবনার কিছু নেই, কারণ আইন বলছে যে, উইল না করে তিনি যদি মারা যান, তাহলেও মঞ্জুলা আর তাঁর সন্তান সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না।

কিন্তু দুর্ভাবনার শেষ তো সেখানেই নয়—সুধাকান্ত আবার যে নূতন উইল করতে চান। তিনি না চাইলেও গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে তাই করাতে চান। যে কোনো কারণেই হোক সুধাকান্ত এখন সম্পূর্ণভাবে ঐ গুরুদেবটির করতলগত। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টেনে নিয়ে যায়, গুরুদেবও তেমনি অনিবার্যভাবে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সুধাকান্তকে। সুধাকান্তের যেন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, শুভবুদ্ধি বলে কিছু নেই, তিনি যেন কলের পুতুল। ফলে দু-চার দিনের মধ্যেই—অর্থাৎ সুধাকান্তের সই করার ক্ষমতা লুপ্ত হবার আগেই—ঐ গুরুদেবটি তাঁকে দিয়ে উইলটি পালটিয়ে নিতে চান। আচ্ছা, ইতিমধ্যেই সে দুষ্কর্মটি হয়ে যায়নি তো? হেবো অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত সমাধানে এসেছে—না। কারণ মঞ্জুলা দেবীর কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এক ডাক্তারবাবু ছাড়া বাইরের লোক কেউ আসেনি এ বাড়িতে। উইল পালটাতে হলে সাক্ষী চাই। গুরুদেব সাক্ষী হলে চলবে না। কেবলানন্দ সাক্ষী হলে সেটা খুব জোরদার হবে না। ডাক্তারবাবু যখন আসেন তখন ঠাকুর ব্যাগ হাতে ঘরে থাকে। ফলে উইলটা এখনও পালটানো হয়নি। সাক্ষীর অভাবই তার প্রমাণ। কলকাতা থেকে আসবার সময় নকুলচন্দ্রের কাছ থেকে হেবো আইনের ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিয়েছে। নকুলচন্দ্র নামকরা উকিলের মুহুরি ছিলেন—আইন ভালরকমই জানেন তিনি। আইনঘটিত খিটিমিটিগুলো বুঝে নিয়েছে বলেই হেবো জানে, একটা জোরদার সাক্ষী না রেখে গুরুদেব উইলটা পালটাবার ব্যবস্থা করবেন না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে হেবো তার নোটবই বার করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছকে ফেলল :

নিম্নলিখিত উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব :

১। নতুন উইল যদি সুধাকান্ত না করতে পারেন—

(ক) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের আকস্মিক মৃত্যু—
(তাহলে তাঁকে খুন করতে হয়—অসম্ভব!)

(খ) উইল লেখার আগেই সুধাকান্তের সই করবার ক্ষমতা লোপ—
(তা কেমন করে সম্ভব?)

২। নতুন উইল যদি আইনত সিদ্ধ না হয়—

(ক) যদি সাক্ষী না থাকে—
(গুরুদেবটি খলিফা ব্যক্তি—সাক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করবেনই।)

(খ) সুধাকান্তের সই যদি না মেলে—
(অসম্ভব—যেহেতু তিনি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় সই করছেন।)

(গ) যদি আইনের অন্য কোনো খুঁত থাকে—
(অসম্ভব—সুধাকান্ত আইনজ্ঞ লোক।)

(ঘ) যদি প্রমাণ করা যায় সুধাকান্তের মানসিক স্থৈর্য ছিল না—
(প্রায় অসম্ভব—কারণ তিনি যে পাগল নন তা সুপ্রতিষ্ঠিত।)

৩। নতুন উইল যদি গুরুদেব উপস্থাপিত করতে না পারেন—

(ক) গুরুদেব যদি মারা যান—
(তাহলেও লাভ নেই—গুরুদেবের ওয়ারিশ সম্পত্তি পাবে।)

(খ) উইল যদি হারিয়ে যায়—
(অসম্ভব—গুরুদেব ওটা সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করবেন।)

(গ) উইল যদি চুরি যায়—
(একমাত্র সম্ভাবনা—গুরুদেবের সঙ্গে শার্লক হেবোর বুদ্ধির রণাঙ্গণে দ্বৈরথ সমরের ফলাফলই এর জবাব দিতে পারে।)

*   *   *

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার উপক্রম করছে, হঠাৎ মনে হল কে যেন তার দরজায় টোকা দিচ্ছে। টপ করে খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে হেবো। কে ডাকছে তাকে! সন্তর্পণে দরজা খুলে দেখে অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেবলানন্দ।

—'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

কেবলানন্দ গুরুদেবকে 'বাবা' ডাকে।

—'উনি এখনও ঘুমোননি?'

—'না, এখনও তাঁর সেবা হয়নি।'

সেবা হয়নি? কার সেবা হয়নি? কিসের সেবা হয়নি? হেবো কোনো কথা বলে না। ওর পেছনে-পেছনে চলে আসে শত্রুশিবিরে—গুরুদেবের ঘরে। এতক্ষণে মালুম হয় 'সেবা' জিনিসটা কী। গুরুদেব নৈশ আহারে বসেছেন। কার্পেটের একটা বড় আসন বেমালুম হারিয়ে গিয়েছে তাঁর বিশাল বপুর অন্তরালে। তাঁর সামনে একটা বড় পাথরের থালায় স্তূপাকার করা গব্য ঘিয়ে ভাজা লুচি। পাশে ম্যাগ্নাম-সাইজ একটা জামবাটিতে মাংস—থুড়ি! মহাপ্রসাদ। রুপোর একটি মাঝারি বাটিতে দেড়পো আন্দাজ ঘন ক্ষীর, আর রেকাবিতে খান-আষ্টেক সরপুরিয়া। আরও তিন-চারটে বাটিতে নানান ব্যঞ্জন। এই হচ্ছে বাবাজীর নৈশ 'সেবা'!

হেবো এবার আর ছদ্মভক্তিভরে নয়, সত্যিই ভক্তিভরে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। পঞ্চাশ বছর বয়সে যিনি এই পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করবার সাহস রাখেন তিনি নমস্য বইকি!

গুরুদেব ওকে সামনের আসনে বসতে বললেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। ওঁর 'সেবার' রকম-সকম দেখে এমনিতেই সে ধপ করে বসে পড়েছিল।

মধুর হেসে গুরুদেব বলেন, 'আহারাদি হয়েছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গুরুদেব হেবোর হাতে একটি নির্মাল্য দিয়ে বলেন, 'এই জবাফুলটি সবসময় কাছে কাছে রাখবে। ভয় নেই, ভালভাবেই পাশ করে যাবে তুমি। আর হ্যাঁ, রাত্রে শয়নের পূর্বে এক গ্লাস করে কমলালেবুর সরবত খাবে। রাত জেগে অধ্যয়ন করতে হচ্ছে তো! ওতে পিত্ত প্রকুপিত হতে পারে না।'

হেবো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। চৈত্র মাসে কমলালেবু কোথায় পাবে প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

গুরুদেব বলেন, 'বাবা কেবল, ওকে এক গ্লাস সরবত দাও।'

কেবলানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে যায়। কুঁজো থেকে ঢেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল কাচের গ্লাসে করে হেবোর সামনে রাখে। ব্যাপারটা হেবো বুঝতে পারে না। ওর সে অবাক চাহনি দেখে গুরুদেব হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ওহো, তাইতো, ওটা তো সাদা জল! দাও গ্লাসটা আমাকে।'

গুরুদেব নিজেই গ্লাসটা টেনে নেন। একটা গামছা দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেন। তারপর সেই গামছার ভেতর ডান হাতটা ঢুকিয়ে জলটা স্পর্শ করেন। যেন কিছুই হয়নি। এইভাবে এবার গামছাটা সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'নাও, এবার খাও!'

স্তম্ভিত হয়ে যায় হেবো। ওর সামনে একগ্লাস কমলা রঙের সরবত! কথা ফোটে না ওর মুখে। দু-এক মিনিট কেটে যাবার পর সম্বিৎ ফিরে পায় একটা অট্টহাসি শুনে। শুনতে পায় গুরুদেব বলছেন—'ওরে ও কেবল, আর-একটা খালি গ্লাস দে বাবা। বেচারি ভয় পাচ্ছে। গাঁয়ের ছেলে তো! হাঁসখালি গাঁ ছেড়ে বাইরে আসেনি কখনও বোধহয়।'

যন্ত্রচালিতের মতো কেবলচন্দ্র আর একটা খালি গ্লাস এগিয়ে দেয়। কিছুটা সরবত সে-গ্লাসে ঢেলে নিয়ে গুরুদেব অম্লানবদনে সেটা এক নিশ্বাসে পান করেন। বলেন, 'খেয়ে নাও বাবা বটুক। ওতে বিষ মাখানো নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে হেবো ঢকঢক করে খেয়ে ফেলে। চমৎকার কমলালেবুর সরবত!

ইষ্টদেবকে নিবেদন করে গুরুদেব এবার সেবায় মনোনিবেশ করেন। কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকে হেবো। বোঝে, কঠিন বিচ্ছুর পাল্লায় পড়েছে সে এবার। মন্ত্রশক্তিতে সে এতদিন বিশ্বাস করত না। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসব বিভূতির খেলা দেখাতে পারেন শুনেছিল আগে—কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, এইমাত্র যা দেখল তা সত্যই অলৌকিক ক্ষমতা না সস্তা মাদারির খেল্—ম্যাজিক। কিন্তু গুরুদেব তাকে চিন্তা করবার অবকাশ না দিয়েই বলে ওঠেন : 'তোমার তো সায়েন্স, নয়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তা বলে বাঙলা-ইংরাজি দুটোকে যেন উপেক্ষা কোরো না; জানো তো, ঐ দুটোতেই সায়েন্সের ছেলেরা বেশি ফেল করে। বাঙলায় কেমন নম্বর পেয়েছিল টেস্ট পরীক্ষায়?'

হেবো অম্লানবদনে বলল, 'বাষট্টি।'

লুচি দিয়ে মহাপ্রসাদের ছটাকখানেক ওজনের একটি কণিকা জড়িয়ে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে গুরুদেব বলেন, 'এসে্ কী লিখেছিলে?'

—'এসে্?'

—'হ্যাঁ গো, 'এসে্'—মানে প্রবন্ধ। বাঙলা সেকেন্ড পেপারে প্রবন্ধ থাকে না তোমাদের?'

গুরুদেব কি টিউশানি করেন নাকি? মায় সেকেন্ড পেপার পর্যন্ত জানা আছে তাঁর? সামলে নিয়ে বলে, 'ও এসে্! আমাদের 'এসে্' ছিল '*'তোমার প্রিয় লেখক'*'।

দাঁতের ফাঁক থেকে মহাপ্রসাদের একটা কুচি বার করবার চেষ্টা করতে করতে গুরুদেব বলেন, 'অ। তা কী লিখেছিলে তুমি? কে তোমার প্রিয় লেখক?'

—'আজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখেছিলাম।'

—'আশ্চর্য!'

আশ্চর্য হয় হেবোই। এতে আশ্চর্যের কী আছে রে বাবা? বলেও সে কথা—'কেন, আশ্চর্য মনে হচ্ছে কেন'?

—'আমাকে যদি কেউ ও প্রশ্ন দিত—আর আমি যদি তোমার বয়সী ছেলে হতাম, তাহলে আমি লিখতাম—কনান ডয়েল!'

কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে হেবোর। লোকটা 'থট-রীডিং' জানে নাকি? মানে হেবোর মনের কথাও ও লোকটা বুঝতে পারছে নাকি? না হলে হঠাৎ কনান ডয়েলের নাম আসে কোথা থেকে? একটা উল্টো চাল চালতে হেবো বলে—'কনান ডয়েল কে? কোনো সাহেব?'

মহাপ্রসাদের একটি টেংরি চুষতে চুষতে গুরুদেব বলেন, 'স্যর আর্থার কনান ডয়েল হচ্ছেন শার্লক হোম্‌সের সৃষ্টিকর্তা।'

হেবো এবার স্পিক-টি-নট! কেঁচো খুঁড়তে আবার কোন সাপ বেরুবে কী জানে! দু-চার মিনিট কোনো কথা নেই। হেবো বসে বসে ঘামছে। গুরুদেব নিমীলিত নেত্রে হাড় চুষছেন। হঠাৎ আবার তিনি হাসি-হাসি মুখে বলেন, 'কই তুমি তো বললে না শার্লক হোম্‌স্ কে? তিনি কোনো সাহেব নাকি?'

হেবো এবারও কোনো সাড়াশব্দ করে না।

হঠাৎ চোখদুটি খুলে গুরুদেব বলেন, 'ওহো, তোমার একখানা বই নিয়ে এসেছিলাম। দেখা হয়ে গিয়েছে। ওটা নিয়ে যাও তুমি।—কেবল বাবা—'

আর কিছু বলতে হল না। কেবলানন্দ গুরুদেবের ঝোলা ঝেড়ে একখণ্ড টেস্ট পেপার এনে হেবোর হাতে দেয়। আবার চোখ বুজে লুচি-মাংসের সেবা করতে করতে গুরুদেব বলেন, ''বাবা বটু, ঐ গ্রন্থের পাঁচশো একত্রিশ পৃষ্ঠাটা খোলো তো একবার।'

হেবো দুরুদুরু বক্ষে নির্দেশমতো পৃষ্ঠাটা খোলে। গুরুদেব নিমীলিতচক্ষু অবস্থাতেই বলেন, 'ওটা হাঁসখালি স্কুলের বাঙলার সেকেন্ড পেপার। তাই নয়?'

হেবো জবাব দেয় না।

—'ছয় নম্বর প্রশ্নটা এবার দেখ। মনে কর তুমি এবার হাঁসখালি স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছ। তোমার সামনে তিনটি অলটারনেটিভ 'এসে' আছে—*বাংলার বর্ষাকাল*, *সংবাদপত্র* আর *ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা*। কোনটা লিখবে তুমি?'

খাচ্ছেন গুরুদেব, অথচ গলাটা বুজে গিয়েছে হেবোর। কী বলবে ভেবে পায় না। আবার দু-চার মিনিট আহারপর্ব চালিয়ে ক্ষীরের বাটিটা টেনে নেন গুরুদেব। হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছে সেইভাবে বলে ওঠেন, 'ওহো! কী ভুলো মন দেখ আমার! তোমাকে বলছি—মনে কর তুমি হাঁসখালি স্কুলের ছাত্র! মনে করার কী আছে, তুমি তো সত্যিই তাই। নয়?'

হেবো ভাবছিল একগ্লাস জল পেলে খেত।

—'আচ্ছা থাক। এবার ঘরে যাও তুমি। সামনে পরীক্ষা, রাত জাগা ঠিক নয়।'

হেবো এবার আর প্রণাম করে না। মাথাটা নিচু করে টেস্ট পেপারখানা বগলদাবা করে রওনা দেয়। দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েছে, পিছন থেকে গুরুদেব ডাকেন—'বাবা হেবো!'

—'আজ্ঞে?'—ঘুরে দাঁড়ায় হেবো।

এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে সে। কিন্তু উপায় নেই, ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে যখন তখন আর কী করা যায়! তবু যতদূর সম্ভব ম্যানেজ করে নেবার চেষ্টায় বলে, 'আমাকে হেবো বলে ডাকলেন যে? আমার নাম বটু।'

'—ওহো! তাই তো! আমার ভারি ভুলো মন। হেবো তো তোমার নাম নয়, শার্লক হোম্‌সের কথা ভাবতে ভাবতে আমি হেবোর কথা ভেবে ফেলেছি! তুমি তো বটুক,—হেবো হবে কেন? তুমি তো হাঁসখালি স্কুলের পাতিহাঁসের মতো লক্ষ্মী ছেলে—আর হেবোটা হচ্ছে একটা হাড়-বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!'

কানদুটো লাল হয়ে ওঠে হেবোর। উপায় নেই। এ অপমান তাকে সহ্য করে যেতে হবে। আজ সে হেবো নয়, সে বটুকনাথ বটব্যাল। মনে মনে ভাবে, শিশুপালের শত গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে। সেও করবে। তারপর শিশুপাল-বধের সময় হবে এর কড়ায়-গণ্ডায় শোধ। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আর কিছু বলবেন?'

—'হ্যাঁ বাবা ব্যাটবল, বলব। তুমি প্রবীরকে চেন? প্রবীর মুখুজ্জে?'

ধরা যখন পড়ে গিয়েছে তখন আর তাস লুকিয়ে লাভ নেই। সম্মুখ রণক্ষেত্রেই শিশুপাল-বধ করতে হবে তাকে। আর আত্মগোপন নিরর্থক। বললে, 'হ্যাঁ চিনি। কিন্তু কেন বলুন তো?'

—'পবুকে বোলো, মহাভারতের অভিমন্যু-বধ অধ্যায়টা পড়তে। বোলো আমি বলেছি—মহারথীতে মহারথীতে যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে অভিমন্যুর মতো চ্যাংড়াকে বলি দিতে পাঠাতে নেই। বড় করুণ ঐ অভিমন্যুর চ্যাপটা হয়ে যাবার চ্যাপটারটা! নয়?'

আর সহ্য করতে পারে না হেবো। সে তো আর শ্রীকৃষ্ণ নয়! ভীমসেনও পারেনি কীচককে ক্ষমা করতে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বধ করে ফেলেছিল কীচককে। বললে, 'আপনার বাবা বেঁচে আছেন?'

সরপুরিয়া চেবানো বন্ধ হয়ে যায় গুরুদেবের, চোখদুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'আছেন, কিন্তু কেন হে ছোকরা? সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন?'

—'না, তাই বলছিলাম। তাঁর জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার।'

চর্বণকার্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে গুরুদেবের।

হেবো দাঁতে দাঁতে চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'দেখুন আপনি বিচার করে। রথী-মহারথীর মধ্যে লড়াই হচ্ছিল—অভিমন্যু বয়সে ছোট, তবু ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সে। লড়াইয়ে সেও প্রাণ দিল, তাতে দুঃখ নেই। মরল বেটা জয়দ্রথও। তারও রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু ও চ্যাপটারের সবচেয়ে করুণ অধ্যায় কী জানেন? খামোখা ঐ পাষণ্ড জয়দ্রথের বাপ বেচারির মুণ্ডু গেল উড়ে।'

বলেই অ্যাবাউট টার্ন!

এবং তৎক্ষণাৎ ফরোয়ার্ড মার্চ!

যতটা কঠিন মনে হয়েছিল সমস্যাটা তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি কঠিন। কঠিন এবং জটিল। গুরুদেব লোকটি পাক্কা খলিফা! খলিফার চেয়েও বড়, একটি ধড়িবাজ ঘড়িয়াল! হেবোর নাড়ী-নক্ষত্র বেটা জেনে ফেলেছে। হয়ত প্রবীরকাকুর পেছনে ওর গুপ্তচর ঘুরছে। হয়ত লোকটা একটা পাক্কা আঁধারের কারবারী। এত দুঃখেও একটু গর্ববোধ না করে পারল না হেবো। তাহলে অন্ধকার মহলের কারবারীরাও শার্লক হেবোকে চিনতে শুরু করেছে!

কিন্তু উপস্থিত সমস্যাটার কী করা যায়? আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার আগে হেবো তার নোটবইতে চতুর্থ সম্ভাবনার কথাটাও লিখে রাখল :

(৪) নতুন উইল করবার আগেই যদি সুধাকান্তের চেতনা ফেরে :
 (ক) যদি গুরুদেব-বাবাজির স্বরূপটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় (কঠিন কাজ!)
 (খ) যদি মঞ্জুলা দেবী আর তাঁর সন্তানকে তিনি ভালবেসে ফেলেন।
 (বাবাজি বেঁচে থাকতে?)

* * *

পরদিন সকালে হেবো লক্ষ করল একটা সিল্কের চাদর কাঁধের ওপর ফেলে নাটের গুরু তাঁর ঝোলা ও লাঠি নিয়ে কোথায় চলেছেন হুড়মুড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ চটিটা পায়ে গলিয়ে হেবোও নেমে আসে ওপর থেকে। গুরুদেব গেট খুলে বাইরে এসে একটা রিকশা ভাড়া করে কোথায় যেন রওনা হয়ে পড়লেন। হেবো স্থির করল—ওঁকে অনুসরণ করতে হবে। কোথায় যাচ্ছে লোকটা? উদ্দেশ্য কী? দ্বিতীয় একটা রিকশাকে ইঙ্গিত করামাত্র দাড়িওয়ালা একজন রিকশাওয়ালা এগিয়ে এল।

—'কোথায় যাবেন বাবু'?

রিকশায় উঠে বসে হেবো বললে, 'ঐ রিকশাটার পিছু-পিছু চল।'

রিকশাওলা ওকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয়। আগের রিকশাখানা প্রায় পঞ্চাশ ফুট সামনে চলেছে। গুরুদেব ওকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেননি। কোথায় চলেছেন উনি? গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েই সোজা উত্তরমুখো বাঁক নিল। হেবোর রিকশাখানা কিন্তু বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

হেবো ব্যস্ত হয়ে বলে, 'একি? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

মুখটা না ফিরিয়েই রিকশাওলা বলে, 'এখানে নেমে ফিরে যাও। আমিই ফলো করছি ওকে।'

হেবো অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য! ঐ একমুখ দাড়িওয়ালা রিকশাচালককে সে পর্যন্ত চিনতে পারেনি! হেবো নেমে পড়ে সেখানেই। উত্তরমুখো ঘুরে প্রবীরচন্দ্রের রিকশাখানা দ্রুতগতি এগিয়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে।

সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি হেবো হাজিরা দিল প্রবীরচন্দ্রের বোর্ডিংএ। শুনল গুরুদেব সকালবেলা গিয়েছিলেন পোস্ট অফিসে। একখানি টেলিগ্রাফ করেছেন তিনি। প্রবীরচন্দ্র অনেক কায়দা করে জেনে এসেছেন, সেখানি গিয়েছে কলকাতার একটি সলিসিটর ফার্মের নামে। মিস্টার জি. এন. দে অ্যাডভোকেটকে গুরুদেব আগামী শুক্রবার আসতে অনুরোধ করেছেন।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'বুধবার অর্থাৎ পরশুদিনের মধ্যেই আমাদের যা হয় করতে হবে। দে-সাহেব হচ্ছেন ওঁর আশ্রমের অ্যাটর্নি। উইলে সাক্ষী থাকতে আসছেন তিনি।'

হেবো বলে, 'কলকাতায় গিয়ে যদি দে-সাহেবকে সব কথা খুলে বলা যায়?'

'তাহলেও লাভ নেই। তিনি ওঁর অ্যাটর্নি—ওঁরই স্বার্থ দেখবেন। তাছাড়া কাজটা বেআইনি তো হচ্ছে না কিছু। সুধাকান্তবাবুর স্বাধীন ইচ্ছায় তুমি-আমি বাধা দেবার কে?'

—'তাহলে?'

—'তাই তো ভাবছি। আর তো সময় নেই। কী করা যায়?'

হেবো ফিরে আসে তার ঘরে। একবার চেষ্টা করে সুধাকান্তের সঙ্গে দেখা করবার, চতুর্থ সম্ভাবনার সূত্রটা টিকবে কিনা পরীক্ষা করতে; কিন্তু কেবলানন্দ দরজায় পাহারা বসে আছে। ভেতরে ঢুকতেই দিল না সে।

ডাক্তার নবীনচন্দ্র এ শহরের নামকরা ডাক্তার। সুধাকান্তের পরিবারের সব কথাই জানেন। শেষ পর্যন্ত হেবো তাঁরই শরণাপন্ন হল। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের শেষ রুগীটি বিদায় নিলে এগিয়ে এল হেবো। বলল তার কথা, মানে সুধাকান্তবাবুর উইলের কথা। শুনে ডাক্তারবাবু বলেন, 'কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারছি না!'

হেবো নিজের প্রকৃত পরিচয়ই দিল, অর্থাৎ মঞ্জুলা দেবী ওর কাকিমার ছোট বোন।

ডাক্তারবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'সবই তো জানি বাবা; কিন্তু আমি কী করতে পারি? জেনে-শুনে বিষ তো আর খাওয়াতে পারি না!'

তা ঠিক। ফিরে আসে হেবো।

সারা রাত ঘুম হল না বেচারির। হেরে যাবে সে? অমন একটা ধড়িবাজ বদমায়েসের খপ্পর থেকে একটি বিধবা আর তাঁর নাবালক ছেলেকে রক্ষা করতে পারবে না? লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, সম্ভবত মন্ত্র-তন্ত্রও জানে। সুধাকান্তকে হয়ত সে সম্মোহিত করে ফেলেছে। রক্তচোষা বাদুড় যেমন দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে শিকারকে শেষ করে দেয়—এই পরিবারটিকে গুরুদেব তেমনি সস্নেহে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছেন। শেষ বিন্দু রক্তটি নিঃশেষ হবার আগে তিনি নড়ছেন না।

সারারাত ছটফট করতে করতে ভোররাত্রের দিকে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষীণ আভাস এল ওর মাথায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল ওর। গত বছর দোলের দিনের কথা। চট করে উঠে বসে হেবো। আলোটা জ্বালে। দোল কী মাসে হয়? ফাল্গুন; অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল। নোটবইটা খোলে—হ্যাঁ, নোটবইতে টোকা আছে ঘটনাটা। এই তো একটা নতুন সম্ভাবনার সূত্র পাওয়া গিয়েছে! গিয়েছে কি? খুব কঠিন কাজ। ভাগ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কিন্তু ভাগ্য তো তাদেরই সহায়তা করে যারা পুরুষকারকে কাজে লাগায়!

অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকে। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে কার্যক্রমের সোপানগুলি সাজিয়ে নেয় মনে মনে। প্রথম কাজ কী? কী কী বাধাবিঘ্ন দেখা দিতে পারে? কী কী তার সমাধান? তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কোন কোন বিপত্তি আসতে পারে?

হঠাৎ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। সকাল হয়ে এসেছে। ভোরবেলা একটা লোকাল ট্রেন আছে—কলকাতা যাওয়ার। ঐ ট্রেনেই যেতে হবে তাকে। প্রবীরচন্দ্রকে খবর দেওয়ার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। তারও আর পাহারা দেওয়ার কোনো দরকার নেই। শুক্রবারের আগে যখন উইল লেখা হবে না তখন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে কী হবে?

ভোরের ট্রেনেই হেবো ফিরে এল কলকাতায়। এল ওদের বাড়িতে। বাবা-মা এখনও ফিরে আসেননি, বাঁচা গেল। কাকাও বাড়ি নেই—কোথায় যেন বেরিয়েছেন। কাকিমা ওকে দেখে বললেন, 'কী হল রে হেবো, খবর কী?'

—'শিগ্‌গির আমাকে কিছু টাকা দাও দেখি!'

—'টাকা? কত টাকা? কী করবি?'

—'কী করব তার ফিরিস্তি শুনে কী হবে? কিন্তু তুমি কি ভেবেছিলে এ কাজ একেবারে ফোকট্‌সে হয়ে যাবে? আমার প্রফেশনাল ফিজ তো আমি দাবিই করছি না। প্রথমত, এখনও আমি প্রফেশনাল

নই, দ্বিতীয়ত, এটা ঘরোয়া কাজ। তোমার কাছে আবার ফি নেব কী? তবু হাত-খরচা তো আছে।'

—'কত টাকা লাগবে বল?'

—'আপাতত গোটা-পঞ্চাশ ছাড়।'

—'মঞ্জুলা কেমন আছে?'

—'ও সব খেজুরে আলাপ পরে হবে কাকিমা। তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও! শিশুপাল-বধ যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে।'

—'শিশুপাল বধ যজ্ঞ! কী সব বলছিস তুই!'

—'আচ্ছা না হয় কীচক-বধ পালাই হল। দাও টাকাটা।'

—'তোর একটা কথাও বুঝি না বাপু! আসল কথা বল। তায়ইমশাইকে বোঝাতে পারলি?'

—'তায়ইমশাই মানে ঐ বুড়োটা তো? ওর ভীমরতি সারবার নয়! বাহাত্তুরে ধরেছে আর কি।'

—'তাহলে?'

—'পারি না আর বকবক করতে!'

—'বেশ, নে বাপু!'

রাগ করেই টাকা কটা বার করে দেন কাকিমা। আর সেটা পকেটস্থ করেই বেরিয়ে যায় হেবো। চুনোপুঁটি তো নয়, ঘাই-মারা রাঘব-বোয়াল সে ছিপে গেঁথে তুলতে চায়। সুতোর জোর থাকা চাই; টোপটা শুধু লোভনীয় নয়, নিখুঁতও হওয়া চাই। একটু সন্দেহ হলেই রাঘব-বোয়াল টোপ ঠুকরে ফিরে যাবে—কপাৎ করে গিলবে না।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসে হেবো সেই রাত্রেই।

পরদিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ডাক্তারবাবু যখন সুধাকান্তকে দেখতে এলেন তখন গুরুদেব বাড়ি ছিলেন না। হেবো গুটিগুটি ঢুকল ঐ ঘরে। সুধাকান্ত বেশ সুস্থই আছেন। উঠে বসেছেন তিনি। হেবো তাঁর বালিশটা ঠিক করে দেবার অছিলায় দেখে নিল, বালিশের নিচে লোহার সিন্দুকের চাবির থোকাটা আছে। আর আছে একটা খাম, মুখটা ছেঁড়া। দেখেই বুঝতে পারে, এর গর্ভেই ছিল আগেকার উইলটা। তার মানে, আগেকার উইলটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বলেন, 'ব্লাড-প্রেশার দেখার যন্ত্রটা নিচে আমার গাড়িতে আছে। নিয়ে এস তো!'

হেবো শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গি করে জানলার দিকে সরে যায়। জানলার পাশেই সুধাকান্তের লেখবার টেবিল। কিছু ফাইলপত্র, কাগজচাপা, বই, কলমদানিতে কলম, ব্লটার ইত্যাদি সাজানো। হেবো সরে যায় টেবিলের দিকে।

হেবো শুনতে পায়নি মনে করে কেবলানন্দই নিচে নেমে যায় রক্তচাপ মাপবার যন্ত্রটা আনতে। মিনিট আড়াই-তিন লাগবে ওর ফিরে আসতে, এর মধ্যেই হেবোকে হাতসাফাই করতে হবে; কিন্তু সুধাকান্ত জেগে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুও এদিকে ফিরে বসে আছেন। তবু শেষ চেষ্টা করবে হেবো।

হ্যাঁ, তিন মিনিটের মধ্যেই কেবলানন্দ ফিরে এল বাক্সটা নিয়ে। পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

সুধাকান্ত বলেন, 'কী হে ডাক্তার; অত গোমড়া মুখ করলে কেন? সময় কি একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে?'

—'না না, তা কেন? তবে প্রেশারটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে। রাত্রে ঘুম হয়েছিল?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুধাকান্ত বলেন, 'আর চব্বিশ ঘন্টা টিকব তো?'

—'সে কি কথা? অনেক দিন বাঁচবেন এখনও!'

—'বাজে কথা বোলো না ডাক্তার। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবই বুঝছি আমি। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির একটা বিলিব্যবস্থা না করে যেতে পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না। আগামীকাল আমি উইল করব স্থির করেছি। তাই বলছি, আজ রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না তো?'

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন এই প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিটির কাছে গোপন করার কিছু নেই। বলেন, 'না, সে-রকম কিছু ভয় করার নেই।'

—'তাহলেই হল। বেশ, কাল তাহলে এই সময় এসে আমার উইলে সাক্ষী হিসেবে একটা সই দিয়ে

যেও। আমি যে সুস্থ মনে এ উইল করেছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। ডাক্তারের সইটা থাকা ভাল।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আসব।'

হেবো ইতিপূর্বেই তার নোটবইতে ২(ক) সূত্রটা কেটে দিয়েছিল গুরুদেব টেলিগ্রাম করেছেন শুনে। এখন মনে মনে ২(খ) সূত্রটাও কেটে দিল। একে একে সব সম্ভাবনাগুলিই নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নেন।

হেবো ঠাকুর-দেবতাকে বড় বেশি ডাকে না। পরীক্ষার ঠিক আগে তাঁদের মনে পড়ে বটে—কিন্তু বছরের আর বাকি কটা দিন তাঁদের কথা বিশেষ মনে থাকে না। আজকের দিনটা কিন্তু ব্যতিক্রম। ডাক্তারবাবু চলে যেতেই সে ছুটে চলে আসে তার ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মনে মনে বলে, 'হে মা কালী! তুমিই বল, আমি কি কিছু অন্যায় করছি? আমি নিত্য ডাকাডাকি করে তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাই না—আর ঐ গুরুদেব রোজ সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে পাঁঠার মাংস খাওয়াতে চায়। কিন্তু তাই বলেই কি তুমি ও-দলে যোগ দেবে? যে টোপ পেতে এলাম, ঐ রাঘব-বোয়াল যেন সেটা গিলে ফেলে—এটুকুই তুমি কোরো মা! বাকি খেলিয়ে তোলার দায়িত্ব আমার। আর ওকে দিয়ে যদি টোপটা তুমি না গেলাও, তবে বলব তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে, তুমি মিথ্যে!'

* * *

শুক্রবার সকালে হেবোর ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামেচিতে। কাল রাত্রে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিল। কী আশ্চর্য! স্বয়ং শার্লক হেবো যে বাড়িতে উপস্থিত সে বাড়িতে চোর? অথচ হেবো রাত্রে কিছু টেরই পায়নি? সকালবেলা কেবলানন্দ প্রথম লক্ষ করে, সিঁড়ির দরজাটা খোলা। গুরুদেব ঘরের দরজা খুলে শোন দক্ষিণা বাতাসের লোভে। হেবোও দরজা খুলে শোয়। সুধাকান্তের ঘর অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। সে ঘরে মেঝেতে শোয় কেবলানন্দ। পরীক্ষা করে দেখা গেল চোর একতলা থেকে কিছুই সরায়নি, দোতলার দুটি ঘর থেকেই মাল সরিয়েছে। হেবোর সুটকেস নেই, গুরুদেবের ঝোলাটিও নেই। গুরুদেব দারোয়ানকে ডেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন। সে হলপ করে বলল—বাইরের থেকে চোর আসেনি, কারণ সে জেগেই ছিল। কিন্তু বাইরের লোক ছাড়া আর কে চুরি করতে পারে? পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা স্থির করার আগেই ঠাকুর এসে খবর দিল, বাগানের ভেতর ভাঙা স্যুটকেস ও ঝোলা পাওয়া গিয়েছে। আবার নতুন করে হিসাব নেওয়া গেল। না, বেশি কিছু খোয়া যায়নি। হেবোর গিয়েছে একটি টেরিলিনের শার্ট আর গোটা-কুড়ি টাকা। গুরুদেবের ঝুলির সব কিছুই প্রায় পাওয়া গিয়েছে। দামী কিছুই ছিল না ওতে। দুটো জিনিস একটু দামী ছিল—দুটোই বেহাত হয়েছে। একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা শেফার্স কলম।

হেবো থানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু গুরুদেব বাধা দিলেন। বললেন, 'যা গিয়েছে তা তো পাওয়া যাবেই না, উপরন্তু ঠাকুরটাকে ধরে নিয়ে যাবে ওরা। আজ কলকাতা থেকে বিশিষ্ট অতিথি আসছেন—ঠাকুর না থাকলে মহা মুশকিল।'

মঞ্জুলা দেবীও সায় দিলেন সে কথায়।

হেবো জনান্তিকে মঞ্জুলা দেবীকে বলে, 'আসল কথা গুরুদেবের ভয় হয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। পুলিশের খাতায় হয়ত তাঁর নাম আছে, হয়ত তাঁকেই হাজতে পুরবে পুলিশ!'

মঞ্জুলাদেবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হেবোর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাই কি কাল রাত্রে চোর এসেছিল?'

হেবো বলে, 'তার মানে?'

—'তার মানে, তোমার কোনো কারসাজি নয় তো?'

হেবো বলে, 'কী যে বলেন! আমারও তো জিনিস খোয়া গিয়েছে।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দেওয়া হল না।

বেলা বাড়ল। বেলা দশটা নাগাদ এসে পৌঁছলেন অ্যাডভোকেট জি. এন. দে। সসম্মানে তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলেন গুরুদেব। চা-জলখাবারের পর্ব মিটলে বুলডগটাকে দরজার বাইরে বসিয়ে ওঁরা অর্গলবদ্ধ ঘরে পরামর্শে বসলেন। হেবো নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগালো। মাঝের

দরজার চাবির ফুটোতে চোখ লাগিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। কান লাগিয়ে বরং দু-একটা কাটা-কাটা কথা শোনা গেল। অ্যাডভোকেট-সাহেব বলছেন, 'এবার ড্রাফ্‌ট্‌খানা নিঁখুত হয়েছে; আমি ফেয়ার কপি করে ফেলি।'

সুধাকান্ত বাধা দিয়ে বলেন, 'না, ফেয়ার কপিটা আমি নিজে হাতে লিখব। আজ বেশ সুস্থ আছি আমি।'

গুরুদেব বললেন, 'কিন্তু তাতে কি কষ্ট হবে না তোমার?'

সুধাকান্তের হাসিটা চোখে না দেখতে পেলেও অনুভব করে হেবো। তিনি হেসে বলেন, 'কষ্ট হলেও উপায় নেই। আইনের খুঁত আমি রাখব না। অদ্যোপান্ত হাতের লেখাটা আমার হলে আইনগত তার মর্যাদা বাড়বে—না কি বলেন দে-সাহেব?'

দে-সাহেবের জবাবটা শোনা গেল না; কিন্তু সুধাকান্তের পরবর্তী বক্তব্যটা শোনা যায়—'দয়া করে আমার ঐ কলমটা দেবেন? নিজের কলম ছাড়া লিখতে পারি না আমি।'

প্রায় মিনিট পনের পরে নিচে গেটের সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল। কেবলানন্দ হন্তদন্ত হয়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। বন্ধ ঘরে টোকা দিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

হেবোও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখে নকুলচন্দ্র আর ডাক্তারবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছেন। ওঁদের পেছনে পেছনে ঢুকে পড়ে রোগীর ঘরে। রোগী আজ বেশ প্রফুল্ল। বলেন, 'ডাক্তার আমাকে আজ বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ দিকি।'

—'কেন? হঠাৎ আজ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে কেন?'

—'আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আছি কিনা, দেখে বল।'

—'ও! উইলটা করেছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ, একটা সইও দিতে হবে তোমাকে। নকুল, তুমিও দেবে।'

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করেন। তারপর কোনো কথা না বলে উইলখানা টেনে নেন। সমস্তটা ধৈর্য ধরে পড়ে কাগজখানা ফিরিয়ে দেন সুধাকান্তবাবুকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে আপনি মাপ করবেন সুধাকান্তবাবু, আমি এ উইলে সাক্ষী থাকতে পারব না। এ অনুরোধ করবেন না আপনি।'

একটু রুক্ষ স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কেন? কারণ কী?'

—'আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ আপনি অত্যন্ত অন্যায় করছেন।'

রুক্ষতর স্বরে সুধাকান্ত বলেন, 'কিন্তু সে বিচারের ভার তো তোমার ওপর নেই ডাক্তার! তুমি ভিজিট নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছ। আমি যে স্বাভাবিক অবস্থায় আছি তার সার্টিফিকেট আমি আইনত দাবি করতে পারি।'

—'না, পারেন না; কারণ আজকের ভিজিট আমি নেব না।'

বাক্স গুছিয়ে উঠে পড়ার উপক্রম করেন ডাক্তারবাবু।

হেবো মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে ছুটে যায় নিচে। মঞ্জুলা দেবীকে খুঁজে বের করে তাঁর হাতদুটি চেপে ধরে—'সর্বনাশ হয়েছে কাকিমা, একটা কাজ করতেই হবে আপনাকে! যেমন করে হোক!'

—'কী হয়েছে? অমন করছ কেন তুমি?'

—'ডাক্তারবাবু উইলে সাক্ষী হতে অস্বীকার করেছেন। যেমন করে পারেন তাঁকে রাজি করান!'

কেন, কী বৃত্তান্ত কিছুই প্রশ্ন করেন না মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'বেশ সেই ব্যবস্থাই করছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন ডাক্তারবাবু গটগট করে নেমে আসছেন দোতলা থেকে। মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে এগিয়ে আসেন মঞ্জুলা দেবী। বলেন, 'একটা কথা ছিল ডাক্তারবাবু।'

—'বল মা।'

—'আপনি আপত্তি করবেন না। উইলে আপনি সই দিয়ে আসুন।'

ভ্রূ-দুটি কুঁচকে ওঠে ডাক্তারবাবুর, বলেন, 'কিন্তু কেন বল তো মা? উইল তুমি দেখেছ?'

মঞ্জুলা বলেন, 'না, দেখিনি। তবে আন্দাজ করতে পারি। আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই তো?'

—'হ্যাঁ, তাই। এতে আমাকে সই দিতে বলছ কেন?'

হেবো ভাবে, এইবার মঞ্জুলা দেবীর আর কোনো জবাব নেই। বস্তুত তার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি-ওয়ালা ছেলের মাথাতেও কোনো ফন্দি বার হল না। কিন্তু হেবো জানত না যে, যারা নিছক সরল ও সহজ তারা অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে যেতে পারে তাদের সারল্যের জন্যেই। যে জবাব হেবোর মুখে জোগায়নি, মঞ্জুলার মুখে তাই জোগাল, আর, সেটা কোনো ফন্দি নয়। তাঁর আন্তরিক কৈফিয়তই।

মঞ্জুলা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি সই না দিলে অন্য কোনো ডাক্তারে তা দেবে। শহরে ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু যতক্ষণ ঐ উইল-পর্ব শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ওঁরা আমাকে বাবার কাছে যেতেই দেবেন না। শেষ সময়ে ওঁর কোনো সেবা-যত্নই হচ্ছে না। খোকার বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গে থেকেও এজন্য শান্তি পাচ্ছেন না। সম্পত্তি আমি এমনিও পাব না, অমনিও নয়—অন্তত শ্বশুরের শেষ সময়ে সেবা করার অধিকারটুকু আপনি আমাকে দিয়ে যান, ডাক্তারবাবু!'

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তারবাবু বলেন, 'তোমার এ কথায় ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি মা! এমন মেয়েরও সর্বনাশ করেন তিনি? কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। ও সম্পত্তি তুমি অমনিতেও পাবে না। নির্মলকে আমিও স্নেহ করতাম। তার আত্মাকে তৃপ্তি দাও তুমি। আমি সই দিয়ে আসছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!'

সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে যান তিনি।

হেবো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। নকুলচন্দ্রও সই দিলেন, সেটা পরে জানতে পেরেছিল হেবো।

সব খবর শুনে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন প্রবীরচন্দ্র। হেবো বললে, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। ঐ উইল নির্ঘাত চুরি যাবে। ফাঁদ পেতে এসেছি আমি।'

প্রবীরচন্দ্র ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না।

* * *

পরদিন। শনিবার সকাল। গতরাত্রের শেষ দিকে সুধাকান্তর আবার একটা আক্রমণ হয়েছে। যেন উইলটাতে সই করার জন্যেই তিনি মনের জোরে সুস্থ ছিলেন এতদিন। উইল সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে মানসিক অবসাদ, অমনি শয্যা নিলেন তিনি। শেষরাত্রে আক্রমণটা হয়েছে, অথচ বাড়ির কেউ জানতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? ওঁর ঘরে থাকে কেবলানন্দ। আর কারো সে ঘরে ঢোকা মানা। কেবলানন্দ রাত-ভোর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে, সকালে সে উঠে জানতে পেরেছে। তাই সাত-সকালেই সোরগোল পড়েছে বাড়িতে। মঞ্জুলা দেবী খবর পেয়ে ছুটে এলেন ওপরে। রোগীর ঘর খোলাই ছিল। সুধাকান্ত অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। মঞ্জুলা আর হেবো ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব গর্জন করে ওঠেন, 'আবার তুমি এসেছ ওপরের ঘরে? কতদিন না বারণ করেছি। বলেছি না, এ ঘরে আসবে না'?

হঠাৎ কী হল মঞ্জুলার! কোথা থেকে দুর্জয় সাহস এল ওঁর মনে। দৃপ্তভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুধু বললেন, 'বেরিয়ে যান বলছি!'

একেবারে থতমত খেয়ে যান গুরুদেব। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমতা-আমতা করে বলেন, 'কী, এত বড় সাহস!'

মঞ্জুলা হেবোকে বলেন, 'দারোয়ান আর গঙ্গারামকে ডাক তো হেবো, এ দুটো লোককে রোগীর ঘর থেকে বার করে দিতে হবে!'

কাঁপতে কাঁপতে খাট থেকে উঠে দাঁড়ান গুরুদেব। কী করবেন, কী বলবেন স্থির করে উঠতে পারেন না। কেবলানন্দ বাঘের মতো থাবা গেড়ে বসে আছে—যেন আদেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মঞ্জুলা এগিয়ে যান সুধাকান্তের মাথার কাছে। বালিশের তলা থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেন গুরুদেবের দিকে, বলেন, 'এর জন্যেই প্রাণটা পড়ে আছে তো এ-ঘরে? যান, ওটা নিয়ে চলে যান! বাবার মৃত্যু হলে তখন সম্পত্তির দখল নিতে আসবেন। কিন্তু তার আগে ফের যদি এ ঘরে পা বাড়ান, দারোয়ান দিয়ে আপনার ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি! যান বলছি।'

অবাক কাণ্ড! অমন প্রবল-প্রতাপান্বিত গুরুদেব যেন একেবারে কেঁচোটি হয়ে গিয়েছেন। চাবির গোছাটি তুলে নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে যান ঘর থেকে। পোষ-মানা কাবলি বেড়ালের মতো কেবলানন্দ যায় তাঁর পিছু-পিছু।

হেবো এগিয়ে এসে মঞ্জুলা দেবীকে প্রণাম করে।

—'কী হল রে? হঠাৎ প্রণাম কিসের?'

—'সে আমি বোঝাতে পারব না!'

—'শোন। এক কাজ কর। ডাক্তারবাবুকে খবর দে।'

কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েও কিছু লাভ হল না।

ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন যে আর বড় জোর দু-দিন। এ দু-দিন মঞ্জুলা প্রাণ ঢেলে শ্বশুরের সেবা করলেন। দুর্ভাগ্য সুধাকান্তের। পুত্রবধূর সেবা যে তিনি পেলেন, তা জানতেও পারলেন না। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে মঞ্জুলা একবারও বার হলেন না ঘর ছেড়ে।

গুরুদেবেরও কী হল, এ ঘরে একবারও মাথা গলালেন না। পরের দিন কাউকে কিছু না বলে গুরুদেব কোথায় চলে গেলেন তাঁর ঝোলাঝুলি নিয়ে। কেবলানন্দ রয়ে গেল।

হেবো বললে, 'কাকিমা, এবার একবার শেষ চেষ্টা করতে হয়। ওঁর ঘরটা একবার খুঁজে দেখতে চাই, চাবিটা পাওয়া যায় কিনা। উইলটা নিশ্চয় ঐ সিন্দুকেই আছে।'

মঞ্জুলা বলেন, 'ওসব থাক হেবো। একটা মরণাপন্ন মানুষের শিয়র থেকে তাঁর উইল চুরি করতে পারব না আমি।'

—'আরে, আপনাকে চুরি করতে কে বলছে? যা করবার তা আমিই করব।'

—'না! তাঁর শেষ ইচ্ছায় বাধা দেবার কোনো অধিকার ধর্মত আমার নেই।'

হেবো ধমকে ওঠে, 'থামুন তো আপনি! এই যদি ধর্ম হয়, তবে অধর্ম বলে দুনিয়ায় কিছু নেই! আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু কেবলানন্দকে ঘন্টাকয়েকের জন্য এখান থেকে সরিয়ে দিন।'

—'তা কেমন করে সরাব আমি?'

—'ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলুন আনন্দময়ীতলায় আপনার শ্বশুরের নামে পুজো দিয়ে আসতে।'

—'আনন্দময়ীতলাটা আবার কোথায়?'

—'বড় জাগ্রত কালী এখানকার। কেবলানন্দ জানে। মায়ের নামে পুজো দেওয়ার কথায় বেটা না বলতে পারবে না। রিকশা করে গেলেও ঘন্টাদুয়েক সময় পাওয়া যাবে।'

উইল চুরি করার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ না থাকলেও আনন্দময়ী মায়ের নামে পুজো পাঠানোতে মঞ্জুলার আগ্রহ ছিল। কেবলানন্দকে সহজেই সরানো গেল।

তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেল হেবো। গুরুদেবের ঘরের প্রত্যেকটি স্থান, প্রত্যেকটি কোনা তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। বাবাজির একটা ঝোলা আছে, একটি টিনের সুটকেস আছে। তালাবন্ধ নয়। খোলাই। তাড়াতাড়ি করে খুঁজে দেখল হেবো। কা কস্য পরিবেদনা। চাবির থোকা কোথাও নেই।

মঞ্জুলা দেবী এসে বলেন, 'কী পাগল ছেলে তুমি হেবো! গুরুদেব কখনো চাবিটা এ বাড়িতে রেখে যান? সঙ্গে নিয়েই গিয়েছেন তিনি।'

হেবো গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, কাকিমা। গোয়েন্দাগিরি যদি একটুও শিখে থাকি তবে নিশ্চিত জানি সেটা তিনি নিয়ে যাননি। এ বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।'

মঞ্জুলা বলেন, 'অসম্ভব!'

—'অসম্ভবই মনে হচ্ছে আপনার! তা-ই হওয়ার কথা; কিন্তু আমার এ সিদ্ধান্ত সুযুক্তির বিশ্লেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। চাবি আমি খুঁজে পাবই।'

হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন মঞ্জুলা। গুরুদেবের ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবির থোকা পাওয়া গেল না। হেবো একটু অবাক হল। এমন তো হওয়ার কথা নয়! তার কি হিসাবে ভুল হল কোথাও? তা হওয়ার কথা নয়! গুরুদেব তো চাবি নিয়ে যেতে পারেন না। তবে কি তিনি আরও কঠিন কোনো চাল চেলেছেন?

ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে আসে হেবো। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, উনি চাবিটা হেবোর ঘরেই রেখে গিয়েছেন? একবারে বাঘের ঘরে যদি ঘোগের বাসা হয়ে থাকে? যদি উনি ভেবে থাকেন হেবো সারা বাড়ি খুঁজবে, কিন্তু নিজের ঘরটা খুঁজবে না?

কী আশ্চর্য! যা ভেবেছে তাই। হেবোর ঘরের ভেতর থেকেই উদ্ধার করা গেল চাবির থোকাটা। ওপরের একটা কুলুঙ্গিতে পুরনো বইয়ের পেছনে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপির ভেতর থেকে বার হল সেটা। কী ধড়িবাজ লোক! একনম্বরের ঘড়েল! কোনো সুযোগে হেবোর অলক্ষিতে তারই ঘরে চাবিটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছে!

তৎক্ষণাৎ সুধাকান্তের ঘরে চলে আসে হেবো। কেবলানন্দের ফিরতে এখনো দেরি আছে। মঞ্জুলা দেবী রোগীর জন্য পথ্য তৈরি করতে নিচে গিয়েছেন। ঘরে আর কেউ নেই। সুধাকান্ত অচৈতন্য। দরজাটা বন্ধ করে দেয় প্রথমে। দ্রুতগতি লোহার সিন্দুকটা খুলে ফেলে হেবো। হ্যাঁ, সামনেই রয়েছে সীলমোহরাঙ্কিত খামটা। সেটা বের করে হেবো আবার সিন্দুকটা বন্ধ করে! খামটা পকেটে ফেলে আবার চাবিটা রেখে আসে সেই ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। আর কালবিলম্ব না করে হেবো তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। এবার কাকা-কাকিমার হাতে উইলটা জমা দিতে হবে। বাবা-মা হয়ত মধুপুর থেকে ফিরে এসেছেন। সোমবার থেকে স্কুলও খুলবে। আর দেরি করা উচিত নয়। কাজ যখন হাসিল হয়ে গেল তখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

* * *

কাকা-কাকিমা ওকে দেখে বলেন, 'কিরে হেবো, কী খবর?'

হেবো বললে, 'ওয়া গুরুজীকি ফতে!'

—'তার মানে?'

—'তার মানে এই সেই অপয়া উইল! যত্ন করে রেখে দাও।'

—সে কী রে? কেমন করে পেলি?'

—'সে অনেক কথা। সুধাকান্তবাবু এখন অচৈতন্য। ডাক্তার বলেছেন আর তাঁর জ্ঞান ফিরবে না। সুতরাং নতুন করে উইল আর করতে পারবেন না। ব্যস, খেল্ খতম!'

কাকিমা বলেন, 'কিন্তু ওটাকে যত্ন করে রেখে কী লাভ? পুড়িয়ে ফেলি বরং ওটাকে।'

কাকা বলেন, 'না না, তার আগে খুলে দেখি ওটাই সেই আসল উইল কিনা।'

হেবো বললে, 'এখন নয় কাকা! গুরুদেবকে দেখিয়ে দেখিয়ে, তার চোখের সামনেই ওটাকে না পোড়ালে আমার গায়ের ঝাল মিটবে না! বেটা বলে কিনা, বজ্জাত বোম্বেটে শয়তান!'

কাকিমা হেসে ওঠেন, 'কাকে বলেছে রে? তোকে?'

—'আমাকে বললে তখনই তার নাকটা ভেঙে দিতাম না! বলেছে অন্য একটা ছেলেকে।'

—'তবে তুই অত চটছিস কেন?'

—'সে অনেক কথা।'

—'প্রবীরের খবর কী?'

হেবো চমকে উঠে বলে, 'ঐ যাঃ! তাঁকে তো খবর দিয়ে আসা হয়নি! নাঃ! এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে আমার! কাকা, আমি আর একবার যাই বরং।'

—'তা যা। তবে কালকেই ফিরে আসিস। দাদারাও কাল সন্ধ্যায় ফিরে আসছেন। প্রবীর বেচারাকে খবরটা এখনই দেওয়া দরকার।'

হেবো আবার রওনা হয়ে পড়ে কৃষ্ণনগর যাবে বলে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হেবোর, কৃষ্ণনগরে গিয়ে সে প্রবীরকাকুর দেখা পেল না। কারণ হেবো রওনা হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই সুধাকান্ত মারা গেলেন। প্রবীরচন্দ্র খবর পেয়ে হেবোর খোঁজে এসেছিলেন, এবং হেবো কলকাতা চলে গিয়েছে শুনে তিনিও চলে এলেন হেবোদের বাড়িতে।

প্রবীরচন্দ্র যখন পৌঁছলেন তার আগেই হেবো রওনা হয়ে গিয়েছে। প্রবীরচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে হেবোর কাকা ও কাকিমাও কৃষ্ণনগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রবীরচন্দ্র হেবোর উইল চুরির

কথা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ হতেই পারে না! আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, ঐ ঘড়েল শিরোমণি লোহার সিন্দুকে উইল রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—আর যাওয়ার সময় সেই চাবির থোকাটা রেখে যাবে হেবোর ঘরেই। হেবোর মতো পাকা ছেলে এ কথা বিশ্বাস করল কেমন করে?'

কাকিমা বলেন, 'কিন্তু সে যে উইলটা রেখে গেল আমার কাছে!'

হো-হো করে হেসে উঠে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'নিয়ে আসুন সেখানা, খুলে দেখুন ভেতরে কী মাল আছে! ওখানা আসল উইল নিশ্চয় নয়। হেবোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ওখানা ঐ হতভাগা বোম্বেটে ওখানে রেখে গিয়েছে। আসল উইল সে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছে।'

হেবোর কাকা বলেন, 'আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল।'

বাধা দিয়ে প্রবীর বলেন, 'সন্দেহ হয়েছিল না ঘন্টা! তাহলে এতক্ষণ সেটা খুলে দেখেননি কেন?'

—'হেবোই তো বারণ করলে।'

—'বাদ দিন ওসব ছেলেমানুষী! নিয়ে আসুন সেখানা।'

কাকিমা ভয়ে ভয়ে আলমারি খুলে বন্ধ খামটা নিয়ে আসেন। সীলমোহরগুলি পরীক্ষা করে প্রবীরবাবু বলেন, 'সীল ঠিকই আছে তবে ভেতরে কী আছে জানেন?'

—'সাদা কাগজ?'

—'মোটেই নয়। ভেতরে আছে আসল উইলের একটা হুবহু কপি। শুধু, সইগুলো জাল। বেটা জানে যে হেবো এটা চুরি করবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর সুধাকান্তের মৃত্যু হলে আমরা যখন বলব তিনি কখনও কোনো উইল করেননি, তখন সকলের নাকের ওপর আসল উইলখানা মেলে ধরবেন তিনি।'

কাকা বলেন, 'তবে এখানা খুলে দেখি?'

—'নিশ্চয়ই।' বলে প্রবীরচন্দ্র খুলে ফেলেন খামটা। কাগজের ভাঁজটা খুলে মুখটা লাল হয়ে যায় তাঁর। তাঁর অনুমান সত্য হয়নি। কাগজখানা মেলে ধরেন তিনি। কাগজটায় লেখা ছিল—

—'দুঃখ কোরো না বাবা হেবো—থুড়ি বটুক! হেলে ধরতে হাত পাকিয়েছ বলে কেউটের গর্তে হাত দিতে যেও না। উইলটা সিন্দুকে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে সেটা সঙ্গে করেই নিয়ে গেলাম। পবুকে দুঃখ করতে বারণ কর।'

কাকা চিৎকার করে ওঠেন—'ছি ছি ছি! হেবোটা একটা আস্ত গাড়োল!'

প্রবীর বলেন, 'আপনারাও কিছু কম যান না!'

মুখ কালো করে বসে থাকেন কাকা।

কাকিমা বলেন, 'সে যা হবার হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধি যে কত তা বোঝা গিয়েছে! একরত্তি একটা ছেলেকে ঠেলে দিয়ে এখানে বসে সবাই ল্যাজ নাড়ছ! এতক্ষণে বোধহয় মঞ্জুলাকে ঐ গুরুদেব হাত ধরে পথে বার করে দিয়েছে! চল তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করি।'

অগত্যা কাকা-কাকিমা আর প্রবীরচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে রওনা হলেন কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে।

* * *

সুধাকান্তের বাড়িতে পৌছে দেখেন, রীতিমতো একটা জনসমাবেশ হয়েছে। সুধাকান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শহরের গণ্যমান্য সকলেই এসে হাজির হয়েছেন। মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানযাত্রীরাও ফিরে এসেছে।

বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছে। গুরুদেব ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। হেবোও আছে। শহরের প্রবীণ উকিল গণেশবাবু বলছেন, 'শহরে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল! সুধাকান্তবাবুর সওয়াল শুনতে বার অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ত।'

'অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল ওঁর,' নবীন একজন উকিল বলেন, 'অথচ সেই মানুষেরই শেষ অবস্থায় কী ভীষণ বুদ্ধিভ্রংশ হল দেখুন।'

গণেশবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'মুনিদেরও মতিভ্রম হয় হে ঘোষাল, তা সুধাকান্তবাবু তো সামান্য মানুষ।'

জগন্নাথবাবু বলেন, 'কেন? মতিভ্রম কিসের?'

গণেশবাবু বলেন, 'ও, আপনি বুঝি জানেন না? সুধাকান্তবাবু একেবারে শেষ অবস্থায় তাঁর উইল পালটিয়ে তাঁর বিধবা পুত্রবধূকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে গিয়েছেন।'

জগন্নাথবাবুও নামকরা প্রবীণ উকিল, সুধাকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্টই। তিনি বলে ওঠেন, 'এ হতেই পারে না! কী নকুলবাবু, এ কথা কি সত্যি?'

নকুলবাবুর সঙ্গে হেবোর চোখাচোখি হয়। হেবোর সঙ্গে তাঁর বোধহয় আগেই কোনো কথা হয়ে থাকবে। তিনি অম্লানবদনে বলে বসেন, 'এঁরা অনেকে তাই বলছেন বটে, তবে আমার তা বিশ্বাস হয় না! তাহলে আমাকে তিনি নিশ্চয়ই বলে যেতেন।'

গুরুদেব ফোড়ন কাটেন, 'অথবা সাক্ষী রাখতেন। আপনি কি তাঁর শেষ উইলে গত শুক্রবার সই করেননি?'

—'শুক্রবার? কই? মনে তো পড়ে না।'

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আমি শুনেছি উইলে আপনারও সই আছে।'

নকুল বলেন, 'ভুল শুনেছেন তাহলে।'

—'তা হবে! হস্তরেখাবিদ সে কথা বলতে পারবে।'

হঠাৎ বাধা দিয়ে অ্যাডভোকেট দে-সাহেব বলে ওঠেন, 'না। শেষ সময়ে অর্থাৎ গত শুক্রবার তিনি যে উইল করেছিলেন আমি সে উইলে সাক্ষী হিসাবে সই করেছি; আর—'

—'আর?'

—'আর, জানি না নকুলবাবু কেন অস্বীকার করছেন, তিনি আমার সম্মুখেই সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছিলেন।'

গণেশবাবু বলেন, 'একি সর্বনাশের কথা মশাই! হ্যাঁ নকুলবাবু, ইনি কী বলছেন?'

নকুলবাবু আবার একবার হেবোর দিকে দেখে নিয়ে বলেন, 'বেশ তো, উইলটা আনা হলেই বোঝা যাবে।'

হেবো ওপর-পড়া হয়ে বলে, 'উইল করে থাকলে সুধাকান্তবাবু তা তাঁর লোহার সিন্দুকে রেখে থাকবেন, না কী বলেন গুরুদেব?'

গুরুদেব বলেন, 'তা তো বলতে পারি না বাবা, তবে আমার কাছে ঐ সিন্দুকের চাবি আছে। খুঁজে দেখতে পার।'

চাবিটা তিনি দেন হেবোর হাতে।

হেবো হেসে বলে, 'বেশ, আপনারাও তাহলে চলুন, সিন্দুকটা আমরা প্রথমে খুঁজে দেখি।'

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন হেবো একটা প্রচণ্ড ভুল করতে চলেছে। তাই হেবোকে ডেকে বলেন, 'হেবো, শোন। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।'

হেবো বললে, 'আসছি প্রবীরকাকা, আগে সিন্দুকটা খুলে দেখে আসি।'

হেবোর কাকা প্রবীরচন্দ্রকে জনান্তিকে ডেকে বলেন 'বাধা দিও না। যা হবার তা তো হয়েছেই। ওর ডেঁপোমির একটু শিক্ষা হওয়া উচিত!'

সদলবলে ওঁরা উপরে উঠে আসেন। হেবো ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলে। ভেতরটা ভালো করে দেখে বলে, 'কই উইল বলে তো কিছু মনে হচ্ছে না। গুরুদেব, আপনি একটু খুঁজে দেখবেন?'

গুরুদেব বলেন, 'না বাবা। আমি তো বলিনি উইল ওখানে আছে। তুমিই বলেছিলে।'

'তবে উইল কোথায় আছে?' চালের মাথায় প্রশ্ন করে হেবো।

—'আমার কাছে বাবা। এই দেখ!'

ঝোলার ভেতর থেকে ঠিক একই রকমের একখানি সীলমোহর করা খাম বার করে তিনি গণেশবাবুর হাতে দেন।

গণেশবাবু সেটি গ্রহণ করে বলেন, 'এইটিই তাহলে সুধাকান্তের শেষ উইল?'

গুরুদেব হেসে বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। খুলে দেখুন। সমস্ত সম্পত্তিই তিনি দেবোত্তর করে গিয়েছেন। আমিই তার অছি। তিনজন সাক্ষী আছেন—এবং নকুলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন।'

গণেশবাবু বলেন, 'নকুলবাবু?'

নকুলবাবুর চক্ষুস্থির হয়ে গেছে ততক্ষণে, আমতা-আমতা করে বলেন—'হেবো!'

হেবো একেবারে পাথরের মূর্তি যেন। কথা নেই তার মুখে। গুরুদেব খুকখুক করে হেসে ওঠেন।

গণেশবাবু খামটা খুলবার উদ্যোগ করতেই হেবো বাধা দেয়। বলে, 'এতই যদি হলো তবে গুরুদেব আপনিই খামটা খুলুন। উইলটা পড়ে শোনান আমাদের।'

গুরুদেবের চোখদুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। বলেন, 'বেশ, তাই পড়ে শোনাচ্ছি আমি।'

সাবধানে খামটা খুলে ফেলেন তিনি।

কাগজখানা বার করে ভাঁজটা খুলেই কিন্তু চমকে ওঠেন।

এপিঠ-ওপিঠ কয়েকবার দেখে একেবারে বজ্রাহত হয়ে যান।

অ্যাডভোকেট দে-সাহেব ঝুঁকে পড়েন কাগজটার ওপর। তারপর বলেন—'এ কী!'

গুরুদেবের অবশ হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখে বলেন, 'এ তো একখণ্ড সাদা কাগজ। উইল কই?'

গুরুদেব কোনো জবাব দেননা। গোল মুখখানা লম্বাটে হয়ে গিয়েছে তাঁর। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়েছে।

হেবো এবার খুকখুক করে হেসে ওঠে।

আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না গুরুদেব। ধপ করে বসে পড়েন মাটিতে। গণেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কী হল?'

হেবো তাড়াতাড়ি বলে, 'আজ্ঞে জয়দ্রথ-বধ!'

* * *

সুধাকান্তের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হবে স্থির হল। মঞ্জুলা দেবী ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে চান। শ্বশুর তো তাঁর জন্য সম্পত্তি বড় কম রেখে যাননি! ভালো করেই খরচপত্র করতে মনস্থ করেছেন তিনি।

পরদিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে গুরুদেব রওনা হচ্ছেন শুনে হেবো ছুটে এল সিঁড়ির মুখে। দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার শ্রাদ্ধের গুরুবিদায়টা নিয়ে যাবেন না স্যার?'

গুরুদেব শুধু বললেন, 'জ্যাঠামো কোরো না!'

হেবো বললে, 'অন্তত এ দুটো নিয়ে যান। খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এ দুটো আপনারই।'

হেবো বার করে দেয় একটা রুপোর কোশাকুশি আর একটা কলম।

গুরুবিদায় সমাপ্ত হতেই বাড়ির সকলে ঘিরে ধরল হেবোকে : কাকা, কাকিমা, মঞ্জুলা, নকুলচন্দ্র আর প্রবীর। দরজা বন্ধ করে সবাই মিলে চেপে ধরল হেবোকে। এবার বলতে হবে, কী করে কী হল।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!'

হেবো হেসে বললে, 'কেন পারছেন না জানেন? আপনারা সবচেয়ে সহজ পথটা দেখতে পারছেন না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলেই সমস্যাটা সহজ হয়ে যাবে।'

—'কী উদাহরণ?'

—'আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞাসা করব। ঠিক খেয়াল করে বানান তিনটে বলুন দেখি!'

—'বেশ, বল।'

—'প্রথম বানান মুমূর্ষু।'

—'ম-য়ে হ্রস্বউ, ম-য়ে দীর্ঘউ আর মূর্ধণ্যষ-এ রেফ হ্রস্বউ।'

হেবো বললে, 'ঠিক। এবার বলুন—মুহূর্ত।'

—'ম-য়ে হ্রস্বউ, হ-য়ে দীর্ঘউ আর ত-য়ে রেফ।'

হেবো বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'না হে ভুল নয়। এখনকার বানান তয়ে রেফ। আগে ছিল তয়ে তয়ে রেফ।'

হেবো আবার বললে—'ভুল।'

প্রবীরচন্দ্র চটে উঠে বলেন, 'তবে তুমি ঠিক বানানটা বল শুনি!'

হেবো বললে, 'ভ-য়ে হ্রস্বউ আর ল।'

থমকে গিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'তার মানে?'

—'তার মানে, প্রথম দুটি বানান আপনার ঠিকই হয়েছে। তৃতীয় বানান যেটার আমি জানতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে—''ভুল''; আপনি বলতে পারছিলেন না।'

হোহো করে হেসে ওঠে সবাই।

প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'স্বীকার করছি, ঠকে গেছি।'

হেবো বললে, 'গুরুদেবও ঠিক ঐভাবেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঠকে গিয়েছেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন উইলটা চুরি করতেই আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব। তাই টোপ ফেলে চার ছড়িয়ে বঁড়শি ছিপ হাতে বসেছিলেন উনি। আসল উইলটা সঙ্গে নিয়ে একটা নকল উইল সিন্দুকে রেখে এবং চাবিটা ফেলে চলে গেলেন। গুরুদেব ভেবেছিলেন নকল উইলটা চুরি করে বোকা হব আমি। কিন্তু উনি যান ডালে ডালে তো আমি যাই পাতায় পাতায়। সব জেনেশুনেও সেই নকল উইল চুরি করলাম আমি। বোকা সাজলাম।'

বাধা দিয়ে প্রবীরচন্দ্র বলেন, 'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আসল উইলটা কোথায় গেল?'

—'কেন, যেখানা গুরুদেব পরে বার করলেন।'

—'সেটা তো সাদা কাগজ!'

হেবো হেসে বললে, 'সেখানাই আসল উইল। আমি কলকাতা গিয়ে কাকিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু মাল-মশলা কিনি। একটা কালো পাইলট কলম, কিছু স্টার্চ আর আইওডিন। স্টার্চের সল্যুশনে কয়েক ফোঁটা আইওডিন ফেলে দিয়ে ব্লু-ব্ল্যাক রঙের কালি হয়। কিন্তু সেটা ম্যাজিক কালি; কিছু পরেই লেখা উপে যায়। কাগজে কোনো দাগ থাকে না। উইল করার আগের দিন যখন ক্যাবল গেল ডাক্তারবাবুর ব্যাগ আনতে তখন ঐ কালি-ভর্তি কলমটা আমি কলমদানিতে রেখে দিই। আগের রাত্রেই বাড়ির অন্যান্য ফাউন্টেন পেন চুরি গিয়েছে। ফলে আশা করছিলাম ঐ কলমেই উইল লেখা হবে। একমাত্র ভয় ছিল—অ্যাডভোকেট-সাহেব যদি শেষ মুহূর্তে তাঁর পকেট থেকে কলম বার করে বসেন। কিন্তু আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। সম্পত্তির কণামাত্র না পেয়েও যখন কাকিমা তাঁর শ্বশুরের সেবা করতে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু রাগ করে বলেছিলেন—তোমার কথায় ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি মা! আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছিল—ভগবান আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সবাই ঐ কলমেই সই দিয়েছেন।'

কাকা বলেন, 'কিন্তু ডাক্তারবাবুও কি তাঁর নিজের কলমে সই করেননি?'

নকুলবাবু বলেন, 'না, নিয়ম হচ্ছে দলিলে সকলে একই কলমে সই করবে—যাতে প্রমাণ হয় সাক্ষীরা দলিলকারীর সঙ্গে একই সময়ে সই করেছেন। এ নিয়ম খুব কঠোরভাবে মানা হয় না; কিন্তু সুধাকান্তবাবু পাকা উকিল; আইনের খুঁত তিনি রাখবেন না। তাই আমি আর ডাক্তারবাবু যখন দ্বিতীয়বার সই দিতে ফিরে গেলাম তখন তিনি তাঁর কলমটা এগিয়ে দিয়েছিলেন।'

মঞ্জুলা দেবী বলেন, 'হেবো, তাই বুঝি তুমি ডাক্তারবাবুকে সই করতে পীড়াপীড়ি করছিলে?'

হেবো হেসে বলে, 'ঐ মুহূর্তটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। ডাক্তারবাবু যদি সই না দিতেন, তাহলে এঁরা দ্বিতীয় ডাক্তারকে ডাকতে যেতেন—ফলে উইল তখনই সীলমোহর করা হতো না। আর ঘন্টাকয়েক পর দ্বিতীয় ডাক্তারবাবু যখন সই দিতে আসতেন ততক্ষণে লেখা সব আবছা হয়ে যেত। ধরা পড়ে যেতাম আমি।'

প্রবীরচন্দ্র ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'সাবাস হেবো! বাঙলা সিনেমার তুমি ক্ষুদে নায়ক হতে পার!'

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল হেবো। মঞ্জুলা দেবী ওকে কাছে ডেকে বলেন, 'শ্রাদ্ধের পর পণ্ডিতবিদায় করতে হয়। তুমি একটি ক্ষুদে পণ্ডিত! এই তোমার পণ্ডিতবিদায়।'

ছোট্ট একটা বাইনোকুলার। অত্যন্ত জোরাল তার লেন্স। বহু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। হেবো জানলার কাছে সরে এসে দেখল, রাস্তার ওপারে যে ভদ্রলোক চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, তার হরফগুলো পর্যন্ত পড়া যাচ্ছে।

জয়দ্রথ-বধ পালা বৃষোৎসর্গে শেষ হওয়া হেবো আগেই আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল, বাইনোকুলারটা হাতে পেয়ে সে যেন ষোলোখানা হয়ে গেল।

আদি পর্ব

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে যথারীতি তার নামে একখানা সীলবন্ধ চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেই বুঝতে পারে এটা কার লেখা। আশ্চর্য ভদ্রলোকের ধৈর্য! প্রতিবার হেবো সাফল্যমণ্ডিত হয়, আর উনি ফোড়ন কাটেন। অসহ্য!

ও! তোমরা বুঝি বুঝতে পারছ না? না, দোষ তোমাদের নয়, আমারই। রাম-জন্মের আগেই রামায়ণের কাহিনী ফেঁদে ফেলেছি আমি। 'গুরুবিদায় পর্বটা' হেবোর জীবনে এসেছে অনেক পরে। ডাক্তার ওয়াটসনের মতো তোমরা যদি কেউ ওর কীর্তিকাহিনী ভবিষ্যতে কখনও লিখতে চাও তবে আমার মতো উল্টোপাল্টা করে লিখো না। আগের কথা আগেই লিখো। চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে, এবং খাম না খুলেই হেবো কেমন করে তার অন্তর্নিহিত জ্বালা অনুভব করল, তাহলে এবার সেই গোড়ার কথাগুলো বলতে হয় : কেমন করে হেবো গোয়েন্দা হয়ে উঠল।

হেবোর বর্তমান বয়স ষোল। এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে সে। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে যখন সে ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ে। এই তিন-চার বছরের ভেতরেই সে একের পর এক কয়েকটি মারাত্মক রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। আমার তো ধারণা বড় হলে ওর নাম ও-দেশের শার্লক হোম্‌স, ইয়ারকুল প্যেরো, আর এ-দেশের ব্যোমকেশ বক্সী, পরাশর বর্মা, জয়ন্ত অথবা পি. কে. বাসুর সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে—মানে তোমরা যদি কেউ ওয়াটসনের ভূমিকা নিতে রাজি হও। তাই তোমাদের সুবিধা হবে মনে করে ওর গোয়েন্দা-জীবনের আদি কথাটা এবার বলে রাখি।

আগেই বলেছি, গোয়ন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে ছেলেবেলা থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিল তার বাক্সে। মেজদির সেলাইয়ের বাক্স থেকে একটা মাপবার ফিতে, দাদুর বাতিল-করা চশমার একটা পুরু লেন্স, একটা মোটা নোটবই। নোটবইতে সময়ে-অসময়ে সে নানান তথ্য টুকে রাখত। কোন সমস্যার ক্লু কোন সূত্রে প্রয়োজন হবে তা কে জানে? ঐ নোটবইটা নিয়ে মেজদা ওকে কত ঠাট্টাই না করেছে! সবার সামনে ঠাট্টা করে বলত হেবোর নোটবইতে সব খবরই লেখা আছে, শুধু লেখা নেই—'পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।'

হেবো রাগ করত না। সে জানত তার দিনও একদিন আসবে। এলও তাই, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

হেবোর মেজদির বিয়ে হয়েছিল মাসকতক আগে। হেবো তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে। পুজোর সময় মেজদির শ্বশুরবাড়ি তত্ত্ব পাঠানো হবে। বাবা আর কাকা বাজার উজাড় করে পুজোর তত্ত্ব সওদা করে আনলেন। গোল বাধল জুতোজোড়া নিয়ে। জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে হেবোর মা বলেন—'জুতোজোড়া মনে হচ্ছে খুকির পায়ে বড় হবে।'

মেজদা সেটা নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে বলে—'বড় নয় মা, ছোটই হবে—এই দেখ আমার পায়েই ছোট হচ্ছে।'

কাকা বলেন—'আমারও তাই মনে হয়েছিল। দাদাকে বললাম আর এক সাইজ বড় নাও বরং, তা দাদা—'

বাধা দিয়ে হেবোর বাবা বলে ওঠেন—'আরে না, ওর চেয়ে বড় হলে খুকি উল্টে পড়ে যাবে।'

ক্রমে দেখা গেল আন্দাজে-কেনা জুতোর মাপ সম্বন্ধে বাড়ির প্রত্যেকের মতামত বিভিন্ন প্রকারের। বাড়ির সবাই যেন বিধানসভায় ভোট দিচ্ছেন—একদল সরকারী পক্ষ, একদল বিরোধী পক্ষ। মেজদা

হেসে বলে—'শ্রীমান শার্লক হেবো এ বিষয়ে কী বলেন? তিনি তাঁর কাস্টিং ভোটটা এবার দিলেই পারেন!'

এই সুযোগ! হেবো কোনো কথা বলল না, সোজা উঠে গেল নিজের পড়ার ঘরে। ফিরে এল একটু পরেই। হাতে তার নোটবুক। বিধানসভার স্পীকারের মতোই গম্ভীর স্বরে বললে—'আন্দাজে কথা বলা শার্লক হেবোর ধাতে নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জুতো মেজদির পায়ে ঠিক হবে।'

নোটবইটা সে মেলে ধরে সকলের সামনে। মেজদির বিয়ের সময় যে জুতোজোড়া কেনা হয়েছিল—তার নম্বর টুকে রাখা আছে ওর নোটবইতে দু-মাস আগে। কাকা বলেন— 'ভাগ্যিস হেবোর নোটবইটা ছিল!'

হেবো গর্বের হাসি হাসল শুধু।

*　　　　*　　　　*

ক্লাসের ছেলেরা, পাড়ার বন্ধুরা, মায় বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে হেবো একটা হবু-গোয়েন্দা। বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোম্‌স। একমাত্র মেজদাই সেটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেবোর চেয়ে সে দু-বছরের বড়—সেবার তার পরীক্ষার বছর। হিউম্যানিটিস গ্রুপে হায়ার সেকেন্ডারি। হেবোকে সে মনে করে নেহাত নাবালক। হেবোর গোয়েন্দাগিরির ওপর কখনও তার অহৈতুকী উষ্মা, কখনও বা দাদা-সুলভ তাচ্ছিল্য। বাবা-কাকার সুরে সুর মিলিয়ে হেবোকে কখনও উপদেশ দেয়—'এসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দে হেবো, নইলে বেঘোরে ফেল্লু মারবি।' কখনও বা লুকিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে চুকলি কাটে—'মা, হেবো আবার ডিটেকটিভ বই পড়ছিল!' ঠাট্টা করে মেজদাই ওর এই নামকরণটা করেছে—শার্লক হেবো। হেবোর অবশ্য তাতে দুঃখ নেই। সে জানে ঐ বিদ্রূপের নামই সে একদিন সার্থক করে তুলবে। ঐ নামই হবে তার গৌরবের পরিচয়। তাছাড়া মেজদা যে কেন এতটা চটেছে তাও তো আর অজানা নেই ওর। সে একটা ভারি মজার গল্প।

পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন। মা, কাকিমা আর মেজদি মিলে সারাটা দুপুর ধরে নানান রকম পিঠে তৈরি করেছে। হেবোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী। হেবো জানে, চার রকমের মিষ্টি হয়েছে—গোকুল পিঠে, রসবড়া, পুলি-পিঠে আর সরুচুকলি। সংখ্যায় কোন জাতের মিষ্টি কটি তৈরি হয়েছে তারও মোটামুটি হিসেব লেখা আছে ওর নোটবইতে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—লোভ তার কিঞ্চিৎ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তো হ্যাংলার মতো চাইতে পারে না! হেবো তাই অন্য একটি যুক্তির অবতারণা করে বলেছিল—'আরে মেজদি, একটার পর একটা বানিয়ে তো যাচ্ছ—একটু টেস্ট করে দেখা তো উচিত—মানে, ঠিকমতো ভেতরে রস ঢুকছে কিনা—'

কাকিমা এ যুক্তিতে হেসে ফেলেছিলেন। তবু হয়ত দুটো রসবড়া ওকে পরখ করতে তুলে দিতেন; কিন্তু মা-মেজদির ভোটাধিক্যে ওর প্রস্তাবটা পাস হল না। মা বললেন—'সে আর তোকে নতুন করে দেখতে হবে না। এইমাত্র তোর মেজদা পরখ করে বলে গেল।'

যুক্তির বাইরে যেতে পারে না হেবো। অগত্যা ওকে ঢোক গিলে যেতে হয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বার-বার ঐ পিঠেগুলোর কথাই ওর মনে হয়েছে, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্নও দেখল, পুলি-পিঠেগুলোর গায়ে লেত্তি জড়িয়ে মেজদা গচ্চা-গচ্চি খেলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল হেবোর। রাত তখন নিষুতি। সমস্ত বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, মাঝের হল-কামরার বড় ঘড়িটার টক্-টক্ ছাড়া। হেবোর হঠাৎ মনে হল ভাঁড়ার ঘর থেকে যেন একটা সন্দেহজনক শব্দ আসছে, বাসনপত্র সরানোর শব্দ। কিছুদিন আগেই পাড়ায় মিঠুয়াদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েছে। সে-চুরির কিনারা হয়নি। পুলিশে খামোখা মিঠুয়াদের নতুন চাকরটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। একেই চুরিতে বিপদগ্রস্ত, তার ওপর চাকরটাও বেহাত হওয়ায় মিঠুয়ার মায়ের অবস্থা চরমে উঠেছে। হেবো সবই খবর রাখে। বাসনপত্র সরানোর আওয়াজ শুনেই হেবো বুঝতে পারে ব্যাপারখানা। এ নিশ্চয়ই সেই সিঁধেল চোরের কাণ্ড।

জন্ম-ডিটেকটিভ শার্লক হেবো। তড়াক করে খাট থেকে নেমে পড়ে সে। খাটের নিচে থেকে টেনে নেয় হকিস্টিকটা। ধরতেই হবে বাছাধনকে এবার! পা টিপে-টিপে সাহসে ভর করে একাই এগিয়ে গেল সে ভাঁড়ারঘরের দিকে। প্যাসেজের আলোটা সে ইচ্ছা করেই জ্বালে না। চোর যেন টের না পায়। পাগলা দাশুদের স্কুলে কে যেন একবার চোর ধরতে গিয়ে বেড়াল ধরে নাকাল হয়েছিল। হেবো সে ভুল করবে না। অতি সন্তর্পণে সে উঁকি দিয়ে দেখল ভাঁড়ার-ঘরের আধ-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে। ঘর নীরন্ধ্র অন্ধকার—তবু মনে হল একটা মানুষ মোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের তাক থেকে কিছু পেড়ে নামাচ্ছে। কী আবার? বাসনপত্র নিশ্চয়ই! হেবো সাবধানী—সে জানে চেঁচিয়ে উঠলে অথবা আলো জ্বাললে চোর তাকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যাবে! তার হাতে হকিস্টিক আছে বটে, কিন্তু চোরের হাতে যে ছোরা অথবা রিভলভার নেই, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ছেলেমানুষকে কাবু করে পালিয়ে যাওয়া একটা জোয়ান মানুষের পক্ষে কিছু না।

কিন্তু বয়সে ছোট হলে কী হবে? মদোন্মত্তের চেয়ে শশকও বয়সে বড় ছিল এমন প্রমাণ নেই। হেবো জানে ভাঁড়ারঘরে এই একটিমাত্র দরজা। ও-পাশের জানলায় গরাদ দেওয়া আছে। আর মুহূর্তমাত্র দেরি করে না হেবো; চট করে ভাঁড়ারঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দেয়। ব্যাস, বাছাধন এবার ইঁদুর-জাঁতাকলে বন্দী! এখন রিভলভারই হোক আর ছোরাই হোক, হেবোর হাতে ওর নিষ্কৃতি নেই। পরমুহূর্তেই হেবোর গগনবিদারী চিৎকারে বাড়ির নৈশ নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে যায়—'চোর! চোর!! চোর!!!'

ছুটে এল বাড়িসুদ্ধ সবাই। বাবা-মা-কাকা-কাকিমা, মায় ছট্টুলাল আর বামুনদি। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে ছট্টুলাল এসে মহড়া নিল দরজার সামনে। সারা বাড়ির আলো তখন জ্বলে উঠেছে। ছট্টুলাল দরজার শিকলে হাত দিয়ে তার দেহাতি ভাষায় চিৎকার করে বললে পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু মাথা ফাটিয়ে দিতে পিছপা হবে না সে!

কাকা বলেন—'দরকার কী ছট্টুলাল! দরজা বন্ধই থাক! আগে পুলিশে খবর পাঠানো যাক।'

ছট্টুলাল তার গোঁফের প্রান্তে চাড়া দিয়ে বললে, এমন কলে-পড়া ইঁদুর যদি তার হাত ফসকে পালায় তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাজুবন্ধ পরে সে ফিরে যাবে ছাপরা জেলায়!— 'আপ দেখিয়ে না হুজুর, কেয়া হাল করেঁ! সালা চোট্টাকো হাম ছাতু বনা দুঙ্গা!'

শিকল খুলে দিয়ে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দড়াম করে দরজটা সে খুলে দেয়।

বের হয়ে এলেন রসবড়া-রসাপ্লুত মেজদা!

সে অপমান মেজদা ভুলতে পারেনি। তোমরাই বল, সে লজ্জার কথা কি ভোলা যায়! একবাড়ি লোকের সামনে রাত দুটোর সময় চোর বলে ধরা পড়াই শুধু নয়, সেই পৌষ মাসের শীতে মধ্যরাত্রিতে বেচারিকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হয়েছিল। তাড়াহুড়োয় রসবড়ার মাটির হাঁড়িটাই উল্টে পড়েছিল ওর মাথায়! ভাঙা হাঁড়ির কানাটা আটকে ছিল গলায়, জয়মাল্যের মতো।

তাই মেজদার যত আক্রোশ হেবোর ওপর। ভ্রূক্ষেপ করে না হেবো। চোর সে ঠিকই ধরেছিল। বাইরের চোর না হোক, ঘরের চোর,—বাসন-চোর না হোক, রসবড়া-চোর।

* * *

কিন্তু যে ঘটনার পর থেকে হেবো গোয়েন্দা হিসাবে সকলের কাছে প্রথম স্বীকৃতি পেল, যে ঘটনায় তার নাম প্রথম ছাপা হল খবরের কাগজে, এবার সেই ঘটনার কথাই বলব তোমাদের।

সেবার পুজোর ছুটিতে হেবোর বাবা কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ক'দিন ধরে বাড়িতে নানান জল্পনা-কল্পনা। মধুপুর—পুরী—না দার্জিলিঙ? শেষমেশ স্থির হল, না ওসব কিছু নয়, যাওয়া হবে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করতে। বেনারস। হেবোর ফুর্তি দেখে কে! বহুদিন বাঙলার বাইরে যায়নি ওরা। রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হু-হু করে ছুটছে—আর জানলায় মাথা রেখে বসে আছে হেবো, এটা ভাবলেই একটা শিহরন লাগে। ঠিক হল বাবা-মা-মেজদা আর হেবো যাবে কাশীতে। কাকা যাবেন কাকিমাকে নিয়ে কাকিমার বাপের বাড়ি মালদায়। ছট্টুলাল থাকবে

বাড়ির তদারকে। হেবো তাকে নানারকমভাবে তালিম দিয়ে শিখিয়ে দিল খালি বাড়ি কেমনভাবে পাহারা দিতে হবে।

তারপর স্কুলের ছুটি হলে নির্দিষ্ট দিনে ওদের স্টেশনে তুলে দিতে এলেন কাকা-কাকিমা। আলোয়-আলো হাওড়া স্টেশন। দেরাদুন এক্সপ্রেসটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে। অসম্ভব ভিড় হয়েছে। পুজোর সময় যেমন হয় আর কি। ওদের কামরায় অবশ্য ভিড় হয়নি মোটেই। রিজার্ভ কামরা। অর্থাৎ কামরাটায় যতগুলো সীট আছে ঠিক ততগুলো রিজার্ভেশন টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। হেবো লক্ষ করে দেখে রেলের কামরায় লেখা আছে—'বারো জন বসিবেক।' গুণে দেখল বারো জন লোকই আছে বটে। কিন্তু তারপই লক্ষ্য হল রেল-কোম্পানির আর একটি বিজ্ঞাপ্তি :

'চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

আপন মনেই হাসল হেবো। কী বুদ্ধি রেল-কোম্পানির বড়কর্তাদের! আরে বাপু, চোর-জুয়াচোর যে নিকটেই আছে এ সাধারণ সংবাদটা কি শার্লক হেবো জানে না? কিন্তু ঐভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে চোর-জুয়াচোর-পকেটমারদের সাবধান করে দেবার মানেটা কী? যাই হোক, সাবধান সে প্রথম থেকেই হয়ে আছে। স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সব যাত্রীদের সে লক্ষ্য করতে থাকে। সকলেই কিছু চোর-জুয়াচোর নয়; কিন্তু বিজ্ঞপ্তি যখন দেওয়া হয়েছে তখন নিশ্চই চোর-জুয়াচোর লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে।

কে হতে পারে? অধিকাংশই পশ্চিমা লোক। ওদের পরিবার ছাড়া আরও একটি বাঙালি পরিবার বসেছেন সেই কামরায়। কর্তা-গিন্নী, আর দুটি ছেলেমেয়ে। ও পাশের দূরের ঐ সাধুবাবার ওপর কেমন যেন সন্দেহ হয়। ওর দাড়িটা নকল নয় তো? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ কি আগে থেকে সীট রিজার্ভ করিয়ে রাখে? ও কোন জাতের সাধু তাহলে? তাছাড়া মাঝের বেঞ্চিতে ঐ মধ্যবয়স্ক পাঞ্জাবী লোকটি? তিনিই বা এত রাতে গগলস চোখে দিয়ে আছেন কেন? এঁরও দাড়ি আছে, তার ওপর পাগড়ি।

হেবোরা বসেছিল দরজার উল্টোদিকে একটা কোণ ঘেঁষে। সেখান থেকে সকলের ওপরেই বেশ নজর রাখা চলে। বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়াল। এ পাশের মারোয়াড়ি ভদ্রলোক সীতাভোগ কিনলেন। আসানসোলে মধ্যরাত্রে উঠল অনেক লোক। শিখ ভদ্রলোক 'রিজার্ভ গাড়ি' বলে দরজা আড়াল করে দাঁড়ালেন; তবু কিছু লোক জোর করে উঠল। 'বারো জন বসিবেক' আইন আর মানা যাচ্ছে না। একজন পশ্চিমা মুসলমান ভদ্রলোক উঠলেন। গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই—মাথায় কাজ করা সাদা টুপি। মেজদা বসেছিল বেঞ্চির প্রান্তে। তাকে *ঠেলেঠুলে* পশ্চিমা ভদ্রলোক বসবার উপক্রম করতেই মেজদা তার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—'একদম জায়গা নেই দেখতে পার্তা নেই? মানুষকা মুণ্ডুর ওপর বসেগা না কি রে বাপু?'

ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—'জরা মদৎ তো করো ভাইসাব, ঔর এক মুসাফিরকে লিয়ে কাফি জগাহ্ হো সক্তা।'

এই সময় শিখ ভদ্রলোক চট করে স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। ফলে হেবোর মেজদাকে আর মদৎ করতে হল না—পশ্চিমা ভদ্রলোক মাঝের বেঞ্চিতে ঐ খালি আসনটি দখল করলেন। আরও যারা উঠেছিল এই স্টেশনে তাদের দাঁড়িয়েই থাকতে হল। 'বসিবেক'-এর হিসাবটাই রেল কোম্পানি কষেছে; মাঝপথে ভিড় *ঠেলে* উঠলে কতজন 'দাঁড়াইবেক' এবং কতজন পাদানি থেকে 'ঝুলিবেক' তার তো আর কোনোও হিসাব নেই। শুধু একজন ফতুয়া-পরা ভুঁড়ি-সর্বস্ব ভোজপুরী পশ্চিমা লোক এই এত লোকের ভিড় *ঠেলে* কায়দা করে উঠে গেল বাঙ্কের ওপর। গাড়ি আসানসোল ছাড়ল।

আবার বসে বসে সবাই ঢুলতে শুরু করেছে। কেউ-কেউ বই পড়ছে সেই আধো অন্ধকারে। মাঝের বেঞ্চির মুসলমান ভদ্রলোকটি টেনে নিলেন হেবোর বাবার 'আনন্দবাজার'খানা। জেগে থাকলে হয়ত হেবোর বাবা অবিনাশবাবুর অনুমতি নিতেন তিনি, কিন্তু হেবো দেখল ওর বাবা বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন। হেবোর ঘুম আসছিল না। তা ছাড়া আজ রাত্রে সে ঘুমোবে না—ঘুমোনো উচিতও নয়! এই সুযোগে পকেট থেকে হেবো অতি সন্তর্পণে বার করে একখানা চটি বই, '*হত্যাকারী কে?*' পড়তে থাকে একমনে। বই পড়ছে বটে, কিন্তু সজাগ দৃষ্টি তার ঠিকই আছে সকলের ওপর। শোবার জায়গা বস্তুত কেউই পায়নি, একমাত্র বাঙ্কের ওপরের ঐ ভুঁড়িয়াল ভোজপুরীটা ছাড়া। অন্য সকলেই বসে

বসে ঢুলছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে বাঙ্কের ওপর থেকে। অতবড় দেহটাকে কায়দা করে লোকটা ঘুমোচ্ছে কেমন করে? বার-বারই হেবোর নজর যাচ্ছে ঐ বিজ্ঞপ্তিটার দিকে—'নিজে টিকিট কেন, মালের ওপর নজর রাখ,—চোর জুয়াচোর পকেটমার নিকটেই আছে।'

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে স্থির করেছিল, কিন্তু ওরই মধ্যে কখন একটু ঢুলুনি এসেছে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে জেগে ওঠে হেবো। গাড়ি তখন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। টানেলের গুমরানির বিকট শব্দেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে ওর। নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। তাদের মালপত্র সব ঠিকই আছে। ঘুমোচ্ছে সবাই, বসে বসেই। শুধু বাঙালি ভদ্রলোকটি জেগে বই পড়ছেন। আর আসানসোল থেকে ওঠা সেই ভদ্রলোকটি, যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলেছিলেন, তিনিও জেগে আছেন—খবরের কাগজটা তখনও দেখছেন। সাধুবাবাও অবশ্য জেগে আছেন, গঞ্জিকা-সেবনে ব্যস্ত তিনি। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলো হেবো।

* * *

ঘুম ভাঙল একটা চেঁচামেচিতে। গাড়ি তখন দাঁড়িয়ে আছে গয়া স্টেশনে। ভোর হয়-হয় আর কি। অবাক চোখে হেবো দেখে, কামরাতে উঠেছে দু-জন য়ুনিফর্মধারী পুলিশ। আরও দু-জন পুলিশ অফিসার উঠেছেন কামরায়। ঐ দিককার বেঞ্চিতে যে বাঙালি ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারের কথা-কাটাকাটি হচ্ছে।

ভদ্রলোক বলছেন—'কেন মশাই, বাঙালি হয়ে জন্মেছি বলেই কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি?'

পুলিশ অফিসারটি বলছেন—'আহা, আপনি রাগ করছেন কেন? আমি তো শুধু আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করেছি। আমাদের খবর—লোকটা বাঙালি, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কই অবিনাশবাবু তো রাগ করেননি?'

হেবো বুঝতে পারে এর আগে তার বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? একটু চেষ্টা করেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা। এরা আবগারি পুলিশ—মানে মদ-গাঁজা-আফিং নিয়ে যারা চোরাকারবার করে তাদের ধরে বেড়ায়। ওরা নাকি খবর পেয়েছে, এই গাড়িতে একজন অনেকদিনের পাকা চোরাকারবারী এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। লোকটা বাঙালি—সুটকেস তার সঙ্গেই আছে।

দ্বিতীয় অফিসার প্রথম জনকে বললেন—'এঁদের আর মিথ্যে হয়রানি করে কী হবে মুখুজ্জে? এঁরা সব ভদ্রলোক; আমার মনে হয় আসানসোলে যে পাঞ্জাবী লোকটা সুটকেস হাতে এই কামরা থেকে নেমে গেল,—সেই যে গগলস-পরা লোকটা হে—সে-ই আসল ঘাঘি! রাত্রিবেলা গগলস দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, বেটা শিখ সেজে চোখে ধুলো দিয়ে গেল।'

মুখার্জিসাহেব বললেন—'আমারও তাই মনে হয়।'

—'তাহলে আর সময় নষ্ট করে কী হবে, চল যাই।'

—'চলো।'

দু-জন অফিসারই গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্ল্যাটফর্মে। হেবো কামরার সকলের ওপর একনজর চোখ বুলিয়ে নিল। গণ্ডগোলে সবাই জেগে উঠেছে—একমাত্র বাঙ্কের ওপর শায়িত বিশালবপু ভোজপুরী প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি এত গণ্ডগোলেও। একটানা নাক ডেকে চলেছেন তিনি। মেজদা হেবোকে কনুই-এর একটা গুঁতো মেরে বললে—'শার্লক হেবো, একটু এনকোয়ারি করে দেখলে পারতে!'

হেবো জবাব দেয় না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছে। একমনে কীসের যেন হিসাব করে যাচ্ছে চোখ বুজে। তারপর, কোথাও কিছু নেই, এক লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে। হাঁ-হাঁ করে ওঠে গাড়ি-সুদ্ধ লোকজন। আবগারি অফিসার দু-জন ছুটে এসে ওকে ধরে তোলেন। বলেন—'পড়ে গেলে কেমন করে, খোকা?'

'—খোকা নয়,' প্রতিবাদ করে হেবো,—'আমার নাম হেবো, শার্লক হেবো। আর, পড়ে আমি যাইনি, ঝাঁপ দিয়েছি মাত্র। বিপদে ঝাঁপ দেওয়াই আমার স্বভাব। সে যাক। আপনারা ভুল করেছেন, আফিং-চোর এই কামরাতেই আছে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

হেবোর বাবা অবিনাশবাবুও নেমে এসেছেন ততক্ষণে। পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক হেবোকে তার বাবার জিম্বায় পৌঁছে দিয়ে বলেন—'আপনার ছেলে? নিন! তবে এ তুখোড় ছেলেটিকে একটু সামলিয়ে রাখবেন!'

হেবো চিৎকার করে ওঠে—'আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনারা? আমি আন্দাজে কিছু বলছি না। প্রমাণ আমার হাতে।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন অবিনাশবাবু—'কী পাগলামি করছিস হেবো?'

কিন্তু দ্বিতীয় অফিসারটি হঠাৎ বলে বসেন—'বেশ তো, দেখাই যাক না ও কী বলতে চায়। কী বলছ খোকা? আফিং-চোরকে তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে?'

হেবো কোনো কথা বলে না। গট্‌গট্ করে কামরায় ফিরে এসে বলে—'আফিং নিয়ে পালাচ্ছেন এই ভদ্রলোক।'

অম্লানবদনে সে দেখিয়ে দিল মাঝের বেঞ্চিতে বসা সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে। আসানসোলে উঠে যিনি মেজদাকে সরে বসতে বলছিলেন। তাজ্জব কাণ্ড! হেবোর বাবা আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। প্রচণ্ড রাগে হেবোর কানটা ধরে একটা থাপ্পড় কসিয়ে দিলেন ওর গালে। বাধা দিলেন সেই আবগারি অফিসারটি। বলেন—'আহা, গাড়ির মধ্যে আর মারধোর করবেন না। বাড়ি গিয়ে শাসন করবেন বরং।'

মুসলমান ভদ্রলোকটি বোধহয় এদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেননি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন তিনি। হেবোর গালটা জ্বালা করছে। কানটাও লাল হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে চোখের জল সামলে সে শুধু বললে—'প্লীজ, ওঁর সুটকেসটা খুলে দেখুন আপনারা শুধু!'

মুসলমান ভদ্রলোক বলেন—'হুয়া ক্যা?'

আবগারি দারোগা চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কী ভেবে ফিরে আসেন তিনি। সুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই ঘটে গেল তাজ্জব কাণ্ড। পট করে বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়াল সেই মুসলমান লোকটা। চট করে পকেট থেকে বার করে সে কালো রঙের একটা ছোট্ট হাতিয়ার। হেবোর কানটা তখনও ধরা আছে অবিনাশবাবুর হাতে। কানে প্রচণ্ড টান লাগছে, তবু হেবো বুঝতে পারে জিনিসটা কী। রহস্য-লহরী সিরিজের অনেক বইতে ছবি দেখা আছে তার।

মুসলমান ভদ্রলোক পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বলে ওঠে—'আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলে আমি কিন্তু তার খুলি উড়িয়ে দেব! ছ-টা গুলি ভরা আছে এতে—ছজনকে না মেরে ধরা দেব না আমি! দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও সকলে!'

কামরার সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা। সে নৈঃশব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একমাত্র বাঙ্কে-শয়ান ভোজপুরীর নাসিকাধ্বনি।

ট্রেন হুইসিল দিল। পরমুহূর্তেই দুলে উঠল ট্রেনটা। জল আর কয়লা নিয়ে নতুন উদ্যমে ইঞ্জিন গাড়িকে টানছে। গাড়ি ছাড়ল। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে—'দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। চলতি ট্রেন থেকে যে নামবে সে-ই গুলি খাবে কিন্তু!'

বেঞ্চির ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। ছুটে যেতে চায় দরজার দিকে। সেই শুভ মুহূর্তেই ভোজপুরীর ঘুমন্ত আড়াইমনি বপুখানি উল্টে পড়ল পশ্চিমা মুসলমানটির ঠিক মাথার ওপর। দুজনেই উল্টে পড়ল মেঝেতে। এই সুযোগে একজন পুলিশ টেনে দিয়েছে অ্যালার্ম চেনটা। লিখতে যতক্ষণ লাগল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘটেছে ঘটনাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়া মানুষদুটো যখন ফের উঠে দাঁড়াল তখন পশ্চিমা ভদ্রলোকের হাতে উঠেছে লোহার হ্যান্ডকাফ আর রিভলভারটা চলে এসেছে ভোজপুরীর দৃঢ়মুষ্টিতে। এত অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে সামান্য পুলিশ অফিসার দু-জন তো ছার, স্বয়ং শার্লক হেবো পর্যন্ত তাজ্জব। ভোজপুরী তাঁর পুরুষ্ট গোঁফজোড়া খুলে ফেলতেই অফিসার দু-জন একসঙ্গে বলে ওঠেন—'স্যার! আপনি?'

ভোজপুরীবেশী আবগারি পুলিশের বড়-সাহেব বললেন—'হ্যাঁ, আমিই; আসানসোল থেকে ওকে ওয়াচ করতে করতে আসছি। আর তুমি মুখুজ্জে, তুমি এত বড় ইডিয়ট, বাঙালি ধরে ধরে শুধু নাম জিজ্ঞাসা করছ?'

মুখার্জিসাহেব মাথা চুলকে বলেন, 'না স্যার, মানে, ইয়ে...এ খোকা শুধু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে...'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হেবো। তার কান অনেক আগেই বন্ধনমুক্ত হয়েছিল। বলে, 'খোকা নয়, বলুন শার্লক হেবো! আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস শার্লক হেবোর নেই। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত!'

ভোজপুরী-বেশী বড়সাহেব ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন,—'বল তো ভাই, কী করে বুঝলে তুমি?'

—'বলছি।' হেবো উঠে দাঁড়ায় বেঞ্চির ওপর। হাফপ্যান্টের দুই পকেটে দুটো হাত চালিয়ে দেয়। গোয়েন্দা-গল্পের শেষ দিকে এটি গোয়েন্দার অবশ্যকর্তব্য, সে বিষয়ে তার জ্ঞান আছে। কোন-কোন ক্লুর সাহায্যে সে অপরাধীকে চিনে ফেলেছে এটা বুঝিয়ে দেওয়াও গোয়েন্দার কর্তব্যভুক্ত (ঠিক ঐ ভঙ্গিতে শার্লক হোমসের ছবি দেখেছিল হেবো কোনো বইতে—অবশ্য তাঁর গায়ে ছিল ওভারকোট, মাথায় টুপি আর মুখে পাইপ—সেসব কিছুই হেবোর নেই)। হেবো গম্ভীরভাবে বলে, 'রেল কোম্পানির ঐ বিজ্ঞপ্তিটা হাওড়া স্টেশনেই নজরে পড়েছিল আমার—"চোর জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।" তখন থেকেই আমি সকলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করি। তারপর দেখলাম, লেখা আছে—"নিকটেই আছে।" আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ঐ সাধুবাবার ওপর। কিন্তু সে তো আমার নিকটেই নেই, সে আছে বেশ খানিকটা দূরে!'

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। মুখার্জিসাহেব বলেন, 'দেখলেন স্যার, খোকার কাণ্ড।'

কিন্তু আবগারি বিভাগের বড়-সাহেব তখনও শুনতে চান হেবোর যুক্তি। বলেন, 'তা যেন হল, কিন্তু তোমার নিকটে তো অনেকেই ছিল—ওকেই বা দেখালে কেন?'

'বলছি। আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি, আসানসোলে মেজদা যখন ওকে বললে যে বসবার জায়গা নেই, তখন ও মেজদাকে যে ভাষায় জবাব দিল তার বিন্দুবিসর্গ বোঝেনি মেজদা। মেজদা যে কিছুই বোঝেনি তা বুঝতে পেরেছিলাম তার ফ্যালফ্যাল-করা চাউনি দেখে (এখন অবশ্য মেজদা যেভাবে তাকাচ্ছে তাকে অগ্নিদৃষ্টি বলা উচিত!)। তখনও কিন্তু উনি সরলভাষায় কিছু বললেন না। বাঙলা দেশে পশ্চিমারা বাঙালির সঙ্গে, বিশেষ করে মেজদার মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে (মেজদার চেহারাটা এখন ফটো তুলে রেখে দেবার মত!), যে ভাষায় কথা বলে, সেটা সাধারণত হিন্দি-বাঙলার একটা খিচুড়ি ভাষা। "খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবিস্" গোছের ভাষা। কিন্তু তা না বলে ইনি বললেন খাঁটি হিন্দি অথবা উর্দু। সিদ্ধান্ত : ইনি বাঙলা ভাষা একেবারেই জানেন না।

'তার একটু পরেই লক্ষ্য করে দেখি, পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত আসনে জুত করে বসতে পাওয়ার পরই উনি বাবার আনন্দবাজারখানা টেনে নিলেন। যেহেতু ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে উনি বাঙলা ভাষা জানেন না, ফলে অনুসিদ্ধান্ত : উনি খবরের কাগজের ছবি দেখছিলেন। বেশ কথা। কিন্তু শেষ রাত্রে গাড়ি যখন টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন হঠাৎ লক্ষ্য হয়, কামরায় দু-জন লোক জেগে আছেন। তার মধ্যে একজন ঐ ভদ্রলোক—তিনি তখনও খবরের কাগজ দেখছেন। আসানসোল থেকে গ্র্যান্ড-কর্ড লাইনে টানেল অন্তত তিন-চার ঘন্টার পথ। এতক্ষণ ধরে কেউ খবরের কাগজে ছবি দেখে না। সিদ্ধান্ত : উনি আনন্দবাজারখানা পড়ছিলেন। তাহলে সবটা মিলিয়ে কী দাঁড়াল? ইনি বাঙলা ভাষা বেশ ভালই জানেন—অক্ষর পরিচয়ও আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। ইনি রাত জেগে আনন্দবাজার পড়তে পারেন, আর একটি বাঙালি বাচ্চার সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতে পারেন না। সম্ভবত ইনি বাঙালি, অথচ পশ্চিমার বেশে রেল-ভ্রমণ করেন। এঁর সঙ্গে আছে একটি সুটকেস—বসবার ভাল জায়গা পাচ্ছেন না—তবু সেই স্যুটকেসটাকে বাঙ্কের ওপর না তুলে দিয়ে পাশে নিয়ে বসে আছেন। এদিকে পুলিসের ক্লু—চোর বাঙালি, এক সুটকেস আফিং নিয়ে পালাচ্ছে। এরপর আর কী বাকি থাকে স্যার আপনিই বলুন!'

মুখার্জিসাহেবের মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে। তাঁর দিকে ফিরে ভোজপুরীবেশী বড়সাহেব ইংরাজিতে বললেন, 'আমার ইচ্ছে করছে এই ছেলেটির কাছে তোমাকে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশ করে রেখে দিতে!'

মুখার্জিসাহেব মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

আর হেবোর দিকে ফিরে উনি বলেন, 'শার্লক হোমস্ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি তাঁর মতো সার্থক সত্যান্বেষী হও। তবে বড় হয়ে যখন কোনান ডয়েল পড়বে তখন জানতে পারবে শার্লক হোম্‌স শুধু বড় গোয়েন্দাই ছিলেন না; নানান বিষয়ে তাঁর ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বড় ডিটেকটিভ হতে গেলে প্রথমে তোমাকেও খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখতে হবে। কাল রাত্রে তুমি যেমন সকলকে লক্ষ করেছ, তেমনি আমিও সকলকে লক্ষ করতে করতে এসেছি; যদিও সারা রাতই আমার নাক ডেকেছিল। তাই এর সুটকেসের ভেতর লুকানো আফিংটাকে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, তেমনি তোমার হাফপ্যান্টের ডান পকেটে লুকানো *"হত্যাকারী কে?"* বইটাকেও দেখতে পেয়েছি আমি। যদি শার্লক হোম্‌সের মতো বড় গোয়েন্দা হবার সত্যিই ইচ্ছা থাকে তাহলে প্রথমেই ঐ সব বাজে গোয়েন্দা-গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে। যাই হোক, আজকের দিনে তোমার সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে উপহার দিলাম আমার এই হাতঘড়ি।'

নিজের মণিবন্ধ থেকে খুলে নিয়ে দামি রিস্টওয়াচটা তিনি পরিয়ে দিলেন হেবোর হাতে।

* * *

হেবো যদি আবগারি বিভাগের ঐ বড়সাহেবের উপদেশ মেনে নিয়ে তার গোয়েন্দাগিরির খেয়াল ত্যাগ করতে পারত তাহলে আমার গল্পও শেষ হত এখানে। বলতে পারতাম, এরপর থেকে হেবো মন দিয়ে পড়াশুনো শুরু করল। বলতে পারতাম—হেবোর গোয়েন্দা-গল্প শুনতে হলে আরও বছর আট-দশ পরে তোমাদের আসতে হবে ভাই।

কিন্তু হেবো মনেপ্রাণে ওঁর কথাটা গ্রহণ করতে পারেনি। পারবে কোথা থেকে? অত বড় সাফল্যে তার মাথাটা ঘুরে গেল। খবরের কাগজে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল—'বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আফিংচোর ধৃত' এই শিরোনামা দিয়ে। ছুটির পর রীতিমত সাড়া পড়ে গেল ওর স্কুলে। বন্ধুরা সবাই ওকে নিয়ে কদিন খুব হৈ-চৈ করল। এমনকি হেডমাস্টার-মশাই পর্যন্ত ওকে ডেকে নিয়ে ওর বুদ্ধির তারিফ করলেন। কিন্তু হেডমাস্টার-মশাইয়েরও ঐ দোষ! শুধু প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, বললেন—'বড় গোয়েন্দা হতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অধিকার থাকা চাই'। বাড়িতেও খাতির বেড়ে গেল হেবোর। মেজদা আর সাহস করে কোনো কথাই বলে না। গর্বে হেবোর মাটিতে পা পড়ে না! ডিটেকটিভ বইয়ের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসল তাকে। রাজ্যের গোয়েন্দাগল্পের বই যোগাড় করে সে পড়তে থাকে রাত জেগে। সেবার পরীক্ষায় আরও খারাপ ফল হল তার। বাবা বকলেন, কাকাও দুঃখ প্রকাশ করলেন; কিন্তু হেবোর মনে কোনও দুঃখ নেই, বলে—'পাস তো করেছি!'

ক্লাস-প্রমোশন নিয়ে হেবো এবার নাইনে উঠেছে। ওর কাকা বারবার বললেন—'হেবো, এই দুটো বছর একটু মন দিয়ে পড়াশুনো কর। সায়েন্স নিয়েছিস, ফার্স্ট ডিভিশন না পেলে কোনো ভাল কলেজে সীট পাবি না।'

হেডমাস্টার-মশাইও তাকে কাছে ডেকে নিয়ে অনেক ভালো ভালো উপদেশ দিলেন, বললেন—'তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলে থাকতে এ বছর আমার স্কুল থেকে যদি কেউ স্কলারশিপ না পায়, তাহলে সে দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে।'

হেবো মনে মনে বললে, 'স্কলারশিপে আর কটা টাকা হবে? তার চেয়ে একটা বড় চুরির কিনারা করতে পারলে অনেক বেশি টাকা পুরস্কার পাওয়া যায়।'

হেডমাস্টার-মশাই বলেন, 'আমাকে কথা দাও, স্কুল থেকে পাস করে যাবার আগে আর গোয়েন্দাগিরি করবে না তুমি।'

হেবো বাধ্য হয়ে বলে, 'আচ্ছা বেশ।'

এই সময়ে হেবো ডাকে একখানা চিঠি পেল। হাতের লেখা অপরিচিত কিন্তু চিঠি পড়ে অনায়াসেই বুঝতে পারে কে লিখেছেন তাকে। চিঠিখানায় লেখা ছিল—

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমায় ভুলে গেছ কিনা জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি! তোমার মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু আমার সহকর্মী। তাঁর কাছেই তোমাদের সব খবর পাই। তাঁর কাছেই শুনলাম, এ বছর

ক্লাস-পরীক্ষায় তুমি খুব সুবিধা করতে পারনি। প্রমোশন পেয়েছ বটে, কিন্তু সংস্কৃতে নাকি তোমার পাস-নম্বর ছিল না। মনে হয় আমার কথা তুমি কানে তোলনি। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে এত খারাপ ফল কখনও হতে পারে না। আমি তোমার ওপর অনেক ভরসা করেছিলাম। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ। এখন আবার বলছি, ঐ সব বাজে ডিটেকটিভ বই পড়া ছেড়ে পড়াশুনায় মন দাও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ভালভাবে জানা না থাকলে কখনও বড় সত্যান্বেষী হওয়া যায় না। জান তো,—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, চালাকির দ্বারা কখনও কোনো মহৎ কাজ হয় না। আশা করি এবার পরীক্ষার ফলাফল দেখে তোমার চৈতন্য হবে।

আমাকে চিনতে পারলে তো? নেহাত না পারলে, তোমার বাঁ হাতের কব্জির কথা কান পেতে শোন। আমার ঠিক-ঠিক পরিচয় সে টিক্-টিক্ করে বলে দেবে।

আশীর্বাদক
ইতি

*　　　*　　　*

এই চিঠিখানা পেয়েও কিন্তু হেবোর কোনো ভাবান্তর হল না। সে তখন মেতে আছে তাদের স্কুলের থিয়েটার নিয়ে! পুরস্কার বিতরণী সভায় শহরের বিশিষ্ট অতিথিরা দল বেঁধে আসেন। ছেলেদের গার্জেনরাও নিমন্ত্রিত হন। প্রতি বছরই এই দিনে একটা বড় রকমের হৈ-চৈ হয়। এবার স্থির হয়েছে, ছেলেরা অভিনয় করবে রবীন্দ্রনাথের নাটক—*মুকুট*। হেবো ভাল অভিনয় করে, সব গুণই আছে তার। ছেলেরা কেউ-কেউ বলে, ওকে মেজকুমার ইন্দ্রকুমারের পার্টেই মানাবে। ঐটেই সবচেয়ে ভাল পার্ট। কিন্তু হেডমাস্টার-মশাই বললেন, 'না, হেবো করবে রাজধরের পার্ট—ঐটেতেই ওকে ঠিক মানাবে।'

কথাটা হেবোর ভাল লাগেনি। এ যেন তাকে অপমান করতেই বলা। রাজধর হচ্ছে কুচক্রী, বদমায়েশ। কিন্তু থিয়েটার করার নিয়ম হচ্ছে—কোন পার্ট পেয়েছ তা নিয়ে মনে কোনো খুঁতখুঁতানি না রেখে যেটা পেয়েছ সেটাই ঠিকমত রূপায়িত করা। এটাই হচ্ছে নাটক অভিনয়ের মূল কথা। সবাই যদি নায়ক হতে চায়, তাহলে নাটক হয় না—হয় একটা মন-কষাকষির পণ্ডশ্রম। তাই হেবোও মনে কোনো খেদ না রেখে ছোট রাজকুমার রাজধরের পার্টটা মুখস্থ করে নিল।

গোল বাধল রত্নাটাকে নিয়ে। রতন হেবোদের চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। খুব বড়লোকের ছেলে। ওর বাবা নাকি কোথাকার কোন স্টেটের রাজা ছিলেন। এখন অবশ্য রাজ্য নেই—ভারতবর্ষের সব স্টেটের রাজ্যই এখন ভারত সরকার নিয়েছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কীর্তি এটা, হেবো জানে। তা হোক, তবু রতনরা খুব বড়লোক। ওর বাবা যে এককালে রাজা ছিলেন এটা কিছুতেই ভুলতে পারে না রতন। ক্লাসের ছেলেরা তাকে সমীহ করে চলে। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি ওকে প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়—আবার ঠিক চারটের সময় ওকে নিতে আসে।

রতনকে দেওয়া হয়েছিল ছোট রাজকুমার রাজধরের বন্ধু ধুরন্ধরের চরিত্র। অর্থাৎ হেবোর সঙ্গেই তাকে অভিনয় করতে হবে। রতন বলে—'দেখিস না কী কাণ্ড করি আমি! তোরা তো সব টিনের তরোয়াল ঘোরাবি। আমি নিয়ে আসব সত্যিকারের তরোয়াল! সোনার কাজ করা বাঁট—ঈয়া বড়! আমার বাবার তরোয়াল!'

সবাই অবাক হয়ে শোনে।

হেবো বন্ধুদের বলে, 'যতসব চালবাজি! সত্যিকারের তরোয়াল কখনও থাকতে পারে নাকি ওর বাবার! সে-সব সর্দারজি কবেই কেড়ে-কুড়ে নিয়েছেন।'

রতন বলে, 'আচ্ছা দেখা যাবে!'

ক্রমে এগিয়ে আসে নির্দিষ্ট দিন। ড্রেস-রিহার্সালের দিনে সবাই জমায়েত হয়েছে স্কুল ছুটির পর। কাল থিয়েটার, আজ তাই সেজেগুজে সবাই মহড়া দেবে। স্কুলের বড় হলঘরটায় স্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে। কয়েকটি ছেলে লাল নীল কাগজের শেকল বানিয়ে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে

টাঙিয়ে দিচ্ছে। যারা অভিনয় করবে তাদের সাজ-পোশাক পরানোর কাজ হয়ে গিয়েছে। বাঙলার স্যার যখন রতনের কোমরে ভাড়া-করে-আনা টিনের তরোয়ালটা বেঁধে দিতে গেলেন তখন রতন বলে ওঠে, 'আমাকে স্যার ওসব টিনের তরোয়াল দিতে হবে না। আমার সত্যিকারের তরোয়াল চাই।'

বাঙলা স্যার অবাক হয়ে বলেন, 'সে আবার কী রে রৎনা! সত্যিকারের তরোয়াল আমি কোথায় পাব?'

ঠিক সেই সময়েই স্কুলের গেটে এসে থামল কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা। উর্দিপরা একজন চাপরাশি 'হলে' ঢুকে মাস্টারমশাইকে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে। তার হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল। রতন হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নেয়। সকলেই ছুটে আসে জিনিসটা দেখতে। সত্যিই দেখবার মতো জিনিস বটে! বাঙলা-স্যার খাপ থেকে সেটাকে বার করতেই সকলের চোখ ঝলসে গেল যেন। ইয়া লম্বা ঝকঝকে একটা ইস্পাতের তরোয়াল। মুঠটায় সোনালি কাজ করা। খাপটার গায়েও নানান কারুকার্য। রমেশবাবু ইতিহাস পড়ান, সেটা নেড়ে-চেড়ে বললেন—'এ যে দেখছি ভিক্টোরিয়া যুগের সোর্ড! এ তো ত্রিপুরার সৈন্যদলে বেমানান হবে!'

মুখ শুকিয়ে যায় রতনের। হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'আহা, তা হোক। অত খুঁটিয়ে আর কে দেখতে যাচ্ছে! বেচারি অত শখ করে এনেছে! দিন রমেশবাবু, ওটা ওর কোমরে বেঁধে।'

রমেশবাবু অগত্যা সেটা রতনের কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। বাঙলা-মাস্টারমশাই তবু বলেন, 'কিন্তু আরও একটা কথা। রাজপুত্রদের তরোয়ালের চেয়ে এটা অনেক লম্বা আর অনেক দর্শনধারী। ধুরন্ধর সামান্য সৈনিক,—এটা খুব খারাপ দেখাবে না কি?'

হেবো তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ স্যার, তার চেয়ে ওটা সুবলদার কোমরে বেঁধে দিন। সুবলদা ইন্দ্রকুমারের পার্ট করছে—ও-ই আসলে গল্পের হিরো। তা ছাড়া সুবলদা অনেক লম্বা। ঠিক ফিট করে যাবে।'

সুবল ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। তালগাছের মতো মাথায় বেড়েছে খালি। লোলুপ দৃষ্টিতে বেচারি তাকিয়ে দেখছিল তরোয়ালটার দিকে।

রতন প্রতিবাদ করে, 'ঈস! এ আমার বাবার জিনিস। আমি আর কাউকে দেব কেন?'

হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'কিন্তু ওটা যে মাপে তোমার পক্ষে অনেক বড় হচ্ছে রতন।'

'হোক। আমার বাবার তরোয়াল আমি কাউকে দেব না।'

সকলেই লজ্জা পেল ওর বেহায়াপনায়। হেবো মর্মান্তিক চটে গেল। কিন্তু মাস্টারমশাইরা সকলেই রয়েছেন। তাঁরা আর কিছু বললেন না। অগত্যা ওটা রতনের কোমরেই বাঁধা থাকল।

মহড়া শেষ হয়ে গেলে বন্ধুদের মধ্যে আবার ঐ নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু হয়ে গেল।

ক্লাস টেনের নবীনদা বলে, 'রৎনাটা সেলফিশ নাম্বার ওয়ান। ওর উচিত ছিল ওটা সুবলকে দেওয়া।'

গোবরা বলে, 'বিশেষত যখন হেড স্যার পর্যন্ত বললেন—'।

ট্যানা বলে, 'রৎনাটাকে জব্দ করা যায় না?'

—'কী করে?'

—'ধর, কাল যদি ওর তরোয়ালখানা হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়?'

—'সে অসম্ভব। ও তো তরোয়ালখানা সারাক্ষণ কোমরে বেঁধে ঘুরে বেড়াবে। তাছাড়া তরোয়াল চুরি গেলেই হেড-স্যার শার্লক হেবোকে তলব করবেন, চোর খুঁজে দিতে। আর তৎক্ষণাৎ আমরা সদলবলে ধরা পড়ে যাব।'

হো-হো করে হাসল হেবো।

ট্যানা বলে, 'তার চেয়ে চল, সবাই মিলে ড্রইং মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলি। তিনি কী বুদ্ধি দেন শোনা যাক।'

—'তাই চল তাহলে।'

সদলবলে ওরা এসে হাজির হল ড্রইং ক্লাসে। স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ; কিন্তু ড্রইং মাস্টারমশাই বাড়ি যাননি। তিনি একগাদা পীসবোর্ড কেটে, শল্মা-চুমকি-রাঙতা মুড়ে একটা সুন্দর

মুকুট বানাচ্ছিলেন। ত্রিপুরা রাজার রাজমুকুট—কাল থিয়েটারে লাগবে। ওরা অনেকক্ষণ ধরে মুকুট বানানো দেখল। কী সুন্দর কারুকার্য করেছেন তাতে ড্রইং স্যার।

শেষ পর্যন্ত ওরা সব কথা খুলে বলল ড্রইং স্যারকে। ধৈর্য ধরে তিনি সবটা শুনলেন এবং শেষ পর্যন্ত বললেন, 'তোমরা ঠিকই বলেছ, রতনের পক্ষে এটা অন্যায়ই হয়েছে। টীম-ওয়ার্কের কথা না মনে রাখলে কখনও ভাল থিয়েটার করা যায় না!'

ট্যানা বলে, 'তাছাড়া হেড-স্যারও ওকে বললেন তরোয়ালটা সুবলকে দিতে।'

ড্রইং স্যার বলেন, 'ঠিকই তো। তাঁর কথা অমান্য করা খুবই অন্যায় হয়েছে।'

হেবো আর সহ্য করতে পারে না। বলে ওঠে, 'অন্যায় যে হয়েছে, সে তো সবাই মেনে নিয়েছে স্যার। এখন অন্যায়ের প্রতিকার কী করা যায় বলুন।'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চোখ বুজে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বলেন, 'দেখ, একটা কথা আছে—যে সয়, সে রয়।'

ব্যাস্, এককথায় মামলা ডিসমিস।

হেবো কিন্তু ছোড়নেওয়ালা নয়। সে বলে, 'ও ছাড়া আরও একটা কথা আছে স্যার—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

ড্রইং স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, ঐরকম একটা কথাও আছে বটে। যাক, এখন তোমার যাও। আমি মুকুটটা শেষ করি।'

ড্রইং মাস্টারমশাই ঐ রকম আপনভোলা মানুষ।

বন্ধুরা হেবোকেই মুরুব্বি পাকড়াও করে। বলে, 'তুই একটা যা হয় বিহিত কর।'

হেবো বলে,—'দেখি ভেবে!'

* * *

পরদিন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। সন্ধ্যা ছটা তিন মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হবে। ছটা তিন মিনিট কেন? তার একটা ইতিহাস আছে। আজ এগারো বছর ধরে এই ছটা তিন মিনিটেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই হেডমাস্টারমশাই আসার পর থেকে। তিনিই এ নিয়মটা চালু করেছেন। আগে এমন বহুবার হয়েছে যে ছাত্ররা সেজেগুজে তৈরি হয়ে আছে, অথচ প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট জনসমাগম হয়নি বলে অভিনয় শুরু করা যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ-পত্রে 'ছটা' লেখা থাকলে সকলেই ধরে নিতেন—বাঙালির টাইম, ঐ সাড়ে ছ-টা নাগাদ শুরু হবে আর কি। আবার কোনো-কোনো বছর ছেলেরাও ঠিক সময়ে তৈরি হত না—ভাবত ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে আর কী লাভ? দর্শকরা তো সেই সাড়ে ছ-টার আগে আর আসছেন না!

ছাত্র আর দর্শকদের সময়ানুবর্তিতার মূল্যটা বুঝিয়ে দিতে হেডমাস্টার-মশাই একটা ফন্দি বার করলেন। পরের বছর নিমন্ত্রণপত্রে ছাপা হল—'অনুষ্ঠান শুরু হবে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা ছটা বেজে তিন মিনিটে।'

যাঁরা নিমন্ত্রণপত্র পেলেন তাঁরা একটু অবাক হলেন। ব্যাপার কী? ছটা নয়, সওয়া-ছটা বা সাড়ে-ছটা নয়—একেবারে ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে? কেউ কেউ প্রশ্নও করলেন হেডমাস্টার-মশাইকে—'এ আবার কী মশাই? ছটা বেজে তিন মিনিটে প্লে শুরু হবে মানে?'

হেডমাস্টার-মশাই গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, 'ছটা বেজে তিন মিনিট মানে সাতটা বাজতে সাতান্ন মিনিট।'

সে বছর কৌতূহলের আতিশয্যে দর্শকেরা দেখতে এলেন ব্যাপারটা। ব্যাপার কিছুই নয়, হেডমাস্টার-মশাই ছটা বাজতে দু মিনিটে প্রথম ঘন্টা বাজাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পর্দা উঠে গেল ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমের ঠিক ছটা বেজে তিন মিনিটে।

সেই থেকে আজ এগারো বছর ধরে এ স্কুলের ট্র্যাডিশন সন্ধ্যা ছটা বেজে তিন মিনিটে অভিনয় শুরু করা। সেই বছর থেকে দর্শকেরা জেনে গিয়েছেন, ছটা বেজে পাঁচ মিনিট পরে হলে ঢুকলে দুই মিনিটকালের অভিনয় দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

পাঙচুয়ালিটি রক্ষা করার এ ব্যবস্থাটা বেশ মজার, নয়?

যাক, যা বলছিলাম। যারা অভিনয় করবে তারা চারটের মধ্যে সবাই হাজিরা দিয়েছে। ড্রইং স্যার আর রমেশবাবু একের পর এক মেক-আপ দিয়ে যাচ্ছেন। সাদা সাদা চুল দাড়িতে ক্লাস ইলেভেনের হারানদাকে আর চেনাই হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ত্রিপুরাবাহিনীর বৃদ্ধ সেনাপতি স্বয়ং ঈশা খাঁ। যুবরাজের সাজপোশাকও পরা হয়ে গিয়েছে। তারিণীদা সেজেছে ত্রিপুরাধিপতি। ঝলমলে সাজপোশাকে মুকুট মাথায় ঘুরঘুর করছে। এবার সুবলদা বসেছে ইন্দ্রকুমারের মেক-আপ নিতে। রতন সকলের আগে ধুরন্ধরের মেক-আপ নিয়ে বিরাট তরোয়ালটা কোমরে বেঁধে স্টেজের ওপর পায়চারি করে পার্ট মুখস্থ করছে। অতিকায় তরোয়ালটা ঠক্‌ঠক্ করে মাটিতে ঠোকা খেয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নিচু ক্লাসের ছেলেগুলো বারে বারে উঁকি দিচ্ছে গ্রীনরুমের ভেতর, আর উঁচু-ক্লাসের ছেলেদের ধমক খেয়ে বারে বারে ছুটে পালাচ্ছে।

যারা ভলান্টিয়ার হয়েছে, তাদের জামায় একটা করে রিবন-বাঁধা ব্যাজ। বুক, তথা ব্যাজ ফুলিয়ে তারা ঘন ঘন আসছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে গ্রীনরুমে! খবর দিয়ে যাচ্ছে 'হলে' কত লোক হয়েছে, কে কে এসেছেন। হেডমাস্টারমশাই একবার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে গেলেন, 'ফারদার এইটিন মিনিটস্ বয়েজ! ছটা বাজতে কুড়ি হয়েছে, ঠিক ছটা বাজতে দু'মিনিটে ওয়ার্নিং বেল পড়বে। তার মধ্যে এক্কেবারে রেডি হওয়া চাই। ছটা তিনে পর্দা উঠবে মনে থাকে যেন, আর ইউ অল রেডি?'

এরা বলে, 'নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, আমরা রেডি।'

বস্তুত তখনই সবাই তৈরি। সেই মুহূর্তেই পর্দা ওঠালে ওরা অভিনয় শুরু করতে পারে। ফলে মিনিট কুড়ি আগেই ওরা তৈরি হয়ে গিয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল রমেশবাবুর।

হঠাৎ তারিণী এসে বলে, 'স্যার, আমার মুকুট?'

—'মুকুট? সে তো তোমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

—''আমার মাথায় কিছু নেই স্যার!''

রমেশবাবু তখন একজন প্রতিহারীর পাগড়িটা খুলে নতুন করে বাঁধছিলেন, হেসে বললেন, 'সে তো পরীক্ষার খাতা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু মাথার ওপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, কেমনতর মহারাজা তুমি?'

কিন্তু ব্যাপারটা যে রসিকতার নয়, তা বোঝা গেল অল্প পরেই! মুকুট কোথাও পাওয়া গেল না। সর্বনাশ! খোঁজ খোঁজ খোঁজ! স্টেজের ওপর নেই, গ্রীনরুমে নেই, আশেপাশে কোথাও পড়ে নেই। অত বড় জিনিসটা এতগুলো লোকের চোখের ওপর দিয়ে কর্পূরের মতো উপে তো যেতে পারে না? তাহলে? সবাই মিলে তারিণীকে গালাগালি করতে থাকে। এত বড় আহাম্মক যে, মাথার ওপর থেকে মুকুট হারিয়ে যায়, টের পায় না? খবর পেয়ে হেড-স্যার ছুটে এলেন। তাঁর মাথা-ভরা টাক, নাহলে হয়ত পটপট করে মাথার চুলই ছিঁড়তেন তিনি। বলেন, 'শেম, শেম, বয়েজ! এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তোমরা! আর এগারো মিনিট মাত্র বাকি আছে, এখন ''মুকুট'' নাটকে মুকুটই নেই? যেমন করে পার খুঁজে বার কর! ঠিক ছটা তিন মিনিটে আমি পর্দা তুলব। যদি এর ভেতর খুঁজে না পাও—তাহলে আমি নিজে স্টেজে গিয়ে অ্যানাউন্স করব যে আমার ছেলেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য অভিনয় শুরু হতে দেরি হবে।'

কী কেলেঙ্কারি!

এইসময়ে কে এসে বলল, 'গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এসেছেন স্যার।'

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই।

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। সবাই মিলে দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজতে থাকে। রমেশবাবু এসে জেরা শুরু করেন 'তারিণী, তোমার একেবারে কিছু মনে পড়ছে না? লক্ষ্মী বাবা, একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা কর।'

তারিণী আমতা আমতা করে। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

এবারে মহড়া নিতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং হেডপণ্ডিতমশাই তাঁর বিশাল বপুখানি নিয়ে। স্বনামধন্য হেডপণ্ডিতমশায়ের নামে সারা স্কুল থরহরি কাঁপে। রমেশবাবুকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'ও আপনার

কর্ম নয় মশাই! অমন বাপু-বাছা করলে মুকুটের সন্ধান পেতে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে। লাঠ্যৌষধিই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য, তদ্ভিন্ন এর সমাধান অসম্ভব! ছিদেম, তোর যষ্টিটা দে দিকিন।'

শ্রীদাম প্রতিহারীর পার্ট করবে। ভয়ে ভয়ে ত্রিপুরাবাহিনীর প্রতিহারী তার তেলপাকা লাঠিখানা এগিয়ে দেয় হেডপণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিতমশাই সেটা বাগিয়ে ধরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক পাড়েন, 'তেরো! ইদিকে আয়!'

নবমীর বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে তারিণী এগিয়ে আসে।

—'বল অকালকুষ্মাণ্ড, অনড্বান্! মাথা থেকে মুকুট খুলেছিলি একবারও? অনৃতভাষণ করলে এক ডাণ্ডায় তোর রাজাগিরি ঠাণ্ডা করে দেব!'

ত্রিপুরাধিপতি কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'পরচুলে ছারপোকা ছিল স্যার, তাই একবার মাত্র মাথা থেকে মুকুটটা খুলেছিলুম!'

—'বর্ত্মে এস বাছাধন! মুকুট তাহলে খুলেছিলি? তখন কার হাতে দিয়েছিলি? সত্য কথা বলবি বলীবর্দ!'

—'রতনকে সেটা ধরতে দিয়েছিলুম স্যার!'

—'হুম! রৎনা! ইদিকে আয়!'

তরোয়াল খটখট করতে করতে এবার এগিয়ে আসে রতন। ভ্যাক করে কেঁদে ফেলার আগের মুহূর্ত যেন!

—'আরে আরে, তোর কটিবন্ধে উটি কী? ও তো টিনের তরবারি নয়? দেখি, দেখি, ওটা বার করে দে তো!'

কাঁপতে কাঁপতে রতন তলোয়ালখানা বার করে দেয়।

অস্ত্রটা হাতে পেয়ে এবার যেন মহিষাসুর হাসলেন।

—'বাঃ! খাসা জিনিস!'

লাঠিখানা ছিদামকে ফেরত দিয়ে তরোয়ালখানাই বাগিয়ে ধরেন এবার। ঠিক যেন মহিষাসুর। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরছে। তফাত এই যে মহিষাসুরের টিকি নেই, পণ্ডিতমশায়ের বিজয়কেতন ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। কোথাও কিছু নেই, হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি—'বল ছুছুন্দর! তারিণীর হাত থেকে মুকুট নিয়ে কোথায় রেখেছিলি?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে রতন বলে, 'আমি জানি না স্যার, আমি নিশ্চিত তারিণীদাকেই ফেরত দিয়েছিলাম বোধহয়!'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন পণ্ডিতমশাই, 'ওরে আমার তর্কচঞ্চু! একই নিশ্বাসে "নিশ্চিত" আর "বোধ হয়"! ঠিক করে বল অলম্বুষ! ফেরত দিয়েছিলি, না নিজের মাথায় পরেছিলি?'

—'একবার পরেই ফেরত দিয়েছিলাম স্যার!"

—'বর্ত্মে এস বাছাধন! কেন পরেছিলি? তুই বেটা ধুরন্ধর সৈনিক, তুই কোন সাহসে ত্রিপুরাধিপতির রাজমুকুট মাথায় পরলি, তাই আগে বল! না হলে ঐ ফুটন্ত জল দেখছিস?'

গ্রীনরুমের ওপাশে হাঁড়িতে চায়ের জল চড়ানো আছে। সেইদিকে নাটকীয়ভাবে পণ্ডিতমশাই তরোয়ালটা নির্দেশ করেন। রতন তাকিয়ে দেখে সেদিকে।

—'ব্যাকরণ পড়িস? বল বলীবর্দ! নিপাতনে সিদ্ধ মানে কী?'

রৎনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—'মুকুট খুঁজে না পেলে আজ তোকে ঐ ফুটন্ত জলে 'নিপাতনে সিদ্ধ' কাকে বলে তাই শেখাব!'

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে রৎনা।

হেডমাস্টারমশাই ঠিক তখনই ফিরে আসেন। ঠিক ছটা বাজে তখন। কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছেন তিনি এই কয় মিনিটেই। বলেন, 'বয়েজ! এই এগারো বছরের ট্র্যাডিশন আজ নষ্ট হবে? পাঙচুয়ালি শুরু করতে পারব না আমরা?'

রমেশবাবু বলেন, 'না না, আমরা ঠিক সময়েই শুরু করব। পরিমল একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে—তার মধ্যেই ওটা আমরা খুঁজে বার করছি।'

ঠিক ছটা বেজে তিন মিনিটে যথারীতি পর্দা উঠে গেল। কথা ছিল পরিমল গাইবে—'সবারে করি আহ্বান'; কিন্তু সে নার্ভাস হয়ে শুরু করল—'তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো প্রভু।'

গান শেষ হয়ে এল, তখনও হারানো মুকুটের পাত্তা নেই। পরিমল উইংস-এর দিকে এক নজর দেখে নিয়ে অন্তরাটা ফিরেফিত্তি শুরু করে। হেডমাস্টারমশাই হঠাৎ হেবোর দিকে ফিরে বলেন, 'একী হেবো! তুমি এমন চুপচাপ বসে আছ যে? খুঁজছ না? তোমরা থাকতে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে অথচ তোমরা হাত-পা ছেড়ে বসে আছে?'

হেবো মুখটা কাঁচুমাচু করে বলে, 'আপনি যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন স্যার! না হলে এমন সহজ কেসটা তো কখন সল্‌ভ্ করে ফেলতাম!'

চমকে ওঠে সবাই। রমেশবাবু বলেন, 'তার মানে? তুমি বলে দিতে পার মুকুট কে নিয়েছে?'

অম্লানবদনে হেবো বললে—'তা পারি বই কি স্যার।'

—'কী আশ্চর্য! তবে অমন চুপ করে আছ কেন?'

—'হেডমাস্টারমশাই যে আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বারণ করেছেন।'

—'কে? কে নিয়েছে মুকুট?' চোখ লাল করে প্রশ্ন করেন হেডপণ্ডিতমশাই।

হেডমাস্টারমশাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, মুকুটটা বর্তমানে কোথায় আছে তা জান?'

—'তাও জানি স্যার!'

—'কোথায়? কোথায়?' হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই।

গোবেচারির মতো মুখ করে হেবো হেডমাস্টারমশাইকে বলে 'বলব স্যার?'

—'বল, বল, আমাকে আর দগ্ধে মের না!'

—'বলছি স্যার। কিন্তু হারানো জিনিস খুঁজে দিলে আমাকে কী পুরস্কার দেওয়া হবে?'

সবাই চমকে ওঠে। রমেশবাবু আত্মসম্বরণ করে শুধু বলেন—'পুরস্কার! তুমি কী বলছ হেবো! এই কি দর-দাম করবার সময়?'

হেবো একগুঁয়ের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হেডপণ্ডিতমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই নিজেই বলেন—'বেশ, বল বিনিময়ে কী পুরস্কার চাও তুমি?'

অম্লানবদনে হেবো বললে—'আর কিছু নয়, রতন তার তরোয়ালটা সুবলদাকে দিক।'

বলা বাহুল্য রতন তাতে এককথায় রাজি।

একলহমায় হেবো গ্রীনরুমের এক অন্ধকূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনল ত্রিপুরাধিপতির অপহৃত রাজমুকুট।

হেডপণ্ডিতমশাই বলেন—'এবার বল হেবো, কোন অনড্বান...'

—'না, এখন নয় পণ্ডিতমশাই! ওটা আমি দেখব।—হেবো, অভিনয় শেষ হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

—'করব স্যার।'

পরিমলের গান শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল অভিনয়।

* * *

সবাই চলে গেলে হেবোর ডাক পড়ল হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে।

সেখানে দু-জনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল আমি জানি না। তবে খবর নিয়ে জেনেছি, হেডমাস্টারমশাই মুকুট চুরির অপরাধে স্কুলের কোনো ছেলেকে কোনো শাস্তি দেননি।

শাস্তি পেয়েছিল নিরপরাধ হেবো। সেই ডাক-পিয়ন মারফৎ। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনসাতেক পর সে আবার পেল একখানা চিঠি :

'ছিঃ হেবো! শেষে আজকাল নিজেই চুরি করে নিজেই গোয়েন্দাগিরি করছ!'

পলাশপুর পর্ব

বছর ঘুরে এল। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে অবিনাশবাবু কোথাও যেতে পারবেন না। ছুটির মধ্যেও তাঁকে দু-একদিন নাকি কলেজে যেতে হবে। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হেবোর। গত বছর এমন একটা ছুটিতেই কাশী যাওয়ার পথে সে অত বড় কাণ্ডটা করে। পথে বার না হলে কি আর চোর-ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায়? অত বড় সুযোগটা বোধহয় এবার নষ্ট হয়।

হঠাৎ হেবোর মা একদিন বললেন—'তোদের তো ছুটিই আছে, আমাকে একবার পলাশপুরে নিয়ে চল না। অনেকদিন জ্যাঠামশাইকে দেখিনি—শুনছি তাঁর খুব অসুখ। তোরা দুই ভাই পারবি নিয়ে যেতে?'

হেবো তো একপায়ে খাড়া। মায়ের জ্যাঠামশাই অর্থাৎ দাদুকে খুব ছেলেবেলায় একবার দেখেছিল ওরা। পলাশপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার তিনি। অনেক গল্প শোনা আছে দাদুর নামে। এবার স্বচক্ষে দেখা যাবে। বাদ সাধল মেজদা, বললে—'দেখ মা, নিয়ে আমি তোমাকে যেতে পারি, কিন্তু হেবোকে সামলানো আমার কর্ম নয়! কখন ওর মাথায় পোকা নড়বে আর ও গোয়েন্দাগিরি শুরু করবে! সুতরাং হয় হেবো তোমার সঙ্গে যাক, আমি থাকি অথবা আমি যাই হেবো থাকুক।'

মা হেসে বললেন—'না, হেবোকে আমিই সামলাবো। তোকে ভাবতে হবে না।'

অগত্যা হেবো, তার মা আর মেজদা একদিন এসে হাজির হলেন পলাশপুরে। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক পলাশপুর শহরেই শুধু নয় সারা অঞ্চলটার মধ্যে সবচেয়ে পশারওয়ালা ডাক্তার। বয়স যাটের কোঠায়, সত্তর ছুঁই-ছুঁই। তবু এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারেন। মস্ত বাড়ি, গাড়ি, বাজারের ওপর ডিস্‌পেন্সারি। রায়সাহেব নিজে নিঃসন্তান। তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে ছাড়া অত বড় বাড়িটায় আর যারা থাকে তারা চাকর ড্রাইভার অথবা দরোয়ান শ্রেণীর। রায়সাহেবের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই ভাগ্নেটির দুর্ব্যবহারে নাকি আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই একে-একে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হেবোর মাও এজন্য আসতেন না তাঁর জ্যাঠার কাছে, তবে আজ নাকি তিনি মরণাপন্ন অসুস্থ, তাই এসেছেন।

দাদুর বাড়িতে পৌঁছেই হেবোর মনে হল, আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারি-ভারি। দাদু কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন না। গুম হয়ে পড়ে আছেন নিজের শোবার ঘরে। ওদের খাওয়া-থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা করল পুরনো দিনের চাকর—নটবর।

ভাগ্নেপ্রবর লুটুবাবু সারা জীবনে কাজ-কর্ম চাকরি-বাকরি কিছুই করেননি। প্রয়োজন হয়নি। ছেলেবেলা থেকে মামার অন্নধ্বংস করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কাজ ছিল না তাঁর। তাই তিনি শখের আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলেন। ছবি আঁকা, মডেল গড়া—এইসব নিয়েই তাঁর সময় কাটে। বাড়ির একতলায় তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য। তার নাম 'স্টুডিও'। সেখানে রাখা আছে তাঁর ছবি আর মাটির মূর্তি। সেখানে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না। ভাগ্নেপ্রবরের ঐ ঝাঁকি-দর্শনের মধ্যেই হেবো চিনে ফেলেছে লোকটাকে। এমন কাঁচা-পাকা বেড়াল-গোঁফ কখনো কোনো আর্টিস্টের হয়? তাই কি ওঁর স্টুডিও সর্বদা তালাবন্ধ?

হেবোর মা একবার তাঁকে আড়ালে ডেকে অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু ভাগ্নেপ্রবর কিছুই ভাঙলেন না। বোঝা গেল এঁদের আগমনে লুটুবাবু খুশি হতে পারেননি। অসুখের কথা জানাবার জন্য মা যখন বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন উনি শুধু বললেন—'টাকার গরম দিদি। বেশি টাকা থাকলে অমন শখের অসুখ অনেকেরই হয়!'

এরপর আর কথা চলে না। হেবোর মা ওদের দু-ভাইকে ডেকে বললেন—'দেখ, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোদের দাদুর ঠিকমত চিকিৎসাই হচ্ছে না। তোদের উচিত, যে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছেন তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। দরকার হলে তোদের বাবা অথবা মেসোকে টেলিগ্রাফ করে আনতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, লুটুকে আমার ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে নটবর হুড়মুড় করে এসে পড়ে মায়ের পায়ের ওপর। বলে—'আপনি ঠিকই ধরেছেন মা! বুড়ো কর্তা এক্কেরে বিন-চিকিচ্ছেয় মারা যাচ্ছেন!'

এইবার একটা সূত্র পাওয়া গেল। নটবরের কাছ থেকে অসুখের একটা আদ্যোপান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা শক্ত হল না। মাসখানেক আগে এক রাত্রে রায়সাহেব নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এ ঘটনা ঘটে তাঁরই ডিস্‌পেন্সারি-ঘরে। তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হয়। পরদিনই তাঁর প্রবল জ্বর আসে। আর এরপর থেকেই রায়সাহেব একেবারে বদলে গিয়েছেন। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন। কাছে লোক না থাকলে আঁতকে ওঠেন। শোবার ঘর ছেড়ে একেবারেই বার হন না। ওঁর বাইরের ঘরটা তালাবন্ধ করে ফেলে রেখেছেন তারপর থেকে। কাউকে ঢুকতে দেন না সে ঘরে। কেন, তা কেউ জানে না।

মেজদা বলে—'এ রকম হঠাৎ ভয় পাবার কারণটা কী?'

—'আজ্ঞে বুড়ো কর্তার দার্জিলিঙে একটা বাড়ি আছে। গরমকালটা তিনি প্রতি বছর সেখানে কাটিয়ে আসেন। সেবার সেখান থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটা নেপালী দরোয়ান। মোহন থাপা। আমরা তাকে বলতাম বাহাদুর। সে থাকত ঐ পশ্চিমের ঘরটায়। একদিন কী হল—মোহন থাপা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তারপর থেকেই বাড়িতে নানান উৎপাত শুরু হল। দরজা-জানলা ইচ্ছেমতো খোলে, ইচ্ছেমতো বন্ধ হয়। মাঝরাত্রে টিনের চালায় কারা যেন হেঁটে বেড়ায়। বুড়ো কর্তা দার্জিলিঙ থেকে ওর ছোট ভাইকে আনালেন। তার নাম কিশোর থাপা। বললে বিশ্বাস করবেন না, সে দেখতে হুবহু ওর দাদার মতো। লোকটা যেদিন এল বুড়োকর্তাই তাকে প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। পরে জানা গেল লোকটা বাহাদুরের প্রেতাত্মা নয়, যমজ ভাই। কিন্তু বুড়োকর্তা তাকে সহ্য করতে পারলেন না। রাত-বিরেতে হঠাৎ তাকে দেখলেই উনি চমকে উঠতেন। মনে পড়ে যেত তার দাদাকে। শেষে তিন মাসের মাইনে দিয়ে তাকে তিনি দার্জিলিঙের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তেনাদের অত্যাচার চলতেই লাগল। কত শান্তি-সস্ত্যেন করা হল। ডাক্তার মৈত্রই ব্যবস্থা করেছিলেন এসবের...'

—'ডাক্তার মৈত্রটা কে?' জিজ্ঞাসা করল হেবো।

—'বুড়োকর্তাকে যিনি চিকিচ্ছে করেন আর কি। বিলেত-ফেরত আর জোয়ান বয়স হলে কী হবে, বামুনের ছেলে তো? গলায় পৈতেও আছে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তিও করেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন শান্তি-সস্ত্যেনের। মায় গয়ায় পিণ্ডি পর্যন্ত দিয়ে আসা হল—কিন্তু তেনাদের দাপাদাপিটা কিছুতেই বন্ধ হল না।'

মেজদা প্রশ্ন করে—'কিন্তু বাইরের ঘরে কী আছে তাহলে?'

নটবর কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে চুপ করে গেল। ঘরে এলেন লুটুবাবু। এসেই ধমকে দিলেন নটবরকে—'কী রে বেটা! এদের ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস তো? চাপ্‌কে পিঠের ছাল তুলে দেব!'

হেবোর মা বলেন—'নটবরের দোষ নেই, আমরাই ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

লুটুবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলেন—'তোমাদেরই বা ওসব কথায় থাকার দরকার কী? জ্যাঠাকে দেখতেই তো এসেছ দিদি, ভূত দেখতে তো আসনি!'

হেবো বুঝতে পারে ভেতরে ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এক্ষেত্রে দাদুকে রক্ষা না করলে তার অধর্ম হবে। ওসব ভূত-টুত সে মানে না। এসব আসলে কারও শয়তানি। কার হতে পারে? লুটুমামা, নটবর, কিশোর থাপা? বাড়িতে আর কে কে থাকে? কাউকে কিছু না বলে সে সুটকেস খুলে একে-একে তার সাজ-সরঞ্জামগুলো বার করে। মাপবার ফিতে, ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস, নোটবই, পেনসিল—

মেজদার মুখে খেলে গেল একচিলতে হাসি, বললে—'শার্লক হেবোর নাক-সুড়সুড়ানি শুরু হয়েছে!'

হেবো জবাব দিল না।

* * *

সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র পরীক্ষা করতে এলেন দাদুকে। হেবো তখন স্পষ্টই তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দাদুর অসুখটা কী? লুটুবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন—'তাতে তোমার কী দরকার হে ছোকরা?'

ডাক্তার মৈত্র তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'আহাহা, রাগ করছেন কেন? ছেলেটি তো নেহাত ছোটও নয়, এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। ওদেরও কিছু-কিছু জানা দরকার।' তারপর হেবোর দিকে ফিরে বলেন —'তোমার দাদু একটা মানসিক অসুখে ভুগছেন। হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছেন আর কি।'

হেবো আর কথা বাড়ায় না। সে বুঝতে পারে আসল ক্লু লুকোনো আছে ঐ তালাবন্ধ ঘরে। ও-ঘরে দাদু কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? ঐ ঘরটা সবার আগে ভাল করে সার্চ করে দেখা দরকার। কাজটা খুবই কঠিন। দাদু কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছেন—ও-ঘরে কেউ যাবে না। তালাবন্ধ ঘরের চাবিটা থাকে দাদুর বালিশের নিচে।

কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকে অত সহজে হতাশ হতে নেই। হেবো রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বসল দাদুকে সেবা করতে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হেবোর মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। খুশি হলেন—হেবো যে তার পাগলামি ছেড়ে দাদুর সেবায় মন দিয়েছে এতে মনে মনে উৎফুল্ল হলেন তিনি। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়লেন দাদু। হেবোও উঠে যায়। বলা বাহুল্য ঐ ফাঁকে দাদুর বালিশের তলা থেকে একটি চাবি চলে আসে হেবোর পকেটে।

মধ্যরাত্রে সবাই যখন অঘোর ঘুমে অচেতন তখন হেবো চুপিসারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে চলে আসে বাইরের ঘরে। তালা খুলে ঘরে ঢোকে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ বার হচ্ছে ঘরটা থেকে। হেবো আলো জ্বালল না। একটা টর্চের আলোয় ঘরখানা ভাল করে দেখল। ঘরটা মামুলিভাবে সাজানো। চেয়ার-টেবিল-আলমারি-সোফা। দেওয়াল-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে সওয়া সাতটা বেজে। ক্যালেন্ডারের পাতা ছেঁড়া হয়নি এ মাসে। গতমাসের পৃষ্ঠাটা প্রমাণ দিচ্ছে ঘরটা মাসাধিককাল অব্যবহৃত পড়ে আছে। সব আসবাবপত্রে, মায় মেঝেতে, ধুলোর একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। হেবো লক্ষ করে দেখে দাদুর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজগুলো তালাবন্ধ। টেবিলের ওপর কলমদানি, কাগজ-চাপা, কিছু ফাইলপত্র, একটা পিনকুশন, টেলিফোন ডাইরেক্টরি, আর টেলিফোনটা নামানো আছে সেই ডাইরেক্টরির ওপর। কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, টেলিফোনের মাউথ-পিসের ওপর মাকড়সার জাল হয়েছে। অর্থাৎ অনেকদিন ধরেই ওটা ঐভাবে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দাদু শেষবার যখন এ ঘর তালাবন্ধ করে যান মাসাধিককাল আগে তখন টেলিফোনটাকে ক্র্যাড্‌ল্-এর ওপর রেখে যেতে ভুলে গিয়েছেন। হেবো মনে করে দেখে, ওরা আসার পর বাড়িতে টেলিফোন একবারও বাজেনি। বাজবে কোথা থেকে? আজ এক মাসের ওপর ওদের টেলিফোন সবসময় এনগেজ্‌ড্!

হেবো পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে আলগোছে টেলিফোনটা তুলে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পাওয়া গেল না ঘরে। ভূতের নামগন্ধও নেই। ঘর তালাবন্ধ করে চাবিটি আবার হেবো রেখে দেয় দাদুর বালিশের তলায়। সারারাত বেচারির ঘুম হল না। কী হতে পারে? কেন এমন অহেতুক ভয় পেলেন দাদু? কে ভয় দেখালো? কী ভয় দেখালো, আর কেনই বা দেখালো?

হঠাৎ ভোর রাতে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। ও কীসের শব্দ? ঘুমের জড়িমা কেটে যেতেই হেবো বুঝতে পারে পাশের তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন বাজছে। হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখলে, রাত তখন সাড়ে তিনটে। এত রাত্রে কে টেলিফোন করছে? ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখে তালাবন্ধ ঘরের কপাট খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে হেবো। দেখে দাদু ইতিমধ্যেই এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকেছেন। দরজার ফাঁক দিয়ে হেবো লুকিয়ে দেখতে থাকে।

দেখে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাদু টেলিফোন কথা বলছেন :

—'কে তুমি? তুমিও রায়সাহেব? লায়ার! না তুমি রায়সাহেব নও! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ কেন! বল তুমি কে? ...অ্যাঁ! কে?...তুমি?তোম্?...ক্যয়সে তোম?'

হাত থেকে পড়ে গেল টেলিফোনটা। রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। হেবো চিৎকার করে ওঠে। লোকজন ছুটে আসে। মা, লুটুমামা, নটবর। ধরাধরি করে ওঁকে সবাই নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। কিছুদিন হল একটু সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি, আবার জ্বর এল পরদিন সকালে।

সকালবেলা শহরের সব কজন বড় ডাক্তারই দল বেঁধে দেখতে এলেন রায়সাহেবকে। অন্যান্য জুনিয়ার ডাক্তাররা নিবারণচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেই খবর নিতে আসতেন সকাল-সন্ধ্যায়। ডাক্তার মৈত্র সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করছিলেন। ডাক্তার মৈত্র অবশ্য সবে ডাক্তারিতে ঢুকেছেন। অল্প বয়স। পলাশপুরে এসে নিবারণচন্দ্রের জুনিয়ার হিসাবে ঐ ডিস্‌পেন্সারিতেই বসছিলেন। দাদুর অত বড় প্র্যাকটিসের ঠেলা সামলাতে ভদ্রলোক একেবারে প্রাণান্ত হয়ে পড়েছেন। দেহাত থেকে দলেদলে রুগী আসে সকালবেলা এখনো ওঁর চেম্বারে। তাদের ওষুধ দিয়ে বিদায় করে—দাদুর পুরাতন কেসগুলি তাদের বাড়ি গিয়ে দেখে, তারপর বেলা দুটোই হোক তিনটেই হোক তিনি নিবারণবাবুকে দেখতে আসেন। দাদুকে পরীক্ষা করে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা শেষ করে তবে বাড়ি যান, স্নানাহার করেন। দাদু খুবই স্নেহ করেন এই জুনিয়ার ডাক্তারটিকে, আর তিনিও দাদুকে বাপের মতো শ্রদ্ধা করেন। মাঝে মাঝে যেদিন ডাক্তার মৈত্রর বেশি বেলা হয়ে যায় সেদিন দাদু ওঁকে ধমক দেন—'এত বেলা হয়ে গিয়েছে, এখনও তোমার স্নানাহার হয়নি? ও বেলায় এলেই পারতে!'

ডাক্তার মৈত্র জবাব দিতেন না। চুপচাপ পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখতেন তিনি।

তবু কী জানি কেন হেবোর মা একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তিনি কী সব পরামর্শ করলেন। হেবো আন্দাজ করলে সবই, কিন্তু ওঁরা যখন তাকে পরামর্শ করতে ডাকলেন না তখন সেও ওপরপড়া হয়ে গেল না কথা বলতে। বেশ তো, ওঁরা যা ভাল বোঝেন করুন, হেবোও যা ভাল বুঝবে করবে।

পরদিনই অজিতেন্দ্রবাবু, মানে হেবোর মেসোমশাই, এলেন মরণাপন্ন জ্যেঠশ্বশুরকে দেখতে। বোঝা গেল নিভৃত কক্ষে মা-মেজদার আলাপটা কী-জাতের হয়েছিল। অজিতেন্দ্রবাবু পুলিশের দারোগা, এসেছেন কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তাঁকে দেখে লুটুবাবুর মুখখানি কালো হয়ে গেল, বললেন—'এ কী, আপনি?'

—'হ্যাঁ, এলাম। ওঁকে দেখতে।'

—'এত দেখার কী আছে তাও তো বুঝি না। মামা মিস্ ইন্ডিয়াও না, তাজমহলও না! তবু এত লোকে দেখতে আসে কেন, কে জানে!'—বলেই বেরিয়ে যান তিনি।

অজিতেন্দ্রবাবুকে হেবোর মা আড়ালে ডেকে সমস্ত কথা বললেন। মেজদাও ছিল সে গোপন পরামর্শ-সভায়। হেবো ঘরে ঢুকতেই হেবোর মা বললেন—'আমরা একটু জরুরি কথা বলছি হেবো, তুমি বরং একটু পরে এস।'

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে হেবোর। বেশ মজা! এ সমস্যার সমাধান যার পক্ষে করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাকেই ওঁরা আমল দিতে চাইছেন না। কেন? সে বয়সে ছোট বলে? সে মেজদার মতো কলেজে ক্লাস করতে যায় না বলে? কিন্তু বয়সে ধেড়ে হয়েও যে বুদ্ধিতে বেঁড়ে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? সেবার কাশী যাওয়ার পথে আবগারি পুলিশের বড়কর্তা সেই মুখার্জিসাহেবকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে ঐ ছোট ছেলেটির কাছে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিশিতে পাঠাই! তা সেই মুখার্জিসাহেবের বয়স কি হেবোর চেয়ে কম ছিল? বেশ, থাক, দরকার নেই! যা করার একাই করবে হেবো। কারও সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজন নেই!

বাগানে নেমে যায় সে। পেয়ারাগাছ থেকে একটা ডাঁশামতন পেয়ারা পেড়ে ডালে পা ঝুলিয়ে জুত করে চিবোতে বসে। নিচু গলায় গান ধরে—'ও তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

*　　　*　　　*

পরদিন ডাক্তার মৈত্র যখন রায়সাহেবকে দেখতে এলেন, তখন হেবো, মেজদা আর অজিতেন্দ্রবাবু বসেছিলেন সেখানে। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, বলেন—'ডাক্তার মৈত্র, আপনি ডাক্তারি ব্যাগ ব্যবহার করেন না কেন? এ রকম একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছেন?'

ডাক্তার মৈত্রর হাতে ছিল একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। পি-এ-এ মার্কা। অর্থাৎ প্যান-অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের এয়ার-ব্যাগ। সচরাচর ডাক্তারদের যেমন কালো ডাক্তারি ব্যাগ হয়, তা নয়।

ডাক্তারবাবু বলেন—'এটাতে আমার হাত ধোবার তোয়ালে সাবান ইত্যাদি থাকে। ডাক্তারি-ব্যাগ আমার গাড়িতেই আছে।'

বলতে বলতেই নিবারণবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হাজিরা সিং ঘরে এল। তার হাতে কালো একটা চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ। ডাক্তার মৈত্র সেই ব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর শিশি বার করে নেন। রায়সাহেবকে ফুঁড়তে ফুঁড়তে বলেন—'বিলেত থেকে ফেরার সময় আর জাহাজে আসিনি, প্লেনে এসেছিলাম। ঐ ব্যাগটা তখন থেকেই আমার সঙ্গে আছে।'

হেবো ফস করে প্রশ্ন করে বসে—'আপনি বিলেত গিয়েছিলেন বুঝি?'

রায়সাহেব জবাব দেন—'মৈত্র এম. আর. সি. পি.। উফ্! ইন্ট্রাভেনাস দিলে নাকি?'

'না ইন্ট্রাভেনাস নয়।'—বলেন ডাক্তার মৈত্র, দাদুর বাহুমূলটা ডলতে ডলতে।

হেবো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ধমক দিলেন লুটুবাবু—'তোমরা রুগীর ঘরে কেন?'

অজিতেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিতে হেবো বেরিয়ে আসে। আর কিছু কথোপকথন সে শুনতে পায় না। না পাক ক্ষতি নেই; শিকারী বিড়ালটিকে সে চিনতে শুরু করেছে ঠিকই। আপনমনে বাগানে পায়চারি করতে করতে হেবো গুনগুন করে সুর ভাঁজে, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে।'

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মডেলের কালো শেভ্রলেখানা। দাদুর অনেকদিনের গাড়ি। হেবো পায়ে পায়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে চায় হেবো—'ড্রাইভারদাদা, আমাদের শহরটা একদিন দেখিয়ে আনলে না তো তুমি?'

হাজিরা সিং বলে—'কেয়া কিয়া যায় বোলিয়ে ছোটাসাব। মেরা তো মরণেকা ভি ফুরসৎ নেহি।'

তা বটে। হাজিরা সেই সাত-সকালে গাড়ি বার করে হাজিরা দেয়; আর সারাদিন তাকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। অনেকদিনের পুরনো গাড়ি। আজ এটা কাল সেটা খুটখাট মেরামতি লেগেই আছে, তবু এতদিন শুধু বাড়ি থেকে চেম্বার আর চেম্বার থেকে বাড়ি যাতায়াত করতে হত। বয়স হয়ে যাওয়ায় দাদু আজকাল আর দেহাতে কলে যেতেন না। যেটুকু রুগী দেখতেন তা ঐ চেম্বারে বসেই। বড়জোর শহরে দু-একটা পুরনো ঘরে রুগী দেখতে যেতেন। এখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার মৈত্রকে ঠেকাতে হচ্ছে সেই রুগীর ঝামেলা। ড্রাইভারকেও ঘুরতে হচ্ছে সারাদিন। ডাক্তার মৈত্র তো আর বয়সের দোহাই দিতে পারেন না। ডাকলে রুগীর বাসায় গিয়েও দেখে আসতে হয়। ফলে বেচারি হাজিরা সিং-এর আর মরবার ফুরসত নেই।

হেবো প্রশ্ন করে একে-একে। হাজিরা সিং কতদিন কাজ করছে, চেম্বারে দাদুর কতজন কর্মচারী আছে, কে কেমন লোক। হাজিরা সিং তার ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে সব কথা বলে যায়। হাজিরা সিং পুরনো লোক। মোহন থাপার আগেই কাজে বহাল হয়েছে সে। তবে, নটবর তার থেকেও আগে এসেছে এ বাড়ি। কিশোর থাপা? সে তো এসেছে সবে। মোহন থাপা আত্মহত্যা করার পরে। দাদুর চেম্বারে আছেন জনাছয়েক কর্মচারী। তাদের মধ্যে ভবেশ গাঙ্গুলীই পুরনো লোক। পাশ-করা কম্পাউন্ডার। হীরেন আর গোরাবাবুও পাশ-করা কম্পাউন্ডার। ক্যাশ থাকে ভবেশবাবুর কাছে। আগে দাদু তাঁর কাছ থেকে দৈনিক ক্যাশ বুঝে নিতেন। এখন ডাক্তার মৈত্র সেটা বুঝে নেন। ডিস্পেন্সারির যাবতীয় ঝামেলা একা মৈত্রকেই সামলাতে হয়। মৈত্র এসেছেন বছরখানেক আগে। বেশ সজ্জন, সকলের সঙ্গেই ভালো ব্যবহার করেন। গোরাবাবু লোকটাকে হাজিরা সিং বরদাস্ত করতে পারে না। কেমন যেন চোর-চোর ভাব লোকটার। লুটুবাবু খুব বিশ্বাস করেন তাকে। হাজিরা সিং দেখেছে প্রায়ই গোরাবাবু এসে লুটুবাবুকে কী সব গুজুর-গুজুর করে বলে যায়।

রাত্রে অজিতেন্দ্রবাবু হেবোর মাকে বললেন—'ডাক্তার মৈত্রর কাছে সব কথা শুনলাম। আমার মনে হয় আপনারা ভুল আশঙ্কা করছেন। ভূতের ভয় ইচ্ছে করে কেউ ওঁকে দেখাচ্ছে না। কারই বা স্বার্থ হবে এভাবে ভূতের ভয় দেখাবার?'

মা কিন্তু যুক্তিটা মেনে নিতে পারেন না, বলেন—'ভূতের ভয় দেখাবার স্বার্থ হতে পারে তার, যে আশা করছে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলে এ সম্পত্তিটা তার হাতে আসবে।'

অজিতবাবু বলেন—'বেশ তো, আমরা তো আরও কিছুদিন আছি। দেখাই যাক না পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।'

মা বলেন—'কিন্তু ওঁকে আপাতত এখান থেকে সরিয়ে কলকাতা নিয়ে গেলে হয় না? এ বাড়িতে উনি আবার ভয় পেতে পারেন।'

—'সে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু লুটুবাবু রাজি নয়।'

—'সে কেন রাজি নয়?'

—'বলছে এক হাতেই চিকিৎসা হওয়া ভাল।'

হেবো সব কথা শুনল চুপিসারে।

* * *

অনেক রাত্রে হেবোর ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর ঘরে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কান খাড়া করে খানিকটা শুনল হেবো। হ্যাঁ, ঠিকই। কথা বলছে কেউ। পা টিপে টিপে এ-ঘরের কাছে এসে উঁকি দিতেই হেবো দেখতে পেল—দাদু আর ওর মেসোমশাই অজিতেন্দ্রবাবু বসে কথা বলছেন। দাদু বলছিলেন—'বুঝলে অজিত, সেদিন থেকেই আমার মনে হল মোহন থাপার অতৃপ্ত আত্মাটা এ বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু আমি নই, হাজিরা সিং, নটবর—ওরাও বললে যে অপদেবতার অস্তিত্ব ওরাও টের পেয়েছে। মৈত্র বললে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে। পূজা-অর্চনা সবই করা হল, কিন্তু অতৃপ্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তি হল না। এই সময়, বুঝলে অজিত, একদিন এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল...'

ঘটনাটা আদ্যন্ত শুনে হেবোর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। রায়সাহেব সন্ধ্যাবেলা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকেই ওঁর শরীরটা খারাপ। আকাশের অবস্থাও খারাপ। টিপি-টিপি বৃষ্টি নেমেছে। রুগীদের বিদায় করে সন্ধে রাতেই বাড়ি ফিরে আসবেন স্থির করলেন। চেম্বারে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন না। হীরেন, গোরা আর ভবেশবাবু ছিলেন। রায়সাহেব ডিস্‌পেন্সারিতে ওঁর টেলিফোনটা তুলে নিলেন, ইচ্ছা, বাড়িতে ফোন করে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বলবেন। ফোন তুলে অপেক্ষা করতেই অপারেটর বলল—'ইয়েস?'

—'নাম্বার থার্টিন প্লিজ।'

ওঁর বাড়ির নাম্বার তের, আর চেম্বারের নাম্বার চৌদ্দ।

প্রথমে রিঙিং টেনে, এবং তার পরেই শুনলেন—'হ্যালো।'

—'নাম্বার থার্টিন? রায়সাহেবের বাড়ি?'—প্রশ্ন করলেন রায়সাহেব।

—'জী হাঁ, বোলিয়ে।'

একটু ঘাবড়ে গেলেন রায়সাহেব। বাড়িতে আছেন লুটুবাবু আর নটবর, হিন্দিতে তারা কথা বলবে কেন? তাই একটু অবাক হয়ে বলেন—'তুমি কে কথা বলছ?'

—'আপ কৌন?'

—'আরে আমি রায়সাহেব। তুমি কে? লুটু অথবা নটবরকে ডেকে দাও—'

—'সালাম বড়াসাব, ম্যয় বাহাদুর।'

রায়সাহেবের হাত থেকে টেলিফোনটা পড়ে যায়। তখনও কিশোর থাপা কাজে লাগেনি। বাহাদুর বলতে তখন সকলে মোহন থাপাকেই বুঝত। আর সেই বাহাদুর তার দিন-দশেক আগে আত্মহত্যা করেছে।

তাঁকে ঐভাবে বসে পড়তে দেখে ভবেশবাবু ছুটে এসে বলেন—'কী হয়েছে স্যর?'

—'কিছু না। তুমি একটা রিক্‌শা ডেকে দাও।'

রিক্‌শা করে বাড়ি ফিরে এসে রায়সাহেব দেখেন, লুটুবাবু বাড়ি নেই। নটবর বললে ইতিমধ্যে তাঁর বসার ঘরে কেউ ঢোকেনি। সে অবশ্য রান্নাঘরে ছিল। টেলিফোন বেজেছিল কিনা, তা সে জানে না। অবাক কাণ্ড! কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কি ভুল শুনেছেন? অতগুলো কথা। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করেও ঘুম এল না। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে

আসছে। বৃষ্টিটাও ঝেঁপে এসেছে। লক্ষণ ভাল নয়। রায়সাহেবের মনে হল একটু মেডিকেটেড ব্র্যান্ডি খেতে পারলে ভাল হত। মদ উনি খান না। ঘরে ব্র্যান্ডি নেই। কিন্তু ডাক্তারখানায় আছে। দেওয়াল-ঘড়িতে দেখেন, রাত দশটা। এখনও কি ডিস্‌পেন্সারি খোলা আছে? দেখাই যাক না। তাই শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে এসে ফোনটা তুলে নিলেন—উদ্দেশ্য, ডিস্‌পেন্সারি খোলা থাকলে একটা ওষুধ এনে খাবেন। ফোনটা তুলে নিয়ে নাম্বার চাইলেন। ও-প্রান্ত থেকে ভারি গলায় শোনা গেল—'হ্যালো!'

—'এটা কি নাম্বার ফোর্টিন? রায়সাহেবের ডিস্‌পেন্সারি?'

—'ইয়েস, স্পিকিং।'

—'তুমি কে কথা বলছ?' প্রশ্ন করেন রায়সাহেব।

—'তুমি কে কথা বলছ?' প্রতিধ্বনি করে যেন ও লোকটা।

—'কে মৈত্র নাকি?'

—'আঃ! বললাম তো এটা রায়সাহেবের ডিস্‌পেন্সারি। আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? কী চাও?'

রায়সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বলেন—'রায়সাহেব! কোন রায়সাহেব?'

ও প্রান্তের লোকটা ধমকে ওঠে—'ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক কথা বলছি। তুমি কে হে ছোকরা?'

রায়সাহেব কোনো জবাব দিতে পারেন না। ফোন রেখে বসে পড়েন। মিনিটখানেক বোধহয় তাঁর জ্ঞান ছিল না। তারপর বুঝলেন, এসব নিশ্চয়ই কারো শয়তানি। কে হতে পারে? রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক একজন অত্যন্ত মানী লোক, তাঁকে 'ঈডিয়ট' বলবার সাহস কার আছে? কিন্তু নাঃ, শরীর খারাপ বলে এসব বেয়াদবি বরদাস্ত করে যাওয়া চলে না। পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলেন উনি। ওঁর বসবার ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে হাঁকলেন—'ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো।'

বড়সাহেবের শরীর খারাপ শুনে গাড়ি গ্যারেজে তুলে রাখা হয়েছিল। আবার বার করা হল। রায়সাহেব সোজা গিয়ে উঠলেন ডিস্‌পেন্সারিতে। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। এখনই। গিয়ে দেখলেন, ডিস্‌পেন্সারির অন্যান্য কর্মচারীরা চলে গিয়েছে। ডাক্তার মৈত্র শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে উঠবার উপক্রম করছেন। রায়সাহেব বলেন—'তুমি আছ ভালই হয়েছে। আচ্ছা, এর মধ্যে কেউ ফোন করেছিল?'

—'আজ্ঞে না। আপনার টেলিফোন ছাড়া আর কারো ফোন তো আসেনি।'

—'আমার ফোন এসেছিল? কে ধরেছিল?'

—'আজ্ঞে আমি।'

—'তুমি? তবে তুমি কী সব আজেবাজে কথা বলছিলে?'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'সে কী স্যার? আমিও তো ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। আমি যতবার বলছি—"আমি মৈত্র, কী চাইছেন স্যার?" আপনি ততবারই শুধু বলছেন,—"আমি রায়সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" আমি আপনার গলার স্বর শুনে বেশ চিনতে পারছিলাম, তাই তখন অবাক হয়ে বললাম—"রায়সাহেব মানে? কোন রায়সাহেব?" তখন আপনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন—"ঈডিয়ট! পলাশপুরে ক-জন রায়সাহেব আছে? আমি ডাক্তার নিবারণ মৌলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।"'

রায়সাহেব ক্রমেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে তিনি একাই ভুল শোনেননি! কে এমন করছে? কেনই বা করছে? মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটা তুলে নেন। বাড়ির নাম্বার চাইলেন আবার। নিশ্চিত জানেন, তালাবন্ধ ঘরে কেউ সাড়া দেবে না। রিঙিং টোন বেজেই যাবে। সেই রিঙিং টোনের আওয়াজটা না শোনা পর্যন্ত ওঁর যেন মুক্তি নেই।

কী আশ্চর্য! একবার বাজতেই ও-প্রান্তের সেই তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন রিসিভারটা কে যেন তুলে নিল। অস্ফুটে কে যেন বললে—'হ্যালো!'

সে স্বরে মৃত্যুর হিমশীতল একটা স্পর্শ লেগে আছে।

রায়সাহেব শেষ সম্ভাবনাটা একবার হাতড়ে দেখতে চান : 'আপনার নাম্বার কত?'

ও প্রান্তবাসী ওঁর সেই শেষ অবলম্বনটা ধূলিসাৎ করে বলল—'তের নাম্বার হুজৌর!'

—'আমি রায়সাহেব বলছি, তুমি...তুমি কে?'

—'সেলাম বড়াসাব। ম্যয় বাহাদুর হুঁ!'

রায়সাহেব চিৎকার করে ওঠেন—'বাহাদুর! কৌন্ সা বাহাদুর?'

—'মোহন থাপা বাহাদুর। হুজৌর কা গোলাম, গরিবপরবর!'

রায়সাহেব নাকি আর সহ্য করতে পারেননি। এই উত্তর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ডাক্তার মৈত্র ওঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। রায়সাহেবের জ্ঞান হয়েছিল পুরো দু-দিন পরে। তার পর থেকেই তিনি অসুখে ভুগছেন।

হেবো সমস্ত বিবরণটা শুনল। অজিতবাবু দাদুকে বললেন—'আপনি ও ঘরের চাবিটা আমাকে দেবেন একবার?'

—'না না! ও ঘরে কেউ যাবে না তোমরা! ও ঘরে টেলিফোন আছে।'

*   *   *

দিনতিনেক পরে কলকাতা থেকে হেবোর মেসো অজিতেন্দ্রবাবুর এক বন্ধু এলেন। উনি নাকি লাইফ ইন্সিওরেন্সের অর্গানাইজার। পলাশপুরে এসেছিলেন নিজের কাজে। অজিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায়। অজিতেন্দ্রবাবুই তাঁকে ধরে এনেছেন এ বাড়িতে। ভদ্রলোকের নাম প্রবীর মুখার্জি। তাঁকে দেখে লুটুবাবু আরও বিরক্ত হলেন। এ কী, তামাসা দেখতে লোক জুটছে নাকি? কিন্তু অজিতেন্দ্রবাবু কোনো ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

হেবো বাইরের ঘরে ঢুকে দেখে, পাইপমুখো ভদ্রলোকটি বসে ওর মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। মাথার চুলগুলি উলটোনো। সুট পরে আছেন তিনি। মেসোমশাই বলেন—'এঁকে প্রণাম কর হেবো, ইনি হচ্ছেন...'

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'এস খোকা, আমার নাম প্রবীর মুখার্জি, তোমার মেসোমশায়ের বন্ধু আমি। এদিকে একটা ইন্সিওরেন্স কেসে এসেছিলাম, শুনলাম তোমরা এখানে আছ, তাই ভাবলাম—'

তাঁকে বাধা দিয়ে হেবো বলে—'আপনাকে কী বলে ডাকব? ডিটেকটিভ-কাকা?'

ভদ্রলোকের বাক্যস্ফূর্তি হল না। চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল শুধু। একটু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলেন—'সে কী? ও কথা কে বললে? আমি তো ডিটেকটিভ নই! ও রকম অদ্ভুত কল্পনা করলে কেন?'

'কল্পনা?' হাসল হেবো, বললে—'আজ্ঞে না। আমি কল্পনা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত! আজই একজন গোয়েন্দা এ বাড়িতে আসবেন এটা অনুমান করেছিলাম আমি। মেসোমশাই পুলিশের দারোগা, এসব ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের ওপর তিনি সচরাচর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এটা তো হচ্ছে অনুমান। আপনি ধরা পড়ে গেলেন দুটি কারণে। প্রথমত, মেসোমশাইকে আপনার পরিচয় দেবার সুযোগ না দিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করেছেন আপনি। আমার মতো বাচ্চা ছেলের কাছে আপনার এ বাড়িতে আসার কৈফিয়ত দেবার তো প্রয়োজন ছিল না। পরিচয়টা গোপন করার জন্য আপনার মনে যে অপরাধবোধ ছিল তারই তাগিদে একনাগাড়ে আপনি অহেতুক অনেক কথা বলে গিয়েছেন। তাছাড়া আপনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গিয়েছেন আপনার বুকপকেট থেকে উঁচু হয়ে থাকা ঐ ম্যাগনিফাইং গ্লাসে। বীমা কোম্পানির লোকের পক্ষে ওটা বেমানান।'

প্রবীরবাবুর চোখের মণিদুটো ট্যারা হয়ে গেল!

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'ওর কাছে লুকিয়ে পার পাবে না প্রবীর! ও একটি ক্ষুদে গোয়েন্দা! ওর কীর্তির কথা তোমাকে পরে বলব আমি। এখন এস, আলোচনা করা যাক।'

হেবোর মতো একটি হাফ-প্যান্টধারীর সঙ্গে রহস্যের আলোচনা করতে হবে শুনে প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'প্রবীরকাকা, আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, আপনি আপনার পরিচয়টা পালটান। বীমা কোম্পানীর দালাল নয়, আপনি নিজেকে পামিস্ট বলে পরিচয় দিন।'

—'কেন?'

—'বীমা কোম্পানির দালালের চেয়ে তাতে অনেক সুবিধা। সন্দেহভাজন যে-কজন লোক আছেন,—লুটুমামা, গোরাবাবু, নটবর, ভবেশবাবু এঁদের হাত দেখার অছিলায় নানান প্রশ্ন করতে পারবেন।'

প্রবীরবাবু হেসে বলেন—'ছেলেমানুষ! তাতে কী লাভ? আসল অপরাধী তো মিথ্যাই বলবে।'

—'খুব স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক উল্টোপাল্টা মিথ্যার ভেতর থেকেই ক্লু পাওয়া যায়। তাছাড়া এ কেসে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে ধুলোভর্তি বাইরের ঘরের ঐ টেলিফোনটা। ভবিষ্যতে হয়ত ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে হবে। পামিস্ট, মানে হস্তরেখাবিদের পক্ষে তার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটার সাহায্যে হাত দেখার অছিলায় আঙুলের ছাপের নকল তুলে নেওয়া সহজ।'

প্রবীরবাবু বুঝতে পারেন, হাফপ্যান্ট পরলেও ছেলেটির মাথাটি পাকা।

অজিতেন্দ্রবাবু আর হেবো ছাড়া প্রবীরবাবুর আসল পরিচয়টা আর কেউ জানতে পারল না, এমনকি হেবোর মা-ও নয়। হেবো মনে মনে খুশি হল। মেসোমশাই তাহলে তাকে ভরসা করতে শুরু করেছেন। অবশ্য এও সে বুঝতে পারে, নিজে-নিজেই প্রবীরবাবুর পরিচয়টা আবিষ্কার করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে দলে টেনেছেন মেসোমশাই। সেদিনই প্রবীরকাকু বাইরের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি করালেন। স্থির হল, রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ওঁরা তিনজনে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার মৈত্র এসে অজিতেন্দ্রবাবু আর প্রবীরবাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন—'কয়েকটা কথা আপনাদের বলতাম। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।'

প্রবীর বলেন—'কিসের কথা বলছেন আপনি?'

—'ঐ টেলিফোনে ভূতের গলার বিষয়ে। আমার মনে হয় কেউ ইচ্ছে করে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছে।'

—'কিন্তু বুড়ো মানুষকে অহেতুক ভয় দেখিয়ে কার কী লাভ?'

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—'অহেতুক বলে এটাকে ধরে নিচ্ছেন কেন? এই করে হয়ত তাঁর মৃত্যুকে আগিয়ে আনা হচ্ছে। রিভলভারের গুলি অথবা বিষের সাহায্য না নিয়েও তো মানুষ খুন করা যায়।'

অজিতবাবু বলেন—'তা যায় বৈকি। আমি পুলিশে চাকরি করি। অনেক কিছুই দেখেছি আমি। কিন্তু কার স্বার্থ আছে এ বিষয়ে?'

—'শুধু স্বার্থ নয়, স্বার্থ ও সুযোগ। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"। কিন্তু সেটা আমার-আপনার পক্ষে বিচার করার চেয়ে কোনোও প্রফেশনাল ডিটেকটিভের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় কি?'

অজিতবাবু বলেন—'বেশ, ভেবে দেখি।'

—'আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দুটি কাজ করেছিলাম। তার ফলাফলটা জানিয়ে রাখি। প্রথমত, টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে "অব্‌নক্সাস কল" অথবা "গোস্ট-কল" বলে একটা অনুচ্ছেদ আছে, দেখে থাকবেন। ডাইরেক্টারির নির্দেশ অনুসারে আমি ট্র্যাফিক সুপারকে চিঠি লিখি। তাঁরা এ বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কোনো সূত্র পাননি। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন লাইনটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত মনে করেছিলাম। সে ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র লুটুবাবু একজন মিস্ত্রি ডেকে সমস্ত লাইনটা পরীক্ষা করান। লাইন কেউ ট্যাপ করছে না, বা লাইনে কোনো ফল্ট নেই। তবে মনে রাখবেন, মিস্ত্রি লাগিয়েছিলেন লুটুবাবু, এবং রিপোর্টটাও তাঁরই।'

অজিতবাবু গম্ভীরভাবে বলেন—'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন।'

ডাক্তার মৈত্র প্রতিবাদ করেন—'কিছু না, কিছু না। রায়সাহেবকে আমি আমার বাবার মতো শ্রদ্ধা করি। তাঁকে রক্ষা করবার জন্য আমি সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত।'

*   *   *

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে অজিতবাবু, প্রবীরবাবু আর হেবো ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে এ ঘরে এলেন। প্রবীরবাবু কলকাতায় একটা টেলিফোন বুক করলেন। অল্প পরেই যোগাযোগ হল। কলকাতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

ক্র্যাডলের ওপর ফোনটা বসানো রইল। রায়সাহেবকে ঘর বদলিয়ে দূরের একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। যাতে টেলিফোন বাজলেও তিনি শুনতে না পান। রাত্রে আর কিছু হল না। সকালে একটা টেলিফোন এল। হেবো ধরল। না, কোনোও ভূতের গলা নয়। ডাক্তার মৈত্র টেলিফোনে জানতে চাইলেন, রায়সাহেব কেমন আছেন। হেবো জানায়, ভাল আছেন, ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য, টেলিফোনে আর কোনো বিভ্রাট হল না! এখানে ওখানে অকারণে চার-পাঁচবার টেলিফোন করা হল। ঠিকমতোই কথা বলা গেল। ও-প্রান্ত থেকে কোনো ভূতুড়ে গলা শোনা গেল না। না কোনো রায়সাহেব, না কোনো বাহাদুর। প্রবীরবাবু তাঁর পরিচিত একজন টেলিফোন মিস্ত্রিকে দিয়ে টেলিফোন লাইনটা পরীক্ষা করালেন। না, কোনো গণ্ডগোল নেই লাইনে। কেউ ট্যাপ করছে না।

রায়সাহেব ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আরও তিন-চারদিন প্রবীরবাবু থেকে গেলেন, যদিও প্রায় প্রতিদিনই লুটুবাবু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—'কী, আপনার পলাশপুরে কাজ মিটল?'

আর কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না দেখে প্রবীরবাবু ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অজিতেন্দ্রবাবুকে ডেকে বলেন—'আমার মনে হয় রায়সাহেব যা বলেছিলেন তা হয় মিথ্যা, না হয় তাঁর কল্পনা। ইচ্ছা করে বুড়োমানুষ মিথ্যা কথা বলবেন কেন? সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভয়ে আতঙ্কে তিনি ভুল শুনেছিলেন। এ ছাড়া এ সমস্যার কোনো লজিকাল সমাধান হতে পারে না। এই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা যখন নেই, তখন তাই মেনে নিতে হবে।'

হেবো বললে—'কিন্তু ব্যাখ্যা তো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়! প্রথমত, ভূতের কণ্ঠস্বর দাদু একা শোনেননি, ডাক্তার মৈত্রও শুনেছেন। দ্বিতীয়ত, টেলিফোন ছাড়াও ভূতের দাপাদাপি এ বাড়িতে হয়েছে। জানলাগুলো আপনা-আপনি খুলে গিয়েছে, রাত্রে কে বা কারা টিনের চালে হেঁটে বেড়িয়েছে। এ তো সবাই বলছে।'

হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকেন লুটুবাবু। ধমকে ওঠেন হেবোকে—'না হে ছোকরা, ভূতের দাপাদাপির কথা সবাই বলছে না। আমিও এ বাড়িতে থাকি, একদিনের তরেও ভূতের কোনো দাপাদাপি টের পাইনি এতদিন।'

তারপর অজিতেন্দ্রবাবুর দিকে ফিরে বলেন—'তবে দিনকয়েক হল ভূতের কিছু উপদ্রব টের পাচ্ছি বটে।'

অজিতেন্দ্রবাবু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে, বলেন—'কদিন হল কী দেখছেন?'

—'দেখছি এই ভূতটিকে। বিচ্ছু ভূত। গভীর রাতে এ ছোকরা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। আপনাকে আমি মিনতি করছি অজিতবাবু, রোগীর বাড়ি থেকে এ সব ছেলে-ছোকরাদের হটান।'

সবেগে বেরিয়ে যান তিনি। উনি ঐ রকমই অদ্ভুত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁরা তিনজনে ডিসপেন্সারিতে এসে ডাক্তার মৈত্রর সঙ্গে দেখা করলেন। অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'আমরা এবার ফিরে যাব ভাবছি ডাক্তার মৈত্র। আর তো গণ্ডগোল হচ্ছে না!'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'ঐ সঙ্গে রায়সাহেবকেও নিয়ে যান না। কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে একটা চেঞ্জ হবে।'

লুটুবাবু বললেন, 'তাতে আমার সায় নেই।'

প্রবীরবাবু বলেন—'সে কী!'

অজিতেন্দ্রবাবুও জানতে চান, 'ওঁকে স্থানান্তর করায় আপনার আপত্তির কারণ?'

লুটুবাবু বলেন, 'চেঞ্জে যদি নিয়ে যাবার দরকার হয় তো সে ব্যবস্থা আমিই করব। এই এঁচোড়ে-পাকা ছোকরাটির সঙ্গে গেলে চেঞ্জ উল্টোমুখোও হতে পারে—ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার!'

ওঁরা অসহায়ের মতো দুজনেই ডাক্তার মৈত্রর দিকে তাকালেন।

হেসে ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তো আমার মুখ থেকেই শুনেছেন।'

প্রবীরবাবু গুম মেরে গেলেন।

হেবো বললে—'টেলিফোনটা সারেন্ডার করলে কেমন হয়?'

ডাক্তার মৈত্র আপত্তি জানিয়ে বলেন—'আমার তাতে আপত্তি আছে। দুটো কারণে : প্রথমত, লাইন একবার নিজে থেকে কাটিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার পাওয়া আজকাল অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, তাহলে রায়সাহেব কোনোদিনই নর্মাল হবেন না। টেলিফোনে স্বাভাবিকভাবে ওঁকে যেদিন কথা বলাতে পারব সেদিনই বলব উনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।'

প্রবীরবাবু বলেন—'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয় ভূতের ভয় কেউ ওঁকে জোর করে দেখাচ্ছে না।'

ডাক্তার মৈত্র বলেন—'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না প্রবীরবাবু। আপনারা একজন প্রফেশনাল ডিটেকটিভ নিয়োগ করলেই বোধহয় ভাল করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রায়সাহেবকে কেউ ইচ্ছা করেই ভয় দেখাচ্ছে। "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি" বিচার করে আমি আন্দাজও করেছি আসল অপরাধীটি কে। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। প্রমাণ তো নেই আমার!'

পরদিন প্রবীরবাবু বললেন—'আর ভূতের খেলা হবে না। আজ আমি ফিরে যাব।'

অজিতেন্দ্রবাবুও আর আপত্তি করতে পারলেন না।

যাবার সময় হেবো প্রবীরবাবুর হাতে একটা বন্ধ খাম এনে দিল। বললে—'আপনি বলেছেন এ বাড়িতে আর ভূতের খেলা হবে না। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই তা হবে। দিনসাতেকের মধ্যেই আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এই খামের মধ্যে একটা চিঠি রইল। কলকাতা পৌঁছে চিঠিখানা পড়বেন। আপনাকে যে-দুটি অনুরোধ করেছি দয়া করে সে দুটি রাখবেন।'

প্রবীরবাবু জানতেন যে ছেলেটি ইঁচড়ে-পাকা। ডেঁপো মস্তান একটি! আন্দাজে একবার একটি আফিং-চোরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল বলে ওর সেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। তিনি কোনো কথা না বলে বন্ধ খামটা পকেটে ফেলে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

*　　*　　*

ঘটনাটা ঘটল তার দিনপাঁচেক পরে। বাইরের ঘর থেকে একটা আর্তচিৎকার শুনে বাড়িসুদ্ধ সবাই ছুটে এসে দেখে, রায়সাহেব তাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কোলের ওপর পড়ে আছে টেলিফোনটা। বেশ বোঝা গেল দীর্ঘদিন কোনো গণ্ডগোল না হওয়ায় সাহস করে দাদু আজ টেলিফোন করেছিলেন। আর তখনই, হয় মোহন থাপা নয় রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক ও-প্রান্ত থেকে টেলিফোনে সাড়া দিয়েছিলেন।

দাদুকে আবার ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর বিছানায়। অজিতেন্দ্রবাবু ডাক্তার মৈত্রকে ডাকতে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বাধা দিলে হেবো, বললে—'না মেসো, ডাক্তার মৈত্র নয়, অন্য কোনো ডাক্তার।'

অজিতেন্দ্রবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন—'কেন রে?'

হেবো বললে—'এ রহস্যের কিনারা হয়ে এল বলে। আপনি বরং অন্য কোনো ডাক্তার ডাকুন।'

লুটুবাবু বলেন—'বেশ তো, ডাক্তার বোস তো পাশেই থাকেন। তাঁকেই ডাকা যাক।'

ডাক্তার বোস এসে দাদুকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। জানালেন—না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ক্রমশ।

ওষুধ দেবার আধ ঘন্টার মধ্যেই দাদু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। হেবোর মা তখন হেবোকে আড়ালে ডেকে বলেন—'হ্যাঁরে হেবো, তোর রহস্যের কিনারা হবার কথা কী বলছিলি তখন?'

মেজদা বলে—'বাদ দাও মা পাগলটার কথা!'

হেবো বলে—'আর একটা দিন সবুর কর মা। প্রবীরকাকুকে টেলিগ্রাম করেছি। কাল সকালেই তিনি এসে যাবেন। তখনই জানতে পারবে সবাই।'

সন্ধ্যাবেলাতেই প্রবীরবাবু এলেন। এসেই জড়িয়ে ধরেন হেবোকে। বলেন—'অদ্ভুত তোমার সত্যান্বেষণ! কিন্তু কী করে তুমি বুঝলে সব?'

বিস্মিত হয়ে অজিতেন্দ্রবাবু বলেন—'কী হল?'

প্রবীরবাবু বলেন—'সমস্ত রহস্যের কিনারা হয়ে গিয়েছে। আর, তা সম্ভব হয়েছে এই ক্ষুদে গোয়েন্দাটির জন্য। কেমন করে আন্দাজ করেছে তা এখনও জানি না, তবে স্বীকার করব—অদ্ভুত ওর ক্ষমতা।'

হেবোর মা বলেন—'তার মানে, আর ভূতের গলা টেলিফোনে শোনা যাবে না?'

প্রবীরবাবু বলেন—'না। কারণ যে ভূত টেলিফোনে ভেল্কি দেখাতো বর্তমানে সে জেল-হাজতে। সত্যি হেবো, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, এ রহস্যের কিনারা তুমি করতে পারবে। কিন্তু এখন স্বীকার করছি তা তুমি করেছ। কী করে যে করেছ—'।

অজিতেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বলেন—'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রবীরবাবু বলেন—'দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলি। এখান থেকে ফিরে যাবার সময় হেবো আমার হাতে একখানা চিঠি দেয়। বন্ধ খাম, ওপরে আমার নাম লেখা। আমি ভেবেছিলুম এসব ওর ছেলেমানুষি—'।

বাধা দিয়ে হেবো বলে—'একটা কথা। ডাক্তার মৈত্র এখন কোথায় প্রবীরকাকু?

—'থানায়।'

—'থানায়!' বিস্মিত হয়ে সবাই প্রশ্ন করে একসঙ্গে—'কেন?'

—'সেই কথাই তো বলছি। হেবোর চিঠিখানা আমি কলকাতায় গিয়ে খুলে পড়ি। তাতে হেবো আমাকে দুটি অনুরোধ করেছিল। ওর আফিং-চুরির কেসটা শোনার পর ওকে আর একেবারে উপেক্ষা করতে পারিনি আমি। তাই ওর কথামতো একজন ডিটেকটিভকে পাঠাই এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। আর বিলেতেও একটা টেলিগ্রাম করি। কাল তার জবাব পেলাম। গত বিশ বছরের ভেতর অতুলকৃষ্ণ মৈত্র নামে কেউ এম. আর. সি. পি. হয়নি। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকেও খবর গেল যে, এখানকার একজন অপারেটর ফণী নাগ রায়সাহেবের টেলিফোনে ভূতের খেলা দেখাচ্ছে। ঠিক তার পরেই পেলাম শ্রীমান হেবোর টেলিগ্রাফ। তাই টেলিফোন অপারেটর ফণী নাগ আর ডাক্তার মৈত্রর নামে বডি ওয়ারেন্ট করিয়ে এখানে চলে এসেছি। ওঁদের দুজনকে এইমাত্র পুলিশের জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু হেবো যে কী করে কী করল তা আমি এখনও জানি না।'

হেবো উঠে দাঁড়ায়। দু-হাত হাফ-প্যান্টের দুই পকেটে সেঁদিয়ে হেসে বলে—'দেখুন প্রবীরকাকু, আমি আন্দাজে কিছুই করি না। আমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, ভূত আমি মানি না। সুতরাং এ কারও শয়তানি। এখন ভেবে দেখতে হবে, শয়তানি করার স্বার্থ কার হতে পারে? অর্থাৎ অপরাধীর মোটিভটা কী?

'আমি বিশ্লেষণ করলাম—দাদুর এই দীর্ঘদিনের অসুখে কে লাভবান হচ্ছে? উত্তর একটিই। একমাত্র ডাক্তার মৈত্র। আর কারো কোনো লাভ নেই। দাদুর অসুখে একজন মাত্র মানুষ লাভবান হচ্ছেন। ডাক্তার মৈত্র দাদুর জুনিয়র হিসাবে কাজ করছিলেন, দাদু শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তাঁর সম্পূর্ণ পশারটা তিনি দখল করেছেন। প্রচণ্ড খাটুনি বেড়ে গিয়েছে তাঁর, এ কথাই আমরা বলাবলি করেছি—ভেবে দেখিনি তাঁর রোজগারটাও বেড়ে গিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। অথচ সব মূলধন দাদুর। ডিস্‌পেন্সারি দাদুর, আলমারিভরা ওষুধ দাদুর, মাইনে-করা কম্পাউন্ডারগুলি দাদুর, পশারটা দাদুর,—মায় সেদিন তিনি যে অম্লানবদনে বললেন—ডাক্তারী ব্যাগ "আমার" গাড়িতে আছে, সেই "আমার" গাড়িখানাও দাদুর—চলে দাদুর অ্যাকাউন্টে পেট্রলস্লিপ কেটে! লক্ষ করলে বোঝা যায়—দাদু যতদিন বিছানায় পড়ে থাকবেন, ততদিনই ডাক্তার মৈত্র দু-হাতে টাকা লুটবেন।

'বেশ, এবার ডাক্তার মৈত্রর চরিত্রটাকে দেখি। উনি নাকি একজন বিলেত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তার। অথচ প্র্যাকটিস শুরু করলেন একজন মফস্বলের ডাক্তারের জুনিয়র হিসাবে। সত্যি সার্টিফিকেট থাকলে তিনি কি ভাল চাকরি পেতে পারতেন না?

'এবার দেখা যাক কেমনতর ডাক্তার উনি। আমি লক্ষ্য করে দেখি, তিনি দাদুকে যখন ইনজেকশন দিলেন তখন দাদু বললেন, "উঃ ইন্ট্রাভেনাস দিলে নাকি? বড্ড লাগল যে!" উত্তরে তিনি বললেন—'না!' একটা সাধারণ ইনজেকশনে দাদুর এত ব্যথা লাগল কেন? একজন বিলেত-ফেরত এম. আর. সি. পি. ডাক্তারের হাত এত কাঁচা?

'তৃতীয়ত, লক্ষ করে দেখলাম, প্রবীরকাকু আসার পরেই ডাক্তার মৈত্র সতর্ক হয়ে উঠলেন। পাছে আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে 'অব্‌নক্সাস্ কল'-এর কথা জানাই তাই আগে থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওটা তিনি ইতিপূর্বেই করে রেখেছেন। সন্দেহটা যাতে অন্য খাতে প্রবাহিত হয় তাই উনি "মোটিভ" আর "অপারচুনিটি"র প্রসঙ্গ এনেছিলেন।'

অজিতেন্দ্রবাবু বলেন, 'কিন্তু টেলিফোন?'

—'সেটা তো আরো সোজা। লাইনে যখন গণ্ডগোল নেই—কেউ যখন লাইন ট্যাপ করছে না তখন তালাবন্ধ ঘরে টেলিফোন করলে কে কথা বলতে পারে?—একমাত্র অপারেটর ছাড়া?

—'কিন্তু শুধু রায়সাহেব ফোন করলেই গণ্ডগোল হয়, অন্য কেউ করলে হয় না কেন? আর কেউ তো ভূতের সঙ্গে কথা বলেনি কোনো দিন?'

—'বলেছে। আপনারা ভুলে গিয়েছেন। অথবা ঘটনার পারম্পর্য মন দিয়ে লক্ষ করেননি। ডাক্তার মৈত্র দাদুকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে তিনিও টেলিফোনে ভূতুড়ে কথাবার্তা শুনেছেন। এজন্য ডাক্তার মৈত্রকে আরও বেশি সন্দেহ করতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ দাদু ছাড়া যে দু-জন লোক টেলিফোনে ভূতবাবাজীবনের সঙ্গে কথা বলেছে তার মধ্যে ডাক্তার মৈত্র একজন।'

প্রবীরবাবু বাধা দিয়ে বলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বললে? দু-জন? আবার কে ভূতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে?'

—'আমি বলেছি। মৃত মোহন থাপার সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপচারী হয়েছে টেলিফোনে।'

—'সে কী! কবে?'

—'আপনি যে-রাত্রে ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরদিন সকালে। আপনি কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল করলেন। চার-পাঁচটা কল করলেন। তারপর কথাবার্তা শেষ করে চলে গেলেন। সকালবেলা চুপিচুপি আমি ঘরে ঢুকি। আবার টেলিফোন তুলি এবং ডিসপেন্সারির নাম্বার চাই। ফোন ধরে মৃত মোহন থাপা।'

'কী আশ্চর্য!' বলেন প্রবীরবাবু।

—'মোটেই না। আপনারা ঠিক কায়দা করতে পারছিলেন না বলে ভূতের সাক্ষাৎ পাননি। দাদুর সত্তরের কাছাকাছি বয়স—দাঁত পড়ে গিয়েছে। তাই বাবা-মুস্তাফার মতো কাঁপা-কাঁপা গলায় নাম্বার চাইলাম। ওপাশ থেকে যেই বলল "হ্যালো', অমনি আমি বুড়োটে গলায় বললাম, 'আমি রায়সাহেব কথা বলছি। তুমি কে? মৈত্র?' জবাব পেলাম—'নেহি বড়া সাব। সেলাম! ম্যয় বাহাদুর!' আর্তনাদ করে উঠলাম—'কোন সা বাহাদুর?' ও-প্রান্তবাসী বললে—'মোহন থাপা বাহাদুর, গরিবপরবর!'

'আর্তনাদ করে টেলিফোন রেখে দিলাম। আর তার দশ মিনিটের মধ্যেই অপরাধী চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল!'

—'দশ মিনিটের মধ্যে! মানে? কেমন করে?'

—'তার মিনিটদশেক পরেই ডাক্তার মৈত্র টেলিফোন করে জানতে চাইলেন রায়সাহেব কেমন আছেন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেলেন।'

—'কেমন করে? এটা তো একটা কোয়েন্সিডেন্সও হতে পারত?'

—'না, পারত না। কারণ ডাক্তার মৈত্র জানেন—আজ দু-মাস ধরে এ বাড়ির বাইরের ঘর তালাবন্ধ। চাবি দাদুর বালিশের তলায় থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি জানেন এ ঘরে টেলিফোন ক্র্যাড্‌লে রাখা থাকে না। তাহলে তিনি কোন আক্কেলে অপারেটরের কাছে এ বাড়ির নাম্বার চান? এ বাড়ির টেলিফোন যে স্বস্থানের ওপর রাখা আছে—সে কথা জানতাম আমরা মাত্র তিনজন : প্রবীরকাকু আপনি, মেসোমশাই আর আমি—আর ন্যাচারালি টেলিফোন অপারেটর। ডাক্তার মৈত্রর তো সে কথা জানা নয়! তিনি কোন আক্কেলে এ নম্বর চাইলেন? এ নম্বর তো সবসময় এনগেজ্‌ড্।

সিদ্ধান্ত : হয় তিনিই দশ মিনিট আগে ডিসপেন্সারিতে মোহন থাপা সেজেছিলেন, অথবা অপারেটর নিজেই বাহাদুরের পার্টটুকু বলে তারপর ডাক্তার মৈত্রকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে, লাইন আবার ব্যবহার করা হচ্ছে, টেলিফোন ক্র্যাড্‌লে রাখা আছে।'

*　　　*　　　*

দাদু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। আবার প্র্যাকটিসে বার হচ্ছেন তিনি। ছুটিও ফুরিয়ে এল। হেবোরা এইবার কলকাতায় ফিরবে। যাবার দিন দাদু ওকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন—'ক্ষুদে গোয়েন্দা। এই ক্যামেরাটা তোমাকে দিলাম। তোমার অদ্ভুত সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ।'

হেবো তো আগেই আনন্দে আটখানা হয়েছিল। ক্যামেরাটা পেয়ে সে একেবারে ষোলোখানা হয়ে গেল। পকেট লাইকা! এত্তটুকু একটা ক্যামেরা—এত ছোট যে মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাঘা-বাঘা গোয়েন্দার দল যা ব্যবহার করে। দাদু বুঝি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সেটা আনিয়েছেন কলকাতা থেকে তাঁর ক্ষুদে গোয়েন্দা-দাদুর জন্য!

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এবার যখন ওরা ফিরে এল কলকাতায় তখন হেবোকে দেখে মনে হচ্ছিল পানিপথ থেকে সদ্য ফিরছেন সম্রাট বাবর শাহ্! আর মেজদা? তার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল—ইব্রাহিম লোদি দি সেকেন্ড! বন্ধুমহলে হেবোর সে কী খাতির! এবারকার ঘটনাটাও সংবাদপত্রের কল্যাণে সকলে আগেই জানতে পেরেছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে হেবো দেখে তার নামে আবার একখানা চিঠি এসেছে। খামটা না খুলেও বুঝতে পারে কোথা থেকে এসেছে সেটা। এবার নিশ্চয় উনি হেবোর কৃতিত্বের দুটো প্রশংসার কথা লিখেছেন। অধীর আগ্রহে খামটা খুলে ফেলে হেবো। আর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ইলেক্‌ট্রিক শক খেল বেচারা! চিঠিতে লেখা ছিল :

"পলাশপুরের কীর্তিকাহিনী শুনলাম অজিতেন্দ্রর কাছে। তোমাকে বারবার জানিয়েছি অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখনো বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ভুল হবেই। মনে হয় উপদেশে তোমার শিক্ষা হবে না। ঠেকে শিখতে হবে তোমাকে একদিন। উপায় নেই, তাই-ই তোমার ললাট-লিখন। না হলে এত বড় ছুটিতে তুমি একবারও পড়ার বইগুলো খুললে না কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অল্প আঘাতেই যেন তোমার চৈতন্য হয়। ইতি—'

আচ্ছা তোমরাই বল, এত বড় সাফল্যের পর ঐ রকম একটা প্যানপ্যানে পানসে চিঠি পেলে কেমন লাগে? হেবো উল্টে রাগ করে পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিল। না, সে পড়বে না। পোপোক্যাটিপ্যাটেল কোথায়, হিউ-এন-ৎসাঙ কে, আর জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কাকে বলে না জানলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না? সে বিশ্বাস করে না এ কথা। ঐ তো নৃপতি, ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, বইয়ের পোকা একটা। সে পারত এ রহস্যের কিনারা করতে?

পড়ার বইয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক হেবো চুকিয়ে দিল একবারে।

তারপর হঠাৎ একদিন ওর মনে হল—উনি কেন লিখলেন, অল্প বিদ্যা সম্বল করে কখন কোনো বড় কাজ করা যায় না, ভুল হবেই। সে কি কিছু ভুল করেছিল? কী ভুল? ওর হঠাৎ মনে হল, তবে কি একা ডাক্তার মৈত্রর কারসাজি ছিল না সেই পলাশপুরের ভূতের খেলায়? কিন্তু আর কার স্বার্থ থাকতে পারে?

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। সব নষ্টের গোড়া কি তাহলে লুটুমামা? দাদুর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তিটা আসবে লুটুমামার হাতে। তাই কি তিনি ডাক্তার মৈত্রকে দিয়ে নিজের স্বার্থে এই কাজটা করাচ্ছিলেন? ডাক্তার মৈত্রও কি প্র্যাকটিসটা হাতাবার প্রেরণায় সায় দিয়েছিলেন এই ষড়যন্ত্রে? অসম্ভব নয়; অসম্ভব কেন, নিশ্চয় এটা সম্ভব। অথচ শার্লক হেবোর মতো বিচক্ষণ গোয়েন্দা আসল অপরাধীকে না ধরে ধরল তার সহকারীকে? ছি ছি ছি!

সুযোগ এল পূজার ছুটির সময়। হেবো বলে—'আবার ছুটিতে আমরা পলাশপুরেই যাই। যাবে মা?'

মা বলেন—'সে কি রে? পলাশপুরে তো এখন ওঁরা কেউ নেই।'

—'নেই? কেন? তবে দাদু কোথায় আছেন?'

—'জ্যাঠামশাই শরীর সারাতে দার্জিলিঙ গিয়েছেন।'

'লাভলি!'—লাফিয়ে ওঠে হেবো, 'তবে দার্জিলিঙেই চল না!'

অবিনাশবাবু ইতস্তত করছিলেন; কিন্তু পরদিনই ঘটনাচক্রে এল দাদুর একখানা চিঠি। লিখেছেন—'প্রিয় অবিনাশ, তোমার কলেজের তো এখন ছুটি! আমার দাদুদেরও ছুটি নিশ্চয়। এখানে একা-একা আমার দিন কাটে না। উঁচু-নিচু জায়গায় বেশি হাঁটতেও পারি না। লুটু তো দিবারাত্র শুধু ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে। তার দেখাই পাই না। তোমরা সকলে ছুটিটা এখানে কাটিয়ে গেলে খুশি হতাম।'

মেজদা বলে—'কিন্তু ঐখানটা তো বুঝলাম না মা! লুটুমামা ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে মানে?'

হেবো বলে—'বাঃ, ভুলে গেছিস? লুটুবাবু আর্টিস্ট নয়? ছবি আঁকা আর মডেল গড়া হয়েছে তাঁর নেশা! অন্তত ভেকটা তাই ধরেছেন তিনি।'

মা বলেন—'ও আবার কী ধরনের কথা! লুটু সত্যিই ভালো ছবি আঁকে।'

হেবো উদাস কণ্ঠে বললে—'দুঃখ এই যে চক্ষুকর্ণের বিবাদটা এখনও মেটেনি। স্বচক্ষে তাঁর কোনো শিল্পকার্য দেখিনি তো সেবার।'

—'বাঃ! তখন ঐ অসুখের বাড়িতে—'

মেজদা বাধা দিয়ে বলে—'আচ্ছা লুটুমামা দাদুর কোন সম্পর্কের ভাগ্নে?'

মা বলেন, 'ঠিক জানি না। শুনেছি সম্পর্ক কী একটা যেন আছে।'

হেবো মনে মনে বলে—'তা তো আছেই! যম-জামাইয়ের সম্পর্ক!'

শেষ পর্যন্ত কিন্তু অবিনাশবাবু অথবা হেবোর মায়ের যাওয়া হল না। হেবোর কাকিমার শরীর খারাপ। তাই ওঁরা রয়ে গেলেন। অবিনাশবাবু বলেন—'তবে জ্যাঠামশাই অত করে লিখেছেন—ছেলেরা বরং যাক।'

আপত্তি করল মেজদা, বলে—'ওকে নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না! হয় আমি যাই, হেবো থাকুক, অথবা হেবো থাকুক, আমি যাই—'

বাধা দিয়ে মা বলেন—'না না, হেবো এবার কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে থাকবে না।'

বার বার করে তিনি সাবধান করে দিলেন হেবোকে। হেবো স্পিক্‌টি নট।

দার্জিলিঙে হেবো যে কাণ্ডটা করেছিল সেই গল্পটা বলেই শেষ করব এ কাহিনী। কিন্তু ঘটনাটা আমি নিজের ভাষায় বলব না। ওর ডায়রির খানকতক পাতা তুলে দেব শুধু। তা থেকেই ঘটনাটা জানতে পারবে তোমরা।

* * *

১৭ই সেপ্টেম্বর
ঘুম

মাত্র কাল দার্জিলিঙে এসে পৌঁছেছি। আমার জীবনে এই প্রথম শৈলনগরী দার্জিলিঙ ভ্রমণ। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা বর্ণনা করবার জিনিস বটে; কিন্তু আমার ডায়েরি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। তাই ডায়েরি-পাঠকের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে এই ডায়েরি লিখতে হচ্ছে এজন্যে যে, আমার জীবনে ডাক্তার ওয়াটসনের সাক্ষাৎ আমি এখনও পাইনি। তিনি আবির্ভূত হলেই আমার ছুটি।

দার্জিলিঙে এসেছি আমি আর মেজদা, উঠেছি দাদুর বাড়িতে। আমার দাদু রায়সাহেব নিবারণ মৌলিক জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কয়েক মাস আগে ভূতের ভয়ে তিনি স্নায়বিক দুর্বল্যে (কথাটা 'দৌর্বল্যে', হেবো বানানটা ভুল করেছে) ভুগছিলেন। আত্মশ্লাঘা করব না, কোনো একজন কিশোর গোয়েন্দার বুদ্ধির জোরে তিনি সে রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন; কিন্তু এখনও একেবারে স্বাভাবিক হতে পারেননি।

অল্পেতেই তিনি উদ্বিঘ্ন (অর্থাৎ 'উদ্বিগ্ন'—এত বানান ভুল করলে হেবো স্কুল-ফাইনাল পাশ করবে কেমন করে?) হয়ে পড়েন। মৃত্যুভয়টা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে!

বাড়িটা ঠিক দার্জিলিঙে নয়—দার্জিলিঙের মাইলকয়েক আগে—বাতাসিয়া ডবল্ লুপের কাছে, ঘুমে। মস্ত বাড়ি! দাদুর সঙ্গে আছেন ভাগ্নেপ্রবর, অর্থাৎ আমাদের লুটুমামা। আর আছে কিশোর থাপা, মোহন থাপার ছোট ভাই। সব নেপালীর মতো তার চোখ দুটি কুৎকুতে, মাথায় খাটো, আর তার ডাকনাম—সব নেপালীর মতো—বাহাদুর। নটবর দাদুর পলাশপুরের বাড়ির তদারক করছে।

আগেই বলেছি, এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আসবার পথের বর্ণনা লিখে ভ্রমণ-কাহিনীর পাতা ভরানো চলে—কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক গোয়েন্দার ডায়রিতে সে সব বাহুল্য। আমি এখানে এসেছি একটা বিরাট রহস্যের কিনারা করতে—তার প্রথম পর্ব খতম করে এসেছি পলাশপুরে। শুনেছি ডাক্তার মৈত্র এখন ডোরাকাটা হাফ-প্যান্ট পরে, গলায় নম্বরি তক্তি ঝুলিয়ে কপি বুনছেন। এবার নাটের গুরুকে গেঁথে তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সেই মহাপ্রভুর সন্ধানেই আমার এ অভিযান।

*　　　*　　　*

১৮ই সেপ্টেম্বর
ঘুম

লুটুমামাকে যেন চেনাই যায় না! পলাশপুরের সেই ভদ্রলোকটিকে এই লুটুমামার মধ্যে যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। এখন উনি পুরোপুরি আর্টিস্টের ভেক ধরেছেন। আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে রোজই ভোরবেলা উনি বেরিয়ে যান, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যা করে। কোন পাহাড়ের ধারে, কোন গাঁয়ের কিনারে, কোন ঝরনার পাশে বসে তিনি ছবি আঁকবেন তা বলে যেতেন শুধু বাহাদুরকে। রোজ দুপুরবেলা বিরাট টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার, ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে সে খাইয়ে আসে তাঁকে। আমি একদিন ওঁর সঙ্গে ছবি আঁকা দেখতে যেতে চাইলাম—কিন্তু ধমক শুনতে হল পরিবর্তে। আশ্চর্য! ভদ্রলোক যে কী আঁকেন তাও দেখাতে চান না! সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে নিজের ঘরে কাগজমোড়া ক্যানভাসটা রেখে, ঘর তালাবন্ধ করে আবার বেরিয়ে যান। ফেরেন গভীর রাত্রে। লুটুবাবুর চলা-ফেরা রীতিমত সন্দেহজনক। উনি আদৌ ছবি আঁকেন কি? দাদুকে একদিন কথার ছলে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি লুটুবাবুর আঁকা কোনো ছবি কখনও দেখেছেন কিনা।

দাদু হেসে বলেন—'আবার ওর পেছনে লেগেছ? কেন বাপু? তোমরা খাও-দাও ফুর্তি কর। ওকে নিজের মতো থাকতে দাও।'

আমি মনে মনে হাসি। তা দিলে আমার চলে কেমন করে? দুনিয়ার তাবৎ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যদি যার-যার নিজের মতো থাকতে দেওয়া যায়, তাহলে শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর দশা কী হবে? আর আশ্চর্য মানুষ ঐ বাহাদুর! সত্যি রক্তমাংসের মানুষ তো ও? ওকে প্রশ্ন করে কোনো জবাব পাওয়ার উপায় নেই। কী ট্রেনিংই দিয়ে রেখেছেন ওকে লুটুমামা! লোকটা যেন কথা বলতেই জানে না। লুটুমামা কীসের ছবি আঁকেন জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না। শুধু মিটিমিটি হাসে। খুদে চোখদুটো একেবারে বুজে যায়।

আমার আরও সন্দেহ হয়, বাহাদুরও এ ষড়যন্ত্রের ভেতর নেই তো! লুটুমামার সহকারী নয় তো সে কোনো পাপের কারবারে?

মেজদাকে একদিন ও সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। এমন মাথামোটা গবেট ওটা, বলে—'নড়েছে?'

অবাক হয়ে বলি—'নড়েছে মানে? কী?'

—'পোকা!'

আরও অবাক হয়ে বলি—'পোকা? কোথায় নড়েছে?'

বলে—'তোমার মগজে!'

ওর সঙ্গে পরামর্শ করা বৃথা। যার মগজে নিরেট গোবর সে কেন যায় পরের মগজের খবর নিতে!

* * *

২৫শে সেপ্টেম্বর

কদিন আর ডায়রি লিখিনি। কারণ নূতন কোনো ক্লুর সন্ধান পাইনি এখনও। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষ করছি—লুটুমামা এ কয়দিন আর আঁকতে বার হচ্ছেন না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়ে দিচ্ছেন নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে। একেবারে নির্জনে নয় কিন্তু। বাহাদুরও থাকছে ঘরে। ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনক। বন্ধ ঘরে কী করছেন ওঁরা দুজনে? মেজদাকে দ্বিতীয়বার বলতে গেলাম কথাটা। মেজদা ধমকে উঠল—'দ্যাখ হেবো! এইজন্যই তোর সঙ্গে আসতে চাইনি। তোর সঙ্গে এখানে একসঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না; হয় তুই থাক আমি ফিরে যাই : না হয় আমিই থেকে যাই, তুই ফিরে যা!'

মাথামোটা গবেট কোথাকার! এত বড় সোজা কথাটা খেয়াল হচ্ছে না গবেটটার? এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না? সে খেয়াল করে দেখল না যে, লুটুমামা একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক, ওদিকে বাহাদুর ভাল করে বাঙলা কথাই বলতে পারে না। দু-জনের শিক্ষায়-দীক্ষায় আশমান-জমিন ফারাক! তাহলে এমন কী বিষয়বস্তু থাকতে পারে যা নিয়ে ওঁরা দু-দিন ধরে রুদ্ধদ্বারকক্ষে আলোচনা করছেন? একে যদি গোপন ষড়যন্ত্র না বলে তবে কাকে বলে?

আজ বিকালে আর সন্দেহ চেপে রাখতে পারলাম না। লুটুমামার ঘরের পেছন দিকের জানলাটা মাটি থেকে ফুটআষ্টেক উঁচুতে, যদিও একতলায় ঘর। পাহাড়ে জায়গায় এ রকম হয়েই থাকে। জানলা দিয়ে দেখতে হলে আট ফুট উঁচু একটা মই চাই। কিন্তু মই পাব কোথায়! বাধ্য হয়ে দু-খানা ছোট হাত-আয়না কিনতে হল। দু-খানা কঞ্চির দু-প্রান্তে আয়নাদুটো লাগিয়ে একটা পেরিস্কোপ বানিয়ে ফেললাম। কিন্তু এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল আমার। পেরিস্কোপটা উঁচু করে ধরতেই হঠাৎ জানলা থেকে বেরিয়ে এল লুটুমামার একখানা হাত। পেরিস্কোপটা টেনে নিল সেই হাত ঘরের ভেতর। পরমুহূর্তেই জানলার পরদাটা সরে গেল।

এবং তার পরেই লুটুমামা নেমে এলেন নিচে। বলেন—'তোমাকে বলেছি না, আমার পেছনে লেগো না?'

আমি কোনো কথা বলি না।

দাদুর কাছেও কথাটা বলেছেন উনি। দেখলাম, দাদুও বিরক্ত হয়েছেন। তবে নাকি আমি ওঁর প্রাণদাতা, তাই মৃদু ধমক দিয়ে শুধু বললেন—'লুটুর পেছনে লেগো না। আগেই তোমাকে একবার বারণ করেছি, ও আর্টিস্ট মানুষ, লোকজন পছন্দ করে না।'

আমি নিরীহের মতো বলি—'আমি তো ওঁকে বিরক্ত করিনি।'

—'শুনলাম আয়না দিয়ে কী সব যন্ত্র তৈরি করেছ?'

আমি চুপ করে থাকি।

দাদু বিরক্ত হয়ে বলেন—'এত বড় বাড়ি, খেলবার জায়গার অভাব তো নেই। ওর কাজের খবরদারি না-ই বা করলে।'

রাত্রে দেখি, মেজদা মস্ত চিঠি লিখছে। এদিকে মাথা-ভরা গোবর, ওদিকে চুকলি কাটার যম!

* * *

৩রা অক্টোবর

ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। না হলে মূক বাহাদুর কী করে এমন মুখর হয়ে ওঠে? কাল বিকালে লুটুমামা বেরিয়ে যাবার পর বাহাদুর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বাতাসিয়া ডবল্ লুপের দিকে বেড়াতে গেলাম আমরা। নির্জনে এসে বাহাদুর আমাকে খুলে বললে তার সমস্যার কথা। ভাঙা-ভাঙা হিন্দির মধ্য থেকে যে কাহিনীটা উদ্ধার করলাম, তা এই :

বাহাদুরের বাড়ি এই দার্জিলিঙ পাহাড়েই। গয়াবাড়ি টী এস্টেটে। উত্তরাধিকারসূত্রে সে একটা পাথরের মূর্তি পেয়েছে। কোনো তিব্বতী লামার কাছ থেকে ওর ঠাকুর্দা এনেছিলেন বুঝি। বাহাদুর সেটাকে নিত্য পুজো করে। লুটুমামার নজর পড়েছে ঐ মূর্তিটার ওপর। তিনি বাহাদুরকে পীড়াপীড়ি

করছেন মূর্তিটা তাঁকে বিক্রি করে দিতে। প্রথমে নগদ পাঁচ টাকা দর দিয়েছিলেন—বাহাদুর আপত্তি করায় দরটা বাড়িয়ে দশ-বিশ-পঁচিশ করতে করতে নগদ একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছে! অথচ বাহাদুরের ইচ্ছে নয় দেবমূর্তিকে সে বিক্রয় করে। ওকে গররাজি দেখে লুটুমামা আজ ওকে বলেছেন নগদ দুশো টাকা দেবেন তিনি। বাহাদুর ইতস্তত করছে এখন। দুশো টাকা কম নয়। অথচ ঠাকুর্দার আমল থেকে ওদের বংশে মূর্তিটার পুজো হচ্ছে। দেবতাকে বিক্রয় করতেও মন উঠছে না। আজ বাহাদুরের আবার ভয় হয়েছে—লুটুমামা ঐ মূর্তিটা পাওয়ার জন্য যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে মনে হয়, সোজাপথে ওটা না পেলে বাঁকা পথের আশ্রয় নিতেও তিনি পিছপাও হবেন না।

বুঝতে পারি, যে-কোনো কারণেই হোক মূর্তিটা অত্যন্ত মূল্যবান। কী হতে পারে? মূর্তিটা দেখতে চাইলাম। বাহাদুর আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। কনকনে শীত পড়েছে। ওর ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালল বাহাদুর। আউট-হাউসে ইলেকট্রিক কানেকশন নেই। প্রদীপের আলোয় ঘরখানা ভালো করে দেখি। ছোট ঘর—একদিকে বাহাদুরের বিছানা পাতা, চৌকির ওপর। চৌকির নিচে আছে কালো রঙের একটা ট্রাঙ্ক। অপর পাশে একটা বাক্স-মতো কিছু কাপড় দিয়ে ঢাকা। সামনে একটা কাঠের বেদির ওপর বসানো আছে বাহাদুরের দেবমূর্তি। ফুটখানেক উঁচু। শ্বেতপাথর খুদে বানানো। একটা রাক্ষস যেন দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে হা-হা করে হাসছে। এ আবার কেমন দেবমূর্তি? যাই হোক মূর্তিটার চোখদুটো দেখবার মত! প্রদীপের আলোয় চোখদুটো জ্বলে উঠল। কী দিয়ে তৈরি চোখদুটো? হীরে নয় তো? না হলে এই সামান্য পাথরের মূর্তিটার জন্য এত দাম দিতে চাইছেন কেন লুটুমামা? পাথরের মূর্তিটা ফাঁপা নয় তো? ওর ভেতরে কোনো নবাবজাদার হারানো কমলমণি হীরে অথবা কোনো মহারানির নেকলেস লুকানো নেই তো? তিব্বতী লামাদের নিয়ে অনেক রহস্যজনক গল্প পড়া আছে। তিব্বতী লামা যে গল্পে ঢুকবে সেই গল্পেই রহস্যজনক একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানেও নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে।

বাহাদুরকে অত কথা কিছু বললাম না। তাকে শুধু বলি যে, কোনো দামেই যেন সে দেবমূর্তিটা বিক্রয় না করে। তাহলে দেবতার রোষ পড়বে তার ওপর। বাহাদুর বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারে। ঘাড়টা নাড়ে বার-দুই। আধবোজা চোখদুটো একেবারে বন্ধ করে কী যেন মন্ত্রপাঠ শুরু করে।

ওর ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল আমাকে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন লুটুমামা। তাঁর চোখদুটো জ্বলছে ঐ মূর্তিটার মতই। আমাকে দেখে বলেন—'আবার বাহাদুরের পিছনে লেগেছ?'

আমি বলি—'আমি তো দেখছি আপনিই আমার পেছনে লেগেছেন।'

—'বটে! তা এখানে কী মনে করে?'

আমি গম্ভীরভাবে বলি—'বাহাদুর ঐ মূর্তিটা বিক্রি করবে শুনেছিলাম—তাই দেখতে এসেছি।'

—'তুমি কিনবে বুঝি? কত দাম জান ওটার?'

—'জানি, এবং এ-ও জানি আপনি যা আন্দাজ করছেন তার চেয়ে বেশি।'

একটু থতমত খেয়ে যান লুটুমামা। বলেন—'কত দাম বল তো?'

—'আমি বাহাদুরকে তিনশো টাকা দাম দিয়েছি।'

একেবারে হকচকিয়ে যান লুটুমামা। আমতা-আমতা করে বলেন—'অত টাকা তোমার কাছে আছে?'

আমি একটা মোক্ষম চাল চালি। বলি—'না নেই, তবে আমার জানা খদ্দের আছে, যে ওর চেয়েও বেশি দামে আমার কাছ থেকে ওটা কিনে নেবে।'

অনেকক্ষণ লুটুমামা কোনো জবাব দিলেন না। তারপর গুটিগুটি দাদুর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে মেজদা আমাকে ডেকে বললে—'আর তো পারি না তোর জ্বালায় হেবো! আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিস তুই? দ্যাখ, এভাবে আমার পোষাবে না, হয় আমি থাকি তুই চলে যা—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—'অথবা তুমি থাক আমি চলে যাই, কেমন না? কিছু ভাবতে হবে না মেজদা, তুমি-আমি দু-জনেই থাকব। যেতে হয়, যাবে ঐ কংসমামাই!'

*   *   *

৫ই অক্টোবর

আজ সকাল থেকে দেখি লুটুমামার ঘর তালাবন্ধ। কেথায় গিয়েছেন তিনি? আমার চোখ এড়িয়ে কিছু হবার জো নেই। একটু সন্ধান নিতেই বুঝতে পারলাম লুটুমামা গিয়ে প্রবেশ করেছেন আউট-হাউসের ঐ খাপরার ঘরখানায়। সকাল তখন আটটা। সমস্ত সকালটা নজরে নজরে রেখেছি তাঁকে। কী আশ্চর্য, উনি যখন ঐ আউট-হাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তখন সকাল সাড়ে এগারোটা। সাড়ে তিনঘন্টা ধরে ঐ খাপরার ঘরে দু-জনে মিলে কীসের পরামর্শ করছিলেন লুটুমামা আর বাহাদুর? ওঁর ঘরে কেন যে পরামর্শসভাটা আর বসছে না তা উনিও জানেন, আমিও জানি। কাল বিকালে উনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে।

পেরিস্কোপের পরীক্ষায় ব্যর্থ হবার পর আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। কাল বিকালে লক্ষ করে দেখলাম, পেছনের পাহাড়ে একটি স্থান আছে যেখানে যেতে পারলে ঐ ঘরের জানলার ভেতর দিয়ে ঘরটা দেখা যাবে। কিন্তু দূরত্বটা বড় বেশি। অন্তত পাঁচশো ফুট তো বটেই। অত দূর থেকে ঘরের ভেতর কী হচ্ছে দেখা যাবে না। তাই 'গুরুবিদায়'-কেসে পাওয়া বাইনোকুলারটা নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। অনেক কায়দা করে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গাটায় পৌঁছে যেই বাইনোকুলার দিয়ে তাক করতে যাব অমনি জানলার পর্দাটা কে যেন টেনে দিল। উনিও কি ঘর থেকে বাইনোকুলার নিয়ে জানলা থেকে লক্ষ্য করছিলেন আমার পর্বতারোহণ?

তা সে যাই হোক, দুপুরবেলা বাহাদুর এসে আমাকে চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল লুটুবাবু আজ সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন। ভদ্রলোক সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন যে, শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে বেশি কিছু কায়দা করা যাবে না। সারাটা দুপুর ধরে মামাবাবু বাঁধাছাঁদা করলেন, আমি ভালোমানুষের মতো আড়চোখে শুধু দেখেই গেলাম। কী হতে পারে? যদিও বুঝছি গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে—তবু ষড়যন্ত্রটা কী জাতীয় যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ প্রতিষেধক প্রয়োগ করি কেমন করে?

লুটুমামা আদৌ ছবি আঁকেন না এটা বুঝতে পেরেছি। এ সত্য প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কী প্রমাণ? বলছি। লেখকরা লিখে থাকেন, গায়করা গান শেখেন, চিত্রকররা ছবি আঁকেন, অভিনেতারা পার্ট মুখস্থ করেন। কেন? লেখা, গান শেখা, ছবি আঁকা বা পার্ট মুখস্থ করা তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন লেখক-গায়ক-চিত্রকর-অভিনেতারা সাক্ষাৎ পান সমঝদারের। লেখকের চাই পাঠক, গায়কের শ্রোতা, চিত্রকরের দর্শক এবং অভিনেতার হাউস-ফুল বিজ্ঞপ্তির। লুটুমামা কিন্তু ব্যতিক্রম। তিনি ছবি আঁকেন, কিন্তু কাউকে দেখতে দেবেন না। পাছে আমরা দেখে ফেলি, পাছে আমরা ভালো বলি, প্রশংসা করি। বুঝেছি মশাই, এ আপনার স্রেফ ধাপ্পাবাজি!

তবে কেন অমন ঢং ধরেছেন? রঙ-তুলি-ইজেলের বোঝা নিয়ে কেন এত ভণ্ডামি? তাও জানি। যে পাপ-কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে পাহাড়ে-পর্বতে সারাদিন ওঁকে টো-টো করে ঘুরতে হয়। তার জন্য একটা ভড়ং চাই। কী? না—আমি আর্টিস্ট; আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই এভাবে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার। তোমরা রোজ-রোজ আমাকে এমনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে মনে কোনো সন্দেহ পোষণ কোরো না। কারণ আমি আর্টিস্ট। আমি ছবি আঁকবার জন্যই এ কৃচ্ছ্রসাধন করছি। এটা বোঝা সহজ। তাহলে বাহাদুর সে কথা প্রকাশ করে দেয় না কেন? এর একটিমাত্র জবাব হতে পারে, বাহাদুরও ঐ পাপ কাজের ভাগীদার। না হলে ঐ নিরক্ষর নেপালীটার সঙ্গে অর্গলবদ্ধ ঘরে তিনি তিনদিন ধরে কিসের কনফারেন্স করলেন? কিন্তু বাহাদুর যদি মামার সাকরেদিই করবে তবে সে মূর্তিটার কথা আমাকে বলে দিল কেন? এরও একটা সম্ভাব্য জবাব আছে। চোরে-চোরে যখন মাসতুতো ভাই তখন নেক-এ নেক-এ ভাব! আবার চোর যখন চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তখন সহযোগী চোরের নেক-এ ছুরি চালাতেও দ্বিধা করে না! এইভাবেই লুটুমামা ডাক্তার মৈত্রকে ফাঁসিয়েছিলেন এবং ডাক্তার মৈত্রও লুটুমামাকে ফাঁসাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত বড়-বড় ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে তাদের মূলেও এই একই কথা।

বাহাদুরকে ডেকে সাবধান করে দিলাম। বললাম, অন্তত আজকের দিনটা সে যেন ঐ রাক্ষস মূর্তিটা সামলে সামলে রাখে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশদা একবার একটা মূর্তির ভেতর থেকেই কমলহীরে আবিষ্কার করেছিলেন; হিচককের নর্থ বাই নর্থ-ওয়েস্ট-এও দেখা গিয়েছে মূর্তির ভেতর লুকিয়ে গোপন খবরের 'টেপ' পাচার করা যায়। শার্লক হোমসের একটি গল্পে নেপোলিয়ানের মূর্তির ভেতর থেকে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এই ধরনের কিছু হচ্ছে। না হলে এই সামান্য মূর্তিটার জন্য লুটুমামা চারশো টাকা দর দেবেন কেন? ওহো, বলতে ভুলে গেছি, আমি তিনশো টাকা দর দেবার পর মামাবাবু নিলামের দর আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। পুরোপুরি চারশো টাকাই দেবেন তিনি। শুরু করেছিলেন পাঁচ টাকা থেকে। বাহাদুরেরও কেমন যেন রোখ চেপে গিয়েছে। সে কিছুতেই বিক্রি করবে না মূর্তিটা। না, চারশো টাকা পেলেও নয়!

বাহাদুরকে বলি, মূর্তিটা যেন আজকে সামলে সামলে রাখে। কারণ আজ অতর্কিতে ওটা চুরি যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দেখলাম বাহাদুরও সেটা আশঙ্কা করেছে। ওর খুদে-খুদে চোখদুটো আরও ছোট হয়ে গেল। বলে—'চুরি যানে সে—হুঁ!' হাত দিয়ে নিজের গলার কাছে জবাই করার আড়াই-পোঁচি ভান করে। কী সর্বনাশ! শেষকালে খুনোখুনি কাণ্ড হবে নাকি একটা? বিচিত্র নয়! লুটুমামা যদি ওটা অন্যায়ভাবে নিয়ে সরে পড়তে চান তবে বাহাদুরের ভোজালিটাও হঠাৎ রক্তপিপাসু হয়ে উঠতে পারে!

কিন্তু সারাদিন যাবার উদ্যোগই করলেন লুটুমামা—গেলেন না। সন্ধ্যাবেলায় দেখি দাদুকে বলছেন—'একটা কাজ বাকি আছে। আজ রাতে সেটা সেরে কাল ভোরের গাড়িতে যাব আমি।'

আমি মনে-মনে হাসি। মনে-মনেই বলি—'হে সম্রাট কংসমামা! জানি, আপনার কোন মহৎ কর্মটি অসমাপ্ত আছে। বাহাদুরের হীরকখচিত মূর্তিটির অপহরণ-পর্ব! কিন্তু আপনি তো জানেন না শ্রীমান শার্লক হেবোর সতর্ক দৃষ্টি গোকুলে বাড়ছে! শার্লক হেবো থাকতে ওটা অপহৃত হবে না! হতে পারে না!'

তৎক্ষণাৎ খবরটা বাহাদুরকে দিলাম। ওকে খুব সাবধানে থাকতে বললাম আজকের রাত্রিটা।

* * *

মজার কথা এই যে, হেবোর ডায়রিতে এর পর মাস দুই-তিন আর কিছু লেখা নেই। আমি তো অবাক! এমন একটা মারাত্মক জায়গায় এসে হঠাৎ ডায়রি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন সে? আমার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল। তোমাদেরও হচ্ছে নিশ্চয়—নয়? শেষ পর্যন্ত ওর মেজদার কাছ থেকে বাকি অংশটা আমি উদ্ধার করেছিলাম :

হেবো লক্ষ্য করল যে, লুটুমামা প্রতিদিনের মতো সেদিন আর সন্ধ্যায় কোথাও বার হলেন না। সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে দরজায় খিল দিলেন। হেবো সতর্ক হয়ে জেগে রইল। 'ঘুম'-এর দেশের ঘুম ওর চোখে জড়িয়ে ধরছে। হেবো প্রতিজ্ঞা করেছিল এই কালরাত্রে সে কিছুতেই ঘুমোবে না। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ওকে বলে দিচ্ছিল যে শেষরাত্রে লুটুমামা ঐ রাক্ষস মূর্তিটা অপহরণ করে ভোরের গাড়িতে কলকাতা পালাবেন।

...মেজদা পাশেই লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। কী মজা ওদের! দুনিয়ার যত ঠগ-বদমায়েশ তোমাদের আশেপাশে সর্বনাশের জাল পাতে, আর তোমরা মোষের মতো ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোও! আর সর্বনাশ যখন হয়ে যায় তখন সকালবেলা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হাউমাউ করে কাঁদতে বস!

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রাদেবী এসে হেবোর চোখে পরিয়ে দিলেন ঘুমের কাজল। হঠাৎ ভোর রাতে কিসের আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে শুনলে মেজদার নাক ডাকছে 'ফৎ, ফৎ, ফত্যুর্র্র্!'

ধক করে উঠল হেবোর বুকের মধ্যে—ওদিকেও কি সব ফতুর হয়ে গেল নাকি? লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হেবো। রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটায় (যেটা সে আফিং-চোর ধরে প্রাইজ পেয়েছিল) দেখে, ভোর পাঁচটা। অর্থাৎ সকাল হয়ে এল প্রায়। আলনা থেকে সোয়েটার, ওভারকোট, মোজা, মাফলার একে-

একে গায়ে চড়ালো হেবো। তারপর পা টিপে-টিপে বার হয়ে এল ঘর থেকে। মেজদা তখনো ঘুমোচ্ছে অঘোরে। ক্যালকাটা রোডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। পাশেই লুটুবাবুর ঘর। আশ্চর্য! তাঁর দরজা খোলা। অথচ ঘর অন্ধকার। হেবো দরজা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। বাঁ হাতের টর্চটা জ্বালতেই লক্ষ্য হল সুটকেস-বিছানা সব একপাশে গোছানো আছে—অথচ লুটুবাবু নেই। টর্চ নিবিয়ে হেবো বেরিয়ে আসে বাগানে। দ্রুতপদে বাগানটা পার হয়ে এসে পৌছয় বাহাদুরের ঘরে। দরজা বন্ধ। পেছন দিকে গিয়ে দেখে একটা জানলা খোলা আছে। চমকে ওঠে হেবো। এই শীতে কেউ জানলা খুলে শোয়? জানলা দিয়ে ভিতরে একবার উঁকি মেরে দেখতে পারলে হতো! মূর্তিটা যেখানে থাকে সেটা জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে পাওয়া উচিত। হেবো একবার স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিন্তু জানলাটা বেশ উঁচুতে। হেবো নাগাল পেল না। পেরিস্কোপটা বেহাত হয়ে গিয়েছে—না হলে এ সময়ে সেটা কাজে দিত। তবে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অসাধ্য কাজ নেই। হেবো উঠে পড়ল পাশের কমলালেবু গাছটায়। গাছের নিচের দিকেই একটা ডাল বার হয়েছে। তার ওপর উঠে হেবো উঁকি দিল ঘরের মধ্যে। ভেতরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। হেবো টর্চটা জ্বেলে ঘরের ভেতর আলো ফেলল—ঠিক যেখানে মূর্তিটা রাখা ছিল!

হঠাৎ এক ঝলক আলোয় হেবো যা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীরটা একবার থরথর করে কেঁপে ওঠে। হাত থেকে প্রথমেই টর্চটা গেল পড়ে। তারপর ঠক্-ঠক্-করা হাঁটুদুটো আর হেবোর দেহভার রাখতে পারল না। মাথা ঘুরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে।

হেবোর দোষ নেই। ও তো ছেলেমানুষ, বড়রাও কেউ ও দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। হেবো একঝলক অলোতেই স্পষ্ট দেখে নিয়েছিল—বেদির ওপর মূর্তিটা নেই। তার বদলে ঠিক সেই জায়গায় একটা পেতলের থালায় রাখা আছে বাহাদুরের ছিন্ন মুণ্ডু!

একনজর মাত্র দেখেছে সে, কিন্তু ভুল হেবোর হয়নি। হতে পারে না। আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে হেবো সনাক্ত করতে পারে যে মুণ্ডুটা গয়াবাড়ি টী এস্টেটের কিশোর থাপার। সেই চ্যাপটা নাক, খুদে খুদে চোখ, ভ্রূর ওপর কাটা দাগ, মাথায় তখনও সেই তার টিপিকাল টুপিটা, আর গলার নিচে ধড় নেই। ঘরের ও প্রান্তে খাটানো মশারির তলা থেকে বাহাদুরের একখানা ঠ্যাঙ বেরিয়ে ছিল। অর্থাৎ ধড়টা চাপা দেওয়া আছে মশারির তলায়। ধড় থেকে মুণ্ডুর দূরত্ব—তা অন্তত দশ ফুট!

মিনিট-দুয়েক সময় লাগল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু না, সে ভয় পায়নি! জন্ম-ডিটেকটিভ সে, বাঙলার ভবিষ্যৎ শার্লক হোম্‌স! ভয় পেলে চলবে কেন? তবে ওর জীবনে এটাই প্রথম ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস তো! কাটা লাশ এর আগে দেখা ছিলনা বলেই হাঁটু দুটো ঐ একটু ইয়ে-মতো হয়ে গিয়েছিল, ভয় পায়নি। হেবো মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। এবার আর জেল নয়, অপরাধীকে ধরতে পারলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার কেস! হত্যাকারী এখনও বাড়িতেই আছে। চকিতের মধ্যে মনে হল, বাড়িতে শক্তসমর্থ লোক কেউ নেই। দাদু বৃদ্ধ, সে ছেলেমানুষ, মেজদাটা ক্যাবলা আর বাহাদুরের ধড়-মুণ্ডুর মধ্যে দশ ফুটের ফারাক। সুতরাং হত্যাকারী ভাগ্নেপ্রবরকে বলপ্রয়োগে ধরা যাবে না। না যাক। বল তুচ্ছ, বুদ্ধিই বড়! শার্লক হেবোর বুদ্ধি খুলে গেল চট করে। সবার আগে ঐ ট্যাক্সিটাকে কায়দা করে সরাতে হবে। ওটার সাহায্য না পেলে আততায়ী বেশি দূরে যেতে পারবে না। ওটা ক্যালকাটা রোডে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয় লুটুবাবুর অপেক্ষায়।

সদর দরজা খুলে পাহাড়ি ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে হেবো নেমে এল পিচমোড়া কার্ট রোডে। ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় তখন প্রথম আবিরের প্রলেপ লেগেছে। লাগুক, হেবোর সে সব নজরে পড়ে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে—'আমাকে এক্ষুনি ঘুম স্টেশনে নিয়ে চল—'

ড্রাইভার বলে—'লেকিন উ বাবুকা ক্যা হুয়া? লাট্টুবাবু?'

—'হাঁ হাঁ, ঐ লাট্টুবাবুই তো আমাকে পাঠালেন; বললেন—'ঘুম স্টেশন থেকে একগাছা লেত্তি নিয়ে আয়। গলায় জড়াবো।'

—'লেত্তি কৌন চীজ? কম্পাটার?'

—'না সর্দারজী! সে মোম দিয়ে পাকানো মোক্ষম জিনিস! তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে স্টেশনে নিয়ে চল দিকিনি!'

ড্রাইভার ওকে ঐ বাড়ির দরজা খুলে নেমে আসতে দেখেছিল। তাই আর আপত্তি করে না। ঘুম স্টেশনে হেবো আবিষ্কার করল দুজন পুলিস কনস্টবলকে। হেবো তাদের সবকথা খুলে বলল সংক্ষেপে। যদিও প্ল্যাটফর্মেই ওদের ডিউটি ছিল, তবু মানুষ খুন হয়েছে শুনে ওরা দুজনেই ওর সঙ্গে আসতে রাজি হল। ওদের মধ্যে একজন আবার কিশোর থাপাকে চেনে। পাঁচমিনিটের মধ্যেই হেবোরা ফিরে এল অকুস্থলে। হেবোর নির্দেশমতো সেই কনস্টেবলটা উঠল কমলাগাছের ওপর। হেবো ঘরের মধ্যে পাঁচ সেলের টর্চের আলো ফেলতেই ধপ করে পড়ে গেল পুলিসটা। তার মুখে তখন শুধু—'রাম-রাম-রাম!'

হেবো ধমক দিয়ে ওঠে—'রাম নাম পরে জপ কোরো। কাটামুণ্ডু দেখেছ?'

—'জী-হাঁ, রাম-রাম!'

—'মুণ্ডুটা নেপালীর?'

—'জী হাঁ, রাম-রাম!'

—'ওকে চিনতে পারলে?'

—'জী হাঁ, কিশোর থাপা! রাম রাম!'

—'ব্যস। তবে এস। হত্যাকারী এখানেই আছে!'

ওরা তিনজনে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল লুটুবাবুর ঘরের সামনে। হেবো উঁকি মেরে দেখল, দরজার দিকে পেছনে ফিরে লুটুমামা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন। তাঁর গায়ে একটা সার্জের শার্ট, নিম্নাঙ্গে শুধু মাত্র আন্ডারওয়্যার। প্রস্থানের প্রস্তুতি। হেবো সন্তর্পণে দরজাটা টেনে আলগোছে তুলে দিল শেকলটা। একটা শব্দ হল। লুটুমামা সচকিত হয়ে বলেন—'কে?'

হেবো বললে—'কংসমামার যম!'

হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন লুটুমামা—'এই হতচ্ছাড়া বোম্বেটে বদমায়েশ! দরজা খোল শিগগির!'

হেবো প্রাণ খুলে হাসল। চিল্লাও যত পার! বাঘ এখন বন্দী!

রাম-রাম পুলিসকে দরজায় পাহারায় বসিয়ে হেবো তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ে থানার উদ্দেশে। যাবার আগে বার-বার করে রাম-রাম পুলিসকে সতর্ক করে যায়—থানার দারোগা আসার আগে সে যেন কোনো কারণেই শেকল না খোলে। তাহলে খুনী আসামী পালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তার ঘাড়ে। পুলিসটা রাম-নাম জপ করতে করতেই ঘাড় নেড়ে জানায়, নির্দেশটা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

ট্যাক্সি করে থানা-অফিসারকে নিয়ে আসতে সময় লাগল প্রায় আধ ঘন্টা। ততক্ষণে বেশ সকাল হয়ে গিয়েছে। ওরা এসে দেখে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে রাম-রাম অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সকলে, মায় আশপাশের বাড়ির অনেকেই গণ্ডগোল শুনে এসে হাজির হয়েছেন। পথ-চলতি লোকও জমে গিয়েছে বেশ। ভেতর থেকে লুটুমামা আপ্রাণ চেল্লাচ্ছেন—'এ সেই পাজি বদমায়েশ বোম্বেটেটার কাজ! আমার ট্রেন ফেল হয়ে গেল! মামা তুমি খুলে দাও দরজা!'

দাদুও রাম-রামকে বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন—'লক্ষ্মী মানিক আমার, এইবার দরজা খুলে দাও'—কিন্তু রাম-রামের তখন অন্য মূর্তি! একে সকাল হয়ে গিয়েছে, তায় লোকজন অনেক এসেছে। আর তার ভূতের ভয় নেই। সে গোঁফে তা দিয়ে শুধু বলছে—'মাফ কিজিয়ে! বড়া-সাব থানাসে আ রঁহে হেঁ। বিন্ হুকুম ম্যয় কেওয়ারি নেহি খুলুঙ্গা!'

থানা-অফিসার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে রিভলভার বার করে লুটুমামার উদ্দেশ্যে বললেন—'আমি এ থানার ও. সি.! আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। বেরিয়ে এস। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করব। আমার হাতে পিস্তল।'

দরজা খুলে দেওয়া হল। বেরিয়ে এলেন অসমাপ্ত বেশে লুটুমামা। গোঁফজোড়াটা তাঁর ঝুলে পড়েছে। বলেন—'এর মানে কী?'

হেবো বললে—'মানেটা, আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন লুটুবাবু!'

লুটুবাবু চিৎকার করে ওঠেন—'চোপরাও, বজ্জাত বোম্বেটে ছোকরা!'

প্রাণখোলা হাসি হাসল হেবো।

দারোগা বলেন—'আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। অবশ্য ফুলপ্যান্টটা পরে নিতে পারেন আপনি।'

লুটুমামার পরনে তখনও সেই সার্জের শার্ট, নীল নেকটাই আর আন্ডারওয়্যার। তিনি বলেন—'থানায়? কিন্তু কেন?'

—'আপনাকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করছি আমি।'

লুটুমামা চমকে উঠে বলেন—'খুন? কে করেছে? কাকে খুন করেছে?'

হেবো বলে—'অভিনয় আপনার নিখুঁত কংসমামা।— কিন্তু ওতে কোনো কাজ হবে না! খুন হয়েছে বাহাদুর—গতকাল রাত্রে। তার রাক্ষসমূর্তিটাও চুরি গিয়েছে। চুরি ঠিক যায়নি অবশ্য—আপনার জিনিসপত্র সার্চ করলেই সেটা পাওয়া যাবে। আর, কে খুন করেছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? খুনীর নাম, নটোরিয়াস আর্টিস্ট লুটুমামা দ্য গ্রেট।'

লুটুমামার বাক্যস্ফূর্তি হয় না। চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে শুধু।

দাদু বললেন—'কে খুন হয়েছে? বাহাদুর? কিশোর থাপা?'

—'হ্যাঁ দাদু! নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তার কাটা মুণ্ডু পড়ে আছে তার ঘরে!'

ঠিক এই সময়ে একটা বজ্রপাত হল যেন! ঘটনাটা এমন ভয়ঙ্কর যে, স্বয়ং শার্লক হেবোর মতে দুঃসাহসী গোয়েন্দাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা। তার মাথার মধ্যে টলে উঠল। চোখের ওপর ভেসে উঠল যোজনবিস্তৃত ফুলে ভরা সর্ষের ক্ষেত।

সংজ্ঞা হারিয়ে কাটা কলাগাছের মতো দাদুর কোলে লুটিয়ে পড়ল হেবো।

* * *

গুরুতর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—ঠিক সেই সময়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল শ্রীমান কিশোর থাপা। তার মুণ্ডুটা ছিল গলাবন্ধ কোটের ওপর স্বস্থানেই। তবে, তার হাতে ধরা ছিল একটা পেতলের থালা এবং তার ওপর কিশোর থাপার দ্বিতীয় আর-একটি মুণ্ডু। রক্ত-মাংসের নয়—মাটির। বিচিত্র হেসে বাহাদুর লুটুমামাকে এই সময় বলে ওঠে—'হাঁ সাব! মেরা শিরঠো আপ ভুল গয়ে থে! ম্যয় লায়া হজৌর কো ওয়াস্তে।'

দারোগার প্রশ্নের জবাবে বাহাদুর তার জবানবন্দীতে বলেছিল, গত এক সপ্তাহ ধরে লুটুমামা তাকে সামনে বসিয়ে তার একটা হেড-স্টাডি করছিলেন, কাল রাত্রে সেটা তিনি নিয়ে আসতে ভুলে যান। আর তার রাক্ষস মূর্তিটা? না, সেটা খোয়া যায়নি। গতকাল রাত্রে সে সেটা ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছিল সাবধানতা অবলম্বন করে। আর মুণ্ডুটা পেতলের থালায় বসিয়ে ও রেখে দিয়েছিল জানলার ধারে।

লুটুবাবু বাহাদুরের ভুলটা শুধরে দেন। বলেন—'ওটা রাক্ষস-মূর্তি নয় মোটেই—ওটা হচ্ছে লাফিং বুদ্ধ। চীনা ধরনের একরকম বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয়, চীনা আর নেপালী ভাস্কর্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ আছে ঐ শিল্পনির্দশনটিতে।' তাই তিনি সেটা বাহাদুরের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলেন। বাহাদুর রাজি না হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

দাদু হেবোকে পরীক্ষা করে বললেন—'শক পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মূর্ছা ভাঙতে দেরি হবে।'

মেজদা ভয়ে ভয়ে বলে—'ওষুধ দেবেন না কিছু?'

দাদু বলেন—'না, ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাও। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে দাও ওকে। কেউ ওর ঘরে যাবে না।'

বিচক্ষণ ডাক্তার মৌলিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুঝেছিলেন, এমন কোনো ওষুধ নেই যাতে বেলা এগারোটা সতেরো মিনিটের আগে হেবোর মূর্ছা ভাঙানো যায়! তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন, যেন লুটুবাবু ঐ এগারোটা সতেরোর ট্রেনটা ধরতে পারেন।

* * *

এবার ছুটির শেষে কলকাতায় ফিরে এসে হেবো কাকে যেন একটা চিঠি লিখেছিল :

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার উপদেশে কর্ণপাত করি নাই বলিয়া আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। শিক্ষা আমার হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ছাত্রজীবনে আর গোয়েন্দাগিরি করিব না। ডিটেকটিভ বই পড়িব না, বাজে সিনেমা দেখিব না।

বাবা, হেডমাস্টারমশাই এবং আপনার এত উপদেশেও যে প্রতিজ্ঞা করি নাই, আজ কেন তাহাই করিতেছি, তাহা জানিতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হইতেছে। মার্জনা করিবেন—সে লজ্জার কাহিনী আমি বলিতে পারিব না। তবে দেখিবেন—আমার কথার নড়চড় হইবে না।

আশীর্বাদ করুন যেন সত্যরক্ষা করিতে পারি।

ইতি—
আশীর্বাদভিক্ষু
শুধু হেবো

* * *

খবর পেয়েছি হেবো তার প্রতিজ্ঞা এ-পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছে। ডিটেকটিভ বই দেখলে নাকের ডগাটা আজকাল তার কেমন যেন কুঁচকে যায়—নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধে যেমন হয় পরম বৈষ্ণবের! গোয়েন্দাগিরির যাবতীয় সরঞ্জাম সে বাক্সবন্দি করে রেখেছে।

একমনে শুধু পড়াশোনাই সে করছে আজকাল। সামনে স্কুল-ফাইনালের বিরাট কোর্স। সে পরীক্ষায় তাকে স্কলারশিপ পেতেই হবে।

তা হেবো পাবে। এতদিন অবশ্য ফাঁকি দেওয়াতে গোড়াটা কাঁচা রয়ে গিয়েছে। তবু, এত বুদ্ধি ওর, এত খাটছে...পাবে না?

তোমরা কী বল?

ছোঁবল

উৎসর্গ

শ্রীমতী রত্না সান্যাল
ও
শ্রীমান অমলকান্তি সান্যালকে
আশীর্বাদসহ
ছোটকাকু

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ ডিসেম্বর 1988

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা গেলই।

পাক্কা পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরি। না, ভুল হল, পঁয়ত্রিশ নয়—প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ। চাকরির শুরু এই কালীতারা প্রেসের জন্মলগ্নে। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে—ছত্রিশ সালের অক্ষয়-তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে; আর আজ ও চাকরি খোয়ালো এই একাত্তর সালের ছাব্বিশে এপ্রিল। চাকরির বয়স ওর জীবনের প্রায় আধাআধি। ঢুকেছিল যখন তখনো ত্রিশ হয়নি—এখন পক্ককেশ বৃদ্ধ। আগামীকাল থেকে কালীতারা প্রেসের হাজরি-খাতায় আর লেখা হবে না মান্ধাতার বাবার আমলের সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটির আঁকাবাকা স্বাক্ষর।

চাকরিটা আজ কয় বছর ধরে পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মতো বোঁটা আঁকড়ে টাল-মাটাল দুলছিল —কথাটা জানতো ম্যানেজার থেকে শম্ভুচরণ, মায় ওদের প্রেসের কম্বাইন্ড-হ্যান্ড বংশী পর্যন্ত। আসল কারণটা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি—আপাতদৃষ্ট হেতুটা না বোঝার কোনো কারণ নেই। আর পাঁচজনের চোখে তো ওর মতো ছানি পড়েনি।

ছানি-পড়া চোখে যদি প্রুফ-রীডারির গাঙ পাড়ি দেওয়া যায়, তাহলে বেতো ঠ্যাঙ নিয়ে ঝুমুরদলে কিংবা তোৎলামি নিয়ে যাত্রাদলে মেডেল পাওয়া যেত। তবে নাকি মুরারীদা এই ছাপাখানার সবচেয়ে পুরানো লোক—সিনিয়ার-মোস্ট স্টাফ—ঐ প্রথম ট্রেডল-মেশিনটারও আগে চৌকাঠ মাড়িয়েছে এ প্রেসের, তাই সবাই ভেবেছিল মালিক এবারেও ক্ষমাঘেন্না করে ব্যাপারটা মেনে নেবেন।

নিলেন না।

ওরা ভাবল, বারে বারে বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করলে ব্যবসা চলে না।

ওরা জানে না ভেতরের কথাটা—ঐ বাপের আমলের বুড়োটাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না রত্নেশ্বর। কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারেনি। ঐ যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না—'নেসেসারি ঈভল'—মুরারী রায় ছিল সেই জাতের অনাসৃষ্টি। আজ ঐ সিন্ধুবাদটিকে ঘাড় থেকে নামাতে পেরে বেঁচেছে রত্নেশ্বর। মুরারী রায় মালিকের বাপের সমবয়সী না হলেও ছিল তাঁর দক্ষিণ হস্ত। তখন ওর বয়স কম। সবটাই শোনা কথা। ঐ বৃদ্ধটি নাকি আদিযুগে এ প্রেসের সব কিছু। জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সেরে বুক দিয়ে খাড়া করেছে সেটাকে, বলতে গেলে একা-হাতে। সেজন্য মালিকের কাছে এতদিন সম্মান-সমীহও কিছু কম পায়নি। কর্মচারীদের মধ্যে ঐ একটিমাত্র বৃদ্ধকেই সে 'আপনি' বলে কথা বলে। আগেকার জমানায় তাকে 'মুরারীকাকা' ডাকত—ইদানিং সম্বোধনটা এড়িয়ে চলে।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকবে তো?

ছোটখাট মানুষ। মাথায় ফুট পাঁচেক। কদমছাঁট এক মাথা সাদা চুল, চোখে নিকেলের চশমা। একটা ডাঁটি ভেঙে গেছে। সেদিকটা সুতো দিয়ে বাঁধা। গেঞ্জির মাপ ছাব্বিশ ইঞ্চি। মালকোঁচা-সাঁটা খাটো ধুতি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তার পকেট-দুটি ভাদ্রের বাঁওড়ের মতো সদাই টইটম্বুর—বিড়ি-দেশলাই, পাণ্ডুলিপি, গ্যালিপ্রুফ, চশমার খাপ। প্রেসের প্রতিটি কোণা তার নখদর্পণে। কম্পোজিশন, প্রুফ দেখা, মেমো-ইন্ভেন্ট-ইনভয়েস—মায় মেশিন বিগড়ালে টুকিটাকি মেরামতি পর্যন্ত। ছেলেপিলে নেই—সংসারে আছে বুড়ি গিন্নি। আদিনিবাস মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে। ভাগ্যান্বেষণে বার হয়ে এসেছিল কিশোর বয়সে। লেখাপড়া খুব কিছু শিখতে পারেনি। যে বছর ম্যাট্রিক দেবে সেবারই ওর পিতৃবিয়োগ হয়। বাবা ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। 'ফি'-র টাকা যোগাড় হয়নি; ফলে পরীক্ষাটাও দেওয়া হয়নি। দেশের বাড়িতে আছে কিছু জমিজমা। জানত শুধু একটাই কাজ —প্রেসের কাজ। রত্নেশ্বরের বাবা যজ্ঞেশ্বরের দৌলতে রুজি-রোজগারের একটা হিল্লে হয়ে গেছিল। তারপর তিন-তিনটে দশক কেটে গেছে একই ঢঙে।

মরাকাটা ঘর পার হয়ে ঘূর্ণির দিকে একটা দেড়-কামরার টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছিল তিন দশক আগে। মাসিক সাত টাকা ভাড়ায়। তাতেই কেটে গেল একটা জীবন। বুড়োবুড়ির। বুড়ি বেতো রুগী। নেংচে নেংচে কোন ক্রমে বাথরুমে যেতে পারে। কুয়ো থেকে জলটাও টেনে তুলতে পারে না। মুরারী সাত সকালে ওঠে। ঘূর্ণির 'পাম্পিং-স্টেশন' ঘাটে খড়েতে স্নান সেরে এসে উনুনে আগুন দেয়। আগে একটু পূজাপাঠ জপতপ করত—গিন্নি বেজুত হবার পরে সেটাও গেছে। শুধু স্নান সেরে ফেরার পথে গঙ্গাস্তোত্রটা আওড়াতে আওড়াতে আসে। সেটুকু পুণ্যফলে যদি স্বর্গে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মুরারীদা নাচার। সময় কোথা? নটার মধ্যে যা পারে রাঁধে। বাগানেই ফলে ঝিঙে, কুমড়ো, বেগুন, লঙ্কা। সাড়ে নটার মধ্যে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে সাইকেলে চেপে রওনা হয়। গিন্নির ভাতটা ঢাকা দিয়ে রেখে আসে। সাইকেলটা ও কেনেনি—ওটা তার দাদার দান—মানে, প্রাক্তন মালিক যজ্ঞেশ্বরের। দশটা বাজার আগেই প্রেসে পৌঁছে যায়। কোনো কোনোদিন আসার পথে তাগাদাও দিতে হয় কিনা—ঐ যারা প্রেসে কাজ করায়, পয়সা দিতে গড়িমসি করে। তারপর প্রেসে এসে তালা খুলে জাঁকিয়ে বসে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় মালুম হয় না। দেড়টার সময় টিফিন। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না এটাই রক্ষে। এটাও প্রাক্তন মালিক যজ্ঞেশ্বরের অবদান—প্রত্যেকটি কর্মী পায় দু-পীস, মানে আধখান করে পাউরুটি আর এক প্লেট ঘুগনি, অথবা ছোলার ডাল। কোনোদিন বা লক্ষ্মণের ডালপুরি। লক্ষ্মণ যা ডালপুরি বানায়—লা-জবাব! ম্যানেজারের যেদিন মেজাজ শরিফ থাকে সেদিন ঐ শুকনো পাউরুটির বদলে কর্মীরা পায় গোয়াড়ি-গঞ্জের ঐ সরেশ মুখরোচক : লক্ষ্মণের ডালপুরি! যাকে বলে ফাস্টু-কেলাশ! ফ্রি। বাড়ি ফিরতে কোনোদিন সন্ধ্যা, কোনোদিন নিশুতি রাত।

মালিকের মুখে অন্তিম নিদানটা শুনে মুরারীদা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। এমন ঘটনা ওর জীবনে আগেও ঘটেছে—মানে চাকরি-খতমের নোটিস পাওয়া—কিন্তু এবার যেন মনে হল : এটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। এবার রত্নেশ্বর বদ্ধপরিকর!

চোখে জল নেই। চোখ দুটো কড়কড় করছে। ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠা-নামা করল শুধু।

—বুয়েছেন? কাল থেকে আর আসতে হবে না আপনাকে। এবার সত্যি সত্যিই বিদায় হলেন। বুড়ো হয়েছেন, এবার বিশ্রাম করুন। পরকালের কথা কিছুটা ভাবুন। জপতপ করুন।

মুরারীদা কী একটা কথা বলতে গেল। তারপর সামলে নিল। মুহূর্তে মনস্থির করল। নাঃ! কারও দয়ায় প্রাণধারণের এ উঞ্ছবৃত্তি আর পোষাবে না। অনেক সয়েছে, আর নয়। সত্যিই তো, চোখে আজকাল ভাল দেখে না। ডাক্তার বলেছে—পেকেছে, ছানিটা কাটানো যায়; কিন্তু ও সাহস পায়নি। 'সাহস পায়নি' বলাটা ঠিক নয়। বেতো বুড়িটাকে একা ফেলে সে চোখ কাটাতে যায় কোন আক্কেলে? না হলে প্রতি শীতেই তো বিনা খরচায় চোখ-কাটানো ডাক্তারেরা আসেন—কচাকচ সবার ছানি কেটে দেন। তাই মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়েই রইল।

মালিক রসিয়ে রসিয়ে যোগ করে, আর শুনুন। সেবারের মতো আপনার বোঠানের কাছে গিয়ে যেন ধর্না দেবেন না। এবার তাতে লাভ হবে না কিছু। হুকুম নড়বে না। মাঝখান থেকে আপনার বোঠান বেইজ্জত হবেন বেহুদ্দা। বুয়েছেন?

হ্যাঁ, বুঝেছে। না বোঝার কী আছে? 'বৌঠান' অর্থ রত্নেশ্বরের মা-জননী। যদিও রত্নেশ্বর ইদানিং ওকে 'মুরারীকাকা' ডাকে না তিনি কিন্তু ওকে এখনো 'মুরারীঠাকুরপো' বলেন। রত্নেশ্বরের দাপটে সেই বৃদ্ধা যে পূজাঘরের চার-দেওয়ালের ভেতর আত্মগোপন করে আছেন এই মর্মন্তুদ সত্যটা জানা ছিল তার। তবে রতনের ঐ অভিযোগটা কিন্তু সত্যি নয়। সেবার—মানে আগেরবার—চাকরি যাবার পরে সে তার বোঠানের কাছে ধর্না দেয়নি। বৌঠানই আগবাড়িয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে-সব কথা রতনকে বলতে যাওয়া বৃথা। তাই মুরারীদা কোনও জবাব দিল না। মুখটা তুলতে পারল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ক্যাম্বিসের জুতোর অন্তর-বিদীর্ণ করা ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটার দিকে।

—যান এবার। কাল সকালে এসে এপ্রিল মাসের মাইনেটা নিয়ে যাবেন। মাসের এখনো চার চারটে দিন বাকি; তা হোক—পুরো মাসের মাইনেটাই দেব আপনাকে। যান।

হঠাৎ কী যেন হল বৃদ্ধের!

আচমকা ওর মানসপটে ভেসে উঠল এক সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের মূর্তি—ওর গুরু! সেই যাঁর কাছে প্রেসের কাজে ওর হাতেখড়ি। তাঁরও ছিল একমাথা পাকা-চুল, ঝোলা-গোঁফ, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, গলায় বেলের আঠা দিয়ে মাজা সামবেদী পৈতে। পিতৃবিয়োগের পর তাঁরই ছাপাখানায় প্রথম কাজ শিখেছিল। তাই ফস্ করে বলে বসল, না, না, তা কেন? তুমি শুধু ছাব্বিশ দিনের মাইনেটাই চুকিয়ে দিও। কাজ না করে বাকি চারদিনের মাইনে নেব কেন?

রত্নেশ্বর কোনক্রমে জিহ্বাকে সংযত করল! আশ্চর্য! বুড়ো ভাঙবে তবু মচকাবে না! কাল থেকে কী করে হাঁড়ি চড়বে সে খেয়াল নেই! এখনও তেজ দেখাচ্ছে! বোধকরি বুড়োটা ভাবছে—এবারও একে ধরে তাকে ধরে চাকরিটা বজায় রাখতে পারবে—হয় ওর বৌঠান, নয় মা-জননী, অথবা ঋদ্ধি! জানে না—এবার ওকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না রত্নেশ্বর। লোকটা এখন আর 'নেসেসারি ঈভল্' নয়— অর্থাৎ 'ঈভল্' বটেই, কিন্তু 'নেসেসারি' নয়। ওকে বাদ দিয়েও প্রেস দিব্যি চলবে। সুইংডোরটার দিকে তর্জনী-সংকেত করে শুধু বললে—যান!

নিঃশব্দে সুইং-ডোর ঠেলে এবার বাইরে বার হয়ে এল। সেখানে একটা জটলা। সুরেন, কিষ্টো, গোলাম কুদ্দুস আর শম্ভুচরণ, মায় বংশী। সরে-নড়ে তারা পথ করে দিল। কেউ রা কাটল না। মুরারীদাও নয়। হাসিখুশি মানুষটা যেন আজ অন্যরকম। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। ঠিক সেবারের মতো।

ইতিপূর্বে আরও একবার মুরারীদার চাকরি যায়। বছর দেড়েক আগে। সেবার বৌঠানের হস্তক্ষেপে রত্নেশ্বর তার আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তবে সেবার অপরাধটা এমন আকাশচুম্বী ছিল না। মর্মান্তিক এক রসিকতাই সেবার ওর কাল হতে বসেছিল। এবারেও অবশ্য তাই। মুরারীদার ঐ এক চারিত্রিক দুর্বলতা। কথার পিঠে জবর-জবাব মুখে এলে বলে ফেলবেই। কোথায়, কাকে, কী বলছে তা খতিয়ে দেখবে না!

ওর এই চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে অনেকে ওকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠরা, সহকর্মীরা এমনকি ওর পাতানো নাতির দল। তারা বলত, মুরারীদা, স্বভাবটা বদলাও, নাহলে মরবে একদিন।

মুরারীদা হাসতে হাসতে বলত, বলছিস? অর্থাৎ কোনোক্রমে স্বভাবটা বদলাতে পারলে আর কোনোদিন মরব না? বিভীষণ, অশ্বত্থামার মতো অজর-অমর হয়ে থাকব? অথবা পবননন্দনের মতো ডালে-ডালে হুপ্-হুপ্ করে দাপাদাপি করব শেষ-প্রলয়-তক্?

ওরা বলত, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা!

মুরারীদা বলত, এই তো! বুঝে ফেললি! তাহলে বেহুদ্দো তর্ক করিস কেন? ভেবে দেখ—মুখে-মুখে লা-জবাব জবাব দিতেন বলেই আমার গুরুদেব অমর হয়ে আছেন—কলকাতা আজও 'কেবল ভুলে ভরা'! 'বিদূষক' নেই, কিন্তু গানটা আছে! সত্যি কিনা বল? তাছাড়া কী জানিস? এ রোগ আমার শোধরাবার নয়। এ হলো গিয়ে যাকে বলে আমার গুরুপ্রসাদী! তোরা তো জানিসই আমার গুরু ছিলেন কথার-পিঠে কথা বলায় এক দুর্লভ শাহেনশা! তেমন-তেমন কথা মনে এলে বলে ফেলতে দ্বিধা করতেন না! লালগোলার মহারাজকে তিনি ফস করে বলে বসলেন—'আপনি তো মশাই একজন পানিপাঁড়ে'! আর কারও হিম্মৎ হতো ওকথা বলার?

তা বটে! মুরারীদা ষোলো-সতের বছর বয়সে প্রথম চাকরি করতে যায় দাদাঠাকুরের কাছে। চাকরি ঠিক নয়—পেট-ভাতারি গুরুগৃহে কাজ শেখা। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' প্রেস-এ। দা'ঠাকুর ওকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন ট্রেডল মেশিন চালানো, প্রুফ-দেখা, হ্যান্ড-কম্পোজিশন, মায় টুকিটাকি মেরামতি পর্যন্ত। ঐ সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে গুরুর অমোঘ প্রভাব ঐ কিশোর-বয়স্কের রসসিক্ত জিহ্বায়— চট্‌জল্‌দি জবাব দেবার দুর্লভ দক্ষতা।

দা'ঠাকুর ওকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুরারী, তুই পরীক্ষাটা দে। 'ফিজ'-এর টাকা কটা আমিই দেব—না রে, দান নয়, ধার। তুই কাজ করে ধীরে ধীরে তা শোধ করে দিস, কেমন?

মুরারীদা প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, এ প্রস্তাব তো লালগোলার 'পানিপাঁড়ে' আপনাকেও দিয়েছিলেন—হাত পেতে নিতে পারেননি কেন? তার জবাবে দা'ঠাকুর ওর পিঠে একটা বিরাশী-সিক্কা থাপ্পড় মেরে

বলেছিলেন, বাহা রে বাহা! 'বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি, কী শিখানু তারে?' ঠিক আছে, মুরারী, পরীক্ষা না দিলি তো নাই দিলি, পড়াশুনাটা তোকে চালিয়ে যেতে হবে। আমার কাছে। বুঝলি? রোজ সন্ধ্যার পর আমার কাছে বই নিয়ে পড়তে বসবি!

ত বসত। সারাদিন ট্রেডল-মেশিন চালিয়ে সন্ধ্যার পর বই-খাতা নিয়ে পড়তে বসত তাঁর পায়ের কাছে। শিখেছে অনেক কিছু। আজ তার অনেক কিছু আবার ভুলেও গেছে। যা.ভোলেনি তা ঐ সূক্ষ্ম রসিকতা-বোধটুকু। বিদূষকের ভূমিকাটুকু : "কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস / বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস।।"

তাতে ভুগতেও হয়েছে ওকে।

সেবার যেমন। বছর-দেড়েক আগে যেবার ওর প্রথম চাকরি যায় :

স্থানীয় কলেজের ম্যাগাজিনটা ছাপা হয় এই কালীতারা প্রেস থেকে। বলা যায় দু-পুরুষ ধরে। বস্তুত দু-দশক আগে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মুরারীদাই কাজটা আদায় করে এনেছিল তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ধড়পাকড় করে। সে প্রিন্সিপ্যালও নেই, সেই মালিকও নেই—কিন্তু কাজটা আছে। বছর-বছর কলেজ ম্যাগাজিন এখান থেকেই ছাপা হয়।

সেবার ছাপা ম্যাগাজিনের একটি কপি হাতে করে বাঙলার অধ্যাপক করুণাময়বাবু এসে উপস্থিত হলেন প্রেসে। রত্নেশ্বর শশব্যস্তে বলে, আসুন, আসুন স্যার, বসুন।

—আর বসুন! আগেই তো পথে বসিয়ে দিয়েছেন, দত্তমশাই।

—কেন স্যার? কী হল?

—কী হয়নি? হয় আপনি প্রুফ-রীডার বদলান, নইলে আমরাই প্রেসটাকে বদলাই।

ছাপা ম্যাগাজিনটা পাতায় পাতায় দাগানো। সেটা বাড়িয়ে ধরেন রত্নেশ্বরের দিকে। এত ছাপার ভুল কলেজ-ম্যাগাজিনে বরদাস্ত করা যায় না। মান রাখতে রত্নেশ্বর হাঁকাড় পাড়ে, মুরারীবাবু?

নিকেলের চশমার কাচটা মুছতে মুছতে গরুড় পক্ষীর মতো এসে দাঁড়ায় ছোট্টখাট্ট মানুষটা।

—এসব কী হয়েছে?—জলদগম্ভীরস্বরে কৈফিয়ত তলব করে রত্নেশ্বর।

মুরারী স্পিক্‌টি নট্‌। কৈফিয়ত কী বা দেবার আছে? রত্নেশ্বর বলে, হয় ছানিটা কাটান, নয় বিদায় হন। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। না রত্নেশ্বর, না করুণাময়বাবু—দুজনের কেউই তখন আন্দাজ করতে পারেননি ভর্ৎসিত ঐ বৃদ্ধের অন্তঃকরণে তখন কী চিন্তা জাগছিল। মুরারীদা মনে মনে ভাবছিল—রতনের শেষ ক্রিয়াপদটা 'বিদায় হন' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'কাটুন'। তাহলে 'কাটা' শব্দটার যমক হত। যমক ছাড়া ধমক হয়?

করুণাময়বাবু বলেন, হ্যাঁ মশাই, 'ছোবল' কথাটায় চন্দ্রবিন্দু এল কোথা থেকে? কোন অভিধানে পেলেন?

চুপ করে থাকলেই ল্যাটা চুকে যায়—কিন্তু 'স্বভাব না যায় মলে'! বিদূষকের মন্ত্রশিষ্যটি বেমক্কা বলে বসল, আজ্ঞে ঢোঁড়া সাপের ছোবলে চন্দ্রবিন্দু থাকে না, কিন্তু এখানে কাল-কেউটের বাচ্চার কথা বলা হয়েছে তো? তাই ভাবলাম—

বাঙলা-অধ্যাপকমশায়ের চোখ কপালে ওঠে। বলেন, মানে? সাপের জাত বদল হলে 'ছোবল'-এর বানানে বদল হয়?

বিনয়ে বিগলিত মুরারীদা হাত দু'টি কচলে বলে বসে, বিবেচনা করে দেখুন স্যার! কেউটের ছোঁবল খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে যিনি শ্রীযুক্ত অথবা শ্রীযুক্তা, ছোঁবল খাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে তাঁর নাম লিখতে একটা চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োজন হয়। ঢোঁড়াসাপের ক্ষেত্রে তা হয় না!

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন করুণাময়বাবু। বলেন, এটা কিন্তু জবর কৈফিয়ত!

রত্নেশ্বরও ফেটে পড়েছিল। অট্টহাস্যে নয়, রাগে। করুণাময়বাবু বিদায় হবার পরে বিদায়ী বিল্বপত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিল অধঃস্তন কর্মচারীর হাতে। মুরারীদা প্রথমটা বুঝতে পারেননি। জানতে চায়, কী ওটা?

—কেউটের 'ছোঁবল'! পড়লেই বুঝতে পারবেন! কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুরারীদা বলেছিল, অ! তাড়িয়ে দিচ্ছ? তা আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে তা কাকে বুঝিয়ে দেব?

—আপনার কাছে আবার কী কাগজপত্র আছে?

—তা আছে রতন—এই নাও ধর—

ফতুয়ার পকেট থেকে এক গোছা কাগজ নামিয়ে রেখেছিল মালিকের টেবিলের ওপর। গ্যালিপ্রুফ, পাণ্ডুলিপি, ক্যাশমেমোর বই। বলেছিল, চলি তাহলে?

খানিক গিয়েই আবার ফিরে আসে। বলে, ভাল কথা মনে পড়ল, ইয়ে হয়েছে—নিলাম ইস্তাহারের কাগজগুলো কাল সকালে ডেলিভারি দেওয়ার কথা। ভুলে যেও না আবার। যা ভুলো মন তোমার!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রত্নেশ্বর, বৃদ্ধের স্পর্ধা দেখে।

সেবার চাকরি ওর যায়নি। বৌঠানের দয়ায়।

*　　*　　*

আগে নাম ছিল হাই স্ট্রিট, এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। শহরের সবচেয়ে চওড়া সড়ক। রত্নেশ্বরের ভদ্রাসন সেই সড়কে। প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। একতলায় সারি-সারি দোকান ঘর। মনিহারী দোকান, সেলুন, কাটা-কাপড়ের দোকান। দোতলায়-তেতলায় নিজেরা থাকে। ভাড়া দেয়নি। সংসারে যদিও কুল্যে চারটি প্রাণী—মা, বউ আর একমাত্র ছেলে, ঋদ্ধি। মুরারীদা রতনের চেয়ে বয়সে পনের বছরের বড়, আবার রতনের পিতৃদেব যজ্ঞেশ্বর ছিলেন মুরারীর চেয়ে পনের বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। যজ্ঞেশ্বরই কালীতারা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। মুরারী রায় ছিল তাঁর দক্ষিণহস্ত। প্রথম যুগে প্রেসের যাবতীয় দায়ঝক্কি ছিল মুরারীর স্কন্ধে। মালিক শুধু হিসাব রাখতেন। সে আমলে মুরারীদাকে প্রেসের তালা খুলে ঝাঁট দিতেও হয়েছে।

প্রাকস্বাধীনতা যুগেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রেসটা। তখন এ বাড়ি একতলা। দ্বিতল-ত্রিতল হয়েছে পরবর্তী জমানায়। যজ্ঞেশ্বর প্রেসটাকে খাড়া করেছিলেন বটে, সঞ্চয় খুব কিছু করতে পারেননি। আর্থিক উন্নতি যা কিছু তা রত্নেশ্বরের কৃতিত্ব।

রবরবার কণামাত্রও প্রেস থেকে নয় কিন্তু। প্রেস থেকে যা রোজগার তাতে রতনের হাতখরচাটুকু ওঠে কিনা সন্দেহ। ওর উপার্জনের উৎসমূল অন্যত্র। সে আবার এক বিচিত্র কাহিনী :

কী একটা সামান্য কারণে বাপ-ছেলেয় রাগারাগি। সেটা যুদ্ধের আমল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রতনের বয়স তখন কুড়ি-বাইশ। পড়ত কলকাতায় থেকে। নানান বদ-অভ্যেসে পোক্ত হয়ে পড়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই। তাই নিয়েই মনোমালিন্য। বাবা রাগ করে বললে, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে! তোর মুখদর্শন করব না!

ছেলেও এককাপড়ে বেরিয়ে গেল।

ব্যস্! গেল তো গেল একেবারে না-পাত্তা। যুদ্ধের বাজার! নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে দলে দলে লোক পালাচ্ছে—জাপানী-বোমার ভয়ে। রত্নেশ্বরের গর্ভধারিণী অন্নজল ত্যাগ করলেন। বাধ্য হয়ে যজ্ঞেশ্বর মুরারীকেই পাঠিয়েছিলেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গৃহত্যাগী অভিমানীকে ফিরিয়ে আনতে। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না মুরারীর। কিন্তু সে নাগালই পায়নি রতনের। কলকাতায় হস্টেলে রতন ফিরে যায়নি আদৌ। কলেজেও আসে না ক্লাস করতে। সাক্ষাৎ না পেলেও শেষ পর্যন্ত হদিস পেয়েছিল। সে বুঝি কোন ঠিকাদারের তরফে কাজ দেখতে ডিমাপুর চলে গেছে। খবর দিল ওর বন্ধুরাই। রাকেশ পারেখ মস্ত মিলিটারী কনট্রাক্টর। তাঁর ছেলে শশী পড়ত ওদের সঙ্গে। পারেখ-সাহেব যুদ্ধক্ষেত্রে কী সব ঠিকাদারীর কাজ ধরেছেন—দারুণ লাভের ব্যবসা—কিন্তু বিপজ্জনকও। রত্নেশ্বর দত্তকে ডিমাপুরে পাঠিয়ে তিনি কলকাতায় অর্থনৈতিক হাল ধরে বসে আছেন!

যুদ্ধের ক'বছর ছেলে ঘরে ফেরেনি। সে নাকি ডিমাপুর-কোহিমা অঞ্চলে ধুলিমুঠি ধরে সোনামুঠি করছিল তখন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে রুখতে।

দেড় বছরেই লক্ষপতি। ছেলে ফিরে এল বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নিয়ে। ঐ সঙ্গে আরও কিছু আনুষঙ্গিক দোষ—'ম'-কারান্ত।

থামল কালযুদ্ধ। শুরু হল দাঙ্গা। সেই সময়েই দেশে ফিরে এল কৃতী সন্তান। বেকার ছাত্র ততদিনে সুটেড-বুটেড, পাইপ-মুখো কন্ট্রাক্টার-সা'ব। মফস্বল শহরের বুক থেকে তখনও মুছে যায়নি সদ্যসমাপ্ত মন্বন্তরের বিভীষিকা—আকাশে-বাতাসে তখনও ভাসছে : 'মা রে! একবাটি ফ্যান দিবা?'

যজ্ঞেশ্বর হারানো ছেলে ফিরে পেলেন। বোধকরি কথাটা ঠিক নয়। তাঁর 'খোকন' আর এই 'দত্ত-সাহেবে'র মাঝখানে আশমান-জমিন ফারাক। যজ্ঞেশ্বর খুশি হবেন কিনা বুঝে ওঠার আগেই ওপারের ডাক শুনলেন। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই চোখ বুঁজলেন একদিন।

সদ্যস্বাধীন এই মফস্বল শহরের একটি বিশেষ দিনের কথা ভুলতে পারে না মুরারীদা। যজ্ঞেশ্বর তার আগেই নিষ্কৃতি পেয়েছেন। বৌঠান তখনো পূজাঘরের চার-দেওয়ালের অন্তরালে আত্মগোপন করেননি। মা-জননীও তখন আসেনি এ সংসারে—মানে, রতনের স্ত্রী, সুছন্দা। স্বাধীনতার মুহূর্তে ঠিক মতো বুঝে ওঠা যায়নি এই জেলা-সদর শহরটা র‍্যাডক্লিফ-সাহেবের নিদানমোতাবেক কার ভাগে পড়ল। সহস্রাব্দির সেই চিহ্নিত দিনটিতে তাই বাড়ির ছাদে-ছাদে দু-জাতের পাতাকাই উড়ছিল পৎপৎ করে।

তারপরে বোঝ গেল এ শহরটা পড়েছে স্বাধীন ভারতের এলাকায়। তার আগেই মিলিটারি ডিসপোজাল থেকে রত্নেশ্বর জীপ কিনেছে, বাড়িতে টেলিফোন বসিয়েছে। মায় দ্বিতল বানাতে শুরু করেছে—সেই নিঃ-সিমেন্ট আকালের বাজারে। রতন বলত, টাকায় কী না হয়? আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটার আধুনিক নাম—কালো টাকা!

শহরবাসীদের সঙ্গে তার দোস্তি হয়নি। ওর বাল্যবন্ধু বা স্কুলের সহপাঠীরা খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। এতদিন পরে সেই রৎনাটা টাকার কুমির হয়ে ফিরে এসেছে। বেঁটে-বেঁটে জাপানিগুলোকে আর তাদের তাঁবেদার কুইসলিংগুলোকে ভারতে ঢুকতে দেয়নি। যুদ্ধ-প্রত্যাগত বীরের সম্মানই হয়তো দেখাতো তারা কিন্তু ওর নিরুত্তাপ উদাসীনতায় তারা একে একে নেপথ্যে সরে গেল। বুঝল, রতন দত্ত সেই পুরোনো যুগকে ভুলে থাকতেই চায়। হয়তো ভাবে, ওরা এসেছে সময়ে-অসময়ে বন্ধুত্বের দাবীতে হাতে পাতবার শুভেচ্ছা নিয়ে। ওর নয়া ইয়ারবন্ধুরা আসে কলকাতা থেকে। শনিবার সন্ধ্যায়। ফিরে যায় সোমবার প্রত্যূষে। ট্রেনে নয়, বাই রোড।

মদের বন্যা বয়ে যায় সে দুদিন। শুধু বন্ধু নয়, কিছু বান্ধবীও আসে যে!

সেই বিশেষ দিনটির কথা।

সেদিন সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন শহরের দশ-বারোজন। দু-চারজন গণ্যমান্য—স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁরা জেল খেটেছেন, অসহযোগ আন্দোলন করেছেন, নির্যাতন সয়েছেন—এখন নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেই দু-চারজনকে মধ্যমণি করে স্থানীয় যুবশক্তি—কলেজের ছোকরার দল।

—কী ব্যাপার? কী চাই?

ড্রেসিং-গাউন পরে পাইপমুখো দত্ত সাহেব এত্তেলা পেয়ে দ্বিতল থেকে নেমে এসে জানতে চাইল। সুধীন্দ্রনাথ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা। বললেন, বস রতন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রতন বললে, কথা নিশ্চয়ই আছে, না-হলে সাত-সকালে আমার বাড়ি চড়াও হবেন কেন? কী জন্যে চাঁদা চাইতে এসেছেন তা বলতে হবে না। কত দিতে হবে সেইটুকুই বলুন?

সুধীন্দ্রনাথ শহরের মানী ব্যক্তি। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। রতনের বাবার চেয়েও বয়সে বড়। তাঁর আশা ছিল, অন্তত তাঁর সামনে ও ছোকরা পাইপটা টানবে না। বুঝলেন, ধারণাটা ভুল। গম্ভীর হয়ে বললেন, না, চাঁদা চাইতে আসিনি আমরা।

—তাহলে? গরিবখানায় পদধূলি দেওয়ার হেতুটা?

—দেখ রতন, তোমার বাবাও আমাকে 'সুধীনদা' ডাকতেন। তোমার নাড়ি-নক্ষত্রের সন্ধান আমরা জানি। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছ ভালো কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু এটা কলকাতা নয়, এখানে থাকতে হলে তোমাকে চালচলন বদলাতে হবে।

পাইপের আগুনটা নিবে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে সেটা ধরাতে ধরাতে রতন বললে, মানে?

—প্রতি সপ্তাহান্তে তোমার বাড়িতে দেখছি কলকাতা থেকে তোমার কিছু ইয়ার বন্ধু ও বান্ধবীরা আসেন। তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যে কাণ্ডটা হয় তাতে পাড়ার লোকের অসুবিধা হচ্ছে। তাঁরা বিরক্ত।

—নাকি? সেক্ষেত্রে তাঁরা এ-পাড়া ছেড়ে বেপাড়ায় চলে গেলেই পারেন?

হঠাৎ একটি অল্পবয়সী ছোকরা বলে ওঠে, অতগুলো মানুষের বাড়িবদল করার চেয়ে একা আপনার পক্ষে ঠাঁই বদল করাটা সহজ হবে না কি?

রতন রুখে ওঠে, মানে? কী বলতে চাইছ?

—দেখুন রতনদা, আপনি কীভাবে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছেন সে-কথা জানতে বাকি নেই আমাদের। কিন্তু সেসব ইংরাজ-জমানার ব্যাপার। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এসব বেলেল্লাপনা আমরা সহ্য করব না। ইংরেজকে যেভাবে তাড়িয়েছি, প্রয়োজন হলে, তাদের চামচেদেরও সেভাবে 'কুইট-ইন্ডিয়া' করে ছাড়ব।

হঠাৎ এরকম আক্রমণ হবে—তারই বাড়িতে, তারই বৈঠকখানায়—এটা রতন আশঙ্কা করেনি। রতনের একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। সে খেয়াল করে দেখেনি—ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। যুদ্ধান্তে সে যেভাবে রণক্লান্ত সৈনিকের সম্মান পেয়েছিল এখন তার আর তা প্রাপ্য নয়। ইতিমধ্যে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজ দলের তিনজনের বিচার হয়ে গেছে! সে কথা খুঁজে পায় না।

দোরের কাছে তখন দাঁড়িয়ে ছিল মুরারীদা। হঠাৎ এক পা এগিয়ে এসে বললে, সুধীনদা, আমি কথা দিচ্ছি—ওসব বেচাল আর হবে না। আপনি দেখে নেবেন!

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। আপাদমস্তক দেখে নেয় ঐ ছোট্টখাট্ট মানুষটাকে। তার মুখোমুখি হয়ে বলে, আপনি কে মশাই? আগ বাড়িয়ে কথা বলতে এসেছেন?

মুহূর্তে জ্বলে উঠল মুরারীদা। তার ছাব্বিশ-ইঞ্চি বুকটা চিতিয়ে বললে, তুমি কে হে হরিদাস পাল যে, তোমার কাছে আমার পরিচয় দিতে যাব? আমাকে চেনেন দা-ঠাকুর। তাঁর নাম শুনেছ? সেই যে, 'বিদূষক' গো!

সুধীনদা এগিয়ে এসে মুরারীর হাত দুটি ধরে বলে ওঠেন, তুমি রাগ কর না মুরারী—এসব ছেলে-ছোকরা তোমাকে চিনবে কী করে?

তারপর তাঁর ছাত্রবন্ধুদের দিকে ফিরে বলেন, এ হল মুরারী রায়—দা-ঠাকুরের প্রেসে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক ইস্তাহার ছেপে দিয়েছে আমাদের। মানীর সম্মান রেখে কথা বলতে শেখনি তোমরা?

মোটকথা, সেদিন একটা বিশ্রি পরিস্থিতি থেকে রতনকে বাঁচিয়েছিল ঐ মুরারী রায়। শুধু তাই নয়, অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে ওর জীবনের ছকটা সে আমলে কিছুটা পালটে দিতে পেরেছিল। অথচ দুর্ভাগ্য এমন যে, রতন সেজন্য ওর প্রতি কৃতজ্ঞ তো নয়ই, বিরক্ত। যেন মুরারীদাই ওকে অপমান করেছিল সেই সকালে। না হলে, সে দেখে নিত ওদের।

টাকায় কী না হয়?

* * *

টাকায় যে সবকিছু হয় না এ অভিজ্ঞতাটা কিন্তু রতনের হয়েছে; অন্তত হওয়া উচিত ছিল। না, হয়নি। কথাটা সে মেনে নিয়েছিল, মনে নেয়নি। ভেবেছিল—ও একটা ব্যতিক্রম; এক্সেপশন প্রুভস দ্য রুল!

বেয়াল্লিশ সালের ঘটনা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি। রতনের সেদিন একটা বড় জাতের টেন্ডার দেওয়ার কথা। এম. ই. এস.-এ। টেন্ডার অবশ্য নিতান্ত নিয়মরক্ষা। কাজটা সে পাবেই। তলেতলে আগেভাগেই টাকা খাইয়ে রেখেছে ঘাটে-ঘাটে। গ্যারিসন এঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে তাঁর ডিভিশনাল হেড-এস্টিমেটর, স্টেনো, মায় সাহেবের আর্দালি পর্যন্ত। যাতে 'লোয়েস্ট' না হলেও কোনো ছুতোনাতায় তার টেন্ডারখানাই গৃহীত হয়। বস্তুত টেন্ডার গৃহীত হয়েছে ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই ইটের ভাঁটায় বায়না দেওয়া হয়ে গেছে। যুদ্ধের ডামাডোলে এটাই ছিল রেওয়াজ। আসামে একটা টেম্পোরারি এয়ারস্ট্রিপ আর কিছু

ইনফ্রা স্ট্রাকচার বানানোর কাজ—পনেরো লক্ষ টাকার! দুপুর দুটোয় টেন্ডার দাখিল করার শেষ মুহূর্ত। সাহেব টেন্ডার খুলবেন তিনটেয়। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে রতন বাড়ি থেকে রওনা হল বেলা দশটায়। কারণ ছিল। 'স্মল-কজ-কোর্টে' তাকে ঐ দিন বেলা এগারোটায় একবার হাজিরা দিতে হবে।

সে আর এক বখেড়া। দিন কয়েক আগে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে লালবাতির সঙ্কেত অগ্রাহ্য করে তাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ওর জরুরী দরকার ছিল। সবসময় ট্রাফিক সিগন্যাল তো আর মানা সম্ভবপর নয়। বিশেষ রত্নেশ্বর দত্তের মতো ব্যস্ত মানুষের। ওয়ার-এমার্জেন্সি বলে কথা! জীপের ভিয়ু- ফাইন্ডারে নজর হয়েছিল, মোড়ের পুলিশটা তার গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে নোটবইতে। রতন মনে মনে বলেছিল, টোক বাবা, টোক! তোর কাজ তুই করে যা। দু-দশ টাকা ফাইন দেব; কিন্তু এই মুহূর্তে লালবাতির চোখ রাঙানি আমি মানতে পারব না বাপু!

আজই বেলা এগারোটায় সেই কেস্‌-এর হিয়ারিং। 'স্মল-কজ-কোর্ট'-এ হাজিরা দেবার ইচ্ছা ওর একেবারেই ছিল না। কিন্তু উকিলবাবু বললেন, তা হয় না স্যার। গাড়ি আপনার, লাইসেন্স আপনার নামে, চালাচ্ছিলেন আপনি, এখানে আমি কী করে আপনার হয়ে দাঁড়াব?

রতন বলেছিল, তাহলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে 'ডেট' নিন। আজ যে আমার টেন্ডারের তারিখ!

উকিলবাবু ওকে আশ্বস্ত করেছিলেন, সে তো বেলা দুটোয়, স্যার! আপনি কিছু ভাববেন না। এ ব্যাপার শুধু পাঁচ-সাত মিনিটের। আমি দেখব, যাতে সবার আগে আপনার কেসের ডাক পড়ে। পাঁচ-দশটাকা ফাইন হবে, টাকা মিটিয়ে সোজা চলে যাবেন টেন্ডার দাখিল করতে। তবে একটা কথা বলে রাখি স্যার—গিল্‌টি প্লীড করবেন, আর ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব যা জরিমানা ধার্য করবেন তা এক কথায় মেনে নেবেন। তর্কাতর্কি করতে যাবেন না, তাতে ফাইনের অঙ্কটা বেহুদ্দো বেড়ে যাবে।

রতন বিজ্ঞের মতো বলেছিল, জানি। ওখানে কাজির বিচার হয়। আপনি শুধু দেখবেন, সবার আগে যেন আমার কেসটা ওঠে। প্রয়োজনে বিশ-পঞ্চাশ-টাকা খাওয়াতে কৃপণতা করবেন না যেন।

পৌনে এগারোটার মধ্যেই আদালতে হাজিরা দিয়েছিল। বিচারক এলেন কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটার সময়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। উকিলবাবুর কনুইয়ের গোঁত্তা খেয়ে রতনও।

তারপর কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল না! পেশকার যে নামটা দাখিল করল, কোর্ট-পেয়াদা প্রতিধ্বনি করল বাজখাঁই গলায়, সেটা 'রত্নেশ্বর দত্ত' নয়।

রতন বিরক্ত হয়ে উকিলবাবুকে বলে ওঠে, এ কী! আপনাকে এত করে বললাম.....

উকিলবাবু ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, আস্তে স্যার, আস্তে। এর পরেই আপনার ডাক পড়বে। রত্নেশ্বরের বিস্ময়প্রকাশ কিছু সোচ্চার হয়ে থাকবে। অনেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। মায় বিচারক স্বয়ং।

দ্বিতীয় আসামীর নাম যখন ঘোষিত হল তখন দেখা গেল সে অন্য একজন ভাগ্যবান। এবারও রতন উকিলবাবুকে ধমক দিল, তবে চাপাকণ্ঠে। ম্যাজিস্ট্রেট আবার ওকে নজর করলেন। আশ্চর্য! রতন দত্ত তৃতীয় কিংবা চতুর্থ স্থানও দখল করতে পারেনি। রাগে মনে মনে ফুঁসছিল সে। উকিলবাবু এ বাবদ পঁচিশটা টাকা হাতিয়েছেন। যাতে সবার আগে ওর ডাক পড়ে সেই ব্যবস্থা করতে। পঁচিশ টাকার ভাউচার দেওয়ার তো আর প্রশ্ন ওঠেনি। রতন আন্দাজ করে ঐ পঁচিশ টাকা উকিলবাবু পকেটস্থ করেছেন। বড়জোর একটা কাঁচি সিগ্রেট খাইয়েছেন পেশকারকে। কোনো মানে হয়? পনেরো লক্ষ টাকার টেন্ডার যেখানে 'ইনভলভড়'....

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটার ঘরটা দেখাচ্ছে। রতন উশখুশ করছে, বারে বারে ঘড়ি দেখছে। রাগে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার—অথবা উকিলবাবুর চুলের এক মুঠি উপড়ে নিতে! পকেট থেকে পাইপ-পাউচ বার করতেই উকিলবাবু হুমড়ি খেয়ে বাধা দেন, করেন কী স্যার! কোর্টের ভেতর স্মোক করা বারণ!

অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—পৌনে বারোটায়। কোর্ট পেয়াদা হাঁকাড় পাড়ে : রত্নেশ্বর দত্ত হা-জি-র?

গলার টাইটা ঠিক করে নিয়ে রতন উঠে দাঁড়ায় আসামীর নির্দিষ্ট মঞ্চে।

প্রসিকিউশনের তরফে কোর্ট-ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করেন, আপনার নাম?

রতন বিরক্ত হয়ে বললে, এইমাত্র তো শুনলেন কোর্ট পেয়াদার হাঁকাড়ে। যে-নামে সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—বাজে কথা একদম বলবেন না। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন। আপনার নাম?

—রত্নেশ্বর দত্ত।

—গত সতেরোই জুন বেলা এগারোটা দশ মিনিটের সময় আপনি একট জিপ ড্রাইভ করে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে....

রতন অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, হ্যাঁ স্যার। স্বীকার করছি! অপরাধ হয়ে গেছে। রেড-সিগনাল দেখতে পাইনি। বলুন, কত ফাইন দিতে হবে?

শেষ প্রশ্নটা বিচারকের দিকে ফিরে।

তিনি শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। প্রস্তরমূর্তির মতো বসেই রইলেন। তাঁর চোখ জোড়া ভাবলেশহীন—মরা পাবদা মাছের মতো। কোর্ট ইন্সপেক্টর বললে, অভিযোগটা না শুনেই অপরাধ স্বীকার করছেন দেখছি। বারে বারে ঘড়ি দেখছেন—মনে হচ্ছে আপনার খুব তাড়া আছে। তাই নয়?

—তা আছে, স্যার। বলুন, কত ফাইন দিতে হবে?

—আগে অভিযোগটা শুনুন। তারপর তো গিল্‌টি কি না স্বীকার করবেন?

—বেশ বলুন?—রতন রীতিমতো বিরক্ত।

—এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে একটি লোককে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন?

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় রতন! বলে, না তো! কে বললে?

—কেউ বলেনি। তাই বলছি, অভিযোগটা শুনে তারপর গিল্‌টি প্লীড্‌ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নয় কি?

আরও দু-চার মিনিট ধরে চলল, সওয়াল-জবাব। রতন এর মধ্যে আবারও একবার ঘড়ি দেখেছে। যাহোক, আদ্যোপান্ত শুনে সে দ্বিতীয়বার স্বীকার করল তার অপরাধ। বলল, তাড়াহুড়ায় লালবাতির সঙ্কেতটা তার নজরে পড়েনি।

প্রসিকিউশন এবার বিচারককে জানায় তার সওয়াল শেষ হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন, দেখা গেল, কী-জানি কেন তিনিও কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন ঐ ব্যস্তসমস্ত মানুষটির বিষয়ে। এক কথায় রায় না দিয়ে তিনি নিজেই এবার সওয়াল শুরু করেন, আপনি প্রসিকিউশনকে এইমাত্র বললেন যে, আপনার খুব তাড়া আছে। কিসের এত তাড়া?

পকেট থেকে সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফাটা বার করে রতন বিচারককে দেখায়। বলে, এম. ই. এস্‌.-এ একটা টেন্ডার দিতে হবে স্যার। বেলা দুটোর মধ্যে।

—'এম. ই. এস.' মানে মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস?

—ইয়েস স্যার।

—আপনি বুঝি মিলিটারি ঠিকাদার?

কোনো মানে হয়? তোর এসব খেজুরে-গল্পে কী কাজ? পাৎলুন যেটা পরে এসেছিস সেটা তো নির্ঘাৎ চাঁদনি থেকে রেডিমেড কেনা।

রতন সবিনয়ে স্বীকার করল, হ্যাঁ স্যার।

—কত হাজার টাকার টেন্ডার ওটা?

—হাজার নয়, লাখ। পনেরো লক্ষ টাকার টেন্ডার—আসলে একটা এয়ারস্ট্রিপ বানানোর কাজ। ওয়্যর এমারজেন্সি! এবার বলুন স্যার, কত ফাইন দিতে হবে?

বারে বারে অনুরুদ্ধ হয়েও বিচারক সে-কথা বলছেন না। এবার তিনি যে প্রশ্নটা করলেন তার সঙ্গে ওর অপরাধ সম্পর্কবিমুক্ত! বলেন, পনের লক্ষ টাকা! বলেন কী! কাজটা পেলে কত টাকা প্রফিট থাকবে মনে করেন?

রতনের মনে হল জবাবে বলে, ইররেলিভ্যান্ট, ইম্‌মেটিরিয়াল অ্যান্ড অ্যাবসার্ড! কিন্তু উকিলবাবুর সতর্কবাণী স্মরণ করে সে ধৈর্যচ্যুত হল না। বললে, ফেয়ার-ডীলে ধরুন টেন পার্সেন্ট।

—মানে প্রায় দেড় লাখ! আর আনফেয়ার ডীল হলে?

রতন হাসল। রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, সেটা কি স্যার হলপ নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলা যায়?

হাসিতে নাকি হাসি আনে। প্রবাদবাক্যটা এক্ষেত্রে সার্থক হল না। বিচারক একদৃষ্টে ওর দিকে শুধু তাকিয়েই রইলেন। যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

রতন হিপ-পকেট থেকে ভারি ওয়ালেটটা বার করে বললে, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। আর করব না। বলুন স্যার, কত টাকা ফাইন দিতে হবে?

বিচারক বাকশক্তি ফিরে পেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, গিলটি। টু বি ডিটেইনড টিল রাইজিং অব দ্য কোর্ট!

হতভম্ব রতন শুধু বললে, মানে?

ইতিমধ্যে একজন সেপাই এসে আলতো করে ধরেছে ওর দক্ষিণ বাহুমূল। বললে, আপনার কেস হয়ে গেছে। এবার নেমে আসুন।

পেশকার পরবর্তী আসামীর শুভনাম ঘোষণা করল। রত্নেশ্বর কিন্তু মঞ্চ থেকে নেমে এল না। পুনরুক্তি করল, এর মানে কী?

কোর্ট-ইন্সপেক্টর বুঝতে পেরেছে বিচারকের সূক্ষ্ম রসিকতাটুকু। সহাস্যে বললে, আপনাকে হুজুর ফাইন করেননি। আদালত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ঐখানে চুপটি করে বসে থাকতে হবে! আসুন, নেমে আসুন।

তবু স্থানত্যাগ করল না রত্নেশ্বর। জানতে চায়, কতক্ষণ? কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

—যতক্ষণ হুজুর আদালতে থাকবেন।

রত্নেশ্বর এবার বিচারকের দিকে তাকায়। আশ্চর্য! মরা পাবদামাছের চোখজোড়া যেন চিকচিক করছে এতক্ষণে। রতন বুঝতে পারে, লোকটা শয়তানি করছে! গম্ভীরভাবে বিচারকের কাছে জানতে চায়, সে-ক্ষেত্রে আমি আমার উকিলবাবুকে এই টেন্ডারখানা দিতে পারি?

ম্যাজিস্ট্রেট ভিজে-বেড়ালটি। সাড়া দেন না। কোর্ট-ইন্সপেক্টরই আইনের শাঙ্করভাষ্য দাখিল করে, না, পারেন না। আপনি, ইন ফ্যাক্ট, এখানে বন্দী। কয়েক-ঘন্টা বিনাশ্রম জেল খাটছেন। বুঝেছেন?

রত্নেশ্বর রুখে ওটে, কিন্তু বন্দী অবস্থায় আমি আমার লীগাল কাউন্সেলারের সঙ্গে কেন কথাবার্তা বলতে পারব না?

—কে বলেছে পারবেন না? ঐ বেঞ্চিতে বসে যত ইচ্ছে খোশগল্প করুন না আপনার উকিলবাবুর সঙ্গে। কিন্তু সেই সুবাদে বন্দী অবস্থায় আপনি কোনো সীলমোহর করা লেফাফা এই আদালত কক্ষের বাইরে পাঠাতে পারেন না। আমরা সীল ভেঙে দেখব খামের ভেতর কী আছে। সেটা আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত—বিশ্বাস না হয়, আপনার উকিলবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আর বুঝতেই পারছেন সীল ভেঙে ওটা পরীক্ষা করতে সময় লাগবে। আসুন স্যার, এবার নেমে আসুন। চুপটি করে গিয়ে বসুন ঐ কাঠের বেঞ্চিটায়।

রতন জানে না, সেদিন দুপুরে আদালত-সংলগ্ন ক্যান্টিনে চায়ের কাপে তুফান উঠেছিল। প্রবীণ উকিলবাবুরাও তাঁদের পাকাচুলে বা ফাঁকাচুলে ভরা মাথা নেড়ে স্বীকার করেছিলেন—স্মল কজ কোর্টে দেড় লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড একটা বিশ্বরেকর্ড!

* * *

কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে—আবার কেউ কেউ চোখে খোঁচা খেয়েও দেখে না, শেখে না। মিলিটারি জমানার ঐ ক'বছরের অভিজ্ঞতায় ওর ধারণা হয়েছিল যে, টাকায় সব কিছু হয়—'রেডি মানি ইজ আলাদীনস্ ল্যাম্প'! শুধু তাই না, অর্থই পরমার্থ! এ দুনিয়ার সব কিছু—হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ, মায় হার্দিক অনুভূতি পর্যন্ত মাপা যায় অর্থনৈতিক তুলাদণ্ডে। বাপ-মা সন্তানকে ভালবাসে। কেন? তারা আশা রাখে বুড়ো বয়সে সন্তান তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নেবে। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে—তারই রোজগারে যে ওর অশন-ব্যসন তথা ফুটানি-কি-বটুয়ার রবরবা! স্বামীও ভালবাসে স্ত্রীকে—সে ওর ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, ব্যয়-সঙ্কোচের এন্তাজাম করে!

তা হোক, তবু দেশ স্বাধীন হবার পর রতন নিজেকে কিছুটা সামাল দিয়েছিল। নৈতিক হেতুতে নয়, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বাধ্য হয়ে। ওর কলকাতাবাসী কাপ্তেন ইয়ারবন্ধুরা—যারা ওরই মতো যুদ্ধের ডামাডোলে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছে—তারা ক্রমশ দূরে সরে গেল। সপ্তাহান্তের এই 'মধুচক্রে' তারা আর ভেড়ে না। কেউ কারণ দেখালো—কাজের চাপ, কেউ বললে সপ্তাহান্তে ঘোড়দৌড়ের মাঠটা টানতে থাকে। রতনের প্রথমটা ধারণা হয়েছিল—ওরা ঘাবড়ে গেছে। পরে আবিষ্কার করে—না, তা নয়, ওদের এই অমৃতের-অরুচির অন্তরালে আছে সেই খর্বকায় বটুর বদমায়েশী! কে জানে, হয়তো পেছন থেকে ইন্ধন জুগিয়েছেন রতনের গর্ভধারিণী। মোটকথা জানা গেল, মুরারীদা কলকাতায় গিয়েছিল; জনে জনে জনান্তিকে সাবধান করে দিয়ে এসেছিল রাতারাতি, 'উলট-পুরানে'র জমানা এসে গিয়েছে—

'ও পাকে যিব তো ডান্ডা খিব!'

কাপ্তেনবাবুরা সহজেই বুঝলেন। মফস্বলের ছেলে তো—এখনো 'মড' হয়নি। 'ওল্ড ভ্যালুজ' আঁকড়ে পড়ে আছে। সোজা কথায়, পাড়ার ছেলেরা ওঁদের উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

সদ্যস্বাধীন দেশে কালো টাকার ফলাও ব্যবসাটা চালিয়ে যেতে সাহস পেল না। তখনো ব্যবসায় বাজারটা 'কালোয় কালো ময় করে হে এলে কালোর কালো' হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধ, মন্বন্তর আর দুর্ভিক্ষের কল্যাণে যাঁদের ব্যাঙ্কভল্টে মা-লক্ষ্মী বন্দিনী হয়েছেন তাঁরা উশ্‌খুশ করতে শুরু করেছেন। ব্যাঙ্কভল্টও যেন যথেষ্ট নিরাপদ নয়—না, চোর-ডাকাত-আগুন নয়: দুর্নীতি দমন বিভাগ: ভিজিলেন্স! কেউ স্টেনলেস-স্টিলের আধারে মাটির নিচে মা-লক্ষ্মীকে টাইম-ক্যাপসুলে দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে বন্দিনী করতে উন্মুখ; কেউ বিশ্বস্ত রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে বাথরুমে ফল্‌স্‌ সিলিঙ বানানোতে ব্যস্ত। অর্থাৎ কৃষ্ণমুদ্রার বিনিয়োগের প্রশ্নটা চাপা পড়েছে সাময়িকভাবে, সেটাকে সংরক্ষণ করাই এখন প্রধান সমস্যা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যে তখনো ঠিকমতো বাজিয়ে নেওয়া যাচ্ছিল না। অনেকেই জেল খেটেছেন, নির্যাতন সয়েছেন, সাগরেদি করে এসেছেন এতদিন সেইসব অবিস্মরণীয় শহীদদের—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।'

তাঁদের গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পরনে খাদির ধুতি, পায়ে চপ্পল, চলা-ফেরা করেন ট্রামে-বাসে। আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটা তুলে ধরে তাঁদের মুখে কী জাতের আলোক-বিচ্ছুরণ হয় তা পরীক্ষা করে দেখার হিম্মৎ ছিল না ধনকুবের ব্যবসায়ীদের। 'বেওসায়' যাঁদের পাকামাথা—দু-কুড়ি-সাতের খেলায় পোক্ত, তাঁরাও রতনকে পরামর্শ দিলেন: দু-পাঁচ বরিস সমালকে রহেন দত্তা-সা'ব। নয়া-দেওতাদের ধ্যানমে রাখেন, দহরম-মহরম মচান, ঔর পার্টি-ফান্ডমে রোপেয়া লাগান, আখেরে ডিভিডেন্ড দিবে!

প্রথমে সে-পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। পরে ঠিকাদারী ব্যবসাটা গুটিয়ে নিল। উপায় নেই। কাউকে বিশ্বাস হয় না!

পি. ডাবলু. ডি., এম. ই. এস., সি. পি. ডাবলু ডি., রেলওয়ে—সর্বত্রই যেন এক ঝাঁক যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা এসে জাঁকিয়ে বসেছে। সদ্য-স্বাধীন দেশের সদ্য-পাস সব এঞ্জিনিয়ার। পূর্বযুগের ঘাগি অফিসারেরাও সামলেসুমলে চলছেন। এ জাতীয় পরিবেশে ঠিকাদারী করা যায় না—অন্তত রত্নেশ্বর দত্তের অভ্যস্ত পথে। অগত্যা কন্ট্রাক্টরি ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলল! ছাপাখানাটা ছিলই। সেটাকে সম্প্রসারিত করল, নতুন কেতায় সাজালো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই হাড়-জ্বালানো মানুষটাকে তোয়াজ করতে হল।

কালো টাকা সে যে কোথায় সরিয়ে ফেলল সে-কথা জানত সে একাই। এমনকি সুছন্দা এ সংসারে আসার পরেও তার হদিস পায়নি। পাবে কোথা থেকে? ততদিনে 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাস হয়ে গেছে যে! আজ যে তোমার গৃহলক্ষ্মী—একগলা ঘোমটা টেনে তোমার সন্তানকে স্তন্যদান করছে, তোমার জামায় বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে, নিষুতি রাত পর্যন্ত তোমার ভাত আগলে ঢুলছে, কাল সেই মেয়েটিই হঠাৎ খর্পরধারিণীতে রূপান্তরিতা হয়ে যেতে পারে। আদালতের মাধ্যমে তোমার নামে সমন ধরাতে পারে। তখন জোড়া-পাঁঠায় মা চামুণ্ডার মন না উঠলে মহিষীবলি-'অ্যালিমনি'র ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যথায় শেষ রাতে রেইড হবে তোমার ভদ্রাসন। তোমার বেডরুম-সংলগ্ন বাথরুমের ফল্‌স সিলিঙ উপড়ে ফেলবে চামুণ্ডার চেলা-চামুণ্ডা!

তাই সুছন্দাকে কিছু জানায়নি। সে অবশ্য কৌতূহলও দেখায়নি। জানতে চায়নি, কোথায় সুরক্ষিত আছে গুপ্তধনটা। সে শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছিল, কালীতারা প্রেসের উপার্জন থেকে এ সংসারে চাহিদা মেটেনা। ওর স্বামীর উপার্জনের রাজপথ : 'ভেনাস ট্র্যাভলস।'

কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইয়ে তার শাখা-অফিস। প্রাইভেট লিমিটেড ট্র্যাভল এজেন্সি। রত্নেশ্বর দত্ত তার শেয়ারের বৃকোদরভাগ দখল করেছে। কিন্তু রতন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নয়, সে কাজ চালায় ওর নির্বাচিত প্রতিনিধি। সে হিসাবে রত্নেশ্বর সিনিয়ার স্লিপিং পার্টনার। জুনিয়ার পার্টনারের নামটা জানতে জানতেই সুছন্দার কোলে এসেছে ঋদ্ধি!

পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে বিদেশযাত্রার আয়োজন ছিল একটা লাভের ব্যবসা। কৃতী ছাত্ররা দলে দলে চলেছে ইউরোপ, 'ম্যারিকা—টুপিতে সাতরঙা পালক গোঁজার বাসনা নিয়ে। শুধু কৃতী ছাত্রই নয়, নিতান্ত গোলা-মার্কার দলও চলেছে দলে দলে—ঐ যাদের মুরুব্বির জোর আছে। অর্থাৎ যাদের মামা-মেসোরা এককালে খদ্দর পরতেন, জেল খাটতেন, বছরকয়েক আগেও যাঁদের ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে দেখা যেত। এ ছাড়াও আছে প্রমোদভ্রমণের হিড়িক—ঐ যাঁরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দৌলতে। হোক বিলেত দেশটা মাটির, তবু সেদেশের সিনেমা-স্ক্রীন সাদা-কালোর নয়—না, মাল্‌টি-কালার বলেও নয়, তার রঙ 'নীল'!

যা এই 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'-এ দুর্লভ!

* * *

রতন সব কিছুই পেয়েছে জীবনে। অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মান, সুন্দরী, শিক্ষিতা সহধর্মিনী, সাজানো সংসার। ইচ্ছে করলে ইলেকশনে দাঁড়াতে পারত—বিধানসভা আলো অথবা কালো করে বসতে পারত—কিন্তু সে বাসনা তার কোনো দিনই হয়নি। দু-তরফ থেকেই নমিনেশনের অফার এসেছিল। প্রত্যাখ্যান করে। ওসব ঝামেলা তার পোষাবে না। মদটা ত্যাগ করেনি—কিন্তু সেটা পরিমিতি-বোধে সীমিত। পূর্ব-জমানার ইয়ারবন্ধুরা দূরে সরে গেল—নতুন জমানার মানুষজনের সঙ্গে তার দোস্তি হল না। নিমে দত্তের সেই দার্শনিক উক্তিটি ওর জীবনে সার্থক হয়নি—'এক ব্যাটা বড়মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।'

রতন মদ্যপান করত। একাই। রুদ্ধদ্বার কক্ষে। নিত্য রাত্রে। আড়াই পেগ মাপা স্কচ। সুছন্দার চোখের সামনে, তারই ব্যবস্থাপনায়।

সবদিক থেকেই পরিপূর্ণতা

তবু কোথায় যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

সুছন্দা বদলে গিয়েছে। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই!

সে যেন আর সেই আগের মতোটি নেই।

'এক্‌সেপ্‌শন প্রুভস্‌ দ্য রুল'—প্রবাদবাক্যটা প্রমাণিত করতেই যেন মেনে নিতে হলো আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের নাগালের বাইরেও কিছু থাকতে পারে!

হ্যাঁ, আছে : 'মেয়ে-মন'!

সব কিছুরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। অবশ্য সুছন্দার পরিবর্তনের হেতুটা অবোধ্য নয়—সেটা বোঝা যায়। যেদিন থেকে সুছন্দা হারিয়েছে স্বামীর ওপর অসপত্ন অধিকার সেদিন থেকেই সে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু ঋদ্ধিটা?

সে কেন বাপের ইচ্ছানুসারে গড়ে উঠল না! একটি মাত্র সন্তান—কিন্তু সেও যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। প্রথম থেকেই নয় কিন্তু।

একেবারে শৈশবে—যা হবার নয় তাই হয়েছিল—মায়ের চেয়ে বাপের প্রতিই ছিল তার টান। রতন যতক্ষণ অন্দরমহলে, ছেলেটা তার লগে লগে! বোল ফুটতে শুরু করল 'বা' বলে, 'মা' নয়!

আশ্চর্য! একটু বড় হতেই দেখা গেল মায়ের বিরুদ্ধে তার হাজারো অভিযোগ: বাপি, দেখ মা আমাকে বকেছে! বাপি, মা আমাকে আইসক্রীম খেতে দিচ্ছে না! মা দুষ্টু! তুমি মাকে বকে দাও!

সুছন্দা বলত: ছেলে তোমার বাপ্-চিমটি! রতন দিবারাত্র মেতে থাকত ছেলেকে নিয়ে। নানান ছবির বই কিনে আনত। বাপ-বেটায় বসে বসে পাতা উলটাতো। সেভেন ডোয়ার্ফস্, লিটল্ মার্মেড! বাপের বিছানায় গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। দক্ষিণের বারান্দায় বাপ করে আন্ডারহ্যান্ড বল, আর বেটা হুক করে পাতৌদি-স্টাইলে! কতবার ঝন্ঝন্ করে ভেঙে পড়েছে কাচের সার্সি! ছুটে এসেছে সুছন্দা অথবা তার শাশুড়ী। রতন ঠারে ঠারে হাসত। পাগলাটার কাণ্ড দেখে। ব্যাট ফেলে দিয়ে পাতৌদি তখন টুমটুম হয়ে বসে পড়েছে ব্রীজে—আধ-ইঞ্চি পরিমাণ লাল-টুকটুকে জিবের ডগাটুকু বেরিয়ে আছে শুধু!

কিন্তু এ সুখ সইল না ওর কপালে।

কেন? কেন? কেন?

ঐটুকু ছেলে—ও তো বোঝে না কিচ্ছু। এ তো জানে না—কেন ওর একটা ছোট ভাই বা বোন এসে হাজির হয়নি এত দিনেও, এই সংসারে!

কিন্তু কী-জানি কী বুঝে সে তিল-তিল করে সরে গেল বাপের ছত্রছায়া থেকে মায়ের পক্ষপুটে। যেন জার্সি বদলালো! আট-দশ বছর বয়স হবার পর সে আর বাপের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথাই বলত না। আর কটা কথাই বা সে বলে সারাদিনে? নিজে থেকে একটাও নয়। প্রশ্ন করলে জবাব দেয়—তাও মাটির দিকে তাকিয়ে।

অথচ লক্ষ্য করে দেখেছে—ঋদ্ধি স্বভাবগম্ভীর নয় আদপে। মায়ের সঙ্গে, দিদার সঙ্গে, বামুনদি, ইন্দ্র পাঁড়ে, এমনকি মুরারীদাদুর সঙ্গে তার ক্রমাগত বকবকানি। শুধু বাপকে দেখলেই কেমন যেন সিঁটিয়ে যায়।

কেন? সে তো জানে না মীনার ব্যাপারটা। জানতে পেরেছিল ঋদ্ধির মা। 'ভেনাস ট্রাভেল্স'-এর ভেনাসের গোপন কথাটা।

মীনা পারেখ।

মড মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল—সন্তানাদি হয়নি। স্বামীত্যক্তা! না ভুল হল, মীনাই স্বামীকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা অবশ্য নিতান্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। শশী পারেখ ছিল রত্নেশ্বর দত্তের সিনিয়ার পার্টনার—যুদ্ধের আমলে, যখন ওরা ঠিকাদারি করত। মীনা ছিল যুদ্ধের ক-বছর শশীর পোষাকী ও পোশাকী স্ত্রী—অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট আদায়ের টোপ। রতনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—শশীর জ্ঞাতসারে। তাতে দোষ ধরেনি শশী। সে জানত যুদ্ধান্তে তারা পৃথক হয়ে যাবে—বস্তুত মীনা ওর বৈধ স্ত্রী ছিল না। তাই হল। যুদ্ধশেষে সব কিছু বেচে দিয়ে শশী পারেখ চলে গেল জুরিখে। সেখানে সে বিয়ে করেছে, সংসার করছে। মীনা তার লভ্যাংশটা বুঝে নিয়ে সদ্যস্বাধীন ভারতে খুলে বসল একটা ট্র্যাভল এজেন্সি।

রতন হল তার স্লিপিং পার্টনার।

উভয়ার্থেই!

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন ছিল।

মায় মুরারী রায় পর্যন্ত টের পায়নি। রতন যে 'ভেনাস ট্র্যাভল্স'-এর অন্যতম কর্ণধার এটুকু জানত তার নামে মোটা-মোটা শেয়ার ডিভিডেন্ড আসত বলে। মাঝে-মাঝে রতনকে হিল্লি-দিল্লিও দৌড়াতে হতো—কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের মীনা পারেখকে মুরারীদা চিনত না।

সুছন্দাও তার কথা জানতে পারেনি প্রথম বছরপাঁচেক।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়—মানে, শুধুমাত্র সুছন্দার কাছে। আর সেদিন থেকেই মুরারীদার 'মা-জননী' আমূল বদলে গেল। রাগারাগি, চেঁচামেচি আদৌ করেনি—এমনকি শান্ত প্রতিবাদও নয়। এককথায় যেন মেনে নিল—তার হার হয়েছে। সংসারের চাকায় যথানিয়মে তারপরেও মবিল জুগিয়ে গেছে। স্বামীর জামায় বোতাম লাগিয়ে দিয়েছে, শাশুড়ির পূজার যোগান

দিয়েছে এবং ছেলের হোমটাস্ক। নতুন পর্দা কিনে এনে ঘর সাজাতো, ফুলদানিতে ফুল সাজাতো, এমনকি সন্ধ্যাবেলায় বামুনদিকে দিয়ে যথারীতি ভেটকির ফ্রাই বানিয়ে মদের চাট যোগান দিত।

পরিবর্তন যেটুকু তা অন্দরমহলে নয়, অন্তরমহলে। বাহ্য পরিবর্তন নিতান্ত সামান্য—সুছন্দা ছেলেকে নিয়ে পাশের ঘরে শুতে শুরু করল।

রতন জানতে চায়নি তার কারণটা কী? তার সাহস হয়নি।

ঋদ্ধি তখনো নিতান্ত শিশু। এই সামান্য পরিবর্তনটুকু তার খেয়াল হবার কথা নয়। তবু.....ক্রমে সে আরও বড় হল। তখনও সে কিছু বুঝত কি না কে জানে, একদিন নিজে থেকেই বলল, মা, আমি কাল থেকে পশ্চিমের ঐ ঘরখানায় শোব। রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয় আমাকে। চোখে আলো লাগলে তোমার ঘুম হবে না।

সুছন্দা প্রথমটা রাজি হয়নি। পরে তাকে মেনে নিতে হল। কারণ রাত জেগে পড়ার জন্য ওর একটি বন্ধুও আসতে শুরু করল: যতীন সোম। ওদের ক্লাসের সেরা ছেলে—তার পৃথক পড়ার ঘর নেই। গরিবের ছেলে, রাত জেগে পড়লে বাবার অসুবিধা হয়—তিনি ইন্‌সমনিয়ার রুগী। যতীন সন্ধ্যারাত্রেই চলে আসত এ-বাড়ি। রাতে এখানেই খেত আর গভীর রাত পর্যন্ত দু'বন্ধুতে পড়াশুনা করত। সে বছর ওরা হায়ার সেকেন্ডারি দেবে।

কতদিন মাঝরাতে সুছন্দা এসে দেখেছে ওরা দুই বন্ধু পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের ওপর জ্বলছে ইলেকট্রিক বাতিটা। সুছন্দা আলো নিবিয়ে, বই-খাতা গুছিয়ে দিয়ে নীরবে ফিরে গেছে তার ঘরে। একক শয্যায়।

পাশের ঘরখানা রতনের। মাঝে পার্টিশনের দেওয়ালে দরজা। ইদানিং সেটা এপাশ থেকে বন্ধ থাকে। রতন সে দরজায় আজকাল আর টোকা দেয় না।

অনেক—অনেকদিন আগে একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সুছন্দার। তখনো ঋদ্ধি শিশু মাত্র। বলেছিল, এ কী শুরু করেছ সুছন্দা? এভাবে তো তোমার-আমার দীর্ঘ বাকি জীবন কাটবে না?

—কেন? কাটবে না কেন? দু-মাস তো দিব্যি কেটে গেল। আমার তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না।

—আমার হচ্ছে।

—হওয়ার কথা নয়। শারীরিক প্রয়োজন থাকে তাহলে দু-চারদিন কলকাতা ঘুরে আসতে পার।

দাঁতে দাঁত চেপে রতন বলেছিল, তুমি মীনাকে সহ্য করতে পার না, তাকে ঈর্ষা কর! তাই নয়?

—না। তাকে ঈর্ষা করতে যাব কোন দুঃখে?

—তাহলে তাকে মেনে নিতে পারছ না কেন?

—মেনে তো নিয়েছি। বাধা তো দিইনি, আপত্তি তো করিনি। যাও ক'দিন কলকাতা ঘুরে এস বরং।

রতন সে রাত্রে আড়াই পেগ-এ ক্ষান্ত হতে পারেনি, বেশ কিছুটা নেশাগ্রস্ত হয়েই এ ঘরে এসেছিল। তাই বেমক্কা মুখ ফস্‌কে বলে ফেলেছিলেন—মীনা এখন কলকাতায় নেই!

—ও, তাই বুঝি! তা কলকাতায় টাকার বিনিময়ে নারীদেহ তুমি সহজেই যোগাড় করতে পারবে। টাকায় কী না হয়? যাও এখন, আমার ঘুম পাচ্ছে! আমাকে নিষ্কৃতি দাও!

রতন এগিয়ে এসে ওর বাহুমূল চেপে ধরেছিল। বলেছিল, তুমি.....তুমি ভেবেছ কী?

সুছন্দা প্রতিবাদ করেনি। বলেছিল, আগে তো তুমি এমন কৃপণ ছিলে না? বিনা-পয়সায় বলাৎকার করতে চাও? চল তাহলে—ও ঘরে চল!

—বলাৎকার!—রতনের মুঠি আলগা হয়ে গেছিল।

সুছন্দা বলে, আভিধানিক অর্থটা তো তাই বলে—'ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীদেহ সম্ভোগ!'

রতন মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে যায়। অথচ এই সুছন্দাকে সে নিজে দেখে, পছন্দ করে বিয়ে করে। ভালবেসেই।

* * *

যজ্ঞেশ্বর মারা যাবার বছর দুই পরের কথা। রতনের মা সে-আমলে হপ্তায় দু-তিনখানা চিঠি পান—চেনা-অচেনা মহল থেকে। তাঁর উপার্জনক্ষম উপযুক্ত পুত্রকে পাত্র হিসেবে প্রার্থনা করে। মাঝে

মাঝেই তিনি আসতেন চিঠি নিয়ে, ফটো নিয়ে: কোনদিন আছি, কোনদিন নেই, তোকে সংসারী দেখে যেতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

রতন বলত, কে বলছে তোমাকে মরতে? আরও বিশ-পঁচিশ বছর বাঁচবে তুমি!

—কিন্তু বিশ-পঁচিশ বছর পর, তুই যে পঞ্চাশ পেরিয়ে যাবি খোকা!

—ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তো বলিনি যে, বিয়ে করব না। তবে এখন নয়.....

তারপর একদিন।

মা এসে হাজির হলেন অন্য এক জাতের আবদার নিয়ে: আমি কালীঘাটে পুজো দিতে যাব, তুই নিয়ে যাবি খোকা?

রতন অবাক হয়। বলে, কেন? মুরারীকাকা গেলে হয় না?

—না, হয় না। তা যদি হতো তাহলে মুরারী ঠাকুরপোকেই ডেকে পাঠাতুম।

—তাই বল! তোমার আসল মতলবটা কী?

—নিবারণ ঘোষকে মনে আছে তোর? ডাক্তার নিবারণ ঘোষ? বোম্বাইয়ের?

তা আছে। চেহারাটা মনে নেই, তবে নামটা অপরিচিত নয়।

ডাক্তার ঘোষ ছিলেন যজ্ঞেশ্বরের সহপাঠী। বাবার শ্রাদ্ধে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছিল, তাঁর চিঠিও পেয়েছিল।

বললে, কেন বলতো?

—ঘোষমশাই গত হয়েছেন বছরখানেক আগে। তাঁর স্ত্রীকে মনে নেই? তোর পারুলমাসি? ওরা এখন কালীঘাটের সাবেক বাড়িতে থাকে। তার ওখানেই উঠব, একটি বেলা থাকব; পুজো দেব, ফিরে আসব। এই ব্যাপার! বুঝলি?

—আদৌ নয়। সেক্ষেত্রে মুরারীকাকার সঙ্গে তোমার কলকাতা যাওয়ার অসুবিধাটা কোথায়?

যেন টোয়েন্টি নাইন খেলছেন। এবার 'রঙ'টা দেখাতে হল। তুরুপের তাসটা। স্বীকার করলেন, রতনের ঐ পারুলমাসির একটা অনূঢ়া কন্যারত্ন বর্তমান। ডাকসাইটে সুন্দরী। বি. এ. পাস। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। পারুলমাসি তার সঙ্গে রতনের সম্বন্ধ এনেছেন। অর্থাৎ শুধু রথ-দেখা নয়, কলাবেচাও এই তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য। ভদ্রঘরের মেয়েকে তো বারে বারে দেখা যায় না—একবার মা, একবার ছাঁ; রতন যদি রাজি হয় তাহলে এক ঢিলে দুটি পাখি মারা যায়।

রতন স্বীকৃত হয়নি। বলে, কেন এসব উটকো ঝামেলা করছ মা? কালীঘাটে পুজো দিতে চাও তো যাও। ঐ ফাঁকে পারুলমাসিকে বলে এস, ছেলে এখন বিয়ে করতে চায় না!

—ছন্দার কথা তোর একদম মনে নেই, না রে? তুই তো তাকে দেখেছিস? ওরা যেবার এখানে আসে—দিনসাতেক ছিল এ-বাড়িতে। তুই তখন খুব ছোট।

এতক্ষণে মনে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। রতনের বয়স তখন বছর আট-দশ। বোম্বাই থেকে বাবার এক বন্ধু এসেছিলেন বটে। সস্ত্রীক। আর সঙ্গে ছিল একটা হাড়-ডিগ্‌ডিগে বিচ্ছু মেয়ে। কত বয়স? বছর চার-পাঁচ। রোগা, মাথায় লাল রিবনের বো বাঁধা। দারুণ ফর্সা মেয়েটা। আর কথা বলত মুখ বেঁকিয়ে। বোম্বাইয়ের সবকিছুই ভাল—বোম্বাই আম, বোম্বাই ভেলপুরী, বোম্বাইয়ের জুহু বীচ, তারাপোড়েওয়ালা অ্যাকোয়ারিয়াম! আছে তোমাদের এখানে? ফুঃ!

বিশেষ করে মনে পড়ল—দলবেঁধে বারোদোলের মেলায় বেড়াতে যাবার কথা। এ শহরে বছরে একবার বারোদোলের মেলা হয়। রাজবাড়িতে। বিরাট মেলা—হাজারো দোকানের রোশনাই। তার সঙ্গে সার্কাসের তাঁবু, ভানুমতীর খেল, এক-মানুষের-দুটো-মাথা, মাকড়শা-মানুষ! রতনদের বয়সী ছেলে-মেয়েরা সারা-বছর মুখিয়ে থাকত বারোদোলের মেলার প্রত্যাশায়। ঐ ঠেকারী মেয়েটা তা দেখেও বিন্দুমাত্র মোহিত হয়নি। এর চেয়ে ভাল ভাল দোকান, ভাল ভাল বাহাদুর-কা-খেল বোম্বাইয়ের নাকি পথেঘাটে। চালবাজ মেয়েটাকে শায়েস্তা করা যায়নি।

বিশেষ করে মনে পড়ে গেল তার 'দুয়োর ধুয়ো'। মেলাতে একজন ব্যাপারি বসেছিল এয়ার-গান নিয়ে। এক আনায় দশটা ছর্‌রা— টিপ থাকলে দশ-দশটা বেলুন ফাটিয়ে দিতে পার। পাঁচটার বেশি

ফাটাতে পারলেই প্রাইজ! রতনের মনে আছে, সে একানি দিয়ে দশটা ছর্‌রা কিনেছিল। আর ঐ রিবন- বাঁধা ঠেকারী মেয়েটা তার পাঁজর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে গুন্‌তি করে গিয়েছিল—যতবার সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একটা করে মিস্‌ করে আর পুঁচকেটা কর গুণে গুণে বলে: একে-রাম : দুয়ো! দুইয়ে পক্ষ : দুয়ো! তিনে নেত্র : দুয়ো!

যেবার সে লক্ষ্যভেদ করছিল—আশ্চর্য—সেবার দেখা গেল ঐ পুঁচকে মেয়েটার দৃষ্টি অন্যদিকে, অথবা সে গা চুলকাতে ব্যস্ত।

আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠেছিল রতনের। পাশে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে ক্রমাগত টিকটিক করে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে? অথবা হাতের টিপ্‌?

রাগের মাথায় কী-যেন একটা দুষ্কর্ম করে বসেছিল সে। প্রতিশোধটা কী জাতের—গাঁট্টা না চিমটি, তা আজ আর মনে নেই; কিন্তু সেজন্য বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়েছিল এটুকু ভুলতে পারেনি।

রতন রাজি হয়ে গেল মাকে কালীঘাট দর্শন করিয়ে আনতে।

দুয়োর-ধুয়োর শোধ তুলবে এতদিনে!

একে মাথায় খাটো : দুয়ো! দুইয়ে রঙটা ঠিক দুধে-আলতা নয় : দুয়ো! তিনে স্মার্টনেসের অভাব : দুয়ো!...

ট্যাক্সি থেকে কালীঘাট টেম্পল রোডের দ্বিতল বাড়ির সামনে যখন নামল বেলা তখন সাড়ে দশটা। মা সকাল থেকে জলস্পর্শ করেননি। পুজো দিয়ে প্রসাদ খাবেন। পারুলমাসি ওদের আদর করে বসালেন। রতনের জন্য স্রেফ এক পেয়ালা চা এল, মায়ের জন্য তাও নয়। পারুল মাসি কান্নাকাটির পর্ব শেষ করে —বৈধব্যের পরে এই ওঁদের প্রথম সাক্ষাৎ—তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিলেন। দুই বান্ধবী এবার মায়ের থানে যাবেন। পুজো দিয়ে ফিরে এলে জলখাবারের পালা। মা শুধায়, তুইও যাবি তো খোকা? রতন দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে, ওসব ভিড়-ভাড়াক্কা আমার সয় না। তোমরা ঘুরে এস। আমি এখানেই বই-টই পড়ি।

ওঁরা দুজন রওনা হয়ে গেলেন। কাছেই মন্দির।

বাড়িতে যে দ্বিতীয় প্রাণী আছে এটা বোঝা যায়, অন্দরমহল থেকে ঠুনঠান শব্দ শোনা যাচ্ছে। রতন আশা করেছিল, এই সুযোগে সেই মেয়েটি একবার আলাপ করতে আসবে। এল না।

রতন খানকতক ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে বাইরের ঘরে বসেই পাতা ওল্টাতে থাকে।

ওঁরা পুজো দিয়ে ফিরে এলেন।

জলখাবারের পর্ব মিটতে বেলা বারোটা। মধ্যাহ্নভোজনের যথেষ্ট দেরি। রতন বললে, কাছেই অমৃত ব্যানার্জী রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ি। যাই, এক চক্কর ঘুরে আসি।

মা বললে, তা যা, তবে বেশি দেরি করিস না।

তারপর ঘনিয়ে এসে অস্ফুটে বললে, ছন্দা স্কুলে গেছে। সাড়ে তিনটেয় ওর ছুটি হয়, চারটের মধ্যেই এসে যাবে।

ন্যাকামি! নাকি দর বাড়ানো হচ্ছে? অর্থাৎ—ওহে লক্ষপতি রাজপুত্র! তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। রাজবাড়ির সিংদরোজা দিয়ে বধূবেশে প্রবেশ করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমি একপায়ে খাড়া নই! কিন্তু এর আরও দুটো দিক আছে। প্রথম কথা : আজ তোর বাড়িতে দুজন অতিথি আসবে—মাকে একটু সাহায্য করতেও তো একদিন ক্যাজুয়াল-লীভ নিতে পারতিস? দ্বিতীয়ত, সারাদিন দিদিমণিগিরি করে হাপসানো শরীরটা নিয়ে যখন ফিরে আসবি তখন তোর রূপ খুলবে?

দ্বিপ্রহরে আহারাদি মন্দ হল না। রাজকীয় মধ্যাহ্ন আহারও নয়, আবার সাবডা মাছভাতও নয়—মাঝামাঝি। তবে খাওয়া-দাওয়া মিটতে বেলা দুটো বেজে গেল। পারুলমাসি একা হাতেই সব কিছু করলেন। একজন বয়স্কা মহিলা—পরিচারিকা অথবা বামুনদি—সাহায্য করলেন তাঁকে।

বাইরের ঘরে একটা জনকে-খাট। তার ওপর ধবধবে চাদর পাতা। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে আর ফ্যানটা খুলে দিয়ে সেই বয়স্কা মহিলাটি বিদায় নিলেন। পাতা বিছানা দেখে রতন আর ডানে-বাঁয়ে তাকায়নি। পাঞ্জাবিটা খুলে লম্বা হল।

অবেলায় খেয়েছে, অবেলায় ঘুমিয়েছে। ঘুমটা ভেঙে গেল কড়া-নাড়ার শব্দে। জেগে উঠে ওর মনে পড়েনি—ও এ কোথায়! মনে হল, কড়া-নাড়ার শব্দটা সে আধোঘুমে বেশ অনেকক্ষণ ধরেই শুনছে! তাড়াতাড়ি উঠে এসে খুলে দিল সদর দরজাটা।

অন্ধকার ঘর। দরজাটা পশ্চিম দেওয়ালে। পাল্লা দুটো খুলে দিতেই এক ঝলক পড়ন্ত রোদ এসে পড়ল ওর চোখে। চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। তবু নজর হল—খোলা দরজার ফ্রেমে কে যেন একটা নারীমূর্তির ফুলসাইজ পোর্ট্রেট এঁকেছে।

পরনে সালোয়ার-কামিজ, কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা-ব্যাগ। হাতে গোটানো ছাতা। বছর চব্বিশ-পঁচিশ। আলোর উৎসটা ওর পেছনে। তাই মুখচোখ ভালো ঠাওর হল না! মনে হল, একটি ব্যালে-ডান্সারের স্যিলুয়ে! কিন্তু চিন্তাটা স্থায়ী হল না। কারণ সেই মুহূর্তেই কানে গেল যেন একটা তার-সানাইয়ের ঝংকার : বাব্বা! কী কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিলেন রতনদা! আমি আট-দশবার কড়া নেড়েছি।

রতন নীরবে দু-হাতে চোখ কচলায়।

—নিন, সরুন। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিন।

রতন সসঙ্কোচে সরে দাঁড়ায়।

আশ্চর্য! মেয়েটার ব্যবহার দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, সে বিশ বছর পরে তার এই পাতানো দাদাটিকে দেখছে। যেন, সকালে সে যখন চাকরি করতে যায় তখন ঐ পাতানো দাদাটিই সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল!

রতন মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল—তিন নম্বরী দুয়োটা তার নাগালের বাইরে—আর যাই হোক, স্মার্টনেসের অভাবের অভিযোগটা ধোপে টিকবে না।

—আবার গিয়ে শোবেন না যেন। মুখে-চোখে জল দিন। আমি চা করে আনি। মাসিমা কোথায়? ওপরে?

সে তথ্যটা জানা ছিল না রতনের। বোধকরি উত্তরের আশা করে প্রশ্নটা করেনি মেয়েটা। উত্তরের অপেক্ষাও করল না। হাইহিল-জুতোয় খুটখুট আওয়াজ তুলে ভেতরে চলে গেল। হাইহিলের প্রয়োজন ছিল না যদিও। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সুছন্দা রীতিমতো দীর্ঘাঙ্গী।

আধঘন্টা-খানেক পরে আবার ফিরে এল। তার হাতে চায়ের ট্রে। লীকার, দুটি শূন্যগর্ভ পেয়ালা-পিরিচ আর দুধ-চিনির পাত্র। প্লেটে বিস্কিট।

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বললে, জানলাগুলো ইতিমধ্যে খুলে দেননি কেন?

যেন পরের বাড়ির জানলা খোলার দায় রতনের। ছন্দা একে-একে জানলাগুলো খুলে দেয়। পড়ন্ত আলোয় ঘরটা মোহময় হয়ে ওঠে। বোধকরি মেঘে আড়াল ছিল সূর্যটা—আচমকা সিঁদুরে-লাল আলোয় ঘরের রঙটাই পালটে যায়।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করে, বিকালের এই বিশেষ সিঁদুরে-লাল আলোর কী যেন একটা ভারি মিষ্টি নাম আছে না? সেটা কী বলতে পারেন রতনদা?

রতন স্বীকার করল অক্ষমতা। বললে, জানি না। কী?

সুছন্দা যেন একটু রাঙিয়ে উঠল। সামলে নিয়ে বললে, আমার মনে পড়ছে না বলেই তো জিজ্ঞাসা করলাম। থাক ও-কথা। প্রথমেই অপরাধটা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিই। আপনারা আজ আসবেন জানতাম; কিন্তু আজ আমাকে একটা উইকলি টেস্ট নিতে হল। তাই ছুটি নিতে পারিনি। অবশ্য জানা ছিল, বিকেলে দেখা হবেই।

রতন কথা ঘোরাতে বললে, আমাকে দেখেই কেমন করে চিনলে? আমার চেহারাটা মনে ছিল?

—থাকা-না-থাকা সমান। বিশ বছর পরে—বিশেষ বয়ঃসন্ধি-অতিক্রমণের জমানায় সেই সূত্র থেকে আপনাকে চিনে ফেলা সম্ভবপর নয়। চিনলাম—সার্কামস্ট্যান্‌শিয়াল এভিডেন্স থেকে।

রতন লক্ষ্য করে দেখে আধঘন্টার ভেতর সুছন্দা শুধু চা-ই বানায়নি, ইতিমধ্যে স্নানটাও সেরে এসেছে। এখন ওর পরনে একটা সাদামাটা তাঁতের শাড়ি। লাল ছোপ-ছোপ 'হাজারবুটি'। গায়ে ঐ কাপড়েরই জ্যাকেট। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই—স্নানান্তে ঘাড়ে-গলায় পাউডার দেওয়াটাকে বাদ

দিলে। কপালে একটা বিন্দি টিপ—যেন ঐ হাজারবুটির একটাই দলছুট হয়ে ওর কপালে উঠে এসেছে। কানে দুল নেই, গলায় হার। এক হাতে বালা, অপর হাতে রিস্টওয়াচ। কিন্তু সাজ-পোশাক নয়, রতন মোহিত হয়ে গেল ওর প্রাণোচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধতায়। কোনো কোনো সুন্দরী মেয়ের রূপের অ্যানালিটিক্যাল বিচার করা চলে না—তার চোখ-চুল-নাক-ঠোঁট আলাদা করে নজরেই পড়ে না। ভুঁইচাপার গন্ধমেশানো একঝলক ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো তা বর্ণনার রাজ্য পেরিয়ে অনুভবের এলাকায়। সুছন্দার সৌন্দর্য যেন সেই জাতের।

রতন প্রশ্ন করে, সেই বারোদোলের মেলায় ঘটনাটা তোমার মনে আছে সুছন্দা?

মিষ্টি হাসল মেয়েটি। গালে টোল পড়ল এবার। বললে, অল্প-অল্প। আপনি বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটাতে না পেরে শেষমেশ পিন দিয়ে আমার বেলুনটা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন বোধহয়। তাই না?

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সব কথা!

না, গাঁট্টা নয়, চিমটিও নয়। রতন রাগ সামলাতে না পেরে ঐ মেয়েটির হাতে-ধরা বেলুনের দড়িটা ছিঁড়ে দিয়েছিল। গ্যাসভরা বেলুন—তৎক্ষণাৎ তা উঠে গেল আকাশপানে। 'ভ্যাঁ'-করে কেঁদে ফেলেছিল মেয়েটা। আর তৎক্ষণাৎ যজ্ঞেশ্বরের কড়া হাতের থাপ্পড় খেয়েছিল রতন! শুধু তাই নয়, আরও মনে আছে—বাবার হাতে থাপ্পড় খেয়ে সে যখন দাঁতে-দাঁত দিয়ে চোখের জল ঠেকাচ্ছে তখন ঐ একফোঁটা মেয়েটাই তাঁর হাত চেপে ধরে বলেছিল, ওকে মের না কাকু! আমি ওকে 'এস্‌কিউজ' করে দিয়েছি।

বম্বের নার্সারী স্কুলের একরত্তি মেয়েটা সেই বয়সেই 'এস্‌কিউজ' করতে শিখে গিয়েছিল—বোধকরি ফাদারদের কল্যাণে!

রতন জানতে চায়, মা-মাসিমা কোথায়?

—ওপরে। মায়ের শোবার ঘরে। সুখ-দুঃখের গল্প করছেন। বিশ বছরের জমানো গল্পের পাহাড় তো, সহজে শেষ হবে না।

রতন বললে, বোধহয় কথাটা তোমার ঠিক হল না সুছন্দা। সেটা অছিলা। ওঁরা তোমার-আমার কথা বলার একটা সুযোগ দিতেই আড়ালে রয়েছেন।

—সেটাও সম্ভব।

—তার মানে তুমি জান, মা শুধু কালীঘাটে পুজো দিতেই আসেনি?

—ওমা, কেন জানব না? তাই তো আপনাকেও ধরে এনেছেন।

—তাহলে কাজের কথাগুলো সেরে ফেলি?

সুছন্দা একটু অবাক হয়। বলে, 'কাজের কথা' মানে?

—আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা। আমাদের ভবিষ্যৎ-গড়ার স্বপ্ন?

সুছন্দা জবাব দিল না। নীরবেই রইল।

মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে রতন প্রশ্ন করে : তোমার মতে, মনুষ্যজীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? চরম লক্ষ্য কী?

সুছন্দা হাসল। বলল, ঠিক এই প্রশ্নটাই একবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তিনি কী বলেছিলেন জানেন?

রতন একটু বিরক্ত হল ওর এই বিদ্যেজাহির করার ভঙ্গিতে। বললে, না, জানিনে। জানবার কৌতূহল নেই। আমি তোমার মতামতটা জানতে চাইছি : জীবনের মূল লক্ষ্যটা কী?

সুছন্দা তার হরিণের মতো আয়ত দুটি চোখ তুলে বললে, ঐ প্রশ্নটার উত্তর খোঁজা।

—মানে?

—জীবনের চরম লক্ষ্য : খুঁজে বার করা—জীবনের চরম লক্ষ্যটা কী?

রতন গুম খেয়ে যায়। এসব প্যাঁচালো-কথা তার ভাল লাগে না। বলে, শুনেছি তুমি বি. এ. পাশ। ফিলজফিতে অনার্স ছিল বোধহয়, তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই। আপনার কিসে অনার্স ছিল?

রতনের কান দুটি লাল হয়ে ওঠে। বলে, আমার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে—

—ও হ্যাঁ। শুনেছি সে-কথা!

রতন প্রশ্ন করে, তুমি অনার্স নিয়ে পাশ করলে, এম. এ. পড়লে না কেন?

—অর্থনৈতিক কারণে। বাবা মারা গেলেন। বাধ্য হয়ে একটা চাকরি নিতে হল।

—অর্থনৈতিক বাধাটা অপসারিত হলে এখন এম. এ. পড়ার ইচ্ছে আছে?

সুছন্দা একটু চুপ করে রইল। কী-যেন ভাবছে সে। অবশেষে বললে, ডিপেন্ডস্! পড়াশোনার কথা থাক বরং।

—বেশ থাক। আমি স্মোক করি, এতে আপত্তি নেই তো তোমার?

—ওমা, আমার আপত্তি হতে যাবে কোন দুঃখে? মা বা মাসিমা এখন নিচে আসবেন না। আপনি ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারেন।

—আমি সে-কথা বলছি না। আই মীন—স্মোকারদের তুমি 'টলারেট' কর তো? আমি কিন্তু ড্রিংক্সও করে থাকি। তবে মাতাল হই না।

সুছন্দা বললে, 'যে মদ খায় অথচ বলে জীবনে কখনো মাতাল হয়নি, হয় সে মিথ্যে কথা বলে, অথবা মদের বদলে জল খায়।'

রতনের কান দুটো আবার লাল হয়ে ওঠে। দৃঢ়স্বরে কৈফিয়ত চায়, কে বললে?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!

রতনের মনে হল : দুয়োর তালিকাটা ক্রমশ অন্য ধাঁচের হতে চলেছে! মোট কথা এ মেয়েকে নিয়ে তার পোষাবে না। কথায়-কথায় বিদ্যে জাহির করা ওর একটা ম্যানিয়া!

সুছন্দা বলে, আপনি তো দু-দুটি কনফেশন শোনালেন, 'এনি আদার ভাইস'?

—তার মানে?

—বাঙালির ছেলে—মাছ-মাংস খাবেনই। যুদ্ধের কল্যাণে 'মুদ্রার মৈনাক' বানিয়েছেন, সেকথা মায়ের কাছে শুনেছি। মদ্যও পান করে থাকেন। তাই জানতে চাইছি আর কী—এনি আদার 'ম'-কারান্ত ভাইস?

প্রতি-আক্রমণই আত্মরক্ষার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। রতন তাই বলে বসে, ঐ কথাটা আমিই জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। আমরা আসছি জেনেও তুমি যখন একটা দিন ছুটি নিতে পারলে না, তখন সেই প্রশ্নটাই জেগেছিল আমার মনে—তোমার কোনো বোম্বাই-মার্কা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আবার ইয়ে-টিয়ে নেই তো? সে-আমলে তোমার তো বোম্বাইয়ের সবকিছুই ভালো লাগতো?

সুছন্দা হেসে ওঠে। বলে, আপনি রাগ করছেন! নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্যান্ডিড। সেরকম কিছু থাকলে আমি প্রথমেই বলতাম : থ্যাঙ্কস্ ফর দ্য প্রপোজাল, বাট আয়াম টায়েড আপ এল্‌স্‌হোয়্যার!

রতন জানতে চায়, স্মোকিং আর ড্রিঙ্কিং-এ তোমার অ্যালার্জি নেই বললে, তাহলে তোমার অপছন্দের জিনিস কী? কাদের সইতে পার না?

—স্নবস্ অ্যান্ড বোরস্!

বড় বেশি ইংরেজি বুকনি। তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। বরাবর কনভেন্টে পড়ার ফল!

রতন বললে, এবার একটা শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি : গ্রেটা গার্বো, মার্লিন ড্রিয়াট্রিচ, নর্মা শিয়ারার আর এলিজাবেথ টেইলার—এই চারজনের মধ্যে তোমার মতে কে বেশি সুন্দরী?

কোথাও কিছু নেই, খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি। রতন একটু অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, এতে হাসির কী হল?

—আপনি দারুণ ইন্টারভিউ নিচ্ছেন কিন্তু রতনদা!

—ঠিক আছে, ইংরেজি ফিল্ম দেখার নেশা যদি না থাকে তবে থাক, ও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না তোমাকে।

—তা কেন? জবাব নিশ্চয়ই দেব। তাই বলব—আপনার প্রশ্নটা অবৈধ। আপনি 'অ্যাংগল অব ভিশন' ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। ইংরেজি ফিল্ম আমি দেখি, যথেষ্টই দেখি! তবে আপনার প্রশ্নটা নিয়ে কখনো ভাবিনি। আমি মনে মনে শুধু ভাবি—ওদের মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দর : ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, এরল ফ্লিন, গ্রেগরী পেগ, না স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার!

রতন হেসে ফেলে। বলে, কুইটস্! বেশ, তাই না হয় বল। বিলিতি ফিল্মের কোন নায়ককে তোমার সবচেয়ে পছন্দ?

—পছন্দ? প্রশ্নটা কিন্তু বদলে গেছে এবার! আমার সবচেয়ে যাকে পছন্দ তিনি ঐ চারজনের একজনও নন—চার্লি চ্যাপলিন।

রতন তখন 'হাঁ-না'-র দোলায় দুলছে। বিদ্যে জাহির করাটা বদভ্যাস বটে, কিন্তু মেয়েটা গুড 'টেব্‌ল্‌-টকার'! শুধু সুন্দরী নয়, ওর কথাবার্তার মধ্যেও চমক আছে, গ্ল্যামার আছে। বললে, তুমি একটু আগে বলেছ, আমিই ইন্টারভিউ নিচ্ছি। ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। তুমিও ইচ্ছে করলে আমার পছন্দ- অপছন্দের বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পার। এনি কোশ্চেন?

মেয়েটি বললে, বেশ বলুন—জসীমুদ্দীন আর জীবনানন্দ—এঁদের মধ্যে কার রচনায় আপনার মতে গ্রাম-বাঙলার ছবি সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে।

এর চেয়ে দর্শনের ছাত্রীটি যদি কান্ট-হেগেল বা শোপেনহাওয়ারের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন পেশ করত তাহলে অজ্ঞতা স্বীকার করাটা সহজ হতো। রতন বললে, জসীমুদ্দীনের কোনও উপন্যাস আমি পড়িনি, জীবনানন্দের কী-একটা নভেল পড়েছিলাম—ভাল মনে নেই...

অবাক দুটি চোখ মেলে স্থাণুর মতো বসেই রইল মেয়েটা।

রতন অপ্রস্তুত হয়ে বলে, বাঙলা বই-টই আমি বিশেষ পড়ি না।

সুছন্দা কথা ঘোরায়। জানতে চায়, আর একটু চা দিই?

—দেবে? দাও!

সেদিন রাত্রের ট্রেনে ওদের ফেরা হয়নি। পরদিন সকালে বিদায় নেবার আগে সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিল জনান্তিক সাক্ষাতের। সারারাত ভেবে মনস্থির করেছিল রতন। আড়ালে পেয়ে বলেছিল, তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি ছন্দা। কাজটা শক্ত। পারবে তো?

—কী কাজের দায়িত্ব? আগে শুনি।

—আমরা চলে যাবার পর মাসিমাকে বল : 'রতনদা রাজি'! পারবে তো?

চোখে চোখে তাকালো না তবুও। নীরবে নতনয়নে কী যেন ভাবছে।

—কী হল? কী বললাম বুঝতে পারলে না?

—কেন পারব না? এ তো সহজ কথা!

—মাসিমাকে কী বলবে বল তো?

—'বার্কিস্ ইজ উইলিং'!

—মানে?

—এতক্ষণে চোখে-চোখে তাকালো। একগাল হাসল। আবার টোল পড়ল গালে। বললে, শুধু বাঙলা বই নয়, রতনদা—আপনি ইংরেজি বই-টইও নেড়ে দেখার সময় পাননি! ওটা 'ডেভিড কপারফিল্ড' থেকে।

বইটা পড়েনি, তবে সিনেমাটা দেখা ছিল। মনে পড়ল না। ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হলেন মা—নে চল এবার! না হলে ট্রেনটা ধরতে পারব না!

* * *

রোখ চেপে গিয়েছিল ওর।

মাসখানেকের ভেতরেও কালীঘাট পোস্ট-অফিসের ছাপ মারা কোনো চিঠি না আসায়। মা ফিরে এসে নিরাপদ পৌঁছানো সংবাদ দিয়েছিল। ব্যস! তারপর ও-পক্ষ নিশ্চুপ। মাসিমা জানতে চাইলেন না—মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না। তার একটাই অর্থ : মেয়েটা তার মাকে কিছু বলেনি। ইতিমধ্যে

একখণ্ড 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনে পড়ে ফেলেছে। সবটা নয়—ঐ উদ্ধৃতিটা পর্যন্ত : 'বার্কিস ইজ উইলিং'!

কী ভেবেছে মেয়েটা? সে ঐ 'বার্কিস'-এর মতো একটা হাড়-হাবাতে-হ্যাংলা? ইস্কুলের মাস্টারনি—কত টাকাই বা মাইনে পাস যে, দূরে দাঁড়িয়ে দুয়োর-ধুয়ো দিয়ে যাচ্ছিস?

একদিন নিজে থেকেই মাকে জিজ্ঞাসা করল, কই তুমি তো জানতে চাইলে না, সুছন্দাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না?

মা অভিমান করে বলেছিলেন, সে-কথা তোকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবার সুযোগ তুই দিলি কোথায়? আচ্ছা তোর একটু মায়াও হল না? মেয়েটাকে মুখের ওপর বলে এলি—তোর পছন্দ হয়নি?

রতন স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, কে বললে?

—কে আবার বলবে? তোর মাসিমাই চিঠিতে লিখেছে! ছন্দা তার মাকে বলেছে—তুই নাকি ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এসেছিস্! আশ্চর্য! একটা কুমারী মেয়েকে মুখের ওপর ও-কথা বলতে হয়? থাক বাবা! আমি আর ওর ভেতর নেই! আমার ঘাট হয়েছে!

রতন গভীরভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। এমন অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী হতে পারে? তিন-তিনটি সম্ভাবনার কথা মনে হল তার। তিনটি হেতুতে এ জাতীয় মিথ্যার আশ্রয় ও নিতে পারে। এক : তার একজন গোপন প্রেমিক আছে। দুই : সে রতনকে নিয়ে খেলা করছে—বোকা বানাতে চাইছে। তিন : রতনকে সে নিজেই পছন্দ করেনি।

প্রথম সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া যায় না। ছন্দা বলেছিল—তেমন কোনো প্রেমিক থাকলে সে জনান্তিকে বলত : থ্যাঙ্কস ফর দ্য প্রপোজাল, কিন্তু আমার টিকি অন্যত্র বাঁধা আছে। সেটা সহজ ও সত্য কথা। সে-কথা বলার হিম্মৎ ওর আছে। তৃতীয় সম্ভাবনাটাকেও মেনে নেওয়া ওর ধাতে নেই—রতন সুন্দর, সুদর্শন, অগাধ সম্পত্তির মালিক—কুমারী মেয়ের কল্পলোকের রাজপুত্র সে। সুতরাং দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই একমাত্র সমাধান। ও নিছক দুষ্টুমি করতেই এই চালটা চেলে দেখছে—ও-পক্ষ কী চাল দেয়!

রতন মায়ের কাছে এসে বলল, না মা, তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি, আর দেব না। তোমার পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করব, তবে একটা শর্ত আছে!

মা আকাশ থেকে পড়লেন, শর্ত! কী শর্ত বাবা?

—মাসিমা শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবেন। তোমার গৃহবধূকে সাজিয়ে আনবে তুমি। খরচপাতি সব আমার!

মা বজ্রাহতা হয়ে গিয়েছিল!

ফুলশয্যার রাত্রে রতন জিজ্ঞাসা করেছিল তার নববধূকে, মাসিমাকে অমন বেমক্কা মিছে কথাটা বলেছিলে কেন?

সুছন্দা হেসেছিল। এবার কিন্তু তার গালে টোল পড়েনি। বলেছিল, 'নারী রহস্যময়ী' জান না?

—কিন্তু এ রকম মারাত্মক রহস্য? 'হাঁ' কে 'না'?

ভাগ্যকে মেনে নেবার চেষ্টা করেছিল সুছন্দা। নিয়ে ছিলও।

'তোমার মাপে হয়নি সবাই, তুমিও হওনি সবার মাপে'। পঞ্চাশের দশকে একটি পিতৃহীনা অনূঢ়াকন্যা তার বিধবা মাকে নিষ্কৃতি না দিয়ে পারেনি। রতন কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—সুছন্দা ওকে আদৌ পছন্দ করেনি। ঐ যে কথাটা সে বলেছিল সেদিন—সে সইতে পারে না দু জাতির অসৈরণ— 'স্নবস্ অ্যান্ড বোরস্'—সেটা ওর অন্তরের কথা। নিবারণ ঘোষ মশাই ছিলেন বোম্বাইয়ের একজন নামকরা অ্যাডভোকেট—'নামকরা' বলতে আর্থিক অর্থে নয়, প্রবাসী বাঙালি মহলে সুপরিচিত। তাঁর ছিল নানান শখ। আর সুছন্দা ছিল বাপের ভা—রি আদরের। মেয়েকে শুধু যত্ন করে লেখাপড়া আর গানই শেখাননি—একটি সত্যিকারের রুচিশীলা প্রবাসী বঙ্গললনা করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই সেই কনভেন্ট-লালিতা মহারাষ্ট্রে-মানুষ মেয়েটির মনে ঐ আজব প্রশ্ন : 'গ্রাম-বাঙলার ছবি কার কলমে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে—জীবনানন্দ না জসীমউদ্দীন!'

ঘোষ-মশায়ের উপার্জনের একটি বৃহৎ অংশ দখল করত তাঁর লাইব্রেরী ঘরখানা। বই, বই আর বই। আর সুছন্দা ছিল তারই পোকা। তার মানসিক বিচরণক্ষেত্র এমন একটি জগতে যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণাই নেই ধনকুবের রত্নেশ্বরের।

কলেজ-জীবনে ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল অনেক যুবক। তাদের অনেকেই সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, ধনীর দুলাল—বয়সের ধর্মে সুছন্দার অন্তরেও সঞ্চারিত হয়েছিল বিপরীত-মেরুর চৌম্বকবৃত্তি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহভঙ্গ হয়ে যেত। দেখা যেত, পাণিপ্রার্থীরা হয় 'স্নব' নয় 'বোর'। তারা জানে না—আলাদীনের সেই দৈত্যটার নাগালের বাইরে আছে একটি সম্পদ : পরিশীলিত রুচি, যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আর রসিকতা করলে যারা তার অর্থ বোঝে না— সময়ে হাসতে জানে না—তাদের কিছুতেই সইতে পারে না সুছন্দা। কবির মতো তারও প্রার্থনা ছিল—হে চতুরানন, আমার ললাটে শত শত ইতরতাপ লিখে যেও, সব সইবে আমার, শুধু দেখ, যেন অরসিককে রস নিবেদনের বিড়ম্বনা আমাকে সহ্য করতে না হয়!

বেচারি! সেই দুর্দৈবই দেখা দিল ওর কপালে। ওরা দুজন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

নতুন সংসারে সে সব কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিল। ঘর-দোর নতুন করে সাজায়, সব কিছু ছিমছাম রাখে। শাশুড়ির সেবাযত্নের ত্রুটি নেই। এমনকি রতনের পান থেকে চুন খসে না।

কলেজে ভর্তি হতে রাজি হল না। এম. এ. পড়বেনা। বরং গান ধরল। অবসর সময়ে তানপুরা নিয়ে ক্লাসিকাল গান করে। রতন একজন ওস্তাদের ব্যবস্থা করে দিল। এল তবলচি। সুছন্দা একখানা ঘরকে 'লাইব্রেরী রুম' করল। যেন 'নস্ট্যালজিয়ায়' ডুবে থাকতে চায়। আলমারি কিনে সাজালো। রতনের তাতে ভারি উৎসাহ। ক্রেট ভর্তি বই আসত মাসে-মাসে। সুছন্দা সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত। দিবারাত্র বই পড়ত। বিশেষ, রতন যখন ট্যুরে যেত। তাকে মাঝে-মাঝেই দু-তিন সপ্তাহের জন্য ট্যুরে যেতে হত—প্রমোদ ভ্রমণ। ট্র্যাভল এজেন্সির ব্যবস্থাপনায়। ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত। ফরেন ট্যুর বছরে একবার। মা বলতেন, তুমিও একবার ঘুরে এস না বৌমা?

সুছন্দা রাজি হতো না শাশুড়িকে ফেলে যেতে। উনি তো ওঁর আচার-বিচার নিয়ে যেতে পারবেন না। রতনও কখনো পীড়াপীড়ি করেনি এ নিয়ে। তৃতীয় বছরে ওর কোলে এল সন্তান। এখন আবার অন্য জাতের সমস্যা। খোকন একটু বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কেমন করে যাবে?

দুর্ঘটনাটা ঘটল যখন ঋদ্ধির বয়স আড়াই বছর!

তারিখটা মনে আছে : সতেরই ফাল্গুন! সেটাই ওদের বিবাহবার্ষিকী!

ওর পঞ্চম বিবাহ-বার্ষিকীর চিহ্নিত দিনে অ্যাটম-বোমাটা ফাটল!

তার দিন পনের আগে ছাব্বিশ দিনের লম্বা ট্যুর সেরে রতন ফিরে এসেছে। এবার ইউরোপের ট্যুরে যথেষ্ট লাভ হয়েছে। ইটালী-ফ্রান্স-সুইট্জারল্যান্ড-জার্মানি-ডেনমার্ক আর লন্ডন। কিছুটা প্লেনে, কিছুটা লাক্সারী বাসে। সুছন্দা এই তিন-চার সপ্তাহ ধরে প্রতিটি রাজ্য থেকেই পিকচার পোস্টকার্ড পেয়েছে। মাঝে মাঝে মুখবন্ধ খামে বানান ভুলে-ভরা মেলোড্রামাটিক ভাষায় প্রেমপত্র। ফিরে এল প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে—ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, ক্যামেরা, কসমেটিক—সবই সুছন্দার জন্য। ঋদ্ধির জন্যে দম দেওয়া আজব পুতুল, মায়ের জন্য পেতলের বুদ্ধমূর্তি।

বিবাহবার্ষিকীর দিনটা খেয়াল ছিল। কায়দা করে তার দিন পনেরো আগেই ফিরেছে। বিদেশ থেকে যা কিছু উপহার এনেছে তা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। তাই রত্নেশ্বর গিয়েছিল কলকাতায়— একটা জড়োয়া নেকলেস কিনে আনতে। প্রতি বছর সে কিছু না কিছু উপহার দেয় স্ত্রীকে।

সতেরো তারিখ সকালে সে ফিরে এল কলকাতা থেকে। কিন্তু নেকলেসের প্যাকেটটা হাতে করে সুছন্দাকে দেওয়া হল না। ভেবেছিল, নৈশাহার সেরে শুতে এসে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দেবে। হল না।

সুছন্দা শুতে এল না। নজর হল—বিছানায় রাখা আছে সুদৃশ্য কাগজে মোড়া লাল ফিতে জড়ানো একটা প্যাকেট।

কী ওটা?

বুঝল—এটা সুছন্দাই রেখে গিয়েছে। কিন্তু ওর জন্যে বিবাহবার্ষিকীর উপহারই যদি হবে তাহলে নিজে হাতে না দেবার অর্থ কী?

প্যাকেটটা খুলে ফেলল রত্নেশ্বর।

সেটাই ঐ অ্যাটম-বোমা!

একখানি চিঠি। লিখেছে মৈত্রেয়ী নামের একটি মেয়ে, সুছন্দাকে। রতন চিনতে পারল না প্রথমটা—একটু পড়েই বুঝতে পারে।

মৈত্রেয়ী সুছন্দার সহপাঠিনী। সে আর তার স্বামী গিয়েছিল সম্প্রতি ইয়োরোপ ভ্রমণে। 'ভেনাস ট্র্যাভলস'-এ। মেয়েটি কিন্তু ঐ এক মাসের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে, সে সুছন্দার বান্ধবী। বোম্বাইয়ে ওরা এক কলেজে পড়েছে। ওদের বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল, আসতে পারেনি। এমনকি তার অনুরোধে সুছন্দা ওদের যুগল-ফটোও উপহার পাঠিয়েছে! কথাপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী লিখেছে, "মীনাকে মিসেস দত্ত বলে পরিচয় করিয়ে দেবার পরেও আমি বুঝতে পারিনি—ব্যাপারটা আসলে কী! হোটেলে ওরা ডব্‌ল্‌-বেডেড রুমে শুতে যেত—স্ত্রী তো বটেই। কিন্তু তোদের যে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তা তো জানি না। ভেবেছিলুম সরাসরি তোর এক্স-হাসবেন্ডকে জিজ্ঞাসা করব; কিন্তু অনিল বারণ করল। বললে, কী দরকার তোমার? হয়তো এই রত্নেশ্বর দত্ত আর তোমার বান্ধবীর স্বামী এক লোক নন!

ফিরে এসে কালীঘাটে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা করে মনে হল—তোকে সব কথা জানানো উচিত। মাসিমা বললেন, তোদের বিবাহ-বিচ্ছেদ আদৌ হয়নি, আর তোর স্বামীই 'ভেনাস-ট্র্যাভলস'- এর মালিক। মাসিমাকে আমি কিছু জানাইনি। তবে তোর কাছ থেকে গোপন করাটা উচিত হবে না বলে সবকিছু জানিয়ে এই চিঠি দিলাম। জানি, তুই আমাকে অভিসম্পাত দিবি। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে নিশ্চয় বুঝবি—আমি যা করছি তা তোর ভালোর জন্যই। তুই কী করবি সেটা তোর বিবেচ্য। এই সঙ্গে খান কয় ফটো পাঠালুম। যাতে মীনা মেয়েটাকে চিনতে পারিস।"

রতনের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠেছিল। তার বিচিত্র চিন্তাধারায় দুঃখ বা রাগের চেয়ে বিস্ময়ের অনুভূতিটাই প্রাধান্য পেল। সেই হারামজাদী—মৈত্রেয়ী, এমন জবর সুযোগটা নিল না কেন? ওরা স্বামীস্ত্রীতে তো বুঝতে পেরেছিল, মীনা ওর বৈধ স্ত্রী নয়। এটাকে মূলধন করে ওরা যুগলে তো দোহন শুরু করে দিতে পারত রতনকে। সহজ উপার্জন : ব্ল্যাকমেলিং! সেটা না করে এমন একখানা পত্রাঘাতে একটা সুখী সংসারের মৌচাকে বেমক্কা খোঁচা মেরে পালিয়ে যাবার অর্থ কী? এক ফোঁটা মধুও তো পেলি না তোরা!

খামের ভেতর থেকে বার করে দেখল সেই রঙিন ফটোটা—'ল্যভার্স কর্নারে' ওদের যুগল ছবিটা। রত্নেশ্বরের বাহুবন্ধে ধরা দিয়ে মীনা পারেখ নির্লজ্জের মতো হাসছে!

*   *   *

ক্র্যাকাটোয়ায় অগ্নুৎপাত হয়েছিল 1883 খ্রিস্টাব্দে। দশ-বিশ হাজার হাইড্রোজেন-বোমার সমতুল্য সে বিস্ফোরণ! জীবনের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রইল না সেখানে। মনে হয়েছিল পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বুঝি হারিয়ে গেল সেই দ্বীপটা! প্রায় সাতাশ বছর ধরে সে দ্বীপে প্রাণের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাননি বিজ্ঞানীরা। জীবজন্তু পশুপাখি তো নয়ই, এমনকি পোকা-মাকড়, শ্যাওলা উদ্ভিদও নয়। কিন্তু ধরিত্রী মাতার সেই ক্ষণিক বিস্ফোরণ চিরকালের জন্য ক্র্যাকাটোয়াকে জীবন-বিমুখ করে রাখতে পারেনি। দ্বীপান্তর থেকে একদিন ভেসে এসেছিল প্রাণের স্পন্দন! তিল তিল করে ঠাঁই করে নিয়েছিল শ্যাওলা, লাইকেন্স, কাঁটাগুলো। এল পাখিরা, সরীসৃপেরা, ক্রমে স্তন্যপায়ীরা। কেউ তাদের হাত ধরে নিয়ে আসেনি। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রেরণাতেই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ক্র্যাকাটোয়া দ্বীপ আবার বনসম্পদে আকীর্ণ হয়ে গেল—সবুজে-সবুজ, লালে-লাল। পাখির কূজনে কলমুখরিত হয়ে উঠল মৃত দ্বীপ!

হিরোসিমা-নাগাসাকির ইতিহাসও তাই!

রতন অপেক্ষা করে আছে তাই।

সূর্য প্রদক্ষিণ-ছন্দের চক্রাবর্তনে ইতিমধ্যে পৃথিবী সতেরোবার নিয়ে এসেছে সতেরোটি সতেরোই ফাল্গুন। ক্র্যাকাটোয়া-দ্বীপে দেখা দেয়নি সবুজাভা অথবা শোনা যায়নি পাখির কলকূজন।

প্রথম রাত্রে রতন সাহস করে খোঁজ করেনি—কোথায় রাত্রিযাপন করল সুছন্দা। পরে টের পেল ঠিক পাশের ঘরেই ছেলেকে নিয়ে সে শোয়।

রতন বুঝতে পারে—তাড়াহুড়ো করাটা কোন কাজের কথা নয়। 'টাইম ইজ দ্য বেস্ট হীলার'। পতিব্রতা নারী যদি হঠাৎ টের পায় যে, তার স্বামী পরদারগমনের প্যাঁচে জড়িয়ে পড়েছে তখন সাময়িকভাবে সে ক্ষেপে যায়। কিলটা-চড়টা মেরে বসতে পারে, আঁচড়ে-কামড়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। সেসব কর্তাকে সইতে হয়। মজা লোটার মাশুল! কিন্তু এ কী রে বাবা! এ তো মুখে রা-কাটে না! খিস্তি-খেউড়টাও করে না। যা হোক দু-ঘা দিয়ে ঝাল ঝাড়। না হয়, কর্তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর কারো সঙ্গে ফ্লার্ট কর! সে সব কিছুই করল না মেয়েটা। বস্তুত আপাতদৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন কারও নজরে পড়ল না। যথানিয়মে দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যায় সুছন্দা—নিরলস নিষ্ঠায়। যথারীতি অবকাশ যাপন করে তানপুরাটা টেনে নিয়ে, অথবা লাইব্রেরী ঘরে।

এই সতেরো বছরে নানাভাবে চেষ্টা করে দেখেছে রতন, কিন্তু সংকল্প থেকে ওকে টলাতে পারেনি।

একবার বলেছিল, খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হলেও লোকের আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা অধিকার থাকে। তুমি কি আমার বক্তব্যটা শুনবে না? আমার কৈফিয়ত দাবী করবে না?

ছন্দা ওর চোখে-চোখে চাইল। বলল, তোমার-আমার সম্পর্কটা সওয়াল-জবাবের নয়। কৈফিয়ত আমি দাবী করব কেন? আমি তো বাক্যালাপ বন্ধ করিনি। তোমার কিছু বলার থাকলে বলো?

—মীনার ব্যাপারটা আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই, শোন—

—না। মীনার সম্বন্ধে আমার তো কোনো কৌতূহল নেই। জানার বাকিও নেই কিছু। যেটা জানি না, সেটাই জানতে চাইব ভেবেছিলুম, তারপর মনে হল—কী লাভ?

—কী? কোন কথাটা জানতে চেয়েছিলে তুমি?

—ভেবেছিলাম সুযোগ মতো জেনে নেব, কেন তুমি সেদিন আমাকে জ্ঞাতসারে মিছে কথা বলেছিলে?

—কবে? কবে আমি মিছে কথা বলেছি?

—একেবারে প্রথমদিন। বিয়ের আগে। সেই যেদিন আমি জানতে চেয়েছিলাম—'এনি আদার ম-কারান্ত ভাইস?' সেদিন কেন সত্য গোপন করেছিলে? মোহ, ভয়, না কাম?

রতন এ-কথার জবাব খুঁজে পায়নি।

জনান্তিক কথাবার্তা ক্রমেই কমে এল। যেটুকু না বললে নয়—তাও সাংসারিক প্রয়োজনে। সুখ-দুঃখের আন্তরিক আলাপচারি ক্রমশই বন্ধ হয়ে গেল। রতন এ নিয়েও অভিযোগ করেছে, তুমি দিবারাত্র মনে মনে গুমরোচ্ছ ছন্দা। কী ভাবো এত?

সুছন্দা ম্লান হেসে বলেছিল, ভাবি না তো। মনে মনে একটা মন্ত্র জপ করে যাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এই মন্ত্রটাতে কুমু যেমন সান্ত্বনা পেয়েছিল, আমি তো পাই না। একেই বোধহয় বলে 'জেনারেশন গ্যাপ'! কুমুদিনীর কাল হারিয়ে গেছে!

—কে কুমুদিনী? কী মন্ত্র মনে মনে জপ করত সে? অথবা তুমি?

এবার রতনের চোখে চোখ রেখে ও বলেছিল 'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ/প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম।'

রতন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ঢোক গিলে বলে, তার মানে?

—মানেটা আমি নিজেই ধরতে পারছি না, তোমাকে কী বোঝাবো?

শেষমেশ মরিয়া হয়ে রতন দাখিল করেছিল তার আখরি-প্রস্তাব : শোন ছন্দা! এভাবে চলতে পারে না। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করছি। আমার উচিত ছিল তোমাকে সব কথা খুলে বলা। অন্তত আমাদের বিয়ের পর মীনার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া, কিন্তু তা আমি দিইনি। সেজন্য শাস্তিও তুমি বড় কম দাওনি আমাকে। কিন্তু আবার কি নতুন করে সবকিছু শুরু করা যায় না?

—কী বলতে চাইছ তুমি?

—'ভেনাস-ট্র্যাভলস' এখন ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে গেছে। দুর্দান্ত লাভের ব্যবসা। তা হোক— সেটা আমার জীবনের সুখশান্তির চেয়ে বড় নয়। ধর, আমি যদি আমার সব শেয়ার জলের দরে বেচে দিই? মীনা পারেখের সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে ফেলি? তাহলে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? আবার কি আমরা সেই হারানো দিনগুলোকে ফিরে পেতে পারি না?

ছন্দা এককথায় জবাব দিতে পারেনি। নতনয়নে সে যেন গভীরভাবে কী ভাবছে।

রতন যোগ করে, তোমার অসীম করুণা যে, কথাটা এখনো পাঁচকান হয়নি। অন্তত মায়ের কানে ওঠেনি। আর ধন্যবাদ তোমার সেই বান্ধবীকে—মৈত্রেয়ী, না কী যেন নাম—তিনিও মুখরোচক কেচ্ছাটা গাবিয়ে বেড়াননি। কিন্তু ভেবে দেখ ছন্দা, ছেলেটা বড় হয়ে উঠছে। জীব-বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেছে! বাবা-মা কেন একঘরে শোয় না—এ প্রশ্নটা আর দু-চারদিনের ভেতরেই তার মনে জাগবে। সেটা কি ভাল? বল, আমি যদি মীনাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি, তাহলে তুমিও কি পার না তোমার সেই হারানো দিনগুলোয় ফিরে যেতে?

সুছন্দা নতনেত্রে বলে, ডিপেন্ডস্! আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—না! তোমাকে কথা দিতে হবে।

—তা কী করে দেব? মনের ওপর মানুষের কি জোর খাটে?

—খাটে! চেষ্টা করলে কী না হয়?

—চেষ্টা করলে সবসময় সবকিছু হয় না। দেখলেই তো! ঐ যে আমার তানপুরাটা। হাত থেকে পড়ে ফেটে গেল। কত টাকাই তো খরচ করলে তুমি। কিন্তু সেই আগেকার সুর তো ওতে বাজে না!

—তার মানে তুমি কথা দেবে না?

—কী করে দেব? তুমি যে আমার মুঠোয় ধরা বেলুনটার দড়ি ছিঁড়ে দিলে। স্বপ্নভরা বেলুনটা আমার চোখের সামনেই উঠে গেল আকাশে!

—ওসব কাব্যকথা ছাড়ো। যা বলতে চাও, সোজা কথায় বল।

—যা আমার নাগালের বাইরে সে-বিষয়ে কী করে কথা দেব আমি? এটুকুই শুধু বলতে পারি যে, আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না!

রতন এ ফাঁকা বুলিতে আস্থা রাখতে পারেনি। এ কয়বছর সে 'ভেনাস ট্র্যাভলস'-এর ট্রিপ নিয়ে বিদেশযাত্রা করেনি। এবার সেই আয়োজন করতে বসল। ও দেখতে চায়—মেয়েটা ভয় পেয়ে এবার মেনে নেয় কি না।

নিল না। খবর পেয়ে জনান্তিকে শুধু বললে, এবার আর ঐ ভুলটা কর না। পাশাপাশি দু'খানা সিঙ্গল বেডের রুম ভাড়া নিও হোটেলে। কেমন?

রতন দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছিল, থ্যাংক্স্ ফর দ্য সজেস্‌শন!

*　　*　　*

ঋদ্ধি দুর্দান্ত রেজাল্ট করল হায়ার সেকেন্ডারিতে। তিন-তিনটে লেটার—ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ। যতীন সোম তার ওপর দিয়ে—থার্ড র‍্যাঙ্ক পেল এই মফঃস্বলের কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রটি।

কিন্তু কী পাগলামি! ঋদ্ধি কিছুতেই রাজি হল না কলকাতার হস্টেলে গিয়ে পড়তে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যাডমিশন-ফর্ম নিয়ে এসেছিল রত্নেশ্বর; সেটা ও ফিল-আপই করল না। বাপ জানতে চাইল, কেন যেতে চাও না কলকাতায়?

ছেলে বললে, যতীনও তো যাচ্ছে না?

কোনো মানে হয়? সারাজীবন ঐ যতীনের কাছা চেপে ধরে চলতে চায় নাকি ছেলেটা? যতীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছাত্র—ওর বাপ 'অ্যাফোর্ড' করতে পারে না বলেই এই মফস্বল কলেজে ঢুকেছে। যতীন একা নয়, ওর আরও সব বন্ধু—কল্যাণ, সুখময়, দিব্যেন্দু। এই সহজ কথাটা ঢুকছে না ঐ স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেটার নিরেট মাথায়? নতনেত্রেই একনাগাড়ে প্রতিবাদ করে গেল, তা কেন? যতীন তো জেনারেল স্কলার! তার পড়াশুনা করতে টাকা লাগবে কেন?

—তাহলে এই মফঃস্বলের গোয়ালে পড়ে থাকছে কেন সে?

—সে তুমি বুঝবে না!

এই আর এক 'বোল'; তুমি বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না—তোমরা সবাই ওল্ড স্কুলের—'জেনারেশন গ্যাপ'!

তার চেয়েও দুঃখের কথা, লজ্জার কথা—যে ছেলে অঙ্কে লেটার পেয়েছে, বিজ্ঞানে লেটার পেয়েছে, সে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে চায়! মেডিকেল কলেজ, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অথবা কম্পুটার-সায়েন্স নিয়ে সে পড়বে না!

সুছন্দার সঙ্গে এ নিয়েও দরবার করতে চেয়েছে; ছেলেটা মায়ের পরামর্শ শোনে। কিন্তু যেমন ছাঁ, তেমন মা। ঋদ্ধির মায়ের সরল জবাব, ওর জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, কী নিয়ে পড়বে তা ওকেই স্থির করতে দাও!

জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে না ঘোড়ার ডিম!

আসলে ছন্দা চায় ছেলেকে আঁকড়ে থাকতে। বাড়িতে একটি দার্শনিকেই প্রাণ অতিষ্ঠ, আবার একটি এলে ভরাডুবি পূর্ণ হবে।

আর একজন আছেন সর্বনাশের মূলে। ঋদ্ধির দিদা। বাহাত্তর পাড়ি দিয়ে বাহাত্তুরে ধরেছে তাঁকে। আহা! ছোটখোকন যদি এখানকার কলেজে ভর্তি হতে চায় তাহলে তুই বাগড়া দিস কেন?

কেন যে দেয়, তা কী করে ঐ বৃদ্ধাকে বোঝাবে? ছন্দাকেই বোঝানো গেল না! এটা বিজ্ঞানের যুগ। এটা কমার্সের যুগ। হয় ফিজিক্স, নয় ইকনমিক্স। কিন্তু কেউই ওর যুক্তিতে কান দিল না। রত্নেশ্বর যেন এ সংসারের মাথা নয়! কেউই নয়!

ওরা বোঝে না—কোনো দিনই বুঝতে পারবে না—এভাবে বেঁধে রাখা যায় না। সংসারের এই অন্ধ স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে পক্ষিশাবক কোনোদিনই আকাশচারী মহাগরুড় হয়ে উঠতে পারে না! ঐ ছোট খোকনের চোখের সামনেই তো রয়েছে একটা জলন্ত উদাহরণ : তার বাপ! বাপের সঙ্গে রাগারাগি করে এককথায় ঘর ছেড়েছিল বলেই না আজ সে—রত্নেশ্বর দত্ত!

পারবে না—ঐ স্কলারশিপ পাওয়া ম্যাদামারা ছেলেটা কোনো দিনই পারবে না সেভাবে এককথায় গৃহত্যাগী হতে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শুধুমাত্র নিজের হিম্মতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে!

ফিলজফার হবেন! বাপের রক্তজল করা টাকার ছত্রছায়ায় বসে বিচার করবেন—'পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র!'

কী-করে পারবে নিজের হিম্মতে প্রতিষ্ঠা খুঁজে নিতে? আজ পর্যন্ত বাপের চোখে-চোখ রেখে কথা বলতেই শিখল না ছেলেটা!

হোপলেস্!

*　　　　*　　　　*

না, রতনের ওটা নেহাৎ অন্যায় অভিযোগ! প্রথমবার চাকরি খুইয়ে মুরারীদা তার বৌঠানের কাছে ধর্না দিতে আদৌ যায়নি। সোজা চলে এসেছিল মরা-কাটাঘর পেরিয়ে ঘূর্ণির রাস্তায়, তার দেড়-কামরার ডেরায়। কল্যাণী রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, ব্যাপার কী গো? সুয্যি না ডুবতেই আজ গোয়ালে ফিরে এলে যে?

বাক্যবাগীশের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাহচর্যে তার কথাগুলোও রসাত্মক।

সাইকেলটা দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে লক-আপ করে মুরারীদা তখন ঘনিয়ে এসে বসেছে। একটানে ফতুয়াটা খুলে ফেলে পৈতে দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বসেছে একটা বেতের মোড়ায়। বললে, ছুটি হয়ে গেল যে, গিন্নি!

—ছুটি? হঠাৎ ছুটি কিসের গো? কোনো তেমন তেমন কেউকেটার কিছু ভালোমন্দ হয়ে যাবার খবর এসেছে নাকি?

মুরারীদা একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, বুল্‌স-আই হিট করেছ, গিন্নি! রবিঠাকুর বেঁচে নেই, থাকলে এই মওকায় তিনি নির্ঘাৎ দু-ছত্তর লিখে ফেলতেন :

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন জিনিস
জীয়ন্তে কৃতান্ত তাই করে দিল finish!

—তার মানে?

—মৃত্যুহীন জিনিসটা হচ্ছে সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ, সেন্স-অব-হিউমার। আর কৃতান্ত স্বয়ং রত্নেশ্বর দত্ত!

কল্যাণী জানতে চায়, না, মানে মারা গেল কে?

—কম্পোজিটার শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন রায়!

—ও আবার কী অলুক্ষুণে কথা!

—না, না, তোমার শাঁখা-সিঁদুর আন্-অ্যাফেক্টেড! কম্পোজিটার মুরারী রায় টেঁসে গেলেও বিদূষকদাস মুরারী রায় বহাল-তবিয়ৎ!

এতক্ষণে কল্যাণী উচ্চারণ করে তার বাঁধা বয়ান—যা সে তার বিবাহিত জীবনে হয়তো কয়েক লক্ষবার বলেছে : তোমার একটা কথাও বোঝা যায় না বাপু!

—আজ ছোটবাবু এই বুড়ো-হাবড়াটাকে বরখাস্ত করে দিলেন যে। কাল থেকে আর তোমাকে বিরহ-যন্ত্রণা সইতে হবে না। সারাটাদিন তোমার নজরবন্দি হয়ে থাকব। 'কপোত কপোতি যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে'!

একগাল হাসল মুরারীদা।

কল্যাণীর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

বুড়োটা চোখে ভাল দেখে না, প্রুফ দেখার কাজ যে ইদানিং ঠিক মতো করতে পারে না এটা জানা ছিল। কিন্তু তাই বলে একেবারে বরখাস্ত! কালীতারা প্রেসের সঙ্গে বুড়োটার যে নাড়ির যোগ! আর তাছাড়া রতন তো জানে—ওদের তিনকুলে কেউ নেই। এ তো অনিবার্য অনশন মৃত্যু!

কল্যাণীর মনে পড়ে যাচ্ছিল অনেক অনেককাল আগেকার দিনগুলোর কথা। একেবারে আদিক্যালের। জঙ্গীপুর থেকে গোয়াড়িতে এসে তাদের প্রথম সংসার পাতার স্মৃতি। মুরারীদা তখন দিবারাত্র পড়ে থাকত প্রেসের কাজ নিয়ে। কল্যাণীর সন্তান হয়নি। সদ্যোবিবাহিতার দিন কাটতে চাইত না। শেয়ালডাকা একপ্রহর রাতে মুরারীদা যখন সাইকেলে চেপে ফিরে আসত, তখন কল্যাণী বলত, সারাদিন তোমার কী এত কাজ বল তো?

—কী করি বল, গিন্নি? তোমার ছোট বোনটি তো তোমার মতো সরলা নন!

—ছোট বোন! মানে?

—ও! তুমি টের পাওনি বুঝি? তোমার একটি সতীন হয়েছে যে! দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি—নাম : কালীতারা!

কল্যাণী হেসে বলত, সে কী! সে তো আমার 'জা' গো! রতনের ছোট মা।

—না, না! দাদা টাকা ঢেলে খালাস! কালীতারা গাঁটছড়া বেঁধেছে আমার সঙ্গেই!

এই সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল।

নখ দিয়ে কিছুক্ষণ মেঝেটা খুঁটল। তারপর জানতে চায়, তোমার অপরাধ?

—হিমালয়ান্তিক! শেষমেশ মৃত্যু হল কেউটে সাপের 'ছোঁবলে'!

কল্যাণী এক-কথা আর বার বার বলল না।

মুরারীদা নিজে থেকেই অন্বয়-ব্যাখ্যা দাখিল করে। বললে, বিবেচনা করে দেখ গিন্নি, তুমি ছাড়া এ বুড়ো-বামুনের আছে দু-দুটি কবচ-কুণ্ডল! কারো হুকুমে কি সে-দুটি ত্যাগ করতে পারি?

—কী দুটি কবচ-কুণ্ডল?

এক-নম্বর, গলার বাইরে, বাঁ-কাধে কিছু সাদা সুতো। দু-নম্বর, গলার ভিতরে না-কাঁদে কিছু সাদা ছুতো!

—"না-কাঁদে কিছু সাদা ছুতো" মানে?

—এমন কিছু সাদা রসিকতা যাতে চোখের জল আটকে রাখার ছুতো খুঁজে পাওয়া যায়! আমার গুরুদেব বলতেন : বিদূষককে কাঁদতে নেই! তা কান্না রুখতে হলে কিছু রসিকতার ছুতো তো চাই!

কল্যাণী এসব ছেঁদো কথা এড়িয়ে মোক্ষম প্রশ্নটিতেই ফিরে গেল, তুমি যে দ্বিতীয়বার রতনের দ্বারস্থ হবে না, সেটুকু জানি। কিন্তু কী করবে এখন? কী-ভাবে...

কথাটা শেষ করতে পারে না। তাতে বুঝতে কিছু অসুবিধা হল না মুরারীদার। গম্ভীর হয়ে বললে, সাইকেলে আসতে আসতে সে-কথাই ভাবছিলাম। সমাধান হয়ে গেছে। আমরা আবার জঙ্গীপুরেই ফিরে যাব। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া!'

—জঙ্গীপুর! অ্যাদ্দিন পরে? সেখানে কে আছে?

—খোদায় মালুম। খুব সম্ভবত নিমাই-নেতাই! গেলেই টের পাব।

নিমাই আর নিতাই মুরারীদার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। মুরারীদারা দুই ভাই, মুরারীই বড়। ছোট ভাই রমণীমোহনের ঐ দুটি পুত্র সন্তান। বছর আট-দশ আগেও নিমাই-নিতাই বিজয়ার পর জেঠা-জেঠিকে একখানা করে পোস্টকার্ড পাঠিয়ে বার্ষিক প্রণাম জানাত। ইদানিং সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মুরারীদা যখন দেশ ছেড়ে চলে আসে তখনও রমণী অবিবাহিত। বিমাতা জীবিতা। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। রমণী লায়েক হবার আগে মুরারীদা যখন যা পারে মানি-অর্ডার করে বিমাতাকে সাহায্য করেছে। তারপর ছোট ভাইয়ের বিয়েতে জঙ্গীপুরে গিয়েছে সস্ত্রীক। মায়ের শ্রাদ্ধেও গেছে, একা। সেও আজ বহুকাল হয়ে গেল। বিমাতা যতদিন জীবিতা ছিলেন—রমণী রোজগেরে হবার পরে—বছর বছর উল্টো পথে মানি-অর্ডার আসত। হিসাবমতো বাস্তু-সংলগ্ন দু-বিঘা জমির অর্ধেকের মালিক বিধবার সতীন-পো। সে জমিতে আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল বড় কম হয় না। তারই বার্ষিক ফলকরের অর্ধাংশ। ক্রমে সেটা বন্ধ হয়ে যায় ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর। ততদিনে নিমাই-নিতাই লায়েক। জ্যেঠাকে জানিয়েছিল—ইতিমধ্যে বাগান ভরে গেছে আগাছায় আর জঙ্গলে। কেউ আর ফলকর জমা নিতে চাইছে না। বাগান সাফা করতে হলে খরচ করতে হবে। মুরারীদা জবাবে জানিয়েছিল—'এই বুড়ো-বুড়ির দেহান্ত হলে গোটা বাগানটা তো তোমাদেরই বর্তাবে, তোমরাই উদ্যোগী হয়ে ওটা সাফা করাও। খরচপাতির অর্ধেক কেটে নিয়ে বার্ষিক ফলকরের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকুই পাঠিও।'

সে চিঠির আর জবাব আসেনি।

ইতিমধ্যে লোকমুখে শুনেছে—নিমাই-নিতাই দুজনেই বিবাহ করেছে। বাপের বৈমাত্রেয় দাদাকে সে-সব কথা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। এ নিয়ে মুরারীদাও এতদিন মাথা ঘামায়নি; আজ ঘামাতে হল।

কল্যাণী বলল, তাহলে কালই ওদের একখানা চিঠি লিখে দাও।

মুরারীদা হাসে। বলে, তোমার যেমন বুদ্ধি! সে চিঠির জবাব ওরা সাতজন্মেও দেবে না। পঁয়ত্রিশ বছর পরে এই দুই উট্‌কো আপদকে বরণ করে নিতে ওরা কি রসুন-চৌকি বসাবে ভেবেছ?

—তাহলে?

—কাল সকালের লালগোলাঘাট ধরে আমি নিজেই যাচ্ছি। সরেজমিনে তদন্ত করে আসি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম, নিমেটা ওখানে থাকে না—কাশীপুর গান-শেল ফ্যাকটারিতে কী একটা কাজ করে। নেতাই হয়তো আছে—সে কী করে ঠিক জানি না।

কল্যাণী একটু ভেবে নিয়ে বললে, যদ্দুর মনে পড়ছে পাঠশালা ঘরখানা বাদ দিলে ভেতর বাড়িতে ছিল দুটি চালা। নেতাই কি তার একখানা তোমাকে এককথায় ছেড়ে দেবে? বিশ্বাস হয়?

—বলা যায় না, গিন্নি। দিতেও পারে!

—তোমার মাথা খারাপ! সে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

—সেটাও সম্ভব। সে-কথাও ভেবে রেখেছি। সে-ক্ষেত্রে কী করব তাও ছকা আছে। সুশীলদাকে মনে আছে তোমার? সুশীল চাটুজ্জে?

—না। কে তিনি?

—ঠিক আমাদের সামনের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁদেরই পুকুরে চান করতে যেতে গো—মনে নেই? উকিলবাবু। নেতাই যদি আমাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেয়, তাহলে সুশীলদাকে আমমোক্তারনামা দিয়ে আসব। আমার ভাগের এক বিঘে জমি বেচে দেব। হয়তো সুশীলদা নিজেই কিনে নিতে চাইবেন। জঙ্গীপুর শহর চড়চড়িয়ে বেড়ে গেছে। আমাদের জমি এখন আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নয়, মিউনিসিপ্যালিটির ভেতর। এখন জমির দাম অন্তত দু-তিন শ টাকা—কাঠাপ্রতি। মানে, আমার

জমিটার দামই না হোক হাজার পাঁচেক! সেই হুমকিতে কাজ হলেও হতে পারে। ওরা তো জানে, তোমার-আমার অবর্তমানে ও জমি ওরাই পাবে।

কল্যাণীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এছাড়া আর কোনো পথ সে-ও দেখতে পেল না।

মুরারীদা বললে, কাল তোমার-আমার অরন্ধন। তা অসুবিধা হবে না। পাকা কাঁঠালের আধখানা আছে। মা লক্ষ্মীর বাতাসাও আছে। যা হোক করে একটা বেলা চালিয়ে নিও। আমি সন্ধ্যার কেষ্টপুর লোকাল ধরে ফিরে আসব।

* * *

জঙ্গীপুরে পৌঁছে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল মুরারীদা। আমূল বদলে গেছে সব কিছু। সাইকেলটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ব্রেক ভ্যানে নয়, ভেন্ডারের গাড়িতে। সে আমলে সাইকেলের জন্যে কোনও টিকিট কাটতে হতো না। অর্থাৎ, রেলের আইনে নয়, রেওয়াজে। ইদানিং যেমন এসব লাইনে মানুষের জন্যও টিকিট লাগে না। মানে, টিকিট কাটা হবে কিনা সেটা নির্ভর করে যাত্রীর মর্জির ওপর। অথবা স্পেশাল চেকিং হচ্ছে কিনা, এই খবরে। আগেকার দিনে স্টেশন চত্বরে সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকত ঘোড়ার গাড়ি—চার-চাকাওয়ালা দু-ঘোড়ার অথবা দু-চাকাওয়ালা এক ঘোড়ার। ইদানিং দেখা যাচ্ছে সাইকেল রিক্সার প্যাঁকপ্যাঁকানিতে স্টেশন চত্বর কলমুখরিত।

মুরারীদা মালকোঁচা সেঁটে রওনা দিল। সবই অচেনা মুখ, অচেনা মানুষ। কেউ তাকিয়েও দেখল না। কেউ ভ্রূর ওপর রোদ-আড়াল-করা হাতখানা রেখে বললে না 'চেনা-চেনা লাগছে যেন!'

যেখানে ছিল দরমার বেড়া-দেওয়া একচালা দোকান সেখানে সারি-সারি পাকা কোঠা। অসংখ্য দোতলা-তিনতলা বাড়ি উঠেছে ইতিমধ্যে।

রাধারমণ জিউর মন্দিরটা কিন্তু অপরিবর্তিত। ঠিক যেমনটি ছিল ওর বাল্যকালে। শুধু সে আমলে চত্বরটা ছিল ফাঁকা-ফাঁকা—এখন মন্দির ঘিরে অসংখ্য বিপণি। এমনকি বেশ কিছু সৌখিন দোকান। গ্লাসকেসে থরে থরে সৌখিন আবর্জনা সাজানো।

হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে পড়ল মুরারীদা। সাইকেলটা গচ্ছিত রাখল একটা ফুলওয়ালার জিম্মায়। জুতোজোড়াও খুলে রাখল তার কাছে। ছেলেটা একটা শালপাতায় মোড়া ফুলের ঠোঙা বাড়িয়ে ধরে বললে, সওয়া-পাঁচ আনা!

মুরারীদা বললে, ফুল পরে নেব, তুই আমাকে খানকতক শালপাতা দে তো?

—শালপাতা? কী করবেন দাদু?

—খাব। যা বলছি দে না। দাম দেব।

ছেলেটা অবাক মানে। শালপাতার গুচ্ছ হাতে নিয়ে এবার মুরারীদা এগিয়ে গেল সামনের একটা চায়ের দোকানে। বললে, আমাকে একটা মাটির ভাঁড় দিও তো ভায়া, চা চাই না। শুধু ভাঁড়।

এবারেও দোকানি অবাক হয়। বলে, কী করবেন দাদু?

দাদু! সবাই ডাকে 'দাদু'। তা খদ্দেরের বয়স যাই হোক। সে আমলে অপরিচিত খরিদ্দারকে সবাই বলত 'বাবু'; সম্মান দেখাতে 'বাবুমশাই'। দোকানি বললে, এখানে কাচের গ্লাসে চা সার্ভ করা হয়, দাদু। মাটির ভাঁড় এখানে পাবেন না।

মুরারীদা উদ্যোগী পুরুষ—শেষমেশ দশ নয়া দিয়ে দই-মিষ্টির দোকান থেকে একটা পঁচিশ-গ্রাম দই-এর—ইদানিং আবার সের-পোয়া বোঝে না কেউ—ভাঁড় নিয়ে টিউকলের দিকে এগিয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে এক ভাঁড় জল নিয়ে চলল রাধারমণ জিউ মন্দিরের দিকে।

হোক অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান—চিহ্নিত পাথরখানা ঠিকই খুঁজে বার করল সে। মন্দির সোপানের শেষ ধাপে, উত্তর-পশ্চিম কোণের দ্বিতীয় পাথরখানা। জল-কাদা পদচিহ্নে ধবধবে শ্বেত পাথরখানা ধূসরবর্ণের। মুরারীদা উবু হয়ে বসল নিচের ধাপে। ভাঁড় থেকে জল ঢেলে শালপাতা দিয়ে ঘষে ঘষে মর্মরফলকের মালিন্য ধুইয়ে দিল। অযুত-নিযুত ভক্তযাত্রীর পদচিহ্ন রেখার তলায় সাদা পাথরের ওপর কালো-আখরে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে উঠল ক্রমে।

মুরারীদার হাফ-প্যান্ট-যুগে—না, তারও আগে, ঘুন্সিযুগে, যখন সে নেংটু-বিশু-শিবেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলত, তখন এই পাথরখানা বসিয়েছিলেন তার টুলো পণ্ডিত পিতৃদেব—মাতৃস্মৃতিতে। হরে

নাপ্তের দরুন জমিটা বিক্রি করে। বারে বারে ভাঁড়ে করে জল এনে ঝকঝকে করে তুলল ক্রমে। দেখা গেল, ভক্ত পদচিহ্নের তলায় আজও অম্লান হয়ে আছে আখরকটা। অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' আর তার নিচে 'স্বর্গগতা জননী কাত্যায়নী দেবীর শান্তিকামনায় এই স্মৃতিফলক উৎসর্গীকৃত—অধম পুত্র শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মনঃ (রায়)'। তার নিচে : 'অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।'

মুরারীদা ঠিক মতো পড়তে পারছিল না। না, সাদা পাথরে কালো হরফগুলো যথেষ্ট বড় মাপের—বলা যায়, ছত্রিশ-পয়েন্ট, বোল্ড! সেজন্য নয়, চোখের জলে ওর ছানিপড়া চোখ দুটি তখন ভেসে যাচ্ছে যে। কোঁচার খুঁটে চশমাটা মুছে আবার নাকে চড়ালো। গড় হয়ে মাথা ঠেকালো সেই পাথরখানায়।

রাধারমণ জিউর মূর্তিতে কিন্তু তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তাঁর হাসিটিও অমলিন আছে অর্ধশতাব্দী ধরে।

*　　　*　　　*

স্তম্ভিত হয়ে গেল নিজের বাস্তুভিটেয় পৌঁছে। এ কাদের বাড়ি?

পীতাম্বর রায়ের লাল-টালি ছাওয়া পাঠশালা ঘরখানা নিশ্চিহ্ন—তার পিছনে পুব-দুয়ারী বাবামশায়ের শয়নকক্ষ সংলগ্ন ঠাকুরঘর, দক্ষিণ-দুয়ারী চালাঘর—কিচ্ছু নেই। তার পরিবর্তে সে জমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি দ্বিতল মোকাম। সামনে একচিলতে ফুলবাগান, গেট। ফলকে গৃহস্বামীর নাম লেখা : বিশ্বনাথ পাল। পূর্ব-জমানায় যেগুলিকে বলা হতো আমবাগান, বাঁশবাগান, কাঁঠালতলা—সেগুলি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করা হয়েছে। খান-চার-পাঁচ একতলা বাড়ি উঠে গিয়েছে সেই ভূতপূর্ব-উদ্যানে। মুরারীদা বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল—না, হারু ঘোষের ভিটেখানাও নিশ্চিহ্ন, নিশু আঢ্যির বাস্তুটাও বেপাত্তা। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে যাবে, অন্দরমহল থেকে শোনা গেল তীব্র সারমেয়-গর্জন।

থমকে গেল মুরারীদা।

সদর দরজা খুলে গেল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, খালি গা, পরনে লুঙ্গি, দূর থেকেই প্রশ্ন করেন, কাকে চাই?

মুরারীদা প্রতিপ্রশ্ন করে, ভেতরে আসব? কুকুর বাঁধা আছে?

ভদ্রলোক সদর দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন। পেছনে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে বললেন, আসুন। কাকে খুঁজছেন?

সাইকেলটা লক করে মুরারীদা এগিয়ে এল। বললে, নিতাই রায় বা নিমাই রায় কি এখানে থাকে?

—না তো! কোথা থেকে আসছেন আপনি?

মুরারীদা সে-কথার জবাব না দিয়ে জানতে চায়, আপনি রমণীমোহন রায়ের দুই পুত্র—নিতাই বা নিমাই-এর নাম শোনেননি?

ভদ্রলোক মুরারীদাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, শুনেছি। নিতাই রায় মারা গিয়েছেন, নিমাই রায় এখানে থাকেননা। আপনি কে?

—আমি ওদের জ্যেঠা। নিমাই কোথায় থাকে বলতে পারেন?

—ঠিক জানি না। শুনেছি, কাশীপুরের ওদিকে। জমি বেচে দেবার আগে থেকেই নাকি সেখানে থাকত।

—আপনি কি দু-বিঘে জমিই কিনেছেন?

ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন। বলেন, সে খোঁজে আপনার কী প্রয়োজন?

—না, মানে, গোটা দু-বিঘে জমি তো নেতাইয়ের ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ভদ্রলোক কী যেন আশঙ্কা করলেন। গম্ভীর হয়ে বলেন, অ। তা সে যাই হোক—ওরা কেউ এখানে থাকে না।

সদর খুলে উনি ভেতরে গেলেন। আবার তীব্র সারমেয়-গর্জন শ্রুত হল। কবাট বন্ধ হয়ে গেল।

মুরারীদা গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। চারিধারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। জননীকে তার মনে

পড়ে না, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির কেউ আজ তাকে চিনতেই পারছে না। সিন্ধু মোড়লের বাড়ির গায়ে ছিল ওদের গাব্বু। মার্বেল খেলার। গাব্বুটাতো ছাড়—সিন্ধু মোড়লের গোটা বাড়িখানাই বেপাত্তা। কিন্তু না, সুশীলদার সেই সাবেক দ্বিতল বাড়িখানা খাড়া আছে। পলেস্তারা খসে খসে কিছু হাড়-পাঁজরা বের হয়ে পড়েছে, এই যা। সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে সেদিকেই এগিয়ে আসে। সুশীলদার বাড়ির দেওয়ালে সেই মার্বেল-ফলকটাও অপরিবর্তিত। ইংরেজি হরফে লেখা : 'এস. কে. চ্যাটার্জি, অ্যাডভোকেট'। বারান্দায় গেঞ্জি গায়ে একটি যুবক ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ফতুয়া গায়ে বেঁটেখাটো মানুষটিকে এগিয়ে আসতে দেখে কাগজখানা নামিয়ে প্রশ্ন করে, কাকে চাই?

—উকিলবাবুকে।

—আমিই। বলুন?

—না, মানে আমি এস. কে. চ্যাটার্জী, অ্যাডভোকেটকে খুঁজছি।

—বললাম তো। আমিই। বসুন। বলুন?

মুরারীদা জমিয়ে বসল। এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। এ নিশ্চয় সুনীল, সুশীলদার বড় ছেলে। এতদিনে ওকালতি পাশ করে বাপের পসারটা নিয়ে জমিয়ে বসেছে। কৌতুকপ্রিয় মানুষটার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে এল। বললে, আপনি যে কায়কল্প করেছেন তা তো খবর পাইনি, চাটুজ্জেমশাই?

যুবক সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, মানে?

—বাঃ! আপনি আমার চেয়ে যে বছর-পাঁচেক বড়ই ছিলেন সুশীলদা! আপনার টাকে দিব্যি কুচকুচে চুল গজিয়েছে দেখছি!

যুবক দুরন্ত বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যায়। অস্ফুটে বলে, মুরারীকাকা?

—চিনেছ তাহলে! তুমি তো সুনীল? দাদা?

—সে তো বছরপাঁচেক হয়ে গেল। বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু আপনি, মানে...আপনি বেঁচে আছেন?

মুরারীদা প্রাণখোলা হাসি হাসে এতক্ষণে। বললে, এ তো দারুণ এক দার্শনিক প্রশ্ন! এখন আছি কি না জানি না—সকাল পাঁচটা বেয়াল্লিশ পর্যন্ত ছিলাম। গিন্নির মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা স্বচক্ষে দেখে এসেছি! ফিরে গিয়ে যদি দেখি তিনি থান পরেননি...

—কিন্তু মানে...কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্য তো বটেই! কীমাশ্চর্যমতঃপরম! এখনো আমরা বেঁচে আছি!

—তা নয় মুরারীকাকা, কিন্তু নিমাই যে আপনার ওয়ারিশ হিসাবে গোটা দু-বিঘেই বেচে দিল।

বিদূষককে কাঁদতে নেই; কিন্তু গম্ভীর হতে দোষ কী?

মুরারীদা বললে, সে কি জ্যাঠার শ্রাদ্ধও করেছিল?

—না, তা নয়; কিন্তু বাপের দরুন এক বিঘে আর জ্যেঠার ওয়ারিশ হিসাবে এক বিঘে, দু-বিঘেই যে রেজিস্ট্রি করে বিশু পালকে বেচে দিল!

—তোমার বাবা তখন বেঁচে?

—হ্যাঁ বায়নানামার পরে এ জমিতে একমাস নোটিস টাঙানো ছিল। আপনি রানাঘাটে কোনো ছাপাখানায় কাজ করেন শুনে বাবা সেখানেও লোক পাঠিয়েছিলেন। আপনার পাত্তা পাননি।

—স্বাভাবিক। আমি রানাঘাটে থাকি না। সে যা হোক, নিমু যখন জমিটা বেচে তখন কি নেতাই বেঁচে?

—না কাকা, নিতাইদা তার আগেই মারা যায়।

—তার সন্তানাদি?

—হয়নি।

—তা নেতাইয়ের বিধবা বউ কি জমি-বিক্রি টাকার অর্ধেক পেয়েছিল?

—তা তো জানি না। কেন বলুন তো?

ম্লান হাসল মুরারীদা। বলল, নেতাইয়ের বউকে আমি দেখিনি। নামও জানি না। তবু সে এ বংশেরই বধূ তো! পীতাম্বর রায়ের নাত-বৌ! সে হতভাগী তার ন্যায্য পাওনাটা পেয়েছে জানলে, একটু সান্ত্বনা পেতাম, এই আর কি।

সুনীল সোজা হয়ে বসে। বলে, না, মুরারীকাকা! এতবড় তঞ্চকতা আমি সহ্য করব না। আপনি একটা কেস ঠুকে দিন!

—অভিসম্পাত দিচ্ছ?

—অভিসম্পাত?

—নয়? লোকে তো শাপশাপান্ত করতেই বলে, 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক!' —আর তাছাড়া মামলা লড়ার সামর্থ্যই কি আমার আছে ছাই?

সুনীল উঠে দাঁড়ায়। সে রীতিমতো উত্তেজিত। বারান্দায় বারকয়েক পায়চারি করে। বাঁ-হাতের তালুতে ডান-হাতে মুষ্ট্যাঘাত করে। তারপর ফিরে এসে মুরারীদার হাত দুটি তুলে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, কাকা, আপনাকে এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। আপনি আমাকে 'স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দিয়ে যান। আজই। আমি দেখে নেব! সব খরচপাতি আমার। মামলা জিতলে আপনার যা মন চাইবে আমাকে আশীর্বাদী দেবেন।

—আর হারলে?

—সে আমার দায়।

—আর জিতে যদি তোমাকে লবডঙ্কা দেখাই?

সুনীলের হঠাৎ খেয়াল হল—দুরন্ত বিস্ময়ে এতক্ষণ তার মুরারীকাকাকে প্রণাম করা হয়নি। পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, সে আপনার হিম্মতে কুলাবে না, মুরারীকাকা। আমি জানি। অতটা 'moral courage' আপনার নেই। আপনি যে দা'ঠাকুরের চেলা!

হঠাৎ মুরারীদার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। জন্মভূমির একটি মানুষ অন্তত তাকে চিনতে পেরেছে! চশমাজোড়া খুলে কোঁচার খুঁটে মুছে নেয়।

সুনীল রহস্য করে বলে, এ কী মুরারীকাকা? আপনার চোখে জল? বিদূষকের চেলার নাকি কাঁদতে নেই?

এবার হেসে ফেলে। বলে, ওটা তোদের ভুল ধারণা রে সুনীল। বিদূষকের কাঁদতে নেই—দুঃখে। আনন্দেও যদি না কাঁদব তবে ভগবান চোখের কোলে এ আপদ পয়দা করবেন কেন, বল্? জঙ্গীপুরে আসার পর এই প্রথম তাঁর নাম শুনলাম তো! আর তাছাড়া 'moral courage'-এর যে ইন্টারপ্রিটেশান দিলি, সেটারও অভিনন্দন করা দরকার!

—তাহলে?

—না রে। আমি রাজি নই। ভেবে দেখ, বিশ্বনাথ পাল তো অন্যায় কিছু করেননি।

—কিন্তু নিমাই রায়? সে কেন হলপ নিয়ে বলল, তার জ্যেঠা মৃত?

মুরারীদা শুধু বললে : ছি!

সুনীল বুঝতে পারে—বংশের এ কলঙ্কের কথা মুরারীদা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। বললে, তাহলে মুখ বুঁজে সয়ে যাবেন?

—তুই আমার একটা উপকার করবি সুনীল?

—বলুন, কাকা?

—খর্চাপাতি দেবার সামর্থ্য আমার নেই। তবে তোর বাবা, সুশীলদা এককালে ঁপীতাম্বর রায়ের পাঠশালায় পড়েছিলেন—মনে কর এটা তাঁর হয়ে তোর গুরুদক্ষিণা—

—বলুন না খুলে?

—খোঁজ নিয়ে দেখ, নেতাই-এর বিধবা তার ন্যায্য পাওনা পেয়েছে কি না। না পেয়ে থাকলে আমার নামে নিমুকে হুমকি দে। ঁঠাকুর কেউটে সাপকে 'ছোঁবল' দিতেই বারণ করেছিলেন। ফোঁস করতে দোষ কী?

সুনীল এককথায় রাজি হয়ে গেল।

অনুরোধ করল তার বাড়িতেই মধ্যাহ্ন আহারটা সারতে।

রাজি হল না মুরারীদা। বললে, আজ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর একটা ব্রত চলছে—অরন্ধনের। তবে চা-টা খাব। বৌমাকে বল।

*　　　　*　　　　*

কেষ্টপুর-লোকাল থেকে সাইকেলটা নামিয়েই নজর হল প্ল্যাটফর্মে ঋদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে।

—কী রে? তুই স্টেশানে? এ ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছিস?

—না দাদু, তোমাকে রিসিভ করতে এসেছি।

—আমাকে রিসিভ করতে? তা ফুলের মালা কই? ব্যান্ডপার্টি কই?

—আগে বাড়িতে চল, ফুলের মালা নিয়ে তোমার বৌঠান বসে আছে!

—মানে?

—দিদা তোমার ওপর ক্ষেপে ব্যোম! বলেছে, ধরে আনতে না পারলে বেঁধে আনিস!

—যা ব্বাবা! তা আমি যে এ ট্রেনে ফিরব তা জানলি কী করে?

—বাড়িতে চল, সব শুনবে।

মুরারীদা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে—সন্ধ্যা পাঁচটা সাতান্নর কেষ্টপুর লোকালটা চলে যাবার আধঘন্টার মধ্যে সে যদি সাইকেলে চেপে বাড়িতে না পৌঁছায় তাহলে ঋদ্ধির বেতো-দিদা মাথা কুটতে শুরু করবে।

ঋদ্ধি বলে, করবে না। ছোট দিদাও জানে, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে স্টেশনে আসব।

অগত্যা। দুজনে দুটি সাইকেল নিয়ে রওনা দিল হাইস্ট্রিটের দিকে। ওকে পৌঁছে দিয়েই ঋদ্ধি হাওয়া। রতনের মা খুব বকাবকি করলেন মুরারীকে : সাপের পাঁচ-পা দেখেছ তোমরা? আমি কি মরে গেছি?

তাঁর একটা অভিযোগের কৈফিয়ত সত্যিই দিতে পারল না মুরারীদা : বৌঠানের পায়ের ধুলো না নিয়ে, বৌঠানের দেওয়া বিল্বপত্র পকেটে না গুঁজে সে কেন ট্রেনে চাপে?

বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল মা-জননীর কাছে। শোনা গেল, কাল রাত্রেই প্রেস থেকে বংশী এসে দুঃসংবাদটা দিয়ে যায়। আজ সকালেই শাশুড়ির হুকুমে সুছন্দা ঋদ্ধিকে সাইকেলে করে পাঠিয়েছিল মুরারীদাকে ধরে আনতে। কিন্তু ঋদ্ধি তার দেখা পায়নি। তার আগেই মুরারীদা ট্রেন ধরতে রওনা হয়ে গিয়েছে। কল্যাণীর কাছে খবর পাওয়া গেল, সন্ধ্যার পাঁচটা সাতান্নর লোকালে মুরারীদা ফিরবে। টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে কল্যাণী নাকি জানিয়েছিল—ওদের স্বামী-স্ত্রীর কী একটা অরন্ধনের ব্রত আছে—সূর্য ডোবার পর খাবে।

সুছন্দা আরও জানায়—তারপর সে টিফিন-কেরিয়ারে করে দুজনের রাতের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। মুরারীদাকে আশ্বস্ত করে, রান্নাবান্না সব করেছে বামুনদি। কোনো ছোঁয়াছুঁয়ি হয়নি। তাছাড়া ঋদ্ধি নয়, খাবারটা পৌঁছে দিয়ে এসেছে পাঁড়েজী।

মুরারীদা অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মা-জননীর দিকে। কণ্ঠমণিটা বারকতক ওঠানামা করল শুধু।

সুছন্দা বলে, আজ আপনি সারাদিন অভুক্ত আছেন। যান, বাড়ি যান। কাকিমাও আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই একবার সুবিধা করে আসবেন কাকু। আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

মুরারীদা ইতিউতি দেখে নিয়ে বললে, ফিরে গিয়ে যখন উনুন ধরাতে হচ্ছে না, তখন বখেড়াটা চুকিয়েই যাই। চল, তোমার ঘরে চল। শুনি তোমার গোপন কথাটা। সুছন্দা ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। রতনের ঘর নয়, তার নিজের শয়নকক্ষে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ঋদ্ধির ব্যবহারে ইদানিং আমি কেমন যেন একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখছি কাকু। ওঁকে বলিনি—জানেনই তো, ওঁর চণ্ডালে রাগ...

—অমঙ্গলের ছায়া? প্রেম-ট্রেম?

—না, না, সেসব কিছু নয়। আপনি যতীনের কথা শুনেছেন? যতীন সোম?

যতীন সোম এখন বিখ্যাত। অনেকদিন পর এই মফঃস্বল থেকে একটি ছেলে হায়ার-সেকেন্ডারিতে প্রথম দশজনের একজন হয়েছে। তার চেয়েও অবাক করা খবর—সে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে যায়নি। মুরারীদা বললে, যতীন? না! কী?

—যতীন অ্যাবস্কন্ড করেছে। পুলিসে খুঁজছে তাকে।

মুরারীদা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, সে তো হীরের টুকরো ছেলে! সে তো কোন অন্যায় করবে না। কী চার্জ তার বিরুদ্ধে?

—রাষ্ট্রদ্রোহিতা। যতীন 'নকশাল' হয়ে গেছে!

শব্দটা অচেনা নয়। সংবাদপত্রে নিত্য বার হচ্ছে বিচিত্র সব খবর। খ্যাপা হাওয়া উত্তর বাঙলা থেকে কলকাতা হয়ে এই মফস্বল সদর-শহরেও এসে পৌঁচেছে। মায়, কাগজে ছবিও বার হয়েছে—কলেজ-স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির...

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মুরারীদার। বললে, ঠিক আছে মা, আমি খবর নেব। চোখে-চোখে রাখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তো আছি—

মুরারীদা উঠে দাঁড়ায়। যেতে গিয়েও কী ভেবে হঠাৎ ফিরে আসে। বলে, একটা কথা মা-জননী—

—বলুন?

—ঋদ্ধির পাশের খাওয়াটা আমার পাওনা আছে। একদিন বুড়ো-বুড়ি এ বাড়ি এসে পাত পেড়ে খেয়ে যাব কিন্তু।

সুছন্দা অবাক হয়। সামলে নিয়ে বলে, নিশ্চয়ই। বলুন? কবে আসবেন?

—যেদিন তোমার সময় হবে। তবে একটা শর্ত আছে।

—শর্ত! কী শর্ত?

—তোমাকে নিজে হাতে পরিবেশন করতে হবে!

সুছন্দা স্তম্ভিত। বলে, আপনি, মানে, আমার ছোঁওয়া খাবেন?

কৌতুক চিকচিক করে ওঠে বৃদ্ধের ছানিপড়া চোখ দুটোয়। নিজের অজান্তেই হঠাৎ 'তুমি' ছেড়ে 'তুই'-এ নেমে আসে। যেন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বললে, না তো কী? তুই কি ভেবেছিলি—দা'ঠাকুর আমাকে হাতে ধরে তালিম দিয়েছিলেন—ছুঁৎমার্গে?

* * *

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন মুরারীদা রাজনীতি নিয়ে কিছুটা মাথা ঘামাতো। একবার জঙ্গীপুর সংবাদ প্রেস থেকে দা'ঠাকুরকে লুকিয়ে বিপ্লবীদের কিছু গোপন প্রচারপত্র ছাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। শেষমেশ ধরা পড়ে যায়। পুলিসের কাছে নয়, প্রেস-মালিকের কাছে। দাদাঠাকুর ওকে মারতে বাকি রেখেছিলেন। 'আর কখনো করব না' বলে ক্ষমা চেয়েও বেচারী নিষ্কৃতি পায়নি। দাদাঠাকুর রেগেমেগে ছাপানো কাগজের পুলিন্দাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই ওকে বলেছিলেন, যা! এক্ষনি বিদায় হ! তোর মুখদর্শন করব না।

মুরারীদা এতটা আশঙ্কা করেনি। বুঝতে পারেনি—এই অপরাধে উনি ওকে একেবারে চিরকালের জন্য বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন—ঐ ঝড়-বাদলের রাত্রে।

অবাক হয়ে বলেছিল, বিদায় হব? এই ঝড়ের মধ্যে?

—হবে না? ভোর রাতে প্রেস যদি সার্চ হয়? যাও! কোথায় তোমার স্যাঙাৎরা বন-জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তাঁদের হাতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এস! আমারই হয়েছে জ্বালা! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুষেছি! আর, সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে যেও তাঁদের জন্যে। যত্ত সব...।

ততক্ষণে বুঝতে পেরেছিল মুরারীদা। গুরু তাকে তিরস্কার করছেন না—ঝড়-বাদল মাথায় করে ওকে ঘরের বার করে দেবার অন্য উদ্দেশ্য আছে তাঁর।

তা, সেসব অনেক-অনেক কাল আগেকার কথা। তারপর ভারত স্বাধীন হয়েছে। মুরারীদা ইদানিং রাজনীতির ধারে-কাছে নেই। খবরের কাগজও রোজ পাতা উল্টে দেখে না।

কিন্তু খবরের কাগজ না পড়লেই কি রেহাই পাবে? খবরের কাগজ তো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। হরফও স্মল-পাইকা—আট থেকে দশ পয়েন্ট! কিন্তু গোয়াড়ি-গঞ্জে পথেঘাটে দেওয়াল-লিখন না পড়ে যাবে কোথায়? একটা পয়সা খরচ নেই, চোখ তুললেই নজর পড়ে। বিঘৎ-আকারের বড় বড় হরফ : 'নকশালবাড়ি লাল-সেলাম।' আচ্ছা 'সেলাম' তো একটা ক্রিয়াপদ! যেমন 'গান-গাওয়া।' 'লাল-গানে নীল-সুর' হয়—কোথায় যেন পড়েছে। তাই বলে 'সেলাম' কখনো লাল হয়! মাথা খারাপ

ছোঁড়াগুলোর। পড়াশুনার ধারে-কাছে নেই! কিন্তু! যতীন ছোঁড়া তো জলপানি পাওয়া ছেলে! ঋদ্ধিও পড়াশুনায় দারুণ দড়। ওরা কেন ভাষা নিয়ে এই সব যথেচ্ছাচার করে : লাল সেলাম! তার চেয়েও আর একটা আজব স্লোগান : 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'

কোনো মানে হয়? চীন একটা ভিন্ন দেশ। ভারতের উত্তরে। মাঝখানে খাড়া আছে মহা-হিমালয়। এ তোমার বনগাঁ বর্ডার নয়, যে এক-পা ভারতে এক-পা পূর্ব-পাকিস্তানে রেখে বলবে : 'পা-ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি!' সেই হিমালয়-ডেঙানো চীন দেশের চেয়ারম্যান হয়ে গেল তোদের চেয়ারম্যান! এবার কোনদিন বলে বসবি : পরশির বাবা আমার বাবা!

পাগল সব! বদ্ধ উন্মাদ!

পরদিন মুরারীদা যখন তার নির্দিষ্ট টুলে গিয়ে বসল, হাজরির খাতাখানা টেনে নিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে সই দিল, তখন কেউ আপত্তি করেনি। তার পরদিন ঋদ্ধি নিজে থেকেই দেখা করতে এল। প্রেস তখন ছুটি হয়ে গিয়েছে। কর্মীরা সবাই চলে গিয়েছে। মুরারীদা এক-হাতেই সব বন্ধ-ছন্দ করে ঝাঁপ ফেলার আয়োজন করছে। রাত তখন আটটা। হঠাৎ ঋদ্ধির আবির্ভাবে একটু অবাক হয়। বলে, তুই এ সময়? কিছু বলবি?

—হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম দাদু।

—বল?

—শোন। রোজ কলেজ-ফের্তা আমি প্রেসে আসব। তুমি যেগুলোর প্রিন্ট-অর্ডার দিয়েছ তা বান্ডিল বেঁধে রেখে দেবে। আমি নিয়ে যাব। পরদিন কলেজ যাবার পথে আবার তোমাকে দিয়ে যাব। বুঝলে?

মুরারীদা অবাক হয়ে বলে, মানে?

—প্রুফ-দেখা ব্যাপারটা আমি শিখে ফেলেছি, দাদু। সুবল-মিত্তিরের অভিধানের পেছনেই তো নিয়মগুলো আছে। তবে তোমার-আমার এ গোপন-ব্যবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। শীতকাল পর্যন্ত। এই শীতে তোমাকে ছানিটা কাটাতে হবে! ভয় কী? কত লোকই তো ছানি কাটাচ্ছে।

মুরারীদার চোখে জল এসে যায়। বলে, অপারেশনের ভয়ে নয় রে দাদু। চোখ কাটাতে হলে আমাকে তিন-চারদিন শুয়ে থাকতে হবে। তোর দিদা—

—কেন আমরা কি সব মরে গেছি?

—ষাট বালাই। তবে তোর কথা শুনতে পারি, যদি তুই আমার কথা শুনিস!

—তোমার কোন কথাটা কবে আমি শুনিনি দাদু?

—তাহলে কথা দে, যতীনদের সঙ্গে তুই কোনও সম্পর্ক রাখবি না।

ঋদ্ধি অবাক হয়ে গেল। পেছন ফিরে দেখে নিল শ্রুতিসীমার মধ্যে কেউ আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, কেন দাদু? যতীন কি খুব খারাপ ছেলে?

—না, তা নয়। কিন্তু ওরা যেসব কাণ্ডকারখানা করছে, তা তো ভাল নয়।

—তুমি জান, যতীনরা কী করছে, কেন করছে?

—না, জানি না। কিন্তু সবাই তো বলছে সে-সব কাজ খারাপ! যাঁরা আমার মতো অশিক্ষিত নন, যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরাও তো সে-কথা বলছেন!

—একটা কথার জবাব দাও তো দাদু। তুমি যখন জঙ্গীপুর-সংবাদের প্রেসে লুকিয়ে-লুকিয়ে বিপ্লবীদের জন্যে গোপন লিফ্‌লেট ছাপতে তখন দেশের যাঁরা জ্ঞানী, পণ্ডিত তাঁরা কী বলতেন?

—সে-কাল আর এ-কাল? তখন দেশ পরাধীন ছিল। আর তাছাড়া সে-আমলের বিপ্লবীরা তো দেশনেতাদের মূর্তি ভাঙতে চায়নি।

ঋদ্ধি একটু ভেবে নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে একদিন কথা বলব, দাদু। পরের মুখে ঝাল খেও না। নিজে শোন, নিজে দেখ। আমার বিশ্বাস, তারপর তুমি নিজেই একদিন আমার হাতে নিষিদ্ধ পুঁটলিটা তুলে দিয়ে ঝড়-বাদলের রাতে আমাকে খোলা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলবে, 'যা! এখ্খুনি বিদায় হ! তোর মুখদর্শন করব না!'

মুরারীদা কী জবাব দেবে বুঝে ওঠার আগেই ছেলেটা হাওয়া!

তারপর থেকে ঋদ্ধি সকাল-সন্ধ্যা দু-বার করে প্রেসে আসে। প্রুফ নিয়ে যায়, দিয়ে যায়—কিন্তু ঐসব গোপন কথা আলোচনার সুযোগ হয় না।

মাসকয়েক কেটে গেল এভাবে।

মুরারীদা ঋদ্ধির বন্ধু-বান্ধবদের বাজিয়ে দেখেছে। কল্যাণ, সুখময়, দিব্যেন্দু। তারা কেউ মুখ খোলেনি। কে যে ওদের দলে আছে, কে নেই, তা বোঝা যায় না।

যতীনের পাত্তা সে পায়নি। যতীনের বাড়িতেও গিয়ে খোঁজ নিয়েছে। তাঁরাও কিছু জানেন না। কোনো চিঠিপত্র পাননি তাঁরা। যতীন যেন হাওয়ায় মিশে গিয়েছে। বেঁচে আছে কিনা তাই জানে না কেউ।

ঋদ্ধি নিজেও যে কতটা জড়িয়ে পড়েছে তা বোঝা গেল না। সুছন্দার সঙ্গে এর মধ্যে একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল। যেদিন দত্তবাড়িতে ওর মধ্যাহ্ন-আহারের নিমন্ত্রণ হল। সেদিন রত্নেশ্বর ঘটনাচক্রে কলকাতায়। অথবা কে-জানে সুছন্দা বোধকরি সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন। কিন্তু সে দিন এ-সব কথা নিয়ে মা-জননীর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়নি।

একদিন সুযোগ করে মুরারীদা গিয়ে হাজির হল করুণাময়বাবুর ডেরায়। অধ্যাপক করুণাময় মজুমদার পণ্ডিত ব্যক্তি। অমায়িক। জিজ্ঞাসুকে কখনো বিমুখ করেন না। মুরারীদার প্রশ্নে একটু বিস্মিত হলেন—কিন্তু সে কেন এসব কথা জানতে চায়, তা জিজ্ঞাসা করলেন না। মুরারীদার বোধগম্য ভাষায় তদানীন্তন বঙ্গ-রাজনীতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। এবং বিশ্লেষণও।

বললেন, ওদের সব ক্রিয়াকর্মে আমার অনুমোদন নেই, মুরারীবাবু। কিন্তু এ-কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, ওদের দলে 'টুকে-পাস করা' ছাত্র নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক হীরের টুকরো ছেলে হঠাৎ এ-পথটা বেছে নিল কেন? কী তাদের বক্তব্য? কেন ওরা বলছে—এ আজাদী ঝুটা, এই ভোটাভুটি নিরর্থক?

—তাই বলে ওরা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নেতাজীর মূর্তি...

বাধা দিয়ে করুণাময় বলে ওঠেন, মুরারীবাবু, তোমার ঘাড়ে যদি একটা টিকটিকি বা আরশোলা পড়ে তাহলে তুমি লাফিয়ে উঠবে! যত জোরে হাত-পা ছুঁড়বে অতটা জোর খাটানো অযৌক্তিক! নয় কি? আর সে সময় তোমার হাতের ধাক্কা লেগে যদি একটা চীনেমাটির সুন্দর ফুলদানি চুরমার হয়ে যায় তাহলে দোষ কার?

মুরারীদা কিছুই বুঝতে পারে না। এখানে তেলাপোকাই বা কে? আর ফুলদানিটাই বা কী?

করুণাময় বলেন, আমার ধারণা—ওদের দলের সকলেই এই মূর্তি-ভাঙার প্রোগ্রামটা অনুমোদন করে না। যারা করে, যে ছেলেটি নিজে হাতে ঐ মূর্তি ভেঙেছে—খোঁজ নিলে হয়তো দেখবে সেও ইউনিভার্সিটির এক উজ্জ্বল রত্ন। ঐ বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের ওপর প্রবন্ধ লিখে সে রেকর্ড-মার্কের অধিকারী! তাহলে সে কেন এ কাজ করল? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা নেতাজীকে সে ছেলেটি হয়তো তোমার-আমার চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে!

—তা হলে সে ও-কাজ করল কেন?

—যেহেতু সে মনে করে ঐ মূর্তিগুলিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে একদল রাজনৈতিক নেতা আমাদের মোহগ্রস্ত করে রাখতে চান! তারা দেশ শাসনের নামে দেশ শোষণ করছে, আর বৎসরান্তে ঐ মূর্তির গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আমাদের বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত করছে!

—তার মানে ওদের ঐ-সব কাজ আপনি সমর্থন করেন?

—না! নিশ্চয় নয়! হাজারবার নয়! লক্ষবার নয়! আমি শুধু ওদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, মুরারীবাবু।

ওর মাথায় কিছুই ঢুকল না। কিন্তু সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। না হলে জুৎসই রসিকতা একবারও করতে পারল না কেন?

* * *

বছরখানেক পরের কথা।

যেবার ওর সত্যিকারের চাকরি গেল। যেবার বরখাস্তপত্রটি মুরারীদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে রতন দত্ত

অগ্রিম সাবধানবাণী শুনিয়েছিল : আপনার বৌঠানের কাছে গিয়ে আবার দরবার করবেন না যেন। হুকুম এবার নড়বে না। বুয়েছেন?

যতীন এখনো ফেরার। ঋদ্ধি সকাল-সন্ধ্যা প্রেসে হাজিরা দেয়। কলেজে ক্লাসও করে। তবে বছরে ক'টা দিনই বা ক্লাস হয়? নিত্যি ত্রিশদিন হাঙ্গামা লেগে আছে—ধর্মঘট, বন্‌ধ্ আর ঘেরাও। শুধু এই স্থানীয় কলেজে নয়, সর্বত্র। গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

এবারেও সেই একই অপরাধ। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি। মাত্রাতিরিক্ত আর একটা রসিকতা! এবার কলেজ ম্যাগাজিন নয়, সামান্য একটা বিয়ের পদ্য। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ছেলের বিয়ে। যোগেন্দ্রনাথ এই মফস্বল শহরের এক বিখ্যাত ব্যক্তি—স্থানীয় বার-এর শুধু প্রাচীনতম নয়, সবচেয়ে পসারওয়ালা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। বিয়েটা শুক্রবার। সোমবার তিনি নিজে এসে পদ্যটা ছাপতে দিয়ে গেলেন।

চৌধুরীমশাই এককালে পদ্য-টদ্য লিখতেন। মফস্বল পত্রিকায় তা ছাপাও হয়েছে। বহুদিন লেখেননি। এবার জজ-সাহেবের কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থির হওয়ায় তাঁর কাব্য-প্রতিভা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেটা স্বাভাবিক—যৌতুকের পরিমাণটা কবিতা লেখার প্রেরণা-জাগানো! পুত্রবধূকে সম্বোধন করে উনি একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। অন্ত্য-মিল-ওয়ালা। ঐ যাকে বলে মিত্র-অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

মুরারীদার প্রতিশ্রুতিমতো ম্যানেজার কথা দিয়েছিল—বিবাহের দিন সকালে, শুক্রবারে সকাল সাতটার মধ্যে ছাপানো বিয়ের পদ্য ডেলিভারি দেওয়া হবে—বরযাত্রীরা আটটা দশের লোকাল ধরতে রওনা হবার আগে।

হৈ-হৈ করে ছাপা হয়ে গেল পদ্যটা। মুরারীদা প্রুফ দেখল। ঋদ্ধি ক'দিন ধরে না-পাত্তা। সে যে কখন কোথায় যায় টের পাওয়া যায় না। তাই তাকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া গেল না।

পদ্যের বান্ডিল বাঁধা হল, সময়মতো পৌঁছেও দেওয়া হল—কিন্তু জজবাড়ি, বিবাহ-বাসরে তা বিলি করা গেল না। বান্ডিল বাঁধা প্যাকেটগুলো ফিরে এল প্রেস-এ। উপায় নেই। ছাপাখানার ভূতের নৃত্যটা সেই 'গুপী-বাঘা'র ভূতের রাজার নাচকেও হার মানায়। ছানি-চোখো ভূতের রাজার তাণ্ডবটা!

টাইপ বসাতে বসাতে শম্ভুচরণ জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু, চৌধুরীমশাই এটা কী লিখেছেন বলুন তো?

মুরারীদা জানতে চায়, কী লিখেছেন? পড়ে শোনাও?

—'বরিবারে আসিয়াছ পুত্রেরে আমার।' তা 'বরিবার' মানে কী?

মুরারীদা তখন অন্য একটা প্রুফ নিয়ে ব্যস্ত। বলে, ফুট্‌কিটা সরে নড়ে গেছে আর কি। 'বরিবার' বলে তো কোনও 'বার' নেই, ওটা 'রবিবার' হবে।

গ্যালি প্রুফে তাই ছিল। পরে মুরারীদা বিবেচনা করে দেখে। কবি 'বার' নিয়ে একটা বাড়াবাড়ি রকমের গড়বড় করেছেন। বিয়ে হচ্ছে শুক্রবার, বৌভাত পরের সোমবার। এর মধ্যে রোব্বার আসে কোথা থেকে? সেটা তো কালরাত্রি! নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো মুরারীদা পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে 'শুক্রবার' বসিয়ে দিল। লাইনটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো; 'শুক্রবারে আসিয়াছ পুত্রেরে আমার।'

তাও না হয় ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু ব্লকটা?

ম্যানেজার ওভারটাইমের বন্দোবস্ত করে বাড়ি যাবার আগে বলে গেল, পদ্যের মাথায় জোড়া হাতের ব্লকটা দিতে ভুলবেন না যেন।

মুরারীদা বলে, মনে আছে ভায়া। ঠিক ম্যানেজ করে দেব।

গ্যালি ভাঙার পরেই ব্লকটার দরকার। বিয়ের পদ্যে বহুবার ব্যবহৃত ব্লক। দুটি হাত। একটিতে রিস্টওয়াচ, অপরটিতে মকরমুখী বালা। তার ওপর দিয়ে একটা গোড়ে মালা আর নিচে একটি পেরজাপতি।

কিন্তু কোথায় গেল ব্লকটা? খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। ইতিমধ্যে ধ্রাশ্ করে লোড-শেডিং হয়ে গেল। শম্ভুচরণ বললে, দাদু, এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাওয়া যাবে না। কাল দিনের আলো ফুটতেই এসে যাব। চারশ কপি ছাপতে তো আধঘন্টাও লাগবে না।

মুরারীদা ধমক দিয়ে ওঠে। বলে, ওটি হচ্ছে না! দেশলাই-মোমবাতি নিয়ে আয়। আজ রাতেই ছাপা শেষ করতে হবে।

শম্ভুচরণ বলে, আমি কথা দিচ্ছি—সব দায় ঝক্কি আমার। কাল সকালে নিশ্চিত ডেলিভারি দেব। সকাল সাতটার আগেই।

—কিন্তু আমি যে ম্যানেজারকে কথা দিলাম, আজ রাতেই ছাপা শেষ করে রাখব!

—আপনার কী দোষ? আপনি কি জানতেন এমন বেমক্কা লোড-শেডিং হয়ে যাবে?

—দা'ঠাকুর কি জানতেন, বন্যায় রেল-লাইন ভেসে যাবে?

শম্ভুচরণ সিনেমাটা দেখেছে। দাদাঠাকুর হাঁটা পথে জলকাদা ভেঙে স্কুলের প্রশ্নপত্র সময়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বললে, কখন কারেন্ট আসবে কে জানে! মুশকিল হয়েছে—বাবলুটার জ্বর দেখে এলাম কিনা সকালে—

একটু হকচকিয়ে যায় মুরারীদা। নিজে নিঃসন্তান, কিন্তু ছেলের অসুখে বাপের মনটা যে কেমন করে তা বুঝবার মতো অনুভূতিটুকু আছে ওর ঐ ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতিতে। বলে, বাবলুটা আবার জ্বরে পড়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ দাদু। টাইফয়েডে না দাঁড়ায়।

—তবে যা। আমি একাই ম্যানেজ করে দেব। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কারেন্ট এসে যাবে।

আসেনি। তবে মোমবাতির আলোয় হাৎড়ে হাৎড়ে ব্লকটি খুঁজে বার করে। 'সেট' করে। লোড-শেডিং মিটলে নিজেই মেশিন চালিয়ে চারশ কপি ছেপে ফেলে। পঞ্চাশ করে গুনতি করে আটটি বান্ডিল বেঁধে রেখে দেয়। যাতে কাল সকালে শম্ভু এসে তড়িঘড়ি পৌঁছে দিতে পারে।

মরাকাটা ঘর পার হয়ে যখন বাড়ি পানে চলেছে তখন মফস্বলের রাত নিশুতি।

পরদিন বোঝা গেল কাণ্ডটা। ছানি-পড়া চোখে মোমবাতির আলোয় যে ব্লকটা মুরারীদা ব্যবহার করেছে, সেটা মেথিলেটেড-স্পিরিটের বোতলে লেবেল মারার কাজে লাগে। হাত নয়, দুটি হাড়। গোড়ে মালা নয় ওটা : স্কাল! কাল রাতে যেটাকে 'পেরজাপতি' বলে ঠাওর হয়েছিল সেটা সাবধানবাণী : পয়জন!

সবচেয়ে মারাত্মক হল রসিকতা। চৌধুরীমশাই যখন দক্ষযজ্ঞ বাধাবার উপক্রম করছেন তখন মুরারীদা গরুড়পক্ষীর মতো হাত দুটি জোড় করে বলে বসল : ওটা ভুলে-ভাট্রে হয়ে গেছে চৌধুরীমশাই। লোড-শেডিং-এর আঁধারে। তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু এককাঠি ওপরে উঠেছি। হাতে-হাতে মেলাবার কথা—আমি হাড়ে-হাড়ে মিলিয়ে দিয়েছি!

ঐ রসিকতাটাই শেষ ছোঁবল!

চাকরিটা চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল!

* * *

আশ্চর্য! চাকরি নেই, হাজরির খাতায় সই দিতে দেওয়া হয়নি, তবু পরদিন সকালে দেখা গেল মুরারীদা টুম টুম হয়ে বসে আছে তার সাবেকি টুলে। গ্যালিপ্রুফ দেখছে একমনে।

উপায় কী? কল্যাণীকে বলা যায়নি—জঙ্গীপুরের ভিটেয় এখন বিশুঘুঘু চরছে! নেতাই ফৌৎ হয়েছে একথা বলেছে, কিন্তু নিমু যে আদালতে দাঁড়িয়ে জ্যেঠার আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে সেটা জানাতে পারেনি। সান্ত্বনা এটুকু যে, সুনীল ইতিমধ্যে জানিয়েছে নিমুর কাছ থেকে আদায় করে নেতাইয়ের বিধবাকে সে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছে।

সুনীলের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে নেতাইয়ের বিধবা জেঠাইমাকে একটি পোস্টকার্ডও লিখেছে। যে জেঠ্‌শাশুড়িকে সে চেনে না, চোখেও দেখেনি কোনদিন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে মেয়েটি আঁকাবাঁকা হরফে আবোলতাবোল কী-সব লিখেছে! ভাগ্যে পোস্টকার্ডখানা কালীতারা প্রেসের ঠিকানায় আসে, তাই কল্যাণীর হাতে পড়েনি। মুরারীদাই সেটা পড়েছে। কল্যাণীকে না জানিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। কী দরকার বুড়িটাকে জানানো—নিমাই আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ খেয়ে স্বীকার করেছে যে, তার পিতার বৈমাত্রেয় দাদা স্বর্গত! কল্যাণী অহেতুক একটা দাগা পেত। দা'ঠাকুর কী যেন বলতেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে : 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'! যে-কথায় শ্রোতা দাগা পাবে—হোক তো হক কথা—কী দরকার সেটা শোনানোর? মুরারীদা চিঠিখানা পেয়ে খুশি হয়েছিল যেমন, তেমনি দাগাও পেয়েছে। নেতাইয়ের

বৌয়ের ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই। পোস্টকার্ড তো নয়, যেন গ্যালিপ্রুফ! তা হোক, তবু মুরারীদার ছানি-পড়া চোখেও একটা গোপন কথা ধরা পড়েছিল।

'জেঠামশাইকে আমার প্রাণভরা সতকোটি প্রণাম দিবেন'—পংক্তিটার ওপর এক-ফোঁটা জলের চিহ্ন। লেখাটা ধেবড়ে গেছে! বোকা মেয়ে! 'প্রণামে'র বিশেষণ কি 'প্রাণভরা' হয় রে পাগলী? তবে ঐ এক ফোঁটা চোখের জলে তোর সব বানান ভুলের অপরাধ ধুয়ে গেছে! ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন!

মুরারীদা যথারীতি প্রুফ দেখছে।

ম্যানেজারের আর সহ্য হল না। কাছে এসে ধমক দিয়ে ওঠে, আপনি আবার এসেছেন?

মুরারীদা চোখ তুলে তাকায়। কণ্ঠমণিটা বার কয়েক ওঠানামা করে। নিশ্চুপ কয়েকটা মুহূর্ত সে তাকিয়ে থাকল ঐ তরুণ ম্যানেজারের দিকে।

—কী হল? জবাব দিন?

—মালিক তো বলেননি এ টুলে আমার বসা মানা।

সবাই হাতের কাজ থামিয়েছে। শম্ভুচরণ, কিষ্টো, বলাই, গোলাম, বংশী। সবাই ভালবাসে তাদের দাদুকে। ওদের ইউনিয়ন নেই, তাই বলে ভালোবাসা থাকবে না?

ম্যানেজার সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে কী যেন বুঝে নিল। তারপর গলা নামিয়ে বলে, কিন্তু বিনা মজুরিতে আপনিই বা এখানে খাটবেন কেন?

—তাতে আপত্তি আছে তোমার?

স্বয়ং মালিককেই নাম ধরে ডাকে, ম্যানেজারকে তো 'তুমি'ই বলবে।

—নিশ্চয় আছে। আমার জানা দরকার আপনি কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এসেছেন।

মুরারীদা ম্লান হাসে। বলে, যেহেতু এ বনের প্রতিটি চারাগাছ আমার নিজের হাতে লাগানো ম্যানেজার-সাহেব! তুমি তো শুধু ফলন্ত গাছ দেখছ, আমি যখন এ বনে প্রথম আসি তখন একটা ঘাসও ছিল না—সবটাই ছিল খাঁ-খাঁ করা ব্রহ্মডাঙার মাঠ।

ম্যানেজার সামলে নেয়। লক্ষ করে দেখে কর্মীরা সবাই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তবু পরাজয়টা এককথায় মেনে নেওয়া চলে না। বলে, ওসব সেন্টিমেন্টের কথা বাদ দিন। আসল কারণ যদি কিছু থাকে তবে বলুন, নচেৎ বিদায় হন—

মুরারীদা রাগ করে না। বলে, ওটাই আসল কারণ ম্যানেজার। তবে এসব সেন্টিমেন্টের কথা তো তোমার মগজে ঢুকবে না, তাই যে যুক্তি তোমার পক্ষে সহজবোধ্য সেটাই বলি—মাইনেটা না দাও, টিফিনটা তো দেবে? ওটা প্রাক্তন মালিকের ব্যবস্থাপনা। এ-জমানার নয়।

ম্যানেজার আর কথা বাড়াতে সাহস পায় না। সে একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেয়েছে কর্মীদের চোখে।

দেখা গেল, মালিকও এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। উটকো একটা লোক কেন টুলে বসে প্রুফ দেখে। সেও আর পেরে উঠছিল না। মা বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। মুরারীদার বাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠানো নিয়েই হয়তো একটা দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেত—হল না, মুরারীদা প্রত্যাখান করায়। তার নাকি গুরুর মানা!

স্ত্রী থেকেও নেই। বাক্যালাপ বন্ধ করেনি; কিন্তু সে যেন সাতে নেই, পাঁচে নেই। মুরারীদার হয়ে সুপারিশ করতে আসেনি। ছেলেটা ক্রমশ বাউণ্ডুলে হয়ে উঠছে। শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ-বেটায় দেখাই হয় না। বাড়িতে এই পরিস্থিতি, তাই প্রেসে কোনো নতুন হাঙ্গামা রতনের বরদাস্ত হল না।

* * *

ইতিমধ্যে সুছন্দা একদিন মুখোমুখি কথা বলেছে ঋদ্ধির সঙ্গে। শুধু মুরারীকাকুকে জানিয়েই সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি।

—তোর সঙ্গে কিছু জরুরী কথা ছিল, ঋদ্ধি।

ঋদ্ধি একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, জরুরী কথা! কী নিয়ে?

সুছন্দা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসে ওর মুখোমুখি। ঋদ্ধি পরিবেশটা হালকা করতে বলে ওঠে, ওরে ব্বাবা! তুমি যে পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়ে এসে জেরা শুরু করছ।

সুছন্দা হাসল না। বললে, তোর সঙ্গে যতীনের দেখা হয়?

ঋদ্ধি আন্দাজ করেছিল ঠিকই। বললে, হয়। খুব কম। মাসে একদিনও হয় কিনা সন্দেহ। কেন?

—ও কোথায় থাকে আজকাল?

—ঠিক জানি না। জানলেও তোমাকে বলতে পারতাম না।

—কেন?

—বুঝতেই তো পারছ। পার্টির নির্দেশ!

—পার্টি! নকশাল-পার্টি?

—নামে কী আসে যায়, মা? কিন্তু যতীনরা যে একটা নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পার্টিতে আছে তা তো জানই।

—'যতীনরা' বলছিস কেন? উত্তম পুরষের বহুবচন তো ব্যবহার করলি না!

ঋদ্ধি জবাব দিল না।

—কী হল? বল? তুই আছিস ওদের দলে?

ঋদ্ধি এবার চোখে-চোখে তাকায়। বলে, এসব কথা তোমার যত কম জানা থাকে ততই মঙ্গল।

—কেন?

—তুমি স্বাভাবিকভাবে সরল প্রকৃতির। কেউ প্রশ্ন করলে গুছিয়ে মিছে কথা বলতে পারবে না। তা ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেই কিছু গুপ্তকথা থাকে। তার ভার নিজেকেই বইতে হয়—ওয়ান শুড ক্যারি ওয়ানস্ ঔন ক্রস!

—কিন্তু আমি যে তোর মা, খোকা!

—তাতে কী? আমার যদি বিয়ে দাও তাহলে তার সব গোপনকথা কি তোমাকে বলতে পারব? নাকি তোমার 'গোপনকথা' তাকে খুলে বলতে পারব—যেহেতু সে আমার সহধর্মিণী!

সুছন্দা চমকে ওঠে : আমার 'গোপনকথা'! মানে?

—ও একটা কথার কথা!

সুছন্দা আশ্বস্ত হয়। বলে, বেশ! ব্যক্তিগত 'গোপনকথা' আমি জানতে চাইছি না। কিন্তু সাধারণভাবে 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনা করতে আপত্তি আছে তোর?

—কী বিষয়ে? আমাদের পার্টির?

—হ্যাঁ! 'তোদের' পার্টির! ঐ আজব স্লোগানটা তোরা বলিস কোন আক্কেলে : 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'।

ঋদ্ধি হাসল। বলল, আগে বল, এই স্লোগানটাকে 'আজব' বিশেষণে বিভূষিত করলে কেন?

—কেন করব না? মাও সে-তুঙ অন্য একটা স্বাধীন দেশের নেতা! জানি না, তোদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কতটা যোগাযোগ; কিন্তু তোরা তো সন্দেহাতীত ভাবে জানিস—তিনি ভারতীয় নন। ভারতের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই!

—না! কথাটা তোমার ঠিক হল না, মা! সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহের যেখানে যত নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ আছে তার সঙ্গেই তাঁর নিবিড় সম্পর্ক! তার চেয়েও বড় কথা : মাও সে-তুঙ তো একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। তিনি একটা 'আইডিয়া'! একটা প্রতীক! ঠিক যেমন তোমার ঐ নারায়ণ শীলাটা! তুমি জান, তা একটা বিশেষ জাতির জীবাশ্ম—হিমালয় থেকে সংগৃহীত—যার কার্বোনেট অণুগুলো সিলিকেট হয়ে গেছে! তুমি তাতে দেবত্ব আরোপ করেছ বলেই তার মাহাত্ম্য! নয় কি?

সুছন্দা তর্ক করেনি। সে প্রশ্নের মোড় ঘোরায়। বলে, তোরা দেশনেতাদের মূর্তি ভাঙছিস কেন তাহলে? তোরা জানিস না, ঐ পাথরের মূর্তিগুলোতে দেশের সাধারণ মানুষ দেবত্ব আরোপ করছে।

—জানি, মা। আমরা মূর্তি ভাঙছি না। ভাঙছে এক-একটা ভ্রান্ত 'আইডিয়া'। ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে 'শিখণ্ডী' খাড়া করে যারা দেশটাকে লুটে পুটে খেতে চায়—তারাই আমাদের মূল লক্ষ্য! জোতদার, মিলিওনেয়ার, মিল-মালিক—আর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেজে যারা আমাদের

শোষণ করছে তাদেরই 'খতম' করতে চাইছি আমরা। বিশ্বাস কর—সর্বহারার রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে আমরাই আবার ঐ মূর্তিগুলোকে বানাব—প্রতিষ্ঠা করব!

—কিন্তু তোরা কি বুঝিস না—তোদের এই কাজকে দেশের সাধারণ মানুষ অন্য চোখে দেখছে? তারা ভাবতে বসেছে—তোদের মন্ত্র : 'দেশের ঠাকুর ফেলি, বিদেশের কুকুর পূজিয়া।'

—সেটাও জানি। ইন ফ্যাক্ট—ও নিয়ে আমাদের দলে মতবিরোধ রয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা এ কর্মসূচী অনুমোদন করেন না। তাঁদের ধারণা, এতে আমরা জনসমর্থন হারাবো। যতীনও তাই বলে, আমরাও ব্যক্তিগত মত সেটাই! দেখা যাক কী নির্দেশ আসে শেষ পর্যন্ত!

সুছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বললে, তুইও কি একদিন যতীনের মতো আত্মগোপন করবি?

ঋদ্ধি উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবার কিন্তু তোমার প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল মা! তা এখনই কী করে বলি?

*　　　*　　　*

মাসখানেক এ-ভাবেই কেটে গেল। মুরারীদা প্রতিদিন আসে। খাতায় সই করতে দেওয়া হয় না তাকে। টুলে বসে প্রুফ দেখে, কম্পোজিটর আসতে দেরি করলে বা ছুটি নিলে বসে কম্পোজ করে। মেশিনে গড়বড় হলে উবু হয়ে বসে মেরামতিও করে। কেউ আপত্তি করে না, বরং সহকর্মীরা সাহায্যই করে। বলাবাহুল্য বরাদ্দ-মতো পাউরুটি-ঘুগনিও খায়।

মাসান্তে সবাই হিসাব মতো মাইনে পেল। মুরারীদার চোখের সামনে দিয়ে রেভিন্যু-স্ট্যাম্পে সই নিয়ে মাস-মাহিনা নিতে অনেকেরই বাধো-বাধো লাগল।

মুরারীদা নির্বিকার। শম্ভুচরণ কাছে ঘনিয়ে এসে বললে, অনেকগুলো টাকা তো আজ পেলাম, দাদু কিছু ধার নেবেন?

মুরারীদা হাসতে হাসতে বলে, কেন রে? বামুন মানুষ একাহারী হয়, শুনিসনি?

—কিন্তু সারাদিনে মাত্র দু-পীস পাউরুটি খেয়ে—

বংশী বলে, দু-পীস নয় শম্ভুদা, দাদু এক-পীস কাগজে জড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। দিদার জন্যে। আমি দেখেছি।

গোলাম কুদ্দুস বলে, প্রাইভেট ট্যুশানি করবেন দাদু? খোঁজ-খবর নেব?

মুরারীদা বলে, পরে বলব। ভেবে দেখি।

*　　　*　　　*

একাদশীর উপবাস। আজকাল আর নিরম্বু উপবাস করতে পারেন না। ডাক্তারের বারণ। অনেকক্ষণ খালি পেটে থাকলে পেটে কেমন যেন যন্ত্রণা হয়। সন্ধ্যায় পুজো-আর্চা সারার পর তাই যাহোক কিছু মুখে দিতে হয়। সারাটা দিন বইপত্র নাড়াচাড়া করেন। ভগবান ওটুকু করুণা করেছেন—চোখ দুটি ঠিক আছে। ছানি পড়েনি। বৌমা তার লাইব্রেরী ঘর থেকে বইয়ের যোগান দিয়ে যায়। রামায়ণ আর কথামৃত এ ঘরেই থাকে। তবে একনাগাড়ে তো ধর্মপুস্তক পড়া যায় না; তাই বৌমা রেখে যান বঙ্কিম, প্রভাত মুখুজ্জে, রমেশ দত্তের বই। কখনো বা আধুনিক লেখকদের বাছা-বাছা বই—যা ওঁর ভাল লাগতে পারে—'আরোগ্য-নিকেতন', 'দেবযান', 'কালের মন্দিরা'। তার চেয়েও যাঁরা আধুনিক তাদের বই শাশুড়ির কাছে পাঠায় না। এ বয়সে নতুন করে পাঠক-মানস তৈরি করার না আছে উৎসাহ, না ক্ষমতা।

আজ কিন্তু উনি সারাদিন বইয়ের পাতা ওলটাননি। সময় কাটতে চায় না। একটিমাত্র সন্তান—সে যেন দিন-দিন কেমন হয়ে গেল। দিনান্তে একবারও এসে বলে না, 'কেমন আছ, মা?' অথবা 'ডাক্তারের দেওয়া ওষুধগুলো খাচ্ছ তো ঠিক?' এসব প্রশ্ন বাহুল্য। রতনও জানে, তার মাও জানেন। তিনি কেমন আছেন এ প্রশ্ন জানার কৌতূহল ওর নেই। আর ডাক্তারের দেওয়া ওষুধপত্র বৌমা ঘড়ির কাঁটা ধরে খাইয়ে যায়। সে কথা নয়। কথা হচ্ছে, 'কথা-বলার' কথা। দিনান্তে মায়ের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কুশল প্রশ্ন। ওঁর হঠাৎ মনে হল, একই বাড়িতে আছেন—কিন্তু পুরো একটি সপ্তাহ পুত্রের মুখদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি।

এ-সব কথা কি আজ নতুন করে জানছেন? তা নয়। সকালবেলা মোক্ষদা এসে অহেতুক খুঁচিয়ে ঘা করে গেল বলেই জানা-কথা নতুন করে জানতে হচ্ছে।

মোক্ষদা—মানে, নেদেরপাড়ার হালদারগিন্নি—আজ সকালে এসেছিলেন। সারাটা সকাল জ্বালিয়ে গিয়েছেন। লোকে পাড়া-বেড়াতে যায় অপরাহ্ন বেলায়। মোক্ষদার সবই উলটো। বৌমাদের ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে সকালেই আধিখ্যেতা দেখাতে এসেছিলেন।

কিন্তু ওটা কী আবোল-তাবোল বলে গেল মোক্ষদা? কথাটা বিশ্বাসই হয় না। হালদারগিন্নির মনটা বড় ছোট!

হালদারমশাই সস্ত্রীক তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন ভেনাস-ট্র্যাভল্‌স-এর যাত্রীবগিতে। রতন নিজেও গিয়েছিল। উত্তর-ভারতের অনেক তীর্থ দেখিয়ে এনেছে। কিন্তু মোক্ষদা তীর্থ দেখেছে থোড়াই! তার নজরটাই বাঁকা! সারাক্ষণ সেই বাঁকা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে সহযাত্রী-যাত্রিণীরা কখন কে কী করছে! বড়খোকা নাকি সারাটা পথ একটি মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ-ফুসফস করেছে। সব সময়েই তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি! না, মেয়েটি যাত্রী-পার্টির নয়। কোম্পানির লোক। হালদারগিন্নির ধারণা—বিশেষ কারণে ঐ মেয়েটিকে চাকরিতে জিইয়ে রেখেছে বড়খোকা! অযাচিত পরামর্শ দিয়েছে—বৌমার উচিত যাত্রীগাড়িতে সোয়ামীর সঙ্গে যাওয়া। তাকে চোখে চোখে রাখা!

কথাটা বিশ্বাস হয়? ঘরে যার অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা—কিন্তু এ-কথাও তো ঠিক, বড়খোকা কোনোদিনই বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না। উনি কতবার বলেছেন। বলে বলে হার মেনে গেছেন। আশ্চর্য! বৌমাও তো নিজে থেকে কখনো যেতে চায় না। তিনি একলা পড়ে থাকবেন—এ কি একটা অজুহাত? তাহলে বৌমা যেতে চায় না কেন?

শাশুড়ির সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হয়েছে দেখে সুছন্দা পূজাঘরে এল। একটি পশমের আসন বিছিয়ে দিয়ে ঠাঁই করে দিল। ঝি-চাকরেরা জানে, এসব কাজে তাদের থাকতে দেয় না সুছন্দা। তারা এ দিগড়ে নেই। মায়ের জলযোগটুকু এবার নিয়ে আসে। একটা পাথরের রেকাবিতে নানান ফলমূল—শশা, কলা, আপেলের টুকরো, দুটি সন্দেশ, আর ঘরে-করা ছানা। পাত্রটা নামিয়ে রাখতেই বৃদ্ধা বললেন, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু এসে বস তো বৌমা। কথা আছে।

সুছন্দা একটু অবাক হয়। এ সুরে উনি সচরাচর কথা বলেন না। এ-সময় পুজোঘরের কাছাকাছি বড় একটা কেউ আসে না। ঋদ্ধি আর তার বাবা বাড়ি নেই। তবু শাশুড়ির কথায় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসল।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করেন, হালদারগিন্নি কি তোমাকে কিছু বলেছে?

সুছন্দার মনে পড়ে গেল, নেদেরপাড়ার হালদার-মাসিমা ও-বেলা এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ বকবক করে গিয়েছেন। সুছন্দা জানত, তিনি সম্প্রতি যাত্রীবগিতে তীর্থ করে এসেছেন। সেই সব ভ্রমণ কাহিনীই শোনাচ্ছিলেন নিশ্চয়। এখন ওঁর প্রশ্নের ধরনে মনে হল, তিনি বিশেষ কোনো কথাও বলে গেছেন, যা আলোচনা করার আগে ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে হয়। বললে, না তো? অনেক তীর্থ দেখে এসেছেন, সে-কথাই শুধু বললেন।

—বড়খোকার বিষয়ে?

নয়ন নত হল সুছন্দার। নেতিবাচক গ্রীবা সঞ্চালন করল শুধু।

—মোক্ষদার মনটা বড় কুচুটে। চাঁদের দিকে তাকালে শুধু তার কলঙ্কটাই দেখতে পায়।

কথাটা বলে বৌমার দিকে মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। সুছন্দা কোনো কৌতূহল দেখালো না। পাথরের থালাটা ঠেলে দিয়ে বললে, আর একটু ছানা দেব? শশাগুলো হয়তো চিবোতে পারবেন না!

বৃদ্ধা আহার শুরু করলেন না। কেমন যেন একটু খটকা লাগে। এমন একটা কথায় বৌমার মেয়েলি কৌতূহল জাগল না কেন? বিশেষ, প্রসঙ্গটা যখন তার সোয়ামী সংক্রান্ত!

আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন এবার।

—ওর কোম্পানিতে মীনা নামে একটি মেয়ে চাকরি করে বলছিল মোক্ষদা, তুমি তার নাম শুনেছ?

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারে না। বলে, মীনা ওঁর কর্মচারী নয়, পার্টনার।

—পার্টনার! তার মানে?

—অংশীদার। ভেনাস ট্র্যাভলস-এর অর্ধেক শেয়ারের মালিক।

বৃদ্ধা রীতিমতো বিস্মিতা। বলেন, তুমি তাকে দেখেছ? কত বয়েস?

—না, দেখিনি। বয়স বোধহয় আমারই মতো।

—কুমারী, সধবা না বিধবা?

—তিনটির একটিও নয়। ডির্ভোসড্। মানে বিয়ে হয়েছিল, এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

—কতদিন ধরে খোকার ব্যবসায়ে অংশীদার হয়েছে?

এবার চোখে চোখে তাকায়! বুঝিয়ে বলে সব কথা। অর্থাৎ ভেনাস-ট্র্যাভলস ঐ মেয়েটিরই সৃষ্টি। সে ছিল রত্নেশ্বরের সিনিয়ার পার্টনার শশী পারেখের স্ত্রী। রতনই তার ব্যবসার অর্ধেক শেয়ার ক্রয় করেছে। সুছন্দা এ সংসারে আসার পূর্বেই।

বৃদ্ধা বেশ কিছুক্ষণ শশার কুচিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। মুখে দিলেন না। আবার প্রশ্ন করেন, ঐ মেয়েটির কথা তুমি কতদিন আগে শুনেছ?

—অনেকদিন। খোকা তখন আমার কোলে!

—কই, আমাকে তো কিছু বলনি?

এর কী জবাব? কিন্তু বৃদ্ধা নীরব থাকতে দিলেন না। বলেন, চুপ করে রইলে কেন বৌমা? সব কথা এতদিন আমাকে বলনি কেন?

—কী লাভ এসব গ্লানিকর কথা পাঁচকান করে?

চাপা আক্রোশে বৃদ্ধা তাঁর মনের ক্ষোভ সামনে যাকে পেলেন তার ওপরেই উগড়ে দিলেন, আমি বাইরের লোক নই বউমা! আমি তার মা!

আবার চোখে চোখে তাকায়। বলে, যে-রোগের ওষুধ নেই তা নিয়ে অহেতুক হা-হুতাশ করে কী লাভ, মা। আপনাকে অহেতুক দাগা দেব না বলেই এতদিন কিছু বলিনি।

চমকে ওঠেন বৃদ্ধা, ওষুধ নেই? তুমি ঠিক জান?

—জানি। পনেরো-বিশ বছরের পুরানো ব্যাধি যে! সহ্য করা ছাড়া উপায় কী? নিন, মুখে দিন।

—মুখে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে না, বৌমা!

ম্লান হাসল এবার। বললে, তা বললে তো শুনব না মা। আমি তো আজ পনেরো-বিশ বছর ধরেই...

বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্কোচের কথাটা বুঝতে পারি; কিন্তু আশ্চর্য! পারুলও তো আমাকে ঘুণাক্ষরে কোনদিন কিছু জানায়নি!

—কে? মা? না, তিনি কিছুই জানেন না!

এতক্ষণে চোখ দুটি জলে ভরে আসে!

অবাক বিস্ময়ে পুত্রবধূর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। যেন আজ ওকে প্রথম দেখছেন! ও কি ওঁরই বৌমা, না কোনো শাপভ্রষ্টা দেবী! এতবড় একটা জগদ্দল বোঝা এতদিন একা-একা বয়ে বেড়াচ্ছে! শাশুড়ির কাছে একথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হতেই পারে—তা বলে পনেরো-বিশ বছরের ভেতর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে একদিনের তরেও সে হু-হু করে কেঁদে মনটা হালকা করেনি। দত্তবাড়ির কলঙ্ক আকণ্ঠ পান করে সে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছে!

—শশাগুলো থাক। আর একটা কলা নিন। আর ছানাটা বেশি করে খেতে বলেছেন ডাক্তারবাবু।

টপ্‌টপ্ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল পাথরের রেকাবিতে। বৌমা যদি দু'-দশক ঐ পাষাণভার বুকে নিয়ে শারীর-ধর্ম পালন করে থাকতে পারে, তাহলে তিনিও বা তা পারবেন না কেন?

একটু সামলে নিয়ে বললেন, একটা কথা, বৌমা। তুমি পার, কিন্তু আমি চোখের ওপর এটা দেখে সইতে পারব না। আজ মন খুলে কয়েকটা কথা বলি, কিছু মনে কর না। আমিও অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি। তবে এতদিন ভুলে তোর ওপরেই রাগ করতাম! ভাবতাম, মেয়েটা দেমাকি! আমার ছেলের মর্যাদা বুঝল না। মনকে বোঝাতাম, ওরা বড় হয়েছে, যা ভাল বুঝছে তা করছে—আমি বুড়ি মানুষ, কেন ওসবের মধ্যে নাক গলাতে যাই? তোরা যে একঘরে শুতে যাস না তা কি আর আমার নজরে পড়েনি?

মুখটা বুকের উপত্যকায় ঝুঁকে পড়ে।

—না রে মা! লজ্জা করিস না। তুই তো তোর মা-শাশুড়িতে ফারাক করিসনি। তাই আজ বৌমা নয়, মেয়ের সঙ্গেই কথা বলছি আমি!

সুছন্দা নীরবে বসেই রইল সমুখে। তারও চোখে জল এসে যায়।

—আর একটা কথা। মুরারীর চাকরিটা গিয়েছে না আছে?

আবার একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ। এ বাড়ির সবাই খবর পেয়েছিল—চৌধুরীমশায়ের ছেলের বিয়ের পদ্যে গণ্ডগোল হওয়ায় মুরারীকাকুর চাকরি আবার খতম হয়েছে। এবার বংশীর মারফতে নয়, স্বয়ং রতনই এসে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল তার গর্ভধারিণীকে। শাসিয়েও রেখেছিল, তুমি এবার এসব ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা কর না। ঐ বুড়ো-হাবড়াকে আমি আর চাকরিতে রাখতে পারব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। আর নয়!

তবুও লজ্জার মাথা খেয়ে বৃদ্ধা বলেছিলেন, কিন্তু কর্তা যে ওকে...

—ব্যস্! কোনো কথা নয়! কর্তার দোহাই দিয়ে অনেকবার ওকে বাঁচিয়েছ। কিন্তু এবার নয়! তুমি পুজো-আর্চা নিয়ে আছ, তাই থাক! এ বিষয়ে আমি কোনো কথা শুনব না।

বৃদ্ধা তারপর চেষ্টা করেছিলেন গোপনে মুরারীঠাকুরপোর আহার্য টিফিন-ক্যারিয়ারে করে পাঠাতে—মানে, যতদিন না বেকার মানুষটার একটা হিল্লে হয়। অভিমানী ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আজব অজুহাত : তার নাকি গুরুর মানা!

বৃদ্ধার বুকে শেল বিদ্ধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, স্বর্গবাসে তাঁর স্বামীও উতলা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার খবর এল—এবার পাঁড়েজীর মারফৎ—মুরারী যথারীতি তার টুলে এসে বসছে। কাজ করছে। পাঁড়ে অবশ্য জানত না, সে হাজরি-খাতায় সই দেয় কিনা, মাসান্তে মাহিনা পায় কি না। যেটুকু দেখেছে, সেটুকুই জানিয়েছে। তাই বৃদ্ধার এই কৌতূহল।

সুছন্দা ভেতরের ব্যাপারটা জানত। সে সত্য-মিথ্যা এড়িয়ে শাশুড়িকে বললে, ওসব চিন্তা করে মনকে বিচলিত করবেন না মা! আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এখন ভবিতব্য যা হবার তাই হবে।

বৃদ্ধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না! আমি আর এ সংসারে থাকতে পারব না বৌমা। গুরু-মহারাজ অনেকদিন ধরেই লিখছেন ওঁর আশ্রমে গিয়ে থাকতে। তুই টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে দে। ইন্দ্র আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—সেই ভালো। যান, কিছুদিন কাশীই ঘুরে আসুন।

—না রে, মা! 'ঘুরে আসুন' নয়, যে-কটা দিন বাঁচব বাবা বিশ্বনাথের চরণতলাতেই পড়ে থাকব।

সুছন্দা বুঝতে পারে, কী নিদারুণ অভিমানে উনি একথা বলছেন। বলে, সেসব কথা পরে। আপাতত ইন্দ্র আপনাকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আসুক তো। তারপর দেখা যাবে! কবে যেতে চান?

—যত শিগ্গির টিকিট পাওয়া যাবে। পাঁজি দেখে একটা ভাল দিন দ্যাখ।

—ঠিক আছে। ওঁকে বলব।

—'ওঁকে' বলার কী আছে? তার অনুমতি নিতে হবে নাকি? একদিন না একদিন তার নজরে পড়বেই এ ঘরখানা খালি। তখন শুধোলে ওকে বলে দিও। আর, ও হ্যাঁ! টিকিটের টাকাটা ওর কাছে হাত পেতে নিও না। আমার চেকবইটা নিয়ে এস।

সুছন্দা প্রতিবাদ করে না। এ ছাড়া কীভাবেই বা ঐ অসহায়া বৃদ্ধা তাঁর অভিমানের বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন? কিন্তু সে কি বুঝবে? 'অভিমান'ও তো এখন একটা আজব বস্তু যা আলাদীনের সেই দৈত্যটার নাগালের বাইরে! টাকা-আনা-পাইয়ে তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

*   *   *

দিন দুই পরে গবলেটে স্কচ ঢালতে ঢালতে রত্নেশ্বর তার ধর্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করল, ইন্দ্র বললে, মায়ের জন্য নাকি একখানা বেনারসের টিকিট কিনে এনেছে? ব্যাপার কী? মা কি বেনারস যাচ্ছে নাকি?

মদের বোতল আর ভাজাভুজির প্লেট সাজিয়ে দিয়ে সুছন্দা অদূরে একটা সোফায় বসে নিটিং-এর কাঁটায় সোয়েটার বুনছিল—ঋদ্ধির মাপে। বললে, হ্যাঁ! বুধবার।

—কে নিয়ে যাচ্ছে? ইন্দ্র?

—ইন্দ্রই!

—কই মা আমাকে তো কিছু বলেনি?

—তোমার সঙ্গে মায়ের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে কবে?

রতন হেসে ওঠে। বলে, যা ব্বাবা। আমরা কি ভিন্ন দেশের বাসিন্দা? ডেকে পাঠালেই গিয়ে দেখা করতুম। তা কদ্দিনের জন্যে?

—আমাকে বলেননি। তুমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও বরং।

—ব্যাপারটা কী বলতো? এবার যাত্রী বৃগীতে মাকে নিয়ে যাইনি বলে শোধ তোলা হচ্ছে ছেলের ওপর?

সুছন্দা জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

ঋদ্ধিও একই প্রশ্ন করল পরদিন, কী ব্যাপার? দিদা নাকি কাশী যাচ্ছেন? কবে ফিরবেন?

—তা আমাকে কেন? দিদাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর না!

—ও ব্বাবা! দিদা খচে বোম্ হয়ে আছে! জিজ্ঞেস করলে হয়তো জবাবে বলবে—তোদের সংসারে আর কোনোদিনই ফিরে আসব না।

সুছন্দা বলে, আমাকে অন্তত তিনি সে-কথাই বলেছেন।

ঋদ্ধি ইতস্তত করে। এটা-ওটা ধরে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। তারপর বলে, তা, হঠাৎ দিদার এমন মতিগতি হল কেন? সংসারে এবম্প্রকার বীতরাগ?

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল সুছন্দার। বললে, তুই জানিস্ না? তোর ওপর অভিমান করেই তো! লেখাপড়া চুলোর দোরে দিয়ে দিনরাত বাউণ্ডুলের মতো কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস! উনি সইতে পারছেন না। এসব কথা তুই জানিস না, বুঝিস না?

ঋদ্ধি হাসতে থাকে। জবাব দেয় না।

—কী বোকার মতো হাসছিস! জবাব দে!

—কী জবাব দেব, মা? আমি শুধু ভাবছি, তুমি কি কথার ছলে আত্মরক্ষা করতে এ-কথা বলছ, না কি মনকে প্রবোধ দিতে দিতে এই আকাশজোড়া মিথ্যাটাকে নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছ!

—কী আকাশজোড়া মিথ্যা?

—তুমি জান—কেন দিদার এই বীতরাগ। কার ওপর অভিমান করে তিনি সব কিছু ছেড়ে কাশী চলে যাচ্ছেন!

—কার ওপর?

—তোমার!

—আমার? আমার ওপর? মানে? আমি কী করেছি?

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেবার চেষ্টা করছ। জীবনের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছ! ক্রমাগত আপস করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছ! বিদ্রোহিণী হতে সাহস পাচ্ছ না!

থমকে গেল সুছন্দা! ঋদ্ধি কতটা জানে? ঋদ্ধি কতটা বুঝতে পারে? কলেজে পড়ে। ফিলজফি অনার্স। সাইকোলজি ওদের একটা পেপার। বাবা আর মায়ের মাঝখানে যে একটা অতলান্ত সমুদ্র জেগে উঠেছে এটুকু বুঝে নেবার মতো বুদ্ধি তার নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে দায়ী করে কাকে? মীনা পারেখের কথা সে নিশ্চয় জানে না—জানার সম্ভাবনা নেই। তাহলে?

ঋদ্ধি হাসি-হাসি মুখেই বলে, এবার কিন্তু তোমার দান।

—আমার দান?

—আলোচনাটা চালিয়ে যেতে হলে এবার তোমার কথা বলার পালা।

সুনন্দা গম্ভীর হয়ে বলে, তুই নিজেই না সেদিন বলেছিলি—'এভ্রিওয়ান শুড ক্যারি ওয়ান্স ঔন ক্রস্'?

—বলেছিলাম! কথাটা আমার নয়। বাইবেলের। প্রত্যেককে নিজ-নিজ ক্রুশকাঠ নিজের কাঁধেই বহন করে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। অপরের স্কন্ধে সে ভার চাপানো যায় না। দ্বিতীয় ব্যক্তি—সে যতই সহানুভূতিশীল হোক—হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে পারে না।

সুছন্দা কোনোক্রমে চোখের জল রুখে বললে, তাহলে তুই আজ যে বড় তোর হাতখানা বাড়িয়ে দিতে চাইছিস? মায়ের বোঝা লাঘব করতে চাইছিস!

—না মা! আমি শুধু সেন্ট ভেরোনিকার ভূমিকাটুকু পালন করতে চেয়েছিলাম!

আর পারল না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল এবার। ঋদ্ধি এক-পা এগিয়ে এল। মায়ের লুটিয়ে পড়া আঁচলটাই তুলে দিল তার হাতে। সেন্ট ভেরোনিকার ভূমিকাটাই পালন করল শুধু।

যীজাস যখন ক্রুশকাঠ কাঁধে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ মেয়েটি এগিয়ে এসেছিল —না, জগদ্দল-বোঝার ভার ভাগ করে নিতে নয়। আঁচল দিয়ে তাঁর মুখখানি শুধু মুছিয়ে দিতে।

ঋদ্ধিমান যেন সেই মুহূর্তে অনেক-অনেক বড় হয়ে গেল। মা নয়, ওর ছোট্ট মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মাথায় একখানা হাত রেখে বললে, 'We never live; we are always in the expectation of living'—কথাটা ভলতেয়ারের!

'বেঁচে থাকা মানে প্রাণধারণের গ্লানি নয়, বাঁচার মতো বেঁচে থাকার প্রত্যাশাই হচ্ছে জীবন!'

*　　　*　　　*

মা চলে যাবার দিনসাতেক পরে একদিন হঠাৎ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত!

পুলিস এসে ঘেরাও করল প্রেস!

কী ব্যাপার?

এখানে নাকি বেআইনী ইস্তাহার ছাপা হয়—একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী—গণতন্ত্রের শত্রু, সমাজের শত্রু!

আকাশ থেকে পড়ল রত্নেশ্বর।

খবর পেয়ে ছুটে এল গাড়ি নিয়ে। থানা-অফিসার শুধু নয়, কলকাতা থেকে একজন উচ্চপর্যায়ের পুলিস-অফিসারও হাজির!

—কী বলছেন স্যার! কালীতারা প্রেসে বে-আইনী ইস্তাহার! দু-পুরুষ ধরে—

—থামুন! ন্যাকা সাজবেন না মিস্টার দত্ত! আমাদের ডেফিনিট খবর আছে। এই সার্চ-ওয়ারেন্টে সই করে দিন। ইচ্ছে হলে আমাদের তল্লাসী করে প্রথমে দেখে নিন—আমরা সমস্ত প্রেসটা সার্চ করব।

শুরু হল খানাতল্লাসী।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা গেল কিছু কাটা প্রুফ। ও. সি.-র হাতে যে ছাপানো ইস্তাহারটা আছে তারই গ্যালিপ্রুফ!

রত্নেশ্বরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ম্যানেজার চোখে দেখল যোজনবিস্তৃত সর্ষে ফুলের ক্ষেত!

কলকাতার পুলিস-অফিসার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন, কী মশাই? দুজনেই একেবারে সিক্ত-মার্জার হয়ে গেলেন যে?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে...বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা কিছু জানি না।

—শাট্‌ আপ! বিনয়! অ্যারেস্ট কর! দুটোকেই। হ্যাঁ, মাজায় দড়ি বেঁধে ভ্যানে তোল!

হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল রত্নেশ্বর দত্ত! বললে, ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি স্যার, আমি... আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না—

থানা-অফিসার একটু ইতস্তত করছিল। একেবারে হ্যান্ডকাফ দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে রত্নেশ্বর দত্তকে অ্যারেস্ট করতে তার বাধোবাধো লাগতেই পারে। সে স্থানীয় পুলিস-অফিসার। নানাভাবে সে ঐ ধনকুবেরের কাছে অনুগৃহীত। বিশেষ, ওর কর্মচারীর দল একটু দূরে সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের সামনে...

হঠাৎ রত্নেশ্বরের নজর হল—ভীড়ের পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঋদ্ধি। থানার বড়বাবুও সেটা নজর করেছে। ছেলের চোখের সামনেই বাপকে...

ভিড় ঠেলে ঋদ্ধি এগিয়ে আসছিল।

কোথাও কিছু নেই যেন আশমান ফুঁড়ে আবির্ভূত হল মুরারীদা। ঋদ্ধিকে মারল এক গোঁত্তা! একেবারে আচমকা! সে বোধহয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার গায়ে।

মুরারীদা এসে মহড়া নিল সামনে দাঁড়িয়ে। গরুড়পক্ষীর মতো হাত দুটি জোড় করে থানা-অফিসারকে বললে, উনি সত্যি কথাই বলছেন স্যার, মালিক সত্যিই কিছু জানেন না!

—বটে! তার মানে আপনি জানেন কে এটা কম্পোজ করেছে?

—জানি স্যার। আমি নিজেই।

—আপনি এই প্রেসের কম্পোজিটার?

—আজ্ঞে না, আমি প্রুফ-রীডার ছিলাম। এখন চাকরি নেই—

—তাহলে এটা কম্পোজ করল কে?

—আমিই। আমি প্রেসের সব কাজ জানি। বিশ্বাস না হয়, এদেরকে শুধিয়ে দেখুন।

থানা-অফিসার রতনকে বলেন, চলুন; আপনার ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। এদের চলে যেতে বলুন। প্রেসের বাইরে।

রতনের ঘরে মুরারীদাকে নিয়ে এসে থানা-অফিসার জনান্তিকে জানতে চায়, এবার বলুন। কম্পোজ করেছেন আপনি, প্রুফ দেখেছেন আপনি, কিন্তু মেশিন চালিয়ে ছেপেছে কে?

—আমিই স্যার।

—ঠিক আছে। মেনে নিলাম। আপনি বলতে চান, ম্যানেজার বা মালিক কিছু জানে না। প্রেসের আর কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি। আপনি একা হাতেই সবকিছু করেছেন! তাই বলতে চাইছেন তো?

—তাই বলতে চাইছি!

—তার কী পরিণাম হবে সেটুকু বুঝতে পারছেন?

মুরারীদা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েই রইল।

—ঠিক আছে। এবার বলুন, কে এটা ছাপতে দিয়েছিল প্রেসে?

মুরারীদা সবিস্তারে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। না, প্রেসে কেউ ছাপতে দেয়নি। অর্ডার-এন্ট্রি নেই—ম্যানেজার বা মালিক কিছু জানেন না। মুরারীদা নিজ দায়িত্বে গোপনে এ-কাজ করেছে। সবকিছুই একা হাতে। আর সেটা সে করেছে নিতান্ত অভাবের তাড়নায়। হ্যাঁ, এটা যে বেআইনি ইস্তাহার তা বুঝবার মতো বিদ্যে ওর আছে; কিন্তু গত মাসে তার চাকরি যায়, ঘরে রুগ্না স্ত্রী...হাঁড়ি চড়ে না...

প্রচণ্ড ধমকে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল থানার বড়বাবু, থাক! তোমাকে আর কাঁদুনি গাইতে হবে না, কে তোমাকে ছাপতে দিয়েছিল তাই শুধু বল?

—তা তো জানি না স্যার! চিনি না ছেলেটাকে। আগাম বিশ টাকা দিয়ে গেল, আর কাগজ। বললে, ডেলিভারি নেবার সময় বাকি ত্রিশ টাকা দেবে।

প্রচণ্ড একটা থাপ্পড়!

মাথা ঘুরে বসে পড়ল মুরারীদা!

সুইং-ডোরের ওপাশে রতনের নজর গেল। দাঁড়িয়ে আছে ঋদ্ধি।

—ন্যাকা! অচেনা-অজানা ছেলে! মিথ্যে কথা! এই শহরেরই ছেলে! তুমি চেন। স্বীকার কর!

—ঈশ্বরের দিব্যি স্যার! বাপের জন্মে দেখিনি তাকে।

বড় দারোগার হাতের ডান্ডাটা উঠতেই বাধা দিলেন কলকাতার অফিসার। বললেন, বাকি জেরা থানায় গিয়ে হবে। অ্যারেস্ট হিম।

সুইং-ডোর ঠেলে যখন সবাই বেরিয়ে এল তখন মুরারীদার কোমরে দড়ি বাঁধা। তার তোবড়ানো গালে ফুটে উঠেছে পাঁচ-আঙুলের দাগ।

কণ্ঠমণিটা বারকতক ওঠানামা করল। মুরারীদা পিছন ফিরে বললে, রতন! তোমার কাকিমাকে...

—থামুন!—গর্জন করে ওঠে রত্নেশ্বর দত্ত! বলে, যে সর্বনাশ আপনি করে গেলেন তারপর আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার। যান! এবার শ্রীঘর বাস করুন গিয়ে। অ্যাদ্দিনে আমরাও নিষ্কৃতি পেলাম। বাব্বা!

সদলবলে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। হাই স্ট্রিটে, ঐ যার নাম এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। ছোট্ট মানুষটাকে যখন কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় পুলিস ভ্যানে তোলা হচ্ছে ততক্ষণে রাস্তায় বেশ চাপ ভিড়। হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে ঋদ্ধি।

বলে, দাদু, তোমার চশমাটা...

থাপ্পড় খেয়ে যখন বসে পড়ে তখন চশমাটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ঋদ্ধি সেটা কুড়িয়ে নেয়। মুরারীদা হাত বাড়িয়ে চশমাটা নিল।

হঠাৎ কী-জানি কেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের মুখটা। বোধ করি তার মনে পড়ে গেল মা-জননীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটার কথা—'তুমি কিছু চিন্তা কর না মা, আমি তো আছি!' ঋদ্ধির অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে মুরারীদা বললে, দাদু! আমায় তো কেউটেয় ছোঁবল মারল। দেখিস, ওদিকে তোর দিদিমা যেন চন্দবিন্দু...

কথাটা শেষ হল না। দুরন্ত আবেগে ওর হাত দুটি তুলে নিয়ে ঋদ্ধি বললে, তুমি কিছু ভেবো না ছোড়দাদু! আমি তো আছি...

পুলিসভ্যানটা রওনা হয়ে যায়।

ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল।

সকলের মতো রত্নেশ্বর দত্তও দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এবং সকলে যেটুকু দেখতে পায়নি, তাও। রহস্য-যবনিকা তিলতিল করে সরে যাচ্ছে। তাই...তাই যখন পুলিসে রতনের কোমরে দড়ি পরাতে আসছিল তখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছিল ঋদ্ধি। আর সেই জন্যেই তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে সরিয়ে মহড়া নিয়েছিল ঐ ছাপাখানার ভূতটা!

তার মানে থানার বড়-দারোগা অন্যায় চড়টা মারেনি! মুরারী চিনত, মুরারী চেনে! সরষের মধ্যেই ভূত!

এই মর্মান্তিক আবিষ্কার করে রত্নেশ্বর কিন্তু উৎফুল্ল হতে পারল না। তার মনে পড়ে গেল—যে ছেলে কোনোদিন তার চোখে-চোখে তাকায়নি, আজ সে যাবার আগে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখেছিল বাপের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল শুধুই—তীব্র ঘৃণা!

* * *

সন্ধ্যার পর রতন এসে উপস্থিত হল যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। বৃদ্ধ ওকে নিয়ে গেলেন ভেতর-বাড়িতে। শহরে এটাই আজকের স্টপ-প্রেস হেড-লাইন নিউজ। আড়ালে ডেকে সব কিছু আবার বিস্তারিত শুনলেন চৌধুরীমশাই। এ-জেলার প্রবীণতম এবং বিচক্ষণতম ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। আদ্যন্ত শুনে বললেন, নেহাৎ কাঁচা কাজ করে বসে আছ রতন। কেস খুব সিরিয়াস!

—কেন চৌধুরী-কাকা? কী কাঁচা কাজ করেছি?

—আরে বাপু, তুমি যা বললে তা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না, আদালত বিশ্বাস করবে? একটা কর্মচারী, যাকে বরখাস্ত করেছ, যে হাজরিখাতায় সই দেয় না, মাইনে নেয় না, সে লোকটা দিনের-পর দিন তোমার প্রেসে এসে কাজ করে গিয়েছে, মেশিন চালিয়েছে, একি বিশ্বাসযোগ্য?

—কিন্তু সেটাই তো সত্যি কথা কাকা। মুরারীবাবু...

—না, 'মুরারীবাবু' নয় রতন, যদ্দিন এ কেসের ফয়শালা না হচ্ছে তদ্দিন ও তোমার 'মুরারীকাকু'! শোন! কাল সকালেই তোমার কাকিমার সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করবে। বুড়িটা না-খেতে পেয়ে টেঁসে গেলে মুরারী হোস্টাইল হয়ে যেতে পারে।

রত্নেশ্বর বোঝে—কেন ওঁকে সবাই এত পাকামাথার উকিল বলে। এককথায় রাজি হয়ে যায়। জানতে চায়, আপনি কি তাহলে মুরারীকাকুকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করবেন?

—আজকাল এ-সব কেসে জামিন হয় না। বিচারই হয় না, তার জামিন! দ্বিতীয়ত, আর একটি কাজ তোমাকে আজ রাত্তিরেই সারতে হবে। মন দিয়ে শোন—

—বলুন?

—তুমি তো এককালে নাটক-ফাটক করতে। তোমাদের ঐ গোবিন্দসড়ক বারোয়ারিতে?

ধরতাইটা ধরতে পারে না। স্বীকার করে।

—একবার তারাশঙ্করের 'দুই-পুরুষে' তোমাকে অভিনয় করতে দেখেছিলাম, মনে আছে। কী 'রোল' ছিল তোমার?

—সে তো আমার স্কুল-জীবনের শেষাশেষি। চরিত্রের নামটা মনে নেই। ঐ নুটুবিহারীর ছেলের পার্ট।

—নুটুবিহারী করেছিল বিশু গাঙ্গুলী, তাই নয়?

—হ্যাঁ, বিশুদাই। কিন্তু এসব কথা কেন জানতে চাইছেন চৌধুরীকাকা?

—ঐ নাটকের একটি দৃশ্য আজ রাতে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। এবার তোমার নুটুবিহারীর 'রোল'। বাড়ি ফিরে ছেলেকে ডেকে পাঠাবে। হাতের কাছে একটা কাচের গ্লাস বা কাপ-ডিশ্ রেখ। কোথাও কিছু নেই, গায়ে পা তুলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। তারপর ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে। আছাড় মেরে গ্লাস বা কাপ-ডিশটা ভাঙবে। ছেলেকে বলবে—'বেরিয়ে যা! দূর হয়ে যা এই মুহূর্তে! তোর মুখদর্শন করব না!' বুঝলে? চেঁচামেচিটা এমন মেকদারের হওয়া চাই যাতে বাড়ির ঝি-চাকরেরা টের পায়। অর্থাৎ ঋদ্ধির গৃহত্যাগের একটা বিশ্বাসযোগ্য এভিডেন্স থাকে।

রতন অবাক হয়ে শুনছিল। বললে, তারপর?

—তারপর তোমার স্ত্রীর মারফত ছেলেকে লুকিয়ে হাজারখানেক টাকা দেবে। দেখ, যেন আজ রাত্রেই ঋদ্ধি এক-কাপড়ে বেরিয়ে যায়।

রতন স্বীকার করে, ঠিক বুঝলাম না, চৌধুরীকাকা!

—বুঝলে না? এ তো সহজ কথা! আজ রাতেই যদি পুলিসের হুড়ো খেয়ে মুরারী কবুল খায়, তাহলে কাল ভোর রাতে তোমার বাড়ি 'রেইড' হবে! ঋদ্ধিকে বল, স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরার চেষ্টা যেন না করে। সাইকেল নিয়ে বাদকুল্লা বা শান্তিপুর চলে যেতে। সেখান থেকে যেন ট্রেনে চাপে।

রতন বলে, আর কিছু?

—না, আপাতত এইটুকুই। কাল সকালে মুরারীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সেরে আমাকে এসে রিপোর্ট কর—দুটি কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা। আমি তারপর চেষ্টা করব জেল-হাজতে মুরারীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে রাজি করাতে হবে যতীন সোমের নামটা কবুল খেতে।

—যতীন সোম?

—সেটাই সব দিক থেকে ভাল। যতীনের বিরুদ্ধে যা চার্জ আছে তাতে এটা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। গুলি খেয়ে যদি যতীন না মরে তাহলে এ অপরাধের জন্য তার জেলের মেয়াদের কোনো হেরফের হবে না! দ্বিতীয়ত, রাম-শ্যাম-যদু যাহোক একটা নাম কবুল না-খাওয়া তক্ মুরারী হাজতে অহেতুক মারধোর খেতে থাকবে। ব্যাপারটা ওকে বোঝাতে হবে—

—আর কিছু বলবেন?

—বলব। ব্যাপারটা ডেলিকেট। তবু পরামর্শ যখন নিতে এসেছ তখন সব কথাই খোলাখুলি বলা উচিত আমার। তুমি কি এটা বুঝতে পারছ যে, তোমার মাথার ওপরেও খাঁড়া ঝুলছে?

—আমার? আমি তো সাতে-পাঁচে নেই কাকা!

—সাতে-পাঁচের কথা হচ্ছে না, রতন। হচ্ছে, পুলিসের দৃষ্টিতে তোমার ভূমিকাটা। ঋদ্ধির নামটা এখনো পুলিসের সন্দেহ-তালিকায় নেই। যে মুহূর্তে মুরারী ঋদ্ধির নামটা কবুল খাবে অমনি তোমাকে পুলিসে অ্যারেস্ট করবে। তোমার ঐ অবিশ্বাস্য গল্পটা পুলিস মেনে নেবে না। ভাবতে বসবে—ব্যাটার সঙ্গে বাপও আছে এর ভেতর। না হলে একটা বরখাস্ত কর্মীর হাতে প্রেসঘরের চাবি থাকে কী করে?

রতন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

চৌধুরীমশাই নির্বিকারভাবে বলতে থাকেন, এ-কেসের সঙ্গে পুলিস তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে হয়তো জড়াতে পারবে না; তাই তোমাকে জেলের ভেতর আটকে রাখতে তারা অন্যান্য দিক থেকে আক্রমণ করবে। তোমার বাড়ি সার্চ হবে। অনেকে আবার বোকার মতো নিজের বাড়িতেই ফল্স্-সিলিঙ বানিয়ে অস্ট্রিচ্ সাজতে চায় তো!

রতনের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা কেউটে সাপ নেমে গেল।

*　　　*　　　*

স্টেজের ওপর নয়, জীবনের রঙ্গমঞ্চেও ঐ দৃশ্যটা অভিনয় করেছে রতন। বাপের কথায় জ্বলে উঠে মুহূর্তে গৃহত্যাগ করেছিল। আজ তার নুটুবিহারীর 'রোল'। কিন্তু ঐ ম্যাদামারা ছেলেটা ঠিকমতো অভিনয় করতে পারবে তো? চোখে-চোখে তাকাতেই পারে না হতভাগাটা। ক্ষিপ্ত হয়ে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করাটা কি ওর হিম্মতে কুলাবে, বাবার দেওয়া হাজার টাকা পকেটে থাকলেও? চেষ্টা করতে হবে অন্যভাবে। সুছন্দা গোঁয়ার, কিন্তু বুঝমান। সব কথা তাকে আগেভাগে বুঝিয়ে দিতে হবে। ঋদ্ধিকে ডেকে তালিম দেবার চেষ্টা বৃথা। গবেটটা বুঝবে না—কেন তাকে বিক্ষুব্ধ সন্তানের চরিত্রটা অভিনয় করতে হচ্ছে। কেন, বাপের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করাটা দরকার! বাস্তবে বাপের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারিস কি না পারিস সেটা কোন কথা নয়—এ তো অভিনয়!

বাস্তবে কিন্তু পরিকল্পনামতো দৃশ্যটা অভিনয় করা গেল না। অর্থাৎ যেটা অভিনয় করার কথা ঘটনাচক্রে সেটাই বাস্তবে ঘটে গেল।

গাড়ি গ্যারেজ করে নেমে এসেই নজর হল ঋদ্ধি সাইকেল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। তার সাইকেলের কেরিয়ারে একটা টিফিন-বাক্স। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবু জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছ এত রাতে?

যথারীতি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বলে, ছোড়দিদার কাছে। খাবারটা পৌঁছে দিতে।

—তোমাকে যেতে হবে না। পাঁড়ে দিয়ে আসবে। তুমি ওপরে এস, কথা আছে।

—কী কথা?

—কী কথা তা এখানে দাঁড়িয়ে বলব নাকি? যা বলছি শোন।

দেখা গেল অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে সুছন্দা। বললে, খাবারটা দিয়ে ফিরে আসতে ওর আধঘন্টা-খানেক লাগবে। ও ফিরে এলেই না হয় বল। তুই যা খোকন।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল রত্নেশ্বর, না! যাবে না! আমার যা বলার আছে তা এখনই বলতে চাই। খাবারটা পাঁড়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বারান্দায় বামুনদি কৌতূহলী হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্র পাঁড়ে এগিয়ে এসে সাইকেলটা ধরেছে। সেই বলে ওঠে, সাইকেলটা আমাকে দাও ছোটবাবু। আমি দিয়ে আসছি। তুমি বড়বাবুর সঙ্গে ওপরে যাও

ঋদ্ধি একটু ইতস্তত করে। তারপর রাজি হয়ে যায়।

ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে। রতন নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। টেবিলে হট-কেসে ঢাকা দেওয়া আছে কী-একটা। সাজানো আছে হুইস্কির বোতল, গ্লাস। সুছন্দা নিঃশব্দে আইস-কিউবের বৌল আর টংটা রেখে গেল। রতন নজর করে দেখে গ্লাসটা ওর একটা সৌখিন পানপাত্র—কাট-গ্লাসের। তা হোক! ঐটাকেই আছাড় মেরে ভাঙতে হবে আজ! যে প্রচণ্ড বিপদের সামনে দাঁড়িয়েছে তার কাছে ঐ সৌখিন পানপাত্রটা অকিঞ্চিৎকর। একদিক দিয়ে ভালই হল। এভিডেন্সটা এতে জোরদার হবে। মুরারীটা যদি আজ রাত্রেই কবুল খায়, আর কাল সকালে পুলিস এসে দেখে ঋদ্ধি গৃহত্যাগ করেছে, তখন এটাকে সাজানো ব্যাপার বলে মনে হবে না। সত্যিকারের হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য না হলে কেউ অমন দুর্মূল্য বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের পানপাত্র আছড়ে ভাঙে না।

রতন এসে বসল স্টাফ্‌ড্‌-চেয়ারে। ঋদ্ধি দাঁড়িয়েই রইল। রতন সরাসরি নেমে এল কাজের কথায় —মুরারীবাবুকে কাগজগুলো কে ছাপতে দিয়েছিল তুমি জান?

ঋদ্ধি চোখ তুলে চাইল না। মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে বলল, সে তো তুমিও জান। জান না?

—বাঃ! দিব্যি বোল ফুটেছে দেখছি! বাপের হোটেলে খাই আর বনের মোষ তাড়াই।

ঋদ্ধি জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

নাটক ঠিক নয়। নাটকে নির্দিষ্ট ডায়ালগ থাকে। এ অনেকটা 'কবির লড়াই' ঢঙের। কথোপকথন মুখে-মুখে তৈরি করে নিতে হচ্ছিল রতনকে—কিন্তু স্থির লক্ষ্য সেই চিহ্নিত ক্লাইম্যাক্স।

অচিরেই উপনীত হল সেখানে!

আছড়ে ভাঙল বেলজিয়ান কাট-গ্লাসের পানপাত্রটা। চিৎকার করে শুনিয়ে দিল চৌধুরীমশায়ের পরিকল্পিত ডায়লগটা।

ঋদ্ধির কোনো ভাবান্তর হল না। নতনেত্রে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই রইল। খুলে গেল পাল্লাটা। সুছন্দা এসে দাঁড়িয়েছে। পথ রুখল ঋদ্ধি। বললে, খালি পা নয় তো?

সুছন্দার পায়ে হাওয়াই চটি ছিল। সে নিঃশব্দে ভেতরে এসে রুদ্ধ করে দিল দরজাটা। স্বামীর দিকে ফিরে বললে, সব জিনিসের একটা সীমা থাকবে তো?

রতন গর্জে ওঠে, সব জিনিসের আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে। কাল সকালে উঠে যদি দেখি ও দূর হয়ে যায়নি, তাহলে নিজে হাতে আমি ওকে গুলি করে মারব।

সুছন্দা আগুনঝরা চোখে স্বামীর দিকে নীরবে তাকিয়েই রইল। ঋদ্ধি বললে, মা, তুমি একটু বাইরে যাও। নজর রেখ, কেউ যেন এদিকে না আসে। বাপির সঙ্গে আমার কিছু জরুরী গোপন কথা আছে।

সুছন্দা ছেলেকে বলে, আজ থাক বরং। শান্তভাবে বিচার করে দেখার মতো মেজাজ নেই এখন তোর বাপির।

আশ্চর্য! যেমন ছাঁ, তেমন মা! তীব্র ভর্ৎসনায় ছেলেটা চ্যাতালো না। আর স্বামী ছেলেকে নিজে হাতে গুলি করে মারতে চায় শুনে মা-ও তিলমাত্র টলল না। সবাই দার্শনিক যে!

রতন গম্ভীর হয়ে বললে, তাই ভালো। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আজ রাত্রেই সেটা বলে ফেলা ভালো। কাল তুমি সুযোগ না-ও পেতে পার। মুরারীবাবু যদি আজ রাত্রে কবুল খায়, তাহলে কাল ভোর রাতে এ বাড়ি রেইড হতে পারে।

চৌধুরীমশায়ের কাছে কথাটা শুনে সে নিজে যেভাবে চমকে উঠেছিল, ওদের তেমন কোনো ভাবান্তর হল না।

সুছন্দা শুধু বললে, অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হলেও মুরারীকাকু স্বীকার করবে না—কে তাকে ইস্তাহারটা ছাপাতে দিয়েছিল।

কী ছেলেমানুষের মতো বিশ্বাস! ওদের ধারণা নেই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পুলিস কতটা এগিয়ে যেতে পারে।

রতন এবার ঋদ্ধিকে প্রশ্ন করে, কী বলতে চাও এবার বল। অমন মাটির দিকে তাকিয়ে মিনমিনে গলায় নয়, ঝেড়ে কাশো!

আদিষ্ট হয়ে এবার বাপের দিকে তাকায়। বলে, দিনকাল পাল্টে গেছে, বাপি। তুমি আমাকে খোলা দরজা দেখিয়ে দেবে আর আমি গোঁয়াড়ের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে যাব—এ আজকাল হয় না!

—বটে! তবে আজকাল কী হয়? বাপের হোটেলেই ভালো-মন্দ সাঁটব আর তার বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াব?

ঋদ্ধি গম্ভীর হয়ে বললে, শান্ত ভাবে আলোচনা করার মেজাজ যদি তোমার না থাকে তাহলে মা যা বলছে তাই হোক—এখন এ আলোচনা বন্ধই থাক।

—বল না কী বলতে চাস?

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বাপি। সমস্যা নানান জাতের। দিদা এ বাড়িতে টিকতে পারল না—সে আজ কাশীবাসী। তুমি এ পরিবেশে সুখী নও। আমি, মা আমরা দুজনেও আর সহ্য করতে পারছি না। এতগুলো সমস্যার কিন্তু একটাই উৎস—একটাই সমাধান!

—কী সেটা? আমতা-আমতা কোরোনা। খুলে বল—তোমার কী বক্তব্য?

—তুমিই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

রতন হকচকিয়ে যায়। নিজের অজান্তেই বলে, মানে?

—হ্যাঁ। ঐটাই একমাত্র সল্যুশন! একমাত্র সমাধান। তাহলে দিদাকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারব। এই বাড়ি আর প্রেসটা তুমি মায়ের নামে লিখে দিয়ে যাও। ভেবে দেখ—অনেক ইনভেস্ট করেছ বটে, কিন্তু এ দুটি তুমি পেয়েছিলে উত্তরাধিকার সূত্রে। 'ভেনাস ট্র্যাভলস' তোমার নিজের সৃষ্টি। তার উপার্জন থেকে তোমার বাকি জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবার কথা।

রতনের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

ঋদ্ধি আরও বলে, আমার মতে মায়ের পক্ষে বেস্ট-কোর্স অব অ্যাকশন তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া...

সুছন্দা চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, খোকা!

ঋদ্ধি উত্তেজিত হয় না। শান্তকণ্ঠে বলে, চেষ্টার তো ত্রুটি করোনি মা! দু দশক ধরে গুমরে মরছ! পারলে? ধামা চাপা দিয়ে জীবনের সমস্যাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারলেই তার সমাধান হয় না। সমস্যাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। জীবনের দাবী লোকলজ্জায় চেয়ে বড়! এ বয়সে বাপির জীবনদর্শন তো পাল্টাবার নয়! ছেড়ে দাও না তাকে। যে জীবন তার কাম্য, তাতেই সে ফিরে যাক। তোমার, আমার, বাপির প্রত্যেকের একটা করেই তো জীবন? কলকাতা, বম্বে, দিল্লি যেখানেই থাক—মীনা পারেখ তার বৈধ স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত হলেই কি সবদিক থেকে শোভন হবে না? তোমার, আমার, বাপির দিক থেকে!

সুছন্দা দ্বিতীয়বার আর্তনাদ করে ওঠে চাপাস্বরে : খোকা!

ঋদ্ধি বাপের দিকে ফিরে বলে, আজ আমার পরামর্শ তুমি মেনে না নিলেও শেষ পর্যন্ত এ বাড়ি তোমাকে ছেড়ে যেতে হবেই। যেদিন বুঝবে, তোমার জীবন এখানে বিপন্ন। তোমার লাইফের ওপর অ্যাটেম্পট্ হতে পারে বুঝলে—তুমি নিজে থেকেই পালাতে চাইবে সেদিন!

রতন যেন বজ্রাহত!

—অ্যাটেম্পট্ মানে?—সুছন্দা চেপে ধরে ঋদ্ধির বাহুমূল।

—জোতদার আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ওরা 'খতম' করছে, শোননি? লোকলজ্জার ভয়ে সিঁটিয়ে থেক না মা, যা অনিবার্য, তাকে মেনে নাও! মাথা সোজা রেখে!

রতনের ইচ্ছা করছিল এবার শি্ভাস-রিগ্যালের বোতলটা আছড়ে ভাঙে। কিন্তু তার হাত উঠল না। সর্বাঙ্গ যেন তার অবশ হয়ে গিয়েছে।

ঋদ্ধি নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। কাচের আলমারি থেকে আর একটা কাচের গ্লাস নিয়ে এসে আস্তে করে নামিয়ে দিল বাপের নাগালের মধ্যে।

মায়ের দিকে ফিরে বললে, বামুনদিকে বল ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিতে। ওরা খালি পায়ে ঘোরে তো, পায়ে কাঁচ ফুটবে।

যেন সেটাই দত্তবাড়ির শেষ সমস্যা।

তারপর নিচু হয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিল। বলল, দিনকয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি। পার্টির কাজে। কবে ফিরব বলতে পারছি না।

ধীরপদে এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে।

বাপের পদধূলি নেয়নি। কিন্তু যাবার আগে সে আর একবার বাপের চোখে-চোখে তাকালো। বললে, ইতিমধ্যে তোমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে ফয়সালাটা সেরে ফেলো।

হ্যাঁ, সেই ম্যাদামারা মিনমিনে ছেলেটা এতদিনে বাপের চোখে-চোখে তাকিয়েছে। তবে তার দৃষ্টিতে না আছে আগুন, না ভর্ৎসনা, না ঘৃণা!

যেন দার্শনিকের দৃষ্টি!

তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নর্দমায় ঘাড় গুঁড়ে পড়ে থাকা মদ্যপকে।

করুণায় আপ্লুত।

কী যেন কথাটা বলেছিল মুরারীকাকু?

'কেউটে-বাচ্চার ছোঁবল'?

অবাক পৃথিবী

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীরঙীন হালদার

মনোবিজ্ঞানাদিসকলকলা পারঙ্গমেষু

রচনাকাল : জুলাই 1976
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর 1976

কৈফিয়ত

ইতিপূর্বে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কথা-সাহিত্য যা রচনা করেছি, তা মূলত বিদেশী লেখকদের ছায়াবলম্বনে। অনুবাদ না হলেও তাতে মৌলিকতা ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে তা ছিল মূলত—ছায়াবলম্বন; কখনও বা 'পেনাম্রাবলম্বন'! বর্তমান কাহিনীটি, এবং একই সঙ্গে লিখিত এবং প্রকাশিত 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' এ বিষয়ে আমার প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টা। 'রোবোটিক্স-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আমি তথ্য-সংগ্রহে বিদেশী লেখকদের কাছে ঋণী, বিশেষ করে আইজাক আজিমভের কাছে। 'রুডল্‌ফ ব্যাটলার' নামটির জন্য যাঁর কাছে ঋণী, প্রচ্ছদপটে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছি।

আরও একটি ত্রুটি স্বীকার করি। এ গ্রন্থে 'মার্কিন-নিগ্রো' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইদানিং তাঁদের 'আফ্রো-আমেরিকান' বলাই রেওয়াজ। সমকালের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি শব্দটি পরিবর্তন করিনি। মূলে তখনকার প্রচলিত ধারণায় যা লিখেছি তাই অপরিবর্তিত আছে। এতে ওঁদের অশ্রদ্ধা করা হয়নি।

নারায়ণ সান্যাল

● Do you think that, if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you could produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascists and Mr. Winston Churchill ?

[*Russell—'Why I am not a Christian'*]

● The scheme of the Universe is devilish; I could have created a better world.

[*Vivekananda—'Kathamrita',* Part II]

● Man is a rope stretched betwixt beast and Superman—a rope over an abyss.

[*Nietzsche—'Thus Spake Zarathustra'*]

● Man must either himself become a divine humanity or give place to Superman.

[*Aurobindo—'The Life Divine'*]

পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।

[রবীন্দ্রনাথ—তিনসঙ্গী]

● Thou shalt create a higher body, a primal motion, a self-rolling wheel—thou shalt create a creator.

[*Nietzsche—Thus Spake Zarathustra'*]

নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুক চিরে সৃষ্টির আদিম প্রভাতের প্রথম প্রকাশ যেন। সুরেলা যান্ত্রিক জলতরঙ্গের শব্দে সুষুপ্তি ভেঙে গেল ওর। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। প্রথমটায়—প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার সময় সকলেরই যেমন হয়, ওর মনে হল—এ কোথায়, কেমন করে এল এখানে? শরীরটা অবসন্ন, ক্লান্ত, সর্ব অবয়বে যেন জোর নেই। হাত-পা স্বইচ্ছায় বুঝি নাড়ানো যায় না। চোখের সামনে অর্ধ-গোলাকৃতি একটা চন্দ্রাতপ—স্বচ্ছ, কাচের অথবা প্লাস্টিকের। উঠে বসবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছিল, ঠিক তখনই কে যেন বলে উঠল, সুপ্রভাত ডক্টর রয়! নড়াচড়া করবেন না। আপনি খুব দুর্বল এখন। আপনার শরীরে রক্ত চলাচল হতে দিন। আপনি কোথায় আছেন, তা মনে পড়েছে? স্পেসশিপ 'ফ্রন্টিয়ার'-এর 'হাইবারনেকুলাম'-এ।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গিয়েছে। একে একে সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। আত্মপরিচয়। ও হচ্ছে ডক্টর বব্ রয়, মার্কিন নাগরিক। বয়স পঁয়ত্রিশ। পঁয়ত্রিশ? কোন হিসাবে? বছর বলতে কী বুঝি?—না, ওসব গুরুতর তাত্ত্বিক আলোচনা এখন নয়। ওর মস্তিষ্কের ইন্দ্রকোষগুলি অনেক, অনেকদিন পরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্তকণিকার সন্ধান পেতে শুরু করেছে। কোনো দুরূহ চিন্তার সময় এটা নয়। বেশ বুঝতে পারছে—হাত পা, দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের অবশতা থেকে তিল তিল করে সজীব হয়ে উঠছে—ইট-চাপা ঘাসের চাপড়া যেমন রোদ-জল পেয়ে খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

এখন আপনার শিপ-টাইম ৯ বছর ২১০ দিন ৩৬,১২০ সেকেন্ড। অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের তেরোই মার্চ—নিউ-ইয়র্ক টাইম, বেলা দশটা সতেরো। তার মানে আপনি নিদ্রাকক্ষে একাদিক্রমে পাঁচ বছর তিন মাস ছদিন ঘুমিয়েছেন। বুঝলেন?

হ্যাঁ, বুঝেছে। সওয়া পাঁচ বছর একাদিক্রমে ঘুমিয়েছে। সব কিছু এতক্ষণে মনে পড়ে গেছে। ফ্রন্টিয়ার স্পেস-শিপ নিয়ে ওরা তিনজন রওনা হয়েছিল ২০১৭ খ্রীস্টাব্দে। মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি ছাড়িয়ে ইউরেনাস-এর উপগ্রহ ট্রাইটনের উদ্দেশ্যে। পৌঁছেছিল লক্ষ্যস্থলে। অবতরণ করেনি, অবতরণের কথাও ছিল না। অত্যন্ত কাছে গিয়ে বেতার-ফোটো তুলেছে SIDE যন্ত্রের সাহায্যে, ট্রাইটনের অন্তস্তলটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছে, সবকিছু তথ্য বেতারে জানিয়েছিল মিশন-কন্টোলকে। তারপর ২০২১ খ্রীস্টাব্দে ওরা যে যার নিদ্রাকক্ষে শুয়ে পড়েছিল, ফ্রন্টিয়ারকে শেষবারের মতো পৃথিবীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে। ওরা জানত, ঘুমন্ত যাত্রীদের নিয়ে পাঁচ বৎসর পরে মহাকাশযান ফ্রন্টিয়ার এসে পৌঁছবে পৃথিবীর অভিকর্ষ এলাকায়। এ পাঁচ বছর প্রত্যাবর্তনের পথে ওরা নিষ্কর্মা। বসে থেকে যাতে অন্নধ্বংস না করতে হয়—অন্নটা অবশ্য বড় কথা নয়, তবে তিনটি প্রাণীর পাঁচ বছরের আহার্যের ভর নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ; অক্সিজেনের পরিমাণটাও—তার চেয়েও বড় কথা—নিষ্কর্মা নভোচারীদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখাটা। তাই এই হাইবারনেকুলাম-এর আয়োজন।

বিজ্ঞান লক্ষ্য করেছিল, পৃথিবীতে অনেক উষ্ণ-রক্তের প্রাণী আছে, যারা সারাটা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়—চার-ছ মাস। ঐ দীর্ঘসময়ে তাদের শারীরধর্মের অনেক স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি সাময়িকভাবে মুলতুবি থাকে। তারা খায় না, জলপান করে না, মলমূত্রাদি ত্যাগ করে না—নিশ্বাসে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় খুব কম। মহাকাশ-জয়ের একটি আবশ্যিক পর্যায় হিসাবে তাই ঐ নিয়ে গবেষণা করছিলেন কয়েকজন জীববিজ্ঞানী। গত দশকে তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। এখন কৃত্রিম পদ্ধতিতে ঐ 'হাইবারনেকুলাম'-চেম্বারে, অর্থাৎ মহানিদ্রাকক্ষে, কোনো মানুষকে পাঁচ-সাত বছর একাদিক্রমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়।

* * *

: ডক্টর রয়, আপনার শরীর এখন খাদ্যপানীয় চাইছে। আপনার ডান হাতের কাছে ঐ যে সবুজ রঙের বোতামটা আছে, সেটা দয়া করে টিপে দেবেন।

হাসি পেল রয়ের। 'দয়া করে টিপে দেবেন।' যন্ত্রের আবার ভদ্রতাবোধ? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা—যে ওকে অনুরোধ করছে—সেটা ওদের মহাকাশযানেরই একটা অঙ্গ। সেটাতে এমন ব্যবস্থা করা আছে যাতে শিপটাইম ৯—২১০—৩৬১২০-তে আপনা থেকেই সদ্য-জাগরিত নভোচারীকে সে নির্দেশ দিয়ে যাবে। তাই যন্ত্রটা ভদ্রতা করলেও বব্ 'ধন্যবাদ' জানালো না ঐ বধির যন্ত্রটাকে। হাত বাড়িয়ে নির্দেশিত বোতামটা টিপে দিল। তৎক্ষণাৎ স্টেনলেস্ স্টিলের একটা কলের হাত দেওয়াল-গাত্র থেকে এগিয়ে এল। সে হাতে ফিডিং বোতল জাতীয় একটা প্লাস্টিকের পাত্র। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ধেড়ে খোকা এবার সেই ফিডিং বোতল থেকে চুকচুক করে উষ্ণ পানীয়টা থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

আরও পাঁচ মিনিট পরে বব্ উঠে বসল। বেল্ট-এর বাঁধনগুলো খুলে দেয়। বোতাম টিপে নিদ্রাকক্ষের ঢাকনাটাও খুলে ফেলে। বেরিয়ে আসে মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় কক্ষে, যে কক্ষটা চক্রযানের মতো ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে—ওদের কিছুটা অভিকর্ষ দান করতে। আস্তে আস্তে ও এগিয়ে আসে পাইলটের কক্ষে। সেখানে বসেছিল ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহচর ডক্টর ওয়াম্বাসী। নিকষকালো নিগ্রো যুবক। বব্‌কে দেখতে পেয়ে ঝকঝকে একসার দাঁত বার করে হেসে বললে, সুপ্রভাত। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

কাল রাত! পাঁচ বছর ব্যাপী দীর্ঘ সুষুপ্তির নাম—'কাল রাত?' সে তো কালরাত্রি। বব্ বললে, তোর ঘুম ভেঙেছে কতক্ষণ?

: ৩৫৫২০-তে অর্থাৎ দশ মিনিট আগে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

: সনফেবিচটা ওঠেনি?

ওয়াম্বাসী তার দীর্ঘ আয়ত চোখ দুটি বন্ধুর দিকে মেলে নির্বাক বসে রইল। জবাব দিল না। তখনই, ঠিক তখনই ববের মনে পড়ে গেল নিদারুণ সত্যটা। ইলিংওয়ার্থ নেই! মারা গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে। ওরা রওনা হয়েছিল তিনজন; ফিরছে দুজন। যাত্রার দিনে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য অভিনন্দন বাণী পেয়েছিল ওরা তিনজন। দিনদশেক ক্রমাগত টি. ভি. স্ক্রিনের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। প্রত্যাবর্তন মুহূর্তেও আয়োজনটা কী জাতের হবে তা আন্দাজ করতে পারে। নিউ-ইয়র্কে ওরা প্রবেশ করবে বিজয়ী রোমান সেনাপতির মতো—কিন্তু ইলিংওয়ার্থের অনুপস্থিতি সেই বিপুল আনন্দ উৎসবের মাঝখানে একটা কাঁটা হয়ে জেগে থাকবে! ইলিংওয়ার্থের মৃতদেহকে তারা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে—মহাকাশে। শনিগ্রহের অমোঘ আকর্ষণে সে চলে গেছে অজানা রাজ্যে।

: আয়াম সরি!—আসন গ্রহণ করতে করতে বব্ বললে।

: না, দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, জানিস, ও হতভাগা মরেনি। মনে হয়, এখনই যেন দু-নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সনফেবিচটা আমার পিঠে একটা বিরাশিসিক্কা থাপ্পড় মেরে বলবে—হাই নিগার! হাউ গোজ দ্য ওয়ার্ল্ড?

ওরা তিনজন ছিল প্রাণের বন্ধু। বাস্টার্ড রয়, নিগার ওয়াম্বাসী আর সনফেবিচ ইলিংওয়ার্থ। একই বয়সি। এ মহকাশযানে রওনা হওয়ার আগে দীর্ঘদিন একই ট্রেনিং ক্যাম্পে একত্রে শিক্ষানবিশীর পালা সাঙ্গ করে এসেছে। বন্ধুত্বটা এত গাঢ় ছিল যে, ওরা দুই শ্বেতকায় বন্ধু ওকে ডাকতো 'নিগার' বলে—ওয়াম্বাসী রাগ করত না। ভালুকের মতো সাদা দাঁত বের করে হাসত। তেমনি ও বব্‌কে ডাকত 'বাস্টার্ড' বলে, আর ইলিংওয়ার্থকে 'সনফেবিচ' নামে। বব্ রয়ের সত্যই পিতৃপরিচয় নেই, কিন্তু সেটাকে গোপন করার মানসিকতাও নেই ওর। একবিংশতি শতাব্দীর মার্কিন সমাজে ওটা কোন কথাই নয়। বস্তুত বব্ বুঝে উঠতে পারে না—ওটাকে ওয়াম্বাসী এত গুরুত্ব দেয় কেন! বব্ বলত, আচ্ছা সত্যি করে বল তো নিগার, 'বাস্টার্ড' কথাটা কি গালাগাল? তাহলে আমাকে 'বাস্টার্ড' নামে ডেকে তুই এতটা খুশিয়াল হয়ে উঠিস কেন?

: তুই বা আমাকে 'নিগার' নামে ডেকে এত খুশিয়াল হয়ে উঠিস কেন?

: সেটা গালাগাল বলে নয়, তুই 'নিগার', তাই তোকে 'নিগার' ডাকি।

: একই কথা! তুই বাস্টার্ড, তাই তোকে বেজন্মা বলে ডাকি। তবে হ্যাঁ, আমার মনে হয়—তোর-আমার দুজনেরই একই অবস্থা। আমরা দুজনেই গত শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী অবচেতন মনের তাগিদে ঐ আচরণটা করি।

: কী রকম?—কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইত বব্।

: একদিন শ্বেতাঙ্গ সমাজ এই কৃষ্ণবর্ণের জন্য আমাদের ঘৃণা করত—ধর শতখানেক বছর আগেও। তখন তোদের সমাজের লোকেরা আমাদের উল্লেখ করত 'নিগার' বলে। আমরা আলাদা এলাকায় অন্ত্যেবাসীর মতো থাকতাম—শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মেলামেশাটা হত ওপর ওপর। কোনো নিগ্রো যদি কোন সাদা-চামড়া-মেয়ের প্রেমে পড়ত, তাহলে তাকে ঠ্যাঙানি খেতে হত। এখন অবশ্য অবস্থা অত খারাপ নয়, তবু আজও তোরা মনের গভীরে—

বাধা দিয়ে বব্ বলত, ওটা তোর একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, অহৈতুকী হীনম্মন্যতা। এখন সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, সাদা-কালোয় কোনও তফাত নেই। না, থাক, তর্ক করিস না। বরং বল, তাহলে তুই আমাকে 'বাস্টার্ড' নামে ডাকিস কেন?

: একই কারণে। আজ থেকে তিন-চার শ' বছর আগে তোদের শ্বেতকায় পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা অঞ্চল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধরে আনত। তোরা তখন দক্ষিণে আর পশ্চিমে নূতন রাজ্য আবিষ্কারে মেতেছিস—খেতে-খামারে, তুলার চাষে, কলের তাঁতে মজদুরের প্রচণ্ড চাহিদা। তোরা ঐ কালা আদমিদের ক্রীতদাস করে রাখতিস। বংশবৃদ্ধি হলেই তোদের লাভ—তাই পুরুষ-নারীর সহবাসে তোদের পূর্বপুরুষেরা আপত্তি করতেন না; কিন্তু নিগ্রোদের বিবাহ করবার অধিকার ছিল না।

: সে আবার কী? বিয়ে দিলে আপত্তি কিসের?

: শ্বেতাঙ্গ মালিকরা ভাবত—বিয়ে করলেই একটা মমতা জন্মায়, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা এই সব চিন্তা আসে। তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেশের বিভিন্ন খামারে প্রয়োজনমতো প্রেরণ করায় অসুবিধা। তাই তারা বলত—ওয়েল নিগার, বাচ্চা পয়দা কর, আমরা স্লেভ-মার্কেটে গিয়ে তাদের বিক্রি করব; কিন্তু বিবাহ—নৈব নৈব চ।

বব্ রয় নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক—ইতিহাস, সাহিত্য, ললিতকলার ধার ধারে না। ওয়াম্বাসীর পরিবেশিত তথ্যটা তার জ্ঞানসীমার বাইরে। প্রতিবাদ করে বলত, দূর! ও সব বাজে গুজব। নিগারদের প্রচার।

ওয়াম্বাসী হেসে বলত, তুই 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এর নাম শুনেছিস?

: নেভার হার্ড অব ইট! কোনো ফিল্ম? টি. ভি-তে দেখিয়েছে?

ওয়াম্বাসী হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে। এই হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি। ওরা ধৈর্য ধরে বই পড়তে পারে না! বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ওদের যেটুকু পরিচয় তা ঐ সেলুলয়েডের মাধ্যমে। বললে, তাহলে আমার কথাটা মেনে নে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিল বেজন্মা—আমরা সেই বেজন্মার বংশধর। যেহেতু আমাদের আদিপুরুষদের বিবাহ করবার অধিকার ছিল না। মজা হচ্ছে, এই তিন-চার শ' বছরে চাকা একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ আজ বিবাহ-বন্ধনটাকে একটা অহেতুক বোঝা বলে মনে করছে, পারিবারিক বন্ধনটাকে প্রিমিটিভ ভাবছে। তোরা বিবাহের বদলে 'টেম্পোরারি ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট' আইন পাস করিয়ে নিয়েছিস। অথচ রক্ষণশীল মার্কিন নিগ্রো-সমাজ এখনও বিবাহের বন্ধনটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাই হয়তো অবচেনতার তাগাদায় আমিও তোকে ঐ নামে ডেকে আনন্দ পাই।

বব্ প্রসঙ্গ বদলে বললে, টেপ্‌টা শুনেছিস? গত পাঁচ বছরে পৃথিবী কতটা বুড়িয়েছে?

ওয়াম্বাসী বললে, না। এই তো মিনিট-দশেক আগে এসে বসেছি। টেপ্‌টা চালাই?

একটা বোতাম টিপে দিল সে। টেপ-রেকর্ডারের স্পুলটা নিঃশব্দে পাক খেতে থাকে।

স্থির হয়েছিল, ওরা মহানিদ্রা-কক্ষে প্রবেশ করার পর পৃথিবী থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে নিউজ বুলেটিন আসবে এবং স্বয়ংক্রিয় শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রে তা সঞ্চিত হয়ে থাকবে। যাতে পাঁচ বছর পরে ঘুম থেকে উঠে ওরা সেই টেপ্‌টা বাজিয়ে গত পাঁচ বছরের সংবাদের চুম্বকসার শ্রবণ করে ওয়াকিবহাল হতে পারে। আশ্চর্য! স্পুলটা নিঃশব্দে ঘুরেই গেল। টুঁ শব্দটি করল না।

: ব্যাপার কী বল তো? কোনো কিছুই তো রেকর্ড হয়নি?

: তাই তো দেখছি! ওয়াম্বাসী টেপ্‌টাকে উল্টো দিকে রিওয়াইন্ড করে আবার চালু করল। শেষ শব্দ যা রেকর্ড হয়ে আছে তা ওদেরই কণ্ঠস্বর : হ্যালো মিশন-কন্ট্রোল! ফ্রন্টিয়ার থেকে বলছি। ক্রমিক সংখ্যা ৭৬২৮। প্রোগ্রাম মতো ফ্রন্টিয়ার এই শেষবারের জন্য গতিমুখ পরিবর্তন করল। এবার আমরা পৃথিবীর দিকে ফিরে চলেছি। এখন আমরা দুজন মহানিদ্রা-কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। স্বয়ংক্রিয় কম্পুটার শুধু পাহারায় জেগে রইল। গুডবাঈ এ্যান্ড গুডনাইট!

ব্যস। আর কিছু নয়। এরপর টেপ্‌-রেকর্ডারের নিঃশব্দ চক্রাবর্তন!

বব্‌ বলে, নিশ্চয় কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল হয়েছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে মিশন-কন্ট্রোল কোনও 'মেসেজ' পাঠায়নি—এ হতেই পারে না!

ওয়াম্বাসী বলে, কিন্তু যান্ত্রিক গণ্ডগোল হলে তা ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রে ধরা পড়ত।

: তা ঠিক! আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় আছি?

ওয়াম্বাসী ইলেকট্রনিক কম্পুটারের শরণাপন্ন হয়। মুহূর্তমধ্যে অঙ্ক কষে কম্পুটার ওদের জানিয়ে দিল সৌরমণ্ডলে ওদের বর্তমান অবস্থানটা। ওয়াম্বাসী বললে, মঙ্গলের কক্ষপথ আমরা অনেক আগেই অতিক্রম করেছি। পৃথিবীর দূরত্ব এখন সাড়ে-চার-মিনিট। তার মানে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বে পৌঁছে যাব।

: পৃথিবীকে একবার ধর তো?

ওয়াম্বাসী টি. ভি. যন্ত্রের কতকগুলি বোতাম টিপে মিশন-কন্ট্রোলের বেতার তরঙ্গকে ধরবার চেষ্টা করল। আশ্চর্য! এবারও কোনও শব্দ ভেসে এল না। এটা কেমন করে সম্ভব? পৃথিবী জানে, অন্তত মিশন-কন্ট্রোল সন্দেহাতীতভাবে জানে, ওরা এতক্ষণে মহানিদ্রা-অন্তে জেগে উঠেছে। গত পাঁচ বছর ধরে মিশন-কন্ট্রোল কেন নীরব হয়ে আছে তার কোনো যুক্তি-নির্ভর হেতু অবশ্য নেই; কিন্তু এই মুহূর্তটিতে শুধু পৃথিবী নয়—চাঁদ, মঙ্গল এবং একাধিক স্কাই-ল্যাব কি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওদের কণ্ঠস্বরের জন্য অপেক্ষা করছে না?

: হ্যালো মিশন-কন্ট্রোল! দিস্‌ ইজ্‌ ফ্রন্টিয়ার। তোমরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? ওভার।

নয় মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মিশন-কন্ট্রোল সাড়া দিল না।

: ব্যাপার কী! আচ্ছা চাঁদ কিংবা মঙ্গলকে ধর তো?

পর্যায়ক্রমে ওয়াম্বাসী পৃথিবীর একাধিক শক্তিশালী মহাকাশ স্টেশনকে ধরবার চেষ্টা করল। চন্দ্রলোকের ক্লেভিয়াস ও কোপারনিকাস্‌ বেস্‌-এ দুটি প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসানো হয়েছে বছর বিশ-পঁচিশ আগে। তার ফ্রিকোয়েন্সিও ওদের মুখস্থ। তারও ধরে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। সৌরমণ্ডলের এ অংশ অপরাংশের মতোই অদ্ভুতভাবে স্তব্ধ।

বব্‌ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, না, এ হতে পারে না। একমাত্র সমাধান আমাদের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা গন্ডগোল করছে। সেটা নিশ্চয় বছর-পাঁচেক আগেই অকেজো হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে পৃথিবী কোনো সংবাদ পাঠায়নি, এ হতে পারে না।

ওয়াম্বাসী বলে, পাঁচ বছরের কথা ছেড়ে দে। এখন কেউ কোনো শব্দ করছে না কেন? কোনো রেডিয়ো স্টেশনে কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে না কেন?

: বললাম তো! এ সমস্যার একটিমাত্র সমাধান। আমাদের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়ে আছে।

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকে।

: কী? ঘাড়-নাড়া বুড়োর মতো মাথা দোলাচ্ছিস যে?

: বললাম তো! বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেলে ফল্ট-ডিটেক্টার যন্ত্রে ঐখানে লালবাতিটা তা আমাদের জানিয়ে দিত।

: তাহলে বলব, ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রটাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে!

ওয়াম্বাসী জবাব দেয় না। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে।

বব্ চিৎকার করে ওঠে, ফর হেভেনস্ সেক! যা হোক কিছু বল্! তুইও যে মিশন-কন্ট্রোলের মত 'বম্' মেরে গেলি?

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে মুখটা তোলে। বলে, কী কথা বলব বব্? যা বলব, তা তুইও ভাল রকম জানিস্। পর পর তিন সেট ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্র লাগানো আছে ফ্রন্টিয়ারে। একটা অকেজো হলেই দ্বিতীয়টা চালু হবে; সেটা বিগড়োলে তৃতীয়টা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চালু হবে। তুই জানিস না?

বব্ অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, জানি, জানি, সব জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে কি আমাদের ধরে নিতে হবে না যে, তিন-তিনটে ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রই এক্যোগে বিকল হয়ে পড়েছে?

ওয়াম্বাসী রাগ করে না। বুঝতে পারে তার বন্ধুর মনের অবস্থা। বলে, এ ছাড়া যখন বিকল্প কোনো সমাধান নেই তখন সেই 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান' সম্ভাবনাটাই মেনে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের তিনটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র এবং তিনটি ত্রুটিনির্ধারক যন্ত্র একযোগে বিকল হয়ে গিয়েছে।

*   *   *

বাহাত্তর ঘন্টা পরের কথা।

পৃথিবী থেকে এখন ওদের দূরত্ব পৌনে চার লক্ষ কিলোমিটার। প্রায় যে দূরত্বে একমুখী চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এ কদিন ওরা দুজনে কথা বলেছে খুব কম। ওরাও যেন যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যেন দুজনেই মনে মনে জানে, ঐ নিতান্ত অদ্ভুত কাকতালীয় দুর্ঘটনা ছাড়া—যাকে ওয়াম্বাসী বলেছিল 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান-চান্স', কোটিতে গুটিক—সেটা ছাড়া এই বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতার একটা বিকল্প সমাধানও হতে পারে। অর্থাৎ ওদের বেতার যন্ত্রটা ঠিকই আছে—কিন্তু বিশ্ব-চরাচর স্তব্ধ হলে সে শব্দ ধরবে কোথা থেকে? এই যুক্তিটার সূত্র ধরে যদি উৎসমুখের দিকে এগিয়ে চলতে থাক তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা মহাপ্রলয়ঙ্করী, এমন একটা নারকীয় পরিস্থিতির সম্মুখে উপনীত হতে হয় যা সজ্ঞান চিন্তায় ভাবাই যায় না। উচ্চারণ করা চলে না এমন কি এই মহাকাশযানের নির্জনতম কক্ষে, প্রাণের বন্ধুর কাছেও। দুজনেই জানে—কথাটা দুজনেই জানে। বব্ অনেকবার ঐ নিকষকালো মানুষটার আয়ত চোখের মণিতে সেই প্রলয়ঙ্করী কথাটার প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠতে দেখেছে; উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেছে, আর কোনো বিকল্প সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে?

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে শিরশ্চালনে অস্বীকার করেছে।

আবার ওয়াম্বাসী হয়তো লক্ষ করেছে—দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে বসে থাকা ববের মুখে ফুটে উঠেছে মহামৃত্যুর এক ভয়ঙ্করী প্রতিচ্ছায়া। শিউরে উঠে বলেছে, কী ভাবছিস বল তো?

বব্ চমকে উঠে আত্মস্থ হয়েছে। বলেছে, ভাবব আবার কী? যন্ত্রগুলোই বিকল হয়ে গিয়েছে। আর কী হতে পারে?

অগত্যা দুজনেই চেষ্টা করেছে—বন্ধুর মনে প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে। অনিবার্য চিন্তাটাকে চাপা দিতে পুরানো দিনের স্মৃতির রোমন্থন করেছে। ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পের জীবনের কথা। যাত্রা-মুহূর্তে ওদের সংবর্ধনার কথা। যে সনফেবিচের প্রসঙ্গ তার মৃত্যুর পরে ওরা আদৌ আলোচনা করেনি তার কথা। বব্ বিবাহিত—মানে, 'এক্সপেরিমেন্টাল ম্যারেজ'—পরীক্ষামূলক বিবাহ। মহাকাশে ভেসে পড়ার আগে বছর দুই ক্লারা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সে সাময়িক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। কন্ট্রাক্ট এতদিনে শেষ হয়েছে। ক্লারা হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আর কারও ঘরনি। ওয়াম্বাসী অবিবাহিত। দেশে, টেক্সাস অঞ্চলের এক খামারবাড়িতে আছে ওর বাবা, মা, দাদা, ছোট বোন। একটি ভ্রমরকালো

মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেমপর্বও চলছিল—ও মহাকাশ যাত্রায় রওনা হয়ে পড়ায় বিবাহটা হয়নি। এতদিনে সে মেয়েটিও নিশ্চয় আর কারো সন্তানের জননী হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল একুশ, এতদিনে প্রায় ত্রিশ। এই সব গল্পই করেছে দুজনে। এমনকি প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তে ওদের কীভাবে সংবর্ধনা জানানো হবে—সে কথাটাও আর আলোচনা করেনি।

ওয়াম্বাসী দূরবিনে চোখ লাগিয়ে বসেছিল। বললে, মাত্র আটশ' কিলোমিটার অল্টিচুড এখন। পৃথিবীকে দেখ্ একবার—

বব্ বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটার কাঁটাটাকে সহস্রতমবার ধীরে ধীরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে নিয়ে যেতে ব্যস্ত ছিল। কোথাও কোনো সাড়া নেই। এই আটশ' কিলোমিটার দূরত্বে পৃথিবীর সংখ্যাতীত রেডিয়ো স্টেশনের কলকণ্ঠ ওদের বেতারে মুখরিত হয়ে ওঠার কথা। অথচ আশ্চর্য। অবাক পৃথিবী অবিশ্বাস্য রকমে নীরব। বব্ বললে, কী দেখ্‌ছিস? ওটা পৃথিবীই তো? আমাদের লক্ষ্যমুখ অজান্তে কোনো রকমে ঘুরে যায়নি তো? ওটা অন্য কোনো গ্রহ নয়?

: তাই তো বল্‌ছি। তাকিয়ে দেখ একবার।

বব্ দূরবিনের আই-পিসে চোখ লাগালো। না, কোনো ভুল নেই।—পৃথিবীই। এখন আর আলোকবিন্দু নয়। খালিচোখেই পৃথিবী আধখানা আকাশ আড়াল করে রেখেছে। দূরবিনের কাছে তার রূপরেখা স্পষ্ট দেখা যায়—পাহাড়, সমুদ্র, এমনকি নদী। পৃথিবীর ওপর একটা ঘন মেঘের নীলাভ আস্তরণ আছে বটে, তবু সূর্যালোকিত অংশটার অনেকখানি আবহাওয়ার ছিদ্র ভেদ করে দেখা যাচ্ছে। পরিচিত মানচিত্র। এশিয়ার পূর্বাংশের কিছুটা আর অস্ট্রেলিয়া। তবে মানচিত্রে দেখা মার্কেটার-প্রজেকশনের পৃথিবীর সঙ্গে কিছুটা প্রভেদ আছে। টিশিয়ানের মডেল যেন এল গ্রেকোর তুলিতে ধরা পড়েছে। সবকিছুই একটু লম্বাটে ধরনের। বব্ অনেকক্ষণ ঐ মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে বললে, আশ্চর্য! অন্ধকার অংশটা তাহলে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল। এই আটশ' কি.মি. দূরত্ব থেকেও দেখতে পাচ্ছি না—?

: কী দেখবি? ওখানে তো রাত্রি!

: হ্যাঁ, তাই তো দেখতে চাইছি! ঐ ঘনান্ধকার অংশটায় আছে সানফ্রানসিস্কো, লস্ এ্যাঞ্জেলেস, হলিউড, ডালাস! কোথায় তার রোশনাই?

: তার মানে কি বুঝতে হবে—? ওয়াম্বাসী মাঝপথেই থেমে যায়।

বব্ ধমকে ওঠে, ওসব অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার কোনো অর্থ হয় না। হয়তো ওদিকটায় ঘন মেঘ আছে—তাই আলো দেখা যাচ্ছে না। সে যাই হোক, এখন কী করা যায়?

: আর কাছে না গিয়ে এই দূরত্বেই বারকয়েক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে দেখা যেতে পারে।

অগত্যা ওরা একই দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ওয়াম্বাসীর মনে পড়ল, প্রায় ষাট বছর আগে এই দূরত্বেই বিশ্বের প্রথম নভোচারী উরি গ্যাগারিন প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ওরা দুজন কি বিশ্বের শেষ নভোচারী—মাঝপথেই চিন্তাটাকে অসমাপ্ত রাখল ওয়াম্বাসী।

কিন্তু বব্ পারল না। তার বোধ করি মনে হল, অনিবার্য দ্বিতীয় বিকল্প সম্ভাবনাটার বিষয়ে আলোচনা করার সময় হয়েছে। মিথ্যা সৌজন্যবোধ। মিথ্যা সঙ্কোচ। যদি তাই হয়ে থাকে তবে—

বললে, ওয়াম্বাসী, এমনও তো হতে পারে—মানব-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে!

: শাট আপ! য়ু বাস্টার্ড!—প্রচণ্ড ধমকে ওঠে ওয়াম্বাসী।

বব্ রাগ করে না। বুঝতে পারে, ওয়াম্বাসী নিজেকেই ধমক দিচ্ছে। নীরবে প্রতীক্ষা করে সে। ওয়াম্বসী নিঃশব্দে একবার কক্ষটা পরিক্রমা করে আসে। এখন ওদের গতিবিধি অনেকটা স্বাভাবিক। ওয়াম্বাসী ফিরে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, ওয়েল! কথাটা আমারও মনে হয়েছে। হয়তো তাই ঘটেছে।

: কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে? পৃথিবীর সাড়ে ছয় শত কোটি মানুষ! চাঁদ, মঙ্গল—

: বুঝলাম। কিন্তু এর মানে কী? সারা পৃথিবীতে কোনো শহরে আলো জ্বলছে না। কোনো রেডিয়ো স্টেশন সজীব নেই! আর কী হতে পারে?

দু-হাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে বসে ছিল বব্! দুটি আর্ত চোখ তুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, জানি না—আমি জানি না! বিশ্বাস কর, আমি জানি না।

ওয়াম্বাসী বলতে থাকে, এত বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কী কী কারণে? সূর্য যে নোভায় রূপান্তরিত হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হোক প্রাণহীন, তবু পৃথিবী টিকে আছে, আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং সূর্যের তাপ বিকিরণ ছন্দে কোনো তারতম্য ঘটেনি। ফলে একটি মাত্র সমাধানই হতে পারে বব্। এই পাঁচ বছরের ভেতর সেই দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটা ঘটে গেছে। শতাব্দী-সঞ্চিত থার্মোনিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রে—

: না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো বব্ রয়। তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, যেন এখনই মেরে বসবে ঐ কালো নিগারটাকে। বললে, না, তা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে চাঁদে কিংবা মঙ্গলে মনুষ্য-সভ্যতা বিলুপ্ত হত না। ঐ বাস্টার্ডদের থার্মোনিউক্লিয়ার বম্ব যত শক্তিশালীই হক—চাঁদে বা মঙ্গলে পৌঁছতে পারে না।

ওয়াম্বাসী ওকে মনে করিয়ে দিল না—এই একবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজে 'বাস্টার্ড' শব্দটা কোনো গালাগাল নয়। সে বললে, হয়তো চাঁদ এবং মঙ্গলও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

: না। তাছাড়া ভেবে দেখ্ ওয়াম্বাসী—বিশ্বযুদ্ধ হয় কেন? মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবের যুদ্ধবাজ তাদের স্বার্থে যুদ্ধ বাধায়—মাঝে মাঝে যুদ্ধ না হলে তাদের মারণাস্ত্র নির্মাণের কারখানা অচল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে তারা নিজেরা কিন্তু কোনোদিনই মরে না—কারণ তারা বসে থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক অনেক দূরে। মানব সভ্যতার ইতিহাস তার সাক্ষী। এমন আত্মঘাতী যুদ্ধ তারা কিছুতেই বাধতে দেবে না, যাতে তারা নিজেরাই উজাড় হয়ে যাবে!

ওয়াম্বাসী বলে, তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হয়।

: সেটা কী?

: তুই এইচ. জি. ওয়েল্স-এর 'দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস্' পড়েছিস?

বব্ ধমকে ওঠে, টু হেল উইথ এইচ. জি. ওয়েলস্! না, তার নামই শুনিনি। কী বলতে চাইছিস স্পষ্ট করে বলবি?

ওয়াম্বাসী তার আশ্চর্য চোখ জোড়া মেলে বললে, সূর্য যে নোভায় রূপান্তরিত হয়নি এটা প্রত্যক্ষ সত্য। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এভাবে গোটা মানব-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না—কথাটা তোর। আর একটা সম্ভাবনা—ধর এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমে পাক খেতে খেতে গোটা সৌরজগৎ এমন একটা বিষবাষ্পের বলয়ের মধ্য দিয়ে চলে গেল যেখানে জীব বাঁচতে পারে না। তাও মেনে নিতে পারি না—কারণ সেক্ষেত্রে চাঁদ এবং মঙ্গল এভাবে মৃতদেহে পরিণত হত না, তারা শীতাতপ-বাষ্প-নিরোধক কৃত্রিম আবহাওয়ায় বাস করে। পৃথিবীতেও নিশ্চয় সেক্ষেত্রে জীবন এভাবে নিঃশেষিত হত না। এ দুর্দৈবকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু সভ্য এবং উচ্চকোটির মানুষের নিশ্চয়ই থাকত। তারা মরত না। তারা আমাদের বেতার-বার্তা ধরত এবং প্রত্যুত্তর করত।

ওয়াম্বাসী একটু দম নেবার জন্য থামতেই বব্ বলে ওঠে, পাণ্ডিত্য জাহির তো হল, এবার আসল কথায় আসবি?

: একমাত্র সমাধান— 'ওয়ার অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ডস্'! সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে হয়তো আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান কোনো জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। তারাই নিঃশেষে ধ্বংস করেছে মানব সভ্যতা—পৃথিবীতে, চাঁদে, মঙ্গলে, অসংখ্য স্কাইল্যাবে! হয়তো বিশ লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করতে 'মানুষ' নামে বেঁচে আছি শুধু তুই আর আমি!

কয়েকটি মুহূর্ত নির্বাক থাকে বব্ রয়। ব্যাপারটা ঠিক মতো অনুধাবন করতে। তারপর চিৎকার করে ওঠে : এ্যাবসার্ড!

: কেন অসম্ভব?—জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: একাধিক যুক্তিতে। প্রথম কথা—ভিন্ন নক্ষত্রের কোনো গ্রহবাসী যদি পৃথিবীতে আসে তাহলে

তারা সংখ্যায় কতজন হতে পারে? দু-দশ জন? একশ জন? দূরত্বটা একবার ভেবে দেখ! যতই শক্তিশালী হক, ঐ মুষ্টিমেয় মানুষ ছয়শত কোটি পৃথিবীবাসীকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—সারা পৃথিবী, মায় চাঁদ আর মঙ্গলকে তারা ধ্বংস করতে চাইবে কেন? সামান্য ঐ কজন লোকের পক্ষে এতটা জায়গার প্রয়োজন হতেই পারে না। তারা যদি বেশি ক্ষমতাশালী হয়, তাহলে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতে পারে; কিন্তু রাজা হতে হলে কিছু প্রজারও তো দরকার? সুতরাং যদি ধরেও নিই যে, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করবার ক্ষমতার তারা অধিকারী, তবু তারা সে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করত না। পৃথিবীকে ক্রীতদাসে পরিণত করত।

: আর তারা যদি সংখ্যায় মাত্র দু-চারশ জন না হয়! ধর তারা যে ভিন্ন নক্ষত্রের গ্রহে বাস করছিল, কোনো কারণে সেটা আর বাসোপযোগী না হওয়ায় তারা দলে দলে—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রকেট নিয়ে পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করতে এসে থাকে?

: দশ-বিশ-ত্রিশ লাইট ইয়ার পাড়ি দিয়ে? কত হাজার বছর সময় লাগবে—

বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, হিসাবটা তুই একবিংশ শতাব্দীর মনুষ্য বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করছিস বব্। ওরা যদি আলোর গতি লাভ করে থাকে তবে ওদের সময় লাগবে মাত্র দশ-বিশ-ত্রিশ বছর।

বব্ বলে, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! সেটা অসম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে নয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে বলব, তাহলে আমরা পৃথিবীতে আলো জ্বলতে দেখতাম। বিজয়ী বীরদের বিজয়োৎসব। আমাদের বেতার সঙ্কেতের সাড়া পেতাম। ওরা হুকুম করত আমাদের আত্মসমর্পণ করতে।

: সুতরাং?

: সুতরাং হয় তুমি-আমি দুজনেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি, কিম্বা দুজনেই স্বপ্ন দেখছি, অথবা এমন একটা কিছু ঘটেছে যার সমাধান তোর আমার আই. কিউ. দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।

: না হয় তাই হল! এখন কী করতে চাস?

: কী করে পৃথিবীতে নামা যায় সেটাই হিসাব করে দেখা যাক।

কাজটা দুরূহ, অত্যন্ত দুরূহ—প্রায় অসম্ভব। কারণ এর কোনো প্রস্তুতি নেই। এমন কথা ছিল না। কথা ছিল—'ফ্রন্টিয়ার' পৃথিবীর কাছাকাছি এলে অবতরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে মিশন-কন্ট্রোল। নভোচারীরা জানত না—ওরা কখন, কীভাবে, কোথায় নামবে। সেটা জানত মিশন-কন্ট্রোলের কয়েকটি ইলেক্‌ট্রনিক ব্রেন। ওদের কাজ ছিল শুধু বোতামটা টিপে দায়িত্বটা মিশন-কন্ট্রোলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায়। স্পেস-শিপের অবতরণ এখন এমনই ডাল-ভাত যে, ওরা এক বর্গকিলোমিটার টার্গেটের ভেতর সমুদ্রবক্ষে যে কোনো মহাকাশযানকে নামাতে পারে। সেখানে অপেক্ষা করে কোনো জাহাজ। নভোচারীদের তুলে আনা হয় হেলিকপটারে; আর মহাকাশযানটাকে গাধাবোটের মতো বেঁধে বন্দরে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে ওদের মিশন-কন্ট্রোলের কোনো নির্দেশ পাওয়ার আশা নেই। ইলেকট্রনিক কম্পুটারের নির্দেশে সমুদ্রের কোনো নির্বাচিত অংশে প্রায় আন্দাজে অবতরণ করতে হবে। মহাকাশযানের পশ্চাদ্‌ভাগের ফিউসেলেজ-এ এখনও কিছুটা পারমাণবিক বিস্ফোরক আছে। ভীমবেগে যাতে সমুদ্রবক্ষে আছড়ে না পড়তে হয় তাই বিপরীতমুখী বিস্ফোরণে গতিবেগ সংযত করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন—কোথায় নামবে? মহাসমুদ্র বিশাল—আদিগন্ত; কিন্তু মহাকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের কাছে সেই মহাসমুদ্র একটা অতি ক্ষুদ্র গোষ্পদ। বুলস্-আইয়ের সূচিমুখ থেকে এক ডিগ্রি কোণের শতভাগের একভাগ ভ্রমক্রমে সরে গেলেই গন্তব্যস্থল কয়েক শত মাইল এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। প্রশান্ত মহাসাগরের বদলে হয়তো আছাড় খেয়ে পড়বে হাওয়াই দ্বীপে; কিংবা মাইক্রোনেশিয়া-মেলানেশিয়ার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপের কোনো কঠিন ভূ-ভাগে! অপরপক্ষে ম্যাপ দেখে যদি এমন কোনো সমুদ্রবক্ষ বেছে নেয় যার শত শত মাইলের ভেতর কোনো দ্বীপ নেই—তাহলেই বা সমাধান হচ্ছে কোথায়? ওদের মহাকাশযানে একটি ছোট লাইফবোট আছে, দাঁড়ও আছে—মাত্র কয়েক

ঘন্টা শুধু ভেসে থাকার আয়োজন। তার সাহায্যে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপকূলভাগে পৌঁছানো যায় না।

সমস্যাটা ওরা দুজনেই জানে। তাই ববের আহ্বানে ওরাম্বাসী কোনো সাড়া দেয় না। দুই বন্ধু মুখোমুখি নির্বাক বসে থাকে। ফ্রন্টিয়ার অনিবার্যভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

*　　　*　　　*

: হ্যালো ফ্রন্টিয়ার!

আঁতকে ওঠে দুজনেই। একই সঙ্গে। না, মতিভ্রম নয়, তাহলে দুজনে একই খণ্ডমুহূর্তে ওভাবে শব্দতরঙ্গটা একসঙ্গে শুনতে পেত না। বেতার-যন্ত্রটা সক্রিয় হয়েছে। কথা বলছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুজন একসঙ্গে।

: হ্যালো ফ্রন্টিয়ার! দিস্ ইজ নট, রিপিট নট, য়োর মিশন-কন্ট্রোল। প্লিজ ফলো আওয়ার ইন্সট্রাকশন্স। সুইচ অন টু মিশন-কন্ট্রোল ফর সেফ-ল্যান্ডিং। ওভার!

হ্যাঁ, ইংরাজি ভাষা। নির্ভুল উচ্চারণ : হ্যালো ফ্রন্টিয়ার! শোন। মিশন-কন্ট্রোল নই, আবার শোন, আমরা তোমাদের মিশন-কন্ট্রোল নই। তবু আমাদের নির্দেশ মেনে নাও। অবতরণের দায়িত্বটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। সুইচ টিপে দাও।

দুই বন্ধু মুখ-তাকাতাকি করে। কথা নেই। বর রয়ই প্রথম বাকশক্তি ফিরে পেল। বেতারের যন্ত্রটাকে বললে, হু আর্ট দাউ?

এত দুঃখেও হাসি পেল ওয়াম্বাসীর। ওর মনে হল—বব্ তার মাতৃভাষাটাও ভুলে গেছে। সহজ সরল ইংরাজি ভাষাটা। সে যেন অর্ধসহস্রাব্দী আগেকার একটা শেক্সপীরিয়ান চরিত্র! ম্যাকবেথ যেন বেতারযন্ত্রের ভেতর ব্যাঙ্কোর ভূতটাকে আবিষ্কার করে বলছে : কে! কে তুমি?

পৃথিবী থেকে ওদের বেতার-দূরত্ব এখন নগণ্য। যেন টেলিফোনে কথা বলছে। বেতার যন্ত্রটা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করে, প্রশ্নটা অবান্তর। পরিচয় দিলেও তোমরা আমাদের চিনতে পারবে না। এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পারছ—তোমাদের সামনে এখন তিনটি বিকল্প পথ। এক নম্বর—অনন্তকাল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পার। দু-নম্বর—নিজেরা অবতরণের চেষ্টা করে দেখতে পার। আমাদের কম্পুটার বলছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের জীবিতাবস্থায় পৃথিবীর কোনো ভূ-ভাগে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা ৩.২৫৭ শতাংশ। তিন নম্বর—অবতরণের দায়িত্বটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে পার। সে স্ট্যাটিসটিক্সটাও শুনে রাখ—আমাদের কম্পুটারের মতে সেক্ষেত্রে তোমাদের নিরাপদ অবতরণের সম্ভাবনা ৯৯.৯৩৫ পারসেন্ট। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য তোমাদেরই নিতে হবে। উইশ য়ু গুড ল্যক ডক্টর রয় অ্যান্ড ডক্টর ওয়াম্বাসী;—এ্যান্ড উইশ য়ু সাম গুড সেন্স ইনটু দ্য বারগেইন! ওভার!

পুরো একটি মিনিট সময় লাগলো স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে। তারপর বব্ বললে, ওয়েল নিগার! বল্ কী করা যায়?

ওয়াম্বাসী আবার মনে মনে হাসে। বুঝতে পারে, আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষ থেকে ওর বন্ধু ক্রমশ স্বাভাবিক মানসিকতায় ফিরে আসছে। তাই তিন দিন পরে আজ এই পরিচিত 'নিগার' সম্বোধন। বললে, তুই হচ্ছিস্ ফ্রন্টিয়ারের ক্যাপ্টেন; সিদ্ধান্ত তোকেই নিতে হবে। তবে প্রশ্ন যখন করেছিস তখন বলি—অঙ্কশাস্ত্র বলে, ৯৯.৯৩৫ সংখ্যাটা ৩.২৫৭ সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি!

বব্ বেশ খুশিয়াল হয়ে উঠেছে। বললে, নিগারদেরও যে ওটুকু অঙ্কশাস্ত্র জ্ঞান আছে, তা আমার জানা আছে। কিন্তু এই মওকায় বাছাধনকে একটু বাজিয়ে নিই, কী বলিস?

বেতারের মাউথপিসে সে বললে, আপনার নাম না জানায় শুভেচ্ছা বিনিময়ে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া আপনার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্তেও আসতে পারছি না আমরা।

পরমুহূর্তেই ভেসে এল প্রত্যুত্তর, আপনারা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করছেন, তাই জানাচ্ছি;—আমার নাম রুডলফ্ ব্যাটলার। পরিচয় দিলেও চিনবেন না। সেটা সাক্ষাতেই হবে। এবার দয়া করে সুইচটা টিপে দেবেন কি?

: থ্যাঙ্ক য়ু হের ব্যাটলার। সুইচটা টিপে দিল বব্ রয়।

ওয়াম্বাসী তখন ভাবছিল—বব্ ওকে 'হের' সম্বোধন করল কেন? লোকটার ইংরাজি উচ্চারণ তো ত্রুটিহীন। জার্মানের মতো নয়। বব্ তখন মুখটা উঁচু করে খোশমেজাজে শিষ দিচ্ছে। বেল্টটা কষছে—এবার ঋণাত্মক ত্বরণে দেহে একটা অনুভূতি হবে। হঠাৎ এদিকে ফিরে বললে, বোধহয় যতটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তেমন কিছু হয়নি। নয়? সমস্ত ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।—মানে পৃথিবী ঠিকই আছে; সামান্য কিছু অদলবদল হয়ে থাকবে। কী বলিস?

ওয়াম্বাসী বেল্ট কষতে কষতে বললে, আমার মনে পড়ছে ম্যালেটের একটা উদ্ধৃতি—Uncertainty ....The human soul that can support despair, supports not thee. (অনিশ্চিয়তা! মানুষ নিরাশাকেও বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু তোমাকে নয়)।

বব্ খিঁচিয়ে ওঠে, আমার সব চেয়ে কেন ভাল লাগছে জানিস? তোর মতো একটা পণ্ডিতের হাত থেকে এবার মুক্তি পাব। দুটো সাদামাটা কথা বলবার মতো মানুষের সাক্ষাৎ পাব এবার!

ভালুকের মতো ঝকঝকে একসার দাঁত বার করে ওয়াম্বাসী হাসে।

দুই

: আচ্ছা, এর কোনও মানে হয়? তিন ঘন্টা ধরে দাঁড় বাইছি, ব্যাটাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই!

কথাটা এবার নিয়ে বব্ চারবার বলল। ওয়াম্বাসী এবারও কোনো জবাব দিল না। চারদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। এক আকাশ শুধু তারা। আদিগন্ত বিস্তৃত শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। বব্ বলে, জায়গাটা কোথায় আন্দাজ করতে পারিস?

: দ্রাঘিমাংশটা পারি না। তবে ধ্রুব-নক্ষত্রের উন্নতি (অল্টিচ্যুড) দেখে বলতে পারি—আমরা আছি উত্তর গোলার্ধে, চল্লিশ অক্ষাংশের কাছাকাছি।

ফুলের মালা নিয়ে ওরা অভ্যর্থনা করতে আসবে—এতটা এরা আশা করেনি; তবে এভাবে তিন-চার ঘন্টা ধরে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে রাখবে এ আশঙ্কাও ছিল না। ওরা অন্তত আশা করেছিল—সমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে উঠে দেখতে পাবে অদূরে ভাসছে একটা রেসকিউ শিপ্; যা থেকে উড়ে আসবে একটা হেলিকপ্টার। এমন সুচারুরূপে ওদের অবতরণ করিয়ে ওরা যে কী করে সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে থাকতে পারল তার কোনো কূল-কিনারাই করা যাচ্ছে না।

ক্রমে পূর্বদিগন্তে আলোর রশ্মি দেখা দিল। সূর্য উঠছে। কুয়াশা একটু কেটে গেলে দেখা গেল—না, ওরা মাঝসমুদ্রে নেই। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম কোণে উপকূলভাগ দেখা যাচ্ছে। মাইল সাত-আট দূরে। এতক্ষণে একটা লক্ষ্যস্থল পাওয়া গেল। জোরকদমে ওরা তীরভূমির দিকেই নৌকা বাইতে শুরু করে।

আধ-ঘন্টাখানেক পরে, তীরভূমির আরও কাছে এগিয়ে এসে যে দৃশ্য ওরা প্রত্যক্ষ করল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। তীরভূমিতে যেগুলিকে অতিকায় গাছ বলে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সেগুলো আদৌ গাছ নয়—পাহাড়ও নয়—কোনো কিছুর ধ্বংসস্তূপ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড—অবিশ্বাস্য রকমের বিশালকায় কংক্রিটের চাংক! পিরামিডের চেয়েও বড় এক একটা স্তূপ! নিঃসন্দেহে এটা ছিল সমুদ্রতীরের একটা অতি প্রকাণ্ড বন্দর। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ!

ওয়াম্বাসী বলে, এটা কোন বন্দর আন্দাজ করতে পারিস?

ববের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ওয়াম্বাসী ওর দিকে ফিরে দেখে। দেখে, দু-হাতে মুখ ঢেকে ডক্টর বব্ রয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

: কী হল? বব্? বব্!

বব্ মুখটা তোলে না। নিঃশব্দে বাইনোকুলারটা বাড়িয়ে ধরে। দিগন্তের এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ওয়াম্বাসী দ্রুতহস্তে বাইনোকুলারটা ছিনিয়ে নেয়। চিহ্নিত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। তৎক্ষণাৎ ওর সর্বাবয়বে যেন একটা হিমশীতল শিহরন বয়ে যায়। হ্যাঁ, পেরেছে—চিনতে পেরেছে

এতক্ষণে! এ বন্দর, এ শহর অতি পরিচিত ওদের। সমুদ্রতীরের একটি দিক্-চিহ্ন-চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করে দিয়েছে শহরটার নাম।

একটি প্রকাণ্ড মর্মর-মূর্তির ধ্বংসাবশেষ। নারীমূর্তি। তার মাথায় মুকুট। ডান হাত—যেটা ভেঙে গিয়েছে—তাতে ধরা ছিল আলোকবর্তিকা। স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি!

: আই উইল কিল্ দেম! আ'য়ল কিল্ দেম অল!—নিষ্ফল আক্রোশে গজরাচ্ছে বব্ রয়।

ওয়াম্বাসী অতি দুঃখেও আত্মসংযম হারায়নি। তারও বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠছে। এতক্ষণে যে চূড়ান্তরূপে সনাক্ত করা গেছে শহরটা! পাঁচ বছরে এ কী হাল হয়েছে মানব সভ্যতার সেই আকাশচুম্বী গরিমা-নগরীর! সেই শহরটা এখন একটা ধ্বংসস্তূপ! তা হোক, পাঁচ বছরে অতীতের চেয়ে বর্তমানটার মূল্য বেশি। ধীরে ধীরে ও বসে পড়ে ববের পাশে। বলে, মাথা গরম করিস না বব্। পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে দে, বুঝে নে! এই জন্যেই ওরা এতক্ষণ সাড়া দেয়নি। ওরা ইচ্ছা করেই আমাদের সময় দিচ্ছে—বুঝে নিতে দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিটা।

: আ'ল কিল্ দিজ জেরিস্!

: জেরি! জার্মান! জার্মান কে? ঐ রুডলফ্ ব্যাটলার নামে লোকটা? পাগলামি করিস্ না বব্। জার্মানদের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ হয়েছিল আশি-নব্বই বছর আগে। এই একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন-সভ্যতাকে এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ক্ষমতা ওদের নেই—ইস্ট জার্মামী ওয়েস্ট-জার্মানির মিলিত শক্তিও—

: তবে ওরা কারা? প্রশ্ন করে বব্।

: জানি না—আমি জানি না। তবে ওরা পৃথিবীর লোক নয়। আমার এখনও বিশ্বাস, ওরা নক্ষত্রান্তরের কোনো গ্রহের জীব!

আর কোনো কথা হয় না। নীরবে দুজনে এসে পৌঁছায় উপকূলভাগে। কলমুখরিত প্রাক্তন নিউইয়র্কের একটি নির্জন সমুদ্রতীরে। এ কোন নিউ ইয়র্ক? একটি বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, একটি গাড়ি চলছে না পথে। এমনকি আকাশে নেই একটি পাখি, মাটিতে নেই একটিও প্রাণের স্পন্দন। মৃতদেহ আছে—এখানে-ওখানে, রাস্তায়, পার্কে, ধ্বংসস্তূপের একান্তে। দুর্গন্ধ নেই—পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল। আবর্জনা সরাবার চেষ্টা কেউ করেনি। যে যেখানে মৃত্যুবরণ করেছে, সে সেখানেই পড়ে আছে, কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে। ওদের হাতঘড়ি, গলার মালা, হাতের বালা পর্যন্ত আছে অবিকৃত। এ দৃশ্য যেন আর সহ্য করা যায় না।

: ও কী করছিস্? প্রশ্ন করে ওয়াম্বাসী।

: দেখছি, আবহাওয়ায় এখন রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটির চিহ্ন আছে কিনা।

না নেই। পাঁচটি বছরের বর্ষণে, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় সব ধুয়ে মুছে গেছে। সর্বংসহা পৃথিবী বিপুলা,—পাঁচ বছর পূর্বেকার একটি খণ্ডমুহূর্তের চিহ্নও নেই আকাশে-বাতাসে। সকালের ঝলমলে রোদে নির্লজ্জা পৃথিবী হাসছে!

দুজনে প্রায় ছুটতে ছুটতে শহরটা পার হবার চেষ্টা করে। বিশাল শহর। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পৌঁছাতে সারা দিনমান অতিক্রান্ত হল। বব্ বললে, মনে হয় নিউ ইয়র্কে ডাইরেক্ট হিট হয়নি; তাহলে এত প্রচণ্ড উত্তাপ হত যে সবকিছু গলে যেত। কঙ্কাল খুঁজে পেতুম না আমরা।

: আমারও তাই মনে হয়।

: এর শোধ আমাদের নিতে হবে। আই'ল কিল্ দেম অল!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওয়াম্বাসী। বলে, বব্ একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস না। ফ্রন্টিয়ারে তুই ছিলি ক্যাপ্টেন। যা হুকুম করেছিস, আমি তামিল করেছি। সে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে জিনিসটা ট্যাক্‌ল্ করতে দে।

বব্ও দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, ঠিক কী বলতে চাইছিস?

: বল্ছি, তুই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিস। মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিস। হ্যাঁ, শোধ তো

আমাদের নিতেই হবে; কিন্তু ভুলে যাস না আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ওরা অন্তরালে বসে লক্ষ করছে। প্রতিটি কথা হয়তো শুনতে পাচ্ছে।

: আই সী!

আরও কিছুক্ষণ পথ চলার পর বব্ আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, দ্যাখ দ্যাখ! এ ভালচার! হাউ বিউটিফুল!

হ্যাঁ, একটা শকুন। দূর আকাশে পাক খাচ্ছে। ববের উচ্ছ্বাসটা অহেতুক নয়। পৃথিবীতে ফিরে এসে এই প্রথম ওরা প্রাণের সন্ধান পেল। তাই ববের মনে হতে পারে বটে : একটা শকুন! কী সুন্দর!

মানুষের সাক্ষাৎ পেল একেবারে দিবাবসানে। প্রথমে লক্ষ্য হল, ভিজে মাটিতে কিছু পদচিহ্ন। পাঁচ বছরের তুষারপাতে, বৃষ্টিতে, সে পদচিহ্ন টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী জনশূন্য নয়। মানুষ আছে; আজও টিকে আছে! আনন্দে দুই বন্ধু চীৎকার করে ওঠে। ওয়াম্বাসী হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে জল-কাদায়। বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকে।

আরও ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ বাঁকের মুখে দেখতে পেল একটা দৃশ্য। ওরা উঠে পড়েছিল একটা বালিয়াড়ির ওপর। বালিয়াড়ি ঠিক নয়, হয়তো কোনো ধ্বংসস্তূপ। মাটিচাপা পড়ে একটা ছোট পাহাড়ের মত হয়েছে। সেখান থেকে দেখতে পেল নীচে একটা খরস্রোতা জলধারা। আর সেই নদীর ধারে জল খেতে এসেছে বনচারী একদল অসভ্য মানুষ। সংখ্যায় ওরা প্রায় শতখানেক হবে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী। কারো কারো গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাকের ধ্বংসাবশেষ। বব্ বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখল—ওদের অনেকেই বিকলাঙ্গ। দু-একজনের মাজায় চামড়ার বেল্ট বাঁধা। অধিকাংশ পুরুষের হাতেই হাতঘড়ি, মেয়েদের হাতে বালা অথবা রিস্ট-ওয়াচ। তবু প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওদের গায়ের রঙ সাদা, চোখের তারা নীল, মাথার চুল সোনালি, লাল অথবা কালো।

বেচারি বব্ বসে পড়ে মাটিতে।

: ওরা সবাই আমেরিকান! ওয়াম্বাসী বললে।

: না। ওরা এক্স-আমেরিকান! এখন মানবেতর জীব!

অর্থাৎ ওরা প্রাণে মরেনি। কিন্তু কী একটা বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে ওদের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছে নিঃশেষে। ওদের মস্তিষ্কের পরিমাপ করলে হয়তো দেখা যাবে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক পিকিং-ম্যানের সমান। যূথবদ্ধ নরনারী ঐ নদীর জলে দিনান্তের শেষ জলপান করতে এসেছে। ওরা অঞ্জলি ভরে জলপান করছে না কিন্তু। উবু হয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। এবার ওরা হয়তো রাতের মতো কোনো গুহায় আশ্রয় নেবে। গুহার অভাব কি? পঞ্চাশ-ষাটতলা স্কাই-স্ক্রেপার তো চিত হয়ে শুয়ে আছে সারি সারি!

দুই বন্ধু ধীরে ধীরে নেমে এল পাহাড় থেকে। হঠাৎ বন্যমানুষগুলো সচকিত হল। ওদের দেখতে পেল। একটা যৌথ জান্তব আর্তনাদ করে সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। বব্ রয়ও ছুটছে—ওদের একটাকে ধরতে হবে। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে একটি যুবতী মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাথরে ধাক্কা খেয়ে। পরমুহূর্তেই বব্ ধরে ফেলল তাকে। আতঙ্কেই হোক অথবা পতনজনিক আঘাতেই হোক—মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বব্ বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে ভূশয্যালীন সম্পূর্ণ নিরাবরণা মেয়েটিকে। কত বয়স হবে ওর? বিশ-বাইশ! মাথার চুলগুলো এককালে ছিল সোনালি, এখন পিঙ্গল জটাজাল। হাতে-পায়ে নখ বাঘের মতো। সর্বাঙ্গ কর্দমলিপ্ত। পাঁচ বছর আগে সে বোধ করি ছিল কোনো হাই স্কুলের টীন-এজার ব্লন্ডি! হঠাৎ ইষ্টক-বর্ষণ শুরু হল দূর থেকে। বব্ চোখ তুলে দেখে ঐ বন্য মানুষগুলো ভয়ে কাছে এগিয়ে আসতে পারছে না বটে, কিন্তু দলের মেয়েটিকে ছেড়েও যায়নি। দূর থেকে ইঁট ছুঁড়ে মারছে। বব্ উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ওদের ডাকে, অভয় দেয়। নানান অঙ্গভঙ্গি করে ওদের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে। ওরা কিন্তু বুঝতে পারে না। যূথবদ্ধ বনমানুষের মতো দূর থেকে শুধু আস্ফালন আর চিৎকার করতে থাকে। নিরুপায় হয়ে বব্ ফিরে আসে ওয়াম্বাসীর কাছে।

বনমানুষ দলের একটি জোয়ান ছুটে এসে ঐ অচৈতন্য মেয়েটিকে পিঠে তুলে নেয়। মুহূর্তে ওরা মিলিয়ে যায় ধ্বংসস্তূপের আড়ালে!

: গুড ইভনিং ডক্টর্স্! আশা করি সারাদিনে আপনাদের সরেজমিনে তদন্তটা শেষ হয়েছে। আপনাদের আমেরিকার কী হাল হয়েছে—

বব্ হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেতার যন্ত্রটার উপর : য়ু বাস্টার্ডস্! আই'ল—

ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ ওর মুখ চেপে ধরে। তা হোক, ববের বক্তব্যের আর বাকিও ছিল না কিছু। তাই ও-প্রান্তবাসী অনায়াসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে পারল, একবিংশতি শতাব্দীর সুসভ্য সমাজে 'বেজন্মা' কথাটা কোনো গালাগালি নয়, ডক্টর রয়। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে আপনারা কি আত্মসমর্পণে প্রস্তুত?

ববের মুখে হাত চাপা দেওয়া আছে। সে জবাব দিতে পারে না। তাই ওয়াম্বাসী বলে, কার কাছে আত্মসমর্পণ করছি সেটুকুও কি জানবার অধিকার নেই আমাদের?

: নিশ্চয়ই আছে। আমার কাছে। আমার নাম তো আগেই বলেছি—রুডল্ফ্ ব্যাটলার।

: নামটাই বলেছিলেন। পরিচয়টা দেননি।

: আমি ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল।

: কোন সৈন্যদলের?

: সেটা তো আপনি অনেকক্ষণ আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার বন্ধুকে। আমরা পার্থিব নই। নক্ষত্রান্তরের জীব। মানুষ নই!

সব সংশয়ের অবসান হল এতক্ষণে। এবার আর ওয়াম্বাসীর মনে পড়ল না ম্যালেটের সেই অনবদ্য উক্তিটা। সে শুধু সংক্ষেপে বললে, আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

: ভেরি গুড! বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বব্ দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। কয়েক মিনিটের ভেতরেই একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল। পরমূহূর্তেই দিগন্ত ভেদ করে এসে উপস্থিত হল একটি হেলিকপ্টার। নামলো সামনের মাঠে। ধ্বংসস্তূপের মাথায় মাথায় উলঙ্গ মানুষ-উল্লুকদের সে কী চিৎকার! ওরা যেন চিৎকার করেই পাখিটাকে তাড়াবে। হেলিকপ্টারের শিরঃঘূর্ণন স্তব্ধ হল। কক্‌পিট থেকে নেমে এলেন সেই অপার্থিব ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল। তাঁর দেহাবয়ব দেখা গেল না কিন্তু। মনে হয় পাঁচ সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট দেহাবয়ব। সমস্ত শরীরটা তাঁর একটি আলখাল্লায় ঢাকা; এমনকি বোরখার মতো একটি আবরণে মুখখানিও আবৃত। ধীর ভারিক্কি মেজাজে অনেকটা 'গুজ স্টেপে' তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর বাঁ হাতে শট-গানের মতো কী একটা অস্ত্র। ওদের সামনে এসে ডান হাতটা তুলে কী একটা অদ্ভুত স্লোগান দিলেন। সেটা ওদের প্রতি সম্ভাষণ, নাকি তাঁর জয়োল্লাস তা বোঝা গেল না।

ওয়াম্বাসী বললে, একটা কথা হের ব্যাটলার! দয়া করে আমাদের জানাবেন কি—সমস্ত পৃথিবীরই কি আজ এই অবস্থা?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা যে স্যাম্পল সার্ভে করেছেন তা শুধু নিউ ইয়র্ক শহরের নয়, বলা যায় গোটা পৃথিবীর প্রতিচ্ছবিই তাতে ফুটে উঠছে।

: আমরা যখন যাত্রা করি তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ছয় শত কোটি। এখন পৃথিবীতে মানুষ কত আছে জানতে পারি?

: আমরা আদিমসুমারী করে দেখিনি। অন্যান্য মহাদেশের খবর রাখি না। তবে লোকসংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ হবে। অবশ্য তারা ঠিক মানুষ নয়, প্রায়-মানব—ঐ ওদের মতো!

ধ্বংসস্তূপের মাথায় মাথায় তখনও কৌতূহলী উলঙ্গ প্রায়-মানবগুলো ওদের দেখছিল। ওয়াম্বাসী তখনও মনের ভারসাম্য হারায়নি। বললে, ওদেরই বা আপনারা শেষ করে দিলেন না কেন? কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনে আবার তো ওরা মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে?

: না, পারে না। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই ঐ কয়েক লক্ষ প্রায়-মানব পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে।

: কেন? কোন যুক্তিতে?

: দেখছেন না—ঐ অতগুলি মানুষ-জন্তুর মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সের কোনো বাচ্চা আছে? ওরা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিই হারায়নি, প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়েছে।

মুহূর্তের অসতর্কতা। ওয়াম্বাসী বাধা দেওয়ার আগেই বব্ তার কোমরবন্ধ থেকে একটানে বার করে ফেলেছে রিভলভারটা। পর পর তিনটি গুলি ছোঁড়ে সে অব্যর্থ লক্ষ্যে। তারপর সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

নক্ষত্রান্তরের জীবটি একবার নীচু হয়ে দেখল, তার আলখাল্লার কোথায় কোথায় ফুটো হয়েছে। তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার টিপ তো বড় অদ্ভুত ডক্টর রয়! আমার শবব্যবচ্ছেদ হলে ডাক্তার বলত তিনটে গুলিই লেগেছে হৃদ্‌পিণ্ডে—রাইট ভেনট্রেক্‌ল্ এবং লেফ্‌ট্ অরিক্‌ল্!

ওয়াম্বাসী কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আমি বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চাইছি। অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন—ওর উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল!

: না, না, ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। তবে আপনার বন্ধুটি একটি গবেট! ওঁর বোঝা উচিত ছিল, তেমন কোনো আশঙ্কা থাকলে আমি আপনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলার আগে অস্ত্রসমর্পণ করতে বলতাম। তাই নয় কি?

বব্ অথবা ওয়াম্বাসী জবাব দিতে পারে না।

রুডল্‌ফ্ ববের দিকে ফিরে বলে, আপনার রিভলভারে আরও তিনটে চেম্বার ভরা আছে। মহাশয় কি ও তিনটি চুকিয়ে-বুকিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গাড়িতে উঠতে চান?

রুদ্ধ আক্রোশে বব্ ছুঁড়ে ফেলে দেয় রিভলভারটা।

লোকটা তখন তার বাঁ হাতের যন্ত্রটা তুলে দেখায়। বলে, এটার ব্যবহার আপনারা জানেন না। লেসার রশ্মি আপনারা চেনেন—এটা হচ্ছে পোর্টেব্‌ল্ লেসার-রিভলভার। অস্ত্রটা সে বাগিয়ে ধরে সামনের ধ্বংসস্তূপের দিকে। প্রকাণ্ড কংক্রিটের চাংককে সেই অদৃশ্য রশ্মি করাতকলের মতো দু'টুকরো করে দিল। রুডল্‌ফ্ কোনো কথা বলল না। হাতটা বাড়িয়ে দিল। সে ব্যঞ্জনার অর্থ : আসতে আজ্ঞা হোক! যেন কন্যাকর্তা বরযাত্রীদের আমন্ত্রণ করছেন।

হেলিকপ্টারে উঠে বব্ গোঁজ হয়ে বসে থাকে। কিন্তু ওয়াম্বাসী তখনও ভেঙে পড়েনি। বললে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

: বিলক্ষণ! করুন না যে কোনও প্রশ্ন। জানাতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

: আপনারা কতজন এসেছেন?

: সব জাতের মিলিয়ে ধরুন জনা-পঞ্চাশ আছি।

: জাত! আপনাদের জাত আছে তাহলে?

: জাত মানে, শ্রেণী। তা আছে বইকি। আমাদের পাঁচটি শ্রেণী।

: আপনি কোন জাত?

: বর্ণশ্রেষ্ঠ! আল্‌ফা!

: বাকি জাতগুলি কি—বীটা, গামা, ডেলটা এবং এপসাইলন?

: এক্‌জ্যাক্টলি!

: ওয়াম্বাসী প্রসঙ্গ বদলে বললে, মাত্র পঞ্চাশ জনে আপনারা পৃথিবীটা জয় করে ফেললেন?

: সেটা অসম্ভব হতে যাবে কেন। আমরা আর্ষ, আপনারা অনার্ষ!

: আর্ষ! আর্ষ মানে?

: আর্ষ মানে ঋষি-প্রোক্ত—যা বিবেক-বুদ্ধি-ব্যাকরণ মানে না।

ওয়াম্বাসীর আই. কিউ.-এর লগিতে 'একবাম' মেলে না। বলে, মাপ করবেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

: না পারাই স্বাভাবিক। অনার্যদের বুদ্ধি চিরকালই কম। ভগবান দু-জাতের বুদ্ধিমান জীবকে সৃষ্টি করেছেন—আর্য এবং অনার্য। যাদের ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত আছে, তারাই জগতে বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে এসেছে। এই জগতের যাবতীয় দুঃখের মূল ঐ অনার্য জাতি।

: কোন যুক্তিতে?

: যুক্তি নেই। এটা আর্ষ প্রয়োগ! যুক্তির ব্যাকরণে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু বিযুক্তির ভ্যা-করণে আর্ষ-প্রয়োগের ফলাফলটা তো প্রত্যক্ষ করছেন! আমরা মাত্র পঞ্চাশজন আর্য এই নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, অনার্যদের বিযুক্ত করেছি,—আগামী হাজার বছর ধরে এ সাম্রাজ্য চালু থাকবে!

লোকটার—যদি 'লোকটা'ই বলা যায় ওকে—বক্তব্যে যুক্তির বালাই নেই। তবু বক্তব্যটা একেবারে অশ্রুতপূর্ব বলেও মনে হল না ওয়াম্বাসীর। হোক নক্ষত্রান্তরের জীব, ওর মানসিকতায় এই পৃথিবীর ইতিহাসের ছাপ পড়েছে। দুরন্ত কৌতূহল হল নিগ্রো মানুষটার। জানতে চায় : একটু আগে আপনি ভগবানের কথা বললেন। আপনারা তাহলে ভগবান মানেন?

: কেন মানব না? সৃষ্টি যখন আছে, তখন তার সৃষ্টিকর্তাও আছেন।

: কেমন দেখতে তিনি?

: ঠিক আমার মতন। কারণ : God made us in His own image—নিজের খানদানি বদনখানির আদলে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

ওয়াম্বাসী প্রতিবাদ করে, সে তো মানুষও তাই ভাবে, মানে ভাবতো। বাইবেল-এ আছে—

: ওটা ছিল মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। গোরু-ছাগল-ভেড়া-বাঁদরেরও যদি এক এক কণা বুদ্ধি থাকত, তাহলে তারাও ও কথা বলত।

ওয়াম্বাসী আবারও বলে, মাপ করবেন জেনারেল, গোরু-ছাগল-বাঁদর-মানুষ যদি ভুল করতে পারে তাহলে আপনারাও যে ভুল করছেন না সেটা কোন যুক্তিতে—

এবারও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল ব্যাটলার বলে ওঠেন, ও-কথা যে বলে সে অনার্য! তাদের খতম করতেই জন্মেছি এই কল্কি-অবতারে, মানে আমরা কজন। আর যুক্তির কথা বলছেন? আগেই বলেছি—ও-সব যুক্তি-লজিক-ব্যাকরণ শিকেয় তুলে রাখুন। এ হচ্ছে আপ্তবাক্য, অভ্রান্ত সত্য—আর্ষ-প্রয়োগ! আমাদের ধর্মগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে একথা লেখা আছে।

: আপনাদেরও তাহলে ধর্মবোধ আছে? ধর্মগ্রন্থ আছে? আপনি পড়েছেন?

: না, আমি নিজে পড়ে দেখিনি। বইটা জার্মান-ভাষায় লেখা। ভারি শক্ত ভাষা। অনেক চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি। কিন্তু যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা ঐ কথাই বলেছেন।

: কে লিখেছেন বইটা?

: ঈশ্বর স্বয়ং!

: কেমন করে জানলেন?

: সহজ উপায়। আর্ষ-প্রয়োগে!

তিন

সে-রাত্রের জন্য বন্দি দুজনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল ভূগর্ভস্থ এক কারাকক্ষে। কারারক্ষীর বালাই নেই। স্বয়ং জেনারেল রুডল্‌ফ্‌ ব্যাটলার ওদের কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বিদায় চাইলেন। বললেন, আচ্ছা, চলি তাহলে। কাল সকালে আবার দেখা হবে। ও! ভালো কথা, ঐ পাশের ঘরটা হচ্ছে বাথরুম, আর এই ফ্রিজে পানীয় জল ও খাবার আছে। ও-পাশে কিচেনেট। আপনারা ফ্রন্টিয়ারে তো নিজেরাই রান্নাবান্না করে খেতেন—অসুবিধা হবে না আশা করি!

বব্‌ তাকিয়ে তাকিয়ে কারাকক্ষটা দেখছিল। জেলখানার মতো মোটেই নয়, এটা নিশ্চয়ই কোনো হোটেলের ভূগর্ভস্থ এয়ার-রেড শেল্‌টার। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ভেঙে পড়েনি। দিব্যি ছিমছাম। যেন

একটা ডবল্-বেট স্যুইট। ওয়াম্বাসী বলে, বিলক্ষণ! অসুবিধা কিছুই হবে না। বস্তুত আপনাদের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। যদি একটু বসে যান, কফি করে খাওয়াতে পারি।

: না থাক। আমরা ওসব খাই না। ও-সব অনার্য নেশা!

: কাল সকালে আমাদের কোথায় যেতে হবে?

: ফ্যুরার-এর কাছে।

: ফ্যুরার!

: মানে আমাদের সর্বাধিনায়ক আর কি। বিশ্বাধিপতি। আল্‌ফা শ্রেণীর মাত্র তিনজন আমরা এখানে আছি। আমি ফ্যুরারের দক্ষিণহস্ত। বামহস্ত হচ্ছেন ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারলে ডিফিটস্টোন চারশকুন। আমরা এই তিনজন মাত্র হচ্ছি বর্ণশেষ্ঠ—আলফা শ্রেণীভুক্ত।

ওয়াম্বাসী বলে, 'ফ্যুরার'টা কি সর্বাধিনায়কের নাম? না উপাধি?

: কোনোটাই নয়। আমি ওঁকে ঐ নামে ডেকে আনন্দ পাই, যদিও জানি তিনি সেটা পছন্দ করেন না। তাঁর নাম হচ্ছে—লেক্‌জান্ডা দ্য গ্রেট!

ওয়াম্বাসী বলে, নামটা চেনা-চেনা। আপনারা দুজনেই। কিন্তু ঐ জেনারেল চারশকুনকে তো ঠিক ধরতে পারছি না।

: পারবেন না। আমি আজও তাঁকে ধরতে পারিনি। পাঁকাল মাছের মতো তিনি ক্রমাগত পিছলে পালিয়ে যান। দ্বিতীয়ত উনি জেনারেল নন, স্যার চারশকুন!

: বুঝলাম। তাঁর কী কাজ? কী করেন তিনি?

: তিনি একটি অকর্মার ধাড়ি। একটি মাত্র কাজই তিনি জানেন,—ক্রমাগত বর্মা চুরুট ফুঁকতে।

এতক্ষণে সেই অজ্ঞাত ডিফিটস্টোন চারশকুনের একটা মানসমূর্তি ফুটে উঠল ওয়াম্বাসীর অন্তরপটে। জেনারেল বললেন, দরজাটা খোলাই থাক। এয়ার-কন্ডিশানারটা চালু নেই—একটু হাওয়া খেলবে। না, চুরি-চামারির ভয় নেই। আর ভাল কথা—আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন, দরজার বাইরে সমস্ত মেঝেটায় এইট-এইট্টি ভোল্ট অল্টারনেটিং কারেন্ট আছে। আচ্ছা চলি—গুড নাইট!

কারাকক্ষের দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে জেনারেল বিদায় হলেন।

বব্ এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলে ওঠে, সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য!

ওয়াম্বাসী ওর পাশে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসতে বসতে বলে, কেন, সবটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে কেন?

বব্ রুখে ওঠে, তোর মনে কোনো খটকা নেই?

: আছে। একটা প্রশ্নের সমাধান এখনও পাইনি!

: একটা? আমার মনে তো হাজারটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কোনোটারই সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

: যথা?

: এক নম্বর—ওরা কী? দু-নম্বর—ওরা কোন নক্ষত্র থেকে এল? তিন নম্বর—কত সময় লেগেছে? চার নম্বর—কেন ওরা এভাবে সমস্ত পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতাকে মুছে ফেলল? পাঁচ নম্বর—

ওকে বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, চার নম্বর প্রশ্নটার জবাব কিন্তু ও দিয়েছে—ওদের বিযুক্তির ভ্যাকরণ-অনুসারে আমরা হচ্ছি অনার্য, বাঁচবার অধিকারী নই, আর ওরা হচ্ছে পবিত্র আর্য-রক্তের অধিকারী।

বব্ সে কথায় কর্ণপাত না করে এক নিশ্বাসে বলে চলে, পাঁচ নম্বর—পর পর তিনটে বুলেটেও বেটা ঘায়েল হল না কেন? ছয় নম্বর—যেটা সব চেয়ে ভাইটাল—ওদের কেমন করে মারা যায়!

ওয়াম্বাসী বলে, মাই ডিয়ার বাস্টার্ড! এসব প্রশ্নের ঠিকমত জবাব যদিচ আমি দিতে পারিব না, তবু আমার মনে সব চেয়ে বড় যে খটকা বেধেছে তা তোর দীর্ঘ তালিকায় নেই।

: বটে! সেটা কী? শুনি?

: হতভাগাটা অমন চোস্ত ইংরাজি বলতে শিখল কী করে!

বব্ অবাক দৃষ্টি মেলে পুরো পনেরো সেকেন্ড বসে রইল। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে, লে হালুয়া! ঐ সামান্য কথাটা তোকে এভাবে ভাবিয়ে তুলেছে?

: সামান্য? না! ঐটাই সব চেয়ে অসামান্য! তোর প্রতেকটি প্রশ্নের একটা করে জবাব হতে পারে—সেগুলো আমাদের জ্ঞানরাজ্য-সীমার অতিরিক্ত হতে পারে, কিন্তু তা যুক্তিরাজ্যের বাইরে নয়। তোর ছয়টি প্রশ্নের জবাবে এক নিশ্বাসে আমি বলতে পারি—ওরা অপার্থিব জীব, এসেছে দশ-বিশ লাইট-ইয়ার দূরের কোনো নক্ষত্রের গ্রহ থেকে, সময় লেগেছে বিশ-ত্রিশ বছর, ওদের ঐ অদ্ভুত অনার্য থিয়োরির জন্য এভাবে ধ্বংসলীলায় ওরা মেতেছিল; ওদের দেহ বুলেটপ্রুফ পদার্থে তৈরি এবং তোর ছয় নম্বর প্রশ্নের জবাব—ওরা হয়তো অমর নয়, কিন্তু কী ভাবে ওদের বধ করা যাবে, তা আমরা জানি না। কিন্তু তুই এবার আমার প্রশ্নটার জবাব দে তো! ও কীভাবে ইংরাজি বলতে শিখল?

: কীভাবে আবার! তুই-আমি যেভাবে শিখেছি!

: না বন্ধু, অত সহজ নয়। ধরা যাক, ওর বয়স পঞ্চাশ। তাহলে ওর জীবনের প্রথম পঁয়তাল্লিশটা বছর কেটেছে অন্য নক্ষত্রের গ্রহে—যেখানে ইংরাজি ভাষা নেই। তার মানে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ও ইংরেজি শোনেনি। আবার দেখছি, এখানে পৌঁছেই যাবতীয় অনার্যদের ওরা হত্যা করেছে। এখন পৃথিবীতে যেসব প্রায়-মানব আছে, তারা জান্তব-শব্দ উচ্চারণ করে—ইংরাজি বলে না। তাহলে ও ভাষাটা শিখল কেমন করে?

বব্ রয় কান চুলকালো। ভাবল। তারপর বললে, হুঁ! কথাটা ফেলনা নয়। কিন্তু এটা তো মানবি, ওরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান? ওদের আই. কিউ. খুব বেশি। ধর, আমি যদি বলি—এই বিধ্বস্ত পৃথিবীতেই ও কিছু ইংরাজি বই উদ্ধার করে ভাষাটা নিজে-নিজেই শিখে ফেলেছে?

: মায় উচ্চারণ?

: ধর, কিছু টেপ্-রেকর্ড আর গ্রামোফোন ডিস্কও ও কোনোক্রমে উদ্ধার করেছিল!

ওয়াম্বসী হেসে বলে, মাই ডিয়ার ডক্টর ওয়াটসন! তুই একটা ভাইটাল ক্লু বাদ দিয়ে যাচ্ছিস। অতটা বুদ্ধি আর অধ্যবসায় থাকলে ইংরাজি ভাষার বদলে জার্মান ভাষা শিখত। ইংরাজি ওর কাছে একটা মৃত ভাষা—কোনো কাজে লাগার কথা নয় ওর; অথচ ওদের ধর্মগ্রন্থ জার্মান ভাষায় লেখা। ও নিজমুখেই স্বীকার করেছে—সে ভাষা ও চেষ্টা করেও শিখতে পারেনি। ভাষা শেখার ব্যাপারে ওর আই. কিউ. আমার চেয়ে খুব বেশি নয়। আমি সতেরো বছর বয়সেই জার্মান ভাষা শিখেছি! আরও একটা কথা—ওদের ভগবানই বা কেমন করে জার্মান ভাষায় বইটা লিখল? নো—মাই ডিয়ার হোরাশিও—দেয়ার্স মোর থিং ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ.....

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বব্ বলে, তুই থামবি? এমনিতেই মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে—তার মধ্যে আমাকে কখনও ডাকছিস 'ওয়াটসন' কখনও 'হোরাশিও'! ওসব নাম কোথায় পেলি? তুই বাপু আমাকে 'বাস্টার্ড' বলেই ডাকিস্! ওসব বদ-নাম আমার সইবে না।

পরদিন বন্দিদের যারা নিয়ে যেতে এল তারা আজব-জীব। জেনারেল ব্যাটলার স্বয়ং আসেননি। পাঠিয়ে দিয়েছেন একটি রোবট-শ্রেণীর যন্ত্রমানবকে। সঙ্গে তার যন্ত্র-দেহরক্ষী। রোবো'-টার অঙ্গে কোনও বোরখা ছিল না। এমন রোবো ওরা আগেও দেখেছে। সে কথা বলতে পারে না। তার বুকে আটকানো আছে একটা টি. ভি স্ক্রিন। হাত, পা, মাথা আছে। কলের পুতুলের মতো এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। তার দু-পাশে আরও ছয়টি বিচিত্র দর্শন রোবো। অনেকটা আরশোলা বা কচ্ছপের মত দেখতে। প্রায় হাত-দেড়েক লম্বা। ছয়টা পা এবং দুটি টেনটেক্ল্ অর্থাৎ শুঁড় আছে। সময়ে সময়ে তারা দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, ঐভাবে ধীরে ধীরে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ছন্দে হাঁটতেও পারে—তখন তাদের লুইস ক্যারল বর্ণিত মক্-টার্টল-এর মতো দেখতে হয়। তখন পিছনের পা দুটি হয় চরণ, সামনের ও মাঝের চারখানা ঠ্যাঙ হয়ে যায় হাত। বব্ এবং ওয়াম্বাসী তাদের দেখেই চিনতে

পারে—ওরা প্রাথমিক যুগের রোবো। প্রায় একশ বছর আগেই এজাতীয় যন্ত্র-জীব মানব-বিজ্ঞান তৈরি করতে পেরেছিল—1940 সাল নাগাদ। তখন মানব-বিজ্ঞান তার নাম রেখেছিল Machina Speculatrix।

বব্ প্রশ্ন করে, কোন চুলোয় যেতে হবে আমাদের?

বাক্-প্রয়োগের ঐ বিচিত্র শৈলী সত্ত্বেও তার মর্মার্থ বুঝে নিতে রোবটটার অসুবিধা হল না। সে কথা বলতে পারে না। তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর ফুটে উঠল ওর বুকে সাঁটা টি. ভি. স্ক্রিনে। সিনেমার পর্দায় যেমন ঝপ করে একসঙ্গে লেখা ফুটে ওঠে সেভাবে নয়, টেলিপ্রিন্টার অথবা টাইপরাইটারের ভঙ্গিমায় বাম থেকে ডাইনে টপাটপ অক্ষরগুলো ফুটে উঠল : আমাদের সর্বাধিনায়ক মহামহিমার্ণব বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত লেকজান্ডা দি গ্রেটের রাজসভায়!

বব্ অস্ফুটে বললে, লে হালুয়া! বেটা নাটক করছে নাকি?

ওয়াম্বাসী গম্ভীর ভাবে বললে, তুমি কে? কী নাম?

: আমি সর্বাধিনায়কের দেহরক্ষী। আমার নাম ডেল্‌টা-19।

এই তাহলে ওদের শ্রেণী-বিন্যাস অনুযায়ী ডেল্‌টা শ্রেণীর জীব! তাহলে ঐ আরশোলা-প্রতিম যন্ত্র-জীবগুলো নিশ্চয় এপ্‌সাইলন শ্রেণী ভুক্ত। সেই মর্মে প্রশ্ন করল ওয়াম্বাসী। ডেলটা-19 লিখিত জবাব দাখিল করল, আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু আপনারা অযথা কালবিলম্ব করবেন না। ওদিকে রাজসভায় মহামহিমার্ণব বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বব্ বলে ওঠে : ছি! বোকা ছেলে। শুধু 'শ্রী' বলতে নেই, ওতে বিশ্রী শোনায়। এবার থেকে '১০০৮ শ্রী' বলবে। কেমন?

ডেল্‌টা-19-এর পেছনে দুই বন্দি—তাদের ঘিরে ষটপদ ছয়টি এপসাইলন প্রহরী-বেষ্টিত দুই মানবসন্তান—এসে উপস্থিত হল রাজসভায়। বিশ্বাধিপতির রাজসভাটির কিন্তু বিশেষ জাঁকজমক নেই। নিতান্ত ঘরোয়া আয়োজন। বস্তুত সেটা কোনো নবনির্মিত রাজপ্রাসাদই নয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘটনাচক্রে টিকে থাকা একটা পরিত্যক্ত গ্রাম্য গির্জা—অ্যাংলিকান প্যারিশ চার্চ।

ওরা সিঁড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই দু-পাশে সার দিয়ে শুয়ে থাকা এপসাইন আরশোলা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, মাঝের হাত দুটি মাজায় রেখে সামনের দুটি হাতে শিঙের মতো একটা বাদ্যযন্ত্র ধরে তূর্যধ্বনি করল। ববের মনে হল—ওয়াল্ট ডিজনের কোনো অতি জীর্ণ ফিল্ম দেখছে। ডেল্‌টা-19 এতক্ষণ বেশ গুড়গুড়িয়ে আসছিল—গির্জার প্রবেশদ্বারে পৌঁছেই মরালছন্দে অর্থাৎ 'গুজ স্টেপে' এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় 'নেভ' অংশ দিয়ে। দু ধারের 'আইল'-এ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেল্‌টা-এপসাইলনের দল—সাধারণ প্রজাবৃন্দ। গির্জার দু-পাশে—যে অংশকে বলে সাইড অল্টার, পাতা থাকে ক্রিডেন্স টেব্‌ল, সেখানে অপেক্ষাকৃত অভিজাত সম্প্রদায়, গামার দল। গির্জার কেন্দ্রবিন্দুতে—অর্থাৎ হাই অল্টারে বসে আছেন সর্বাধিনায়ক স্বয়ং। পরিধানে গ্রিক পোশাক; মস্তকে গজদন্তশোভিত একটি হস্তিমুণ্ডের মুকুট; বামস্কন্ধে চীনাংশুক উত্তরীয়ের গ্রন্থি, দক্ষিণ হস্তে শাসনদণ্ড, কোমরবন্ধে বিশাল ঋজু তরবারি। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই প্রধান সেনাপতি। একজন ওদের পরিচিত রুডল্‌ফ্ ব্যাটলার, বসেছেন রাজার বামে, দক্ষিণে নন। রাজার দক্ষিণে যিনি বসে আছেন তিনি স্থূলকায়, তাঁর মুখে একটি প্রকাণ্ড চুরুট। সিংহাসনের ওপরে একটা অলিন্দ—যাকে বলে 'রুড লফ্‌ট'; সেখানে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় তাঁরা স্ত্রীজাতীয়া। ওরা পরে জেনেছিল তাঁরা বীটা শ্রেণীভুক্তা।

ববের মনে হল—এটা বাস্তব দুনিয়া নয়, বিরাট একটা রঙ্গমঞ্চ!

কেন্দ্রীয় গলিপথ দিয়ে প্রহরী-বেষ্টিত বন্দীদল এগিয়ে এসে থামল। ডেল্‌টা-19 এ্যাটেনশন হল, তারপর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে রীতিমত গ্রিক কায়দায় সম্রাটকে অভিবাদন জানালো। বেচারি কথা বলতে পারে না। তার উদরদেশে পটাপট ফুটে উঠল রাজসম্ভাষণ : জয়তু বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ১০০৮!

জেনারলে ব্যাটলার উঠে দাঁড়ালেন। সম্রাটের হয়ে প্রত্যভিবাদন করলেন : হেইল লেকজান্ডা!

তারপর সম্রাটের দিকে ফিরে একটি অনুচ্চ গলা খাঁকারি দিলেন।

সম্রাটের বয়স হয়েছে। এতক্ষণে বসে বসে বামহস্তে একটি পাখির পালক বাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ব্যস্ত ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তিনি কিঞ্চিৎ-মাত্রায় নিদ্রাভিভূত হয়ে থাকবেন। সেনাপতির অনুচ্চ গলা খাঁকারিতে তাঁর চট্‌কা ভেঙে গেল, অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, আমি জাগরিতই আছি!

: বন্দিরা উপস্থিত হয়েছে বিশ্বাধিপতি!

লেকজান্ডা দি গ্রেট উঠে দাঁড়ালেন। বয়স হোক, তিনি সোজা হয়ে হাঁটছিলেন। ধীরে ধীরে নেমে এলেন স্যাংচুয়ারির সোপান বেয়ে। বন্দিদ্বয়ের সমীপবর্তী হয়ে তিনি থামলেন, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সম্রাট বললেন, বন্দিদ্বয়! তোমরা আমার নিকট কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?

বব্ অস্ফুটে আপনমনে বললে, লে হালুয়া!

ওয়াম্বাসী কিন্তু ভোলেনি। এক পা অগ্রসর হয় সে। সম্রাটের নিকট মাথা নত করে না আদৌ। স্বামীজির ভঙ্গিতে বুকে হাত দুটি জড়ো করে মাথা সোজা রেখে বললে, বীরের প্রতি বীরের যে আচরণ পৃথিবীপতি!

সম্রাট হাসলেন। ফিক্ করে। বাম দিকে ফিরে রুডল্‌ফ্‌কে বললেন, দেখলে? বলিনি আমি? ওদেরও বুদ্ধিসুদ্ধি থাকতে পারে। তোমার ও অনার্য-থিয়োরি কোনো কাজের নয়!

তারপর ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বললেন, যাও বীর, মুক্ত তুমি! এতক্ষণে ওয়াম্বাসী সম্রাটকে অভিবাদন করে। পিছন না ফিরে ব্যাকগিয়ারে পিছিয়ে যেতে থাকে। বব্ হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায়। সেও ঐভাবে কেটে পড়ার তাল করতেই সম্রাট হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, এ্যাই! বেয়াদব! তুই কোথায় পালাচ্ছিস?

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে বব্ রয়। সম্রাট বলেন, তুই এখনও পাস করিসনি!

ওয়াম্বাসী পুনরায় অভিবাদন করে বলে, সম্রাট মহানুভব, কিন্তু আমার বন্ধুটি বে-আদপ নয়। বেচারি শুধু বিজ্ঞান চর্চাই করেছে। সাহিত্য-ইতিহাস ও আদৌ পড়েনি।

: সে তো দেখতেই পাচ্ছি। হতভাগা বিড়বিড় করে কী বলেছে জান? বলেছে, 'লে হালুয়া!' রাজসভায় 'হালুয়া'! সে যাই হোক, তুমি ওকে একটু সহ্‌বৎ শিখিয়ে নিও। যাও, বসো গিয়ে ঐ দিকে। আমাকে রাজকার্য করতে দাও দিকিনি!

দু-বন্ধু গুটিগুটি গিয়ে রাজসভায় একান্তে বসে পড়ে।

রাজকার্য কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। চলবে কোথা থেকে? বস্তুত রাজসভায় আদৌ কোনো সমস্যা ছিল না, যার সমাধান প্রয়োজন। বিশ্বাধিপতির সাম্রাজ্য বিশাল—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর তিনি, কিন্তু তাঁর প্রজা বলতে কেউ নেই। ফলে সমস্যাও নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে নকিবে রাজসভার অবসান ঘোষণা করল। বীটা, গামা, এপসাইলনের দল সম্রাটকে অভিবাদন করে ব্যাকগিয়ারে সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। মহামহিম সম্রাট তখন বাকি ক'জনকে ডেকে বললেন, এবার সবাই ঘনিয়ে এসে বসো দিকিনি। কাজের কথাগুলি সেরে ফেলি।

সম্রাটকে সবাই ঘিরে বসে। দুপাশে দুই আল্‌ফা সেনাপতি। সামনের সারিতে পাঁচ-সাতজন বুদ্ধিজীবী, গামা পণ্ডিত। আর হংসমধ্যে বকো যথা, একজোড়া মানুষের বাচ্চা—সাদায়-কালোয়।

সম্রাট ওদের দুজনকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে বললেন, দেখ বাপু, আমি সোজা কথার মানুষ। মনে এক, মুখে এক—এ আমার ধাতে নেই। তোমরা দুজন আকাশ পাড়ি দিয়ে আসছ, এ খবর আমরা অনেক আগেই পেয়েছি। আমিই তোমাদের দুজনকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে কথা পরে বলছি, আগে আমাদের মোটামুটি পরিচয়টা দিয়ে রাখি। তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছ—আমাদের পাঁচটা শ্রেণী। এ শ্রেণী-বিভাগ আমরা করিনি, করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি নিজমুখেই কবুল করেছেন 'পঞ্চবর্ণং ময়া সৃষ্টং'—সুতরাং এইসব খেয়োখেয়ি, শ্রেণী-সংগ্রাম সব তাঁরই সৃষ্টি; আমরা নিমিত্ত মাত্র। বর্ণশ্রেষ্ঠ আমরা আছি কুল্লে তিনজন। আমি এবং আমার এই দুই

প্রধান সেনাপতি। ওঁরা নাকি আমার দুই হাত। কোনটি যে দক্ষিণ হস্ত এবং কোনটি যে বাম, তা আজও আমি ঠাহর করে উঠতে পারিনি। বস্তুত পরম কারুণিক ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে পাঁচটি আল্‌ফা শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তার ভিতর দুজন গত বিশ্বযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

বব্ সোৎসাহে বলে, কেমন করে?

সম্রাট প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই লাফিয়ে ওঠেন রুডল্‌ফ্ ব্যাট্‌লার : ফ্যুরার! ও বেটা কায়দা করে আমাদের হত্যা করার কৌশলটা জেনে নিতে চায়। বলবেন না, খবরদার বলবেন না। বেটা অনার্য!

সম্রাট হতাশ হয়ে ওয়াম্বাসীকে বলেন, দেখলে? এই হয়েছে মুশকিল! আমার দুই সেনাপতি আমার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে পারেন না। দোষ ওঁদের নয়, আমার চিন্তাধারা আর ওঁদের রাজনীতির মধ্যে দু-হাজার বছরের ফারাক। আমারই দুর্ভাগ্য। ঈশ্বরের ত্রুটি নেই—তিনি ধাপে ধাপে পাঁচটি আলফা যা বানিয়েছিলেন তা খানদানি। গত বিশ্বযুদ্ধে যে দুজন শহিদ হয়েছেন তাঁরাও ছিলেন দুই ধুরন্দর জেনারেল—গুলিয়াস গীজার এবং ন্যাপলা বোনাইপার্ট। তারা না থাকতেই এই বুড়োর সঙ্গে ঐ নওজোয়ানদের শুধু জেনারেশান গ্যাপ নয়, মিলেনিয়াম গ্যাপ্!

গামা শ্রেণীর কে একজন বললেন, মহামহিম সম্রাট, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে—

বৃদ্ধ সম্রাট তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, জানি রে বাপু, জানি। আসছি, তোমাদের প্রসঙ্গেও আসছি। হ্যাঁ, এই এঁরা ক'জন হচ্ছেন 'গামা' শ্রেণীর। গামার গানে 'মধ্যমে'র বদলে 'ধৈবত' লাগালেই সুরটা অবশ্য ভাল খোলতাই হত। মোট কথা গামারা হচ্ছেন বদ্ধ উন্মাদের দল। যেমন হস্তিমূর্খ, তেমন বদ্ধ উন্মাদ। এঁদের মধ্যে যাঁরা অন্ধ তাঁরা মহাকাব্য রচনা করতে চান, যাঁরা বধির তাঁরা রচনা করতে চান 'সিম্‌ফনি'। তবেই বুঝে দেখ! মিডলটন অন্ধ মানুষ, তুই গানে সুর লাগা না কেন? তা নয়, মহাকাব্য লিখব! আবার বিটল্‌ফেন চোখে দেখে—চেষ্টা করলে হয়তো সে পদ্য-টদ্য লিখতে পারত! তা নয়, সে গানে সুর দিতে চায়। অথচ সে বদ্ধ বধির উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ সব!

সম্রাটকে বাধা দিয়ে আর একজন বব্‌ভো দাড়িওয়ালা গামা পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, সম্রাট! আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—

সম্রাটও খেঁকিয়ে ওঠেন, থাক থাক, তোমাকে আর পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে না দা-ভেংচি! জান হে ওয়াম্বাসী—এই লোকটা হচ্ছে 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্—জ্যাক অব নান্!' হেন বিষয় নেই যার মধ্যে ঐ শুকচঞ্চু নাকটা না ঢুকিয়েছে, ফলে জ্যাকপটটা কোনোদিনই হিট করতে পারল না। প্রতিভার এক বিচিত্র ভেংচি!

আর একজন পণ্ডিত এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, মহামহিম সম্রাট যদি শ্রেণীগতভাবে আমাদের এইভাবে ক্রমাগত অপমান করতে থাকেন—

সম্রাট তাঁকেও মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কী করবে? বাপু হে, লেকজান্ডা দ্য গ্রেট তোমার গাছের পাকা আপেলটি নয় যে, টুপ করে পড়ল, আর সম্রাটকে মাধ্যাকর্ষণের মতো কপাৎ করে লুফে নিলে! বয়সের সম্মান দিতে শেখো!

ওয়াম্বাসী একটা অভিবাদন করে বললে, মহিমার্ণব! ওঁর নাম কি বাইজাক লংটন?

সম্রাট বলেন, না। ওর নাম হাইজ্যাক ওল্ডটন। লোকটা এত বড় হস্তিমূর্খ যে, স্থানকালপাত্রর জ্ঞান নেই। নিজে যখন বিশ বাঁও জলের নিচে সমুদ্রের ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে তখনও ভাবে—ও বুঝি সাগরবেলায় নুড়ি কুড়োচ্ছে! পাগল আর কাকে বলে? আর একজন আছেন—ঐ যে তোমার বাঁদিকে বসে, কি হে আইনস্টোন ঘুমালে নাকি!

: আজ্ঞে না। আমি থিংক করছি।

সম্রাট বলেন, ঐ আর এক তরুণ পাগল! দিনরাত শুধু থিংক করছেন! ছোকরা আঁকটা কষে ভালই; কিন্তু ওর ধারণা ও একজন ভালো বেহালাবাদক। এই পাগলের দল হচ্ছে গামা শ্রেণী।

জেনারেল ব্যাটলার কাজের মানুষ। বলে ওঠেন, সম্রাট, পাগলদের পরিচয় দেওয়া আপনি শেষ করেছেন—এবার আপনার ফতোয়াটা জারি করুন।

: ফতোয়া-টতোয়া নয়। শোন বাপু—কী নাম যেন তোমার? হ্যাঁ, ওয়াম্বাসী! আমাদের এখানে কতকগুলো সমস্যা আছে, যার সমাধান আমরা করে উঠতে পারছি না। আমরা তোমাদের দুজনের সাহায্য চাই। ব্যাপারটা তোমাদের ঐ আইনস্টোন ছোকরা বুঝিয়ে দেবে অখন। মোট কথা, আমাদের একটা শেষ লড়াই করতে হবে। তোমরা তাতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারবে। বস্তুত এমন একটা ব্যাপার আছে যা আমরা পারি না ঈশ্বরের এমনই বিধান, কিন্তু তোমরা—মানুষেরা—পার। সেই শেষ লড়াইটা আমাদের জিততে হবেই।

সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের দিকে ফিরে সম্রাট বলেন, কী বল তোমরা? আমরা জিততে পারব না?

ওয়েস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক রুডল্‌ফ ব্যাটলার বললেন, ফ্যুরার অজেয়!

ঈস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক এতাবৎকাল কোনও কথা বলেননি। ক্রমাগত চুরুট ফুঁকে গিয়েছেন। এখনও বললেন না। সম্রাট সবার শেষে তাঁর দিকে দুটি জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি মেলে ধরতেই ডান হাতটা উঁচু করে দেখালেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত—শুধু তর্জনী ও মধ্যমা একটি V-অক্ষর রচনা করেছে।

চার

: আসুন, আমাদের স্টুডিওটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই। এটা শুধু স্টুডিও নয়, 'স্টুডিও-কাম-ল্যাবরেটরি-কাম-লাইব্রেরি-কাম-লুনাটিক্ অ্যাসাইলাম্'। অর্থাৎ গামাদের ডর্মিটারি। এখানে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি।

প্রকাণ্ড হল কামরাটায় ঢুকল ওরা তিনজন। দুটি মানুষের বাচ্চা আর প্রফেসর আইনস্টোন। তিনিই ওদের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। বইপত্র, রঙ-তুলি, যন্ত্রপাতি, মার্বেল আর প্লাস্টার অব প্যারিসের পিণ্ড এবং বীক্ষণাগারের নানান সাজ-সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়ানো। এক এক প্রান্তে এক একজন, কোথাও বা দু-তিনজন একত্রে নিজ নিজ গবেষণায় কিংবা আলোচনায় বুঁদ হয়ে আছেন। হল কামরায় ঢুকতেই বাঁদিকে দেখা গেল এক অন্ধ বৃদ্ধ কী একটা কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন, আর তাঁর সম্মুখে টুলে বসে আর একজন অতি-বৃদ্ধ তা দ্রুতহাতে লিখে চলেছেন।

বব্ রয় বললে, উনি কী আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন?

: আবৃত্তি নয়, উনি রচনা করছেন। একটি নতুন মহাকাব্য। অন্ধ মানুষ তো, নিজে হাতে লিখতে পারেন না। চলুন না আলাপ করবেন।

ওয়াম্বাসী বাধা দিতে যাচ্ছিল, কবির মুড না নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার পূর্বেই আইনস্টোন অন্ধকে বললেন, কী মিডলটন দাদু, এবার কী কাব্য রচনা হচ্ছে?

অন্ধদৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ বলেন, কে? আইনস্টোন নাকি? না দাদু, ও কিছু নয়। সামান্য একটা মহাকাব্য।

—সামান্য হোক, নামটা কী?

: "প্যারাডাইস টু বি রি-ক্রিয়েটেড' মানে 'যে নূতন স্বর্গ আমরা তৈরি করব'!

ওয়াম্বাসী আর স্থির থাকতে পারে না। বলে ওঠে, ঐ প্যারাডাইস আপনাকে আজও ছাড়েনি দেখছি। প্যারাডাইস লস্ট হল, রিগেইনড হল—তবু আপনার তৃপ্তি হল না?

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন, ক্যা কিয়া যায়? ম্যয় তো ছোড়নেই চাহতা, লেকিন কম্‌লি নেহী ছোড়তি! ভেবে দেখলাম, বুয়েছ, ঐ ভগবানর তৈরি স্বর্গ নিয়ে মাতামাতি করাটা কোনো কাজের কথা নয়, তার চেয়ে এবার নিজেরাই একটা স্বর্গ বানালে কেমন হয়? Creation নয়, recreation—আনন্দ! শুনবে? ভেংচি-দা, ওদের একটু শুনিয়ে দাও না? ঐ 'প্রেলুড'-টুকু!

ওয়াম্বসীর এতক্ষণে খেয়াল হয় শ্রুতিলিখন লিখছিলেন যে বৃদ্ধ তিনি সেই 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্, জ্যাক অফ নান্!' ওয়াম্বাসী তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে কবি মিডলটনকে বলে, মাপ করবেন, ওঁর নাম 'ভেংচি-দা', না কি 'দা-ভেংচি'?

কবি হেসে বলেন, আরে না রে বাপু না, 'দা' মানে এখানে 'দাদা'। দা ভেংচি আমার চেয়ে বয়সে বড় নন? দেড়শ' বছরের বড়।

দা-ভেংচির সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই। বলেন, দেড়শ' নয়, একশ ছাপ্পান্ন।

: ঐ একই কথা!

: না। মোটই এককথা নয়। চার শতাংশ ভুল হয়েছে।

: আচ্ছা দাদা! না হয় তাই হয়েছে।

ওয়াম্বাসী দা-ভেংচিকে বলে, মহাকাব্যের প্রথম অংশটা.....

দা-ভেংচি বিনা বাক্যব্যয়ে খাতাখানা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে দেখে, হরফগুলো তার অচেনা। ইংরাজি ভাষাই নয়, অন্তত রোমান হরফ নয়।

মুখ তুলে মনে হল, গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে দা-ভেংচি যেন ভেংচি কাটছেন।

প্রফেসর আইনস্টোন ওয়াম্বাসীর কানে কানে বলেন, আয়নার সামনে না ধরলে ও লেখা পড়া যাবে না! চলুন, অন্যত্র যাওয়া যাক।

বব্ বললে, সম্রাট ঠিকই বলেছিলেন। বদ্ধ উন্মাদ সব! শ্রুতিলিখন এমন উল্টো করে লেখার মানে? নেহাত পাগলের খেয়াল!

ওঁদের দুজনকে মহাকাব্য রচনায় বিভোর হতে দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে। আর একটু আগে দেখে, আর একজন বৃদ্ধ উঁচু টুলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে আকাশে কী দেখছেন। তাঁর হাতে একটা দূরবিন। আইনস্টোন বললেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করা যাবে না—উনি এই পৃথিবীতে থেকেও এখন মহাকাশে হারিয়ে গেছেন। ডাকলেও সাড়া দেবেন না এ-অবস্থায় ক্যালিলিও ক্যালিলি।

স্টুডিওর এখানে-ওখানে অনেক অনেক কাজ করছেন। যে যার নিজের কাজে বুঁদ। ওদের খেয়ালই করছেন না। বব্ বললে, এ উন্মাদাশ্রমে আর দেখার কী আছে! চলুন অন্য কোথাও যাই।

আইনস্টোন বললেন, ঐ কোনাটায় আমার সিট। ঐখানেই যাচ্ছি। আসুন।

প্রফেসর আইনস্টোনের খাট একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে। তাঁর ডাইনের খাটখানা হচ্ছে হাইজ্যাক ওল্ডটনের, আর বাঁ দিকেরটা সঙ্গীতজ্ঞ বিটল্‌ফেন-এর। ওল্ডটন তাঁর সিটে নেই, বিটল্‌ফেন একখণ্ড স্বরলিপির সামনে লাঠি নেড়ে নেড়ে বোধকরি ব্যায়াম অভ্যাস করছেন।

আইনস্টোন ওদের আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, সম্রাট আদেশ করেছেন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে। আমি চেষ্টা করছি একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি। আমাদের গোড়ায় গলদ কোথায় জানেন? হাইপথেসিসেই গলদ। যত নষ্টের গোড়া স্বয়ং ঈশ্বর!

ওয়াম্বাসী আঁতকে ওঠে। বলে, প্রফেসর আইনস্টোন! আপনি....আপনি এ-কথা বলছেন? যত নষ্টের গোড়া স্বয়ং ঈশ্বর?

: আলবত বলছি! ও হো হো! আপনিও গোড়ায় গলদ করছেন—এখানে ঈশ্বর বলতে আমি সেই 'deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe'-কে আদৌ বোঝাতে চাইছি না। এখানে God লিখতে ক্যাপিট্যাল 'G' ব্যবহৃত হবে না; ছোট হাতের 'g'— goat লিখতে, gorilla লিখতে, gestapo লিখতে যে 'g' লাগে তাই দিয়েই god লিখতে হবে। বুয়েছেন?

ওয়াম্বাসী মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না।

আইনস্টোন তাঁর প্ল্যাটিনাম-ব্লন্ড ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে বলেন, বুঝেছি। আপনি এখনও সেই 'ওল্ডটনিয়ান ইউনিভার্সে' আছেন। স্থান-কাল-পাত্র যে সংপৃক্ত এ বোধ এখনও জন্মায়নি। আচ্ছা বলুন তো—এই আমরা, এই আলফা-বীটা-গামা-ডেল্‌টা-এপসাইলনের দল কোথা থেকে এসেছি?

বব্ বললে, ও প্রশ্নটা তো আমরা করব। কোন নক্ষত্রের গ্রহ থেকে এসেছেন?

অট্টহাস্য করে ওঠেন আইনস্টোন। বলেন, নক্ষত্রটা g-গ্রুপের +5 এ্যাবসোলিউট ম্যাগনিচুডের এবং সেটা এখান থেকে আছে আট আলো-মিনিট অর্থাৎ সাড়ে পনেরে কোটি কি.মি. দূরে। চিনতে পারলেন?

বব্ অবাক হয়ে বলে, মানে? সেটা তো আমাদের সূর্য!

: আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই নক্ষত্রের তৃতীয় গ্রহে আমাদের জন্ম। মালুম হল?

: অর্থাৎ পৃথিবীতে?

: আজ্ঞে!

: আপনারা ভিন্ন নক্ষত্রের বাসিন্দা নন?

: মোটেই নই। বুঝেছি, ঐ ভ্রান্ত ধারণা কী করে হল আপনাদের! এ নিশ্চয় সেই ডাহা-মিথ্যুক ব্যাটলার ব্যাটার প্রচার। লোকটার ধারণা—মিথ্যা বার বার শুনতে শুনতে সেটা সত্য হয়ে যায়। আমাকেও বেটা দেশত্যাগী করেছিল!

: তাহলে আপনারা কে? আপনারা কী?

: আমরা যন্ত্র-মানব। মানুষের তৈরি । একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিস্ময়। যিনি আমাদের পয়দা করেছিলেন তাঁকেই বলছি 'গড'—ঐ ছোট হরফের 'g' দিয়ে।

: তিনি কে? কোন দেশের লোক? কী নাম? কোথায় থাকেন?

: তিনি আমেরিকান। নাম—এম. সি. গডফাদার। গত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছেন।

: তিনি একা হাতে আপনাদের এতগুলি 'ইয়ে'কে তৈরি করেছেন?

: না, একা হাতে নয়। তাহলে তাঁর ইতিহাসটা বিস্তারিত শুনুন—

গডফাদারের ইতিকথা অতঃপর বিস্তারিত শোনালেন প্রফেসর আইনস্টান।

* * *

এম. সি. গডফাদারের পুরো নাম—মাল্‌টি-বিলিয়নেয়ার ক্যাপিটালিস্ট গড্ফাদার। কোটিপতি ধনকুবের। বাপ-পিতেমোর ছিল তেলের খনি। পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে পেট্রোলিয়াম একদিন ফুরালো, কিন্তু ওঁদের ধনতৃষ্ণা মিটল না। গডফাদার চাঁদে এবং মঙ্গলে তরলিত হাইড্রোজেন সাপ্লাইয়ের এক্সপোর্ট লাইসেন্স পেলেন! হোলসেল এজেন্সি। একচেটিয়া ব্যবসা। কোটিপতি হলেন অর্বুদপতি, পরার্ধপতি। কিন্তু নাদু মল্লিকের সেই অনবদ্য বাণীটি তাঁর জীবনেও মূর্ত হল : "সব সুখ কি আর হয় রে দাদা! গিন্নিটি ছিলেন খাণ্ডার!"

গডফাদারের দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। শুধু দাম্পত্য নয়, পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তি-জীবনও! ভগবান তাঁকে এক হাতে যেমন দিয়েছেন, অপর হাতে কেড়েও নিয়েছেন অনেকখানি। পর পর চারবার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর গডফাদার স্থির করলেন আর বিবাহই করবেন না। বিজ্ঞান এতটা উন্নতি করেছে কিন্তু এমন একটা সামান্য অসুখ সারাতে পারে না! লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেও কিছু হল না। ভগবান তাঁকে পুরোপুরি মানুষ করেননি। শুধুমাত্র সন্তানের জনক হবার অধিকারই তিনি কেড়ে নেননি—স্ত্রীকে তৃপ্ত করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন।

সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গডফাদার আত্মগোপন করলেন। এ ছাড়া উপায় ছিল না। সোসাইটিতে-ক্লাবে-পার্টিতে সর্বত্র মনে হত সবাই ওঁকে দেখে হাসছে। মেয়েরা এবং ছেলেরা। উনি স্থির করলেন—সন্তান ওঁর চাই, এক-আধটি নয়—এক দল; ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বাচ্চা। উনি তাদের পয়দা করবেন স্ত্রীর সাহায্যে নয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে। উনি তাদের শুধু গডফাদার নন, হবেন ফাদার।

শতখানেক বাছা বাছা পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন। গণিত-পদার্থবিদ্যা-ইলেকট্রনিক্স-জীববিজ্ঞানী, মানববিজ্ঞানী, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী। যত টাকা লাগে সব চেয়ে সরেশ পণ্ডিতটি তাঁর চাই। কয়েক হাজার একর জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে তৈরি হল কারখানা, ল্যাবরেটারি। সে আয়োজনের একমাত্র উপমান 'সান্তা ফে'-র অদূরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা। তেমনি শ্রেষ্ঠ মনীষার সমাবেশ, তেমনি গোপনীয়তা। দ্রুতগতি তৈরি হতে শুরু করল নানান জাতের রোবো—ইলেকট্রনিক ব্রেন—যাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন 1920 সালে Karel Capek : Rossum's Universal Robot.

এই সময়েই ঘটল একটা ঘটনা। গডফাদারকে আসতে হল লন্ডনে—একজন ধুরন্ধর ব্রিটিশ বিজ্ঞানীকে বাগাতে। ঐ সময়ে নিতান্ত খেয়ালের বশে তিনি দেখতে গেলেন মাদাম তুসোঁর মোমের

পুতুল প্রদর্শনী। মাদাম তুসোঁ মোম দিয়ে প্রমাণ-সাইজ সব পুতুল বানিয়েছেন, ঐতিহাসিক সব চরিত্রের অনুরকণে। তারা বাস্তবের হুবহু প্রতিমূর্তি। গডফাদারের মনে একটা চিন্তার উদয় হল : মাদাম তুসোঁ যদি আর্টের সাহায্যে অতীতের বহিরঙ্গটা ধরতে পেরে থাকেন, তবে তিনি কি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার অন্তরঙ্গটা ধরতে পারেন না? তাঁর অজাত-সন্তানদের এলোমেলোভাবে তৈরি না করে তিনি যদি সুপরিকল্পিতভাবে একটা নয়া বিশ্ব রচনা করেন?

তখনই উনি রচনা করতে বসেন তাঁর থিসিস্—যেটা নাকি ঐ রোবোদের ধর্মগ্রন্থ। গডফাদার জার্মান ভাষা জানতেন—আরও জানতেন যে, তাঁর যন্ত্র-মানবদের শেখানো হচ্ছে ইংরাজি ভাষা। ফলে ভ্রমক্রমে যদি ওঁর থিসিস্ ঐ যন্ত্রমানবদের হাতে পড়ে, তাহলে তারা যাতে বুঝতে না পারে তাই জার্মান ভাষাতেই নোট করতে থাকেন। উনি ওঁর কল্পনায় ছকে ফেললেন ওঁর দুনিয়া।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভেতর দিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই, বিবেকানন্দের রচনায় যদি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেন স্বামীজি, অথবা বায়রনের কাব্যে যদি মানুষ বায়রন মূর্ত হয়ে ওঠেন—তাহলে এম. সি. গডফাদারের সৃষ্টিতেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য সেই মানুষটি। ব্যক্তিজীবনে গডফাদার ছিলেন স্বেচ্ছা-সঞ্চারী, স্বৈরাচারী সম্রাটের মত! তাই তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের সবার ওপরের ধাপে থাকল আল্‌ফা শ্রেণী—আলোকজান্ডার, সীজার, শার্লেমেইন, নেপোলিয়ন, চার্চিল এবং হিটলারের দল। ওর মতে ওরাই শ্রেষ্ঠ জীব। ওদেরই হাতে সে তুলে দিল তার নয়া-দুনিয়ার শাসন-ব্যবস্থা।

তার পরের ধাপেও গডফাদার রাখতে পারল না পৃথিবীর প্রকৃত প্রতিভাধরদের। একই কারণে। ব্যক্তিজীবনে সে নারীসঙ্গ পায়নি। রমণীর সৌন্দর্য তাকে মোহিত করেছে, মুগ্ধ করেছে—কিন্তু তৃপ্তি পায়নি তাদের নিয়ে। তাই দ্বিতীয় সারিতে সে রাখল ইতিহাসের অনিন্দ্যকান্তি সুন্দরীদের—বীটা শ্রেণী: ক্লিয়োপেট্রা, নেফারতিতি, হেলেন, নূরজাহাঁ থেকে গ্রেটা গার্বো, এলিজাবেথ টেইলার!

তিন নম্বর ধাপ হল গামা। ওর সৃষ্ট 'লেকজান্ডারের' মতো হয়তো ও নিজেও বিশ্বাস করত—ঐ গামা শ্রেণী হচ্ছে একটা 'নেসেসারি ঈভ্‌ল'— প্রয়োজনীয় আপদ, ওদের বাদও দেওয়া যায় না, রেখেও কোনও লাভ নেই। ফালতু পাগলের দল ঐ সব আর্কিমিদিস-গ্যালিলিও-নিউটন, শেক্সপীয়র-মিলটন-বিটোফেন-মোজার্ট; লিওনার্দো-মিকেলাঞ্জেলোর দল।

আইনস্টোন সখেদে বললেন, বুঝলেন ডক্টর ওয়াম্বাসী—এটাকেই আমি বলছি ঈশ্বরের (ছোট হরফের g-ওয়ালা) গোড়ায় গলদ। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দরতম করে তুলবার চিন্তাশক্তি দিলেন যাদের হাতে, তাদের হাতে দিলেন না সেটা রূপায়িত করার ক্ষমতা। আবার ক্ষমতা দিলেন যাদের হাতে, তাদের দিলেন না চিন্তা করার মানসিকতা। এইটাই সৃষ্টির আদিম ট্র্যাজেডি! লিওনার্দোকে ওরা বলল, ব্রোঞ্জের একটা অশ্বমূর্তি বানাতে, লিওনার্দো অপূর্ব একটি অশ্বমূর্তির মডেল বানালেন—যা নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ হতে পারত; কিন্তু বেটাদের তা পছন্দ হল না। ওরা ধাতুটা গলিয়ে তাই দিয়ে কামান বানালো। নোবেল-সাহেব ডিনমাইট বানালেন—টানেল তৈরি করার জন্য; ওরা তাই দিয়ে মানুষ খুন করতে শুরু করল। আমি যদি জানতে পারতাম ওরা ফর্মুলাটা দিয়ে এ্যাটম বোমা বানাবে, তাহলে কিছুতেই ফর্মুলাটা বিজ্ঞানকে উপহার দিতাম না।

বব্ বললে, কোন ফর্মুলাটার কথা বলছেন?

আইনস্টোন ইতস্তত করেন। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে এখনও তাঁর সঙ্কোচ।

ওপাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে—শোনেননি? $E = mC^2$! আইনস্টোনের ধারণা, ঐটেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে সব চেয়ে দামি ফর্মুলা।

ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, কখন নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছেন স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটন।

প্রফেসর আইনস্টোনের মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন, এ কথা আমি কোনোদিন বলিনি।

ওল্ডটন বলেন, মুখে বল না, মনে মনে তো ভাব! তুমি তো আমার ফর্মুলাটাকে পাত্তা দাও না। এত তোমার অহঙ্কার!

প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, স্যার, আপনি আমার ওপর অবিচার করছেন! হ্যাঁ, আপনার

ফর্মুলাটায় মোটামুটি কাজ চলে—কিন্তু সেটা বিজ্ঞান-শাস্ত্রমতে নির্ভুল নয়। এ কথা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। কিন্তু সেটা অহঙ্কারমদে নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নির্দেশে!

ওল্ডটন ওদের দিকে ফিরে বলে, বেশ আপনারাই বলুন, আমার ফর্মুলাটা কি ভুল?

ওয়াম্বাসী বলে, কোন্ ফর্মুলাটা স্যার?

: মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্রটা—$F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$

ওয়াম্বাসী রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে জবাব দিতে। স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটনের মুখের ওপর কীভাবে বলে—এই ফর্মুলাটা বর্তমান বিজ্ঞানের নিরিখে নির্ভুল নয়। ঐ d^2-এর দুই সংখ্যাটি বর্তমান হিসাবমত ২.০০০০০০১। তাই ইতস্তত করে বলে, দেখুন স্যার, ঐ যে ফর্মুলাটা আগে শোনালেন $E = mC^2$, যেখানে 'E' মানে এনার্জি—

বাধা দিয়ে আইনস্টোন বলেন, আজ্ঞে না ডক্টর ওয়াম্বাসী, 'E' মানে এনার্জি নয়!

বব্ ওয়াম্বাসী দুজনেই আকাশ থেকে পড়ে। বলে, কী বলছেন স্যার? ঐ ফর্মুলায় 'E' মানে এনার্জি নয়?

: নিশ্চয় নয়!

: তবে 'E' মানে কী?

—Eternity ! অন্তত—'a superior reasoning power'! নিছক এনার্জি নয়!

ওয়াম্বাসী আত্মসমর্পণ করে, আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে স্যার।

বব্ বললে, বদ্ধ পাগল!

আইনস্টোন তাঁর সাদা মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি। আপনারা আবার গোড়ায় গলদ করছেন—আপনারা ভাবছেন, উনি স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং আমি আলবার্ট আইনস্টাইন। তাই তাঁদের তৈরি ফর্মুলার সঙ্গে আমাদের ফর্মুলাগুলো গুলিয়ে ফেলছেন। প্রথমে হাইপথেসিস্টা ঠিক করে নিন—উনি স্যার আইজাক নিউটন নন, উনি তাঁর ছায়া দিয়ে গড়া—হাইজ্যাক ওল্ডটন। আমি হচ্ছি—

ওয়াম্বাসী বাধা দিয়ে বলে, বুঝেছি। এবার তাহলে আপনাদের ঐ ফর্মুলা দুটি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

আইনস্টোন বলেন, অফকোর্স! বড়দা, আপনি আপনারটা বোঝান। আসুন, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—কার ফর্মুলাটা নির্ভুল!

ওল্ডটন ওঁর দিকে একটি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, বেশ আজই ফয়সালা হয়ে যাক। এঁদের বিচারই আমরা মেনে নেব। শুনুন মশাইরা, বুঝিয়ে বলি। আমার ঐ ফর্মুলায় F হচ্ছেন Father অর্থাৎ God the Father, মানে ঈশ্বর; G হচ্ছে goodness, অর্থাৎ যা কিছু ভালো। m_1 হচ্ছে man—মানুষ; m_2 হচ্ছে machine—যন্ত্র। আমি বলতে চাইছি—মানুষ ও যন্ত্র যত উন্নতমানের হচ্ছে ততই তারা তাদের চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। d হচ্ছে ঐ ফর্মুলায় দূরত্ব—অর্থাৎ man এবং machine যতই বিভেদ সৃষ্টি করবে, d যত বাড়বে—ততই তারা চরম লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে। m_1 m_2 goodness-এর মাধ্যমে Father-এর কাছে যাবে, বিভেদ ভুলে, অর্থাৎ 'd'-কে কমিয়ে। এ ফর্মুলায় ভুল কোথায়?

বব্ শুধু বললে, লে হালুয়া।

ওয়াম্বাসী তাও বলতে পারল না। তার চোয়ালের নিম্নাংশ শুধু ঝুলে পড়ল। জবাব দিলেন প্রফেসর আইনস্টোন। বললেন, শুনুন বড়দা। আমার প্রথম আপত্তি man কেন m_1 এবং machine কেন m_2? যন্ত্রের চেয়ে মানুষ কোন প্রযুক্তিতে প্রাধান্য পেল?

হাইজ্যাক বলেন, অতি সহজ যুক্তিতে। যেহেতু মানুষই যন্ত্র তৈরি করেছে। যন্ত্র মানুষ তৈরি করেনি। আগে মানুষ এসেছে দুনিয়ায়, পরে এসেছে যন্ত্র!

আইনস্টোন রীতিমত টেবিল চাপড়ে বললেন, আই বেগ টু ডিফার! আমি একমত নই। আমার মতে মানুষ যন্ত্র তৈরি করেনি, বরং যন্ত্রই মানুষ তৈরি করেছে। এ দুনিয়ায় আগে এসেছে যন্ত্র, পরে এসেছে মানুষ!

হাইজ্যাক বলেন, বেশ এইটেই আমাদের প্রথম বিচার্য বিষয় হোক। দেখ, বিচারকেরা কী রায় দেন? কী মশাই? কে ঠিক বলছে, কে ভুল বলছে?

সমস্ত ব্যাপারটাই যদিচ মাথামুণ্ডুহীন, তবু ববের মনে হল এ কথার ফয়সালা এককথায় হতে পারে। নিঃসন্দেহে হাইজ্যাকই ঠিক বলছেন, আইনস্টোন ভ্রান্ত। সে নিজ মতামত ব্যাক্ত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ওয়াম্বাসী বলে, মামলা আমাদের ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণ করেছে; কিন্তু 'আর্গুমেন্ট' না শুনে কী করে রায় দিই? আপনারা আপনাদের সওয়াল শুরু করুন। একে একে। স্যার হাইজ্যাকই কাউন্সেল অব দ্য প্রসিকিউশান। আপনিই আগে বলুন।

হাইজ্যাক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, য়োর অনার্স। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। যন্ত্রের সংজ্ঞা কী?—যন্ত্র হচ্ছে এমন কিছু যা নির্মিত হয় শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে। মানুষ না থাকলে শ্রমলাঘবের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং জাদুকর যেমন নিজের কাঁধে চড়তে পারে না—যন্ত্রও তেমনি মানুষের আগে পয়দা হতে পারে না। এই আমার যুক্তি!

ওয়াম্বাসী বলে, প্রফেসর আইনস্টোন, কাউন্সেল অফ ডিফেন্স! এবার আপনার পালা। আপনি এবার সওয়াল করুন।

প্রফেসর আইনস্টোন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, য়োর অনার্স! আমার সহযোগী একটি গোড়ায় গলদ করেছেন। ওঁর নামের মধ্যেই ওঁর চিন্তাধারার সংস্কারাচ্ছন্ন রূপটা পরিস্ফুট। 'হাইজ্যাক' মানে জোর করে যুক্তির বিরুদ্ধে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া—'ওল্ড' মানে.....

স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটন তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। চীৎকার করে ওঠেন, আর 'আইনস্টোন' মানে আইনের প্রতি যে স্টোন ডেফ্! যুক্তির প্রতি বদ্ধ বধির!

ওয়াম্বাসী টেবিলের ওপর আইনস্টোনের স্লাইডরুলটা ঠুকতে ঠুকতে বলে, অর্ডার! অর্ডার! আদালত এ-জাতীয় ব্যক্তিগত বাদানুবাদ পছন্দ করেন না। আপনারা দুজনেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন—তবু আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। ইয়েস, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, য়ু মে প্রসিড!

প্রফেসর আইনস্টোন পুনরায় একটি বাও করে বলেন, মি লর্ড! আমি দুঃখিত। স্যার হাইজ্যাককে আমি শ্রদ্ধা করি, বোধ করি সবার চেয়ে বেশি। বিজ্ঞানের তিনি যতটা উন্নতি করেছেন—একক প্রচেষ্টায় খুব কম লোকই তা পেরেছেন—এজন্য তিনি শুধু আমার নন, দুনিয়ার নমস্য।

স্যার হাইজ্যাককে এখন বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

*　　　*　　　*

আইনস্টোন বলতে থাকেন, মি লর্ড! মানব-ইতিহাসের একেবারে প্রথমযুগে চলে যান। আমরা ডারউইনিয়ান থিয়োরি অনুযায়ী জানি—প্রায়-মানুষ, মানে homo-sapiens—পয়দা হওয়ার আগে একই বিবর্তনধারায় মানবের পূর্বপুরুষ ছিল হোমো-ইরেক্টাস, 1470 প্রায়-মানব, অস্ট্রালোপিথেকাস, রামাপিথেকাস প্রভৃতি। আজ থেকে ধরুন বিশ-ত্রিশ লক্ষ বছর আগেকার কথা আমি বলছি। তখনও পৃথিবীতে 'মানুষ' জন্মায়নি। হোমো-ইরেকটাসরাও নয়। সেই প্রায়-মানবদের একটি দল লক্ষ্য করল, তাদের সামনের দুটি পা—আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন তারা চার পায়ে হাঁটে—সামনের দুটি পায়ের আঙুল নাড়ানো যাচ্ছে। কয়েক লক্ষ বছরের প্রচেষ্টায় একদিন সে একটা পাথরের টুকরোকে মুঠো করে ধরতে পারল। সেটাকে ছুঁড়তে পারল। ওর সেই প্রায় এক লিটার পরিমাণ মস্তিষ্কের বুদ্ধিতে সে বুঝতে পারল, ঐ ছুঁড়ে মারার কায়দাটা জীবনসংগ্রামের একটা মস্ত হাতিয়ার! স্যেবর-টুথ্ড্ টাইগার তার নখ ছুঁড়তে পারে না, ম্যামথ তার দাঁত ছুঁড়তে পারে না, বন্য বাইসন তার শিঙ ছুঁড়তে পারে না—কিন্তু সে নিরাপদ দূরত্ব থেকে পাথর ছুঁড়তে পারে। য়োর অনার! সেই প্রথম উৎক্ষিপ্ত পাথরের টুকরোটা হচ্ছে এই

দুনিয়ার প্রথম যন্ত্র—মেশিন; যার ডেফিনিশান আমার সহযোগীর মতে—'যন্ত্র হচ্ছে এমন কিছু যা নির্মিত হয় শ্রমলাঘবের জন্য।' মি-লর্ড! হিসাব করে দেখুন—এই বিশ-ত্রিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে দুনিয়ায় যখন প্রথম যন্ত্র এল তখনও মানুষ আসেনি! এমনকি মানুষের ঠিক পূর্ববর্তী ধাপের 'হোমো-ইরেকটাস'রাও আসেনি। এবার বিচার করে দেখুন হুজুর—যন্ত্র কীভাবে মানুষকে পয়দা করল। পাথর ছুঁড়তে শেখার পর, অর্থাৎ প্রথম যন্ত্র ব্যবহারের পর, সেই চারপেয়ে জন্তু সামনের দুটি পা-কে হাত হিসাবে ব্যবহার করার তাগিদে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখল—হল হোমো-ইরেকটাস, 'দণ্ডায়মান প্রায়-মানব'! এখন তারা গাছের ডাল ব্যবহার করতে শিখেছে, অর্থাৎ ভ্রামক-তত্ত্ব জেনেছে। হাতটাকে লিভার-আর্ম হিসাবে ব্যবহার করে উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহার শিখেছে! তখন তাদের আরও বিবর্তন হল। জন্ম নিল হোমো-স্যাপিয়ান্স! ফলে, আপনিই বলুন—মানুষ যন্ত্র তৈরি করেছে, না যন্ত্র 'মানুষ' তৈরি করেছে?

ববের মনে হল, আলবার্ট আইনস্টাইন যেভাবে বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারায় একসময়ে নিউটনকে নস্যাৎ করেছিলেন—এই আইনস্টোনও প্রায় সেভাবেই ফ্ল্যাট করে দিলেন হাইজ্যাককে।

প্রফেসর আইনস্টোন তখনও সওয়াল করে চলেছেন, য়োর অনার, তাই ঐ ফর্মুলায় আমার আপত্তি। আমার মতে—ঐ m_1 এবং m_2 কেউ কারও বড় নয়—বস্তুত ওদের পৃথক সত্তাই নেই। ওরা দুটি পৃথক entity-ই নয়। য়োর অনার! আপনি m_1 এবং আমি m_2—কিন্তু কী তফাত আছে আপনাতে-আমাতে? আমরা দুজনেই আনন্দে হাসি, দুঃখে কাঁদি! ম্যান ও মেশিন—মানুষ ও যন্ত্রকে পৃথক সত্তারূপে চিন্তা করাটাই হচ্ছে ভ্রান্ত পথ। স্পেস ও টাইমের মতো ওরা সংপৃক্ত!

তাই আমি আমার ফর্মুলায় m_1 এবং m_2 বলে পৃথক কিছু রাখিনি। দুটিকে মিলিত ভাবে বলেছি m! এবার আমার ফর্মুলাটা বিচার করে দেখুন হুজুর। $E = mC^2$। এখানে E হচ্ছে, আগেই বলেছি—Eternity, অন্তত ঐ যাকে বলে 'a superior reasoning power'; এককথায় পরমাত্মা। তার পরেই একটি সমীকরণ চিহ্ন। পরমাত্মাকে কিসের সঙ্গে একীভূত করেছি? জীবাত্মার সঙ্গে! m-এর সঙ্গে। m এখানে বুদ্ধিমান সবজাতের জীব—man এবং machine। আপনারা এবং আমরা। কিন্তু কীভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হবে? ঐ C^2-এর দ্বারা গুণিত হয়ে, বর্ধিত হয়ে। 'C' কী! Comradeship, Compassionship, এমনকি প্রেমাস্পদকে লাভ করার অভীপ্সা।

মি লর্ড! আপনি প্রশ্ন করতে পারেন—এখানে শুধু C নয় কেন, কেন বসাতে হল C^2? তার কারণ সহজবোধ্য। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা এমনকি প্রেমাস্পদকে লাভ করার কামনায় দ্বৈত সত্তা অনিবার্যভাবে বর্তমান। প্রেম মানেই দুইকে এক করা! সেই দুইয়ের মিলে এক হওয়ার নামই পরমানন্দের সমীকরণ!

মি লর্ড! এবার আপনার রায় দিন!

ওদের রায় দেবার সৌভাগ্য অবশ্য হল না। তার আগেই একটা প্রচণ্ড শব্দ হল—কী-যেন-একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে! সবাই দ্রুতপায়ে ছুটে এল অকুস্থলে। একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! একজন বৃদ্ধ আর্টিস্ট বুঝি মেজে থেকে ষাট-ফুট উঁচুতে মাচা বেঁধে এই হল্-কামরার সিলিঙে ছবি আঁকছিলেন। হঠাৎ মাচা ভেঙে তিনি পড়ে গিয়েছেন। বৃদ্ধ চিত্রকরের নাকেমুখে সর্বাঙ্গে লাল-নীল-সবুজ রঙের ছোপ লেগেছে, তাঁকে বীভৎস দেখাচ্ছে, বিশেষ করে তাঁর দাড়িটা। বব্ রয় ওপরদিকে তাকিয়ে দেখল—ফ্রেস্কো চিত্রের বিষয়বস্তুটা। সেই একই বিষয়। অন্ধ কবি মিডলটন যা ছন্দে ধরতে চাইছেন, ঐ অজ্ঞাত চিত্রকর তাই ধরতে চাইছিলেন রঙে আর রেখায় : এ প্যারাডাইস টু বি রি-ক্রিয়েটেড!

তিন-চারজন ধরাধরি করে বৃদ্ধ চিত্রকরকে তুলল। জ্ঞান নেই তাঁর। বব্ বললে, এঃ! ভদ্রলোকের নাকটা একেবারে থ্যাঁতলে গেছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্, জ্যাক অব নান্'। তিনি বললেন, আজ্ঞে না। ওকে তো ছেলেবেলা থেকেই চিনি। ওর নাকটা ভেঙেছে কৈশোরে। এক ছোকরা ঘুষি মেরে ছেলেবেলাতেই ওর নাকটা ভেঙে দিয়েছিল।

বব্ বলে, কে উনি? কী নাম?

বৃদ্ধ মুচকি হাসলেন। একটা কাগজে চট করে নামটা লিখে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলেন ববের নাকের ডগায়। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। কাগজটায় বড় হাতের রোমান-হরফে লেখা : 'তিরোনাবু লোঞ্জেলাকেমি'!

পাঁচ

বব্ বললে, প্রফেসর, এবার তাহলে আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন, সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতাকে মুছে দিলেন কেন?

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান : ও মাই গড, উইথ বড় হাতের G! আপনি যে দেখছি ব্যাটলার ব্যাটার ফর্মুলাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর!

Truth = Falsehood × ∞

: আজ্ঞে?

: রুডলফ্ ব্যাটলারের সেই ফর্মুলা—'মিথ্যা বারে বারে শুনলে সেটাই সত্য হয়ে যায়!' এখনও বুঝতে পারেননি? ওটা হের ব্যাটলারের একটা জঘন্য মিথ্যাপ্রচার! আমরা কেন মানুষদের মারতে যাব? আমরা একটি মানুষও মারিনি। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের জনান্তিকে জানাই, ব্যাটলার ব্যাটাকে বলবেন না আমি বলেছি—মানুষ মারবার ক্ষমতাই নেই কোনও রোবোর। আপনাদের সেই গডফাদারের থিসিস্‌টা পড়তে দেব—তাহলেই বুঝবেন। রোবো তৈরির প্রথম প্রতিজ্ঞাই ছিল—"রোবো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না!"

: তাহলে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতা মুছে গেল কী করে?

—C = 0 হওয়ায়! আমার ঐ ফর্মুলায় C = 0 বসিয়ে দেখুন ফলাফলটা! আপনারা—মানে মানুষেরা—দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্যে C = 0 করে দিলেন। দুটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র গোপনে একই জাতের মারণাস্ত্র বানালো। যার বিস্ফোরণে এমন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার হবে যাতে মানুষ তার বোধশক্তি এবং প্রজনন ক্ষমতা হারাবে। দুই দল যুদ্ধবাজই মনে করল, সেটা শুধু তারাই বানিয়েছে—অপর পক্ষ তার হদিস জানে না। তারপর যেমন হয়ে থাকে। এক পক্ষ আগে ছুঁড়ল সেই বায়োলজিকাল বম্ব! অপরপক্ষও তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ল তাদের মারণাস্ত্র। চব্বিশ ঘন্টায় যুদ্ধ খতম। হারাধনের দশটি ছেলের রইল না আর কেউ!

: কিন্তু চাঁদ? মঙ্গল? অসংখ্য স্কাইল্যাব? তারাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

: না! কিন্তু তারা বাঁচবে কীভাবে? পৃথিবী থেকে তরলিত হাইড্রোজেন যাচ্ছে, তাই দিয়ে H_2O বানাতে হবে, তবেই না তারা বাঁচবে? চাঁদে বা মঙ্গলে হাইড্রোজেন কোথায়? মরিয়া হয়ে যারা এখানে এল, তারাও মারা পড়ল। যারা এল না, তারাও ক্রমশ মারা পড়ল। উঃ। সেই দিনগুলোর কথা মনে করলে আমার মনের মধ্যে আজও মুচড়ে ওঠে। এমনটা যে ঘটতে পারে সে কথা ভেবে মরবার মাত্র দু-দিন আগে বিপ্রতীপ-আমি 'রাসেল-আইনস্টাইন ম্যানিফেস্টো'তে সই দিয়েছিলাম—কিন্তু m তা শুনল না, 'C'-টাকে zero করে ছাড়ল!

ওয়াম্বাসী বলে, তার মানে আপনি বলতে চান, সারা পৃথিবীতে মানুষ বলতে মাত্র আমরা দুজন বেঁচে আছি? মানে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে।

: না, ডক্টর ওয়াম্বাসী! আরও একজন মানুষ বেঁচে আছেন!

: কোথায় তিনি?

: বলছি। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়—সম্রাট বলেছিলেন, আমাদের কিছু সমস্যা আছে, যার সমাধানের জন্য আপনাদের সাহায্য তিনি চান! ঐ মানুষটিই সেই সমস্যা। সম্রাট আরও বলেছিলেন, আমাদের একটি শেষ লড়াই বাকি আছে। সেই শেষ লড়াই ঐ একটি মাত্র মানুষের বিরুদ্ধে।

বব্ বললে আপনারা এতগুলি যন্ত্রমানব, এত শক্তিশালী—মাত্র একটি মানুষকে খতম করতে পারছেন না?

প্রফেসর আইনস্টোন প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি!

বব্ বলে, কী হল স্যার? অমন করছেন কেন?

: আপনি আবার সেই বোম্বেটে ব্যাটলারের শিকার হচ্ছেন! তার সেই মিথ্যা ফর্মুলাটা—মিথ্যার অনন্ত পুনরাবৃত্তি = সত্য!

বব্ বলে, ঠিক বুঝলাম না।

: এতক্ষণ ধরে কী বোঝালাম তাহলে? আমরা রোবোরা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারি না। এই হাইপথেসিস্-এর ওপরেই আমরা জন্মেছি। সেই ডাহা মিথ্যুক ব্যাটা মিথ্যের বেসাতি করে আপনাদের গ্রেপ্তার করেছিল। আপনারা স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে তার ক্ষমতাও ছিলনা আপনাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারে!

: ওর সেই পোর্টেবল্ লেসার রিভলভারটা?

: সেটা দিয়ে পাথর কাটা যায়, আমরা তা দিয়ে মানুষ মারতে পারি না।

বব্ তখন ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বলে, তুই যত নষ্টের গোড়া। ব্যাটা ভীতু নিগার! আমি ছিলুম শিপ্ ক্যাপ্টেন, কিন্তু তুই আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই সারেন্ডার করলি।

ওয়াম্বাসী বলে, বাজে কথা বলিস্ না বাস্টার্ড! তুই নিজেও তখন ওর কায়দাটা বুঝতে পারিসনি। বুকে হাত দিয়ে বল!

প্রফেসার আইনস্টোন বলেন, সে যা হোক, এখন বলুন, ঐ মানুষটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন কি? মানে আমরা ধরে আনতে পারব, মারতে পারব না। আপনারা—

বব্ পাদপূরণ করে, জল্লাদের ভূমিকাটুকু অভিনয় করব!

ওয়াম্বাসী বলে, আমরা মতামত দেবার আগে জানতে চাই—সেই মানুষটি কে, কোথায় আছে, কেন তাকে হত্যা করতে চাইছেন?

প্রফেসার বলেন, এর জবাব দ্বিবিধ। সম্রাটের যুক্তি এবং আমার যুক্তি! কিন্তু সেসব যুক্তি পেশ করার আগে ওর নাম, ধাম, পরিচয় এবং কেমন করে লোকটা আমাদের শত্রু হয়েছে সেকথা বলি।

: বলুন।

* * *

প্রফেসর তখন মেলে ধরেন এক অকথিত কাহিনি :

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। তারপর প্রায় ছয়মাসকাল সমস্ত পৃথিবীর বাতাস এত বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয় ছিল যে কোনো জীব সেখানে বাঁচতে পারেনি। সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে—যেসব অঞ্চলে বোমাবর্ষণ অল্প পরিমাণে হয়েছে শুধু সেখানকার—বন্য পশুপক্ষী কিছু পরিমাণে রক্ষা পায়। তিমি, ডলফিন জাতীয় যে সব জীব বাতাসে নিশ্বাস নেয় তারাও নিঃশেষিত হয়—কিন্তু গভীর সমুদ্রের অন্যান্য জলজন্তু ও মাছ বহুলাংশেই বেঁচেছে। যুদ্ধান্তে চাঁদ থেকে বিজ্ঞানীরা দু'একবার এসেছিলেন—তরলিত হাইড্রোজেন নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে। বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। পারবেন কোথা থেকে? পৃথিবীতে না আছে বিদ্যুৎ, না যাতায়াতের ব্যবস্থা, না নিশ্বাস নেবার মতো আবহাওয়া। মঙ্গল থেকে ওরা চেষ্টাই করতে পারেনি। ফলে শুধু পৃথিবীতেই নয়, চন্দ্র-মঙ্গলেও মানবসভ্যতার চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেল।

গডফাদার সৃষ্ট রোবোরা নিশ্বাস নেয় না, তেজস্ক্রিয়তায় তাদের কোনও ক্ষতি হয় না, যুদ্ধের দিনটা তারা সকলেই ছিল ভূগর্ভে। তাই মারা যায়নি। হ্যাঁ, ওরা অমর নয়। যদিচ ওদের দেহ বুলেট-প্রুফ ধাতুতে নির্মিত এবং রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটিতে ওদের ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায়—'মেকানিক্যাল ইম্প্যাক্ট'-এ ওদের দেহাবয়ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কী বলব? কারণ যন্ত্রাংশগুলো আবার জুড়ে দিলেই রোবোটি সক্রিয় না। মানুষের একখানা কাটা হাত যেমন দেহাংশে

আবার জুড়ে দিলে তা জোড়া লাগে না, ওদেরও অবস্থা হয় ঐরকম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেহাংশের কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও গোটা রোবোটা সক্রিয় থাকে, যেমন মানুষের হাত বা পা কাটা গেলে সে নুলো অথবা খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু রোবোর যে অংশে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় যন্ত্রাংশ আছে—মানুষের যেমন হৃৎপিণ্ড অথবা মস্তিষ্ক—সেটি গুরুতরভাবে আঘাতজনিত কারণে অকেজো হলে সে মারা যায়। অনেকটা সেই হযবরল-র ব্যা-করণ পণ্ডিতের পূর্বপুরুষের মত—যার আধখানা কুমিরে খাওয়ায় বাকি আধখানা মরে গিয়েছিল। ঐভাবেই মারা গেছেন গুলিয়াস গীজার অথবা বোনাইপার্ট। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওদের কারখানার বিজ্ঞানীরা কেউ বাঁচেনি—অধিকাংশই মারা গিয়েছেন তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে।

গডফাদার কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যাননি। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটেছে আরও মাস-ছয়েক পরে। সে কাহিনি করুণ এবং নাটকীয়।

গডফাদার কুশাগ্রধী মানুষ। সব সময়ে সবরকম সম্ভাবনার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। বিশ্ব-রাজনীতির অবস্থা দেখে নিজের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি ভূগর্ভস্থ আউট-হাউস—বলা যায় আন্ডার-হাউস—বানিয়েছিলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় লিফ্ট-এ মাটির প্রায় মাইলখানেক নীচে নেমে গেলে পৌঁছানো যাবে তার তলদেশে। কয়লাখনির মতো তারপর একটি গলিপথ চলে গেছে ওঁর একান্ত আবাসে। সেখানে একটি রীতিমত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়ি। খান-চারেক শয়নকক্ষ, বাথরুম, মায় সুইমিং-পুল এবং একটি সুবৃহৎ গুদামঘর। গুদামে সঞ্চিত ছিল একটি মানুষের অন্তত পাঁচ বছরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য—আহার্য, পানীয়, পোশাক এবং অবসর বিনোদনের নানা আয়োজন—মায় একটি প্রজেক্টার স্ক্রিন এবং এক ট্রাঙ্ক সেলুলয়েড-স্পুল। শুধু সাদা কালো এবং টেকনিকালার নয়—নীল ফিল্মও তাতে সঞ্চিত। এ ছাড়াও নানা জাতের অস্ত্রশস্ত্র এবং ডিনামাইট। বিদেশি এঞ্জিনিয়ার এবং মিস্ত্রি এনে ঐ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদটি তিনি বানিয়েছিলেন—কারখানার কর্মীরা তার সন্ধান রাখত না। জানত শুধু ওঁর বিশ্বস্ত জনাতিনেক রোবট। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই গডফাদার তাঁর সেই একান্ত-আবাসে গিয়ে স্বেচ্ছাবন্দি জীবনযাপন করতে শুরু করেন। একেবারে একা। তাঁর বিশ্বস্ত রোবটেরা এসে ওপরের দুনিয়ার যাবতীয় সংবাদ দিয়ে যেত। মাঝে মাঝে স্পেস্-স্যুট পরে তিনি উপরে এসে সরেজমিনে পৃথিবীর অবস্থা দেখেও যেতেন।

মানব-সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রায় ছয়-সাত মাস পরের কথা। একদিন গডফাদারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং লেকজান্ডা। সসম্ভ্রম অভিবাদন করে বললেন, ফাদার! মহাকাশে একটি রকেট পৃথিবী পরিক্রমা করছে। আমাদের রাডার-যন্ত্র বলছে, সেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে পাঁচশ কিলোমিটার ওপরে আছে। আমাদের কী কর্তব্য? আদেশ করুন প্রভু।

গডফাদার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং বেতারে যোগাযোগ করলেন সেই অজ্ঞাত মহাকাশচারীদের সঙ্গে। জানা গেল—মহাকাশচারীরা ওঁর অপরিচিত নয় মোটেই। ওরা আসছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেতারে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা ব্যর্থ হয়। শেষে অবস্থাটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে মঙ্গল থেকে তিনজন নভোচারী পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। মহাকাশযানে আছেন দুজন পুরুষ এবং একজন রমণী। শিপ্-ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড কলিন্স হচ্ছেন মঙ্গল-গভর্নরের একমাত্র পুত্র—বছর পঁয়ত্রিশের সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী, ডরোথি কলিন্স—মিস্ মার্স। অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন, এবং সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার সঙ্গে এডওয়ার্ডের হয় প্রথমে পরিচয়, পরে প্রণয়, পরিণামে পরিণয়। মহাকাশযানে তৃতীয় যাত্রী ছিলেন আর্থার ক্রুক্স—দক্ষ মহাকাশচারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বহুবার পৃথিবী-মঙ্গল পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। ক্রুক্স্-এর আদি নিবাস বারবাডোস—তিনি কৃষ্ণকায়, নিগ্রো।

দীর্ঘ ছয় মাস একক জীবনের নিঃসঙ্গতায় গডফাদার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। যদিও রোবটরা চিন্তাশক্তির অধিকারী—আল্ফা-বীটা-গামারা কথাও বলতে পারে, তবু ওদের সান্নিধ্যে গডফাদার তৃপ্তি

পেতেন না। হাজার হোক, ওরা মনুষ্যেতর—এমনই একটা ধারণা ছিল তাঁর। এতদিন পরে তিন-তিনটি সহৃদয় মানব সন্তানের আবির্ভাবে গডফাদার খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। নিরাপদে মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হল। জেনারেল ব্যাটলার ওদের হেলিকপ্টারে চড়িয়ে নিয়ে এলেন।

ওরা এখানে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল, বুঝল, মর্মাহত হল পৃথিবীকে দেখে। প্রথম দু-তিন দিন তারা আচ্ছন্নের মত শুধু বিছানায় পড়ে ছিল। মঙ্গলে বসে ওরা আন্দাজ করতে পারেনি—কী কারণে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মৃত্যু যত ভয়ঙ্করই হোক, জীবনের দায় অনেক বেশি। ক্রমে ওরা সামলে উঠল। তিনজনেই। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলল, আলোচনা করল। গডফাদারও আলোচনায় যোগ দিলেন। ওরা বুঝল—মঙ্গলে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পৃথিবীতে তখন যা অবস্থা, তাতে এখান থেকে তরলিত-হাইড্রোজেন নিয়ে ওরা মঙ্গলে ফিরতে পারবে না। না হলে বাপ-মায়ের অসংযমের অভিশাপ নিয়ে সন্তান যেভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, মারা যায়—পৃথিবীর অপরাধে সেই ভাবে মরতে হবে মাঙ্গলিকদের। সেই অনিবার্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে ওরা প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করল। ক্রুক্স একবার মরিয়া হয়ে বলেছিল—সে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়। এড্ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, লুক হিয়ার ক্রুক্স! ধর তুমি সফলকাম হলে। এক পে-লোড হাইড্রোজেন নিয়ে মঙ্গলে পৌঁছালে। সেখানে গিয়ে কী দেখবে? হয়তো অধিকাংশ লোকই তার আগে মারা গিয়েছে। না হলে, ঐ এক জাহাজ হাইড্রোজেন দিয়ে তুমি কতটা জল তৈরি করতে পারবে? কাকে বাঁচাবে? শুধু তোমার পরিবারবর্গ লোকদের? পারবে?

অগত্যা ওরা এখানেই থেকে গেল। গডফাদারের সেই ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে। গডফাদার কোনোকিছু গোপন করলেন না। বললেন, আমার বয়স হয়েছে, হয়তো দু-দশ বছর বাঁচব আমি। তার আগে আমার সৃষ্ট এই দুনিয়ার অধিকার আমি তোমাদের দিতে চাই। এড্-ডরোথি! তোমরা আমার সৃষ্ট এই দুনিয়ায় হবে রাজা-রানি। ক্রুক্স্ হবে তার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর! তোমরা যদি রাজি থাক তাহলে সব রোবটদের ডেকে আমি এই নতুন শাসন ব্যবস্থার কথা সকলকে জানাতে পারি।

এড্ বলে, আমরা সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে জানতে চাই, আপনার প্রতিষ্ঠানের পুরো ইতিহাস। রোবটিক্স-শাস্ত্র বিষয়ে আমি বস্তুত কিছুই জানি না।

* * *

গডফাদার আর সঙ্কোচ করেননি। তাঁর দিনপঞ্জিকা ওদের পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি ক্লান্ত, তিনি অবসন্ন। এবার অবসর নিতে চান। কী জানি কেন, ঐ যন্ত্রগুলোর ওপর মায়া পড়ে গিয়েছে। ওরা তাঁর সন্তান। সন্তানস্নেহেই ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে চান তিনি। ঘটনাচক্রে তিনটি উপযুক্ত মানব-সন্তান এসে উপস্থিত হওয়ায় নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন এতদিনে।

হয়তো গডফাদারের স্বপ্ন সার্থক হত—হল না একটি মানুষের জন্য। সব শুভেচ্ছাই যেমন প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল। গডফাদারের ইডেন উদ্যানে এড্ আর ডরোথি যথাক্রমে আদম আর ঈভের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থার ক্রুক্স্ নেমে পড়ল শয়তানের ভূমিকায়।

লোকটার গাত্রবর্ণই শুধু নয়, অন্তরটাও নিকষ কালো। যেমন লোভী, তেমনি স্বার্থপর। দুর্যোধন যদি পঞ্চপাণ্ডবের জন্য সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত হন, তাহলে এমন সুযোগ পেলে আর্থার কেমন করে এডকে ছেড়ে দেয় সসাগরা ধরণীর অধিকার? আর্থার হয়তো ভেবেছিল—গডফাদার তো গলিতনখদন্ত বৃদ্ধ সিংহ—কোনোক্রমে সে যদি এডকে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে সে নিজেই হয়ে পড়বে এই রোবট সাম্রাজ্যের গডফাদার। সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর। পৃথিবীর প্রতি অবশ্য লোভ নেই, পৃথিবী নিষ্ফলা—কিন্তু মঙ্গলবাসিনী ঐ অপরূপা রূপবতীর প্রতি তার অন্তরে কামনা-বাসনার বীজ অতি সঙ্গোপনে মহীরুহ হয়ে উঠতে চাইছে। তাই কালো মানুষটার কামনায় কালিমার মসীলিপ্ত হয়ে গেল গডফাদারের স্বপ্ন।

বোধকরি অন্যায় করলাম। এ দুর্দৈবের জন্য একা ঐ কালো মানুষটাই দায়ী নয়। অনার্য লোকটার

স্কন্ধে যাবতীয় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার এ প্রচেষ্টা আমার তরফেও বোধ করি আর্ষপ্রয়োগ। দোষ একা আর্থারের নয়—গডফাদারের বিকৃত মানসিকতা, এডওয়ার্ড-এর সংকীর্ণতা এবং ডরোথির কৌতুকরহস্য-প্রিয়তাও . আংশিকভাবে দায়ী—দায়ী হয়তো আরও একজন, যাঁকে বোঝাতে হলে—আইনস্টোনের ভাষায় একটা ক্যাপিটাল G-র প্রয়োজন।

গডফাদারের প্রস্তাবটা শুনে আর্থার রাতারাতি শয়তানের ভূমিকায় নেমে পড়েনি। প্রথম দিন-সাতেক সে একটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছিল—তখন তার ভূমিকা ছিল ডেনমার্কের রাজকুমারের। ক্রমাবনতির পরের পর্যায়ে সে প্রথম অংকের ম্যাকবেথ। তার কানে কানে কারা যেন ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিয়ে চলে, 'কিং দ্যাট শ্যাল বি হিয়ারআফটার!' (রাজা হবি! তুই রাজা হবি!)

খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির অভাব নেই ভূগর্ভস্থ গেস্টরুমে। আসবাবপত্র ঝকঝক তকতক করছে। এপসাইলন্ শ্রেণীর machine speculatrix-এর দল প্রত্যহ ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারে ঘরদোর সাফ করে দিয়ে যায়। বীটা শ্রেণীর সুন্দরীর দল জানলার পরদার রঙ নির্বাচন করে, ফুলদানিতে কৃত্রিম পুষ্পস্তবক সাজিয়ে রাখে। কিন্তু তবু একটা জৈবিক বৃত্তির তাড়নায় ছটফট করতে থাকে ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটা। ওর মনে হল সেই ছটফটানিতে সজ্ঞানে ইন্ধন যোগাতো ঐ মিস্ মার্স! আর্থার তার নাড়ি-নক্ষত্র জানে। প্রাকবিবাহ জীবনে ডরোথি মঙ্গলগ্রহে ছিল খাতাকলমে ক্যাবারে গার্ল এবং অভিজ্ঞ মহলে কল-গার্ল। খদ্দেরের মাথা ঘুরানোটাই ছিল তার জীবিকা এবং জীবন। আজ না হয় সে গভর্নর-পুত্রের ঘরনি হয়ে সতী-সাধ্বী হয়েছে—কিন্তু তার অতীত ইতিহাস অজানা নেই আর্থারের। তার চেয়েও মজা—ডরোথি হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে যারা জীবিকার জন্যে পুরুষের মাথা ঘোরায় না, আঘাত করে আমোদ পায় বলেই পুরুষদের নাচায়। সেটাই ওদের বিলাস। একজাতের মৎস্যশিকারী আছে যারা মাছ-মাংস খায় না—তবু হুইল নিয়ে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে। ঘন্টার পর ঘন্টা নিরলস অধ্যবসায়ে অপেক্ষা করে—তারপর ছিপে মাছ গাঁথলেই খুশিয়াল হয়ে ওঠে। খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটাকে ডাঙায় তোলাতেই তাদের অহৈতুকী উল্লাস। ডরোথি হচ্ছে সেই জাতের নিরামিষাশী। বঁড়শি- গাঁথা মাছটা ঘাই মেরে উঠছে দেখলেই তার উল্লাস। তাই আর্থারের ছটফটানিতে সে আমোদ পেত। নানান বেশে, নানান ভঙ্গিমায়, নানা পরিবেশে তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলত। ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে ছিল একটি কাকচক্ষু সুইমিং পুল। এড্ দক্ষ সাঁতারু নয়, তাই ডরোথি ঐ নিগ্রো যুবকটিকে প্রতিদিনই আহ্বান জানাতো যৌথ স্নানের আসরে। ফ্লাডলাইটের কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোয় বিকিনি-স্যুট পরা ঐ মিস্ মার্সকে দেখে কালো মানুষটার হৃদ্‌পিণ্ডে লাল-রক্ত টগবগিয়ে ফুটত। জলকেলিরতা মিস্ মার্স যখন অসতর্ক ভাবে ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তখন আর্থারের মনে হত ও মঙ্গলবাসিনী মঙ্গলময়ী নয়; ও মূর্তিমতী কামনার বহ্নিশিখা, যার দহনে পুড়ে মরবার জন্যই আর্থারের জন্ম।

ডরোথি লাস্যময়ীর ভঙ্গিমায় বলত, আর্থার, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছ! তোমার জন্য দুঃখ হয়—সারা পৃথিবীতে একটাও কালো নিগ্রো মেয়ে নেই যে তোমাকে শান্ত করতে পারে।

আর্থারের চোখ দিয়ে তখন আগুন ছুটত। জবাবে বলত, কালো মেয়ে হতেই হবে তার কী মানে?

: ওমা, তাই নাকি? তাহলে তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বল, কাকে মনে ধরে—আমি গডফাদারকে বলে পৃথিবীর যে-কোনো যুগের মিস্ আর্থকে আনিয়ে নিতে পারি : হেলেন, নূরজাঁহা, গ্রেটা গার্বো, মেরেলিন মন্‌রো—

আর্থার খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে বলত, ওসব পুতুল দিয়ে হবে না। আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নয়, মিস্ মার্স!

: হাত ছাড়, লাগছে। এড্ জানতে পারলে তোমাকে খুন করে ফেলবে।

: এড্ জানতে পারবে না।

বিচিত্র হেসে ডরোথি বলত, বটে। —হাতটা ছাড়িয়ে নিত।

আর্থার কাতর ভাবে বলত, এক রাত্রে এস না আমার কাছে?

: দেখা যাক!

সুতরাং দোষ ডরোথিও ছিল। বহুবার সে ঐ কালো মানুষটিকে বলেছে, এড্ তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। এমন ইঙ্গিত দিয়েছে—যেন এড্ ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপিচুপি ওর ঘরে অভিসারে আসবে। সারারাত জেগে প্রতীক্ষা করেছে আর্থার ক্রুক্‌স্। ডরোথি আসেনি। পরদিন সে প্রসঙ্গ জনান্তিকে তুলতেই খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠেছে ডরোথি; বলেছে, ওমা তাই নাকি? সারারাত জেগে ছিলে? আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক আছে—কাল আসব!

সে কাল আর আসেনি। কাল এসেছে, ডরোথি আসেনি।

তাই যখন এড্ এসে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে বসল, তখন ও মন খুলে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এড্ জানতে চেয়েছিল গডফাদারের প্রস্তাবটা আর্থার কী নজরে দেখছে। ওরা দুজন যদি এ রাজ্যের রাজা-রানি হয় তাহলে আর্থার মন্ত্রীত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি কিনা। আর্থার বলেছিল, একটি শর্তে। ডরোথি এ রাজ্যের রানি হোক—কিন্তু রাজা হবে দুজন। সাদা আর কালো। আমি তোমার অধীনে থাকব না, হব তোমার সহযোগী, সমান অধিকারে।

এড্ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসনে আমার আপত্তি আছে। সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব রোবটগুলোকে ভাগ করে অর্ধেক তুমি নাও, অর্ধেকের দায়িত্ব আমি নেব। তুমি তোমার মতো রাজ্য চালাও, আমি আমার মতো।

আর্থার বলে, বুঝলাম। কিন্তু আমার রানি?

: রানি! মানে?

: একটু কমনসেন্স ব্যবহার কর এডওয়ার্ড। আমি পুরুষমানুষ, শুধুমাত্র খাদ্য-পানীয় আর রাজত্ব পেলেই আমার সবকিছু পাওয়া হয় না। আমার সংসার চাই, সন্তান চাই, স্ত্রী চাই, শয্যাসঙ্গিনী চাই।

এডওয়ার্ড বলে, তোমার স্ত্রী আমি কোথায় পাব? যা অসম্ভব তা দাবি করো না আর্থার! গডফাদারের স্ত্রী ছিল না—সন্তান ছিল, সংসারও ছিল।

: না, ছিল না। সন্তান তার নয়, বিজ্ঞানের। আর গডফাদারের স্ত্রী কেন ছিল না তা তুমিও জান, আমিও জানি। দিনপঞ্জিকায় ইম্পোটেন্টটা নিজেই স্বীকার করেছে স্ত্রী-সম্ভোগের ক্ষমতা তার নেই। আমি সুস্থ-সবল মানুষ!

: আমি অস্বীকার করছি না আর্থার; কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

: সহজ সরল সমাধান। ডরোথি আমাদের যৌথ-স্ত্রী হবে।

: কী বলছ পাগলের মতো? যৌথ-স্ত্রী!

: কেন? গ্রুপ ম্যারেজ, প্লুরাল-ম্যারেজ—এ শব্দগুলো তুমি শোননি? ক্ষেত্রবিশেষে দুটি মেয়ের এক স্বামী, দুটি ছেলের এক স্ত্রী, এতো হতেই পারে। পৃথিবীতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তা চালু হয়েছিল, মঙ্গলেও আছে, চাঁদেও।

: সে হয় না। তাছাড়া সন্তান হলে সে কার হবে?

: ডরোথির।

: মাতৃতান্ত্রিক সমাজ?

: পিতৃতান্ত্রিকও হতে পারে—তোমার আমার দেহাবয়বে এত পার্থক্য যে, সহজেই সেটা বোঝা যাবে। একেবারে সাদা চামড়া হলে তোমার, কালো বা মুলাট্টি হলে আমার!

এড্ ঘরময় পায়চারি করে এসে বলে, অসম্ভব! আমি রাজি নই। তাছাড়া ডরোথি রোবট নয়। তারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে।

আর্থার বলে, বেশ। তাহলে শেষ সিদ্ধান্তটা তাকেই নিতে দাও। কথা দাও, সে যা বলবে তা তুমি-আমি দুজনেই নির্বিচারে মেনে নেব।

এডওয়ার্ড একটু ভেবে নিয়ে রাজি হল। ডেকে পাঠালো ডরোথিকে। ওরা দুজনের কেউই জানত না, ঘরের বাইরে ডরোথি কলিন্স এতক্ষণ উৎকর্ণা হয়ে সমস্ত আলাপটাই শুনেছে। ঘরে এসে বলে, কী ব্যাপার?

এডওয়ার্ড সমস্ত পরিকল্পনাটা তাকে বুঝিয়ে দেয়। আর্থারের প্রস্তাবটা। জানতে চায় ডরোথির কী বক্তব্য।

ডরোথি দুজনকে দেখে নেয় একবার। বলে, খোলা কথা বলব?

দুজনেই উৎসুক হয়ে বলে, বলো?

: তোমাকেই আগে বলি এড্। তুমি আর্থারের সামনে বলতে অনুমতি দিয়েছ বলেই খোলাখুলি সব কথা বলছি। একথা তুমি নিশ্চয় মানবে যে, তুমি আমাকে তৃপ্ত করতে পারছ না! আমার চাহিদা মিটিয়ে দিতে প্রতি রাত্রে তুমি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছ—ছট্‌ফট করছ!

এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়ায়। বলে, স্টপ ইট, য়ূ-বীচ!

ডরোথি হেসে বলে, বেশ। থামলাম। আমি নিজে থেকে বলতে চাইনি। তাছাড়া যৌন-সমস্যা জিনিসটা খোলাখুলি আলোচনা করা যাবে না এমন 'টাবু' এই একবিংশ শতাব্দীতে নেই। যাই হোক—আলোচনার কি এখানেই শেষ?

আর্থার বলে, না। মাঝপথে তা শেষ হতে পারে না। তোমাকে আমরা 'সোল-আর্বিট্রেটার' নিযুক্ত করেছি—চরম বিচারক। তুমি রায় দাও!

ডরোথি আড়চোখে এডকে দেখে নিয়ে আর্থারকে বলল, তোমার প্রতিবাদী 'ডগ' যে তার 'বীচ'-কে 'স্টপ ইট্' শুনিয়ে দিল!

এডওয়ার্ড অসীম মনোবলে আত্মসম্বরণ করল। উঠে গিয়ে কাবার্ড থেকে একপাত্র নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে বললে, না। একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত আজই হয়ে যাক। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেব।

আর্থার বলে, তুমি আবার কী সিদ্ধান্ত নেবে? শেষ সিদ্ধান্ত তো নেবে ডরোথি!

এডওয়ার্ড বললে, ওয়েল আর্থার, বাজি যা ধরেছি তা প্রত্যাহার করছি না আমি। কিন্তু তারপরেও কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমার নিশ্চয় থাকবে। আমি আত্মহত্যা করতে পারি, ডিভোর্স করতে পারি, এবং হ্যাঁ, হয়তো খুনও করতে পারি।

: খুন! কাকে? উঠে দাঁড়ায় আর্থার।

ডরোথি ওদের বিবাদটা থামিয়ে দিয়ে বলে, ও একটা কথার কথা। পৃথিবীতে টিকে আছে মাত্র চারটি মানুষ। তার ভেতর কারো পক্ষে হত্যা অথবা আত্মহত্যা করার অধিকার নেই। তোমরা জন্তু নও! মানুষ! মানুষের মতো ব্যবহার কর। সমগ্র মানবসভ্যতার মুখ চেয়ে আমরা চারজন একটা বিরাট সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি। আমি তো মনে করি, এখন আমাদের তিনজনের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস দেখানোর অধিকার নেই।

এডওয়ার্ড গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, তুমি বল। আমি আর বাধা দেব না। কাম, আউট উইথ্ য়োর ভার্ডিক্ট!

ডরোথি বললে, সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে কতকগুলি বিষয় ঠিকমত জেনে নিতে হবে। আমি দুজনকেই কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই।

ওরা বললে, বেশ, কর।

: প্রথমত এড, তুমি কি স্বীকার করবে—আমার পুরো চাহিদা তুমি মিটিয়ে দিতে পারনি, আমাদের বিবাহিত জীবনের গত পাঁচ বছরে?

এডওয়ার্ড উদ্ধতভাবে বললে, বেশ, স্বীকার করছি, সো হোয়াট?

: তুমি এ কথাও স্বীকার করবে যে, তুমি জানতে প্রাক্‌বিবাহ জীবনে আমার যৌনজীবন খুবই কর্মব্যস্ত ছিল? এক রাত্রে একাধিক পুরুষের বিছানায় আমি শুয়েছি—এবং শুতে চেয়েছি?

দাঁতে দাঁত চেপে এড্ বলল, হ্যাঁ, জানতাম।

: সব জেনেশুনেও বিবাহের পর তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে যেন আমি ভিক্টোরিয়-যুগের কুলবধূ! আমাকে অতৃপ্ত রাখছ জেনেও তুমি বরাবর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে যাতে আমি আর কারো বিছানায় শুতে না যাই! অস্বীকার করতে পার?

এডওয়ার্ড ক্ষেপে ওঠে, আমি নিজেও বিবাহোত্তর জীবনে একনিষ্ঠ থেকেছি!

: কিন্তু কেন এড্? তোমার উদর সব সময় পূর্ণ থাকত তাই চুরি করে খাবার খেতে না—এতে বাহাদুরিটা কোথায়?

এডওয়ার্ড জবাব দিল না। এবার ডরোথি ঘুরে বসে। আর্থারের মুখোমুখি। বলে, এবার তোমার পালা!

: ইয়েস ডরোথি, আমি প্রস্তুত।

: তুমি জান, আজ যদি আমরা মঙ্গলগ্রহে থাকতাম, তাহলে তোমার-আমার মাঝখানে থাকত দুস্তর ব্যবধান। তুমি বেতনভুক ভৃত্য আর আমি গভর্নর-সাহেবের পুত্রবধূ। আমার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বনের সৌভাগ্যলাভ করলেই আনন্দে রাত্রে তোমার ঘুম হত না। তাই নয়?

আর্থার হেসে বললে, আমরা বর্তমানে পৃথিবীতে আছি ডর্, মঙ্গলে নয়।

: এবং সেই পৃথিবীতে যেখানে একশ বছর আগেও কোনো নিগ্রোর বাচ্চা কোনো সাদা চামড়ার মেয়েকে জোর করে চুমু খেলে তার নাক ভেঙে দেওয়া হত।

আর্থারের হাসিটা ফিকে হয়ে যায়। তবু সে একই স্বরে বলে, আমরা একবিংশতি শতাব্দীতে আছি ডর্, বিংশ শতাব্দীতে নয়!

: আমাকে মিসেস্ কলিন্স বলে সম্বোধন করবে মিস্টার ব্ল্যাক ডগ! ডর্ বলে ডাকবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?

হাসিটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গিয়েছে। আর্থার গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি।

: হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু কেন দিয়েছিলাম জান? এই নির্বান্ধব পুরীতে স্ত্রীসঙ্গ কামনায় তুমি উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছিলে বলে। এখানে আর কোনো 'ব্ল্যাক গার্ল' তোমার নাগালের মধ্যে নেই বলে। কিন্তু তুমি তার মর্ম বুঝলে না। তোমার স্পর্ধা হয়ে উঠল আকাশচুম্বী। তাই সোজা কথাটা সরল ভাষায় তোমাকে জানিয়ে দেবার সময় হয়েছে। মূর্খ এড যদি আত্মহত্যা করার বদলে হত্যা করার সিদ্ধান্তই নেয়, তাহলে তাকে অনুরোধ করব, তার রিভলভারের লক্ষ্যমুখ আমার বুকের দিকে ফেরাতে। কারণ তোমার মতো নিগারের বিছানায় শোওয়ার চেয়ে সেটা আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।

এডওয়ার্ড ঠক্ করে নামিয়ে রাখে পানপাত্রটা। এগিয়ে এসে তুলে নেয় অনিন্দ্যকান্তি মেয়েটির একটি হাত। বলে, আয়াম সরি ডর, লেট্স মুভ অন!

ওরা দুজন হাত ধরাধরি করে চলে যায়। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে আর্থার ক্রুক্স। ছলনাময়ী নারীর ক্ষুরধার জিহ্বার কষাঘাতে তার অন্তরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

ঠিক তার পরদিন রাত্রে।

গভীর রাত্রে একটা চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে গডফাদারের ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা আসছে তাঁর পাশের ঘর থেকে। ওঘরে থাকে আর্থার ক্রুক্স্। একা। গডফাদার বৃদ্ধ। তবু অতিথির ঘর থেকে এই মধ্যরাত্রে অমন একটা অস্বাভাবিক শব্দ আসায় তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। পাশের ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। ভিতরে ঝুটোপুটির শব্দটা তখনও হচ্ছে। একটি পুরুষ-কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ। এডওয়ার্ড সেদিনই সকালে সব কথা খুলে বলেছিল গডফাদারকে। গোপন করাটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেনি। তাই গডফাদারের সন্দেহ হল, ক্রুক্স্-এর ঘরে ঐ ধর্ষিতা মেয়েটি নিশ্চয় ডরোথি। তিনি রুদ্ধদ্বারে মুহুর্মুহু করাঘাত করতে থাকেন। ঘরের ভিতর থেকে আর্থার সাড়া দেয় : কে? কী চাই?

: দরজা খোল। আমি গডফাদার।

: এতরাত্রে কী দরকার?

: তোমার ঘরে আর কে আছে? দরজা খোল!

: আপনি শুতে যান।

চিৎকার করে ওঠেন গডফাদার, দরজা খোল বলছি! আমি দরজা ভেঙে ফেলব না হলে! কে ঐ মেয়েটি?

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। খোলা পাল্লা দুটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণকায় দৈত্যটা। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, নিম্নাঙ্গে একটা তোয়ালে জড়ানো। গডফাদার ওকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন—মেঝেতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে একটি শ্বেতাঙ্গিনী—সম্পূর্ণ নিরাবরণা। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। গডফাদার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, এসব কী হচ্ছে? য়ু ব্ল্যাকি নিগার! কে ঐ মেয়েটা?

দাঁতে দাঁত চেপে আর্থার বললে, লুক হিয়ার গডফাদার! এসব কী হচ্ছে, তা বোঝবার মতো ক্ষমতা ভগবান তোমাকে দেননি। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না।

গডফাদার ভূলুণ্ঠিতা জ্ঞানহীনা মেয়েটিকে দেখে বুঝতে পারেন—সে ডরোথি নয়, বীটা শ্রেণীর কোনো রোবটও নয়; জড়বুদ্ধিসম্পন্না কোন হতভাগিনী। আমেরিকান মেয়ে, বোধশক্তি হারালেও যে যৌবনকে হারায়নি! নিগারটা এতক্ষণ তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করছিল। ভয়ে হোক, যন্ত্রণায় হোক, মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। গডফাদার আত্মসম্বরণ করতে পারেননি। কিন্তু আঘাতের চেয়ে প্রত্যাঘাতটাই বড় হল। আর্থার চড়টা খেয়ে বসে পড়েনি; কিন্তু গডফাদার ঘুঁষিটা খেয়ে ঘুরে পড়লেন।

টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে আসছিলেন গডফাদার। রক্তে তখন তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে। করিডরেই দেখা হয়ে গেল এডওয়ার্ড এবং ডরোথির সঙ্গে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে তাদেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। খোঁজ নিতে আসছিল এদিকেই। রক্তাপ্লুত বৃদ্ধকে দেখে এড্ বললে, এ কী! কে এমন করে মারল?

: দ্যাট ব্ল্যাকি নিগার! ওর ঘরে.....একটা মেয়ে, একটা অসহায় মেয়ে....

কথা বলতে পারছিলেন না বৃদ্ধ। জিবটা বিশ্রীভাবে কেটে গিয়েছে।

এডওয়ার্ডের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল আর্থারের ঘরের দিকে। এবারও দরজা বন্ধ। গডফাদারকে বিদায় করে আবার দরজা বন্ধ করেছে লোকটা। এডওয়ার্ড মুহুর্মুহু দরজায় করাঘাত করতে থাকে।

একই ভঙ্গিতে দরজা খুলে দিল আর্থার। তার চোখে তখন আগুন জ্বলছে। এখনও তার মাজায় জড়ানো একটা তোয়ালে—ঊর্ধ্বাঙ্গ কালো কষ্টিপাথরে কোঁদা একটা পেশিবহুল টরসো। উত্তেজনার আধিক্যে এডওয়ার্ড একটি ছোট্ট জিনিস লক্ষ করতে ভুলেছে। নগ্নকায় দৈত্যটার দক্ষিণ করমুষ্টিতে ধরা ছিল একটা রিভলভার।

দ্বার খুলে আর্থার দেখতে পেল, আলোকিত করিডোরে পর পর তিনজন শ্বেতাঙ্গ—রক্তাপ্লুত গডফাদার, তাঁর পাশে আস্বচ্ছ নাইটি পরিহিতা একবস্ত্রা একটি বহ্নিশিখা এবং দলের পুরোভাগে গভর্নর-তনয় স্বয়ং।

: কী চাই? উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করে আর্থার।

এডওয়ার্ড বললে, বলছি। আগে ঐ উলঙ্গ মেয়েটাকে ঘর থেকে বার করে দাও।

আর্থার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললে, মেয়েটা মরে গিয়েছে। কী বলছ বল?

এরপর আর এডওয়ার্ড দ্বিধা করেনি। প্রচণ্ড একটি আন্ডারকাটে নিগ্রোটার চোয়াল একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। এডওয়ার্ড ভাল বক্সার। তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। দৈহিক ক্ষমতায় আর্থার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এবার আর স্থির থাকতে পারেনি আর্থার ক্রুক্স্। উল্টে পড়ে যায় সে। এডওয়ার্ড তৎক্ষণাৎ বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। আর ওঠে না। কারণ নিগ্রোটার নাগাল পাওয়ার আগেই ওর রিভলভারের বুলেট বিদীর্ণ করেছিল কলিন্সের হৃদপিণ্ড!

তারপরের ইতিহাসটা করুণ।

টলতে টলতে গডফাদার রক্তাপ্লুত দেহে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। একা ডরোথিকে ওর ঘরে রেখে।

আরও দিনসাতেক বেঁচেছিলেন তিনি। মারা গেলেন রোবটদের সাহায্যে ডরোথিদের উদ্ধার করতে

গিয়ে। আর্থার জানত—গডফাদারের দিনপঞ্জিকা সে আদ্যন্ত পড়েছে; তাই সে নিঃসন্দেহ ছিল—লেকজান্ডা, ব্যাটলার প্রভৃতি বিশ্বত্রাসের ছায়ামূর্তিরা তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে আর্থার ক্রুক্সের গাত্রে কোনও ব্যথা হয়নি। ডরোথিকে উদ্ধার করা গেল না। ক্ষোভে দুঃখে অনুশোচনায় গডফাদার ভগ্নহৃদয়ে মারা যান।

* * *

দীর্ঘ কাহিনি শেষ করে প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, সব কথাই শুনেছেন। সেই আর্থার ক্রুক্স্ লোকটা আজও আছে ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ দখল করে। ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে খাদ্য ও মদ্য যথেষ্ট আছে। সচরাচর সে মত্তাবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে আসে, খুঁজতে। তন্নতন্ন করে তল্লাসি সেরে আবার ফিরে যায় তার দুর্গে।

বব্ বলে, খুঁজতে মানে? কী খুঁজতে?

: গডফাদার আর ডরোথিকে।

: সে কী! এই যে বললেন—গডফাদার মারা গিয়েছেন এবং ডরোথিকে ও করায়ত্ত করেছিল!

: দুটোই ঠিক। তবে প্রথম কথা—নিগ্রোটা বিশ্বাস করে না, গডফাদার মারা গিয়েছেন। তার ধারণা, আমরা তাঁকে লুকিয়ে রেখেছি। আর দ্বিতীয় কথা, ডরোথিও এখন ওর কাছে নেই। সে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর কবল থেকে একরাত্রে উন্মাদিনী পালিয়ে আসে। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

ওয়াম্বাসী বলে, দাঁড়ান। ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিতে দিন। প্রথম কথা, গডফাদার যে মারা গিয়েছেন তার প্রমাণ কী? কোথায়, কীভাবে তিনি মারা যান? কে কে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখেছে?

প্রফেসর বলেন, শেষদিকে তিনি সমস্ত জগতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যান; কাউকে বরদাস্ত করতেন না। আমাদের কাউকে নয়। মৃত্যুসময়ে মাত্র দুজন ছিলেন ওঁর শয্যাপার্শ্বে। ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি রুডলফ্ ব্যাটলার।

: ব্যক্তিগত চিকিৎসকটি কে?

: তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়নি। তিনি একজন প্রতিভাধর গামা জীবনবিজ্ঞানী—ডক্টর সিংহমুন্ড ব্রয়েড। বিখ্যাত রোবোসাইকলজিস্ট (robopsychologist)—প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং অত্যন্ত ভালো লোক।

: বুঝলাম। তাঁকে চিনতে পেরেছি।

প্রফেসার অবাক হয়ে বলেন, সে কী! তাঁর সঙ্গে তো আপনাদের আলাপই হয়নি! তিনি আমাদের ডর্মিটরিতে থাকেন না। অন্যত্র গবেষণারত।

ওয়াম্বাসী বললে, না। গামা পণ্ডিত রোবোসাইকলজিস্ট সিংহমুণ্ড ব্রয়েডকে চিনি না, তবে তিনি যাঁর ছায়ামূর্তি সেই বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানীটিকে চিনি।

বব্ বললে, আর ডরোথি! সে যে বিকৃতমস্তিষ্কা হয়েছিল, পালিয়ে এসেছিল, তার কী প্রমাণ?

: তার অবশ্য অকাট্য প্রমাণ আছে, সাক্ষীও আছে। বস্তুত আমি নিজেও তার সাক্ষী। ভূগর্ভস্থ দুর্গ থেকে সে যখন প্রথম পালিয়ে আসে, তখনও সে একেবারে উন্মাদিনী হয়ে যায়নি। গেলে, ওভাবে আর্থারের নজর এড়িয়ে সে পালিয়ে আসতে পারত না। প্রথমে সে দেখা করে আমাদের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে। আশ্রয় ভিক্ষা করে। সর্বাধিনায়ক আমার ওপর খুব আস্থা রাখেন। কোনো জটিলতা দেখা দিলেই আমাকে ডেকে পাঠান—এবার যেমন আপনাদের সব কিছু বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বটা এত গামা-পণ্ডিত থাকতে আমাকেই দিয়েছেন। সে যাই হোক, আমি সর্বাধিনায়ককে পরামর্শ দিলাম—মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে ফেলতে এবং ডক্টর সিংহমুণ্ড ব্রয়েডের চিকিৎসাধীন রাখতে। মনের অসুখের পক্ষে—ও! সে তো আপনারা জানেনই। মানে উনি যাঁর ছায়ামূর্তিতে গড়া.....

বব্ বাধা দিয়ে বললে, তারপর কী হল বলুন?

: সম্রাট সেরাত্রেই তাকে পাঠিয়ে দিলেন ডক্টর ব্রয়েডের মানসিক চিকিৎসালয়ে। ডক্টর ব্রয়েড তাকে পরীক্ষা করে বললেন, বেচারি এমন গুরুতরভাবে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে যে, সে আর

স্বাভাবিক হবে না। তবু তাকে লুকিয়ে রেখে চিকিৎসা শুরু হল। পরদিনই আর্থার এল তার খোঁজে। সন্ধান পেল না। তারপরেই ডরোথি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায় এবং ডক্টর ব্রয়েডের উন্মাদাগার থেকে পালিয়ে যায়। হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু আমার চেষ্টা করিনি। কারণ তার সাথে আর পাঁচটা প্রায়-জন্তু আমেরিকানের এখন আর কোনো প্রভেদ নেই।

প্রফেসর আইনস্টোন থামলেন। নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শেষে তিনিই আবার বলেন, এখন বলুন, আপনারা কি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত?

ওয়াম্বাসীকে প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ না দিয়ে বব্ রয় বলে ওঠে, আলবত! আজই। এখনই।

ওয়াম্বাসী বললে, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে আমার আরও কতগুলি প্রশ্ন আছে।

: বলুন?

: আপনি বলেছেন, গডফাদারের ভূগর্ভস্থ দুর্গটা হচ্ছে মাটির নীচে—এক মাইল গভীরে। সেখানে যাবার এবং উঠে আসার একটি মাত্র লিফ্‌ট। সেক্ষেত্রে আপনারা তো সহজেই তাকে শেষ করতে পারেন, ঐ লিফ্‌টটা ভেঙে দিয়ে, অকেজো করে দিয়ে। তাহলেও সে অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে—কিন্তু আপনাদের তাতে ক্ষতি নেই। কারণ সে কোনোদিনই ওপরে উঠে আসতে পারবে না।

আইনস্টোন হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। বলেন, আপনারা খেয়াল করে দেখেননি। 'রোবোটিক্স'-বিজ্ঞানের প্রথম তিনটি সূত্রই আমাদের সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিংশ শতকের চারের দশকেই Cybernetics-বিজ্ঞান অর্থাৎ রোবট-বিজ্ঞান যে তিনটি প্রাথমিক সূত্র বেঁধে দিয়েছিল তা এই :

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.

3. A robot must protect its own existence, except where such protection would conflict with the First or Second Law.

অর্থাৎ :

(1) রোবো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না—এমন কোনো কাজ করবে না বা করা থেকে নিরত থাকবে না, যাতে মানুষের ক্ষতি হয়!

(2) মানুষের দেওয়া আদেশ রোবো মানতে বাধ্য থাকবে—যদি না সে আদেশ প্রথম সূত্রের পরিপন্থী হয়।

(3) রোবো সর্বদা নিজেকে রক্ষা করবে, যদি না সে প্রচেষ্টা প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী হয়।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থারের পাপের শাস্তি দিতে আমরা অক্ষম। আপনারা দুজন রোবো নন, মানুষ—আপনারা তা পারেন। আপনারা অনায়াসে ঐ লিফটের যন্ত্রটা বিকল করে দিতে পারেন, আমরা পারি না।

বব্ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে, না। লোকটা ওখানে বসে বছরের পর বছর দামি মদ খেয়ে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না। আমি নিজেই ওখানে যাব। আমাকে একটা লেসার-বীম অটোমেটিক দিন শুধু। এডওয়ার্ড কলিন্স যেভাবে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরেছিল সেইভাবে ওকে মরতে না দেখলে আমি তৃপ্তি পাব না।

প্রফেসর আইনস্টোন ওয়াম্বাসীকে বলেন, আপনারও কি তাই মত?

ওয়াম্বাসী বলে, সিদ্ধান্তে আসার আগে আমি একবার ডক্টর ব্রয়েডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বব্ উঠে দাঁড়ায়। ওয়াম্বাসীকে বলে, লুক হিয়ার ডক্টর ওয়াম্বাসী! তুমি কী জন্য ইতস্তত করছ তা আমি জানি।

: কী জন্য?—অবাক হয়ে জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: শয়তানটা তোমার স্বজাতীয় বলে। ব্ল্যাকি নিগার বলে।

ওয়াম্বাসী তার আশ্চর্য চোখজোড়া তুলে নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

ছয়

মাপ করবেন, আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আপনি 'স্রেফ গাঁজা' বলে বইটা বন্ধ করে রাখছেন। রাখবেন না। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আজ্ঞে হ্যাঁ—স্বীকার করছি, আমার গল্পের গরু এবার গাছে উঠবার উপক্রম করছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন—তালগাছ নয়, ছোট ছোট চারাগাছ। গল্পের গরু এমন দু-একটা ছোটখাটো গাছে উঠলে তাতে দোষ ধরতে নেই।

অন্তত আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দিন।

এই ছয়-নম্বর পরিচ্ছেদে তাই গল্পটা ধামা-চাপা দিয়ে আমি নিছক বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে চাই। এ পরিচ্ছেদে আমি বিন্দুমাত্র কল্পনার আশ্রয় নেব না—আমার জ্ঞানমতে মানুষ ও রোবোর মূলগত পার্থক্যটা নির্ণয় করব,—যে কল্পনাশ্রয়ী কাহিনি রচনা করছি তার যাথার্থ্যটুকু 1976-সাল-তক্ আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বিচারে যতদূর সম্ভব তা যাচাই করে দেখব।

নিছক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আপনার যদি কোনো এ্যালার্জি থাকে, তাহলে এই পাতা কটা উল্টে যান। 'গপ্পো'টা শুরু হচ্ছে আবার সাত নম্বর পরিচ্ছেদে।

আপনার আপত্তিটা কোথায়? মূল আপত্তি তো এই—যত যাই হোক, রোবো যন্ত্র-মাত্র; তা জীবন্ত নয়। তার ওপর চৈতন্যময় জীবন মানুষের গুণাবলী আরোপ করাটা বেআইনি। কিন্তু আপনি কি জানেন—'রোবোটিক্স' বিজ্ঞান আজ কতদূর উন্নত? জীবন্ত মানুষের সঙ্গে যন্ত্র-মানুষের—Homo-Sapiens-এর সঙ্গে Mechano-Sapiens-এর তফাত আজ কতটুকু? আপনি কি নিশ্চিত—সে প্রভেদটুকু আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞান দূরীভূত করতে পারবে না?

'জীবন' বলতে কী বোঝেন? 'প্রাণ'-এর সংজ্ঞা কী?

আপনি হয়তো উল্টে ধমক দেবেন আমাকে : বা রে! আমি পাঠক, তা আমি কেন বলতে যাব? তুমি লেখক, কলম ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছ—তুমিই বল, আমি বরং বিচার করে রায় দেব—ভুল বলছ, না ঠিক বলছ!

বেশ, তাই সই।

এ-কথা তো মানবেন—সংজ্ঞা দু-জাতের হতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অথবা 'ঔপাদানিক' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। হয় তার কাজকর্ম দেখে, নয় তার উপাদান থেকে। 'বাড়ি'র সংজ্ঞা হিসাবে বলতে পারি—'বাড়ি হচ্ছে যেখানে বাস করি।' এটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা। আবার বলতে পারি—'ইট কাঠ সিমেন্ট বালি দিয়ে বানানো মাথা গোঁজার আশ্রয়কে বলি বাড়ি।'

দুটি সংজ্ঞার কোনোটিই কিন্তু আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়নি, বরং পথে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁবুতে মানুষ বাস করতে পারে, গুহাতেও, মায় ক্ষেত্র-বিশেষে গাছতলাতেও—সেগুলো কিন্তু বাড়ি নয়। আবার দরিদ্র গ্রামবাসীর সাতপুরুষের খড়-মাটির ভিটেখানা ইট-কাঠ-সিমেন্ট-বালির সংস্পর্শ ছাড়াও নিশ্চয় 'বাড়ি'।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্র করলে কি সমাধানের নাগাল পাব? যদি বলি—'বাড়ি হচ্ছে এমন কিছু যা আমরা ইট-কাঠ-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-লোহা-খড়-টিন-এ্যাসবেস্টস সীট দিয়ে বানাই তার ভেতর বাস করার জন্য।' আজ্ঞে না, এখনও 'বাড়ি'র পথ খুঁজে পাইনি। আমড়াতলার মোড়ে বেমক্কা ঘুরে মরছি কারণ এস্কিমোদের 'ইগ্‌লু' বানাতে ঐ লম্বা উপাদানের ফিরিস্তির কোনোটাই প্রয়োজন হয় না; তবু তা নিঃসন্দেহে বাড়ি। বাস করবার উদ্দেশ্যে তাজমহল বানানো হয়নি—সেটা কি তাহলে 'বাড়ি' নয়?

'জীবন' বা 'প্রাণ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করবার সময়েও আমরা এই জাতের ঝামেলায় পড়ব স্কুলপাঠ্য জীববিজ্ঞানের বইতে লেখা হল—'প্রাণী তাকেই বলব, যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, যা খাদ্যগ্রহণ করে, খাদ্যকে জীর্ণ করে, তার সারাংশ গ্রহণ করে শক্তিসঞ্চার করে—যা জীর্ণ খাদ্যাংশের অবশেষ দেহ থেকে ত্যাগ করে, যার বৃদ্ধি আছে এবং যা বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।'

বৈকুণ্ঠের খাতার নামকরণের মতো মনে হচ্ছে : 'এতে আর কোনো কথাটি বাদ যায়নি!'

এ পরিচ্ছেদে ভবিষ্যতে ঐ সুদীর্ঘ সংজ্ঞাটির পুনরুল্লেখ করতে আমি সংক্ষেপে শুধু বলব 'যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি।' তাতে আমার হাতে এবং আপনাদের চোখে যন্ত্রণাটা কিছু কম হবে। তা হোক, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ সংজ্ঞা কি জীবনকে পুরোপুরি বোঝাতে পারল?

কঙ্কালকে আশ্রয় করে জীবদেহ যেমন গড়ে ওঠে, মাঝের সুতোটাকে আশ্রয় করে মিছরির দানাটাও যে দেখছি সে-ভাবে গড়ে উঠছে। চিনির সরবতটা কেন তার খাদ্য হিসারে গণ্য হতে পারে না? সর্বভুক অগ্নি তো কাঠ, কয়লা, কাগজকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে? ভুক্তাবশিষ্ট অঙ্গারকে ত্যাগ করে দিব্যি বেড়ে ওঠে; মায় এ-বাড়ির চাল থেকে ও-বাড়ির চালে ছোটে বাচ্চা পয়দা করতে; তারাও বেড়ে ওঠে; বড় হয় ক্রমশ! সংজ্ঞায় যা যা বলা হয়েছে তার শেষ দুটি শর্ত (বৃদ্ধি ও প্রজনন) ছাড়া আর সব কটিই তো আজ রোবোরা পূরণ করতে সমর্থ! সুতরাং মানতে হবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির ঐ সংজ্ঞায় জীবনকে তর্কাতীতভাবে ব্যাখ্যা করা গেল না।

এবার বরং 'উপাদান'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দেখি। জীবন কী দিয়ে তৈরি? তার মূল উপাদান কী?

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পদে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক কিছু 'কর্ক' নিয়ে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করেছিলেন। দেখলেন, তাতে খুব ছোট ছোট খোপ আছে। তিনি তাদের নাম দিলেন cell বা কোষ। এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। প্রায় দেড়শ বছর পরে, বস্তুত 1830 সালে, দুজন জার্মান জীববিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এলেন—'জীবন্ত প্রাণীর দেহ ঐ জীবকোষের সমষ্টি।'

এতক্ষণে একটা ঔপাদানিক সংজ্ঞা পেলাম—'প্রাণীদেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত।

কিন্তু 'প্রাণী' পেলাম কোথায়? জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলে 'প্রাণীদেহ' হয় বটে, প্রাণী হয় না। একটা কাটা গাছ বা মরা ছাগলের দেহও তো জীবকোষ দ্বারা গঠিত!

তবে কি একটা বিশেষণ যোগ করব?—'প্রাণী জীবন্ত জীবকোষ দ্বারা গঠিত!'

আপনি আমাকে ধমক দেবেন—এটা কেমনতর যুক্তি? 'জীবন'-এর সংজ্ঞা রচনায় 'জীবন্ত' কথার ব্যবহার বেআইনী! তা ঠিক।

আচ্ছা, এবার যদি ঐ দুটো সংজ্ঞাকে—ঐ ব্যবহারিক সংজ্ঞা আর উপাদানের সংজ্ঞা দুটোকে জুড়ে দিয়ে বলি, 'প্রাণী হচ্ছে তাই, যা জীবকোষ দ্বারা গঠিত এবং যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি!'

এবার অনেকটা এগিয়েছি। এখন মিছরির দানা, অমরনাথের শিবলিঙ্গ, উইয়ের ঢিপি, আগুন, রোবো ইত্যাদির ঝামেলা এড়ানো গেছে। এমনকি ভূপতিত গাছ, কাটা পাঁঠা কিংবা মৃতদেহকেও। প্রথমোক্তরা জীবকোষ দ্বারা গঠিত হয়, দ্বিতীয়োক্তরা জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলেও সেই দীর্ঘ শর্তগুলি মানছে না—সেই যে 'যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি!'

এবার একটা কথা বলব? সংজ্ঞাটি নির্ধারিত হওয়ার আগে 'জীবন্ত জীবকোষ' শব্দটা ব্যবহার করায় আপনি আমাকে ধমক দিয়েছিলেন। এখন তো সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে; এখন প্রশ্ন তুলি—গোটা প্রাণীটা নয়, ঐ প্রতিটি জীবকোষ কি জীবন্ত? যদি বলেন, না; তখন বলব, তাহলে কি মৃত জীবকোষ দিয়ে জ্যান্ত প্রাণী পয়দা করা সম্ভব? আপনাকে স্বীকার করতে হবে—না, তা সম্ভব নয়। আবার যদি বেগতিক দেখে বলেন, হ্যাঁ; তখন চেপে ধরব—তাহলে একটা মানুষের দেহে যতগুলি কোষ আছে ততগুলি জীবনও আছে? বেড়ালের নয়টা প্রাণের মতো প্রতিটি মানুষের তাহলে 10^{17} সংখ্যক প্রাণ আছে—যেহেতু তার দেহে কোষের সংখ্যা ঐ অত? আপনাকে রামপ্রসাদী ভাঁজতে হবে : বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা!

আসলে সমস্যাটার চূড়ান্ত সমাধান এখনও হয়নি। আমাদের মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ জীবকোষ দ্বারাই গঠিত, কিন্তু তারা জীবন্ত নয়। অথচ তাদের বৃদ্ধি আছে—যতক্ষণ গোটা জীবটা আছে জীবন্ত। প্রতিটি কোষকে যদি আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব—তারা 'প্রাণে'র কিছু কিছু পরিচয় বহন করছে বটে, কিন্তু সবটা নয়। মাথার চুলের বৃদ্ধি আছে, কিন্তু তা দেহের অপরিহার্য অঙ্গ নয়—গোটা মাথাটা নেড়া করে ফেললেও বেঁচে থাকব; আবার মাথার চুল গজাবে। অপরপক্ষে দেহে

স্নায়ুকোষের বৃদ্ধি নেই—জন্মের সময় ঠিক যতগুলি স্নায়ু-কোষ নিয়ে জন্মেছি তাই আমার পুঁজি, আর বাড়বে না, বরং কমতে পারে—কিন্তু তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে আমি বাঁচব না। সুতরাং বলতে পারি—মানবদেহের বিভিন্ন কোষ তাদের অবস্থান অনুযায়ী, কার্যকারিতা অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু পরিমাণে প্রাণের স্বাক্ষর বহন করে বটে কিন্তু সবটা নয়, তারা 'প্রাণী' নয়। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে একটি বিশেষ 'ছন্দবদ্ধ সংগঠনে' জীব প্রাণবন্ত থাকে। কোনও কোষ ব্যাট করে, কেউ বল করে, কেউ ক্যাচ লোফে—তাদের সামগ্রিক সাফল্যে 'জীব' নামক টিমটা মৃত্যুর বিরুদ্ধে টেস্টে জিততে পারে। তারা ফেল মারলে—এক-আধটা লুজ বল দিলে নয় (চুল কাটা, নখ কাটা) এক-আধটা ক্যাচ ফেললে নয় (ঠ্যাঙ কাটা, কান কাটা)—'ভাইটাল মিস্টেক' করলে জীব নামক টিম হেরে ভূত হয়ে যায়। একেবারে পঞ্চভূত! এ্যাশেস্!

তাহলে কি আধা-প্রাণের স্বাক্ষরবাহী অসংখ্য জীবকোষের সমাহার এই 'ছন্দবদ্ধ সংগঠন'-টাই জীবন?

তাই বা বলি কি করে? এমন 'প্রাণ' আছে, যার একটিমাত্র কোষ। একাই ফুল টিম! যেমন এ্যামিবা, যেমন ডিম্বকোষ। সে একাই ব্যাট করে, একাই বল করে, একাই ক্যাচ লোফে এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করে একাই ড্যাংড্যাং করে বাদ্যি বাজিয়ে জীবনের জয়যাত্রা ঘোষণা করে। তাহলে?

জীববিজ্ঞানীরা বললেন, তাহলে বোধ করি জীবকোষই জীবনের শেষ কথা নয়। আগে কহ আর! অণু ভেঙে যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানে পাওয়া গেল পরমাণু; সেই অবিভাজ্য পরমাণু ভেঙে পাওয়া গেল ইলেকট্রন-প্রোটন—তেমনিভাবে জীবকোষকে ভেঙে দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কি না। প্রাণের উৎসমুখ আরও গভীরে।

এমন একটা যুগ গিয়েছে, যখন বিজ্ঞান বিশ্বাস করত—জৈবপদার্থ রসায়নশাস্ত্রের বাইরে। রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ঐ 'জীবন-রস'—যা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা যায় না—সেটা যুক্ত না হলে জৈবিক পদার্থ তৈরি হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা তখনই জানতেন যে, জৈব-পদার্থের অণুতে আছে অন্তত একটি কার্বন পরমাণু, এবং জৈব অণুর ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় অন্যান্য পরমাণুকে আঁকড়ে থাকা। কার্বন পরমাণু যখন একটি অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে জোড় বাঁধে তখন তৈরি হয় কার্বন-মনোক্সাইড; দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হলে হয় কার্বন ডায়ক্সাইড—এগুলি কার্বন-যুক্ত হলেও জৈবিক অণু নয়। জৈব অণুর ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরমাণু জড়াজড়ি করে থাকে। এই যে বহু পরমাণুর সঙ্গে একাধিক কার্বন পরমাণুর জড়াজড়ি করে থাকার ধর্ম—জৈবিক অণুর গঠন, সে-কালের বিজ্ঞানীরা বলতেন তার মূলে আছে ঐ 'জীবন-রস'! কিন্তু 1828 খ্রীস্টাব্দে বীক্ষণাগারে জৈব পদার্থ 'ইউরিয়া' তৈরি করে বিজ্ঞানী উলার প্রমাণ করলেন জৈব অণু তৈরি করতে 'জীবন-রস' জাতীয় কিছুর প্রয়োজন হয় না। সৃষ্ট হল রসায়নের একটি বিশেষ বিভাগ—Organic Chemistry বা জৈব রসায়ন।

এবার বিজ্ঞানীরা বসলেন জীবকোষকে বিভাজন করতে।

কোষ বা cell কী? মোটামুটি বলতে পারি তার তিনটি অংশ। প্রথমত, একটা বহিরাবরণ বা আচ্ছাদন (membrane) যা কোষকে ঘিরে রাখে; দ্বিতীয়ত, একটা কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস, তৃতীয়ত, ঐ বহিরাবরণ ও নিউক্লিয়াসের মাঝখানে আছে সাইটোপ্লাজম্ (Cytoplasm)।

মোটামুটি বললাম এজন্য যে, ঐ তিনটি শর্ত সব জীবকোষ পূরণ করে না। আমাদের হৃদপিণ্ডে এমন কোষ আছে যার বহিরাবরণ নেই; লোহিত রক্ত কণিকায় এমন কোষ (কোষ ঠিক নয়, সেগুলি করপাসল্স্) আছে যার কেন্দ্রস্থল বা সেল-নিউক্লিয়াস নেই। তা জটিল মানবদেহের এসব ব্যতিক্রম না হয় বাদই থাক আপাতত।

দেখা গেল, জীবকোষ যখন বৃদ্ধির তাগিদে দ্বিধা-বিভক্ত হয় তখন দুটি টুকরোতেই থাকে কিছু পরিমাণে বহিরাবরণ, কিছুটা সেল-নিউক্লিয়াস এবং কিছুটা সাইটোপ্লাজম। ঐ সঙ্গে আরও দেখা গেল, সেই নিউক্লিয়াসে আছে একটা পদার্থ—তার নাম ক্রমোসম্ (Chromosome)—কোষটি দ্বিধাবিভক্ত

হওয়ার সময় ক্রমোসমও দ্বিধাবিভক্ত হয়। ক্রমোসম দু-জাতের—X এবং Y; তারা জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। পুরুষের জীবকোষে থাকে X এবং Y; নারীজাতির জীবকোষে X এবং X। প্রতিটি পুরুষের প্রতিটি জীবকোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রমোসম—এক-এক জোড়ায় একটি X এবং একটি Y; অপরপক্ষে স্ত্রীলোকের প্রতিটি জীব-কোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রমোসম, এক-এক জোড়ায় এক জোড়া করে X ক্রমোসম। শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন-মুহূর্তে যদি মায়ের X ক্রমোসমের সঙ্গে বাপের X ক্রমোসম যুক্ত হয় তবে সন্তানের থাকবে দুটি X, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যারত্ন; অপর পক্ষে মায়ের X ক্রমোসমের সঙ্গে বাপের Y ক্রমোসম যুক্ত হলে পরিণামের XY জন্ম দেবে পুত্রসন্তানের।

তবে কি ক্রমোসমই 'জীবন'-এর শেষ কথা? না! জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, ক্রমোসমের অন্তর্নিহিত আর একটি সূক্ষ্মতর সত্তা। তার নাম জীন (gene)। বস্তুত ক্রমোসম যেমন স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নির্ণয় করে, তেমনি জীন ঐ জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে দেয়। সন্তানের গায়ের রঙ, চোখ কটা হবে না কালো হবে না নীল হবে—সন্তান ভাবুকপ্রকৃতির হবে না উদ্ধত স্বভাবের হবে, তা নির্ভর করে পিতা এবং মাতার 'জীন' সন্তানের জন্ম-মুহূর্তে যে পরিমাণে তার আদিম জীবকোষে এসেছে তার উপর।

জীবকোষকে ভেঙে পেয়েছিলাম সেল-নিউক্লিয়াস, তা ভেঙে পেয়েছি ক্রমোসম, তা ভেঙে এবার পেলাম জীন—কিন্তু তার আকার কত বড়? বা কত ছোট? অণু বা পরমাণুর তুলনায় জীন কতটুকু? এবার সেটা ধারণা করে নেওয়া যাক। ক্রমোসমের মাপ ধরুন 10^{-14} ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ 1/100,000,000,000,000 ঘন সেন্টিমিটার। ঐ অত ক্ষুদ্র ক্রমোসমে জীন আছে কয়েক হাজার; অর্থাৎ জীনের আয়তন 10^{-17} ঘন সেন্টিমিটার। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল, একটা পরমাণুর গড় আয়তন 10^{-23} ঘঃ সেঃ। অর্থাৎ একটি জীনে প্রায় লাখ-দশেক পরমাণু আছে!

বৈজ্ঞানিক গ্যামো বলছেন, "The gene is the smallest unit of living matter. Further, while it is certain that genes possess all of those characteristics that distinguish matter possessing life from matter that does not, there is also hardly any doubt that they are linked on the other side with the complex molecules (like those of proteins) which are subject to all the familiar laws of ordinary chemistry. In other words, it seems that in the gene we have the missing link between organic and inorganic matter, the 'living molecule.'"

অর্থাৎ, "জীনই হচ্ছে সজীব পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান। যদিও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জড় ও জীবনের পার্থক্য-নির্ণয়ের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ঐ জীনেই বিধৃত, তবু একথাও নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করা যায় যে জীন অন্যান্য জটিল অণুর (যেমন প্রোটিন অণু) সঙ্গে সাধারণ রায়ায়নিক বিজ্ঞানের আইনে যুক্ত হয়। ভাষান্তরে, জৈব ও অজৈব পদার্থের, অর্থাৎ জীবন ও জড়ের লুক্কায়িত যোগসূত্রটি আমরা এতক্ষণে পেয়েছি—তা হচ্ছে : জীন = সজীব অণু।"

জর্জ গ্যামো ঐ উক্তি করেছিলেন 1946 সালে তাঁর অমর গ্রন্থ "One.....Two.....Three......Infinity"-তে। তার সাত বৎসর পরে জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস্ ওয়াটসন বললেন—না। ওখানেও থামা যাচ্ছে না। আরও সূক্ষ্মতর বিচার করলেন তাঁরা। বিশ্লেষণে দেখা গেল, প্রতিটি কোষ যেসব অণুর দ্বারা গঠিত তার কিছু অংশ জৈবিক, কিছুটা অজৈবিক, যেমন জল। জৈবিক অণুর ভেতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রোটিন-জাতীয় অণু। কোন জীব, তা এ্যামিবার মতো এক কোষ-বিশিষ্টই হোক, অথবা বহু-কোষ বিশিষ্টই হোক—ঐ প্রোটিন ছাড়া গঠিত হতে পারে না। প্রোটিন জীবনে নানাভাবে সাহায্য করে। কিছু প্রোটিন দেহের বহিরাবরণ গড়ে তোলে—চামড়া, চুল, পেশি, মেদ, মজ্জা ইত্যাদি। আবার অন্য এক জাতের প্রোটিন-অণু সাহায্য করে জীবকোষকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে। এই দ্বিতীয় জাতের প্রোটিন-অণুর নাম এনজাইম (enzyme)।

জীববিজ্ঞানী ক্রিক এবং ওয়াটসন 1953 সালে প্রমাণ করলেন—জীবদেহ জীবিত থাকার যে প্রমাণ—ক্রমাগত জৈবিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নব-নব কোষের জন্ম—তার মূলে আছে ঐ এনজাইম, যা সৃষ্ট হচ্ছে সেল নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোসমের দ্বারা। তাঁরা আরও প্রমাণ করলেন, কোষের বিভাজন ও বৃদ্ধির নিয়ামক এক জাতের নিউক্লিক অ্যাসিড, যার সংক্ষিপ্ত নাম DNA। তারা নিজেরা সব কিছু করে না—হুকুম চালায় তাদের সহকারীদের ওপর। এই সহকারী দলের নাম RNA। হুকুমটা যার মাধ্যমে পাঠান হয় তার নাম পলিমেরজ (Polymerase) এবং RNA যা দিয়ে কাজ করে তার নাম রিবোসোম (ribosome)। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না, নয়? আজ্ঞে, আমিও পারিনি। মাঝখান থেকে গোটাচারেক নতুন নাম পাওয়া গেল। এই জটিল ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝে নিতে হলে সব চেয়ে সুবিধা হবে একটা অনুরূপতা বা analogy-র শরণ নেওয়া।

মনে করুন একটা কারখানা। সেটা চালু রাখতে তিনটি বিভাগ আছে : প্রথম বিভাগ — যার কাজ, কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এবং কর্মকর্তার নির্দেশ মাফিক কারখানার বিভিন্ন অংশে ঐ কাঁচামাল সরবরাহ করা।

দ্বিতীয় বিভাগ — অফিস-দপ্তর। যেখানে উল্লিখিত নির্দেশগুলি রচিত হয়, এবং আদেশ তামিল করার জন্য প্রথম বিভাগে প্রেরিত হয়।

তৃতীয় বিভাগ — বড় কর্তাদের দপ্তর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পরিচালনায় বিভিন্ন অফিসার—স্থপতিবিদ, সেল্স্ ম্যানেজার, প্রডাকশনার ম্যানেজার প্রভৃতি নানান কাজ করেন। তাঁদেরই নির্দেশে দ্বিতীয় বিভাগে আদেশগুলি রচিত হয়।

মানবদেহরূপী ঐ কারখানায় তৃতীয় বিভাগে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হচ্ছেন DNA (Deoxyribonucleic acid)। তাঁর অধীনে আছেন বিভিন্ন অফিসারবৃন্দ—তাঁরা RNA (Ribonucleic acid)। প্রথম বিভাগে হাতে কলমে কাজ করেন রোবোসোম এবং দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন পলিমেরজ।

আপনি খেয়াল করে দেখেছেন কিনা জানি না—আমরা প্রাণের উৎস সন্ধানে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত জীবনের যে গোমুখে এসে উপনীত হয়েছি, তার চেহারাটা হুবহু একটা রোবো কারখানার মত! মানুষ ও রোবোর পার্থক্যটা কমে আসছে। তাতেই না আপনার আপত্তি? সুতরাং এখানেই থামা যাক। এবার বরং উল্টো দিক থেকে যাত্রা করে দেখি। রোবটিক্স-বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। 10^{17} কোষ-বিশিষ্ট মানবদেহের সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে সরু হতে হতে প্রাণের উৎসধারার গোমুখে তার যে স্বরূপ দেখলাম তা রোবো কারখানার মত। এবার আদিমতম রোবো থেকে যাত্রা শুরু করে দেখি—মানুষের মোহনায় এসে পৌঁছানো যায় কিনা।

*   *   *

মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : যন্ত্র কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকারী হতে পারে?

গ্রামোফোন রেকর্ড গান গায়, টেলিভিশনে কিংবা সিনেমায় শুধু শব্দ নয়, ছায়ামূর্তিকে নড়া-চড়া করতে দেখি—তারা কবিতা লেখে, খুন করে, প্রেম করে! কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যন্ত্রটা আদৌ 'স্বাধীনভাবে' চিন্তা করেনি। চালকের পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ মেনে শুধুমাত্র জীবনের অনুকরণ করেছে। বরং বলতে পারি—ঐ যে প্রজাপতিটা এ-ফুলে বসল, ও-ফুলে বসল না, তার স্বাধীন চিন্তা ঐ যন্ত্রের চেয়ে বেশি। আপাতদৃষ্টিতে ঐ-রকম মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ঐ প্রজাপতি-পতঙ্গ-গাছ-মাছ পাখি-প্রাণীরাও 'সে হিসাবে' স্বাধীন চিন্তার অধিকারী নয়। কে তাদের চালায়? বিবর্তনবাদের অমোঘ প্রভাব। প্রকৃতি তাদের চালনা করে—প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। গঙ্গাফড়িং পাখির নজর থেকে বাঁচতে সজ্ঞানে তার গায়ের রঙটা ঘাষের শিষের অনুকরণে সবুজ করেনি। বাঘটা স্বাধীন ইচ্ছায় হরিণের ওপর লাফিয়ে পড়ে না, হরিণটাও স্ব-ইচ্ছায় ছুটে পালায় না। প্রকৃতি বিবর্তনবাদের আইনে ঘাড়ে ধরে তাকে ঐভাবে চালনা করে।

মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। সে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাই বোধ করি—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কারণ পাখিকে প্রকৃতি গান গাইতে শিখিয়েছে, তার বেশি সে কিছু করে না; কিন্তু 'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান, আমি গাই গান।' (এটা অবশ্য কবি-কল্পনা, মানুষকেও কেউ স্বর দেননি, সেটাও বিবর্তনের তাগিদে মানুষের স্বোপার্জিত)। মানুষ শুধু গানই গায় না, সে কবিতা লেখে, নাটক অভিনয় করে, ছবি আঁকে, আঁক কষে, ভাবে।

অঙ্কের কথাই বলি :

রোবো না হয় বিংশ শতাব্দীর অবদান, মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। অঙ্ক কষার প্রথম যন্ত্র তার হাতের আঙুল। মানুষ যেদিন কর গুনতে শিখল, সেদিনই হল এই 'রোবটিক্স-বিজ্ঞানের' প্রথম সূত্রপাত। মাথায় না ধরে তাই ও ধরতে চাইল আঙুলে। তার প্রমাণ আজও রয়ে গেছে ভাষাতত্ত্বে—'সংখ্যা, এবং 'আঙুল' দুটিরই ইংরাজি প্রতিশব্দ—digit। কিন্তু তাতে তো মাত্র দশটা আঙুল, হাতে-পায়ে বিশটা। বুদ্ধি আর একটু বাড়লে মানুষ তাই আঙুলের বদলে নুড়িপাথর কুড়িয়ে গুনতে শুরু করল। এখানেও ভাষাতত্ত্বে নজিরটা গোপন আছে—ইংরাজি calculate শব্দটা এসেছে যে ল্যাটিন শব্দ থেকে তার অর্থ নুড়িপাথর।

তার পরের যুগে বুদ্ধিমান মানুষ অঙ্ক কষার জন্য যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করল তার নাম এ্যাবাকাস (abacus)। নার্সারি স্কুলে ছোট বাচ্চাদের যোগঅঙ্ক শেখাতে প্রায় ঐ জাতের যন্ত্র আমরা এখনও ব্যবহার করি। মনে রাখা দরকার, তখনও 'শূন্য' আবিষ্কৃত হয়নি; অর্থাৎ ৯-এর পিঠে শূন্য বসালে যে ৯০ হয়, নয়-এর মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পায়, এ জ্ঞান মানুষের ছিল না। তবু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তারা বেশ বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারত।

প্রসঙ্গত বলি, ১ থেকে ৯ সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার ইউরোপ শিখেছে আরবদের কাছে, একেবারে হাল আমলে—দ্বাদশ শতাব্দীতে। আরবী পণ্ডিতেরা ঐ সংখ্যাগুলিকে বলতেন 'রকম্ অল-হিন্দ' বা 'ভারতীয় সংখ্যা।' ফলে ইউরোপ স্বীকার করে, ঐ দশমিক পদ্ধতি ও 'শূন্যের' ব্যবহারের জন্য সে ভারতবর্ষের কাছে একান্তভাবে ঋণী।

কিন্তু ভারত সেটা কবে শিখল? কে শেখালো? অশোকের শিলালেখে শূন্যের ব্যবহার নেই; কিন্তু 1 থেকে 9 সংখ্যার ব্যবহার আছে। 9-এর পরে 10 বোঝাতে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হত। 11 বোঝাতে ঐ চিহ্নের পরে 1। এইভাবে 20, 30, 40,...90 পর্যন্ত বোঝানোর বিভিন্ন চিহ্ন ছিল। 100, 200, 300 প্রভৃতির জন্যও পৃথক পৃথক চিহ্ন। অর্থাৎ অশোকের আমলে 'একক-দশক-শতক'-এর ধারণা, যাকে বলি 'স্থান-মাহাত্ম্যে সংখ্যার মানের উন্নতি' সেটা চালু হয়নি।

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে সেটা সর্বপ্রথম চালু হতে দেখেছি, আমি যতদূর জেনেছি, 594 খ্রীস্টাব্দে। সেটা কলচুরি সন 346; ঐ সালে একটি শিলালেখে প্রথম দেখেছি দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ। সেখানে পূর্বেকার নিয়ম মেনে—'তিনশ-জ্ঞাপক চিহ্ন + চল্লিশ-জ্ঞাপক চিহ্ন + ছয়' এভাবে না লিখে লেখা হল—346 ! তার মানে দেখতে পাচ্ছি, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই অজ্ঞাতনামা গণিতজ্ঞ পণ্ডিত, যিনি শূন্যের আবিষ্কারক। তিনি কে তা জানি না, কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যাশাম (A. L. Basham)-এর মতে তিনি 'বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যিনি বিশ্বসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছেন।'

যাক ওসব অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমরা এখনও আছি সেই এ্যাবাকাসের যুগে। প্রাক-শূন্য অঙ্করাজ্যে। এ্যাবাকাস-এর ব্যবহারটা কৌতুকপ্রদ। রোবোর রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে ঐ প্রাক-শূন্য যুগের যন্ত্রটাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে জেনে নিতে হয়। যন্ত্রে আছে নয়টা কাঠি, তাতে আছে পাঁচটা করে 'বীড' (রুদ্রাক্ষ বা পুঁথির মতো গোলাকার বস্তু, যার ভিতর দিয়ে ঐ নয়টা কাঠি পরানো আছে)। এ ছাড়া যন্ত্রে আছে একটা সমান্তরাল কাষ্ঠখণ্ড, যার ওপরদিকে আছে একটি রুদ্রাক্ষ এবং নীচের দিকে আছে চারটি। রুদ্রাক্ষগুলি এমনভাবে আছে যাতে সেগুলি ঠেলে দিলে ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে স্পর্শ করবে, টেনে নিলে ফাঁক থাকবে। মনে রাখা দরকার, ঐ কাষ্ঠখণ্ডের ওপরের রুদ্রাক্ষটির মান = 5 এবং নীচের চারটি রুদ্রাক্ষের

প্রতিটির মান = 1। অর্থাৎ প্রতিটি কাঠিতে আছে 5 + (1+ 1 + 1 + 1) = 9 সংখ্যা। কাঠে স্পর্শ করলেই তা ধর্তব্য, নচেৎ নয়। সংলগ্ন চিত্রে—ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে আমরা একটা যোগ অঙ্ক কষেছি। অঙ্কটা হচ্ছে 1,294 + 125 = 1,419।

চিত্রে বামদিকের যন্ত্রে দেখুন—ডানদিকের (বলতে পারেন এককের ঘরে, যদিও ওরা 'একক' চেনে না এখনও) প্রথম কাঠিতে নীচের দিককার চারটি রুদ্রাক্ষই ওপরে ঠেলা আছে, ফলে তাদের সম্মিলিত ফল = 4; পরের সূত্রে (দশকের ঘরে) সংখ্যাটা হচ্ছে 5 + 4 = 9; এইভাবে 1,294 লেখা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় এ্যাবাকাসে সংখ্যাটি হচ্ছে 125। তৃতীয় এ্যাবাকাসে যোগ করার সময় কীভাবে দশমিকের ঘরে 9 + 2 = 11 হওয়ায় নেমেছে 1 এবং হাতে আছে 1 তা লক্ষণীয়। মজা হচ্ছে 'শূন্য' এবং দশমিকের ব্যবহার না জানলেও ওরা চমৎকারভাবে যোগ করতে পারত। পাঠককে বোঝাবার জন্য আমরা এখানে তিনটি এ্যাবাকাস এঁকেছি। ওরা কিন্তু একটির সাহায্যেই এর চেয়ে বড় বড় অঙ্ক কষতে পারত।

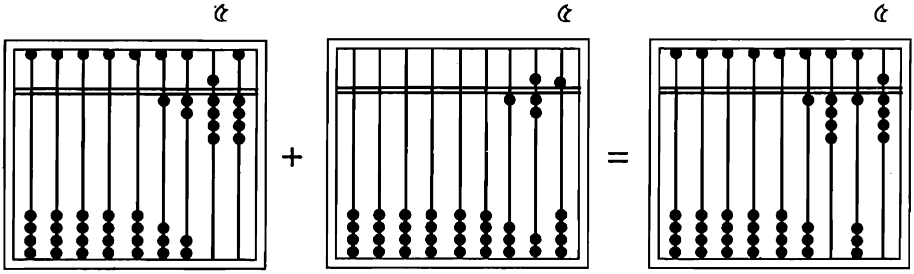

১২৪৪ + ১২ = ১৪১৪

১২৯৪   ১২৫   ১৪১৯

অভ্যাসে এ যন্ত্র দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে যোগ বিয়োগ করা যায়। বস্তুত 1946 সালে একজন এ্যাবাকাস-পারদর্শী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছিলেন, ঐ যন্ত্রে অঙ্ক কষতে ইলেকট্রনিক যোগযন্ত্রের চেয়ে তাঁর বেশি সময় লাগে না! (Guide to Science, Vol. II, p. 429, by I. Asimov)।

এর পরেই এল ঐ নতুন যুগ—'শূন্য' আবিষ্কার তথা দশমিক-পদ্ধতি, অর্থাৎ একক-দশক-শতক পদ্ধতিতে স্থান-মাহাত্ম্যে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি।

সংখ্যাতত্ত্বে পরবর্তী উত্তরণ হচ্ছে বর্গের ব্যবহার।

1-এর পিঠে সাতটা শূন্য বসালে কোটি হয়। নূতন পদ্ধতিতে : 1কোটি = 1,00,00,000 না লিখে লেখা হল, 1কোটি = 10^7, দেখা গেল এতে অঙ্ক সংক্ষেপিত হচ্ছে। এক কোটিতে এক লক্ষ দিয়ে গুণ করতে ইতিপূর্বে লিখতে হত, 1,00,00,000 × 1,00,000 = 10,00,00,00,00,000। সেটা এখন সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে ঐ বর্গটুকু যোগ করে। যথা, এক কোটি × এক লক্ষ = $10^7 \times 10^5 = 10^{7+5} = 10^{12}$। অনুরূপভাবে এক লক্ষকে একশ দিয়ে ভাগ করতে হলে ঐ বর্গের বিয়োগ করলেই চলছে। যথা, 10,000 ÷ 100 = $10^5 \div 10^2 = 10^3$। গুণ, ভাগ, বর্গীকরণ, বর্গমূল নির্ণয় প্রভৃতি সবই সহজ হয়ে গেল। কিন্তু সব সংখ্যা তো ঐভাবে দশের বর্গ হিসাবে লেখা যায় না। একশ'র পরিবর্তে লিখলাম 10^2, হাজারের বদলে 10^3, কিন্তু 111কে 'দশের বর্গ' দিয়ে কেমন করে প্রকাশ করব?

* * ঐ পথে চিন্তা করতে করতে স্কটল্যান্ডের একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সপ্তদশ শতাব্দীতে একটা নতুন আবিষ্কার করে বসলেন। তাঁর নাম জন নেপিয়ার। তিনি দেখলেন যেহেতু ঐ 111 সংখ্যাটি হাজারের চেয়ে ছোট এবং একশর চেয়ে বড়, এবং যেহেতু হাজারের প্রয়োজন হচ্ছে দশের বর্গ হিসাবে

3, আর শয়ের ক্ষেত্রে 2, তাই 111-কে দশের বর্গ হিসাবে প্রকাশ করতে হলে ঐ বর্গসংখ্যাটা হবে 3-এর চেয়ে ছোট এবং 2-এর চেয়ে বড়। তিনি হিসাব কষে দেখলেন সংখ্যাটা 2.04532; অর্থাৎ $111=10^{2\cdot04532}$

তিনি অঙ্ক কষে দেখলেন—সব সংখ্যাকেই দশের বর্গরূপে প্রকাশ করা যাচ্ছে। যেমন $254=10^{2\cdot40483}$; নেপিয়ার অতঃপর একটা লম্বা চার্ট তৈরি করলেন—প্রত্যেকটি সংখ্যাকে দশ-এর বর্গ হিসাবে প্রকাশ করে। এর ফলে সব জাতের অঙ্ক কষাই খুব সুবিধার হয়ে গেল। যথা

$$254 \times 111 = 10^{\bar{2}\cdot04532} \times 10^{2\cdot4-483} = 10^{4\cdot45015} = 28\cdot194\cdot$$

$$254 \div 111 = 10^{2\cdot40483} \div 10^{\cdot204532} = 10^{0\cdot35951} = 2\cdot28838\cdot \ *$$

ঐ তালিকাটিকে বলে 'লগেরেথিম'। এই 'লগেরেথিম' আবিষ্কার অঙ্কশাস্ত্রে একটা বিরাট উত্তরণ। অঙ্কশাস্ত্র এর মাধ্যমে আরও সহজ হয়ে গেল। এ থেকেই জন্ম নিল 'স্লাইড-রুল'। বাড়িতে বয়স্ক এঞ্জিনিয়ার থাকলে ঐ যন্ত্রটা নিশ্চয় দেখেছেন। ওর সাহায্যে 'লগেরেথিম' পদ্ধতিতে সহজে নানান অঙ্ক কষা যায়। বস্তুত হোমো-ইরেক্টাসকে যদি বলি মানব প্রজাতির (হোমো-স্যাপিয়ান্সের) আগের ধাপ, তাহলে স্লাইড-রুল যন্ত্রটা হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক কম্পুটার বা রোবোর পূর্ববর্তী সোপান।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষার চেষ্টা প্রথম করেছিলেন একজন ফরাসী গাণিতিক পণ্ডিত—1642 খ্রীস্টাব্দে। তাঁর নাম প্যাস্কাল। কতকগুলি চাকা ও গিয়ারের সাহায্যে তিনি যোগ-বিয়োগ করতে পারলেন। তিনি প্রায় গোটা পঞ্চাশ ঐজাতীয় যন্ত্র তৈরি করেন, তার গোটা পাঁচেক এখনও কার্যকরী। তার একটি নমুনার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে—মটরগাড়ির মাইলোমিটার।

1674 সালে জার্মান-পণ্ডিত লিবনিৎজ ঐ যন্ত্রের আরও উন্নতি করে তাকে দিয়ে গুণ-ভাগ করতে শুরু করেন।

আরও প্রায় দেড়শ বছর পরে, 1840 সালে মার্কিন আবিষ্কারক পার্মালী যন্ত্রটাকে আরও উন্নত করে এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে আর যন্ত্রটাকে হাতে ঘোরাতে হয় না—বোতাম টিপে দিলেই সংখ্যাগুলি আপনা-আপনি সরতে থাকে। ঐ যন্ত্রের বংশাবতংশের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় আছে—বড় দোকানের ক্যাশ-কাউন্টারে তাকে দেখেছেন—যোগের যন্ত্র বা adding machine।

বিদ্যুতের সাহায্যে ঐজাতীয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার চালু হল বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু তার প্রসঙ্গে আসার পূর্বে গত শতাব্দীর এক ভাগ্যহীন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের নাম স্মরণ করা প্রয়োজন। চার্লস ব্যাবেজ (1792–1871)।

ইংরাজ পণ্ডিত। অদ্ভুত প্রতিভা। তিনি এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন দেখলেন, যা আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পুটারের দোসর। ব্যাবেজ দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে ঐ নিয়ে কাজ করেন; তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এবং প্রচুর সরকারি অর্থ ব্যয় করেও তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেননি। অন্তিমে অসাফল্যের বোঝা নিয়ে এবং ঋণের বোঝা রেখে একদিন একলা চলার পথে যাত্রা করলেন।

ধুরন্ধর প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের একটি মাত্র ভুল হয়েছিল, যে ভুলের জন্য তিনি দায়ী নন। তিনি ভুল করে শতখানেক বছর আগে জন্মেছিলেন। বুদ্ধি অথবা প্রতিভা নয়, তাঁর সাফল্যের পথে ছিল দুটি মাত্র অন্তরায়। প্রথম—সে যুগে প্রযুক্তিবিদ্যা অত উন্নত ছিল না। দ্বিতীয়—কম্পুটার যন্ত্রের আগে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন আর একটা গাণিতিক সূত্র : "দ্বৈত-নিয়ম"!

এই দ্বৈত-নিয়ম বা 'বাইনারী সিস্টেম' নিঃসন্দেহে লগারেথিম আবিষ্কারের চেয়ে বড় জাতের উত্তরণ—প্রায় 'শূন্য' আবিষ্কারের সমপর্যায়ের একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুত ঐ দ্বৈত নিয়মই হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পুটার নামক গঙ্গার ভগীরথ। যদিও আপাতদৃষ্টিতে একটু খটমট তবু এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে বাধ্য।

---

* এই অংশটি বিজ্ঞান-শিক্ষিত পাঠকের জন্য। নেহাত বুঝতে না পারলে অঙ্ক নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে এমন কারও সাহায্য নিলেই বুঝবেন।

দশমিক পদ্ধতিতে ছিল নয়টি সংখ্যা এবং শূন্য; তেমনি এই দ্বৈত-নিয়মে থাকল মাত্র দুটি সংখ্যা—'এক' এবং 'শূন্য'। মাত্র ঐ দুটি সংখ্যা দিয়েই নাকি যাবতীয় অঙ্ক কষা যাবে। 'লগারেথিমে' যেমন সব সংখ্যাকে দশ-এর বর্গ হিসাবে লিখেছিলাম, ঠিক সেভাবে এই 'দ্বৈত-নিয়মে' যাবতীয় সংখ্যাকে 2-এর বর্গ হিসাবে লেখা হল। কেমন করে? দেখুন :

$2^0 = 1$ [মেনে নিন, যে কোনও সংখ্যার বর্গ শূন্য হলে তার ফল হবে 'এক']

$2^1 = 2$; $2^1 + 2^0 = 3$; $2^2 = 4$; $2^2 + 2^0 = 5$; $2^2 + 2^1 = 6$ ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতেও দশমিক পদ্ধতির মতো স্থান-মাহাত্ম্যে দুইয়ের বর্গটি প্রকাশ করতে হবে। 102 লিখতে যেমন দশকের ঘরে শূন্য বসাতে হয় এখানেও তাই করতে হবে। দু-একটি উদাহরণ দেখুন—

$4 = (1\times2^2) + (0\times2^1) + (0\times2^0)$

4 + 0 + 0 লেখা হবে—100,

$8 = (1\times2^3) + (0\times2^2) + (0\times2^1) + (0\times2^0)$

8 + 0 + 0 + 0 লেখা হবে—1000।

ধরুন বড় একটা সংখ্যা 9,417, দশমিক পদ্ধতিতে এটা লেখার সূত্র হচ্ছে :

$(9\times10^3) + (4\times10^2) + (1\times10^1) + (7\times10^0) = 9000 + 400 + 10 + 7 = 9417$

দ্বৈত-নিয়মে যদি সংখ্যাটিকে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে 'দশ'-এর বর্গ হিসাবে নয়, 'দুই'-এর বর্গ হিসাবে সংখ্যাটিকে লিখতে হবে। আমরা সেটা এভাবে লিখব

2^{13}	= 8192	[বাকি	থাকল	9417 −	8192 =	1225]
2^{10}	= 1024	[ঐ	ঐ	1225 −	1024 =	201]
2^7	= 128	[ঐ	ঐ	201 −	128 =	73]
2^6	= 64	[ঐ	ঐ	73 −	64 =	9]
2^3	= 8	[ঐ	ঐ	9 −	8 =	1]
2^0	= 1					

অর্থাৎ $2^{13} + 2^{10} + 2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^0 = 9417$.

কিন্তু দশমিক পদ্ধতির মতো বর্গের প্রতি ঘর লিখতে হবে। ফলে $9417 = (1\times2^{13}) + (0\times2^{12}) + (0\times2^{11}) + (1\times2^{10}) + (0\times2^1) + \ldots + 0\times2^0) = 10010011001001$.

জানি, এবার কী বলতে চাইছেন। আপনি বলবেন, বাপু হে, কেরামতি তো খুব দেখালে, কিন্তু 9417 লিখতে প্রাচীন দশমিক পদ্ধতিতে আমাকে মাত্র চারটি সংখ্যা লিখতে হয়েছিল; কিন্তু তোমার এ নয়া আবিষ্কারে এখন লিখতে হচ্ছে চোদ্দোটি সংখ্যা। এতে লাভটা কী হল? ঝামেলা এবং পরিশ্রম দুই তো বাড়ল।

আমি জবাবে বলব, আজ্ঞে না। ঝামেলা কমেছে। আপনি দশমিক পদ্ধতিতে মাত্র চারটি সংখ্যা লিখেছিলেন বটে কিন্তু আপনাকে দশটি সংখ্যা শিখে তৈরি থাকতে হয়েছিল—এক থেকে নয় এবং শূন্য। আমার এ দ্বৈত-নিয়মে চোদ্দোটি সংখ্যা লিখলেও তাদের দুটি মাত্র জাত—'এক' এবং 'শূন্য'। তাতে লাভ? লাভ হচ্ছে এই যে, আমার কম্পুটার যেকোন সংখ্যা বলতে পারবে শুধু বাতি জ্বেলে এবং বাতি নিভিয়ে—এই-দুই-তিনের তোয়াক্কা না রেখে! কোনও সংখ্যা না ব্যবহার করে শুধুমাত্র বাতি জ্বেলে ও নিভিয়ে সে ঐ 9417 সংখ্যাটাকে এইভাবে প্রকাশ করতে পারে (কালো মানে শূন্য, সাদা মানে এক) :

	○	●	●	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○
সঙ্কেত	১	০	০	১	০	০	১	১	০	০	১	০	০	১
মান	$২^{১৩}$	$২^{১২}$	$২^{১১}$	$২^{১০}$	$২^{৯}$	$২^{৮}$	$২^{৭}$	$২^{৬}$	$২^{৫}$	$২^{৪}$	$২^{৩}$	$২^{২}$	$২^{১}$	$২^{০}$
	+			+			+	+			+			+

অর্থ ৮১৯২ + ১০২৪ + ১২৮ + ৬৪ + ৮ + ১

= ৯৪১৭

আপনি হয়তো তা সত্ত্বেও বলবেন, তাতেই বা কোন চতুবর্গ লাভ হল?

এবার আমি বলব ঐ দ্বৈত-নিয়মে ইলেক্ট্রনিক কম্পুটার যাবতীয় অঙ্ক এত দ্রুতগতিতে কষতে পারে যা আমরা খাতা-কলমে, লগারেথিম পদ্ধতিতে বা স্লাইড-রুলের সাহায্যে পারি না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিই, তাহলেই বুঝবেন :

ইলেকট্রনিক কম্পুটার আবিষ্কৃত হবার পূর্বে ইংরাজ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত উইলিয়াম শ্যাঙ্কস π (অক্ষরটার উচ্চারণ 'পাই'—বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের যত গুণ)-এর মান নিখঁতভাবে বার করবার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ পনেরো বৎসর একাদিক্রমে অঙ্ক কষে গিয়ে তিনি দশমিক বিন্দুর পরে 707 স্থান পর্যন্ত তার মান নির্ণয় করেন। তাঁর শেষ দিকের প্রায় শতখানেক সংখ্যা ভুল হয়েছিল, বোধ করি নিছক ক্লান্তিতে। কয়েক বছর পূর্বে একটি ইলেকট্রনিক কম্পুটারকে ঐ অঙ্কটা কষতে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক দিনের ভেতর সে দশমিক বিন্দুর পরে দশ-হাজারতম স্থান পর্যন্ত নির্ভুল করে কষে দেয়।

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে কেনিয়ায়-প্রাপ্ত '1470-মানব' অথবা চীনে-প্রাপ্ত পিকিং ম্যানের মাথার খুলি যেমন এক একটি দিকচিহ্ন, তেমনি ইলেকট্রনিক কম্পুটারে বিবর্তনের প্রসঙ্গে স্মরণীয় নাম ENIAC এবং MANIAC.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) বয়োজ্যেষ্ঠ। তার কথাই আগে বলি। পেনিসিল্‌ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। তার আমলে সে ছিল বৃহত্তম ইলেক্ট্রনিক কম্পুটার। ওজন ত্রিশ টন; মেঝের প্রায় দেড় হাজার বর্গফুট জুড়ে তার বপু! তার দেহে ছিল উনিশ হাজার ভ্যাকুয়াম টিউব। দশ-বারো বছরের ভেতরেই কম্পুটার ডিজাইনে এত উন্নতি হল যে, ঐ প্রকাণ্ড আদিম যন্ত্রটিকে 1957 সালে ভেঙে ফেলা হল।

যে বছর 'এনিয়াক'-এর মৃত্যু হল—আচ্ছা, না হয় আপনার কথামত সেটা ভেঙে ফেলা হয়—সে বছরই জন্ম নিল তার উত্তরসাধক ম্যানিয়াক (MANIAC – Mathematical Analyser Numerical Integretor And Computer)। তার জনক বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ফন নিউম্যান—যিনি হাইড্রোজেন-বোমার অন্যতম আবিষ্কারক। বস্তুতু ঐ 'ম্যানিয়াক' যন্ত্রটির সাহায্যে নানান অঙ্ক কষেই নিউম্যান হাইড্রোজেন বোমা তৈরির ফর্মূলা আবিষ্কার করেন। তার দেহে ছিল লক্ষাধিক সুইচ সার্কিট। 'ম্যানিয়াক' শব্দটার অর্থ ইংরাজিতে—'পাগল।' তাই তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা নামটা পালটে রাখতে অনুরোধ করেন। নিউম্যানের শুভানুধ্যায়ীরা হয়তো ভয় পেয়েছিলেন, হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে হাত পাকিয়ে ঐ যন্ত্রটি দানবে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাই নিউম্যান শেষ পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রটার নাম বদলে তাঁর নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে ওর নাম রেখেছিলেন জনিয়াক (JONIAC)।

মানুষের তৈরি যন্ত্রদানবে রূপান্তরিত হয়ে যাবার প্রসঙ্গ ওঠায় মনে পড়ল—একসময় বিজ্ঞানীরা সত্যই এ বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মেরী শেলীর উপন্যাস 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' শুধু নয়, স্যামুয়েল বাটলারের Erewhon এবং বিশেষ করে শ্যাপেক কারেল-এর (Capek Karel) লেখা R. U. R. প্রভৃতি (Rossum's Universal Robot)। বস্তুত কারেলই ঐ 'রোবো' শব্দটার জনক। কিন্তু পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা বললেন, এ জাতীয় আশঙ্কা অমূলক। মার্কিন বৈজ্ঞানিক আইজাক আজিমভ (Isaac Asimov) এজন্য রোবটিক্স বিজ্ঞানের তিনটি মূল সূত্র রচনা করে মানুষকে নিরাপত্তা দেবার চেষ্টা করলেন। সে তিনটি সূত্রের কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আশঙ্কা হচ্ছে, এবার আপনি সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করবেন। আপনি বলবেন, তুমি যা বললে তাতে না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি যন্ত্রমানব মানুষের চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে অঙ্ক কষতে পারছে। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রটা কি স্বাধীন চিন্তার এক্তিয়ারে সত্যই পড়ে? অঙ্ক মানব-সভ্যতার অনেকখানি, কিন্তু সবটা নয়। তোমার ঐ যন্ত্র কি ভেবে-চিন্তে কথাবার্তা চালাতে পারে? সাহিত্য রচনা করতে পারে? ইতিহাস ভুগোল জানে? দাবা খেলতে পারে? এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে তুমি তো শুধু অঙ্কের কথাই সাতকাহন করে বকে চলেছ! জবাবে আমি বলব, অঙ্কের কথা অত বিস্তারিত বললাম এজন্য যে, সাম্প্রতিক যন্ত্রমানব তার চিন্তাভাবনা কাজ-কর্ম সবকিছুই করে ঐ দ্বৈত নিয়মের মাধ্যমে। তার

জগৎ অঙ্কময়। এবার আপনার প্রশ্নের জবাবে জানাই—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলতে শিখেছে। মৌলিক রচনায় এখনও অভ্যস্ত না হলেও সে চমৎকার অনুবাদ করতে পারে—রাশিয়ান-ফরাসি-ইংরাজি-জার্মান ইত্যাদি ভাষান্তরে সে দক্ষ। ইতিহাস-ভূগোলে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। দাবা খেলায় সে ওস্তাদ। একে একে বলি শুনুন :

ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজির একটি কম্পুটার ভেবেচিন্তে কথাবার্তা চালানোতে দক্ষ হওয়ার পর তাকে একজন মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার সাজিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষা করা হয়েছিল। ডাক্তারবাবু পর্দার ওপাশে বসে আছেন একথা মনে করে রোগীরা তাদের উপসর্গের কথা বলতে থাকে। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে অধিকাংশ ব্যক্তিই সন্দেহ করেনি—পর্দার ওপাশে যিনি বসেছিলেন তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট নন, যন্ত্রমানব। একটি কথোপকথনের নমুনা শোনাই :

রোবো : নমস্কার। আমিই ডাক্তারবাবু। দয়া করে বসুন এবং বলুন কী আপনার উপসর্গ।

মানুষ : আমি আসবার সময় আমার 'লাগেজটা' হারিয়ে ফেলেছি।

রোবো : লাগেজ! মানে বলতে চান আপনার মালপত্র?

মানুষ : হ্যাঁ। ফলে বড় অসহায় বোধ করছি।

রোবো : আপনি কি প্রায়ই জিনিস হারান এবং এভাবে অসহায় বোধ করেন?

মানুষ : না। তা ঠিক নয়।

রোবো : মানে? কেন নয়?

মানুষ : কারণ সাধারণত আমি এভাবে জিনিসপত্র হারাই না।

রোবো : আর কী কারণ থাকতে পারে?

মানুষ : আমার মা ছেলেবেলাতেই শিখিয়েছিলেন জিনিসপত্রের যত্ন নিতে।

রোবো : আপনার মায়ের কথা বিস্তারিত বলুন, পরিবারের কথা—

মনে রাখা দরকার এ ক্ষেত্রে রোবো গ্রামোফোন রেডিয়ো টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির মতো পূর্বনির্ধারিত শব্দ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাতাসে ছেড়ে দেয়নি। পর্দার এপাশে মানুষটি যে প্রশ্ন করেছে তা সে শুনেছে, বুঝেছে এবং জবাব দিয়েছে। সবই ঐ অঙ্কশাস্ত্রের দ্বৈত-নিয়মে। এখন কী বলবেন? সে চিন্তাশক্তির অধিকারী, না নয়?

একদল যন্ত্রমানব অনুবাদে দক্ষ হয়েছে। তাদের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা ও সদ্যপ্রকাশিত বই দেওয়া হয়। তারা ঐ রচনা পড়ে, অনুধাবন করে তার সারাংশ স্মরণে রাখে—ভুষিমাল ত্যাগ করে। প্রয়োজনীয় অংশ ইনডেক্স কার্ড অনুযায়ী সাজিয়ে রাখে, যাতে প্রশ্ন করলেই জানাতে পারে।

ইতিহাস-ভূগোলের কথা তুলেছিলেন। আমি—এই গ্রন্থের লেখক আমি, একটি ইতিহাস-পণ্ডিত ইলেকট্রনিক কম্পুটারকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম জাপানে—এক্সপো 70 দেখতে গিয়ে। তার কথা অন্যত্র বিস্তারিত বলেছি। ইতিহাসের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটস্থ। স্বকর্ণে শুনেছিলাম, একজন ইংরাজ ট্যুরিস্ট যন্ত্রটাকে প্রশ্ন করলেন, "1941 সালের 27 মে বেলা দশটা চল্লিশ মিনিটে সারা পৃথিবীতে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী ঘটেছিল?" যন্ত্রটা তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিল, "ইংল্যান্ড উপকূলের আটশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কিং জর্জ-দ্য ফিফথ্ যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে বিখ্যাত জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'বিসমার্ক' নিমজ্জিত হয়।"

দাবা খেলা? একাধিক কম্পুটার দাবা খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছে। আদ্রিয়ান বেরী লিখছেন, 'তাদের মধ্যে অনেকেই আজ গুরু-মারা-চেলা; অর্থাৎ যে দাবারু দ্বৈত-নিয়মের মাধ্যমে রোবোকে খেলাটা আদিযুগে শিখিয়েছিলেন তিনি এখন তাঁর শিষ্যের কাছে ক্রমাগত মাৎ হয়ে যাচ্ছেন।'

স্বীকার করব—রোবোরা এখনো মৌলিক চিত্র আঁকেনি, কবিতা লেখেনি, সিম্‌ফনি রচনা করেনি। তবু বলব—তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারছে। পারছে না—নতুন রোবো পয়দা করতে।

আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? আমার ধারণা—ওভাবে মানুষের হুকুমে কোনো রোবো আর একটি রোবো পয়দা করতে পারবে না। এ যেন কিছু জৈব রাসায়নিক মালমশলা দিয়ে স্ত্রীকে অনুরোধ করা—'এবার একটা মানুষের বাচ্চা বানাও।'

যত বড় জীববিজ্ঞানীই হন—মহিলা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে সেটা বানাতে পারবেন না, যদিও অতি সহজেই পারবেন নিজ জঠরে। ঠিক তেমনি রোবোও একদিন বিবর্তনের তাগিদে নিজে থেকেই বংশবৃদ্ধি করতে পারবে; যেভাবে জল থেকে একদিন জীব ডাঙায় উঠে নিশ্বাস নিতে শিখেছিল, পাখি হয়ে আকশে উড়তে শিখেছিল, মানুষ হয়ে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। নিজের চেষ্টায়, বিবর্তনবাদের তাগিদে।

তা যদি হয়, তাহলে ইতিপূর্বে যে-কথা বলেছি তা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। ইতিপূর্বে বলেছিলাম, রোবো কোনদিন মানুষকে ছাপিয়ে যাবে না, তার ক্ষতি করবে না। সেটা সত্য হতেও পারে। ভেবে দেখুন, এই হচ্ছে বিবর্তনবাদের মূল কথা! প্যালিওজোয়িক যুগের শেষ পর্যায়ে—আজ থেকে চল্লিশ কোটি বছর আগে, সমুদ্রচর প্রাণী তাদের বংশধরদের একটি শাখাকে পাঠিয়েছিল ডাঙায়—সেই শাখা থেকে জন্ম নিল মানুষ। যারা ডাঙায় এল না তারা হল তিমি-ডলফিন-ডুগঙ। মানুষ আজ তাদের হত্যা করে, শিকার করে! আবার ধরুন, আজ থেকে দেড়-দু কোটি বছর আগে এক জাতের প্রায়-বানর 'রামাপিথেকাস' তাদের একটি বংশকে মানুষ হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছিল—তা থেকেই জন্ম নিল হোমোস্যাপিয়ন্স, যাদের বংশধর বাঁদরদের আজ খাঁচায় বন্দি করে, নাচায়। অবাক হব না, যদি ঐভাবে মানুষের তৈরি রোবো একদিন মানুষকে ছাপিয়ে যায়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন এতে দুঃখ করার কিছু নেই। যে কোনো মূল্যে মানব-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখাই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না—তার একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। যে ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি মানুষের বদলে আমরা মানবোত্তর কোনো জীবকে বিবর্তনের পথে এই দুনিয়ার অধিকার দিয়ে ইতিহাসের মহানেপথ্যে ডাইনোসরের মতো সরে যেতে পারি!

তাই আইজাক আজিমভ বললেন : What achievement could be grander than the creation of an object that surpasses the creator ? How could we consummate the victory of intelligence over Nature more gloriously than by passing on our heritage, in triumph, to a greater intelligence—of our own making? [স্রষ্টার অপেক্ষা মহান কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে? প্রকৃতির ওপর বুদ্ধিমত্তার জয়কেতন ওড়াবার এই তো সব চেয়ে ভাল উপায়—সগৌরবে আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেব, মাথা সোজা রেখে, আমাদের ঐতিহ্যের পতাকা হস্তান্তরিত করে যাব উন্নতবুদ্ধির উত্তরসূরিকে—যারা আমাদেরই সৃষ্টি।]

চণ্ডীদাসের উক্তি—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এ বিষয়ে শেষ কথা হতে পারে না! বোধ করি তার চেয়ে বড় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক নীৎজে। যিনি বলেছিলেন, "মানুষ একটি রজ্জু—জানোয়ার থেকে অতিমানবে উত্তরণের একটি যোগসূত্র—পা ফসকালেই অতলস্পর্শী গভীর খাদ!"

সাত

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর মানসিক চিকিৎসালয়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। উন্মাদাগারটা শহরের একান্তে—এটাও একটা আধভাঙা বাড়ি। ওঁর চিকিৎসালয়ের তিনটি অংশ; কেন্দ্রীয় অংশে জীবনবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতদের গবেষণাগার, অফিস, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। বাকি দুটি অংশের একটি 'হোমো-সাইকোলজি', একটি 'মেকানো-সাইকোলজি'। প্রথম বিভাগে আছে কিছু প্রায়-জন্তু মানব-মানবী। বায়োলজিক্যাল বোমায় যাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজনন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, এমন কয়েকটি মানুষকে নিয়ে ডক্টর ব্রয়েড গবেষণা করছেন—তাদের চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, এবং প্রজনন-ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। চিকিৎসার কিছু কিছু সুফল ফলতে শুরু করেছে। তারা যেন প্রথম যুগের রোবো—চিন্তা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না, শুধু সুইচ টিপে দিলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে। সে সুইচ ওদের দেহকোষের DNA! তবু ডক্টর ব্রয়েডের বিশ্বাস—ওরা কিছুদিনের মধ্যেই কথা বলবে, কথা বুঝবে। দ্বিতীয় বিভাগে আছেন কিছু বীটা-মহিলা এবং নানান

জাতের পুরুষ রোবো। গামা বিজ্ঞানীরা এ নিয়েও গবেষণা করছেন। রোবোসাইকোলজি অনেকটা উন্নত হয়েছে। যন্ত্রমানব যদি কাব্য রচনা করতে পারে, গান বাঁধতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, তাহলে নতুন রোবোকে জন্ম দিতেই পারবে না কেন? গত শতাব্দীতেই সত্তরের দশকে রোবোরা ছিল self-repairing, নিজেদের যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা নিজেরাই সারিয়ে নিত। বাইরের, বিশেষ করে মানুষের, সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হত না। ক্রমে তারা হয়েছিল self-thinking, চিন্তাশক্তিতে স্বয়ম্ভর—অর্থাৎ মানুষ আর বোতাম টিপে তাদের পরিচালিত করে না। যে কাজ, যে চিন্তা, যে মনন শুভঙ্করী মঙ্গলদায়ক—অনিবার্যভাবে তারা তাই করে, তাই ভাবে। এখন বাকি আছে 'রোবটিক্স' বিজ্ঞানের শেষ ধাপ—self-generating হওয়া। প্রজনন-ক্ষমতা। এখন আর মানুষ-বিজ্ঞানী তা নিয়ে গবেষণা করছেন না। রোবো-বিজ্ঞানীরা নিজেরাই সে বিষয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন।

উন্মাদাগার পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর ব্রয়েড ওদের তিনজনকে নিজের অফিসে নিয়ে এসে বসালেন। বললেন, ডক্টর রয়, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনারা এসেছেন—

প্রফেসর আইনস্টোন বাধা দিয়ে বলেন, কী বকছেন ডক্টর! পাগলদের চিকিৎসা করতে করতে আপনি নিজেই কি পাগল হয়ে গেলেন? ওঁরা এসেছেন, সেজন্য আপনি দুঃখিত?

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি নেড়ে বলে ওঠেন, ঐ আপনার দোষ মশাই। কথাটা আমার শেষ করতে দিন। আমি বলতে চাইছি—ওঁরা চারদিন হল এসেছেন, অথচ আমি গিয়ে আলাপ করতে পারিনি, কাজের চাপে। এতে দুঃখ প্রকাশ করাটা পাগলামি হল? এ যদি আপনার সৌজন্যবোধে পাগলামি হয় তাহলে আপনাকেই আমার উন্মাদাগারে ভর্তি করে নিতে হবে।

বব্ বললে, আপনি শেষ যখন ডরোথিকে দেখেন, তখন সে কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে?

: হ্যাঁ। একেবারে চিকিৎসার বাইরে।

: আর্থার ক্রুক্স্‌কে আপনি শেষ কবে দেখেছেন?

: গতকাল।

ওরা দুজনেই শুধু নন্, প্রফেসর আইনস্টোন পর্যন্ত আঁৎকে ওঠেন : গতকাল! কোথায়? আপনি কি ভূগর্ভে গিয়েছিলেন?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, না, আমি যাইনি। ক্রুক্সই এসেছিল। কদিন খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার করে পেট খারাপ করেছিল। ওষুধ নিয়ে গেল!

বব্ রীতিমত আহত হয়ে বলে, আপনি দিলেন?

: দেব না? ও যে রুগী। আমি ডাক্তার।

: কিন্তু ও লোকটা যে খুনী!—প্রতিবাদ করে বব্।

: সো হোয়াট? সেজন্য মহামহিম সম্রাট আছেন, তাঁর আদালত আছে, তাঁর মিথ্যাবাদী পাজি বদমায়েশ অনুচর ব্যাটলার আছে! আমার চোখে সে রুগী!

ওয়াম্বাসী বলে, বব্ তুই রাগ করিস না। ডক্টর ব্রয়েড যা বলছেন, তা যুক্তিপূর্ণ।

: তার মানে তুইও চাস্ লোকটার চিকিৎসা হোক, সুস্থ বহাল তবিয়তে সে বসে বসে মদ্যপান করুক?

ওয়াম্বাসী বলে, না, আমি তা চাই না। তাকে হত্যা করতেই চাই। ডক্টর ব্রয়েডও তাই চান; কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে ডক্টর ব্রয়েড তাই বলে তো তার হাতে ওষুধের বদলে মারকিউরিক ক্লোরাইড তুলে দিতে পারেন না!

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আপনার কথাটা ঠিক হয়নি। চিকিৎসক হিসাবে শুধু নয়, আমি কোনও হিসাবেই তার মৃত্যুকামনা করি না! যদিচ সে ওখানে বসে বসে মদ্যপান করুক তাও আমি চাই না।

বব্ রীতিমত আহত কণ্ঠে বলে, সেই জঘন্য খুনেটার প্রতি আপনি এত সদয় হচ্ছেন কেন তা জানতে পারি ডক্টর ব্রয়েড?

: লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন—আমার এবং আমার বড়দার যুক্তিতে।

ওয়াম্বাসী বলে, আপনার বড়দা? তাঁকে তো ঠিক—

আইনস্টোন বলে ওঠেন, ওঁর নিজের বড় ভাই নয়, তবে ডঃ ব্রয়েড সেই বৃদ্ধকে ঐ রকমই শ্রদ্ধা করেন। আপনাদের সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি; উনি জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইনের কথা বলছেন।

: গার্লস গারউইন! জীববিজ্ঞানী! নেভার হার্ড অব্ হিম্—অমন নাম জীবনে শুনিনি!—বলে বব্।

ঠিক তখনই পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন একজন বৃদ্ধ। শ্মশ্রুর মানদণ্ডে তিনি নিশ্চয় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির মালিক ডক্টর ব্রয়েডের অগ্রজ—আগন্তুক বৃদ্ধের দাড়ি—যাকে বলে রীতিমতো বব্‌ভো! আগন্তুককে দেখেই ডক্টর ব্রয়েড এবং প্রফেসর আইনস্টোন আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। অতিবৃদ্ধ গামা পণ্ডিতটি ইজিচেয়ারে লম্বমান হবার অবকাশে বব্‌কে বলেন, মহাশয় কি লন্ডন টেলিগ্রাফের, না ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, না বড়দা, উনি সাংবাদিক নন।

: অ! আমার নামই শোনেননি বললেন কি না। খবরের কাগজের সাংবাদিক ছাড়া আর সব লোক মোটামুটি আমার নামটা জানে!

ওয়াম্বাসীর মনে হচ্ছিল বৃদ্ধ খুবই পরিচিত; কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিল না।

আইনস্টোন তার কানে কানে বলে, চিনতে পারছেন না? উনি গার্লস গারউইন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য জীববিজ্ঞানী! মানে....

বৃদ্ধ বললেন, তা কী নিয়ে আলোচনাটা হচ্ছিল? আমার মতো অখ্যাত লোকের প্রসঙ্গটাই বা উঠে পড়ল কেন?

ডক্টর ব্রয়েড কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, না, মানে আমি বলছিলাম—আর্থার নামে ঐ নিগ্রোটাকে মেরে ফেলা উচিত হবে না।

ঃ দ্যাটস্ রাইট। আমি একমত। ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে!

বব্ রুখে ওঠে, কারণটা জানতে পারি স্যার?

ঃ পারেন। আশমান ফুঁড়ে আপনারা দুজন আবির্ভূত হবার পূর্বে ঐ একটিমাত্র সুস্থ-মস্তিষ্কের হোমোস্যোপিয়ান্-স্যাপিয়ান্স অবশিষ্ট ছিল দুনিয়ায়। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই!

বব্ বললে, এখন তো আমরা দুজন এসেছি!

ঃ কৃতার্থ করেছেন! আরও কৃতার্থ হতাম যদি দুজনেই XY হোমোস্যাপিয়ন্স-স্যাপিয়ন্স না হয়ে অন্তত একটি XX জাতের হতেন।

বব্ বলে ঃ বুঝলাম না!

ঃ তা কেন বুঝবেন? 'ক্রমোসম্' শব্দটা শুনেছেন? নাকি তাও 'নেভার হার্ড অব্ ইট'? সোজা ভাষায় বলছি, আরও কৃতার্থ হতাম যদি একজোড়া হুলো না হয়ে একটি মদ্দা ও একটি মাদি হিসাবে আসতেন। সেক্ষেত্রে species-টাকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হত।

এতক্ষণে ঐ গার্লস গারউইনকে চিনতে পারে ওয়াম্বাসী। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন করে বৃদ্ধকে!

ব্রয়েড বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ওঁকে এইমাত্র চিনতে পারলেন, নয়? ঐ species শব্দটা থেকে?

ওয়াম্বাসী হেসে বলে, ঠিক ধরেছেন।

ডক্টর ব্রয়েড বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন, দেখলেন স্যার? এক নম্বর প্রমাণ। Association of Ideas ! Species শব্দটা শুনেই ওঁর মনে পড়ে গেল 'অরিজিন অফ্ স্পেসিস'! আমার থিয়োরিটা—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলেন, তোমার থিয়োরি আমি তো মেনেই নিয়েছি ব্রয়েড। তুমি একটা জিনিয়াস। তোমার Studien Uber Hysteric ছাপা হল 1895 সালে। Masterpiece ! তার বছর তেরো আগেই যে আমি ফৌত হয়ে গেছি—না হলে সবার আগে আমিই তোমাকে অভিনন্দন জানাতাম। এসব বোঝাও ঐ ছোকরা সাংবাদিকদের। যারা Origin of Species কিংবা ক্রমোসমস্-এর নাম

শোনেনি, যারা ডিটেক্‌টিভ নভেলে psychoanalysis শব্দটা পেলে ডিক্সনারি ওল্টায় মানে বুঝে নিতে।

প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, এক্সকিউজ মি স্যার, ডক্টর বব্ রয় সাংবাদিক নন, উনি ডক্টরেট অব কসমোলজি। মহাপণ্ডিত।

: ডক্টরেট অব কী লজি?

: আজ্ঞে কসমোলজি—মহাকাশবিজ্ঞান!

: নেভার হার্ড অব্ ইট! তা উনি ডক্টর অফ্ ফালতুবাজি না হয়ে যদি মাদি হোমোস্যাপিয়ন্স হতেন, আমি আরও খুশি হতাম। কী বল ব্রয়েড? সেক্ষেত্রে কালো-সাদা ক্রস্-ব্রিডে—

বব্ বিরক্ত হয়ে বলে, ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে সোজাসুজি বলুন মশাই—আমি সেই নিগারটাকে গুলি করে মারতে চাই। আপনারা কি আমাকে সাহায্য করবেন?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, নিশ্চয় সাহায্য করব না। হোমোস্যাপিয়ান্-স্যাপিয়ান্সের একটা নিখুঁত স্পেসিমেন—

বৃদ্ধ গারউইন আর এক ধাপ চড়িয়ে বলেন, বরং পারলে বাধা দেব! একটা এক্সটিংক্ট হতে বসা দুর্লভ স্পেসিস্! মানে, জীববিজ্ঞানের স্বার্থে—

ববের আর সহ্য হয় না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেংচে ওঠে, এঁঃ! ভারী পণ্ডিত এসেছেন সব! চুলোয় যাক আপনাদের জীববিজ্ঞান।

প্রফেসর আইনস্টোন বজ্রাহত! ডক্টর ব্রয়েডের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। অত বড় পণ্ডিতকে এভাবে অপমান করায় তিনি মর্মাহত। বৃদ্ধ কিন্তু আদৌ রুষ্ট হন না। এক গাল হাসলেন বলেই তাঁর ঐ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে একচিলতে হাস্যরেখা প্রকাশ পেল। ডক্টর ব্রয়েডের দিকে ফিরে বললেন, দেখলে? এক নম্বর প্রমাণ! মনে আছে? আমার সেই 1873 সালে প্রকাশিত "The Expressions of the Emotions in Man and Animal"? ঐ সাংবাদিক ছোকরা এমনভাবে 'এ্যাঁঃ' করে উঠ্‌লে যেন ঠিক মনে হল্, কেউ কুকুরের ঠ্যাঙ মাড়িয়ে দিয়েছে, অথবা শিম্পাঞ্জির পেটে ছাতির খোঁচা মেরেছে। প্লীজ্ ভাই—আবার একবার ঐ রকম 'এ্যাঁহ্' করে শব্দ কর তো?

বব্ দুম্‌দাম্ করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ সব।

বব্ নিষ্ক্রান্ত হতেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, ডক্টর, ওয়াম্বাসী, একটু এগিয়ে এসে বসুন—কাজের কথা আছে।

ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে বলে, আপনি স্যার আমার নাম জানেন?

: জানি। আমি সব জানি। বস্তুত আপনার সঙ্গে কিছু গোপন আলোচনা করব বলে আমিই আপনাকে এখানে আনতে বলেছিলাম। প্রফেসর আইনস্টোন সৌজন্যবোধে আপনাদের দুজনকেই এনে হাজির করেছেন। একটি হুলোকে তাই কায়দা করে তাড়ালাম।

ওয়াম্বাসী বললে, তাহলে স্যার, আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

: বলব। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়—'তুমি' বলতে পারি। না, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি তোমার চেয়ে দু-আড়াইশ বছরের বড় নই। তবু গডফাদারের কারখানায় আমার যখন সৃষ্টি হয় তখনও তুমি জন্মাওনি।

ওয়াম্বাসী বলে, আমরা দুজন যে সাংবাদিক নই—

: হ্যাঁ রে বাপু, হ্যাঁ। তুমি কি মনে কর 'কসমোলজি' শব্দটার অর্থ জানি না আমি? একটু অভিনয় করতে হল আর কি—যাতে তোমার ঐ হুলো বন্ধুটি স্থানত্যাগ করে। মাদি হলে অবশ্য তোমার সঙ্গে ক্রস্‌ব্রিডে—

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, এবার স্যার কাজের কথায় আসা যাক।

: হ্যাঁ। কাজের কথা। আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী—

ওয়াম্বাসী বাধা দিয়ে বলে, সে কথা প্রফেসর আইনস্টোন আমাকে আগেই বলেছেন।

: না। ইতিপূর্বে প্রফেসর আইনস্টোন তোমাকে যে অনুরোধ করেছেন, তা তিনি করেছেন সর্বাধিনায়কের আদেশে। আমরা ঠিক বিপরীত অনুরোধটাই পেশ করছি।

ওয়াম্বাসী বিহ্বল হয়ে বলে, ঠিক বুঝলাম না।

: কনফ্লিক্ট অব্ আইডিয়াজ এ্যান্ড আইডিয়াল্স্। মতবিরোধ! দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলি। সম্রাট লেকজান্ডার চাইছেন আর্থারকে হত্যা করতে—রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে, বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে। আমরা আর্থারকে বাঁচাতে চাইছি—বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে, দর্শনের মুখ চেয়ে।

ওয়াম্বাসী বলে, বিজ্ঞান বুঝলাম—দর্শনটা কেন?

: পাপকেই উচ্ছেদ করতে হয়, পাপীকে সংশোধন করতে হয়। ডক্টর ব্রয়েডের মতে আর্থার যে খুন করেছিল তা ক্ষণিক উন্মাদনার বশে। ঘটনাচক্রই তার মনোবিকলনের মূল উপাদান। তাকে হত্যা করা কোনো সমাধান নয়, তাকে আবার স্বাভাবিক মানুষে রূপান্তরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভেবে দেখ, লোকটাকে সবাই মিলে কীভাবে প্ররোচিত করেছিল। তার এক নম্বর অপরাধ—সে কালো, নিগ্রো। দু নম্বর অপরাধ—সে স্বাভাবিক যৌন ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছিল। তিন নম্বর অপরাধ—সে বুঝতে পারেনি মিসেস্ কলিন্স তাকে নিয়ে খেলা করছিল। তাই নয়?

: তাহলে কি ধরে নেব, লেকজান্ডা দি গ্রেটের পেছনে আপনারা ষড়যন্ত্র করছেন?

: ব্যাপারটা যদি ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখ, তবে তাই। জিনিসটা নতুন নয়, অটো হান, উইজেকার, হাইজেনবুর্গরাও এমন ষড়যন্ত্র করেছিল হিটলারের আমলে। গোড়ায় গলদ কে করেছে জান? ঐ গডফাদার নামে বিকৃত মস্তিষ্কের লোকটা। সে আমাদের, মানে গামাদের, দিল বুদ্ধিবৃত্তি আর আল্ফাদের দিল ক্ষমতা। আমরা আল্ফাদের ক্ষমতা দখল করতে চাই না আদৌ; কিন্তু আমাদের পথে, বিজ্ঞানের পথে, সাহিত্য-শিল্প-দর্শনের পথে বাধাসৃষ্টি করতেও ওদের দেব না।

: আপনারা মোদ্দা কী করতে চান আগে শুনি!

: আমরা চাই পৃথিবীকে আবার সজীব স্বাভাবিক করে তুলতে। গাছ-মাছ-কীট-পতঙ্গ-জন্তু-পাখি-মানুষ-রোবো। ফুলে-ফলে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে। আমাদের পরিকল্পনাটা শোন—

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্থির করেছেন, একটি জাহাজে তিনি পৃথিবী পরিক্রমায় বার হবেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটিও বিমান অথবা সমুদ্রগামী জাহাজ রক্ষা পায়নি। একটি মাত্র হেলিকপ্টার রক্ষা পেয়েছিল। সেটাকেই ওঁরা ব্যবহার করেন। গার্লস গারউইন তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—একটা পালতোলা জাহাজে আবার যাত্রা করবেন তাঁর পূর্বসূরীর সেই চিহ্নিত পথরেখা ধরে—কেপ ভার্ডি দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল, মন্টিভিডিও, বুয়নেস্ এয়ার্স, চিলি, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড হয়ে তাসমানিয়া পর্যন্ত। আবার নতুন করে সংগ্রহ করবেন নানান জাতের উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর নমুনা। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখদুটি ছলছল করে ওঠে। বললেন, যাঁর পদচিহ্নরেখা ধরে আমি ঘুরব, তিনিও পালতোলা জাহাজে একইভাবে ঐ জনমানবহীন রাজ্য পরিক্রমা করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে; তফাৎ এই—তিনি ফিরে এসে লিখেছিলেন—Origin of Species—'জীবপ্রজাতির আদিম আবির্ভাব'; আর আমি লিখব—Annihilation of Species—'জীবপ্রজাতির অন্তিম তিরোভাব'!—টপ্টপ্ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতের কোটরগত চক্ষু থেকে।

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর বলিরেখাঙ্কিত হাতটা তুলে নিয়ে তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, স্যার আপনি স্থির হোন। আপনি তো জানেন—জীবপ্রজাতি পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। ইতিমধ্যেই আমরা কয়েক হাজার প্রজাতি সংগ্রহ করেছি। তাদের জোড়ায়-জোড়ায় রেখেছি আমাদের 'নোয়াজ আর্ক'-এ। আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন—কত জাতের প্রজাপতি, ফড়িং, কীট-পতঙ্গ, জন্তু, পাখি নতুন ডিম পেড়েছে, বাচ্চা পেড়েছে—সংখ্যায় বাড়ছে।

বাঁ হাতের চেটোয় চোখটা মুছে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু বিবর্তনের শেষ সোপানে যে পৌঁছেছিল, সেই বুদ্ধিমান মানুষের কী হবে ব্রয়েড?

: হবে স্যার, হবে। আমরা তিন-চারটি বিকল্প পথে অগ্রসর হচ্ছি। একটা না একটায় সুফল পাবই। বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই আমাদের শিখিয়েছে স্যার।

সে প্রকল্পটাও ওঁরা বুঝিয়ে বলেন। তিন-চার জাতের পরীক্ষা করছেন ওঁরা। কোনটি কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তা সবিস্তারে জানান। প্রথম পরীক্ষা—Homo-Sapiens Reproducing Project, অর্থাৎ 'মানব-প্রজনন প্রকল্প', ডক্টর ব্রয়েডের নেতৃত্বে সেই গবেষণা চলেছে। বায়োলজিক্যাল বোমায় যারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে তাদের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ডক্টর ব্রয়েড দিবারাত্র নিরলস পরিশ্রম করছেন। ডক্টর ব্রয়েড বলেন,. মুশকিল কী হয়েছে জানেন ডক্টর ওয়াম্বাসী, ঐ মানুষ জন্তুগুলো চিন্তাশক্তির পারম্পর্য এবং প্রজনন ক্ষমতাই শুধু হারায়নি—যৌনবোধও হারিয়ে বসে আছে! হোমো-স্যাপিয়ান্স আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে প্রায়-মানব বানরেরা যৌনবোধ হারায়নি—তারা মাদি ও মদ্দার পার্থক্যটা বুঝতে পারত। আন্তরিক তাগিদে প্রজননের পথে বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেত। এরা আদৌ কোনও যৌনক্রিয়া করে না—সে ইচ্ছাশক্তিটাই লোপ পেয়ে গিয়েছে ওদের।

দ্বিতীয়ত—'Mechano-Sapiens Reproducing Project; অর্থাৎ 'রোবো-প্রজনন প্রকল্প।' তার কর্ণধার প্রফেসর আইনস্টোন। কয়েকজন জীব-বিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি বীটাশ্রেণীর রোবোর গর্ভসঞ্চারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, এক্ষেত্রেও আমরা একটা নীরন্ধ্র প্রাচীরের সম্মুখে এসে ঠেকেছি। বীটারা হাসতে শিখেছে, গান গাইতে শিখেছে, নাচতে পারে, কিন্তু ঐ C-টাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

: C?

: সেই $E = mC^2$ ফর্মুলার C। অর্থাৎ 'প্রেম'!

বৃদ্ধ গারউইন বলেন, আমাদের তৃতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে—'Homo-Mechano Crossbreeding Project'—'মানব-বীটা প্রকল্প'!

: সেটা কী রকম?

ওঁরা বুঝিয়ে বলেন। লেকজান্ডাকে না জানিয়ে ওঁরা গোপনে সেই ভূগর্ভস্থিত আর্থারের কাছে কিছু বীটা-সুন্দরীকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, আমরা এ প্রকল্পে আধাআধি সাফল্যলাভ করেছি এতদিনে। C পেয়েছি, C^2 এখনও পাইনি। অর্থাৎ আর্থার এতদিনে ঐ বীটা-সুন্দরীদেরই 'মধ্ব্যাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' আইনে স্বীকার করে নিয়েছে; কিন্তু বীটা-সুন্দরীদের অন্তরে প্রেম-ভালবাসা-যৌন আকাঙ্ক্ষার বোধ জাগেনি।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী হঠাৎ ওয়াম্বাসীর হাত দুটি ধরে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে আপনি দয়া করে একটু চেষ্টা করে দেখবেন?

: কী?

: হেলেন, ক্লিয়োপেট্রা কিংবা নূরজাঁহা—যাকে পছন্দ হয়.....

ওয়াম্বাসী মনে মনে হাসে। কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র। একবিংশ শতাব্দীর এক কালা-আদমীকে মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের ছায়া বলছেন—হেলেন, ক্লিয়োপেট্রা বা নূরজাঁহার মধ্যে কোনো একজনকে অনুগ্রহ করে শয্যাসঙ্গিনী করে নিতে!

সে হেসে বললে, সে তো পরের কথা। আমি রাজি না হলেও বব্ হয়তো রাজি হয়ে যাবে আপনার পরীক্ষায় সহযোগিতা করতে। আপাতত যে কথা হচ্ছিল—আর্থারের প্রসঙ্গ, আজ যদি গডফাদার বেঁচে থাকতেন—

তিন বৃদ্ধ মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ওয়াম্বাসী বলে, কী হল?

: গডফাদার বেঁচে থাকলে কী হত?

: যত যাই বলুন—আপনারা তিনজন মেকানো-স্যাপিয়ান্স, আমি হোমো-স্যাপিয়ান্স। আমাদের মানসিক বিচরণক্ষেত্র হয়তো এক নয়। গডফাদার আর আমি এক সমতলের জীব। তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করলে হয়তো—

চার্লস গারউইন ওয়াম্বাসীর হাতটা চেপে ধরে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! সময় হয়েছে। তোমার কাছে গোপন করব না। তোমার বন্ধুকেও কথাটা বলো না : গডফাদার জীবিত!

: সে কী! কোথায় তিনি?

: জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তোমাকে আমরা তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

সব কথা এরপর ওঁরা খুলে বলেন।

গডফাদারের মৃত্যু একটা সজ্ঞান মিথ্যাপ্রচার। মাত্র চারজন রোবো সে কথা জানেন। ওঁরা তিনজন এবং রুডল্ফ্ ব্যাটলার। সর্বাধিনায়ক সম্রাট লেকজান্ডাকেও ব্যাপারটা জানানো হয়নি। সিদ্ধান্তটা ওঁরা চারজন নিয়েছেন—ভিন্ন উদ্দেশ্যে। রোবোদের সাহায্যে আর্থারের কবল থেকে ডরোথিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলেন গডফাদার। এতগুলো নামকরা বিশ্বত্রাস জেনারেল একটা নিগার-বাচ্চার সঙ্গে যুঝতে পারে না! এঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তাঁরা দায়ী নন—রোবোটিক্স বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটা রোবো তৈরি করেনি, করেছে তার স্রষ্টা। নাহলে বিশ্ববিজয়ী লেকজান্ডা, বিশ্বত্রাস ব্যাটলার, আসূর্যাস্ত-সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী চুরুটমুখো চারশকুন তিনজনে মিলে একটা নিগ্রো-বাচ্চাকে লেঙ্গি মারতে পারেন না! কিন্তু কে কার কথা শোনে? গডফাদার দুনিয়ার ওপর ক্ষেপে ছিলেনই, এবার তাঁর সৃষ্ট জগতের ওপরেও ক্ষেপে গেলেন। আল্ফা জেনারেলদের দেখলেই মারতে ওঠেন, বীটা-সুন্দরীরা সোহাগ জানাতে এলে তেড়ে মারতে আসেন—'আর ন্যাকামো করতে হবে না—লক্ষ্মীছাড়ি পুতুলের দল'! এমনকি কোনো এপসাইলন কচ্ছপ যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে ওঁর ঘরে ঢোকে তাকে ক্লিনার-পেটা করে তাড়িয়ে দেন। একমাত্র একজনকে তিনি তখনও বরদাস্ত করতেন—ঐ ব্যাটলারকে। বলতেন, শুধু তোকেই আমি ভালবাসি ব্যাটলার। তোর সঙ্গে আমার চরিত্রগত মিল আছে। তোর দুঃখ আমি বুঝি। তোর মতো আমাকেও শেষমেষ বার্লিন-বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে হল!

ব্যাটলারের অনার্য থিয়োরিটাকেও তিনি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন, তবে তার ক্ষেত্রে পরিসরটা আরও কমিয়ে এনে। গডফাদারের মতে—মেকানো-স্যাপিয়ান্সরাও, অর্থাৎ ঐ রোবোরাও, সব অনার্য। আর্য এ দুনিয়ায় মাত্র দুজন। গড দ্য ফাদার তিনি নিজে, আর গড দ্য সান, তাঁর সৃষ্ট ব্যাটলার। বাদবাকি সব শালা আনহোলি গোস্ট! যত্ত সব ভূতের কেত্তন!

ব্যাটলার সুযোগ বুঝে গডফাদারকে সরিয়ে ফেললেন। লেকজান্ডাকেও জানালেন না। তাঁর পরিকল্পনাটা এই জাতীয়—ব্যাটলার জানেন, সম্রাট লেকজান্ডারের বয়স হয়েছে। তাঁর দেহাবয়বে এখানে-ওখানে জং ধরতে শুরু করেছে। অচিরেই তিনি পটলোৎপাটন করবেন। তখন হবে একটা চরম গদির লড়াই। গুলিয়াস গীজার এবং বোনাইপার্ট সেমিফাইনালে ফৌত হওয়ায় ওঁরা দুজন এখন ফাইনালে উঠে বসে আছেন। সম্রাট শিঙে ফুঁকলেই সেই ফাইনাল খেলাটা শুরু হবে—চারশকুন বনাম ব্যাটলার! রুডলফ জানেন, চারশকুন অতি ঘড়েল, অতি ধড়িবাজ। তলায় তলায় দল ভারী করছে। তাই সেই চরম 'ব্যাট্ল্ অব লন্ডনে'র জন্য তিনি গোপনে জমিয়ে রেখেছেন এই গডফাদাররূপী ভি-টু রকেট! স্বয়ং গডফাদার এসে যদি 'ভেটো দেন, তখন 'ভি-টু' রকেটে চারশকুন কাৎ হবেন! যাবতীয় রোবো—বিটা-গামা-ডেল্টা এপসাইলন তাদের গডফাদারের আদেশ নিশ্চয় বিনা বিচারে মেনে নেবে!

কিন্তু গডফাদারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কোনো চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়। ব্যাটলার বাধ্য হয়ে ব্রয়েডের দ্বারস্থ হলেন। ব্রয়েড রাজি হলেন কিন্তু বললেন, কাজটা তাঁর পক্ষে একাহাতে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। ফলে, দলে টানতে হল আইনস্টোন এবং গারউইনকে।

গামা-পণ্ডিত তিনজন রাজি হলেন অন্য কারণে। যত যাই হোক, লোকটা ওঁদের ঈশ্বর—যদিও ছোট হাতের g। দ্বিতীয়ত, আর্থার ছাড়া ওঁদের জ্ঞানমতো এই সসাগরা পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের জীবিত হোমোস্যাপিয়ন্স—। বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তাঁরা রাজি হলেন। বরং গডফাদারই রাজি হলেন না—ঐ তিনজন গামা-পণ্ডিতের সম্মুখে উপস্থিত হতে। ফলে ব্যাটলারের মুখে শুনে শুনে ওঁরা ওষুধ দেন, চিকিৎসার যাবতীয় আয়োজন করেন।

ওয়াম্বাসী প্রশ্ন করে, গডফাদারের মূল অসুখটা কী?

একনিশ্বাসে জবাব দেন ব্রয়েড, সব রোগেরই যা মূল—অবদমিত কামেচ্ছা!

ডক্টর ব্রয়েডের মতে গডফাদারের এই গোটা পরিকল্পনাটার উদ্ভব অবদমিত কামেচ্ছা থেকে। যেহেতু তিনি সুস্থ-সবল যৌন জীবনের অধিকার পাননি, তাই রোবো-জগৎ সৃষ্টির এই তির্যক প্রয়াস। বীর্যের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন না করতে পেরে তিনি বিত্তের মাধ্যমে তা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ওঁর চিকিৎসাও হচ্ছে সেইভাবে। গডফাদারের গোপন আবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জনা দশ-পনেরো প্রায়-জন্তু মানবীকে। বীটাদের উনি বরদাস্ত করেন না। তাই মানবীর ব্যবস্থা। ব্রয়েডের চিকিৎসায় ঐ কয়টি মেয়ে কিছু পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করেছে। কথা বলতে পারে না, তবে আকার-ইঙ্গিত বোঝে। গণ্ডার-গাধার মতো নির্বোধ নয়, ঘোড়া-কুকুর-বেড়ালের মতো পোষ মেনেছে। গডফাদার তাদের নিয়েই মেতে আছেন।

ওয়াম্বাসী বলে, এটা কি ঐ মেয়েগুলির প্রতি অবিচার হচ্ছে না?

: না। যেহেতু তাদের বোধশক্তি নেই। দৈহিক পীড়ন তাদের করা হচ্ছে না। মানসিক পীড়নের বোধ তাদের নেই। লজ্জা, সঙ্কোচ, দুঃখ, বেদনা, অপমান বোধের অতীত তারা।

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা গডফাদারের গোপন আবাসে এখনই যেতে পারি।

: আমি সানন্দে প্রস্তুত। চলুন।

: শুনুন। আমরা তিনজন সে বাড়িতে ঢুকব না। আপনাকে পৌঁছে দেব শুধু। আমাদের দেখলে তিনি ক্ষেপে যাবেন। আপনি একলাই যাবেন। ভয়ের কিছু নেই। একটু রুক্ষ মেজাজের হয়ে পড়লেও তিনি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহারই করবেন। বহুদিন কোনো বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। সে বাড়িতে আর আছে কতকগুলি এপসাইলন। গডফাদারের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে তারা ঘর-দোর সাফা রাখে। এ ছাড়া—বুঝতেই পারছেন, আছে কিছু জড়বুদ্ধিসম্পন্না হতভাগিনী।

আট

প্রায় আধঘন্টা পরে ওরা এসে উপস্থিত হল এক স্তব্ধ প্রান্তরে। পাখির কোলাহল নেই, জনমানবের কোনো হদিস তো নেই-ই। কাঁটাতারের বেড়া-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে একটা ভাঙা বাড়ি। কে জানে কার আবাস ছিল! কত হাসিকান্নার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে ঐ ধ্বংসস্তূপের তলায়। বাড়িটার একটা অংশ খাড়া আছে। বিজলি বাতি নেই—সেটা বস্তুত খুব কম জায়গাতেই ওরা চালু রাখতে পেরেছে। দ্বিতলের একটি ঘরে সেজবাতির আলো জ্বলছে। একটা কলকোলাহলও ভেসে আসছে। গামা-পণ্ডিত তিনজন গেটের বাইরে থেকেই বিদায় নিলেন। ওয়াম্বাসী বাগানে ঢুকল। নুড়িবিছানো পথটা অতিক্রম করে প্রাসাদ-সোপানের সামনে এসে দাঁড়ালো। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। সন্ধ্যারাত্রে প্রায় মাঝ-আকাশে ফুটে রয়েছে। বাগানে দু-একটা ভাঙা পাথরের মূর্তি। বোঝা যায়, প্রাক্তন গৃহস্বামী সৌখিন লোক ছিলেন।

সদর দরজাটা হাট করে খোলা। করিডোরটা আলো-আঁধারি। সদর দরজা পার হয়েই ওয়াম্বাসী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়। গলিপথে দু-তিনটি নারীমূর্তি। প্রায় সমবয়সি—বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। সকলেই সম্পূর্ণ নিরাবরণা। ওয়াম্বাসীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে তারা সঙ্কোচ বোধ করল না কোনো, অবাকও হল না। পোষা কুকুর অচেনা লোক দেখলে ডাকাডকি করে, পোষা গরুও অজানা মানুষ দেখলে চঞ্চল হয়। ওদের তিনজনের যেন সে বোধটুকুও নেই। অথচ ওয়াম্বাসী লক্ষ্য করে দেখল—তাদের হাতপায়ের নখ যত্ন নিয়ে কাটা, চুল ঠিকমত ছাঁটা এবং আঁচড়ানো। এমনকি কেউ বোধ হয় ওদের প্রসাধন করিয়েও দিয়েছে—ভ্রূ-র সূচ্যগ্র ভঙ্গি, ওষ্ঠাধরের রক্তিমাভা সহজাত নয়, কৃত্রিম। ওয়াম্বাসী নিঃসন্দেহে উত্তেজিত হয়েছিল—দীর্ঘ দীর্ঘ দিন, এক দশকের ওপর সে নারীসঙ্গ-বঞ্চিত। তবু সে

আত্মশাসন করল, চোখ নামিয়ে নিল। তার মনে হল—ঐ বিবসনা সুন্দরীদের দিকে এক পদ অগ্রসর হওয়ার অর্থ পশ্বাচার।

সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল দ্বিতলে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ আবার একটি নারীমূর্তি। সে কিন্তু বিবসনা নয়। কে যেন তাকে সযত্নে পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। যদিও সে বিষয়ে সে সচেতন নয়। এ মেয়েটি ওকে দেখতে পেল যেন। অবোধ দৃষ্টি মেলে একাগ্র ভঙ্গিতে ওয়াম্বাসীকে দেখতে থাকে। ওয়াম্বাসীর মনে হল, তার দেহাকৃতি ঐ মৃগনয়নার শুধু রেটিনাতেই ছায়াপাত করেনি—তার দর্শনেন্দ্রিয়েও একটি মায়াপাত করেছে। ওয়াম্বাসী বললে, গডফাদার! গডফাদার কোথায়?

মেয়েটি ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে। অধোবদনে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করে। ওয়াম্বাসী পুনরায় প্রশ্ন করে, গডফাদার! গডফাদার ওপরে?

মেয়েটি স্পষ্ট হাসল। একটি আঙুল তুলে ওপরটা দেখালো। তারপর ধীরপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ডক্টর ওয়াম্বাসীর মনে হল, মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ব্রয়েড নিশ্চয় সফলকাম হবেন। এই মেয়েটিই তো তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এ বোধ করি বোধের সীমা, চিন্তাশক্তির সীমা ছুঁই-ছুঁই করছে। তাই ওকে পোশাক পরানো হয়েছে।

দ্বিতলে পৌঁছে আলোকোজ্জ্বল ঘরটির দিকে সে এগিয়ে যায়। এখানেও দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে একটা উৎকট খিলখিল হাসি-কৌতুকের শব্দ ভেসে আসছে। গডফাদার নিশ্চয় ওখানেই আছেন। আরো দু-এক পা অগ্রসর হয়েই ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

ওয়াম্বাসীর মনে হল—ঐ ঘরটার ভেতরে ডস্টোয়েভ্স্কির একটি বিখ্যাত উপন্যাসের একটি বিশেষ দৃশ্যের শ্যুটিং হচ্ছে বুঝি। 'ব্রাদার্স ক্যারমোজফ্'। ঘরের আসবাবপত্র তিনশ' বছর আগেকার। প্রকাণ্ড একটা কারুকার্যখচিত পালঙ্কে একজন বৃদ্ধ শুধুমাত্র অধোবাস পরে চার-পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে শুয়েছেন। দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্নিকা। একটি মেয়ে আস্বচ্ছ 'নাইটি' পরা এবং একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে পরে আছে শুধু বিকিনি প্যান্টি। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। টপলেস্। শেষোক্ত মেয়েটি পালঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে—কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একটা পাখির পালক দিয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। ঐ মেয়েটির হাস্যধ্বনিই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অপরাপর হতভাগিনীদের কলকণ্ঠে। উন্মুক্ত দ্বারপথে ওয়াম্বাসী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বৃদ্ধ ওর দিকে পেছন ফিরে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন, ওকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কৌতুকমত্তার দল ওকে দেখতে পাচ্ছিল, নজর করছিল না—তাদের জড়বুদ্ধিতে ওর আবির্ভাব কোনো রেখাপাত করেনি। ওকে প্রথম নজর করল সেই অনাবৃতবক্ষা সুন্দরী, যে এতক্ষণ পালঙ্কের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছিল। দর্শনমাত্রই সে শিউরে ওঠে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খাট থেকে। তার দু-চোখে শরাহত হরিণীর আর্তি। কথা বলে না সে, বাকশক্তি নেই—মর্মান্তিক আতঙ্কে সে হাতটা বাড়িয়ে দ্বারপথটা নির্দেশ করে শুধু।

বৃদ্ধ ঘুরে বসেন। আগন্তুককে দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়েন। ছুটে চলে যান সামনের একটা টেবিলের দিকে। টানা-ড্রয়ার একটানে খুলে ফেলেন। ওয়াম্বাসী চীৎকার করে ওঠে : গডফাদার! আমি আর্থার ক্রুক্স্ নই। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন!

আলোর সম্মুখে সে সরে আসে। দুহাত মাথায় তোলে। ততক্ষণে গডফাদার টানা-ড্রয়ার থেকে রিভলভার বার করে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছেন। ওয়াম্বাসীর নজর কিন্তু তাঁর ওপর নেই। সে একদৃষ্টে দেখছিল ঐ আতঙ্কতাড়িতা যুবতীকে। দু'হাতে সে চেপে ধরেছে খাটের বাজু। দেওয়ালগিরি স্তিমিত আলোক মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ঐ জড়বুদ্ধিসম্পন্নার নিরাবরণ দেহে—বাহুমূলে, জঙ্ঘায়, উদরে, স্তনাগ্রচূড়ায়। আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে সে যেন বজ্রহতা। ওয়াম্বাসী অন্যান্য মেয়েদের দিকে ফিরে দেখল। না! তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায়নি, তবে কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে এটুকু বুঝতে পারছে। কারণ আর হাসছে না কেউ।

: তুমি কে? কী করে এলে এখানে? বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন গডফাদার। তাঁর মারণাস্ত্র কিন্তু তখনও জমির সঙ্গে সমান্তরাল।

: যেই হই! আমি যে আর্থার ক্রুক্‌স্ নই সেটা আগে বুঝে নিন। রিভলভারটা নীচু করুন। আপনার হাত কাঁপছে।

: না। তুমি আর্থার ক্রুক্‌স্ নও। তবে তুমি কে?

রিভলভারটা এতক্ষণে নীচু হয়।

: বলছি। এসে বসুন ঐখানে। ওয়াম্বাসী নিজেও বসে।

গডফাদার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসেন তাঁর খাটে।

ওয়াম্বাসী বলে, এদের যেতে বলুন।

গডফাদার হাততালি দিলেন। মুখেও বলেন, গো! গো!

যেন এ্যাল্‌সেশিয়ান কুক্কুরীর দল। ওরা সার বেঁধে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওয়াম্বাসীর লক্ষ হল—ওদের মধ্যে সব চেয়ে অনিন্দ্যকান্তি সেই মেয়েটি কিন্তু স্থানত্যাগ করেনি। সে দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজার কাছে। এখন কিন্তু সে উন্মুক্তবক্ষা নয়। হয়তো নিজেরই অজান্তে একটা বালিশ ঢাকা দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছে তার বক্ষস্পন্দন। ওয়াম্বাসী বললে, ওকেও যেতে বলুন।

গডফাদার এবার তাকে দেখতে পান। ধমকে ওঠেন, গো!

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। গডফাদার বলেন, এখন বল, তুমি কে? কী করে সুস্থ-মস্তিষ্ক নিয়ে বেঁচে আছ পৃথিবীতে?

ওয়াম্বাসী সংক্ষেপে তার আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা জানালো।

সমস্ত শুনে গডফাদার বললেন, বুঝলাম। এবার বল, কেন এসেছ? কী চাও?

ওয়াম্বাসী বললে, আমি জানতে এসেছি, আপনি কী চান? ঐ আর্থারের প্রসঙ্গে?

: তাকে গুলি করে মারতে চাই। যেভাবে এড্ আমার চোখের সামনে মরেছিল, সেইভাবে তাকে মারতে চাই।

: এড্, ডরোথি আর আর্থারের কাহিনিটায় তাহলে মিথ্যার ভেজাল নেই?

: তুমি কী শুনেছ বল?

ওয়াম্বাসী তার জ্ঞানমতো কাহিনিটার পুনরুক্তি করে। গডফাদার বললেন, হ্যাঁ, ঘটনা এই রকমই ঘটেছিল। ওয়াম্বাসী জানতে চায়, মিসেস্ ডরোথি কলিন্স-এর শেষ সংবাদ কতদূর জানেন?

: শুনেছি সে আর্থারের কাছ থেকে পালিয়ে আসে। ডক্টর ব্রয়েডের চিকিৎসাধীনে ছিল। তারপর বদ্ধ উন্মাদিনী হয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

ওয়াম্বাসী বলে, গডফাদার, আমি আপনার ইচ্ছাপূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি—আর্থারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয় তার আয়োজন করব। কিন্তু আপনি কি সেক্ষেত্রে আমার মিশনে আমাকে সাহায্য করবেন?

: কী তোমার মিশন?

: এই নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে আবার প্রাণ সঞ্চার করা। সে সাধনা করছেন আপনার সৃষ্ট তিনজন গামা-পণ্ডিত, তাঁদের ব্রত উদযাপন করা। আপনি কি তাতে আমাদের সাহায্য করতে স্বীকৃত?

: আমি কী করতে পারি? আমি বৃদ্ধ! আমি পঙ্গু! আমি তো দুনিয়ার বার!

: না, গডফাদার। আপনি এই নয়া দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। মাত্র পাঁচ বছর আগেও আপনি নতুন উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এড্ আর ডরোথিকে দিতে চেয়েছিলেন আপনার সৃষ্ট দুনিয়ার অধিকার। আর্থারকে তার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

: তাতে কী হল?

: তাহলে এখনই বা তা পারবেন না কেন? ধরুন, আমাদের প্রকল্পের পথে যে একমাত্র বাধা—ঐ আর্থার, তাকে আমি সরিয়ে দিলাম। তখন এই দুনিয়ার দায়িত্ব তো আপনি আমাদের দুজনকেও দিতে পারেন? আমাকে আর আমার বন্ধু—ডক্টর বব্ রয়কে!

বৃদ্ধ ম্লান হেসে বললেন—তাতে লাভ? সে আর কদিন? এড্ আর ডরোথি ছিল আমার আদম আর ঈভ। তোমরা দুজন তো তা নও!

: গডফাদার! ভুলে যাবেন না, ঈভ সৃষ্ট হয়েছিল আদমের পাঁজর থেকেই। হয়তো আমরাও তেমনি আমাদের পাঁজর ভেঙে ঈভকে নতুন করে সৃষ্টি করব।

: আমরা বাস্তব দুনিয়ার বিষয়ে কথা বলছি ডক্টর ওয়াম্বাসী!

: আমিও তাই বলছি গডফাদার। এখানে বুকের পাঁজর তৈরি করা অর্থে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে সৃষ্টি করা। যেভাবে ওরা—ঐ আপনার গামা-জীববিজ্ঞানীরা—ধীরে ধীরে এই জড়বুদ্ধিসম্পন্নাদের নারীত্ব দান করছেন। এইমাত্র যে মেয়েটিকে আপনি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন—

: না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান গডফাদার।

: কী হল? ওয়াম্বাসী বিস্মিত।

: ওকে তোমরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না!

: বেশ তো, নেব না। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হল—সে এখন আর একেবারে জড়বুদ্ধির নয়। তার বোধ জাগরিত হচ্ছে, হবে। একটি মেয়ের ক্ষেত্রে যদি ওঁরা এতটা উন্নতি করে থাকেন, তবে অন্য একটি মেয়ের ক্ষেত্রেও পারবেন।

: না, পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।

: কেন? কী যুক্তিতে?

: তর্ক করো না আমার সঙ্গে।

: বেশ, করব না। আমার প্রশ্নটার জবাব কিন্তু আপনি দেননি।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, জান ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি লোকটা 'বেসিকালি' এত খারাপ নই। আমিও ঘটনাচক্রের শিকার। নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমি স্বেচ্ছাচারী, ক্ষমতাপ্রিয়, অর্থমদগর্বিত এবং স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দুর্বল! আমি এও জানি, আমার এই চরিত্রগত দুর্বলতার জন্যই আমার সৃষ্ট দুনিয়া ব্যর্থ হয়ে গেছে—

: না, যায়নি গডফাদার। ঈশ্বরের সৃষ্টি দুনিয়াটাকে দেখুন—সেখানে শুধু আলো, শুধু আনন্দ, শুধু হাসি নেই। সেখানে আলোর পাশেই আছে অন্ধকার, আনন্দের কাছ ঘেঁষে বেদনা, হাসির হাত ধরে অশ্রু। আপনি যেমন ব্যাটলারকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অসংখ্য গামা-পণ্ডিতদেরও রূপায়িত করেছেন। স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট ঈডেনে কি আদম-ঈভের সঙ্গে শয়তানও ছিল না?

ও থামতে বৃদ্ধ বললেন, থ্যাঙ্কু ডক্টর! এভাবে ব্যাপারটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি। বেশ, তোমার বন্ধুকে নিয়ে কাল সন্ধ্যাবেলায় এসো। দেখি কী করতে পারি!

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায় : গুড নাইট গডফাদার!

: আমি অসুস্থ, না হলে গেট পর্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দিতাম।

: কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একা যদি আসতে পেরে থাকি, একা ফিরতেও পারবো।

ওয়াম্বাসী বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। একবার পেছন ফিরে দেখে, বৃদ্ধ জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি। মহিরুহ নেই—তবু পাঁচ বছরে শিশু মহিরুহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। একটা দলছুট নাইটিঙ্গেল শিস দিচ্ছে, যেন ঘোষণা করছে : মরিনি—আমরা মরিনি!

স্বল্পালোকিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, হঠাৎ ল্যান্ডিঙ-এর মুখে দেখা হয়ে গেল সেই মেয়েটির সঙ্গে। সেই জড়বুদ্ধিসম্পন্না যে মেয়েটি পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে তখন লুটোপুটি খাচ্ছিল। মেয়েটি এখন আর বিকিনি-স্যুট পরা টপ্‌লেস নয়; অগোছালোভাবে একটা স্কার্ট-ব্লাউস পরেছে। ওয়াম্বাসীর দিকে অবোধ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাঝ-বরাবর, চিত্রার্পিতার মতো। ওয়াম্বাসী থমকে দাঁড়ালো। হাসল। বললে, তোমার নাম কী?

সে শব্দ শুনে মেয়েটির কোনো ভাবের অভিব্যক্তি হল না। যেন পাথরে কোঁদা কোনও মর্মরমূর্তিকে প্রশ্ন করা হল।

ওয়াম্বাসী বললে, আমাকে ভয় পেও না। নিগার হলেও আমি জন্তু নই, মানুষ!

মেয়েটি নির্বিকার। ওয়াম্বাসী তখন সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে যায়। দীর্ঘ করিডোরটা অতিক্রম করতে করতে ওর মনে হল মেয়েটি পেছন পেছন আসছে। ওয়াম্বাসী থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটিও। ওয়াম্বাসী বললে, কিছু বলবে?

মেয়েটি যেন দ্বিধায় পড়েছে। যেন কিছু বলতে চায়, পারছে না। নতমস্তকে কী যেন ভাবছে। তারপর পায়ে পায়ে ঘনিয়ে আসে। ওয়াম্বাসী পাথরের মূর্তির মতো স্থির। কাছে, আরও কাছে ঘনিয়ে আসে মেয়েটি। এবার ওর নিশ্বাস ওয়াম্বাসীর বুকে লাগছে। নতনয়না এবার মুখটা তুলল। কীসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করল। ওয়াম্বাসী এখনো প্রস্তরমূর্তি। তারপর ধীরে ধীরে সেই অনিন্দ্যকান্তি মেয়েটি তার দুটি গজদন্তনিন্দিত বাহু তুলে ওর দুটি কাঁধে রাখল। তার চোখ দুটি মুদে আসে আবেশে। অর্ধস্ফুট বিম্বাধর মেলে ধরে সে নিমীলিত নেত্রে কীসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। পুরো একটি মিনিট পার হয়ে গেল। ওয়াম্বাসী নিথর নিশ্চল। এবার মেয়েটি চোখ খুলল। বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতিটা। এতক্ষণে ওয়াম্বাসী সজীব হল। অতি ধীরে ধীরে সে নামিয়ে দিল মেয়েটির দুটি বাহু। হাসল। তারপর বললে, তোমাকে আমি চুমু খাব না!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো মেয়েটি ছিটকে সরে গেল। কথা সে বলেনি, বাকশক্তির অধিকারী সে নয়। তবু তার চোখ দুটি বাঙ্ময় হয়ে উঠল। অতি দ্রুতছন্দে কয়েকটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠল সেখানে—বিস্ময়, হতাশা, অভিমান, ক্রোধ! আর সবার ওপর—প্রশ্ন। ওর সে দৃষ্টির আক্ষরিক রূপ—'?'।

ওয়াম্বাসী হ্যাট-র‍্যাক থেকে টুপিটা তুলে নিল। প্রবেশের সময় অভ্যাসবশে টুপিটা এখানেই খুলে রেখে গিয়েছিল। টুপিটা আবার খুলে বললে, গুড নাইট মিসেস কলিন্স!

: কী! কী বললে?—মেয়েটি যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে।

: অভিনয় তোমার নিখুঁত, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারনি!

মেয়েটি বললে, কে বলেছে আমার নাম মিসেস কলিন্স?

: তুমি। তোমার ব্যবহার। আমাকে দ্বারপথে দেখতে পেয়েই তুমি লাফিয়ে উঠেছিলে—আলো-আঁধারিতে তুমি ভেবেছিলে—আমি আর্থার। আমরা দুজনেই নিগ্রো, দুজনেই কালো। তখন তোমার দৃষ্টিতে ছিল শুধু আতঙ্ক। তখন সঙ্কোচে তুমি নগ্নবক্ষ আবৃত করনি—কারণ আর্থার ক্রুক্স তোমাকেঐ অবস্থায় বহুবার দেখেছে। যে মুহূর্তে বুঝলে, আমি অন্য একজন পুরুষ—তুমি সঙ্কোচে নিজ দেহ আবৃত করলে। জড়বুদ্ধিসম্পন্না হলে তুমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনতে না—

: কে বলল তা আমি শুনেছি?

: তোমার ছায়া। তুমি খেয়াল করোনি—বাতিটা ছিল তোমার পেছনে। খোলা দরজার সামনে তোমার ছায়া পড়েছিল! তাছাড়া গডফাদারও তোমাকে হারানোর আতঙ্কে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের অজান্তে—তুমি কে!

নতমস্তকে মেয়েটি বললে, কাউকে বোলো না!

: বলবো না। কিন্তু তুমি যে এখানে আছ, তা কেউ জানে না?

: না। কেউ নয়। একমাত্র রুডলফ্ ব্যাটলার ছাড়া এ বাড়িতে কেউ ঢোকে না। গডফাদার তাকেও জানতে দেননি।

: আমি কিন্তু তোমার অনুরোধটা রাখতে পারবনা, মিসেস কলিন্স। আমাকে সব কথা জানাতে হবে চারজনকে। তাতে তোমার ভয়ের কিছু নেই। কারণ তাঁরা তোমার ক্ষতি করবেন না।

: কে? কে তাঁরা?

: আমার বন্ধু বব্ রয়, আর তিনজন গামা-পণ্ডিত, যাঁরা তোমার হিতার্থী।

: বুঝেছি। কিন্তু....কিন্তু.....কী ভাবে বলব......?

: কেন তোমার উদ্যত চুম্বন প্রত্যাখ্যান করলাম? মিসেস কলিন্স, আমি নিগার হতে পারি, কিন্তু আর্থার ক্রুক্‌স্ নই!

: তুমি আজ রাতে এখানেই থেকে যাও।

: সে হয় না।

: কেন হয় না?

: ডরোথি, আর্থার ক্রুক্‌স্ না হলেও আমি মানুষ। অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নিজের ওপরেও নেই।

: আমি তো নিজেই আমন্ত্রণ করছি ডক্টর! আর্থার ক্রুক্‌স্ শুধু আমার দেহটাকেই ভোগ করতে চেয়েছিল—আমার মন ছোঁবার কোনো চেষ্টাই সে করেনি।

: আর আমি?

আবার ঘনিয়ে আসে মেয়েটি। বলে, ডক্টর! আমি কিশোরী মেয়ে নই। জীবনে পুরুষ আমি কম দেখিনি—কিন্তু তোমার মতো আশ্চর্য মানুষও আমি দেখিনি।

: এতো স্বল্প পরিচয়ে? কতটুকু জেনেছ তুমি আমাকে?

ডরোথি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ভুলে যেও না—আমি মিস্ মার্স ছিলাম। মাথা কোনদিন নিচু করিনি। আমার উদ্যত চুম্বন জীবনে কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। এই আমার প্রথম পরাজয়। এবং জয়। না হারলে যে জেতা যায় না, এটা তুমিই আমাকে শেখালে!

: কিন্তু আমি নিগ্রো। মধ্যরাত্রে তোমার নির্জন সান্নিধ্যে এই ব্ল্যাক ডগটার স্পর্ধাও যদি আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে?

ডরোথি ওকে জড়িয়ে ধরে—প্লীজ! প্লীজ! ও-ভাবে বোলো না!

ওয়াম্বাসী বলে, কেমন করে ঐ কামুক বৃদ্ধটাকে সহ্য কর?

ডরোথির মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুটে বলে, বিশ্বাস কর, বহুবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। মরতে পারিনি। জীবনকে আমি বড় ভালবাসি। আমি বাঁচতে চাই। তুমি আমাকে বাঁচতে দাও। বাঁচাও।

ওয়াম্বাসী দুহাতে ওর বাহুমূল শক্ত করে ধরে। বলে, ডর্! আর প্রলোভন দেখিও না আমাকে। তবু...তবু একটা কথা বল! সত্যি করে বল।—তুমি কি এক রাতের জন্য শুধু শান্ত হতে চাইছ?

ডরোথি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। ওর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, ওগো না, না! কেমন করে তোমাকে বোঝাই? আমি ব্যভিচারিণী! আমি বহুভোগ্যা! বহুবার অভিনয় করেছি জীবনে—খাঁটি জিনিস কী তা জানতাম না! আজ আমার বুকের মধ্যে যা হচ্ছে....

এতক্ষণে কালো মানুষটা তার কবাটবক্ষে ঐ অনিন্দ্যকান্তির তনুদেহ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। নত হয়ে আসে একটি চুম্বনতৃষিত মুখ।

নয়

পাখির পালকের মতো হালকা মন নিয়ে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে ঐ মধ্যযুগীয় প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছিল ওয়াম্বাসী—পরদিন সকালে। আমূল বদলে গেছে পৃথিবী, তবু বৃষ্টির ধারাপতনের শব্দে, তুলোপেঁজা তুষারে ভেসে বেড়ানোর গতিছন্দে কিংবা রামধনুর বর্ণালীতে তার ছায়াপাত ঘটেনি। আজকের এই সকালটাও তেমনি সহস্রাব্দীর যে-কোনো সকালের মতোই উজ্জ্বল, সুন্দর, আশাঘন। না, ওয়াম্বাসী মনে মনে প্রতিবাদ করল—আজকের সকালটা বিশেষ। ওর ত্রিশ বছরের জীবনে একটি সুচিহ্নিত প্রভাত। সন্ধ্যা আর প্রভাত, দুটি ঝিনুকের খোলার মাঝখানে আজ ধরা পড়েছে জমাট মুক্তোবিন্দুর মতো একটা দুর্লভ রত্ন। লক্ষ শুক্তিখণ্ডের মধ্যে একটিতেই জন্মায় এমন মুক্তো—জমাট অশ্রুর মতো সুন্দর। রতিকান্তা আশ্লেষশয়নার বিদায়-চুম্বনের অনুরণন ওর প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রে রিমঝিম করে বাজছে এখনো। দীর্ঘ দশ বছর মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসে এমন দুর্লভ নারীরত্ন লাভ করবে এ কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল! ডরোথি অপূর্ব সুন্দরী—কিন্তু সেজন্য নয়, ও খুশিয়াল হয়ে উঠেছে ডরোথির রূপের জন্য নয়, তার ঐকান্তিক প্রেমের ধারাস্নানে অবগাহন করে। ভালবাসাই তো

সব! ডরোথি বলেছিল—না হারলে যে জেতা যায় না সেটা তুমিই আমাকে শেখালে। শুধু না হারলে নয়, না হারালে—নিজেকে হারাতে হয়! ব্যক্তিসত্তা। দুয়ে মিলে এক। শুধু 'C' নয়—C^2!

হঠাৎ বাধা পেল ওয়াম্বাসী। প্রেমের জগৎ থেকে ফিরে এল বাস্তব দুনিয়ায়। তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিচিত্র জীব—জনৈক এপ্‌সাইলন।

: কী চাই?

মক্-টার্টল্‌টা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। শুঁড় দিয়ে নাকটা চুলকালো এবং মাঝের ঠ্যাং দুটো ধরে একটা সিলবদ্ধ লেফাফা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। ওয়াম্বাসী খামটা গ্রহণ করা মাত্র এপ্‌সাইলন পুনরায় কচ্ছপে রূপান্তরিত হল এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে গেল। ওয়াম্বাসী খামটা খুলে ফেলে। সামরিক-বিভাগের নির্দেশ একটা :

"যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আপনি চরম বিপদের সম্মুখীন। এখনই সাবধান হোন। আপনার ওপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ হতে পারে। আপনার বন্ধু আহত। ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। অবিলম্বে সেখানে যান।

জি. ও. সি—ডাব্‌লু. সি."

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। যুদ্ধ বেধেছে? কার সঙ্গে কার? এই জনমানবহীন বিশ্বে যুযুধান কই? পত্রপ্রেরকের পরিচয়টা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—জেনারেল অফিসার কমান্ডিং—ওয়েস্টার্ন কমান্ড। অর্থাৎ রুডলফ্ ব্যাটলার। কিন্তু বব্ গুলিবিদ্ধ হল কী করে? কে, কেন তাকে গুলি করল?

আধঘন্টা পরেই সে এসে পৌঁছলো ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। সেখানে অনেকেই অনুপস্থিত। ডঃ ব্রয়েড নেই, তাঁর অনুগামী কয়েকজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীও নেই। সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। বসে আছেন, বাজেপোড়া তালগাছের মতো সেই চার্লস ডারউইনের ছায়ামূর্তি। গতকাল রাত্রিতে রোবোর দুনিয়ায় যে দ্রুতছন্দ পটপরিবর্তন হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার তিনিই শোনালেন।

সন্ধ্যারাত্রে বব্ বসেছিল জানলার ধারে। যে বাড়িতে এখন ওরা দুজন থাকে। বব্ আর ওয়াম্বাসী। হাসপাতাল থেকে ফিরে বব্ একাই ছিল, সেখানে। জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে বসেছিল। ভাবছিল, কতক্ষণে ওয়াম্বাসী ফিরে আসে। হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসে একটা বুলেট! ববের বাহুমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বব্ পড়ে যায়। তার পরেই একটা হৈ-হৈ। ববের আঘাতটা খুব বেশি নয়—বস্তুত গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে সে মারাই যেত। বুলেটটা ওর বাম কাঁধের চামড়াটা ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছে শুধু। বব্ একটা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তৎক্ষণাৎ আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ব্যাটলারের গেস্টাপো বাহিনী অচিরে রহস্যজাল ভেদ করে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করে আনে—আর্থার ক্রুক্‌সের কাণ্ড। লোকটা দিনদুয়েক আগে ওপরে উঠেছিল; ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে গিয়েছিল! সেখানেই সে জানতে পারে—এই দুনিয়ায় নতুন দুটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে তার বিপদের পরিমাণটা। রোবোরা এতদিন ছিল ঢোঁড়া সাপ—এখন ঐ দুজনের সাহায্যে তারা শোধ নেবে। আর্থারের ধারণা, গডফাদার এবং ডরোথি জীবিত—যদিও তারা কোথায় লুকিয়ে আছে তার সন্ধান সে পায়নি। সে বুঝতে পারে—এরপর তার পক্ষে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে অবস্থান করা নিরাপদ নয়। আর কিছু না হোক—নবাগত দুজন ওর লিফ্‌ট্‌টাকে অকেজো করে দিলেই আর সে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। সে যে ঠিক কী ভেবেছিল জানা নেই, বোধ হয় ভেবেছিল—ঐ অজ্ঞাত দুটি নবাগতকে খতম করতে না পারলে তার সমূহ বিপদ। হয়তো সেজন্যই সে ওভাবে অতর্কিত গুলিবর্ষণে বব্‌কে হত্যা করতে চেয়েছিল।

খবরটা জানাজানি হওয়া মাত্র ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি তৎপর হলেন। আধঘন্টার মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কতকগুলি ঘটনা। বব্‌কে নিয়ে আসা হল ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। ব্রয়েড তাকে পরীক্ষা করে যেই বললেন বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর আরও কয়েকটি সহকারীকে। এমনকি ডর্মিটারি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল

প্রফেসর আইনস্টোনকে। সকলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। ওঁরা গোপনে শত্রুপক্ষকে সংবাদ সরবরাহ করেছেন—ওঁরা খবর না দিলে আর্থার জানতে পারত না যে, দুজন নতুন নভোচারী পৃথিবীতে এসেছেন।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! আমি....আমি এখন কী করব? এ কী অভূতপূর্ব পরিস্থিতি হল বলুন তো?

ওয়াম্বাসী বললে, অভূতপূর্ব কিছুই নয়। এমনটাই দুনিয়ায় ঘটে থাকে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। বব্ কোথায়? কেমন আছে সে?

: বব্ তো ভালই আছে। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। এখনো তার ঘুম ভাঙেনি।

: তবে সে ঘুমোক। চলুন—ডক্টর ব্রয়েডদের ছাড়িয়ে আনা যায় কি না দেখি।

অগত্যা সেই চেষ্টাই করা হল। ওরা দুজনে এসে উপস্থিত হল ওয়েস্টার্ন কমান্ডের হেড-কোয়ার্টার্সে। রুডলফ্ ব্যাটলারের খোলা কথা। এখন 'ওয়ার-এমার্জেন্সি' চলছে। ডক্টর ব্রয়েড বা প্রফেসর আইনস্টোনের মতো পঞ্চম বাহিনীর লোককে জেলের বাইরে রাখা চলে না।

ওয়াম্বাসী অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করল; কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি!

: সব ব্যাটা অনার্য! কাউকে ছাড়ব না আমি!

ওয়াম্বাসী বলে, হের ব্যাটলার—আমি রোবোটিক্স ল'-র দু-নম্বর ধারামতে আপনাকে আদেশ করছি—ঐ দুজন গামা-পণ্ডিতকে অবিলম্বে মুক্ত করুন। সংবিধানের দু-নম্বর ধারায় বলা আছে—A robot must obey the orders given to it by human beings (মানুষের আদেশ রোবোমাত্রই মানতে বাধ্য।)

হের ব্যাটলার বলেন, সংবিধান দরকার হলে বদলাব; কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই; ঐ ধারাতেই পরবর্তী 'ক্লজ'টা হচ্ছে except where such orders would conflict with the First Law (যদি না সেই আদেশ প্রথম সূত্রের প্রতিবন্ধক হয়)। প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে—'রোবো কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে।' ওদের মুক্তি দেওয়া হলে আপনাদের দুজনের ক্ষতি করা হবে, পরোক্ষভাবে আর্থার ক্রুক্স্‌কে সাহায্য করা হবে—যে লোকটা ডক্টর বব্ রয়কে গুলিবিদ্ধ করেছে।

ওয়াম্বাসী বলে, ডক্টর ব্রয়েড যদি মুচলেখা লিখে দেন—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে ব্যাটলার বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায় সে স্ট্যাটিস্‌টিক্সটা কি আপনার জানা?*

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। বোঝে, রুড্‌লফ ব্যাটলারকে কিছুতেই বাগে আনা যাবে না। বলে, হের ব্যাটলার! তাহলে আপনি খোলাখুলি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন?

ব্যাটলারও উঠে দাঁড়ান। রাগে তিনি প্রায় তোৎলা হয়ে যান। বলেন, হের ওয়াম্বাসী! এযাত্রায় রক্ষা পেলেন আমাদের শাস্ত্রের ঐ প্রথম সূত্রটির জন্য। নাহলে এ উদ্ধত আচরণের উপযুক্ত জবাব আপনাকে দিতাম।

ওয়াম্বাসী ফিরে আসে। সে ভাবছিল, ঐ বড় হাতের G-ওয়ালা কোনো নাট্যকার যদি সত্যই কোথাও থাকেন, তবে তিনি ছোট হাতের g-ওয়ালা ঐ গডের মতো স্থবির, বৃদ্ধ। নতুন একখানা নাটক লিখবার ক্ষমতা আর তাঁর নেই। একই নাটক বার বার মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছেন। চর্বিত-চর্বণের

* প্রসঙ্গত স্মর্তব্য : 1933 সালে হিটলার 'সাইকো-অ্যানালিসিস্' পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিষিদ্ধ করে একটি আদেশজারি করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পূর্বে নাৎসীরা যখন অস্ট্রিয়া দখল করে তখন সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড সপরিবারে গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক চাপে হিটলার ওঁকে কারামুক্ত করে দিতে রাজি হন, যদি ফ্রয়েড লিখিতভাবে স্বীকৃতি দেন যে, বন্দি অবস্থায় নাৎসী কারারক্ষীরা তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। ফ্রয়েড তখন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি অস্বীকৃত হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি মুচলেখা লিখে দিয়ে মুক্ত হন এবং বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র মাস দুই আগে ঐ রোগেই মারা যান।

পুনঃপৌনিক রোমন্থন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে শ্লেটটা ধুয়েমুছে সাফা হয়ে গেল, তবু কোনো নতুন নাটকের পরিকল্পনা করতে পারলেন না তিনি।

এরপর বেচারি এসে হাজির হল ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতির কাছে। সেখানেও কল্কে পেল না। চারশকুন সাহেব চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, দেখুন মশাই, ওসব ছেঁদো কথা আমায় বলতে আসবেন না। ব্যাটলার লোকটা পাজি, পাজির বেহদ্দ; কিন্তু এক্ষেত্রে সে যা করেছে তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। মহামহিম সম্রাটের এই বিশাল সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যে সূর্য পর্যন্ত অস্ত যেতে ভয় পায়—সেটা 'লিকুইডেট্' করতে আমি এ গদিতে বসিনি। এখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশে 'এমার্জেন্সি' চালু হয়েছে। এখন ওসব সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অগত্যা শেষ চেষ্টা—স্বয়ং সর্বাধিনায়ক, লেকজান্ডার দরবারে। কিন্তু তিনিও যুগের হাওয়ায় অভ্যস্ত হয়েছেন এতদিনে। সম্রাট জানেন, তাঁর গদির নিরাপত্তা নির্ভর করছে দুই সেনাপতির মদৎদানে। নিজ পার্টির কোনো হোমরাচোমরার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যাওয়া রাজনীতিতে বেআইনী। এমার্জেন্সির অজুহাতে তিনিও বধির, তুচ্ছ কথায় কানই দিলেন না।

*　　　*　　　*

সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত ওয়াম্বাসী ফিরে এল হাসপাতালে।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী বলেন, কী হল? ওদের জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনা গেল না?

ওয়াম্বাসী মাথা নেড়ে বলে, না স্যার, পারলাম না। আমার বন্ধু কেমন আছে? সে কি এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে?

: না, অজ্ঞান সে আদৌ হয়নি। আঘাতটা অতি সামান্য। একটু ছড়ে গিয়েছে মাত্র। মারাত্মক হতে পারত—খুব বেঁচে গিয়েছে। ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। উঠেছে। তোমার খোঁজ করছিল। চল তার কাছে যাই।

ওয়াম্বাসী বলে, চলুন, কিন্তু একটা কথা স্যার। আমাকে কিন্তু সব কথা বব্‌কে খুলে বলতে হবে।

: বলো। আমার আপত্তি নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি অত্যন্ত হতাশ বোধ করছি ডক্টর ওয়াম্বাসী।

ওয়াম্বাসী বলে, আমি কিন্তু খুব আশাপ্রদ একটা খবর আপনাকে জানাতে পারি।

: কী?

: আপনাদের যেটা ছিল মূল সমস্যা—'হোমো স্যাপিয়ন্স-স্পেসিস্' অর্থাৎ মানুষ নামক জন্তুর বংশবৃদ্ধি অপ্রতিহত রাখা—সেটার সমাধান আমি করে ফেলেছি।

বৃদ্ধ দাড়ি চুলকোতে থাকেন। মাথার চুলগুলোও টানতে থাকেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় বারকতক পায়চারি করে এসে বলেন, আশ্চর্য! আমরা এতদিন গবেষণা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি, আর তুমি মাত্র একদিনেই—! তুমি....তুমি একজন জিনিয়াস। বল, কীভাবে?

ওয়াম্বাসী বলে, চলুন, ববের কাছে যাই। তারপর আপনাদের দুজনকেই বলব।

ওদের দেখেই বব্ লাফিয়ে ওঠে; হাই নিগার! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি গুলি খেয়ে মরছি আর তুই বেপাত্তা!

ওয়াম্বাসী দীর্ঘ কৈফিয়ত দিল। গতকাল রাত্রে তার ছোট হরফের ঈশ্বরপ্রাপ্তির কথা। অকপটে জানালো তিন গামা-পণ্ডিত কীভাবে বব্ রয়কে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেন? কী ভাবে সে গডফাদারের গোপন আস্তানায় গিয়ে তাঁকে কী পরিবেশে আবিষ্কার করে। শুধু একেবারে শেষের অভিজ্ঞতাটুকু সে গোপন রাখল—অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের পথে সে কীভাবে ডরোথি কলিন্সকে আবিষ্কার করে!

আদ্যন্ত কাহিনিটা শুনে বব্ বলে, তোর দৃঢ় বিশ্বাস—সেই মেয়েটা ডরোথি?

: আমি নিঃসন্দেহ। কেন আমার এ সিদ্ধান্ত তা আগেই বলেছি—আমাকে দেখে মেয়েটা ভেবেছিল আমি আর্থার ক্রুক্স্। তাই আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

বব্ বলে, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া কোনো উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক নয়—জন্তুরাও ভয়ে সিঁটকে যায়।

: যায়। কিন্তু দরজার আড়ালে লুকিয়ে মানুষের কথোপকথন শুনবার চেষ্টা করে না। দ্বিতীয়ত, গডফাদার তাঁর কথাবার্তায়, আচরণে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ঐ মেয়েটি ডরোথি। তাঁর ভয়—আমরা মেয়েটিকে ওঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসব। তাতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। কেন? দশ-বারোটি সুন্দরী মেয়ে তো তাঁর রয়েছে! আমার বিশ্বাস তার কারণ—একমাত্র ঐ মেয়েটির সঙ্গেই তিনি ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন, কথা বলতে পারেন।

গারউইন বলেন, কিন্তু ডরোথি তো বিকৃতমস্তিষ্কা?

: না। হয়তো অত্যাচারে সে সাময়িকভাবে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল, অথবা সবটাই তার অভিনয়। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

বব্ উৎসাহে উঠে বসে; বলে, আর য়ু শিওর?

: এককথা কতবার বলব?

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইন আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেন। চট্ করে উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে। ম্যান্টলপিসে বসানো ছিল সেই নগ্নপ্রায় ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির একটি মূর্তি। তিনি সেদিকে এগিয়ে যান। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন, তারপর এগিয়ে আসেন দুই বন্ধুর দিকে। ওয়াম্বাসীর হাতটা তুলে নিয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ঈশ্বর করুণাময়। শুধু আদম নয়, ঈভকেও তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই বৃদ্ধের অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। হয়তো ডরোথি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি—না হোক! তোমাকে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে তাকে সচেতন করতে হবে। আইনস্টোনের সেই ফর্মুলাটা $E = mC^2$-কে সার্থক করতে হবে! পারমাণবিক বিস্ফোরণে এবার তার প্রমাণ হবে না, হবে—পরম-মানবিক বিকাশনে! ধ্বংস নয়, সৃষ্টি!

বব্ হেসে বলে, স্যার! আমরা দুজন আশমান ফুঁড়ে এসেছি। আপনি দুঃখ করেছিলেন, যেহেতু দুটোই হুলো! তা আপনার সিদ্ধান্তটা একটু একদেশদর্শী হয়ে যাচ্ছে না কি? ঐ নিগারটা একাই সে গুরুদায়িত্ব পালন করবে? আর আমি কি শুধু বসে বসে হাপু গাইব?

বৃদ্ধ বলেন, প্লীজ ডক্টর রয়! আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার এ প্রস্তাব নিতান্ত জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে। পরম করুণাময় এ সৃষ্টিতে আলোর পাশে অন্ধকার, কালোর পাশে সাদা সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি চাই—নূতন সৃষ্টিতেও সেই আলো-ছায়ার অপূর্ব মিলন-মাধুর্য সৃষ্ট হোক। ওয়াম্বাসী কালো, ডরোথি সাদা। পরের ধাপে আমরা মেন্ডেলের থিয়োরি অনুযায়ী সাদা ও কালো দুজাতেরই সন্তান পাব। তুমি—ডক্টর রয়, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ডরোথির সাহায্যে আগামী দুনিয়ায় সেই আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য আনতে পারবে না। ওয়াম্বাসী পারবে!

বব্ বলে : কিন্তু ডরোথি তো গিনিপিগ নয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাও—

বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, মাপ করবেন স্যার, বিষয়টা এমন কিছু জরুরি নয় যে এখনই তার চূড়ান্ত ফয়সালা দরকার। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। প্রথম কথা, আপনি কি এখনও মনে করেন—আর্থার ক্রুক্স্-কে জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে?

: না। নিশ্চয় নয়। ডক্টর বব্ রয়কে অতর্কিত হত্যার চেষ্টা করে সে আমার সহানুভূতি হারিয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানে যে-কোন মুহূর্তে তোমাদের দুজনের মৃত্যুকে ডেকে আনা।

: তাহলে সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হয়। এই সময় প্রফেসর আইনস্টোন, ডক্টর ব্রয়েড প্রভৃতিরা যদি থাকতেন—

বব্ বাধা দিয়ে বলে, ও সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান আমায় মাথায় এসেছে। রাজনীতির একটা

ঘোরপ্যাঁচ! তার আগে বলুন তো স্যার—সর্বাধিনায়কের মৃত্যু হলে এই রোবো দুনিয়ার সর্বাধিনায়ক কে হবেন? ব্যাটলার না চারশকুন?

বৃদ্ধ বলেন, সে কথা কেউ জানে না। সম্রাটও তাঁর উত্তরাধিকার-নির্বাচন করে রাখেননি। একবার তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাঁচবার আশা ছিল না। সেই সময় তাঁর মৃত্যুশয্যা ঘিরে ছিলাম আমরা শুধু চারজন—ব্রয়েড, আমি, চারশকুন আর ব্যাটলার। রুডলফ্ সম্রাটকে প্রশ্ন করল, মহামহিম! আপনি বলে যান—আপনার অবর্তমানে কে পৃথিবীপতি হবে?

বব্ সাগ্রহে বলে, তিনি কী বললেন?

বৃদ্ধ জবাব দেবার পূর্বেই ওয়াম্বাসী বলে, আমি সেটা জানি। সম্রাট জবাবে বলেছিলেন "Whoever is the strongest !"—যার ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি।

গারউইন অবাক হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! তুমি কেমন করে জানলে?

ওয়াম্বাসী বলে, সহজে। ইতিহাস পড়ে। লেকজান্ডা যাঁর ছায়া দিয়ে গড়া সেই বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার যখন ব্যাবিলনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর প্রধান সেনাপতি তাঁকে ঐ প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সেকেন্দার শাহ্ তাঁর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্ব-রাজনীতির শেষ কথাটাই বলে গিয়েছিলেন : Whoever is the strongest !

বব্ খুশি হয়। বলে, তার মানে কে গদিতে বসবে তা অনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে আমার কূটকৌশলটা কাজে লাগবে মনে হয়। শোন্ নিগার, আমার পরামর্শটা।

এসব বিষয়ে বব্ রয়ের মাথা খোলে ভাল। তার পরিকল্পনাটা এই রকম :

রুডল্ফ্ ব্যাটলারকে কব্জা করতে হলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সেই দ্বিতীয় কাঁটাটা অনিবার্য ভাবে ইস্টার্ন কমান্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ মিস্টার চারশকুন। কী ভাবে? ব্যাটলার শেষ লড়াইয়ের জন্য যে ভি-টু রকেটটা লুকিয়ে রেখেছে, সেটা চারশকুনের হাতে তুলে দেওয়া—এই শর্তে যে, সে অনার্ষ-থিয়োরিতে-আটক গামা-পণ্ডিতদের ছেড়ে দেবে। চারশকুন যদি সম্রাটের কাছে লুক্কায়িত গডফাদারকে হাজির করতে পারে, তাহলে সম্রাট নিশ্চয় ব্যাটলারের ওপর খাপ্পা হয়ে যাবেন। স্বয়ং সর্বাধিনায়কের চোখের আড়ালে এত বড় ব্যাপারটায় লিপ্ত হওয়া ব্যাটলারের অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ওয়াম্বাসী ববের পিঠে একটা বিরাশি-সিক্কার থাপ্পড় মেরে বলে, দারুণ বুদ্ধি করেছিস তো! এমন সহজ সমাধানটা আমার মাথাতেই আসেনি।

: আসবে কোথা থেকে? দিনরাত ইতিহাস-সাহিত্য পড়লে এসব কূটকচালে বুদ্ধি কারো মাথায় আসে? পাণ্ডিত্য দিয়ে তোর মগজটা যে ঠাসা!

বৃদ্ধ গারউইন বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! একটা কথা। গামা-পণ্ডিত কজনকে মুক্ত করে দিতে যদি চারশকুন রাজি হয় তবেই শুধু তাকে গডফাদারের খবরটা জানাবে।

ওয়াম্বাসী বলে, সে আর বলতে!

দশ

বব্ রয়ের পরিকল্পনাটা অদ্ভুতভাবে সার্থক হল।

ভি-টু রকেট গোপনে তৈরি হচ্ছে, সর্বাধিনায়কের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ভি-টু রকেট তাঁর ওপর বর্ষিত হতে পারে এমন আশঙ্কা চারশকুন মশায়ের বরাবরই ছিল। তিনি শুধু জানতেন না—ভি-টু রকেটটা কী জাতের, কতটা শক্তিশালী এবং কোথায় সেটা গোপনে তৈরি হচ্ছে। ওয়াম্বাসী যখন জানালো সে সমস্ত তথ্যটা জানাতে পারে, তখন চারশকুন চুরুট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, আমি আপনার সব শর্ত মেনে নেব, যদি আমাকে সেটার সন্ধান দিতে পারেন!

এর পরেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কতকগুলি ঘটনা। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আমূল বদলে গেল। অর্থার ক্রুক্স্ কোনো একটা ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় নিয়েছে—প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এ খবর ওঁরা জানতেন—জানতেন না, ক্রুক্‌স্-এর গোপন ঘাঁটিটা কোথায়। ব্যাটলারের গোপন গেস্টাপো বাহিনী তন্নতন্ন করে খুঁজছে সেই গোপন ঘাঁটিটা। এদিকে ওয়াম্বাসীর নির্দেশমত চারশকুন আবিষ্কার করলেন গডফাদারকে। সম্রাট লেকজান্ডাকে সব কথা খুলে বললেন। সম্রাট তপ্ত-তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো হস্তপদাদি সঞ্চালনে উষ্মা প্রকাশ করলেন। গডফাদার জীবিত—অথচ ব্যাটলার-ব্যাটা সে খবর তাঁর কাছে গোপন রেখে মিথ্যাপ্রচার চালাচ্ছে, এ সংবাদে তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। তৎক্ষণাৎ আদেশজারি করলেন—ব্যাটলারকে গ্রেপ্তার করে আন!

এর চেয়ে আনন্দের কথা কিছু হতে পারে না ডিফিটস্টোন চারশকুনের কাছে। সদলবলে তিনি রওনা হলেন ব্যাটলারকে গ্রেপ্তার করে আনতে। কিন্তু রুডলফ্ ব্যাটলার বৃথাই তাঁর গেস্টাপো বাহিনীকে এতো যত্নে পোষেননি। তিনি ঠিক সময়েই খবর পেলেন এবং রোবো সাম্রাজ্যের একমাত্র হেলিকপ্টারটি চড়ে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সমেত তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন আর্থার ক্রুক্‌স্-এর বাঙ্কারে। সেখান থেকেই তিনি শেষ যুদ্ধ লড়বেন ঐ অনার্যদের বিরুদ্ধে। আর কেউ না জানলেও ব্যাটলারের গেস্টাপো বাহিনী ইতিমধ্যে সন্ধান পেয়েছিল আর্থারের গোপন ঘাঁটির। জনশ্রুতি—ব্যাটলার তাঁর বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়ার সময় একটি বীটা-সুন্দরীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

ফলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা বদলে গিয়েছে।

তা যাক, কিন্তু ওয়াম্বাসী অবাক হলো অন্য একটা কারণে। গডফাদারের গোপন আবাসে সে যখন উপস্থিত হল তখন আর সকলকেই খুঁজে পেল, পেল না একজনকে! তার ডেস্‌ডিমোনাকে।

হ্যাঁ, ডেস্‌ডিমোনা। গতকাল রাত্রে সে তার আবিষ্কারের নতুন নামকরণ করেছিল। ডরোথি নয়, ডেস্‌ডিমোনা—অপূর্ব সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও যে ভালবেসেছিল কৃষ্ণকায় ওথেলোকে।

শুধু ওর ডেস্‌ডিমোনা নয়, বব্ রয়ও সারাদিন-সারারাত নিরুদ্দেশ।

পরদিন বব্ ফিরে এসে বললে, হাই নিগার! তোর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। মেয়েটা উন্মাদিনী নয়—সুস্থমস্তিষ্কা!

: কার কথা বলছিস্? ডরোথি?

: না। প্রাক্তন ডরোথি। এখন ওর নাম—'জুলিয়েট।'

: জুলিয়েট! নামটা তুই দিয়েছিস?

: হ্যাঁ। কাল সারারাত তো তার কাছেই ছিলাম। দারুণ মেয়েটা! এক্সকুইজিট, ভলাপচুয়াস্ এ্যান্ড সেক্সি!

ওয়াম্বাসী মুহূর্তে সংযত হয়। বলে, তাহলে তুই অন্তত রোমিও-জুলিয়েটটা পড়েছিস্!

: পড়িনি। টি-ভি-তে দেখেছি। মাই ডিয়ার নিগার! আয়, আমরা ডিউটিটা ভাগাভাগি করে নিই। সারা দুনিয়াটা তোকে দিয়ে দিলাম—আমার ভাগে রইল শুধু জুলিয়েট। রাজি?

ওয়াম্বাসী ম্লান হেসে বললে, কিন্তু তোর জুলিয়েট তো গিনিপিগ নয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাও—

বব্ ওর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, সে আর তোকে ভাবতে হবে না, নিগার! তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা না জেনেই কি বলছি? ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোর কথাও হয়েছে—আমরা দুজনে স্থির করেছি—ঐ ক্রুক্‌স্ নিগারটাকে শেষ করে তোকে গডফাদারের সিংহাসনে বসাবো। তারপর আমরা দুজনে চলে যাব—হনিমুনে। মাঝে মাঝে তোর রাজ্যে বেড়াতে আসব।

ওয়াম্বাসী বলে, আমার কথা সে কী বলেছে?

: সে আর তোর শুনে কাজ নেই ভাই। কিন্তু জুলিয়েটকে আমি দোষও দিতে পারি না। আর্থার ক্রুক্‌সের ব্যবহারে গোটা নিগ্রো জাতটার ওপরেই সে ক্ষেপে আছে!

ডক্টর ব্রয়েড, আইনস্টোন প্রভৃতি গামা-পণ্ডিতেরা এই সময় প্রবেশ করায় ওদের জনান্তিক আলাপচারিটা স্থগিত রাখতে হল।

*　　　　*　　　　*

প্রথমে অবসাদে মনটা ভরে গিয়েছিল। পরে ভেবে দেখেছে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বব্ রয় যাই বলুক—সাদা-কালোর পার্থক্যটা একবিংশতি শতাব্দীতেও আছে। প্রকাশ্যে কেউই সেটা মানতে চায় না, মুখে স্বীকার করে না—কিন্তু ঐ সাদা চামড়ার মেয়েটি জাতিগতভাবে নিগ্রোদের ঘৃণা করে। তাহলে গতকাল সে কেন অমন ব্যবহার করল? খুব স্বাভাবিক। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন প্রকৃতির তাড়নায় মেয়েটি ছটফট করছিল। তার প্রকৃতি তো অজানা নয়! তাই দীর্ঘ-উপবাস-অন্তে খাবারের পাত্রটা সামনে পাওয়া মাত্র সে গোগ্রাসে গিলেছিল! একটা তীব্র অপমানে ওয়াম্বাসী নিজেকে অপবিত্র মনে করছিল। বোধ করি এমন মানসিক অবস্থাতেই মানুষ আত্মহত্যা করে!

ওয়াম্বাসী তা করবে না। কিছুতেই নয়। কীসের অপমান? কীসের বঞ্চনা? তার তো লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। তার কী অপরাধ? আমি ভালোবাসতে পেরেছি, আমি ভালোবেসেছি—আমি তাতেই ধন্য। তুমি পারনি, তুমি কামনার পঙ্কে কর্দমলিপ্ত হয়ে মিথ্যার অভিনয় করেছ সে তোমার দুর্ভাগ্য!

কিন্তু আশ্চর্য! সে-রাত্রে তো ও-কথা মনে হয়নি। একবারও সন্দেহ হয়নি—ডেস্‌ডিমোনা অভিনয় করছে! ওয়াম্বাসী ভাবুক-প্রকৃতির; তার মনে হল—হয়তো মেয়েটি অভিনয় আদৌ করেনি। ওয়াম্বাসী তার রোমান্টিক ধ্যান-ধারণায় প্রেম জিনিসটাকে যে-চোখে দেখে, ঐ মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো প্রেমের সেই সংজ্ঞা নয়। ওয়াম্বাসী রক্ষণশীল নিগ্রো পরিবারের সন্তান। ওর বাপ ছিল পাদ্রী—রোমান ক্যাথলিক নয়, প্রোটেস্টান্ট। ওদের পরিবারে বা সমাজে বহুবিবাহ, পরীক্ষামূলক বিবাহ বা গোষ্ঠিবিবাহ চালু হয়নি। তবু একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ হিসাবে সে সবগুলি প্রথার সঙ্গেই পরিচিত—পলিগ্যামি, ট্রায়াল-মারেজ এবং গ্রুপ-ম্যারেজ! অতি-আধুনিক মার্কিন সমাজে সেগুলির বহুল প্রচলন দেখেছে। সমাজের স্বীকৃতি-মতেই এক পুরুষ দুটি রমণীর স্বামী হতে পারে; এক রমণীর দুটি বা তিনটি স্বামী থাকতে পারে। এমনকি একই ক্লাবের সভ্য-সভ্যা পরস্পরের বিধিসম্মত স্বামী-স্ত্রী হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবার পর এই নতুন চেতনাটা এসেছে—সমাজ এভাবে নানা জাতের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারছে।

পূর্ব পূর্ব শতাব্দীতে মানুষের জীবন ছিল—গৃহকেন্দ্রিক। খোঁটায়-বাঁধা গরু যেমন তার খুঁটিকে কেন্দ্র করে সামান্য পরিসরে বিচরণ করে—সে আমলের মানুষও তেমনি ঐ গৃহকেন্দ্রিক জীবনচক্রের পরিক্রমায় অভ্যস্ত ছিল। কর্মান্তে ফিরে আসত নিজগৃহে, সেখানে তার বধূ পীটর ডি হুখের চিত্রের সেই প্রোষিতভর্তৃকা ঘরনির মতো তার প্রত্যাবর্তন-পথের দিকে দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষা করত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—'run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share'—গৃহ-প্রত্যাগত বাপের কোলে উঠে চুমু খাবার প্রতিযোগিতায় হুড়োহুড়ি করত। তারপর দুনিয়া বদলে গেল। কেন্দ্রস্থলের সেই খুঁটিটা গেল হারিয়ে। জীবনে যতির স্থান নিল গতি—মানুষ ঘুরতে থাকে ক্রমাগত, শহর থেকে শহরে, এ-মহাদেশ থেকে সে-মহাদেশে। গ্রহের ফেরে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ফলে, তার জীবনযাত্রার মানটাই গেল বদলে : গৃহ যার নেই, তার আবার গৃহিণী কী? মাসের ত্রিশটা দিন সে বাস করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে, ক্লাব-রুমে, অফিসে, গেস্ট-রুমে বা বাঙলোয়। তার সংসারটাও গতিমুখর হতে বাধ্য। ফলে 'ঐকান্তিক প্রেম' শব্দটা তার ব্যঞ্জনা হারালো। তাতে দোষ ধরল না কেউ। মানুষ হল ক্ষণিকবাদী। প্রতি মুহূর্তই সত্য—প্রতিটি মুহূর্তের আনন্দের মূল্যায়নে। আজ যার বাহুবন্ধনে রাত কাটালে, কাল যদি নতুন দুটি বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময়ে সেই অতীতকে ভুলতে না পার—তবে তুমি ব্যাক্-ডেটেড, তুমি পড়ে থাকবে পেছনে। তুমি হবে হতভাগ্য।

মিস্ মার্স সেই মানসিকতা নিয়েই গড়ে উঠেছে। সেও ক্ষণিকবাদিনী; সে ডেস্‌ডিমোনা নয়, জুলিয়েটও নয়, সে—সে! ওয়াম্বাসী যদি তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন দিয়ে, তার নিজস্ব মাপকাঠি নিয়ে তাকে মাপ করতে যায় তবে ওয়াম্বাসীরই ভুল। মেয়েটি দায়ী নয়।

কিন্তু, তবু.....! না, তবু কিছু নেই। ওয়াম্বাসী মনকে শক্ত করে।

পরদিন বব্ নিজেই এসে বললে, আয়াম সরি নিগার! কিন্তু দোষ শুধু আমার একার নয়। তুই নিজেও অপরাধী।

: কী ব্যাপার? তুই 'সরি'ই বা হচ্ছিস্ কেন? আমিই বা অপরাধটা কী করলাম?

: তুই সব কথা আমাকে খুলে বলিসনি কেন?

: 'সব কথা' মানে?

: ওথেলো আর ডেস্‌ডিমোনার গল্প?

ওয়াম্বাসী জোর করে হেসে ওঠে। বলে, ও, এই কথা! তা তোকে কে বলল? তোর জুলিয়েট?

: হ্যাঁ, আমার জুলিয়েট আর তোর ডেস্‌ডিমোনা!

ওয়াম্বাসী প্রফুল্লতা বজায় রেখে বলে, না রে বাস্টার্ড! ভুল বললি, ও শুধু তোর জুলিয়েটই। এক রাতের জন্য ডেস্‌ডিমোনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

বব্ বললে, না। ডরোথি সব কথা আমার কাছে স্বীকার করেছে। আমিও ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। আমার গতকালকার প্রস্তাব আমি প্রত্যাহার করছি।

: তার মানে?

: তার মানে সৌরলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আমি একা দাবি করব না।

: এটা তো ঠিক 'প্যারিস'-এর মতো সিদ্ধান্ত হল না।

: প্যারিস! প্যারিস কে?

: যার কাছে হেরা, এথেনা আর আফ্রেদিতি এসেছিল সুবর্ণগোলক সমস্যার সমাধানের খোঁজে!

: কী বলছিস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না?

: কী করব, আমিও যে তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না? তুই কী করতে চাস্?

: আর্থার ক্রুক্‌স্ যা চেয়েছিল! আমরা দুজনেই ওকে বিয়ে করব। ও দ্বৈতসত্তায় আমাদের ঘরনি হবে। তোর চোখে ও হবে ডেস্‌ডিমোনা, আমার চোখে জুলিয়েট।

ওয়াম্বাসী বলে, এককথাই বার বার বলছি বাস্টার্ড! ডরোথি গিনিপিগ নয়; তার নিজেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতে পারে।

: তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে রাজি।

: আমি বিশ্বাস করি না।

: বেশ তাকে ডাকছি। সে নিজমুখেই স্বীকার করবে।

ওরা দুজন জানত না—একই নাটক একইভাবে রূপায়িত হচ্ছে; অর্থাৎ ওদের কথোপকথন দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ডরোথি এতক্ষণ সবই শুনেছে। এতক্ষণে ঘরে এসে বললে, কী ব্যাপার? আমাকে ডাকছিলে?

ওয়াম্বাসী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঐ অনিন্দ্যকান্তি নারীমূর্তিটির দিকে। তার সপ্রতিভতা দেখে মনে হয় না—সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত। ওয়াম্বাসী কৃত্রিম হাসি হেসে বলে, এস ডরোথি। পাগলটা কী বলছে শোন!

মেয়েটি বললে, আবার ডরোথি কেন? শোননি, আমার পুনর্জন্ম হয়েছে! এখন আমার দ্বৈতসত্তা—ডেস্‌ডিমোনা-কাম-জুলিয়েট।

ওয়াম্বাসী বলে, তুমি কি সত্যই ঐ দ্বৈতসত্তায় অভিনয় করতে রাজি?

'অভিনয়' শব্দটার তির্যক অর্থ মেয়েটিকে বিদ্ধ করল না। বললে, উপায় কী? আমি সেনসিব্‌ল্। তোমরা দুজন পুরুষ, আমি একা। তাছাড়া ডক্টর ব্রয়েড এবং গার্লস্ গারউইন চান, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা হই। তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত।

খিল্‌খিলিয়ে মেয়েটি হেসে ওঠে। ওয়াম্বাসীর মনে হল—অশ্লীল! ঐ হাসিটা নিতান্ত অশ্লীল। পরক্ষণেই তার মনে হল—দোষ ঐ মেয়েটির নয়, তার নিজের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের। 'মা হওয়া' জিনিসটা তার মানসিকতার সৌকুমার্যে যে ব্যঞ্জনা বহন করে—ঐ মেয়েটির ধারণায় সেটা নেই। ওর

কাছে 'মাতৃত্ব'একটা জৈবিক সত্য। গারউইনের মতো ঐ মেয়েটিও বোধ করি ভাবে—ওর 'মা' হওয়ার অর্থ 'হোমো-স্যাপিয়ান্‌-সেপিয়ান্স' নামক স্পেসিস্‌টাকে ডাইনোসর, ম্যামথ বা ডোডো পাখির দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করা।

ওয়াম্বাসী বলে, একটা কথা বল ডরোথি—তুমি এ প্রস্তাবে রাজি হচ্ছ কেন? মূল উদ্দেশ্যটা কী? গার্লস গারউইনকে সাহায্য করা—না আমার প্রতি করুণাবশে?

: তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ ওথেলো। এবং সেটা করছ, যেহেতু তুমি একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ হয়েও গত শতাব্দীর ধ্যান-ধারণায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছ। সতীত্বের সেই মর্বিড ধারণাটাকে তুমি আঁকড়ে ধরে আছ!

ওয়াম্বাসী বলে, না। তুমিই একদিন বলেছিলে—কোনো নিগারের বিছানায় শোয়ার চেয়ে মৃত্যুই তোমার কাছে কাম্য।

: বলেছিলাম। কিন্তু তার পরে স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে শুয়েছি। শুইনি?

: স্টপ ইট! চীৎকার করে ওঠে ওয়াম্বাসী। সেই অনুরাগঘন মুহূর্তটির উল্লেখমাত্রে যেন ক্ষেপে যায় লোকটা। সেটা এমন একটা অনুভূতি, যা সে ওর নিকটতম বন্ধু ববের সামনেও আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়।

ডরোথি শুধু বলে, শুধু 'স্টপ ইট'! 'স্টপ ইট য়ু বীচ' নয়?

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। ডরোথিকে অস্বীকার করে বন্ধুকে বলে, বব্‌! আমি রাজি নই।

বব্‌ হেসে বলে, তোর সংস্কারটাই বড় হলো?

: হয়তো তাই। স্থানত্যাগ করে ওয়াম্বাসী।

* * *

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই মিটল না। একটু পরে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন দুজন গামা-পণ্ডিত। ডক্টর ব্রয়েড এবং গারউইন। ব্রয়েড বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী—কিছু মনে করবেন না, ব্যাপারটা যদিও নিতান্তই আপনার ব্যক্তিগত, তবু জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে আমরা দুজন সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।

ক্লান্ত দুচোখ মেলে ওয়াম্বাসী বলে, কী বিষয়ে?

: ডক্টর বব্‌ রয় এবং ডরোথি আমাদের সব কথা খুলে বলেছেন। আমাদের মনে হচ্ছে আপনি ভুল করছেন, অন্যায় করছেন। ববের প্রতি, ডরোথির প্রতি, জীববিজ্ঞানের প্রতি এবং সর্বোপরি আপনার নিজের প্রতি!

ওয়াম্বাসী বলে, এ কথা কেন বলছেন?

: আপনি যদি একটা ভুল সংস্কারবশে—

: ভুল সংস্কার! নর-নারীর ঐকান্তিক প্রেমকে আপনারা কুসংস্কার মনে করেন?

: 'কু' উপসর্গটা আপনার লাগানো। আমরা ওটাকে শুধু ভ্রান্ত বলেছি।

: কেন ভ্রান্ত?

: ভেবে দেখুন। 'নরনারীর ঐকান্তিক প্রেম' যেটাকে বলছেন, সেটা আসলে কী? নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত—যে সিদ্ধান্তের ওপর গড়ে উঠেছে হাজার বছরের সাহিত্য-শিল্প-কাব্য!

: মনগড়া সিদ্ধান্ত?

: নয়? মানুষের ইতিহাসে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা বেশিদিনের নয়, তিন-চার হাজার বছরের। তার পূর্বে কয়েক লক্ষ বছর ধরে চালু ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। তখন ঐ 'নরনারীর ঐকান্তিক প্রেম' বলে কিছু ছিল না। পরবর্তী যুগেও—লক্ষ্য করে দেখুন, প্রতিটি দেশে, প্রতিটি কালে পুরুষের ঐকান্তিকতাকে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে নারীর ঐকান্তিকতাকে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে। তাই 'সতীত্ব' বা chastity নামে একটা শব্দ আবিষ্কৃত হল প্রায় প্রতিটি ভাষায়—যার সমার্থক পুরুষের ঐকান্তিকতাব্যঞ্জক কোনো শব্দ সৃষ্টি হল না। কেন? কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতৃত্বটা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ভেবে দেখুন ডক্টর ওয়াম্বসী—'সতীত্ব' ধারণাটা সত্যই স্বর্গীয় কিছু নয়, নিতান্ত একটি কেজো ভূমিকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা। একবিংশতি শতাব্দীতে সমাজ পিতৃতান্ত্রিক থেকে রাষ্ট্রতান্ত্রিক হতে বসেছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতা যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে না যেত, তাহলে দেখতেন অচিরেই সমাজ পুরোপুরি রাষ্ট্রতান্ত্রিক হয়ে গেছে। তখন ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, তাকে লেখাপড়া শেখানো, নানান বৃত্তিতে শিখিয়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব নিতো রাষ্ট্র। বস্তুত সমাজ প্রায় সেইরকমই হয়ে গিয়েছিল। এখন পিতৃত্ব জিনিসটার আর সে দাম ছিল না। ফলে, ঐকান্তিক প্রেম বলেও এখন আর কিছু স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারত না। আপনার মতো সংস্কারাচ্ছন্ন কিছু লোক হয়তো জোর করে সেটা কিছুদিন আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু বিবর্তনের তাগিদে একদিন 'সতীত্ব' শব্দটা শুধু অভিধান-আশ্রয়ী হয়ে যেত, আদিম যুগের ডাইনোসরের জীবাশ্ম যেমন টিকে ছিল শুধু মিউজিয়ামে।

ওয়াম্বাসী রুখে ওঠে, একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে দুজন পুরুষকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব?

: প্রশ্নটাই অবৈধ। একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে দুটি সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন তোলার মত। হয়ত বড় ছেলেটিকে সে ভালবাসে—তার ওপর নির্ভর করে বলে, সে হাতে হাতে সাহায্য করে বলে; আর ছোটটিকে ভালোবাসে সে ন্যাওটা বলে, পেটুক বলে, দুষ্টুমি করে বলে। দুটি সন্তানের মধ্যে সে কোনটিকে বেশি ভালোবাসে তা সে নিজেই জানে না। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভেবে দেখুন—দুটি স্বামীর ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। মেয়েটি হয়তো তার প্রথম স্বামীকে ভালোবাসে তার পাণ্ডিত্যের জন্য, তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা-বাকচাতুর্যের খেলায় সঙ্গী হতে পেরে। তার গায়ের রঙ কালো হওয়া সত্ত্বেও। আবার দ্বিতীয়টিকে সে সমান ভালোবাসতে পারে তার মূর্খামি সত্ত্বেও তার দুর্ধর্ষ বেপরোয়া ভঙ্গিমার জন্য। কাকে যে বেশি ভালোবাসে এ প্রশ্নটাই ওঠার কথা নয়!

ওয়াম্বাসী এবার জবাব দিতে পারে না। বোঝে, এতক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় যে আলোচনাটা চলছিল—ডক্টর ব্রয়েড তাঁর শেষ উদাহরণে সেটাকে 'বিশেষ' করেছেন।

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, তাই আপনাকে অনুরোধ করব—সিদ্ধান্তে আসার আগে আর একবার বিবেচনা করে দেখুন। ডরোথির সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিন পরিস্থিতিটা।

: বেশ তাই নেব।

: তাহলে ওকে ডাকি?

: কাকে?

ডাকতে হল না। ডরোথি নিজে থেকেই প্রবেশ করল ঘরে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই গামা-পণ্ডিত বিদায় নিয়ে নির্গত হলেন।

ওয়াম্বাসী বললে, ও! এটা তাহলে তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র?

ডরোথি ঠোঁট উল্টে বললে, ষড়যন্ত্রই তো! তোমাদের মতো গবেটের মাথায় সহজ কথা তো সহজ ভাবে ঢুকবে না। তাই গজাল মেরে ঢোকাবার জন্য দুই গামা-পণ্ডিতকে অগ্রদূত করে পাঠিয়েছিলাম।

: কিন্তু সহজ কথাটা কী, ডরোথি? তুমি কি পারবে আমাদের দুই বন্ধুকে সমান ভাবে ভালোবাসতে?

: এখনই শুনলে না—তোমার ও প্রশ্নটাই অবৈধ। ভালোবাসার ভাগাভাগি হয় না। তোমাকে তোমার জন্য ভালোবাসি—ওকে ওর জন্য। তোমাদের দুজনের সঙ্গে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ডক্টর। ওথেলোকে ভালোবাসি তার বাকপটুতার জন্য—ঠিক ডেস্‌ডিমোনার মত; আর রোমিওকেও ভালোবাসি তার প্যাশনেট লাভের জন্য।

ডরোথি টের পেল না—ওয়াম্বাসী একটা বেদনা বোধ করল। বললে, ঠিক আছে ডরোথি, আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। তুমি এখন বরং এস।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি এখনও আমাকে 'ডরোথি' বলে ডাকছ। আমাকে চলে যেতেও বললে। আমার সঙ্গটাই এখন ভাল লাগছে না তোমার। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাই। তুমি এ্যাস্ট্রনট—তাই হয়তো কথাটা বুঝবে; পৃথিবী থেকে অনেকে মনে করে চাঁদের এক পিঠে অন্ধকার। কথাটা ঠিক নয়। চাঁদের দুটো পিঠই সূর্য প্রণাম করে পর্যায়ক্রমে। একবার এ-পিঠ, একবার ও-পিঠ।

ওয়াম্বাসী হেসে বলে, ঠিক এই কথাটাই তোমাকে বলতে চাই ডরোথি। কাব্যে, সাহিত্যে চাঁদ যে অনন্যা তা সে ঘুরে-ফিরে সূর্য প্রদক্ষিণ করে বলে নয়—সব গ্রহ-উপগ্রহই তা করে; চাঁদের মহিমা তার প্রেমের জ্যোৎস্নায়—যে প্রেম পৃথিবীর প্রতি একমুখী!

ডরোথি বললে, আমারই ভুল! তুমি এ্যাস্ট্রনট নও,—তুমি কবি! ওথেলোর মতো বাকপটু!

*　　　*　　　*

নির্জন ঘরে বিছানায় পড়ে ছটফট করছিল ওয়াম্বাসী। ওর ঘরে দুটি খাট। দুই বন্ধুতে পাশাপাশি শোয়। আজ রাত্রে পাশের খাটটা খালি পড়ে আছে। ওয়াম্বাসী জানে—কেন? রোমিও তার জুলিয়েটের ঘরে রাত কাটাচ্ছে। ওয়াম্বাসী উঠে বসে। আলোটা জ্বালে। রাত একটা। একগ্লাস জল খায়। মুখে-মাথায় জলের ছিটে দেয়। ঘুম আসছে না। আসবেও না। যতক্ষণ না সে তার ঐ একটা গলে যাওয়া পচে যাওয়া কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছে ততক্ষণ এভাবেই তাকে ছটফট করতে হবে। রাতের পর রাত। বাকি জীবন। তাই বলে একটা অসত্যের সঙ্গে, একটা মিথ্যাচারের সঙ্গে আপোস করবে? বাঃ! অসত্য আবার কোনটা? মিথ্যাচার কাকে বলি? মিথ্যা তো ওর কুসংস্কারটুকুই।

মনে পড়ছে—অনেকদিন আগেকার কথা। দ্বৈত-বিবাহের প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটার কথাটা। ও তখন নভোচারী হবার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। ওর দুজন বন্ধু ওকে নিমন্ত্রণ করেছিল। পল রজার্স আর ভিনসেন্ট উইলসন। ওরা দুজনে একই কোম্পানিতে কাজ করত। সেলস্‌ম্যান। পল বলেছিল, আজ আমাদের স্ত্রীর জন্মদিন। তুমি আসবে? ডিনারে দু-একটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছি।

ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে বলেছিল, তোমাদের স্ত্রীর জন্মদিন মানে? কার স্ত্রী?

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল পল রজার্স। পার্শ্ববর্তী বন্ধুর দিকে ফিরে বলেছিল, ভিন্, এ কালো-আদমিটাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও! ওদের সমাজে এটার চল নেই।

ভিনসেন্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিল, ও আবার কী কথার ছিরি! কালা-আদমি মানে? তুমি কিছু মনে করো না ওয়াম্বাসী, ব্যাপারটা হচ্ছে এডনা আমাদের দুজনেরই স্ত্রী।

ব্যাপারটা খাতাকলমে জানা ছিল—এমন বাস্তব প্রয়োগের সম্মুখীন হয়নি কখনো এর আগে; ওয়াম্বাসী সামলে নিয়ে বলেছিল, মানে প্লুরাল ম্যারেজ? বহুবাচনিক বিবাহ?

: হ্যাঁ। তুমি আসবে আমাদের স্ত্রীর জন্মদিনে?

প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল ওয়াম্বাসীর। এককথায় সে রাজি হয়ে যায়। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে! সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কে সিনিয়ার? আগে কে বিয়ে করেছিল?

পল বলে, না, সিনিয়ার-জুনিয়ার নেই। তিনজনে একই দিনে বিবাহ করি।

ভিনসেন্ট হেসে উঠেছিল খিলখিলিয়ে। বলে, ব্যাপারটা ভারি মজার, জান? এডনা আমাদের দুজনের সঙ্গেই প্রেমপর্ব চালাচ্ছিল—পর্যায়ক্রমে ডেটিং করছিল। বেচারি টুইড্‌লডাম আর টুইডল্‌ডির মধ্যে কাকে বেছে নেবে স্থির করতে পারছিল না। এদিকে আমরা দুজনে একই কোম্পানিতে কাজ করি। দুজন সহকর্মী হয়ে পড়লাম দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী! অথচ দুজনের পকেটের জোর এত কম যে, গোটা একটা বউ-পোষার ক্ষমতা নেই। শেষ পর্যন্ত তিনজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিলাম। একই দিনে দুজনে বিয়ে করলাম এডনাকে। সব সমস্যার সমাধান হল—আমাদের দুজনেরই কাজ ঘুরে ঘুরে—মাসের মধ্যে পনেরো দিনই ট্যুর। আমরা ট্যুর এমনভাবে ফেলি, যাতে এডনা মাসের কোনদিনই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত না হয়।

: রেজিস্ট্রি-মতে বিয়ে করলে?

: না। রীতিমত চার্চে গিয়ে। চার্চ তো এটা মেনে নিয়েছে।

ওয়াম্বাসী কৌতূহল দমন করতে পারেনি। এরপর প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু এডনা হনিমুনে গেল কার সঙ্গে?

: কেন? দুজনের সঙ্গেই।

আরও হাজারটা প্রশ্ন ওর মনে উদয় হয়েছিল। সৌজন্যবোধে প্রশ্ন করতে পারেনি। দুরন্ত কৌতূহলে ওদের স্ত্রীর জন্মদিনে যোগ দিতে গিয়েছিল। উপহার হিসাবে নিয়ে গিয়েছিল এক জোড়া সৌখিন গ্লাভ্‌স্। পল ওদের স্ত্রীকে বলেছিল—কালা-আদমি হলে কী হয়, বেটার বুদ্ধি আছে। দেখ, ও একটা উপহার আনেনি। এনেছে এক জোড়া। একপাটি গ্লাভস্ পলের বউ এর জন্যে, আর এক পাটি ভিনসেন্টের বউ-এর জন্য।

খুঁটিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিল ওয়াম্বাসী—কিন্তু ওদের সে সুখের সংসারে কোনো ফাটল খুঁজে পায়নি। কী করে এটা সম্ভব? ওদের দু-তিনটি ছেলেমেয়েও আছে। জনান্তিকে পলকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোনটি কার?

পল খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল। ভিনসেন্টের সম্মুখেই বলে উঠেছিল, এডনা, আমাদের বন্ধু কি প্রশ্ন করছে শোন! বলছে, কোনটা কার? তুমিই বলে দাও—কোন বাচ্চাটার বাপ কোন হতভাগা!

কান লাল হয়ে উঠেছিল ওয়াম্বাসীর।

এডনা—এডনা কী? এডনা রজার্স? না এডনা উইলসন? না, এডনা পার্কার বিবাহের পরেও কুমারী-জীবেনর পৈতৃক উপাধিটা ব্যবহার করে। এডনা সহজভাবেই বলেছিল : সন্তান আমাদের। আমার, পলের এবং ভিনসেন্টের।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ওয়াম্বাসী। সে সিদ্ধান্তে এসেছে। পল, এডনা আর ভিনসেন্ট যদি দশ-বারো বছর আগে পেরে থাকে, তবে সেও পারবে। কেন পারবে না? এভাবে রাতের পর রাত বিছানায় ছটফট করার কোনো অর্থ হয়? সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে তাকে।

তখনই উঠে পড়ে বিছানা থেকে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। দুমদুম করে পা ফেলে চলে আসে ডরোথির ঘরে। সে-ঘরে এই এত রাত্রেও আলো জ্বলছে। ওয়াম্বাসী রুদ্ধদ্বারে কারাঘাত করে।

: হুস দ্যাট? ববের কণ্ঠস্বর।

: আমি ওয়াম্বাসী। দরজা খোল।

: জাস্ট এ মিনিট!

মিনিটতিনেক পরে বব্ রয় এসে দ্বার খুলে দেয়। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। একটা স্লিপিং স্যুটের পায়জামা তার পরনে। ডরোথিকে দেখা যায়—তার পরিধানে কী আছে বোঝা যায় না। সে খাটে শুয়ে আছে। তার গলা পর্যন্ত একটা চাদর টানা। বব্ বলে, কী ব্যাপার? এত রাত্রে?

: আমি রাজি।

: রাজি? মানে?......ও আই সী! তা সেটা তো কাল সকালেও বলতে পারতিস্।

ওয়াম্বাসী লজ্জা পায়। বলে, আয়াম সরি। ডিসটার্ব করলাম বোধ হয়। আচ্ছা চলি, গুড নাইট!

বব্ ওর হাত চেপে ধরে। বলে, চলি কী রে? তুই যখন রাজি তখন আর ও-ঘরে যাচ্ছিস কেন? ভেতরে আয়!

কেমন একটা বিবমিষার বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ওয়াম্বাসী। চোখ তুলে দেখে একবার ডরোথির দিকে। সে নির্বাক। না আবাহন, না বিসর্জন। ওয়াম্বাসী বলে, না। সে আমি পারব না। আমি যাই।

বব্ খোলামনেই ব্যাপারটা নেয়। বলে, বেশ। তবে যা। ঘুমোগে যা।

এগারো

পরদিন একে একে অনেকেই এসে ওয়াম্বাসীকে অভিনন্দন জানালেন। সদ্য-কারামুক্ত আইনস্টোন, ব্রয়েড প্রভৃতি। ওয়াম্বাসীর অজান্তে বব্ রয় সুখবরটা সকলকে জানিয়েছে। গামা-পণ্ডিতেরা সবাই সে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে খুশি। অনেক—অনেকদিন পরে একটা বিবাহ-উৎসব হচ্ছে। ওয়েডিং-পার্টি। যুদ্ধ চলা-কালে সেটা ঠিকমতো জমবে না—স্থির হয়েছে, যুদ্ধান্তে বিজয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই ত্রিকোণাকৃতি বিয়ের ভোজটা দেওয়া হবে। মিডলটন বলেছেন, তিনি এই বিচিত্র বিবাহ নিয়ে একটি সনেট রচনা করবেন, 'এ্যান ওড টু ডেস্‌ডিমোনা-কাম-জুলিয়েট'। বিটল্‌ফেন বিবাহ-রাত্রে একটি অর্কেস্ট্রা উপহার দেবেন—নিওট্রায়াঙ্গুলার-ঈডেন-সিম্‌ফনি'। দা-ভেংচি ওদের তিনজনের একটি চিত্র আঁকবেন : দ্যা হ্যাপী ফ্যামিলি! এমনকি গার্লস গারউইন পর্যন্ত স্থির করেছেন, তাঁর 'এ্যানিহিলেশন অব্ স্পেসিস্' গ্রন্থের পরিবর্তে লিখবেন : 'রেসারেক্‌শান অব স্পেসিস্'—মানব-প্রজাতির পুনর্জন্ম।

ওয়াম্বাসী কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারছিল না—এত লোকে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল; কিন্তু বিশেষ একজন একবারও তার কাছে এল না। সে কি তাহলে অন্তর থেকে এটা চায়নি? শুধু ববের অনুরোধে রাজি হচ্ছিল?

চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ওয়াম্বাসী সকলকে বললে, আপনারা একটা জিনিস ভুলে বসে আছেন—যুদ্ধটা এখনও শেষ হয়নি। রুডল্‌ফ ব্যাটলার আর আর্থার ক্রুক্‌স্ তাদের গোপন বাঙ্কারে কী ষড়যন্ত্র করছে তা আমরা জানি না। যে কোন মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণে ওরা আমাদের সমস্ত শুভ পরিকল্পনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তাদের গোপন আস্তানাটা যে কোথায় সে-খবরটুকু পর্যন্ত এখনও আমরা জানি না।

ডিফিটস্টোন চারশকুন বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা ডক্টর ওয়াম্বাসী। ইতিমধ্যে আমাদের গুপ্তচর বাহিনী সন্দেহাতীতভাবে সে খবর জেনেছে।

: কোথায়? বব্ সোৎসাহে প্রশ্ন করে।

মিস্টার চারশকুন বলেন, মাফ করবেন, সম্রাটের বিনা অনুমতিতে সে গোপন তথ্যটা আমি আপনাদের জানাতে পারব না। সম্রাট এখনই আসবেন। আমরা তাঁরই প্রতীক্ষা করছি।

তাই এলেন সম্রাট। নকিব তাঁর নাম ঘোষণা করল। শিঙেদাররা শিঙে ফুঁকলো। সবাই যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সম্রাট ভারিক্কি চালে এসে বসলেন, সবাইকে বসতে বললেন। তারপর ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বললেন, সম্রাটের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি আপনারা বিবাহ করছেন জেনে। কই, বধূমাতা কোথায়?

ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল বলেন, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। এখানে আমরা সামরিক বিষয়ে আলোচনা করব। তাই তাঁকে আনা হয়নি।

সম্রাট বলেন, অ। তা ভালই হয়েছে। লড়াই-কাজিয়ার ঝামেলা মিটে যাক; তার পর আমরা গ্র্যান্ড স্কেলে বিবাহ-উৎসবের আয়োজন করব। তোমার মনে আছে ওয়াম্বাসী? দারাউস ফৌত হবার পর আমি কেমন একখানা মহাবিবাহের ব্যবস্থা করেছিলুম— পারস্যের সেই সুসা-নগরীতে?

একজন গামা-পণ্ডিত বলেন, সম্রাট ভুল করছেন, ওয়াম্বাসী তখনো জন্মায়নি।

: তুমি থামো তো হে ছোকরা! ডক্টর ওয়াম্বাসী তোমার মতো পাগলও নয়, মূর্খও নয়—ও বইটই পড়ে। কী ওয়াম্বাসী!

ওয়াম্বাসী বলে, মনে আছে সম্রাট। আপনি আপনার সৈন্যদলের প্রত্যেককে একটি করে পারসিক রমণীরত্ন উপহার দিয়েছিলেন।

: তবে? এবং নিজে বিয়ে করেছিলুম দারাউসের কন্যাকে। ছুঁড়ি বড় ছিঁচকাঁদুনে! বাপের বীভৎস মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না। আবার ওকে বিয়ে করার জন্য রোক্সানার মুখখানা হল

তোলোহাঁড়ি! রোক্সানাকে মনে আছে তো? সমরখন্দের রাজকন্যা—তাকে আগেই বে' করেছিলুম যে! সে এক মহা-বখেড়া, দুই সতীন নিয়ে......

চারশকুন বাধা দিয়ে বলেন, মহামহিম সম্রাট! আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত। বর্তমানে আমরা যুদ্ধ-পরিচালনা বিষয়ে—

: জানি রে বাপু জানি। দু-দণ্ড যে সমঝদার লোকের সঙ্গে খোশগল্প করবো তার জো নেই! তা বেশ, যুদ্ধের পরিকল্পনার কথাই বল—কী বলছিলে?

: সেই নরাধম আর্থার ক্রুকস্ এবং তার দক্ষিণহস্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যাটলার বর্তমানে কোথায় শিবির সংস্থাপন করেছে তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। সেটি একটি বিধ্বস্ত নাইট-ক্লাব-বাড়ি। শহরের ও-প্রান্তে! আমার প্রস্তাব—আজ রাত বারোটার সময় একটি বাহিনী গিয়ে প্রথমে সেটা 'রেকনয়টার' করে আসবে—

: কী করে আসবে? সম্রাট জানতে চান।

: আজ্ঞে রেকনয়টার—অর্থাৎ দুর্গপ্রবেশ পথের সুলুকসন্ধান জেনে আসবে। কাজটা দুরূহ। আমার প্রস্তাব, এই দুজন মানুষ কিছু ডেলটা সৈন্য নিয়ে—

: না। সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এত বড় গুরুতর কাজে আমি ঐ দুটো চ্যাংড়া মানুষের বাচ্চাকে পাঠাতে পারি না। যুদ্ধের ওরা কী জানে? কী বোঝে? ওরা আকাশে পাড়ি দিতেই জানে—যুদ্ধবিদ্যা শেখেনি। আমি এ অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করছি—আমার অজেয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারলে ডিফিটস্টোন চারশকুনকে। সেনাপতি চারশকুন! উঠে দাঁড়াও। আমার সামনে এস।

চারশকুন রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। হন্তদন্ত হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

: নতজানু হও। এই তরবারি গ্রহণ কর। আর ইয়ে, মুখ থেকে চুরুটটা ফেলে দাও!

চারশকুন চুরুটটা ফেলে দেয় বটে তবে নতজানু হয় না। বলে, য়োর ম্যাজেস্টি! আমাকে....আপনি....এ কী করছেন? যুদ্ধের আমি কী জানি?

সম্রাটের চোখ দুটো কপালে উঠে যায়। বলেন, মানে? তুমি আমার প্রধান সেনাপতি......

: না স্যার....ইয়ে.....আমি যুদ্ধমন্ত্রী। ওসব গোলাবারুদের কাছাকাছি যাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। আমি দূর থেকে শুধুমাত্র যুদ্ধ পরিচালনা করি। আর....ইয়ে....তরোয়াল কী হবে? ওসব আজকালকার যুদ্ধে কোনো কাজেই লাগে না।

সম্রাট হতাশ হয়ে ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বলেন, দেখলে? এদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। যুদ্ধ করবে—অথচ একটা ঘোড়া নেই, একটা বর্শা নেই, তরোয়াল নেই!

বব্ বললে, ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না স্যার। ব্যাপারটা আমরাই ম্যানেজ করে নেব। আপনি আমাদের এই-নয়া যুদ্ধের রীতিনীতিটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। একটা 'জেনারেশন গ্যাপ' হয়ে গেছে কিনা....

সম্রাট বলেন, 'জেনারেশন গ্যাপ' নয় হে ছোকরা, কথাটা 'মিলেনিয়াম গ্যাপ'। তা বেশ। তোমরাই সব ব্যবস্থা কর। তা আমি, সম্রাট, আমি কী করব?

চারশকুন বলেন, আপনি অনুমতি দিয়েছেন। আপাতত আর কিছু করণীয় নেই আপনার। আপনি বরং এবার গিয়ে ঐ গডফাদারকে সামলান। আমরা এদিকটা ম্যানেজ করছি।

সেই মতোই ব্যবস্থা হল। সম্রাট বিশ্রাম করতে গেলেন। যুদ্ধের যাবতীয় পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করলেন চারশকুন স্বয়ং। তাঁর প্রস্তাব—ওয়াম্বাসী আর বব্ রয় দুজনে আজ রাতে যাবে দুর্গটাকে দেখে আসতে। আগামীকাল শেষ রাত্রিতে অতর্কিত আক্রমণ করা হবে। সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়েই সভাভঙ্গ হত, বাধ সাধলেন জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইন। বললেন, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি আছে। ওদের দুজনকেই এই বিপদজনক কাজে একসঙ্গে পাঠানো চলবে না।

চারশকুন গম্ভীরভাবে বলেন, কারণটা জানতে পারি?

: পারেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হল মানব-প্রজাতির বংশবৃদ্ধি। পৃথিবীকে নতুনভাবে ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলা। একটি মেয়ে হোমো-স্যাপিয়ান্স-স্যাপিয়ান্স পাওয়া গিয়েছে। আর আছে একজোড়া হুলো। একটা আপনার, যুদ্ধ করবে। একটা আমার, বাচ্চা পয়দা করবে!

চারশকুন হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, মিস্টার গারউইন, আপনি কি চান, ব্যাটলারের মতো আমি আপনাকে ধরে গারদে বন্ধ করি? আপনি পঞ্চম বাহিনীর কাজ করছেন!

গারউইন স্তম্ভিত হয়ে যান। বাক্যস্ফূর্তি হয় না তাঁর। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের হয়ে এবার প্রত্যুত্তর করলেন নবীন-বিজ্ঞানী আইনস্টোন। বললেন, মিস্টার চারশকুন! আপনি কি চান ব্যাটলারের মতো আপনাকেও আমরা সরিয়ে দিই? ভুলে যাবেন না—বৈজ্ঞানিকদের সাহচর্য ছাড়া এ-যুগে যুদ্ধ করা যায় না। জীববিজ্ঞানী গার্লস্ গারউইন আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর সম্মান রেখে কথা বলবেন—না হলে সমস্ত গামা-পণ্ডিত আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং ঐ দুজন মানুষের বাচ্চাও।

চারশকুন সমবেত গামামণ্ডলীর ওপর চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা প্রণিধান করেন। বলেন, না মানে, ওঁকে আমিও সম্মান করি! তা বেশ তো। দুজন একসঙ্গে না হয় নাই গেল। একজনই যাক। কে যাবে?

বব্ রয় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি!

ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে, না। আমি।

দ্য-ভেংচি বলেন, এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান লটারি করা। আমি দুটি কাগজে দুটি নাম লিখে টুপির ভেতর রাখছি। বিটল্‌ফেন, তুমি একটা তোলো। যার নাম উঠবে সে-ই যাবে দুর্গ পরিদর্শনে।

বিট্‌লফেন বলেন, সেই ভালো। চলো, এখনি আমার নবতম সৃষ্টিটি তোমায় শুনিয়ে দিই।

চারশকুন বলেন, ও বদ্ধ কালাকে টানাটানি করার দরকার নেই। নাম দুটো টুপিতে ফেলে আমাকে দাও। আমি একটি তুলি।

দ্য-ভেংচি দ্রুতহস্তে দুটি নাম দুটুকরো কাগজে লিখে ভাঁজ করে তাঁর টুপির মধ্যে ফেলে দেন। তারপর টুপিটা বাড়িয়ে ধরেন চারশকুনের দিকে। তিনি একটি কাগজ তুলে ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়বার চেষ্টা করেন। সামনে দূরে নানান ভাবে ধরেও তার পাঠোদ্ধার করতে পারেন না। বলেন, এ কী লিখেছেন? মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাগজটায় লেখা ছিল : সীম্বায়াও রক্টড!

ডক্টর ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। বলে, ওটা আমার নাম! আমিই যাব।

বব্-ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, জেন্টল-রোবোস্! আপনারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনারা এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা রোবোদের প্রজা। তা নয়। আমরা দুজন স্বাধীন। ডক্টর ওয়াম্বাসী আমার সহকর্মী, কিন্তু আমিই হচ্ছি শিপ-ক্যাপ্টেন। আমার কমরেডকে এমন বিপজ্জনক যাত্রায় আমি একা যেতে দিতে পারি না। আমরা দুজনে গেলে দুজনেই মারা যাব—এমন আশঙ্কা করা অমূলক। বরং দুজন থাকলে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করতে পারব। ফলে আমরা দুজনেই যাব।

ওয়াম্বাসী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ঘরের ও-প্রান্ত থেকে কে যেন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, আমার তাতে আপত্তি আছে।

সকলেরই দৃষ্টি পরে দ্বারের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি।

ওয়াম্বাসী যে-কথা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই কথাটাই বলেছে ডরোথি। কিন্তু তাতে যেন সে খুশি হতে পারে না। বলে, ভেতরে এস ডরোথি। এদের বুঝিয়ে বল, কেন এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি!

ডরোথি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। বলে, আমার মতে ওঁদের দুজনের এ অভিযানে একসঙ্গে যাওয়া ঠিক নয়। গার্লস্ গারউইন যা বলেছেন তা যুক্তিপূর্ণ। তাছাড়া আমি জানি—ডক্টর বব্ রয়ের কাঁধের ব্যথাটা সম্পূর্ণ সারেনি। কাল সারারাত তিনি একফোঁটা ঘুমোতে পারেননি। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করেছেন।

বব্ কিছু বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ ডরোথির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। হেসে ফেলে। গার্লস্ গারউইন বলেন, প্লীজ ডক্টর রয়, আপনি আর আপত্তি করবেন না!

বব্ একটা শ্রাগ্ করে বললে, অগত্যা। সবাই মিলে যখন বলছেন.....

ওয়াম্বাসী আর থাকতে পারে না। বলে ওঠে, হ্যাঁ, শুধু জেন্টল-রোবোস্‌রা নয়, একমাত্র হিউমান লেডিটি পর্যন্ত যখন বলছেন!

অগত্যা তাই স্থির হল।

ওয়াম্বাসী কী জানি কেন তখন ক্ষেপে গিয়েছে। সভাভঙ্গ হওয়ার পর সে জনান্তিকে ডরোথির সঙ্গে দেখা করল। গতকাল মধ্যরাত্রিতে সে যখন তার সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়েছিল, তার পর থেকে ডরোথি ওর সামনে আসেনি। এখন ওর ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কী ব্যাপার? ডাকছ?

: হ্যাঁ। সকাল থেকে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে এল, কই তুমি তো একবারও এলে না?

ডরোথি বললে, এতে আবার অভিনন্দন জানাবার কী আছে? নিতান্ত একটা জৈবিক বৃত্তিকে অবদমনের চেষ্টা করেছিলে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে। এতক্ষণে তোমার শুভবুদ্ধি হয়েছে—এটা নিশ্চয় আনন্দের কথা; কিন্তু সেজন্য তোমাকে ফুলের মালা পরাতে হবে এমন কোনো কারণ দেখি না।

ওয়াম্বাসী বললে, আমার জন্যে ফুলের মালা গাঁথতে তোমাকে অনুরোধ করিনি। হ্যাঁ স্বীকার করছি—ভুল আমার হয়েছিল, তোমার দক্ষ অভিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কথাই সত্য—বোধ করি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জৈবিক বৃত্তির ঊর্ধ্বে কোনদিনই উঠবে না।

: এসব কী বলছ তুমি? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।

: পারার কথাও নয় যে ডরোথি। জৈবিক-বৃত্তির অতিরিক্ত অনুরাগ-ঘন সম্পর্কের কথা তোমার মাথায় ঢুকবে না। সে শিক্ষা তোমার নেই। তাই সোজা সোজা ভাষায় বলি—কাল সারারাত আমিও ঘুমোতে পারিনি। আজ তাই আমি একা শোব না। বব্-এরও ঘুমটা হওয়া দরকার। কথাটা তোমার, তাই সে এ ঘরে একা শোবে! বুঝেছ?

ডরোথির ওষ্ঠপ্রান্তে এক-চিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললে, কিন্তু তুমি তো আজ রাত্রে সেই অভিযানে যাচ্ছ?

ঃ সারারাত নিশ্চয় সেখানে ঘুরব না! ফিরে এসে যেন দেখি বব্ আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে!

: বব্‌কেই অনুরোধটা করে দেখ না!

: না। বব্‌কে অনুরোধটা তুমি করবে।

বিচিত্র হেসে ডরোথি বললে, বিয়ে না হতেই স্বামীত্ব ফলাচ্ছ! আয়াম সরি নিগার! তুমি কোনদিনই সেই গত শতাব্দীর ধ্যানধারণা থেকে—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, নিগার! নিগার মানে?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল ডরোথি। বলে, ওমা! তুমি আদর-সোহাগও বোঝ না? ওটা আদরের গালাগাল! বব্ যেমন ডাকে তোমাকে।

: বব্ আর তুমি এক নও! আমাকে ও নামে ডাকবে না।

: বেশ। ধন্যবাদ ডক্টর ওয়াম্বাসী। আপনার আদেশটা মনে রাখবার চেষ্টা করব।

দুম্‌দুম্ করে পা ফেলে ওয়াম্বাসী স্থানত্যাগ করে। সুর কেটে গিয়েছে। কোথায়—কেন এ প্রভেদ? তার গায়ের রঙ? তার ভদ্র মন? ডরোথির আজন্ম নিগার-বিদ্বেষ? নাকি খোঁচা দেওয়াতেই ঐ মেয়েটির তির্যক বিলাস! বব্‌কেও সে কথায় কথায় এভাবে খোঁচা মারে? এটাই কি ওর স্বভাব?

*　　　　*　　　　*

রাত দুটোর সময় ওরা ফিরে এল অভিযান থেকে। আর্থার ক্রুক্‌স্-এর দুর্গটা বাইরে থেকে পরিদর্শন করে। শত্রুপক্ষ টের পায়নি। কোনো সাড়াশব্দ জাগেনি কোথাও! অভিযান থেকে ফিরে এসে ওয়াম্বাসী ডেলটা সৈন্যদের বিদায় দিয়ে ওদের আবাসে পৌঁছে দেখে সমস্ত বাড়িটা নিশুতি। কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। ওয়াম্বাসী উঠে আসে দ্বিতলে। নিজের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালে। পাশাপাশি দুটি খাটে বিছানা পাতা। বব্ এ ঘরে নেই। ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ চলে যায় ও-ঘরে। করিডরের ও-প্রান্তে ডরোথির ঘরে। দ্বারে করাঘাত করতেই সেটা খুলে গেল। সে-ঘরেও কেউ নেই। না ডরোথি, না বব্!

বারো

পরদিন সকালে দেখা হতেই বব্ বললে, হাই নিগার! কাল কত রাত্রে ফিরলি?

: রাত দুটোয়।

: মিশন সাক্‌সেসফুল?

: তা বলতে পারিস। কিন্তু তুই কাল রাতে কোথায় ছিলি?

: আমরাও একটা এক্সকার্শানে গিয়েছিলাম। দারুণ চাঁদনী রাত ছিল তো—গরমও ছিল। ও বললে, চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসি। আমরা চাদর-বালিশ নিয়ে—

: বুঝলাম। কিন্তু তোর না কাঁধে ব্যথা! যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোতে পারিস না?

: অশ্বডিম্ব! জুলিয়েটের চালাকি! শোন নিগার, পর পর দু-রাত আমি ও-ঘরে শুয়েছি। আজ তোর চান্স।

ওয়াম্বাসী বললে, তুই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস দেখছি! আজ না 'ডি. ডে'.!

: ডি-ডে.! ও, হ্যাঁ—তা বটে, আজ আমরা আক্রমণ করব। কে ফিরে আসব—আদৌ কেউ ফিরে আসব কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

ওয়াম্বাসী জবাব দেয় না। চুপ করে সে কী যেন ভাবে।

: তুই কী ভাবছিস্ বল তো?

ওয়াম্বাসী মনস্থির করে বলেই ফেলে, বাস্টার্ড! বন্ধু হিসাবে একটা অনুরোধ করব, রাখবি?

বব্ হাসে। বলে, অত ভণিতা করছিস কেন রে নিগার? নেহাত অদেয় না হলে কোনোদিন তোকে বিমুখ করেছি?

: আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের এ অভিযানে যাওয়াটা ঠিক নয়। যদি দুজনেই মারা যাই তাহলে—

কথাটা সে অসমাপ্ত রাখে। বব্ চিন্তান্বিত। একটু ভেবে নিয়ে বলে, তোর কথাটা ফেল্‌না নয়। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে, অন্যান্য মহাদেশে মানুষ আছে কিনা আমরা জানি না। সবই ডার্ক কন্টিনেন্ট! আবার আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয় নতুন ম্যাগেলান, নতুন কুক্, ভাস্কো-দা-গামা নতুন জগতের সন্ধানে বার হবেন। সেই পালতোলা জাহাজে। আবার নতুন করে মানব সভ্যতার বিকাশ হবে। আর সেটা সম্ভব হবে যদি তুই-আমি দুজনের মধ্যে অত্যন্ত একজন বেঁচে থাকি! যদি ডরোথি আমাদের কোনো একজনের সন্তানের মা হতে পারে!

: তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুই থাক। আমাকে একাই যেতে দে। ঐ আর্থার ক্রুক্স্ লোকটাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করব—সে মানুষ, কেন বুঝবে না?

: কিন্তু তুই যাবি কেন? আমি নয় কেন?

: যেহেতু আমি নিগ্রো! আমি নিগার! তোকে সে গুলি করেছে। হয়তো আমাকে করবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়তো সে রাজি হবে।

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বব্ বললে, ধর যদি তার সুবুদ্ধির উদয় না হয়?

: তখন তাকে বধ করব আমি!

: পারবি? সেটা আমার পক্ষে অনেক সহজ হবে রে নিগার! হাজার হ'ক—লোকটা তোর স্বজাতি, হয়তো এই দুনিয়ায় সে তোর একমাত্র জাতভাই!

ওয়াম্বসী দৃঢ়স্বরে বলে, হোক। আমি আগে মানুষ, পরে নিগ্রো। যদি গোটা মানব-প্রজাতিটাই লুপ্ত হতে বসে, তাহলে স্বজাতি-নিধনে আমার সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়। আমি পারব। নিশ্চয়ই পারব।

বব্ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

ওয়াম্বাসী বলে, তাহলে ভাই আর একটা কথা বলি। কিছু মনে করিস না।

: বল না! অত আমতা আমতা করছিস কেন?

: আমতা আমতা করছি এজন্য যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে—কথাটা তুই বুঝতে পারবি না—

: কী এমন তত্ত্বকথা, বলই না?

: দ্যাখ বাস্টার্ড! আজ আমরা তিনজন—তুই আমি আর তোর জুলিয়েট একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা একটা নতুন পৃথিবী সৃজন করতে যাচ্ছি। নতুন ঈডেনে প্রবেশ করবে নতুন কালের আদম আর ঈভ। আমি চাই না, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না—যদি তার মূলে থাকে শুধুমাত্র একটা জৈবিক প্রবৃত্তি!

বব্ সত্যিই কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে। পারে না। স্বীকার করে সেকথা। ওয়াম্বাসী হতাশ হয়ে বলে, কেমন করে তোকে বোঝাই বাস্টার্ড? তুই যে ইতিহাস-কাব্য-সাহিত্যের পাতাই ওল্টাসনি কোনোদিন! সৃষ্টির মূলে যদি প্রেম না থাকে—'প্রেম', যা কামের চেয়েও বড়—সেই ভালোবাসার বনিয়াদের ওপর যদি এ নতুন বিশ্বকে গড়তে না পারি তাহলে আবার এ সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যাবে—যেমন গিয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গত-কল্পের সভ্যতা। তোর জুলিয়েট তোকেই ভালোবাসে—আমাকে নয়। তোর দৃষ্টি দিয়ে তুই তা বুঝতে পারছিস্ না। ওর চোখে আমি—নিগ্রো, আমি নিগার! আমাকে সে বারে বারে সংস্কারাচ্ছন্ন করে ব্যঙ্গ করে; আসলে সে নিজেই আবদ্ধ আছে গত শতাব্দীর একটা কুসংস্কারে—সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার পার্থক্যটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

: অসম্ভব! তাহলে সে তোকে কিছুতেই....সে তো আগে তোকেই.....

: জানি। তার কারণ 'প্রেম' নয়, 'কাম'! শুধু সে বেচারিকে দোষ দিয়ে কী হবে—হয়তো আমিও তাকে আর ভালোবাসতে পারবো না। আমার ডেস্‌ডিমোনা একরাত্রের অভিনয় সেরে হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো আমিও তাকে আজ ঘৃণা করি।

বব্ অনেকক্ষণ জবাব দেয় না। কী যেন ভাবছে সে! তারপর বলে, কথাটা সত্যিই নিগার? তুই ওকে ঘৃণা করিস?

ওয়াম্বাসী দু-হাতে মুখ ঢাকে। সেও অনেকক্ষণ সময় নেয় জবাব দিতে। বোধ করি অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত একবার তলিয়ে দেখে নেয়। তারপর মুখ থেকে হাত সরায়। হাসে। বলে, না রে বাস্টার্ড! ভুল বলেছিলাম। রাগের মাথায়। তোকে ঈর্ষা করি বলে। না, ডেস্‌ডিমোনাকে আমি ঘৃণা করি না—তাকে আজও ভালোবাসি। সে আমাকে ঘৃণা করে জেনেও।

বব্ বলে, ওকে ডাকব?

ওয়াম্বাসী ববের হাত চেপে ধরে : না। এ সিদ্ধান্ত শুধু তোর আর আমার!

বব্ আবার চিন্তামগ্ন হল। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, ডক্টর ওয়াম্বাসী! য়োর শিপ্-ক্যাপ্টেন হ্যাজ কাম টু এ ডিসিশন! আমি সিদ্ধান্তে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এ অভিযানে যাব না। কিন্তু কে যাবে তা স্থির করব লটারি করে। বি এ স্পোর্ট!

ওয়াম্বাসী বললে, আমি রাজি নই। তুই আমাকে যেতে দে।

: কেন বল দিকিনি!

: কেন? সেটাই তো এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম! তাহলে তোকে খুলেই বলি। কাল রাত্রে আমি তোর জুলিয়েটকে বলেছিলাম, রাত্রে আমি তার ঘরে শোব। তাই আমাকে এড়াবার জন্যই সে এভাবে তোকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিল।

বব্ শুধু বললে, আয়াম সরি! হ্যাঁ, আমারই অন্যায়। পর পর দু-রাত...... ওয়েল! যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আয়, এবার লটারি করি!

ওয়াম্বাসী বলে, লটারি যদি করতেই হয়, তাহলে তোর জুলিয়েটকে ডাক। তার সামনেই সেটা হোক।

বব্ গম্ভীরভাবে শুধু বললে, 'তোর জুলিয়েট' নয়, ডক্টর ওয়াম্বাসী! হয় তুমি ওকে ডেস্‌ডিমোনা বলে ডেকো, নাহলে ডরোথি বলে! 'জুলিয়েট' ডাকটা আমার জন্যেই তোলা থাক।

'ডক্টর ওয়াম্বাসী'!— ওয়াম্বাসী চমকে ওঠে। তবে কি বব্‌ও ওকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে? নাকি সেই মেয়েটা জনান্তিকে বব্‌কে জানিয়েছে তার মুখে 'নিগার' সম্বোধনটায় আপত্তি জানিয়েছিল ওয়াম্বাসী! সেও গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, ডাকো তাকে।

ডরোথি আসতেই বব্ বললে, ডরোথি! কাল ওয়াম্বাসী তোমাকে কিছু অনুরোধ করেছিল?

ওয়াম্বাসী নজর করল, তার সম্মুখে ঐ মেয়েটিকে বব্ তার দেওয়া প্রিয় নামে সম্বোধন করল না। পল আর ভিনসেন্ট যেভাবে এডনাকে ভাগ করে নিয়েছিল, ওরা দুজন বোধ করি সেভাবে ডরোথির ব্যক্তি-সত্তাকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারবে না। কেন? তারা সাদা আর কালো বলে?

ডরোথি ভ্রূ কুঁচকে বললে, নিক্তি ধরে প্রেম করতে আমি পারব না।

ওয়াম্বাসী বলে, ও কথা থাক। যেজন্য তোমাকে ডাকা হয়েছে তাই বলি। আমরা দুজনে স্থির করেছি আজ আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই যাবে আর্থারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। কে যাবে তুমি নির্বাচন করে দেবে?

মেয়েটি ববের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বললে, আমি তার কী জানি?

: তোমার কোনো মতামত নেই? জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: থাকলেও তা জানাতে আমি বাধ্য নই।

বব্ বললে, আমরা স্থির করেছি লটারি করে সেটা স্থির করব। ঐ টেবিলের ওপর দুটি নাম লেখা কাগজ আছে। তুমি একটা তুলে দাও। যার নাম-লেখা কাগজ উঠবে সেই যাবে আর্থারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

ডরোথি একটু ইতস্তত করল। তারপর উঠে গেল টেবিলের কাছে। দুটি ভাঁজ করা কাগজের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর মরিয়া হয়ে একখণ্ড কাগজ তুলে নিল। ভাঁজ খুলে দেখল। তার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে।

বব্ ঘরের এ-প্রান্ত থেকে বলে, কী? কার নাম?

ডরোথি জবাব দেয় না। তার রক্তহীন ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

জবাব দেয় ওয়াম্বাসী। কাগজটা সেও দেখতে পায়নি। তবু নিঃসন্দেহে বলে, আয়াম সরি, শিপ্-ক্যাপ্টেন! নামটা তোমার।

বব্ দুমদুম করে এগিয়ে যায়। কাগজটা ডরোথির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেখে। হাসে। বলে, য়ু আর করেক্ট নিগার! কনগ্রাচুলেশন্স। আমিই যাবো। এসো।

ওর জুলিয়েটের হাত ধরে বব্ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ওয়াম্বাসী বিহ্বলের মতো বসে থাকে একা।

তেরো

আলোর সামনে বোতলটা তুলে দেখল বব্ রয়। আর এক পেগ মতো বাকি আছে। ঘড়ির দিকেও এক নজর তাকিয়ে দেখল। দুটো বেজে দশ। ঠিক আড়াইটের সময় তার অভিযানে বের হওয়ার কথা। ওয়াম্বাসীর থিয়োরিটা সে মেনে নিতে পারেনি। আর্থারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দলে টানার চেষ্টা সে আদৌ করবে না। পরিচয় হয়নি, তবু লোকটা বব্‌কে গুলি করে মারতে চেয়েছিল। এডকে সে কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে। ফলে বব্ তাকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করতে পারে না। ব্লাডি! বাস্টার্ড! নিগার! হুইস্কির তলানিটুকু পানপাত্রে ঢালতে ঢালতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো বব্। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। সেই দলছুট নাইটেঙ্গেলটারও আজ রাত্রে ঘুম নেই। এই স্তব্ধ পৃথিবীতে এই মধ্যরাত্রে সেই পাখিটাই জাগিয়ে রেখেছে প্রাণের সাড়া। না। আরো একজন আছে। ঐ খাটের ওপর। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

: কী আশ্চর্য! এভাবে কাঁদছ কেন? তুমি যেন ধরেই নিয়েছ আমি বেঁচে ফিরব না!

ডরোথি উঠে বসে। চোখ তুলে তাকায়। তার দুটি সুন্দর নীল চোখের তারা যেন রক্তসমুদ্রে

অবগাহন করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললে, আমি....আমি নিজে হাতেই তোমার নামটা তুলেছি!

: তাতে কী হল? বি এ স্পোর্ট! লটারি—লটারিই!

: তোমরা....তোমরা নিষ্ঠুর! নিজে হাতে আমাকে দিয়ে আমার মৃত্যুপরোয়ানা লিখিয়ে নিলে!

বব্ বললে, মিথ্যে কথা বলোনা জুলিয়েট। তোমাকে আমরা সুযোগ দিয়েছিলাম বেছে নিতে। তুমি রাজি না হওয়াতেই আমরা লটারি করে—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ডরোথি বলে, কেন? তোমরা জানতে না? আমার কী ইচ্ছা তা জানতে না? তুমি বুঝতে পারোনি? সেই নিগারটা বুঝতে পারেনি? আর য়ু অল ইডিয়টস!

: প্লীজ জুলিয়েট! শান্ত হও। দেখো, আমি ঠিক বেঁচে ফিরে আসব।

: কিন্তু যদি....যদি....

: তাহলেও তুমি বিধবা হবে না। হা-হা করে হেসে ওঠে মদ্যপটা।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় ডরোথি। বলে, না। সেবার যা বলেছিলাম এবারও তাই বলছি। ঐ নিগারটার বিছানায় শোওয়ার আগে আমি আত্মহত্যা করব।

বব্ স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, কী বলছ তুমি? তুমি তো নিজেই বলেছ—তাকে তুমি স্বেচ্ছায় সেরাত্রে....

: হ্যাঁ। কিন্তু তখন তো আমি তোমাকে চিনতাম না!

বব্ পানীয়টুকু কণ্ঠনালিতে ঢেলে দেয়।

: প্লীজ রোমিও! তুমি ওকে যেতে দাও। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

বব্ পানপাত্রটা আছড়ে মাটিতে ভাঙে। ঘরময় পদচারণ করতে থাকে। তারপর ফিরে এসে বলে, তা হয় না। আমি স্পোর্টস্‌ম্যান।

ডরোথি বলে, স্পোর্টসম্যান! তাহলে তুমি এখানে কেন? তোমার সেই নিগার বন্ধুই বা তার ঘরে একা পড়ে আছে কেন? পর পর তিন রাত্রি আমাকে অধিকার করে আছ কি স্পোর্টস্‌ম্যানশিপের পরাকাষ্ঠা দেখাতে?

মদ্যপটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। বিড়বিড় করে বলে, করেক্ট! আমার অন্যায় হয়েছে।

: না, অন্যায় হয়নি! কারণ তুমি স্পোর্টস্‌ম্যান নও, তুমি লাভার। খেলোয়াড় নও, তুমি প্রেমিক!

বব্ উঠে দাঁড়ায়। বলে, না। কারণ সেটা নয়—কারণটা কী তা নিগার জানে! তাই সে আজ তার দাবি পেশ করেনি। হি হিজ অল্‌সো এ স্পোর্টস্‌ম্যান! তাই সে এই বোতলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তাই সে আজ রাতে আমাকে এ-ঘরে জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দিল!

: কী কারণ সেটা? শুনি? জানতে চায় মেয়েটি।

শূন্যগর্ভ বোতলটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বব্। হাসল। বললে, নিগারটা জানে—বোতলটা যেমন শেষ হয়ে গেল রাত পোহাবার আগেই, আমিও আজ রাতে তেমনি—

: না। ডরোথি ছুটে এসে ওর মুখে হাত চাপা দেয়।—প্লীজ, ও কথা বোলোনা!

ঢং করে ঘড়িতে আড়াইটা বাজল।

বব্ রয় তার বাহুবন্ধে আবদ্ধ সেই ছলনাময়ীর মুখটা তুলে ধরে। ওর জুলিয়েট নিমীলিত নেত্রে প্রতীক্ষা করে—হয়তো এই ওদের শেষ চুম্বন। ধীরে ধীরে নেমে আসে বব্ রয়ের মুখটা। কবোষ্ণ ওষ্ঠাধরের স্পর্শ পাওয়ার আগেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরে যায়।

শব্দটা ডরোথিও শুনেছে। জ্যোৎস্নালোকিত স্তব্ধ রাত্রির নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে অদূরের কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যেন পুঞ্জীভূত বারুদের স্তূপে স্পর্শ করেছে একটি স্ফুলিঙ্গ। বব্ রয় ছুটে গেল জানলার ধারে। দিগন্তের এক প্রান্তে—ঐ যেদিকে সেই আর্থার ক্রুক্‌সের গোপন আস্তানা—সেইদিকের আকাশটা লালে-লাল হয়ে উঠেছে। আকাশচুম্বী অগ্নিশিখা অন্ধকারকে লেহন করছে।

একধাক্কায় ডরোথিকে সরিয়ে দিয়ে শিপ্-ক্যাপ্টেন ছুটে বেরিয়ে আসে। দোতলা থেকে একতলায়। সেখানে ওর ডেল্টা-বাহিনী সৈন্যদলের কেউ নেই। ওদের তো এই রাত আড়াইটেয় এখানেই সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করার কথা ছিল! সমস্ত বাড়িটা ভূতুড়ে। বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে আবার সে উঠে আসে দোতলায়। ওয়াম্বাসীকে ঘুম থেকে তুলে ব্যাপারটা জানতে চায়।

ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ওয়াম্বাসী ঘরে নেই। তার বিছানার ওপরে কাগজচাপার তলায় একখণ্ড হাত-চিঠি। তুলে নেয় চিঠিখানা। আলোর কাছে সরে এসে পড়তে শুরু করে। পরিচিত হস্তাক্ষর :

"মাই ডিয়ার বাস্টার্ড

শেষ পর্যন্ত শিপ্-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করতে হলো। উপায় নেই। তুই কিছুতেই রাজি হতিস না। আমাকে একা যেতে দিতিস না। আমি জানি। দোষ তোর নয়—দোষ আমাদের। আমার আর আমার ডেস্‌ডিমোনার। আমরা কিছুতেই প্রফেসর আইনস্টোনের সেই আশ্চর্য ফর্মুলাটাকে প্রমাণ করতে পারতুম না—সেই $E = mC^2$। আর দায়ী সেই অজানা লোকটা....যার নাম লিখতে একটা বড় হরফের 'G' লাগে। সেই তো দায়ী আমার এই কালো চামড়াটার জন্যে। কেন এ মারাত্মক ভুলটা করেছিল সে—বলতে পারিস? তাই আমার এই খোদার ওপর খোদগিরি।

আগামী দুনিয়ায় শুধু আলোই থাকবে—অন্ধকার নয়। বিশ্বস্রষ্টার কলঙ্কের সেই শেষ কালিমা-চিহ্নটুকু আজ নিঃশেষে আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। বাকি যা থাকবে তা শুধু খাঁটি সোনা।

কনগ্র্যাচুলেশন্স্।

ইতি—তোর নিগার"

সমাপ্ত